কবিরাজ—শ্রীআশুতোষ সেন,

স্বত্বাধিকারি ও ম্যানেজার।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কলিকাতা

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর-রোড, আদি-আয়ুর্ব্বেদ মেশিন প্রেসে,

শ্রীকেদারনাথ পালিত দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য—১৵০ আনা।

সূচীপত্র।

আয়ুর্ব্বেদ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন।

সমীরণ।

আগমনী।

আবাহন।

রোয়ে জলদ আজু, শরদ বিমানে,
যামিনী চমকি মিলায়ে,
শ্বেত উজলকর, দিনকর ভাতি,
শেফলী বাস বিলায়ে।
উঠ উঠ ভারত! মোহ বিমুক্ত
ঝারহ নয়ন কি বারি,
আয়ে অবনীত, জগজন মাতা,
লহ লহ কোর পসারি।
অসিত বসন তব, চির অবগুণ্ঠন,
আলিস হৃদয় বিলাস,
মুঞ্চ ক্ষণিকতর, শ্বাস সুদীরঘ
শোক দহন হা হুতাশ,
আও পুলকিতর, পুলক বিধায়িনি!
ডাকে জননী উতরোলে,
শোক অছরু কণ, অঞ্চলে বারহ,
দেহ প্রবোধ মধুবোলে।
আও জননী আজু, আও আনন্দে,
বাহ তরণী মৃদুবায়ে,
নাহি সলিল বল, জাহ্নবী বক্ষে
ক্ষীণ জীবন বহি যায়ে।
মেঘ গগনপরট, বিফল আড়ম্বর,
শুষ্ক হৃদয় তট মাঠ,
সরসী বিহীন জল, গাভী তৃষাতুর,
ধূলি পটল বহে বাট।
বাহ তরণী সতি! বাহ আনন্দে,
কাহে সরম হৃদি মাঝ?
সকরুণ রোদন, ভারত সন্ততি,
স্রোত বহাইবে আজ।
বিল্ব তুলসী দল, পাবন বারি
প্রীতি পরম উপহার,
প্রেম কুসুমচয়, ভকতি সচন্দন,
ঢালব চরণ তুহার।

২য় খণ্ড। ১৩০১ সাল আশ্বিন। ১ম সংখ্যা।

আগমনী।

বেদান্তবাদী যথার্থ বলিয়াছেন, এ সংসার মায়াময়। মায়াময় হিন্দুর সংসার ও পরিবারমণ্ডলী। যে পরিবার-পতি সংসার পাতিয়াছেন, চারিদিকেই তাঁহার মায়া—পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, পুত্র কলত্র, সকলই মায়াময়। বৃদ্ধ পিতাকে হিন্দু চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারেন না; মাতার মধুর বাক্য শুনিলে তাঁহার হৃদয় জুড়াইয়া যায়। হিন্দুর জায়া তাঁহার প্রাণসমা প্রিয়তমা। সবাই তাঁহার হৃদয় বন্ধনে গ্রথিত—পিতামাতা ভক্তি ও প্রেমে গ্রথিত, জায়া প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ। যাহারা স্নেহসূত্রে গ্রথিত সেই পুত্রগণ মায়ার পুত্তলী। হিন্দুর পুত্র স্নেহরসে মাখা, কিন্তু পুত্র অপেক্ষা কন্যা বুঝি সর্ব্বাপেক্ষা মায়াবিনী। পুত্র পালনীয়, শাসনীয়; কন্যা কেবল পালনীয়া শিক্ষণীয় উভয়েই। পুত্র অপেক্ষা কন্যার হৃদয় আরও কোমল। সেই কোমল হৃদয়ে কন্যা শিশুকালে জনক জননীকে একেবারে মোহিত করিয়া রাখে। কন্যার আচরণ, ব্যবহার তাহাদের একান্ত মনোহরণ করে। তাঁহারা জানে, কন্যা দুদিন বাদে পরগৃহে যাইবে, তাই সে তত মায়াবিনী হয়।

হিন্দুর সংসার যেমন মায়াময় তেমনি ধর্ম্মময়। সেকালে আর্য্যেরা গৃহী হইতেন, কেবল ধর্ম্মসাধনার জন্য। তাঁহাদের গৃহ অতিথির আশ্রয়, গুরুজনের সেবাস্থান, দেবতার অর্চ্চনালয় এবং ধর্ম্মের কর্ম্মক্ষেত্র? সেকালে ব্রহ্মচারী সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতেন কেবল ধর্ম্মভাবের পরিণতি সাধন করিবার নিমিত্ত। গৃহধামে ধর্ম্মভাবের সম্যক্ পরিপাক না হইলে সংসারী তৃতীয় আশ্রমে যাইবার উপযোগী হইতেন না। সংসারের কর্ম্মক্ষেত্র স্বর্গের দ্বারস্বরূপ ছিল। হিন্দুমতে সংসারধর্ম্মে পরিণত না হইলে স্বর্গধাম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। তাই সেকালে হিন্দুর গৃহ দেবতার অধিষ্ঠান-ভূমি ছিল।

গৃহী কি করিতেন? তিনি পরিবার মধ্যে মায়ায় পরিবৃত হইয়া কি চিরকাল থাকিতেন? তিনি জানিতেন গৃহপুর

তাঁহার গন্তব্য স্থলে যাইবার পথ মাত্র। তাঁহার যাইবার স্থান মায়াময় গৃহের অনেক দূরে। সেই স্থানে [illegible] তিনি গৃহধামে প্রস্তুত হইতেন। যে মায়ায় পুত্র পরিবারগণ আবদ্ধ, সেই মায়াকে তিনি সংসার হইতে অপনীত করিয়া ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরে নিয়োজিত করিতেন। তিনি পিতৃভক্তিতে সর্ব্বপালন-কর্ত্তাকে সর্ব্বোপরি পিতৃরূপে দেখিতেন। জননীর উপর বিশ্বজননীকে পূজা করিতেন। তদপেক্ষা আরও নিকট ভাবের অধিকারী হইলে, যশোদা যেরূপ ব্রজদুলালকে একবারও চক্ষুছারা করিতে পারিতেন না তদ্রূপ নিকট-ভাবে ইষ্টদেবকে তিনি পুত্রবৎ দেখিতেন। পুত্রবাৎসল্য তখন ঈশ্বরে গিয়া স্থাপিত হইত। যে স্নেহে লোকে পুত্রকে ভালবাসে, সেই স্নেহে আর্য্যঋষি ঈশ্বরকে ভালবাসিতেন। তাঁহার ভালবাসা তদপেক্ষাও ঘনতর হইত। যে বাৎসল্য কন্যাতে স্থাপিত, সেই বাৎসল্য রসে নিমগ্ন হইয়া ঋষি ঈশ্বরকে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখিতেন। তখন তাঁহার যশোদার ভাব গিয়া মেনকার বাৎসল্যোদয় হইয়াছে। যে বাৎসল্যোদয়ে পাষাণীও গলিয়া যায়, সেই বাৎসল্যে ঋষি ইষ্টদেবকে হৃদয়-পুরী মধ্যে স্থাপিত করিতেন। তাঁহাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিতেন, ক্ষীর ননী খাওয়াইতেন, আদরে হৃদয়ে বসাইতেন, এবং তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াও যেন তৃপ্ত হইতেন না। মাতা যেমন পুত্রকেও লুকাইয়া কর্ত্তার স্নেহ-পাশে বদ্ধ হইয়া তাহার তৃপ্ত্যর্থ নিজ গোপনীয় সমস্ত ধন বিতরণ করেন, আর্য্যঋষি তেমনই ভাবে ঈশ্বরকে হৃদয় খুলিয়া সমস্ত ভালবাসা অর্পণ করিতেন। এই ভালবাসাভাব আগমনীতে প্রকটিত।

কন্যার প্রতি মাতার যতদূর হৃদয়ের টান, ততদূর টানে পূর্ব্বতন ঈশ্বরপরায়ণ আর্য্যগণ ব্রহ্মানুরাগী ছিলেন। সাত্ত্বিক বাৎসল্যরসে নিমগ্ন হইয়া দেবতাকে পুত্রবৎ স্নেহ, পুত্রবৎ কেন, মাতা যেমন কন্যাকে স্নেহ করেন ততই স্নেহে দেবতাকে হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠিত করিতেন। কিন্তু শুদ্ধ এই কথা বলিলেই তাঁহাদের সাত্ত্বিক বাৎসল্যভাবের সম্যক্ পরিচয় হয় না। যদি বল, পুত্র অপেক্ষা কন্যার প্রতি মাতার অধিক টান কেন হয়? তাহার একটি কারণ এই, কন্যা সর্ব্বদা পরগৃহেই থাকেন। চক্ষের অন্তরালে থাকাতে কন্যার জন্য মাতা অধিকতর ব্যাকুলা। তিনি কন্যার নিমিত্ত যেন সতত অন্যমনস্কা। তিনি কন্যার জন্য যখন তখন ভাবিতেছেন। সেই কাতরতায় তিনি মধ্যে মধ্যে কন্যাকে নিজ পার্শ্বে আনিয়া বিশেষরূপে যত্ন করেন। যাহাকে এতদিন যত্ন করিতে পারেন নাই, তাহাকে পাইয়া মনের সাধে যত্ন করেন। সেই যত্নে কন্যা মাতার বিশেষ আদরিণী। কন্যারও হৃদয়-ব্যথা উথলিয়া উঠে। তিনি শ্বশুর গৃহের সমস্ত দুঃখ ও কষ্ট মাতাকে জানান। দুজনে এক সঙ্গে বসিয়া অশ্রুজলে চক্ষু ভাসাইয়া দেন। তাহাতে তাহাদের হৃদয়-ব্যথা আরও বর্দ্ধিত হয়। কন্যা, মাতার আরও নিকটবর্ত্তিনী হন। আবার যখন মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্না হইয়া সেই কন্যাকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাওয়া হয়, তখন মাতার সমুদয় হৃদয়-ব্যথা উথলিয়া উঠে। সেই হৃদয়-ব্যথায় মাতা কাঁদেন,

তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া কন্যারও ক্রন্দন আইসে। এইরূপে কন্যার প্রতি মাতার টান চিরদিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। উমার প্রতি মেনকার টান তদ্রূপ চির-দিনের টান। তাহা চিরদিন বর্দ্ধিত হইয়াছে। যাঁহারা একান্ত ঈশ্বর-পরা-য়ণ, তাঁহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠা তদ্রূপ চিরদিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। একবার তাহা-দের হৃদয় হইতে ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলে তাঁহারা কাতর হন। আবার ব্রহ্মকে লাভ করিয়া দ্বিগুণতর যত্নে তাঁহাকে হৃদয়-কন্দরে স্থাপন করেন।

কিন্তু কন্যার প্রতি মাতার টান সর্ব্বস্থলে সমান প্রকাশিত হয় না। কন্যার অবস্থানুসারে তাহা প্রকটিত হয়। কন্যার অবস্থা ভাল হইলে মাতার টান কিছু কমে না, তাহা কেবল সকল সময়ে বাহ্য কাতরতায় তত প্রকাশিত হয় না। কিন্তু যে স্থলে কন্যার অবস্থা তত সুখের নহে, সে স্থলে মাতার কাত-রতা দেখে কে? তাঁহার কাতরতা যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া বাহিরে দেখা দেয়। কন্যা রাজরাণী হইলে মাতার যে একে-বারে কাতরতা নাই এমত নহে, তবে তাঁহার হৃদয়-ব্যথার অনেক দূর শান্তি হয়। কন্যা রাজরাণী হইলে যে পরি-মাণে সেই ব্যথার শান্তি হয়, কন্যা ভিখা-রিণী হইলে তাঁহার ততোধিক অশান্তি ঘটে। কাতরতার আর ইয়ত্তা থাকে না। মাতা অহঃরহ অশ্রুজলে ভাসিতে থাকেন। উমার জন্য মেনকার কাতরতা ততদূর অশান্ত ছিল। সেই কাতরতায় পাষাণও গলিয়া গিয়াছিল। গিরিরাজ গলিয়া গিয়া উমাকে আনিলেন। ব্রহ্মের জন্য মানবহৃদয়ের কাতরতা এইরূপ হওয়া চাই। যে ঈশ্বরপরায়ণতা ততদূর কাতর নহে, সে ঈশ্বরপরায়ণতার সম্যক পরিণতি হয় নাই। ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তির নিকটস্থ হইলে পাষণ্ডেরও ভক্তি সঞ্চার হওয়া চাই। তাহাতে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাওয়া চাই। এই রাগই প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগ। এই রাগের ছবি আগমনীতে দেওয়া আছে।

সেই বসন্তকালে বঙ্গবাসী দেবপরায়ণ একবার দুর্গাপূজার উৎসবে মাতিয়া-ছিলেন। সে উৎসব মনে অনেকদিন জাগরিত ছিল। কিন্তু সে উৎসবের তরঙ্গ মনে মনে ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল। তখন সাত্বিক বঙ্গবাসীর হৃদয় দেববিরহে কাতর। তিনি ঈশ্বরের সমস্ত শক্তিরূপ একবার প্রত্যক্ষ প্রতীয়-মান করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে যে ভগবৎ শক্তি জাজ্বল্যমান, তাহা ভগ-বতীতে আঁকিয়া ছিলেন; ঈশ্বরভক্তের অন্তরে যে ঐশ্বর্য্য, তাহা লক্ষীতে দিয়া ছিলেন; ভক্তের যে উজ্জ্বল দিব্যজ্ঞান ও পবিত্রতা, তাহা সরস্বতীতে প্রতি-ফলিত করিয়াছিলেন; ভক্ত-হৃদয়ের যে অদম্য বীরত্ব, যে বীরত্বে সমস্ত পাপা-সক্তিরূপ পাপাসুর বিজিত হয়, যে সংযম-বীরত্বে রিপুকুল বশীভূত হয়, ভক্ত হৃদয়ের সেই বীরত্ব, যাহা ভগবৎ শক্তিরই অঙ্গ, তাহা কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমান দেখিয়াছিলেন; আর ততদূর বীরত্ব নহিলে কি যোগসিদ্ধি লাভ হয়? ভগবৎ-শক্তি-প্রসূত সেই সিদ্ধি গণেশের প্রতিমায় অগ্নিবৎ উজ্জ্বল দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া তিনি যে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দেখেন, যাঁহাকে কার্য্যে, অনু-ষ্ঠানে, ধ্যানে, ধারণায় হৃদয়ে মূর্ত্তিমান

করিয়াছেন, সেই দেবার্চ্চনার উৎসবে তিনি একদা যেরূপ মত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহরাগে কত যত্নের সহিত পূজা করিয়াছিলেন, তাহা কি তিনি কখন ভুলিতে পারেন? আবার বঙ্গীয় ভক্ত হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। ভক্ত সেই দেবমূর্ত্তির স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। মাতা যেরূপ পরগৃহবাসিনী কন্যার স্বপ্ন দেখেন, বঙ্গীয় ভক্ত সেইরূপ দেবস্বপ্নে কাতর হইলেন। কেন তিনি এতদিন দেবতাকে দূরে রাখিয়াছিলেন? আর কি তিনি সে ঈশ্বরকে ধ্যানে আনিতে পারিবেন?

তিনি যে অনেক কষ্টে ভগবৎ শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়াছিলেন। সে সংযম তাঁহার মনে আছে যে সংযমে রিপু ও ইন্দ্রিয়দমন হইয়াছিল। সেই অগ্নিতেজ তাঁহার স্মরণ হইল, যে অগ্নি-তেজে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার স্মরণ হইল যে তত্ত্বজ্ঞানে তিনি পরম পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন; সেই হৃদয়-পূর্ণতা তাঁহার স্মরণ হইল, যে পূর্ণতায় তিনি সমস্ত ভগবৎ বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন; এই সমস্ত স্মরণ করিয়া তিনি সমগ্র ভগবৎ শক্তি হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। এই কৈবল্যদায়িনী ভগবৎ শক্তিকে তিনি স্বপ্নে প্রতীয়মান দেখিতে লাগিলেন। অনেক দিনের বিরহে ভক্তি এইরূপে প্রকটিত হইল। বিরহে ভক্তি এইরূপ স্বপ্নময়ী হইয়া উঠে। কৃষ্ণবিরহে রাধিকা শতবৎসর ধরিয়া শ্যামস্বপ্নে জীবিতা ছিলেন। মেনকাও স্বপ্নময়ী ভক্তি। বিরহেই ভক্তির প্রকৃত রূপ প্রকটিত হয়। তাই পরমভক্ত নারদ বলিয়াছেন;—

"তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে
পরমব্যাকুলতেতি।"

নিজকৃত সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ এবং তাঁহাকে বিস্মৃত হইলে যে চিত্তের একান্ত ব্যাকুলতা জন্মে তাহারই নাম ভক্তি।

বিরহেই অনুরাগের প্রকোপ। অনুরাগের প্রকোপ মিলনের জন্য। বিরহেই ভক্তির পরিপুষ্টি সাধন হয়।

ভক্তের কাছে যেমন দেবতার আদর, তেমনি দেবতার কাছে ভক্তির আদর। ভক্তি যেমন দেবতার প্রিয়, ততদূর প্রিয় আর কিছুই নাই। দেবী যে ভক্তের নিকট বসন্তোৎসবে উদয় হইয়াছিলেন, তাহার ভক্তি ছয় মাস পরে আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। বর্দ্ধিতা ভক্তির নিকট চির যৌবনা উমা তাই কন্যাভাব ধরিলেন। সন্তান বৃদ্ধ হইলে মাতা যেমন কন্যাস্থানীয় হয়েন, বৃদ্ধা ভক্তির নিকট, উমা সেইরূপ কন্যাভাবে আসিলেন। সন্তানের পালনীয়া মাতা, সন্তানকে যে ভাবে দেখেন, আজি উমা বৃদ্ধ ভক্তকে সেই ভাবে দেখিতেছেন। ভক্তও সেই জন্য বাৎসল্যরসে দেবীকে গৃহে আনিতেছেন। একদিন মাতৃভক্তিতে উদ্বোধিত হইয়া যাঁহাকে পূজা করিয়াছেন, আজি কন্যা বাৎসল্যে তাঁহাকে আদরে হৃদয়মন্দিরে আহ্বান করিতেছেন। এ আহ্বান অতি মধুর, সঙ্গীতের ন্যায় মধুর। সেই মধুর সঙ্গীত রবে আগমনী ধ্বনিত হয়। আগমনী হৃদয়ের আহ্বান-গীত—দেবীকে ভক্তহৃদয় আহ্বান করিতেছে। দেবীও ভক্তের হৃদয়ে আকৃষ্ট হইয়াছেন। এই পরস্পর আকর্ষণের মিলন-ছবি দুর্গোৎসব। আগমনী সেই আকর্ষণ শক্তি।

বোধনে ভক্তির উদয়, প্রতিষ্ঠা ও ঘট-স্থাপনা; আর মিলনের ফল দশভূজা প্রতিমা। ভক্তি-জগতে এমন এক সময় উপস্থিত হইয়াছিল, যখন ঠিক এইরূপই ঘটিয়াছিল। যাহা একদিন ঘটিয়াছিল, জগতে তাহা অমূল্য নিধি। সে অমূল্য নিধি কি জগৎ ভুলিতে পারে? তাই তাহা প্রতিবৎসরে ভক্তির উচ্চ আদর্শ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করে—পূজা করে। বাস্তবিক এ আদর্শ প্রতিবৎসর নয়ন-ছবি-রূপে জাগরূক রাখা আবশ্যক। এ আদর্শ ভক্তির দেবত্ব। দেবত্বের পূজায় সত্ত্বগুণেরই গৌরব বৃদ্ধি হয়।

এই উদ্দেশেই কালিকাপুরাণ পৌরাণিক ভাষায় বলিতেছেন;—

"পূর্ব্বকালে সায়ম্ভুব মনুর অন্তরে দেবী ভগবতী, দেবগণের হিতের নিমিত্ত দশ-ভুজা রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এই রূপ ইতিবৃত্ত আছে। উহা মনুষ্যদিগের ত্রেতাযুগের আদিতে জগতের হিতের নিমিত্ত সংঘটিত হয়। পূর্ব্বকালে যেরূপ ঘটিয়াছিল, প্রতিকল্পেই সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। প্রতি কল্পেই দৈত্য দিগের নাশের নিমিত্ত দেবী স্বয়ং প্রবৃত্ত হন এবং রাবণ, রাক্ষস ও রামও প্রতি কল্পে উৎপন্ন হন। প্রতিকল্পে ঐ উভয়ের সেইরূপ যুদ্ধ হয় এবং পূর্ব্বের মত দেবতাদিগের সহিতও রামের সঙ্গ হয়। এই রূপ হাজার হাজার রাম এবং হাজার হাজার রাবণ পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে; ভূত ও ভবিষ্যতে দেবীরও এইরূপ প্রবৃত্তি হইবে। সকল দেবগণ কল্পে কল্পে দেবীর পূজা ও স্বসৈন্যের নীরাজন করেন; অতএব মনুষ্যদিগেরও যথাবিধি দেবীর পূজা করা উচিত।"

দেবী কে? এই দেবী-তত্ত্ব ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে;—

"একদা শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজ নন্দকে বলিতেছেন, দুর্গা আদিভূতা নারায়ণী শক্তি। আমার ঐ শক্তি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কারিণী। আমার ঐ শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্মাদি দেবতা সকল বিশ্বসংসার জয় করেন। ঐ শক্তি হইতেই এই সংসারের উৎপত্তি। আমি জগতের সংহারের নিমিত্ত দেব দেব মহাদেবকে ঐ শক্তি প্রদান করিয়াছি। আমার ঐ শক্তি দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, ও লজ্জাস্বরূপিণী। উনিই গোলকে রাধিকা, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী, কৈলাসে সতী এবং হিমালয়ে পার্ব্বতী। উনিই সরস্বতী ও সাবিত্রী। বহ্নিতে দাহিকা শক্তি, ভাস্করে প্রভাশক্তি, পূর্ণচন্দ্রে শোভাশক্তি, জলে শৈত্য শক্তি, শস্যে প্রসূতিশক্তি, ধরণীতে ধারণাশক্তি, ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ্য শক্তি, দেবগণে দেবশক্তি, তপস্বীতে তপস্যাশক্তি, সকলই উনি। আমার ঐ শক্তি গৃহিগণের গৃহদেবতা, মুক্তের মুক্তি রূপা এবং সাংসারিকের মায়া। আমার ভক্তগণের মধ্যে উনিই ভক্তিদেবীরূপে বিরাজিতা। রাজার রাজলক্ষ্মী, বণিকের লভ্যরূপা, সংসার-সাগরোত্তরণে দুস্তর তারিণী বেদরূপা, শাস্ত্রে ব্যাখ্যা-রূপিণী, সাধুগণের সদ্বুদ্ধিরূপা, মেধাবীতে মেধা স্বরূপা, দাতৃগণে দানরূপা, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণে বিপ্রভক্তিরূপা, সাধ্বী স্ত্রীতে পতি-ভক্তিরূপা, সকলই ঐ শক্তি। এক কথায় আমার দুর্গাশক্তি সর্ব্বশক্তি স্বরূপা।"

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা সর্ব্বশক্তির শক্তিরূপিণী তাহাই ভগবতী। এই শক্তির

প্রভাব উপলব্ধি করিয়া যখন ভক্ত মস্তক অবনত করেন তখনই তাঁহার পূজা করেন। যখন সেই দেবশক্তিতে জীব অনুপ্রাণিত হয় তখনই তাঁহার উদ্বোধন হয়।

এক্ষণে রামতত্ত্ব কিরূপ বেদে উক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রকটিত হইতেছে। "রামশব্দে অদ্বৈত পরমাত্মাকেই বুঝায়, যোগিগণ অন্তে যাঁহাতে রমণ করেন, তিনিই রাম।

"রমন্তে যোগিনোঽনন্তে।"

অন্যত্র;—

প্রণবের অকার জাগ্রদভিমানী লক্ষ্মণ, উকার স্বপ্নাভিমানী শত্রুঘ্ন, মকার সুষুপ্ত্য-ভিমানী ভরত, রাম ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ অর্দ্ধ-মাত্রাত্মক আর শ্রীরামের সান্নিধ্য বশতঃ জগতের আনন্দদায়িনী এবং সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণীভূত সীতাকে মূল প্রকৃতিরূপা জানিবে। তিনিই বিন্দু। যখন সীতা প্রণবের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন ব্রহ্মবাদিরা তাঁহাকে প্রকৃতি বলেন।

"অকারাক্ষরসম্ভূতঃ সৌমিত্রি র্বিশ্বভাবনঃ।
উকারাক্ষরসম্ভূতঃ শত্রুঘ্নস্তৈজসাত্মকঃ॥
প্রজ্ঞাত্মকস্তু ভরতো মকারাক্ষরসম্ভবঃ।
অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ॥ ৬
শ্রীরামসান্নিধ্য বশাজ্জগদানন্দদায়িনী।
উৎপত্তি স্থিতিসংহারকারিণী সর্ব্বদেহিনাম্॥
সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূল প্রকৃতিসংজ্ঞিতা।৮
প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।"

রামতাপনীয়োপনিষদঃ।

বেদে যে যোগতত্ত্ব প্রচারিত, রামায়ণে তাহার কাব্য সৃষ্টি। যোগীর চিত্তাবস্থাই দৈত্য দানব এবং রক্ষঃ পিশাচ। যোগশাস্ত্রে দেখুন রক্ষঃ এবং দৈত্য দানব কি?

"অন্তঃকরণকে চিত্ত কহে। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র আর নিরুদ্ধ ভেদেচিত্তের অবস্থা পঞ্চবিধ। রজোগুণের উদ্রেক হওয়ায় যে অবস্থাতে চিত্ত অস্থির হইয়া সুখ দুঃখাদি জনক বিষযে প্রবৃত্ত হয় সেই অবস্থাকে ক্ষিপ্তাবস্থা কহে। তাহাই দৈত্য দানবাদির অবস্থা। যে অবস্থায় তমোগুণের উদ্রিক্ততাদি নিবন্ধন কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য-বিচার-বিমূঢ় হইয়া ক্রোধাদি বশতঃ চিত্ত সর্ব্বদা বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে মূঢ়াবস্থা কহে। সেই মূঢ়াবস্থাই রক্ষঃ পিশাচের অবস্থা। সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে চিত্ত দুঃখকর বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বদা সুখ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। ঐকালে চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থা জন্মে। এই অবস্থা দেবতাদিগের অবস্থা। সত্ত্বগুণে বিশুদ্ধ হইলে চিত্তের একাগ্রতা ও নিরুদ্ধাবস্থা জন্মে।" *

এই রাক্ষস ও পিশাচের অর্থে আমাদের শাস্ত্রে রাক্ষস ও পৈশাচিক বিবাহ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, বোধ হয়।

সুতরাং প্রতীত হইতেছে, যতদিন ইন্দ্রিয়গণ শাসিত না হয়, ততদিন তমোগুণের প্রাধান্য আছে। দশেন্দ্রিয়রূপী দশানন রাক্ষস। ইন্দ্রিয়লালসা সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষসবৎ। সেই রাক্ষস, প্রকৃতিরূপিণী সীতাকে দেবক্রোড় হইতে হরণ করে। সেই দেবত্বে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করাই রামায়ণ ও যোগ। পরমাত্মরূপী জীব যখন রাক্ষস-বিজয়ী হয় তখন সীতার সহিত রামের মিলন হয়। জীব এই বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া একদা যোগমায়া শক্তির আরাধনা করেন। যখনই সেই রূপ আরাধনা করেন, তখনই দুর্গাপূজা

* শ্রীজয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন।

হয়। দুর্গাপূজা যোগশক্তির সাধনা। যোগসিদ্ধিরূপ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যোগী এই সাধনায় প্রবৃত্ত হন। সাধনাই সিদ্ধির কারণ। যে সিদ্ধির ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যিনি ভগবতীর আরাধনা করেন, ভগবতী তাঁহাকে সেই ফলই প্রদান করেন। কারণ,

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

যোগী সেই ফলাভিলাষী হইয়া যখন যোগারূঢ় হয়েন, তখনই তিনি শক্তিতে উদ্বোধিত হন। তাহার চিত্তে যোগশক্তি সঞ্চারিত হয়। সেই শক্তিতে পূর্ণ হইয়া তিনি যোগ সাধনায় দৃঢ়ব্রত হয়েন। এই উদ্বোধনই দুর্গোৎসবের বোধন।

গীতায় কথিত হইয়াছে ফলকামনায় যাঁহারা ঈশ্বরাধনা করেন, তাঁহারা ফলই প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের নিকট ঈশ্বর ফলদাতা মাত্র। যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঈশ্বর পূজা করেন, তাঁহারা আর ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন না, ফলই লাভ করেন। যাঁহারা ঈশ্বরকে কামনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরকেই লাভ করেন। কিন্তু ঈশ্বর-কামনা করিতে গেলে অন্য সর্ব্ব-কামনা পরিত্যাগ করিতে হয়। তত-দূর ঈশ্বর-পরায়ণতা বড় সহজ কথা নহে। তাহা ঈশ্বরানুরাগের পরিপূর্ণতা। ঈশ্বরানুরাগ অত্যন্ত প্রবল না হইলে আর জীব সর্ব্বকামনা পরিত্যাগী হইয়া কেবল ঈশ্বরেরই অভিলাষী হইতে পারেন না। চিত্তের যখন এই অবস্থা ঘটে, যখন চিত্ত কেবল ঈশ্বরানুরাগী হয়, তখনই চিত্তের একমাত্র স্বপ্ন ঈশ্বর। ঈশ্বর লাভের জন্য তখন চিত্ত একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। সেইরূপ ব্যাকুলতা হয়, যেরূপ ব্যাকুলতায় গিরিরাণী গিরিরাজকে গলাইয়াছিলেন, যেরূপ ব্যাকুলতায় মহারাসে গোপীগণ অচেতন বৃক্ষকেও বলিয়াছিলেন, হে বৃক্ষ, কৃষ্ণ কোথায় গেলেন বলিতে পার? যাহা যাহা সম্মুখে দেখিয়াছিলেন তাহাকেই অধীরতার সহিত সেই প্রশ্ন বারম্বার করিয়াছিলেন। তাহাদের জ্ঞান ছিল না, কাহাকে তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে। বাস্তবিক, অত্যন্ত ব্যাকুলতা হইলে চিত্তের ঠিকভাব এই রূপই ঘটিয়া থাকে। যখন চিত্ত এই অবস্থায় উপনীত হয়, তখনই তাহা গিরিরাণীর সুরে কাঁদিয়া উঠে। ঈশ্বর লাভের জন্য কাঁদিয়া পাগল হয়।

আগমনীতে এই কাতরতা উচ্ছ্বসিত। ঈশ্বরের জন্য চিত্তের এই কাতরতা কিসের সহিত তুলনা হয়? মাতৃভক্তি এ ব্যাকুলতা নয়। বাৎসল্য বুঝি তাহার তুলনীয়। বহুদিন কৃষ্ণকে না দেখিয়া যশোদা যেরূপ কাতরা হইয়া প্রভাসে গিয়াছিলেন, সেই কাতরতা একদিন যোগীর ঈশ্বরলাভ জন্য ব্যাকুলতার সহিত তুলনীয় হইতে পারে। আর তুলনীয় বহুকাল কন্যাহারা মাতার বাৎসল্য। সে বাৎসল্য উথলিয়া উঠে। এক পল-কের বিরহ তাহা বুঝি আর সহ্য করিতে পারে না।

"এনে দাও আমার উমারে।"—

বলিয়া সে বাৎসল্য একেবারে অধীর হইয়া উঠে। এই প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগের ছবি আগমনীতে প্রতিফলিত। ভক্তির এই ঐকান্তিকতা প্রতিবৎসরে উদ্বোধিত করিবার জন্য আগমনীর গান বঙ্গধামে সঙ্গীত হইয়া থাকে। প্রতিবৎসরেই তাহা নূতন হইয়া আইসে। এমত দেব-তুল্য ভগবদ্ভক্তি যদি নূতন বলিয়া না

বোধ হইবে, তবে ত জীব নিতান্ত অচেতন। বঙ্গদেশ এত অচেতন নয় যে, এই গানে উদ্বোধিত না হইবে। তাই যখনই আগমনীর সুর হেমন্তাগমনে বঙ্গবাসীর শ্রবণে প্রবেশ লাভ করে, তাঁহার হৃদয় তখনই অমনি উথলিয়া উঠে। দুর্গোৎসবের জন্ত বঙ্গবাসী অধীর হইতে থাকেন। তাঁহার ভক্তির উৎস উৎসারিত হইবার জন্ত যেন উন্মুখী হয়। তাঁহার হৃদয়ে দুর্গোৎসব আইসে। এই ভক্তি-ভাব কি মধুর!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

ফুলরাণী।

১

রবিটি কেঁদে গেছে—
ছবিটি বিধে আছে
এখনো প্রাণেরে!
আকাশে তারাগুলি
উজ্জ্বল আঁখি মেলি'
চাহিছে ধীরে ধীরে
চাঁদিমা পানে রে!

* * *

২

ফুটিল ফুলদল,
ছুটিল পরিমল,
লুটিল সমীরে!—
ত্যেজিয়া সুরপুরী,
মাধুরী-কর ধরি,'
নামিল সুরবালা
কুসুম-নিকেতনে—
গাঁথিল ফুল-মালা
সোহাগে—সযতনে,
সোহাগে দিল ফুলে
মোহন চুমি রে!—

৩

সলাজে মরি! মরি!!
কুসুম পড়ে ঝরি'
তটিনী-বুকে রে!
সমীরে কাঁপি কাঁপি,
সোহাগে ঝাঁপি ঝাঁপি,
গাহিল গরবিনী
মোহন মৃদু তানে—
ফুলের "ফুলরাণী"
মরিল ফুল-বানে;
জীবনে সঁপি' কায়া
ভাসিল সুখে রে!!—

শ্রীরমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

জম্বু
ও
মণিচোরার সুড়ঙ্গ !

জম্বু হিন্দু রাজ্য—কাশ্মির-রাজের শীতাবাস। ইহাকে কাশ্মিরের প্রবেশ-দ্বার বলিলেও বলা যাইতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা জম্বুতে গিয়াছিলাম। আমার কাকা জম্বুতে থাকিতেন; তাঁহার কন্যার বিবাহোপলক্ষে আমরা প্রায় সকলেই জম্বুযাত্রা করিলাম। তখন আমি সামান্য বালক মাত্র—কিন্তু শিশু নহে। তখনও উপন্যাস পড়িতাম; কবিতা বড় ভাল লাগিত। তখনও 'কপালকুণ্ডলা' পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম; 'ছিন্নমুকুল' পড়িয়া কাঁদিয়াছিলাম—এক কথায়, তখনই আমার মনে কি যেন কিসের 'ছায়া পড়িয়াছিল; সুতরাং দেশ ভ্রমণের নামে হৃদয় নাচিয়া উঠিল।

যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন লাহোর হইতে কেবল সেয়ালকোট পর্য্যন্ত রেল হইয়াছিল—জম্বু পর্য্যন্ত হয় নাই; সুতরাং আমরা সেয়ালকোটের টিকিট লইলাম। রাত্রি ১০ টার সময় ট্রেন লাহোর ছাড়িল—ভীম গর্জ্জনে মেদিনী কাঁপাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল! লাহোর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে যেমন জনকোলাহল-পূর্ণ সুন্দর সুন্দর ষ্টেশন গুলি দেখিতে পাওয়া যায়, এ পথে সেরূপ একটীও দেখিলাম না। যাহাও দেখিলাম তাহার অধিকাংশই ক্ষুদ্র, ভগ্ন, ও জনহীন।

ঊষার কনক-মাধুরীতে জগৎ হাসিল, আমরাও সেয়ালকোট পৌঁছিলাম। সেয়ালকোট নগরটী ক্ষুদ্র কিন্তু মনোহর। আমার চক্ষে আরও মনোহর বোধ হইল, কারণ সুবিখ্যাত পূর্ণচন্দ্র এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তাঁহার সহিত সুন্দরার প্রণয় সংঘটিত হয়, এবং এই স্থানেই তাঁহার বিমাতা 'লোনা' তাঁহার সহিত অবৈধ প্রণয়-লাভে হতাশ হইয়া ঘোর ষড়যন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে এক গভীর কূপে নিক্ষেপ করেন। সেই কূপটীও দেখিলাম—দেখিয়া মনোমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার হইল!

সে যাহা হউক আমরা একখানি পাল্কি-গাড়ী ভাড়া করিয়া জম্বুযাত্রা করিলাম।

আকাশ মেঘ-নির্ম্মুক্ত, নির্ম্মল। সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণে জগৎ হাসিতেছিল—দূরে দু'একটী পাখি গাছের সুন্দর শ্যামিকায় গা ঢাকিয়া তরুণ অরুণের প্রতি চাহিয়া করুণ স্বরে যেন কোন অজ্ঞানিত অদৃষ্ট শক্তিকে আহ্বান করিতেছিল। যেন সে আহ্বানে মানবের স্বার্থপরতা নাই—তাহাতে যেন "কি যেন" মাখান! সে আহ্বান হৃদয় মাঝারে কি যেন এক সঙ্গীত-প্রবাহ ঢালিয়া দেয়—নীরব বীণা জাগিয়া কাঁদিয়া উঠে, হৃদয়-মাঝারে যেন কোন উদাস স্বরলহরীর মৃদুল প্রতিধ্বনি আনয়ন করে!

সে যাহা হউক আমাদের গাড়ি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। পথটী প্রস্তর পূর্ণ; কষ্টের কথা বলা বাহুল্য। পথের উভয় পার্শ্বে-গোধুম-ক্ষেত্রের অনন্ত বিস্তার—প্রভাত-সমীরণে অনন্ত সাগরোর্ম্মির ন্যায় হিল্লোলিত হইতেছিল! দূরে—বহু দূরে হিমাণী-মণ্ডিত পর্ব্বত রাজির ক্ষীণ নীলিমা নবোদিত নীরদমালার ন্যায় শোভা পাইতেছিল! আমার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল—বোধ হইল যেন কোন মেঘপুরে কিন্নর বৃন্দের কুসুম-রাজ্যে গমন করিতেছি! ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, সূর্য্য-কিরণ প্রখর হইল; আমরা "নওয়া সরাই" পৌছিলাম। নওয়া সরাই" একটী ক্ষুদ্র চটী। ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বর্দ্ধমান জেলার 'কৈচোর' বা গুড়ুন্‌দিঘী'র ন্যায় নহে,—ইহা একটী ক্ষুদ্র বারিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উভয় পার্শ্বে কতকগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ ও দোকান; এক পার্শ্বে এক গভীর কূপ, এবং মধ্যে প্রশস্ত প্রাঙ্গন।

পিশিমা এখানে রন্ধনাদির যোগাড় করিতে লাগিলেন। কিন্তু গাড়োয়ান বিষম আপত্তি তুলিল, কহিল, এখানে বিলম্ব করিলে জম্মু পৌছিতে রাত্রি হইবে, পথে পাহাড়ী দস্যুরা মারিয়া ফেলিবে। আমাদের নানা জেদ সত্বেও সে সেখানে থাকিতে রাজি হইল না, কাজেই আমাদের জলযোগের ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। আমরা দলে পাচজন। আমি, পিশিমা, তাঁহার দুই পৌত্র, ও কাঙ্গাড়াজেলা নিবাসী জনৈক 'অদ্ভুত' পাহাড়ী ভৃত্য। দুধ ও বরফী কিনিলাম। এখানে দুধ ভারি সস্তা—খাঁটি দুধ টাকায় ১৬।১৭ সের। কিন্তু বরফী মুখে দিয়া ই—হরি! হরি!! এ যে আটার ঢিবি!!! বোধ হয় দোকানী তাহার মান্ধাতার আমলের, ছাতা-ধরা, "সুন্দর সবুজ" বরফীর বৌনিটা সর্ব্ব প্রথম আমাদের উপরই ঝাড়িল! যাহা হউক, কোন প্রকারে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। সমস্ত দিন নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই জম্মুর নিকটবর্ত্তী হইলাম। প্রথমেই সম্মুখে দেখিলাম—বাহুদেবীর বিশাল পর্ব্বত। বোধ হইল পর্ব্বতটী আমাদের নিকট হইতে যেন এক রশি তফাতেই আছে—দৌড়িয়া গিয়া ছুঁইলেই হয়। কিন্তু গাড়োয়ান বলিল এখনও ৭ মাইল তফাৎ আছে—সে আরও বলিল যে 'সতীর' বাহু ঐ স্থানে পড়াতে উহার নাম "বাহুদেবী" হইয়াছে। ইহা ঐ স্থানের হিন্দুদিগের একটী পবিত্র তীর্থ স্থান।

পর্ব্বতটী 'তাবী' নদীর উপরেই, এবং উহার সর্ব্বোচ্চ শিখরে জম্মুর সুদৃঢ় কেল্লা—আকাশ পটে চিত্রিত চিত্রের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া উন্নতমস্তকে দক্ষিণদিকে চাহিয়া দেখিতেছে—পঞ্জাব কতদূর—যেখানে গোলাবসিংহের প্রতাপের প্রথম বিকাশ পরিস্ফুট হয়।

গাড়ি একটা বাক ফিরিল—তাবিতট-স্থিত অসংখ্য গৃহমালা-শোভিত রবিকর-প্রোজ্জ্বল জম্মু নগরী একখানি চিত্রিত চিত্রের ন্যায় নয়ন-সম্মুখে জ্বলিয়া উঠিল! আনন্দোৎফুল্ল লোচনে দেখিলাম প্রসন্ন-সলিলা "তাবী" 'সৌধ-কিরীটিনী' জম্মুর সুন্দর ছায়া বুকে করিয়া আপন মনে ভাসিয়া চলিয়াছে! জম্মু পর্ব্বতোপরি স্থিত—সুতরাং মনোমুগ্ধকর! তার

হিন্দুরাজ্য ; অসংখ্য স্বর্ণ-চূড় মন্দির অস্তমান সূর্য্যের হেমকিরণে জল্ জল্ জ্বলিতেছে ! দূরে এক উচ্চ শীখরে রাজ-ভবন। তাহারপর পর্ব্বত—পর্ব্বতের পর পর্ব্বত—সাগর-তরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গে তরঙ্গে,- রঙ্গে ভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া যেন দূরে গিয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া কুজ্ঝটিকায় পরিণত হইযাছে !!

আমরা অগ্রসর হইলাম, কিন্তু সহসা গাড়ির চাকা চোরাবালিতে বসিয়া গেল! আমরা নামিতে বাধ্য হইলাম, এবং বহু-কষ্টে কতকগুলি বিশাল বপু কাশ্মিরী কুলীর সাহায্যে তীরে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, কাকা আমাদেব জন্য কয়েক খানি পাল্কি পাঠাইয়া দিযাছেন, কাবণ পাল্কি বা পদযুগলের সাহায্য ভিন্ন পাহাড়ে উঠিবার অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু পাল্কি দেখিয়াই আমার হরি ভক্তি উড়িয়া গেল ! "পাল্কি" নাম শুনিয়া পূর্ব্বে আমা-দের দেশের 'পতড়-সেবনকাবী গুন্‌গুনে উড়ে বেহারা-বাহিত সুন্দর পাল্কির 'ফোটো' আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিযা-ছিল। কিন্তু পাল্কি দেখিয়াই হরিষে বিষাদ' হইল—প্রতিজ্ঞা করিলাম, প্রাণ থাকিতে এই "নারদের ঢেঁকি"তে চড়িয়া 'স্বর্গে উঠিব না ! মনে করুণ—দুইখানি বংশখণ্ড, তাহার উপর চারি কোনা কঞ্চির উপরে একখানি রাঙা 'টুন' জড়ান, তাহা আবার দুইজন মুটে মাথায় করিয়া পাহাড়ে উঠিবে—ইহাই জম্মুতে "পাল্কি" নামে অভিহিত। ইহাতে চড়া কি সহজ ব্যাপার ? ষোল আনার উপর আমার পিশিমা স্থূলাঙ্গী ছিলেন, সুতরাং তিনি তো পাল্কি (অগত্যা ইহাই বলিতে হইবে) দেখিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। চারিদিকে লোক জড় হইল। যাহাহউক কোনপ্রকারে তিনি ঐ সকল অদ্ভুত পদার্থের মধ্য হইতে একখানি 'জো সো রকমের, চলন সই গোছ' বাছিয়া লইলেন ; আদর করিয়া আমাদের ডাকিলেন—"তোরা কেউ আস্‌বি রে ?" আমরা দূর হইতে প্রণাম করিয়া পদব্রজেই চলিলাম।

পুল পার হইলাম, পেরুণী একপয়সা কবিয়া পড়িল। তাহার পর পাহাড় আরম্ভ হইল। মহারাজ পাহাড় কাটা-ইয়া পথ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া উপরে উঠিয়াছে আমবাও হেলিয়া দুলিয়া উপরে উঠি-লাম। সম্মুখেই জম্মুর তোরণ-দ্বার। চারিজন দীর্ঘকায় সশস্ত্র তোগরা সৈনিক উলঙ্গ অসি হস্তে দণ্ডায়মান। তখনও শানিত কৃপাণ-ফলকে বেলা ঝিকিমিকি কবিতেছিল। আমরা তোরণের নিকট-বর্ত্তী হইলাম। একজন বিশালকায় তোগ্‌রা অগ্রসর হইযা দীর্ঘ তরবারী হেলাইযা গম্ভীর স্বরে কহিল—"খড়া রও!" আমবা দাঁড়াইলাম। একজন একখানা খাতা লইয়া আমাদের নাম ধামাদি লিখিয়া লইল। যে অক্ষরে লিখিল তাহার কিছুই বুঝিলাম না, বুঝি-লাম শুধু—ঘটি, বাটি, হাতা, বেড়ী, খন্তা ইত্যাদি। নাম ধামাদি জিজ্ঞাসা করি-বার কারণ, পাছে কেহ গুপ্তচর নগরে প্রবেশ কবে। যে সময়ের কথা আমি লিখিতেছি তখন সেখানে ইংরাজের এত আধিপত্য ছিল না।

আমরা নগরে প্রবেশ করিলাম। নগরটী মন্দ নহে। দোকান গুলি রঙ্গীন—দেখিতে প্রায় একরকম ; নম্বর

না থাকিলে কাহার কোন্‌টী চেনা ভার হইত। সব ভাল কেবল রাস্তাগুলি পাহাড় কাটা বলিয়া অসমান—সামান্য অমনোযোগেই হোঁচট খাইতে হয়। যাহাহউক, ঘরে পৌঁছিলাম, কাকাকে দেখিলাম—জীবনে কাকাকে এই প্রথম দেখিলাম প্রণাম করিলাম। কাকিমা নাই, সুতরাং আদর করিবার লোক নাই; তবে দিদি ইন্দুমতী ও কাকা খুব যত্ন করিলেন। সে রাত্রি বেশ এক রকম কাটিল; তবে তোগবা-রমণীদিগের একঘেয়ে বিকট বিবাহ গীত ও ধম্‌ধম্‌ ঢোলপেটার উৎকট জ্বালায় স্বপ্নের ব্যাঘাত হইয়াছিল। জম্বুতে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব কম, সুতরাং বাঙ্গালী রমণী অধিক পাওয়া দুষ্কর, অতএব সেই দেশীয় স্ত্রীলোকগণকেই একপ্রকার স্ত্রী আচার মঙ্গলাচার প্রভৃতি সমাধা করিতে হইয়াছিল, কাজেই এই ঘোর জ্বালা !!

প্রভাতে উঠিয়াই নগর ভ্রমণে বাহির হইলাম। সঙ্গে দুইজন তোগ্‌রা পথ প্রদর্শক।

জম্বুর পাহাড়ী অধিবাসীগণকে "তোগ্‌রা" বা "তোগব" বলে। দুই গড়ের মধ্যবর্ত্তী বলিয়াই "দোগড়" বা "তোগড়" তথা "তোগর" হইয়াছে। ইহারা দীর্ঘকায় ও সুশ্রী, সাহসী ও সত্যবাদী। দেখিতে প্রায় পঞ্জাবের বিখ্যাত বীর জাতি শিখদিগের ন্যায়; ভাষাতেও অল্প প্রভেদ।

শারীরিক প্রভেদের মধ্যে শিখেরা কেশ রাখে, ইহারা রাখে না। ধর্ম্ম-বিষয়ে—শিখগণ, একেশ্বরবাদী, ইহাঁরা অনেকে শৈব। ইহারা আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়।

যে সময়ের কথা আমি লিখিতেছি তখন অনেকের কটিদেশেই তরবারী বিলম্বিত দেখিয়াছি।* তখন অস্ত্রের লাইসেন্স ছিল না।

আমরা নগর ভ্রমণ করিয়া জম্বুর "মিউজিয়ম" দেখিলাম—"সালামার বাগ" দেখিলাম। বলিবার কিছুই নাই।

সেদিন 'হোলী'। পথ, ঘাট, মাঠ, সকলই বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত—কিছুই বাকি নাই। বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা, বালক, স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই রঙে মাতিয়াছে! বাজারে বাজারে রঙের ফোয়ারা বসিয়াছে। আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে, হাসির খল খল রবে, অলঙ্কারের সুমিষ্ট নিক্কনে ও গীতে মধুময় তানে প্রত্যেক হৃদয়ই প্রফুল্ল! কোথাও কাহারা গাহিতেছে "দেখ্ যে সারি দুনিয়া হ্যায় রং বরং"—আবার কোথাও বা "রঙ্গিলা শ্যাম খেলে হোরী বিরজ মে" ইত্যাদী।

আমাদের ভিজাইতেও কেহ কসুর করিল না। দোল যাত্রার সময় আমাদের দেশে শীত নাই বলিলে হয়, কিন্তু এখানে এত শীত যে হাত বাহির করিলেই "হাত নাই"!

সে যাহা হউক, আহারাদি করিয়া আমরা "বাহুদেবীর কেল্লা" ও "মণিচোবার সুড়ঙ্গ" দেখিবার নিমিত্ত বাহির হইলাম। এখানকার লোকের বিশ্বাস মতে এই সুড়ঙ্গই নাকি "মহাভারতোল্লিখিত মণিচোরা জম্বুবানের সুড়ঙ্গ; এবং এই জম্বুবানের নামানুসারেই নাকি নগরের নাম 'জম্বু' হইয়াছে।

সে কথা যাক—আমরা প্রথমে "বাহুদেবীর কেল্লা" দেখিয়া সুড়ঙ্গে যাইব

* এখনও সকলে অস্ত্রত্যাগ করে নাই।

স্থির করিলাম, কারণ কেল্লা পর পারে স্নুড়ঙ্গ দেখিয়া যাইতে হইলে বেলা থাকে না। স্নুতরাং অগ্রে তথায় চলিলাম। বহু কষ্টে পাহাড়ীদের অনুসরণ করিয়া পর্ব্বত অবতরণ করিলাম। পূর্ব্বে কখনও অভ্যাস ছিল না, স্নুতরাং কষ্ট বিলক্ষণ হইল; কিন্তু নামিবার সময় যে সকল মনোহর দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে সকল কষ্ট অনায়াসেই ভুলিয়া গেলাম।

সম্মুখেই নির্ম্মল-সলিলা 'তাবী'—নীহার-মণ্ডিত শৈলমালার মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া, হেলিয়া, দুলিয়া, নাচিয়া, হাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। শৈলগুলি মস্তক অবনত করিয়া যেন সেই প্রকৃতির কোমল দর্পণে আপনাদের তুষার মণ্ডিত উন্নত বদনের অবনত প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছে। এখানে পাখিরা বঙ্গদেশের ন্যায় "ফটিক জল, ফটিক জল" রবে অনবরত চিৎকার করে না—এখানে তাহারা দলে দলে, দুলে দুলে, ফটিক জলে সাঁতার কাটে!

আমরা অঞ্জলি পুরিয়া নদীর জল পান করিলাম। বিফাইন করা কলের জলও ইহার নিকট লজ্জা পায়, কিন্তু এত ঠাণ্ডা যে মুখে দিলেই মুখ "নাই!"

আমরা কিরূপে পার হইব ভাবিয়া আকুল। কারণ খেয়া পারে গিয়াছে, আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব, কাজেই আমরা তীরে বসিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিলাম। রূপসী পাহাড়ী ললনাগণ দলে দলে ঘাট আলো করিয়া স্নান করিতেছে—সে দিকে পুরুষের যাইবার যো নাই; রাজ আজ্ঞা। কিছু দূরে স্নুশ্রী, সবলকায়, গৌরবর্ণ পাহাড়ীরা কেহবা স্নান করিতেছে—কেহবা আহ্নিক করিতেছে—আবার কেহবা "হর হর বম্ বম্ জয় মহাদেও" রবে স্নুপ্ত পর্ব্বত রাজিকে জাগরিত করিতেছে! একজন ডোগরা অশ্বারোহী আমাদের নিকটে আসিয়া ঐরূপ ভাবে বসিয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল; আমরাও সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। সে আমাদের পাইয়া বসিল, বলিল, "আমি ঘোড়া দিতেছি তোমরা একে একে পার হইয়া যাও।" আমরা স্বীকৃত হই না, সেও ছাড়ে না, এমন সময় নৌকা আসিয়া তীরে ভিড়িল, আমরাও বাঁচিলাম।

পার হইলাম। তাহার পর পদ-ব্রজেই চলিলাম। দুই দিকে পাহাড়ের সারি, মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ—উঠিয়া, পড়িয়া, আঁকিয়া, বাঁকিয়া চলিয়াছে; আমরাও তদ্রূপ ভাবেই চলিলাম। চলিতে বিলক্ষণ কষ্ট হইতে লাগিল, পায়ের নিচে পাথরে পাথরে ঠোকর খাইয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে কোন কোনটা পাহাড় এরূপ ভাবে মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যে দেখিলেই বোধ হয় বুঝি এই পড়িল!!

দুই ধারে কুল গাছ—কুলে লাল; আরও নানা জাতি তরু লতা ফল ফুলে শোভিত।

পাহাড়ের কোলে এক প্রকার ফল পাওয়া যায়, তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। গাছ ছোট ছোট, আমাদের দেশের সেওড়া, কাল্‌কাসন্দার চেয়ে বেশী বাড়ে না। ফল ফলসার ন্যায়—আস্বাদন অম্ল-মধুর—খাইতে মন্দ লাগে না। আমরা তাহাই খাইতে খাইতে চলিলাম। মাথার উপর দিয়া কতরকম পাখী উড়িয়া

গেল—বাতাসে উজ্জ্বল পাহাড়ী ফুলগুলি মাথায় উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল! আমরা চলিলাম— কোথাও পথ বন্ধুর, কোথাও বিস্তৃত; কোথাও মাথার উপর লতায় লতায় একত্র হইয়া একটি সুন্দর চন্দ্রাতপ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক এক খণ্ড-আকাশ স্বচ্ছ স্ফটীক-মুকুরের ন্যায় শোভা পাইতেছে; আবার কোথাও আকাশ বিস্তৃত, গভীর—তরঙ্গশূন্য সমুদ্র-বৎ স্থির, প্রকাণ্ড! যত উর্দ্ধে উঠিতেছি, প্রকৃতির কোমল মাধুরীতে স্বর্গের বিমল ছায়া যেন ততই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছে! স্বর্গ আর কোথায়? *

আরও উর্দ্ধে উঠিলাম। পর্ব্বতা-রোহনে অনভ্যস্ত, পা আর চলে না, তবুও বিরাম নাই।

অবশেষে পর্ব্বত-শীখরে আরোহন করিলাম। আহা! কি রমণীয় দৃশ্য! যতদূর দৃষ্টি চলে পর্ব্বতের অসীম তরঙ্গ-বিস্তার—মধ্যে মৃদুলকলনাদিনী ফুল্ল-নীরা তাবী—একটি ক্ষীণ রজত রেখার ন্যায় আঁকিয়া বাঁকিয়া নির্জীব পাষাণ-হৃদয়কে সজীব করিয়া দূরে—দূরে—বহুদূরে গিয়া কি জানি কোথায় মিশাইয়া গিয়াছে! দূরে—দূরে—আরও দূরে—জন কোলা-হল শূন্য-শান্তিময় নীহার-রাজ্যে—আকা-শের ধূসর প্রান্ত ভেদ করিয়া হিমালয়ের উন্নত মস্তক শোভা পাইতেছে। হেমন্ত সূর্য্যের কোমলকর-সংলগ্ন সুশুভ্র মেঘ-মালার ন্যায় সেই তুষার মণ্ডিত হিমা-লয় যেন, গর্ব্বোন্নত মস্তকে, শ্রবণভেদী কোলাহলপূর্ণ বিস্তীর্ণ জগতের প্রতি চাহিয়া বলিতেছে—"নিদ্রিত ভারতকে আর জাগাইও না। অদৃষ্ট-সমরে ক্লান্ত হইয়া ভারত আজি আমার শান্তিময় ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিতেছে—ভারতকে আর জাগাইও না!"

* * * * *

তাহার পর দুর্গ দেখিলাম। দুর্গে বিস্তর সৈন্য—বেশ সুরক্ষিত দুর্গটী এই-রূপ স্থানে অবস্থিত যে ইচ্ছা করিলে কাশ্মির রাজ অনায়াসে সেয়ালকোট উড়াইয়া দিতে পারেন।

বাহুদেবীর মন্দিরে গেলাম। ব্রাহ্মন শুনিয়া তাহারা আমাদিগকে খুব যত্ন করিল। মন্দিরে দেব দেবী কিছুই নাই, শুধু একস্থানে তৈলসিন্দুর-চর্চ্চিত একখানি বস্ত্র, শুনিলাম এই বস্ত্রের নিচেই সতীর বাহু আছে। থাকুক বা না থাকুক আমি তাহা দেখি নাই **, সুতরাং বিশ্বাস, অবিশ্বাসের কথা বলিয়া সুনাম বা কুনাম কিনিতে চাহি না।

সে যাহা হউক, বাহু দেবীর পাহা-ড়ের উপর কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া আমরা "মণিচোরার সুড়ঙ্গ" দেখিতে চলিলাম। পুনর্ব্বার নদী পার হওয়া গেল। বেলা প্রায় ৫ টার সময় বহু কষ্টে গাছ পাথর ধরিয়া একটা খাড়া পাহাড় উঠা গেল। সম্মুখেই সুড়ঙ্গ-দ্বার। সুড়ঙ্গ-দ্বারে, শিব, দুর্গা, গণেশ প্রভৃতি দেব দেবীগণের

* আমি সেই বৎসরে স্বর্গে যাইবার মানসে ৭ সাতবার রামায়ণ ও মহাভারত শেষ করিয়া ছিলাম। বলা বাহুলা, তখন আমি "আলোক" হইতে অনেক দূরে ছিলাম স্বর্গ দেখিলাম কি না তাহার উত্তর না মরিয়া দিতে পারিব না, তজ্জন্য পাঠক পাঠিকাগণ মার্জ্জনা করিবেন।

* পাণ্ডাবা কাহাকেও তাহা দেখায় না, দেখিলেই অন্ধ হয়।

অসংখ্য প্রস্তর মূর্ত্তী। পাহাড়ে প্রস্তরের অভাব নাই। পাণ্ডাগণ এই মুর্ত্তিরাশির সাহায্যে যাত্রীগণের নিকট হইতে বিলক্ষণ দুইহাত আদায় করিয়া থাকে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে পাণ্ডা মহোদয়গণ কার্য্যান্তরে ব্যস্তছিলেন। পুরোহিত মহাশয়ও স্থানান্তরে গিয়াছিলেন—আমরাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

ফাটকে ঢুকিয়া আর একটা ফাটক দেখিলাম। আমাদের পথ প্রদর্শক পাহাড়ীদ্বয় অগ্রসর হইল। ক্রমাগত ১৫টী সিঁড়ি নামিয়া আমরা একস্থানে আসিলাম। সেটা অন্ধকূপ কি যমালয় তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, কারণ মৃত্যুর নিবিড় ছায়ার ন্যায়, গভীর নিস্তব্ধতা-মাখা এক ঘোর অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না! দৃষ্টিই বা ছিল কোথায়? নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হইল— ভাবিলাম ইহা বুঝি Black hole এর দ্বিতীয় সংস্করণ!"—পাহাড়ীগণ বলিল, আর একটু অগ্রসর হইলেই আলো পাইব কিন্তু কিরূপে অগ্রসর হইব বুঝিতে পারিলাম না। কারণ পথ প্রদর্শকের দীর্ঘ শিখা পর্য্যন্ত তিমিরাচ্ছন্ন'। তখন আমরা নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলাম! কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত জাতিগণের নিকট অশিক্ষিত বর্ব্বর পাহাড়ী Humdrum নামে আখ্যাত হইলেও আমাদের পথ প্রদর্শক পাহাড়ীদ্বয় নেহাত Humdrum শ্রেণীভুক্ত ছিল না। তাহাদের ঘটে কিছু বুদ্ধি ছিল। তাহারা তাহাদের উত্তরীয় দুইখানি আমাদের ধরাইয়া পশ্চাতানুসরণ করিতে বলিল।আমার ঠিক সেই সময় নল, নীল, গবাক্ষের হাত ধরাধরি করিয়া লঙ্কায় বীর রক্ষার কথা মনে পড়িল। কি করি? উপায় নাই! কাজেই Humdrum পাহাড়ীর মোটা বুদ্ধির নিকট মাথা নোওাইয়া আমরা তিন বাঙ্গালী—রাম রমা, উপেন্—নল, নীল, গবাক্ষের শ্রেণীভুক্ত হইয়াই চলিলাম, বা চলিতে বাধ্য হইলাম। প্রায় দুই দণ্ড অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ করিয়া দূরে একটী ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাইলাম। সেই ক্ষীণ আলোক যে তখন কত মধুর, কত উজ্জল বোধ হইয়াছিল তাহা লিখিয়া জানাইতে অক্ষম।

যাহা হউক, নিকটে গিয়া দেখিলাম, একটী শিবলিঙ্গের নিকট একটা প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। সে আলোকে শুধু 'অন্ধকার' দেখা যায়! সম্মুখে চন্দন-চর্চ্চিত কুসুমরাশি—সুবিমল পরিমল বিস্তার করিয়া নির্জ্জন ভয়াবহ গুহাকে কথঞ্চিৎ কোমল ভাব-সম্পন্ন করিয়াছে। পাহাড়ীরা বলিল যে জাম্বুবানের বধ সাধনার্থ † আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে শ্রান্তি দূর করেন এবং উক্ত শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা ও তাহার পূজা করিয়া গুহা প্রবেশ করেন। সে যাহাই হউক, লিঙ্গের মস্তকোপরিস্থ প্রস্তরাবরণ দেখিলে উহা সামান্য মনুষ্যকৃত বলিয়া বোধ হয় না। ঐরূপ ভয়ঙ্কর পাহাড়ের গা কাটিয়া ঐরূপ মনোহর কারুকার্য্য সম্পন্ন করা সামান্য মনুষ্যের সাধ্যাতীত। পাহাড়ের গায়ে, লিঙ্গের বাম পার্শ্বে, দুইটা প্রকাণ্ড গহ্বর, যেন মুখ ব্যাদান করিয়া গিলিতে আসিতেছে!! শুনিলাম

† এই গল্পটী বঙ্গের নরনারীর নিকট অবিদিত নহে, সুতরাং ইহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

উহাই সুড়ঙ্গের প্রকৃত পথ। আমাদের নিকট মোমবাতি ছিল, প্রদীপের সাহায্যে তাহা জ্বালিয়া একটা গহ্বরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু ১০।১২ হাতের অধিক যাইতে পারিলাম না। তা'ছাড়া ইহাও জানিতাম যে অধিক সাহস করিলে অজাগর সর্পের বিশাল উদরে আমাদের অধিষ্ঠান হইবে! শুনিলাম কাশ্মির-সেনাপতি যুবরাজ রামসিংহ একবার কৌতুহলপরবশ হইয়া অনুচরগণসহ উহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ২।৩ মাইলের অধিক যাইতে পারেন নাই—আগে কেবল জল। তা'ছাড়া তাঁহাকে অনেক পাহাড়ী-সাপের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

আমরা ফিরিলাম। এই সময় পাণ্ডাগণও ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমাদিগকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, এবং—ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য—আমাদের এই দুঃসাহসিক কার্য্যের জন্য বিশেষ সুখ্যাতিও করিল না। তাহাদের মতে দৈব বলে আমরা বাঁচিয়া গিয়াছি, কারণ দ্বার হইতে শিবলিঙ্গ পর্য্যন্ত—সর্প-রাজ্য। আলো না লইয়া যাওয়া আমাদের বুদ্ধিহীনতার যে এক প্রধান সাক্ষ্য ইহাতে তাহাদের আর কোন সন্দেহ রহিল না। শুনিলাম সর্পগুলিকে প্রত্যহ দুগ্ধ দেওয়া হয়।

ইহার পর মহাত্মাগণ আমাদের নগ্নমস্তকে হস্ত বুলাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে, অতি সাবধানতা সহকারে স্বীয় স্বীয় অভ্যস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের পথ প্রদর্শক দ্বয় Humdrum শ্রেণীভুক্ত ছিল না; সুতরাং বলা বাহুল্য যে তাহাদের পাহাড়ী-কৌশলে (অর্থাৎ মুষ্টাঘাত) কোথাও বা দিয়া, কোথাও বা না দিয়া সে যাত্রায় উদ্ধার লাভ করিলাম।

পাণ্ডাগণকে সুড়ঙ্গ-সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। কেহ বলিল, "এই সুড়ঙ্গ আমেরিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে।" কেহ বলিল "না কাশ্মির।" কেহ—"লদাক", কেহ "তিব্বত"—তাহার পর বাকবিতণ্ডা, অবশেষে হাতাহাতি। বেগতিক দেখিয়া আমরা সরিয়া পড়িলাম।

শ্রীরমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

স্মৃতি।

চন্দ্রমার রজত কিরণে,
বাঁশরীর মোহময় তানে,
সমীরের সুমন্দ হিল্লোলে,
বিহগের মৃদু মধু বোলে,
বিকশিত কুসুম-শোভায়,
প্রভাতের কনক বিভায়,

উছলিত দিবস যামিনী
ক'র যেন স্নিগ্ধ ভালবাসা,
এই ফুলে, শিশিরের সনে
করেছিল ক'ার মৃদু আশা!
স্মৃতি তার স্বপন মতন,
মনে হয়—কে ছিল কখন!!

কুমারী সরযূবালা দেবী।

গৌরী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভালগাছ কাটুম, বোসের বাটুম
গৌরী হেন ঝি।
তোর কপালে বুড় বর,
আমি কর্ব্ব কি?
ও গৌরি! ঐ দেখ্ তোর বর।"

পাড়ার চৌধুরী বুড়ো, হাতে লাঠী, কাঁধে গামছা লইয়া, ঠক ঠক করিয়া মিত্রদের বাড়ীর সামনে হাটখোলায়, বাজার করিতে যাইতেছিল। হর-গোবিন্দের মেজ মেয়ে সুশীলা তাহাকে উল্লেখ করিয়া গৌরীকে ঐ কথা বলিতেছিল। কথাটা বুড়োর কাণে পৌঁছিল। বুড়া গৌরীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। ওষ্ঠের দুই পাশ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে গোত্রজহীন, সাথীহারা দুটী শুভ্র-দন্ত বাহির হইয়া পড়িল। বুড়ো গৌরীকে বলিল "পুঁটী! আমার ক'নে হবি? বেশ ছোকরা বর হবো। দুজনে রাঁধবো, বাড়বো, খা'ব। যা পুঁটী, মাকে বলগে যা।"

সুশীলা মজা দেখিয়া হাসিতে লাগিল। সে বড় দুষ্ট। পাড়ার কোন মেয়ে তাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতনা।

গৌরী কাঁদ কাঁদ হইয়া ছল ছল চোকে মার কাছে গেল। বলিল "হাঁ মা! চৌধুরী বুড়ো কি আমার বর? সুশী খালি খালি আমাকে কাঁদাচ্ছিলো।"

মা হাসিলেন। বলিলেন "বালাই! বুড়ো তোমার বর হতে যাবে কেন? ও সুশীর বর হবে। তোমার জন্য আমি গোরার মত রাঙা বর আনবো।"

তবে মেয়ে চুপ করে।

* * * *

তার পর একদিন মা বুঝিলেন গোরার মত রাঙা হউক, আর বাঙালীর মত কালই হউক গৌরীর জন্য বরের সন্ধান করিতে হইবে। নইলে আর ভাল দেখায় না। কর্ত্তাকেও ঐ রূপ বুঝাইলেন। কর্ত্তা আহারের পর নিশ্চিন্ত ভাবে তামাক খাইতে খাইতে কথাটা শুনিলেন। কিন্তু হুঁকাটা নামাইয়া রাখিবার পর হইতে সে নিশ্চিন্ত ভাবের অনেকটা হ্রাস হইয়া গেল।

বরের অনেক সন্ধান হইল। বর জুটিলও অনেক। বাতিল হইলও অনেক। কর্ত্তা গৃহিণী দুজনের মনের মত বর জুটে কৈ? পাবনা জেলায় একবার এক বরের হদিশ মিলে। কর্ত্তার ও খুব ইচ্ছা তারই হাতে গৌরীকে সঁপিয়া দিয়া আবার দিনকতক নিশ্চিন্ত হইয়া তামাক টানেন। কিন্তু গৃহিণীর মত হইল না। প্রথমতঃ বরের দেশ সে কোন মুলুকে। একবার মেয়ের তত্ত্ব লইতে গেলে চাল চিড়া বাঁধিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। সাত নয়, পাঁচ নয়, ঐ একটী মেয়ে—তাকে কি সেই কোন্ রাজ্যিতে পাঠাইয়া প্রাণ ধরিয়া থাকা যায়। তারপর, বরের বয়স পঁয়ত্রিশ—আবার দোজবরে। হোকগে

মাইনে আড়াইশ। শুধু তাই নয় সে আবার জেলার হাকিম—মেয়েকে লইয়া এ দেশ সে দেশ করিয়া বেড়াইবে। গৃহিণী একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। অগত্যা সকালের ইচ্ছাটা রাত্রির আহারের সঙ্গে কর্ত্তাকে হজম করিয়া ফেলিতে হইল।

আবার নূতন বরের সন্ধান হইতে লাগিল। শীঘ্র খবরও জুটিল। এবার আর গৃহিণীর কোন আপত্তি রহিলনা। বরের বাড়ী ও কনের বাড়ীর মাঝে শুধু একটা ছোট গ্রাম ব্যবধান। সে ত এপাড়া ওপাড়া। বিশেষতঃ যে গ্রামে বরের বাড়ী, তারই কোলে মাঠের মাঝখানে গৌরীর বাপের জমাবিলি ৮।১০ টা কনি আছে। কর্ত্তাকে মাঝে মাঝে তাহা দেখিতে যাইতে হয়; ফিরিবার সময় চাইকি গৌরীর খবরটা লইয়া আসিতে পারিবেন। মার প্রাণ তবু কতটা ঠাণ্ডা থাকিবে। তার পর বরের সংসারে সব জাজ্বল্যমান। মা, বাপ, ভাই, বোন, সব আছে। অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল। ছেলে মানুষ বর—বয়স ১৭।১৮ একটা পাশ করিয়া কলিকাতায় দু'টা পাশের পড়া পড়িতেছে। দেখিতেও চাঁদপানা। আর চাই কি? কর্ত্তা গৃহিণী দুজনেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথমে লোকদিয়া কথা পাঠাইলেন। শেষে একদিন গৌরীর বাপ, পশুপতি ঘোষাল স্বয়ং বরের বাপকে গিয়া ধরিয়া বসিলেন। অনূঢ়া কন্যাভারগ্রস্ত একজন ব্যক্তি তাঁহার নিকট একটা মস্ত অনুগ্রহ যাচঞা করিতে আসিয়াছে দেখিয়া, রামনিধি চাটুর্য্যের মনে, তিনি একজন পাশকরা ছেলের সঙ্গতিপন্ন পিতা শুধু এইকথাই উদয় হইতে লাগিল। পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকেও যে রায়নার হরসুন্দর মুখুর্য্যের বাড়িতে নিতান্ত দীন ভাবে, কর্ত্তার মুখপানে চাহিয়া মাঝে মাঝে হত্যাদিয়া পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল সে কথা একবারও মনে হইলনা। তিনি একটা বড় তাকিয়ার উপর কনুইএর ভর দিয়া, আড় হইয়া শুইয়া, আগবার গড় গড়ার রূপার মুখওয়ালা নল লাগাইয়া, চোক বুজিয়া তামাক খাইতে ছিলেন। আর ভাবিতে ছিলেন, তিনি শুধু একটা ছোট মুখের কথায় এইরকম কত কন্যা-বিপদ-গ্রস্ত পিতার মাথা কিনিতে পারেন। এসকল পিতৃ কুলের মস্তকের কি অল্প মূল্য!

অনেক গুলা ঢোক গিলিয়া, এবং তদপেক্ষা অধিক বাজে কথায় ভূমিকার পর, যখন পশুপতি নিতান্ত ভয়ে ভয়ে চাটুর্য্যে মহাশয়কে জানাইল, যে সে বাস্তবিকই স্বয়ং উপযাচক হইয়া আজ তাঁহার নিকট মাথা বেচিতে আসিয়াছে এবং ইহলোক হইতে অবসৃত তাহার প্রাক্তন চতুর্দ্দশ পুরুষেরাও আপনাদের অদৃশ্য মাথা গুলিও ঐ সঙ্গে বেচিতে আসিয়াছেন—এবং আরও জানাইল যে, যে অভাগা কন্যার সে হতভাগ্য পিতা, তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার অশুভ মুহূর্ত্ত হইতে প্রাগুক্ত পুরুষগুলি আপনাদের অধিকারচ্যুত হইয়া এতদিন শূন্যে যথেচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং অভিশাপ মোচনের আশায়, অনুগ্রহ-

পয়োধী-মন্থিত, চাটুর্য্যে মহাশয়ের মুখ-ভাণ্ডক্ষরিত শুধু একবিন্দু সুধার লালসায় তৃষিত হইয়া কাল কাটাইতেছেন, তখন রামনিধি চাটুর্য্যে মহাশয় একবার চোক মেলিয়া চাহিলেন। আলবোলায় একটা লম্বা টান দিয়া—একটা ছোট হাসির কিরণে পশুপতির সন্দেহ—কণ্টকিত অন্ধকার পথ চকিতে আলোকিত করিয়া, নলটা তাহার হাতে দিলেন।

অনেকটা পথ হাঁটিবার পর সম্মুখে সুখসেব্য তাম্রকূট দেখিয়া পশুপতি এতক্ষণ একটা রুদ্ধ-রুদ্ধ বাসনার যাতনা অনুভব করিতেছিল। এখন নলটা হাতে পাইয়া ভাবিল, চাটুর্য্যের মুখ না হউক অন্ততঃ ঐ ফুরসিটা সুধাভাণ্ড।

বেশী কথা হইল না। তবে যাহা হইল, তাহাতে পশুপতি এইটুকু বুঝিলেন যে সুরেশ বাপাজীবন যতদিন না বিএ পাশ হয় ততদিন চাটুর্য্যে মহাশয়ের পুত্রের বিবাহে অভিমত নাই। বিশেষতঃ বাবাজীউ এখন বিদ্যা—রাজপথের একজন পথিক। এখন তাহাকে বিবাহ বন্ধনে স্ত্রীরূপ খোটায় বাঁধিয়া দিলে, তাহার গতির সহসা শেষ হইবার খুব সম্ভাবনা। আপত্তিও শুধু সেই আশঙ্কায়।

কথাটা শুনিয়া পশুপতি বিনীতভাবে জানাইল, যে যতদিন বাবাজীউ বিএ পাশ হইতে না পারেন, ততদিন বধূকে ঘরে না আনিলে আশঙ্কার কোন কারণ থাকিবে না। তবে শুভ কর্ম্মটা আপাততঃ সারিয়া রাখিতে আপত্তি কি?

আপত্তি যে বিশেষ ছিল এমন নহে। কারণ শুনিয়াছি চাটুর্য্যে মহাশয় দু একটী সুন্দরী পাত্রীর সন্ধানও লইতেছিলেন। উঠিবার সময় পশুপতি এইটুকু জানিতে পারিলেন যে, যে সুধাভাণ্ড ক্ষরিত অমৃত—বিন্দুর আশায় তিনি এবং চতুর্দ্দশ পুরুষ উর্দ্ধমুখ হইয়া আছেন, তাহার প্রকৃত মালিক মহালক্ষ্মী চাটুর্য্যে মহাশয়ের অন্তঃপুরে বিরাজ করিতেছেন। চাটুর্য্যেকে যাঁহাকে বহির্ব্বাটীতে দেখিলেন তিনি ঐরাবত বা উচ্চৈশ্রবা।

বিদ্যুন্মালা বা বিদ্যুল্লতা সংক্ষেপে বিদ্যানি লক্ষণ কামারের স্ত্রী। পশুপতির প্রতিবেশী। পাড়াসুবাদে গৌরীর পিসী। গৌরীকে সে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। তাহাকে দিয়া পশুপতি তার পর দিন সেই লক্ষ্মীর নিকট দরখাস্ত পেশ করিলেন। সে একখানা ফর্দ্দ লইয়া ফিরিল। সেটা সেই সুধাবিন্দুর মূল্যের হিসাব।

হিসাবটা হাতে লইয়া পশুপতির চক্ষু স্থির হইল। তিন ছিলাম তামাক পুড়িয়া গেল কিন্তু হিসাবটা রীতিমত আয়ত্ব হইল না। গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন "অন্যত্র চেষ্টা দেখি। এ বরের আশা ছাড়িয়া দাও।"

ফর্দ্দ শুনিয়া গৃহিণীও মাথায় হাত দিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ বলিলেন "জন্মের মধ্যে এইত একটী কর্ম্ম। আর ছেলে মেয়েও নাই। বিশেষতঃ সব দিকে ভাল এমন পাত্র আর সহজে মিলিবে না। চেষ্টার ত আর ক্রটি হয় নাই। তুমি এইখানেই গৌরীর বিয়ে দাও। শাশুড়ী ননদ সব আছে; মেয়ে সুখে থাকবে। আর বাড়ীর কাছে, দুবেলা খবর পাওয়া যাবে।

পশুপতি চুপ করিয়া সব শুনিয়া বলিলেন "ফর্দ্দের অত টাকা মিলিবে কোথা।"

গৃ। গড়ের কাছে নলপুকুরের ধারে যে বড় ফলের বাগান আছে সেইখানা বাঁধা দাও। কনি কটা বেচে ফেল। আর আমার হাতের নোয়া অক্ষয় হয়ে থাকুক। আমার যে কখানা গহনা আছে তাই দিও"।

প। ভরসা ত ঐ বাগান আর কনি-কটা। যে দুচারঘর প্রজা আছে, আমরা খাই ভাঁড়ে জল ত তারা খায় ঘাটে। তার পর! পেট দু'টা ত আর বেহাই টাকার সঙ্গে লইবেন না।

গৃহিণী। মেয়ের ভালত আগে চাই। আমাদের কথা পরে। আর ভাবনাইবা কি? বাগানখানা যেমন প্রজাবিলি আছে তেমনি থাক। যে টাকা পাও তাই থেকে মাসে মাসে সুদটা ফেলে দিও। বাকী যা থাকিবে তাইতে শাক ভাতও চলিবে। তবেই ঢের। কোলেত আর কচি কাছা নাই, যে তার ভাবনা ভাবিতে হইবে।

অগত্যা কর্ত্তাও সেইরূপ বুঝিলেন—অন্ততঃ বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু খুব বেশী করিয়া ধরিয়া একটা কাল্পনিক হিসাব করিয়া দেখিলেন যে তাহাতেও সব টাকা কুলায় না। কিন্তু তখন অন্য আর কোন কথা না কহিয়া বিদ্যু-নির মুখে বলিয়া পাঠাইলেন ফর্দ্দের সব টাকা দিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ রামনিধি চাটুর্য্যে কন্যা দেখিতে আসিবেন। কন্যা দেখা, আশীর্ব্বাদ এক সঙ্গেই হইবে। তিনি সংসার-অভিজ্ঞ লোক। পছন্দ অপছন্দ অত বুঝেন না। ফর্দ্দের টাকা মিলিলেই হইল। সে অঙ্গীকারও পাইয়াছেন।

পশুপতির আশা, উৎকণ্ঠায় সমস্ত দিন বুকের ভিতর দুর দুর করিতেছিল। ভাবী বেহাইকে ভালরূপ আদর অভ্য-র্থনার যাহাতে কোন ক্রটী না হয় এই ভয়েই বেচারা সারা হইয়া যাইতেছিল। নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া জাল ফেলিয়া কনি হইতে ভাল মাছ ধরা হইয়াছে। গোয়ালাবাড়ী দই ক্ষীরের ফরমাস গিয়াছে। ফলের বাগানে যে কটা উৎ-কৃষ্ট ফলের গাছ, তাহারই ফল পাড়া হইয়াছে। শুধু গৃহদেবতা নারায়ণ আর গৌরীর সে ফল ইজারা করা। কর্ত্তা গৃহিণী কখন তাহা মুখে পর্য্যন্ত দেন নাই। আর সেদিনকার তামাকের কথাটা খুব মনে ছিল। বেচারামকে চাকরীর ধরাতে প্রতিদিন কলিকাতায় যাওয়া আসা করিতে হয়। তাহাকে দিয়া পূর্ব্বদিন কলিকাতা হইতে খুব উৎকৃষ্ট তামাক আনাইয়া রাখা হইয়াছে। এই সব যোগাড় করিতে প্রায় আড়াই প্রহর বাজিয়া যায়। তখন তাড়াতাড়ী পুকুরে একটা ডুব দিয়া পশুপতির দুটী ভাত মুখে দিবার একটু অবসর ঘটে।

গৃহিণীও কর্ত্তার অপেক্ষা কম ব্যস্ত নহেন। তিনিও সকাল সকাল গৌরীকে দুটী ভাত খাওয়াইয়া, আপনি ও শুধু দুটী মুখে গুঁজিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়াছেন।

রন্ধনশাস্ত্রে তাঁহার এতদিনের অভিজ্ঞতার যেন আজ একটা মহা পরীক্ষা হইবে। আর এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর যেন একটা মস্ত লাভ লোকসান নির্ভর করিতেছে। নইলে এত যত্ন, এত পরিশ্রম সব মিথ্যা। বিদ্যুন্মালা ও সকাল হইতে হামরাও হইয়া রহিয়াছে। বাটনাবাটা কুটনাকোটা, দৌড়ঝাঁপের সব কাযের ভার সে আপনার ঘাড়ে লইয়াছে।

ক্রমে পুরোহিত সঙ্গে করিয়া চাটুর্য্যে মহাশয় আসিয়া দেখা দিলেন। কিরূপে অভ্যর্থনা করিলে যথেষ্ট শীলতা, নম্রতা, ও সৌজন্য প্রকাশ প্রায় পশুপতি প্রায় ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া আপনার সহিত সে সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিচার করিয়াছিল। অনেকগুলা ভাল ভাল কথা ও জিহ্বাগ্রে জড় করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যখন চাটুয্যে মহাশয় তাঁহার ভুঁড়ি, রেলির থান, গরদের চায়না কোট, আর মোটা ঘড়ির চেন লইয়া হাজির হইলেন এবং উৎকণ্ঠাময় প্রতীক্ষার যাতনা—শ্লিষ্ট ঘোষাল ঠাকুরকে দেখিয়া কাঁচাপাকা গোঁফের পাশ হইতে খুব গম্ভীর স্বরে বলিলেন "নমস্কার ঘোষাল মহাশয়" তখন ঘোষাল ঠাকুর একটা বড় রকম ঢোক গিলিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অত যত্নে সংগৃহীত "ভাল" কথাগুলা, সহসা ধাক্কা পাইয়া, মসৃণ জিহ্বার উপর গড়াইতে গড়াইতে কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। পশুপতি যখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহাদের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে গেলেন, তখন তাহারা নাগালের অনেক বাহিরে। পশুপতির ইচ্ছা ছিল সৌজন্যের একটা রীতিমত অভিনয় করিয়া ভাবী বেহাইকে আপ্যায়িত করে। কিন্তু শেষে। "আজ্ঞা হাঁ" "পরম সৌভাগ্য" -মহাশয়ের পদধূলি" ইত্যাদি ভগ্নপদ, ম্লানদেহ দু একজন মাত্র অনেক সাধনার পর জিহ্বামঞ্চে দেখা দিয়া কতকটা মান রাখিল। অভিনয়ের যেটুকু অঙ্গহানি হইয়াছিল অতিরিক্ত মাত্রায় হাত কচলাইয়া পশুপতি সেটুকু সারিবার চেষ্টায় ছিলেন।

তারপর মেয়ে দেখা। বিদ্যুনি পিশির হেফাজোতে থাকিয়া গৌরী জড় সড় হইয়া কনে-দেখা দিতে আসিল। তাহাও অনেক কষ্টে। বাড়ীর ভিতর মার অনেকগুলা বকুনি খাইয়া। শেষে ভুচারিবার পিশির অঙ্গুলির গুপ্ত প্ররোচনার পর, গৌরী থতমত খাইয়া তাড়াতাড়ী ভাবী শ্বশুরের পাযের কাছে একটা ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া ফেলিল।

চাটুর্য্যে মহাশয় হাসিলেন। বলিলেন "মুখখানা একবার তোল ত মা।"

এইবার পশুপতি হরি স্মরণ করিলেন।

গৌরী কাল। স্পষ্ট কাল। পাড়ার সকল মেয়ের চেয়ে কাল। অত কাল মেয়েকে সাধ করিয়া কে ঘরের বৌ করিবে। কিন্তু হরি বুঝি শুনিলেন। যখন গৌরী তাহার সেই ঝুমুর ঝুমুর চুলঘেরা, পুরন্ত, নিটোল পানপানা মুখখান তুলিয়া, সলজ্জ ছলছলে চোক মেলিয়া একবার ভাবী শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিল, তখন বুড়োর মনে হইল, অনেক মেয়ে দেখিযাছি, অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখিয়াছি—কিন্তু কালরঙ্গে এমন লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে ত দেখি নাই। হোগ কাল, এই মেয়েটীকেই বৌ করিয়া ঘরে লইয়া যাইতে হইবে। এতটা মনে

হইল বটে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া পশুপতিকে বলিতে পারিলেন না, যে আমার ছেলে তোমাকে দিতেছি, শুধু তোমার মেয়েটী আমাকে দাও। অন্য দেনাপাওনায় আর কায নাই।

যাহা হউক, কাল মেয়ে পছন্দ হইল। আশীর্ব্বাদও হইয়া গেল। পশুপতি স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন।

আহারের পর ঘরে ফিরিবার পূর্ব্বে যখন চাটুর্য্যে মহাশয় ধীর ভাবে তামাক টানিতেছিলেন, তখন পশুপতি কাছে গিয়া বসিলেন। কথা অনেক হইতে লাগিল; কিন্তু একটা কথা তাঁহার গলায় কাঁটার মত বিঁধিয়াছিল। ঢোক গিলিয়া তাহা চাপিবার যো নাই। সেটা বলিতেই হইবে। না বলিলে সোয়াস্তি নাই। শেষ যখন তামাক পুড়িয়া গেল—চাটুর্য্যে মহাশয় উঠিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন পশুপতি হঠাৎ হাত দিয়া তাঁহার পা দুটা চাপিযা ধরিল। সাহস করিয়া, মুখ ফুটিয়া বলিল "বেহাই মহাশয়! আমাকে মাপ করিতে হইবে। আমার সর্ব্বস্ব দিয়াছি, তবু সব টাকার কিনারা করিতে পারি নাই। দয়া করিয়া শুধু তিন শত টাকা ছাড়িয়া দিতে হইবে। আপনি বড় লোক। আপনার সংসারের অর্দ্ধেক মাসের খরচ উহা অপেক্ষা অধিক।

কথাটা শুনিয়া রামনিধি চাটুর্য্যের সহসা মুখখানা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "আশীর্ব্বাদের পূর্ব্বে কথাটা জানাইলে ভাল হইত। তাহা হইলে অন্য ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। এখন সময় বড় অল্প। ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা ঠিক উত্তর দিবার অবকাশ নাই।"

পশুপতি পা ছাড়িয়া দিয়া চুপকরিয়া সব শুনিল। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "বিবাহের এখনও দেরী আছে। আপনি একবার ভাবিয়া দেখিবেন। তার পর যাহা ভাল হয় করিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যখন বিদ্যান বাড়ীর ভিতর খবর দিল, কাল গৌরীকে শ্বশুরের মনে ধরিয়াছে তখন গৃহিণী একেবারে আহ্লাদে কাঁদ কাঁদ হইয়া পড়িল। শুধু তাই নয়। আজ আনন্দের উপর আনন্দ। আহারে বসিয়া বেহাই ব্যঞ্জনের বড় সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। সে কথাগুলা গৃহিণীর গলা হইতে বুকের কাছে সড় সড় করিয়া বেড়াইতে ছিল। দু দশজনের কাছে সে গল্প না করিলে আর রাত্রিতে ঘুম হইবে না। কিন্তু এখন দু দশজন শ্রোতাই বা কোথায় মিলে। একশ্রোতা বিদ্যান। কিন্তু সে খোদ বেহাইএর মুখ হইতে তাহা মৌলিক অবস্থায় শুনিয়াছে। তবু তাহাকে ডাকিয়া নূতন করিয়া শুনাইতে হইবে। তাই ভাষার একটু পরিবর্ত্তন করিয়া গৃহিণী বলিতে ছিলেন "দেখ্ বিদ্যে ঠাকুরজী! আমার সত্য ভাই বড় ভয় হয়েছিল। ভেবেছিলাম, হয় ত বেহাই খাবার দাবার একটু মুখেও করিতে পারিবেন না। কৈ তোর দাদাকে কখন কোনদিন কোন রান্না ভাল বলিতে শুনি নাই।'

বিদ্যানি হাসিয়া বলিল "দেখিস বউ দাদাকে পথে বসাসনে। আজ রান্না খাওয়াইয়া বেহাইকে যে রকম গুণ

করেছিল, তার হয় কোন দিন না বেহাই তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে, হেঁসেলে কয়েদ করে রাখে।”

পশুপতি বাড়ীর ভিতরে আসিয়া শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন “আমাকে না শেষ এক মেয়েব বিয়ের দায়ে কয়েদ হ'তে হয়। চুরী ভিন্ন ত আর অন্য উপায় দেখি না।”

যখন মোট কথাটা ভাঙ্গিয়া বলিলেন তখন গৃহিণীর অত আনন্দ সছিদ্র বেলুনের বাষ্পের ন্যায় নিমেষ মধ্যে বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটাও যেন কেমন চুপসিয়া গেল। বিহ্যানিও কথাটা শুনিয়া লইল।

সে দিন ঘরে ফিরিয়া যাইবার সময় শুধু সে বলিয়া গেল—“যখন ভগবান এতদূর মুখ তুলে চেয়েছেন, তখন কি আর দু'শ টাকার জন্যে বিয়ে আটকাবে!

* * *

বিহ্যানির স্বামী লক্ষণ কামাবের কলিকাতায় বড়বাজারে একখানা লোহাব দোকান ছিল। তাহার আয়ও মন্দ ছিল না। সংসাবে সে নিজে, স্ত্রী আর একটী তিন বছরেব মেয়ে। যখন একদিন সেই আদবের মেয়ে, বাপ মার সব মায়া কাটাইয়া, কাহাকে কিছু না বলিয়া চুপী চুপী পলাইয়া গেল, তখন লক্ষণের সংসার একটা মস্ত ভুয়োবাজী বলিয়া বোধহইল। তার এক মাস পরেই দোকান উঠাইয়া দিল। জিনিষ পত্র বেচিয়া ফেলিল। ইচ্ছা, যে নগদ টাকা হইবে, তাহা লইযা স্ত্রীপুরুষে কাশীবাস করিবে। কিন্তু সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই মেয়ে বাপকে ডাকিয়া লইল। তখন বিহ্যান সংসারে বড় একা হইয়া পড়িল। ভাবিল, অদৃষ্টে ত সব সুখই হইল, এখন দিনকতক তীর্থ ধর্ম্ম করি। তারপর কপালে যাহা থাকে! যাইবার প্রায় সব ঠিক। এমন সময় কোথা হইতে গৌরী আসিয়া তাহার ছোট ছোট হাত দিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। বিহ্যান্ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুকে তুলিয়া লইল। মুখে চুমো খাইয়া ভাবিল “কোন্ চুলোয় আর তীর্থ করিতে যাইব!”

সংসারের ভাবনা বড় ভাবিতে হইল না। স্বামী যাহা রাখিয়া গিয়াছিল তাহার কতক টাকা কোম্পানিতে জমা দিল, কতক সুদে খাটাইল। আর কতক টাকা কাছে রাখিল—শুধু নাড়িবার চাড়িবার, গণিবার, দেখিবার জন্য। দুদিক দিয়া মাসে মাসে সুদ আসে, সংসারও দুবেলা বেশ চলে—তবু হাতের কাছে কিছু টাকা না থাকিলে বোধ হয় কিছুই নাই।

তার পরদিন বিহ্যানি নগদ দু'শ টাকা লইয়া পশুপতির হাতে দিয়া বলিল “দাদা! পাড়ায় বড় চোরের দৌরাত্ম্য হইয়াছে। আর আমার ঘরের সিন্দুক বাক্স ভাঙা; কোন দিন চোরে সর্ব্বস্ব লইয়া যাইবে। তুমি টাকাগুলা রাখিয়া দাও। যখন চাইব—দিও।”

পশুপতি আসল কথাটা বুঝিলেন। একটা বড় কষ্টের হাসি হাসিয়া বলিলেন “বিহ্যান! তোর টাকা ফিরাইয়া লইয়া যা। আইবুড় মেয়ের বাপ একজন মস্ত চোর।”

বি। তোমার ঘোরফের অত কথা আমি বুঝি না। চাই বজায় থাক, চাই খোয়া যাক, আমি টাকা ফিরাইয়া লইব না।

পশু। শোন্ বিদ্যুন! আমার কথা শোন্! 'তোর ঐ টাকা বিধবার সম্বল। আমি উহাতে হাত দিয়া কি শেষে মহা পাতকের ভাগী হইব।

বিদ্যুনি এইবার বড় রাগ করিল। বলিল "বাপ মায়ের বুকের রক্তের টাকায় কেনা বাগান, বাড়ী বেচিবার সময় মহা-পাতক হয় না?"

পশুপতির চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। শেষ গদগদ স্বরে বলিল "মহাপাতক ত হইয়াছেই। যে দিন মেয়ের বাপ হইয়াছি সেই দিন হইতেই নরকের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। এখন আর নূতন পাপ চাপাইয়া কেন বোঝা ভারী করি।'

গৌরীর মা স্বামীর কাছেই বসিয়া-ছিল। বিদ্যুন প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া তাহাকে বলিল "প্রসব করিলেই মা হয় না। তুমি ত পেট হইতে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলে। তার পর এত দিন খাওয়াইয়া, পরাইয়া, মাখাইয়া, মুছাইয়া গৌরীকে কে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে? ও ত আমারই মেয়ে। আমার মেয়ের বিয়েতে যদি আমি টাকা খরচ করি, তোমরা বারণ করিবার কে?"

আর তর্ক চলে না। পশুপতিকে সে দিন হার মানিতে হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তার পর একদিন সকাল হইতে দেউড়ীর কাছে ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া সানাইওয়ালারা আসর জাঁকাইয়া বসিল। পাল-ঢাকা হইয়া বাড়ী মেঘলা মেঘলা দেখাইতে লাগিল। পশুপতির গ্রামস্থ দু'পাঁচজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ও ভিন্ন গ্রামস্থ আত্মীয় কুটুম্ব ভিয়ানের বামুনের সঙ্গে বাড়ীতে আসিয়া, সকালে আহার, দুপুরে চণ্ডিমণ্ডপে শয়ন ও নিদ্রা, এবং বৈকাল হইতে কায়মনে যত না হউক এক বাক্যে দুয়ের সমস্ত অভাব সংশো-ধন করিয়া লইয়া, পশুপতির সাধ্য-মত উপকার করিতে লাগিলেন। বাটীর ভিতর ও বাক্যের যে খুব অভাব ছিল তাহা নহে। পশুপতির নিমন্ত্রিতা আত্মীয়া কুটুম্বিনীদের মধ্যে যাঁহারা প্রৌঢ়া ও পশুপতিকে নিতান্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন তাঁহারা অপর্য্যাপ্ত পরি-মাণে ঐ দ্রব্যটা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ছিলেন এবং আজ মমতা বশে মুক্তহস্তে উহা খয়রাত করিতে ছিলেন। তবে কায়মনের যদি কোথাও কিছু অভাব থাকে, একা বিদ্যুন্মালা তাহা সারিয়া লইবা ছিল। সে আজ একাই এক সহস্র—আজ গৌরীর বিয়ে। সে বিদ্যু-তেরই মত ছুটিয়া বেড়াইতে ছিল। রসুই বামুন বলিল "লুচি বেলিবার তেল ফুরা-ইযাছে" বিদ্যুনি আপনি কলুব বাড়া ছুটিল। যেখানে মাছ কুটা হইতেছে বিদ্যুন সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল পার্ব্বতী চক্রবর্ত্তীর বড় মেয়ে পান্না একটা বড় মাছ লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যুন তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আপনি মাছটা কাড়িয়া লইয়া কুটিতে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিল "তোর বাছা! এ গেরো কেন? তুই পান সাজগে যা। গলির পথে কুলুঙ্গিতে খোল আছে, হাতটা ভাল করে ধুয়ে যাস্।" দেখিতে দেখিতে এক রাশ মাছ কুটিয়া দিয়া, যেখানে পান সাজা হইতেছে একবার

সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল অঙ্গুলি ও জিহ্বার কাজ সমান ভাবে চলিতেছে। মরুক! তত দোষের কিছু নাই। তবে এক স্থানে একটা কাজ বড় অসঙ্গত ঠেকিল। মাঝের ঘরের এক কোণে মাছুরের উপর তাস চলিতেছিল। খেলুড়ে চারিজনই পাড়ার মেয়ে। খেলা খুব জমিয়া গিয়াছে। বনমালি মিত্রের ভাইঝি বড়পুঁটী একখানা ছক্কা ও চারখানা কাগজ হারিয়াছে। এবার খেলা সামলাইতে না পারিলে পঞ্জা হারিতে হইবে। কাজেই খুব সমজাইয়া খেলিতে হইবে। পাশে দশমাসের শিশু উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল। অবশ্য তার একটা বিশেষ কিছু অভাব হইয়াছিল। কিন্তু খেলার পড়্তা আর শিশুর অভাব একসঙ্গে কিছু সাম্লান যায় না। কাজেই বড়পুঁটী খেলাটাই ভাল ক'রে সাম্লাইতেছিল। তবু অন্যমনস্কে মুখে এক একবার বলিতেছিল "লক্ষ্মী চাঁদ আমাব যাদু আমার, একটু থাম—এইবার তো্মাকে কোলে নিচ্চি।" কিন্তু লক্ষ্মী ছেলেটী যখন কিছুতেই বুঝিল না যে তাহার আপাততঃ স্বরসংযম করা বিশেষ আবশ্যক, নতুবা মাতার চিত্ত-বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা এবং তৎফলস্বরূপ খেলায় পরাজিত হইয়া পুত্রশোকেরও অধিক শোক পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা—তখন মাতা পুত্রের বোধহীনতাব পরিচয় পাইয়া যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হইলেন এবং সুবুদ্ধি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে মাতৃ কুলের চিরাভ্যস্ত প্রথা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু ঔষধে রোগ বাড়িয়া উঠিল। বিব্রত ও নিরুপায় মাতা যখন ঔষধের মাত্রা বাড়াইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন তখন বিদ্যুন সেই খানে গিয়া পৌঁছিল। কাণ্ডটা দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল "মর অভাগীরা! গিলবেন, কুটবেন, আর কাযের সঙ্গে খোজ নাই। কাণের কাছে ছেলেটা ডা পিট্‌ছে, সে খেয়ালই নেই। বাছা ক্ষিদেয় সারা হয়ে গেল ওঁর এখন খেলাই বড় হ'ল।" বকিতে বকিতে শিশুকে কোলে তুলিয়া লইল। তাহার অশ্রু, লালা, কজ্জল রঞ্জিত মুখ মুছাইয়া দিল। আপনি উদ্যোগ করিয়া ভুলাইয়া একবাটী দুধ খাওয়াইয়া শেষে মাব কোলে দিয়া বলিল "এখন নে তোর ছেলে ধর, আমার হাতে ঢের কায আছে।" বাড়ীর খিড়কির পুকুব পাড়ে যেখানে দইমাখা কলাপাত আব ভাঙা ভাঁড় খুরির চারিপাশে কুকুরের দল সভা করিয়া বসিয়াছিল সেইখানে, ছেঁড়া, মলিন কাপড়-পরা একজন ভিখারিণী চিরদারিদ্র্যেব পরিচয় স্বরূপ, আপনারই অনুরূপ একটী শিশু কোলে কবিয়া বসিয়াছিল। আর মাঝে মাঝে খিড়কীর পাশ হইতে বাড়ীর ভিতর যেখানে রোয়াকের উপর বসিয়া নিমন্ত্রিতারা খাইতেছিল, সেইদিকে ক্ষুধিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। হঠাৎ বিদ্যুনের সেই দিকে নজর পড়িল। একেবারে তার কাছে গিয়া বলিল "তুই মাগী এখানে বসে কি কচ্চিস? খাওয়া দেখ্‌লে কি তোর পেট ভরবে? আমি ত লক্ষবার এই খান দিয়ে আনা গোনা কচ্চি। আমাকে একবার ডেকে বলতে কি বাক্‌রোধ হয়েছিল? আয়! উঠে আয়!" তখন গলির পথে একপাশে তার জন্য পাত পড়িল। যে পবিবেশন

করিতেছিল তাহাকে বিদ্যুন গিয়া বলিল "বেনারসী সাড়ীআঁটা গয়নাপরাদের কাছে কেবল তাতের থালা নিয়ে ঘুরে ম'চ্চ কেন? ঐ গলির ভিতর টেনী পরা একজন আছে, ঐ দিকে একবার যাও।"

গৌরী একখানা রাঙ্গা গুলবাহার ঢাকাই শাড়ী পরিয়া, কপালে চন্দনের টিপ কাটিয়া, খোঁপায় রূপার কাজলনাতা গুঁজিয়া, আলতা, আর ঘুমুর দেওয়া মলে পা দুখানি ঢাকিয়া, ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আজ যেন কেমন একটু চুপচাপ। শ্বশুরবাড়ী গিয়া যে গাম্ভীর্য্য, যে সংযম শিখিতে হইবে, আজ বুঝি ঘরে তাহার হাতেখড়ি। বাড়ীতে আজ খাওয়া দাওয়ার এত ঘটা—জিনিষ পত্রের এত ছড়াছড়ি। গৌরীর কিন্তু আজ কোন জিনিষে অধিকার নাই—আজ তার উপোষ। অন্য দিন হইলে এতক্ষণ খাবার বায়নায় মাকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হইত।

বাড়ীর ভিতরে এত গোল—বাহিরে আরও বেশী। গৌরীর এক একবার মনে হইতেছিল, বিদ্যুনি পিশির মুখে যে সকল রূপকথা শুনিয়াছিল, আজ যেন সেই রকম একটা কি কাণ্ড তাহাদের বাড়ীতে ঘটিবে। আর সে যেন নিজেই সেই ঘটনার সঙ্গে সকলের চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। নহিলে যে বাড়ীতে আসিতেছে সেই কেন একবার তাহাকে দেখিতে চায়। কেন বাপু! তারা কি গৌরীকে কখন দেখে নি? তবে আজ কেন আবার এমন নূতন করিয়া দেখিতে চায়? আর বিদ্যুনি পিশি, হাজার কাজের ভিতর হইতে মাঝে মাঝে, ছুটিয়া আসিয়া গৌরীর মুখখানি তুলিয়া দেখিতেছে আর বলিতেছে "দেখিস মা! পরের ঘরে গিয়ে পিশিকে একেবারে ভুলে যাস্‌নি।" গলার আওয়াজটা কেমন ধরা ধরা না? কিন্তু খানিক আগে নফরা জেলেকে বকিবার সময় ত স্বরের খুব জোর ছিল।

আর একজন—শুধু আজ নয়—আজ ক'দিন গৌরীর সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে হরগোবিন্দের মেজ মেয়ে সুশীলা। গৌরীর বিয়ে—কাযেই সে কেমন করে ঘরে থাকে। বিয়ের পাঁচদিন আগে হ'তে সে গৌরীদের বাড়ীতে বাস বাঁধিয়াছে। সুপারিকাটা, বড়ি দেওয়া, ডালঝাড়া, চালকাঁড়া, সব কাযেই আজ ক'দিন বাড়ীর অন্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সমান অংশ লইয়াছে। গায়েহলুদের দিন সকাল হ'তে শাঁকটা একচেটে করিয়া লইয়াছে। কদিন ধরিয়া তাহার উপর এত জুলুম হইতেছে যে সে বেচারা ভাবিতেছে হায়! কেন সমুদ্র-স্বদেশ ছাড়িয়া দুখানি কচি পাতলা ঠোঁটের লোভে বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছি। বড় ভুল করিয়াছি—কিন্তু আর উপায় নাই। মরিয়াছি যে—নহিলে ফিরিতাম।

গৌরীর বিয়ে—এত আহ্লাদ। তবু বোধ হইতেছে, যেন আহ্লাদের তলায় একটা লুকান অসোয়াস্তি রহিয়াছে। সুশীলার বোধ হইতেছে যেন আজ রাত্রে কোন দেশ হইতে বাজনাবাদ্যি করিয়া কাহারা আসিয়া গৌরীকে ডাকাতি করিয়া লইয়া যাইবে। যদি তারা আর কখন না পাঠায়! গৌরী আসিতে পাবেনা—শুধু বসে বসে কাঁদবে! বাপের জন্যে, মার জন্যে, বিদ্যুনি পিশির জন্যে—আর—আর কার জন্যে? আর এখানে কি কেউ তার জন্যে কাঁদবেনা?

যদি না পাঠায়: সেই বড় ভয়। তবে এবাড়ীতে সুশী আর কেমন করে পা বাড়াবে। দুপুর বেলা মাসীমা ঘুমাইলে কার সঙ্গে আর খিড়কীর বাগানে আঁকুশী দিয়া গাছ ঠেঙ্গাইয়া জামরুল পাড়বে—শেষে ভাগ করিবার সময়, একটা বাদুড়ে খেকো, আধপচা জামরুল লইয়া, এক কাঠা জমী লইয়া বাঙ্গালার দুই দুর্দ্দান্ত জমীদারের ন্যায়, বা আধহাত সরু একটা নর্দ্দমা লইয়া কলিকাতার সমাজের শীর্ষ স্থানীয়, সুনীতির প্রতিপালক, গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উচ্চ উপাধী ভূষিত দুই সম্ভ্রান্ত পরিবারের ন্যায় একটা প্রকাণ্ড ফৌজদাবী মামলা বাধাইবে। আঁচলে মুড়ি লইয়া, সানের ঘাটের পুকুরের রানায় বসিয়া, যখন মাছেদের মুড়ি খাওয়াইবে, তখন কে তাহার পাশে বসিয়া মজা দেখিবে। আবার মানুষের মত বুদ্ধিমান, একটা বলবান বড় মাছ যখন অন্য ক্ষুদ্র ক্ষীণকায় প্রতিবাসীদের ঠেলিয়া ফেলিয়া, সবলে অগ্রসর হইয়া তাহাদের প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার গ্রাস করিয়া গৌরবে ন্যাজ আছড়াইতে আছড়াইতে ফিরিয়া যাইবে, তখন কে তাহার গলা জড়াইয়া হাসিয়া খুন হইবে। আর সেই চিলের ছাতের ঘরে বসিয়া, হাঁড়ী-হইতে কুলচুর, কাসুন্দি চুরি করিয়া খাইবার সময় "মাসীমার চেয়ে বেনা নাপতের খুড়ী ভাল কাসুন্দি কর্ত্তে পারে" এই কথা লইয়া কার সঙ্গে প্রায় ২।৩ ঘণ্টাস্থায়ী একটা মহা কলহের সৃষ্টি করিবে? যদি গেরীকে না পাঠায়! তবে কি হইবে! তবে সুশী বাঁচে কি করিয়া! তবে—প্রভাতগুলা কত শুষ্ক, নীরস—রৌদ্রতপ্ত বিজন মধ্যাহ্ন গুলা কত কর্ম্মহীন, অর্থহীন—সন্ধ্যাগুলা কত বিষণ্ণ অশ্রুময়—আর নিদ্রাহীন রাত্রিগুলা কত দুঃস্বপ্নের বিভীষিকাময়ী হইয়া দাঁড়াইবে। তবে আর কি রহিল—যদি গৌরী চলিয়া যায়—তবে এতবড় গ্রাম খানায় সুখের আর কি রহিল! তাই আজ সুশীলা ক'দিন গৌরীর পাছু পাছু ফিরিতেছে। প্রাণপণে কাছ ছাড়া হইতে চায় না।

ক্রমশঃ—

শ্রীক্ষেত্রমোহন গুপ্ত।

সাংখ্যস্বরলিপি।

১ম খণ্ড ৭৪৮ পৃষ্ঠার পর।

অলঙ্কারচিহ্ন।

স্বরযোগ।

সুরের পর সুর গাহিতে বা বাজাইতে গেলে তাহাদিগের মধ্যে যে একটী স্বাভাবিক যোগ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই স্বরযোগ। এই স্বাভাবিক স্বরযোগ-অলঙ্কার হইতেই আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের অলঙ্কারসমূহ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই স্বাভাবিক স্বরযোগের জ্ঞাপকচিহ্নস্বরূপে যোগচিহ্ন অথবা "কমা" (,) বা ছেদচিহ্ন ব্যবহৃত হইবে। কিম্বা ঐ সকল চিহ্ন ব্যবহার না করিয়া পরে পরে কিঞ্চিৎ ব্যবধান রাখিয়া সুরগুলি লিখিয়া গেলেও চলিবে। যথা, সা—রে—র্মা = সা, রে, মা = সা রে মা।

এই স্বাভাবিক স্বরযোগই সুরের সাধারণ যোগ। ইহাকে ছেদযোগ বা সংক্ষেপে গৌণত স্বর বিয়োগও বলিতে পারা যায়। কিন্তু সুরের বিশেষ যোগকে ছেদহীন যোগ অর্থাৎ শুদ্ধ যোগ কহা যায়। এই যোগে, যোগের ছেদ শূনির উপর একটি রেখা অশনির সমান পড়িয়া সেই ছেদ টুকুকে ছিন্ন করে বলিয়া তাহার চিহ্ন (+); এই চিহ্নকে সংস্কৃত ভাষায় বজ্রচিহ্ন নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে। এই শুদ্ধ যোগেই সুরের টানের উৎপত্তি হয়।

সুরের টান।

যতমাত্রা পর্য্যন্ত কোন সুরের টান চলিবে তত মাত্রা পর্য্যন্ত সেই সুরের অক্ষরের মাথা হইতে একটী কসি টানিয়া যাইতেঃ হইবে। যথা,। $\overline{\text{সা}+১+১+১}$ = সা+৩। বলা বাহুল্য যে সা সুরের একমাত্রাওঃ রক্ষিত হইবে এবং তৎসঙ্গে তিনমাত্রা টান চলিবে অর্থাৎ সা সুরটী একটানে চারিমাত্রা কাল গাহিতে হইবে। সুরের টান গুণিতমাত্রার দ্বারাই ব্যক্ত হইতে পারে, তথাপি প্রয়োজনবশতঃ সুরের টানের স্বতন্ত্র চিহ্নও করা গেল। যথা। $\overline{\text{সা}+১+১+১}$ = $\overline{\text{সা}+৩}$। = ৪সা = সা+সা+সা+সা। *

আশ।

গানের কথার একটী অক্ষরে সুর হইতে সুরে গমনকে আশ কহে। আশ বুঝাইবার জন্য সুরগুলির মধ্যে মধ্যে এক একটী করিয়া আকার কসি অথবা সমতান ভাবে স্থাপিত আকার (—) টানিতে হইবে।

যদি একটী সুরও দুই বা ততোধিকবার একটী অক্ষরে উচ্চারিত হয় তাহা হইলেও সুরগুলির মধ্যে আশচিহ্ন লিখিতে হইবে।

মীড়।

অতি ঘন সংলগ্ন আশকে মীড় কহে। মীড়ে সুরের হিঁচড়ান ভাব প্রকাশ পায়।

* গুণিতমাত্রার শেষ অংশটুকু দেখ।

মীড় বুঝাইবার জন্ত আশযুক্ত স্বরগুলির উপরে একটী রেখা টানিয়া যাইতে হইবে।

এক জাতীয় স্বরের মধ্যে মীড় হইতে পারে না।

গমক।+

স্বরের ধীর কম্পনকে গমক বলে। ইহাতে প্রত্যেক স্বর কম্পিত এবং প্রস্বনিত হয়। গমকের চিহ্ন=ং। যে যে স্বর গমকযুক্ত হইবে সেই সেই স্বর অনুস্বার সমেত করিয়া লিখিতে হইবে। যথা সাং। গানের কথার একটী অক্ষরে যদি কোন স্বর দুই বা ততোধিকবার সগমক উচ্চারিত হয় তাহা হইলে সেই সগমক স্বরগুলির মধ্যে মধ্যে আশ-চিহ্ন দেওয়া যাইবে।

স্বরের ঝোঁক।

যে যে স্বরে ঝোঁক পড়িবে সেই সেই স্বরের উপর ছোট ছোট দাঁড়ি পড়িবে। যথা । । । ।

সা রে গা মা।

গিট্‌কিরি।

আশ সহকারে স্বর হইতে দ্রুত গমনকে গিট্‌কিরি কহে। গিট্‌কিরির চিহ্ন—স্বরের মাথায় ঋফলা যতদূর গিট্‌কিরি চলিবে ততদূর ঋফলা হইতে ফুটকি দিয়া যাইতে হইবে। যথা

< ....

ধা—ধা—পা—মা—পা ;

কে — — — — —

অথবা ঋফলাকে যদৃচ্ছা অবস্থানে অবস্থিত করিয়া সারি সারি সাজাইয়া রাখিতেও পারা যায় অর্থাৎ ঋফলার ফাঁকের দিক বা মুখের দিকটা উপরে কিম্বা নিম্নে বা পার্শ্বে যেরূপভাবে ইচ্ছা রক্ষা পূর্ব্বক সারি সারি সাজাইয়া লিখিতে পারা যায় অথবা সারি সারির পরিবর্ত্তে যেরূপ অবস্থানে হউক ঋফলাটী একবার লিখিয়া তাহার পরে পূর্ব্বোক্ত প্রকার ফুট্‌কি-রাশি গিট্‌কিরির গতি পর্য্যন্ত বসাইয়া যাইতেও পারা যায়।

গিট্‌কিরি অতি দ্রুত হইলে স্বরের মাথায় দীর্ঘঋ ফলা বসিবে; সেই অতি-দ্রুত গিট্‌কিরিটীও যতদূর চলিবে ততদূর দীর্ঘ ঋফলা হইতে ফুটকি দিয়া যাইতে হইবে। এবং তাহার অন্যান্য সজ্জাতেও গিট্‌কিরির নিয়ম খাটিবে।

স্বরমিশ্র (Harmony)

স্বরগুণন।

আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীতের দিকেও লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। দুএকটি ইংরাজী গৎ আজকাল অনেকেরই মুখে প্রায় শোনা যায়। যদিও আমাদের দেশীয় সঙ্গীত ইউরোপীয় সঙ্গীত অপেক্ষা নানাগুণে শ্রেষ্ঠ তথাপি কবি মুরের আইরিষ গান এবং মোজার্ট রসিনি প্রভৃতি জর্ম্মণ ও ইটালীয় স্বর-কবিগণের

+ বৈদিক শ্লোকে কোন কোন স্থলে অনুস্বারের পরিবর্ত্তে গুম্‌চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়। গুম্‌চিহ্নের উচ্চারণ গুম্। এই গুমে আমরা অনেকটা গমকের ভাব পাই এই জন্য গুম চিহ্নটাকেই আমাদের গমকের চিহ্নরূপে ব্যবহার করিবার ইচ্ছা ছিল. কিন্তু ইহা সচরাচর চলিত নয় বলিয়া আমরা সুবিধার্থে গুমের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত অনুস্বারের এবং আরও বিশেষরূপে কার্য্যতঃ বাঙ্গালা অনুস্বারের চিহ্ন সাংখ্য স্বরলিপিতে ব্যবহার করিলাম।

সঙ্গীত যাঁহারা জানেন তাঁহারা ইউ-রোপীয় সঙ্গীতের মধুরতা অস্বীকার করিতে পারেন না। ইউরোপীয় সঙ্গীত স্বরমিশ্র-প্রধান।

স্বরমিশ্র-প্রধান সঙ্গীতের স্বরগুণই মুখ্য উপাদান। দুই বা ততোধিক স্বরের একস্বরী করণকে স্বরগুণন কহে। একস্বরীকরণ অর্থাৎ বিভিন্ন স্বরের যুগপৎবাদন, পরে পরে নয়।

স্বরের গুণচিহ্ন = × অথবা . বিন্দু। স্বরগুণনের চিহ্ন স্বর সমূহের মধ্যে মধ্যে স্থাপিত হইবে। যথা, সা × গা × পা অথবা সা. গা. পা।

একস্বরীভাবে ক্রীড়িত দুই বা ততোধিক স্বরকে গুণিতস্বর (chord) কহে। যথা সা × গা × পা। এই গুণন চিহ্ন-যুক্ত তিনটী স্বর একটী গুণিতস্বর। যদি এই গুণিত স্বর দ্বিমাত্রিক হয় তাহা হইলে ২ সা. গা. পা. এইরূপ লিখিতে হইবে। যদি অর্দ্ধমাত্রিক হয় তাহা হইলে ½ সা. গা. পা. অথবা সা. গা. পা. অথবা সা. গা. পা ÷ ২ লিখিত হইবে ইত্যাদি।

স্বররাজ্যে গুণন।

বীজগণিতের নিয়মানুসারে যেমন একাধিক বর্ণ এবং বর্ণ ও সংখ্যা অবিচ্ছিন্নভাবে পাশাপাশি থাকিলে তাহারা গুণিত হইয়া যায় সেইরূপ সাংখ্য স্বরলিপির নিয়মানুসারে একাধিক স্বরবর্ণ এবং স্বরবর্ণ ও তাহার সংখ্যা অবিচ্ছিন্নভাবে পাশাপাশি থাকিলে তাহারা গুণিত হইয়া যায়।

স্বরবর্ণ ও তাহার সংখ্যা—স্বরবর্ণ ও তাহার শ্রম বা বিশ্রম নিরূপক কালসংখ্যা।

স্বরযোগ ও স্বরগুণন।

স্বরের আত্যন্তিক যোগভাবই স্বরগুণন। স্বরযোগে স্বরসমূহের মধ্যে ব্যবধান থাকে কিন্তু স্বরগুণনে স্বরগুলির মধ্যে সে প্রকার ব্যবধান থাকে না, বিশেষরূপে অব্যবহিত ভাব ধারণ করে। স্বরগুণনে স্বরদিগের আন্তরিক গাঢ় মিলন রাজত্ব করে।

স্বরযোগ প্রধানতঃ প্রাচ্য এবং স্বরগুণন প্রধানতঃ প্রতীচ্য। স্বরযোগ লইয়া প্রাচ্য ভূমির সঙ্গীত রাজ্যে প্রধানতঃ যত কৌশল ও খেলা; এবং স্বরগুণন লইয়া প্রতীচ্য ভূমির সঙ্গীত রাজ্যে প্রধানতঃ যত কৌশল ও খেলা।

স্বরযোগ ও স্বরগুণন ইহাদের পৃথক ভাবে মুখ্যতঃ উন্নতিসাধন করতঃ এবং তাহাদের পরস্পরের সাহায্যে সঙ্গীত রাজ্যে মহোন্নতি সাধন করা যায়।

সাংখ্য স্বরলিপির নিয়মানুসারে স্বরলিপিতে সশ্রম ও সবিশ্রম স্বররাশির—একাধিক স্বরের মধ্যেই যোগ—গুণন ইত্যাদি চলিতে পারে। এই সশ্রম ও সবিশ্রম স্বরসমূহের মধ্যে সশ্রম স্বরেরই যোগ—গুণন ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ।

সশ্রমস্বর = কাল বা মাত্রাসহ শ্রমীস্বর। সবিশ্রম স্বর = কাল বা মাত্রাসহ শ্রমহীন নীরব স্বর।

গুণনস্বর ও তাহার নানাবিধসজ্জা।

অব্যবহিত ভাবে কতিপয় স্বর একত্র বিরাজ করিলে তাহা গুণিত ভাব ধারণ করে। যথা সাগাপা = সা,গা,পা = সা × গা × পা

সা × গা × পা = × (এরূপ
গা
×
সা

অতিরিক্ত সজ্জাতেও গুণিতস্বর রাখা যাইতে পারে।)

স্ত্রীস্বর ও গুণিতস্বর।

স্ত্রীস্বরের অর্থাৎ প্রকৃত হসন্তমাত্রিক স্বরের বেলায় দুইটী স্বর অব্যবহিত ভাবে বসিলেও প্রকৃতপক্ষে মুখ্য স্বরটীই বিরাজ করে, স্ত্রীস্বরের বিশেষ কোন মূল্য থাকে না ; সেই কারণে—স্বরবর্ণ-হীনতা প্রযুক্ত স্ত্রীস্বরের বেলায় হসন্ত-চিহ্নের বিধি বলীয়ান হয়, এবং তাহা গুণিতচিহ্নের প্রভাব নষ্ট করিয়া দেয়।

সিকিমাত্রিক স্বরের বেলায়, তাহাতে হসন্তচিহ্নের অধিকার থাকিলেও তাহা প্রকৃত হসন্তমাত্রিক স্বর নহে বলিয়া স্ত্রী স্বরের উপরোক্ত নিয়মটী তাহাতে খাটিবে না। কারণ সিকিমাত্রিক স্বরের স্বীয় প্রাধান্য আছে, তাহা স্ত্রীস্বরের ন্যায় স্বরবর্ণহীন নয় তবে এই পর্য্যন্ত, তাহার ভাবটা কিয়ৎপরিমাণে স্ত্রীস্বরের ভাবের কাছে পৌঁছে।

স্বরের চারিটী অবস্থা।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটী অবস্থার দ্বারা যেমন মানব জীবন সার্থক হয় সেইরূপ স্বরের চারিটী অবস্থা—স্বরযোগ স্বরবিয়োগ, স্বরগুণন স্বর-ভাগ অর্থাৎ স্বরের শুদ্ধযোগ, ছেদযোগ, গুণযোগ, এবং আশ ও খণ্ডযোগ দ্বারা সঙ্গীত-জীবন সার্থক হয়। স্বরের এই সকল অবস্থা কালের তারতম্যে ঘটে।

স্বরযোগ ও স্বরবিয়োগ।

এই জগৎরাজ্যে অসৎ থাকিলেও যেমন তাহার মধ্যে সত্ই প্রধানতঃ রাজত্ব করে সেইরূপ স্বররাজ্যে—সঙ্গীত রাজ্যে—বিয়োগ থাকিলেও তাহার মধ্যে যোগই মুখ্যত রাজত্ব করে। এইহেতু স্বরযোগ ও স্বরবিয়োগের মধ্যে স্বরযোগই প্রধান। যেমন আত্মা পরমাত্মার সহিত নানাপ্রকারে বিযুক্ত হইয়া চলিতে প্রয়াস পাইলেও তাঁহার সহিত আত্মার যোগ কখনও ছিন্ন হয় না অলক্ষিত ভাবে বিদ্য-মান থাকে সেইরূপ একটী স্বরের সহিত অপর স্বর বিযুক্ত ভাবে চলিলেও তাহা-দের মধ্যে যোগ অদৃশ্যভাবে বর্ত্তমান থাকে—শত বিয়োগের মধ্যেও যোগ বিরাজ করে। তাহা যদি না হইত তাহাহইলে স্বররাজ্য অবসন্ন হইয়া মৃত-দশা প্রাপ্ত হইবার উপক্রম করিত।

(অন্তরে অন্তরে যোগ বিদ্যমান আছে বলিয়াই বিয়োগ সপূর্ণরূপে বিয়ো-গাত্মক নহে কিন্তু আপেক্ষিক যোগা-ত্মক—যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া যোগমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে।)

উদাসীন যোগীবেশে সাজারে আমায়।

উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়।
কাজ নাই এসংসারে
মোহময় কারাগারে
জ্বলিছে জীবন ঘোর বিষের জ্বালায়।
উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়॥
কাজ নাই বেশ ভূষা
কনক মুকুতা ভূষা
কাজ নাই নগরের মোহিনী শোভায়।
উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়।
ছুটেছে পরাণ মোর
ছিঁড়েছে মায়ার ডোর
মনোমত্ত মাতঙ্গেরে বেঁধে রাখা দায়
যায়—নাহি মানে মানা-ছুটিয়া পলায়॥

(২)

উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়।
কে আছ সুহৃদ হেন
কররে জীবন দান
রাখ রাখ—করে ধরি সংহারের দায়
জ্বলিছে পরাণ মোর বিষের জ্বালায়।
চাহেনা অন্তর আজি
রম্য হর্ম্ম গজ বাজী
মুকুতা প্রবাল রাজি
লুটুক ধূলায়
সাজিব তাপশ আজি ভস্ম মাখি গায়॥
কি ছার সে সুখাসন
সুকোমল রাজাসন
কিছার সে সুখ শয্যা
হেরি লজ্জা পায়
প্রকৃতির প্রেমময় অচল শোভায়।
বসিব উপল তলে,
পেখিবরে কুতূহলে
অনন্তের মোহান্তক হরিত শোভায়
উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়॥

(৩)

উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়,
দেরে কমণ্ডলু করে
জটাভার ধরি শিরে
অক্ষমালা বক্ষোপরে কিবা শোভা পায়
জুড়াব পরাণ মোর বিষের জ্বালায়॥
যাব না যাব না ফিরে
আর পুন দুখনীরে
বল না বল না সখে ভাসিতে আমায়।
পেয়েছি পরম স্থান
সুখ দুঃখ মায়া আন
পুতুলের হাসি খুসি সকলি লুকায়
ভুলেছি ভুলেছি আজি মায়ার মায়ায়

(৪)

হে অচল! মহা যোগী তুমি এ—ধরায়
হেরিলে তোমারে ক্ষণ
নাহি জানি কি কারণ—
সংসারের সুখ দুঃখ সব ভুলে যায়
কি জানি পরাণ কেন কাঁদে উভরায়॥
অনন্ত তোমার নাম
তুমি অনন্তের ধাম
মজি তপে ধরেছ কি এ সুন্দরকায়?
কে বলে পাষাণ তুমি?
অনন্ত প্রেমের ভূমি
প্রেম নয় অনন্তের অনন্ত প্রভায়
জানিলাম মহাযোগী তুমি এ ধরায়

(৫)

তুমি রত্নাকর, গিরি, রতন নিলয়।
তব মহা ভীমোদরে,
আছে গুপ্ত থরে থরে
কুবেরের রত্নরাজি মাণিক্য নিচয়।
কিন্তু মরি, একি শোভা,
মুনিগণ মনোলোভা!—
রতনের লেশ অঙ্গে নাহি দেখা যায়
সর্ব্ব অঙ্গে শ্যাম শষ্প, কত শোভা তায়!
মুকুতা বিদ্রুম পাঁতি
কনকের তারে গাঁথি,
জড়া'য়ে হীরক পুষ্পে কনক পাতায়,
মণ্ডিত করিত যদি তব সর্ব্ব কায়;
হইত কি হেন শোভা কখন তাহায়?
নিজে শুল্ক সাজ ধ'রে
আপনি বিলাও পরে,
আপন রতন ধন যাহার তাহায়।
সর্ব্ব ত্যাগী মহাযোগী তুমি মহোদয়!
চাহি না রতন রাজি,
তব শ্যাম সাজে সাজি,
রহিব চরণে তব, দাও হে আশ্রয়।
চরণে শরণ মাগে দীন দুরাশয়॥

(৬)

মরি গিরি, এত প্রেম শিখিলে কোথায়?
প্রেমেতে আপন হারা,
প্রেমেতে পাগল পারা,
প্রেমে বহে সুধা ধারা, পবিত্রি ধরায়,
পূত তরঙ্গিনী রূপে দূরে বহি যায়।
কিবা কল কল স্বন,
কিবা সে উদ্দাম ঘন,
কিবা নিরমল বারি, অমিয় আশয়!
ভুলিব কেমনে ইহা? একি ভুলা যায়?
এ মোর মিনতি ধর,
কর কৃপা গিরিবর
দাও দাও অভাগারে পূত পদাশ্রয়
উদাসীন যোগী বেশে রহিনু হেথায়।
উদাসীন যোগী বেশে,
আজি এ বিজন দেশে
রহিনু পাশরি গিরি সংসার মায়ায়।
জনমের আশা বাসা,
যত আজি মরা পাশা,
সোহাগের যত ভাষা, আর না জুয়ায়।
ভূত চিন্তা—স্বপ্ন। আমি ভুলেছি তাহায়।
কোথা যাও, নির্ঝরিণি!
করি কুলু কুলু ধ্বনি,
কোথা যাও উন্মাদিনী, বলগো আমায়।
দাঁড়াও সেওনা ফেলে,
ক্ষেপা প্রাণ তব জলে
গলেছে—মিশেছে—দেখ ওই ভেসে যায়।
তব কল কল স্বনে,
মিশি আছি এক তানে
গাহিয়া প্রেমের গীতি সে আমার ধায়।
বাসনা মিশিতে অন্তে অনন্তের গায়॥

আমার পশ্চিমে চাকরি।

প্রথম অধ্যায়।

সাঁইত্রিশ বৎসরের কথা আজ লিখিতে বসিয়াছি। এই দীর্ঘকালে জড় প্রকৃতির কতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক উন্নতি এই কয় বৎসরে কত অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে! যাহারা জন্মে নাই তাহারা এখন পুত্রের পিতা, যাহারা বিদ্যালয়ে সবে মাত্র পাঠ শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা এখন সংসার সাগরের তীরে নৌকা ভিড়াইয়াছে। কত নগর রাজধানী হইয়াছে, কত রাজধানী শ্মশান হইয়াছে, কত শ্বাপদ সঙ্কুল প্রদেশ, মনোহর নগরে পরিণত হইয়াছে। কত পরিবর্ত্তনই যে হইয়াছে তাহা আর কি লিখিব?

নিজের কথাই বলি, এই সাঁইত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বে যাহা ছিলাম, এখন তাহা নাই। তখন সংসারের প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্রে নবোৎসাহে নবীন উদ্যমে বুক বাঁধিয়া প্রবেশ করিয়া ছিলাম। বাসন্তী সমীর প্রস্ফুটিত নূতন ফুলের ন্যায় নবীন—আশা, কেমন হৃদয় খানিকে প্রফুল্লিত করিয়া ছিল—ভবিষ্যৎ উন্নতি, সুদূর সুখ—আশা, কতই সেই নবীন চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া ছিল—কিন্তু এখন আমি— পূর্ব্বের সেই ভগ্নাবশেষ মাত্র। যৌবন গিয়াছে—জরা আসিয়াছে, প্রফুল্লতা—বিষন্নতার জন্য আমার হৃদয়ে আসন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে; উদ্যম—আলস্যের জন্য স্থান রাখিয়াছে; উৎসাহ—চলিয়া গিয়াছে, নিরুৎসাহ পূর্ণমাত্রায়, এই ভগ্ন হৃদয়ে—আধিপত্য করিতেছে। যাহা ছিল—সবই গিয়াছে—কিন্তু আছে কেবল মাত্র স্মৃতি। সেই স্মৃতি—বড় ভীষণ। জীবনের কত সুখ দুঃখের কথা ভুলিয়াছি- যৌবনের কত বিলাস বিভ্রমের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়াছি—কিন্তু একটী—ওঃ—তাহা অতি ভয়ানক—আজও আমার সম্মুখে ভীষণ দৃশ্য বিস্তার করিতেছে। সেটী একটী শোণিতময়ী কাহিনী, হিন্দুস্থানে কখনও তাহা ঘটে নাই ও ঘটিবে না। ঈশ্বর করুন—সহস্র উৎপাত, অত্যাচার দুর্দ্দৈব ভারতবর্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাক্ তবু যেন—তাহা আর না ঘটে!!

আমি—১৮৫৪ সালে, কলিকাতা হইতে মীরটে—কমিসেরিয়েট বিভাগে বদলি হই। আমার মনিব, কমিসারি জেনারেল—মেজর জেনারেল্ সি, বি হপ্‌কিন্স সাহেব তখন মীরটে অবস্থান করিতেছিলেন। হপ্‌কিন্সই আমাকে কলিকাতায় চাকরী করিয়া দেন। তাঁহার খুড়া -সিবিলিয়ান হপকিন্স সাহেব মুরশীদাবাদের কালেক্টার ছিলেন। আমার পিতা কালেক্টরির প্রথম পেস্কার, পিতার প্রার্থনায়, আমার কমিসেরিয়েটে চাকরি হয়।

মীরটে যখন বদলি হইলাম, তখন আমার বয়স ৩৩ বৎসর। আমার এক বৃদ্ধা পিসি আমায় মানুষ করিয়া ছিলেন শৈশবে মাতৃ বিয়োগ হইয়াছিল—কাজেই

তিনি আমায় চখের আড়াল করিতে না পারিয়া সঙ্গে গিয়া ছিলেন। মীরটে দেড়-বৎসর থাকিয়া সাহেবের সঙ্গে পুনরায়—আগরায় বদলী হই।

আগরায় মোটে ছয়মাস থাকিলাম, আমি হিসাব বিভাগে কাজ করিতাম। মনিবের—বেস সুনজর ছিল। ছয়মাস পরে—কাণপুরে হেড্ এসিস্‌টাণ্টের পদ শূন্য হইল। সাবেক হেড্ এসিস্‌টাণ্ট হিন্দুস্থানী ছিলেন—পদটী হিন্দুস্থানীর জন্য সৃজিত—কিন্তু অন্য উপযুক্ত লোক না থাকাতে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিরা আমায় সেই কর্ম্মে বাহাল করিলেন।

আমার বেতন তখন দুইশত টাকা, ত্রিশ টাকায় কলিকাতা হইতে আসিয়া ছিলাম—এই অসম্ভব পদোন্নতিতে ঈশ্বরকে, ইষ্টদেবতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম। মনে বড় দুঃখ হইল পিতা মাতা বাঁচিয়া থাকিলে আজ তাঁহাদের কতই না আনন্দ হইত।

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আগে দেশে চিঠি লিখিলাম। জবাব আসিল—তখন ডাকের এত সুবিধা হয় নাই—জবাব দেরিতে পাইলাম। পত্র পড়িয়া জানিলাম, আমার মঙ্গলার্থে বাটীর সকলে কালি-ঘাটে পূজাদিয়া আসিয়াছেন এবং আমার কাছে আসিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

এতদিন সকলকে আনি নাই খরচ পত্র বড় বেশী পড়িবে। সেই সময়ে সবে রাণীগঞ্জ অবধি লাইন খোলা হইয়াছে। এখন বুঝিলাম আনিলেই বা ক্ষতি কি?

তিনমাসের ছুটী লইয়া—দেশের দিকে যাত্রা করিলাম। সেকালে অনেক দিনের পর দেশে আসায় যে সুখ, তাহা ভুক্ত ভোগি ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিবে না।

দেখিতে দেখিতে একমাস কাটিল, ছুটী ফুরাইবার পূর্ব্বে কাজে লাগিবার জন্য—আপিস হইতে চিঠি পাইলাম। সুতরাং দেশে আর বেশী বিলম্ব করিতে পারিলাম না। পরিবারবর্গকে লইয়া বিষয় আশয়ের বন্দোবস্ত করিয়া কাণপুর যাত্রা করিলাম।

রেলের রাস্তা ফুরাইল—সুখেরও শেষ হইল। গোরুর গাড়ি সকল কষ্টের পূর্ব্ব সূচনা করিল। তারপর বয়েল—মাঝে মাঝে এক্কা, এইরূপে পঁচিশ দিনের পর—কাহিল হইয়া কাণপুরে পৌঁছিলাম। আমার সঙ্গে আসিলেন—আমার এক ভগিনী, দুই ভাগিনেয়ী, এক বিধবা ভ্রাতৃবধূ, এবং আমার স্ত্রী ও দুটী ছোট ছেলে। তখন সকলে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইতে পারিতেন না। সে সময়ে পশ্চিমে বাঙ্গালীর সংখ্যা বড় কম ছিল। আমি আত্মীয় স্বজন বেষ্টিত হইয়া "বিদেশ কথাটা ভুলিতে লাগিলাম। কিন্তু হায়! পরে এই কার্য্যের জন্য আমায় বিশেষ অনুতাপ করিতে হইয়াছিল।

ভবিষ্যৎ কে কোথায় দেখিতে পায়! যে দেখিয়াছে—সে মহাপুরুষ, কিন্তু প্রজ্ঞাচক্ষু কয়জনের আছে? আমাদের ন্যায় সামান্য মানব ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইলে এত কষ্টভোগ করিবে কেন? যে পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া আমি আত্মসুখে—বিস্মৃতির অগাধ জলে ডুবিতেছিলাম, সেই পরিবারবর্গই কয়েক মাস পরে আমার মহা বিপদের কারণ হইয়াছিল।

আমি যখন কাণপুরে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, তখন রাজনৈতিক আকাশ শারদীয় জ্যোৎস্না প্লাবিত, পৌর্ণমাসী-ময়ী—সুনীল—প্রশান্ত—সুদূর বিস্তৃত, তাহাতে কালমেঘের ছায়া মাত্র দেখা যাইতেছিল না। কিন্তু কে জানে কয়েক মাসের মধ্যে কোথা হইতে সেই বিমলাম্বরে কালমেঘের ছায়া পড়িল, মেঘের পর মেঘ আসিয়া, সেই শারদ কৌমুদির দীপ্ত হাসি মুছিয়া দিল। মহাঝটিকার পূর্ব্ব সূচনা স্বরূপ জোর বাতাস উঠিল।

আমি পাঁচ মাস কাণপুরে বিশেষ দক্ষতার সহিত কাজ করিলাম। খাই দাই—আপিস্ যাই, কাজ করিয়া ফিরিয়া আসি। দিন যায় রাত্রি আসে, সূর্য্য অস্ত যায়, আকাশে চাঁদ ভাসে, নক্ষত্র উঠে, প্রকৃতি ঘুমায়, জগত যেমন চলিয়া থাকে তেমনি চলে। মাঝে সরকারী কোন একটা কাজের জন্য—আমায় একবার ফতেপুর যাইতে হইল। আমি সাহেবের সঙ্গে ডাক গাড়িতে রওয়ানা হইলাম।

ফতেপুর হইতে কাণপুর ৪৮ মাইল চব্বিশ ক্রোশ। সকালে বাহির হইয়া রাত্রি—নয় ঘটিকার সময় আমরা ফতেপুরের বাঙ্গলায় পৌছিলাম। আমার আহারাদি সম্বন্ধে ফতেপুরের কণ্ট্রাক্টর লালা—কুমার প্রসাদের বাটীতে পূর্ব্বেই বন্দোবস্ত হইয়া ছিল।

কুমার প্রসাদ—লক্ষ্মীমন্ত লোক। বড় বাড়ী, লোক জন, বিষয় আশয়, গাড়ি ঘোড়া, যাহা থাকিলে লোকে বড় লোক বলে সবই তাঁর আছে। তাঁর উপর তিনি ব্যবহারে বড় ভদ্র। আমায় যথেষ্ট খাতির করিলেন। এই তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়। প্রথম আলাপে যেন কতকালের পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। আমি জলযোগ করিলাম—সাহেবের জন্য লালাসাহেব, খাঁটি দুধ, ভাল বখরার মাস, ও কতক মেওয়া ও ভাল ফল পাঠাইয়াদিলেন। রাত্রি কাটিল—পরদিন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ সকাল সকাল বসুইএর কাজ সারিল—আহারাদি করিয়া—সাহেবের কাছে গেলাম! লালাসাহেবও সঙ্গে গেলেন, সেখানকার কাজ সারিতে আরও দুই দিন বিলম্ব হইল। আমি, লালাজী, ও সাহেব পুনরায় কানপুরে ফিরিলাম।

পথে আসিতে আসিতে লালাজী দুইজন পরিচিত লোকের মুখে মীরট ও দিল্লীর বিদ্রোহ ও সিপাহির অবাধ্যতা সম্বন্ধে সংবাদ শুনিলেন। কথাটা সাহেবের ও কাণে উঠিল কিন্তু তখন আমরা কেহ বিশ্বাস করিলাম না।

১৫ই মে আমরা কাণপুরে পৌছিলাম। ফতেপুরের পথে যে বিদ্রোহের গল্প শুনিয়াছিলাম, কাণপুরে পৌছিয়া তাহা যে সত্য তৎসম্বন্ধে প্রমাণ পাইলাম। কিন্তু তখন সকলেরই মনে ঘটনাটা সামান্য বলিয়া বোধ হইল। আমিও ঐরূপ ভাবিলাম বটে। কিন্তু আমরা সকলেই সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত হইয়াছিলাম।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, যাহা প্রথমে জনরব ছিল—তাহা যেন, কতকটা সত্যভাব ধারণ করিল। যাহাতে লোক আদৌ বিশ্বাস করে নাই—তাহা যেন কতকটা ভয় আনিয়া দিল। একটা নির্দ্ধারিত কিছুই ঘটিতেছে না অথচ সাহেব—দেশী সকল কর্ম্মচারিই যেন

সতর্ক। নগরে কোন অসন্তোষের কারণ নাই—ছাউনীতে কোন গোল-যোগ ঘটে নাই—তথাপি লোক যেন মনে ভাবিতে লাগিল কি যেন একটা ঘটিবে। কোথাও কিছু নাই অথচ যেন ভয়ের একটা শূন্য ছায়া সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অদৃশ্য প্রেতমূর্ত্তির ন্যায় ঘুরিতে লাগিল।

আগরার—বিষণদয়াল, আমার ধর্ম্ম-ভ্রাতা। তাঁহার সহিত আমার বড় ঘনিষ্ঠ, আত্মীয়ভাব হইয়াছিল। এক প্রাণ ভিন্ন দেহ। আমি তাঁহার "মা"কে "মা" বলিতাম। তিনি হিন্দুস্থানী, আমি বাঙ্গালী, তাঁহাকে ভিন্ন জ্ঞান ছিল না। একবার মনে ভাবিলাম কাজ কি, দিল্লী ও মিরাটের যেরূপ সংবাদ শুনি-তেছি, যদি কিছু ঘটে, সাবধান হওয়াই ভাল। পরিবারবর্গকে আগরার বিষণ-দয়ালের বাড়ী পাঠাইয়া দিই। কিন্তু আবার সে সংকল্প ত্যাগ করিলাম। যেদিন মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছি সেই দিনই আপনি আপনি গিয়া সর-কারী চিঠি দেখিলাম—যে গুজরেরা * দিল্লী হইতে কাণপুরের পথে আসিতেছে এবং পথিমধ্যে—আমাদের কমিসরি-এটের—মাল পত্র লুঠ করিয়া লইযাছে। আমার বাটীর সকলে—অন্য কাহারও সঙ্গে যাইতে অস্বীকৃত হইল। বিশেষতঃ আমার পিশি ঠাকরুণ ও স্ত্রী ত বিষম বাকিয়া বসিল। আমার পক্ষে তখন ছুটী লওয়া বড় বিষম ব্যাপার। কাজের বিষম ভীড়, বিশেষতঃ সেদিন তিন মাস ছুটী লইয়াছি। শেষ না পাঠানই মত স্থির করিলাম। অদৃষ্টে কষ্ট থাকিতে তাহার ভোগ লঙ্ঘন করে কার সাধ্য! মানুষে নিজের বুদ্ধির দোষে মজিয়া শেষ দেবতার দোষ দেয়। এই সন্দিগ্ধ অব-স্থায় ৪।৫ দিন কাটিয়া গেল। সন্ধান পাইলাম জনকতক সাহেব সওদাগর, পূর্ব্ব হইতেই নৌকা ভাড়া করিয়া রাখি-তেছেন, অন্যান্য দুই চারি জনে ডাক বন্দোবস্ত করিতেছেন। একটু গোল-যোগ দেখিলেই তাহারা ভৃত্যদিগের উপর বাঙ্গলার ভার দিয়া এলাহাবাদ প্রস্থান করিবেন। এরপর আবার দুই তিন জন সত্য সত্যই কাণপুর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এই সময়ে একটী সামান্য ঘটনা ঘটিল! অন্য সময়ে হইলে হয়ত কেহ তাহার দিকে চাহিয়াও দেখিত না। তিলকে তাল করিত না। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে এই সময়ে এক নৌকা আটা কমিশেরিয়েটবিভাগে কাণপুর সৈন্যদলের ব্যবহারের জন্য আসিল। অনেক দিনের কেনা বলিয়াই হউক বা গমগুলিতে কোন কারণবশতঃ জল লাগাতেই হউক—আটার অবস্থা অতি খারাপ হইয়া গিয়াছিল। দস্তর মত তাহা গুদামজাত হইয়া সিপাহীদের মধ্যে বিলি হইতে লাগিল। আটার দোষ এই—রুটীতে কেবল একরূপ দুর্গন্ধ হইত। সিপাহীরা এ সম্বন্ধে রসদদারের কাছে অভিযোগ করিল। রসদদার একজন ইংরাজ—সুতরাং তিনি এ কথাটায় মাথা ঘামাইবার তত প্রয়োজন বোধ করি-লেন না।

সিপাহীরা একটু অসন্তুষ্ট হইল। অসন্তোষ প্রথম প্রথম তাহাদের মনের

* ইহারা ডাকাতি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

ভিতর ছিল—পরে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। দুষ্টলোকে সুযোগ পাইল। তাহারা এককে আর করিয়া তুলিল। সহরে চাউনীতে সিপাহী মহলে প্রচারিত হইল যে ফিরিঙ্গি আটার সহিত গরু ও শূকরের অস্থি চূর্ণ মিশাইয়া দিয়াছে। ঘরে আগুণ লাগিলেই বৈশাখী প্রচণ্ড বায়ুতে সেই অগ্নিরাশি যেমন প্রবলবেগে চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়ে এই জনরবও সেইরূপ চারিদিকে নানা আকারে প্রচারিত হইতে লাগিল। গোলযোগ দেখিয়া, সেই রসদ পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হইল।

আর একটী গুজব উঠিল—যে এক নেকা নূতন টোটা মীরট হইতে আসিতেছে—তাহাতে সুবিধার জন্য শুকর ও গোরুর চর্ব্বি মিশ্রিত করা হইয়াছে। হিন্দু মুসলমানকে তাহা দাঁতে কাটিয়া ছুঁড়িতে হইবে। যাহারা অস্বীকার করিবে তাহাদের তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইবে।

তৃতীয় কারণ এই—সেই সময়ে সিপাহিদিগের পুরাতন ছাউনী নূতন করিয়া তৈয়ারি হইতেছিল। ইউরোপীয় সৈনিক ও পদস্থ কর্ম্মচারিগণ নিজেদের সুবিধা বুঝিয়া গঙ্গার খালের পূর্ব্বদিকের কোটা বাড়ী গুলিতে সরিয়া গিয়াছিল। গরীব সিপাহিরা সেই ছাউনীর কাছে, তাঁবু গাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। শীত গেল পশ্চিমে শীতের দারুণ কষ্ট তাহারা—বিনাবাক্য ব্যয়ে সেই তাঁবুর মধ্যে কাটাইয়া, সহ্য করিল। তার পর গ্রীষ্ম আসিল। দিনের বেলায় লু ছোটে, রাত্রে ভয়ানক ঠাণ্ডা। সিপাহীরা বড় কষ্টে পড়িল। বলিবার কোন উপায় নাই—বলিলেও কেহ শুনে না। ইহাতে তাহাদের মনে এক ভয়ানক বিদ্বেষ বহ্নি ধুমাইত হইতে লাগিল। লক্ষ্ণৌএ এক শিশি উচ্ছিষ্ট ঔষধের জন্য মহা বিদ্রোহ সূচিত হইয়া উঠিল। এতগুলি কারণ "সত্বে" এতদিন কাণপুরে যে তাহা হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

দাবাগ্নি প্রবল হইলে যেমন সমুদের উপরের জল চঞ্চল ও আলোড়িত হইয়া উঠে—অথচ প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্থির দেখিয়া লোকে তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে পারে না, কাণপুরে আমাদেরও তাহাই হইল। লোকের মন দিন দিন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে সকলেই যেন কি একটা অব্যক্ত আশঙ্কায় আকুল হইয়া পড়িতেছে, অথবা তাহার প্রকৃত কারণ কি তাহার স্থির হইতেছে না। ১৯এ মে গুজব উঠিল—যে সিপাহিরা বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যোগ করিতেছে এবং গুজরেরা কাণপুরের খুব কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে। জনরবটা চিন্তার কারণ বটে। আমি আমাদের বিভাগীয় একজন কাপ্তেন সাহেবের নিকট ইহার তথ্য জানিতে পাঠাইলাম। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন কোন ভয় নাই। ওসব বাজার গুজব মাত্র।" পাছে কাপুরুষতা প্রকাশ পায়, কেহ কোন আত্মরক্ষার বিশেষ উপায় করিতেছে না—অথচ আমি করিলে যদি তাহারা আমায় উপহাস করে—এই ভয়ে আমি পরিবার বর্গের ভবিষ্যৎ নিরাপদতার কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিলাম না। এই লোকলজ্জাই আমার কাল হইল। আমি যদি তখন আত্মরক্ষার কোন উপায় করিতাম, পরিবারদের দেশে পাঠাইয়া

দিতাম তাহা হইলে পরে আমায় অত কষ্ট পাইতে হইত না।

ভয় যে খালি আমার হইয়াছিল তাহা নয়। বড় বড় পদস্থ সিবিল মিলিটারি সাহেব—যাঁহারা, বন্দুক পিস্তলের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে জানেন তাঁহারাও ভয় পাইয়াছিলেন। আমার সাহেবের অনুগ্রহে—অনেক পদস্থ সাহেব আমায় বিশেষ বন্ধুভাবে দেখিতেন। আমি অবসর ক্রমে তাঁহাদের বৈঠকে জুটিতাম। সেখানেও অই কথা। কতরকম মতলব আঁটা হইল একটীও মনঃপুত হইল না, শেষ স্থির হইল—এসম্বন্ধে কাণপুর বিভাগের সেনাপতি—জেনারেল স্যর হেনরী হুইলারের পরামর্শ ও অনুমতি লওয়াই বিশেষ যুক্তি যুক্ত।

তাহাই হইল। চারি পাঁচ জন বড় সাহেব—ও দুই জন হিন্দুস্থানী—সওদাগর, সাহেবের সহিত দেখা করিলেন। সেদিন আমি সমস্ত দিন আপিসে কাজে ব্যস্ত ছিলাম, পরে শুনিলাম, হুইলার সাহেব বলিয়াছেন—"বর্ত্তমানে কোন ভয়ের কারণ নাই তবে ভবিষ্যতের জন্য গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিরা (ইউরোপীয়) ৩২ নং পদাতিক দলের পরিত্যক্ত বারাক শ্রেণীতে বাস করিতে পারেন। এবং দেশীয় কর্ম্মচারিরা তাহার পার্শ্বের আর একটী বাড়ি দখল করিতে পারেন।" হুইলার সাহেব যে বাড়ীর কথা বলিয়াছিলেন তাহা এক নিভৃত অংশে, এবং যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয় তবে সেই দুইটী বারাকে যে কি উপকার হইবে তাহা অনেকে বুঝিতে পারিলেন না।

আমি মনে মনে স্থির করিলাম, আমার সহ কর্ম্মচারি বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ সহরের বাহিরে বাস করেন। যদি কোন বিপদের সূচনা দেখি, তাহা হইলে পরিবার বর্গকে অন্ততঃ তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দিব। নিজের জন্য ভাবি না যখন চাকরি করিতে আসিয়াছি বিশেষতঃ কমিসেরিএটে—তখন আমার মাথাটার মূল্য যে বড় বেশী নয়, তাহা গোড়া হইতেই জানিতাম। কাহাকে কিছু না বলিয়া—মনে মনে সংকল্প স্থির করিয়া রাখিলাম। কেবল আপিসে গিয়া অবসর ক্রমে লক্ষ্মীনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিবার মতলব রহিল।

সে রাত্রিটা নানা ভাবনায় কাটিল। পর দিন—দশটার সময় আপিসে গেলাম। আপিসে গিয়া দেখিলাম, দেশীয় কর্ম্মচারিদের মধ্যে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিন জন বাঙ্গালী। আমার এক দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি খুড়তুত ভাই সেই সময়ে অডানেন্সে কাজ করিতেন। তিনি আমার ঘরে আসিয়া বলিলেন "দাদা! পরিবারবর্গের রক্ষার কি উপায় করিতেছেন? এদিকে যে সর্ব্বনাশ!! আর বুঝি বিভ্রাট ঘটিবার দেরি নাই। সাহেবরা সব ষ্টেসন ছাড়িয়া পলাইতেছেন, আজ সকালে আমাদের আফিসের কাপ্তেন উইলিয়াম সহর ত্যাগ করিয়া ছাউনির দিকে সপরিবারে চলিয়া গিয়াছেন। আর একজন মিলিটারি সাহেব তিনি স্ত্রীপুত্রদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিতে গিয়াছেন তিনি এত ব্যস্ত হইয়া গিয়াছেন যে গাড়ী করিবার অবকাশ হয় নাই। আমাদের কি উপায় হইবে?"

আমি বলিলাম—জগদীশ্বরই আমাদের উপায়। সেকথা এখন ভাবিয়া

কি হইবে? যদি প্রকৃতই বিপদ ঘটে তখন বুদ্ধিও জোগাইবে। আর এখন যাইবা কোথায়? চাকরি ছাড়িয়া দিলেই বা পরিত্রাণ কই? ভায়া ত এই কথা শুনিয়া চলিয়া গেলেন। আমি আপিশের কাজে লাগিলাম। কেরাণী-দের অনেকেই অন্য মনস্ক। বেলা হইতেছে ছোট সাহেব আসিতেছে না, ইহাতে কাজকর্ম্মের বড় অসুবিধা হইতে লাগিল। বড় সাহেব তিন মাসেব ছুটীতে আছেন, ছোট সাহেব তাঁহার কাজ করিতেছেন। তিনি মিলিটারি নহেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কার্য্য দক্ষ। ছোট সাহেবের বাড়ীতে চাপরাসী পাঠাইলাম সে আসিয়া বলিল—বাটী শূন্য বাহির হইতে চাবি দেওয়া। ঘরে জিনিসপত্র কিছু নাই। কেবল খাট বিছানা পড়িয়া রহিয়াছে। সাহেব কোন চিঠি পত্র রাখিয়া যান নাই সুতরাং কি যে কবিব, কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না।

মনে করিলাম, গোলযোগ দেখিয়া সাহেব হয় ত, পবিবার বর্গকে অন্যত্র কোথাও রাখিতে গিযাছেন। যখন গোলযোগ এতটা উঠিযাছে—যে সক-লেই আত্মরক্ষাব চেষ্টা করিতেছে, তখন আমার মনে হইল আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। আমিও সকাল সকাল আপিস বন্ধ কবিলাম। আপিসের পিযা-দার কাছে সাহেবের নামে এক চিঠি রাখিয়া গেলাম।

সর্ব্ব প্রথমেই আমাব পরিবার বর্গকে স্থানান্তর করা যুক্তিসিদ্ধ ভাবিলাম। আমার বন্ধু লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার বাড়ী সহরের বাহিরে, সহর হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে। আমি দুই খান গাড়ি করিয়া আবশ্যকীয় জিনিস পত্র সমেত সেই ভরা বার বেলায় শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম। আমার বন্ধু লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু আমার সঙ্গে যাত্রা করিলেন।

সন্ধ্যার সময আমরা সেখানে পৌছি-লাম। লক্ষ্মীনারায়ণ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু-স্থানী ব্রাহ্মণ। তাঁহাব সংসারে তাঁহার এক বৃদ্ধা মাতামহী, বিধবা মাতা ও স্ত্রী। তাঁহাব পরিবার বর্গ সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও তাঁহাদের অমায়িকতা গুণে আমাদের পরিবারেরা তাঁহাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশিযা গেল। আমি লক্ষ্মী-নারায়ণ বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া চারিজন আরদালী তাঁহাব বাটী রক্ষণার্থ নিয়োজিত করিলাম। এবং প্রতি সপ্তাহে দুইবার করিয়া তাঁহাদের দেখিয়া আসিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।

এইবারে আমার চিন্তার অর্দ্ধেক অংশ কমিয়া গেল। নিজের জন্য তত ভাবনা নাই। অন্যকয়জন বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহাদের বাসায গিয়া মিশিলাম। আর-দালিব নিকট ছোটসাহেবের জন্য যে পত্র রাখিয়া গিয়া ছিলাম, তাহার জবাব আসিয়াছে। সাহেব লিখিয়াছেন— আমার দুই চারি দিন বিলম্ব হইবে। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আপিসের কাজ কর্ম্ম বন্দ করিওনা, কাগজ পত্র সহীর জন্য অমুকস্থানে আরদালী দ্বারা পাঠাইও। যেরূপ জনরব শোনা যাই-তেছে—তাহাতে, বিশেষ ভয়ের কথা বটে। বাহির বাহির হইতে নানাগোল-যোগের সংবাদ আসিতেছে। আমি সে দিন হুইলার সাহেবের সহিত দেখা করিযা ছিলাম। তিনি সাবধান হইতে

পরামর্শ দিলেন বলিলেন আমাদের পরিবারবর্গ সহর হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছি। আপিসের সরকারী কাগজ পত্র ও ক্যাশ সম্বন্ধে খুব সাবধান। সর্ব্বদা গুহ্য সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করিবে। তোমার কার্য্য দক্ষতার উপর আমার খুব বিশ্বাস আছে। আবশ্যক মতে তুমি অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পার। তোমাকে দুইটী বিভল্‌ভার, দুই খানি তরবারি ও দুইটী বন্দুক দিবার জন্য আমি পিক্ সাহেবকে পত্র দিলাম। ইত্যাদি—ইত্যাদি। * আমি পত্র পাইয়া দস্তর মত কাজ চালাইতে লাগিলাম। অস্ত্র গুলি আনাইয়া বাসায় রাখিলাম। একটী পিস্তল, ও একটী বন্দুক ও কিছু বারুদ ও গুলি লক্ষী প্রসাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম।

একদিন কৌতুহলী হইয়া পুরাতন বারিকে সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলাম। সে খানে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে একবারে চক্ষুস্থির। সহরের যত সিঁবিল্ মিলিটারি, ও সওদাগরগণ স্বস্ব স্ত্রী পুত্র দিগকে সেই বারাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ঘর অপেক্ষা লোক বেশী, কাজেই ঠাসা ঠাসি আরম্ভ হইয়াছে যে ঘরে এক জন করিয়া লোক থাকিলে নির্জ্জনতা প্রিয় ইংরাজের অসহ্য বোধ হইত সেই ঘরে এখন ৫।৭ টা বিছানা পড়িয়াছে। দিনরাত খস্‌খস্ টাটীর জলসিক্ত, শীতল সমীর সেবন করিয়াও যাঁহাদের গ্রীষ্ম দূর হইতনা, এখন তাঁহারা সকলে এক খোলা লম্বা বারান্দায় কুণ্ডলীকৃত হইয়া রহিয়াছেন। যদিও এস্থানে তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট হইতেছে তথাপি নিরাপদতা সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইয়া—তাঁহারা এ সমস্ত আদৌ গ্রাহ্য করিতেছেন না। আরও দেখিলাম সেই পুরাতন বারাকের অন্য এক বাড়ীতে একদল গোরা গোলন্দাজ—ছাউনী করিয়াছে। ইহা অবশ্য সেই আগন্তুক স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকা দিগের রক্ষার জন্য। ক্রমশঃ—

* ইনি Ordanance এর বড় সাহেব।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

৫। তড়িত।

কোন কোন দ্রব্য ঘর্ষিত হইলে নিকটবর্ত্তী সকল প্রকার হাল্‌কা পদার্থকে যে আকর্ষণ করে, তড়িৎ তাহার কারণ। যদি ধুনা বা গালার খুব মোটা শলাকে লোমশ বা রেশমী কানির দ্বারা খুব ঘর্ষণ করিয়া, গাছের মাইজের ছোট ছোট গুলি পাকাইয়া মসিনা বা শণের সুতা দিয়া অথবা চেক্‌নাই রেশমী সুতা দিয়া সেই শলার সাম্‌নে টাঙ্গাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ঐ ধুনা বা গালার শলা তাহাদিগকে অনেক দূর হইতেও আকর্ষণ করে। ইহা কাঠের গুঁড়া, পালকের লোম, সোনার পাত প্রভৃতি আর আর দ্রব্যকেও আকর্ষণ করে। কাচ, গন্ধক, তৃণমণি (amber) বিশেষত লাক্ষাও এই গুণ উচ্চ পরিমাণে ধারণ করে। ধুনার শলা ঐ গুণ যেমন অধিকক্ষণ রাখিতে পারে না, সেইরূপ কাচ প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্যের শলাতেও ঐ গুণ কতক ক্ষণ পরে আর থাকে না, তখন আবার ঘর্ষণ করিলে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

তড়িৎ কল এই নিয়মমূলের উপর নির্ভর করে। ইহাতে বৃহৎ একটি কাচের চাক্‌তি আছে, তাহার উপরে ও নীচে, দুই দিকে দুইটা গদির
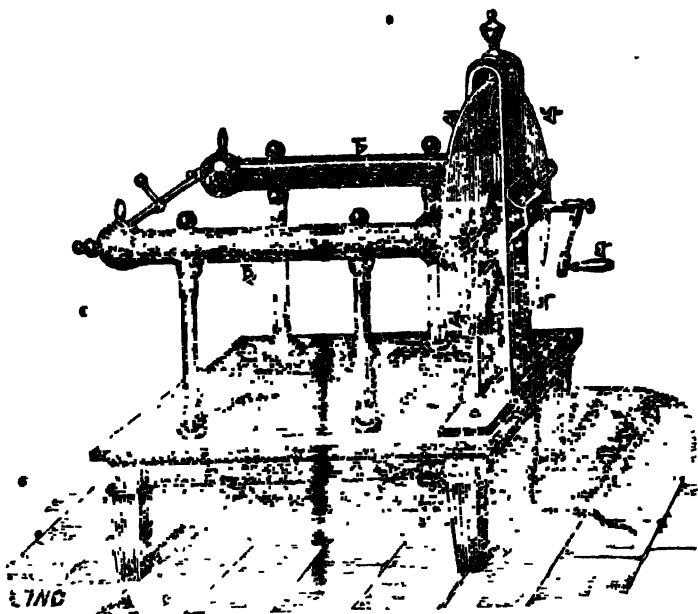
মত আছে—তাহার মাঝে কাচটা রহিয়াছে। কাচের মধ্যস্থলে একটা বাঁট লাগান রহিয়াছে। সেই বাঁট যত ঘোরান যায়, কাচটা তত ঘোরে, ঘুরিলেই গদিতে খুব ঘর্ষণ লাগে—তাহাতে যে তড়িৎ কাচে প্রকাশ হয়, তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে, কিন্তু মধ্যস্থ সম্বন্ধে পরিচালকে প্রবেশ করিয়া অধিকাধিক করিয়া জমা হইতে থাকে। পরিচালকেরা এইরূপ তড়িদুপেত হইয়া যে কেবল হাল্‌কা সামগ্রী আকর্ষণ করে তাহা নহে কিন্তু যদি তাহার কতক অঙ্গুলি পরিমিত বা বিতস্তিপরিমিত নিকটে হস্ত লইয়া যাওয়া যায়, অকস্মাৎ জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে দেখা যায় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিরেট পুট্‌পুট্‌ শব্দও শ্রুত হয় এবং হস্তে, বাহুতে এবং কখন কখন সমুদয় শরীরে, অল্পই হউক বা অধিকই হউক, এক প্রকার উত্তেজনা উপস্থিত হয়।

তড়িৎ তবে কাচের চাকতি হইতে নিকটস্থ পরিচালকে সংগত হয় এবং নিমেষ মধ্যে তাহার সমুদয় আয়তনে প্রসৃত হয়, এই অবস্থায় যদি কোন দ্রব্যকে তাহার নিকটে উপনীত করা যায়, তথা হইতে ঐ তড়িৎ পুনরায় দ্রব্যে আগমন করে এবং স্ফুলিঙ্গ দ্বারা অর্থাৎ আলোক ও শব্দ দ্বারা আপনার গৃহীত পথকে ব্যক্ত করে।

কিন্তু সকল পদার্থেরই সমান পরিচালকতা গুণ নাই অর্থাৎ সমান পরিমাণে তড়িৎকে প্রসৃত হইতে বা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে দেয় না, ধাতুকে পরিচালক বলে, যেহেতু ইহা, যত বড়ই হউক না, তড়িৎকে ক্ষণমাত্রে আপনার সমুদয় আয়তনে উপনীত বা পরিচালিত করে। জল, ভিজে বাতাস, ভিজে মাটি, মনুষ্যদেহ, সূতা বা তুলার দ্রব্য, ইহারাও পরিচালক, যদিচ ধাতু অপেক্ষা তাহাদের পরিচালকতা কম। ইহার বিপরীতে কাচ, লাক্ষা, ধুনা, গন্ধক, শুষ্ক বায়ু, রেশমী বা লোমশ দ্রব্য ইহারা অপরিচালক বা ধারক, ইহারা তড়িৎকে উপনয়ন করে না, কিন্তু তাহাকে ধরিয়া রাখে, আবদ্ধ রাখে।

অতএব তড়িৎকে এক প্রকার তরল পদার্থ কহা যাইতে পারে, যাহা ঘর্ষণ দ্বারা কোন

কোন বস্তুতে প্রকাশ হয়, যাহা তড়িৎ যন্ত্রের ধাতুময় পরিচালককে এবং সামান্যত সকল পরিচালককেই সঞ্চলন করে এবং তাহা হইতে বাহির হইয়া নিকটস্থ দ্রব্যে প্রসৃত হয়। ইহাকে তড়িৎ পদার্থ কহে; ইহা ভারহীন। গালার দণ্ড যখন খুব শুষ্ক এবং অত্যন্ত তড়িতান্বিত হয়, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত করে, এইরূপ অদৃশ্যপ্রায় স্ফুলিঙ্গ প্রায় দুই খৃষ্টীয় শতাব্দ গত হইলে প্রথম দৃষ্ট হইয়াছিল, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ওয়াল নামক যে বিজ্ঞানবিৎ ইহা প্রথম দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে ইহার শব্দ বজ্রধ্বনির ক্ষুদ্র অনুকৃতি এবং ইহার আলোকবিন্দু বিদ্যুৎপঙ্‌ক্তির অনুরূপ। এই যে মহাঘটনার সহিত ঐ অতি ক্ষুদ্র ঘটনার আশ্চর্য্য তুলনা—ইহা দ্বারা কিন্তু বাস্তবিক সত্যই ব্যক্ত হইয়াছিল অথবা ইহা সেই প্রথম উষাকিরণের ন্যায় প্রকাশ পাইয়াছিল, যাহা হইতে অবশেষে সত্যসূর্য্য দীপ্তি পাইল, কেননা এই তুলনার সত্যতা সপ্রমাণ করিবার জন্য আরও এক শতাব্দীর অনুসন্ধান, পরিশ্রম ও পরীক্ষা লাগিল।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বিখ্যাত ফ্রাঙ্কলিন প্রতিভা দ্বারা চালিত হইয়া ঝোড়ো (ঝড়ের) মেঘ হইতে স্বকীয় পদতলে বজ্রশিখা আনয়ন করিবার জন্য প্রগল্‌ভ হস্ত দ্বারা তাহার কর্ষণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং পদতলে আনত স্বয়ং বজ্রের নিকট হইতেই তাহার উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই অবধি নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িল, গাঢ় অন্ধকার ঘুচিয়া গেল এবং সত্যের জ্যোতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই সময় বিশেষত ফ্রান্স দেশে তাড়িৎ ঘুড়ির দ্বারা যে সকল জমকাল পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহা দ্বারা তড়িৎস্ফুলিঙ্গ নহে, কিন্তু বহুগজ দীর্ঘ বজ্রাৎশিখাপত্র সকল ভূমিতলে অবতরণ করান গিয়াছিল এবং তাহা সঠিক প্রমাণ দ্বারা আমাদের তড়িৎযন্ত্রনির্গত তড়িতের সদৃশ বলিয়া অনায়াসে চিনিতে পারা গিয়াছিল। অতএব যেখানেই ভারবান্ পদার্থ আছে (যেমন সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলে), সেখানেই যে তাপের ন্যায় তড়িৎও বিদ্যমান আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন ঘটনা আজও পর্য্যন্ত আমাদের মনে ইহা উদ্দীপ্ত করিয়া দেয় নাই যে আমাদের সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের পরস্পরের মধ্যে তড়িতের গতিবিধি আছে।

৬। তাড়িৎচৌম্বক।

গাল্ভা বা প্রাণিতড়িত, বলটার স্তম্ভ এবং ঐ সমস্ত দিয়া যাহা চৌম্বক ও তড়িৎ পদার্থের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত হয়, এ সমস্তই অধুনাতন তাড়িৎচৌম্বকের অন্তর্ভূত।

বিজ্ঞানের এই শাখাটী যেমন নূতন আবিষ্কৃত, তেমনি বিস্তৃত ও উর্ব্বর। অর্দ্ধশতাব্দীর কিছু বেশী হইল, ইহার মধ্যেই ইহা হইতে রাসায়নিক তড়িৎ ও তাড়িত সম্বাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রধান তিনটী আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা এই শাখার জন্মলাভ হইয়াছে।—১৭৯০ খৃষ্টাব্দে গাল্‌ভানির আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বল্টার আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা এবং ১৮২০ খৃষ্টাব্দে অরষ্টেডের আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা।

এখন এই তিন প্রাথমিক তথ্যের ভাব হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য সংক্ষেপে ইহাদের লক্ষণ বিবরণে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাদের দ্বারা বিজ্ঞানের নূতন পথ সকল উন্মুক্ত হওয়াতে ইহাদের প্রত্যেকের এক এক শ্রেণী নূতন আবিষ্ক্রিয়া সকল বৃদ্ধি হইয়াছে।

গাল্‌ভানি। গাল্‌ভানি সূক্ষ্মরূপে নিষ্পাদিত অনুসন্ধানপরম্পরা দ্বারা এই একটী প্রধান তথ্যের আবিষ্ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইলেন যে, যদি অনেকক্ষণ মৃত ব্যাঙের শরীরকেও ভিন্নযুক্ত ধাতু বা মধ্যচ্ছেদ করিয়া তাহার মাংসপেশী ও ধমনীকে একদা স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে ঐ মাংসপেশী ও ধমনীর সঙ্গে যে যে অঙ্গের যোগ আছে, সেই সেই অঙ্গতে, ভেক জীবিত থাকিলে স্ববলে তাহারদিগকে যেরূপ গতিক্রিয়া উত্তেজিত করিতে পারিত, ঠিক সেইরূপ সংকুচ্য গতি বিধান করা যাইতে পারে।

এরূপ ঘটনার কারণ কি হইতে পারে? এই তো নিজচেষ্টাবিহীন, প্রাণক্রিয়াশূন্য ছিন্ন কলেবর জড়রাশি (inert mass)—ইহা অকস্মাৎ

জীবনের আকার ইঙ্গিত কিরূপে পুন প্রাপ্ত হইল? প্রথমে সকলে মনে করিয়াছিল, দেহ-সঞ্চালন দ্বারা বুঝি শারীর রচনাপ্রণালীরই কোন ভেদ ব্যক্ত হইতেছে; তাহাদের মনে এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে বুঝি শরীরের মধ্যে এমন কোন জৈবনিক তরল পদার্থ আছে যাহা, ধমনী ও মাংসপেশীকে একদা স্পর্শ করিলে, দেহমধ্যে সঞ্চালিত হইয়া ঐরূপ অঙ্গচালনা উৎপন্ন করে। এই যে আনুমানিক সিদ্ধান্ত, ইহার আর প্রমাণ গ্রহণ না করিয়াই ততই সকলে আদর পূর্ব্বক ইহাকে স্বীকার করিয়া লইল, যতই লোকে দেখিতে লাগিল যে, ঐ ব্যাপার কেবল যে ভেকেরই মৃত শরীরে দেখা যায় তাহা নহে, কিন্তু সকলেরই মৃতদেহে ঐরূপ হয়, কেবল যে মৃতদেহে তাহাও নহে, আবার জীবৎ পশুতেও ঐরূপ ঘটনা ঘটে এবং উহা নানারূপে প্রকাশ পায়; এবং যখন পরীক্ষকেরাও নিজে উৎসাহপূর্ণ হইয়া স্বীয় শরীরের নানাস্থানে উপরের চর্ম্ম উঠাইয়া খিলান আকার ধাতু দ্বারা একদা নিম্নস্থ চর্ম্মের দুই ভিন্ন অংশ স্পর্শ করিতেন, তাঁহারাও ঐরূপ অপূর্ব্ব ইন্দ্রিয়বোধ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনুমানসিদ্ধ পদার্থের নাম সকলে গাল্বানি তরল পদার্থ রাখিলেন এবং যে সকল ঘটনা গাল্বানি কর্ত্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত ঘটনার অনুরূপ, তাহাদিগকে লোকে গাল্বানিত্ব অথবা গাল্বানিক্রিয়া বলে।

বল্টা। বল্টা এই প্রমাণ করিলেন যে ঐরূপ গাল্বানিক সংকুচ্যতা এবং অপর অপর ঘটনা যাহা গাল্বানিত্বের উপর নির্ভর করে, তাহা তড়িৎ ব্যতীত আর কিছুই নহে, কিন্তু ঐ তড়িৎ অন্য তড়িতের মত ঘর্ষণ দ্বারা আবিষ্কৃত না হইয়া, যাহা আগে জানা ছিল না এমন বিশেষ অবস্থায় ইহার আবির্ভাব হয়। পরে তিনি অনেক নূতন পরীক্ষা দ্বারা আপনার মত সমর্থন করিয়া শ্রেণী-বদ্ধ সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তপরম্পরা দ্বারা স্তম্ভযন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন—এই আশ্চর্য্য যন্ত্র বিজ্ঞানের পক্ষে এক নূতন অঙ্কের সূচনা করিয়া দিয়াছে, বলিতে হইবে।

বল্টার স্তম্ভকে তড়িতের স্বাভাবিক ও অক্ষয় আকররূপে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহা তাড়িত স্রোতকে তদ্রূপই প্রবাহিত করে, যেমন মশাল আলোক দান করে এবং উনন তাপ প্রদান করে। ইহার পরবর্ত্তী যে সকল আবিষ্ক্রিয়া, তাহা বল্টার প্রথম আরম্ভকে এরূপ সুসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে যে তাড়িতস্রোত এখন করচের মধ্যে আসিয়াছে—একটী সুনিশ্চিত নিয়মের মধ্যে আসিয়াছে; ইহার স্রোতের গতিকে যেদিকে ইচ্ছা চালান যাইতে পারে, ইহার আতিশয্য বা প্রগাঢ়তা নিয়মিত করা যাইতে পারে, এই স্রোতকে এত মৃদু করা যাইতে পারে যে তাহা ব্যাঙের অঙ্গ সংকোচ করিতে পারে কি না সন্দেহ, আবার ইহাকে এত পরাক্রমশালী করিয়া তোলা যাইতে পারে যে আকাশের বজ্রের সঙ্গে ইহার তুলনা হয়, কারণ বজ্রের ন্যায় ইহা জীবন ধ্বংস করে, বজ্রের ন্যায় বড় বড় লোহ স্বর্ণ প্লাটিন খণ্ডকে গলাইয়া বাষ্প করিয়া ফেলে; তবে কিনা, ইহা এমন এক প্রকার বজ্র, যাহা ইচ্ছাতে করিয়া উৎপন্ন হয়, ইচ্ছাতে করিয়া চালিত হয় এবং ইচ্ছাতে করিয়া নিয়মিত হয়।

প্রথম প্রথম যে সকল তড়িদুদ্গম যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাদের, উপরে যেরূপ বলা গেল, সেরূপ কিছুই অসাধারণ ক্ষমতা ছিলনা বটে কিন্তু ঐ ক্ষমতাকে সূত্ররূপে ধারণ করিত; সেই ক্ষমতাকে সম্যক্ প্রকাশ করিতে তখন অনেক পরীক্ষাপরম্পরার আবশ্যক ছিল। কিন্তু কোন বিষয়ের প্রথম আরম্ভ জানিতে আমাদের যেমন আনন্দ হয় এমন আর কিছুতেই হয় না; এইজন্য বল্টা তাঁহার যন্ত্রের গড়ন যেরূপ প্রথম মনে করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল। এইরূপ স্তম্ভাকারে স্থাপন করাতে ইহার নামই স্তম্ভযন্ত্র হইয়া গেল।

এই স্তম্ভ, যাহাকে স্তম্ভের পোস্তাও বলে, পরপৃষ্ঠার উপকরণে রচিত হয়—সকলের নীচে
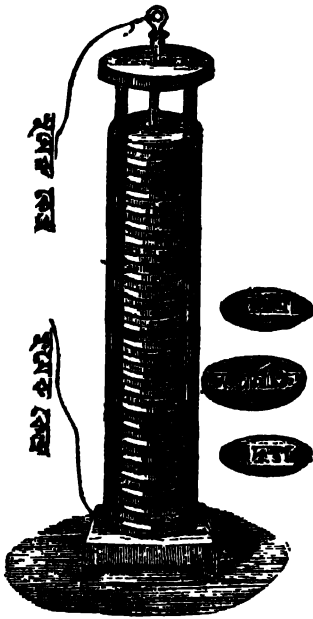
দস্তার চাক্‌তি, তাহার উপর একটা ভিজা পদার্থের চাক্‌তি, তাহার উপর একটা তাম্র চাক্‌তি—ইহাই স্তম্ভের প্রথম মূল থাক হইল; তার পরে এবং বরাবরই ঐরূপ শ্রেণীপরম্পরায় উহাদিগেকে বসাইতে হইবে—দস্তার চাক্‌তি, ভিজা চাক্‌তি, তাম্র চাক্‌তি—এইটা আবার স্তম্ভের দ্বিতীয় মূল থাক হইল, এইরূপ শত থাক পোস্তা নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। কানিব, কাঠের, লোমজমাট বস্ত্রের বা মণ্ডপাটের (কাগজ জমাট) চাক্‌তিকে ঈষৎ অম্ললবণ বা ক্ষারবান্‌ জলের দ্বারা সিক্ত করিলে তাহাকে ভিজে চাক্‌তি বলে। এইরূপ, যখন পোস্তা গাঁথা শেষ হইল, তখন যদি কেহ একদা একহাতে তাহার মূল ও আর এক হাতে তাহার অগ্রভাগ স্পর্শ করে, সে তীব্র উত্তেজনা অনুভব করে, সেই উত্তেজনা আরও অধিক হয়, যদি হাত ভিজে থাকে—বিশেষতঃ যদি দুই হাতে দুই ধাতুনির্ম্মিত ভিজে চোঙা দ্বারা যোগসাধন করা যায়। পাছে উত্তেজনা আত্যন্তিক হয়, এই জন্য স্তম্ভের কতক অংশমাত্র ঘেরের মধ্যে আনিয়া উহার মৃদুতা সম্পাদন করা যাইতে পারে; অর্থাৎ এক হাত গোড়ায় দিয়া আর এক হাত ক্রমে ক্রমে উচ্চে দিয়া দেখিতে হয়, কোন্‌ অবধি হাত সহে; কিন্তু বরাবরই ভিন্ন থাক্‌ স্পর্শ করিতে হইবে, যেমন প্রথম এবং দশম, প্রথম এবং পঞ্চদশ, প্রথম এবং শেষ—যাহাদিগকে দুই কেন্দ্র বলে। ঐ দুই কেন্দ্র বা স্পৃষ্টস্থানের মধ্যে যত অধিক সংখ্যক থাক ব্যবধান থাকে, ততই তড়িতের কার্য্য বেশী হয়।

দুই জন হোক্‌, দশজন হোক্‌, শতজন হোক্‌, যদি পরস্পর হাতাহাতি করিয়া গোল হইয়া দাঁড়াইয়া, প্রথম ব্যক্তি যখন স্তম্ভের গোড়ায় হাত দিয়া রহিয়াছে, শেষ ব্যক্তি যদি তখন স্তম্ভের আগায় হস্তার্পণ করে, ঘেরের তাবৎ মানুষই সেই একই সময়ে উত্তেজনা অনুভব করিবে এবং ঐ উত্তেজনা ততক্ষণ বরাবর থাকে, যতক্ষণ স্তম্ভের সহিত সংস্পর্শ থাকে এবং ঘেরটাও জোড়া থাকে, ঘেরের মধ্যে বিচ্ছেদ না থাকে অর্থাৎ যদি সকলেই পরে পরে আপনার ভিজে হাত দিয়া অন্যের ভিজে হাত ধরিয়া বা স্পর্শ করিয়া থাকে; মধ্যে যদি কিছুমাত্র বিচ্ছেদ থাকে, তাহা হইলে ঘের খুলিয়া গেল, তড়িৎ আর যাইবে না, তৎক্ষণাৎ সকল ক্রিয়া ফল (effect) বন্ধ হইয়া যাইবে।

আরও, ঘেরটা স্তম্ভ হইতে অনেক দূরে থাকিতে পারে। স্তম্ভটা যেন পারী নগরে থাকিল, যেখানে বল্‌টা প্রথম ঐ যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন, ঘেরটা লণ্ডন নগরে থাকিতে পারে; কেবল ঐ ঘেরকে পূরণ করিবার জন্য বার্ত্তাবহের তারের মত লণ্ডন হইতে পারী পর্য্যন্ত দুইটা সংবৃত (isolated) তার আবশ্যক। যথায় (পারীনগরে) একটা তার স্তম্ভের গোড়ার সঙ্গে যোগ থাকা, আর একটা তার উহার আগার সঙ্গে যোগ থাকা চাই। এখন, লণ্ডনেই হোক, পারীতেই হোক্‌, যেখানেই হোক্‌, যেই ঘেরকে জোড়া দেওয়া যাইবে, অমনি ঘেরের তাবৎ মানুষই উত্তেজনা অনুভব করিবে এবং যে পর্য্যন্ত ঘেরটা বদ্ধ থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত উত্তেজনাও বরাবর থাকিবে। ইহা ভিন্ন টুরিন, লিয় এবং আর আর মাঝামাঝি স্থলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার পরিধি হওয়ার বাধা হয় না, স্তম্ভের বল বৃদ্ধি করিলে সর্ব্বত্রই একদা ঐ উত্তেজনা অনুভূত হইবে, কিন্তু যদি ঘেরের মধ্যে কোন স্থান খোলা না থাকে, যদি সংলগ্নতার (continuity) মধ্যে কিছু বিচ্ছেদ না থাকে। যে ঘেরে বিচ্ছেদ থাকিবে, সেই ঘেরের মানুষের উত্তেজনা অনুভূত হইবে না।

ইন্দ্র।

১ম খণ্ড ৩১২ পৃষ্ঠার পর।

আনুষঙ্গিক কথা।

ইন্দ্রের বিরুদ্ধে বৈদিক অভিযোগ এই :—

(১) তাঁহার একজন নির্দ্দিষ্ট জনক আছে বলিয়া বোধ হয় না।

(২) তিনি মাতৃঘাতী।

(৩) তিনি সোমপায়ী ও সোমপ্রিয়।

আর পুরাণের প্রচলিত কাহিনী গুলি পাঠে সহজেই মনে হয়, পিনাল কোডে এমন কিছু গুরুতর অপরাধের বিধান নাই যাহা ইন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হইতে পারে।

ইন্দ্র সম্বন্ধে বেদবাণী ও পৌরাণিকী কথা স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র হইবারই কথা। বেদ পুরাণ নহে, শ্রুতি—স্মৃতি নহে। তবে কিনা স্মৃতি বল, দর্শন বল, পুরাণ বল, তন্ত্র বল সকলই বেদমূলক। কেবল বেদ মূলক নহে—বেদবিরোধি আর্য্যধর্ম্মমত অগ্রাহ্য। আর বেদ সভ্যতার শৈশব যুগের অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য কৃষক বালকগণের উল্লাস সঙ্গীত নহে, বেদ—অপৌরুষের আর্য্যশাস্ত্র। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ।

বেদ "আর্য্য" জাতির আদিম ধর্ম্মগ্রন্থ, সম্ভবতঃ এই কারণেই কৃষকগীতি চাষার গান, কল্পিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত গণ অর্ ধাতু হইতে আর্য্যশব্দ সিদ্ধ করেন। অর্ ধাতুর অর্থ ভূমিকর্ষণ। "ল্যাটিন, গ্রীক, এংলো স্যাক্সন, ইংরাজী, রুষ, আয়রিশ, কর্ণিস, ওয়েল্‌স্, প্রভৃতি অনেক য়ুরোপীয় ভাষায় হাল বা কৃষিবাচক শব্দগুলি এই অর্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তাঁহাদের মতে এই জাতি কৃষিকার্য্য করিত বলিয়া এই নাম হইয়াছে। য়ুরোপীয় উক্ত জাতিগুলি এই আর্য্য জাতি হইতে সমুদ্ভূত।" কৃষিই তখন প্রধান জীবনোপায় ছিল, এরূপ অনুমান করা অসম্ভব না হইতে পারে। সে যাহা হউক, বিশ্বস্ত পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের মতে "আসরীয়ার শিলালিপির অরি শব্দ হল বাচক। এই শব্দটীও আর্য্যের প্রতিরূপ হইতে পারে। যখন অরি, অর্য্য বা আর্য্য কৃষক বুঝাইতেছে, তখন আদিম আর্য্যশাস্ত্র চাষার গান ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কি বৈদেশিক, কি লৌকিক উভয়তই দেখা গেল আর্য্য শব্দ কৃষিবাচক তবে আদিম আর্য্যগ্রন্থ কৃষকের গান বলায় আপত্তি কি?

আপত্তি আছে। অপরের কথা শুনায় মহাপাপ হয় না বটে কিন্তু আত্ম সম্মান ও জাতীয় গৌরবের কথার দিকে সযত্ন সম্ভ্রম দৃষ্টিপাতও একান্ত প্রার্থনীয়। দেশের লোক আর্য্য বলিতে কি বুঝে, যে বেদের কথার আলোচনা হইতেছে, সেই বেদের আচার্য্যগণ আর্য্য বলিতে কি বুঝিতেন, সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

কতকাল হইতে আর্য্য নাম প্রচলিত, এবং কি অর্থে তাহার ব্যবহার, অনুসন্ধান করিতে যাইলে দেখিতে পাই,

জগতের আদিম গ্রন্থ বেদেও ইহার উল্লেখ আছে। সে সময়ের লোকে আর্য্য বলিতে কি বুঝিত, স্পষ্ট জানিতে না পারিলেও ইহা জানা যায় যে, বৈদিক ব্যাকরণে বা ধাতু কোষে অর্ ধাতু নাই। সংস্কৃত অর্ ধাতু কাল্পনিক; ইহার অর্থ হল বা ভূমিকর্ষণ সুতরাং শূন্যভিত্তি সিদ্ধান্তস্তম্ভ। ইহারই উপর প্রাসাদ নির্ম্মাণ তাহাও কি আশ্রয়যোগ্য।

বৈদিক সময়ের যাঁহাদের কথা কোনমতে উপেক্ষা করা যাইতে পারে না, সেই যাস্ক ও সায়ণাচার্য্য ইহার কিরূপ অর্থ করিয়াছেন, দেখা যাক্।

যাস্ক বলেন, "আর্য্য ঈশ্বরপুত্রঃ।" আর্য্য শব্দের অর্থ ঈশ্বরপুত্র।৬।২৬

সায়ণাচার্য্য ইন্দ্র সম্বন্ধে কতক গুলি ঋকে আর্য্য শব্দের অর্থ করিতে গিয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে সেগুলি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

(১) "হে ইন্দ্র! কাহারা আর্য্য এবং কাহারা দস্যু তাহা অবগত হও। কুশযুক্ত যজ্ঞের বিরোধীদিগের শাসন করিয়া (যজমানদিগের) বশীভূত কর। ১।৫১।৮। সায়ণ এই স্থলে আর্য্য অর্থ করিলেন "বিদুষোহনুষ্ঠাতৄন্" অর্থাৎ বিজ্ঞ যজ্ঞানুষ্ঠাতা।

(২) হে ইন্দ্র! আর্য্যগণের বল ও যশ বর্দ্ধন কর।" ১।১০৩।৩। সায়ণ এস্থলেও কৃষকের বল ও যশ না বাড়াইয়া "বিদ্বাংসঃ স্তোতার" বিজ্ঞ স্তোতারই বল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলেন।

(৩) "হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আর্য্য মনুষ্যের জন্য লাঙ্গল দ্বারা (চাষ করাইয়া) যব বপন করাইয়া ও অন্নের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া এবং বজ্র দ্বারা দস্যুকে বধ করিয়া তাহার প্রতি বিস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছ।" ১।১১৭।২১। লাঙ্গল ছিল, যব বপন ছিল তথাপি সায়ণ আর্য্য অর্থ "বিদ্বান" "বিজ্ঞ" করিলেন।

(৪) ইন্দ্র যুদ্ধে আর্য্য যজমানকে রক্ষা করিয়াছেন।" ২।১৩০।৮

সায়ণ এইস্থলে আর্য্য অর্থ করিলেন "অরণীয়ং সর্ব্বগন্তব্যং" অরণীয় বা সর্ব্বগন্তব্য।

(৫) "ইন্দ্র অশ্ব দান করিয়াছেন, সূর্য্য দান করিয়াছেন, বহু লোকের উপদেশযোগ্য বোধন দান করিয়াছেন, সুবর্ণময় ধন দান করিয়াছেন, দস্যুদিগকে বধ করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন।" ৩।৩৪।৯

সায়ণ এস্থলেও আর্য্য শব্দে কৃষক না বুঝাইয়া "উত্তমং বর্ণং ত্রৈবর্ণিকম" ত্রৈবর্ণিক উত্তম বর্ণ অর্থ করিয়াছেন।

(৬) ইন্দ্র বলিতেছেন, "আমি আর্য্যকে পৃথিবী দান করিয়াছি। ৪।২৬।২

সায়ণ চাষা হস্তে পৃথিবী দান না করাইয়া "মনবে" মনুর হস্তে পৃথিবী দান করিয়াছেন।

আরও দেখুন—

(৭) হে ইন্দ্র। তুমি আমাদিগকে সমবেত বিপুল মঙ্গলময় সম্পত্তি প্রদান কর, যেন শত্রুগণ বর্ষণ করিতে সমর্থ না হয়? হে বজ্রধর! তুমি সম্পত্তি দ্বারা কি দস্যু কি আর্য্য সমুদয় মানব শত্রুকে সুজেয় সম্পাদন করিয়াছ। ৬।২২।১০

সায়ণ তথাপি ভুলিয়াও বলিলেন না আর্য্য অর্থে কৃষক। তিনি আর্য্য শব্দের "কর্ম্মযুক্তানি" কর্ম্মযুক্ত অর্থ করিয়াছেন।

(৮) "হে বীর ইন্দ্র! তুমি কি দস্যু, কি আর্য্য উভয়বিধ মানবই সংহার করিয়াছ।" ৬।৩৩।৩

সায়ণ ইন্দ্রের উপরি এস্থলে দুষ্ট দস্যু এবং অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য কৃষক, উভয়-বিধ শত্রু সংহার গুণ অর্পণ না করিয়া "কর্ম্মানুষ্ঠাতৃত্বেন শ্রেষ্ঠানি" কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠদিগের সংহারের ব্যবস্থায় কুণ্ঠিত হন নাই।

সায়ণের ব্যাখ্যায় এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, সেই অনাদিপ্রায় প্রাচীনকালে একটি জ্ঞানবান জাতি ছিল। যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তাহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। তাহা-দিগের গতি সর্ব্বতোমুখী। হয়ত তাহাবা ঈশ্বরকে সকলেরই পিতা বলিয়া বুঝিয়াছিল।

এখনকার মতে ধাতুগত অর্থ ধরিয়া অর্থ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, ঋ ধাতু ণ্যৎ করিয়া আর্য্য শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ঋ ধাতুর যে অর্থ গমন ও ব্যক্ত কর। ইহা হইতে সায়-ণের অরণীয়ং সর্ব্বগন্তব্যম্ অর্থ স্থিরতর হইতে পারে। গমন বা ব্যাপ্ত দেখিয়া হলচালনা বা ভূমিকর্ষণ অর্থ কল্পনা করা যদি অতিকল্পনা না হয়, তাহা হইলে যাহাদের ধীশক্তি বা দৃষ্টিশক্তি সর্ব্বগামিনী, অগ্নিইন্দ্রে তারকা তপনে ভূলোকে, স্বর্লোকে গমন করিতে সমর্থ বা ব্যস্ত,তাহারাই আমাদের আর্য্যজাতি, এরূপ অনুমান অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক বলিবে কি?

বৈদিক প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিলেও প্রচলিত সকল স্থলে আর্য্য শব্দে বিজ্ঞতা বা শ্রেষ্টত্ব বুঝায়। হলচালনা বা ভূমি-কর্ষণ বোধক প্রয়োগ কোথাও নাই।

"পারসীকদিগের আবেস্তা নামক প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রে ঐর্য্য শব্দ শ্রদ্ধাস্পদ ও লোকসাধারণ এই দুই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আর্ম্মাণি ভাষায় অরি শব্দের অর্থ ইরানি ও মানসিক। অতএব যখন বেদব্যতীত আসিয়া খণ্ডের অপর প্রাচীন ভাষাতেও বিকৃতাকার প্রাপ্ত আর্য্য শব্দের অর্থ হল বা ভূমিকর্ষণ উভয়ের কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যাইতেছে না" তখন "আর্য্য" শব্দের কৃষক বা ভূমিকর্ষণ প্রভৃতি অর্থগ্রহণ কিরূপে যুক্তিসঙ্গত বলা যাইতে পারে? *

এখন এই অগ্রাহ্য কথা ছাড়িয়া দিয়া দ্বিতীয় কথা, বেদ অপৌরুষেয়। আর্য্য ধর্ম্ম শাস্ত্র অসংখ্য কিন্তু বেদ নিত্য অপৌ-রুষেয় ব্রহ্মবাণী। ইহা মানবেব মুখের কথা নহে। কথাটা আজিকার দিনে অনেকের নিকট উপহাসেব বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আর্য্য ঋষি মুনি-গণ ইহা উপহাসের বিষয় মনে করিতেন না। আত্মদর্শী দর্শনকারদিগের নিকটও ইহা উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। মহাভারত প্রণেতার ন্যায় বিশ্ব-বলিনী বুদ্ধিমান ও কল্পনপ্রিয় পুরুষও ইহা অযৌক্তিক মনে করেন নাই। বর্ত্তমানকালে শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ধর্ম্ম-বীরও কথাটিকে উপেক্ষা করেন নাই। আর অসাধারণ পুস্তক অসাধারণ আজ-গবি মত প্রচার করিয়া লাভবান বা কীর্ত্তিমান হইবে এরূপ কোন গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনার জন্যও এই মত সাধা-রণ্যে জাহির হয় নাই। পূর্ব্বতন আচা-র্য্যেরা এই কথায় কি বুঝিতেন, তাহাই একবার আলোচনা করিয়া দেখিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী।

* কবশজীএদলজী কাঙ্গাকৃত বন্দী দাসের গুজরাটী অনুবাদের শেষে একখানি অভিধানে ঐর্য্য শব্দের আসল অর্থ অর্য্য বা আর্য্যগৃহিত হইয়াছে। এই ঐর্য্য শব্দ হইতে ফার্সী ইরান শব্দ হইয়াছে। (বিশ্বকোষ)

আয়ুর্ব্বেদ।

মদাত্যয়।

অন্যান্য চিকিৎসার ন্যায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় মদ্যপান বিধি সমধিক প্রচলিত না থাকিলেও মদ্যপান বিরল বা একেবারে নিষিদ্ধ নহে। গুণগ্রাহি মহাত্মাগণ গুণেরই আদর করিতেন, ভক্ষ্য অভক্ষ্য বা পাপ পুণ্য লইয়া সমাজকে বিচলিত করিতেন না, সেই জন্য আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায়ও কতকগুলি ঘৃণার্হ দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অদ্য সে বিষয়ের মীমাংসার কোন প্রয়োজন নাই, তবে বলিতে হইবে মদ্যপান শাস্ত্র ও সমাজ-বিরুদ্ধ হইলেও আয়ুর্ব্বেদ মতে নিষিদ্ধ নহে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে সমুদায় রীতিতে মদ্যপান উল্লিখিত হইয়াছে, আধুনিক মদ্যপায়ীদিগের পক্ষে ঐ রীতি অক্ষুণ্ণ রাখা অতীব দুরূহ ব্যাপার। এখন সুখের বিনিময়ে ঘোর দুঃখভোগ মদ্যপায়ীর স্বতঃসিদ্ধ। যাহার হৃদয়ে বল আছে, চিত্ত সংযমিনী শক্তি আছে, তিনিই যেন সুখের আশায় মদ্যপান করেন। নচেৎ নির্ধন ধনবান্, রোগী নীরোগ, ইতর ভদ্র কাহারও পক্ষে মদ্যপান সঙ্গত নহে, পরন্তু সর্ব্বতোভাবেই নিষিদ্ধ। এখন ধর্ম্মের জন্য মদ্যপান নাই, যোগসিদ্ধির জন্য মদ্যপান নাই, ঔষধার্থ মদ্যপান নাই, আছে বিলাসিনীর কালকূটপূর্ণ কটাক্ষরূপ কন্দর্প-শর জর্জ্জরিত যুবকের যন্ত্রণা নিবারণার্থ, তন্ত্রযুক্তি প্রভাবে ভারতবর্ষে মদ্য পান-প্রথা বহুকাল হইতে গুপ্তভাবে চলিতেছিল কিন্তু ইংরাজ রাজের মহিমায় ভারতে আর সে গুপ্তভাব নাই, প্রকাশ্যেই সমস্ত সংঘটিত হইতেছে, পক্ষান্তরে যাহাদিগকে আমরা শ্রেষ্ঠ, মহাপ্রভাবশালী, ধনবান্ ও বিদ্বান্ বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের অধিকাংশই ঐ ভয়ঙ্কর দোষে দূষিত, অনুকরণপ্রিয় ভারতবাসী আবার উঁহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া মজিতে বসিয়াছে। সুরা রাক্ষসীর করাল দশন-বিকাশ কে না দেখিয়াছে? সর্ব্বসংহারিণী সুরার অসীম শক্তিতে কত শত অমরাবতী বিনিন্দিত সুরম্যহর্ম্ম্য মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে। সুরা সাহায্যে কত শত বলিষ্ঠ যুবক শীর্ণ বিশীর্ণ কঙ্কাল-সার কলেবরে কাল কবলে কবলিত হইতেছে। মনুষ্য সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া গোহত্যা নরহত্যা স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি কোন্ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে? বাস্তবিক দেখিতে গেলে, ধর্ম্ম শাসনের ন্যায়, সমাজ শাসনের ন্যায়, পারিবারিক শাসনের ন্যায়, রাজ শাসন সুদৃঢ় নহে। পুরাকালে ভারতে মদ্যপান প্রথা ছিল বটে, কিন্তু এরূপ নৃশংসতা কে কবে দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে? অনেকে মনে করেন, ঈদৃশ অনিষ্টজনক মদ্যপান কিরূপে সর্ব্বজনীন আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত হইল? আবার অনেক সময় আয়ুর্ব্বেদের দোহাই দিয়া অনেকে সুরা পিপাসার

শাস্তিও করিয়া থাকেন। আজ আমরা সেই জন্য কিরূপ সুরাপান আয়ুর্ব্বেদানুমোদিত ও সুরার দোষ গুণ কি, তাহাই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রেত্য চেহ চ যচ্ছ্রেয়ঃ শ্রেয়ো মোক্ষশ্চ যৎ পরম্।
মনঃসমাধৌ তৎ সর্ব্ব মায়ত্তং সর্ব্বদেহিনাম্॥

মনুষ্যদিগের ইহকাল ও পরকালে যাহা শ্রেয়ঃ, মঙ্গল ও মোক্ষ, উহা সম্পূর্ণভাবে চিত্তৈকাগ্রতার আয়ত্ত অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা ব্যতীত ইহ ও পরকালে শ্রেয়ঃ মোক্ষ বা মঙ্গল লাভ করা যায় না। মদ্যপানে চিত্তের সংক্ষোভ উপস্থিত হয়, সুতরাং ইহ ও পরকালে মদ্যপায়ীরা কখনই শ্রেয়ঃ বা মোক্ষ লাভে সমর্থ হয় না।

মদ্যেন মনস শ্চাস্য সংক্ষোভঃ ক্রিয়তে মহান্।
মহামারুতবেগেন তটস্থস্যেব শাখিনঃ॥

প্রবল বায়ুবেগে নদীতটস্থ বৃক্ষ যেরূপ আন্দোলিত হয়, সেইরূপ মদ্যপানে মনের যৎপরোনাস্তি সংক্ষোভ উপস্থিত হয়। মদ্যপানে মনের স্থিরতা সম্পাদন অতীব দুরূহ ব্যাপার।

মদ্যপ্রসঙ্গ মজ্ঞায় মহাদোষং মহাগদম্।
সুখ মিত্যধিগচ্ছন্তি রজোমোহ পরাজিতাঃ॥

রজঃ ও তমোগুণাভিভূত ব্যক্তিগণ মদ্যপানের রোগোৎপাদক মহাদোষ না জানিয়া সুখের আশায় মদ্যাসক্ত হইয়া পড়েন ও চিরকাল মদ্যপানের দুর্নিবার অপকার ভোগ করিতে থাকেন।

মদ্যোপহতবিজ্ঞানা বিযুক্তাঃ সাত্ত্বিকৈ গুণৈঃ।
শ্রেয়োভি র্বিপ্রযুজ্যন্তে মদান্ধা মদলালসাঃ॥
মদ্যে মোহো ভয়ং শোকঃ ক্রোধো মৃত্যুশ্চ সংশ্রিতাঃ
সোন্মাদ মদ মূর্চ্ছাদ্যাঃ সাপস্মারাপতানকাঃ॥
যত্রৈকঃ স্মৃতিবিভ্রংশ স্তত্র সর্ব্ব মসাধুবৎ।
ইত্যেবং মদ্যদোষজ্ঞা মদ্যং গর্হন্তি যত্নতঃ॥

মনুষ্যগণ মদ্যপান করিয়া অজ্ঞানরূপ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, স্বাভাবিক সাত্ত্বিক গুণ সমুদায় হীন হয়, সুতরাং মদলালস মদান্ধ ব্যক্তিকে সত্বর মঙ্গল সমূহ হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়িতে হয়। মদ্য হইতে মোহ, ভয়, শোক, ক্রোধ, উন্মাদ, মত্ততা, মূর্চ্ছা, অপস্মার ও অপতানক প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। মদ্য হইতে মৃত্যুপর্য্যন্তও সংঘটিত হইয়া থাকে। পরন্তু যাহা হইতে একমাত্র স্মৃতিভ্রংশ উপস্থিত হয়, এমন কোন অমঙ্গল নাই, যাহা তাহা হইতে সংঘটিত হইতে পারে না। মদ্যদোষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপে সর্ব্বদা মদ্যের নিন্দা করিয়া থাকেন।

যে বিষস্য গুণাঃ প্রোক্তা স্তেঽপি মদ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ।

বিষের যে সমুদায় গুণ অর্থাৎ বিষে যে সমুদায় অনিষ্টকারিণী শক্তি আছে, মদ্যের ও তাদৃশী শক্তি।

সত্য মেতে মহাদোষা মদ্যস্যোক্তা ন সংশয়ঃ।
অহিতস্যাতিমাত্রস্য পীতস্য বিধিবর্জ্জনম্॥
কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথাস্মৃতম্।
অযুক্তিযুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথামৃতম্॥
প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা হিনস্ত্যসূন্।
বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম্॥

পূর্ব্বে মদ্যের যে সমুদায় দোষ উল্লিখিত হইল, মদ্যপান বিধি অতিক্রম করিলে বাস্তবিকই ঐ সমুদায় অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে কিন্তু বিধিবিহিত মদ্যপানে অপকার না ঘটিয়া উপকারই সংঘটিত হয়। উহা ক্রমশঃ প্রদর্শন করা যাইতেছে। মদ্য স্বভাবতঃ অন্নসদৃশ হিতকর দ্রব্য। অবৈধভাবে সেবিত হইলে নানাবিধ রোগের কারণ হয় বটে, কিন্তু বিধি অনুসারে পীত মদ্য অমৃতসদৃশ হিতকর

বস্তু। যে অন্ন প্রাণিদিগের প্রাণস্বরূপ, তাহাও অযথারূপে সেবিত হইয়া প্রাণনাশক হয় এবং স্বভাবতঃ প্রাণনাশক গুণসম্পন্ন বিষও যুক্তি অনুসারে সেবিত হইয়া রসায়ন সদৃশ উপকার করে। মদ্যও তদ্রূপ।

যুক্তিপূর্ব্বক মদ্যপান করিলে হর্ষ, বল, পুষ্টি, আরোগ্য ও পৌরুষ জন্মে। যে মদ্যপানে মত্ততা জন্মে, দুঃখ না হইয়া সুখ হয়, ঐ মদ্য রুচিকারক, পাচকাগ্নির উদ্দীপক, হৃদয়ের সন্তোষজনক, বলকারক, ভয় শোক এবং শ্রমনাশক, নিদ্রাজনক, বাক্‌পটুতাজনক, অতিনিদ্র ব্যক্তির প্রবোধক, মলমূত্রের বিবন্ধ নাশক, আঘাতপ্রাপ্তি এবং বন্ধনাদি যন্ত্রণার নিবর্ত্তক। মদ্যোত্থ রোগের নিবর্ত্তক, রতিবর্দ্ধক, মনঃসংযোগকারক, প্রীতিবর্দ্ধক এবং অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিরও উৎসব ও আনন্দজনক।

বহু দুঃখকৃতস্যাস্য শোকেনোপহতস্য চ।
বিশ্রামো জীবলোকস্য মদ্যং যুক্ত্যা নিষেবিতম্॥

বহুবিধ দুঃখ ও শোকোপহত ব্যক্তির যুক্তিপূর্ব্বক নিষেবিত মদ্যই একরূপ বিশ্রামস্থল অর্থাৎ ক্লেশ-নিবারক।

অন্ন পান বয়োব্যাধি বল কাল ত্রিকাণি ষট্।
ত্রীন্ দোষাংস্ত্রিবিধং সত্ত্বং জ্ঞাত্বা মদ্যং পিবেৎ সদা॥

ত্রিবিধ অন্ন, ত্রিবিধ পান, ত্রিবিধ বয়ঃক্রম, ত্রিবিধ ব্যাধি, ত্রিবিধ কাল, ত্রিবিধ দোষ ও ত্রিবিধ সত্ত্ব এই সকলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া মদ্যপান করা কর্ত্তব্য।

তেষাং ত্রিকাণামষ্টানাং যোজনা যুক্তি রুচ্যতে।
যথাযুক্ত্যা পিবেন্ মদ্যং মদ্যদোষৈর্ন যুজ্যতে॥

উল্লিখিত ত্রিবিধ অন্নাদির সম্যক্ যোজনার নাম যুক্তি, ঐ যুক্তি অনুসারে মদ্যপান করিলে কোন দোষই ঘটে না।

আপানে সাত্ত্বিকান্ বুদ্ধ্বা তথা রাজস তামসান্।
জ্ঞাত্বা সহায়ান্ যৈঃ পীত্বা সহদোষানুপাপ্নুতে॥

মদ্যপান স্থলে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস বিবেচনা করিয়া মদ্য পান করা উচিত, যাহাদের সহিত মদ্যপান করিলে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাদৃশ ব্যক্তির সহিত কখনই মদ্যপান করা বিধেয় নহে। আজ কাল এই সঙ্গ দোষ বিবেচনা না করার জন্যই অনেক লোককে বিষম বিপদে পতিত হইতে হয়। যে সমুদায় ব্যক্তি সুশীল, মিষ্টভাষী, সুমুখ, সজ্জন, গীত বাদ্যাদি কলাকুশল, বিশদ বাক্, বিষয়াদিতে অত্যাসক্তিরহিত, পরস্পর বশীভূত ও সৌহার্দ্দযুক্ত, যাহারা সুমধুর হাস্য ও প্রীতিজনক বাক্য দ্বারা পান ভূমির উৎসব পূর্ণ করে এবং যাহারা পরস্পর দর্শনে সুখ বোধ করে, তাহাদিগের সহিত মদ্যপান করিলে মদ্যপায়ী আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মদ্যপানের কতিপয় ক্রম লিখিত হইল. অধিক লেখা আবশ্যক মনে করি না, কারণ আমাদের মতে মদ্যপান অনাবশ্যক ও অনুচিত।

মদ্যের পরিমাণ ও তীব্রতাভেদে চারি প্রকার মত্ততা উপস্থিত হয়। অতঃপর যথাক্রমে ঐ সমুদায়ের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বুদ্ধিস্মৃতিপ্রীতিকরঃ সুখশ্চ, পানান্ন নিদ্রারতি বর্দ্ধনশ্চ। সংপাঠগীত স্বর বর্দ্ধনশ্চ, প্রোক্তোঽতি রম্যঃ প্রথমো মদো হি॥

প্রথম মদ, বুদ্ধিপ্রকাশক, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক, প্রীতিজনক, সুখোৎপাদক এবং

পান, ভোজন, রতিশক্তি ও কণ্ঠস্বর সংবর্দ্ধক এইরূপ মদাবস্থা অতীব সুখকর। যাহাদের মদ্যপান নিতান্ত প্রয়োজন, তাহারা যেন এরূপ ভাবে মদ্যপান করেন, অর্থাৎ উল্লিখিত লক্ষণ সমুদায় হইতে অতিরিক্ত কোন লক্ষণ উপস্থিত না হয়। বাস্তবিক পক্ষে কেহই মদ্যপানে স্থির থাকিতে পারে না, আকাঙ্ক্ষার অপরিতৃপ্তিই ইহার মূল কারণ অর্থাৎ প্রথম মদ্যপানের পর সকলেই মনে করেন, আরও একটু পান করিলে ইহাপেক্ষা অধিকতর সুখোদয় হইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত হইয়া পড়ে।

অব্যক্ত বুদ্ধিস্মৃতি বাগ্ বিচেষ্টঃ,
সোন্মত্তলীলাকৃতি বপ্রশান্তঃ ॥
আলস্য নিদ্রাভিহতো মুহুশ্চ,
মধ্যেন মত্তঃ পুরুষো মদেন ॥

দ্বিতীয়মদমত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি, স্মরণ শক্তি ও বাক্য সম্যক্ ব্যক্ত নহে অর্থাৎ জড়তাযুক্ত, চেষ্টার বিকৃতি, আকৃতি ও কার্য্য উন্মত্তের ন্যায় এবং মুহুর্মুহু আলস্য ও নিদ্রার আবির্ভাব এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়। ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইলেও মদ্য পান হইতে বিরত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য নচেৎ অতীব দুরবস্থাগ্রস্ত হইতে হয়। ইহার নাম দ্বিতীয় মদ।

গচ্ছেদগম্যাং ন গুরূংশ্চ মন্যেৎ,
খাদেদভক্ষ্যাণি চ নষ্টসংজ্ঞঃ ॥
ব্রূয়াচ্চ গুহ্যানি হৃদিস্থিতানি
মদে তৃতীয়ে পুরুষোঽস্বতন্ত্রঃ ॥

মদ্যপানে দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা নিবৃত্ত হয়না আরও অধিক পান করিতে থাকে, ঐ সমুদায় ব্যক্তির নিন্দনীয় তৃতীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। তৃতীয় অবস্থা উপস্থিত হইলে মনুষ্য অগম্যা নারীতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হয়, গুরুজনের অবমাননা করে, এবং হৃদয়স্থ গুহ্য বিষয় প্রকাশ করে ও অভক্ষ্য ভক্ষণ করে। এতদবস্থ ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য ও আপনার অনায়ত্ত হইয়া পড়ে।

চতুর্থে তু মদে মূঢ়ো ভগ্নদার্ব্বিব নিষ্ক্রিয়ঃ।
কার্য্যাকার্য্য বিভাগাজ্ঞো মৃতাদপ্যপরো মৃতঃ ॥
কোমদং তাদৃশং গচ্ছেদুন্মাদ মিব চাপরম্।
বহুদোষমিবামূঢ়ঃ কান্তারং স্ববশঃ কৃতী ॥

অতঃপর চতুর্থ মদাবস্থায় মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানশূন্য, ভগ্ন কাষ্ঠের ন্যায় নিষ্ক্রিয় ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার শূন্য হইয়া পড়ে। চতুর্থমদাবস্থ ব্যক্তি অবিকল মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। অমূঢ় অর্থাৎ বিচার শক্তি সম্পন্ন আত্মবান্ কোন্ কৃতী ব্যক্তি বহুদোষোৎপাদক বিবিধ হিংস্রজন্তুসংকুল দুর্গম পথের ন্যায় চতুর্থ মদাবস্থায় উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন। মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইলে প্রায়শঃই সকলকে যুক্তিচ্যুত হইয়া পড়িতে হয় এবং অবশেষে নানা বিধ বিপদে পতিত হইতে হয়। তুলনা করিতে গেলে মদ্যপানে উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক। সুতরাং কাহারই পক্ষে মদ্যপান যুক্তি বা শাস্ত্রসম্মত নহে।

নির্ভক্ত মেকান্তত এব মদ্যং, নিষেব্যমানং মনুজেন নিত্যং। আপাদয়েৎ কষ্ট তমান্ বিকারান্ আপাদয়েচ্চাপি শরীরভেদম্ ॥

নিত্য অধিক পরিমাণে অন্নাদি উপকরণহীন মদ্যপান করিলে, নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্টদায়ক রোগ জন্মে এবং পরিশেষে তদ্দ্বারা মৃত্যুপর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে।

ক্রুদ্ধেন ভীতেন পিপাসিতেন,
শোকাভিতপ্তেন বুভুক্ষিতেন॥
ব্যায়ামভাবাধ্ব পরিক্ষতেন,
বেগাবরোধাভিহতেন চাপি॥
অত্যম্বু ভক্ষাবততোদরেণ
সাজীর্ণভুক্তেন তথাবলেন॥
উষ্ণাভিতপ্তেন চ সেব্যমানম্,
করোতি মদ্যং বিবিধান্ বিকারান্॥

ক্রোধ, ভয়, পিপাসা, শোক ও ক্ষুধার সময়, ব্যায়াম ভারবহন বা পথ পর্য্যটন দ্বারা ক্লান্ত অবস্থায়, মল মূত্রাদির উপস্থিত বেগ রোধ করিয়া, অন্ন ভোজন বা জলপান দ্বারা উদরের পূর্ণাবস্থায়, দৌর্ব্বল্যাবস্থায় এবং উষ্ণাবস্থায় অর্থাৎ পরিশ্রমাদি দ্বারা শরীর উষ্ণ হইলে মদ্যপান করিবে না উহাতে পানাত্যযাদি কঠিন রোগ উৎপন্ন হয়।

পানাত্যযং পরমদং পানাজীর্ণ মথাপি চ।
পান বিভ্রম মুগ্রঞ্চ যকৃদ্রোগং করোতি তৎ॥
তৎ অবধিপীত মদ্য মিত্যর্থঃ।

শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া মদ্যপান করিলে, পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ, পান বিভ্রম ও দারুণ যকৃৎ রোগ উৎপন্ন হয়। পানাত্যয় ও মদাত্যয় এই দুইটী শব্দ একার্থ বাচক সুতরাং মদাত্যয়াধিকার নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

হিক্কা শ্বাস শিরঃকম্প পার্শ্বশূল প্রজাগরৈঃ।
বিদ্যাদ্ বহুপ্রলাপস্য বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥

বাতিক মদাত্যয় রোগে হিক্কা, শ্বাস, শিরঃকম্পন, পার্শ্ববেদনা, নিদ্রানাশ ও প্রলাপ বাহুল্য এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

তৃষ্ণাদাহ জ্বর স্বেদ মোহাতিসার বিভ্রমৈঃ।
বিদ্যাদ্ধরিতবর্ণস্য পিত্তপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥

পৈত্তিক মদাত্যয় রোগে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, ঘর্ম্মনির্গম, মূর্চ্ছা, অতিসার, ভ্রম ও দেহের হরিতবর্ণতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ছর্দ্দ্যরোচক হৃল্লাস তন্দ্রাস্তৈমিত্য গৌরবৈঃ।
বিদ্যাচ্ছীতপরীতস্য কফপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥

শ্লৈষ্মিক মদাত্যয়ে বমি, অরুচি, বমনবেগ, তন্দ্রা, গাত্রে আর্দ্র বস্ত্রাবৃতবৎ বোধ, দেহের গুরুতা ও অতিশয় শীত এই সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

উল্লিখিত বাতিকাদি ত্রিবিধ মদাত্যয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সান্নিপাতিক মদাত্যয জানিতে হইবে। পরমদ প্রভৃতিতে মদাত্যয লক্ষণের অতিরিক্ত কতক গুলি লক্ষণ লক্ষিত হয়। পরমদ নামক রোগে শ্লেষ্ম-প্রাচুর্য্য, নাসাস্রাব, দেহভার, মুখ বৈরস্য, মলমূত্র রোধ, তন্দ্রা, অরুচি, তৃষ্ণা, শিরোবেদনা ও সন্ধি সমুদয়ে ভঙ্গবৎ বেদনা প্রভৃতি শ্লেষ্ম লক্ষণ সমুদায় দেখিতে পাওয়া যায়।

পীত মদ্য জীর্ণ না হইয়া পানাজীর্ণ রোগ জন্মায়। ইহাতে অতি ক্লেশকর উদরাধ্মান, বমন, অথবা মদ্যগন্ধযুক্ত উদ্গার ও গাত্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পান বিভ্রমাখ্য রোগে সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ বক্ষস্থলে সুচিবেধবৎ বেদনা, কফ স্রাব, কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমনবৎ বোধ, মূর্চ্ছা, বমি, শিরঃপীড়া, দাহ এবং গৌড়ী (ধেনো) কাদম্বরী (তাড়ী) প্রভৃতি মদ্যে বিদ্বেষ উপস্থিত হয।

মদ্যানাং সততাভ্যাসাৎ তীব্রমদ্য নিষেবণাৎ।
নিরন্নাদপি পানাচ্চ যকৃদ্রোগা ভবন্তি হি॥
যকৃদ্রোগাধিকারে তান্ সলক্ষণ চিকিৎসিতান্।
পুরাসেচনকেভ্যো বো ব্যাসতোঽহমকীর্ত্তয়ম্॥

বিবিধ মদ্যের নিরন্তর পান, তীব্র মদ্য পান, ও খাদ্য রহিত মদ্যপান প্রভৃতি কারণে যকৃৎ রোগ উৎপন্ন হয়। যকৃতে যে সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে, ঐ সমুদয় এবং তাহার চিকিৎসা যকৃদধিকারে ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে।

রাজযক্ষ্মা চিকিৎসা।

দোষাধিকানাং বমনং শস্যতে সবিরেচনম্।
স্নেহ স্বেদোপপন্নানাং সস্নেহং যন্ন কর্ষণম্॥

দোষের আধিক্য থাকিলে স্নেহ ও স্বেদ প্রদানের পর স্নেহযুক্ত বমন কিম্বা বিরেচন প্রদান করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যের বল মলায়ত্ত এবং শুক্রায়ত্ত জীবন, অতএব কিরূপে যক্ষ্মারোগীকে বমন বিরেচন দেওয়া যায়? বস্তুতঃ যক্ষ্মারোগী যদি বলবান্ হয় এবং দোষের আধিক্য থাকে, তবে যাহা শরীরের পক্ষে কর্ষণ অর্থাৎ ক্ষয়কর নহে, তাদৃশ মৃদুবিরেচন দেওয়া যাইতে পারে। কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

যোগান্ সংশুদ্ধকোষ্ঠানাং কাসে শ্বাসে স্বরক্ষয়ে।
শিরঃ পার্শ্বাংস শূলেষু সিদ্ধানেতান্ প্রযোজয়েৎ॥

উক্তরূপ সংশোধন দ্বারা কোষ্ঠ শুদ্ধ হইলে, কাস, শ্বাস, স্বরক্ষয়, শিরঃশূল, পার্শ্ববেদনা, ও অংস বেদনা প্রভৃতিতে বক্ষ্যমাণ ঔষধ সমুদায় ব্যবস্থা করিবে।

খর্জ্জুর ও কিস্‌মিস্ সমভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া, উহাতে কিঞ্চিৎ চিনি, পিপ্পলী চূর্ণ, ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে স্বরভঙ্গ, কাস ও শ্বাস প্রভৃতির নিবৃত্তি হয়।

দশমূল শৃতাৎ ক্ষীরাৎ সর্পির্যদুদীয়াল্লবম্।
সপিপ্পলীকং সক্ষৌদ্রং তৎপরং স্বরবোধনম্॥
শিরঃ পার্শ্বাংস শূলঘ্নং কাস শ্বাস জ্বরাপহম্।

একসের দুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া দশমূলের সহিত চারিসের জল দিয়া পাক করিবে ও দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে এবং উহা হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া পরিপাক শক্তি অনুসারে অর্দ্ধ বা এক তোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু সহ সেবনে, স্বরভঙ্গ, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল, অংসশূল, কাস, শ্বাস, ও জ্বর নিশ্চয় নিবারিত হয়। বিশেষতঃ ইহাতে কণ্ঠ-স্বরের অতীব উৎকর্ষ সাধিত হয়, গায়কগণ স্বরের উৎকর্ষ সাধনার্থ ইহা পান করিয়া থাকেন। শ্লোকোক্ত নব শব্দ দ্বারা বুঝিতে হইবে সদ্যোঘৃতই প্রশস্ত। একদিন প্রস্তুত করিয়া ৩।৪ দিন সেবনে কোন বিশেষ অনিষ্ট না থাকিলেও অবশ্যই উপকারের তারতম্য স্বীকার করিতে হইবে।

সিতোপলাদি লেহ—দারচিনি ১ তোলা, এলাচি ২ তোলা, পিপ্পলী ৪ তোলা, বংশলোচন ৮ তোলা ও মিছরি ১৬ তোলা একত্র সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া ৵০ হইতে ।০ আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে, শ্বাস, কাস ও অন্যান্য কফ জন্য পীড়া নিবারিত হয় এবং আনুষাঙ্গিক জিহ্বাসুপ্ততা (স্বাদ গ্রহণে অশক্তি) অরুচি, অগ্নিমান্দ্য ও পার্শ্বশূল বিনষ্ট হয়। মধু দিয়া মাড়িয়া ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

অজাপঞ্চক ঘৃত—ছাগ ঘৃত ৪ সের ছাগ বিষ্ঠার রস ৪ সের, ছাগমূত্র ৪ সের, ছাগ দুগ্ধ ৪ সের ও ছাগদধি ৪ সের,

ঘৃত পাকোক্ত নিয়মে পাক করিয়া ১সের যবক্ষারচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। মাত্রা ॥০ হইতে ১ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে যক্ষ্মা, শ্বাস ও কাস রোগ প্রশমিত হয়।

ছাগ মাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিঃ সশর্করম্।
ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ॥

ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ পান, শর্করার সহিত ছাগঘৃত পান, ছাগ সেবা ও ছাগ মধ্যে শয়ন করিয়া থাকা যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারক।

জীবন্তীং মধুকং দ্রাক্ষাং ফলানি কুটজস্য চ।
শটীং পুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রীং গোক্ষুরকং বলাম্॥
নীলোৎপলং চামলকীং ত্রায়মাণাং দুরালভাম্।
পিপ্পলীঞ্চ সমং পিষ্ট্বা ঘৃতং বৈদ্যো বিপাচয়েৎ।
"এতদ্ব্যাধি সমূহস্য রোগেশস্য সমুত্থিতম্।
রূপ মেকাদশবিধং সর্পি রগ্র্যং ব্যপোহতি॥"

জীবন্ত্যাদ্য ঘৃত—ঘৃত ৪ সের, জল ১৬ সের, কল্কার্থ জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইন্দ্রযব, শঠি, কুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, নীলোৎপল, ভূঁইআমলা, বলা ডুমুর, দুরালভা ও পিপ্পলী মিলিত ১ সের। ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই ঘৃত সেবনে কাসাদি উদ্রিক্ত একাদশ লক্ষণাক্রান্ত ঘোর রাজযক্ষ্মা প্রশমিত হয়।

বাসায়াং বিদ্যমানায়াং আশায়াং জীবিতস্য চ।
রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কথং সীদসি মানব॥

বহুকাল যাবৎ এই বচনটী প্রচলিত আছে যে, বাসক বিদ্যমান থাকিতে জীবিতাকাঙ্ক্ষী রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও কাস গ্রস্ত ব্যক্তি কেন অবসন্ন হইতেছ। বাস্তবিক শ্লোকটীর যাথার্থ্য শত শত স্থলে প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে ও হইতেছে। বাসকের অসীম শক্তি কাহারই অবিদিত নহে। অন্য ঔষধের অভাবে কেবল বাসক পত্র রস সেবনেও কাসাদি রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। একমাত্র বাসকই যখন এতাদৃশ উপকারী, তখন তাহার সহিত অন্য বস্তু মিশ্রিত হইলে যে নিশ্চয় আরোগ্য জনক হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

শতং সংগৃহ্য বাসায়া স্তোয়দ্রোণে বিপাচয়েৎ।
চতুর্ভাগাবশেষেঽস্মিন্ শর্করায়াঃ পলং শতম্॥
ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধিঞ্চ কট্ফলং মুস্তকং গদম্।
জীরকং পিপ্পলীমূলং রোচনী চবিকা শুভা॥
কটুকী শ্রেয়সী চৈব তালীশং সধনীয়কম্।
কার্ষিকং পৃথগেতেষাং ক্ষিপেন্মধুপলাষ্টকম্॥
তদ্ যথাগ্নিবলং লিহ্যাচ্ছৃত শীতাম্বু পানতঃ।
নিহন্তি রাজযক্ষ্মাণং রক্তপিত্তং ক্ষতং ক্ষয়ম্॥
বাতিকং পৌত্তিকঞ্চৈব শ্বাসঞ্চৈব সুদারুণম্।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কাসঞ্চৈবারুচিং জ্বরম্॥
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতো হ্যেষ বৃহদ্ বাসাবলেহকঃ।

বৃহৎ বাসাবলেহ—বাসক মূলের ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের অর্থাৎ ৬৪ সের জলে ১২॥০ সের বাসক মূলের ছাল (অভাবে গাছের ছাল) জ্বাল দিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া উহাতে ১২॥০ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কট্ফল, মুতা, কুড়, জীরা, পিপুলমূল, কমলাগুড়ী, চই, বংশলোচন, কট্কী, গজপিপ্পলী, তালীশ পত্র ও ধনে ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে ও আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে উহাতে ১ সের মধু, মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ॥০ হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা স্থির করিয়া

শৃতশীতল (উষ্ণজল শীতল) জলের সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর, যক্ষ্মা ও শ্বাসাদি নানা রোগ নিবারিত হয়। গ্রন্থান্তরে বৃহৎ বাসাবলেহের অনুরূপ প্রস্তুত প্রাণালী দেখা যায়, উহাতে কতিপয় দ্রব্য অধিক থাকায় ইহাপেক্ষা আশু ফলদায়ক হয়, সুতরাং, উহার নিয়মও লিখিত হইতেছে।

বৃহতী ২০০ তোলা, কণ্টকারী ২০০ তোলা, বালক মূলের ছাল ২০০ তোলা বামনহাটীব মূলেব ছাল ২০০ তোলা ৬৪ সের জলে জ্বাল দিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে, ইহাতে ২ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে অভ্র ৮ তোলা, পিপুল চূর্ণ ৩২ তোলা, কুড়, তালীশপত্র, তেজপত্র, মরিচ, বেনার মূল, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, গুড়ত্বক্, বামন হাটি, বালা ও মুতা ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে ঘৃত অর্দ্ধ সের প্রদান করিয়া আলোডন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ১ সের প্রদান করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। ইহা বালক, বৃদ্ধ ও যুবা সকলের পক্ষেই সমান উপকারক। রাজযক্ষ্মা ও রক্ত পিত্ত প্রভৃতি রোগে ইহার আশ্চর্য্য ফল সর্ব্বদা দৃষ্ট হইয়া পাকে।

ক্ষয়কারক সান্নিপাতিক যক্ষ্মারোগে জ্বর, সর্ব্বদা ঘর্ম্ম, অরুচি, ও ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যাদি উপস্থিত হইলে প্রবাল ভস্ম ও কস্তুরী ১ রতি মধুসহ সেবন করিতে দিবে। মৃতসঞ্জীবনী সুরা এবং বাসকারিষ্ট প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ ১।২ তোলা মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার হয়। মেহ, উপদংশ ও পারদবিকৃতি জন্য সান্নিপাতিক যক্ষ্মারোগে বিবেচনাপূর্ব্বক উল্লিখিত ও বক্ষ্যমাণ ঔষধ সমস্ত ব্যবস্থা করিবে।

শোষ (ক্ষয়) রোগে জ্বরাদি যে সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়, উহার চিকিৎসায় বিবেচনা করিয়া তত্তদ্রোগাধিকারোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

সুপ্রসিদ্ধ চ্যবনপ্রাশের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। চ্যবন নামে ঋষি প্রথমে ঐ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সেবন করেন, এজন্য উহাব নাম হইয়াছে চ্যবনপ্রাশ। ইহার ফল আমরা কিছু বলিতে চাহি না, যাহারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহারাই ইহার সুফল অবগত আছেন। বাস্তবিক ইহাব উপকারিতার সীমা নাই বলিতে হইবে শ্লেষ্ম দোষ অর্থাৎ যাহাদের অল্প অল্প শ্বাস বা কাসের উদ্বেগ থাকে। তাহাদের ঐ রোগ নিবারণ করিয়া শরীর বিলক্ষণ স্থূল ও বলিষ্ঠ করে। শুক্র বৃদ্ধির পক্ষে ইহা অমোঘ ঔষধ।

চ্যবনপ্রাশ।

বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোনাক কাশ্মর্য্যঃ পাটলা বলা।
পর্ণাশ্চতস্রঃ পিপ্পল্যঃ শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্॥
শৃঙ্গী তামলকী দ্রাক্ষা জীবন্তী পুষ্করাগুরুঃ।
অভয়া চামৃতা ঋদ্ধি জীবকর্ষভকৌ শঠী॥
মুস্তং পুনর্নবা মেদা সূক্ষ্মৈলোৎপল চন্দনে।
বিদারী বৃষমূলানি কাকোলী কাক নাসিকা॥
এষাং পলোন্মিতান্ ভাগান্ শতান্যামলকস্য চ।
পঞ্চ দদ্যাত্তদৈকধ্যং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
জ্ঞাত্বা গত রসান্যেতা ন্যৌষধান্যথ তং রসম্।
তচ্চামলক মুদ্ধৃত্য নিষ্কুলং তৈল সর্পিষোঃ॥
পল দ্বিদশকে ভৃষ্ট্বা দত্ত্বাচার্দ্ধতুলাং ভিষক্।
মৎস্যণ্ডিকায়াঃ পূতায়া লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ॥

ষট্‌পলং মধুন শ্চাত্র সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ।
চতুঃপলং তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপ্পল্যা দ্বিপলং তথা॥
পলমেকং বিদধ্যাচ্চ ত্বখেলা পত্রকেশরাৎ।
ইত্যয়ং চ্যবনপ্রাশঃ পরমুক্তো রসায়নঃ॥
কাস শ্বাস হরশ্চৈব বিশেষেণোপদিশ্যতে।
ক্ষীণক্ষতানাং বৃদ্ধানাং বালানাঞ্চাঙ্গ-বর্দ্ধনঃ॥
স্বরক্ষয় মুরোরোগং হৃদ্রোগং বাতশোণিতম্।
পিপাসাং মূত্রশুক্রস্থান্ দোষাংশ্চৈবাপকর্ষতি॥
অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যোপরুন্ধ্যাচ্চ ভোজনম্।
অস্য প্রয়োগাচ্চ্যবনঃ সুবৃদ্ধোঽভূৎ পুনর্য্ বা॥
মেধাংস্মৃতিং কান্তি মনামযত্ব
মায়ুপ্রকর্ষং বল মিন্দ্রিযাণাম্॥
স্ত্রীষু প্রহর্ষং পরমগ্নিবৃদ্ধিম্
বলপ্রসাদং পবনানুলোম্যম্॥
রসাযনস্যাস্য নবঃ প্রয়োগা-
ল্লভেত জীর্ণোঽপি কুটিপ্রবেশাৎ॥
জরাকৃতং পূর্ব্বমপাস্যরূপং, বিভর্ত্তিরূপং নবযৌবনস্য।
সিতা মৎস্যণ্ডিকালাভে, ধাত্র্যাশ্চ মৃদ্বভর্জ্জনম্।
চতুর্ভাগজলে প্রাযো দ্রব্যং গন্ধবসং ভবেৎ॥

বেলছাল, গণিয়াবীছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলাছাল, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাষাণি, পিঁপুল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কাকড়াশৃঙ্গী, ভুঁইআলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরিতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শঠী, মুতা, পুনর্নবা, ছোট এলাইচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, প্রত্যেক ৮ তোলা। শ্লথ (ঢিলে) পোট্‌লীবদ্ধ কাচা আমলকী ৫০০টা বা ৭৸৹ ছটাক। জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সের। ৬৪ সের জলে উল্লিখিত দ্রব্যগুলি অল্প থেঁতো করিয়া দিবে এবং ৫০০টা আমলকী একখানি নূতন কাপড়ে ঢিলে করিয়া বান্ধিয়া ঐ জলে প্রদান করিবে ঐ বস্ত্রের উপরিভাগ (দোলা-যন্ত্রবৎ) একখানি কাঁঠ বা বাখারিতে বান্ধিয়া রাখিতে হয। ১৬ সেব অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া আমলকী গুলি বস্ত্রের অগ্রভাগ ধরিয়া পৃথক একটী প্রস্তর পাত্রে রাখিবে ও কাথটী ছাঁকিয়া লইবে।

পোট্‌লী বদ্ধ আমলকী সকল খুলিয়া উহার বীজ গুলি ফেলিয়া দিবে, এবং তিন পোয়া ঘৃত ও তিন পোয়া তিল তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে আমলকী ভাঁজিয়া শিলায উত্তমরূপ পেষণ করিবে। পরে মিছরি ⁄৬। সেব (৫০ পল), ঐ কাথ জল ও আমলকী একত্র পাক কবিবে। লেহবৎ গাঢ় হইলে বংশলোচন ৩২ তোলা, পিপুল চূর্ণ ১৬ তোলা, গুড়-ত্বক্ ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, এলা-ইচ ২ তোলা, ও নাগেশ্বব ২ তোলা উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৩ পোযা মিশ্রিত কবিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিযা দিবে। মাত্রা ॥০ হইতে ২ তোলা। অনুপান ছাগদুগ্ধ বা ঈষদুষ্ণ গোদুগ্ধ।

ইহা সেবনে স্ববভঙ্গ, যক্ষ্মা, শুক্রগত দোষ, অর্থাৎ প্রমেহ ও ধাতু দৌর্ব্বল্যাদি প্রশমিত হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি, ইন্দ্রিয় সামর্থ্য, বায়ুর অনুলোমতা, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ও বৃদ্ধেবও যৌবন ভাব উপস্থিত হয়। দুর্ব্বল ও ক্ষীণধাতুব পক্ষে ইহার ন্যায অত্যুৎ-কৃষ্ট ঔষধ আব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয না।

পীড়ার প্রবৃদ্ধাবস্থায় যক্ষ্মারি লৌহ, ক্ষয়কেশরী, যক্ষ্মান্তক লৌহ, রসেন্দ্র গুড়িকা, মৃগাঙ্ক চূর্ণ, মৃগাঙ্ক বটিকা, রাজ মৃগাঙ্ক, মহামৃগাঙ্ক, রত্নগর্ভপোট্টলী রস ও কাঞ্চনাভ্র প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। উহাদেব প্রস্তুত প্রণালী অতঃপর লিখিত হইতেছে। ক্রমশঃ—

পুটপাক প্রণালী।

অতীত ও বর্ত্তমান সংখ্যা সমীরণে যে সমুদায় ঔষধ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি ঔষধ পুটপাক দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়। পুটপাক প্রণালী বিজ্ঞ ভিষগ্‌গণের জানা থাকিলেও আমাদের গ্রাহক মাত্রেরই জানা আছে বলিয়া বোধ হয় না। তজ্জন্য আমরা আজ পুটপাকের বিষয় আলোচনা করিব অতঃপর ধাতুাদির শোধনাদি লিখিতে চেষ্টা করিব।

পুট শব্দের আবরণার্থ লইয়া ঔষধ মারণ উপযোগী মুচি (কটোরা) ও স্থালী (হাঁড়ী) প্রভৃতি দ্রব্য গ্রহণ করা হয়। ঐরূপ স্থালী প্রভৃতিতে পাকের নাম পুটপাক। লোক সকল বিভিন্ন-রুচি, কেহ সংস্কৃতের সমাদর করেন, আবার হয়ত কেহ সংস্কৃত পাঠ করিতে বিরক্তি বোধ করেন। যাহা হউক আমরা যেখানে যেখানে মূল সংস্কৃত দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছি, সেই সেই স্থলে সংস্কৃত মূল উদ্ধৃত করিলাম। কারণ মূল ও বিশদ অনুবাদ থাকিলে কাহারই মনে সন্দেহের সঞ্চার হইতে পারিবে না। পাঠক মহাশয় যথারুচি পাঠ করিবেন।

গম্ভীরে বিস্তৃতে কুণ্ডে দ্বিহস্তে চতুরস্রকে।
বনোপলসহস্রেণ পূরিতে পুষ্টনৌষধম্‌॥
কোষ্ঠে রুদ্ধং প্রযত্নেন পোবিষ্টোপরি ধারয়েৎ।
বনোপল সহস্রার্দ্ধং কোষ্ঠিকোপরি নিক্ষিপেৎ॥
বহ্নিং বিনিক্ষিপেৎ তত্র মহাপুট মিতি স্মৃতম্‌॥

মহাপুট—দীর্ঘ, প্রস্থ ও গভীরতা সকল দিকেই দুই হস্ত প্রমাণ একটী চতুষ্কোণ গর্ত্ত খনন করিয়া, তন্মধ্যে এক হাজার বিল ঘুঁটে সুন্দররূপে স্থাপন করিবে, উহার উপরিভাগে ঠিক মধ্যস্থলে পুটনীয় বস্তুপূর্ণ মূষা অর্থাৎ পুটপাক পাত্র স্থাপন করিবে। পরে ঐ মূষার উপরিভাগে আর পাঁচশত খানি বিলঘুঁটে দিয়া মূষা সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদন করিবে এবং উহার উপরিভাগে অগ্নি প্রদান করিবে। অনন্তর সমুদায় ঘুঁটে ভস্মীভূত ও তাপশূন্য হইলে মূষা উদ্ধৃত করিবে ও মূষার উপরিভাগস্থ দগ্ধমৃত্তিকাদি পরিষ্কৃত করিয়া অভ্যন্তরস্থ পুটিত বস্তু গ্রহণ করিবে এবং প্রয়োজনানুরূপ ব্যবহার করিবে। মহাপুটের উল্লেখ থাকিলে সর্ব্বত্রই এইরূপে কার্য্য করিতে হইবে।

পুটপাকের পূর্ব্বে যে দ্রব্যে পুট প্রদান করিতে হইবে, উহা দৃঢ় পাত্রে (যেস্থলে যে পাত্রের উল্লেখ থাকে) রাখিয়া মূষার মুখরুদ্ধ করিবে অর্থাৎ মুচিতে পুট দিতে হইলে অপর একখানি মুচি দ্বারা ও হাড়ীতে দিতে হইলে, হাড়ীর মুখে পড়ে, কোন দিকে শূন্য না থাকে, এরূপ একখানি সরাব (সরা) দ্বারা মুখ রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা ঐ সন্ধিস্থল উত্তমরূপে লেপন ও শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়। লেপন করিবার সময় মৃত্তিকার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়, অর্থাৎ এরূপ মৃত্তিকা দ্বারা মুখ লেপন করিতে হয়, যাহাতে পরে উহা না ফাঁটিয়া যায়।

সপাদ হস্তমানেন কুণ্ডে নিম্নে তথায়তে।
বনোপলসহস্রেণ পূর্ব্বে মধ্যে বিধারয়েৎ॥
পুটন দ্রব্যসংযুক্তাং কোষ্ঠিকাং মুদ্রিতাং মুখে।
অধোর্দ্ধানি করণ্ডানি অর্দ্ধাস্যোপরি নিক্ষিপেৎ॥
এতদ্গজপুটং প্রোক্তং খ্যাতং সর্ব্বপুটোত্তমম্‌।
সাধারণ-নরাঙ্গুল্যা ত্রিংশদঙ্গুলকো গজঃ॥

গজপুট—দীর্ঘ প্রস্থ ও গভীরতা সকলদিকেই সওয়াহাত অর্থাৎ ত্রিশ

অঙ্গুলি পরিমিত একটী চতুষ্কোণ গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে ৫০০ পাচশত খানি বিলঘুঁটে উত্তমরূপে সাজাইয়া রাখিয়া উপরিভাগে মধ্যস্থলে উল্লিখিত নিয়মে মৃত্তিকালিপ্ত, শুষ্ক ও ঔষধপূর্ণ মূষা সংস্থাপন করিবে এবং উহার উপরিভাগে আর ৫০০ পাঁচশতখানি বিলঘুঁটে দিয়া চাপা দিবে। অনন্তর পূর্ব্ববৎ উপরিভাগে অগ্নি প্রদান করিবে। এই পুট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহার নাম গজপুট।

মধ্যাবয়ব পুরুষের ত্রিশ অঙ্গুলিতে এক গজ হয়। গজ প্রমাণ গর্ত্তে পুট প্রদান করা হয় বলিয়া ইহার নাম গজপুট।

অন্যচ্চ—গজ প্রমাণগম্ভীরং খনিরং ক্রমশস্ততম্।
বিতস্তিদ্বিতয়মুখং ত্রিবিতস্তিতলং তথা॥
এবং বিধায় যত্নেন বিশিখস্ককরীষবৎ।
তস্য পাদং যং সম্যক্ পূরয়িত্বা বনোপলৈঃ॥
ভৈষজ্য কোষ্ঠিকাং তত্র স্থাপয়িত্বা ততঃ পুনঃ।
বনোপলৈঃ সংপূরয়াদেতদ্ গজপুটং স্মৃতম্॥
অত্র পাদোনহস্তদ্বয় প্রমাণো গজঃ।

গজপুট—একগজ অর্থাৎ পৌনে দুই হস্ত গভীর গোলাকৃতি একটা গর্ত্ত খনন করিবে। ঐ গর্ত্তের ঊর্দ্ধভাগের বিস্তার দুই বিতস্তি অর্থাৎ একহস্ত এবং তলদেশের বিস্তার তিন বিতস্তি বা দেড়-হাত। বংশাঙ্কুরের (বাঁশের কোড়) অগ্রভাগ কাঁটিয়া ফেলিলে দেখিতে যেরূপ হয়, এই গর্ত্তটীও দেখিতে সেইরূপ হইয়া থাকে। গর্ত্তের মধ্যে ঘুঁটে দিয়া চারিভাগের তিন ভাগ পূর্ণ করিবে, এক ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে মধ্যস্থলে ঔষধ-গর্ভ মূষা স্থাপন করিবে। পরে পুনর্বায় বিলঘুঁটে দ্বারা অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ সমস্ত গর্ত্ত পূর্ণ করিবে ও উপরিভাগে অগ্নি প্রদান করিবে। ইহাও একরূপ গজপুট, সম্প্রতি এতদ্দেশে ঈদৃশ গজপুটই প্রচলিত।

অরত্নিমাত্রকে কুণ্ডে পুটং বারাহমুচ্যতে।

বরাহ পুট—দৈর্ঘ্য, বিস্তৃতি ও গভীরতা সকল দিকেই এক অরত্নি (কনিষ্ঠাঙ্গুলি লইয়া যে হাত হয়) প্রমাণ চতুষ্কোণ গর্ত্তে পুট প্রদানকে বারাহ পুট বলে। এই পুটে ঘুটের পরিমাণ নাই বটে, কিন্তু গর্ত্তে যাহা ধরে, উহাই ইহার পরিমাণ। পূর্ব্ববৎ ঘুঁটে দ্বারা গর্ত্তের তৃতীয়াংশ পূরণ করিয়া মূষা সংস্থাপন করিবে এবং চতুর্থাংশও ঐরূপ ঘুঁটে দ্বারা পূরণ করিয়া উপরিভাগে অগ্নি প্রদান করিবে ও শীতল হইলে তুলিয়া লইবে।

ষোড়শাঙ্গুলকে খাতে কস্যচিৎ কৌক্কুটং পুটম্।

কৌক্কুট পুট—সমস্ত দিকে ১৬ অঙ্গুলি পরিমিত গর্ত্তে পুট দেওয়াকে কৌক্কুট পুট বলে।

যৎপুটং দীয়তে খাতে হ্যষ্টসংখ্যবনোপলৈঃ।
কপোতপুটমেতত্তু কথিতং পুটপণ্ডিতৈঃ॥
এতদেব লঘুপুটনাম্না খ্যাতম্।

যে খাতে আটখানি ঘুঁটে দ্বারা পুট-পাক সাধিত হয়, তাহাকে কপোতপুট বলে। সর্ব্বাপেক্ষা অল্প ঘুঁটে ও খাতে এই পুট প্রদত্ত হয় বলিয়া ইহার নাম লঘুপুট। যেস্থলে লঘুপুট উল্লেখ থাকিবে। সেইস্থলে এই রীতিতে পুট প্রদান করিতে হইবে।

বৃহদ্ভাণ্ডস্থিতৈর্যত্নে গোবরৈর্দীয়তে পুটম্।
তৎ গোবরপুটং প্রোক্তং ভিষগ্ভিঃ সূতভস্মকৃৎ॥
গোষ্ঠান্তর্গোক্ষুরক্ষুণ্ণং শুষ্কচূর্ণিত গোময়ম্।
গোবরং তৎ সমাখ্যাতং বরিষ্ঠং রসসাধনে॥

গোবরপুট—যে যন্ত্রে পুটপাক করিতে হইবে, ঐ যন্ত্রটীর মধ্যে ঔষধ রাখিয়া পূর্ব্ববৎ মুখ রোধ, মৃত্তিকা লেপন ও শুষ্ক করিয়া একটী বৃহদ্‌ভাণ্ডে ঐ মূষা স্থাপন করিবে এবং ভাণ্ডের মুখে শরাবাদি প্রদান করিয়া রুদ্ধ করিবে। অনন্তর গোবর দ্বারা ঐ ভাণ্ডটী এরূপভাবে আবৃত করিবে যে ঐ ভাণ্ডটীর নিম্ন পার্শ্ব ও উপরিভাগ সুন্দর আচ্ছাদিত হয়, যেন কোন স্থল অনাবৃত না থাকে। পরে উপরিভাগে অগ্নি প্রদান করিয়া সাবধান থাকিতে হইবে যেন উপরিভাগের গোবর না পড়িয়া যায়। গোবর সাজাইবার সময়েই এবিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। এই পুটে পারদ ভস্ম করিতে হয়।

গোষ্ঠমধ্যস্থ গোময় সমস্ত গরুর খুর দ্বারা মর্দ্দিত, শুষ্ক ও চূর্ণিত হইলে উহাকে গোবর বলা যায়। সামান্যতঃ ইহাকে ঘসি বা ঘেঁটা বলা হইয়া থাকে। এই গোবর রসসাধন-বিষয়ে বিশেষ উপযোগী।

বৃহদ্‌ভাণ্ডে তুষৈঃ পূর্ণে মধ্যে মূষাং বিধাবয়েৎ।
ক্ষিপ্তাগ্নিং মুদ্রয়েদ্‌ ভাণ্ডং তদ্‌ভাণ্ডপুটমুচ্যতে॥

একটী বৃহদ্‌ভাণ্ডের তৃতীয়াংশ তুষ দ্বারা পূর্ণ করিয়া পূর্ব্ববৎ নির্ম্মিত ঔষধপূর্ণ মূষা স্থাপন করিবে ও অবশিষ্টাংশ তুষ দ্বারা পূর্ণ করিয়া অগ্নি প্রদান করিবে। অনন্তর শরাবাদি দ্বারা ভাণ্ডের মুখ ঢাকিয়া দিবে। কোনদিকে একটু শূন্য থাকা প্রয়োজন, নচেৎ অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

যন্ত্রপ্রকরণ।

কবচী যন্ত্র।

নাতিহ্রস্বাং কাচকুপীং নচাতি মহতীং দৃঢ়াম্‌।
বাসসা কর্দ্দমাক্তেন পরিবৃতা সমন্ততঃ॥
সংলিপ্য মৃদুমৃৎস্নাভিঃ শোধয়েদ্‌ভানুবহ্নিনা।
নিধায় ভেষজং তত্র মুখমাচ্ছয়েত্ততঃ॥
কঠিন্যা দৃঢ়যা বাপি পচেদ্‌ যন্ত্রে বিধানতঃ।
কবচী যন্ত্র মেতদ্ধি রসাদিপচনে মতম্‌॥

একটী মধ্যবিধ সমতল দৃঢ় বোতল কর্দ্দমাক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উত্তমরূপ বেষ্টন করিবে এবং কর্দ্দম দ্বারা লেপন করিয়া ক্রমে শুষ্ক ও পুনরায় লেপন করিবে। অনন্তর ঐ বোতলের মধ্যে ভেষজ দ্রব্য নিহিত করিয়া বালুকা যন্ত্র প্রভৃতির মধ্যে স্থাপন করিয়া তত্তদ্‌ যন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পাক ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। আবশ্যক হইলে খড়ী দ্বারা বোতলের মুখ বদ্ধ করিবে। ঈদৃশ প্রলিপ্ত বোতলের নাম কবচী যন্ত্র। পারদাদির পাক ক্রিয়া উল্লিখিত রীতিতেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। বালুকা যন্ত্রাদির নিয়ম ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।
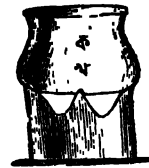
বালুকা যন্ত্র।

ভাণ্ডে বিতস্তি গম্ভীরে মধ্যে নিহিত কূপিকে।
কূপিকাকণ্ঠপর্য্যন্তং বালুকাভিশ্চ পূরিতে॥
ভেষজং কূপিকাসংস্থং বহ্নিনা যত্র পচ্যতে।
বালুকা যন্ত্র মেতদ্ধি যন্ত্রংতত্র বুধৈঃ স্মৃতম্‌॥

উল্লিখিত চিত্রের 'ক' চিহ্নিত পদার্থ কূপিকা এবং 'খ' চিহ্নিত পদার্থ ভাণ্ডস্থ

বালুকা। স্থালী ও চুল্লী স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, বিশেষ চিহ্ন প্রদানের আবশ্যকতা দেখা যায় না। বিতস্তি (বিঘত) প্রমাণ গভীর একটী ভাণ্ডের মধ্যে ঔষধগর্ভ কুপিকা স্থাপন করিয়া উহার চতুষ্পার্শ্বে বালুকা নিক্ষেপ করিবে। কুপিকার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বালুকা দ্বারা পূর্ণ হইলে চুল্লিতে স্থাপন করিয়া নিম্নে অগ্নি প্রদান করিবে এবং নাতি তীক্ষ্ণ ও নাতি মৃদু ভাবে নিয়মিত কাল পর্য্যন্ত জ্বাল দিয়া ঔষধ পাক সমাধা করিবে। ইহার নাম বালুকা যন্ত্র। স্বর্ণ সিন্দুরাদি পাক করিতে হইলে উল্লিখিত কবচী যন্ত্রের পরিমাণানুসারে আধার ভাণ্ডেরও পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন এবং ঐ ভাণ্ডের তলদেশে একটী ছিদ্র করিয়া বোতলটী বসাইতে হয়। বিস্তারিত বিবরণ স্বর্ণসিন্দুরাদি পাকে প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা রহিল।
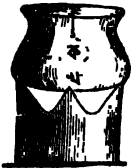
দোলা যন্ত্র।

দ্রবদ্রব্যেণ ভাণ্ডস্থ পূরয়িত্বার্দ্ধ মাত্রকম্।
সূত্রেণ লম্বয়েৎ কাষ্ঠে বদ্ধা ভেষজ পোট্টলীম্॥
স্বেদযেচ্ছান্তরগতাং দোলাযন্ত্র মিদং স্মৃতম্।
পিধায় পচ্যতে যত্র তদ্‌যন্ত্রং স্বেদনং স্মৃতম্॥

এই চিত্রের 'ক' সূত্র বদ্ধ লম্বমান ঔষধ পোট্টলী ও 'খ' ভাণ্ডস্থ তরল পদার্থ। দ্রব দ্রব্যের দ্বারা একটী ভাণ্ডের অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিয়া মুখে একখানি কাষ্ঠ (কাঠ, বাখারি কিম্বা কঞ্চি প্রভৃতি) পাতিত রাখিয়া উহার সহিত ঔষধের পোট্টলী (নূতন বস্ত্র দ্বারা বদ্ধ) ঝুলাইয়া বান্ধিয়া রাখিবে যাহাতে ঔষধ পোট্টলী তরল পদার্থে সম্পূর্ণ মগ্ন হয়, অথচ ভাণ্ডের নিম্নদেশ হইতে পৃথক্ থাকে, এরূপ পরিমাণ করিয়া ঝুলাইতে হইবে। পরে চুল্লীর উপরিভাগে সংস্থাপন করিয়া নিম্নভাগে জ্বাল দিতে থাকিবে। দ্রব্যের কাঠিন্য অনুসারে সময়ের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে, পাকের নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। এইরূপ যন্ত্রকে দোলা যন্ত্র বলে। ভাণ্ডের মুখে ঢাকা দিয়া এইরূপ ক্রিয়া করিতে হইলে তাহাকে স্বেদন যন্ত্র কহে।
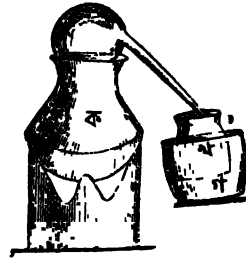
বারুণী যন্ত্র।

ঊর্দ্ধে তোয়সমাযুক্তং জলদ্রোণী বিবর্জ্জিতম্।
তোয়সংবেষ্টিতাধার মৃণুনাড়ীসমন্বিতম্॥
যন্ত্রং তদ্বারুণীসংজ্ঞং সুরাসাধনকর্ম্মণি।
অন্যচ্চ—বীজদ্রব্যং ঘটে দত্ত্বা সংচ্ছাদ্যাননেন তন্মুখম্।
মৃদা মুখং বিলিপ্যাথ নাড়ীং বংশাদিসম্ভবাং॥
যন্ত্রাদাধারগাং কৃত্বা স্রাবয়েদ্ বিধিনা রসম্।
বারুণীযন্ত্র মেতদ্ধি সুরাসংসাধনে সুখম্॥

উল্লিখিত চিত্রে 'ক' ঘট মধ্যস্থ বীজ দ্রব্য (যাহা হইতে সুরা প্রস্তুত হয়) 'খ' আধার পাত্র (যাহাতে সুরা সংরক্ষিত

হয়) এবং 'গ' সুরাধার শীতল রাখিবার জন্য জলসংযুক্ত অপর একটী পাত্র। ইহার মধ্যে সুরাধার বসান থাকে এবং ইহা শীতল জলে পূর্ণ থাকে। জল উষ্ণ হইলে মধ্যে মধ্যে জল পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হয়।

কলসী অপেক্ষা বৃহৎ মুখবিশিষ্ট মৃণ্ময় বা তাম্র কলসাকার পাত্রে ভেষজ দ্রব্য রাখিয়া অপর একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কলসী উহার মুখে উপুড় করিয়া চাপা দিবে এবং উভয়ের সন্ধিস্থল মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপ লেপন করিবে। উপরিস্থ কলসীর উদরে একটী ছিদ্র করিয়া একটী নল প্রবেশ করাইবে। নলটী সবল হওয়া আবশ্যক, উহা তাম্রাদি ধাতু দ্বারা নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। বাঁশের নল দিলেও চলিতে পারে, ৬।৮ অঙ্গুলি পরিমাণ নল কলসীর মধ্যে প্রবেশ করিবে, উহার সন্ধিস্থল জীর্ণ বস্ত্রাদি ও মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। নলের অপর মুখ ঐরূপ ৬।৮ অঙ্গুলি পরিমাণ, যে পাত্রে সুরা রক্ষিত হইবে উহার মুখে প্রবেশ করাইবে ও উহার মুখ উত্তমরূপ রুদ্ধ করিবে। সুরা পাত্রটী কোন একটী জলপূর্ণ পাত্রে বসাইয়া রাখিতে হয় ও মধ্যে মধ্যে জল পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হয়। এইরূপে যন্ত্র স্থাপন করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপ দিবে। তাপের আধিক্য হইলে মৃত্তিকা প্রলেপ ফাটিয়া যাইতে পারে কিম্বা উপরিস্থ কলসী উঠিয়া পড়িতে পারে। কত সময় জ্বাল দিতে হয়, তাহা নির্দ্দিষ্ট করা সহজ নহে, তবে ধূম নির্গমনের পর ১৫।২০ মিনিট রাখিলেই চলিতে পারে। এই বারুণী যন্ত্রে মৃতসঞ্জীবনী সুরা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

নাড়িকা যন্ত্র।

বিনিধায় ঘটে দ্রব্যং কনীয়াংস মধোমুখম্।
ঘটমগ্যমুখে তস্য স্থাপয়িত্বোভয়োর্মুখম্॥
মৃত্মৃদ্ভিঃ সমালিপ্য নাড়িকাং বিনিবেশয়েৎ।
যন্ত্রাৎকুণ্ডলিতাং ভিত্বা জলদ্রোণীং মহত্তমাম্॥
আধার ভাণ্ডপর্য্যন্তং তচ্চ,লাং বিধারয়েৎ,
অধস্তাজ্জালয়েদবহ্নিং যাবদ্ বাষ্পো বিশেদধঃ॥
গৃহ্নীয়াদাধারগতং নির্ম্মলং রসমুত্তমম্।
নাড়িকাযন্ত্রমেতদ্ধি মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্।

'ক' ইহার কলসীস্থ স্রাবণীয় পদার্থ। একটী কলসে ভেষজ দ্রব্য রাখিয়া অন্য একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কলস উহার মুখে উপুড় করিয়া চাপা দিবে এবং সন্ধিস্থল কোমল মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে লেপন করিবে। ঐ যন্ত্র হইতে একটী নল বক্র হইয়া শীতল জলপূর্ণ একটী দ্রোণী (টব্) ভেদ করিয়া আধার ভাণ্ডে উপস্থিত হইবে। যন্ত্র চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া নিম্নে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে। ইহাতে কলসস্থ দ্রব্যের বাষ্প নাড়িকা পরিবেষ্টন করিয়া ও জল দ্রোণীর নিকট শৈত্যসংযোগে ঘনীভূত হইয়া আধার ভাণ্ডে পতিত হইবে। ঐ পরিস্রুত সুনির্ম্মল রস গ্রহণীয়। এই নাড়িকা যন্ত্র দ্বারা বস্তুর সুনির্ম্মল রস (আরক) সংগৃহীত হয়। এখন গোলাপজল ও মৌরীর আরক প্রভৃতি এই রূপে প্রস্তুত হয়।

ভৈষজ্যতত্ত্ব।

পটোল।

ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বোধ হয় পটোলের বিষয় অবগত আছেন, সুতরাং বিশেষ করিয়া প্রতিরূপ (চিত্র) প্রদর্শনের কোনই আবশ্যকতা দেখা যায় না। পটোলের পত্র ফলাদি সমস্তই ব্যবহার করা যায়, কিন্তু উহার উপকারিতা হয়ত অনেকেই জ্ঞাত নহেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর কাহাকে যে কোন্ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, কে বলিতে পারে? লক্ষ কোটী স্বর্ণ মুদ্রায় যাহা সাধিত না হয়, একটী সমান্য তৃণ দ্বারা তাহা সম্পন্ন হয়। জগদীশ্বরের সৃষ্টিরাজ্যে একটী সামান্য তৃণের মহিমা চিন্তা করিলেও, বিস্মিত হইতে হয়।

পটোল পত্রং পিত্তঘ্নং নাড়ী তস্য কফাপহা।
ফলং ত্রিদোষশমনং মূলং তস্য বিরেচনম্॥

পটোল পত্র ভক্ষণে পিত্ত নাশ হয়, নাড়ী অর্থাৎ পটোলের ডাটা সেবনে কফ বিনষ্ট হয়, ফল ভক্ষণে ত্রিদোষের শমতা হয় এবং মূল সেবনে বিরেচন হয়।

পিত্তজ্বরে পটোল পত্রের রসের সহিত হিঙ্গুলেশ্বর প্রভৃতি বটী সেবনে বিশেষ উপকার হয়। ঐ অবস্থায় কেবল মাত্র পটোলপত্র রস ১।২ ছটাক সেবনেও বিশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়া থাকে। পরন্তু পিত্তপ্রধান বিষমজ্বরে ধনে ১ তোলা ও পলতা (পটোল পত্রকে সাধারণতঃ পলতা বলা হয়) ১ তোলা পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন ছাকিয়া লইয়া ঐ জলসহ চন্দনাদি লৌহ, পিত্তান্তকলৌহ ও বিষম জ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবনে অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। কেবলমাত্র ধনে পলতার জল সেবনেও শত শত স্থলে পিত্ত-প্রধান জীর্ণ জ্বর আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। পলতার ঝোল ও পলতার ডালনা তিক্ত হইলেও অতি উপাদেয় ও হিতকর সামগ্রী।

শ্লেষ্ম-প্রধান জ্বরাদি রোগে পটোলের ডাঁটার রসের সহিত সর্ব্বেশ্বর, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি শ্লেষ্মজ্বরাধিকারোক্ত ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহাতে অরুচি, তন্দ্রা ও আলস্য প্রভৃতি উপসর্গ অতি সত্বর নিবারিত হয়। পটোলের রসের সহিত অনেক ঔষধ সেবিত হইয়া, থাকে। ত্রিদোষ জনিত ব্যাধির ইহা প্রধান অনুপান। পটোলের মূলের ছাল চূর্ণ ৪ হইতে ৮ রতি মাত্রায় উষ্ণ জল সহ সেবনে ৪।৫ বার তরল মলভেদ হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। এই বিরেচনটী নিতান্ত মৃদু নহে, সুতরাং বিবেচনা পূর্ব্বক পীড়া বিশেষে প্রদান করিবে। মৃদু বিরেচনের আবশ্যক হইলে ইহা কদাচ দেওয়া বিধেয় নহে। জ্বর, উদর ও পাণ্ডু কামলা প্রভৃতি রোগে এই চূর্ণ প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

সমালোচনা।

আমরা সমালোচনার্থ অনেক গুলি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছি, আগামী বার হইতে ক্রমান্বয়ে সেই সকলের যথাযথ সমালোচনা করা যাইবে, প্রথম বৎসরে বিশেষ কোন কারণে সেগুলির সমালোচনা করা হয় নাই, গ্রন্থকারগণ নিরাশ হইবেন না—

এমারেল্ডে—"মা"।

অনেকদিনের পর সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী নূতন দলবল নূতন সাজ সরঞ্জাম লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, একটা কমিটী গঠিত হইয়াছে উক্ত কমিটীর সম্মতিক্রমে অনেকদিনের পরে থিয়েটরের পূর্ব্বতন ম্যানেজার ও প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল সুর পুনর্ব্বার ম্যানেজার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, কতকগুলি পাকা অভিজ্ঞ অভিনেতাও ইহাতে যোগ দান করিয়াছেন। সম্প্রতি মরকতের প্রধান ম্যানেজার ও নাটক রচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ মিত্র, কবিকঙ্কণ হইতে কালকেতু উপাখ্যান ভাগকে, ভগবতীর মূর্ত্তিকেই প্রধানা করিয়া নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া "মা" নামে অভিহিত করিয়াছেন; নাটক খানি যখন কল্পনা করা হয়, তখন সাধারণের রুচির প্রতি যে অতুল বাবু দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না, আড়ম্বর-পূর্ণ কতকগুলি বাক্যচ্ছটায় সাধারণে প্রীতি পাইবে এই আশা বলবৎ হওয়াতে তিনি বিষয়টীকে সাধারণের বিশেষ বিরক্তির কারণ করিয়া ফেলিয়াছেন। যাহাই হউক চরিত্র চিত্রণে দোষ থাকিলেও অভিনেতাগণ আপনাপন কার্য্যে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইয়াছেন। নৃত্য সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, অথচ সুরুচির পরিচায়ক, কালকেতুর মধুর কণ্ঠে সকলেই বিমোহিত হইয়াছিল, সাধু সিদ্ধিনাথ যখন খড়্গ লইয়া উন্মত্তভাবে মাতৃপদে নরবলি প্রদান করিতেছিল, সে সময়ে সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিল। প্রথমাঙ্কে, সহসা চণ্ডীর, অসুর মর্দ্দিনীরূপ ধারণ সাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, নাটক রচয়িতা দৃশ্যপট গুলি সম্বন্ধে, বিশেষ মনযোগ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। কতকগুলি চরিত্র নাটকে না থাকিলে সম্ভবতঃ আমরাও প্রীতিলাভ করিতে পারিতাম। মরকতের উন্নতি সম্বন্ধে এবার আমাদের বিশেষ আশা জন্মিয়াছে, সুতরাং ভরসা করি নাট্যকার নাটক নির্ব্বাচন কালে বিশেষ ধীরতা সহকারে বিবেচনার সহিত কার্য্য করিবেন।

২য় খণ্ড। } ১৩০১ সাল কার্ত্তিক। { দ্বিতীয় সংখ্যা।

সূচী পত্র।

মূল্য, প্রতি সংখ্যা ৵৹ আনা।

একটি বিশেষ অনুরোধ।

আমাদিগের এই ক্ষুদ্র কার্য্য সাধারণের নিকট এত অল্প কালের মধ্যে আদরণীয় হইবে, এ আশা আমাদের মনে পূর্ব্বে স্থান প্রাপ্তই হয় নাই। ইতিমধ্যেই আমাদের গ্রাহক সংখ্যা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে আমরা কোন ক্রমেই আর কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছি না, সেইজন্য কোন কোন গ্রাহক এপর্য্যন্ত প্রথম বৎসরের সমুদয় সংখ্যা প্রাপ্ত হন নাই, এই ত্রুটীর জন্য আমরা বিনীত ভাবে তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, অল্প দিবসের মধ্যেই আমরা তাহাঁদের সংখ্যাগুলি পূরণ করিয়া দিতে বাধ্য রহিলাম।

বিশেষ নিয়ম।

আমাদের এই পত্রের মূল্য অগ্রিম দেওয়াই নিয়ম; এক্ষণে আমরা সেই নিয়মানু-যায়ী ৩য় সংখ্যার মধ্যেই গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট ২য় বৎসরের প্রাপ্য মূল্য প্রার্থনা করিতেছি; যাঁহারা ইতি মধ্যে টাকা না পাঠাইবেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা তৃতীয় সংখ্যা ভ্যালু পেয়েবেলে পাঠাইয়া মূল্য আদায় করিয়া লইব, এ ত্রুটীও বোধ হয় ক্ষমা করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন না।

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

"চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান" ও সমীরণ প্রতি মাসের শেষে প্রকাশিত হয়।

চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য কলিকাতায় ১৶০ আঠার আনা, মফঃস্বলে ১৷০ দেড় টাকা। প্রত্যেক খণ্ড দুই আনা মাত্র। নমুনার জন্য প্রতি সংখ্যায় ৵১০ দশ পয়সা অগ্রিম পাঠাইতে হয়।

যিনি একত্রে পাঁচটী গ্রাহক করিয়া দিয়া অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাকে বিনামূল্যে এক এক খণ্ড পত্র প্রদান করা হইবে।

চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে এক বৎসরের জন্য প্রতি পেজ, প্রতি মাসে ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পেজ ৩৲ টাকা, সিকি পেজ ২৲ টাকা, সিকি পেজের কম বিজ্ঞাপন কণ্ট্রাক্ট হিসাবে গৃহীত হয় না। সিকি পেজের কম প্রত্যেকবার প্রতি লাইন ।০ চারি আনা হিসাবে দিতে হইবে।

এই পত্র সম্বন্ধে টাকাকড়ি আমার নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডারের কুপনে আপন নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণকে আপনার নম্বর লিখিতে হইবে। পত্রোত্তর আবশ্যক হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিবেন, নচেৎ উত্তর যাইবে না—

সম্পাদকীয় পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

টাকা কড়ি আমার স্বাক্ষরিত বিল ব্যতীত কেহ দিলে আমি তাহার দায়ী হইব না।

ব্যারিং বা ইনসফিসেণ্ট পত্র গৃহীত হইবে না।

১৪৬ নং ফৌজদারী-বালাখানা, কলিকাতা। | কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন, স্বত্বাধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষ।

২য় খণ্ড। | ১৩০১ সাল কার্ত্তিক | ২য় সংখ্যা।

পেঁড়োর মন্দির।

১ম খণ্ডের ৪৮৮ পৃষ্ঠার পর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আবার রাত্রি সমাগত হইল এবং পরদিবস পুনরায় প্রভাতগগনে নবীন তপন দেখা দিল। মুসলমানেরাও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া পুনরায় দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইল। বিগত দিবসের দারুণ পরাজয়ের পর হিন্দুরা যে আবার অসম সাহসিক বীরত্ব প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইবে, তাহারা তাহা ভাবে নাই, তাই তাহারা সদম্ভপদক্ষেপে চলিতে লাগিল। তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দেখিল যে হিন্দুরা ইতিপূর্ব্বেই মৃত সৈন্যদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছে এবং আহতদিগকে দুর্গের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়াছে। এই সকল দেখিয়া মুসলমানেরা স্থির ধারণা করিল যে হিন্দুরা আর সহজে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধ করিবে না—মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা ভীত হইয়াছে। তাহাদিগের এই ভ্রম অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইল না।

প্রাকারের যে অংশে পূর্ব্ব দিবসে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, মুসলমানসেনা সেই অংশ পরিত্যাগ করিয়া আক্রমণ করিবার পক্ষে সুবিধাজনক অপর এক অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য যেই পশ্চাৎ ফিরিল, তখন সেই পূর্ব্বোক্ত প্রাকারে এক সুন্দরী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত বালকেরই ন্যায় তাহাদিগকে মধুর কণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিল এবং চকিতের মধ্যে তাহাদিগের মস্তকে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় অজস্রধারে জুতারাশি বর্ষিত হইতে লাগিল। জুতাবর্ষণও যেমন থামিল, দুর্গের দ্বাদশ সিংহদ্বারও সহসা খুলিয়া গেল। আরও

আশ্চর্য্য! মুসলমানসেনা কাল যে বলভদ্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখিয়াছিল, আজ সেই বলভদ্র ও তাঁহার দুই ভ্রাতা, রামভদ্র ও বীরভদ্র, দুর্গ হইতে বেশ সুস্থশরীরে বিনির্গত হইয়া সত্বর উপযুক্ত ব্যূহ রচনা করিয়া তাহাদিগকে সিংহবিক্রমে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। মুকিউদ্দীন ইহা দেখিয়া সন্ত্রস্তভাবে এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তে কোরাণের "বসেদ্"-লিখিত পতাকা ধারণ করিয়া স্বীয় ভীত সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিয়া বলিতে লাগিলেন "ভ্রাতৃগণ! ভীত হইও না, এ সকলই কাফেরদিগের জাদুগিরি; ইহাতে কদাপি ভীত হইও না, সাহসপ্রদর্শনপূর্ব্বক কাফেরদিগকে বিনাশ কর।"

ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আবার মুকিউদ্দীন ও বলভদ্র পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। আবার বাবর আলী আসন্নমৃত্যু হইতে ফার্দ্দুস আলী কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেন। এবারে বাবর মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলেও কিছু গুরুতররূপে আহত হইলেন। হিন্দুদিগের পক্ষে এবারে বলভদ্র ও তাঁহার দুই ভ্রাতা, তিনজনেই আহত হইয়া রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। মুসলমানসেনারও বাবর ব্যতীত অনেকগুলি সেনানী এই যুদ্ধে হতাহত হইলেন। বলভদ্র প্রভৃতি আহত হইবামাত্র হিন্দুরা পূর্ব্বের ন্যায় দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিল এবং মুসলমানেরা তাহাদিগের নিহত সেনানী ও সৈন্যদিগের কবর দেওয়া সমাধা করিয়া আনন্দ করিতে করিতে শিবিরে প্রত্যাগমন করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাবর আলী তাঁহার কতকগুলি সহচর অনুচরের স্কন্ধে শিবিরে আনীত হইলেন। ফার্দ্দুস আলীও তথায় আসিয়া উপস্থিত। ফার্দ্দুস তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার ক্ষতস্থানগুলি এরূপ যত্নসহকারে বাঁধিতে লাগিলেন এবং তাঁহার কষ্টের লাঘব করিবার জন্য এত চেষ্টাচরিত্র করিতে লাগিলেন যে দর্শকমাত্রেই তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু বাবর এই সকল যত্ন তেমন ভাল মনে গ্রহণ করিতেছিলেন না। এত যত্ন, এত চেষ্টা তাঁহার মনে যে কোন গভীর ভাব ফেলিয়াছে, তাহা বোধ হইল না। বাবর ও ফার্দ্দুসের মধ্যে কি এক আশ্চর্য ভাব বর্ত্তমান! যেখানে বাবর, সেইখানেই ফার্দ্দুস; ফার্দ্দুস বাবরের প্রীতিপাত্র হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, আর বাবর তাহা অতি নিষ্ঠুরভাবে অবহেলা করিতেছে। এত অবহেলাতেও ফার্দ্দুসের যত্নের ত্রুটি নাই—বরঞ্চ বৰ্দ্ধিতই হইতেছে।

বাবরের পিতা মুসলমানসেনার অন্যতর প্রধান সেনানী ছিলেন; তিনি ইতিপূর্ব্বেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। বাবরের চরিত্র যেমন উন্নত, তাঁহার স্বভাবও তেমনি উদার ও মধুর।

দেখিতে শুনিতেও তিনি অতি সুশ্রী ছিলেন। এদিকে, তাঁহার বিতাড়িত বন্ধু ফার্দ্দুস আলীর জন্মস্থান বা তাঁহার পিতামাতার বিষয় কেহই জানিত না। তাঁহার আকৃতি নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব—মাঝারি রকমের কিন্তু তাঁহার মুখের এবং শরীরের গঠন এরূপ পরিপাটী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং তাঁহার চোখ দুটী এমন পটলচেরা চোখ ছিল যে, সুফিউদ্দীনের চতুর ও তীক্ষ্ণদর্শী সহচর সরফখাঁর অনেক বার সন্দেহ আসিয়াছিল যে ফার্দ্দুস যে সাজে সজ্জিত হইয়াছেন, সে সাজ তাঁহার উপযুক্ত নহে।

বাবরের বন্ধুরা যখন দেখিলেন যে তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা সকলেই চলিয়া গেলেন, কেবল ফার্দ্দুস তাঁহার শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে বাতাস দিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল; চারিদিক্ নিস্তব্ধ—জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না, এই অবসরে ফার্দ্দুস বাবরকে গভীর নিদ্রামগ্ন দেখিয়া, শিবিরগাত্রে একখানি সেতার ঝুলিতে দেখিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া ঝঙ্কার দিতে লাগিলেন। ঝঙ্কারের শব্দে বাবরের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ফার্দ্দুসের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য নিদ্রামগ্নের ন্যায়ই পড়িয়া রহিলেন। ফার্দ্দুস তাহা জানিতে পারিলেন না। ক্রমে তিনি সেতারের ঝঙ্কারের সঙ্গে আপনার সুকণ্ঠ মিশাইয়া স্বীয় রুদ্ধপ্রাণের কাতর গাথা গাহিতে লাগিলেন;

হায়!

বুঝিবারে পারি আমি নারীর প্রণয়,
আমার অন্তরে বাজে নারীর হৃদয়;
সতী ও বিশ্বাসীভাবে রব চিরন্তর
অপেখি' নীরবে তব মধু প্রত্যাদর।

হায়!

তাহার কোমল তনু হ'ত যদি মোর,
পারিতাম গলাইতে পাষাণে কাতর;
তখন হে প্রিয় তুমি সুন্দর যুবক!
সতত রহিতে ভোর আমার সেবক।

একপুত্রা মাতৃসম সেবিতাম তোরে,
মাথাটী যতনে থুয়ে হৃদয়ের পরে;
আনন্দে উঠিত তাহা নাচি' ধুকি ধুকি;—
সকল নারীর মাঝে হইতাম সুখী।

বাবরআলী সেতারের প্রথম ঝঙ্কারেই জাগ্রত হইলেও ফার্দ্দুসের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য সাড়াশব্দ না করিয়া নিদ্রাচ্ছলে শয়ান থাকিয়াই সকলই দেখিতে লাগিলেন ও শুনিতে লাগিলেন। অবশেষে ফার্দ্দুসের গানটী শেষ হইয়া গেলে বাবর তাঁহাকে বলিলেন "ফার্দ্দুস! আর গাহিতে হইবে না, এখান হইতে প্রস্থান কর; আমার অপ্রিয় হইলেও তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর না, তোমাকে লইয়া যে কি করিব তাহা এখনও বুঝিয়া উঠিতেছি না; আমার বিশ্বাস ছিল যে তুমি স্ত্রীলোক নহ, কিন্তু এখন বিশেষ সন্দেহ হইতেছে যে তুমি স্ত্রীলোক। আমার প্রতি এত যত্ন ও সেবা প্রদর্শন করিয়া তোমার যে কি লাভ হইবে তাহাত বুঝি না। তুমি আমার এত উপকার করিয়াছ ও করিতেছ যে আমার পক্ষে তাহা পরিশোধ করিবার আশা করা বৃথা। যাই হৌক, আমি একজন যোদ্ধা ও বীরপুরুষ, অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু আমাদের প্রার্থনীয়; সুতরাং

তোমার আর এত সেবা ও যত্ন করিতে হইবে না।”

ফার্দ্দুস এতদিন পুরুষের সাজে সজ্জিত হইয়া পুরুষের স্বর অনুকরণ করিতেছিলেন, কিন্তু এখন বাবরের বাক্যবাণে পীড়িত হওয়াতে তাঁহার স্বাভাবিক স্ত্রীকণ্ঠ প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন “হায়! তবে কি তোমার জন্য প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করা দোষাবহ হইল? বাবর! আমার মুখেরদিকে একটীবারও তাকাও; সকলেই এই মুখের সৌন্দর্য্য দেখিতে অনিমিখ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে কেবল তুমিই কি ইহা দেখিবে না? এই আমার বাহুদ্বয় দেখ, এরূপ সুগোল বাহু স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্যত্র সম্ভবে? এখন, যদি এই স্ত্রীশরীরের মধ্যে স্ত্রীহৃদয়ও বাজিতে থাকে, তবে বল প্রিয়তম বাবর! বল যে তুমি আর পুরস্কারের কথা উল্লেখ না করিয়া সর্ব্বদা তোমার নিকটে বসিয়া তোমার সেবা ও শুশ্রূষা করিবার অনুমতি দিবে।”

ফার্দ্দুস এই কথাগুলি বলিয়া আবার সেতার ধরিলেন এবং বাবরের মন প্রাণ কাড়িয়া লইয়া গাহিতে লাগিলেন, আর তাঁহার দুই কপোল বহিয়া মুক্তাকণা সকল ঝরিতে লাগিল—

বৃথা প্রেমাহ্বান করে কপোতী সাথীর তরে
হৃদয় তাহার গিয়াছে সরিয়া;
বৃথা বুলবুল হায় সারানিশি গান গায়
সহচর লাগি' অশ্রুতে ভাসিয়া;
অপর কুসুম তার
নয়নে দিয়েছে আঁধা;—
অপর আসবে তার
হৃদয় পড়েছে বাঁধা!

ফার্দ্দুস যখন এই গানটী গাহিতে ছিলেন, তখন বাবর তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন এবং দেখিয়া তাঁহার মনে একটী সন্দেহ উপস্থিত হইল। সেই সন্দেহ পাছে অপ্রিয় সত্যে পরিণত হয়, সেই ভয়ে তিনি তাহা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে আপনার মনকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন “না, না, তাহা অসম্ভব—জুমিলার এখানে আসা নিতান্তই অসম্ভব”। কিন্তু সন্দেহ একবার ধরিলে শীঘ্র যাইতে চাহে না। বাবর সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে নিরাকরণ করিবার জন্য আর একবার ফার্দ্দুসের মুখ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার সন্দেহ সত্য বলিয়াই জানা গেল। তিনি দেখিলেন যে ফার্দ্দুস জুমিলাই বটে,—তাঁহার প্রিয়তমা পরাণপুতলী বন্নুর প্রতিযোগী জুমিলা। জুমিলা যে বাবরের প্রেমের অধিকতর উপযুক্ত পাত্র, তাহাই বাবরকে দেখাইবার জন্য এই যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের ছদ্মবেশে আসিয়া বাবরের রক্ষা-দেবতারূপে ঘুরিতেছেন। ফার্দ্দুসকে দেখিয়া বাবরের মনে অনেকবার জুমিলা বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সবিশেষ না জানিতে পারায় হঠকারিতার সহিত তাহা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু জুমিলা যখন তাঁহার নিকট স্বীয় দুর্দ্দমনীয় প্রেম ব্যক্ত করিলেন তখন তিনিও কর্ত্তব্যবোধে প্রকাশ করিলেন যে তিনি তাঁহার আপনার হইতে পারেন না।

বাবর বলিলেন "জুমিলা! তুমিতো জানই যে আমি বন্নু ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভালবাসিতে পারিব না, আর তাহার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাবও চলিতেছে; সুতরাং আমি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিব না, তবে কেন এইরূপে আমার অনুসরণ করিয়া আপনাকে বৃথা কষ্ট দিতেছ? যে তোমার প্রেমের প্রতিদান করিবে না, তাহার জন্য কেন এই যুদ্ধে প্রাণ দিতে অগ্রসর হইতেছ? আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমার হৃদয় যদি স্বাধীন থাকিত, তবে তোমাকেই তাহা সমর্পণ করিবার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিতাম; কিন্তু এখন তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই"।

প্রেমের প্রতিদান না পাইলেও জুমিলা যে উপকার করিয়াছেন, বাবরের স্মৃতিপথে তাহা উদিত হওয়ায় এবং তাঁহার নিজের তীব্র বাক্যবাণের নিষ্ঠুরতা বুঝিতে পারায় তাঁহার চক্ষে অশ্রু উথলিয়া উঠিল; তিনি তাহা গোপন করিবার অভিপ্রায়ে মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া ইঙ্গিতের দ্বারা জুমিলাকে প্রস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। যাঁহার কাছে তিনি এত যত্ন ও সেবা এবং ভালবাসা পাইয়াছেন, এই নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানকালে তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইতেও যেন কষ্টবোধ করিতেছিলেন। যাহাইহউক তিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরী বন্নুর কথা স্মরণ করিয়া জুমিলাকে একজন প্রকৃত বন্ধুমাত্র বলিয়া হৃদয়ে স্থান দান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বন্নুর জন্ম সম্রাটের বংশে; তাঁহার মাতা সুফিউদ্দীনের ভগ্নী। শৈশবে তাঁহার পিতৃমাতৃবিয়োগ হওয়ায় সুফিই তাঁহাকে লালন পালন করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক নানাবিধ আছে; কেহ বা গৃহের কোমল ছায়ার তলে বসিয়া গৃহকার্য্য করিতে উৎসুক ও দক্ষ; কেহ বা গৃহের গৃহিণী হইবার অপেক্ষা পুরুষোচিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে অধিক তৎপর। বন্নু প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি আদতেই সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার নিকটে কেহ সংগ্রামের অবস্থা বর্ণনা করিলে তিনি আন্তরিক বিরক্তি প্রকাশ করিতেন এবং যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে কত-না দুঃখ প্রকাশ করিতেন। জুমিলা বন্নুর বিপরীত ছিলেন। তিনি গৃহের নির্জ্জনতা ও শান্তিরস তত পসন্দ করিতেন না। তিনি অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রিয় ছিলেন। তাই বলিয়া কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে বন্নু কাপুরুষের ন্যায় ছিলেন। কাপুরুষের প্রতি বন্নুর আন্তরিক ঘৃণা ছিল। ভাগিনেয়ী বন্নুর অভিপ্রায়ানুসারে সুফিউদ্দীন স্থির করিয়াছিলেন, যে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে সমধিক সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন, তিনিই বন্নুর পাণিগ্রহণ করিবার অধিকারী হইবেন। বাবর আলীর সহিত পরিচয়ে বন্নু বুঝিয়াছিলেন যে তিনিই তাঁহার পাণিগ্রহণের একমাত্র উপযুক্ত

পাত্র সুতরাং তাঁহাকেই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন; আবার বাবরও বন্নুর সরলতামাখা মূর্ত্তিখানি দেখিয়া আত্মহারা হইয়া তাঁহাকেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। যে, যে প্রকৃতির লোক হয়, অনেক সময়ে সে তাহার প্রতি-যোগী স্বভাবের সহচর প্রার্থনা করে। এই সূত্রেই "বৃদ্ধস্য তরুণীভার্য্যা" এই প্রবাদ চলিত হইয়াছে। বাবরআলী নিজে বীরপুরুষ ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন, তাই তাঁহার শান্তিরসপ্রিয় বন্নুকে অতি প্রিয় বোধ হইয়াছিল। সংগ্রামক্ষেত্র দূরে থাক্, বন্নু সহরেরও কোলাহল দূরে পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে ভাল বাসিতেন;—পল্লীগ্রামের স্রোতস্বতীর নীরব কুলুকুলু ধ্বনি, পল্লীগ্রামে প্রবাহিত মলয়-পবন তাঁহার প্রিয়তর বোধ হইত। বন্নুর প্রশান্তসরল মুখ দেখিলে সকলেরই ভালবাসিবার ইচ্ছা হইত।

জুমিলাও রূপবতী ছিলেন—সকলেই তাঁহার রূপের প্রশংসা করিত বটে, কিন্তু কেহই তাঁহাকে মনের সহিত ভাল-বাসিতে পারিত না। ইংরাজীতে এই ভাবটী পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করিতে পারা যায় "She might be liked but not loved." সে রূপের কাছে যে আসিত, সে দগ্ধপ্রায় হইয়া যাইত কিন্তু বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করিতে পারিত না। সে রূপের কাছে দাঁড়াইলে রূপতৃষা জ্বলিয়া উঠিত কিন্তু প্রশমিত হইত না। সেই রূপ যখন আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিত, তখন তাহার শত্রু-দিগেরও হৃদয় কাঁপাইয়া দিত। সেই রূপেরই তেজে জুমিলা চতুঃপার্শ্বস্থ লোক সকলকে ঝলসিত করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথ বাহির করিয়া লইতেন। যুদ্ধকালে জুমিলা যেরূপ উৎসাহধ্বনি প্রকাশ করিতেন, বন্নু তাহা দেখিলে জুমিলার প্রতি হয়তো দণ্ড অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিতেন। বন্নু যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া জুমিলার ন্যায় প্রিয়তমের পার্শ্বসহচর হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু লোকের দুঃখ দেখিলে তাহার দুঃখমোচন করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিতে পারিতেন; আহত বা রোগী-দিগের পার্শ্বে বসিয়া তাহাদিগের সেবা করা, তাহাদিগকে বাতাস দেওয়া, তাহাদিগের মুখে জল তুলিয়া দেওয়া, তাহাদিগের আহারের ব্যবস্থা করা, এই সকল বিষয়ে বন্নু সম্যক্ পারদর্শী ছিলেন। জুমিলার ন্যায় তিনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া দুদণ্ডের জন্য অপরের হৃদয়কে কাড়িয়া লইতে শেখেন নাই, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক মধুরিমায় সকলেই মুগ্ধ হইত। জুমিলা যে দিকে চাহিতেন, সে দিকে যেন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর তেজরাশি ছুটিত; বন্নু যে দিকে চাহিতেন সে দিকে যেন শারদীয় পূর্ণিমার মধুময় জোৎস্না বিকীর্ণ হইত। জুমিলার কটাক্ষ যেন হৃদয়কে অসিপত্রে বিদীর্ণ করিতে চাহে, বন্নুর মধুমাখা চাহনি যেন হৃদয়কে গোলাপ-পত্রে আবৃত করিয়া রাখে। জুমিলা স্বীয় মোহিনী শক্তি চতুর্দ্দিকে প্রকাশ করিতে ভাল বাসেন; বন্নু আবরণের আড়ালে লুকাইয়া থাকিতে চাহেন—তাঁহার রূপে যে অন্যের হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহা যেন তিনি দেখিতে চাহেন না।

জুমিলা ও বন্নু এই প্রকারের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সুন্দরী। ইহাঁরা যখন উভয়ে দিল্লীতে ছিলেন, তখন পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সম্প্রীতি ছিল। জুমিলা বন্নুর নিকটে বসিয়া অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত করিতেন। বোধ হয় পাঠকদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না যে, ইদানীং বাবর আলীর প্রণয় লইয়া তাঁহাদিগের কিছু মনকষাকষি চলিতেছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে কোন প্রকার বিবাদ কলহ ঘটে নাই। জুমিলার ন্যায় বন্নুও যদি ঈর্ষাপরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে সম্প্রীতি থাকা সহজ হইত না। বন্নু নিজে অতি সরলপ্রকৃতি, তাই তিনি আপনার সফলপ্রেমজনিত সুখে উল্লাস করিবার পরিবর্ত্তে অনেক সময়ে জুমিলার নিরাশপ্রেমজনিত দুঃখ অপনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেন।

একবার জুমিলা বাবরকে উদ্দেশ করিয়া বন্নুর নিকট পুরুষের পাষাণহৃদয়ের কথা বলিতেছিলেন, তখন বন্নু তাঁহাকে অতি মিষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন—"ভাই জুমিলা! তুমি তাঁহার উদ্দেশে কেন এই সকল কঠোর কথা প্রয়োগ করিতেছ? তাঁহার ভগিনী থাকিলে তিনি যেরূপ ভাল বাসিতেন, তোমাকেও সেইরূপই ভাল বাসেন; তবে আর এ সকল কঠোর কথা কেন?"

জুমিলা রাগে ও অভিমানে গরগর করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"এ সকল কথা কেন? কেন?—আমি কি তাঁহার ভগিনী যে তিনি আমাকে ভগিনীর মত ভাল বাসিবেন? না বন্নু, তাহা অসম্ভব। আমি বেশ জানি যে বাবর প্রেম কি, তাহা বুঝিতে পারে নাই—না, না; আমি যে বন্নুর কাছে বলিতেছি তাহা ভুলিয়া যাইতেছি; সৌভাগ্যবতী বন্নু জানে যে বাবর ভালবাসিতে জানে। তিনি যদি বিচার করিয়া উপযুক্ত পাত্রে প্রেম অর্পণ করিতেন, তাহা হইলে আমি কিছুই দুঃখ করিতাম না।"

বন্নুও তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"হাঁ, তিনি বিচার করিয়া দেখিলে, আমার প্রিয়তম বন্ধু জুমিলাকেই ভাল বাসিতেন এবং তিনি এখনও যদি বিবেচনা করিয়া দেখেন যে, বন্নু তাঁহার প্রীতির নিতান্ত অনুপযুক্ত পাত্র, তাহা হইলে এখনও হয় ত তিনি তোমাকেই আমার পরিবর্ত্তে ভাল বাসিতে পারেন।"

এই সুন্দরীদ্বয়ের মধ্যে কে বাবর আলীর প্রীতির অধিকতর উপযুক্ত পাত্র, তাহা সুন্দরী পাঠিকাগণ বিচার করিয়া বাবরকে প্রেমিক অথবা নিষ্ঠুর, যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পারেন। আমরা এইটুকু জানি যে বাবর একমাত্র বন্নুকেই অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন। তিনি জুমিলার নিকটে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিলেও তাহা পরিশোধ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। জুমিলা তাঁহার হৃদয় চাহিতেন, বাবর তাহা দিতে পারেন না—সে হৃদয় আর একজন আপনার হৃদয়ের বিনিময়ে ইতিপূর্ব্বেই ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

জুমিলাকে বাবর আলী যেরূপ কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, অন্য কোন স্ত্রীলোক হইলে তাহার ছায়া মাড়াইতেও চাহিত না। জুমিলা কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন না। বাবরের প্রতি তাঁহার এতদূর অনুরাগ দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। জুমিলার রূপ, অনুরাগ ও কার্য্য সকল আলোচনা করিয়া মুসলমানেরা তাঁহাকে পরী বলিয়া সন্দেহ করিত। তিনি যখন সভামধ্যে প্রবেশ করিতেন, তখন সকলেরই মুখে তাঁহার সৌন্দর্য্যের ছায়া পড়িয়া প্রফুল্লতা আনয়ন করিত, তিনিও চলিয়া যাইতেন, আর সভামধ্যে ম্লানভাব রাজ্যবিস্তার করিত। জুমিলার রূপে মুগ্ধ হয় নাই, মুসলমানদিগের মধ্যে এমন কেহই ছিল না। কেবল সরফ খাঁকে দেখিয়া বোধ হইত যে, জুমিলার রূপ তাহার হৃদয়ে কোনরূপ চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে নাই। তাহার এই প্রকার অনুভবহীনতা দেখিয়া নানা লোকে নানা কথা বলিত; কিন্তু বাবর ভাবিতেন যে, সে অন্য কোন রমণীকে হৃদয়ে স্থান দিয়া জুমিলা হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সমবেদনাবিশিষ্ট ব্যক্তিরা শীঘ্রই পরস্পরের বন্ধু হইয়া উঠে। বাবর ও সরফ উভয়ে সত্বরই পরস্পরের দৃঢ়বন্ধু হইয়া উঠিলেন। তন্মধ্যে বাবরই সরফের নিকট অনেক মনের কথা ব্যক্ত করিতেন, কিন্তু সরফ নীরবে তাহা শুনিয়া যাইত; তাহার নিজের প্রণয়িনী আছে কি না, তদ্বিষয়ে ইঙ্গিতেও কিছুমাত্র ব্যক্ত করিত না। বাবর সময়ে সময়ে তাঁহার প্রণয়িনী বন্নুর কথা সরফের নিকট বলিতেন; কিন্তু তাহার একটাও মনের কথা না পাইয়া ভাবিতেন যে, 'আমি আমার ভাবী সুখের বিষয় বলিতে গেলেই এই কথাই বার বার বলি যে যতদিন বন্নু আমার হৃদয়কে তাহার কোমলতায় ছাইয়া না ফেলিবে, ততদিন আমার সুখ নাই; যখন যুদ্ধে জয়লাভের আমার গৌরব-বৃদ্ধির কথা হয়, তখন উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া ফেলি যে, যতদিন আমি আমার জয়পতাকাসকল বন্নুর পদতলে দিতে না পারি, ততদিন আমি গৌরবকে গৌরব বলিয়াই মনে করি না; যখন সিরাজের সুগন্ধি আসব পান করিতে উদ্যত হই, তখন প্রথম পেয়ালা তাঁহারই উদ্দেশে উৎসর্গ করি। কিন্তু সরফ তো এ সকল কিছুই করে না; সে প্রেমের কথাই বলে না—সে বিষয়ের একটা অক্ষরও তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় না। সে কি সত্য সত্য প্রেমের জালে ধরা পড়েছে—পড়েনি, তাই বা বলি কি প্রকারে? সেও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে; আমার সহিত বন্নুর বিবাহ হউক, এ বিষয়ে কত আশা প্রকাশ করে, আর এই বন্নুর কথাই আমার নিকট শুনিতে ভালবাসে। প্রেমিক না হইলে সে প্রেমিকের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করে কিরূপে?'

দশম পরিচ্ছেদ।

বাবরের প্রত্যাখ্যানে জুমিলা তাঁহার নিকট কিয়ৎক্ষণের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে সরফ খাঁ বাবরের শিবিরে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া এক পার্শ্বে লুকাইয়া থাকিয়া বাবর ও জুমিলার কথোপকথন আদ্যন্ত শুনিয়াছিল। এখন সে ত্বরা পূর্ব্বক স্ফিউদ্দীনের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সকল কথাই বলিল। স্ফি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ জুমিলাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং সরফের সকল কথাই সত্য বলিয়া জানিলেন। পরদিন প্রভাতে ফার্দ্দুস যে বাবরের প্রণয়ভিখারী জুমিলা ব্যতীত অন্য কেহ নহে, একথা রাষ্ট্র হইতে বড় বিলম্ব হইল না। সকলেই আশ্চর্য্য হইল। মুসলমানেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল এবং আপনাদিগের নির্ব্বুদ্ধিতার প্রতি ধিক্কার দিতে লাগিল, কারণ তাহারা এতদিন বুঝিতে পারে নাই যে, ফার্দ্দুস একজন স্ত্রীলোক। জুমিলার নানা চাতুরীতে বিমূঢ় হইয়া তাহারা এতদিন এবিষয়ে ভাবিবার অবসরই প্রাপ্ত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে যদিও বাবর ও সরফের মনে তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া অনেকবার সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়াতে এবং অন্যান্য নানা কারণে তাহা ব্যক্ত করেন নাই। এখন, সরফ নিজের পদবৃদ্ধির আশায় এই সংবাদ সর্ব্বপ্রথম সৈন্যাধ্যক্ষের গোচর করিল।

এরূপ স্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের পরেও যে জুমিলা বাবরের প্রতি এত অনুরক্ত, তাহাতে সকলেরই আশ্চর্য্যবোধ হইতে লাগিল। যাহারা প্রকৃত প্রেমের আস্বাদ জানে নাই, তাহারা বাবরের রূপতৃষা মিটাইবার এরূপ সুন্দর অবসর পরিত্যাগ করাকে নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য ভাবিতে লাগিল। আবার যাহারা জুমিলাকে স্বায়ত্ত করিবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল, তাহারা বাবরের বন্ধুর প্রতি ঐকান্তিক প্রীতির প্রশংসা করিয়া জুমিলাকে বাবরের প্রতি বিরক্ত করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল।

পাণ্ডুয়ার দুর্গসম্মুখে যে সকল যুদ্ধ হইয়া গেল, সেই সকলে যেমন বাবরের, তেমনি জুমিলারও বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। বাবরকে রক্ষা করিবার জন্য জুমিলা তাঁহার কাছাকাছি থাকিয়া শত্রুসংহার করিতে করিতে এরূপ বীরত্বের সহিত অগ্রসর হইতেন যে, সেনাগণ নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া তাহা ক্ষণকাল তাকাইয়া দেখিত। আবার তাহাদের মধ্যে ঐরূপ মন-কষাকষি দেখিয়া সৈন্যেরা বলাবলি করিত যে "জুমিলা বাবরের উপযুক্ত অথবা বাবর জুমিলার উপযুক্ত? এরূপ দুইটী প্রেমস্রোত কেন মিলিত হইতেছে না"?

আমরা যে যুদ্ধের বিষয় পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, তাহা সেদিন কিছু পূর্ব্বাহ্নেই স্থগিত হইয়া গেল। সেই দিন রাত্রিতে মুসলমানদের এক মন্ত্রণাসভা বসিল; তাহাতে স্থির হইল যে, যখন উঠিবার

সিঁড়ি সকল প্রস্তুত হইয়াছে এবং প্রাকারের একপার্শ্বে উঠিবার উপযুক্ত স্থানও আবিষ্কৃত হইয়াছে, তখন আর খোলা মাঠে যুদ্ধ না করিয়া একেবারেই প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

মধ্যরাত্রে বাছা বাছা এক হাজার সৈন্য লইয়া মুসলমান সেনার এক প্রধান সেনানী ফতেআলী নিঃশব্দ পদক্ষেপে প্রাকারের নির্ব্বাচিত স্থানে আসিয়া তথায় সিঁড়ি লাগাইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রাকারের উপরে উঠিয়া পড়িলেন। সেইখানেই তাহাদের ভবলীলা সাঙ্গ হইল; সুবর্ণ মন্দিরের ভয়ানক চীৎকার ধ্বনিতে হিন্দুসেনা জাগ্রত হইয়া সহসা তথায় আসিয়া সহস্র সৈন্যের একটিকেও অবশিষ্ট রাখিল না। ক্ষণকালের জন্য সকলই নিস্তব্ধ হইল, অবশেষে হিন্দুদের উল্লাসধ্বনি ও সঙ্গীতে সেই গম্ভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। প্রাকারের উপর হিন্দুরা সঙ্গীত করিতেছিল। এই ভীষণ কালে এইরূপ সঙ্গীতাদি করা সয়তান ব্যতীত অপরের পক্ষে সম্ভব নহে বিবেচনা করিয়া মুসলমানেরা বলাবলি করিতে লাগিল "আল্লাই ইহার সকল জানেন, আসমানে সঙ্গীত হইতে লাগিল, আমরা এখন কি করিব"? তাহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া আপনাদের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতে মুসলমান মাত্রেরই মুখ মেঘাচ্ছন্ন। এদিকে হিন্দুরা প্রাকারগুলি পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া তদুপরি প্রত্যুষ হইতে নৃত্যগীত আরম্ভ করিয়াছিল। সঙ্গীতে বলভদ্রের বীরত্ব-কাহিনী বর্ণিত ছিল। কতকগুলি পরমা সুন্দরী স্বর্ণাভরণভূষিতা হইয়া নাচিতে নাচিতে মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল "হে কামুকগণ! তোরা কবে আমাদের অন্তঃপুরে আসিবি? এই ত আবার তোদের এক হাজার সৈন্য আমাদিগকে ছাড়িয়া তোদের পয়গম্বরের স্বর্গের হুরিদের কাছে গিয়াছে— তাদের প্রাণ কি পাষাণ।"

পয়গম্বরের নাম শুনিয়া মুসলমানেরা আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া প্রাকারস্থিত নর্ত্তকীদিগের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে করিতে বেগে অগ্রসর হইল। তাদের অব্যর্থ সন্ধানে কতকগুলি নর্ত্তকী নিহত হইল—ক্ষণকালের জন্য সব নিস্তব্ধ হইল। কিন্তু একি! মুহূর্ত্তের মধ্যে দুর্গের দ্বাদশ সিংহদ্বার পুনরায় উন্মুক্ত হইল এবং সেই বলভদ্র তাহার দুই ভ্রাতার সহিত সহসা বহির্গত হইয়া মুসলমানদিগের উপর ভীষণবেগে আপতিত হইল। তাহাদের ধ্বংসসাধন করিতে লাগিলেন। মুসলমানেরা আহত বলভদ্র প্রভৃতিকে পুনরুজ্জীবিত দেখিয়া ভয়ে অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিল, এমন সময়ে তাহারা সৈন্যাধ্যক্ষের উৎসাহবাণীতে উৎসাহিত হইয়া পুনরায় দ্বাদশ বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিল। এবারেও যেমন বলভদ্র ও তাহার দুই ভ্রাতা আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পতন করিলেন, অমনি হিন্দুরা দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিল।

মুসলমানেরা সৈন্যাধিক্যবশতঃ যদিও প্রায় প্রতি যুদ্ধেই জয়লাভ করিতেছিল, কিন্তু বলভদ্র ও তাহার ভ্রাতৃদিগকে

পুনরুজ্জীবিত দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। তাহাদের অন্তরে এই প্রশ্ন উঠিল যে উহাঁরা কে? উহাঁরা কি মানব? তাহা অসম্ভব বোধ হইল। তবে উহাঁরা কি ছায়া? সুফি ও অন্যান্য মুসলমান বীরদিগের তরবারি তাহাও অসম্ভব প্রমাণ করিয়াছে। তবে উহাঁরা কে? মুসলমানেরা উহাঁদিগকে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতে দেখিয়াছে এবং উহাঁদের গাত্র হইতে বহুমূল্য দ্রব্য সকল অপহরণ করিয়াছে। উহাঁরা যে ছায়া নহে, তাহা সেই সকল দ্রব্যই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিতে লাগিল। এই সকল বলবত্তর প্রমাণ না থাকিলে মুসলমানদিগের কেহই যুদ্ধ করিতে আর অগ্রসর হইত না। যুদ্ধক্ষেত্রে আরও বহুমূল্য দ্রব্য লাভ করিবার আশাতেও তাহারা খানিকটা রহিয়া গেল। কিন্তু অনেক মুসলমানরক্ত বৃথা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি রাজা পাণ্ডু অপরাজিতই রহিলেন, এই সকল ভাবিয়া তিন সপ্তাহের জন্য সন্ধি প্রার্থনা করা হইল এবং উভয় পক্ষই তাহাতে স্বীকৃত হওয়াতে সন্ধি মঞ্জুর হইল। এই তিন সপ্তাহ মধ্যে আর কোন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

মহাভারত (২)।

পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়।

এই প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে 'অনুক্রমণিকাধ্যায়' (আদিপর্ব্বের প্রথম অধ্যায়) সম্বন্ধে গতবারে যথাসাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে। মহাভারতের দ্বিতীয় অধ্যায় পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় নামে প্রসিদ্ধ। এইবারে এই অধ্যায়ের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির দিকে পাঠকগণের মনোযোগ-আকর্ষণ করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

এই "পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়।" দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে মহাভারতের অন্তর্গত পর্ব্বাধ্যায় সমূহের নাম ও সংখ্যা এবং অপরাংশে প্রত্যেক পর্ব্বের শ্লোক ও অধ্যায় সংখ্যা এবং বিষয়ানুক্রমণিকা বিস্তারিতভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত প্রথমাংশকে "সংক্ষিপ্ত পর্ব্বসংগ্রহ" ও অপরাংশকে "বিস্তৃত পর্ব্বসংগ্রহ" বলে। আমরা এই সমগ্র পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় ও বিভিন্ন সংস্করণের মহাভারত অবলম্বনে পরবর্ত্তী দুইটি তালিকা প্রস্তুত করিলাম। (ক)

এই তালিকা ও তৎসন্নিবিষ্ট পাদটীকাগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, ১ম,—আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায় মতে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা বোম্বাই ও প্রতাপ বাবুর সংস্করণানুসারে ৮৭৮৩৬, কিন্তু "শব্দকল্পদ্রুম" সংগ্রাহকগণের অবলম্বিত মূল মতে ৮৫৮৩৭ শ্লোক, অপরাপর সংস্করণে ৮৮৮১১ শ্লোকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রচলিত মুদ্রিত পুস্তকের বোম্বাই সংস্করণে এখন পাওয়া যায় ৯১০১৬টি শ্লোক। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা বাড়িয়াছে ৮৭২৫, ও কমিয়াছে ২০৪৫ শ্লোক। সুতরাং মোটের উপর বাড়িয়াছে (৮৭২৫—২০৪৫) ৬১৮০ শ্লোক। এই হেতু মুদ্রিত পুস্তকে বর্ত্তমানে ৮৪৮৩৬ + ৬১৮০ = ৯১০১৬ শ্লোক দৃষ্ট হয়। এই গেল বোম্বাই সংস্করণের কথা। ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণের মুদ্রিত পুস্তকের শ্লোক সংখ্যাও পরস্পর মিলে না। এক সংস্করণের মহাভারতে যে শ্লোক দৃষ্ট হয়, অপর সংস্করণে তাহা প্রায়ই পাওয়া যায় না, এরূপ উদাহরণও বিরল নহে। ডাক্তার বর্ণেল বলেন, Tanjore palace Libraryতে "মলায়ালম" অক্ষরে লিখিত যে সংস্কৃত মহাভারতের প্রাচীন পুঁথি আছে, তাহাতে মুদ্রিত পুস্তকাপেক্ষা সচরাচর শতকরা প্রায় ৫টি শ্লোক অধিক দৃষ্ট হয়। তাঁহার উক্তি এই,—The difference in entire Slokas do not amount to more than 5 per cent and these are generally omitted in the Northern recension". এতদনুসারে উক্ত গ্রন্থে মুদ্রিত পুস্তকাপেক্ষা মোটের উপর প্রায় চারি সহস্র শ্লোক অধিক দৃষ্ট হয়। এইরূপ আরও অনেক গরমিল আছে। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

২য়।—মহাভারতের পর্ব্বাধ্যায় সংখ্যা আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বর্ণনানুসারে (হরিবংশ বাদে) ১২০, টীকাকার নীলকণ্ঠ মতে ৯৭, আর বর্ত্তমান মুদ্রিত পুস্তকে পাওয়া যায় ১১২টি মাত্র।

৩য়।—মহাভারতের অধ্যায় সংখ্যা (অপরাপর সংস্করণ মতে) পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় মতে ১৯৩৩, বোম্বাই সংস্করণ মতে ১৯২৩ মাত্র। এখন মুদ্রিত পুস্তকে পাওয়া যায়—বোম্বাই সংস্করণে ২১১১, প্রতাপ বাবুর সংস্করণে ২১১৪, বৰ্দ্ধমান রাজবাটীর সংস্করণে ২১০৯ মাত্র। অধ্যায় সংখ্যার এইরূপ হ্রাস বৃদ্ধির অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ;—লেখকগণের অনভিজ্ঞতা বা অসাবধানতা। অনবধানতাবশতঃ কোনও কোনও পুস্তকের কোনও কোনও স্থলে একটি অধ্যায় বিভক্ত হইয়া দুই অধ্যায়ে পরিণত হইয়াছে। আবার কোথাও বা দুইটি অধ্যায় একত্রীভূত হইয়া গিয়াছে। উল্লিখিত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেও উপলব্ধি হইবে যে, কোনও কোনও পর্ব্বে পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাপেক্ষা শ্লোক কমিয়াছে কিন্তু অধ্যায় সংখ্যা বাড়িয়াছে। অধ্যায় বিভাগকরণকালীন অসাবধানতাই এরূপ অনৈক্যের এক প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয় তালিকা।

পর্ব্বাধ্যায় সমূহের নাম।

আদি পর্ব্ব।—১ অনুক্রমণিকা পর্ব্ব। ২ পর্ব্ব সংগ্রহাধ্যায় পর্ব্ব। ৩ পৌষ্য পর্ব্ব। ৪ পৌলোম পর্ব্ব। ৫ আস্তীক পর্ব্ব। ৬ আদিবংশাবতারণ পর্ব্ব। ৭ সম্ভব পর্ব্ব। ৮ জতুগৃহদাহ পর্ব্ব। ৯ হিড়িম্ব বধ পর্ব্ব। ১০ বকবধ পর্ব্ব। ১১ চৈত্ররথ পর্ব্ব। ১২ স্বয়ম্বর পর্ব্ব। ১৩ বৈবাহিক পর্ব্ব। ১৪ বিদুরাগমন পর্ব্ব। ১৫ রাজ্যলাভ পর্ব্ব। ১৬ অর্জ্জুনবনবাস পর্ব্ব। ১৭ সুভদ্রাহরণ পর্ব্ব। ১৮ হরণাহরণ পর্ব্ব। ১৯ খাণ্ডবদাহ পর্ব্ব।

টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে, "বিদুরাগমনং রাজ্যলম্ভশ্চৈকং পর্ব্ব।" অর্থাৎ বিদুরাগমন ও রাজ্য লাভ এক পর্ব্বাধ্যায়ের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট এবং "খাণ্ডবদাহো ময়দর্শনং চৈকৈকং পর্ব্ব।" অর্থাৎ খাণ্ডবদাহ পর্ব্বের (অর্থাৎ পর্ব্বাধ্যায়ের) শেষাংশ "ময়দর্শন পর্ব্ব" নামে পৃথক গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু মূলে আছে, "ততঃ খাণ্ডবদাহাখ্যং তত্রৈব ময়দর্শনং।" যাহা হউক, ফলে, ঘটনা সম্বন্ধীয় কোনও অনৈক্য নাই।

সভাপর্ব্ব।—১ সভাক্রিয়া পর্ব্ব। ২ মন্ত্রণা পর্ব্ব। ৩ জরাসন্ধ বধ পর্ব্ব। ৪ দিগ্বিজয় পর্ব্ব। ৫ রাজসূয়িক পর্ব্ব। ৬ অর্ঘাভিহরণ পর্ব্ব। ৭ শিশুপাল বধ পর্ব্ব। ৮ দ্যূত পর্ব্ব। ৯ অনুদ্যূত পর্ব্ব।

বোম্বাই সংস্করণে মন্ত্রণা পর্ব্ব পৃথক্ রূপে গৃহীত হয় নাই। ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের পর্ব্ব সংগ্রহাধ্যায়ের সহিত উদ্ধৃত তালিকার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কিন্তু তাহার সভাপর্ব্বে মন্ত্রণাপর্ব্বের পরিবর্ত্তে "লোকপাল সভাখ্যান পর্ব্ব" ও "রাজসূয়ারম্ভ পর্ব্ব" দৃষ্ট হয়। পর্ব্ব সংগ্রহে কিন্তু এ দুটির নাম নাই। প্রকৃত পক্ষে ও অন্যান্য সমস্ত মহাভারতে উক্ত পর্ব্বাধ্যায় দুটি সভাক্রিয়া ও মন্ত্রণা পর্ব্বের অন্তর্গত।

বন পর্ব্ব।—১অরণ্য যাত্রা পর্ব্ব। ২ কির্ম্মীর বধ পর্ব্ব। ৩ অর্জ্জুনাভিগমন পর্ব্ব। ৪ কৈরাত পর্ব্ব। ৫ ইন্দ্রলোকাভিগমন পর্ব্ব। ৬ নলোপাখ্যান পর্ব্ব। ৭ তীর্থ যাত্রা পর্ব্ব। ৮ জটাসুর বধ পর্ব্ব। ৯ যক্ষযুদ্ধ পর্ব্ব। ১০ নিবাত কবচ যুদ্ধ পর্ব্ব। ১১ আজগর পর্ব্ব। ১২ মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্ব। ১৩ দ্রৌপদী সত্যভামা সংবাদ পর্ব্ব। ১৪ ঘোষ যাত্রা পর্ব্ব। ১৫ মৃগ স্বপ্নোদ্ভব পর্ব্ব। ১৬ ব্রীহি দ্রৌণিকোপাখ্যান পর্ব্ব। ১৭ ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান পর্ব্ব। ১৮ দ্রৌপদী হরণ পর্ব্ব। ১৯ জয়দ্রথ বিমোক্ষণ পর্ব্ব। ২০ রামোপাখ্যান পর্ব্ব। ২১ পতিব্রতামাহাত্ম্য (সাবিত্রী উপাখ্যান) পর্ব্ব। ২২ কুণ্ডলাহরণ পর্ব্ব। ২৩ আরণেয় পর্ব্ব।

বর্দ্ধমান রাজবাটীর পণ্ডিতগণ "জটাসুরবধ পর্ব্বকে" "তীর্থযাত্রা পর্ব্বের" অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। মূলে কিন্তু স্পষ্টই আছে, "তীর্থযাত্রা ততঃ পর্ব্ব কুরুরাজস্য ধীমতঃ। জটাসুর বধঃ পর্ব্ব যক্ষযুদ্ধমতঃ পরং॥" এখানে "তীর্থযাত্রা পর্ব্ব" ও "জটাসুর বধ পর্ব্ব" দুইটি বিভিন্ন পর্ব্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বর্দ্ধমান রাজবাটীর পণ্ডিতগণ এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন, "তৎপরে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা পর্ব্ব, তাহাতেই জটাসুর বধ উক্ত হইয়াছে।" বলা বাহুল্য এই অনুবাদ ভ্রমপূর্ণ। রাজবাটীর অনুবাদকগণ

"মৃগ স্বপ্নোদ্ভব" ও "ব্রীহি দ্রৌনিক উপাখ্যান" ঘোষযাত্রা পর্ব্বের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। এবং "ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান" পর্ব্বের নাম অনুবাদে পরিত্যাগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মূলে এই তিনটি প্রকরণ পৃথক্ পৃথক্ পর্ব্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই রূপ আবার জয়দ্রথ বিমোক্ষণ, রামোপাখ্যান ও সাবিত্রী উপাখ্যান রাজবাটীর অনুবাদে দ্রৌপদী হরণ পর্ব্বের অন্তর্গত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ সেগুলি দ্রৌপদী হরণ পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নহে। অপরাপর অনুবাদকগণ আমাদের ন্যায় জটাসুর বধ, মৃগ স্বপ্নোদ্ভব, ব্রীহি দ্রৌনিকোপাখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান, জয়দ্রথ বিমোক্ষণ, সাবিত্রী উপাখ্যান ও রামোপাখ্যান—এই কয়টি প্রকরণ স্বতন্ত্র পর্ব্বরূপে গণনা ও অনুবাদ করিয়াছেন।

মুদ্রিত মহাভারতের বনপর্ব্বে দ্রৌপদী হরণ পর্ব্বের পূর্ব্বে ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান দৃষ্ট হইল না। অনেক অনুসন্ধানের পর, মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়ের এক স্থলে উহা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে দেখিলাম। তৎপরে বিস্তৃত পর্ব্ব সংগ্রহে দেখি, সেখানেও "ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান" মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বের অন্তর্গত,—দ্রৌপদী হরণ পর্ব্বের পূর্ব্বে উহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই (ক)। সংক্ষিপ্ত পর্ব্ব সংগ্রহ ও বিস্তৃত পর্ব্বসংগ্রহ এক সৌতির এক সময়ের উক্তি হইয়াও উহাতে কেন এরূপ বিরোধ দৃষ্ট হয়, বলিতে পারি না।

বিরাট পর্ব্ব।—১ পাণ্ডব প্রবেশ পর্ব্ব। ২ সময় পালন পর্ব্ব। ৩ কীচক বধ পর্ব্ব। ৪ গোগ্রহণ পর্ব্ব। ৫ বৈবাহিক পর্ব্ব।

উদ্যোগপর্ব্ব।—১ সেনোদ্যোগ পর্ব্ব। ২ সঞ্জয় যান পর্ব্ব। ৩ প্রজাগর পর্ব্ব। ৪ সনৎ সুজাত পর্ব্ব। ৫ যানসন্ধি পর্ব্ব। ৬ ভগবদ্ যান পর্ব্ব। ৭ মাতলীয় উপাখ্যান পর্ব্ব। ৮ গালব চরিত পর্ব্ব। ৯ "সাবিত্রী উপাখ্যান পর্ব্ব।" "১০ বামদেবোপাখ্যান পর্ব্ব।" "১১ বৈণ্যোপাখ্যান পর্ব্ব।" ১২ জামদগ্ন্যোপাখ্যান পর্ব্ব। "১৩ ষোড়শ রাজিক পর্ব্ব।" ১৪ সভাপ্রবেশ পর্ব্ব। ১৫ বিদুলা পুত্র শাসন পর্ব্ব। ১৬ সৈন্যোদ্যোগ পর্ব্ব। ১৭ "শ্বেতোপাখ্যান পর্ব্ব।" ১৮ বিবাদ পর্ব্ব। ১৯ সৈন্য নির্য্যাণ পর্ব্ব। ২০ রথাতিরথ সংখ্যান পর্ব্ব। ২১ উলূক দূতাগমন পর্ব্ব। ২২ অম্বোপাখ্যান পর্ব্ব।

মুদ্রিত মহাভারতের (বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদের) উদ্যোগ পর্ব্বে উদ্ধৃত চিহ্নস্থগত ৫টী পর্ব্ব দৃষ্ট হয় না। অন্য কোনও সংস্করণের মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে সেগুলি আছে কি না, সবিশেষ অবগত নহি। যদি না থাকে তবে কি ঐ কয়টি পর্ব্বাধ্যায় কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে? প্রতাপ বাবু, কালীসিংহ ও রাজকৃষ্ণ রায়ের অবলম্বিত মূলের সংক্ষিপ্ত পর্ব্ব সংগ্রহে ঐ সকলের উল্লেখ আছে; কিন্তু বিস্তৃত পর্ব্বসংগ্রহে আবার ঐ ছয়টি প্রকরণের কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না;—রাজবাটীর বিস্তৃত পর্ব্বসংগ্রহেও দৃষ্ট হয় না। তৎ পরিবর্ত্তে "দম্ভোদ্ভবোপাখ্যান"

(ক) এই প্রস্তাব লিখিত হওয়ার পর এই অংশের নীলকণ্ঠের টীকা আমার হস্তগত হয়। তাহাতে দেখ, লিখিত আছে,—"ইন্দ্রদ্যুম্নমিত্যত্র ক্রমোন বিবক্ষিতঃ সংখ্যায়াং তাৎপর্য্যাৎ, সমস্যান্তর্গতং বেদঃ পর্ব্ব।" ৫৫ শ্লোকের নীলকণ্ঠটীকা।

নামক একটি উপাখ্যান বিস্তৃত পর্ব্বসংগ্রহে ও উদ্যোগ পর্ব্বে দৃষ্ট হয়। এই উপাখ্যান জামদগ্ন্য পরশুরামপ্রোক্ত। ইহাই কি সংক্ষিপ্ত পর্ব্বসংগ্রহোক্ত "জামদগ্ন্যোপাখ্যান" ?

৺রাজকৃষ্ণ রায় ও কালী প্রসন্ন সিংহের বঙ্গানুবাদের সংক্ষিপ্ত পর্ব্বসংগ্রহে শ্বেতোপাখ্যানের পর "মন্ত্রমূল কার্য্য চিন্তন" "সেনাপতি নিয়োগাখ্যান" ও "শ্বেত বাসুদেব সংবাদ" এই তিনটি পর্ব্বাধ্যায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিস্তৃত পর্ব্বসংগ্রহে সেগুলির অভাব। ষোড়শ রাজিকোপাখ্যান বহু অনুসন্ধানের পর শান্তি পর্ব্বের এক স্থলে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাইলাম। কিন্তু পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ের কোনও স্থলেই ইহাকে শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত বলা হয় নাই।

বোম্বাই সংস্করণের পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে শ্বেতোপাখ্যানের পরিবর্ত্তে "বিশ্বোপাখ্যান পর্ব্বাধ্যায়ের" উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ভীষ্ম পর্ব্ব।—১ ভীষ্মাভিষেচন পর্ব্ব। ২ জম্বুদ্বীপ নির্ম্মাণ পর্ব্ব। ৩ ভূমিপর্ব্ব। ৪ ভগবদ্গীতাপর্ব্ব। ৫ ভীষ্মবধ পর্ব্ব।

দ্রোণপর্ব্ব।—১ দ্রোণাভিষেক পর্ব্ব। ২ সংসপ্তক পর্ব্ব। ৩ অভিমন্যু বধ পর্ব্ব। ৪ প্রতিজ্ঞা পর্ব্ব। ৫ জয়দ্রথ বধ পর্ব্ব। ৬ ঘটোৎকচ বধ পর্ব্ব। ৭ দ্রোণ বধ পর্ব্ব। ৮ নারায়নাস্ত্র মোক্ষণ পর্ব্ব।

১ কর্ণ পর্ব্ব।

শল্য পর্ব্ব।—১ শল্য বধ পর্ব্ব। ২ হ্রদ প্রবেশন পর্ব্ব। ৩ গদাযুদ্ধ পর্ব্ব। ৪ সারস্বত তীর্থ বংশানুকীর্ত্তন পর্ব্ব।

মূলে আছে,—"সারস্বতং ততঃ পর্ব্ব তীর্থ বংশানুকীর্ত্তনং।" প্রতাপ বাবুর অনুবাদ এই, Then comes *Saraswata* and then descriptions of holy shrines, and then geneologics." (PP. 25.) এখানে "তীর্থ বংশানুকীর্ত্তন" মানে কি "তীর্থ বিবরণ ও বংশতালিকা কথন" ? বিস্তৃত পর্ব্বসংগ্রহে ও মূল গ্রন্থেও (শল্য পর্ব্বে) যখন বংশানুকীর্ত্তণের প্রসঙ্গ মাত্র দেখা যায় না, তখন "তীর্থ বংশানুকীর্ত্তন" "তীর্থ সমূহের ইতিহাস কথন" হওয়া উচিত।

সৌপ্তিক পর্ব্ব।—১ সৌপ্তিক পর্ব্ব। ২ ঐষীক পর্ব্ব।

স্ত্রীপর্ব্ব।—১ জল প্রাদানিক পর্ব্ব। ২ স্ত্রী বিলাপ পর্ব্ব। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, "জল প্রাদানিকে এবংস্ত্রীবিলাপনং।" ৩ শ্রাদ্ধ পর্ব্ব।

শান্তি পর্ব্ব।—১ চার্ব্বাক বধ পর্ব্ব। ২ আভিষেচনিক পর্ব্ব। ৩ গৃহ প্রবিভাগ পর্ব্ব। ৪ শান্তি পর্ব্ব (যাহাতে রাজধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে)। ৫ আপদ্ ধর্ম্ম। ৬ মোক্ষধর্ম্ম। ৭ শুক প্রশ্নাভিগমন পর্ব্ব। ৮ ব্রহ্ম প্রশ্নানুশাসন পর্ব্ব। ৯ দুর্ব্বাসা প্রাদুর্ভাব ও মায়াসংবাদ পর্ব্ব।

শান্তি পর্ব্বের ৩৮শ অধ্যায়ে চার্ব্বাক বধ কীর্ত্তিত হইয়াছে ও সেইখানে চার্ব্বাকবধ পর্ব্বের প্রারম্ভ। তাহা হইলে শান্তি পর্ব্বের প্রথম ৩৭টি অধ্যায় কোন্ পর্ব্বাধ্যায়ের অন্তর্গত ? বিস্তৃত পর্ব্ব সংগ্রহে চার্ব্বাক বধ, আভিষেচনিক, শুক প্রশ্নাভিগমন, ব্রহ্ম প্রশ্নানুশাসন ও দুর্ব্বাসা প্রাদুর্ভাবাদির উল্লেখ নাই। "দুর্ব্বাসা প্রাদুর্ভাব পর্ব্ব" শান্তিপর্ব্বে দৃষ্ট হয় না। বহু অনুসন্ধানের পর অনুশাসন পর্ব্বের শেষভাগে দুর্ব্বাসার প্রভাব সম্বন্ধীয় একটি উপাখ্যান শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে দেখিলাম। উহাই কি দুর্ব্বাসা প্রাদুভাব পর্ব্ব ? কিন্তু উহাতে মায়া সংবাদ দৃষ্ট হয় না।

অনুশাসনপর্ব্ব।—১ অনুশাসনপর্ব্ব। ২ ভীষ্ম স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

অশ্বমেধপর্ব্ব।—১ আশ্বমেধিকপর্ব্ব। ২ অনুগীতাপর্ব্ব।

৬ বঙ্কিম বাবু বলেন, পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা পর্ব্বাধ্যায়ের নামোল্লেখ নাই। আমরা কিন্তু অনুগীতার উল্লেখ সকল সংস্করণের মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়েই পাইয়াছি।

আশ্রমবাসিকপর্ব্ব।—১ আশ্রমবাসিকপর্ব্ব। ২ পুত্রদর্শনপর্ব্ব। ৩ নারদাগমনপর্ব্ব।

১ মৌষলপর্ব্ব।

১ মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব।

১ স্বর্গারোহণিকপর্ব্ব।

(প্রতাপচন্দ্র রায়ের প্রকাশিত মহাভারতের দ্বিতীয় অধ্যায় অবলম্বনে উপরিলিখিত তালিকা প্রস্তুত হইল।)

ইহার পর "হরিবংশপর্ব্ব, বিষ্ণুপর্ব্ব ও ভবিষ্যৎপর্ব্ব" এই পর্ব্বাধ্যায়ত্রয়ের নামোল্লেখ করিয়া সৌতি বলিতেছেন,—

"এতৎ পর্ব্বশতং পূর্ণং ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা।" কিন্তু পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় কথিত নামাবলীর সমষ্টি করিলে ১২০ হয়। ব্যাসপ্রোক্ত শত পর্ব্বের উপর এই ২০টি অধিকপর্ব্ব কোথা হইতে আসিল, জানা যায় না। যে পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় অবলম্বনে এই তালিকা প্রস্তুত হইল, প্রতাপ বাবুর প্রকাশিত সংস্করণে উহা ৩৮৪ শ্লোকবিশিষ্ট, কিন্তু বোম্বাই সংস্করণের মহাভারতের আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে ৩৯৬ শ্লোক বিদ্যমান রহিয়াছে দেখা যায়। এইরূপ গরমিল আরও অনেক বিষয়ে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়।

এইখানে আমরা মহাভারতের ২য় অধ্যায়ের সমালোচনা শেষ করিলাম। ইহার পর মহাভারত বর্ণিত মূল ঘটনা ও অপরাপর বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা মহাভারতের টীকাকারগণের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। পূর্ব্বে মহাভারতের অনেকগুলি টীকা ছিল; তন্মধ্যে এখন একমাত্র নীলকণ্ঠের টীকাই সুপ্রাপ্য। তাঁহার টীকার নাম "ভারতভাবদীপ"। নীলকণ্ঠ সমগ্র মহাভারতের টীকা করেন নাই, কেবল জটিল শ্লোকগুলিরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

উত্তানার্থং কোষমাত্রপ্রমাণং পদেঃনৈবাশ্রিতং।
গম্ভীরেষু ন সেতবো ন বিহিতাঃ টীকান
শ্লোকচিতা ॥
ন চ্ছিন্না ন তমশ্চ নানন হরিভক্তা ন নাম্নাদিতা।
নো দানাশ্চ ন বিভাষণা ন বিহিতাঃ প্রাজ্ঞৈশ্চ প্রণায্য
শ্রিতৈঃ ॥

মহাভারতের পরিশিষ্ট স্বরূপ হরিবংশের টীকার উপসংহারে নীলকণ্ঠ যেরূপ ভাবে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, গোদাবরী তীরস্থিত "কর্পূরগ্রামে" (বর্ত্তমান নাম 'কোপরগাঁও') গোতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার উপাধি "চতুর্ধর" (চৌধুরী) ছিল। তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দ ও মাতার নাম অম্বাদেবী। শিব, কৃষ্ণ, ত্র্যম্বক নামে, তাঁহার তিনটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। নীলকণ্ঠ বারাণসীতে অবস্থানকালে মহাভারতের টীকা রচনা করেন। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের টীকার প্রারম্ভে আরও একটু পরিচয় পাওয়া যায় যথা,—

বেদান্তে লক্ষ্মণাচার্য্যং স্তুতিনিধিবিবরে তীর্থ নারায়ণার্য্যং। তর্কে শ্রীবেশমিশ্রান্ ফণিপতি ভণিতৌ গোপাল গঙ্গাধরার্য্যং। বেদে সাঙ্গে পিতৃব্যং শিবমথ পিতরং দক্ষিণামূর্ত্তিপাদং। শ্রৌতে চিন্তামণিং সংশরণমুপগতো ভূমি গোপালদেবং। ইত্যাদি।

ইহাতে জানা গেল, নীলকণ্ঠ চতুর্ধর—লক্ষ্মণ, নারায়ণ, শ্রীবেশ, গঙ্গাধর গোপাল, পিতৃব্য শিব, পিতা গোবিন্দ, চিন্তামণি ও গোপালদেব এই অষ্ট গুরুর নিকট আটটি বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। স্বীয় টীকার উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—

টীকান্তরাণীন্দ্রমণীদৃশানি
বাক্যার্থমাত্রাণি প্রকাশয়ন্তু।
অর্থনিগূঢ়ার্থচয়প্রকাশে,
দীপক্ষমো ভারতভাবদীপঃ ॥'

মহাভারতের অর্জ্জুনমিশ্রকৃত টীকার সকল অংশ এখন আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বহু পরিশ্রমে অর্জ্জুনমিশ্রকৃত টীকার ৪টি মাত্র পর্ব্ব সংগ্রহ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পদ্মানন্দ নামক জনৈক পণ্ডিত সমগ্র মহাভারতের টীকা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তৎকৃত টীকার দুইটি পর্ব্ব (আদি ও কর্ণপর্ব্ব) ব্যতীত অপরাপর অংশ এখন আর পাওয়া যায় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের একটী প্রধান ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকরণ। বিভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ ইহার বিবিধ ভাষ্য টীকা ও টীকার টীকা রচনা করিয়াছেন। সেই সমস্ত ভাষ্য ও টীকার সংখ্যা ১২৫এর অপেক্ষা ন্যূন নহে। উদ্যোগপর্ব্বের অন্তর্গত "সনৎসুজাতীয়" প্রকরণেরও বিবিধ টীকা দৃষ্ট হয়। সেইরূপ শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় ও তাহার বিশেষ বিশেষ অংশের অনেকগুলি করিয়া টীকা রচিত হইয়াছে।

ফলতঃ, সমগ্র মহাভারতের তিনটি ভিন্ন অপর কোনও টীকার বিষয় আমরা এপর্য্যন্ত অবগত নহি। এই তিনটির মধ্যে একটি (নীলকণ্ঠ প্রণীত টীকাটি) সর্ব্বত্র সুপ্রচার। অপর (অর্জ্জুনমিশ্র ও পদ্মানন্দ পণ্ডিত কৃত) দুইটির কিয়দংশমাত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অপরাংশ এখনও বিলুপ্তপ্রায়।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র।

অসি।

এই অস্ত্রটী সর্ব্বদেশ সাধারণ এবং ইহার প্রচার ও ব্যবহার অদ্যাপি সমভাবে বর্ত্তমান আছে। প্রাচীন জনশ্রুতি ও ধনুর্ব্বেদের লিপি পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, পূর্ব্বকালে যেরূপ তীক্ষ্ণধার অসি উৎপন্ন হইত—এখন আর সেইরূপ শক্তিসম্পন্ন তীক্ষ্ণ অসি কোন শিল্পীই প্রস্তুত করিতে পারে না। শুনা গিয়াছে এবং ধনুর্ব্বেদেও লিখিত আছে যে, অসির আঘাতে প্রস্তর স্তম্ভও কর্ত্তিত হয়। পাথরে আঘাত করিলেও ধার থাকে ভাঙ্গিয়া যায় না এরূপ অসি আর এখন নাই। কেন নাই? তাহা জানি না। এ সকল কথা যেরূপ হয় হউক, পরন্তু পূর্ব্বকালে কত প্রকার অসি ছিল, কিরূপ লোহায় কোন্ প্রদেশে প্রস্তুত হইত, কিরূপ পায়ন অর্থাৎ পান্ দিয়া তাহার ধার বাঁধা হইত এবং কিরূপ কৌশলেই বা তাহারা ব্যবহৃত হইত, অদ্য আমরা এই সকল বৃত্তান্ত বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়া পাঠকগণের অক্ষি সমক্ষে অর্পণ করিব। যদিও এরূপ প্রস্তাবে কিছু শিক্ষিতব্য থাকে না—তথাপি ইহাদ্বারা কুতূহল বৃদ্ধি ও পূর্ব্বপুরুষদিগের মহিমা অনুভূত হইতে পারে তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

এই অস্ত্র অতি পুরাতন। অতি পূর্ব্বকালে ইহার আটটী মাত্র নাম ছিল। যথা—অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণধর্ম্মা, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্ম্মপাল বা ধর্ম্মমাল। অনন্তর ইহার আরও কএকটী নাম বৃদ্ধি হইয়াছিল। যথা—নিস্ত্রিংশ, চন্দ্রহাস, রিষ্টি, কৌক্ষেয়ক, মণ্ডলাগ্র, করপাল, করবাল, তরবার ও তরবারি। ছোট বড় ও গঠনের তারতম্য অনুসারে ইহার আরও দুই চারিটী নামে আছে সে সকল ক্রমে ব্যক্ত হইবে।

ধনুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অসিসম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা লিখিত আছে। তাহাহইতে প্রথমে আমরা লৌহ-পরীক্ষাটী বিবৃত করিব। অগ্রে লৌহ-পরীক্ষা, পশ্চাৎ দোষগুণের পরীক্ষা করাই উচিত।

অসির উপযুক্ত লৌহ প্রথমতঃ বিবিধ। নিরলি ও সালি। প্রথমোক্ত নিরলি লৌহ আবার অনেকবিধ। সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত লৌহকে কাঙ্কী প্রভৃতি নামদ্বারা ব্যক্ত করা হয়। সেই সকল লৌহই অসিনির্ম্মাণের উপযুক্ত এবং বিবিধ ব্যাধির বিনাশক। যথা—

"লৌহানাং লক্ষণং বক্ষ্যে যথোক্তং মুনিপুঙ্গবৈঃ।
নিরঙ্গ সাঙ্গভেদেন তে লৌহো বিবিধা মতাঃ॥
নিরঙ্গাঃ কাঙ্কিপাণ্ড্যাদি ভেদাৎ বহুবিধা মতাঃ।
অসিকর্ম্মসু তেনাস্তা নানাব্যাধিবিনাশনাঃ॥"

বীরচিন্তামণি।

খড়্গ ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র প্রায়শঃই সাঙ্গ লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হয়, এজন্য সেই সঙ্গে লৌহের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও চিহ্ন সকল ব্যক্ত করাই কর্ত্তব্য। বীর

চিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি নামক গ্রন্থে এতদনুরূপ একটী বচন আছে তাহা এই—

"বক্ষ্যন্তে প্রায়শো যস্মাৎ সাঙ্গাঃ খড়্গাদিকর্ম্মসু।
নামভেদেন চিহ্নানি লৌহানামভিদগ্মহে॥"

খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্রের উপাদান প্রধান প্রধান সাঙ্গ লৌহের নাম দশটী। যথা রোহিণী, নীলপিণ্ড, ময়ূরগ্রৈবক্, ময়ূর-বজ্র, তিত্তিরাঙ্গ, সুবর্ণবজ্র, শৈবলমালান, মৌবলবজ্র, কঙ্কোলবজ্র বা স্বর্ণক ও গ্রন্থিবজ্র এতদ্ভিন্ন আরও কএক প্রকার লৌহ আছে তাহা সামান্য বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে। এ সকলের লক্ষণ বা চিহ্ন উক্ত গ্রন্থে অতি বিস্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। যথা—

রোহিণী।

"ক্ষুদ্রাঙ্গং সুদৃঢ়ং যস্য নীলমীষৎ প্রতীয়তে।
রোহিণীং তাং বিজানীয়াৎ তৎক্ষতে বহুবেদনা॥"

যাহার অবয়ব ক্ষুদ্র (কুন্দুই বা ক্ষুদ্র কাঁকরের ন্যায় আকার বিশিষ্ট) নীলবর্ণ দেখাইবে তাহাকে রোহিণী বলিয়া জানিবে। এই রোহিণী লৌহদ্বারা ক্ষত হইলে ক্ষত স্থানে অত্যন্ত বেদনা জন্মে।

নীলপণ্ড।

"নীলপিণ্ডসমাঙ্গঞ্চ নীলপিণ্ডং বিদুর্ব্বুধাঃ॥"

যাহা নীলপিণ্ড অর্থাৎ নীলবড়ীর ন্যায় তাহা নীলপিণ্ড বলিয়া জানিবে।

ময়ূরগ্রৈবক।

"ময়ূরকণ্ঠসংস্থানমঙ্গং যস্য প্রতীতয়ে।
ময়ূরগ্রৈবকং লোহং তং বিদুর্মুনিপুঙ্গবাঃ॥"

যাহার অবয়ব ময়ূরের কণ্ঠ তুল্য—তাদৃশ লৌহকে মুনিগণ ময়ূরগ্রৈবক বলিয়া থাকেন।

ময়ূরবজ্রক।

"নাগকেশরপুষ্পাভমঙ্গং যস্য প্রতীয়তে।
ময়ূরবজ্রকং প্রাহুর্লৌহশাস্ত্রবিদো জনাঃ॥"

যাহার অঙ্গে নাগকেশর ফুলের আভা দৃষ্ট হয়—লৌহ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে ময়ূরবজ্র নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

তিত্তিরাঙ্গ।

"যস্মিংস্তিত্তিরপক্ষাভমঙ্গং লৌহে প্রতীয়তে।
দুর্লভং তম্মহামূল্যং তিত্তিরাঙ্গং সুপাকজম্॥"

যে লৌহের অঙ্গ তিত্তির পাখীর পক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হয়—সেই লৌহই তিত্তিরাদি নামে বিখ্যাত। এই তিত্তিরাদি লৌহ অতি দুর্লভ ও অতি মূল্যবান্ এবং ইহা অতি সুপাকজাত অর্থাৎ সুধাতু লৌহ। এই সুধাতু লৌহদ্বারা যে কোন অস্ত্র নির্ম্মিত হয় সমস্তই উত্তম ও গুণবান্।

সুবর্ণবজ্রক।

"সুবর্ণসদৃশাকারাস্ত্বঙ্গভূমিঃ প্রতীয়তে।
সুবর্ণবজ্রকং বিদ্যাৎ বহুমূল্যং মহাগুণম্॥"

যাহার অঙ্গে সুবর্ণাকার চিহ্ন প্রতীত হয়—সেই লৌহকে সুবর্ণবজ্র বলিয়া জানিবে। এই সুবর্ণবজ্র নামক লৌহও বহুমূল্য ও গুণবান্।

শৈবলমালান।

"অবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মাঙ্গং দূর্ব্বাভাঙ্গমপাকজম্।
যস্মিন্ শৈবলমালানমাহুস্তং মুনিপুঙ্গবাঃ॥"

মুনিগণ বলিয়াছেন যে, যে লৌহে অবিচ্ছিন্ন সুসূক্ষ্ম অঙ্গ (আঁস্) থাকে এবং উহার আভা যদি দুর্ব্বাদলের ন্যায় হয়, তবে তাহাকে শৈবলমালান আখ্যা প্রদান করিবেক।

মৌষলবজ্র।

"শুক্লং পার্শ্বদ্বয়ং যস্য মধ্যো স্বর্ণমযাঙ্ককম্।
ধূম্রবৎসীমসংস্থানং মৌষলং বজ্রকং বিদুঃ॥"

যাহার পার্শ্বদ্বয়ে শ্বেতাভা স্ফুরিত হয়, মধ্যে স্বর্ণরেখা দৃষ্ট হয়, সংহত করিলে সংঘাত স্থান ধূম্রবর্ণ হয়, তাদৃশ লৌহকে মৌষলবজ্রক বলিয়া জানিবে।

কঙ্কোলবজ্র বা স্বর্ণক।

"মৃণালনামপ্রতিমঃ বিবরৈবগ্রসংস্থিতৈঃ।
কঙ্কোলবজ্রকং প্রাহুঃ স্বর্ণকং লোহচিন্তকাঃ॥"

লৌহতত্ত্ব-অনুসন্ধানীরা বলিয়া থাকেন যে, যাহাকে ভাঙ্গিলে তদগ্রভাগে মৃণালের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রসকল দেখা যায়— তাহাকে কঙ্কোলবজ্রক অথবা স্বর্ণক বলিয়া জানিবে।

গ্রন্থিবজ্র।

"অঙ্গং প্রতীয়তে যত্র বহুগ্রন্থিসমন্বিতম।
দুর্লভং তন্মহামোল্যং গ্রন্থিবজ্রকমুচ্যতে॥"

যাহার সর্ব্বাঙ্গে গ্রন্থিল অর্থাৎ যাহার অনেকস্থানে গাইট্ আছে বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহার নাম গ্রন্থিবজ্র। এই গ্রন্থিবজ্র লৌহও দুর্লভ ও মহামূল্য।

এতদ্ভিন্ন নিরঙ্গ লৌহও অনেকপ্রকার আছে। তাহাদের নাম ও চিহ্ন সকল লোহার্ণব গ্রন্থে বিবৃত আছে। রোহিণী, পাণ্ডা ও কৃষ্ণ এই তিন প্রকার মাত্র নিরঙ্গ লৌহ অস্ত্রের উপযুক্ত। কৃষ্ণ বা কান্তলোহ নিরঙ্গ মধ্যপাতী। আজকাল ইংলিশ লৌহে দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে। তজ্জন্য আর সেই কষ্টসংগ্রহ ও বহুমূল্য দেশী লৌহ কেহ আহরণ করেন না। এমন কি এ দেশীয় লোকেরা প্রায় দেশী লৌহের স্বরূপ, চিহ্ন, গুণাগুণ সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে লৌহের আকর আছে কি না তাহাও কেহ জ্ঞাত নহেন, বা অনুসন্ধান করেন না।—করিবারও প্রয়োজন নাই। কারণ, এখন কেবল অলাবুচ্ছেদনের উপযুক্ত বঁটি নির্ম্মাণের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র লৌহের প্রয়োজন হয় পরন্তু তাহা অল্প মূল্যের মৃৎকল্প ইংলিশ লৌহদ্বারাই সুসম্পন্ন হইতে পারে। পূর্ব্বে এদেশে ইংলিশ লৌহের আমদানি ছিল না এবং মেষ, মহিষ, হয়, হস্তী, বা কাষ্ঠযষ্টি, লৌহযষ্টি, ও অস্থিযষ্টি প্রভৃতি বৃহৎ ও সারবান্ বস্তুচ্ছেদনের উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন ছিল, সুতরাং তদুপযুক্ত লৌহেরও প্রয়োজন হইত। প্রয়োজন বুঝিয়া কৃপাণী পরীক্ষক পুরুষেরাও দেশে দেশে এবং ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া লৌহের অনুসন্ধান সংগ্রহ ও পরীক্ষা করিতেন। এখন আর কিছুই করিতে হয় না, চারি পয়সা ফেলিয়া দিলেই দিব্য একখানি প্রস্তুত বঁটি পাওয়া যায়। ফল, এ সকল প্রসঙ্গগত কথার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে প্রকৃত কথায় মনোনিবেশ করুন।

উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্ত কোন এক লৌহদ্বারা অসি নির্ম্মাণ করিবে। অসিনির্ম্মাতার যদি নৈপুণ্য না থাকে তবে উত্তম লৌহ পাইলেও তিনি উত্তম অসি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবেন না। কোন্ লৌহকে কিরূপ প্রকারে ও কত বার পোড় দিয়া পিটিতে হয়, তাহা জানা আবশ্যক। পরন্তু পায়ন অর্থাৎ পানের গুণেই তাহার ধার তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় হয়; এজন্য শিল্পীকে অগ্রে অস্ত্রের পায়নকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ হইতে হয়। পায়ন-কার্য্যটা যদি উত্তম বা

সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তবেই অস্ত্রের উত্তমতা জন্মে—নচেৎ সমস্তই বিফল। পায়নকার্য্যের পাকটী লিপিদ্বারা শিক্ষা করা যায় না। উহা প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্বহস্তে তৎকার্য্য সাধন—এই প্রক্রিয়া-দ্বারাই শিখা যায়। অন্য কোন প্রকারে শিক্ষা করা যায় না। তথাপি পণ্ডিতেরা পায়নের দ্রব্য ও প্রক্রিয়াগুলি যথাসাধ্য লিখিতে ত্রুটী করেন নাই। বৃহৎসংহিতা-প্রোক্ত অসির পায়নবিধিটী এস্থলে পাঠকবর্গের সুগোচরার্থ উদ্ধৃত করিলাম।

পায়ন অর্থাৎ পাইন্ (পান) দিবার বিধি।

অসি প্রস্তুত হইলে উহা পরিষ্কৃত করিয়া ধারের মধ্যে লবণ কি অন্য কোন ক্ষার, মৃত্তিকা দ্রবে মিশ্রিত করণপূর্ব্বক প্রলেপ দিয়া, সেই প্রলিপ্ত ধারটী অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া পশ্চাৎ উহাকে জল, কি অন্যান্য দ্রব দ্রব্য পান করানকে পায়ন বলে। দগ্ধ করিয়া জল কি অন্য কোন তরল দ্রব্যে নিক্ষেপ করিলেই তাহা পান করান হয়। অসিকে যে যে দ্রব্য পান করাইলে উত্তম হয়, মহর্ষি উশনা অর্থাৎ অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য তাহা বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"ইদমৌশনক্ষ শস্ত্রপানং
রুধিরেণ-শ্রিয়মিচ্ছতঃ প্রদীপ্তাম্।
হবিষা গুণবৎসুতাভিলিপ্সোঃ
সলিলেনাক্ষয়মিচ্ছতশ্চ বিত্তম্॥
বড়বোষ্ট্রকরেণুদুগ্ধপানং
যদি পাপেন সমীহতেঽর্থসিদ্ধিম্।
ঋষপিত্তমৃগাশ্ববস্তদুগ্ধৈঃ
করিহস্তচ্ছিদয়ে সতালগর্ভৈঃ॥
আর্কং পয়ো হুড়বিষাণমষীসমেতম্
পারাবতাখুশকৃতা চ যুতং প্রলেপঃ।
শস্ত্রস্য তৈলমথিতস্য ততোঽস্য পানম্
পশ্চাচ্ছিতস্য ন শিলাসু ভবেদ্বিঘাতঃ॥
ক্ষারে কদল্যা মথিতেন যুক্তে
দিনোষিতে পায়িতমায়সং যৎ।
সম্যক্ শিতং চাশ্মনি নৈতি ভঙ্গং
ন চান্য লৌহেষ্বপি তস্য কৌণ্ঠ্যম্॥"

অর্থ এই যে, যিনি শ্রীবৃদ্ধি ইচ্ছা করেন, তিনি শস্ত্রকে রুধির পান করাইবেন। অর্থাৎ শস্ত্রের ধার দগ্ধ করিয়া রুধিরে নিক্ষেপ করিবেন। (১) আর যিনি গুণবান্ পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছুক, তিনি শস্ত্রে ঘৃত পান দিবেন। (২) এবং যিনি অক্ষয় ধন কামনা করেন, অসিকে তিনি জল পান করাইবেন। (৩) এইরূপ, প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত অসিকে ঘোটকীর দুগ্ধ, উষ্ট্রের দুগ্ধ, হস্তিনীর দুগ্ধও পান করাইবেন। (৪।৫।৬) আর যদি হস্তীর শুণ্ড কাটিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি অস্ত্রকে মৎস্যের পিত্ত, মৃগীর দুগ্ধ, কুক্কুরের দুগ্ধ, ছাগীর দুগ্ধ পান করাইবেন। (জনশ্রুতি আছে যে, মহারাণা প্রতাপসিংহের নাকি এতদ্রূপ তরবারি ছিল)। (৭।৮।৯।১০) আকন্দের আঠা, হুড় বিষাণ (?), কয়লা, পারাবত ও ইন্দুরের বিষ্ঠা একত্রিত ও মর্দ্দিত করিয়া তৈলমথিত শস্ত্রের ধারে প্রলেপ দিবেক। অনন্তর উহাকে পূর্ব্বোক্ত কোন দ্রব্য পান করাইবেক। পরে উহাকে সুশাণিত করিবেক। এইরূপ করিলে সে অস্ত্র প্রস্তরেও কুণ্ঠিত হইবে না। অর্থাৎ পাথরে চোট মারিলে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবেক, ভাঙ্গিয়া যাইবে না। (১১) অপিচ অস্ত্র কদলীক্ষারে ম্রক্ষিত করিয়া এক দিন ও এক রাত্রি

রাখিবেক। পশ্চাৎ উহাতে পান দিয়া উত্তমরূপে শাণিত করিবেক। এরূপ করিলেও সে অস্ত্র প্রস্তরে ভাঙ্গিবে না এবং অন্য লৌহতে কুণ্ঠিত হইবে না। (১২)।

এইরূপ আরও অনেক প্রকার পায়ন বিধি আছে। পরন্তু সে সকল—তীরের ফলার জন্য বিহিত। বিষ কিংবা বিষবৎ দ্রব্য পান করাইলে অস্ত্র অতি ভীষণাকার ধারণ করে। বিষপায়িত অস্ত্রদ্বারা অত্যল্প রক্তপাত ঘটনা হইলেই উহা প্রাণ-সংহারক হইয়া উঠে।

অস্ত্রে পান্ দিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গন্ধ বহির্গত হয়। সেই সকল গন্ধ-দ্বারা অস্ত্রের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জানা যায় বলিয়া বর্ণিত আছে এবং পানের সময় অস্ত্রকে যে দগ্ধ করিতে হয়—তৎকালের যে বর্ণ বা রঙ্ হয়—তাহা দেখিয়াও তাহার ভবিষ্যৎ শুভাশুভ অনুমিত হয়। যথা—

"করবীরোৎপলগজমদ
ঘৃতকুঙ্কুমকুন্দচম্পকসগন্ধঃ।
শুভদো হি নিস্ত্রিংশো গোমূত্র
পঙ্কমেদঃ সদৃশগন্ধঃ॥
কূর্ম্মবসাসৃককল্পেরাগন্ধশ্চ
ভয়দুঃখপ্রদো ভবতি গন্ধঃ।
বৈদূর্য্যকনকবিদ্যুৎপ্রভো
জয়ারোগ্যবৃদ্ধিকরঃ॥"

করবীর, উৎপল, হস্তিমদ, ঘৃত, কুঙ্কুম, কুঁদফুল, ও চাঁপা ফুলের ন্যায় গন্ধ নির্গত হইলে জানিবে যে, সে অস্ত্র শুভ হইবে। আর যদি গোমূত্র পঙ্ক-ঘটিত, কূর্ম্ম, বসা, রক্ত কিংবা ক্ষারতুল্য কোন গন্ধ উত্থিত হয়, তবে জানিবে যে, সে অস্ত্র অশুভ। দাহকালে যদি বৈদূর্য্য, কনক, কি বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা বহির্গত হয় তাহা হইলে সে অস্ত্র জয় ও আরোগ্য বৃদ্ধি করিবে, নচেৎ অশুভ বৃদ্ধি করিবে। এসকল কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা নির্ণয় করিবার সাধ্য নাই, পরন্তু প্রাচীনদিগের মতামত বর্ণন করিবার জন্যই এসকল সঙ্কলন করিলাম। অপিচ অসি সম্বন্ধে আরও কএক লক্ষণানুযায়ী নাম আছে তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

১ ধবলগিরি।

"কর্পূরস্ফটিকসমা ছবিরঙ্গে শ্বেতা যস্যাসেঃ।
তং ধবলগিরিং পাণ্ড্যা পণ্ডিতাঃ প্রবদন্তি হি॥"

পাণ্ড্য লৌহজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, যাহার দেহ কর্পূর ন্যায় ও অবয়ব শুভ্র তাহা পাণ্ড্যোক্ত সমুদ্ভব এবং তাহার নাম ধবলগিরি।

২ কালগিরি।

"তনৌ যস্যাসি কালা সৌবর্ণাঙ্গাসিপত্রিকা।
প্রাহুঃ কালগিরিং পাণ্ড্য লোহশাস্ত্রবিশারদা॥"

যাহার অঙ্গে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্বর্ণাকার অথবা কৃষ্ণাভাযুক্ত পত্রাঙ্গাকার চিহ্ন দেখা যায়, তাহার নাম কালগিরি; ইহা লৌহশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন।

৩ কজ্জলগাত্র।

"ধারা শুভ্রা ভবেৎ যস্য মধ্যং কজ্জলসন্নিভম্।
সর্ব্বাঙ্গে শ্যামলং গাত্রং বিদ্যাৎ কজ্জলগাত্রকম্॥"

যাহার ধার শুভ্রবর্ণ, মধ্যে কজ্জলবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে কালদাগ,—তাহাকে কজ্জলগাত্র বলিয়া জানিবে।

৪ কুটারক।

"কৃষ্ণং রজতপত্রাভমঙ্গং কৃষ্ণাসিপত্রিকা।
কুটারকঃ সমাখ্যাতো তৎক্ষতে প্রথম্ভবেৎ॥"

যাহার অঙ্গে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রজতপত্রের চিহ্ন থাকে—অথচ কৃষ্ণবর্ণ—এতাদৃশ অসিপত্রিকাকে কুটীবক বলে। এই কুটীবক অসিদ্বারা ক্ষত হইলে শরীরে শ্বয়থু অর্থাৎ শোথ জন্মে।

৫ কেতকীবজ্র।

"কেতকীপত্রসদৃশমঙ্গং যস্য প্রতীয়তে।
বিদ্যাৎ কেতকবজ্রং তং————————॥"

যদঙ্গে কেতকী পত্রাকার চিহ্ন থাকে সে অসির নাম কেতকবজ্র।

৬ কাম্বিরৌহ বা নিরঙ্গ।

"নিরঙ্গং [illegible] যৎ।
[illegible] তন্মহামূল্যং কাম্বিরৌহং প্রকীর্তিতম্॥"

যাহা কাম্বিরৌহদ্বারা নির্ম্মিত ও যদঙ্গে বোঁপা পত্রাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং বর্ণ অগ্নি নীল—এরূপ অসি [illegible] ও মহামূল্য।

৭ দমনবজ্র।

"যস্য দমনপত্রাভমঙ্গে যস্মিন্ প্রতীয়তে।
বিদ্যাদ্দমনবজ্রন্তু তীক্ষধারং মহাগুণম্॥"

যাহার অঙ্গে দমন পত্র—অর্থাৎ দোনা নামক বৃক্ষের কিংবা কুন্দ বৃক্ষের পত্রাকার চিহ্ন জন্মে—তাহার নাম দমনবজ্র। এই দমনবজ্র অসি প্রায়ই তীক্ষ্ণধার ও মহাগুণশালী হয়।

৮ কাল-খড়্গ।

"[illegible]স্বর্ণাভমাভং বজ্রাঙ্কসংযুতম্।
ডাকিনীবজ্রকং বিদ্যাৎ কালসংজ্ঞমথাপরং॥"

যাহার ক্ষেত্র কাল, পরন্তু উহার আভা যদি স্বর্ণ বর্ণ হয়, আর যদি তাহাতে অগ্ন বজ্র চিহ্ন থাকে, তবে তাহাকে ডাকিনীবজ্র বলিয়া জানিবে। কেহ বলেন, এতদ্রূপ লক্ষণাক্রান্ত খড়্গের নাম কালখড়্গ।

৯ নকুলাঙ্গ।

"ঊর্দ্ধগং কপিলাভাসমঙ্গং যস্মিন্ প্রতীয়তে।
নকুলাঙ্গন্তু তং বিদ্যাৎ স্পর্শতস্তু হি নাশনম্॥"

যাহার অঙ্গে ঊর্দ্ধগামী কপিল দ্যুতি দৃষ্ট হয়—তাহার নাম নকুলাঙ্গ। এই নকুলাঙ্গ অসির স্পর্শে সর্পও প্রাণত্যাগ করে।

১০ ক্ষুদ্রবজ্র।

"আশীবিষা [illegible] দাঙ্গে [illegible]তম্।
ক্ষুদ্রবজ্রক নামানং প্রাহ [illegible] মুনিঃ॥"

যাহার শরীরে কুণ্ডলাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশীবিষমালা দৃষ্ট হয় নাগার্জ্জুন মুনি তাহাকে ক্ষুদ্রবজ্র নামে প্রখ্যাত করেন।

১১ মহৎ।

"[illegible] বিবর্জ্জিত
[illegible]
[illegible] শক্রবধার্থং মহাগুণ
কৃতাং খড়্গং দেবরাজোঽপি হৃষ্টঃ॥"

যাহার অন্তভাগ অতি গাঢ় অর্থাৎ কঠিন, যাহা সর্ব্ব প্রকার চিহ্ন বর্জ্জিত, মধ্যদেশ স্থূল, ধারও স্থূল কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ,—দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসগণের বধ বিধানের নিমিত্ত এতদ্রূপ মহান্ খড়্গ নির্ম্মাণ করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন।

১২ বামনাঙ্ক।

"বামনাঙ্কং মহাস্থূলং [illegible]।
ছেদে গাঢ়ং চিহ্নহীনং প্রাহ খড়্গং [illegible]॥"

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে মহান্ খড়্গ অত্যন্ত গাঢ় অথচ ছেদকালে যাহা ছেদ্য বস্তুতে তত স্পষ্ট হয়না এবং যাহার অঙ্গে কোন চিহ্ন থাকে না, তাদৃশ খড়্গের নাম বামনাঙ্ক।

১৩ মহিষাখ্য।

"এতদ্বীজ প্রতিমমঙ্গং যস্মিন্ প্রতীয়তে।
মাহিষাখ্যঃ স বৈ খড়্গো নীলমেঘসমচ্ছবিঃ॥"

যে খড়্গের গাত্রে এরণ্ডবীজের ন্যায় চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং যাহার দীপ্তি নীল মেঘের ন্যায়, এতাদৃশ খড়্গের নাম মহিষাখ্য।

১৪ অঙ্গপত্র।

"দৃষ্টং যস্মিন্ ভবেৎ খড়্গে শরীরং প্রতিবিম্বিতম্।
অঙ্গপত্রাভিধং খড়্গং প্রাহুঃ খড়্গ বিচক্ষণাঃ॥"

খড়্গকে মজ্জন করিলে যদি তাহা দর্পনের ন্যায় শরীরপ্রতিবিম্ব ধারণ করে—তবে উহাকে খড়্গতত্ত্ব নিপুন-পণ্ডিতেরা অঙ্গপত্র নামে উল্লেখ করেন।

১৫ গজবজ্র।

"যস্যাঙ্গে স্থূলরেখা ঘনমসৃণরুচিং সর্ব্বতো ব্যাপ্য তিষ্ঠেৎ
ধারা তীক্ষ্ণাতিসূক্ষ্মা প্রবিশতি রুধিরস্পর্শমাত্রেণ খড়্গা।
যস্যাম্ভঃ পীযমানং শময়তি নিখিলং ব্যাধিমাধি সমগ্রং
বৈবিশ্রেণীং ...... প্রবদতি গিরিশো বজ্রমেতৎ গজাদি॥"

যাহার অঙ্গে স্থূল রেখা, অঙ্গ রুচি অতি ঘন ও মসৃণ, ধার অতি তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম, রক্তস্পর্শ মাত্রে যাহা অভ্যন্তর প্রবিষ্ট হয়, যাহার অঙ্গধৌত জল পান করিলে আধিব্যাধি বিনষ্ট হয়, দেবাদি-দেব গিরিশ তাহাকে গজবজ্র নামে অভিহিত করেন।

বিভিন্ন দেশীয় অসির গুণাগুণ।

অসি সকল দেশে সমান হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত অসি উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যে যে দেশে যে যে প্রকার অসি নির্ম্মিত হইত তত্ত্বাবতের একটা তালিকা আছে। সে গুলি এই—

"লোহং প্রধানং খড়্গার্থং প্রশস্তং তদ্বিশেষতঃ।
খটী খট্টর-ঋষিক বঙ্গ সূর্পারকেষু চ॥
বিদেহেষু তথাঙ্গেষু মধ্যমগ্রামবেদিষু।
সহগ্রামেষু চীনেষু তথা কালঞ্জরেষু চ॥"

অনেক প্রকার লৌহ আছে, পরন্তু তন্মধ্যে যাহা প্রধান অর্থাৎ উৎকৃষ্ট তাহাই খড়্গের নিমিত্ত প্রশস্ত। (খড়্গ নির্ম্মাণের লৌহ উপধার্থ লৌহ হইতে স্বতন্ত্র এবং উহা উৎকৃষ্ট বিবরণযুক্ত ও স্বতন্ত্র লক্ষণাক্রান্ত)। বিশেষতঃ খটী, খট্টর, ঋষিক, বঙ্গ, শূর্পারক, বিদেহ, অঙ্গ, মধ্যম গ্রাম, বেদী, সহগ্রাম, চীন, কালঞ্জর,—এই সকল স্থানে যাহা উৎপন্ন হয় উহা অত্যন্ত প্রশস্ত।

"খটীখট্টরজাতা যে দর্শনীয়াস্তু তে মতাঃ॥"

খটী ও খট্টর দেশজাত অসি সকল অত্যন্ত সুদৃশ্য জানিবে।

"কায়চ্ছেদস্থিকা যে ঋষিজা গুরবস্তথা।"

ঋষিকদেশজাত অসি শরীরচ্ছেদ করিতে সমর্থ এবং গুরুভারযুক্ত। ঋষিকদেশ হিমালয়ের উত্তরভাগে ছিল।

"তীক্ষ্ণাশ্ছেদসহা বঙ্গা দৃঢ়াঃ শূর্পারকোদ্ভবাঃ॥"

বঙ্গদেশজাত অসি তীক্ষ্ণ ও ছেদভেদে পটু এবং শূর্পারকদেশীয় অসি সমধিক কঠিন। (লৌহিত্য নদীর পশ্চিমে অঙ্গদেশের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক্ষণে উহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। বর্ত্তমান দ্বারকার উত্তর পশ্চিমভাগে শূর্পারকদেশ অবস্থিত ছিল)।

"অসহাশ্চৈব বিজ্ঞেয়া প্রভাবন্তো বিদেহজাঃ।"

বিদেহদেশজাত অসি প্রভাশালী ও অসহ্য তেজ। বর্ত্তমান ত্রিহুতদেশকে পূর্ব্বে বিদেহ বলিত।

"অঙ্গদেশোদ্ভবস্তীক্ষ্ণা ——————।"

অঙ্গদেশজাত অসি তীক্ষ্ণ ও দৃঢ়। বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলা ও চম্পারণ প্রভৃতি স্থান পূর্ব্বে অঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

"লঘবশ্চ তথা তীক্ষ্ণা মধ্যমগ্রামসম্ভবাঃ।"

মধ্যগ্রাম সম্ভূত অসি লঘুভার ও তীক্ষ্ণ। (এই মধ্যমগ্রাম এক্ষণে কোথায়, তাহা নির্ণয় হয় না)।

"অসারা লঘবোস্তীক্ষ্ণা চেদিদেশসমুদ্ভবাঃ।"

চেদিদেশ প্রভব খড়্গ হাল্কা, তীক্ষ্ণ, কিন্তু সারহীন। (পঞ্জাব ও কনোজ প্রভৃতি দেশের অংশ বিশেষকে চেদীদেশ বলিত)।

"সহগ্রামোদ্ভবাঃ খড়্গাঃ সুতীক্ষ্ণা লঘবস্তথা।"

সহগ্রামজাত খড়্গ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও লঘু অর্থাৎ হাল্কা। মধ্যগ্রাম এক্ষণে অপরিচিত অবস্থায় আছে।

"নির্ব্রণা নির্ম্মলাস্তীক্ষ্ণাশ্চীনদেশসমুদ্ভবাঃ।"

চীনদেশীয় খড়্গ অত্যন্ত নির্ম্মল ও তীক্ষ্ণ। চীনদেশ আজিও সমভাবে পরিচিত আছে।

"কালঞ্জরা কালসহাস্তীক্ষ্ণাশ্চ লক্ষণান্বিতাঃ।"

কালঞ্জর পর্ব্বতের সন্নিহিত দেশে যে সকল খড়্গ উৎপন্ন হয়, তাহা দীর্ঘ-কাল স্থায়ী, তীক্ষ্ণ ও সুলক্ষণ। কালঞ্জর পর্ব্বত প্রয়াগের অনেক দূর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত আছে।

অসির পরিমাণ।

৪ অঙ্গুল পরিসর ও ৫০ অঙ্গুল লম্বা অসি শ্রেষ্ঠ এবং ইহার অল্প হইলে তাহা মধ্যম। ২০ অঙ্গুলের ন্যূন হইলে তাহাকে অসি না বলিয়া অসি-পুত্র বলা যায়। এইরূপে বিস্তারে ২ অঙ্গুলের ন্যূন হইলেও তাহা অসি নামে গণ্য হইবে না। বৃহৎ শার্ঙ্গধর, আগ্নেয়-ধনুর্ব্বেদ ও বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ—সর্ব্বত্র এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। যথা—

"শতার্দ্ধমঙ্গুলানাস্তু খড়্গং শ্রেষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতম্।
তদর্দ্ধং মধ্যমং জ্ঞেয়ং ততো হীনং ন কারয়েৎ॥"
"পঞ্চাশদঙ্গুলোৎসেধশ্চতুরঙ্গুলবিস্তৃতঃ।"

কেহ কেহ বলেন যে, ৩০ অঙ্গুলের অধিক দীর্ঘ অসি নিংস্ত্রিংশ নামে খ্যাত ও উহাই উত্তম। বৃহৎসংহিতা গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"অঙ্গুলশতার্দ্ধমুত্তম ঊনঃ স্যাৎ পঞ্চবিংশতিং খড়্গঃ।"

পদ্মপুষ্পের পাবড়ীর অগ্রভাগ যেরূপ, অসির অগ্রদেশ যদি সেইরূপে গঠিত হয়, তবে সে অসি উত্তম এবং করবীর পত্রের তুল্যাকার হইলে উহা তদপেক্ষা উত্তম। যাহার অগ্রভাগ মণ্ডলাকার অর্থাৎ সুগোল কিংবা কিঞ্চিৎ বক্র—সে অসি তত প্রশস্ত নহে। যথা—

"খড়্গঃ পদ্মপলাশাগ্রোমণ্ডলাগ্রশ্চ শস্যতে।
করবীরপলাশাগ্রসদৃশশ্চ বিশেষতঃ॥"

মণ্ডলাগ্র অসি এক্ষণে "বগী" নামে খ্যাত। কোন কোন অস্ত্রবিৎ যোদ্ধা ইহাকেও প্রশংসা করিয়া থাকেন। বৃহৎসংহিতা গ্রন্থেও ইহার এবং অন্যান্য প্রকার খড়্গের প্রশংসা আছে।

"গোজিহ্বাসংস্থানো নীলোৎপলবংশপত্রসদৃশশ্চ।
করবীরপত্রশূলাগ্রমণ্ডলাগ্রাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ॥"

গোজিহ্বা, সুঁদী, নাল ফুলের পাপড়ি, বাঁশের পাতা, করবীর ফুলের পাতা ও

শূলের অগ্রভাগের তুল্যাকার খড়্গ ও মণ্ডলাগ্র খড়্গ প্রশস্ত অর্থাৎ উত্তম।

অসির ধ্বনি।

আঘাত করিলে যদি কাকস্বরের ন্যায কর্কশ ধ্বনি বা শব্দ উত্থিত হয় কিংবা অং—ইত্যাকার শব্দ হয় তবে সে তরবারি রাজাদিগের পরিত্যাজ্য। পরন্তু যাহার শব্দ মধুর, কিঙ্কিণীধ্বনিসদৃশ অর্থাৎ কনকনে এবং দীর্ঘ অর্থাৎ বহুক্ষণ স্থায়ী, সেই খড়্গই শ্রেষ্ঠ খড়্গ এবং রাজারা এতদ্রূপ খড়্গই ধারণ করিবেন। যথা—

"আহতে যদ খড়্গো স্যাৎ ধ্বনিঃ কাকস্বরোপমঃ।
অং আকারধ্বনির্বা স্যাৎ স খড়্গো নৃপপুঙ্গবৈঃ॥"
"দীর্ঘঃ সুমধুরঃ শব্দো যস্য খড়্গস্য ভারত।
কিঙ্কিণীসদৃশস্তস্য ধারণং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে॥"

এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, অগ্নিপুরাণ ও কল্পদ্রুমধৃতযুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে খড়্গ সম্বন্ধে কতকগুলি সুচিহ্ন কুচিহ্নের কথা আছে তাহা পশ্চাৎ বলা যাইবে। তৎপশ্চাৎ খড়্গ-যুদ্ধের সঞ্চরণমার্গ অর্থাৎ গতি সকল বলা যাইবে। এক্ষণে বৃহৎসংহিতার লিখিত ব্রণাদি দোষ এবং শার্ঙ্গধরের লিখিত খড়্গের দোষ ও তাহার পূজা প্রভৃতি কএক প্রকার অবান্তরিত বিষয় বলা যাইতেছে।

"অঙ্গুলমানাজ্জ্যেষ্ঠো ব্রণোঽশুভো বিষমপর্ব্বস্থঃ।"
"শ্রীবৃক্ষো বর্দ্ধমানাতপত্রশিবলিঙ্গকুণ্ডলাব্জানাম্।
সদৃশাঃ ব্রণাঃ প্রশস্তা ধ্বজায়ুধস্বস্তিকানাঞ্চ॥"
"কৃকলাসকাককঙ্কক্রব্যাদকবন্ধবৃশ্চিকাতয়ঃ।
খড়্গে ব্রণা ন শুভদা বংশানুগাঃ প্রভূতাশ্চ॥"
"স্ফুটিতো হ্রস্বঃ কুণ্ঠো বংশচ্ছিন্নো ন দৃষ্টমনোনুগতঃ।
অস্বন ইতি চানিষ্টঃ প্রোক্তবিপর্যয়স্তু ইষ্টফলঃ॥"

"কথিতঃ ব্রণাযোক্তং পর্বাজয়ায প্রবর্ত্তনং কোষাৎ।
স্বয়মুদ্গীর্ণে যুদ্ধং জ্বলিতে বিজয়ো ভবতি খড়্গে॥"
"নাকারণং বিবৃণুযান্ন বিঘট্টয়েচ্চ।
পশ্যেন্ন তত্র বদনং ন বদেচ্চ মূল্যম্॥"
দেশং ন চাস্য কথযেৎ ন প্রতিমানায়েচ্চ।
নৈব স্পৃশেৎ নৃপতিরপ্রযতোঽসিযষ্টিম্॥"
"নিষ্পন্নো ন চ্ছেদ্যো নিকষৈঃ কার্য্যঃ প্রমাণযুক্তঃ সঃ
মূলে ম্রিয়তে স্বামী জননী তস্যাগ্রতশ্ছিন্নে॥"
"কাকোলূকসবর্ণাভা বিষমাঙ্গুলিসংস্থিতাঃ।
বংশানুগাঃ প্রশস্তাশ্চ ন শস্ত্রাস্তে কদাচন॥"
"খড়্গ" প্রশস্তং মানসমযুক্তং
কোষে সদা চন্দনচূর্ণযুক্তম্।
স স্থাপ্য ভূমিপতিঃ প্রযত্নাৎ
রক্ষেৎ তথৈব শরীরবচ্চ॥"
"শ্রীবৃক্ষপদ্মাদিশুভানি তানি
চিহ্নানি খড়্গস্য শুভাশুভানি।
বিজ্ঞায ভূমিপতয়ঃ সদৈব
সঞ্চারয়েযুঃ সমুদা কৃপাণম্॥"

অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি অঙ্গুল হইতে শতার্দ্ধ অঙ্গুল পর্য্যন্ত খড়্গ নির্ম্মাণ করিলে যদি তাহাতে ব্রণ অর্থাৎ চিহ্ন বিশেষ উৎপন্ন হয়, তবে তাহার শুভাশুভ লক্ষণ অঙ্গুলি পরিমাণদ্বারা নির্ণয় করিবেক। বিষমাঙ্গুলি স্থানে চিহ্নপাত হইলে তাহা অশুভ বলিয়া স্থির করিবেক। চিহ্ন অনেক প্রকার হইতে পারে, পরন্তু তন্মধ্যে শ্রীবৃক্ষ, বর্দ্ধমান, (পর্ব্বত) ছত্র, শিবলিঙ্গ, কুণ্ডল, পদ্ম, ধ্বজ, কোন প্রকার অস্ত্র ও স্বস্তিক অর্থাৎ ত্রিকোণ তুল্য চিহ্নই শুভদায়ক। আর কৃকলাস (গিরগিটে) কাক, কঙ্কপক্ষী, মাংসাশী জন্তু, মস্তকশূন্য জীবশরীর ও বৃশ্চিকের সদৃশ আকৃতি বিশিষ্ট ব্রণ ও বহু ব্রণযুক্ত হইলে উহা অশুভদায়ক, স্ফুটিত অর্থাৎ ভাঙ্গা অথবা সছিদ্র, হ্রস্ব, কুণ্ঠ এবং দেখিতে কুদৃশ্য ও মনের বিরক্তিজনক ও শব্দ বর্জ্জিত—

এরূপ খড়্গও অনিষ্টকারী হয়। খড়্গে যদি অকস্মাৎ শব্দ জন্মে তবে জানিবে যে, তাহা মরণের উপদেশ করিতেছে। খড়্গ যদি আপনা আপনি কোষ হইতে বহিরাগত হয় তবে জানিবে, যে নিশ্চিত পরাজয় হইবে। খড়্গ যদি বিনা কারণে উদ্গীর্ণ হয় তবে জানিবে যে, শীঘ্রই যুদ্ধ উপস্থিত হইবে এবং খড়্গ যদি আপনা আপনি অত্যন্ত প্রজ্বলিত হয়, তবে জানিবে যে, যুদ্ধে জয় হইবে।

বিনা কারণে অসিকে উলঙ্গ করিবে না। খড়্গগাত্রে আত্মপ্রতিবিম্ব অবলোকন করিবে না। উত্তম ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত না হইলে বিনা প্রয়োজনে অসির মূল্য ব্যক্ত করিবে না। কোন দেশের অসি—তাহাও বলিবে না। কোন সময়েই অসিকে অসম্মান করিবে না। রাজা অশুচি হইয়া অসিযষ্টি স্পর্শও করিবেন না। নির্ম্মাণের পর বিষমাঙ্গুলি হইল দেখিয়া সমাঙ্গুলি করিবার জন্য তাহাকে ছিন্ন করিবে না। নির্ম্মাণের পর সমাঙ্গুলি করিতে হইলে শানযন্ত্রদ্বারা ইচ্ছামত প্রমাণ যুক্ত করিবে। যদি মূলভাগে ছিন্ন করা হয় তবে সে অসি ধারণ করিলে মৃত্যু হইবে। যদি অগ্রভাগে ছিন্ন করা হয় তবে সে অসি ধারণ করিলে জননীর মৃত্যু দেখিতে হইবে। কাক, উলূক, কি বসার ন্যায় আভাযুক্ত, বিষমাঙ্গুলি পরিমাণ (বিযোড় অর্থাৎ ৪৯।৪৭ ইত্যাদি) ও বংশানুগ অসি কোন কালেই শুভদায়ক হয় না। উত্তম অসিকে মণি ও স্বর্ণভূষিত ও চন্দন চূর্ণযুক্ত সদা সর্ব্বদা কোষ মধ্যে রক্ষা করিবেক। যেরূপ নিজের শরীর যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয়, রাজা সেইরূপ যত্নে অসিকেও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর, বীরচিন্তামণি, শার্ঙ্গধর পদ্ধতি ও যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে খড়্গ সম্বন্ধে উক্তরূপ অনেক কথাবার্ত্তা আছে। তত্তাবতের সারসংগ্রহরূপ এই প্রস্তাব এবারে এই স্থানেই সম্পন্ন করা গেল। পরবর্ত্তী পত্রিকায় ক্রমে ইহার অবশিষ্ট কাযগুলি অর্থাৎ যুদ্ধকালে ইহা কিরূপে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি বর্ণন করা যাইবেক।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

রাসমালা।

১ম খণ্ড পৃঃ ৬০০ পর।

ভূবরদেব।

শঙ্করকবির আগমন।

একদা রাজা ভূবর স্বীয় পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া কৈলাস সদৃশ পরম মনোহর এক প্রমোদোদ্যানে আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন। উদ্যানটী বিবিধ ফলপুষ্প-পাদপ ও কান্ত কুঞ্জবাটিকায় সমলঙ্কৃত। যুবরাজ কর্ণ মনোরম রাজ-বেশে বিভূষিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বে সমাসীন এবং চন্দ প্রভৃতি সামন্তগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দেবমণ্ডল সদৃশ বিরাজ করিতেছিলেন। তথায় কবি ও কোবিদ্গণ এবং কবিকুলকেশরী কামরাজও নানা শাস্ত্রালাপনে আনন্দবাসরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে নিবিষ্ট। কামরাজ কাব্য-শাস্ত্রে পরম পারদর্শী; বীরকুলের মধ্যে যেমন ভূবর প্রধান, কবিগণের মধ্যে তেমনই কামরাজ শ্রেষ্ঠ। তিনি রাজার পরম বন্ধু; রাজা তাঁহাকে বড় আদর করিয়া থাকেন। এইরূপ সুন্দর পাত্র-মিত্রদলে পরিবেষ্টিত হইয়া শোলাঙ্কি রাজ ভূবর আনন্দে কাল যাপন করিতেছেন, এমন সময়ে একজন বিদেশীয় কবি আসিয়া তাঁহাকে অনুপম মণিমালা সদৃশ একটী মনোহর কবিতাহার দিয়া তাঁহার স্তুতিগান করিল। রাজা ভূবর সেই কবিতার অনুপম লালিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবিবর! আপনি কোন রাজ্য উজ্জ্বল করেন?" তৎপরে তিনি স্বীয় সভাস্থ কবিগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "যে কেহ ইহাঁর উপযোগী কবিতা রচনা করিয়া এই কবিতার উত্তর দিতে পারিবে, তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।" কাহারও সাহস হইল না; কেহই তদুপযোগী কবিত্বময় শ্লোক রচনা করিতে অগ্রসর হইল না। তখন ভূবর সেই অভ্যাগত কবিকে সম্মানসূচক মহার্হ সজ্জা পুরস্কার দিয়া পরম সমাদর সহকারে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবিশিরোমণি! এতদিন কোন্ গভীর প্রদেশে লুক্কায়িত ছিলেন?"

তদনুসারে সেই অভ্যাগত কবি সবিনয়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "রাজন্! এ দীনের নাম শঙ্কর! বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনোরম রাজ্য গুর্জ্জর হইতে আমি আসিতেছি। সে রাজ্য অতিশয় উর্ব্বর; তাহা সুবিমল সলিল ও বিবিধ শস্য, তৃণ ও পাদপদলে সুশোভিত। তাহা কমলার চিরলীলাস্থল এবং সাধু, সচ্চরিত্র ও দয়াবান পুরুষগণের রমণীয় আবাসভূমি। তাহার রাজধানীর নাম পঞ্চাসর; পঞ্চাসর বীণাপাণির বিলাসভূমি। ফল কথা সেই রাজ্য এত রমণীয় যে, যাহারা তাহাতে কিছু দিনের জন্য বাস করিয়াছে তাহাদের আর অমরাবতীতে বাস

করিবার বাসনা নাই। সৌররাজ তথায় রাজত্ব করেন; তিনি সমগ্র ক্ষত্রিয়কুলের চূড়ামণি। স্বীয় অনুপম বীরত্ব ও অবদান পরম্পরায় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া তিনি দেশীয় কবিগণ কর্ত্তৃক "জয়শেখর" নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অনুপম রূপগুণবতী রূপসুন্দরী তাঁহার প্রধানা মহিষী, বিজ্ঞ ও বীর শূরপাল তাঁহার শ্যালক ও প্রধান সখা জয়শেখর ও শূরপাল একত্রে মিলিত হইলে স্বর্গসিংহাসন হইতে মহেন্দ্রকেও আচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হয়েন। কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহাদের অল্পই প্রয়োজন; কেননা একমাত্র গুর্জ্জরই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট; গুর্জ্জর বিশ্বের সার ভূত। ভগবতী বীণাপাণি তথায় চিরকাল বিরাজ করেন; সেই অনুপম গুর্জ্জর-রাজ্যেই আমি এই কাব্যস্থান লাভ করিয়া বিশ্বজয় করিবার বাসনায় বহির্গত হইয়াছি।"

গুর্জ্জরের এই বিপুল খ্যাতি শ্রবণ করিয়া শোনাঙ্গিরাজ ভুবর সদর্পে স্বীয় গুম্ফ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে যেন জ্বলন্ত অনলস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইতে লাগিল। তখনই কবি কামরাজ সদম্ভে দণ্ডায়মান হইয়া শঙ্করকে কবিতা-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। শঙ্কর তদনুরূপ দর্প সহকারে তাঁহার সহিত সেই অনুপম বাগ্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে কামরাজেরই পরাজয় হইল। তখন বিজয়ী শঙ্কর সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন "শঙ্কর যে চিরকালই কামজিৎ, তাহা কি তুমি জান না।"

ভুবরের তৃপ্তি হইল না; তিনি প্রমোদকাননে আমোদ প্রমোদ করিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বিপরীত ফল হইল। স্বীয় কাল্পনিক সার্ব্বভৌমিকত্বের সুখস্বপ্নে মোহিত হইয়া তিনি এতদিন অসীম বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু আজি তাঁহার সে আনন্দের ভঙ্গ হইল, বিশুদ্ধ অমৃতরাশিতে কে গরল ঢালিয়া দিল। প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে তিনি স্বীয় সামন্ত ও সচিবগণকে আহ্বান করিলেন এবং গুর্জ্জরের বিষয় আরও শুনিতে চাহিলেন। সমবেত সর্দ্দারগণ আপনাদিগের বীরত্ব কীর্ত্তন করিয়া সমস্বরে বলিল "আমরা গুর্জ্জর জয় করিয়া জয়শেখরকে পরাস্ত করিয়াছি; সৌররাজা অধীনতা স্বীকার করাতে তাঁহার নগর ধ্বংস করি নাই। প্রভো! আপনি বিশ্বজিৎ।" এ কথায় রাজার আদৌ বিশ্বাস হইল না, তিনি তাহাদিগের প্রতি কুটিল ভ্রুকুটি নিক্ষেপ করিয়া চন্দকে বলিলেন "বারট! তুমি সত্যবাদী, তুমিই আমাকে সত্য বিষয় প্রকাশ করিয়া বল।" চন্দ বীর গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "মহারাজ! কল্যাণপুরীর সামন্তগণ অর্ব্বুদগিরি হইতে দক্ষিণপথে আসিবার কালে পথিমধ্যে জয়শেখরের শ্যালক শূরপালের সেনাদলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শূরপাল সেই বাহিনীর পুরোভাগে আসীন ছিলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া দুরূহ ব্যাপার মনে করিয়া অবশেষে আমরা বক্রপথে সৌরাষ্ট্রে উপস্থিত হইয়াছি।" সৌররাজ ভুবরের জয়তৃষ্ণা দারুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল; তিনি অচিরে বিশাল সেনাদল সজ্জিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার আদেশ পরিপালিত হইল। চতুরঙ্গিনী

সেনা যথানিয়মে সজ্জীভূত হইয়া ভীষণ বিক্রম সহকারে পঞ্চাসরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। পথিমধ্যে নানা দুর্লক্ষণ প্রতিপদে তাহাদের নয়নগোচর হইল; কিন্তু রাজাদেশ অখণ্ডনীয়; সুতরাং সর্দ্দারগণ কোন স্থলেও বিরাম করিতে পারিলেন না।

এদিকে কবিবর শঙ্কর স্বগৃহে প্রত্যাগত হইয়া রাজাকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। জয়শেখর বুঝিতে পারিলেন যে, যুদ্ধ অনিবার্য্য; তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। সংগ্রামতৃষায় সেই সমরকেশরীর উন্নত হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি অচিরে স্বীয় সামন্তদিগকে বলয়, কুণ্ডল ও অন্যান্য অলঙ্কার বিতরণ করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধ।

কল্যাণপুরের প্রশস্ত রঙ্গক্ষেত্রে রণদামামা বাজিয়া উঠিল। সর্দ্দার ও সেনানিগণ স্ব স্ব সেনাদল সমভিব্যাহারে সেই বিশাল প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সেনা ভিন্ন ভিন্ন বাহিনীতে বিভক্ত হইয়া আস্ফালন সহকারে ক্রমে ক্রমে দুর্গ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। চতুঃসহস্র যুদ্ধরথ; তদ্ব্যতীত অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব এবং অগণ্য ধনুষ্ক পদাতি সৈন্য। এই ভয়াবহ অনীকিনীর প্রচণ্ড পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। রাজ্যের লোকজন ত্রস্তবিত্রস্ত হইয়া প্রাণভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে যে পথে বিরাট চমূ অগ্রসর হইল, তৎপ্রদেশের নগর গ্রাম একবারে জনহীন হইয়া পড়িল। পরিত্যক্ত গৃহবাটীকাদির ধনসামগ্রী অভিযাত্রিগণের হস্তগত হইতে লাগিল। যাহারা ইহাদের গতিরোধ করিতে সাহস করিল, তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। উন্মত্ত সৈন্যগণ তাহাদিগের প্রতি অসীম অত্যাচার করিয়া হতভাগ্যদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল। ইহাদের অতুল বিক্রমে জলাশয়সমূহ শুষ্ক হইয়া পড়িল এবং শুষ্ক ক্ষেত্র সকল জলাশয়ে পরিণত হইতে লাগিল। এইরূপ অপ্রতিহত বিক্রম সহকারে সেই বিশাল আক্রমিক সেনা পঞ্চসরের নিকট শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইল। প্রত্যেক বিরামস্থলেই সৈন্যগণ মল্লযুদ্ধ, দ্বন্দযুদ্ধ, প্রভৃতি বিবিধ ব্যায়াম করিতে লাগিল; এইরূপে প্রচণ্ড গতিতে অগ্রসর হইয়া অবশেষে ইহারা পঞ্চসরের তিনক্রোশ দূরে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক প্রান্তসীমান্ত নগর গ্রামাদি লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেক নরনারী তাহাদিগের হস্তে পতিত হইয়া স্বাধীনতা হারাইল।

এই সকল লোমহর্ষণ সংবাদ অচিরে জয়শেখরের শ্রুতিগোচর হইল। শত্রুকুলের বিষম অত্যাচারের বিবরণ শ্রবণ করিয়া তিনি প্রচণ্ড রোষানলে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং শত্রুকুলের প্রধান সেনানায়ক মিরকে বিস্তর তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। পত্রে এই মর্ম্ম প্রকটিত ছিল;—"কাপুরুষ! দীনদরিদ্রদিগের প্রতি অত্যাচার করা কি বীরের ধর্ম্ম? পশ্চাতে লুক্কায়িত থাকিয়া নিরস্ত্র ব্যক্তিদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা কি বীরাভিমানীর কর্ত্তব্য? বুঝিলাম, তুমি বীরাখ্যার

অযোগ্য। কুক্কুর যেমন শিলাখণ্ড দ্বারা আঘাতিত হইলে ঘাতকের সম্মুখীন হইতে সাহস না করিয়া কেবল সেই শিলাকেই দংশন করিতে থাকে, তুই তেমনই আমার সম্মুখে আসিতে না পারিয়া অসাক্ষাতে ভীরুর ন্যায় আমার নগর গ্রাম পীড়ন করিতেছিস্।" এই বিষদিগ্ধ তীর গালি-বর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া শোলাঙ্কি-রাজ ভুবরের প্রধান সেনাপতি প্রত্যুত্তরে জয়শেখরকে লিখিয়া পাঠাইলেন "দন্তে তৃণ লইয়া রাজাধিরাজ ভুবরের শরণাপন্ন হও, নতুবা তোমার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। ঘোর যুদ্ধে তোমার রাজ্য ছারখারে দিব। আইস, অন্যথা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।" তেজস্বী জয়শেখর অবিলম্বে স্বীয় ভ্রাতা ও অপরাপর যোদ্ধাদিগকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন।

মিরের উদ্ধত প্রত্যুত্তর যৎকালে জয়শেখরের হস্তগত হয়, শূরপাল তখন রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন না; তিনি তখন স্বীয় দলবল লইয়া নিশাকালে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। দৈব তাঁহার অনুকূল হইল; তিনি চরমুখে অবগত হইলেন যে, আক্রমকগণ সম্পূর্ণ অসতর্ক রহিয়াছে;—কেহ নৃত্য, কেহ গীত, কেহ বাদ্য করিতেছে;—কেহ বা পান ভোজনে ব্যাপৃত অথবা গভীর নিদ্রায় পতিত রহিয়াছে; অবশিষ্ট সকলে লুণ্ঠনাভিলাষে নিকটস্থ পল্লী সমূহে গমন করিয়াছে। এই সুযোগে শূরপালের সৈন্যগণ অসিহস্তে যমদূতের ন্যায় তাহাদিগের উপর আপতিত হইল এবং সম্মুখে যাহাকে পাইল, তাহাকে সংহার করিল। এইরূপে অনেক হতভাগ্য প্রাণত্যাগ করিল। শূরপাল স্বহস্তে চন্দ্রকে আহত করিলেন। চন্দ্র ঘোরতর আহত হইয়া পলাইয়া গেলেন; কিন্তু পথিমধ্যেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হইল। সিংহ যেমন মৃগপালের মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, শূরপাল সেইরূপ শত্রুসৈন্য দলিত করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিলেন। বৈদ উচ্চ প্রামার-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এই নিদারুণ অপমানে তাঁহার হৃদয় ঘোরতর আলোড়িত হইল,—মনোমধ্যে বিষম আত্মগ্লানি তাড়না করিতে লাগিল; অতিশয় মনোদুঃখে ভগ্নহৃদয় হইয়া তিনি স্বীয় যুদ্ধসজ্জা দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং সন্ন্যাসীর বেশে বারাণসীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রধান সেনাপতি মিরেরও মনোবেদনার সীমা রহিল না; কোথায় পঞ্চসর জয় করিবেন ভাবিয়া তিনি সদর্পে আসিলেন, তাহা না হইয়া ঘোরতর অপমানের সহিত তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইল। রাজা ভুবর যে একমাত্র তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া এই কঠোর ও দুঃসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, মির কি এইরূপে তাহার প্রতিদান করিলেন? যদি তাঁহার প্রকৃত বীরের দূরদর্শিতা থাকিত, তাহা হইলে যুদ্ধ করিতে আসিয়া তিনি কখনই অসতর্ক থাকিতেন না। তিনি বুঝিলেন, তাঁহারই দোষে পরাস্ত হইতে হইয়াছে। মিরের চরিত্রে গভীর কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত হইল, তাঁহার উন্নত মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। পলায়মান ছিন্নভিন্ন সৈন্যদিগকে একত্রিত করিয়া তিনি

কল্যাণপুরের আটদিনের দূরপথে শিবির স্থাপন করিলেন।

এই ঘোর পরাজয় বার্ত্তা ভুবরের শ্রুতিগোচর হইল; তিনি অবিলম্বে নিবের সেনানিবেশে উপস্থিত হইলেন এবং হতাশ্বাস সৈন্যমণ্ডলকে পুনরুৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সৈন্যগণ। তোমাদের এ পরাজয় ও পলায়নে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হই নাই, তোমরা জান যে, পশ্চাদপসরণ সময়ে সময়ে জয়লাভের সূচনা স্বরূপ হইয়া থাকে, দেখ, খড়্গ পশ্চাদ্ভাগে নমিত না হইলে কখনও প্রচণ্ড বলে আঘাত করিতে পারে না। অতএব তোমরা অস্ত্র লইয়া শত্রু বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হও। এইবার নিশ্চয়ই তোমাদের জয়লাভ হইবে।" শোলাঙ্কিসৈন্যগণের মগ্নমান হৃদয় আবার বৈদ্যুতিক উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বিকট রণনাদ ত্যাগ করিয়া তাহারা তখনই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। অনন্তর ভুবর অবশিষ্ট প্রধান প্রধান সামন্ত ও সেনানিদিগকে আহ্বান করিয়া একটা সমরসভার অধিবেশন করিলেন। সকলের ঐকমত্যক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে শত্রুদের বিরুদ্ধে অচিরে সেনাদল পুনঃ চালনা করা আবশ্যক;—রাজা ভুবর স্বয়ং এই দলের অধিনায়ক হইয়া যাইবেন। তখনই চারিদিক বিকম্পিত করিয়া ভীম নির্ঘোষে রণভেরি বাজিয়া উঠিল। শোলাঙ্কিসেনাদল ভিন্নভিন্ন বাহিনীতে বিভক্ত হইয়া প্রচণ্ড বিক্রম সহকারে পঞ্চসরের অভিমুখে পুনর্ব্বার ধাবিত হইল। পথিমধ্যে নানা মঙ্গলসূচক লক্ষণ তাহাদিগের নয়নগোচর হইয়া সৈন্যমণ্ডলের উৎসাহ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল।

শত্রুসৈন্য পঞ্চসর দৃঢ়তর অবরোধ করিল। তখন জয়শেখর দুর্গের সমস্ত বহির্দ্বার বদ্ধ করিয়া শত্রুকুলের আক্রমণ রোধ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে বীর একদা দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার অভিপ্রায়ে পঞ্চসরের ভিতরে নানা অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু শূরপাল তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এইরূপে ছয় চারি দিবস অতীত হইলে জয়শেখর একদিন স্বীয় সৈন্যসামন্তদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যদি স্বাধীনতার প্রতি মমতা থাকে, স্বদেশের প্রতি স্নেহ থাকে, তবে সকলে প্রাণপণে মাতৃভূমির উদ্ধারার্থ প্রস্তুত হও। "জীবনের মায়ায়" মোহিত হইলে, এ পবিত্র পুরী হইতে বিদায় লইয়া যাও।" এই কথা শুনিয়া সৌর যোদ্ধগণ উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া উঠিল 'মহারাজ! আমরা সকলেই পবিত্র রাজপুত-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা আমাদিগের চিরন্তন ব্রত, অদ্য আমরা সেই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করিবার নিমিত্ত অম্লানবদনে আপনার সহিত সমরক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ করিব; মাতৃভূমির এই বিষম সঙ্কটে,—স্বাধীনতার এই ঘোর বিপদকালে যদি কেহ জীবনের মমতায় মহারাজকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহার আর কিছুতেই সদ্‌গতি হইবে না, কাকগণও তাহার পাপ-মাংস স্পর্শ করিতে ঘৃণা করিবে,—সে নরাধম কোটি কোটি বৎসর ভীষণ নরকানলে দগ্ধ হইতে থাকিবে।"

এইরূপে প্রায় দুই মাস অতীত হইল,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধব্যাপারে ক্রমে দ্বিপঞ্চাশৎ দিবস চলিয়া গেল, তথাপি ভুবড় কিছুই করিতে পারিলেন না, সমরকুশল শূরপাল তাঁহাদিগের সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিলেন। অবশেষে শোলাঙ্কিরাজ ভুবড় একদা সেনাপতি মীরকে মন্ত্রণাগারে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মীর! এক্ষণে উপায় কি? শূরপালের বাহুবলে ত সকল চেষ্টাই ক্রমে ক্রমে নিষ্ফল হইতে লাগিল। এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিলে অভীষ্ট সাধন হইতে পারে?" তখন মীর উত্তর করিলেন, "মহারাজ! ঐ শূরপাল পরম চতুর ও রণদক্ষ, উহার ন্যায় অতুলিত যোদ্ধা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না; বলিতে কি ঐ বীরই এক্ষণে জয়শেখরের একমাত্র প্রধান সহায়। কৌশলে অথবা প্রলোভন দেখাইয়া যদি উহাকে ভিন্ন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদিগের নিশ্চয়ই জয় হইবে। অতএব চেষ্টা করিয়া দেখুন যদি কোন উপায়ে উহাকে স্বদলে আনিতে পারেন।" এই পরামর্শই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইল। অনন্তর রাজা ভুবড় কোন লতাবসে একখানি প্রলোভনময় পত্র লিখিয়া গোপনে শূরপালের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। শূরপাল তদুপরি কুঙ্কুম প্রয়োগ করিয়া সমস্ত [illegible] বিষয় জানিয়া লইলেন। ক্রোধে তাঁহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কি এতই নীচাশয়, এতই লঘুচেতা এতই অর্থপিশাচ যে, প্রলোভনের বশীভূত হইবেন? শূরপাল তখনই সেই পাপ-পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, "মূঢ়! আমি উচ্চ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তবে কি প্রকারে তুমি লোভে আমাকে মোহিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছ। আজি জানিলাম তোমার নিতান্তই কুবুদ্ধি হইয়াছে। যদি ত্রিলোকের সাম্রাজ্য আমার করতলস্থ হয়, তথাপি কেহ শূরপালকে মহারাজ জয়শেখরের নিকট হইতে ভিন্ন করিতে পারিবে না। যে কাপুরুষ, যে উচ্ছিষ্টান্নভোজী, যে লোভমোহপ্রিয়, সেই মূঢ় নীচাশয়ই বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে।"

এইরূপে দুই মাস অতীত হইয়া গেল। তথাপি উভয় পক্ষের জয় পরাজয়ের কোন লক্ষণই পরিলক্ষিত হইল না। দিবাভাগ যুদ্ধব্যাপারে অতিবাহিত করিয়া প্রত্যেক রজনীতে উভয় নরপতিই স্ব স্ব শিবিরে সৈন্য সামন্তদিগকে লইয়া মহাভারতের যুদ্ধ পর্ব্ব সকল পাঠ করেন। পাণ্ডব বীর ভীম সেনের অসীম সাহস ও বীরত্বের কথা শ্রবণ করিলেই সৌর যোধগণ তাড়িত তেজে উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠে,—"কখন রজনী প্রভাত হইবে,—কখন প্রাতঃকাল দেখা দিবে—রণরঙ্গে লিপ্ত হইব?"

ক্রমশঃ—

পাতঞ্জলদর্শন।

১ম খণ্ড ২১৩ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নিরুদ্ধ অবস্থা উপস্থিত হইলে কি হয় তাহা পরে কথিত হইবে; এক্ষণে তাহাই বলা যাইতেছে।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্॥ ৩॥

তদা তস্মিন্ কালে নিরোধসময়ে দ্রষ্টুঃ চিৎস্বভাবস্য স্বরূপে চিন্মাত্রতায়াং অবস্থানং ভবতীতি শেষঃ। পুরুষস্য চৈতন্যমাত্রং স্বভাবো নতু বৃত্তয়ঃ ইতি কুসুমস্যাপগমে স্ফটিকস্যেব বৃত্ত্যপগমে তস্য স্বরূপপ্রাপ্তিরিতি দিক্।

তদা সেই কালে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ অথবা নিরুত্থান সময়ে দ্রষ্টার অর্থাৎ দর্শনকর্ত্তা আত্মার বা পুরুষের স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি হয়। ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য এই যে, এই অবস্থাতেই আত্মার স্বরূপ অপচ্যুতভাবে অবস্থিত থাকে; অন্যান্য সময়ে তিনি বুদ্ধিবৃত্তির সহিত একীভূত থাকাতে তাঁহার স্বরূপ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। সেই হেতুই মানবগণ কখন অযোগীর অবস্থায় প্রকৃত বা যথার্থ আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া থাকে। চৈতন্যমাত্রই পুরুষের স্বভাব, কিন্তু বৃত্তি সকল স্বভাব নহে; যেমন স্ফটিকের উপরি পতিত কুসুমপ্রভার অপগম হইলে তাহার স্বরূপতা প্রাপ্তি হয়, সেইরূপ বৃত্তির অপগম হইলে পুরুষেরও স্বরূপপ্রাপ্তি হয়।

এক্ষণে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, নিরুদ্ধ-অবস্থা এবং মনের লয় অথবা বিনাশ প্রায় একই কথা; নিরুদ্ধ-অবস্থায় যদি চিত্তের লয় অথবা অভাব হয়, তবে আর থাকিল কি? যখন কিছুই থাকিল না তখন সেই অবস্থাকে যোগ না বলিয়া অন্য এক প্রকারের মরণ বলা হউক; যেহেতু মনের লয় বা আত্মার লয় একই কথা। তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে এই বিষয়ে অনেক প্রভেদ আছে; অনভিজ্ঞ মানবগণের ঐরূপ ভ্রম বটে কিন্তু মন ও আত্মা এই দুইটি এক নহে, পৃথক্ পদার্থ। ইহা যোগিদিগের সমাধি কালেই অনুভূত হয়, এবং তাহাই ইহার যথার্থ প্রমাণস্থল। মন ও আত্মা এই উভয়ে এক বস্তু হইলে সমাধি অর্থাৎ চিত্তের লয়াবস্থা হওয়ামাত্র অবশ্যই সেই যোগিদের দেহের পতন হইত। কিন্তু যখন তাহা ঘটে না, তাহাদের শরীর যেমন তেমনই থাকে, তখন তাঁহাদিগের মনোলয় হইয়াছে বলিয়া আত্মার লয় হইয়াছে এরূপ বলিতে পারা যায় না; বরং এরূপ বলা যায় যে তৎকালে তাঁহাদের আত্মার যথার্থ স্বরূপ (অনারোপিতত্ব হেতু) ও পার্থক্য অনুভূত হয়। অতএব মনোবৃত্তির নিরোধকালেই পুরুষ বা আত্মা আপনার যথার্থরূপে অবস্থিত থাকেন অন্যান্য সময়ে সেরূপ থাকেন না। অন্যান্য সময়ে যেরূপ থাকেন এক্ষণে তাহাই বলা হইতেছে।

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র॥ ৪॥

ইতরত্র অন্যস্যামবস্থায়াম্। বৃত্তয়ঃ বক্ষ্যমাণলক্ষণাঃ। তাভিঃ সারূপ্যং সমানাকারত্বং

তত্তাদাত্ম্যভ্রমো ভবতীতি বাক্যশেষঃ। অতএব ন তদাপি তস্য স্বরূপক্ষতির্যস্তু লোহিত্যভ্রমকালে স্ফটিকস্যেবেতি দ্রষ্টব্যম্।

অন্যান্য সময়ে তিনি চিত্তবৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া বিবিধ প্রকারে দৃশ্য হইয়া থাকেন। ফলতঃ সেই সময়ে বৃত্তির সহিত সমানাকারত্বহেতু তত্তাদাত্ম্যভ্রম হয়, অতএব তখনও তাহার স্বরূপক্ষতি হয় না; যেমন লোহিত্যভ্রমকালে স্ফটিকের স্বরূপ ক্ষতি হয় না তদ্রূপ জানিবেন। মনোবৃত্তি কত প্রকার এক্ষণে তাহাই বলা যাইতেছে।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

বৃত্তয়ঃ বিষয়সম্বন্ধাৎ চিত্তস্য পরিণামবিশেষাঃ। তাশ্চ ক্লিষ্টাদিভেদেন দ্বিধা, প্রমাণাদিভেদেন চ পঞ্চতয্যঃ। পঞ্চাবয়বাঃ পঞ্চভিরেকৈকশো বিভক্তাবেতাঃ। তত্র অবিদ্যাদিক্লেশফলাঃ ক্লিষ্টাঃ। অক্লিষ্টাস্তু তদ্বিপরীতাঃ। এতচাগ্রেঽস্পষ্টীভবিষ্যতি।

মনোবৃত্তি প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার। সেই প্রকার মনোবৃত্তি আবার দুই প্রকার হইয়া থাকে, এই উভয়ের মধ্যে ক্লেশদায়ক বলিয়া একের নাম ক্লিষ্ট এবং ক্লেশের অর্থাৎ সংসার-দুঃখের বিনাশক বলিয়া অন্য প্রকারের নাম অক্লিষ্ট। আরও বিস্তারিতরূপে বলিতে হইলে এইরূপে বলিতে হয়, বিষয়ের সহিত সম্পর্ক হইবামাত্র চিত্ত, বিষয়ের (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থই বিষয়) আকার প্রাপ্ত হয়, চিত্তের সেইরূপ বিষয়াকার প্রাপ্তি হওয়াকে বৃত্তি কহে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে ইন্দ্রিয় দেহস্থিত এবং বিষয় বহিঃস্থিত এই উভয়ের সম্বন্ধহেতু চিত্তের নানাবিধ অবস্থা বা বিবিধ পরিবর্ত্তন হইতেছে, সেই মনের পরিবর্ত্তিত অবস্থার নাম বৃত্তি। বিষয় অসংখ্য সুতরাং বৃত্তিও অসংখ্য। ঐ বৃত্তি অসংখ্য হইলেও সেই সমস্তের শ্রেণীগত বা প্রকারগত বিভাগ অসংখ্য নহে। প্রকারগত বিভাগ প্রধানকল্পে পাঁচ এবং দ্বিতীয় কল্পে দুই। সেই দুইটির মধ্যে একটির নাম ক্লিষ্ট ও অন্যতরটিকে অক্লিষ্ট কহে। রাগ, দ্বেষ, কাম ও ক্রোধাদি বৃত্তি সকল সংসার-ক্লেশের কারণ সেই হেতুই তাহাদের নাম ক্লিষ্ট, এবং শ্রদ্ধা, ভক্তি, বৈরাগ্য, মৈত্রী ও দয়াদি বৃত্তিসকল তাহার বিপরীত অর্থাৎ সংসারদুঃখনিবৃত্তির অর্থাৎ মুক্তির কারণ, সেইহেতু তাহাদের নাম অক্লিষ্ট। ক্লিষ্টবৃত্তিসকল পরিত্যাগ এবং অক্লিষ্ট বৃত্তিগুলি অবলম্বন যোগ্য। কিন্তু যোগকালে ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট সমস্ত মনোবৃত্তিই নিরোধ করিতে হয়; তাহা না হইলে অক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তিদ্বারাও যোগের বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া থাকে। এক্ষণে মনোবৃত্তির প্রধানকল্পের পঞ্চবিভাগ কি কি তাহা উক্ত হইতেছে।

প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥

প্রমাণাদীনাং লক্ষণানি অব্যবহিত পরত এব সূত্রৈরুক্তম্।

মনের বৃত্তি প্রধানতঃ প্রমাণবৃত্তি, বিপর্য্যয়বৃত্তি, বিকল্পবৃত্তি, নিদ্রাবৃত্তি ও স্মৃতিবৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকার। ক্রমে ক্রমে এই পঞ্চবিধবৃত্তির বিষয় বর্ণিত হইবে। এক্ষণে প্রমাণবৃত্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

প্রমাণশব্দোঽজহল্লিঙ্গঃ তেন প্রমাণানীতি-প্রয়োগঃ। প্রমাকরণং প্রমাণমিতি সামান্য লক্ষণম্। প্রমা চ অনধিগতার্থাবগাহীবোধঃ।

চিত্তস্থ অর্থাকারায়াং বৃত্তৌ চিদাত্মনো যঃ প্রতিবিম্বঃ স চাস্মিন্ শাস্ত্রে পৌরুষেয়ো বোধঃ ফলমিতি চোচ্যতে। তত্র ইন্দ্রিয়সম্বন্ধদ্বারা চিত্তস্থ বিষয়সম্বন্ধে সতি যা তত্র বিশেষনির্দ্ধারণা বৃত্তিরূপজায়তে সা প্রত্যক্ষম্। হেতুদর্শনাদ্ হেতুমতি যা সাধ্যতাবচ্ছেদকসামান্যনির্দ্ধারণাবৃত্তির্জায়তে সা অনুমানম্। আপ্তেন দৃষ্টো বানুমিতো বার্থো যেন শব্দেনোপদিশ্যতে তস্মাচ্চ শব্দাৎ শ্রোতুর্যা তদর্থবিষয়াবৃত্তিরুদেতি সা আগম ইতি সংক্ষেপঃ।

প্রমাণবৃত্তি তিন প্রকার প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম। প্রমার যে করণ তাহার নাম প্রমাণ। অনধাবিত অর্থাৎ যাহাবোধের নাম প্রমা, চিত্তের অর্থাকারা বৃত্তিতে চিদাত্মার যে প্রতিবিম্ব তাহাই এই শাস্ত্রে পৌরুষেয় জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাতে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ দ্বারা চিত্তের বিষয়সম্বন্ধ ঘটিলে পর তাহা যে বিশেষ নির্দ্ধারণাবৃত্তির উৎপত্তি হয়, তাহারই নাম প্রত্যক্ষ। হেতুদর্শন হেতু, হেতুবিশিষ্টপদার্থে যে সাধ্যতাবচ্ছেদক সামান্যনির্দ্ধারণা (সাধ্য বা উদ্দেশ্যের যাথার্থ্যাবধারক যে সামান্যনিশ্চয়) বৃত্তির উদয় হয়, তাহার নাম অনুমান। আপ্ত অর্থাৎ বিশ্বস্তব্যক্তিকর্তৃক দৃষ্ট বা অনুমিত অর্থ যে শব্দদ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই শব্দ হইতে শ্রোতার যে তদর্থবিষয়কবৃত্তির উদয় হয়, তাহার নাম আগম।

নৈয়ায়িকেরা উপমানকেও প্রমাণ মধ্যে গণ্য করেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রমাণ চারি প্রকার। কিন্তু পাতঞ্জলবেত্তা পণ্ডিতগণ তাহাকে অনুমান মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন।

ইহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে হইলে এইরূপ বলা যাইতে পারে। যেমন কোনও ধাতুদ্রব্য দ্রবীভূত করিয়া ছাচে ঢালিলে তাহা যেমন অবিকল ছাঁচের আকার ধারণ করে, সেইরূপ জীবগণের মন বাহ্য বস্তুতে সংযুক্ত হইবামাত্র ঠিক তদাকারে পরিণত হয়। মনের সেইরূপ পরিণামকেই আমরা সাধারণতঃ জ্ঞান বলিয়া থাকি, যোগশাস্ত্রকারেরা তাহাকে বৃত্তি বলিয়া থাকেন। মনোবৃত্তি সকল অবলম্বিত পদার্থের অবিকল সাদৃশ্যে উৎপন্ন হইলেই তাহা প্রমা বা সত্যজ্ঞান নামে পরিচিত হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রকার প্রমাণ দ্বারাই ঐ প্রমার উৎপত্তি হয়। এক্ষণে বিপর্য্যয় বৃত্তির বিষয় উক্ত হইতেছে।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥

যস্য যৎ পারমার্থিকং রূপং তস্মিন্ ন প্রতিষ্ঠতীত্যতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্। অতথাভূতেহর্থে তথাভূততয়োৎপদ্যমানং মিথ্যাজ্ঞানং বিপর্য্যয় ভ্রম ইতি যাবৎ। অস্যৈব ভেদাঃ পঞ্চক্লেশা ইত্যগ্রে স্ফুটীভবিষ্যতি।

যাহার পারমার্থিক বা যথার্থরূপ যাহা, তাহাতে যাহা প্রতিষ্ঠিত বা স্থির থাকেনা, সেই মিথ্যাজ্ঞানই বিপর্য্যয় বা ভ্রম। আরও সরল করিয়া বুঝাইতে হইলে এইরূপ বলিতে হয় যে, যে জ্ঞান মিথ্যা, যে জ্ঞান পূর্ব্বরূপে স্থায়ী হয় না অর্থাৎ এক সময়ে যে জ্ঞান জন্মিল অন্যক্ষণে সেই জ্ঞান স্থির না থাকিয়া অন্যপ্রকার হইয়া গেল, তাহার নামই বিপর্য্যয়। পূর্ব্বে যে ছাচের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, এই বিপর্য্যয় জ্ঞান তাহার বিপরীত অর্থাৎ ছাচের ঢালিবার দোষে যাহা ঠিক ছাচের আকারে না হইয়া অন্য প্রকার হইয়া যায়, তাহাকেই বিপর্য্যয় কহে। এক কথায় বলিতে হইলে, যে বস্তু যাহা নহে তাহাতে তদ্‌বুদ্ধির উদয় হইলে

তাহাই মিথ্যাজ্ঞান বিপর্য্যয় বা ভ্রম। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, শুক্তিতে রজত জ্ঞান, মরীচিকায় বারিবুদ্ধি, শরীরাদিতে আত্মত্ব বুদ্ধি ইত্যাদি।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥ ৯ ॥

শব্দজন্যং জ্ঞানং শব্দজ্ঞানং তৎ অনুপতিতং শীলং যস্য স তথোক্তঃ। বস্তুশূন্যো নির্বিষয়ঃ তাদৃশো যোঽধ্যবসায়ঃ স বিকল্পঃ। নরশৃঙ্গাদি শ্রবণ সমনন্তরমবশ্যমেব ভবতি নির্বিষয়া বৃত্তিঃ। তস্যা যো বিষয়ো নর শৃঙ্গাদিঃ স নাস্তীতি তস্যা নির্ব্বিষয়ত্বম্। তস্যা বিপর্য্যয়বৎ বাধো নাস্তীতি পূর্ব্বোক্তাৎবিপর্য্যয়াদ্ ভেদঃ।

কেবল কথায় যাহা প্রতিপন্ন কিন্তু বস্তু শূন্য তাহাই বিকল্প। ফলতঃ বস্তু নাই অথচ শব্দজন্য একরূপ মনোবৃত্তি জন্মে; সেই মনোবৃত্তির নাম বিকল্প। যেমন আকাশ-কুসুম, নরশৃঙ্গ, শশশৃঙ্গ বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদি। আকাশপুষ্প নাই অথচ তাহা শুনিবামাত্র মনোমধ্যে এক প্রকার প্রবৃত্তির উদয় হয়। দুইটি পদার্থে একটি মাত্র মনোবৃত্তি জন্মিলেও তাহা বিকল্প বৃত্তি হইবে। পদার্থ একটি কিন্তু শব্দ প্রভাবে দুইটি সংশ্লিষ্ট বৃত্তি জন্মিলেও তাহাও বিকল্প বৃত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। আত্মা ও চৈতন্য পদার্থ বস্তুতঃ একবস্তু হইলেও আত্মার চৈতন্য এইরূপ বলিলে দুইটি সংশ্লিষ্ট বৃত্তির উৎপত্তি হয়। চৈতন্য বিশিষ্ট মূল বুদ্ধিতত্ত্ব রূপ অহংতত্ত্ব বস্তুতঃ দুই বস্তু কিন্তু অহং বা আমি, এই শব্দের দ্বারা একভিন্ন দুইটি বৃত্তি বা জ্ঞান জন্মেনা। অতএব বস্তুর যথার্থ স্বরূপ বিবেচনা না করিয়া পদার্থান্তর কল্পনাত্মক মিথ্যা বৃত্তির নাম বিকল্প।

অভাব প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তি নিদ্রা ॥ ১০ ॥

কার্য্যং প্রতি অযতে গচ্ছতীতি প্রত্যয়ঃ কারণম্। অভাবে জাগ্রৎ স্বপ্ন বৃত্তীনাং প্রবিলয়ে কারণং তমঃ। তদেব আলম্বনং বিষয়ো যস্যাঃ সা তথোক্তা বৃত্তি নিদ্রোচ্যতে।

যাহাতে সমস্ত মনোবৃত্তি লীন হয়, সেই অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যখন মনোবৃত্তি উদিত থাকে, তখন তাহা নিদ্রা বা সুষুপ্তি নামে উক্ত হয়। আরও যখন বাহ্য বোধের নিরোধ হয়, তাহাকে নিদ্রা কহে। বাহ্য পদার্থ বোধের অভাবের প্রত্যয় হইলেই তখন নিদ্রা হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ—

শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্ন।

গোপাল নায়ক ও আমীর খস্রু।

১ম খণ্ড ৫৯৩ পৃষ্ঠার পর।

২

যাহা হউক খস্রুর বুদ্ধিকে ধন্য। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে উক্ত প্রকার জয় আমীর খস্রুর পক্ষে সেরূপ গৌরবজনক না হইলেও কভু যে তাহা সঙ্গীতে অবুদ্ধিমত্তা ও অক্ষমতার পরিচায়ক নহে ইহা নিঃসংশয়।—যেহেতু রাগে রাগ মিশ্রিত করিয়া তিনি নূতন প্রকার রাগরাগিণী উদ্ভাবনে সমর্থ হইয়াছিলেন তো। তাঁহার এই রাগোদ্ভাবনী ক্ষমতা অবিমিশ্রপ্রাণ না হইলেও অসাধারণ গুণবিশিষ্ট—যে গুণবলে দিল্লী সাঙ্গীতিক পরাভব হইতে রক্ষা পাইল।

এখানে অনেকে মনে করিতে পারেন যে ঐরূপ রাগে রাগ মিশাইয়া নূতন রাগের উপসৃষ্টি করা এত কি দুরূহ বিষয় যাহার জন্য খস্রু প্রশংসনীয় হইতে পারেন। তাহাতে উত্তর এই যে তাহা যতটা আমরা সহজ বলিয়া মনে করি ততটা নহে; তাহা হইলে প্রত্যেকেই অতি সহজে—অনায়াসে এক একজন সঙ্গীতবিশারদ ব্যক্তি হইতে পারিতেন।

অপরের রাগের সাহায্যে হইলেও, পৃথক্ রাগাদির মিলনে নবরাগের সঞ্চার কার্য্য যে সে লোকের বুদ্ধিবলে হয় না, তাহাতে বিশেষরূপ সূক্ষ্ম সাঙ্গীতিক প্রাণ চাই; যাহার অভাবে, তড়িৎবিনা যেমন উদজান ও অম্লজান পৃথক্ বায়ুদ্বয় কাছাকাছি একত্রে থাকিলেও মিশিয়া জলে পরিণত হইতে পায় না, সেইরূপ পৃথক্ রাগসমূহও সফল সংযোগলাভে সমর্থ হয় না।

আমীর খস্রুর অন্তরে সঙ্গীতসুধা অন্তঃসলিল হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত ছিল বলিয়াই যেমন তাহা কোন কার্য্যসূত্রে আহত ও খনিত হইল অমনি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সাঙ্গীতিক সূক্ষ্ম বুদ্ধি আদো না থাকিলে তিনি কখন শ্রুতমাত্রেই অন্যের রাগসংযোগে অমন রাগবর্ণ সমন্বেব জন্ম দান করতঃ সভাশুদ্ধ চকিতে চমকিত করিতে পারিতেন না। সঙ্গীতের গূঢ় প্রবাহবলেই তিনি অত সত্বর গোপাল নায়কের রাগরাগিণী বুঝিয়া লইতে সমর্থ হইলেন এবং তাহাদিগের প্রাণে আরব ও পারসীক রাগের প্রাণ সম্মিলন দ্বারা অচিরে বার তের প্রকার রাগরাগিণী উদ্ভাবন করিয়া ফেলিলেন:—এরাক নামে এক পারসীক রাগ লইয়া তাহার একাংশ গারার সহিত মিশ্রিত করিয়া, মতান্তরে টৌড়ির সহিত এরাকের অঙ্গ মিশ্রিত করতঃ, একটী রাগ প্রস্তুত করিলেন তাহার নাম খস্রু দিলেন মোহিয়র। এই মোহিয়র মিহির বলিয়াও কেচিৎ কথিত হইয়া থাকে। খস্রু এই রাগটী প্রথমতঃ উদ্ভাবিত করিলেন। দ্বিতীয়তঃ পূরবীতে গৌরা, গুণকেলী ও পারসীক এক রাগের মিশ্রণদ্বারা অথবা মতান্তরে পূরবীবিভাসের সহিত পারসীক রাগ মিশাইয়া

একটী রাগ রচনা করিলেন, তাহার সাজগিরি আখ্যা দিলেন। তৃতীয়তঃ হিন্দোলেতে পারসীক রাগের মিলন সাধনের দ্বারা একটী রাগ প্রস্তুত করতঃ তাহার ইয়ামন নামকরণ করিলেন; এই ইযামন কাহারও মতে ইমন, আবার কোন মতে তাহা নহে; পরন্তু আমার পূর্ব্বোক্ত মতের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে কারণ এমন এমন ইমন আছে যাহার সহিত হিন্দোলের তুলনা করতঃ উভয় রাগকে ভালরূপে আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে ইমনের প্রাণের মধ্যে হিন্দোলের ছায়া কম বর্ত্তমান নহে। ইহা গায়কেরা অত্যন্ত গভীরভাবে তলাইয়া না দেখিলে সহজে ধরিতে পারিবেন না। চতুর্থতঃ সারঙ্গ ও বসন্তের সঙ্গে পরবস্তের এক রাগের সংযোগ সাধন পূর্ব্বক ওসাক নামে এক রাগ প্রকাশ করিলেন। পঞ্চমতঃ, টোড়ি ও মালশ্রীতে দোগা বলিয়া এক পারসীক রাগ ও আরবী হোসেনী রাগ মিলিত করিয়া মওয়াফেক নামে একটী রাগ উদ্ভাবিত করিলেন; এই মওয়াফেককে দেওয়ালী বলিয়াও কেহ কেহ কহেন। ষষ্ঠতঃ পুরবীতে পারসীক রাগ মিশাইয়া গানম্ বলিয়া একটী রাগ প্রস্তুত করিলেন। সপ্তমতঃ খটে একটী পারসীক রাগের অল্পাংশ মিশাইয়া জিলফ রাগ তৈয়ারি করিলেন; পূর্ব্ব পূর্ব্ব ওস্তাদেরা খট ও জিলফকে প্রায় একই চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। অষ্টমতঃ, গুণকেলির সঙ্গে গওরা সম্মিশ্রিত করিয়া ফরগণা নামে এক পারসীক ধাঁচের রাগ প্রস্তুত করিলেন। নবমতঃ গৌড়সারঙ্গেতে পারসীক রাগ সংযুক্ত করিয়া, কিম্বা ভিন্নমতে, গৌড়, বেলাবল ও পুরবীর সঙ্গে পারসীক রাগের সম্মিলনে, অথবা মতান্তরে, মল্লার ও টোড়ির সহিত একটী রাগ মিশাইয়া সরফরদা রাগ গড়িলেন। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখিতেছি, কেহ এই একটী রাগ গড়িতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রাগমিশ্রণের বিধান দেখিয়া যেন আশ্চর্য্যান্বিত না হন ও ইহা অসঙ্গত মনে না করেন যেহেতু ইহা সকলেই জানেন বোধ হয় যে সংসারে বিভিন্ন মার্গের দ্বারা একটী লক্ষ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আরও দেখুন, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকরণের নানা নিয়ম প্রণালীর দ্বারা একই ভাষার ভাষ্য কীর্ত্তিত হইতেছে, পুনশ্চ চিত্ররাজ্যেও দেখা যায় যে কোন একটী চিত্ররাগ এক এক শ্রেণীর বিচিত্র বর্ণদানের দ্বারা পরিস্ফুরিত করা যায়।—দশমতঃ, দেশকারকে পারসীক রাগরঞ্জিত করিয়া বাজরি নামে একটী রাগোদ্ভাবন করিলেন। একাদশতঃ, কানাড়া, গৌরি ও পুরবীর সঙ্গে এক পারসীক রাগ মিশ্রিত করতঃ ফরোদস্ত নামক রাগ উপসৃজন করিলেন। দ্বাদশতঃ, কল্যাণের সঙ্গে এক পারস্য রাগ মিলিত করিয়া সনম নামে একটী রাগ উৎপন্ন করিলেন; এবং অতিরিক্ত মতে খস্রু কল্যাণ রাগের সহিত ইমনের সহবাস ঘটাইয়া ইমণ কল্যাণও তৈয়ারি করিয়াছিলেন।

গোপালনায়ক খস্রুর সুকৌশলোদ্ভাবিত এই ত্রয়োদশ প্রকার রাগরাগিণী শ্রবণ করিয়া বিস্মিতভাবে তাঁহার রাগমিশ্রণচাতুর্য্যকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। গোপাল, আমীর খস্রুর রাগমিশ্রণপাণ্ডিত্যে বড়ই

মুগ্ধ হইয়াছিলেন—খস্রু এরূপ সুচারুরূপে সুবুদ্ধিসহকারে মিলনকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন যে গোপালের তদ্বিশ্লেষণে ভালরূপ সামর্থ্য ছিল না, তিনি সেই মিলনদলের উপাদানসমূহ ধরিতে ছুঁইতে পারেন নাই; শেষে নায়কশ্রেষ্ঠ নিজমস্তক হইতে তিন তুম্বি খুলিয়া খস্রুকে প্রদান করিলেন এবং আপনার তুল্যব্যক্তিরূপে গ্রাহ্য ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন। খস্রু এইরূপে নায়কসমতা লাভপূর্ব্বক নায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। গোপালের সহিত খস্রু এখন তুল্যমূল্যতা লাভ করিলেন, কিন্তু তিনি যদি দক্ষিণানেতাকে বিশুদ্ধরূপে, একেবারে পরসহায়তাহীন স্বোদ্ভাবনীশক্তিপ্রভাবে জয় করিতে সমর্থ হইতেন তাহা হইলে তিনি গোপালের নিকট হইতে চতুতুম্বি অর্থাৎ তাহার জয়লব্ধ সমুদয় তুম্বি লাভ করতঃ ভারতে নায়কসিংহাসনে আসীন হইতে সক্ষম হইতেন।

এই জয়ব্যাপারে বুঝিতে পারা যায় যে খস্রুর রাগোদ্ভাবনে কম মৌলিকতা ছিল না। কিন্তু তাহা স্বতন্ত্রভাবাপন্ন না হইয়া পরতন্ত্রভাবাপন্ন ছিল।—স্বাতন্ত্রিক মৌলিকতা প্রত্যক্ষভাবে স্বভাব হইতে গৃহীত হয়, কিন্তু পারতন্ত্রিক মৌলিকতা প্রকৃতি হইতে পরোক্ষভাবে অনুকৃত হইয়া থাকে। ইহাও ঐকান্তিক অভ্যাসের ফল, তদ্ব্যতিরেকে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা দুষ্কর।—অনভ্যস্ত ব্যক্তি তাহাতে নির্জ্জীবতা আনিয়া ফেলে।—যেমন বাল্মীকৃত পরের চিত্র পাইলেও চিত্রে অপটু ব্যক্তি তৎসাহায্যে কোনরূপ নূতন বিষয় কিছু বাহির করিতে পারেন না, আনিতে গেলে চিত্রে সামঞ্জস্যহীনতা আনিয়া ফেলেন, সেইরূপ রাগে অকবি ও রাগসকল করতলন্যস্তবৎ পাইলেও তৎসাহায্যে নব রাগ তৈয়ারি করতঃ রাগোদ্ভাবনে পারতন্ত্রিক মৌলিকতাও দেখাইতে সমর্থ হয়েন না। পারতন্ত্রিক মৌলিকতা আনয়ন করাও কম গুণীর কার্য্য নহে। যেহেতু অপরের রাগরাগিণী লইয়া ভালরূপে পরিপাক না করিতে পারিলে তাহা হইতে পারতন্ত্রিক মৌলিকতার সঞ্চার হয় না। ইহা রাগসমূহের মধ্যে আনিতে গেলে সঙ্গীতদেহে পরকীয় রাগরসের জীর্ণতা উৎপাদনপূর্ব্বক তাহার মধ্যে রাগরক্তের আবির্ভাব করাইতে হয়। অনভিজ্ঞের হাতে তদভাব পরিলক্ষিত হয়। পরকীয় রাগগুলি ভাল পরিপাক না পাইয়া রাগবিপাকরূপে শ্রোতাগণের বিরক্তিকারণ হয়। সংক্ষেপে বিশিষ্টরূপে বৈজ্ঞানিক ধাচে বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে অনভিজ্ঞ অকবি ব্যক্তি রাগগুলি পাইলে তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ শুধু যোগমাত্র সাধন করিতে পারেন কিন্তু অভিজ্ঞ জন তাহাদের গুণ উপলব্ধি করিয়া তাহাদের গুনন বা গুণযোগ সাধনের দ্বারা শ্রোতাদিগের মনকে অনুরক্ত করিয়া তোলেন।

পরকীয় রাগগুলির মধ্যে রাগরক্ত উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিতে খস্রু আশ্চর্য্যরূপ নিপুণ ছিলেন বটে; কিন্তু যখন আমরা তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখি তখন আমরা আর তত বিস্মিত হই না কারণ তিনি একজন অসাধারণ কবি ও মনীষি ছিলেন। পূর্ব্ব প্রস্তাবে তাঁহার রসাত্মক ভাবেরও আভাস

দিয়াছি এবং তাঁহার মনীষিতার সম্বন্ধেও একপ্রকার ইঙ্গিতমাত্র করিয়া আসিয়াছি—বলিয়াছি যে তিনি ত্রয়োদশ বিদ্যার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু আর একটু খুলিয়া বলিলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন যে সেই ত্রয়োদশটী বিদ্যা বড় কম নহে, যা'তা লইয়া যে সেই ত্রয়োদশ বিদ্যা হইয়াছে তাহা নয়। তাহা পারস্যের কয়টী কঠিন বিদ্যা লইয়া গঠিত নিম্নলিখিত কয়টী বিদ্যা তাহার অন্তর্গত ;—তসর্দি (পারস্যের নিদান), তেব (পারস্যের বাগ্‌ভট বা চরক), হেন্দেশা (পারস্যের গণিতশাস্ত্র), হায়েৎ (পারস্যের খগোল গণনাশাস্ত্র), জবর-মোকাবেলা (পারস্যের লীলাবতী), ফেকা (পারস্যের ধর্ম্মশাস্ত্র), এলাহিয়েৎ (পারস্যের বেদ), মনাজেরা (বিচার বা পরীক্ষাশাস্ত্র), মনাজের (অগ্নিবিদ্যা), তবই (সমুদয় বিদ্যার সারসংগ্রহ, বেদান্ত পারস্যের দর্শনশাস্ত্র ও তবইর অন্তর্গত), নজুম (পারস্যের জ্যোতিষ)।

খস্রু শুধু যে এই প্রকার বিদ্যা অধ্যয়নমাত্র করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি তাঁহার রসাত্মক ভাবের সহিত অধ্যয়ন ফল মিশ্রিত করিয়া পারস্য ভাষায় নিরে নব্বইটী গ্রন্থ রচনা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। এই নিরেনব্বই গ্রন্থের প্রায় সকলই কাব্যে লিখিত। কাব্যরচনাই তাঁহার মুখ্য জীবন ছিল। কবি খস্রু বলিয়াই তিনি ভারতে প্রসিদ্ধ, কবি আমীর খস্রু বলিয়াই ইতিহাসাদিতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। দেখা যায় কাব্যেই যেন তাঁহার চরিত্র পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের ঘটনার মধ্যে কবিজনোচিত কেলিই যেন প্রভুত্বলাভ করিয়াছে। গোপাল নায়ককে তিনি যেরূপে পরাজিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কবিজনসঙ্গত একটী কৌশলই প্রকাশ পাইয়াছে ; তাঁহার ঐ কীর্ত্তিটীর মধ্যে একটা কাব্যক্রীড়া স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। তাঁহার ঐরূপ চতুর কার্য্য তাঁহার কল্পনানৈপুণ্যকে দীপ্ত করিয়াছিল, তাঁহার অন্তরস্থ কাব্যেরই গূঢ়দৃশ্য যেন প্রকাশিত করিয়াছিল। কাব্যে তাঁহার সমুদয় জীবন প্রধানতঃ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে ; যথার্থ কবির ন্যায় তিনি অল্পেতেই উচ্ছ্বসিত হইয়া কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেন। প্রকৃত কবির ভাবে তাঁহার হৃদয় অভিভূত হইত। টোগলাকনামা নামক তাঁহার একটা কাব্যরচনা তৎসম্বন্ধে মন্দ সাক্ষ্যদান করে না ; সার্ এইচ্ এম্ ইলিয়ট্ সাহেব বলেন, "দুর্ভাগ্যবশতঃ খস্রু যে সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন সেই সময়ে হিন্দুস্থানে পাপাসক্তি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল ; যাহা হউক তিনি তাঁহার জীবনের শেষাংশে কতিপয় বৎসর ভারতে ঘায়েস্ উদ্দীন টোগলাক নামে একজন ন্যায়বান্ রাজপুত্রকে সিংহাসনারূঢ় দেখিতে পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন, এবং সুখে টোগলাকনামা নামক কাব্য লিখিয়াছিলেন।" কবির হৃদয় সদ্‌গুণ দেখিলেই গুণবর্ণনায় আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে ; কবি খস্রুর ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল, তিনি ন্যায়পরায়ণ রাজপুত্র ঘায়েস্ উদ্দীন টোগলাকের সদ্‌গুণ দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না অমনি তাহা কাব্যোচ্ছ্বাসে ধ্বনিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন,

তাঁহার কাব্যানল কেহই নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হয় নাই, তিনি বিচিত্র-ভাবে তাঁহার কাব্যগ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার ইষথিয়া (আসক্তি-আষথ্) নামক গ্রন্থে প্রেম-বিষয়ক কবিতাসমহ লিখিয়া গিয়াছেন; তাহার মাৎলাউল্ আন্ওয়াব্ নামক গ্রন্থে সুফিমতসম্বন্ধীয় কবিতাসকল লিখিত হইয়াছে; তাঁহার দিবান (দিব্য—Divine) নামক কাব্যের কবিতাগুলি প্রধানতঃ সগূঢ়াত্মক দেব-তত্ত্ব এবং স্বর্গীয় প্রেমের উপর লিখিত; ইহার কবিতাগুলি সুরে বসাইয়া সুফি অর্থাৎ মুসলমানধর্ম্ম-সন্ন্যাসীরা গাহিয়া থাকেন; এই সকল গান গাহিবার সময় তাহাদের অন্তরে একরূপ ঘোর উচ্ছ্বাসের আবির্ভাব হয়; ইহাকে তাহারা ওয়াজদ্ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক প্রমাদ কহে।

শ্রীহিতেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ষ্টারে চন্দ্রশেখর।

উপযুক্ত চরিত্র সৃষ্টিই কাব্যের চরমোৎকর্ষ—আদর্শ চরিত্র সৃষ্টিই কাব্যের সফলতা। এই আদর্শ যদি প্রকৃত আদর্শ হয়, তবে উপন্যাসের মধ্য দিয়া যে শিক্ষা হয়, ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়াও সেরূপ হয় না।

আদি কবিগুরুদের কত পরে কালিদাস জন্মিয়াছেন—তাঁহাদের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট উপকরণ লইয়া কালিদাস যে চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—তাহাতেই তাঁহার নাম সর্ব্বদেশে অমর হইয়াছে। মহাভারতের শকুন্তলায় ও তাঁর শকুন্তলায় কত প্রভেদ। ভবভূতি উত্তর-রামচরিতে রামের যে আদর্শ লোকের সম্মুখে ধরিয়াছেন—তাহাতেই তাঁহার যশ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। মহাকবি সেক্ষপীয়রকে চরিত্রাঙ্কনী প্রতিভায় কোন পাশ্চাত্য কবিই ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। Lape De Vegga সহস্রাধিক নাটকে শত সহস্র ভিন্ন প্রকৃতির চিত্র আঁকিয়া যাহা না করিতে পারিয়াছেন সেক্ষপীয়র—কেবলমাত্র রোমিও জুলিয়েট, দেসডামিনা, প্রভৃতি দুই তিনটী চিত্রে তাহাকে কতনীচে ফেলিয়া—অমরতা লাভ করিয়াছেন—এই জন্যই গেটে, শিলার, হেইন্ প্রভৃতি কবি ঔপন্যাসিকগণ পাশ্চাত্য সাহিত্য জগতে এত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বাঙ্গালার উপন্যাসকারদিগের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার চরমোৎকর্ষ উদাহরণ। তাঁহার সূর্য্যমুখী, শৈবলিনী, কুন্দ, কমলমণি, ভ্রমর, রজনী, লবঙ্গলতা, চঞ্চলকুমারী, শান্তি ও শ্রী, প্রফুল্ল ও দলনী কাব্য কাননের সম্যক প্রস্ফুটিত আনন্দ উদ্ভাসিত পবিত্র পারিজাত কুসুম। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি খুব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি আধফুটন্ত অবস্থাতেই সুগন্ধে প্রাণ মজাইতেছে—কতকগুলি সরলতা, মলিনতাতে আচ্ছন্ন হইয়া তাহার মধ্য হইতে একটী অদ্ভুত বৈদ্যুতিক শক্তি

মানব হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়াছে। উল্লিখিত স্ত্রীচরিত্রগুলি যেমন একদিকে এক শ্রেণীর আদর্শ আবার অন্যদিকে তেমনি প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, নগেন্দ্রনাথ, অমরনাথ, জীবানন্দ, গোবিন্দ লাল, রাজসিংহ প্রভৃতি আর এক ভাবের আদর্শ।

সৃষ্টসৌন্দর্য্যে বঙ্কিমের "বিষবৃক্ষ" ও "চন্দ্রশেখর" সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে। চন্দ্রশেখরের যাহা অভাব, রজনীতে তাহা পরিপূরিত। কিন্তু চন্দ্রশেখরে আমরা বিশেষ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া যে একটা অদ্ভুত জিনিস পাই—বিষবৃক্ষে তাহা আমরা পাই না। "চন্দ্রশেখরের" "প্রতাপ" সৃষ্টিসৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব উদাহরণ। বঙ্কিম বাবু নিতান্ত সাহসী কবি নিতান্তইনাকি আধ্যাত্মিক তেজপূর্ণ, এই আর্য্য ভূমিতে জন্মিয়াছেন তাই প্রতাপের ন্যায় তেজোময় চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

প্রতাপকে লইয়া চন্দ্রশেখরের মেরুদণ্ড সংগঠিত হইয়াছে। মন্ত্রারূপিণী শৈবলিনী তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া প্রতাপ চরিত্র আরও দৃঢ় করিয়াছে। চন্দ্রশেখর সেই প্রতাপ শৈবলিনী সম্মিলিত, অপরিস্ফুট শরীর গ্রন্থির মধ্যে জীবনীশক্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনটীর কাহাকেও পৃথক করিবার যো নাই। কাহারও শ্রেষ্ঠতা কমাইবার যো নাই—কাহাকেও অপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিবার যো নাই—তাহা হইলেই যেন বোধ হয় কবির প্রতি আমরা মহা অত্যাচার করিলাম।

"চন্দ্রশেখরের" মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ও মনোবিজ্ঞানের কয়েকটী কূট সমস্যার মীমাংসা আছে। একটী অপূর্ব্ব উদ্দেশ্য সাধারণ চক্ষু হইতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ইহার গভীরতম স্তরে বিচরণ করিতেছে। চন্দ্রশেখরকে উপন্যাস বলিয়া ভাবিতে হয় ভাবিও গল্পচ্ছলে পড়িয়া যাও একরূপ দেখিবে। বিশেষ চিন্তার সহিত একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া চরিত্রগুলি আলোড়ন বিশ্লেষণ ও উৎক্ষেপণ করিয়া একটুবেশী নাড়িয়া চাড়িয়া যাও, আরও এক অদ্ভুত পদার্থ দেখিবে। মানবের শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তিগুলি যাহা না থাকিলে মানুষ মানুষ হইতে পারে না, চন্দ্রশেখরের সৃষ্ট চরিত্র কয়েকটীর সহিত পাশাপাশি রাখিয়া তাহাদের কার্য্য কারণ ভাব সম্বন্ধ পরিণাম, ইত্যাদি আলোচনা কর তাহা হইলে চন্দ্রশেখরের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে।

কবি নিজ সৃষ্ট আদর্শ চরিত্রগুলি কোন কোন স্থলে সৃষ্টির যথার্থ অনুকরণে কতক গুলি বা কল্পনা প্রভাবে নূতন সৃষ্টি করিয়া দেখাইয়া থাকেন, কোনগুলি বা Subjective এবং কোনগুলি বা Objective হয়। কোনগুলির আদর্শ বা আমরা এই সংসারের মধ্য হইতে খুজিয়া লইয়া কার্লাইলের মতানুবর্ত্তী হইয়া আমরা সেইগুলির পূজা করি আর কতকগুলি বা আমাদের, দূরবগম্য, আয়াস প্রাপ্য আদর্শ বলিয়া তাহার অনুকরণ করিয়া থাকি।

চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের চরিত্র কেবল মাত্র হিন্দুর দেশেই সম্ভব। হিন্দু কবিই এই প্রকার আদর্শ চরিত্রের অবতারণায় সক্ষম। বিদেশীয় উপন্যাসে আমরা ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র দেখিতে পাই না। পাই না বলিয়াই তাহা পাঠ

করিয়া আমাদের সম্পূর্ণরূপে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। কর্ম্মক্ষেত্র ভাবতে আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ আর্য্যভূমিতে—মানব-হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম প্রবৃত্তিবিশিষ্ট এই এক সময়ে উন্নত ও আদর্শ, এখন অধঃপতিত হিন্দুজাতিতে কেবল প্রতাপের ন্যায় চরিত্রই সম্ভবে।

দুইটী বিভিন্নমুখী ঘটনা, একত্র করিয়া চন্দ্রশেখরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। একটী প্রতাপ শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরকে লইয়া একদিকে গিয়াছে—অপরটী মীর-কাশেম ও দলনীকে লইয়া। আবার এই দুইটী পৃথক ঘটনাস্রোত, কবির কৌশলে এক স্থলে আসিয়া মিশিয়া, পরস্পরের প্রতি ঘাত-প্রতিঘাত উৎপাদন করিয়া উল্লিখিত দুইটী পৃথক ও বিভিন্ন-মুখী স্রোতকে একত্রিত করিয়াছে।

এক্ষণে বিবেচ্য এই—অদ্ভুত ঘটনা-ময় বিচিত্র চরিত্রপূর্ণ চন্দ্রশেখর পাঠ অপেক্ষা তাহার অভিনয়ে কোন বিশেষ লাভ আছে কি না? কবি চন্দ্রশেখর গ্রন্থকে যেরূপ ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে, তাহার যে পূর্ণ নাটকীয় সৌন্দর্য্য সকল স্থলেই বিকশিত হইয়াছে এরূপ নহে। কোন স্থানে ভাব, খুব ফুটন্ত, কোথাও বা আধ বিকশিত। কোথাও বা মানব হৃদয়ের শ্রেষ্ঠভাবগুলি বর্ণনার পূর্ণ দীপালোকে—উজ্জলভাবে, সাধারণ-চক্ষের উপর জাগিয়া উঠিয়াছে—আবার কোথাও বা সেগুলিকে বিশেষ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইয়াছে। চন্দ্র-শেখর পাঠে যে ফল—অভিনয় দর্শনে সেই ফলের সার্থকতা। পাঠে—হৃদয় যে একটী অপূর্ব্বভাব কি--যেন কি-এক একটা সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ-স্রোতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—যথাযথ অভিনয় দর্শনে সেই অপূর্ব্ব ভাবের আরও পরিপুষ্টি হয়—সেই কি—যেন—কি—একটী ভাব যেন পূর্ণ-শক্তিতে উত্তেজনা আনিয়া দেয়। দৃশ্য-কাব্যখানি পড়িলে মনের ভাবগুলি কেবল মনের মধ্যেই উত্তেজিত ভাবে বিচরণ করিতে থাকে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অভিনয় দেখিলে সেই উত্তেজিত ভাবের সহিত একটা আকাঙ্ক্ষা, পরি-তৃপ্তি, চিত্তপ্রসন্নতা ও সর্ব্বাপেক্ষা একটী স্থায়ী সহানুভূতি, সৌন্দর্য্যবোধ, অত্যা-চারে ঘৃণা, পাপে বিতৃষ্ণা, প্রণয়ে দৃঢ়তা, কর্ত্তব্যে কর্ম্মক্ষমতা প্রভৃতি ভাবের আবির্ভাব হয়। নাটক ছায়া—প্রকৃত অভিনয়, তাহার শরীর, নাটক, নাটক-তেজ, অভিনয় কার্য্যকারী ব্যক্তি, নাটক জীবন শিক্ষাদাতা, অভিনয় সজীব শিক্ষাদাতা। নাটকে আকাঙ্ক্ষা, অভি-নয়ে পরিতৃপ্তি, নাটকে পিপাসা, অভি-নয়ে নিবৃত্তি, নাটকে ইচ্ছা ও আগ্রহ, অভি-নয়ে তাহার সার্থকতা ও স্থিরতা। নাটকে যাহা পরিস্ফুট—অভিনয়ে তাহা আরও পরিস্ফুট, নাটকে যাহা ফল—অভিনয়ে তাহা গন্ধ, পাঠের ফল নির্ব্বাক্‌,—হৃদয়ের এক কেন্দ্রগত; অভিনয়ের ফল স্ফুটবাক্‌, হৃদয়ে বৈদ্যুতিক ইতস্ততঃ ব্যাপী তেজ-সঞ্চারকারী। কাব্য বৃক্ষ, অভিনয় ফল, কাব্য-সৌন্দর্য্য, অভিনয় উপভোগ, কাব্য-কোমলতা, অভিনয় স্পর্শজ্ঞান, কাব্য-মেঘ, অভিনয় জল, কাব্য-তেজ, অভিনয় বিদ্যুৎ। একে উত্তেজনা অপরে স্থায়ীভাব, একে আকাঙ্ক্ষা অপরে তাহার চরিতার্থতা, একে বাসনা অপরে তাহার সার্থকতা, একে বিলাস অপরে তাহার পরিতৃপ্তি। যাহা কল্পনার—

অভিনয়ে তাহা সত্য, যাহা অপরিস্ফুট—অভিনয়ে তাহার পরিস্ফুট, যাহা নিদ্রিত—অভিনয়ে তাহা জাগরিত। অভিনয়ের ফল এত বলিয়াই "টুকী" আখ্যাধারী নাট্য-সম্প্রদায় নবপিশাচ নাদের সাহের সম্মুখে অভিনয় দ্বারা দিল্লীর হত্যাকাণ্ড হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

মূল পুস্তক বঙ্কিম বাবুর। নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন নটপ্রবর বাবু অমৃতলাল বসু। অমৃত বাবু কেবল দক্ষ অভিনেতা নহেন। তিনি নিজে একজন বিখ্যাত নাট্যকার। তাঁহার "তরুবালা" একখানি মনোহর নাটক। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর এরূপ নাটক বাঙ্গালার নাটকীয় সাহিত্যে অতি অল্পই জন্মিয়াছে। বঙ্কিমের চন্দ্রশেখরের নাটকাকারে পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অমৃত বাবু বহুকাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছেন। কবির সৃষ্ট সৌন্দর্য্যগুলির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া Dramatise করিবার জন্য তিনি বিশেষ পরিশ্রম, চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। নিজে যে সকল স্থানে কলম চালাইয়াছেন, নূতন দুই চারিটী চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে নাটকীয় সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই। তিনি বিশেষ সাবধানতার সহিত কবির সৃষ্ট-সৌন্দর্য্য ও ভাবের সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া "চন্দ্রশেখর" নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহার হাতে চন্দ্রশেখরের মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে, ইহাতে আমরা তত সন্তুষ্ট নহি কিন্তু কোন প্রকারে মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য হানি হইলে, আমাদের দুঃখের ইয়ত্তা থাকিত না।

চন্দ্রশেখরের প্রথম ও প্রধান চরিত্র প্রতাপ। নাটকের যে টুকু Romance তাহা প্রতাপকে লইয়া। প্রতাপ-শৈবলিনী এক বৃন্তে দুইটী ফুল। প্রতাপ কিশোর বয়স্ক, শৈবলিনী সাত আট বৎসরের বালিকা। বালক-বালিকা ভাগিরথী তীরে বসিয়া সান্ধ্য-জলকল্লোল শ্রবণ করিত, নীলাকাশে তারকা গুণিত, মালা লইয়া বিবাদ করিত, নৌকা গুণিত, নৌকার দাঁড়ের জলে কেমন সোনা জলিত তাহাই দেখিত।

কিন্তু "বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে" কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক; প্রতাপ-শৈবলিনীর বিবাহ হইল না—সমাজ প্রতিবন্ধকতা করিল। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা, ভালবাসা হইল—সেই ক্ষুদ্র, পবিত্র পারিজাতবৎ শুভ্র সৌন্দর্য্যশালী কোমল হৃদয়ে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইল, কিন্তু ফলিল না। দুইটী একমুখগামী তরঙ্গ একদিকে তীব্র বেগে আসিতেছিল, সহসা বাধা পাইয়া দুইটা বিভিন্ন মুখে প্রতিধাবিত হইল।

"বাল্য প্রণয়ে অভিশাপ" থাকিলেও, সমাজ প্রতিবন্ধকতা করিলেও "অঙ্কুরে বীজের" গুণ কোথায় যাইবে? প্রতাপ কথাটা ভাল করিয়া বুঝিল, কিন্তু তখন কিশোর-যৌবনের সন্ধিস্থল। যৌবনের আধ ফুটন্ত, উদ্দাম প্রবৃত্তি সে কথঞ্চিৎ দমন করিল বটে, কিন্তু শৈবলিনী তাহাও পারিল না। শৈবলিনী জীবনেও এ প্রকৃতি দমন করিতে পারে নাই। তাই চন্দ্রশেখর এত পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

তখনও শৈবলিনীর অন্যত্র বিবাহের সম্বন্ধ হয় নাই। অবস্থা হীনতাই তাহার

মূল কারণ। প্রতাপ শৈবলিনী নিজ নিজ অবস্থা বুঝিল, একদিন গোপনে মন্ত্রণা করিয়া উভয়ে গঙ্গাস্নানে গেল। প্রতাপ শৈবলিনীকে ডাকিল—"আয় শৈবলিনী সাঁতার দিই।" অনেক দূর গিয়া প্রতাপ বলিল—"শৈবলিনি! এই আমাদের বিয়ে।" শৈবলিনী বলিল—"আর কেন এইখানেই", প্রতাপ ডুবিল।

শৈবলিনী ডুবিল না। তাহার কারণ শৈবলিনীর উপাদানে আকাঙ্ক্ষা বলিয়া একটা পদার্থ ছিল। এই "আকাঙ্ক্ষা" তাহাকে আজীবন পরিচালিত করিয়াছে। "আকাঙ্ক্ষার" পতন—"পরিতৃপ্তিতে"। "পরিতৃপ্তি" তখন কোথায়? শৈবলিনী ভাবিল—"প্রতাপ আমার কে? আমার ভয়করে আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে আসিল।

"আত্মবিসর্জ্জনের" এই খানেই প্রথম প্রতিষ্ঠা হইল। কবি যে অপূর্ব্ব চিত্র ভবিষ্যতে চিত্রিত করিবেন তাহার প্রথম রং এইখানেই ফলান হইল। শৈবলিনী-প্রতাপ নাটকের বীজ এইখানেই প্রোথিত হইল।

প্রতাপ মরিল না—একজন নৌকারোহী তাহাকে আসিয়া উদ্ধার করিলেন। উদ্ধার কারী স্বয়ং চন্দ্রশেখর। ইহার পর প্রতাপ শৈবলিনীর মধ্যে আর একটী দুশ্ছেদ্য ব্যবধান জন্মিল চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহ হইল।

এই ঘটনার পর হইতে প্রকৃত নাটকের সূচনা হইয়াছে। অমৃত বাবু এইখান হইতেই তাহার অনুসরণ করিয়াছেন।

প্রতাপ শৈবলিনী বিচ্ছিন্ন হইল। আজন্ম বর্দ্ধিত মাধবী সহকার হইতে চ্যুত হইয়া অপর এক মহাতরুর সহিত সম্মিলিতা হইল। চন্দ্রশেখর বিবাহ করিলেন দুইটা উদ্দেশ্যে—এক বিবাহ না করিলে তাঁহার সংসার চলেনা; সংসারিক কার্য্যে নিয়ত ব্যস্ত থাকিতে গেলে তাঁহার আযৌবন পরিপুষ্ট শাস্ত্র চর্চ্চায় ব্যাঘাত হয়। তার উপর শৈবলিনী সুন্দরী—

শৈবলিনী জীবনের এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনে অপরের ধর্ম্ম-পত্নী হইয়াও প্রতাপকে ভুলিতে পারিল না। দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তখন তাহার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে স্তরে স্তরে জ্বলিতে ছিল। প্রতাপ যখন বেদগ্রামে আসিয়া চন্দ্রশেখরের বন্দোবস্ত অনুসারে সুন্দরীর ভগিনী রূপসীকে বিবাহ করিলেন তখন উভয়ের আবার দেখা সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। প্রতাপ সে কথাটা বড় স্থির ভাবে আলোচনা করিয়া শৈবলিনার "বিষের ভয়ে" বেদগ্রাম ত্যাগ করিলেন।

শৈবলিনীর বাল্য প্রণয়—যৌবনের সমাগমে আরও বাড়িয়া উঠিল। একদিকে আসঙ্গ লিপ্সা অপর দিকে সমাজ, একদিকে প্রবৃত্তি অপর দিকে নিবৃত্তি একদিকে সংসার ধর্ম্ম অপর দিকে প্রেমধর্ম্ম, একদিকে বিরাগ অপর দিকে অনুরাগ, শৈবলিনীর সেই ক্ষুদ্র হৃদয়কে আরও আলোড়িত করিয়া তুলিল। প্রতাপ শৈবলিনীর সম্মুখ হইতে পলাইলেন বটে, কিন্তু তাহার মনোরাজ্য তিনি পূর্ণ প্রভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখরের সহিত তাহার বিবাহ শরীরের—মনের বিবাহ প্রতাপের সঙ্গে। শৈবলিনী ও প্রতাপের প্রেম, রোমিও

জুলিয়েটের মত প্রথম সন্দর্শন জনিত নহে। তাহা হইলে সব আপদ চুকিয়া যাইত। এ প্রেম বাল্য পরিপুষ্ট, কিশোরে পরিমার্জ্জিত, যৌবনে সম্যক উদ্ভাসিত। শৈবলিনী প্রতাপের জন্য ব্যাকুল হইল দেশ না ছাড়িলে সে প্রতাপের সহিত মিলিত হইতে পারিবেনা কাজেই সে ফষ্টরের সঙ্গে দেশত্যাগ করিল।

"আকাঙ্ক্ষা" অপেক্ষা ভয়ানক পদার্থ আর বুঝি কিছুই জগতে নাই। ইহা নির্জীব হৃদয়ে তাড়িত শক্তি উচ্ছাসিত করিয়া দেয়; ভীতকে সাহসী করে। প্রেমের প্রথম অবস্থায় "আকাঙ্ক্ষা" বড় প্রচ্ছন্ন থাকে। "প্রেম" "রিপুতে" পরিণত হইলে "আকাঙ্ক্ষা" তাহার সহিত সাহস ও উৎসাহ আনিয়া দেয়। শৈবলিনীর তাহাই হইয়া ছিল। শৈবলিনী অসীম সাহসে ভর করিয়া গৃহত্যাগ করিল। ফষ্টর কেবল তাহার কার্য্যোদ্ধারের অতি সামান্য অধিরোহণী—কিন্তু যতটা প্রথমে সহজ বোধ হইয়া ছিল শেষটা ততটা রহিল না। শেষ ঘটনাবশে প্রতাপকেই শৈবলিনীর উদ্ধার জন্য ধাবিত হইতে হইয়াছিল। এই খানেই কবি—সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের আর একটী মুখ খুলিয়া দিয়াছেন। প্রতাপ শৈবলিনী উদ্ধার করিল নিজের স্বার্থে নহে, শৈবলিনীর জন্যও নহে কেবল চন্দ্রশেখরের জন্য, যে চন্দ্রশেখর তাহাকে জীবন দিয়াছেন, যাঁহা হইতে তিনি দারিদ্রতার ভীষণ ক্রোড় মুক্ত হইয়া একজন "মান্যগণ্য" জমিদার হইয়াছেন সেই চন্দ্রশেখরের স্ত্রী সেই শৈবলিনী।

শৈবলিনী—ফষ্টর সঙ্গ মুক্তি লাভের পর ঘটনাবৈগুণ্যে প্রতাপের গৃহেই স্থান প্রাপ্ত হইল। প্রতাপ বাড়িতে আসিয়া দেখিলেন পালঙ্কে শয়ানা শৈবলিনী। প্রতাপ "জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন শ্বেত শয্যার উপর কে যেন নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুম রাশি ঢালিয়া দিয়া গিয়াছে, প্রতাপ স্থির হইয়া সেই অনিন্দ্য যৌবন প্রস্ফুটিত মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। তিনি ইন্দ্রিয় জয়ী বীর পুরুষ, ইন্দ্রিয় বশ্যতা তাঁহার এতাদৃশ আগ্রহময় দর্শন কারণ নহে। একটা অতি সুন্দর কিছু দেখিলে যেমন লোক বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া থাকে ইহাও সেই রূপ।" অনেক দিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল, সহসা স্মৃতি সাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ প্রহৃত হইতে লাগিল।

শৈবলিনী নিদ্রাযান নাই—মুদ্রিত নয়নে নিজের অবস্থা ভাবিতে ছিলেন। এত চিন্তায় মগ্ন যে প্রতাপের পদধ্বনিতেও তাহার মনোযোগ আকর্ষিত হয় নাই, সহসা দেয়াল রক্ষিত বন্দুক পতনের শব্দে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল শৈবলিনী চাহিয়া দেখিল সম্মুখে প্রতাপ, সেই প্রতাপ যাহার জন্য সে গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল—যে প্রতাপকে নেত্র সম্মুখে রাখিয়া সে পাপিষ্ঠা ফষ্টরের সহিত কথা কহিতে সাহসী হইয়াছিল যে প্রতাপ তাহার জন্য জলে ডুবিয়াছিল কিন্তু সে ডুবে নাই, যে প্রতাপের অনুসন্ধানে সে এত কাণ্ড করিয়া কৃতকার্য্য হয় নাই, সেই প্রতাপ তাহার সম্মুখে। শৈবলিনী আশ্চর্য্যে বলিল—একি এ? কে তুমি?

আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু, যাহা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই,—যাহার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গিয়াছে-যাহার জন্য অনেক কষ্ট

সহ্য করিতে হইয়াছে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ঘুরিয়াছে। তথাপি তাহাকে পাই নাই—সেই আকাঙ্ক্ষার জিনিস যদি সহসা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় ও তাহাতে আসঙ্গ লিপ্সা, অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষা ছদ্মবেশীয় উত্তেজিত মনোবৃত্তি নিরাশায় আশার সঞ্চার, উপস্থিত হইলে মানব প্রকৃতি যেরূপ হওয়া সম্ভব শৈবলিনীরও সেইরূপ হইল—এই গুলি শৈবলিনীর হৃদয়ে—একটা অভূতপূর্ব্ব, অননুভূত উত্তেজনার সৃষ্টি করিল সেই উত্তেজনার—তড়িৎ শক্তিতে শৈবলিনী সংজ্ঞা হারাইল।

ইন্দ্রিয় বিজয়ী বীর প্রতাপের মহা পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। প্রতাপ অপূর্ব্ব আন্তরিক বারত্বের পরিচয় দিয়া শৈবলিনীর সংজ্ঞা প্রদান করিলেন, শৈবলিনী স্থিরভাবে বলিল, "কে তুমি? প্রতাপ!" না কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছ?

শৈবলিনী বিমুগ্ধা কিন্তু প্রতাপ প্রকৃতিস্থ—শৈবলিনী উত্তেজিতা, প্রতাপ, অচঞ্চল সমুদ্রবৎ স্থির, প্রতাপ বলিলেন "আমি প্রতাপ?"

"তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?

প্রতাপ বলিলেন—এই আমার বাসা শৈবলিনীর হৃদয় মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছিল তাহার নখ পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল, সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতেছিল, সে বলিল, আমায় এখানে কে আনিল?

প্র। আমরাই আনিয়াছি।

শৈ। আমরাই? আমরা কে?

প্র। আমি ও আমার চাকর।

শৈ। কেন তোমরা এখানে আনিলে তোমাদের কি প্রয়োজন?

প্রতাপ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, বলিলেন "তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখ দর্শন করিতে নাই। তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত হইতে উদ্ধার করিলাম, তুমি আবার বল—এখানে কেন আনিলে?"

শৈবলিনী ক্রোধ দেখিয়া ক্রোধ করিল না, বিনীত ভাবে বাষ্প গদগদ হইয়া বলিলেন "যদি ম্লেচ্ছের ঘরে থাকা আমার এত দুর্ভাগ্য মনে করিয়া ছিলে, তবে আমাকে সেইখানে মারিয়া ফেলিলে না কেন? তোমাদের হাতে ত বন্দুক ছিল।"

প্রতাপ বলিলেন—"তাও করিতাম কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়ে করি নাই। তোমার মরণই ভাল।"

শৈবলিনী কাঁদিল—রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল আমার মরাই ভাল, কিন্তু অন্যে যাহা বলে বলুক তুমি আমায় এ কথা বলিও না। আমার এ দুর্দ্দশা কাহা হইতে? তোমা হইতে। কে আমার জীবনকে অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি। কাহার আশায় কুপথ সুপথ জ্ঞান শূন্য হইয়াছি? তোমার জন্য! কাহার জন্য দুঃখিনী হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য গৃহ ধর্ম্মে মন রাখিতে পারি নাই? তোমার জন্য। তুমি আমায় গালি দিও না।"

প্রতাপ বলিলেন, "তুমি পাপিষ্ঠা তাই তোমায় গালি দিই, আমার দোষ! ঈশ্বর জানেন আমি কোন দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন ইদানীং সর্প মনে করিয়া আমি তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়া ছিলাম তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ তোমার প্রকৃতির

দোষ; তুমি পাপিষ্ঠা তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি।"

শৈবলিনী গর্জ্জিয়া উঠিল—বলিল, "তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে! আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কালে কেন তুমি ও রূপের জ্যোতি আমার সম্মুখে জ্বালিয়া ছিলে! যাহা একবার ভুলিয়া ছিলাম, তাহা আমার কেন আমার হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়া ছিলাম? দেখিয়া ছিলাম ত তোমায় পাইলাম না কেন? না পাইলাম ত মরিলাম না কেন? তুমি কি জাননা তোমার রূপ ধ্যান করিয়াই গৃহ আমার অরণ্য হইয়া ছিল? তুমি কি জাননা যে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, যদি কখন তোমায় পাইতে পারি এই আশায় গৃহ ত্যাগিনী হইয়াছি। নহিলে ফষ্টর আমার কে?"

যে কথা কবি এতক্ষণ কৌশল করিয়া প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন যাহা পাঠকের জানা দূরে থাক্—প্রতাপই জানিতে পারেন নাই পাপিষ্ঠা শৈবলিনী সেই কথাই নিজমুখে ব্যক্ত করিল।

"তোমার মরণই ভাল" "তুমি পাপিষ্ঠা" এই কথা গুলি শৈবলিনার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। যাহার জন্য সে সর্ব্বত্যাগিনী তাহার এই কথা!! ক্রুদ্ধা শৈবলিনী ভাবিল, "প্রতাপ আমার কে? কে তাহা জানিনা কিন্তু সে শৈবলিনী পতঙ্গের জ্বলন্ত বহ্নি। সে এই সংসার প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ সে আমার মৃত্যু। আমি কেন গৃহ ত্যাগ করিলাম কেন ম্লেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম? কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম না?"

শৈবলিনী—যখন কিছু বুঝিত না, তখন তাহার প্রবল প্রণয় স্রোতে, সমাজ আসিয়া বাধা দিয়াছিল। তখন স্রোত ও তত খর ছিলনা। এখন যৌবনের ষোলকলা ভরিয়া উঠিয়াছে। শৈবলিনার চক্ষু ফুটিয়াছে—দুর্দমনীয় প্রেম তাহাকে সমাজ বিগর্হিত, ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করাইয়াছে—তাহার উপর আবার বাধা।" শৈবলিনী—মহা নিরাশায় ভাসিল, অন্তস্তাপে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। আবার বেদগ্রাম—বেদগ্রামের সুখ-স্মৃতি, চন্দ্রশেখরের দেবতুল্য হৃদয়ের অপার স্নেহ—সবই মনে পড়িল। কবির প্রথম পরিচ্ছেদে নিহিত বীজের ফলোৎপাদন হইল।

তারপর—প্রতাপ শৈবলিনীর জন্যই ইংরাজ হস্তে বন্দী হইলেন। শৈবলিনী এখন প্রতাপের উপর রাগ ভুলিয়া—নিরাশা ভুলিয়া, তাহাকে ইংরাজ হস্ত হইতে উদ্ধার করিল। কিন্তু তখনও প্রতাপ দৃঢ় তখনও তিনি শৈবলিনীর "বিবের ভয়ে আকুল"। তখনও চন্দ্রশেখরের সুখের জন্য আত্মবলি দিতে প্রস্তুত।

এদশা মহা পরীক্ষার। উভয় পক্ষেই আত্মত্যাগ আবশ্যক। কিন্তু এক পক্ষে সাহস অপর পক্ষে ভয়। এক পক্ষে আসক্তি অন্য পক্ষে বিরক্তি—মহা—পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়া উভয়ে নদীতে সাঁতার দিতেছে।

উপরে চাঁদ উঠিয়াছে। চাঁদের কিরণ জাহ্নবীর চঞ্চল তরঙ্গ মালায় প্রতিহত হইয়া শত শত হীরক চূর্ণ উচ্ছ্বসিত করিতেছে। প্রতাপ আজ ইন্দ্রিয় বিজয়ী মহাপুরুষ—মহাপরীক্ষায় তিনি উদ্যোগী

হইয়াছেন, কাজেই তাঁহার আনন্দ। তাঁহাদের জীবনে প্রথম সন্তরণের দিন প্রতিষ্ঠার,—আজ বিসর্জ্জনের; প্রতাপ প্রফুল্ল; শৈবলিনী বিষণ্ণা—শৈবলিনীর হৃদয়ের মরা গঙ্গায় প্রতাপচন্দ্রের মনোহর জ্যোতি আজ অনেক দিনের পর পড়িয়াছে তাহার উপর আবার প্রতাপ সেই চির প্রিয় বাল্য সম্বোধন—"শৈবলিনী সৈ" বলিয়া ডাকিয়াছে। সে আবার কতকাল পরে!! তাই হতভাগিনী শৈবলিনী বলিল, প্রতাপ! আজি এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

প্রতাপ বলিল—চাঁদের! না সূর্য্য উঠিয়াছে!

শৈ। চল তীরে উঠি।

প্র। সৈ—

আবার "সৈ"

শৈ। কি

প্র। মনে পড়ে?

শৈ। কি

প্র। আর এক দিন এমনি সাঁতার দিয়াছিলাম।

শৈবলিনী—তখন ক্লান্ত, একখণ্ড কাষ্ঠ পাইয়া প্রতাপকে বলিল—"ধর" ভর সহিবে।

প্রতাপ বলিল—

মনে পড়ে—তুমি ডুবিতে পারিলে না আমি ডুবিলাম?

শৈ। মনে পড়ে। তুমি যদি সেই নাম ধরিয়া আজ না ডাকিতে তবে আজ তার শোধ দিতাম। কেন ডাকিলে?"

বড় শক্ত কথা। গভীর সমস্যা। কে বল দেখি ইহার রহস্য ভেদ করিবে? প্রতাপ বলিলেন—"তবে মনে আছে যে আমি মনে করিলে ডুবিতে পারি।

শৈবলিনী শঙ্কিতা হইয়া বলিল—"চল প্রতাপ চল তীরে উঠি?

প্র। আমি উঠিবনা আজি মরিব। প্রতাপ কাষ্ঠ ছাড়িল।

শৈ। কেন প্রতাপ?

প্র। তামাসা নয়—নিশ্চিত ডুবিব। তোমার হাত। শৈবলিনীর হাত! আজ এতস্থলের মাঝে এত দুঃখের মাঝে তাহার হাত। সে ইচ্ছা করিলে প্রতাপ বাঁচিতে পারে! শৈবলিনী তাহা করিতে প্রস্তুত। বলিল—

কি চাও প্রতাপ! যা বল তাই করিব।

প্র। একটা শপথ কর—তবে আমি উঠিব।

শৈ। কি শপথ প্রতাপ?

শৈবলিনী কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল। তাহার চক্ষে তারা সব নিবিয়া গেল। সে শপথ কি তাহা বুঝিতে পারিল। নীলজল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল। শৈবলিনী রুদ্ধশ্বাসে বলিল-কি শপথ প্রতাপ? শপথ যে কি তাহা কি শৈবলিনী বুঝে নাই!!

প্র। এই গঙ্গার জলে—

শৈ। আমার গঙ্গা কি?

প্র। তবে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বল।

শৈ। আমার ধর্ম্মই বা কোথায়?

প্র। তবে আমার শপথ।

শৈ। কাছে আইস হাত দাও।

বহুকাল পরে প্রতাপ শৈবলিনীর হাত ধরিল।

শৈ। এখন যে কথা বল শপথ করিয়া বলিতে পরিব। কতকাল পরে প্রতাপ!!

প্র। শপথ কর—নহিলে ডুবিব। কিসের জন্য প্রাণ? কে সাধ করিয়া এ পাপ জীবনের ভার সহিতে চায়? চাঁদের আলোয় এ স্থির গঙ্গার মাঝে যদি এ

বোঝা নামাইতে পারি—তবে তার চেয়ে আর সুখ কি?

শৈ। তোমার শপথ—কি বলিব?

প্র। শপথ কর, আমায় স্পর্শ করিয়া শপথ কর— আমার মরণ বাঁচনের শুভাশুভের তুমি দায়ী।

শৈ। তোমার শপথ—তুমি যা বলিবে ইহার জন্যে তাহাই আমার স্থির।

প্রতাপ অতি ভয়ানক শপথের কথা বলিল। সে শপথ শৈবলিনীর পক্ষে অতিশয় কঠিন—অতিশয় মর্ম্মঘাতী, তাহার পালন অসাধ্য। প্রাণান্তকর। শৈবলিনী শপথ করিতে পারিল না, বলিল—

"এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে প্রতাপ"। পাঠক! এমন মর্ম্মভেদী কথা কি কখন শুনিয়াছেন?

প্র। আমি।

শৈ। তোমার ঐশ্বর্য্য আছে—বল আছে, কীর্ত্তি আছে, বন্ধু আছে—ভরসা আছে, রূপসী আছে, আমার কে আছে প্রতাপ?

প্র। কিছু না আইস তবে ডুবিয়া মরি।

এবার শৈবলিনীর চিন্তা নূতন ধরনের। অনেক দিন পূর্ব্বে সে যখন সাঁতার দেয়, তখন বলিয়াছিল—"প্রতাপ আমার কে?" এখন ভাবিল, "আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি? আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন?"

শৈবলিনী শপথে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া প্রতাপ আবার ডুবিল—শৈবলিনী আবার প্রতাপের হাত টানিয়া তুলিল—সে বলিল "আমি শপথ করিব। তুমি একবার ভাবিয়া দেখ। আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ। আমি তোমাকে চাহি না, তোমার চিন্তা ছাড়িব কেন?" কি গভীর আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ প্রেম!! শেষ হতভাগিনী শৈবলিনী শপথ করিল, পবিত্র প্রেমের নিকট আপনার সর্ব্বস্ব বলি দিল, বলিল—"প্রতাপ হাত চাপিয়া ধর। প্রতাপ শুন। তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তোমার মরণ বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন, তোমার শপথ—আজি হইতে তোমায় ভুলিব—আজি হইতে আমার সর্ব্ব সুখে জলাঞ্জলি—আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

বস্তুতঃ এইখানে শৈবলিনী মরিল। আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্তি, আশার সমাধি, নূতন শৈবলিনী গঠন করিল। ইহার পর সে যাহা হইল, তাহার পূর্ব্ব চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। তাহার বিস্তারিত বর্ণনায় আমাদের প্রয়োজন নাই।

তার পর শেষ দৃশ্যে প্রতাপের সহিত আমাদের শেষ দেখা। সে দৃশ্য অতি ভয়ানক—ভীতিবিধায়ক। বোধ হয়, সেরূপ দৃশ্য চন্দ্রশেখরে আর নাই। তাহার পূর্ব্বে আমরা চন্দ্রশেখরের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিব।

চন্দ্রশেখর আধ্যাত্মিকতায় শ্রেষ্ঠ হইতে পারিতেন, কিন্তু কবি বরাবর তাঁহাকে উচ্চ রাখিয়া একস্থলে বড়ই নীচে ফেলিয়া দিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের প্রথম কার্য্যে-পরিচয় প্রতাপের উদ্ধার-সম্পাদনে। তিনি কি ধাতুতে নির্ম্মিত, ইহাতেই তাঁহার প্রথম আভাস। "তিনি ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত" শাস্ত্রপাঠ তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, শৈবলিনীকে

বিবাহ করিবার পরও তিনি সে কর্ত্তব্য ভুলেন নাই। শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম। তিনি স্বামীর মত স্বামী, বালকে যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি সেরূপ করিতে জানেন না। বিধাতা তাঁহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। অধীত গ্রন্থগুলি হৃদয় শোণিতবৎ তাঁহার জীবনের সঙ্গী ছিল, কিন্তু শৈবলিনীর গৃহত্যাগের পর তিনি সেগুলিকেও অগ্নিসাৎ করিয়াছিলেন। শৈবলিনী তাঁহার গৃহে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার গৃহ যেমন ছিল, চলিয়া যাইবার পর তাহা অপেক্ষাও ভীষণ হইল।

তার পর চন্দ্রশেখরের পরোপকার প্রবৃত্তি। তাঁহার পরোপকার যে নিঃস্বার্থ,—কেবল নিষ্কাম আশ্রমী হিন্দুরই উপযুক্ত আর সে পরোপকারিতা ধর্ম্ম যে কেবল কর্ম্মক্ষেত্র ভারতেই সম্ভব ইহার পরিচয়—পথপরিত্যক্তা-দলনী, কলঙ্কিনী শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার ব্যবহারেই বেশ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। শৈবলিনীর প্রতি চন্দ্রশেখর যেরূপ বরাবর অদ্ভুত দয়া প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, গৃহত্যাগিনী কলঙ্কিনী ভার্য্যার বিরহে তিনি যেরূপভাবে সন্ন্যাসীবৎ সংসার-সমুদ্রে বিচরণ করিয়াছেন, মহাপাপিনী শৈবলিনী যেমন পাপ স্বীকার করিল, অমনি তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া দয়ার পাত্রী ভাবিয়া যেরূপ ভাবে উদারতার সহিত পরিচর্য্যা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার উদারতায় আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও সন্দেহান্বিত হই। কিন্তু শৈবলিনী প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপারে শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার উদারতা ও সদ্ব্যবহার ঐ প্রকার ঘটনাস্থলে সাধারণ মনুষ্যের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তাঁহার প্রকৃত আদর্শে যেন একটু কলঙ্কের ছায়া পড়ে। কবি কেন যে এইখানে চন্দ্রশেখরের অদ্ভুত আধ্যাত্মিক চরিত্র একটু মলিন করিয়া দিলেন, তাহা বড়ই রহস্যজনক। প্রায়শ্চিত্তের পরও শৈবলিনী যেরূপভাবে চন্দ্রশেখর কর্তৃক আদৃতা ও পরিগৃহীতা হইলেন, তাহাতে "চন্দ্রশেখর" চরিত্রে একটী আমাদের সহজ জ্ঞান বিরোধী উদারতার প্রকৃত উদাহরণ পাওয়া যায়।

এক্ষণে অভিনয়সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলা আবশ্যক। তিনটী বিষয় লইয়া অভিনয়ের সার্থকতা হয়। (১) দৃশ্যপট ও বেশভূষা, (২) পাত্রনির্ব্বাচন, (৩) গ্রন্থনিহিত চরিত্রচয়ের মর্য্যাদা বুঝিয়া অভিনয়। দৃশ্যপট ও বেশভূষা ঠিক কালানির্দ্দিষ্ট সময়ের ঘটনাবলীর অনুরূপ হইয়াছে। প্রথম দৃশ্য ভীমা পুষ্করিণী, চারিদিকে ঘন তাল গাছের সারি, অস্তগামী সূর্য্যের হেমাভ কিরণ সেই বৃক্ষশিরে পড়িয়াছে, শৈবলিনী ও সুন্দরী আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া ভীমার জলে বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে ধীরে ধীরে লরেন্স ফষ্টরের প্রবেশ বেশ স্বাভাবিক। গুরগন খাঁর মুঙ্গেরের দুর্গ, পার্শ্ব-প্রবাহিনী জাহ্নবীর মনোমোহিনী দৃশ্য বেশ সুসঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী।

তার পর গঙ্গাবক্ষে শৈবলিনী ও প্রতাপ। উভয়ে সন্তরণ করিতেছেন, গঙ্গায় চাঁদের আলো পড়িয়াছে, স্রোতে স্রোতে, তরঙ্গে তরঙ্গে, সেই কিরণরাশি, বিক্ষিপ্ত, স্ফুটিত, চূর্ণীকৃত হইয়া আধ অন্ধকার, আধ আলো, আধ সজীব, আধ নির্জীব ভাবের মধ্যে থাকিয়া অদ্ভুত

শোভার বিস্তার করিতেছে, শৈবলিনীর কেশরাশি জলসিক্ত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত! উভয়েরই ক্লান্তি, অবসাদজনিত কষ্টশ্বাস, আর তাহার মধ্যে ভাবরুদ্ধ কণ্ঠে প্রতাপের "সৈ" "শৈবলিনী" সম্বোধন—শৈবলিনীর শপথ, প্রতাপের আত্মবিসর্জ্জন দৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। ষ্টারের অভিনয়ের সমস্ত কথা ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব হইলেও, গঙ্গাবক্ষে এই মহান্ দৃশ্য ও রণক্ষেত্রের বিভীষিকাময় শেষ অঙ্ক স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলা একটু অসম্ভব বোধ হয়।

পাত্র-নির্ব্বাচনে অমৃত বাবু কৃতিপুরুষ, "চন্দ্রশেখরের" প্রধান প্রধান পাত্রগুলি, যাঁহারা দক্ষ অভিনেতা ও অভিনেত্রী বলিয়া বিখ্যাত তাহাদেরই দেওয়া হইয়াছে। "চন্দ্রশেখরের" প্রধান চরিত্র গুলি, অর্থাৎ চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ও প্রতাপ কবির সৃষ্ট সৌন্দর্য্যের ও আরোপিত ভাবের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অভিনীত হইয়া ছিল। কিন্তু এই দুই অংশ যাঁহারা অভিনয় করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ—যিনি "চন্দ্রশেখর" তিনি ষ্টার মঞ্চের একজন অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা অভিনেতা। চন্দ্রশেখরের অংশ তাঁহার ন্যায় কৃতীলোকদ্বারা আরও উজ্জ্বল ও আবেগময়ী ভাবে অভিনীত হইয়া কবির কল্পনা সৌন্দর্য্যের পূর্ণতায় উপস্থিত হইবে, আমরা এরূপ প্রত্যাশা রাখি। প্রতাপ চরিত্র ঠিক বঙ্কিম বাবুর চিত্তনিহিত কল্পনানুযায়ী যথাযথ ভাবে অভিনয় করা সম্পূর্ণ সম্ভব ও সহজসাধ্য কি না এ বিষয়ে আমাদের একটু সন্দেহ আছে। "প্রতাপ" চরিত্র যাহা ফুটিয়াছে তাহাতে অভিনেতার বিশেষ প্রশংসা করা যায়। কিন্তু তদপেক্ষা তিনি কি আরও ফুটিয়া উঠিতে পারেন না? আর এরূপ আশাও কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব? কখনই নহে।

তার পর শৈবলিনী—

শৈবলিনীর চরিত্রে কবি প্রকৃতিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, প্রতাপে লোকধর্ম্মের তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন। একজনকে ইহলোকের সজীব সাক্ষ্য করিয়া কবি সৃষ্টি করিয়াছেন; অপরকে পরলোকের উপযুক্ত করিয়াছেন। এই জন্যই আমরা বলিতেছি, শৈবলিনীর অভিনয় সকলকে ছাড়িয়া না উঠিলে পূর্ণসৌন্দর্য্য অনুভূতি সম্বন্ধে একটু অপেক্ষা থাকে। কিন্তু এসম্বন্ধে আমাদের মনক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই। শৈবলিনীর অংশ আদ্যোপান্তই কবির সৃষ্ট সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা রক্ষা ও স্থলে স্থলে তাহা অপেক্ষা উজ্জ্বল অভিনয় হইয়াছিল।

ইহার পর অন্যান্য চরিত্র, যাহারা চন্দ্রশেখরের আশে পাশে, অথচ মধ্যে মধ্যে প্রস্ফুট ও অস্ফুট ভাবে বিজড়িত। ইহাদের মধ্যে মীরকাশেম লরেন্স ফষ্টর সর্ব্বপ্রধান। ফষ্টর না হইলে, শৈবলিনী এত স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিত না। অভিনয়াংশে ধরিতে গেলে নাট্যশালার অধ্যক্ষ ফষ্টরের আকৃতি প্রকৃতিতে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে "জন—কোম্পানীর" কর্ম্মচারীর প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত করিয়াছেন। হাবভাবে, কার্য্যে, কর্ম্মক্ষেত্রে ফষ্টর ইংরাজ-প্রকৃতি রক্ষা করিয়া অভিনয় করিয়াছেন। মীর কাশেম বাঙ্গালার শেষ মুসলমান ভূপতি। মীর কাশেমকে বঙ্কিম বাবু বিশেষরূপে ফুটাইয়া তোলেন

নাই। বোধ হয় তাহার ততটা আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। অমৃত বাবু মীর কাশেমকে আরও পরিস্ফুট করিয়া দর্শকের চক্ষে ধরিয়াছেন। মীর কাশেম দলনী ও সুন্দরী অতি সুসঙ্গত ও সুন্দরভাবে অভিনয় করিয়াছে।

অমৃত বাবু চন্দ্রশেখরে এমন ভাবে দুই একটী নূতন পার্শ্ব চরিত্রের (Supplementary Character) অবতারণা করিয়াছেন যে, তাহাদের মূলগ্রন্থের সহিত কোন সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় নাই। এগুলি সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য। এমন অনেক দর্শক আছেন, যাঁহারা চন্দ্রশেখরে নাচ গান আমোদ প্রমোদ বেশী নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই সকল প্রকৃতিবিশিষ্ট লোককে ভুলাইবার জন্য, ভিন্ন রুচির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এই চরিত্রগুলির অবতারণা। ইহাদের মধ্যে গন্ধগোকুল কিছু বেশী আমোদ করিয়া যান।

শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশেষ দৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্র। দৃশ্যসম্বন্ধে ইহাও উৎকৃষ্ট। রণস্থলে মৃত অশ্বের উপর পিঠ দিয়া পড়িয়া প্রতাপ। সেই শৈবলিনীর প্রতাপ—যে শৈবলিনীর জন্যই রণক্ষেত্রে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছিল। সেই প্রতাপ, যে শৈবলিনীর "তুমি জীবিত থাকিলে আমি সুখী হইব না" এই মর্ম্মঘাতী কথা শুনিয়া, জীবনকে অতি তুচ্ছ ভাবিয়া, হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছিল। যে প্রতাপ যে প্রথম হইতেই আত্মত্যাগী, যে প্রতাপ নিঃস্বার্থ-প্রণয়ী, যে প্রতাপ ইন্দ্রিয়জয়ী, যে প্রতাপ বাসনাকে কর্ত্তব্যের মন্দিরে বলি দিয়া মহাপুরুষ—যে প্রতাপ ইহকালের নয়—পরকালের, যে প্রতাপে চন্দ্রশেখরের "প্রতিষ্ঠা"; এই দৃশ্যে সেই প্রতাপের "বিসর্জ্জন" দেখিয়া হৃদয়ে শত শত শোকপ্রবাহ ছুটিতে থাকে। শৈবলিনীকে অমর-কবি যবনিকা পতনের পূর্ব্বেই মনের সকল কথাই বলাইয়াছেন; কিন্তু প্রতাপ বলেন নাই—বলিতেনও না। যাহার বিষের ভয়ে তিনি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তিনি জাহ্নবী-প্রবাহে আত্মবিসর্জ্জন করিতে গিয়াছিলেন, যাহার জন্য ইংরাজের হস্তে বন্দী, লাঞ্ছিত ও অপমানিত, সেই প্রতাপ যদি মৃত্যুমুখে আত্মবিসর্জ্জন না করিতেন, রমানন্দ স্বামী সেই, শেষ সময়ে তাঁহার সেই আঘাত-জর্জ্জরিত অন্তরের অন্তরে একটী কথা বলিয়া আঘাত না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যতের ন্যায় প্রতাপের মনের কথাও প্রকাশ পাইত না। রমানন্দ স্বামী যখন বলিলেন—"শুন বৎস! আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি, ব্রহ্মাণ্ড জয় তোমার এ ইন্দ্রিয়-জয়ের তুল্য হইতে পারে না, তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে।"—তখন সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। আর একটু পরেই প্রাণবায়ু দেহ-ত্যাগ করিবে, তথাপি এই কথায় যেন সেই মুমূর্ষু দেহে নূতন জীবনী সঞ্চার হইল। কি এক অদ্ভুত, অপূর্ব্ব, অননুভূত, অপরিমেয় তেজ আসিয়া প্রতাপের বাক্যস্ফূর্ত্তি করিয়া দিল; প্রতাপ বলিল—কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী?—এ জগতে কে মনুষ্য আছে যে আমার এ ভালবাসা বুঝিবে? কে বুঝিবে এই ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত

ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি। আমার ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা, শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিযাছে। কখনও মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না। এই মৃত্যুকালে আপনি কথা তুলিলেন কেন? এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া এ দেহ ত্যাগ করিলাম। আমার মন কলুষিত হইয়াছে, কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন উপায় নাই—তাই মরিলাম। আপনি আমার এই গুপ্ত তত্ত্ব শুনিলেন; আপনি জ্ঞানী, শাস্ত্রদর্শী; আপনি বলুন, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী? যদি দোষ হইয়া থাকে এ প্রায়শ্চিত্তে কি তাহার মোচন হইবে না?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন—"তাহা জানি না—মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ শাস্ত্র এখানে মূক। তুমি যে লোকে যাইতেছ সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারিবে না। তবে ইহাই বলিতে পারি ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই যদি চিত্ত-সংযমে পুণ্য থাকে তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে তবে দধিচীর অপেক্ষাও তুমি স্বর্গাধিকারি—প্রার্থনা করি জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয় জয়ী হই।"

এ দৃশ্য হৃদয় বিদারক এ দৃশ্য আর্য্যক্ষেত্র কর্ম্মক্ষেত্র হিন্দু হৃদয়ের মহা প্রবৃত্তি সংগ্রাম—আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ এ চিত্র কেবল এই এক সময়-মহোন্নত—এক্ষণে মহা পতিত স্বর্ণ ভূমি ভারতেই সম্ভবে। বাঙ্গলায় অমর কবি অমর-চিত্র চিরজ্বলন্ত বর্ণে আঁকিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

বঙ্কিম বাবু তাঁহার অন্যান্য পুস্তকের অভিনয়ে নাট্যশালার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ যদি তিনি তাঁহার "প্রতাপের" ন্যায় সেই অনন্ত ধামে না যাইতেন তাঁহার নিজ-মুখ-কথিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য চন্দ্রশেখরের অভিনয় দেখিয়া হয়ত তাঁহার বিরক্তি জন্মিত না।

ধন্য সেই কবি—যিনি এরূপ অদ্ভুত, জ্বলন্ত, অননুভূত, অদৃষ্টপূর্ব্ব আদর্শ চিত্র আঁকিতে পারেন। ধন্য সেই দেশ! যেখানে এই চিত্র ফুটাইবার জন্য অভিনয় ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যম; পরিশ্রম ও কৃতিত্বের প্রয়োজন হয়। *

* মন্তব্য—মুখে আমরা দুই চারিটী সামান্য ক্রটির কথা উল্লেখ করিব। এ গুলি বোধ হয় অতি সামান্য বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে।—মীর কাশেমের গৃহ ব্যবহার্য্য উষ্ণীষটীর সম্বন্ধে আমাদের একটু আপত্তি আছে। চন্দ্রশেখরের শাস্ত্রপাঠ—অর্থাৎ যে দৃশ্যে শৈবলিনী "ভীমা" হইতে অধিক রাত্রে গৃহ প্রত্যাগতা হইল—তাহা আসনে উপবেশন করিয়া আরও নিবিষ্টভাব সহিত হইলে আরও ভাল দেখাইত। প্রতাপের স্ত্রী "রূপসী" প্রতাপের স্ত্রীর মত দেখায় নাই। বঙ্কিম বাবু রূপসীকে ফুটাইয়া তুলেন নাই বটে, কিন্তু তাহাকে প্রস্ফুটিত গৌরবময়ী চরিত্র "সুন্দরী"র ভগিনী বলিয়া ত উল্লেখ করিয়াছেন। দলনীর প্রথম দৃশ্য কক্ষসজ্জা, বেশভূষা, কাষ্ঠাধারের আবরণী সব লাল হওয়া ভাল হয় নাই।

আয়ুর্ব্বেদ।

গ্রহণী।

আয়ুর্ব্বর্ণো বলংস্বাস্থ্য মুৎসাহোপচয়ৌ প্রভা।
ওজস্তেজোঽগ্নয়ঃ প্রাণাশ্চোক্তা দেহাগ্নিহেতুকাঃ॥

যে অগ্নি বিকৃত হইয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে এবং অবিকৃত থাকিয়া যাবজ্জীবন মনুষ্যকে সুখ প্রদান করে, সেই জঠরাগ্নির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আজ আমরা গ্রহণী রোগের বিষয় সম্যক্ ব্যাখ্যা করিব। মনুষ্যের আয়ু, বর্ণ, বল, স্বাস্থ্য, উৎসাহ, উপচয়, প্রভা, ওজঃ, তেজঃ, অগ্নি ও প্রাণ এ সমস্তই দেহাগ্নি হইতে উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়। এই দেহাগ্নি নির্ব্বাণ হইলে মনুষ্যাদি জীব ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারে না। এই অগ্নি অবিকৃত থাকিলে চিরকাল সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এবং বিকৃত হইলে নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং অগ্নিই সমস্তের মূল কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

শান্তেঽগ্নৌ ম্রিয়তে যুক্তে চিরঞ্জীবত্যনাময়,
রোগবস্থাদ্বিকৃতে মূলমগ্নিস্তস্মান্নিরুচ্যতে॥

অন্ন জীবের সমস্ত ধাতু পোষণ করে বটে, কিন্তু অগ্নি ঐ অন্নের পাচক, অপক্ক অন্ন হইতে রসাদি উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রথমতঃ, প্রাণবায়ু ভুক্ত অন্নকে কোষ্ঠে আকর্ষণ করিয়া লয়, কারণ অন্ন গ্রহণ করা প্রাণবায়ুর স্বধর্ম্ম। অতঃপর আমাশয়ের দ্রবপদার্থ দ্বারা ভুক্ত অন্ন ক্লিন্ন, বিশ্লিষ্ট ও মৃদুতা প্রাপ্ত হয় অনন্তর সমান বায়ু দ্বারা জঠরাগ্নি কম্পিত ও প্রজ্জ্বলিত হইয়া যথাকালে ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিয়া আয়ুর্বৃদ্ধি করে। স্থালীতে অধঃস্থিত অগ্নি দ্বারা যেরূপ অন্নপাক ক্রিয়া সাধিত হয়, তদ্রূপ জঠরাগ্নি দ্বারা আমাশয়স্থ অন্ন পরিপাক ও রস মলাদি উৎপাদন ক্রিয়া জীব শরীরে নিরন্তর সাধিত হইয়া আসিতেছে।

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জাতঃ শুক্রসম্ভবঃ॥

ভুক্ত বস্তু সম্যক্ পরিপাক হইলে উহা হইতে যে তরল সারভাগ বহির্গত হয়, তাহার নাম রস। রস যকৃতে গমন করিলে পিত্ত কর্ত্তৃক রঞ্জিত হইয়া রক্তে পরিণত হয়। ঐ রক্ত স্বীয় উষ্মাদ্বারা পক্ক ও বায়ু দ্বারা ঘনীভূত হইয়া মাংসাকারে পরিণত হয়। মাংস হইতে মেদঃ জন্মে। মেদঃ পক্ক ও শুষ্ক হইয়া অস্থিরূপ ধারণ করে। অগ্নিতে পাক হইয়া অস্থি হইতে এক প্রকার তরল পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই পদার্থ বায়ুদ্বারা ঘনীভূত হইয়া অস্থিরন্ধ্র পূর্ণ করে, ইহারই নাম মজ্জা এবং এই মজ্জা হইতে সার ভাগ বিভক্ত হইয়া শুক্র উৎপন্ন হয়।

রসাদি ধাতুর পরিষ্কৃত ভাগই রক্তাদি রূপ ধারণ করে, মলভাগ পৃথক্ পড়িয়া থাকে। ঐ অপরিষ্কৃত অংশের নাম কিট্ট। অন্নের কিট্ট মল ও মূত্র, রসের

কিট্ট কফ, রক্ত ও মাংসের কিট্ট পিত্ত, মেদের কিট্ট ঘর্ম্ম, অস্থির কিট্ট কেশ ও লোম, মজ্জার কিট্ট শরীরের স্নিগ্ধতা, চক্ষের মল ও ত্বক্। এইরূপ প্রসাদ ও কিট্টরূপে ধাতু সমুদায়ের পরিণতি হয়।

ষড়্‌ভিঃ কেচিদহোরাত্রৈরিচ্ছন্তি পরিবর্ত্তনম্।
সন্তত্যা ভোজ্য ধাতূনাং পরিবৃত্তিস্তু চক্রবৎ॥

কেহ কেহ বলেন ছয় দিন রাত্রিতে একটী ধাতু অপর ধাতুতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে দৈনন্দিন আহারের নূতনত্ব-হেতু সর্ব্বদাই চক্রবৎ ধাতুর ধাত্বন্তর-পরিণমন ক্রিয়া সাধিত হইয়া আসিতেছে। ভুক্ত বস্তুর পরিপাক ও রসাদি ধাতুর উৎপত্তির বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইল, অতঃপর গ্রহণীরোগের বিষয় বলা যাইতেছে।

যোহি ভুংক্তে বিধিং মুক্ত্বা গ্রহণীদোষজান্ গদান্।
স লৌল্যাল্লভতে শীঘ্রং বক্ষ্যন্তেঽতঃপরন্তু যে॥

যে সমুদয় ব্যক্তি লোভপরতন্ত্র হইয়া স্বেচ্ছামত ভোজন করে, ঐ মূঢ় ব্যক্তিগণ বক্ষ্যমাণ গ্রহণীদোষজ পীড়া সমুদায় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। ভোজন না করিয়া একেবারে উপবাসী থাকা, অজীর্ণ সত্ত্বে অতিভোজন, কোন দিন গুরু বস্তু ও কোন দিন লঘু বস্তু, কিম্বা কোন দিন অল্পাহার ও কোন দিন অধিক আহার করা প্রভৃতি বিষমাহার, অসাত্ম্য বস্তু আহার, অতিশয় গুরু বস্তু, অতি শীতল বস্তু, অতি রুক্ষ ও দূষিত বস্তু ভোজন, বমন, বিরেচন ও স্নেহপ্রয়োগের ব্যতিক্রম, কোন পীড়া কর্ত্তৃক অতি কৃশতা, দেশ, কাল ও ঋতুর বৈষম্য এবং মলমূত্রাদির উপস্থিত বেগ ধারণ প্রভৃতি কারণে পাচকাগ্নির বৈষম্য সংঘটিত হয়।

স দুষ্টোঽগ্নিরন্নতৎ পচতি লঘ্বপি।
অপচ্যমানং শুক্তত্বং যাত্যন্নং বিষতাঞ্চ তৎ॥

উল্লিখিত হেতু সমুদায়ে সংদূষিত অগ্নি স্বীয় মন্দতাবশতঃ লঘু অন্নকেও পরিপাক করিতে পারে না সুতরাং অপচ্যমান অন্ন শুক্ত ও বিষবদনিষ্টকারিতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে অন্ন অজীর্ণ হইলে, গুরুতা, অঙ্গের অবসন্নতা, শিরঃপীড়া, মূর্চ্ছা, ভ্রম, পৃষ্ঠগ্রহ, কটিগ্রহ, জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ, তৃষ্ণা, জ্বর, বমি, কুন্থন, অরুচি ও অপরিপাক এই সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে পিত্তের সংস্রব থাকিলে, দাহ, তৃষ্ণা, মুখপাক ও অম্ল-পিত্তাদি পিত্তজনিত ব্যাধি উৎপাদন করে। কফের সংস্রব থাকিলে, যক্ষ্মা, পীনস ও মেহ প্রভৃতি কফজ রোগ সকল উৎপাদন করে। এবং বায়ুর সংস্রব থাকিলে বাতজ নানা পীড়া উৎপন্ন হয়।

বিষম আহারে পাচকাগ্নি বিষমভাব প্রাপ্ত হইয়া ধাতুবৈষম্য জন্মায়, অল্পাহারে তীক্ষ্ণ হইয়া ধাতু শোষণ করে এবং সম আহারে সমতা প্রাপ্ত হইয়া ধাতু সকলের সমতা বিধান করে।

দুর্ব্বলো বিদহত্যন্নং তদ্‌যাত্যূর্দ্ধ্বং মধোঽপি বা।
অধশ্চপক্ক মামং বা প্রবৃত্তং গ্রহণী গদঃ॥
উচ্যতে সর্ব্বমেবান্নং প্রায়োহ্যস্য বিদহ্যতে।

অতিমাত্রায় আহারে পাচকাগ্নি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ভুক্ত অন্ন পরিপাক না হইয়া বিদগ্ধভাব (আধ পোড়া) ধারণ করে। ঐ বিদগ্ধান্ন অজীর্ণাবস্থায় ঊর্দ্ধ্ব বা অধঃপথে নিঃসৃত হয়। অধঃপথে ঐরূপ পক্ক বা আমরূপে নিঃসরণকে গ্রহণীরোগ বলে। গ্রহণীরোগে যাহা কিছু আহার করা যায়, তৎসমস্তই বিদগ্ধভাব প্রাপ্ত হয়। ঐ বিদগ্ধ অন্ন তরলভাবে মলদ্বার

দিয়া সরলভাবে কিম্বা বিবদ্ধভাবে নিঃসৃত হইতে থাকে।

অগ্ন্যধিষ্ঠান মন্নস্য গ্রহণাদ্ গ্রহণী মতা।
নাভে রুপরি সা হ্যগ্নিবলোপস্তম্ভবৃংহিতা॥

অন্নাদি গ্রহণহেতু এই নাড়ীর নাম গ্রহণী, ইহাই অগ্নির অধিষ্ঠান। পাচকাগ্নি অবলম্বনে বৃংহিত হইয়া গ্রহণী নাভীর উপরিভাগে অবস্থিতি করে।

যদাহ সুশ্রুতঃ ;—

ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম যা কলা পরিকীর্ত্তিতা।
পক্বামাশয়মধ্যস্থা গ্রহণী সা প্রকল্পিতা॥

পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যবর্ত্তিনী পিত্তধরা ষষ্ঠী কলাকে গ্রহণী বলে। অহিত ভোজনাদি দ্বারা এই গ্রহণী নাড়ী দুষ্ট হইয়া গ্রহণীরোগ জন্মায়।

অতীসারে নিবৃত্তেঽপি মন্দাগ্নে রহিতাশিনঃ।
ভূয়ঃ সংদূষিতো বহ্নি র্গ্রহণী মভিদূষয়েৎ॥

অতীসার নিবৃত্ত হইয়াছে অথচ পাচকাগ্নির সম্যক্ বল জন্মে নাই, এরূপ অবস্থায় যদি অহিত অর্থাৎ গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার করা যায়, তবে পুনরায় পাচকাগ্নি দুর্ব্বল হইয়া গ্রহণী নাড়ীকে দূষিত করে।

একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চ দোষৈ রত্যর্থ মূর্চ্ছিতৈঃ।
সা দুষ্টা বহুশো ভুক্ত মামমেব বিমুঞ্চতি॥

প্রকুপিত পৃথক্ অথবা মিলিত বাতাদি দোষ দ্বারা গ্রহণী দুষ্ট হইয়া ভুক্ত বস্তুকে অপক্ব অবস্থায় বারংবার ত্যাগ করিতে থাকে। কখনও বা পক্বাবস্থায় অতি দুর্গন্ধযুক্ত মল নিঃসরণ করে। ইহাতে শূলবেদনা উপস্থিত হয়। গ্রহণী রোগে কোন সময় মলবদ্ধ থাকে, কখনও বা তরল ভেদ হইতে থাকে। গ্রহণী নাড়ী দূষিত হইলে এই পীড়া জন্মে, এজন্য আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ ইহার নাম গ্রহণী রাখিয়াছেন। গ্রহণীরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে তৃষ্ণা, আলস্য, বলক্ষয়, ভুক্ত অন্নের দীর্ঘকালে বিদাহপাক ও শরীরের গুরুতা এই সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কটু, তিক্ত, কষায়, অতি রুক্ষ ও সংযোগবিরুদ্ধ (ক্ষীর মৎস্যাদি) দ্রব্য ভোজন, অল্প ভোজন কিম্বা উপবাস, অতিশয় পথভ্রমণ, মলমূত্রাদির উপস্থিত বেগধারণ ও অতি মৈথুন প্রভৃতি দ্বারা কুপিত বায়ু পাচকাগ্নিকে দূষিত করিয়া বাতিক গ্রহণীরোগ উৎপাদন করে। ইহাতে অতি কষ্টে ভুক্ত অন্ন অম্লরসে পরিপাক হয়, শরীর রুক্ষ, কণ্ঠ ও মুখের শোষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য, কর্ণে শব্দের ন্যায় বোধ, পার্শ্ব, উরু, বংক্ষণ ও গলদেশে নিরন্তর বেদনা, তরল ভেদ ও বমন, হৃৎপীড়া, অঙ্গের কৃশতা ও দৌর্ব্বল্য, মুখের বিরসতা, গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া, মধুরাদি ষট্‌প্রকার রসাস্বাদেই স্পৃহা, মনের অবসাদ, কাস ও শ্বাস এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। বায়ুজনিত গ্রহণীরোগে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক সময়ে অথবা পরিপাক হইলে উদরাধ্মান উপস্থিত হয়। কিন্তু আহার করিলে পুনরায় স্বাস্থ্যবোধ হয়। এই পীড়ায় রোগী সর্ব্বদা বোধ করে, যেন তাহার বাতগুল্ম, হৃদ্রোগ কিম্বা প্লীহা জন্মিয়াছে। ইহাতে কখন দ্রব কখনও বা শুষ্ক ফেনবিশিষ্ট অপক্ব মল শব্দের সহিত কষ্টে বারংবার নির্গত হয়।

কটু, অজীর্ণ, বিদাহী (যে আহারে দাহ জন্মে) অম্ল, ক্ষার, লবণ, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য সেবন দ্বারা প্রবৃদ্ধ পিত্ত উত্তপ্ত

জলের ন্যায় অগ্নিকে অপ্লাবিত ও নষ্ট করিয়া পিত্তগ্রহণী রোগ উৎপাদন করে। পিত্তই যখন অগ্নি, তখন পিত্ত প্রবৃদ্ধ হইয়া অগ্নিকে বৃদ্ধি না করিয়া কেন নষ্ট করিবে? এইরূপ সন্দেহ নিরাসার্থ বলা হইয়াছে—"জলং তপ্তমিবানলম্" তপ্ত জলেও যেরূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ প্রবৃদ্ধ পিত্ত পাচকাগ্নিকে প্লাবিত করিয়া নষ্ট করে। এই পিত্ত-গ্রহণীরোগে দুর্গন্ধ অম্ল উদ্গার, হৃদয় ও কণ্ঠের দাহ, অরুচি ও পিপাসা হয়। নীল বা পীতবর্ণ অজীর্ণ দ্রব মল নিঃসৃত হইতে থাকে এবং রোগীর শরীর পীতবর্ণ হইয়া যায়।

অতিশয় গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল, পিচ্ছিল, ও মধুরাদি বস্তু ভোজন, অতিভোজন, কিম্বা দিবসে আহার করিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রা ইত্যাদি কারণে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া জঠরাগ্নিকে দুর্ব্বল করিয়া শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগ জন্মায়। শ্লৈষ্মিক গ্রহণী রোগে ভুক্তদ্রব্য অতি কষ্টে পরিপাক হয়, শ্লেষ্মা দ্বারা মুখ লিপ্ত ও মিষ্ট হয়, রোগী হৃদয়কে শ্লেষ্মা দ্বারা পূর্ণ মনে করে, উদর ভার ও নিশ্চল (বিবদ্ধ) থাকে, বিকৃত মধুর উদ্গার উঠিতে থাকে, শরীর অবসন্ন হয়, স্ত্রী সম্ভোগে প্রীতি থাকে না, এবং আম ও শ্লেষ্মসংসৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন (ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া) গুরু মল নিঃসরণ হয়। এই শ্লৈষ্মিক-গ্রহণী রোগী কৃশ হয় না, অথচ দুর্ব্বল ও আলস্যপরতন্ত্র হয়।

উল্লিখিত বাতজাদি গ্রহণী রোগের নিদান ও লক্ষণ মিলিত হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক গ্রহণী রোগ বলা যায়।

সংগ্রহ গ্রহণীরোগে কাহারও এক মাস পরে, কাহারও এক পক্ষ পরে, কাহারও দশ দিন পরে, কাহারও বা প্রত্যহই তরল, গাঢ়, শীতল, স্নিগ্ধ, আমযুক্ত এবং পিচ্ছিল মল শব্দসহ ও কটিদেশে অল্প অল্প বেদনার সহিত বহু পরিমাণে নিঃসৃত হইতে থাকে। দিবসে এই পীড়ার বৃদ্ধি ও রাত্রিতে শান্তি হয়। সংগ্রহগ্রহণী অতি দুর্জ্ঞেয়, দুশ্চিকিৎস্য ও দীর্ঘকালব্যাপী ব্যাধি। আম ও বায়ুর প্রকোপে এই পীড়ার উৎপত্তি হয়।

গ্রহণীরোগে প্রথমতঃ লঙ্ঘন ও পাঁচন দ্বারা গ্রহণীগত দোষের পরিপাক করিবে। শরীরে আমরস বিদ্যমান থাকিলেও লঙ্ঘন এবং পাঁচন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অনন্তর আমাশয় শুদ্ধি হইলে লঘু অন্ন প্রদান করিবে। গ্রহণীরোগে সদ্যোজাত তক্র একটী সুপথ্য ও মহৌষধ। লঘুতাপ্রযুক্ত তক্র অগ্নিদীপক, গ্রাহী ও সুপথ্য। পরিণামে মধুর রস হয় বলিয়া পিত্তপ্রকোপক নহে, কষায়, উষ্ণ, বিকাশী ও রুক্ষ বলিয়া কফ শান্তি করে এবং স্বাদু, অম্ল ও ঘন বলিয়া বায়ু দমন করে। যথা—

গ্রহণীদোষিণাং তক্রং দীপনং গ্রাহি লাঘবাৎ।
পথ্যং মধুরপাকিত্বা ন চ পিত্তপ্রকোপনম্॥
কষায়োষ্ণবিকাশিত্বাদ্ রৌক্ষ্যাচ্চৈব কফে হিতম্।
বাতে স্বাদ্বম্লসান্দ্রত্বাৎ সদ্যস্কমবিদাহি তৎ॥

চিত্রকগুড়িকা।

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণানি চ।
ব্যোষং হিঙ্গ্বজমোদাঞ্চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ॥
গুড়িকা মাতুলুঙ্গস্য দাড়িমস্য রসেন বা।
কৃতা বিপাচয়ত্যামং দীপয়ত্যাশু চানলম্॥
সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্ভিদমেব চ।
সামুদ্রেণ সমং পঞ্চলবণান্যত্র যোজয়েৎ॥

চিতামূল, পিপুলমূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট্ ও

ঔদ্ভিদ এই পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হিং, বনযমানী ও চই এই সকল একত্র চূর্ণ করিয়া মাতুলুঙ্গ (ছোলঙ্গলেবু) বা ডালিমের রসে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি পরিমাণ গুড়িকা করিবে জলসহ ইহার একটী গুড়িকা সেবনে, আমরসের পরিপাক ও অতিশয় অগ্নি বৃদ্ধি হয়। অধিকাংশ চিকিৎসকই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

গ্রহণীরোগে বিবেচনাপূর্ব্বক গঙ্গাধর চূর্ণ, পাঠাদ্য চূর্ণ, লবঙ্গাদ্য চূর্ণ, আয়ামকাঞ্জিক, কল্যাণগুড়, পিপ্পল্যাদি আসব, জাতীফলাদ্য বটিকা, নৃপবল্লভ, রসপর্পটী, বিজয়পর্পটী, পঞ্চামৃতপর্পটী ও গ্রহণীকপাট রস ইত্যাদি ঔষধ যথাযোগ্য অনুপানের সহিত ব্যবস্থা করিবে।

নাগরাদ্য চূর্ণ—শুঁঠ, আতইচ, মুতা, ধাঁইফুল, রসোত, কুড়চিমূলের ছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বেলশুঁঠ ও কট্‌কী এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া ✓০ আনা হইতে ✓০ আনা মাত্রায় মধু দিয়া মাড়িয়া তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিলে পিত্তজনিত গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়। ৬ গুণ বা ৮ গুণ জলে রাত্রিতে আতপতণ্ডুল ভিজাইয়া প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া লইলে তণ্ডুলজল প্রস্তুত হয়।

পাঠাদ্য চূর্ণ—আকনাদি, বেলশুঁঠ, চিতামূল, ত্রিকটু, জামছাল, দাড়িমবীজ, ধাইফুল, কট্‌কী, আতইচ, মুতা, দারুহরিদ্রা, চিরাতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ সর্ব্বসমান কুড়চিমূলের ছাল চূর্ণ সমুদায় উত্তমরূপে মিশ্রিত ও সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ✓০ বা ✓০ আনা মাত্রায় মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে গ্রহণী ও জ্বরাতীসার আরোগ্য হয়।

বিল্বং মোচরসং পাঠা ধাতকী ধান্যমেব চ।
হ্রীবেরং নাগরং মুস্তং তথৈবাতিবিষা সমম্॥
অহিফেনং লোধ্রকঞ্চ দাড়িমং কুটজং তথা।
পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ॥
তক্রেণ খাদয়েৎ প্রাতশ্চূর্ণং গঙ্গাধরং মহৎ।
জ্বরমষ্টবিধং হন্যাদতীসারং সুদুস্তরম্॥
গ্রহণীং বিবিধাঞ্চৈব কোষ্ঠব্যাধিহরং পরম্।

বৃহদ্ গঙ্গাধর চূর্ণ—বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ধাঁইফুল, ধনিয়া, বালা, শুঁঠ, মুতা, আতইচ, অহিফেন, লোধ, কচি দাড়িম ফলের ছাল, কুড়চি ছাল, পারা ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ একত্র উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান তক্র অভাবে আতপ তণ্ডুলোদক। ইহা সেবনে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, সুতরাং অষ্টবিধ জ্বর, প্রবল অতীসার, নানাবিধ গ্রহণী ও কোষ্ঠাশ্রিত বিবিধ ব্যাধি প্রশমিত হয়। বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণই সর্ব্বদা ব্যবহার করা হয়, তজ্জন্য এস্থলে স্বল্প ও মধ্য গঙ্গাধরের বিষয় উল্লেখ করা গেল না, আবশ্যক হইলে ভৈষজ্য রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবেন।

বৃহল্লবঙ্গাদ্যচূর্ণ—লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, হবুষ, ধনিয়া, কট্‌ফল, কুড়, জয়িত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা, সচললবণ, রসোত, ধাঁইফুল, মোচরস, আকনাদি, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিটলবণ, তিতলাউ, বেলশুঁঠ, গুড়ত্বক, এলাইচ, পিপুলমূল, বনযমানী, যমানী বরাক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, দাড়িমফলের ছাল, যবক্ষার, নিমছাল, শ্বেতধুনা, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেনা, সোহাগার খই, বালা, কুড়চিমূলের ছাল, জামছাল, আমছাল, কট্‌কী, অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক

সমভাগ চূর্ণ। মাত্রা /০ হইতে ৵০ আনা। অনুপান মধু কিম্বা তণ্ডুলোদক। ইহা সেবনে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক গ্রহণী নানাবর্ণ ও বেদনা-যুক্ত পক্ক বা অপক্ক অতীসার এবং জ্বর, অরোচক, অগ্নিমান্দ্য, কাস, শ্বাস ও বমি প্রভৃতি উপদ্রব, অম্লপিত্ত, হিক্কা, প্রমেহ, হলীমক, পাণ্ডু, উদরাধ্মান, সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, আনাহ, শোথ, অতীসার, পীনস, আমবাত, সংগ্রহগ্রহণী ও প্রদর প্রভৃতি বহু রোগ আরোগ্য হয়।

বৃহন্নায়িকা চূর্ণ—চিতামূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ভেলারমুটী যমানী, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, ঝুল, বচ, কুড়, মুতা, অভ্র, গন্ধক, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, বনযমানী, পারদ ও গজপিপ্পলী, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্বসমান সিদ্ধি চূর্ণ, সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ইহার /০ বা ৵০ আনা যথাযোগ্য অনু-পানের সহিত সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, কাস, পাণ্ডু, বিষমজ্বর, প্রমেহ, শোথ, বিষ্টম্ভ, সংগ্রহগ্রহণী, সকল প্রকার অতী-সার ও শূল আমবাত ও সূতিকা প্রভৃতি যাবতীয় পীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া কাঞ্জিক, দধি ও মাংস সেবন হিতকর। ইহাতে অতিশয় অগ্নিদীপ্তি হয়।

"কাষ্ঠমপ্যুদরে যস্য ভক্ষণাদ্ যাতি জীর্ণতাম্।"

জাতীফলাদি চূর্ণ—জায়ফল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, তগরপাদুকা, তালিশপত্র, রক্ত-চন্দন, শুঁঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কর্পূর, হরিতকী, আমলা, মরিচ, পিপ্পলী, বংশ-লোচন, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৫৬ তোলা বা ৭ পল, সকল চূর্ণের সমান চিনি। সুন্দররূপে একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ আনা হইতে ।০ আনা। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে কাস, ক্ষয়, শ্বাস, অরোচক, অতিসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, পীনস ও বাতশ্লেষ্মজ রোগ আরোগ্য হয়।

জীরকাদ্য চূর্ণ—জীরা, সোহাগার খৈ, মুতা, আকনাদি, বেলশুঁঠ, ধনিয়া, বালা, শুল্ফা, দাড়িমফলের ছাল, কুড়চিমুলের ছাল, বরাক্রান্তা, ধাঁইফুল, ত্রিকটু, গুড়-ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্র, গন্ধক এবং পারদ প্রত্যেক সম-ভাগ ও সকল চূর্ণের সমান জায়ফল চূর্ণ, এই সমুদায় সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া যথাযোগ্য জলাদি অনুপানের সহিত সেবন করিবে। মাত্রা ৬ রতি। ইহা সেবনে দুস্তর গ্রহণী, অতিসার, কামলা, পাণ্ডু ও অগ্নিমান্দ্য নিশ্চয় প্রশমিত হয়।

কঞ্চটাবলেহ—কাচড়াদাম ১ সের ও তালমূলী ১ সের ১৬ সের জলে জ্বাল দিয়া ৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, ঐ ক্কাথে চিনি ১ সের পাক করিবে। ১ সের অবশিষ্ট থাকিতে বরাক্রান্তা, ধাঁইফুল, আকনাদি, বেল-শুঁঠ, পিঁপুল, সিদ্ধিপত্র, আতইচ, যবক্ষার, সচললবণ, রসোত ও মোচরস ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা নিক্ষেপ করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে একপোয়া মধু মিশ্রিত করিবে। দোষাদির বলাবল বিবেচনা করিয়া অর্দ্ধতোলা হইতে ইহার মাত্রা নির্দ্দিষ্ট করিবে। ছাগদুগ্ধ অনু-পানের সহিত সেবনই প্রশস্ত। ইহাতে সকল প্রকার অতীসার, সংগ্রহ গ্রহণী ও অম্লপিত্ত জনিত সর্ব্বপ্রকার কোষ্ঠরোগ

এবং শূল, অরুচি অতি সত্বর প্রশমিত হয়।

তক্রারিষ্ট—যমানী, আমলা, হরিতকী ও মরিচ প্রত্যেক ২৪ তোলা এবং পঞ্চলবণ ৮ তোলা চূর্ণ করিয়া ৮ সের তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৪ দিন রাখিবে, মাত্রা /০ ছটাক, ইহা সেবনে অগ্নির অতিশয় দীপ্তি হয় ও গ্রহণ্যাদি পীড়া অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

মস্তকাদ্য মোদক—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, মৌরী, পান, শুল্‌ফা, শতমূলী, ধন্যা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, মেথী ও জায়ফল প্রত্যেক ১ তোলা মস্তা ৪৮ তোলা, চিনি সর্ব্বদ্বিগুণ অর্থাৎ ১৷০ সের। পাকযোগ্য জল দিয়া চিনি পাক করিয়া ক্রমশঃ আসন্নপাকে সমস্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে ও নামাইবে, শীতল হইলে তৎপরদিন কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ১ তোলা। অনুপান শীতল জল, সায়ংকালে সেব্য। ইহাতে গ্রহণী, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, অজীর্ণ, আমদোষ ও বিসূচিকাদি নানা রোগ আরোগ্য হয়। এই মোদক সেবনে বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়, বলী, পলিত ও কৃশতা নাশ হয় এবং দেহের পুষ্টি সাধিত হয়।

জীরকাদি মোদক—উত্তমরূপ চূর্ণিত জীরা ১ সের, বস্ত্রপূত (কাপড়ে ছাঁকা) ঘৃতভর্জ্জিত সিদ্ধিবীজচূর্ণ অর্দ্ধ সের, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মোরী, তালীশপত্র, জয়িত্রী, জায়ফল, ধনে, ত্রিফলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, দ্রাক্ষা, শঠী সোহাগার খই, কুন্দুরগোটী, যষ্টিমধু, বংশলোচন, কাকলা, বালা, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, অর্জ্জুনছাল, শুল্‌ফা, দেবদারু, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কঙ্কী, পদ্মকাষ্ঠ, ও বালুকা ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, সর্ব্বদ্বিগুণ চিনি। যথোপযুক্ত জলে চিনি পাক করিয়া সমুদায় চূর্ণ প্রদান করিবে। শীতল হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে ১ তোলা সেবন করিবে। অনুপান শীতল জল। ইহার উপকারিতার সীমা নাই, রক্তাতিসার, বিষমজ্বর, অম্লপিত্তজ রোগ, সকল প্রকার উদররোগ, সংগ্রহ গ্রহণী প্রভৃতি সর্ব্ববিধ গ্রহণী, শূল, অরোচকাদি যাবতীয় বহ্নিমান্দ্যজনিত রোগ আরোগ্য হয়, ইহা অতি প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ঔষধ।

গ্রহণী কপাট—পারদ, গন্ধক, জায়ফল ও লবঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া হুড়হুড়ে, বিল্বপত্র ও পানিফলের পাতা ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা পরিমিত রসে মর্দ্দন করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার একটী দধির সহিত সেবনীয়। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী, অতিসার, পাণ্ডুরোগ ও জ্বরাদি প্রশমিত হয়।

মহাগন্ধক—পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে, ঐ কজ্জলী কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া পঙ্কবৎ করিবে ও লৌহপাত্রে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া তাহার সহিত জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ ও নিম্বপত্র প্রত্যেক

চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। অনন্তর এই ঔষধ একখানি ঝিনুক বা কটরার মধ্যে রাখিয়া অপর একখানি দ্বারা আবৃত করিবে এবং কদলীপত্র বেষ্টন করিয়া মৃত্তিকা লেপন করিবে। শুষ্ক হইলে বিলঘুটের অগ্নিতে পুটপাক দিবে। পুড়িয়া ঈষৎ রক্তবর্ণ ও শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। ব্যাধি অনুসারে অনুপানের সহিত সেবন করিলে, ইহাতে গ্রহণী, অতিসার, সূতিকা ও জ্বর নিবৃত্তি হয়। বালকদিগের উদরাময়ে ইহা অতি প্রসিদ্ধ ও উপকারী।

বৃহৎ নৃপবল্লভ—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সাসা, চিতামূল, মুতা, সোহাগার খই, জায়ফল, হিং, গুড়ত্বক্, এলাইচ, চিতামল, বঙ্গ, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা, যমানী, শুঠ, সৈন্ধব, মরিচ ও তাম্র প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ॥০ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মাড়িয়া আদার রসে ও আমলার রসে ভাবনা দিয়া চণক-প্রমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহাতে গ্রহণী, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়।

শ্রীনৃপতিবল্লভ—জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, সোহাগার খই, হিঙ্গু, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, পারদ, গন্ধক ও তাম্র প্রত্যেক ৮ তোলা, মরিচ ১৬ তোলা (তাম্রের স্থলে কেহ কেহ রৌপ্য ব্যবস্থা করেন) এই সমুদায় দ্রব্য ছাগদুগ্ধে বা আমলকীর রসে মাড়িয়া ৫ রতি পরিমাণ বটী করিবে। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, শূল, শ্বাস, কাস ও শোথ প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হইয়া বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়। অনুপান মুতার রস, লবঙ্গচূর্ণ ও ছাগদুগ্ধ প্রভৃতি। ইহার অমোঘ ফল শত সহস্রস্থলে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

রসেন্দ্রচূর্ণ (লাল গুঁড়া)—রসসিন্দূর ৮ তোলা, বংশলোচন, মুক্তাভস্ম ও স্বর্ণ-ভস্ম প্রত্যেক ॥০ তোলা, অহিফেন ॥০ তোলা দুগ্ধে ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া তদ্দ্বারা উত্তমরূপে মাড়িবে ও শুষ্ক করিয়া চূর্ণ প্রস্তুত করিবে। পূর্ণ মাত্রা ৪ রতি, ২ রতি হইতে সেবন আরম্ভ করাই নিরাপদ। অনুপান দুগ্ধ। এই মহৌষধ সেবনকালে দুগ্ধান্ন সেবন ও লবণ জল একেবারে ত্যাগ করা বিধেয়। ক্ষুধার বৃদ্ধি অনুসারে হালুয়া ও মোহন-ভোগাদি ঘৃতপক্ক অল্প মিষ্ট দ্রব্য ভোজন ব্যবস্থেয়। শৌচ ও আচমনাদি ক্রিয়া উষ্ণজলে সম্পাদন করিতে হয়। বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বদা গাত্র আবৃত রাখিবে। স্নানাদি ক্রিয়া নিষিদ্ধ। এই চূর্ণ সেবনে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী, রক্তাতিসার, সূতিকা ও অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ আরোগ্য হয় এবং শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। সুস্থ শরীরেও ইহা বলবৃদ্ধির নিমিত্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহার প্রসিদ্ধ নাম লাল গুড়া। এই ঔষধ সেবনকালে অতিশয় সাবধান থাকিতে হয়, কোন রূপে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেই বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা।

হিরণ্যগর্ভ পোট্‌লী রস—পারদ ১ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, কাঁসা ৬ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, কড়ি-ভস্ম ৩ তোলা, সোহাগার খই ২০ রতি এই সমুদায় দ্রব্য লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া মূষা (কটরা) মধ্যে স্থাপন

পূর্ব্বক অপর মুষা দ্বারা মুখ রুদ্ধ ও মৃত্তিকা লেপন করিবে। অনন্তর ক্ষুদ্র পুটে ৩০ খানি বিল ঘুঁটের অগ্নিতে পুট দিয়া শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া লইবে এবং খলে মর্দ্দন করিয়া ২ হইতে ৪ রতি মাত্রায় ঘৃত, মধু ও ২৯টা মরিচচূর্ণ সহ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, বিষম জ্বর, অতীসার, গ্রহণী ও শোথ প্রভৃতি বিবিধরোগ নিরাকৃত হয়, ইহা অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ। ক্রমশ, গ্রহণী-রোগোক্ত তৈল ও পর্পটীর বিষয় আলোচিত হইবে।

ভৈষজ্য-বিজ্ঞান।

১। টাট্‌কা গোমূত্রে নারিকেল-ফুল বাটিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে নেত্রাভিষ্যন্দ বা চক্ষু উঠা আরোগ্য হয়। হরিদ্রা মাখান বস্ত্রখণ্ড দ্বারা চক্ষু আচ্ছাদিত রাখা, ও নূতন সরায় অল্প জল দ্বারা হরিদ্রা ঘসিয়া চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে প্রলেপ দেওয়া হিতকর।

২। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, দাঁতে পোকা লাগিয়া শিশুরা অস্থির হইয়া পড়ে। দ্রোণ (ঘলঘসে) পুষ্পের রস, মধু ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্ণপূরণ করিলে ঐ যন্ত্রণার নিবৃত্তি অর্থাৎ দন্তক্রিমি নষ্ট হয়। বকুল ছালের ক্বাথে কুল্য এবং উহা দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিলে দাঁত নড়া ভাল হয়।

৩। উত্তম গব্য ঘৃত একটী বাটিতে করিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিয়া নিষ্ফেণ হইলে তাহাতে কতকগুলি জাতি ফুলের পাতা ফেলিয়া দিবে ও ভাজা ভাজা হইলে নামাইয়া অল্প উষ্ণ অবস্থায় গলার ঘায়ে, মুখের ঘায়ে ও দাঁতের গোড়ার ঘায়ে দিলে ২।৩ দিনের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। শিশিরের জল কিম্বা মাখন দিলে ওষ্ঠ ফাটা আরোগ্য হয়। শীতকালেই এই সমুদায় রোগের আধিক্য দেখা যায়।

৪। স্তন্যপায়ী শিশু স্তনদুগ্ধ বা গব্য-দুগ্ধ পান করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলে। এরূপ অবস্থায় গব্যদুগ্ধ বা ছাগ-দুগ্ধের সহিত এক চামচে চূণের জল মিশাইয়া খাওয়াইলে দুধতোলা নিবৃত্তি হয়। পূর্ব্ব দিন চূণ জলে ভিজাইয়া প্রাতঃকালে না নাড়িয়া উপরের স্বচ্ছ অংশ লইতে হয়, চূণের অংশ উহার সহিত থাকিলে অনিষ্ট হইতে পারে।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুথা ও আতইচ সমভাগে চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করাইলে, শিশুর কফ, কাসি ও বমন নিবারণ হয়।

খই, যষ্টিমধু ও ইক্ষুচিনি সমভাগে চূর্ণ করিয়া ৪ রতি মাত্রায় মধুসহ মাড়িয়া এক চামচে আতপ চাউলের জলসহ পান করাইলে, শিশুদিগের আমাশয় আরোগ্য হয়।

৫। কোন স্থান কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া রক্তপাত হইতে থাকিলে, টাট্‌কা গোময় ঐ স্থানে দিয়া নেকড়া দ্বারা বান্ধিয়া রাখিলে, ইহাতে রক্ত পড়া বন্ধ হয় ও ক্ষত স্থান জোড়া লাগিয়া যায়।

৬। দগদগে ঘায়ে পোকা হইলে পচা মানের ডাঁটা ও মাখন একত্রে বাটিয়া ঘায়ের উপর প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে বসিবে, এই উপায়ে সমস্ত পোকা বাহির হইয়া ঘা শুকাইয়া যায়। ইহা অনেক-বার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

২য় খণ্ড। | ১৩০১ সাল—অগ্রহায়ণ। | তৃতীয় সংখ্যা।

সূচী পত্র।

মূল্য, প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

একটি বিশেষ অনুরোধ।

আমাদিগের এই ক্ষুদ্র কার্য্য সাধারণের নিকট এত অল্প কালের মধ্যে আদরণীয় হইবে, এ আশা আমাদের মনে পূর্ব্বে স্থান প্রাপ্তই হয় নাই। ইতিমধ্যেই আমাদের গ্রাহক সংখ্যা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে আমরা কোন ক্রমেই আর কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছি না, সেইজন্য কোন কোন গ্রাহক এপর্য্যন্ত প্রথম বৎসরের সমুদয় সংখ্যা প্রাপ্ত হন নাই, এই ত্রুটীর জন্য আমরা বিনীত ভাবে তাহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, অল্প দিবসের মধ্যেই আমরা তাহাদের সংখ্যাগুলি পূরণ করিয়া দিতে বাধ্য রহিলাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পুস্তক বিজ্ঞাপনানুযায়ী নিয়মে বাধ্য হইলাম যে সমস্ত গ্রাহক মহোদয় এতাবৎ মূল্য প্রদান করেন নাই তাঁহাদের আমরা ভিঃ পিঃ তে তৃতীয় সংখ্যা পাঠাইলাম। আশা করি স্ব স্ব দেয় দিয়া পুস্তক গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ সম্বন্ধে
নিয়মাবলী।

"চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান" ও সমীরণ প্রতি মাসের শেষে প্রকাশিত হয়।

চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য কলিকাতায় ১৲০ আঠার আনা, মফঃস্বলে ১॥০ দেড় টাকা। প্রত্যেক খণ্ড দুই আনা মাত্র। নমুনার জন্য প্রতি সংখ্যায় ৵১০ দশ পয়সা অগ্রিম পাঠাইতে হয়।

যিনি একত্রে পাঁচটী গ্রাহক করিয়া দিয়া অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাকে বিনামূল্যে এক এক খণ্ড পত্র প্রদান করা হইবে।

চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে এক বৎসরের জন্য প্রতি পেজ, প্রতি মাসে ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পেজ ৩৲ টাকা, সিকি পেজ ২৲ টাকা, সিকি পেজের কম বিজ্ঞাপন কণ্ট্রাক্ট হিসাবে গৃহীত হয় না। সিকি পেজের কম প্রত্যেকবার প্রতি লাইন ।০ চারি আনা হিসাবে দিতে হইবে।

এই পত্র সম্বন্ধে টাকাকড়ি আমার নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডারের কুপনে আপন নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণকে আপনার নম্বর লিখিতে হইবে। প্রত্যুত্তর আবশ্যক হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিবেন, নচেৎ উত্তর যাইবে না—

সম্পাদকীয় পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

টাকা কড়ি আমার স্বাক্ষরিত বিল ব্যতীত কেহ দিলে আমি তাহার দায়ী হইব না।

ব্যারিং বা ইনসফিসিয়েন্ট পত্র গৃহীত হইবে না।

১৪৬ নং ফৌজদারী-বালাখানা,
কলিকাতা।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন,
স্বত্বাধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষ।

২য় খণ্ড। ১৩০১ সাল—অগ্রহায়ণ। ৩য় সংখ্যা।

নক্সা।

ডাক্তার জুতা।

গেজেট বাহির হইবার পর হইতে পাঁচকড়ি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় দমিয়া পড়িয়াছে। শত্রুপক্ষের মধ্যে অনেকে বলে “কাবু” হইয়াছে। কারণ এবার ভবতারণবাবু এফ, এ, ফেল।

তাহা যাহাই হউক, উৎসাহহারা হইবার যথেষ্ট কারণও ছিল। পাঁচুর গোটা নাম পঞ্চানন—থাকেন খুড়ার বাড়ী। পড়েন একটা ক্রিশ্চানি কলেজে। খোরাকের ভারটা খুড়ার—পোষাক ও জলখাবারের ভারটা নিজের। ছেলে পড়াইয়া সেটা সারিতে হয়। যে হাঁড়িতে সংসারের ভাত হয়, তাহাতেই খুড়ী, পাঁচুর নাম করিয়া একমুঠো চাল ফেলিয়া দেন। তাহা সিদ্ধ হইয়া পাতে দাঁড়াইলে—সরকারী ব্যঞ্জনের কিছু দিয়া পাচু তাহা খাইয়া কলেজে যান। সন্ধ্যার পর পড়াইতে যান—ভোজের আগে ফিরিয়া আসিয়া, সকালেরই ন্যায় উপকরণে আহারান্তে দ্বিতীয় পাতাটি সারিয়া, বাড়ীর বাহিরের ঘরে শুইয়া পড়ে। এই ঘরটার একটা, নির্দিষ্ট, অপরিবর্তনশীল সংজ্ঞা নাই। কখন তা বারান্দা, কখন বাহিরের ঘর, কখন বৈঠকখানা। একটা [illegible], দড়িতে খাটান আল্নার উপর সকালে পাঁচুর জামা উঠিয়া বসে, এবং সারাদিন ধরিয়া কখন ঝুলিতে, কখন দুলিতে থাকে। রাত্রিতে নামিয়া পাঁচুর শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহের সকল অবসাদ আপনি বুক পাতিয়া লয়। মাথার কাছে কুলুঙ্গির ভিতর একটা অসন্তুষ্ট [illegible] টিনের ডিবে প্রায়ই আধপেটা কেরোসিন্ তেলের খোরাক লইয়া জ্বলিতে থাকে—এবং কণ্ঠশ্বাস পর্য্যন্ত চারিদিকে কৃষ্ণধূম ও দুর্গন্ধ বিস্তার করিয়া তাহার প্রতি এ অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলিতে থাকে। পূর্ণ উদর পর্য্যন্ত সেবা

পাইলে তাহার স্বভাবের যে বিশেষ কিছু উন্নতি হইত সে বিষয়ে দারুণ সন্দেহ রহিয়াছে। অবশ্য মাত্রায় তোমার হৃদয়ের স্নেহ দান করাও যে, নীচ সে নীচই থাকিবে। খুড়ার বাড়ীর সহিত পাঁচুর এইরূপ সম্পর্ক।

পাশের খবর বাহির হইবার পর খুড়া একদিন স্নেহোপগত পাঁচুকে ডাকিয়া কিছু ভর্ৎসনা করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে একস্থান হইতে পাঁচুর বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কন্যাপক্ষের বর পছন্দও হইয়াছিল। এফ, এ পাশ হইতে পারিলেই বিবাহ স্থির। খুড়ারও বিবাহে অমত ছিল না। কারণ এ বিবাহে তাঁহার লাভ ভিন্ন লোকসান ছিল না। ভ্রাতার পরলোকপ্রাপ্তি হইবার পর হইতে তিনি পিতৃহীন পঞ্চাননের পিতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন। এবং অভিভাবক ও অন্নদাতা হইয়া পিতৃদেবের [illegible] হইয়াছেন এমনটা প্রায় মনে হয়। সুতরাং উপস্থিত বিবাহের ক্ষেত্রে, আধুনিক প্রথানুসারে বরকর্ত্তার প্রাপ্য আর্থিক লভ্যাংশে তাঁহারই একমাত্র আইনসঙ্গত অধিকার এরূপ কেনই বা তাঁহার মনে উদয় না হইবে? তারপর কন্যার পিতার ঐ কন্যাটি একমাত্র সন্তান। তিনিও একটা অভিভাবকহীন, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন। ইচ্ছা, মেয়ে দিয়া পাত্রের সহিত তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত দায়িত্ব কিনিয়া লইয়া তাহাকে ঘরে রাখিবেন। পরের ছেলের প্রতি একটা জীবনব্যাপী, পদে পদে, ক্ষুদ্র ত্রুটীতে অপরাধীকৃত, শঙ্কিত, কর্ত্তব্যের দায় অপেক্ষা তাঁহার নিকট ঘরের একটা ক্ষুদ্র বালিকার প্রতি কর্ত্তব্যের ভার অন্যের হস্তে অসঙ্কোচে সমর্পণ করা, গুরুতর দায় বলিয়া ঠেকিয়াছিল। পাঁচুর খুড়ার ন্যায় অতবড় একটা অভিভাবক সত্ত্বেও তিনি ঠিক বুঝিয়াছিলেন যে পাঁচুর উপর তাঁহার মৌরশীসত্ব নাই। তিনি শুধু পত্তনীদার। উচিত মূল্য দিলে তিনি সহজেই ইজারাসত্ব আপনার নামে খারিজ করিয়া লইতে পারিবেন। এখন ছটা পাশ করিতে পারিলে পাত্রের বুদ্ধির একটা পাকা পরিচয় পাওয়া যাইবে। সেই অপেক্ষাতেই তিনি ছিলেন।

সুতরাং এই বিবাহে খুড়া এক ঢিলে দুই পাখী মারিতে পারিবেন, এই আশায় অনেকটা উৎফুল্ল ছিলেন। এমন সময় পাঁচুর ভাবীজীবনের এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া, তাঁহার অতিরিক্ত কল্পনা বলে অনেক গুলি নূতন সুবিধা লইয়া ভবিষ্যৎ জীবনপথে যতটা অগ্রসর হইয়াছিলেন, ধাকা খাইয়া সেটা ফিরিয়া আসিতে হইল। তিনি ভর্ৎসনা করিবার সময় কিছু কোপ বা উষ্মা প্রকাশ করিলেন না। ধীরে ধীরে তিনি পাঁচুকে সময়ের ক্রমপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে চিন্তা ও বিচার করিতে বলিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের অবস্থার সচ্ছলতার হ্রাস ও সাংসারিক সকল দ্রব্যের ন্যায় জীবিকার অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সকলের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি হওয়ায়, লোকের অসুবিধা বিরূপ বাড়িয়াছে সে কথাও ভাবিয়া দেখিতে বলিলেন। বিশেষতঃ অল্পবেতনভোগী কপোষ্য-পরিবৃত পিতৃব্যকুলের উপর এই বিষম সাময়িক পরিবর্ত্তনবশে অন্নদুর্মূল্যতার পরিণাম

যে কিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা পাঁচুর ন্যায় বুদ্ধিজীবি, সুবোধ বালকের দ্বারা লক্ষিত হওয়া উচিত, সে কথাও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। খুড়া বক্তৃতা খুব সংক্ষেপে সারিলেন। পাঁচু চুপ করিয়া শুনিয়া গেল। খুড়া উঠিয়া গেলে পাঁচুর বোধ হইল, যেন খুড়া মহাশয় কতকগুলি বড় বড় শিশার গোলা আনিয়া, তাঁহার প্রতি পাঁজরায় বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিয়া গেলেন। ভবিষ্যতে সুবিধা পাইলে একগাছি লাঠি দিয়া উহাদের মাঝে মাঝে দোল দিবেন।

সুতরাং ফেল হইবার পর পাঁচুর উৎসাহভঙ্গ হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রথমতঃ খুড়ী ঠাকুরাণীর যে মুষ্টিতে পাঁচুর ক্ষুধা পরিমিত হইত, তাহার ক্রমশঃ হ্রস্বতা সম্বন্ধে একটা শঙ্কা জাগিয়া উঠিল। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বের সহাধ্যায়ী বন্ধু বান্ধবগণের সঙ্গে এই অদৃষ্ট বিভিন্নতা হেতু সেই অসঙ্কোচ সম্মিলনের মাঝখানে, যে একটা অস্থূল, তীক্ষ্ণপ্রান্ত, স্বচ্ছ কাচের বেড়ার ন্যায় ব্যবধান মাথা তুলিয়া উঠিবে—একটু অন্যমনস্কে একটু অসাবধানে অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বদেহব্যাপী কোন বেগময় অনুরাগ বা প্রীতি জানাইতে গেলে, মুখে বুকে, সর্ব্বশরীরে বড় বড় রক্তময় আঁচড় লাগিবে—সে আশঙ্কাও হইল। বিশেষতঃ এই বিবাহ কথাটার উপর কিছুদিন ধরিয়া, সে একটা যে কি গড়িয়া তুলিয়াছিল, সেইটা সহসা ভাঙ্গিয়া ঘাড়ের উপর পড়ায় যেন পাঁচুর উৎসাহের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িল। পাঁচুর বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই বিবাহিত। সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বেই পঞ্চানন বিবাহিতজীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। পাঁচু বাঙ্গলা, ইংরাজী কাব্য পড়িত। বন্ধুরাও সকলে মিলিয়া প্রেমাশ্রু, অধরসুধাসারসিক্ত, হাস্যকিরণউজলিত বিবাহ কাব্যতরু মাঝে মাঝে সবলে নাড়া দিয়া পাঁচুর নীরস কল্পনাকে ভিজাইয়া দিত, উর্ব্বর করিয়া তুলিত। পাঁচু ঘরে আসিয়া রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া তাই ভাবিত। এক একদিন অদ্ধরাত্রে উঠিয়া, প্রায় তৈলহীন ডিবে কাত করিয়া, ক্ষীণ আলোতে "আধহাসি" "দুটা কথা" "অভিমান" "বাতায়ন পথে" "কবরীতে ফুলে ফুল" প্রভৃতি নামক কবিতা লিখিত, আপনি পড়িত, বন্ধুদের শুনাইত। এক এক সময় ভ্রম হইত যেন সত্যই তাহার বিবাহিত জীবন আরম্ভ হইয়াছে। এবং কে যেন সত্যই কবরীতে ফুল ঢুলাইয়া, বাতায়নে বসিয়া, আধহাসি হাসিতেছিল—আর পাঁচু যেন তাহার নিকট শুধু দুটা কথার করুণা ভিক্ষা করিতে গেল—সে ভিক্ষা দিল না, ফলে লাভ হইল শুধু "অভিমান"। লিখিতে লিখিতে পাঁচুর হৃদয়ের জ্বলন্ত অগ্নির উপর তরল কল্পনা ফুটিতে থাকিত—কলমকাঠীর তাড়নায় উহা স্ফীত ফেনিল হইয়া উঠিত—অবশেষে ঘন ঘন উষ্ণ নিশ্বাসের সহিত বাষ্প কাটিয়া গেলে—অতি উপাদেয় সর্ব্ববিরহজ্বরহর কাব্য ক্বাথ প্রস্তুত হইত। যখন পাঁচুর এইরূপ অবস্থা তখন পাঁচু ফেল হইল, খুড়া বকিল, বিবাহের কথা চাপা পড়িল। কাযেই আঘাতটা লাগিল ভাল।

আজ পাঁচু বৈকাল বেলা বাহিরের ঘরে, জানালার নিকট, পথের দিকে মুখ

ফিরাইয়া বসিয়াছিল। ফেল হইবার পর আর বড় বাড়ী হইতে বাহির হইত না। কেবল সকালে পাড়ার "রিডিং রুমে" গিয়া এক আধ ঘণ্টা খবরের কাগজ পড়িত, কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনগুলা ভাল করিয়া দেখিত, আর ২০৲ টাকা মাহিনায় একজন শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ, সচ্চরিত্র, গ্রাডুয়েট অন্ততঃ এফ এ, পাশ মাষ্টারের প্রয়োজন দেখিয়া প্রতিদিন নিরাশ হৃদয়ে ফিরিত। সকালের জন্য একটা নূতন ছেলে পড়ান কাজ জুটাইবার প্রতি যে লক্ষ্য রাখিত না এমন নহে। সন্ধ্যার পড়ান ত ছিলই।

পাঁচু আপনার কথাই ভাবিতেছিল। যেরূপ উৎসাহহীনতা আসিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া, নূতন উদ্যম সঞ্চয় করিয়া আবার যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, এ কথা মনে করিতেও সাহস হইতেছিল না। কিন্তু তা না করিতে পারিলে অন্য উপায়ই বা কি? পড়া ছাড়িয়া অবলম্বন করিতে পারে এমন নূতন কর্ত্তব্যই বা কি? চাকরীর যেরূপ অবস্থা ও যেরূপ মারামারী, কাড়াকাড়ী তাহাতে ভরসা বড় কম; বিশেষতঃ যখন কোন বলবান্ পৃষ্ঠপোষক নাই। ব্যবসা করিবে! সে মূলধন কোথায়? সে শিক্ষা, সে বুদ্ধি কোথায়? পাঁচু ভাবিতেছিল, বাঙ্গালী স্ত্রীলোক সে বাঙ্গালী পুরুষ অপেক্ষা অধিক অসহায় এমন ত বোধ হয় না। পুরুষ—গর্ব্ব লইয়া, পুরুষের স্বাধীনতা, পুরুষের বুদ্ধি লইয়া'ত সে জন্মিয়াছে—কিন্তু আজ সে সত্যই স্ত্রীলোকের অপেক্ষা অধিক সহায়হীন। সম্মুখে একটা মস্ত ভবিষ্যৎ পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন তাহার কিছুই নাই। পুরুষ—মানুষ হয়, কীর্ত্তি করে—কিন্তু সেই পুরুষ আবার স্ত্রীলোক হইয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদে। স্বাধীনভাবে আপনার জন্য এক মুঠা ভাতের সংস্থান করিতে শুধু মাথা কুটিয়া মরে। কিন্তু কেন এমন হয়? সে কার দোষ? শুধু অদৃষ্ট! পুরুষকার, আত্মচেষ্টা ওসব কেবল কথামাত্র। ভাবিয়া ভাবিয়া পাঁচু স্থির করিল, এই নিখিল সংসারব্যাপী অবিরাম প্রবহমান, তরঙ্গময় কর্ম্মস্রোত এক মহা নিয়তির অঙ্গুলির রহস্যচালিত খেলামাত্র!

পাঁচু বার বার ঐ কথাই ভাবিতেছিল। এমন সময় একখানা বড় জুড়ী রাস্তার অপর পারে, একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পল্লীগ্রাম হইতে একজন যুবক জমীদার আসিয়া সম্প্রতি ঐ বাড়ী কিনিয়াছিলেন। নূতন জমীদারের নিকট কলিকাতা একটা স্বপ্নপুরী বলিয়া ঠেকিয়াছিল—এখনও সে কুহকের ঘোর কাটে নাই। তিনি সকালে জুড়ী করিয়া ইংরাজ-পাড়ার ভিতর দিয়া গড়ের মাঠ, আলিপুর, খিদিরপুরের গঙ্গাতীর ঘুরিয়া থাকেন—দুপুরে মোসাহেব লইয়া গল্প করেন, বা নিদ্রা যান—বৈকালে সকালের ন্যায় বেড়াইতে যান—সন্ধ্যার পর গ্যাসালোকিত, সুসজ্জিত বৈঠকখানা হইতে হারমোনিয়ম্, এসরাজের সুরের সহিত "তেরে নয়নোমে যাদু ডারা" বা "ফরামুমিনে দেল্ হারে, সনম্ জানে কি হাম্ জানে"—ইত্যাদি সুরস্রোত ছাড়িয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পল্লী জাগাইয়া রাখেন। আজ প্রায় এক মাসের অধিক

তিনি পাড়ায় আসিয়াছেন—ঘরের সম্মুখে প্রতিদিন গাড়ী আসিয়া দাঁড়ায়, বাবু, সাজিয়া বাহির হন—রাত্রিতে সঙ্গীত-ধ্বনি উঠে। পাঁচু এতদিন ভাল করিয়া দেখে নাই—শুনেও নাই। আজ সহসা গাড়ীর উপর পাঁচুর সমনোযোগ দৃষ্টি পড়িল। সুন্দর মূর্ত্তি, সুন্দর পোষাক পরিয়া একজন যুবক গাড়ীতে উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন উঠিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিল। তাহাকে পাঁচু চিনিতে পারিল। সে বাঙ্গালা স্কুলের একজন সহপাঠী। অনেক দিন স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে। বড় বড় পা ফেলিয়া ঘোড়া, গাড়ী লইয়া অদৃশ্য হইল।

গাড়া চলিয়া গেল। কিন্তু পাঁচুর মনের ভিতর হইতে গেল না। তাহার একটা নূতন ভাবনা জুটিল।

প্রথমেই পাঁচুর মাথার ভিতর যে কথাটা আসিল সেটা এই রকম। এ সংসারে কেহ আবশ্যকের অনেক অধিক সুখসম্পদ অধিকারী, ধনবান্ হইয়া জন্মে কেন, আর অন্য একজন তাহারই গৃহের পার্শ্বে, পথের উপর ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত হইয়া মরিয়া পড়িয়া থাকে কেন? আমি কি অপরাধ করিয়াছি, যে তোমার গাড়ীর চাকার উৎক্ষিপ্ত ধূলায় অন্ধ হইয়া পথে পড়িয়া যাইব, আর তুমি স্বচ্ছন্দে আমার জীর্ণ পঞ্জরের উপর দিয়া গাড়ী ছুটাইয়া চলিয়া যাইবে। এই কি ভগবানের পক্ষপাতশূন্য বিচার? সেই জন্য কি একই পথের একপারে, শুধু একজনের বিলাস-সুখের জন্য, দেহের নিম্নেস্থিত পা নামে, ভগবানের অতবড় দু'টা উদ্দেশ্যকে নিস্ফল করিবার জন্য প্রতিদিন গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইবে, আর অপর পার হইতে একজন চিরদিন তৃষিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিবে এবং একটা নিস্ফল আশার তীব্র যাতনা সহ্য করিবে? তুমি বলিবে পূর্ব্বজন্ম, পর-জন্ম, কর্ম্মফল, কত কি ছেলে-ভুলান ভুয়াকথা। হাঃ হাঃ! হাসি পায়। এমন কথাত শুনি নাই যে, ইহজন্মে কোন গতিকে একটা পাকা হরিতকি সংগ্রহ করিয়া, তোমার নিরন্ন ভিটায় পুতিতে পারিলে এবং চিরজীবনধৈর্য্য সহকারে উহাতে অশ্রু-সেক করিতে পারিলে, তাহা হইতে অসংখ্য অমৃতস্বাদী ফলের গাছ জন্মিয়া, পরজন্মে, তোমার জন্য বড় বড় বাগান সৃষ্টি হইবে। ভাল! তাই বা মেলে কোথা? তাহা হইলে ত অনেক দিন পূর্ব্বে খুড়ীর ভাঁড়ার কানার কাছ হইতে এই শূন্য উদরটাকে সরাইয়া ফেলিতে পারিতাম। কিছু নয়! আজ ঠিক বুঝিয়াছি। পাপপুণ্য—শুধু জুজুর ভয়। পাঁচুর এই সময় একটা রাম-প্রসাদী গান মনে পড়ায় হাসিয়া আকুল হইল—"আমি নই আটাসে ছেলে।"

তারপর পাঁচু ভাবিল। বেশ! তোমার পূর্ব্বজন্ম, তোমার সুকৃতি দুষ্কৃতি মানিলাম। সেই জন্যই ঐ বাবুটা আজ ধরায় মস্ত জমীদারলীলা করিতেছেন কিন্তু বাপু! ঐ যে উহার পাশে আর একটী—নির-ক্ষর, আমাপেক্ষা অনেক বুদ্ধিহীন ব্যক্তি বসিয়া—ক্লাশে প্রতিদিন সকলের নিচে থাকিত, এখনও ঐ গিলেকরা, সুইসের লম্বাআস্তিন জামা তুলিলে, পিঠে মাষ্টারের বেতের অনেক দাগ বাহির হয়—ঐ বাবরি কাটা লতানে চুলে মাথার কালশিরার দাগ ঢাকিয়া বেড়াইতেছে—ঐ মূর্খ! কি সুকৃতি করিয়াছে, যে অতবড় জমীদারের

ভোগবিলাসের অংশীদার হইয়া বেড়াইবে। কোন চেষ্টা নাই, ভাবনা নাই, খসখসে দেওয়া পাখার হাওয়ায় কপালে একবিন্দু ঘাম জমিতে পায়না। স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়া যাইতেছে। আজ উহার গাড়ীর পাশে বসিতেছে, কাল হয়ত ঐ জমীদারেরই অর্থে উহার বাড়ীর পাশে ঐরূপ বাড়ী তুলিবে। আর হয়ত প্রতিদিন এক একটা ছোট টুকরা ইট আমাদের বারান্দার ছুটিয়া আসিয়া খুড়ীর তপ্ত ভাতের হাড়া ফাঁসাইয়া দিবে। ধিক ধিক্। কে বলিবে আমি উহার অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান। তাহা হইলে আজ আমি কেন উহাকে গাড়ী হইতে মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, ঐ স্থান অধিকার করিয়া বসিতে পারিতেছিনা? এই কথাই ঠিক। ভগবান আছেন—আর তিনি নিতান্ত বিচারশূন্য নহেন। এই পৃথিবীর উপর, ঐ রকম বড় বড় গাছের তলায় তিনি টাকা পুতিয়া রাখিয়াছেন। গাছ চিনিয়া লইয়া, তলা খুঁড়িতে পারিলেই হইল। ও লোকটা ঠিক বলিয়াছে। বাঃ! কি সহজ উপায়। দেখাদেখি, এতদিন এ বুদ্ধি আমার মাথায় আসে নাই! আহা! ভগবান্ আছেন। তিনিই সময় বুঝিয়া সবিতারূপে বুদ্ধির প্রেরণা করিয়া থাকেন। এতদিন সে সময় আসে নাই। এখন দেখি কি করিতে পারি! উৎসাহে পাঁচু বুকে চাপড় মারিল।

কথাগুলা যত মনের মধ্যে তোলাপাড়া, নাড়াচাড়া করে, পাঁচুর ততই আনন্দ হইতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে পাঁচুর নিদ্রাকর্ষণ হইল। পাঁচু হাতে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিল—

যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একটা প্রকাণ্ড আদি অন্তহীন, প্রশস্ত পথ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পথের ধারে কেবল সারি সারি জুতার দোকান। বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র আকারের জুতা সাজান রহিয়াছে। পথের উপর মানুষ নাই। কেবল দলে দলে, পা আসিতেছে যাইতেছে, ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, চলিতেছে। আবার কেহ যানে, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে কেহ পাল্কির ভিতর। কিন্তু সওয়ার, চালক বাহক, সকলেই ঐ পা। সেই অসংখ্য মানব দেহের প্রায় সকলেই অপরূপ জুতা শোভিত। কেহ চটি, কেহ বুট, কেহ স্লিপ ওয়ালা, কেহ ডসন, কেহ বগলোস, কেহ ফিতাবাঁধা। সেই প্রশস্ত বর্ত্মের উপর দিবারাত্রি গতিশীল সংখ্যাতীত পদসংলগ্ন জুতার বিচিত্র শব্দে, এক অপূর্ব ধ্বনি উৎপন্ন হইতেছে। পাচু সে উহাদের জাতির ভাষার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না—কিন্তু সেই পথবাসী বিনামা কুলের ভিতর যে একটা কথার আদান প্রদান চলিতেছে তাহা অনুমান করিতে পারিল। সহসা একটা বড় জুতার দোকানের সম্মুখে একখানা বড় জুড়ী আসিয়া লাগিল। পাচুর বোধ হইল যেন, উহা সেই জমীদারের গাড়ীরই মত। তাহা হইতে কিংখাবের পায়জামা মোড়া একজোড়া সুন্দর, বিনামাহীন চরণ নামিল। পদদ্বয় দোকানে উঠিবামাত্র, সেই দলে দলে সজ্জিত জুতার ঝাঁক সমস্বরে কিচি কিচি শব্দ করিয়া উঠিল। ক্রমে চরণদ্বয়, একের পর, আরেক এইরূপে প্রায় সকল জুতাই পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কোন জোড়া মনের মত হইল না

নিরাশ হইয়া পদ যুগল ফিরিয়া গাড়ীতে উঠিবে। পাঁচু গাড়ীর চাকার কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ পাঁচুর দেহে সেই অপূর্ব্ব চরণ স্পর্শ হইল। স্পর্শমাত্র পাঁচু মানবদেহ ত্যাগ করিয়া, একজোড়া সুন্দর জরীর কাজ করা চটীতে পরিণত হইল এবং বিনামাজন্ম লাভ করিবামাত্রই সেই চরণদ্বয়ে সংলগ্ন হইয়া গেল।

চটা চট্, খটা খট্—কি শব্দ! পাঁচু-সেই কিংখাপমোড়া পা বুকে করিয়া অসাধারণ উৎসাহের সহিত পথের মাঝখান দিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছে। পথের উপর হইতে পায়ের ভিড, পথের দুইপাশে সরিয়া গিয়াছে। এবং সেই সকল পদসংলগ্ন বিনামাকুল বিস্মিত হইয়া পাঁচুকে দেখিতেছে। চটি-ওয়ালারা শত চক্ষু মেলিয়া, স্প্রিংওয়ালারা স্প্রিংএর ঘাড় খাড়া করিয়া পাঁচুকে দেখিতেছে ও তাহার শব্দ শুনিতেছে। কাহারও মুখের ভিতর হইতে লম্বা জিব বাহির হইয়া পড়িয়াছে - কাহারও কমের পাশ দিয়া দন্ত বিকাশ হইয়াছে। সকলেই বিস্মিত, শঙ্কিত, স্তম্ভিত। কেহ কেহ বলাবলি করিতে লাগিল "বোধ হয় কোন সম্ভ্রান্ত, বনিয়াদি বিনামা বংশের দৌহিত্র সন্তান হইবে। নতুবা এত শব্দ ও সাজ। বাঃ! মখমলের উপর কি চমৎকার সাচ্চা কাজ।" পাঁচু দ্বিগুণ শব্দে তাহাদের বিস্ময়-বর্দ্ধন করিয়া, তাহাদের গা ঘেষিয়া চলিয়া গেল। সকলেই অবাক!

পাশ দিয়া একজোড়া ধুলামাখা, ফাটা, শিরাযুক্ত, জুতাহীন শীর্ণপদ চলিতেছিল। পাঁচু হাঁকিয়া বলিল "কেহে! তুমি বেল্লিক? পথের ধূলা উড়াইয়া গায়ে দাও? তুমি আমাকে চেন না? চটীর মর্য্যাদা বুঝ না।

তখন সেই মাংসহীন শীর্ণ পদের ভিতর হইতে কথা বাহির হইল। সে বলিল "আমি বাপ! একজন পথিক। অত রাগ কেন? তোমার চেহারা দেখিয়া বেশ ভদ্র বাবাজী বোধ হয়। পরিচয়টি কি বাপ?"

পাঁচু। আমাকে চেন না! তবে দুনিয়ার কি খবর রাখ। আমি ৮ + ঘাটীর মহা চটু বংশাবতংশ। কুলপুরুষের উঁহারা আমাদেরই বাড়ীর ভাগ্নে। ঠনঠনিয়ার বাবুদের আজকাল বড় পসার প্রতিপত্তি আমাদেরই ধরে বেধে মানুষ। তবে সম্প্রতি বড়লোক হইয়া আলাদা হইয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বের কথা আর মনে নাই।

শুনিয়া সেই [illegible], পথচারী চরণ কহিল "ও! তাহা হইলে ত দেখিতেছি তুমি একজন মস্ত কুলীন। ভাল! ভাল!"

"কাচ" করিয়া পাঁচু হাসিল। বলিল "বাহে বাপ! মুচিখোলা নামে একটা স্থানের নাম শুনেছ? সেটা আমাদেরই মাতৃভূমি। অতি পুরাকালে ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত "মুচি" নামে একজন রাজা প্রথমে ঐ স্থানে আসিয়া রাজ্য-স্থাপন করেন। "মুচি" বা "মোচি" স্বর্গে অমরপতি ইন্দ্রের বিনামা প্রস্তুত করিতেন। ভাল কথা! তোমার কিছু শাস্ত্র পড়া আছে?

চরণ কহিল "কিছু কিছু! তুমি কোন শাস্ত্রের কথা কহিতেছ?

পাঁচু। উপানৎ পুরাণ।

চরণ। নাম শুনি নাই বাপু। মিথ্যা কহিব কেন? তবে পুরাণটা কি একটা শাস্ত্র?

আবার "ক্যাঁচ" করিয়া শব্দ হইল। পাঁচু বলিল—ভাল! পড় নাই আবার বাক্য ব্যয় কর কেন? আমি বলি, মনদিয়া শুন। ঐ পুরাণেই আমাদের বংশপরিচয় পাইবে। তাহাতে লেখা আছে "মোচি" ত্রিদশাধিপের উপানহ-কার ছিলেন। ভগবান ইন্দ্র তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করেন 'অতঃপর তুমি মর্ত্ত্যে গিয়া এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইবে। চরণের আধি মোচন কর বলিয়া। তোমার নাম "মোচি" হইল। তোমার সন্তান সন্ততি গণ জগতে প্রথিতযশা হইবে। এবং নামের বিশেষরূপ পরিবর্ত্তি হইবে বলিয়া উঁহারা "বিনামা" আখ্যা পাইবে। শুনিতেছ?"

চরণ 'হুঁ' দিল। পাঁচু বলিতে লাগিল "সেই রাজবংশের আদি-পুরুষ 'মোচিরাজ' যেখানে আসিয়া প্রথমে রাজ্যস্থাপন করেন, সেই স্থান আজও মুচিখোলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখন কতকটা আমাদের বংশপরিচয় পাইয়াছ?" সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় রকম 'ক্যাঁচ' শব্দ হইল।

চরণ একটু গা ঝাড়া দিয়া বলিল "তোমার পূর্ব্ব গৌরবের কথা যথেষ্ট শুনিলাম। তোমার আধুনিক কিছু পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করি। যাঁহাকে তুমি আশ্রয় করিয়া আছ দেখিতেছি উনি কে?"

পটা পট্ শব্দ হইল। চরণ বুঝিল চটি চটিয়াছে। সে একটু সরিয়া গেল। তখন পাঁচু কহিল" কোন শাস্ত্রই পড়া নাই দেখিতেছি। ভাল! শব্দশাস্ত্রটাতেও কি একটু দৃষ্টি রাখিতে নাই? ঐ যে আশ্রয় কথাটা প্রয়োগ করিলে, ওটার তাৎপর্য্য কি জানা আছে? শব্দ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে তাহার অর্থবোধ হওয়া উচিত!"

কিছু বিস্মিত হইয়া চরণ কহিল "অতটা শব্দশাস্ত্র জ্ঞান আমার নাই বাপু। তবে দেখিতেছি উঁহার তলে তোমার দিনরাত কাটিতেছে; এবং ঐস্থান হইতে সরিয়া পড়িলে তোমার বল, বীর্য্য গতি সব শেষ হইয়া যায়। তখন তোমাদের মধ্যে সম্বন্ধের কথা কহিতে গেলে সহজেই আশ্রয়, আশ্রিত ভাবটাই আগে মনে আসে। সুতরাং শব্দটা প্রয়োগ কালে অতটা দোষের হইয়া দাঁড়াইবে বুঝিতে পারি নাই।"

পাঁচু রাগিয়া কহিল "সে বুদ্ধি থাকিলেই বা তোমার এ দশা কেন? তুমি জান—আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কত মহৎ। একনিষ্ঠ পরহিতব্রতই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। আমরা না থাকিলে আজ জগতের অভাগা চরণকুলের কি দুর্দ্দশা হইত, বুঝিতে পার? কঠিন তপ্ত, ধুলিময়, মৃত্তিকার সহিত নিয়ত সংগ্রামের মাঝে আসিয়া, অকুতোভয়ে আপনাদের প্রশস্ত বক্ষ পাতিয়া দিয়া, সকল ক্লেশ আয়াস সহ্য করিয়া, নির্ম্মম মৃত্তিকাকে কে অবিরত পরাভূত করিতেছে? ধিক! তুমি কহিলে আশ্রয় করিয়া আছি। ন্যায় শাস্ত্র কিছু জান? "তৈলাধার পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল" সে বাক্যটা মনে পড়ে? আর সে সমস্যার উত্তর কি?

তখন চরণ ধীরে ধীরে কতকটা সভয়ে কহিল, "পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাপু! আমার কোন শাস্ত্রই ভাল রকম জানা নাই।

অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এই-খানেই বিদায় লইতে ইচ্ছা করি।

পাচু। "বক্তা শ্রোতাচ যত্রাস্তে রমন্তে তত্র 'সম্পদঃ।" তোমার মত শ্রোতা পাইয়া বড় সুখী হইয়াছিলাম। যাহা হউক তুমি এখন যাইতে পার। অসময়ে উপকারের প্রয়োজন হইলে আমায় স্মরণ করিও।

চরণ চলিয়া গেল।

পাঁচু দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু কতদিন—স্মরণে সেটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। একদিন পাঁচু দেখিল তাহার জরী ঝরিয়া পড়িয়াছে—মখমল বিবর্ণ হইয়াছে—এবং তলায় অনেক গুলা ছিদ্র হইয়াছে। আরও বোধ হইল, যে পদে এতদিন সংলগ্ন হইয়াছিল, তাহাপেক্ষা কতকটা বড় হইয়া ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে। পাচু প্রাণপণে পা দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু পারিল না। শেষে একদিন চরণচ্যুত হইয়া পথে পড়িয়া গেল। যে চরণ এতদিন তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিল সে অন্য জুতার সন্ধানে চলিয়া গেল। পাচু শক্তিহীন হইয়া জড়ের মত পথের ধারে পড়িয়া রহিল।

পথের উপর একদল কুকুর বেড়াইতেছিল। পাচুকে দেখিয়া, অতি উপাদেয় খাদ্য বিবেচনা হইলে বিবেচনা করিয়া ছুটিয়া আসিল। দন্ত, জিহ্বা নখ দিয়া একে একে পরীক্ষা আরম্ভ করিল। পাঁচু যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল "ভো! ভো! শ্বাপদাঃ।"

কুকুরের দল ভয়ে দূরে সরিয়া গেল। এরূপ বায়ুগ ভোজ্য পদার্থ ইতি পূর্ব্বে কখন দেখেনাই। তাহাদের পলাইতে দেখিয়া পাঁচুর ইচ্ছা হইল পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া একবার বিজেতা বীরের গর্ব্ব ও আনন্দ কতকটা উপভোগ করে। কিন্তু দেখিল সর্ব্ব শরীরব্যাপী পক্ষাঘাত-গ্রস্তরোগীর ন্যায় তাহার নড়িবার পর্য্যন্ত শক্তি লোপ পাইয়াছে। একবার হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে জোর পৌঁছিল না। শুধু আশে পাশের ছিদ্র দিয়া খানিকটা বাতাস বাহির হইয়া গেল। পাচু পথের ধারে পড়িয়া রহিল। সেই নিরাবরণ পথের উপর পড়িয়া পড়িয়া পাঁচু রৌদ্র বৃষ্টি শীতের যাতনা সহ্য করিতে লাগিল। পথ দিয়া দলে দলে পা যায় আসে। সেই সকল পদসংলগ্ন জুতারা শব্দ করিয়া গর্ব্ব করিতে করিতে ধূলা উড়াইয়া চলিয়া যায়। সে ধূলা পাঁচুর গায়ে আসিয়া পড়ে। পাচু দেখে যাহারা পূর্ব্বে তাহাকে দেখিলে পথছাড়িয়া দিয়া পাশে গিয়া দাঁড়াইত, তাহারা এখন পাচুকে দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া হাসে যাইবার সময় পাচুর কাছে আসিয়া এমন জোর করিয়া মাটিতে আঘাত করে ও পা ঝাড়া দেয় যে এক একখানা ধূলার মেঘ সৃষ্টি হইয়া পাচুকে ঘিরিয়া ফেলে, পাচুর শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হয়।

একদিন বড় জোরে পথের উপর শব্দ হইতে লাগিল। পাচু দেখে এক জোড়া বিলাতি বুট সগর্ব্বে সশব্দে সেই দিকে আসিতেছে। বুট যখন কাছে আসিল, তখন কষ্টে পাচু ফাটিয়া যাইবার মত হইল। কিন্তু তাহা হইল না, শুধু ছিদ্র দিয়া এক ঝলক গরম বাতাস বাহির হইয়া গেল। জুতার ভিতর যে চরণ প্রায় আত্মীয় মগ্ন হইয়াছিল দেখিবামাত্র পাচু তাহাকে চিনিতে পারিল।

সে পাচুর পূর্ব্বের আশ্রয় ও অবলম্বন। পাঁচুর কান্না আসিল, কিন্তু ভাবিল যাহাহউক ঠকা হইবে না।

বুট কাছে আসিয়া সজোরে পাঁচুর গায়ে ধাক্কা দিল। পাচু দুই তিনটা উলট খাইয়া পড়িয়া গিয়া বলিল "আঃ কি আরাম!"

বুট জোরের মাত্রা চড়াইয়া, আর একবার পাশের দিকে ধাক্কা দিল। পাঁচু শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়া, দুটা ডিগবাজী খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। বুটের ভিতর হইতে পা বলিল "কো কায়দা!"

বুট বলিল "বা!—তোমার ত ব্যায়াম কৌশল খুব অভ্যস্ত দেখিতেছি।

পাচু হাসিয়া বলিল "বলেন কি হুজুর আর্য্য ব্যায়াম শাস্ত্রটা—যাক! তুমি ম্লেচ্ছ তোমার সঙ্গে কি শাস্ত্র কথা কহিব।

বুট। ভাল! ভাল! এখন তোমার সেই শাস্ত্র জ্ঞানের কিছু পরিচয় দাও দেখি। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচুর পার্শ্বে আবার সজোরে আঘাত আরম্ভ হইল। পাঁচু উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আছাড় খাইয়া পড়ে, চোখে মুখে ধুলাকাদা ঢুকিয়া যায়, নিশ্বাস বন্ধ হইবার মত হয়। বুটের ভিতর হইতে বাবু চরণ বলে "কাম্ খুব"। সেইটা সবচেয়ে পাঁচুর বেশী লাগে।

তখন পথের উপর একটা জনতা হইয়া দাড়াইল। দলেদলে পা আসিয়া সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল। সকলেই হাসে, মজাদেখে আর চরণ বাবুর কথার অনুকরণ করিয়া বলে "কাম্খুব।" বুটও ছাড়ে না।

পথের ধারে একটা জুতার দোকানের পাশে একটা শৈবালাচ্ছন্ন দুর্গন্ধ পঙ্কিল জলময় পুষ্করণী ছিল। যখন কণ্ঠাগত প্রাণ, তখন পাচু নিরুপায় হইয়া শূন্যে একটা বড় রকম ডিগবাজী খাইয়া তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পাচুর পতনে জলে আন্দোলন হইল। ভেকেরা ভেগোগ লাগাইল। উহঃ—মাছেরা ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটী করিতে লাগিল। তখন প্রায় কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত। কিন্তু পাচু ভাবিল হায় হায়! আমার হতভাগা স্বজাতিগণ আমায় কিছুমাত্র বুঝিতে পারে নাই, তাই আজ আমার এত অসম্মান। অধম তামাক জাতীয় মৎস্য ভেকগণের যে বুদ্ধি আছে শ্রেষ্ঠ জাত্যাভিমানী বিলাতকুলের সেটুকও নাই। বরোহং। রবিবার পূর্ব্বেও আমার অদৃষ্টে এতখানি সম্মান লেখা ছিল। পাচু গম্ভীরস্বরে মাভৈঃ মাভৈঃ বলিয়া ত্রস্ত ও পলায়নপর ভেক ও মৎস্যগণকে অভয় দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শুধু জলের ভিতর "বুড় বুড়" করিয়া একপ্রকার শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে জলের উপর গোটাকতক বুদ্বুদ ভাসিয়া উঠিল।—চারিপাশের ছিদ্র দিয়া পাচুর শরীরের ভিতর তখন জল ঢুকিতে ছিল ও তাহার ভারে পাচু তলার দিকে নামিতেছিল।

পাশ দিয়া একটা বড় মাছ ছুটিয়া যাইতেছিল। তাহার লম্বা ল্যাজটা বেগে আছড়াইয়া পাচুর গায়ে লাগিল। তলায় পৌঁছিতে যে টুকু বাকী ছিল এইবার তাহা হইল।

পাঁকের উপর গোটা কতক বড় মাছ মজলিস করিয়া বসিয়া ছিল। পাচুকে দেখিয়া তাহারা সভা ভাঙ্গিয়া দিল। জলে ঢেউ উঠিল। পাঁচু ভাসিয়া কতক গুলা জলজ গুল্মের মূলের ভিতর

গিয়া বদ্ধ হইল। নড়িবার ফিরিবার ভাসিবার স্বাধীনতা টুকুও শেষ হইল। মাছেরা ছুটে, জল কাঁপে। তলা হইতে দুর্গন্ধ বাষ্প ও পাঁক উঠিয়া পাঁচুর চারি দিক ঘেরিতে লাগিল। পাঁচুর প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। ইচ্ছা হইল ছুটিয়া পলায়—কিন্তু সে শক্তি নাই। তখন পাঁচু যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা শেষ হইয়াছে। তখনও আলো জ্বালা হয় নাই। ঘরের ভিতর খুব অন্ধকার। পাঁচুর ভ্রম হইল সে সত্যই বুঝি পুকুরের তলদেশে গুল্মের মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ক্রমে অল্পে অল্পে ভ্রম দূর হইল—একে একে বৈকালের সবকথা মনে পড়িতে লাগিল। যখন জাগরণের কাছ হইতে স্বপ্ন অনেকটা দূরে সরিয়া গেল তখন পাঁচু ভাবিল ভগবান্ সত্যই আছেন। আর তিনি সবিতারূপে লোক হিতার্থ, যে শুধু গাছ চিনিয়া তলা খুঁড়িবার সুবুদ্ধি প্রেরণ করেন, তাহা নহে মধ্যে মধ্যে স্বপ্নও প্রেরণ করিয়া থাকেন।

উঠিয়া পড়িয়া পাঁচু প্রায় এক সপ্তাহের ভিতর একটা মাষ্টারি যোগাড় করিল। এবং কলেজ খুলিবা মাত্র আবার ভর্ত্তি হইল।

শ্রীক্ষেত্রমোহন গুপ্ত।

রামসিংহ কুকা।

A wake ! arise ! or be for ever fallen !
They heard, and were abash'd, and up they sprung
—*Milton.*

They died a bloody death * * * *
The Warrior's Wife.

---

[১]

বেশী দিনের কথা নয়—সিপাহী-বিদ্রোহের অনেক দিন পরে, পঞ্জাবে একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় 'ওয়াটার্লু' চিলিয়ান্‌ওয়ালার তুলনায় তুচ্ছ হইলেও তাহা একটী শোণিতময়ী কাহিনী!

শিখ-শাসন-কালে পঞ্জাবে গো হত্যার নাম ছিল না। গোহত্যাকারীকে জীবন্ত শূকরের সহিত জীবন্ত দগ্ধ করা হইত। একবার মুসলমানেরা অমৃতসরের "গুরু-দরবারে" * গো হত্যা করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিল, শিখগণ মুসলমান-রক্তে গো-রক্ত ধুইয়া প্রতিশোধের প্রতিশোধ লইয়াছিল! আর একবার এক

* এই স্থানে গুরুগোবিন্দ সিংহের তরবারি আছে। শিখগণ উক্ত তরবারির পূজা করিয়া থাকে।

জন মুসলমান গো-পীড়ন অপরাধে কুক্কুর-দ্বারা ভক্ষিত হয়। সেই অবধি পঞ্জাবে একটী নূতন শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। কোন জোর জুলুমের কথা শুনিলেই লোকে তাহাকে "শিখ্‌খেশাই" নামে অভিহিত করে।

[২]

তাহার পর পঞ্জাব-কেশরীর সঙ্গে রাজলক্ষ্মীও দেশ ছাড়িলেন। অসহায় শিখ দ্বিতীয় ওয়াটার্লুর অবতারণা করিয়া তাঁহার অনুগামী হইল; জয়লক্ষ্মী চির-দিনের জন্য ইংরাজের অঙ্কশায়িনী হই-লেন—রণজিতের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিল ! †

শিখগণ নিরস্ত্র হইয়া বহুকাল উদ্দেশ্য হীন জীবন অতিবাহিত করিল। সৈনিক শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার নিষেধ, শিখ-হস্তে অস্ত্র দেখিলে ইংরাজ সশঙ্কিত, তৎক্ষণাৎ অস্ত্রত্যাগের আজ্ঞা প্রচার, ইত্যাদি নানা কারণে শিখগণ নিরাশ-ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। মস্তক-হীন দেহের আর কি আশা থাকিতে পারে? কিন্তু তখনও পুণ্যভূমি পঞ্চনদ গো-রক্তে কলঙ্কিত হয় নাই, তখনও শিখের নামে যবনের হৃদয় কাঁপিত !

তাহার পর ১৮৫৭ সালের শোণিত-ময়ী বিভীষিকা!! পাটনায় কুমার সিংহ, কানপুরে ব্রিটীশ-ত্রাস নানা ছিন্ন ভিন্ন ইংরাজদেহ নৌকা বোঝাই করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিল। উপরে লিখিয়া দিল—"যে কেহ হিন্দু এই নৌকা দেখিবে তীরে লাগিতে দিবে না!" কত নৌকা পঞ্চনদে ভাসিয়া আসিল,—মিয়ান্‌মীর ও গুরুদাসপুরের 'পুরবিয়া' সৈন্য বিদ্রোহী হইল! ইংরাজ তখন নিরাশ হইয়া শিখের আশ্রয় লইল। এদিকে রাম ওদিকে রাবণ, এক দিকে তো মরিতে হইবে—ইংরাজ শিখের আশ্রয় লইল। ইংরাজ চিরকৌশলী। তাহারা অনেকে শিখ-গুরুর প্রসাদ খাইয়া শিখ-বেশে সজ্জিত হইল; এক হস্তে তরবারি ও অন্য হস্তে শিখের ধর্ম্ম-গ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' লইয়া গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে শিখের সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিল। বহুদিবসের পর তর-বারির সাক্ষাৎ পাইয়া শিখ-হৃদয় নাচিয়া উঠিল; রক্তাশী বিদ্রোহীর রক্ত-পিপাসা মিটিল, শিখ-করবাল-মুখে, তাহারা শৃগাল-ভোজ্যে পরিণত হইল!! সেই অবধি ইংরাজ-সৈন্যে শিখগণ প্রবেশাধি-কার পাইল।

৫৭ সালের শোণিত-রেখা ভারতের হৃদয় হইতে মুছিয়া গেল,—দিন যেরূপে কাটিতেছিল কাটিতে লাগিল। বাঙ্গালী-গণ দলে দলে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া এদেশে আসিতে লাগিল। আজ কাল যেরূপ লাহোর তখন সেরূপ অমৃতসর বাঙ্গালী-দের হেড্ কোয়ার্টার্স্ ছিল, সুতরাং বলা বাহুল্য, অমৃতসরে তখন বিস্তর বাঙ্গালী। আমার পিতা, পিতামহী, জ্যেঠা, খুড়া, পিসি, পিস্‌তুতভাই—এক কথায়, সকলেই অমৃতসরে ছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখেই আমার এই প্রবন্ধের ঘটনাটী সংঘটিত হয়।

† ভারতবর্ষের মানচিত্রের একস্থান লালবর্ণে রঞ্জিত দেখিয়া রণজিৎ জনৈক পারিষদকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ঐ স্থান ইংরেজাধিকৃত শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "সবলাল হো যায়গা!" অর্থাৎ "সবলাল হইয়া যাইবে"। ইহাই রণজিতের ভবিষ্যদ্বাণী।

সিপাহী-বিদ্রোহের পর অনেক বৎসর কাটিল। মুসলমানগণ 'শিখ্‌খেশাই' ভুলে নাই, তাহারা ভাবিল, যখন শিখেরা ইংরাজের অধীনে সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে তখন উহাদের তেজোদ্যম গিয়াছে, আর উহারা ইংরাজ-শাসনকে উপেক্ষা করিতে সাহস করিবে না। এই অবসরে তাহারা 'শিখ্‌খেশাই'য়ের প্রতিশোধ স্বরূপ * স্থানে স্থানে গো-হত্যা আরম্ভ করিল। শিখ-তীর্থ অমৃতসরে গোহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল! শিখের হৃদয়ে আঘাত লাগিল, তাহারা গ্রামে গ্রামে ঐ কথার আন্দোলন করিতে লাগিল। মাথা নাই, কি করিবে? রণজিৎ নাই, শের নাই, আফগান-ভীতি নলুযা * নাই—কাহার নিকট হৃদয়ের ব্যথা জানাইবে? তাহারা নীরবে সকল সহ্য করিল। কিন্তু শার্দ্দূলের আস্ফালন সিংহ কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে? গো-হত্যার বাড়াবাড়ি দেখিয়া তাহার নিবারণের উপায়োদ্ভাবন-মানসে অমৃতসরের ভদ্র শিখগণ এক গুপ্ত-সভা আহ্বান করিল।

[৩]

গভীর নিশীথে, জনহীন প্রান্তরে, নক্ষত্র-খচিত আকাশ-তলে বসিয়া তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিল, যে কোন প্রকারেই হউক এই ভীষণ অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে হইবে।

দূরে অমৃতসর নগরী সুপ্ত; বৃহন্নগরী মধ্যস্থিত সুরম্য হর্ম্মরাজিতে চেতনার একটী ক্ষীণ স্পন্দও নাই, যেন সকলেই স্তব্ধহৃদয়ে একটী শোণিতময়ী বিভীষিকার প্রতীক্ষা করিতেছে! দূরে—নিকটে, বৃক্ষপল্লবে, অনন্ত শূন্যে সমীরণ সুপ্ত,—প্রকৃতি স্থির, নিস্পন্দ; কি যেন এক মলিনভাবে সকলই আচ্ছন্ন, যেন সেই মলিনতা দূর নক্ষত্রমণ্ডলীকেও স্পর্শ করিয়াছে! সেই বিভীষিকাময়ী রজনীতে, দিগন্ত-প্রসাবিত প্রান্তরের বুকে দাঁড়াইয়া সভাপতি প্রতিজ্ঞা করিলেন—"শোণিতে শোণিতের প্রতিশোধ লইব!" সকলে সমস্বরে গর্জ্জিয়া উঠিল—"শোণিতে শোণিতের প্রতিশোধ লইব!!"

দূরে শৃগাল প্রহর ডাকিল।

সভাপতি বলিলেন—"ভ্রাতৃগণ! আর ঘুমাইও না! উঠ, আমাদেব জন্মভূমি গো-রক্তে রঞ্জিত হইল, একবার চাহিয়া দেখ! জীবনের মায়া ত্যাগ করিতে পারে এরূপ শিখ কি আমাদের মধ্যে একজনও নাই? শিখ কি এতই নির্বীর্য্য হইয়াছে? রণজিতের চিতাভস্মের একটী সামান্য পরমাণুও কি পঞ্চনদে নাই?"

গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল—"আছে!" সকলে চমকিয়া দেখিল—এক অশীতিপর বৃদ্ধ।

সভাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি?"

"আমার নাম রামসিংহ। আমি কুকা সম্প্রদায় ভুক্ত।"

* হরিসিংহ নলুযা। বঙ্গদেশে যেরূপ "বর্গী" আফগানিস্থানে সেইরূপ নলুয়ার নামে আফগান শিশু নিদ্রা যায়। হবিসিংহ নলুযা আফগানগণেব কিরূপ দুর্দ্দশা কবিয়াছিল তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন, সুতবাং সে বিষয় অধিক বলা বাহুল্য। যে হবিসিংহের নামে দুর্দ্দান্ত পাঠানের হৃদয়ও কাঁপিযা উঠে সে হরিসিংহ যে কিরূপ লোক ছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

"আপনি স্বেচ্ছায় এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইতেছেন ?"

"শিখ অনিচ্ছায় মরে না। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি কেবল মাত্র বিংশতি জন অনুচর লইয়া কার্য্য সিদ্ধ করিব।"

"কুড়িজন মাত্র লইয়া আপনি কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন ? তাহারা সংখ্যায় অন্যূন দুই শত।"

"না হয় মরিব! সিংহ এত নির্বীর্য্য হয় নাই যে দুই শত শার্দ্দুল দেখিয়া ভীত হইবে।"

সকলে গর্জ্জিয়া উঠিল!

সভাপতি অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"এখন অস্ত্র ?"

সকলের মুখ বিমর্ষ হইল,—মুখের হর্ষ-ভাতি প্রভাত-শশাঙ্কের ন্যায় মলিন হইল!

রামসিংহ কুকা গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"তাহার উপায়ও করিযাছি। কতিপয় সিপাহীব নিকট হইতে কতকগুলি তববারি সংগ্রহ করিয়াছি।"

সকলের মুখে লুপ্ত হর্ষ-রেখা পুনর্ব্বার ফুটিয়া উঠিল! সেই নক্ষত্রালোকিত রজনীতে নৈশ ভীষণতার বুক ভেদিয়া শব্দ হইল—"সত্য শ্রী অকাল!!" *

দূরে—প্রান্তর-প্রান্ত-স্থিত কোন জটাবহুল বটবৃক্ষ হইতে পেচক তাহার প্রতিধ্বনি করিল!!

তাহার পর রামসিংহ প্রস্তুত হইলেন। বিংশতি জনের অধিক অনুচর লইলেন না। সকলেই স্বসম্প্রদায়ভুক্ত; অধিকাংশ তাঁহার আত্মীয়—ভ্রাতা, পুত্র, ভ্রাতষ্পুত্র। সুন্দরসিংহ নামে তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষীয় পুত্রও অসি গ্রহণ করিল।

তাহার পর—সেই শুব্ধ রজনীতে, দিগন্তমুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাহারা জগতের নিকট শেষ বিদায় লইল! দূর শূন্যে, অসীম নক্ষত্রমণ্ডলীর কোলে, কম্পিত ছায়াপথের মধ্য দিয়া রণজিতের আত্মা তাহারা দেখিল কি না কে বলিতে পারে ?

[৪]

তাহার পর রাত্রিশেষে বিশালনগরী অমৃতসরের এক অর্দ্ধ-নিভৃত, অর্দ্ধ-প্রকাশিত স্থানে প্রায় দুই শত মুসলমান—যাক্, সে দৃশ্য আঁকিতে হিন্দুর লেখনী অক্ষম। তাহা হিন্দুর হৃদয়-বিদারক দৃশ্য!!!

নিকটে দুইজন মুসলমান শান্তিরক্ষক সশস্ত্র হইযা 'শান্তিরক্ষা' করিতেছিল। সেই 'গোরক্ত-প্লাবিত' রজনীতে, অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে তাহারা দেখিল, অদূরে কতকগুলি দীর্ঘমূর্ত্তি দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে। একজন হাঁকিল—"হুকমদার" ? †

গম্ভীরস্বরে উত্তর হইল—"রামসিংহ কুকা!" বলিতে বলিতে শিখগণ নিকটস্থ হইল। প্রহরী অসি নিষ্কোষিত করিয়া বলিল—"পিছে রও!" মুহূর্ত্তের মধ্যে রামসিংহের তরবারি আকাশে উত্থিত হইল, মুহূর্ত্তের মধ্যে সিপাহীর মস্তক ধরাবলুণ্ঠিত হইল! তাহার পর শিখগণ

* ইংরাজের যেমন "Hip hip hurrah" মুসলমানের যেমন "ইয়া অলি" 'ইয়া মহম্মদ' বা "দীন দীন" শিখেরও তেমনি "সত্য শ্রী অকাল।" যুদ্ধকালে ইহা বড় ভীষণ শুনায়। শুনিয়াছি, পাঠানেরা এই "সত্য শ্রী অকাল" শুনিলেই কাঁপিত।

† Who comes there ? এর পিতৃশ্রাদ্ধ।

বিনা বাক্যব্যয়ে গোহত্যাকারীদিগকে আক্রমণ করিল। শত চেষ্টাতেও তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, দীর্ঘ তরবারির প্রত্যেক আঘাতে তিনজন চারিজন করিয়া মুসলমান পড়িতে লাগিল! দেখিতে-দেখিতে প্রায় দেড়শত মুসলমান শিখহস্তে নিহত হইল!!! রামসিংহ ক্লান্ত অনুচরগণ সহ রক্তাক্ত কলেবরে গুরুদরবারাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন চতুর্দ্দিক পিঙ্গলমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

[৫]

প্রভাতে উঠিয়া সকলে মুসলমানের পরিণাম দেখিল। হিন্দুমহলে আনন্দের রোল উঠিল। এমন কি, শুনিয়াছি এই সংবাদ প্রচারিত হইলে স্ত্রীলোকেরা মনের উল্লাসে শঙ্খধ্বনি করিয়াছিল।

সাহেবমহলে শঙ্কার ছায়া পড়িল; কারণ সোত্রাওঁয়ের শোণিত-লহরী বা বিদ্রোহের বিভীষিকা তাহারা তখনও ভুলে নাই। লাহোরে 'তার' গেল। দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই মিয়ান্মীরের পাঠান ও গোরাসৈন্যে নগর ছাইয়া ফেলিল। স্থানে স্থানে তোপখানা পড়িল। প্রজাবিদ্রোহের আশঙ্কা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল।

অমৃতসরে তখন শিখসৈনিক ২০।২৫ জনের অধিক ছিল না; সেই ২০।২৫ জনকেও নিদ্রিতাবস্থায় দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ করা হইয়াছিল।

তাহার পর হত্যাকারীগণের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। মুসলমানগণের মধ্যে যাহারা জীবিত ছিল তাহারা রামসিংহ কুকার নাম করিল। রামসিংহকে ধরিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে সিপাহী ছুটিল।

* * *

অমৃতসরের ‡ পুণ্যসলিলে রামসিংহ ও সুন্দরসিংহ স্নান বা শোণিত প্রক্ষালন করিতেছিলেন এমন সময়ে অন্যূন দুই শত পাঠান সিপাহী আসিয়া তাহাদিগকে ঘেরাও করিল। রামসিংহের নিকট তখন তরবারি ছিল না, সুতরাং বলপ্রয়োগ নিষ্ফল ভাবিয়া বলিলেন—"অত্যাচারীর দণ্ড দিয়াছি তজ্জন্য ভীত নহি, শিখ মারিয়া মরিতে জানে। চল যাইতেছি, কিন্তু সাবধান, আমাদের স্পর্শ করিও না! হরিসিংহ নলুয়ার নাম স্মরণ করিয়া আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকিও! আফগানিস্থানে শোণিত আছে; শিখ এখনও মরে নাই!!"

রামসিংহ ও সুন্দরসিংহ সিংহের ন্যায় বক্ষ স্ফীত করিয়া অগ্রসর হইলেন; পাঠানেরা বিনা বাক্যব্যয়ে পশ্চাদনুবর্ত্তী হইল।

রামসিংহ ধৃত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার অনুচরবর্গ স্বেচ্ছায় আসিয়া আত্মসমর্পণ করিল।

* * *

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা শিখগণকে স-সর্দ্দার তোপে উড়াইয়া দিবার আদেশ হইল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অমৃতসরের সেই বিস্তৃত প্রান্তরে—যেখানে, সেই প্রশান্ত রজনীতে অনন্ত প্রসারিত আকাশ-তলে বসিয়া, তাহারা জগতের নিকট শেষ বিদায় লইয়াছিল—সেই তৃণাবরণ শোভিত দূর-মুক্ত প্রান্তরে ইংরাজের

‡ এই পুষ্করিণীর বক্ষে 'গুরুদরবার' শোভিত এবং ইহার নামানুসারেই নগরীর নাম 'অমৃতসর' হইয়াছে।

তোপখানা পড়িল। একটি ছাড়া প্রায় সকলগুলির মুখই অমৃতসরের দিকে—সেই একটী যবন-হন্তা শিখের জন্ম। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য সৈন্য, ভরা বন্দুক, খোলা তলোয়ার—সুতরাং বিদ্রোহের আশঙ্কা বহুদূরে। সন্ধ্যার বহুপূর্ব্ব হইতে দর্শকমণ্ডলীর সমাগম হইতে লাগিল—বলা বাহুল্য সকলেই মুসলমান।

সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া রামসিংহ, সুন্দরসিংহ ও অন্যান্য শিখগণ বধ্যস্থানে আনীত হইলেন। শিখের নয়নে উদ্বেগের একটী ক্ষীণ স্পন্দও নাই,—তাহা হেমন্তের হিম আকাশের ন্যায় স্থির—প্রশান্ত!

বৃদ্ধ রামসিংহের পলিতকেশ ও বালক সুন্দরসিংহের শ্মশ্রুহীন কোমল মুখ খানি দেখিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিল!

তাহার পর—সৈন্য ছত্রবদ্ধ হইল, বন্দুকে সঙ্গীন চড়িল, অসি কোষমুক্ত হইল—তোপে বারুদ পোরা হইল—গোলন্দাজ বাতি হাতে দাঁড়াইল। কাপ্তেন সাহেব শিখগণকে নিয়মিত পিছমোড়া করিয়া বাধিবার আজ্ঞা দিলেন। শিখগণ গর্জ্জিয়া উঠিল! রামসিংহ হাসিয়া বলিলেন—"ইংলণ্ডবাসীগণ কি মৃত্যুকে এতই ভয় করে যে, সে দেশে হাত পা বাঁধিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে? ভারতসন্তান এখনও এত নিবীর্য্য হয় নাই যে, মৃত্যুকে ভয় করে। শিখ মারিতে মরিতে ভীত নহে। আমরা মারিয়াছি এখন মরিব। বাঁধিতে হইবে না,—একজনও পশ্চাৎপদ হইবে না! চিলিয়ান্‌ওয়ালা ভুলিয়াছ?"

বাঁধা হইল না। শিখগণ গুরুগোবিন্দের নাম স্মরণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইল। সে দৃশ্য দেখিয়া অনেকের মরিতে সাধ হয়! তাহার পর—কে আগে মরিবে? সকলেই আগে মরিতে প্রস্তুত,—যেন ইহা অপেক্ষা সুখের মরণ আর নাই! সকলেই কহিল—"আমি আগে যাইব।"

রামসিংহ কহিলেন "তাহা হইবে না—আমি আগে যাইব।"

সকলে সমস্বরে গর্জ্জিয়া উঠিল, বলিল—"কি? আমরা বিংশতিজন দাঁড়াইয়া অশীতিপর বৃদ্ধের মৃত্যু দেখিব? তাহা হইবে না!"

একজন শিখ গিয়া কামানের মুখে বুক দিল,—গম্ভীরস্বরে বলিল "ওয়াহ গুরু কি ফতেঃ!" মাথার উপর চিল ঘুরিতে লাগিল!

বজ্রনির্ঘোষে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল, শিখের দেহ পরমাণুতে পরিণত হইল!! দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া শব্দ হইল—"সত্য শ্রী অকাল!!" আকাশে কাক চিল উড়িতে লাগিল!!!

তাহার পর একে একে সকলেই জীবন বিসর্জ্জন করিল—রহিল কেবল সুন্দরসিংহ ও রামসিংহ—বালক ও বৃদ্ধ! রামসিংহ গম্ভীর স্বরে বলিল—"সুন্দরসিংহ! তোমার পিতার একবার পুত্রের মৃত্যু দেখিতে সাধ হইয়াছে; যাও পিতৃসাধ পূরণ কর! একদণ্ডের মধ্যেই পরলোকে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

পিতার চরণ স্পর্শ করিয়া পুত্র অগ্রসর হইল। গুরুগোবিন্দের নামোচ্চারণ করিয়া কামানের মুখে বুক দিল। গোলন্দাজ বাতি ফেলিয়া বলিল "আমি ইংলণ্ড হইতে শিশু হত্যা করিবার জন্য আসি নাই।"

একজন পাঠান সিপাহী সেই বাতি কুড়াইয়া বলিল "তুমি ইংলণ্ড হইতে যে জন্য আইস নাই। আমি আফগানিস্থান হইতে সেই জন্য আসিয়াছি!" এই বলিয়া পাঠান বারুদে আগুন দিল; কড়্‌কড়্ রবে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল, পিতার সম্মুখে পুত্রের দেহ শতধা ছিন্ন হইল!

রামসিংহের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, তিনি তীব্রস্বরে বলিলেন "সত্য শ্রী আকাশ!"

সেই হৃদয়ভেদী দৃশ্য দেখিয়া কত ইংরাজের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল, কত নিষ্ঠুর পাঠান কাঁদিয়াছিল; এমন কি সেই দিনই চারিজন পাঠান ইংরাজের কর্ম্ম ত্যাগ করিল।

তাহার পর বৃদ্ধ রামসিংহ কামান মুখে বুক দিলেন—অনেক দর্শক প্রান্তর ত্যাগ করিল।

রামসিংহ বলিলেন "ইংরাজ! ইংলণ্ডেশ্বরীকে চতুর্দ্দশবর্ষীয় শিখ-বালকের শোণিত উপহার দিয়া বলিও যে হিন্দুস্থানে এখনও বীর আছে; পঞ্চনদ এখনও বীরশূন্য হয় নাই, হইবেও না। যতদিন না সোব্রাওঁ, মুদ্‌কি, ফিরোজপুর, গুজরাট ও চিলিয়ান্‌ওয়ালা পঞ্চনদ প্লাবিত হইবে, যত দিন না রণজিতের নাম পঞ্জাববাসীর স্মৃতিভ্রষ্ট হইবে ততদিন পঞ্জাব বীরশূন্য হইবে না! ভাবিও না যে পঞ্জাব তোমাদের অসির অধীন হইয়াছে; পঞ্জাব তোমাদের কৌশলের অধীন হইয়াছে! কতকগুলি অসহায় সিপাহীর নিকট হইতে অন্যায় যুদ্ধে একটী অরাজক দেশ লইয়া গর্ব্বিত হইও না! রণজিতের কথা বলি না, শের সিংহের ন্যায় একজনও জীবিত থাকিলে তোমাদের গর্ব্ব কোথায় থাকিত দেখিতাম! যাহা হউক, একটী অনুরোধ—চিলিয়ান্‌ওয়ালার অসহায় সিপাহীর বীরত্ব ভুলিয়া শিখের মনে আঘাত দিও না—ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন।"

কড়্ কড়্ রবে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল; বৃদ্ধের লোলিত মাংস ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দর্শকমণ্ডলীর মাঝে ছড়াইয়া পড়িল!!! "সত্য শ্রী অকাল" বলিবার কেহই রহিল না!

সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে অস্তমিত হইলেন। আকাশে চাঁদ যেমন হাসে তেমনিই হাসিল, তারা যেমন ফুটে তেমনিই ফুটিল, বাতাস যেমন বহে তেমনিই বহিল; শুধু—সেই চন্দ্র-কর-সংলগ্ন বিস্তৃত প্রান্তরে বিভীষিকার বিকট হাসি ফুটিয়া উঠিল!!

* * * *

তাহার পর—সেই অবধি পঞ্জাবে গোহত্যা নাই। নাই কেন—আছে, তবে প্রকাশ্যভাবে লোকের সম্মুখে নাই। প্রত্যেক লোকালয় হইতে কয়েক মাইল দূরে বনের মধ্যে 'হত্যা' করিয়া তাহা রাত্রের মধ্যেই বিলি করা হয়। তাহাও অতি গোপনে—কেহ জানিতে পারে না।

তাহার পর? তাহার পর, যতদিন পঞ্জাবে শিখের ও হিন্দুর নাম থাকিবে রামসিংহের নামও কেহ বিস্মৃত হইবে না! *

* বলা বাহুল্য, ইহা একটী সত্য ঘটনা।

শ্রীরমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

গৌরী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তার পর রাত্রিতে যেরূপ হইযা থাকে, দস্তুর মত সবই হইল। কাপড়ের মশাল জ্বালাইয়া, রঙমশাল পোড়াইতে পোড়াইতে, সানাই ঢোল বাজাইতে বাজাইতে বরযাত্রীসহ বর আসিয়া উপস্থিত হইল। খালি গায়ে, খালি পায়ে, গরদের জোড় পরিয়া, কোমরে তসরের নামাবলি জড়াইয়া, উপবাসক্লিষ্ট, শুষ্ক মুখে, চোক-ভরা আনন্দ, গাল-ভরা হাসি লইয়া পশুপতি সাধ্যমত আদর অভ্যর্থনা করিয়া বরসহ বরযাত্রীদের ভিতরে লইযা আসিলেন। পাড়ার দু' একজন মাতব্বর দলের লোক ও পশুপতির আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে অনেকেই এ কাজে তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করিল। শাঁক বাজিল— স্ত্রীকণ্ঠ-নিঃসৃত মঙ্গল উলুধ্বনি উঠিল—বর আসরে বসিল—বরের ও বরযাত্রীদের গলার জুঁইএর মালার গন্ধভারে পাল-চাপা বদ্ধবায়ু আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল—বহির্ব্বাটীর উঠানের দিকে জানালায়, ঝাঁকে ঝাঁকে চঞ্চল কৌতূহলপূর্ণ চক্ষু আসিয়া সারি দিল, সঙ্গে সঙ্গে ফিস ফিস কথার লঘু বৃষ্টি আরম্ভ হইল; সে বৃষ্টিতে ভিজিল কে জানি না—আর সেই মালার গন্ধ, সানাইএর হাসি কান্না, মিলন-বিরহ-মাখা রাগিণী,—ও অন্তঃপুররুদ্ধ চিরগুপ্ত রহস্যের, অচল কঠিন বিকারশূন্য, ইষ্টক আবরণের রন্ধ্রপথে, সহসা উজ্জ্বল, চঞ্চল, লীলাময়, ক্রীড়াশীল, উচ্ছ্বসিত রূপতরঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিভঙ্গ দেখিয়া কোন অনুভাবপ্রবণ হৃদয়ে কবিতার সৃষ্টি হইয়াছিল কি না, কিম্বা কোন সাহিত্যজীবন সাময়িকপত্রে বরের বন্ধুবর্গের মধ্যে কাহারও স্বাক্ষরিত "সুখস্মৃতি" বা "আজিও জাগিছে মনে সে সুখযামিনী" উপাধি-শীর্ষক কোন কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। তার পর ছেলেরা বরকে ও সমবয়স্ক বরযাত্রীদের ধরিল—বয়স্কেরা হুঁকা ধরিল—পাড়ার যুবকেরা গ্রামভাটার জন্য বরকর্ত্তাকে ধরিল। কসা মাজা, কঠোর পরীক্ষা সকলেরই উপর রীতিমত চলিতে লাগিল। বালকেরা পরস্পরের বুদ্ধির ভিতর কঠিন প্রশ্নের অস্ত্র চালাইল—বর্ষীয়ানেরা হুকার ভিতর ছিঁচকা চালাইল—ভাঁটী পাওনাদারেরা, রামনিধি চাটুর্য্যে মহাশয়ের গরদের চায়নাকোটের গেলাপ-ঢাকা বুকের ভিতর, পাঁজরার বেড়ার আড়ালে লুক্কায়িত তহবিল লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ বাক্য শলাকা চালাইল। ফল কি হইল, ঠিক জানি না। তবে শুনিয়াছি, সাটিন, গরনেট, ঢাকাই চাদর মোড়া অনেক গুলি সুবুদ্ধির চারি পাশে, অনেক ছিদ্র বাহির হইয়া পড়িয়াছিল—অনেক গুলি শস্যশূন্য নারিকেল মালা, আত্ম পরিচয় ছলে, অসাধারণ বাগ্মিতা দেখাইয়া গুণগ্রাহী পরীক্ষকদের সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিল এবং পুরস্কার স্বরূপ সেই রাত্রিতেই পরীক্ষকগণেরই গৃহ

"বৈঠকে" উন্নীত ও সম্ভ্রমের আসন প্রাপ্ত হইয়া, অনেক দিন পর্য্যন্ত বাষ্প ও শব্দময়ী ভাষায় নারিকেল বংশের লুপ্ত পূর্ব্ব গৌরবকাহিনী কীর্ত্তন করিয়াছিল ও সঙ্গে সঙ্গে সরল, সুউচ্চ, অভ্রস্পর্শী মহিমা শিখর হইতে নিম্নচারী অধম মানবসমাজ মধ্যে পতিত হইয়া, কিরূপে উহারা হীনতা প্রাপ্ত হইয়া অবয়বহীন, মুখসর্ব্বস্ব, শব্দমাত্রসার এক অদ্ভুত জাতিতে পরিণত হইয়াছে, সেই দুঃখ-কাহিনী ও কীর্ত্তন করিয়াছিল। কিন্তু ভাটী পাওনাদারগণের পরীক্ষার ফল কি রূপ দাঁড়াইয়াছিল—উহাদের তীক্ষ্ণ বাক্য-শলাকা চাটুর্য্যে মহাশয়ের টাকার থলি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া, উহার গাত্রে ছিদ্র কাটিতে পারিয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ আছে। কেহ কেহ বলে, পশুপতি স্বয়ং কি কৌশলে মুখ ভোঁতা করিয়া দিয়া উহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল।

লগ্ন উপস্থিত হইল। সকলের অনুমতি লইয়া পশুপতি কন্যা পাত্রস্থ করিবার জন্য বরকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। ভিতরে যাইবার সময় বরের বোধ হইতেছিল, বাল্যকালে শ্রুত উপকথার রাজপুত্র, সোণার কাটী, রূপার কাটীর রক্ষণাবৃত জীবনমরণময়ী রাজকন্যার মায়াপুরীর মধ্যে এইরূপ একটা দ্বার দিয়া বোধ হয় প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তখন সানাই থামিয়া গিয়াছে—অর্দ্ধমৃত জুঁইএর মালার গৌরব, সৌরভ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে—অন্তঃপুরের বাতায়ন হইতে সে উজ্জ্বল, চঞ্চল লহরী উজানে ফিরিয়া গিয়াছে—বিবাহ রাত্রির সমস্ত কবিত্ব বরের সহিত অন্তঃপুরে চলিয়া গিয়াছে। বহির্ব্বাটীতে পড়িয়াছিল, কতকগুলা বুভুক্ষু উদর ও নিদ্রাকাতর চক্ষু।

কন্যা পাত্রস্থ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া পশুপতি দেখিলেন বাহিরে জৃম্ভণ ও তুড়ির কিছু বেশী রকম ঘটা। অবস্থা বুঝিয়া একজন নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়কে ডাকিয়া আহারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলেন।

যখন সুরেশচন্দ্র অন্তঃপুরের "রূপ-কথার" দেশে বসিয়া, রূপ ও কথার বিপদের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিলেন, তখন বহির্ব্বাটীতে অনেক গুলি শূন্য উদর, লুচি কচুরি মিষ্টান্ন প্রভৃতি দুর্ভোগ্য দ্রব্যে বোঝাই হইতেছিল।

অনেকক্ষণ ভোর হইয়াছে। আবার সানাই বাজিতেছে—এখন বড় করুণ শুনাইতেছিল। বাড়ীর ভিতরে বাসি বিয়ের তাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আর খানিক পরেই বর কন্যা বিদায় করিতে হইবে। পশুপতি সকাল হইতে বড় অন্যমনস্ক। বরযাত্রীদের মধ্যে যাঁহারা বিবাহ রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া না গিয়া পশুপতির চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহাদের খাতির যত্নের যে টুকু বাকী ছিল, তাহার যাহাতে কোন ত্রুটী না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। বাড়ীর ভিতর হইতেও মাঝে মাঝে ডাক আসিতেছে। কিন্তু সেই সকল কাণ্ডের ভিতর হইতেও পশুপতি ছোট ছোট অবসর করিয়া লইতেছিলেন। তাহা শুধু নিভৃতে একাকী উপভোগ করিবার জন্য। তাই কখন খিড়কীর পুকুর ধারে—কখন বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার পর পারে, স্নানের

পুকুরের চাতালের বেদীর-উপর,—কখন ভিয়ান ঘরের পাশের ছোট চালার দাওয়ায়, পশুপতিকে দেখা যাইতেছিল। বুকের ভিতর হইতে একটা রুদ্ধ, প্রবল তরঙ্গ মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হইয়া চোখের বেলা ভিজাইয়া দিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। কেবল মনে হইতেছিল, আর খানিক পরে গৌরী, এই বুক খানা এই গৃহের আজন্মপরিচিত স্নেহনীড়—এত বড় গ্রাম খানা খালি করিয়া চলিয়া যাইবে। হৃদয়ের মাতৃভূমি হইতে "নিগূঢ় জীবনরস" পান করিয়া, বুকের প্রত্যেক পঞ্জর বেষ্টন করিয়া, সংসারের সকল বাধা বিঘ্ন, ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের মাঝ হইতে, স্নেহের গূঢ়প্রোথিত, অটল আশ্রয়দণ্ডে নির্ভর করিয়া যে ক্ষুদ্র কোমল লতা, এতদিন ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত, পল্লবিত, মুকুলিত হইয়া সমস্ত গৃহময় আপনার স্নিগ্ধ শ্যামল, সম্পদ বিস্তার করিয়াছিল, আজ স্বহস্তে তাহাকে উন্মূলিত করিয়া অন্যের গৃহপ্রাঙ্গণে রোপণ করিতে হইবে! তা কি পারা যায়! কিন্তু সে বিচার—প্রস্তুত হইবার জন্য সে অবসর আর কোথায়! বুকের প্রত্যেক পঞ্জর ভাঙ্গিয়া যাক—সকল শিরা ছিঁড়িয়া যাক—তোমাকে এই মহাকর্ত্তব্য সাধিতে হইবে। সাধিতে ত হইবে!—কিন্তু হৃদয়ের যে ভূমির মাঝখানে সেই সঞ্জীবনী লতার মূল প্রোথিত ছিল, সেইখানে যে একটা শূন্য অন্ধকার গহ্বর চিরদিন মুখ বিস্তার করিয়া হা হা করিয়া কাঁদিতে থাকিবে, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য কি রহিল!

পশুপতির মনে হইতেছিল, এতদিন যেন সংসারের কাযকর্ম্ম, কতকটা অন্যমনস্কতার ভিতর দিয়া গৌরী আপনি বড় হইয়াছে। এতদিন যেন তাহাকে ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। যে স্নেহে তাহার ন্যায্য অধিকার যেন এতদিন তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাই আজ বিদায়ের পূর্ব্বে শেষমুহূর্ত্তে হৃদয়ের গোপন ভাণ্ডারে সঞ্চিত সমস্ত অপরাধী স্নেহ বুকের সকল কবাট খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গৌরীর সেই করুণ মুখখানি ঘিরিয়া কাঁদিয়া মরিতে চায়! পশুপতির বোধ হইতেছিল, যেন বিগত রাত্রির মধ্যে ক্ষুদ্র শিশুগৌরী সহসা বাড়িয়া উঠিয়াছে—আর আজ না বলিয়া কহিয়া একেবারে বধূবেশে বিদায় লইবার জন্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পশুপতির বুকের ভিতর হইতে কে আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভিতর হইতে ডাক আসিল—যাত্রার সময় উপস্থিত। পশুপতি গিয়া দেখিলেন নব জামাতা, বধূবেশা, অশ্রুময়ী গৌরীর হাত ধরিয়া রহিয়াছে। কনকাঞ্জলি করিয়া আশীর্ব্বাদের সময় বর কন্যার হাত একত্র করিয়া বলিতে হইবে—"আজ হইতে আমার গৌরীকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম—উহার সকল ভার আজ হইতে তোমার। উহার সকল অপরাধ, লজ্জা তোমায় ঢাকিয়া লইতে হইবে।" পশুপতি দুই তিনবার বৃথা চেষ্টা করিল। উচ্ছ্বসিত আবেগ কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল—শেষে গৃহপূর্ণ স্ত্রীলোকের মাঝখানে গৌরীর হাত ধরিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায়, অবোধ শিশুর ন্যায়, কাঁদিয়া ফেলিল। মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না—"গৌরীকে একেবারে দিলাম।"

তার পর আবার সানাই ঢোল বাজাইতে বাজাইতে কনে লইয়া বর চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বর কনে ঘরে পৌঁছিল। কনের মুখ দেখিয়া শাশুড়ী মুখ বাঁকাইলেন। বরণডালায় আর হাত দিলেন না। চোকে আঁচল তুলিয়া বলিলেন "আমার সোনার চাঁদের ঐ কালপেঁচা বৌ!"

পাড়ার ভিতর যাঁহারা কর্ত্তাদের সম্বন্ধে শালিকা বা শালাজ—যুবকদের সরকারী পিশি বা খুড়ী ও নূতন জামাতৃকুলের দিদিশাশুড়ী সম্পর্কীয় ছিলেন এবং এই ত্রিবন্ধনের গ্রন্থিতে যাঁহাদের প্রৌঢ়জীবন পৃথিবীর সহিত খুব দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়াছিল—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই চাটুর্য্যে গৃহিণীকে কতকটা স্নেহ চক্ষে দেখিতেন। বিনা সুদে কখন কখন দু'এক টাকা ঋণ পাইতেন এবং সুবিধা পাইলেই এই উপকারের প্রতিদানও করিতেন। হয় চাটুর্য্যে মহাশয়ের মাচা, সগর-গৃহিণীর ন্যায় পুণ্যবতী লাউ বা কুমড়া লতার অসংখ্য সন্তান সন্ততি ভারে যখন ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাঁহারা ক্ষীণ, দুর্ব্বল কঞ্চি বা বংশ-খণ্ডমাত্রসার মাচা সম্বন্ধে কোন আশু দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বুঝিয়া, অর্দ্ধেকের উপর ভার আপনারা বিভাগ করিয়া লইয়া সে সম্ভাবিত অপায় দূর করিতেন। প্রত্যুপকারের সকল প্রণালীর আমি হিসাব রাখি না; একটা মনে পড়িল—বলিয়াছি।

আজ তাঁহাদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাদের অঞ্চল যে শুধু স্কন্ধের শোভাই বাড়াইয়াছিল—এমন নহে। নববধূর কাল রঙ দেখিয়া আজ-রের সুরেশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে একটা শঙ্কা তাঁহাদের মনে উদয় হইল। অঞ্চল স্থানভ্রষ্ট হইল—কারুণ্য-রসে কণ্ঠস্বর ভিজিয়া উঠিল। সকলেই অবশ্য সমস্বরে নহে—বলিলেন "সোনার চাঁদ সুরেশের অযোগ্য। মেয়ে দেখবার সময় ননদাই চোক দুটা কোথা রেখে গিয়েছিলেন?"

কাছে আর একজন ছিল। সেও এক নববিবাহিতা কন্যার মাতা। সে চাটুর্য্যে গৃহিণীকে উল্লেখ করিয়া বলিল "দেখ্! ঠাকুরঝি, শুভকর্ম্মের দিন আর চোখের জল ফেলে অকল্যাণ করিসনি। একি কথা! বৌ বেটা এসে দাঁড়িয়ে রইল, আর তুই বরণডালা ফেলে কাঁদতে বসলি? কাল হ'ক কুৎসিত হ'ক ফেলবার ত নয়, নিয়ে ঘর কর্ত্তে হবে। নে এখন ওঠ—লোকে যে ছি! ছি! করবে!"

সেই সময় স্বয়ং চাটুর্য্যে মহাশয় একবার অন্দরে আসিলেন। তিনি গৃহিণীর অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "কাণ্ডটা কি?"

কর্ত্তাকে দেখিয়া গৃহিণীর অবস্থা ও সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরের সহসা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি চোখ হইতে আঁচল নামাইয়া কতকটা ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন, "দেখে শুনে শেষে তুমি ঐ মেয়ে বৌ ক'রে ঘরে আনিলে! কেন, বাছা তোমার কাছে কি দোষ করেছিল?"

বেলা হইয়া গিয়াছিল। তখনও স্নান আহার কিছুই হয় নাই। সুতরাং

কর্ত্তার মেজাজটা বড় ভাল ছিল না। মোট কথা, মেয়ে তাঁহার নিজের খুব পছন্দ হয়েছিল। অন্য সময় হইলে কি বলিতেন জানি না—কিন্তু তিনি উত্তরে বলিলেন, "আমার বাবা তোমাকে কি দেখে ঘরে এনেছিলেন? আর সেটা যে আমার কোন বিশেষ দোষের দণ্ড হইয়াছিল, তাও আমার বোধ হয় নাই।"

আবার চোখে আঁচল উঠিল। গৃহিণী মুখ ঢাকিলেন—কথার উত্তর দিলেন না। বুঝিলেন জবাব নাই।

কর্ত্তাও অনেকক্ষণ কোন কথা কহিলেন না। গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু এরূপভাবে বেশীক্ষণ থাকিবার সময় নয়—বর কনে ছাঁদলাতলায় দাঁড়াইয়া। কর্ত্তা বুঝিলেন, গৃহিণীর সহজে মুখ ফুটিবে না। অগত্যা তাঁহাকেই কথা কহিতে হইল। তিনি বলিলেন, "এখন যাও! বর কনে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়া লও। এর পর অন্য ব্যবস্থা ক'ব।"

গৃহিণী অচল—বাক্যহীন। কর্ত্তার পূর্ব্বের কথাটায় বড় বিষ ছিল। গৃহিণী তখন একটা জ্বালা বোধ করিতেছিলেন।

কর্ত্তা আবার বলিলেন, "কনে কাল কি সুন্দর, সে পরিচয়ে তোমার দরকার কি? যদি কুৎসিত হয়, সে দুঃখ যাহার করিবার সে করিবে। রূপের সম্পর্ক ত তোমার সঙ্গে নয়?"

গৃহিণীর তবু কথা নাই। মেয়ে দূরে দাঁড়াইয়া বুড়া বুড়ীর রঙ্গ দেখিতেছিল। বাপ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "যা মা মেনা! তুই বরণ ক'রগে যা!" মেয়ের নাম মৃণালিনী। কর্ত্তা বাহিরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি কাযটা ভাল করিলেন না।

এত লোকের সম্মুখে অপমান! গৃহিণীর সেটা মর্ম্মান্তিক লাগিল। ভাল, এত অপমান—কিন্তু কি দোষে? বউ কাল, কুৎসিত; আর তিনি ছেলের মা—ঘরের গৃহিণী; সে কথাটা কি তাঁর মুখ ফুটিয়া বলিবারও অধিকার নাই। ছি, ছি, বিনা দোষে স্বামী হইয়া এক বাড়ী লোকের সামনে—গৃহিণীর চোকের জল আর আটক মানিল না। পাড়ার পিশি ও খুড়ীদলের পূর্ব্বগৃহীত ঋণ পরিশোধের একটা মস্ত অবসর জুটিয়া গেল। গৃহিণীর চাবি পাশে রাশি রাশি নিশ্বাস ও সান্ত্বনাবাক্য স্তূপীকৃত হইতে লাগিল।

বর কনের বরণ হইয়া গেল। সেটা কন্যা মৃণালিনী মা'র হইয়া সারিয়া লইল।

যখন শোকবেগ অনেকটা কমিয়া আসিল, তখন গৃহিণী ভাবিয়া দেখিলেন, সব দোষ নব বধূর। তাহার সঙ্গে যদি সুরেশের বিবাহ না হইত, তাহা হইলে ত এতটা হইত না। আবার কর্ত্তা তাহার পক্ষ হইয়াই ত আজ গৃহিণীকে দশের মাঝে অপমান করিয়াছেন। সেটা বউএর দোষ নয় ত কাহার? স্বরচিত ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি ও তর্ক দ্বারা অনেকক্ষণ বিচার করিয়া গৃহিণী শেষ দেখিলেন, একটী কাল, কুৎসিতা বালিকা ভিন্ন, প্রকৃত অপরাধী আর কেহই হইতে পারে না। সব কথার ভিতর হইতে যে কথাটা বড় হইয়া উঠিয়াছিল, সেটা এই। তিনি আজ ত্রিশ বৎসরের গৃহিণী; কর্ত্তার সহিত এত বৎসরের একটা এত বড় সম্বন্ধ—আর ঐ চেলিমোড়া এতটুকু মেয়ে, আজ এক ঘণ্টাও বাড়ীতে পা দেয় নাই—ও আজ ঘরে আসিয়াই

কর্তার এত আপনার হইল যে, উহার হইয়া কর্তা তাঁহাকে এত বড় কথা শুনাইয়া দিলেন! গৃহিণী কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না যে, গৌরী একটী ভীতা, সঙ্কুচিতা, নিরপরাধিনী বালিকা বধূমাত্র। তাহার গাত্রবর্ণ বা শ্বশুরের পক্ষপাতিত্ব, কিছুতেই তাহার নিজের কৃতিত্ব নাই।

গৌরী একটা অভিশাপ সঙ্গে করিয়া শ্বশুরগৃহে পদার্পণ করিল। গৃহিণী ভাবিলেন, বধূ কুৎসিত আবার শ্বশুরের প্রিয়। শেষটাই সব চেয়ে বড় অপরাধ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনেকের মুখে শুনা যায়, এ গ্রামে রামনিধি চাটুর্য্যে মহাশয়ের আদি নিবাস নহে। তাঁহার পিতামহ এইখানে বাস উঠাইয়া আনেন। কেন? কেহ বলিতে পারে না! কেহ কেহ অনুমান করেন, বর্গীর ভয়ে।

তা যে গ্রামেই পূর্ব্ব বসতি হউক, তাঁহাদের বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধির আরম্ভ এই গ্রামেই। এবং তাঁহার পিতামহ নরহরি চট্টোপাধ্যায়ই তাহার সূত্রপাত করেন। সে অনেক দিনের কথা। তখনও ইংরাজ পাকা হইয়া ভারতে বসে নাই। তখনও সোনার মাটী শুদ্ধ লঙ্কা ভাগীরথী-তীরে উঠিয়া আসিয়া কলিকাতা নাম ধারণ করে নাই। তখন কলিকাতার অন্য মূর্ত্তি ছিল—একখানা বড় জমীদারীর মূল্যে কলিকাতার এক কাঠা জমি বিক্রয় হইত না। তখন পল্লিগ্রাম—এখনও কবিতায় বা নভেলে যে পল্লীগ্রামের বর্ণনা দেখিতে পাই—সেইরূপ পল্লীগ্রাম বজায় ছিল—গ্রামে মানুষ ছিল—গোলায় ধান ছিল—পুকুরে মাছ ছিল—লোকে দু'বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পাইত। প্রাণ-খোলা হাসি গল্প তখনও দেশ-ছাড়া হয় নাই। তখন ব্রাহ্মণে শাস্ত্র পড়িত—বৈদ্য নিদান পড়িত—শূদ্রে কৃষি বা ব্যবসা করিত—তাঁতি তাঁত বুনিত। ম্যাঞ্চেষ্টরের নাম তখনও কেহ বড় শুনে নাই,—ভূগোলে ইংরাজীপড়া ছেলেরা নামটা পড়িত মাত্র। তখন লোকে বুঝিত জমী লক্ষ্মী। জমী সকলেরই কিছু কিছু ছিল—লক্ষ্মীছাড়ার সংখ্যা বড় কম ছিল। তখন গ্রামের লোক গ্রামে থাকিত। দেশের দশ বিঘা ভদ্রাসন বেচিয়া কলিকাতার নর্দ্দমার পাশে আধ কাঠার উপর ত্রিতল বাটী তুলিবার কথা মনে হইত না—আর আপনার অধিকৃত পক্ক-শস্য-পূর্ণ ক্ষেত্রের মাঝে উচ্চ ভূমিখণ্ড ও মুক্ত বাতাস অপেক্ষা, বেতের চেয়ার ও পাখার হাওয়া যে বেশী সম্ভ্রম ও স্বাস্থ্যজনক, এ কথা কিছুতেই বুঝিত না। তখন ছোট মেয়েদের শ্বশুরবাড়ীর সুখ সম্পদ সম্বন্ধে কল্পনা "আলনায় কাপড় দল মল করে, মেঝে ঘটী বাটী ঝকমক করে"—র বেশী দূর যাইত না। তখন গোয়ালে গরু, মরায়ে ধান, পুকুরে মাছ, বাগানে ফল, আর বাক্সে সোনা রূপা থাকিত। উহার বেশীও লোকে চাহিত না। এখনকার মত ছাপ-মারা কাগজে সিন্দুক পেটারা বোঝাই হইত না। সেইটাই বড় সুখের ছিল।

সেই সময়ে নরহরি চাটুর্য্যে এই গ্রামে বাস উঠাইয়া আনেন। বাসের সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে পিতৃপিতামহ-দত্ত সংস্কার গুলিও লইয়া আসিলেন।

তিনি গ্রামে আসিয়া জমী কিনিলেন—চাষ আরম্ভ করিলেন—পৌষের শেষে মরাইয়ে ধান পুরিলেন। তখন এই সময়ে গ্রামে গ্রামে নবান্নের উৎসবের ঘটা পড়িয়া যাইত। এখন আর তা হয় না।

তার পর দিন কাল বদলাইতে লাগিল। ইংরাজ, আমেরিকায় দাস ব্যবসা তুলিয়া দিয়া, ভারতে তাহার নূতন সংস্কার করিলেন। লোকে জমী লক্ষী, সে কথা ভুলিতে আরম্ভ করিল। ইংরাজ সোনার ফাঁস হাতে করিয়া 'আয়' বলিয়া ডাকিলেন—বাঙ্গালী ভুলিয়া গেল। হারভ্রমে ফাঁস গলায় পরিয়া সোনার ধান্য পূর্ণ পৈতৃক ক্ষেতের উপর আহ্লাদে নাচিতে লাগিল,—লক্ষী পদতলে পিষিয়া গেলেন। ইংরাজ বাঙ্গালীকে খোঁটায় ভাল করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া ক্ষেতের উপর হইতে বেশ করিয়া ঝাঁটাইয়া সব ধান গুলি কুড়াইয়া আপনাদের জাহাজে তুলিল। আর বাঙ্গালী খোঁটার উপর সম্মুখের দুই পা তুলিয়া, আনন্দে মাথা নাড়িয়া ইংরাজের তুড়ির তালে তালে নাচিতে লাগিল। শেষে অতিরিক্ত মাত্রায় কুর্দনের পরিশ্রমের পর যখন ক্ষুধা বোধ হইল, তখন একবার ক্ষেতের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল মাঠে ধান নাই—কতকগুলা শুষ্ক খড় পড়িয়া রহিয়াছে। পরিতোষ সহকারে বাঙ্গালী তাহাই লেহন করিতে লাগিল। গিলিবার যো নাই—গলায় বাধে।

সেই সময় বাঙ্গালী প্রথম চাকুরী করিতে আরম্ভ করিল। হাল ছাড়িয়া কলম ধরিল। সেই সময় হইতে লোকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল, "বাপু দারোগা হও।" সেই সময়ে যে বিশ ত্রিশ টাকা মাহিনা পাইত, গ্রামের লোক তাহার হাত দেখিতে আসিত; সবিস্ময়ে বলিত, "ওরে বাপু! তোর এই হাত সাহেবে ছুঁয়ে প্রতি মাসের শেষে টাকা গুনে দেয়?" তাহার পর বাঙ্গালী দারোগার উপর হাকিম হাকিমের উপর আদালতের জজ হইয়াছে—আরও বড় পদ পাইতেছে। কিন্তু সে শুধু পায়ের নীচে খোটা বাড়িয়াছে। যে ধান বাঙ্গালী পা দিয়া মাড়াইয়াছিল, তাহা আর দেশে ফিরিয়া আসিল না।

নরহরি গোসাঁই ধান রাখিয়া মরিয়া গেলেন। ছেলে ধানের বদলে দারোগাগিরি কিনিল। নাকের বদলে খুর মিলিল। খুর হাতে লইয়াই তিনি আগে আপনার কান দুটা কাটিয়া ফেলিলেন। এবং 'ছিন্নকর্ণনাস' হইয়াই গ্রামের ভিতর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথের ধারে হাতের কাছে সকেশ মাথা পাইলেই, তাহাদের উপর খুরের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরীক্ষার নেশা যখন খুব জমিয়া গেল, তখন সেই মত্ত অবস্থায় অনর্থ ভ্রমক্রমে দু'একটা মাংসমেদময় কণ্ঠ ছিন্ন করিয়া ফেলেন। যখন অজস্র রুধিরস্রাব হইতে লাগিল, তখন তিনি খুব মুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। হাত পাতিয়া সব রুধির অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া লইলেন। মাটিতে এক ফোটা পড়িতে দিলেন না। সুতরাং কোন গোলযোগ হইল না। আর খুর ফেলিয়া দিলেন বটে, কিন্তু তাহা হইতে ইস্পাতটুকু আলাদা করিয়া কাছে রাখিয়া দিলেন। কিছু দিন পরেই তাহার মৃত্যু হইল।

রামনিধি চাটুর্য্যে মহাশয় পিতার অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সেই ইস্পাতটুকু প্রাপ্ত হন।

বিষয় হাতে পাইয়া চাটুর্য্যে মহাশয় একটা সংকল্প স্থির করিলেন। যে সব সাহেবের কাছে বাপ কাজ করিতেন—তাঁহারা খবর লইয়া জানিলেন—মৃতের এক পুত্র আছে। উপযাচক হইয়া তাঁহারা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখনকার সাহেবেরা এরূপ করিতেন, এবং ইহা একটা মস্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন। এখন সে বংশের সাহেব আর ভারতবর্ষে আসে না। যাহা হউক, সাহেব ডাকিয়া পাঠাইলেন—চাটুর্য্যে মহাশয় গিয়া সেলাম করিলেন। কিন্তু চাকুরী গ্রহণ করিলেন না। বলিলেন, "হুজুর যখন আমার বাপের মনিব, তখন আমারও মনিব। আপনার অনুগ্রহ জীবনে ভুলিতে পারিব না। তবে আপনাদেরই কৃপায় বাপ কিছু জমীজারাত রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন। চাকরী স্বীকার করিলে বে-বন্দোবস্তে নষ্ট হইয়া যাইবে। নতুবা এতটা অনুগ্রহ হাতে পাইয়া ত্যাগ করিবার অন্য কোন কারণ নাই।" সাহেব বুঝিলেন—আর বড় পীড়াপীড়ি করিলেন না।

বাপ দারোগাগিরি করিয়া নগদ টাকা করিয়াছিলেন। পিতামহ জমী রাখিয়া গিয়াছিলেন। চাটুর্য্যে মহাশয় জমীর একটা হিসাব তৈয়ার করিলেন। পিতামহের ন্যায় মৌরশ দেওয়া একেবারে বন্ধ করিলেন। যে সকল ঠিকা প্রজা ছিল, তাহাদের খাজনা কিছু কিছু বাড়াইয়া দিলেন; যে দিতে রাজী হইল, সে রহিল—যে অস্বীকার করিল, তাহার জমী নূতন করিয়া বিলি করিলেন। কতকগুলা জমী বেবন্দোবস্তে ছিল। তিনি সেইখানে বাঁশের আওলাত করিলেন। দু একটা ফলের গাছের আওলাত সুদ্ধ জমী অল্প খাজনায় বিলি ছিল। তিনি প্রজা তাড়াইয়া সে গুলা খাস করিয়া লইলেন। নিজে দাঁড়াইয়া, জন খাটাইয়া, নূতন গাছ বসাইয়া, তাহাতে রীতিমত ফলের বাগান করিলেন। যখন গাছ ফলবান হইল—তখন সংসারের খরচের জন্য দু'পাঁচটা গাছ রাখিয়া দিয়া, বাকী সমস্ত গাছ জমা ধরাইয়া দিলেন। পুকুর জেলেকে বিলি করিলেন। তলায় ফাঁকা জমীতে বেগুণের চাষ করিলেন। পাঁচ বৎসর পরে হিসাব করিয়া দেখিলেন, বাপ বর্ত্তমানে জমীর যে আয় ছিল, এখন তাহার দ্বিগুণ আয় দাঁড়াইয়াছে।

তার পর নগদ টাকা। সে জন্য বড় ভাবিতে হইল না। তিনি টাকায় কোম্পানির কাগজ কিনিলেন না। কাগজের উপর বড় বিশ্বাস ছিল না। তিনি ঐ টাকায় দেশে তেজারতী আরম্ভ করিলেন। অনেক টাকা চোটায় খাটাইলেন—তাহাতে সুবিধা বেশী। হাতের কাছে কতক টাকা রাখিলেন বটে, কিন্তু সে সামান্য। প্রথম পাঁচ সাত বৎসর তাঁহাকে খাটিতে হইল। দশ বৎসর পরে তিনি বৈঠকখানায় তাকিয়া হেলান দিয়া, আলবোলায় তামাক খাইতে লাগিলেন। আর লোকে পথ হাঁটিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে টাকা রাখিয়া দিয়া যাইতে লাগিল। জমীর আয় ও টাকার সুদে সংসার চলিয়া

গিয়া, সরকারী খাজনা সরবরাহ করিয়া নগদ টাকা জমিতে লাগিল। তখন তিনি গ্রামের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন।

এই দশ বৎসরের ভিতর তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা হইল। পুত্র—স্থরেশ-চন্দ্র। কন্যা—মৃণালিনী। যখন কন্যা বিবাহযোগ্যা হইল, তখন তিনি কতকটা চিন্তিত হইলেন। 'বেশী দূরে মেয়ের শ্বশুর-ঘর হয়, সে ইচ্ছা তাঁর ছিল না। নিকট হইতে দু'একটী পাত্রের সন্ধান আসে, কিন্তু তাহারা সকলেই গৃহস্থ ঘরের। তখন রামনিধি চাটুর্য্যে মহাশয় গ্রামের মধ্যে একজন বড়লোক—স্থতরাং বড় ঘরের সহিত কুটুম্বিতা করিয়া কিছু দিন পরে বনিয়াদি নামটা জাহির করিতে পারেন, ভিতরে ভিতরে এরূপ সংকল্প ছিল। সেই সময় রায়-নার হরস্থন্দর মুখোপাধ্যায়ের ছেলের কথা তাঁহার কাণে উঠিল। মুখো-পাধ্যায় মহাশয় বর্দ্ধমান অঞ্চলের এক-জন বিশিষ্ট তালুকদাব। চাটুর্য্যে মহা-শয় একেবারে মতলব আঁটিয়া ফেলিলেন।

তিনি নিজেই রায়নায় গিযা মুখো-পাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বিষয়ী লোক—টাকা লইয়া নাড়াচাড়া করেন। চাটুর্য্যে মহাশয়ের পরিচয় পাইয়া খুব খাতির যত্ন করিলেন। বুঝিলেন, একটা বড় মাছ আসিয়াছে। তিনি টোপ বড় করিলেন—স্থতার বহরও বাড়াইলেন, খেলাইবার স্থবিধা হইবে। শেষে অনেক মিষ্ট কথা, অনুনয় বিনয় ও যথেষ্ট টাকা আদায় করিয়া লইয়া, মুখো-পাধ্যায় মহাশয় ছেলের বিবাহ দিলেন। বিবাহের চারি বৎসর পরে তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়।

বাপ যে বুদ্ধি লইয়া কারবার করি-তেন, ছেলে তাহার বড় অল্লাংশেরই উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। সেটা কতকটা বাপেব দোষ। ছেলে খাইত, ঘুমাইত, মাছ ধবিত, গান করিত। মুখুর্য্যে মহা-শযেব সে দিকে দৃষ্টি বড় খাট ছিল। তিনি ভাবিতেন, আমার বিষয় আছে। কিন্তু ঐ সঙ্গে আব একটা কথা ভাবিতে ভুল হইত—বিষয়ের সঙ্গে বিষযবুদ্ধিও কিছু থাকা প্রয়োজন। কর্ত্তা সংসার হইতে ছুটী লইলেন; কিন্তু বাপাজীবনের খেলিবার ছুটীরও শেষ হইল। সহসা বুঝিতে পারিল যে, সংসারটা ছিপের স্থতার মুখে বাঁধা নাই যে, হুইলের কলে তাহা চলিবে। সেটা চালাইতে গেলে আরও কিছু বুদ্ধির প্রয়োজন। কিন্তু তাহার বুদ্ধি হুইলের কলের বাহিরে যাইতে পারিত না। দু একজন নিকট সম্পর্কীয় জ্ঞাতি সে কথাটা বুঝিয়াছিল। তাহারা সময় বুঝিয়া কাছে সরিয়া আসিল। হবিশ্চন্দ্র আপ্যা-য়িত হইযা তাহাদেব গলা জড়াইয়া ধরিল। বলিল,"দাদা! তোমরা এলে,—বাঁচলাম। বাবা কি বোঝাই ঘাড়ে দিয়া গিযাছেন।" তাহাবাও বলিল, "বটে ত! তাঁর বড় অন্যায়! ভাই! তা তোমার কোন চিন্তা নাই। আমরা সব করিয়া লইব।" হবিশ হাঁফ ছাড়িয়া বলিল, আ! বাঁচলাম! তার পর বৎসরের ভিতরই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত বিষয় ও টাকাব বোঝা জ্ঞাতিরা অনেকটা হাল্কা করিয়া দিল।

তিন বৎসরের শেষে হরিশ্চন্দ্র বুঝিল, সে ঠকিয়াছে। আক্রোশে জ্ঞাতিদের

সঙ্গে একটা মামলা বাধাইল। তাহাতে বিষয় আরও হাল্কা হইয়া পড়িল। উপযুক্ত পরামর্শদাতা কেহই ছিল না। শ্বশুর রামনিধি চাটুর্য্যে মহাশয় বড় মনোযোগ দিলেন না—কারণ পূর্ব্বে তাঁহার পরামর্শ একবার অগ্রাহ্য হইয়াছিল। কিন্তু এ অভিমানের ফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল। একদিন জামাতা বাপাজীবন, স্ত্রী ও একটী দুই বৎসরের বালকের হাত ধরিয়া চিরদিনের জন্য বাস করিবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে আসিযা উপস্থিত হইলেন। মকদ্দমার পরও যে বিষয় বাকী ছিল, তাহা জ্ঞাতিদের নিকট আধাদরে বিকাইযাছিলেন। জ্ঞাতিদের উপর শোধটা তুলিযাছিলেন ভাল!

চাটুর্য্যে মহাশয প্রথমে মুখ ভাবী করিলেন বটে, কিন্তু শেষ বুঝিলেন, আর অন্য উপায় নাই। তিনি বিষয়-বেচা টাকায় জামাতাকে কতকটা জমী কিনিযা দিলেন—কতক টাকা সুদে খাটাইয়া দিলেন—জামাতার সংসারের সব ভারটা যাহাতে তার ঘাড়ে না পড়ে। কিন্তু বাপাজীবনের ছিপগতবুদ্ধি তখনও পূর্ণমাত্রায় বজায় রহিয়াছে। তিনি টাকার সহিত আপনার সমস্ত ভার ও দায়িত্ব শ্বশুরের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। তিনি এখন পথের ধারে টুল পাতিয়া বসিয়া দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া দন্তধাবন করেন—স্নানের সময় প্রত্যহ বেলের আঠা দিয়া পৈতা মাজেন ও এই কাজে যথেষ্ট সময় ও ধৈর্য্য খরচ করেন—দুপুরে পাড়ার ঠান্‌দিদিদের সহিত অন্দরে তাস খেলেন, কোন দিন বা খিড়কির পুকুরে ছিপ ফেলেন। সন্তানপালনকার্য্যে স্ত্রীকে যথেষ্ট সহায়তাও করিয়া থাকেন। বাড়ী হইতে কিছু দূরে 'চানকার' কাছে একটা সেক্‌রার দোকান ছিল। সেইখানে হরিশ্চন্দ্রের বৈকালিক মজলিস বসিত। সন্ধ্যার পর ঢোলের শব্দের সঙ্গে মাঝে মাঝে বিকৃতকণ্ঠে "তারা দিলে না দিলে না দিন" বা অব্যবহিত পরেই "এস এস প্রাণ বঁধু প্রেম নিমন্ত্রণ" ইত্যাদি সঙ্গীতধ্বনি উঠিত। পাড়ার যুবতীরা সহজে চানকায স্নান, বা গা ধুইতে যাইত না। পাড়ার পুরুষ মহলের অনেকেরই হরিশ্চন্দ্র প্রমুখ মজলিস সম্বন্ধে বড় মন্দ ধারণা ছিল। তবে হরিশ, চাটুর্য্যে মহাশযের জামাতা বলিয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস করিত না!

সুরেশচন্দ্র কলিকাতায় এফ্-এ পড়িতেছিলেন। সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ক্রমশঃ—

একটি উপদেশ।

জঠরানল প্রদীপ্ত হইলে ভোজন করিতে হয়। শরীরের অবসাদ হইলে নিদ্রায় অভিভূত হইতে হয়। স্ত্রী-সংসর্গের ইচ্ছা হইলে স্ত্রীতে উপগত হইতে হয়। এইরূপ কতকগুলি কার্য্যে প্রাণীমাত্রেরই অবস্থানুসারে স্বতঃ প্রবৃত্তি জন্মে। এরূপ প্রবৃত্তি কাহার উপদেশ অথবা নিয়োগ সাপেক্ষ নহে। এই জন্য কোন শাস্ত্রকার ইহাতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য কোন কথাই বলেন নাই। জীবমাত্রেরই এইরূপ স্বভাব বলিযা ইহাকে পশুবৃত্তি বলিলে কোন দোষ হয না। তবে কি মনুষ্য এই পশুবৃত্তির অধীন? না ইহাতে কোন বিশেষত্ব আছে যাহাতে পশুবৃত্তি হইতে মানব প্রকৃতিকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে? অবশ্যই কিছু না কিছু প্রভেদ আছে নতুবা পশুত্বে আর মনুষ্যত্বে প্রভেদ কৈ রহিল। পশু ভক্ষ্য দেখিলেই ভোজন করে। আঘ্রাণ দ্বারা ভক্ষ্যাভক্ষ্য স্থির করে। যখন ইচ্ছা তখনই নিদ্রাভিভূত হয়। স্ত্রীপশু দেখিলেই যথা তথা এবং যখন তখন মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্যও যদি ঐরূপ ব্যবহার করে, তাহা হইলে কি বলিয়া তাহাকে পশু না বলিয়া মনুষ্য বলিব। পশুদিগের স্বভাবতঃ যখন যাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে তখন তাহাই করে সেইরূপ মনুষ্য যদি রসনা দ্বারা ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিরূপণ করে অর্থাৎ যাহার যাহা রুচিকর তাহাই যদি তাহার আহার্য্য হয় ও নিদ্রা যাইবার যদি কালাকাল না থাকে, স্ত্রীজাতি হইলেই যদি অন্য কোন বিচার না করিয়া তাহাকে ভার্য্যার্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে মনুষ্যে আর পশুতে প্রভেদ রহিল কোথায়? কাজেই দেখা যাইতেছে যিনি যতই আপন আপন প্রবৃত্তির অনুগামী হন, তাহার ততই পশুত্ব প্রাপ্তির জন্য অধোগতি হইতে থাকে। যিনি যত নিবৃত্তি মার্গানুসারী তিনি ততই মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারেন। নিবৃত্তিই মনুষ্য ধর্ম্মের লক্ষণ। প্রবৃত্তি নিরোধই প্রকৃত মনুষ্যত্বে উন্নতি হইবার একমাত্র পন্থা। ইহার বিপরীত পথ ধরিলে নিশ্চয়ই অধোগতি হইবে। মনুষ্য যে গুণে গঠিত অর্থাৎ রজ ও তমোগুণের মধ্যে যে গুণটী প্রবল থাকিলে যাহার যেরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ জন্মিতে পারে সূক্ষ্মদর্শী আর্য্য ঋষিগণ তাহার বিচার করিয়া যতদূর ঐ সকল প্রবৃত্তির নিরোধ করা যাইতে পারে তদনুসারে বিবিধ কার্য্যের নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে কৃতবিদ্যগণের আর্য্য-ঋষিদিগের আদিষ্ট বিধি ব্যবস্থার উপর আস্থা নাই। তাঁহাদিগের মতে ভক্ষ্যাভক্ষ্য আবার কি? যাহা রুচিকর তাহাই ভক্ষ্য। ভোজনের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? ম্লেচ্ছদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করিলে ধর্ম্ম হানি হইবে কেন? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে ইহা নিতান্ত প্রলাপ বাক্য ভিন্ন আর কিছু নহে। ইহাদের ধর্ম্মজ্ঞান কি তাহা অবশ্য নিশ্চয় করা বড়ই সুকঠিন। বাহ্যতঃ এইরূপ বুঝা যায় যে যিনি

পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং কালে ভদ্রে তাঁহার নিকট প্রার্থনাদি-রূপ তাঁহার উপাসনা করেন তিনিই ধার্ম্মিক। ইহার উপর যিনি যথাসাধ্য শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন তিনি ত ঋষি। ইহাই যদি তাহাদের মতে ধর্ম্মের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে সকল দ্রব্য ভোজন অথবা বহুসেবন দ্বারা শীঘ্রই হউক অথবা কালবিলম্বেই হউক শরীরের অথবা মনের এমন অবস্থা উৎপাদন করে যাহাতে উপাসনাদি ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত হয়, সেই সকল দ্রব্য অবশ্যই অধোগতির কারণ, পাপজনক, অথবা ধর্ম্মকার্য্যের হানিকর। মনে করুন সুরাপান করা পাপজনক। সুরাপায়ী নরকে পতিত হয়। ইহা বলিবার কারণ কি? পৃথিবীতে যত জাতি অথবা যত সম্প্রদায় আছে সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করে, এমন কি যে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে সুরাপান একরূপ কৌলিক আচার বলিলেও চলে তাঁহাদিগের মধ্যে বিবেচক ব্যক্তিগণ সুরাপানের বহুল নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। পৃথিবীর মধ্যে নিতান্ত অসভ্য পশুভাবাপন্ন লোকের মধ্যে ইহা আদৃত হইতে পারে কিন্তু একটু বিবেচনা শক্তি যাঁহাদিগের আছে তাঁহারা একবাক্যে সমস্বরে সুরাপান ত্যজ্য বলিয়া স্বীকার করেন। সুরাপানে অনতিকাল বিলম্বে মনুষ্যকে উন্মাদের ন্যায় করিয়া তুলে। শিষ্টাচার ঈশ্বরজ্ঞান ইত্যাদি কোথায় দূরীভূত হইয়া যায়। এরূপ ভাবান্তর করিবার নিদান কি? সুরাই ইহার কারণ। এইরূপ একটী কেন শত সহস্র প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা নিরূপণ করা যাইতে পারে যে যে সকল দ্রব্য আমরা ভোজনে পরিধানে ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার দোষ গুণ সকলই আমাদিগের শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। বিষ ভক্ষণে প্রাণ পর্য্যন্ত দেহ হইতে বিযুক্ত হয়। দুগ্ধপানে দেহের কান্তি, বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়। ঘৃত ভোজনে মেধ বৃদ্ধি হয়। এইরূপ সকল দ্রব্যেরই ভাল মন্দ ফল এই শরীরকেই আজই হউক আর দশদিন পরেই হউক অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। শরীরে ও মনে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে শরীরের অবস্থান্তরে মনেরও অবস্থান্তর হয়। চারিদিকে একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই ইহার রাশি রাশি প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দু-সন্তান হিন্দু-পরিবারবর্গের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া অপগণ্ড শিশুকাল হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত হিন্দু-সমাজ প্রচলিত আচার ব্যবহার দ্বারা গঠিত হইয়া বিলাত গমন করিলেন; ২।৩ বৎসর ইংলণ্ড দেশে বাস করিয়া তদ্দেশবাসীদিগের সংসর্গে তদ্দেশীয় পরিচ্ছদ ধারণে এবং ভক্ষ্য ভোজনে অভ্যস্ত হইয়া যখন হিন্দু-রাজ্যে প্রত্যাগত হন তখন তাঁহার মনের গতি কি পূর্ব্ববৎ থাকে? কখনই নহে। এখন ভাবিয়া দেখুন দেখি এতকাল ধরিয়া যে পদার্থে তাঁহার দেহ ও মন গঠিত হইয়াছিল কি এমন শক্তি প্রভাবে তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত মন, বুদ্ধি, বিবেচনা সমস্ত লুপ্ত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিল। এরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যই কোন অভিনব শক্তি দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। কোন্ পদার্থের এরূপ অপরিসীম শক্তি? অবশ্যই বলিতে

হইবে, প্রথমতঃ সমুদ্রে অর্ণবপোতে দীর্ঘকাল বাস করিবার কালে হিন্দুর বিরুদ্ধাচারে মন অক্ষুব্ধ হইতে অভ্যাস করিয়াছে, পরে গন্তব্য দেশবাসীদিগের সঙ্গে আহার ব্যবহারাদিরূপ ঘনিষ্ঠ সংসর্গ দ্বারা ২৷৩ বৎসরের মধ্যে তদ্দেশীয় হাবভাব সমস্তই মনে সংক্রামিত হইয়া থাকে এই জন্য মনু বলিয়াছেন।

সঃ সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।
যাজনাধ্যাপনাদ্যৌনাগ্নতু যানাসনাশনাৎ। ১৮১।১১

তথাপি পরাশরঃ।

আসনাচ্ছয়নাদ্‌যানাৎ সম্ভাষাৎ সহভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুবিবাম্ভসি ॥ ৭২।৯২

এক্ষণে অকপটচিত্তে বলিতে হইলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে ভোজনাদিরূপ আচার ব্যবহার দ্বারা মন আক্রান্ত হইয়া ভাবান্তরিত হয় ইহা সত্য। উপরে যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে ইহাতে যে ফল আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা কি ঋষিবাক্যগুলিকে অকাট্যরূপে সপ্রমাণ করিতেছে না। গুণাগুণে মন ও শরীর উভয়ই ভাবান্তবিত হইয়া থাকে। জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যে কেবল গুণেরই আধার দোষের লেশমাত্র নাই। পাত্র বিশেষে এবং অবস্থাবিশেষে অমৃত বিষবৎ এবং বিষও অমৃতবৎ কার্য্য করে। ঘোর সান্নিপাতিক জ্বরাক্রান্ত দেহে কালসর্পের বিষ প্রাণ দান করে আবার সুস্থ শরীরে প্রয়োগ করিলে প্রাণ বিয়োগ হইয়া যায়। সহজ জ্ঞান ও রসনা এ সৃষ্টি বৈচিত্রের কিছুই বুঝে না। অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে ভোজ্য পদার্থের প্রত্যেকের গুণাগুণে মন ও শরীর উভয়ই ভাবান্তরিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে পদার্থ অল্প অথবা বহুসেবায় মনকে বিপথগামী এবং শরীরের অসুস্থতা উৎপাদন করে তাহা অবশ্যই পাপজনক এক্ষণে কৃতবিদ্য মহাশয়েরা একটু তলাইয়া দেখুন দেখি, পান ভোজনের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে কি না, বলুন দেখি, যে ঋষিবাক্যকে স্মিতমুখে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাকে এখন অবনত মস্তকে সত্য সত্য॰ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় কি না? সহজ জ্ঞান দ্বারা হিতাহিত বিবেচনা এবং রসনা দ্বারা ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিরূপণ করিতে গেলে শীঘ্রই মনুষ্যত্ব হারাইতে হয়। তবে কেবল রাজশাসনের বলে মানুষ হইয়া বেড়াইতে হয়। শিশুকালে কোন দ্রব্য অল্প অধিক ভোজন করিলে অকালে বার্দ্ধক্য উৎপন্ন করে অথবা যৌবনে কিরূপ আচরণ করিলে প্রৌঢ়াবস্থায় কিরূপ অচিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইতে হয়, ইহলোকে কোন্ কার্য্যের কিরূপ ফল পরলোকে ভোগ করিতে হয় ইহা কি সহজজ্ঞান দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না বিষয় বুদ্ধিতে চতুর চূড়ামণি হইলে বুঝিতে পারিবে। যাঁহারা কঠোর তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন সেই সকল আত্মজ্ঞ মহাপুরুষেরাই এ সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ। আমাদিগের এ সকল প্রশ্নে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করাই অমার্জনীয় মূঢ়তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা ঘোর পাপী তাই এত সাহসী, নিজের হিতাহিত বোধ শূন্য সেই জন্যই কেবল ঐ সকল ত্রিকালজ্ঞ ঋষি প্রবরদিগের উপদেশে অবহেলা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ মত সংস্থাপনের চেষ্টা করি।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে যে সকল কার্য্যে প্রাণীদিগের স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি জন্মে তাহা সম্পাদনার্থ প্রবৃত্তিদায়ক বিধি শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। কারণ বিধি উল্লঙ্ঘন করা পাতকজনক। বিধি উক্ত হইলে সাধুজনকে তাহা সম্পাদন করিতে বাধ্য করা হয় কিন্তু যতদূর সম্ভব প্রবৃত্তি অনুযায়ীক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত রাখাই৺ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সুতরাং এরূপ স্থলে যাহা অকরণীয় তাহাই শাস্ত্রে বলিয়া দিয়াছেন। যেমন অন্যস্থলে বিধি উল্লঙ্ঘনে পাতক জন্মে তেমনি পরিসংখ্যাস্থলে নিষেধ না মানিলে পাপগ্রস্থ হইতে হয়। যথা শাস্ত্র বলিয়াছেন যে দ্বিজাতি গুরুগৃহে পাঠ সমাপনান্তে কোন আশ্রম অবলম্বন করিবেন তাহা স্থির কবিবেন। পুত্রকামী দ্বিজ সমাবর্ত্তনান্তর লক্ষণাক্রান্তা স্বজাতিয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। এস্থলে উপনয়নান্তর গুরুগৃহে বাস এবং বেদ অধ্যয়ন করা দ্বিজাতির পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। তদনন্তব বানপ্রস্থ, যতি, গৃহস্থ ইত্যাদি আশ্রমের মধ্যে যাহার যে আশ্রমে প্রবৃত্তি হয় তিনি সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেন। অনাশ্রমী পুরুষ স্বেচ্ছাচারী কোন আশ্রমের নিয়মাধীন নহেন এই৺ জন্য "অনাশ্রমী তিষ্ঠেৎ" বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন সুতরাং কোন একটী আশ্রম অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। যিনি গৃহাশ্রম অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করিতেই হইবেক। অকৃতদার ব্যক্তি গৃহী বলিয়া পরিচিত নহে। এক্ষণে দেখুন বিবাহ ব্যবস্থা দ্বারা সদৃচ্ছা স্ত্রী-সংগ্রহ নিবারিত হইল। যে ব্যক্তি বিবাহ ব্যবস্থা না মানিয়া ইচ্ছামত স্ত্রী-সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহাকে কি মনুষ্য বলা যাইতে পারে। শিষ্টাচারী ব্যক্তিগণ অবশ্যই এমন লোককে পশুবৎ জ্ঞান করিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। (১) দারপরিগ্রহের ব্যবস্থায় অনেকে বলিয়া থাকেন যে সাবধানি শিষ্টাচারী পুরুষ অকৃতদার হইয়া সমাজ মধ্যে থাকিতে দোষ কি? যাঁহারা "ব্যাচিলার" হইয়া থাকিতে আনন্দ বোধ করেন তাহাদিগের এই মত কিন্তু তাঁহাদিগের দূরদৃষ্টি একেবারেই নাই! ইঁহারা মনে করেন যে সাধুত্ব ও অসাধুত্ব লোকের ইচ্ছাধীন। মনে করিলেই উর্দ্ধরেতা হওয়া যায় এবং মনে করিলেই চোর ডাকাইত হইতে পারা যায়। ভদ্রলোকে যে নিশীথকালে পরের ঘরে সিঁদ দিতে যান না সে কেবল মনে করেন না বলিয়া। অনেক কার্য্য লোকে মনে করিলেও করে না। আবার মনে না কবিলেও কার্য্য করিয়া থাকে। কাহার হয়ত সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদ করিবার ইচ্ছা আছে কিন্তু অর্থের অভাব জন্য কার্য্য করিতে পারে না। কাহাব হয়ত চুরি করিবাব ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল কিন্তু রাজশাসনের কঠোরতা নিবন্ধন অথবা সুবিধা সুযোগ হয় না বলিয়া চুরি কবিতে পাবে না। কাহার বা ইচ্ছা দেবতা ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা সেবা করি, অর্থ থাকিলে সর্ব্বদা দরিদ্রের অভাব মোচন করি কিন্তু কি করে ধন নাই কাজেই ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে না। ইচ্ছাত সম্পূর্ণ আছে তবে হয় না কেন? চোর যখন দণ্ড ভোগ করে তখন শতবার "আর এমন কাজ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াও নিবৃত্ত

হইতে পারে না কেন! ইচ্ছা করা আর না করা ইহা কি কেবল মনের কার্য্য? যদি তাহাই হয় তবে সকলের মন সাধু হয় না কেন! বাস্তবিক মন প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়, আবার প্রবৃত্তি সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ সাপেক্ষ। মনুষ্য এই তিনটি গুণের আধার। সুতরাং সকলের কার্য্যেই এই ত্রিগুণের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য যে বীজে উৎপন্ন হয়, তাহাতে যে গুণ যে পরিমাণে নিহিত থাকে সে সেইরূপ গুণান্বিত হয়; তাহার প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, সঙ্কল্প, সর্ব্বশেষে কার্য্যও সেইরূপ হইয়া থাকে। সেই জন্য যাহার তমোগুণ প্রবল তিনি যদি বলেন আমি ইহা করিলে পরম তপস্বীর ন্যায় কালযাপন করিতে পারি, সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করিয়া থাকিতে পারি তাহা হইলে বলিতে পারি যে তাঁহার সকল কথাই মিথ্যা। ইন্দ্রিয় জয় করা দূরের কথা সে চেষ্টাই হইবে না বরং ইন্দ্রিয়ের দাসানুদাস হইয়া চলিতে হইবে। স্বার্থ সাধনের জন্য, অন্যের বিশ্বাস জন্মাইতে হইলে লোকের নিকট বাক্য অথবা ভাবে ইন্দ্রিয়জয়ী সাধুর ন্যায় ভান করিতে পারে কিন্তু তাহা কতক্ষণ থাকে! অল্পকালের মধ্যে দেখা যায় যে তিনি ইন্দ্রিয়গণের রাজা নহেন বরং নিতান্ত অনুগত প্রজামাত্র। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক লোক কিরূপ তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে যথা—

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥
রাগীকর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠোনৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥

যিনি আশক্তি শূন্য, গর্ব্ববর্জ্জিত, কার্য্য সিদ্ধ অথবা হানিতে হর্ষ বিষাদ শূন্য, ধৈর্য্য ও উৎসাহ সম্পন্ন, তিনিই সাত্ত্বিক গুণশালী।

যিনি বিষয়াসক্ত, কর্ম্মফল প্রার্থীচ্ছু, অন্যায় লাভেচ্ছু, পরপীড়নেচ্ছু অশুচি, হর্ষশোক পরতন্ত্র, তিনি রজঃগুণশালী।

যিনি কার্য্য বৈকল্য নিবারণে অযত্নশীল, বিবেক শূন্য, অহঙ্কার যুক্ত, নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনে অনবহিত চিত্ত, পরাপমানী, অতৃপ্তচিত্ত ও দীর্ঘসূত্রী তিনি তমঃগুণ বিশিষ্ট।

এই তিনটী শ্লোকে সত্ত্ব, রজ, ও তমোগুণের পরিচয় অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু বিস্তারিত রূপে বিশদ করিবার জন্য মহাত্মা ব্যাসদেব যাহা বলিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

সকলেরই দেহ ত্রিগুণাত্মক হইলেও শ্রেষ্ঠ গুণটী প্রায় নিদ্রিত ভাবেই আছেন। এ গুণটী উদ্দীপ্ত হয় এরূপ আচরণ আর নাই সুতরাং অপর দুইটী গুণের লোকই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও আবার এক জীবের সহস্র কার্য্যের মধ্যে নবশত নিরানব্বইটী তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কারণ অধুনা তমোগুণেরই বাহুল্য। সুতরাং এমত লোক সমাজ মধ্যে অকৃতদার হইয়া বাস করিলে অন্যের শয্যাকণ্টক হইবেন না ইহা কে বিশ্বাস করিবে? অন্যের কথা দূরে থাকুক ঊর্দ্ধরেতা সিদ্ধ তাপসগণের মধ্যেও কেহ কেহ স্ত্রীসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং "ব্যাভিচার"

হইয়া গৃহস্থাশ্রমীর মধ্যে বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যুগান্তরে, যখন ধর্ম্ম, বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা প্রবল ছিল, তখন সত্বগুণশালীর যখন পদস্খলন হইয়াছে তখন কিনা অধর্ম্ম প্রবল, কলিতে ঘোর তামসিক লোক হইয়া ইন্দ্রিয় জয় পূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিবেন ইহা কি বাতুলের কথা নহে? এরূপ কথার বক্তা ঘোর দাম্ভিক ও প্রতারক এবং বিশ্বাস কর্ত্তা নিতান্ত বিবেক শূন্য।

সর্ব্বভূতের হিতকর পরম পবিত্র সত্বগুণের লক্ষণ এই :—আনন্দ, প্রীতি, উন্নতি, প্রকাশ, সুখ, বদান্যতা, অভয়, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, মমতা, সত্য, সবলতা, অক্রোধ, অনসূয়া, শৌচ, দক্ষতা, উৎসাহ, বিশ্বাস, লজ্জা, তিতিক্ষা, ত্যাগ, অতন্দ্রিতা, অনৃশমতা, অসংমোহ, সর্ব্বভূতে দয়া, অক্রূরতা, হর্ষ, তুষ্টি, বিস্ময়, বিনয়, সাধু ব্যবহার, শান্তি কার্য্যে সবলতা, বিশুদ্ধ বুদ্ধি, পাপ হর্ষ নিবৃত্তি, ঔদাসিন্য, ব্রহ্মচর্য্য, অনাসক্তি, নির্ম্মমত্ব, ফলকামনা পরিত্যাগ ও নিত্য-ধর্ম্মের অনুশীলন এই সমস্ত কার্য্য সত্বগুণ হইতে উৎপন্ন হয়।”

আশ্বমেধিকপর্ব্বং অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়
৩৮ তম অধ্যায়।

রজোগুণের লক্ষণঃ—

“সন্তাপ, রূপদর্শন, আবাস, সুখ, দুঃখ, শীতগ্রীষ্মের অনুভব ঐশ্বর্য্য, নিগ্রহ, সন্ধি, হেতুবাদ, রতিক্ষমা, বল, শৌর্য্য, মদ, রোষ, ব্যায়াম, কলহ, ঈর্ষা, ইচ্ছা, খলতা, অতিমমতা, পরিবার পোষা, বধ, বন্ধন, ক্লেশ, ক্রয়, বিক্রয়, ভেদ, ছেদ, ও বিদারণের চেষ্টা, মর্ম্মপীড়ন, নিষ্ঠুরতা, হিংসা, আক্রোশ, পরচ্ছিদ্রানুসরণ, ইহলোক ও পরলোকের চিন্তা, মাৎসর্য্য, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, লাভ প্রত্যাশায় দান, বিধবাহরণ, নিন্দা, স্তুতি, প্রশংসা, প্রতাপ, আক্রমণ, পরিচর্য্যা, আজ্ঞাপালন সেবা, বিষয়তৃষ্ণা, পরাশ্রয় গ্রহণ, ব্যবহার, রচনাকৌশল, নীতি, প্রমাদ, পরিবাদ, স্বীকার, স্ত্রীপুরুষ দ্রব্য ও গৃহের সংস্কার, সন্তাপ, অবিশ্বাস, ব্রত, নিয়ম, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি ফলজনক কার্য্য, স্বাহাকার, নমস্কার, স্বধাকার, বষট্‌কার, যাজনা, অধ্যাপন, যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত, মাঙ্গল্যকর্ম্ম, বিষয়াভিলাষ, অনিষ্টাচরণ, মায়া, প্রবঞ্চনা, গৌরব, চৌর্য্য, হিংসা, পরিতাপ, রাত্রিজাগরণ, দম্ভ, দর্প, অনুরাগ, ভক্তি, প্রীতি, প্রমোদ, অক্ষক্রীড়া, অখ্যাতি, স্ত্রৈণতা, এবং নৃত্যগীতাদিতে আসক্তি, এই সমুদায় রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।”

৩৭ তম অধ্যায়।

তমোগুণের লক্ষণঃ—

“মোহ অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চিতা, স্বপ্ন, স্তম্ভ, ভয়, লোভ, শোক, সৎকার্য্য দূষণ, অস্মৃতি, অফলতা, নাস্তিকতা, দুশ্চরিত্রতা, সদসৎ বিবেক রাহিত্য, ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিস্ফুটতা, নিকৃষ্টধর্ম্মে প্রবৃত্তি, অকার্য্যে কার্য্যজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, বৃথাচিন্তা, অসরলতা, কুবুদ্ধি, অক্ষমতা, অজিতেন্দ্রিয়তা, অন্যের অপবাদ, ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, মৎসরতা, নিচকর্ম্মে অনুরাগ, অসুখকর, কার্য্যের

অনুষ্ঠান, অপাত্রে দান, ও অতিথি প্রভৃতিরে দান না করিয়া ভোজন এই গুলি তমোগুণের কার্য্য।”

৩৬ তম অধ্যায়।

এই গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সাংসারিক সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। জীবের জন্মান্তরীণ সদসদ্ কার্য্যের তারতম্যানুসারে এই গুণত্রয়ের তারতম্য জীবদেহে পরিলক্ষিত হয়। যেমন মনুষ্যগণ আপন আপন অবস্থানুসারে স্ব স্ব বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে সেইরূপ জীবের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপপুণ্যানুসারে ঐ গুণত্রয়ের তারতম্য হইয়া মাতৃগর্ভে দেহ গঠিত হয়। সুতরাং যাহার দেহে যে গুণের আধিক্য তাহার প্রবৃত্তি, সঙ্কল্প কার্য্য অধিকাংশ তদনুযায়ী হইয়া থাকে। রাজা যেরূপ দণ্ড দ্বারা দোষ প্রশমিত করেন সেইরূপ অধোগতির নিদান স্বরূপ তমোগুণাদির কার্য্য প্রশমিত করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ উপদেশ ও পন্থা প্রদর্শন করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। সাত্বিক গুণসম্পন্ন সাধুস্বভাবলোকদিগের জন্য তাঁহারা ভাবিত নহেন। রজোতমোগুণবিশিষ্ট বিলাসী ও ভোগেচ্ছুদিগের সদ্গতির জন্য তাঁহাদিগের এত চিন্তা। সাত্বিক লোকেরা চক্ষুস্মান এবং বিবেক বিশিষ্ট স্বভাবতই তাঁহাদিগের অসৎপথে গতি হয় না। রজো ও তমোগুণবিশিষ্ট লোক মোহান্ধ হিতাহিত বিবেক ভ্রষ্ট সুতরাং তাঁহাদিগকে হাতে ধরিয়া পথ দেখাইতে হয় কোন কোন স্থলে দণ্ড প্রয়োগ দ্বারা বলপূর্ব্বক সৎপথে রাখিতে হয়। বিবাহ দ্বারা স্ত্রীলাভ করিয়াও নিষ্কৃতি কোথায়? কামান্ধ পুরুষ স্ত্রীর দাস হইয়া পড়ে। কত প্রকারে উপভোগ করিয়া মনের তৃপ্তি লাভ হইবে তাহা আবিষ্কার করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত! কিরূপ সজ্জায় সজ্জিত করিলে চক্ষের তৃপ্তিকর হয়, কিসে দণ্ড পলও বিচ্ছেদ না ঘটে এরূপ চিন্তায় অভিভূত অথবা নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়িলে মনুষ্য ক্রমশঃ সকল কাজের বাহির হইয়া পড়ে কাজেই স্ত্রীসংসর্গ যাহাতে প্রয়োজন সাধনোপযোগী হয় এইরূপ নিয়মবিধি স্থাপন করিয়াছেন। পর্ব্বদিবসে পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ বাসরে, দিবাতে, সন্ধ্যা অথবা প্রত্যুষে, অসুস্থাবস্থায়, স্ত্রী সহবাস করিবে না। ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে। নির্জ্জন স্থলে স্ত্রীসহবাস করিবে। অধুনা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে যতই এই সকল নিয়ম শিথিল হইয়া পড়িতেছে ততই পুরুষ স্ত্রীজীত হইয়া পড়িতেছে এবং স্ত্রী পুরুষের স্থান অধিকার করিতেছে। স্ত্রী স্বাতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়া কত কত স্বর্গতুল্য সংসার নরকে পরিণত হইতেছে। স্ত্রীশিক্ষা রূপ সূত্র অবলম্বন করিয়া স্বাতন্ত্রতা প্রবেশ করিয়াছে; এক্ষণে আর হিন্দুর সে পরিবারও নাই সে সংসারও নাই। তখন যিনি পরিবারগণের মধ্যে বয়সে বুদ্ধিতে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ তিনিই সংসারের রাজা ছিলেন। স্ত্রীগণ অশীতি বর্ষা হইলেও পুরুষের অধীন ও অনুগত থাকিতেন, ভ্রাতা পুত্র ইত্যাদি সকলেই ভৃত্যের ন্যায় নায়কের আজ্ঞাবহ, পরস্পর পরস্পরের স্নেহ মমতা, শ্রদ্ধা, ভক্তিতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া যেন সকলে মিলিয়া একটী দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকিতেন। সকলেই

তৃপ্ত, সন্তোষচিত্তে আমোদ আহ্লাদে দিন যাপন করিতেন। তখন সংসার দেবপুরী ছিল, এক্ষণে তাহার কঙ্কাল মাত্র আছে কিন্তু ভিতরে হোটেল খানা। কি স্ত্রী কি পুরুষ স্ব স্ব প্রধান। যিনি কর্ত্তা তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়, অরাজক স্বেচ্ছাচারী রাজ্যের ব্যয় বহন করিবার জন্য তিনি ক্রীতদাস হইয়া আছেন। অন্ন বিক্রয় হইতেছে। কেহ কাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া যে যখন পাইতেছে ভোজন সমাপন করিয়া আপন আপন কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন। পার্শ্বস্থ কক্ষের লোক যেন কলিকাতার প্রতিবাসী। পীড়িত হইলে অর্থের সচ্ছলতা থাকিলে দাসদাসী দ্বারা সেবা শুশ্রূষা কার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়া লইতে হইবে নতুবা হাসপাতালে যাইতে হইবে। ঠিক যেন কেহ কাহার নহে। শিক্ষাগুণে ভদ্রতা, নম্রতা, স্নেহ মমতা শ্রদ্ধাভক্তি সমস্তই অন্তর হইতে মুখে আসিয়া বাক্যে পরিণত হইয়াছে। লোকের নিকট পরিচয় দিতে, বিজ্ঞ বিচক্ষণের ন্যায় আলঙ্কারিক বাক্য বিন্যাস করিয়া বর্ণন করিতে কি বালক কি স্ত্রী সকলেই সক্ষম। এই সকল অবধ্য স্ত্রীজাতি ও নির্ব্বোধ পণ্ডিতাভিমানী অজাত শ্মশ্রু বালকদিগের নিকট পরিণামদর্শী বৃদ্ধেরা নির্ব্বাক, নিশ্চল হইয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন আর উপায় কি, হয় কালচক্রে নিষ্পীড়িত হও, না হয় বনবাস আশ্রয় কর। যদি পূর্ব্বাকারের দুই একটা পরিবার খুজিয়া পাওয়া যায় কিন্তু কাল মাহাত্ম্যে আজি না হয় কালি তাহা হোটেলে পরিণত হইবে। যাহাদিগের হৃদয় অনার্য্য ভাবে বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে তাঁহারা এখনও স্ত্রীশিক্ষার ও স্ত্রী স্বাধিনতার বিষময় ফল অনুভব করিতে পারিতেছেন না কিন্তু যাঁহারা অল্প মাত্রায়ও আর্য্যসমাজের হিতেচ্ছু তাঁহাদের চক্ষে ইহা ভাবনাকর ভয়ানক বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে। আর্য্যবংশ ভগবানের আদি সৃষ্টি তিনি কি সত্য সত্যই মূলোৎপাটন করিবেন! ব্যাসদেবের “ম্লেচ্ছীভূত জগৎসর্ব্বং” এই ভবিষ্যৎবাণী উনবিংশ শতাব্দিতেই কি সম্পূর্ণ হইবে? কিন্তু এ বিশৃঙ্খলার কারণ পুরুষের অন্তঃসারে হীনতা ও স্ত্রীতে অত্যন্ত আশক্তি, এই বীজ হইতে শাখা প্রশাখা রূপে নানা দিকে অনেক রূপ অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। যদি শাস্ত্রের কথা শুনিয়া একটু নিবৃত্তির দিকে নত থাকিতেন তাহা হইলে এত জ্বালায় জ্বলিতে হইত না।

অতঃপর শাস্ত্রকারেরা খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন। প্রথমতঃ অতিভোজন নিষেধ, দিবাতে একবার ও রাত্রিতে একবারমাত্র ভোজন করাই বিধি। দিবাতে দ্বিভোজন নিষিদ্ধ। দধি ভিন্ন কোন মধুর দ্রব্য কালে অম্লত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহা ভোজন করা নিষিদ্ধ। মাহিষ দুগ্ধ ভিন্ন কোন আরণ্য পশুর দুগ্ধ পান করা নিষিদ্ধ নারিদুগ্ধ পান করা নিষিদ্ধ। মাংস ভোজন একেবারে না করিলেই ভাল। যিনি মাংস ভোজন প্রবৃত্তি এককালে সংযত করিতে না পারেন তিনি যজ্ঞে প্রোক্ষিত হইয়া যে শাস্ত্রোক্ত ভক্ষ্য পশু হনন করা হয় তাহা ভিন্ন অন্যরূপে হত পশুর মাংস ভোজন করিবেন না।

সমস্ত আরণ্য পশু প্রোক্ষিত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে ভক্ষ্য বলিয়া যেগুলি শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে তাহা শীকার লব্ধ হইলে ভক্ষণ করিতে দোষ নাই। ইহাতে এমত বিবেচনা করিবে না যে শাস্ত্রকারগণ মাংসাহার করিতে বিধি দিয়াছেন কিন্তু তাহা নহে তাঁহারা বরং ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন যে "অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম" আবার হিংসা না হইলে মাংস উৎপন্ন হয় না সুতরাং যাহারা প্রবৃত্তি মার্গানুসারী এবং রজো গুণের আধার তাহারা কোনকালে অথবা কোনমতে মাংসাহারে বিরত হইবেন না, সুতরাং কেবল তাহাদের গতি সাধামত যাহাতে কুটিলতা আশ্রয় না করিতে পারে সেই জন্য মাংস ভোজনের বিবিধ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রাণাপেক্ষা জীবের আর প্রিয়তর বস্তু কিছুই নাই। বহুকষ্ট বহুযন্ত্রণা ভোগ করিয়াও কোন প্রাণী দেহ হইতে প্রাণ বিযুক্ত হইবার ইচ্ছা করে না সুতরাং প্রাণীর প্রাণ হরণ করা অপেক্ষা আর নিষ্ঠুরতা কি আছে? নির্ব্বিকার সর্ব্ব প্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী মহর্ষিগণ কি কখন প্রাণীর প্রাণসংহারে অনুমোদন করিতে পারেন তাহা কখনই নহে। তাঁহারা বরং বলিয়াছেন যে যেমন হস্তীর পদচিহ্নে অন্য সকল প্রাণীর পদচিহ্ন অন্তর্ভূত হয়, সেইরূপ অহিংসা ধর্ম্মে অন্য সকল ধর্ম্ম অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিদিগের যদৃচ্ছা মাংস ভোজন এবং তাহাদিগের স্বাভাবিক মোহান্ধতা জনিত অনিয়মিত মাংসাহার অথবা পীড়াকর মাংস ভোজন নিবারণ করিবার জন্য নিষেধ স্থলগুলি অতি যত্নের সহিত বলিয়া গিয়াছেন। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণগণ প্রাণী হিংসেচ্ছু নহে সুতরাং যে সকল রাজসিক যজ্ঞে পশু হিংসার ব্যবস্থা আছে সেইস্থলে ব্রাহ্মণদিগের জন্য ব্রীহি ইত্যাদি দ্রব্য পশুরূপে কল্পিত হইয়াছে; তদনুসারে ইহযুগে দুর্গোৎসবাদি শক্তি পূজায় অনেক গৃহে পশুস্থলে মাসভক্ত বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে ইহাকে সাত্ত্বিক পূজা বলে। অতএব শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে মাংসাহার না করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অর্থাৎ নিবৃত্তিকল্পে সমধিক উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়, যাঁহারা রাজসিক ও তামসিক গুণের আধার তাঁহারা যদি স্ব স্ব প্রবৃত্তি দ্বারা একান্ত পরিচালিত হইয়া মৎস্য মাংসাদি ভোজনে প্রতিনিবৃত্ত না হইতে পারেন তবে শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধ মানিয়া যজ্ঞে নিহত অথবা শীকার লব্ধ ভক্ষ্য মাংস ভোজন করিলে তাহাতে দোষ নাই। এই কথাই মনু মহাত্মা নিজ সংহিতায় বলিয়াছেন যথা—

ন মাংস ভক্ষণে দোষ ন মদ্য নচমৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহফলা॥

যাঁহাদের তামসিক প্রবৃত্তি তাঁহারাই শাস্ত্রে অনিচ্ছা প্রদর্শন অথবা অর্থ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকেন। এই স্বেচ্ছাচারী পুরুষ মহাত্মাদিগের উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অবৈধ পান ভোজনে উন্মত্ত হন ইহাতে ফল এই হয় যে তাঁহারা নিজের আয়ুঃক্ষয় এবং শরীরে বিবিধ প্রকার অচিকিৎস্য রোগ উৎপাদন করেন অবশেষে অকালে কালকবলে পতিত হন। মহামতি ব্যাসদেব মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব্বান্তর্গত অনুগীত পর্ব্বাধ্যায়ে কাশ্যপ

ও মহাত্মা সিদ্ধ প্রশ্নোত্তরে কিরূপ বলিয়াছেন দেখুন।

মহাত্মাসিদ্ধ মহর্ষি কাশ্যপকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন মহর্ষে! জীব দেহ আশ্রয় করিয়া যে সম্বদয় আয়ুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই সম্বদয় কার্য্যের ক্ষয় হইলেই তাহার আয়ুঃক্ষয় হয়। তখন সে বিপরীত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া নিবন্তর অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করে। স্বীয় শরীরেব অবস্থা বল ও কাল পরিজ্ঞাত হইয়াও অধিক পরিমাণে অহিতকর ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। কোন দিন অতিভোজন ও কোনদিন একেবারে ভোজন পরিত্যাগ করে। কখন অপেয় পান এবং অপরিমিত দুষ্ট অন্ন, আমিস ও পরস্পর বিরোধী গুরুতব বস্তু সমুদয় ভোজনে আশক্ত হয়। কোনদিন ভুক্ত বস্তু জীর্ণ না হইতে হইতেই ভোজন করে। কোন দিন দিবসে নিদ্রিত হয কোনদিন কঠিন পরিশ্রম ও বাবংবাব স্ত্রীসংসর্গ করিয়া শরীবের দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করে। কোনদিন অনববত বিষয় কর্ম্ম সম্পাদন বাসনায় মলমূত্রাদির বেগ ধাবণে প্রবৃত্ত হয় এবং কোনদিন অসময়ে ভোজন করিয়া শরীরস্থ বায়ু পিত্তাদি প্রকুপিত কবে। জীব এইরূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ প্রাণনাশক রোগ আসিয়া উহারে আক্রমণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ আয়ুঃক্ষয় হইলে কুপথ্য সেবনাদি অত্যাচার না কবিয়াও বুদ্ধিভ্রংশ নিবন্ধন উদ্বন্ধনাদি দ্বারা দেহ ত্যাগ করে।”

এইরূপ অপেয়পান, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অনিয়মিত স্ত্রীসহবাস, অকালে নিদ্রা এবং অতি ভোজনাদিরূপ অত্যাচারে যদি মনুষ্য অসুস্থদেহ অকালে জরাক্রান্ত, প্রাণনাশক রোগাভিভূত, হীনায়ু হয় তাহা হইলে তাহার কিরূপে ধর্ম্মোপার্জ্জন করা হইবে? ইহারা ধর্ম্মাচরণের সম্পূর্ণরূপে ব্যাঘাতকারী ধর্ম্মাচরণ না করিলে ক্রমোন্নতিব পথ রুদ্ধ হইয়াপড়ে সুতরাং যদ্দ্বারা দুরবস্থাপন্ন হইতে হয় তাহাকে কি কাহার যত্নের সহিত পরিহার করা কর্ত্তব্য নহে। যদ্দ্বারা শ্রেয়ঃ সাধনের ব্যাঘাত উৎপন্ন হয় তাহা কি অধর্ম্মজনক নহে? এসকল অবৈধ আচবণ অহিতকর তাহাব ত সন্দেহ নাই। অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া যদি ধার্ম্মিকের লক্ষণ হয় তাহা হইলে স্বকীয় দেহের হিতাকাঙ্ক্ষী না হওয়া কি দুবাত্মার লক্ষণ নহে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে আপনার দেহ নাশ কবিতে পারে সে আত্মঘাতী। আত্মঘাতী পুরুষ পাপাত্মা, দুরাত্মা, সকলই হইতে পারে। অতএব যে আচবণ আত্মার উন্নতিরোধক, প্রাণেব ধ্বংশকারী, এবং দেহের অসীম কষ্টদায়ক কোন প্রাণে কেমন করিয়া বলিব যে তাহা পাপজনক নহে। হিন্দু, যবন, খৃষ্টিয়ান, ইত্যাদি যে কোন সম্প্রদায়ের লোক হউক না কেন কেহই অনিষ্টের চেষ্টা করে না সকলেই কিসে ইষ্ট সিদ্ধ হয় ইহাই সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে, কেবল বুদ্ধির মালিন্য নিবন্ধন প্রকৃত উপায় নিরূপণ করিতে অসমর্থ হয়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সহজজ্ঞান অথবা ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তিকর হইলেই যাহারা হিতকর বলিয়া বিবেচনা করেন তাহারা নিতান্ত স্থূলদর্শী ও অবিবেকী কারণ প্রবৃত্তি

সকলের একরূপ নহে। সত্ব, রজ, তমোগুণের মধ্যে যাহার যেটী প্রবল তাহার সেইরূপ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সত্বগুণ প্রকৃতি সাধুদিগের প্রবৃত্তি অনুসরণীয় ও হিতজনক, রজ ও তমোগুণ প্রাকৃতিক লোকদিগের প্রবৃত্তি ভাল নহে, ইহা কখনই সদাচরণের আদর্শস্থল হইতে পারে না। কাযে কাযেই সেই আত্মজ্ঞ সাধুদিগের আচরণ অথবা উপদেশই একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইন্দ্রিয়াদি সকলই ঐ প্রবৃত্তিরই অনুগত ভৃত্য সুতরাং ইহাদের হস্তে ধর্ম্মাধর্ম্মের ভারার্পণ করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে ঐ তিনটির একটীরও স্থিরতা নাই। ইহারা প্রত্যেক মনুষ্যের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। আবার একজনের নিকট সকল কালে সমান থাকেন না। বাল, কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য অবস্থায় ইহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা দেন। যে কার্য্য যৌবন কালে ভাল লাগিয়াছে তাহা প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধাবস্থায় নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বুঝা যায়, ইহার সহস্র সহস্র প্রমান পাওয়া যায়। আহার ও কার্য্যগত রুচি একইরূপ, ইহারা ক্ষণস্থায়ী ও বায়ুর গতির ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল অস্থায়ী, অনির্দ্দিষ্ট শক্তির উপর হিতাহিত নিরুপন করিবার ভার দেওয়া কি বাতুলের কার্য্য নয়। যে হিতাহিত বিবেচনার কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটী হইলে প্রাণ, দেহ, সকলই বিপন্ন হইবে এমত গুরুতর কার্য্যের ভার কি না একটা অস্থায়ী স্বভাব সম্পন্ন বহুতররূপ পরিগ্রহশীল শক্তির হস্তে অর্পিত, ইহা যদি মনুষ্যত্ব হয় তবে পশুত্বের সঙ্গে প্রভেদ রহিল কোথায়? সেই জন্য পুনরায় বলি যে সকল মহাত্মার আত্মা নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ, সৃষ্টিকাল হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত যাহা অচল ও অটল সত্বগুণের আধার সেই সকল আত্মায় যাহা মানবের হিতকর বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, নির্ভয়ে তাহাকেই অবলম্বন কর সত্য সত্যই শুভফল প্রাপ্ত হইবে। প্রকৃত পণ্ডিত না হইয়া পণ্ডিত্তাভিমান পরিত্যাগ করিয়া যাহাদের শিষ্য হইয়া অবিচারিত চিত্তে আজ্ঞাধীন ভৃত্যের ন্যায় তাঁহাদেরই আজ্ঞা প্রতি পালন কর কখনই কষ্ট পাইবেনা।

শরীর পীড়াগ্রস্ত হইলে যেমন রসনা বিকৃত হইয়া অহিতকর কুপথ্যে রুচি হয়, তখন সে রুচির উপর নির্ভর করিলে কদাচ রোগ মুক্ত হয় না বরং শরীরের ধ্বংশ অচীরে উৎপাদন করে। এরূপ স্থানে বিবেচক চিকিৎসকের হস্তে পথ্যাপথ্যের ভার অর্পণ করা শুভাকাঙ্ক্ষী লোকের কর্ত্তব্য এবং তাঁহারই আজ্ঞাবহ হওয়া উচিত। সেইরূপ বিকৃত বুদ্ধি ও মনে যাহা সুপথ্য বলিয়া নিরূপিত হয় তাহা কদাচ সুপথ্য হইতে পারে না বরং যে সকল পথ্যের সেবনে অধোগতি অবশ্যম্ভাবি সে স্থলে নির্ব্বিকার শুদ্ধাত্মা তাপসগণ যাহা ব্যবস্থা করেন তাহারই অনুসরণ একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা ঘোর

বিষয়াশক্ত আত্মহীন হইয়া পড়িয়াছি এক্ষণে যাহা ভাল বলিয়া বুঝি তাহা কেবল বিকারগ্রস্থ লোকের প্রলাপ মাত্র। এ অবস্থায় শাস্ত্রকারগণই প্রকৃত চিকিৎসক তাঁহাদের উপদেশ অবলম্বন ভিন্ন আর রক্ষার উপায় নাই। বিকৃত বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে শীঘ্রই পতন হইবে তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি বাঁচিতে চাও তবে যাও আর্য্যবংশীয় মহাপুরুষদিগের অমৃতময় ব্যবস্থা অবনত মস্তকে গ্রহণ কর এবং তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন কর নতুবা কথনই মনুষ্যত্ব রক্ষা হইবে না নিশ্চয়ই পশুত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দানিয়াড়ী।

রাসমালা।

ঘোরতর যুদ্ধ।

"বিরহবিধুরা বনিতা যেমন স্বামীর আগমন প্রতিক্ষা করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাল যাপন করে, সৌরযোধগণ প্রভাতের প্রতীক্ষায় সেইরূপ উদ্বেগের সহিত নিশাকাল অতিবাহিত করিতে লাগিল। মহাভারতের অতুল নীতিগাথায় তাহারা অবগত হইয়াছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ হইলে স্বর্গীয় বিদ্যাধরী লাভ করিতে পারা যায়। আজি এই ধূলিময় অসার সংসার পরিত্যাগ করিয়া তাহারা সেই দেবগণের আবাস স্থল পবিত্র অমরপুরী প্রাপ্ত হইবার আশয়ে সানন্দে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ধাবমান হইল। রজনী প্রভাত হইবা মাত্র মহারাজ জয়শেখরের আবাহনে সমস্ত সৌরযোধ যুদ্ধার্থ নিত্য প্রস্তুত হয়; যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পার্থিব গৌরবের সহিত স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আসিবে, এ আশা তাহাদিগের নাই; তাহারা সমরক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিয়া দিব্যাঙ্গনাগণের পরিণয়-মালিকা লাভ করিবে, ইহাই তাহাদিগের একমাত্র আশা—একমাত্র বাসনা। বীরগণের এই দৃঢ় সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া অপ্সরোগণ বিবাহার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। যোদ্ধৃবর্গ যখন অঙ্গে চর্ম্ম ও অস্ত্রশস্ত্র পরিধান করে, বিদ্যাধরীগণ সেই সময়ে বিবাহোচিত সুন্দর বসনভূষণে সজ্জিত হয়; যখন যোধগণ অস্ত্রশস্ত্র বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করে, অপ্সরোগণ তখন বিবাহ মালা করে ধরিয়া উৎফুল্ল চিত্তে তাহাদিগকে আহ্বান করিতে থাকে; যোধগণ যখন স্ব স্ব তুরঙ্গের রশ্মি আকর্ষণ করে, দিব্যাঙ্গনাকুল তখন আপনাদিগের পুষ্পরথ তাহাদিগের অভিমুখে চালিত করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে থাকে।"

যুদ্ধবিগ্রহ এইরূপ দিন দিন ঘোরতর হইয়া উঠিল। এই প্রচণ্ড বিপ্লবের ভীষণ শব্দ রাজান্তঃপুরে রূপসুন্দরীর শ্রুতিগোচর হইল। সহসা তাঁহার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল, তাঁহার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত

হইল। তিনি মূহূর্ত্তের জন্ত চারিদিক শূন্যময় দেখিলেন। তিনি বীরপত্নী—বীরাঙ্গনা। কতবার স্বহস্তে স্বামীকে সমরসাজে সজ্জিত করিয়া হাস্যোৎফুল্ল বদনে বিদায় দিয়াছেন, কতবার শত্রু-পরিবেষ্টিত শিবির মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া রণশ্রান্ত পতির শুশ্রূষা করিয়াছেন, আজি তাঁহার তবে এরূপ চিত্তবিকার কেন হইল? কেন রণভেরির প্রচণ্ড রোল তাঁহার কর্ণে প্রলয় মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইতেছে? কেন তিনি যুদ্ধের চিন্তায় ভীত হইতেছেন? রূপসুন্দরী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মনে মনে নানা প্রমাদ গণিয়া তিনি প্রাণপতিকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন এবং জয়শেখর উপস্থিত হইলে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কাতর বচনে বলিলেন, "স্বামিন্! এদাসীর প্রার্থনা রাখুন,—আজি বড়ই অমঙ্গল দেখিতেছি—এসমস্ত দুর্লক্ষণ দূর না হইলে আপনি যুদ্ধে যাইবেন না।" প্রিয়তমা বনিতার প্রার্থনায় জয়শেখরের মুখে হাস্য উদিত হইল; তিনি মহিষীর অশ্রুপ্লাবিত কপোলদেশ চুম্বন করিয়া প্রেমসিক্ত বচনে উত্তর করিলেন, "মহিষি! আজি তুমি কি বালিকা হইলে? তুমি কি জাননা যে, বিবাহ ও যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণের নাম ব্যতীত আর কিছুই সুলক্ষণ নাই?" পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া তিনি অচিরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

ঊষার রক্তিম রাগে পূর্ব্বদিক রঞ্জিত হইবামাত্র উভয় পক্ষে রণদামামা বাজিয়া উঠিল। অমনি সৈন্য ও সামন্তগণ বিকট রণরবে যুদ্ধস্থল প্রতিধ্বনিত করিয়া জীবনমরণের কঠোর সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইল। প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীসমূহ প্রচণ্ড বাত্যাতাড়িত জলদবৎ পরস্পরের বিরুদ্ধে ধাবমান হইল। তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্রাদি বিদ্যুদ্বৎ দীপ্তি পাইতে লাগিল, তাহাদের বজ্রধ্বনিবৎ পদতাড়ননাদে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! হৃদয়োন্মাদিত রণবাদ্যসমূহ অবিরত বাজিতে লাগিল। সেই উত্তেজক রবে এমন কি ভীরুগণও উন্মাদিত হইয়া উঠিল। বর্ষার ধারাপতনের ন্যায় তীক্ষ্ণ শরনিকর অবিরলধারে বর্ষিত হইতে লাগিল; কেহ খড়্গ, কেহ গদা, কেহ শূল, কেহ ভিন্দিপাল, কেহ নারাচ লইয়া নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল; হস্তী হস্তীর বিরুদ্ধে ধাবিত হইল, তুরঙ্গ তুরঙ্গকে আক্রমণ করিল, রথচালক রথচালকের সম্মুখীন হইতে লাগিল। নরশোণিতে রণস্থল প্লাবিত হইল; পতিত বীরগণের শবদেহ সমূহ তাহাতে অসংখ্য জলজন্তুর ন্যায় ভাসিতে লাগিল! যুদ্ধরোলের প্রচণ্ডতার সহিত যোধগণের হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কবিগণ হীনোৎসাহ সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিয়া গাহিতে লাগিল,—ধন্য! ধন্য! বীরপুত্রগণ! এরূপ পবিত্র রণতীর্থে আর কখনও স্নান করিতে পাইবে না;—এই সুযোগে বিপুল অক্ষয় যশ লাভ কর, স্বর্গ লাভ কর, দেবনরকুলের নিকট যশস্বী হও,—ইহ ও পরলোকে অমর হইতে চেষ্টা কর। ঐ দেখ—ঐ দেখ—বিদ্যাধরীগণ মন্দারমালিক হস্তে পুষ্পরথে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন; হর—হর! মহাদেব!"

সৌর ও শোলাঙ্কির প্রচণ্ড যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিল।

ভয়াবহ সমরকল্লোল আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া দেবতাগণের চিত্তাকর্ষণ করিল। তাঁহারা বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, আবার কি কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অপ্সরগণ নৃত্য করিতে লাগিল;—কিন্নরীগণ উন্মত্তের ন্যায় গান করিতে লাগিল, বিদ্যাধরীগণ বিবিধ প্রকার বাদ্য বাজাইতে লাগিল; নাগকুল বিষম ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল! রণভৈরব ভূতপ্রেত ও পিশাচদলে পরিবেষ্টিত হইয়া শোনিতাক্ত নরকপালমালা ধারণ পূর্ব্বক তাণ্ডব নৃত্যকরিতে লাগিলেন;—শতশত কবন্ধ ও রাক্ষস অবিরলধারে রুধির পান করিতে লাগিল।

শোলাঙ্কিরাজের অন্যতম প্রধান সামন্ত ভূত ভূতনাথেরন্যায় যে স্থলে যুদ্ধ করিতে ছিলেন, বীরবর শূরপাল সেই দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার আক্রমণে দলিত ও বিত্রাসিত হইয়া ভূত সদলে পশ্চাদপসৃত হইলেন। দূরে থাকিয়া রাজা ভূবব তাহা দেখিলেন; অমনি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি তদ্দিকে ধাবিত হইলেন এবং সেই পলায়মান সৈন্যদিগকে পুনরুত্তেজিত করিয়া বলিলেন, "যে নরাধম রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলাইবে, আমি স্বহস্তে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিব, ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে ভয়!" তথনই তাহারা উৎকট রণরব ত্যাগ করিয়া সেনাপতি ভট্টের সহিত শত্রুসেনার উপরিভাগে শার্দ্দূলবিক্রমে পতিত হইল। ভট্টের জীবনে মমতা নাই, শত্রুনিক্ষিপ্ত অবিরল শরজালের প্রতি ভ্রুক্ষেপ নাই; স্বীয় রণতুরঙ্গকে শত্রুসেনাব্যূহের মধ্যে তাড়িত করিয়া শানিত তরবারাঘাতে তিনি শত শত সৈন্য নিপাতিত করিতে লাগিলেন; অবশেষে সৌরযোধগণের শরজালে বিদ্ধ হইয়া শূরপালের হস্তে নিহত হইলেন! ভট্টবীর প্রাণত্যাগ করিয়াও স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিয়া গেলেন। সৌররাজা জয়শেখর দুর্গের পশ্চিম প্রান্তে যুদ্ধ করিতেছিলেন, ভট্ট তাঁহাব সম্মুখীন হইয়া সেইস্থল অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে তদভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন; জয়শেখরের সৈন্যগণ প্রাণপণে দুর্গের সেই পশ্চিম প্রান্ত রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কোন উদ্যমই সফল হয় নাই; ভট্ট পতিত হইবা মাত্র তাঁহার উন্মত্ত সৈন্যগণ জয়শেখবকে তাড়িত করিয়া অচিরে সেই প্রদেশ অধিকার করিয়া লইল। অবিলম্বে তৎসম্মুখস্থ দুর্গপ্রাকার বিভগ্ন হইলে তথায় একটী বৃহৎ রন্ধ্র প্রস্তুত হইল।

জয়শেখরের সেনাবল ক্রমে ক্ষয়িত হইয়া আসিল। তাঁহার প্রধান প্রধান সেনাগণ রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাঁহার বিশাল বাহিনীব প্রায় সমস্তই পতিত হইয়াছে। এখন আর দুর্গ রক্ষার আশা নাই। তিনি সেই রন্ধ্রদিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন,—দেখিলেন প্রচণ্ড গিরিনদের ন্যায় শত্রুসেনা ভীষণবেগে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তখন তিনি শূরপালকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আর দুর্গ রক্ষার উপায় নাই। পঞ্চসরের প্রধান প্রধান বীরগণ স্বদেশ রক্ষার্থ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তোমার সসত্ত্বা ভগিনী রূপসুন্দরীকে লইয়া নিরাপদস্থলে রাখিয়া আইস;

নতুবা বংশরক্ষা হইবে না।” শূরপাল সবিনয়ে উত্তর করিলেন,—“মহারাজ! এ বিপদের সময় আপনাকে একাকী রাখিয়া আমি কেমন করিয়া যাইব?” জয়শেখর ধীর নম্রবচনে পুনর্ব্বার বলিলেন, “বীর! তজ্জন্য তোমার চিন্তা নাই; তুমি আমার চির হিতকারী, তাহা আমি জানি; কিন্তু এ সঙ্কটে বংশ রক্ষা না করিলে পিতৃলোক কিসে সান্ত্বনা পাইবেন? কে তাঁহাদিগকে জলগণ্ডূষ দিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিবে? পুত্রহীন হইয়া আমিই বা কি প্রকারে মুক্তি লাভ করিব? হায়, ভ্রাতঃ! তাহা হইলে আমার বংশ বিলুপ্ত হইবে; শত্রুগণ নিষ্কণ্টকে আমার বক্ষের উপর পদাঘাত করিয়া পঞ্চসর ভোগ করিতে থাকিবে।”

শূর আর দ্বিধা ভাবিলেন না; রাজার নিকট বিদায় লইয়া তিনি স্বীয় ভগিনীর সহিত গোপনে দুর্গ ত্যাগ করিলেন এবং গভীর অরণ্যানীর অভিমুখে ধাবমান হইলেন। রূপসুন্দরী এতক্ষণ প্রকৃত বিষয় বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু যখন পলায়নের যথার্থ কারণ তাঁহার বিদিত হইল; তখন তিনি আর পদমাত্রও অগ্রসর হইতে চাহিলেন না; ভ্রাতাকে অনুনয় করিয়া বলিলেন “আমি স্বামীর চরণতলে চিতানলে প্রাণত্যাগ করিব।” শূরপাল তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন এবং রাজার অনুরোধ জানাইয়া পরিশেষে অনেক কষ্টে তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা একটী বিজন বনমধ্যে প্রবেশ করিলে শূরপাল ভগিনীকে তথায় ত্যাগ করিয়া সত্বরপদে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

ভুবরের কঠোর উদ্যম ক্রমে সফল হইবার উপক্রম হইয়া আসিল; সৌর-রাজের প্রধান প্রধান সেনানী ও সামন্তগণ রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল; ভুবর দেখিলেন, পঞ্চাসর রক্ষার আর উপায় নাই। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। এইবার তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী জয়শেখরের উন্নত মস্তক অবনত হইল, তাহার “সার্ব্বভৌম” “রাজ-চক্রবর্ত্তী” উপাধি সর্ব্বতোভাবে অব্যর্থ হইল। গুর্জ্জরের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে পারিয়া তিনি জয়শেখরের নিকট দূত প্রেরণ পূর্ব্বক বলিয়া পাঠাইলেন “যদি সৌর-রাজ দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক পৃষ্ঠবদ্ধ হস্তে অবনত মস্তকে ভুবরের চরণে আত্ম সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তিনি স্বরাজ্যের আধিপত্যেই অধিরূঢ় থাকিতে পারিবেন, নতুবা তাঁহার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।” এই অযৌক্তিক প্রস্তাব সদন্তে উপেক্ষা করিয়া মহারাজ জয়শেখর উত্তর করিলেন, যদি এরূপ জঘন্য হীনতা স্বীকার করিয়া জীবন ও সিংহাসন রক্ষা করিতে হয়, তবে সেই তুচ্ছ জীবন, সেই অকিঞ্চিৎকর রাজাসনে প্রয়োজন? আমি রাজপুত; পবিত্র সৌর-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; স্বদেশের রক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া অনন্ত সুখের নিলয় স্বর্গরাজ্য লাভ করিব?—তবে তুচ্ছ গুর্জ্জর রাজ্যে আমার প্রয়োজন কি? গুর্জ্জর কি স্বর্গের সমতুল্য? সৌররাজ্য শোলাঙ্কির হস্তে পতিত হইবে, হউক, কিন্তু সৌর-কুলের শেষ ধুরন্ধর আজি স্বদেশ রক্ষার্থ যে বীরত্ব রাখিয়া যাইবে, যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাহা কবিগণ কর্ত্তৃক গীত হইবে।”

বীরশেখর জয়শেখর বীরের ন্যায়ই উত্তর করিলেন; নির্ভীক হৃদয়ের এই অদম্য উচ্ছ্বাসে হয়ত কোন বীরের হৃদয় পরম প্রীত হইত; কিন্তু ভূবরের ক্রোধানল দ্বিগুণতর জ্বলিয়া উঠিল; জয়শেখরের ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত শাস্তি দিবার মানসে তিনি সমরানল ঘোরতররূপে প্রজ্জলিত করিলেন; জয়শেখর তাহাতে অনুমাত্রও ভীত হইলেন না, বরং তাঁহার সাহস ও উৎসাহ প্রচণ্ডরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; তাঁহার সহায় সম্বল প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে; যে কতিপয় মাত্র সৈনিক অবশিষ্ট আছে, তাহারা তাঁহার সহিত প্রাণত্যাগ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প। মহারাজ জয়শেখর সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে চরম সাহসে নির্ভর করিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই অবশিষ্ট কতিপয় সৈনিক পুরুষ বিশাল শত্রু-সৈন্য কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে রণস্থলে পতিত হইল। এই হৃদয়বিদারক শোচনীয় দৃশ্য সৌর-রাজ জয়শেখর স্বচক্ষে দেখিলেন; তৎকালে যেদিকে নিরীক্ষণ করিলেন সেইদিকেই অগণ্য শত্রুমুণ্ড দেখিতে পাইলেন;—সেইদিক হইতেই অসংখ্য শোলাঙ্কি সৈন্য উন্মুক্ত অসি হস্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইতেছে; তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও ভীত বা নিরুৎসাহ হইলেন না। বিপদের গুরুত্বের সহিত তাঁহার সাহস ও উৎসাহ চরম সীমায় উন্নত হইল; হৃদয়োন্মাদী রণবাদ্যের গম্ভীর রোলে যেন নৃত্য করিতে করিতে তিনি মদমত্ত কেশরীর ন্যায়ভীষণ বেগে শত্রুসেনার উপর আপতিত হইলেন এবং দুই হস্তে তাহাদিগকে তৃণবৎ কর্ত্তণ করিয়া অবশেষে অনন্ত শস্ত্রশয্যায় শয়ন করিলেন! এই সময়ে সহসা আকাশ-মণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল, সূর্য্যদেব কাঁপিতে কাঁপিতে অকস্মাৎ তিমিরগর্ব্ভে বিলীন হইলেন, যেন স্বীয় বংশধরের নিদারুণ অধঃপতন দেখিতে না পারিয়া তিনি ইহজগৎ হইতে বিদায় লইলেন; দিক্‌চয় ঘোর দর্শন হইয়া উঠিল; পৃথিবী ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল; নদীর জলরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া নগর গ্রাম গ্রাস করিবার উপক্রম করিল; বায়ু প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অনলকণা বর্ষণ করিতে লাগিল; উল্কাবৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিল; যোগীগণের হোমকুণ্ড হইতে এক প্রকার গভীর ধূম উদগত হইতে লাগিল;—স্বর্গ মর্ত্তে শত শত দুর্লক্ষণ মুহুর্মুহুঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল; সেই সমস্ত অলক্ষণ দর্শনে মহাবীরনিপাত ভাবিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক বিষম শোকে অভিভূত হইল। তখনই উন্মত্ত শোলাঙ্কিসৈন্যগণ গগণবিদারী রবে ভয়াবহ জয়নাদ করিয়া উঠিল এবং সৌররাজের শবদেহ পদতলে দলিত করিয়া অপ্রতিহত বেগে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা।

২২। বৈশম্পায়নোক্ত লক্ষ শ্লোক।

পূর্ব্বে (১২শ পরিচ্ছেদে) বলাগিয়াছে যে, পর্ব্বসংগ্রহনির্দ্দিষ্ট শ্লোক সংখ্যার সহিত প্রচলিত মহাভারতের শ্লোক সংখ্যার মিল নাই। তাহার উত্তরে আমরা দেখিতেছি যে সম্ভবতঃ ব্যাসদেব পর্ব্বসংগ্রহ রচিত' হইবার পর আর একবার মহাভারতের সংস্করণ করিয়াছিলেন। এখনও আমাদের আর একটী সংশয় আছে। কি পর্ব্বসংগ্রহোক্ত সংখ্যার সহিত, কি প্রচলিত সংখ্যার সহিত বৈশম্পায়নোক্ত লক্ষশ্লোকের কথা মিলিতেছে না কেন? ইহার সামঞ্জস্য কিরূপে করিবে?

এইবারে তবে শ্লোক সংখ্যা গণিয়া দেখা যাউক। পর্ব্বসংগ্রহোক্ত শ্লোকসংখ্যার সমষ্টি করিলে আমরা পাই ৮৪৮৩৬। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রচলিত মহাভারতের অষ্টাদশপর্ব্বে ৯১০১৬ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় (১)। কোনরূপেই একলক্ষ শ্লোক গণিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সৌতি নিজে পর্ব্বসংগ্রহে শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দেশ করিযাছেন, অথচ তিনিই বলিতেছেন যে বৈশম্পায়ন ব্যাসদেবের অনুজ্ঞায় লক্ষশ্লোক মহাভারত বলিয়াছেন। ইহার মীমাংসা কি? দেখা যাউক।

বৈশম্পায়ন নিজেও তাঁহার বক্তব্য ভারতসংহিতার বিষয় বলিয়াছেন "ইদং শতসহস্রংহি শ্লোকানাং পুণ্যকর্ম্মণাং"॥ (আদি, ৬২ অ, ১৪)। অর্থাৎ এই শ্লোক সকলের শতসহস্র (বিশিষ্ট মহাভারত কীর্ত্তন করিয়াছেন)। এখন দেখিতে হইবে বৈশম্পায়নের এই কথার প্রকৃত অর্থ কি? ইহাতে কি এমনটা বুঝায় যে ব্যাসদেব গোণাগুন্তি করিয়া লক্ষশ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, না লক্ষকল্প (ঈষদূন লক্ষ) শ্লোক করিয়াছিলেন? পর্ব্বসংগ্রহোক্ত ৮৪৮৩৬ শ্লোকসংখ্যা হইতে ৪৮৩৬ বাদ দিয়া ৮০০০০ শ্লোক থাকিলেও যদি বলা যায় "ইদং শতসহস্রংহি শ্লোকানাং", তাহা হইলে কি বড় অন্যায় কর্ম্ম করা হয়? এখানে শ্লোকের রচনাপ্রণালী দেখিয়া ভাব বুঝিতে হইবে। "ইদং শতসহস্রংহি শ্লোকানাং" ইহার চলিত বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতে হইলে "এই লাখ খানেক শ্লোক" এইরূপ করিতে হইবে। পূর্ব্বেও দেখাইয়াছি যে "অধ্যর্দ্ধশত" শব্দের অর্থে "শ' দেড়েক" (৮ম পরিচ্ছেদ দেখ) এবং "চতুর্ব্বিংশতি সহস্রীং" শব্দের অর্থে "হাজার চব্বিশ" (গোণাগুন্তি চব্বিশ হাজার নয়—১৫শ পরিচ্ছেদ দেখ) এইরূপ ধরিলে অর্থের সুসঙ্গতি হয়। এখানেও দেখিতেছি "শত সহস্রং" অর্থে ঠিক "লক্ষ" না ধরিয়া "লাকখানেক" ধরিলেই সহজে বিরোধভঞ্জন হইয়া যাইতেছে এবং এরূপ অর্থ না ধরিবার পক্ষেও তেমন বিশেষ যুক্তিপূর্ণ হেতু দেখিতেছি না।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—:*:—

(১) বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণচরিত্র" পৃঃ ৫৩ দেখ। আমি বর্দ্ধমান রাজবাটির সংস্করণ দেখিয়া দু একটা পর্ব্ব গণিয়াছিলাম তাহাতে বঙ্কিম বাবুর গণনার সহিত কিছু অমিল হইল। তাই সুবিধার্থে আমি বঙ্কিম বাবুর গণনাই স্বীকার করিলাম।

হিন্দু মহিলা।

অহল্যা।

হিন্দু পুরাণকার হিন্দুমহিলাকে যেরূপ স্বর্গীয় গুণগৌরবে মণ্ডিত করিয়া জগতের নারী সমাজে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ আবার নিবিড় কলঙ্কপঙ্কে বিলেপিত করিয়া মহাতলের নিম্নতম নিরয় কূপে নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। হিন্দুর সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও চিন্তা এবং অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী ও রাধা—দুইটী ললনা-সম্প্রদায়ের মধ্যে কত পার্থক্য? যেন স্বর্গ ও নরক! সীতা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিলে সকলেই সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া সেই সতীর চরণে ভক্তিকুসুম অর্পণ করে, এবং অহল্যা প্রভৃতির নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকে। কারণ কি?—না, হিন্দুশাস্ত্রে সীতা প্রভৃতি সতী এবং অহল্যা প্রমুখ রমণীগণ অসতী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই বৃত্তান্তের সারবত্তা ক্রমে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, সেই জন্য অদ্য অহল্যার চরিত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। অহল্যার প্রতি যদি কাহারও অমানুষিক ঘৃণা থাকে, তিনি যেন কিছু ক্ষণের জন্য তাহা সম্বরণ করিয়া আমার মন্তব্যের যুক্তাযুক্ততা বিচার করিয়া দেখেন ইহাই আমার অনুরোধ। অহল্যা অসতী সুতরাং এরূপ মহিলার চরিত্রালোচনায় কোনরূপ সুফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই বলিয়া যদি তিনি আপত্তি করেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, সতীর স্বর্গীয় চরিত্রের আলোচনায় যেরূপ সুফল পাওয়া যায়, অসতীর কলঙ্কিত জীবনের বিশ্লেষণে সেইরূপ সুফলই পাওয়া যাইতে পারে; একটীতে কেবল পুণ্যের সুরভি যশোগৌরব, অপরটীতে পাপের ভয়াবহ প্রায়শ্চিত্ত এবং সেই সঙ্গে পাপভীত পর্য্যাকুল প্রাণের পুণ্যার্জ্জনে প্রবণতা-বৃদ্ধি। মন্দ না দেখিলে, মন্দের ধারণা, মনোমধ্যে ঘৃণার মেঘ বিস্তার না করিলে কেহই কখন ভাল দেখিতে ভালবাসে না,—পুণ্যের বিমল আতপলীলায় আনন্দানুভব করিতে সমর্থ হয় না। ভালমন্দ ও পুণ্যপাপ মানবসমাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিয়া আপেক্ষিক গুণদোষের মিশ্র সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অতিমানুষ চরিত্রের সম্মুখে দশাননের দানব চরিত স্থাপিত না হইলে কে রামের উৎকর্ষ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত? সেইজন্য বলিতেছি, যদি অহল্যাকে কেহ পাপকলুষিত বলিয়া ঘৃণা করেন, তথাপি ইঁহার চরিত্রালোচনা করিলে সুশিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।

অহল্যার প্রধান আপরাধ এই যে, তিনি গৌতম রূপী ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াও তাঁহাকে স্বীয় অমূল্য ধর্ম্ম বিক্রয় করিয়াছিলেন। আদি কবি ভগবান্ বাল্মীকি বলিয়াছেন,

"মুনিবেশং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন!
মতিঞ্চকার দুর্ম্মেধা দেবরাজকুতুহলাৎ॥"

প্রসিদ্ধ টীকাকার রামানুজ বলিতেছেন,

"দেবরাজকুতুহলাৎ—স মামভিলষতি ইতি কৌতুকাৎ দিব্যরতিকে তুকাচ্চ ইত্যর্থঃ। দুর্ম্মেধা অহল্যা তেন সহ রত্যর্থং মতিং চকার ইত্যন্বয়ঃ॥১৯॥

এজন্য অহল্যার উপর স্বেচ্ছাকৃত ব্যভিচার-দোষ পড়িতেছে। কবিগুরু বাল্মীকির এইরূপ বিবরণের উপর পরবর্ত্তী কবি ও পুরাণকারগণ নানা নিবিড় কলঙ্কালঙ্কার আরোপিত করিয়া অহল্যা চরিত একটা জঘন্য ন্যক্কারজনক ব্যাপার-রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। এরূপ ভয়াবহ কলঙ্কারোপ ন্যায়সঙ্গত কি না, এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করা যাইবে। এরূপ করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, অহল্যা কে?

অহল্যা মহর্ষি গৌতমের ধর্ম্মপত্নী, এ কথা হিন্দুমাত্রই অবগত আছেন; কিন্তু তিনি কাহার কন্যা, তাঁহার নাম অহল্যা হইল কেন, কিরূপে তাঁহার নামে কলঙ্ক ঘটিল, এই সকল বিষয় জানা আবশ্যক; এইজন্য সঙ্ক্ষেপে তাহা বলিতেছি। বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে এ সম্বন্ধে একটী বিচিত্র বিবরণ আছে। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলিতে-ছেন,—

অমরেন্দ্র ময়া বুদ্ধ্যা প্রজাঃ সৃষ্টাস্তথা প্রভো।
একবর্ণাঃ সমভাষা একরূপাশ্চ সর্ব্বশঃ॥ ২৯॥
তাসাং নাস্তি বিশেষো হি দর্শনে লক্ষণেঽপি বা।
ততোঽহমেকাগ্রমনাস্তাঃ প্রজাঃ সমচিন্তয়ম্॥২০॥
সোঽহন্তাসাং বিশেষার্থং স্ত্রিয়মেকাং বিনির্ম্মমে।
যদ্বৎ প্রজানাং প্রত্যঙ্গং বিশিষ্টং তত্তদুদ্ধৃতম্॥২১॥
ততো ময়া রূপগুণৈরহল্যা স্ত্রী বিনির্ম্মিতা।"

অর্থাৎ আমি বুদ্ধি দ্বারা প্রজা সকল সৃষ্টি করিলাম। তাহাদের সকলেরই বর্ণ, বয়স ও বচন সমান হইল, কি লক্ষণে, কি দর্শনে, কিছুতেই কোন প্রকার প্রভেদ রহিল না। তখন আমি একাগ্রমনা হইয়া প্রজাদিগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাহাদের পরস্পরের পার্থক্য সাধন করিবার নিমিত্ত প্রজাবর্গের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ উদ্ধৃত করিয়া একটী রমণী সৃষ্টি করিলাম। ইহাতে রূপগুণে অহল্যা অর্থাৎ অনিন্দনীয় ললনা সৃষ্ট হইল। বিশিষ্ট বিশিষ্ট অঙ্গ হইতে অহল্যা সৃষ্ট হইলেন। ভাল, তাঁহার নাম অহল্যা হইল কেন?

ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

হলং নামেহ বৈরূপ্যং হল্যং তৎপ্রভবং ভবেৎ।
যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা।
অহল্যেত্যেব চ ময়া তস্যা নাম প্রকীর্ত্তিতম্॥২৩॥

অর্থাৎ হল শব্দের অর্থ বিরূপতা; তাহা হইতে যাহার জন্ম, তাহার নাম হল্য; যে রমণীর হল্য অর্থাৎ বিরূপতা নাই, সেই অহল্যা বলিয়া অভিহিত হয়; সেইজন্য আমি সেই রমণীর নাম অহল্যা রাখিলাম। এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যে রমণী অনিন্দিতরূপলাবণ্যবতী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, তিনিই অহল্যা। কিন্তু এই অহল্যা গৌতমের অহল্যা কি না, তদ্বিষয়ে আদৌ সন্দেহ হইতে পারে, সেইজন্য ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

নির্ম্মিতায়াঞ্চ দেবেন্দ্র তস্যাং নার্য্যাং সুরর্ষভ।
ভবিষ্যতীতি কস্যৈষা মম চিন্তা ততোঽভবৎ॥২৪॥
ত্বন্তু শক্র তদা নারীং জানীষে মনসা প্রভো!
স্থানাধিকতয়া পত্নী মমৈষেতি পুরন্দর!॥ ২৫॥
সা ময়া ন্যাসভূতা তু গৌতমস্য মহাত্মনঃ।
ন্যস্তা বহূনি বর্ষাণি তেন নির্য্যাতিতা চ হ॥ ২৬॥

ততস্তত্ত পরিজ্ঞায় মহাধৈর্য্যং মহামুনেঃ।
জ্ঞাত্বা তপসি সিদ্ধিঞ্চ পত্ন্যর্থং স্পর্শিতা তদা ॥২৭॥

সেই নারী নির্ম্মিতা হইলে আমার মনোমধ্যে এই চিন্তার উদয় হইল যে, 'ইনি কাহার ভার্য্যা হইবেন?' অনন্তর আমি ন্যাসরূপে মহর্ষি গৌতমের হস্তে সমর্পণ করিলাম; তিনি বহু বৎসর রাখিয়া আমার কাছে প্রত্যর্পণ করিলেন। পরিশেষে মহামুনি গৌতমের জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও তপঃসিদ্ধির পরিচয় পাইয়া অহল্যাকে তাঁহারই হস্তে ভার্য্যারূপে অর্পণ করিলাম।

এই পর্য্যন্ত পিতামহের মুখে অহল্যা-সম্বন্ধে অনেক পরিচয় পাওয়া গেল; কিন্তু আসল কথা এখনও বাকী রহিয়াছে। সে কথা ব্রহ্মারই মুখে শুনিতে হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—

ত্বং "ক্রুদ্ধস্ত্বিহ কামাত্মা গত্বা তস্যাশ্রমং মুনেঃ।
দৃষ্টবাংশ্চ তদা তাং স্ত্রীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥২৯॥
সা ত্বয়া ধর্ষিতা শক্র কামার্ত্তেন সমন্যুনা।"

"পরন্তু তুমি কামপরতন্ত্র সুতরাং কুপিত হইয়া তখন সেই মুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক অনলশিখার ন্যায় প্রদীপ্তা সেই স্ত্রীকে নয়নগোচর করিলে। শক্র। তুমি কামার্ত্ত হইয়া তাহাকে বলাৎকার করিলে।" * এস্থলে ইন্দ্রের অহল্যাহরণ সম্বন্ধে আর কোন কথাই বলিব না; সে বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে; তবে পাঠকদিগকে কেবল এইমাত্র অনুরোধ করিতেছি যে, ব্রহ্মার শেষ কথাটী অর্থাৎ "সা ত্বয়া ধর্ষিতা শক্র কামার্ত্তেন সমন্যুনা" এই শ্লোকার্দ্ধ যেন তাঁহারা স্মরণ রাখেন। যাহা হউক, এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মার সৃষ্টা এই অহল্যাই গৌতমের পত্নী অহল্যা। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? ব্রহ্মার বিবরণ পাঠ করিলে সহসা মনোমধ্যে ধারণা হয় যে, অহল্যা তৎকর্ত্তৃক সৃষ্টা আদি রমণী, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এ সম্বন্ধে আদিকাণ্ডে আমরা এরূপ কোন অদ্ভুত বিবরণ দেখিতে পাই না। ফলতঃ অহল্যা কে? কাহার কন্যা? তাহার নির্ণয় করিতে হইবে।

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশে মুদ্গলের বংশ বিবরণের সহিত এ সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে:—

"মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ। মুদ্গলাদ্ ভবাশ্ব ভবাশ্বাদ্ দিবোদাসোঽহল্যা চ মিথুনমভূৎ। শারদ্বতোঽহল্যায়াং শতানন্দোঽভবৎ।"

অর্থাৎ মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণগণ উদ্ভূত হয়েন, উঁহারা ক্ষত্রিয়-কুলোৎপন্ন। সেই মুদ্গলের পুত্র ভবাশ্ব; ভবাশ্ব হইতে দিবোদাস ও অহল্যা যমজ জন্ম গ্রহণ করেন। অহল্যার গর্ভে শারদ্বতের ঔরসে শতানন্দের জন্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতেও এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়:—

"মিথুনং মুদ্গলাদ্ ভার্ম্যাদ্ দিবোদাসঃ পুমানভূৎ। অহল্যা কন্যকা যস্যাং সতানন্দস্তু গৌতমাৎ।"

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, অহল্যা মুদ্গল গোত্রে উদ্ভূত হইয়াছিলেন; ইনি ভবাশ্বের কন্যা এবং দিবোদাসের ভগিনী। গৌতমের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। শতানন্দ ইঁহাদের পুত্র।

* বর্দ্ধমানরাজপ্রচারিত বঙ্গানুবাদ।

বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত হইতে যাহা উদ্ধৃত হইল, রামায়ণের সহিত তাহার বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে। বিচার করিতে গেলে রামায়ণের অহল্যা যে, গৌতমপত্নী অহল্যা নহেন তাহাই সহজে প্রতিপন্ন হয়। রামায়ণের উত্তরা কাণ্ডে অনেকগুলি আষাঢ়ে গল্প আছে, পূর্ব্বোক্ত অহল্যা বিবরণ তাহার অন্ত-তম। এই সকল কারণে বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের বৃত্তান্ত প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। অহল্যার পিতৃকুলের পরি-চয় পাওয়া গেল, অতঃপর তাঁহার জীব-নীর আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাদলের স্বপন।

দয়া ক'রে হোক, ঘৃণা ক'রে হোক,
এ জীবনে কভু চাবে না সুখ,
দেবি! তোমার লাগিয়ে, এমনি কবিয়ে,
জনম জনম রোদন ও সুখ।
আজি বরষার বায়ু, হুহু করে প্রাণ,
আছি মেখেলার মত পড়িয়ে,
মনে হয় যেন, লাজে বাধ বাধ,
কোণে এসে আছ দাঁড়ায়ে।
যেন এলোচুল ব'য়ে, ঝরে যায় জল,
নয়নে নীহার গাথিয়া,
যেন অধরে মাখান, হাসিটির রেখা
ক্ষীণ হয়ে গেছে ভিজিয়া!
আমি পিছু চেয়ে উঠি, তুমি যেন ছুটি,
আন কোণে যাও পলায়ে,
শুধু আধেক দরশ, আধেক পরশ,
আসে পাশে মোর ঢালিয়ে!
আজি অলস বাদলে, আঁধার বিরলে,
বসে আছি মুদি নয়নে,
তোমা অশরিরী রূপ, আসে দলে দলে,
ঘেরিয়া আমারে স্বপনে,

গান।

মিশ্রকল্যাণ—একতালি।

তুমি আছ তাই বেঁচে আছি সখা!
আঁধার কুটীরে উঁকিটী পড়ে না,
ক্ষুদ্র আপনারে বাঁধা দিতে চাই,
অসীম সাধের মনে তা ধরে না!
এই বাসনার বাসা, পরের হৃদয়ে,
কোথা পাব আমি বাঁধিতে;
বঁধু পরের বুকের সাধের সাপিনী
কে বল পুষিবে বুকেতে!
আমি প'ড়োবাড়ী যেন, প্রেতাবাস যেন,
জাগে বিভীষিকা শুয়ে চরণে,
এই প্রাণের জানালা, নিশি দিন খোলা,
কেহ নাহি ঘেঁসে ভ্রমণে!
দুখ দেছ সখা!—তুমিত দিয়েছ,
দুখ দেওয়া সে কি দেওয়া নয়?
আজ দুখ কোলে করি, ঝরে আঁখি বারি,
ভাবি—আমারে তোমারও মনে হয়!

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদ।

গ্রহণী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গ্রহণী প্রভৃতি জটিল রোগ সমুদায়ে আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অক্ষুণ্ণ প্রভাব বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। আয়ুর্ব্বেদ মতে তৈল প্রয়োগে অধিকাংশ ব্যাধি প্রতিকৃত হইয়া থাকে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি পাশ্চাত্য চিকিৎসার বিপুল আড়ম্বর যেখানে বিফল হইয়াছে, একমাত্র তৈল মর্দ্দনে সেই ব্যাধি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। পাঠকগণকে আজ আমরা গ্রহণী রোগোক্ত সেই মহোপকারক তৈলের বিষয় কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপন করিব। যখন ব্যাধির আমদোষের নিবৃত্তি ও পক্বতা উপস্থিত হয়, অপেক্ষাকৃত বায়ুর প্রকোপ অধিক হয়, তখনই তৈল প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। চিকিৎসক মাত্রেরই এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, নচেৎ অযথা অপযশঃ ভোগ করিতে হয়।

তুলার্দ্ধং শুষ্কবিল্বস্য তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥
আর্দ্রকস্য রসপ্রস্থমারণালং তথৈব চ।
তৈলপ্রস্থং সমাদায় ক্ষীরপ্রস্থং তথৈব চ॥
ধাতকী বিল্ব কুষ্ঠঞ্চ শঠী রাস্না পুনর্নবা।
ত্রিকটুঃ পিপ্পলীমূলং চিত্রকং গজপিপ্পলী॥
দেবদারু বচা কুষ্ঠং মোচকং কটুরোহিণী।
তেজপত্রাজমোদে চ জীবনীয়গণস্তথা॥
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ পাচয়েন্ মৃদুনাগ্নিনা।
এতদ্ধি বিল্বতৈলাখ্যং মন্দাগ্নীনাং প্রশস্যতে॥
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি অতীসারমরোচকম্।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি অর্শসামপি নাশনম্॥
শ্লীপদং বিবিধং হন্তি অন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ।
কফবাতোত্থবং শোথং জরমাশু ব্যপোহতি॥
কাসং শ্বাসঞ্চ গুল্মঞ্চ পাণ্ডুরোগবিনাশনম্।
মক্কল্লশূলং বমনং সূতিকাতঙ্কনাশনম্॥
মূঢ়গর্ভে চ দাতব্যং মূঢ়বাতানুলোমনম্।
শিরোরোগহরঞ্চৈব স্ত্রীণাং গদনিসূদনম্॥
রক্তো দুষ্টাশ্চ যা নার্য্যো রেতোদুষ্টাশ্চ যে নরাঃ।
তেঽপতিতাকাণ্যশুক্রাঢ্যা ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ॥
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং শূরং পণ্ডিতমেব চ।
বিল্বতৈলমিতিখ্যাতমাত্রেয়েণ বিনির্ম্মিতম্॥

বিল্বতৈল—তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ বেলশুঁঠ ৬।০ সের, মিলিত দশমূল ৬।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আদার রস ৪ সের, কাঁজি ৪ সের ও দুগ্ধ ৪ সের। উল্লিখিত দুইটী কাথ পাক শেষ করিয়া কল্ক পাক করিবে। কল্কদ্রব্য—ধাইফুল, বেলশুঁঠ, কুড়, শঠী, রাস্না, পুনর্নবা, ত্রিকটু, পিপুলমূল চিতামূল, গজপিপ্পলী, দেবদারু, বচ, কুড়, মোচরস, কট্‌কী, তেজপত্র, বনযমানী. জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি প্রত্যেক ৪ তোলা। তৈল পাকোক্ত প্রণালীতে পাক সমাধা করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে অগ্নিমান্দ্য,

নানাবিধ গ্রহণী, অতীসার,অরুচি, সংগ্রহ গ্রহণী, অর্শ, শ্লীপদ, অন্ত্রবৃদ্ধি, শোথ, জ্বর, কাস, শ্বাস, গুল্ম, পাণ্ডু, মক্কলশূল, বমি, সূতিকাদোষ, মূঢ়গর্ভ, মূঢ়বাত, শিরো-রোগ, সমস্ত স্ত্রীরোগ, রজোদুষ্টি ও রেতোদুষ্টি প্রভৃতি ব্যাধি প্রশমিত হয়।

গ্রহণীমিহির তৈল—মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ কুড়চীছাল ১২॥০ সের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অথবা ধনে ১২॥০ সের জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের অথবা তক্র ১৬ সের। দোষ দূষ্য বিবেচনা করিয়া এই তিনটীর কোন একটী ক্কাথের সহিত ক্কাথ পাক করিয়া কল্ক পাক করিবে। কল্কদ্রব্য—ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাক্রান্তা, আতইচ, হরিতকী, বেণারমূল, মুতা, বালা, মোচ-রস, রসোত, বেলশুঁঠ, নীলোৎপল, তেজপত্র, নাগেশ্বর, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, শ্যামালতা, পদ্মকাষ্ঠ, তগর-পাদুকা, কট্‌কী, জটামাংসী, দারুচিনি, কেশুরিয়া, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল, কদম্বছাল, কুড়চিছাল, যমানী, ও জীরা প্রত্যেক ২ তোলা, পূর্ব্ববৎ মৃদু অগ্নিতে পাক শেষ করিয়া ছাকিয়া লইবে। এই গ্রহণীমিহির তৈল মর্দ্দনে বলিপলি-তাদি নষ্ট হইয়া দেহ কান্তিবিশিষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। সকল প্রকার অতীসার, গ্রহণী, জ্বর, তৃষ্ণা, কাস, হিক্কা, শ্বাস, বমি, ভ্রমি, উপদ্রব সমন্বিত কোষ্ঠগত যাবতীয় রোগ, অর্শ, কামলা, মেহ, শোথ ও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শূল প্রভৃতি পীড়া আরোগ্য হয়।

বৃহৎ গ্রহণীমিহির তৈল—মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের পূর্ব্বোক্ত ক্কাথত্রয় অর্থাৎ কুড়চিছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, ধনে ১২॥০ সের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের এবং ১৬ সের তক্রের সহিত যথাবিধি ক্কাথ পাক শেষ করিয়া কল্ক পাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা—ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাক্রান্তা, আতইচ, হরিতকী, লবঙ্গ, বালা, পানি-ফল, রসোত, নাগেশ্বর, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌কী, পদ্মকেশর, তগরপাদুকা, শরমূল, ভৃঙ্গরাজ, কেশু-রিয়া, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল, ও কদম্বছাল প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈলে গ্রহণী সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া ও অন্যান্য পীড়া আরোগ্য হয়। গ্রহণী অধিকারোক্ত তৈল সমুদায়ের মধ্যে ইহাই প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ। ইহার অবশ্য-ম্ভাবী সুফল আমরা বহু বহু স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ফলতঃ ইহার ন্যায় ঔষধ অতি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়।

দাড়িমাদ্য তৈল—মূর্চ্ছিত তিল তৈল ১৬ সের। ক্কাথার্থ দাড়িমের খোলা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; বালা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ধনে ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কুড়্‌চি ছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের,শেষ ১৬ সের ও তক্র (ঘোল) ৮ সের। এই সমু-দায়ের সহিত পৃথক পৃথক্ পাক সমাধা করিয়া কল্ক পাক করিবে। কল্ক দ্রব্য—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, চই, জীরা, সৈন্ধব, গুড় ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মৌরী,জটামাংসী, লবঙ্গ, জয়িত্রী, জায়ফল, ধনে, যমানী, বন যমানী, বালা, কাঁচড়া-দাম, আতইচ, থুলকুড়ি, পানিফল পত্র, বৃহতী, কণ্টকারী, আমছাল, জামছাল, শালপানি, চাকুলে, বরাক্রান্তা ইন্দ্রযব, শতমূলী, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, মোচরস,

তালমূলী, কুড়চিছাল, বেড়েলা, গোক্ষুর, লোধ, আকনাদি, খদির কাষ্ঠ, গুলঞ্চ ও শিমুলছাল প্রত্যেক ৪ পল অর্থাৎ ৩২ তোলা। এই কল্ক দ্রব্য তণ্ডুল জলে পেষণ করিয়া তৈলে প্রদান করিবে ও যথাবিধি গন্ধ পাকাদি দ্বারা পাক সমাধা করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে দুর্ব্বার গ্রহণী, বিংশতি প্রকার প্রমেহ ও ষড়্‌বিধ অর্শ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

অতঃপর গ্রহণী রোগোক্ত ঘৃত পাকের বিষয় লিখিত হইতেছে। যে ঘৃত গ্রহণী রোগে বিষবদনিষ্টকর, আয়ুর্ব্বেদ মহিমায় অপরাপর দ্রব্যের সহিত পরিপক্ক হইয়া সেই ঘৃত আবার অমৃত সদৃশ হইয়া থাকে। ফলতঃ আয়ুর্ব্বেদের অসীম মহিমা ও আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য গণের প্রগাঢ় বুদ্ধিবৃত্তি চিন্তা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয় এবং প্রতিছত্রে পাশ্চাত্য চিকিৎসার নিকৃষ্টতা অন্তরে সমুদিত হয়। হিতাহিতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আয়ুর্ব্বেদের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞানে অক্ষম হইয়াই সময় সময় বৃথা নিন্দা করেন। আমরা অনেক সময় শুনিতে পাই যে, আয়ুর্ব্বেদে জ্বর বিকারের ভাল চিকিৎসা নাই, কলেরা রোগ নাই, রোগীকে আহার না দিয়া মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করেন, দুধ খাইতে দেন না, উষ্ণ জল খাইতে দেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনার ভাল মন্দ বিচার করিতে যে ব্যক্তি অক্ষম, সকলেই বোধ হয় তাহাকে মূর্খ ও পাগল বলিয়া থাকেন, আমরাও অযথা দোষারোপী ঐ সমুদায় ব্যক্তিকে মূর্খ হইতেও মূর্খ বলিতে ইচ্ছা করি। প্রকৃতপক্ষে বিবেচনার অভাবেই এত কষ্ট, এত রোগের যন্ত্রণা আমরা ভোগ করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে প্লীহা যকৃতের এত প্রাদুর্ভাব কেহ দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। যাহা হউক আমরা বিফল আড়ম্বরে গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু দুই একটী কথা বলা আবশ্যক বলিয়া বলিতে হইল।

মরিচাদ্য ঘৃত—গব্য ঘৃত ৪ সের, কাথার্থ দশমূল মিলিত ৬।০ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের, দুগ্ধ ৮ সের, কাথ পাক করিয়া কল্ক পাক করিবে। কল্ক দ্রব্য যথা—মরিচ, পিপুল মূল, শুঁঠ, পিপুল, ভেলার মুটা, যমানী, বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, হিঙ্গু, সচল, বিট, সৈন্ধব ও করকচ লবণ, চই, যবক্ষার, চিতামূল, ও বচ ইহাদের প্রত্যেক অর্দ্ধ পল। যথাবিধি পাক শেষ করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা।০ বা ॥০ আনা। এই ঘৃত পানে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, বিষ্টম্ভ, দৌর্ব্বল্য, প্লীহা, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, ভগন্দর, অর্শঃ এবং কফজ, বাতজ ও ক্রিমিজ বিবিধ ব্যাধি আরোগ্য হয়।

মহাষট্‌পলক ঘৃত—ঘৃত ৪ সের। দশমূলের কাথ ৪ সের (দশমূল ৩/০ পোয়া, জল ১৬ সের শেষ ৪ সের) আদার রস ৪ সের, চুক্র ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধির মাত ৪ সের, কাঁজি ৪ সের এই সমুদায়ের সহিত কাথ পাক করিয়া কল্ক পাক করিবে। কল্কার্থ সচল লবণ, মিলিত পঞ্চ কোল, (পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, চিতা ও চই) সৈন্ধব লবণ, হবুষ, বিট্‌লবণ, বনযমানী, যবক্ষার, হিঙ্গু, জীরা, পাঙ্গালবণ, কৃষ্ণ জীরা ও যমানী প্রত্যেক ৪ তোলা। যথাবিধানে পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে, মাত্রা।০ হইতে ॥০ তোলা পর্য্যন্ত। অন্নের সহিত অথবা উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহাতে ক্রিমি,

প্লীহা, উদর, অজীর্ণ, গ্রহণী, প্রবাহিকা (আমাশয়), জ্বর, কুষ্ঠ ও অন্যান্য অগ্নিমান্দ্য জনিত বিবিধ পীড়া প্রতিকৃত হয়।

চাঙ্গেরী ঘৃত—ঘৃত ৪সের, আমরুলের রস ১৬ সের ও দধির মাত ১৬ সের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ক্বাথ পাক করিবে। অনন্তর শুঁঠ, পিপুল মূল, চিতা মূল, গজপিপ্পলী, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও যমানী মিলিত ১ সেরের সহিত কল্ক পাক বিধি অনুসারে কল্ক পাক করিবে ও ছাকিয়া লইবে। মাত্রা।০ হইতে॥০ তোলা। এই ঘৃত বাতশ্লেষ্মঘ্ন। ইহা পানে অর্শ, গ্রহণী, প্রবাহিকা (আমাশয়) মূত্রকৃচ্ছ্র, গুদভ্রংশ ও আনাহ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

তক্রারিষ্ট—যমানী, আমলা, হরিতকী ও মরিচ প্রত্যেক ৩ পল, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট ও ঔদ্ভিদ লবণ প্রত্যেক ১ পল একত্র চূর্ণিত করিয়া ৮ সের তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৪ দিন রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। ইহার নাম তক্রারিষ্ট। তক্রারিষ্ট সেবনে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং গ্রহণী, শোথ ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

অতঃপর পর্পটীর বিষয় লিখিত হইতেছে, কারণ গ্রহণী প্রভৃতি রোগে পর্পটী একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগের কঠিন অবস্থায় চিকিৎসক মাত্রকেই পর্পটীর আশ্রয় লইতে হইয়া থাকে। শোধিত ("রস বিজ্ঞান" শীর্ষক প্রবন্ধে পারদের বিস্তারিত শোধন প্রণালী লিখিত হইল) পারদ ও শোধিত গন্ধকের পরিমাণ সমান। দুইটী বস্তু মিশ্রিত করিয়া যাবৎ নিশ্চন্দ্র অর্থাৎ পারদ কণা অদৃশ্য না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে। চূর্ণ কজ্জল সদৃশ হইলে লৌহ পাত্রে নির্ধূম কুল কাষ্ঠের অগ্নিতে গলাইয়া তরল করিবে। পরে একটী গোময় পিণ্ডের উপর একখানি কচি কলার পাতা পাতিয়া তাহার উপর দ্রবীভূত কজ্জলী ঢালিবে ও অপর একটী গোময় পিণ্ড কচি কলার পাতা দ্বারা আবৃত করিয়া উহা দ্বারা চাপিয়া চটা প্রস্তুত করিবে। দ্রবীভূত কজ্জলীর যে অংশ লৌহ পাত্রে লাগিয়া থাকিবে অর্থাৎ জমিয়া যাইবে উহা গ্রহণ করিবে না, ফেলিয়া দিবে। পর্পটী ময়ূর পুচ্ছের চান্দ্রিকা সদৃশ চিক্কণ হইলে সুপ্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। পর্পটী প্রথম দিবসে ১ বা ২ রতি মাত্রায় সেবন করিবে। অনন্তর প্রত্যহ ১ বা অর্দ্ধ রতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত হইলে পুনরায় ১ বা অর্দ্ধ রতি করিয়া কমাইয়া ২ রতি করিবে। ১০ রতির অধিক মাত্রায় পর্পটী ব্যবহার অনুচিত। ২১ দিন পর্য্যন্ত পর্পটী সেবনের নিয়ম।

পর্পটী সেবন কালে বায়ু বা রৌদ্র সেবা, ক্রোধ, চিন্তা, আহারসময়ের ব্যতিক্রম, ব্যায়াম, পরিশ্রম, স্নান ও অধিক বাক্য কথন প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। ঘৃত সৈন্ধব এবং জীরা ও ধনে বাটনা দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জন, শালি তণ্ডুলের অন্ন, কাল বেগুন, নিমুখী শাক, বাস্তুক শাক, উত্তম মুগ, পটোল, আদা, কাকমাচী শাক, লাবাদি পক্ষীর মাংস, রোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য এবং জলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ আহার করা কর্ত্তব্য। কলা, নিম্বাদি তিক্ত বস্তু, উষ্ণ অন্ন, বরাহ

ও জলচর পক্ষীর মাংস, অম্ল, দধি, শাক ও গড়ক মৎস্য নিষিদ্ধ। ক্ষুধা উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ আহার করিবে। কদাচ ক্ষুধার বেগ ধারণ করিবে না। ভোজন সময়ের ব্যতিক্রম জন্য যদি কখন ও ভেদ বা বমন উপস্থিত হয়, তবে ডাবের জল বা দুগ্ধ পান করিবে। পর্পটী সেবনে উপকার যেরূপ, অপকার ও সেইরূপ। উল্লিখিত অবিহিত বিষয় আচরণ করিলে কিংবা বিহিত বিষয় আচরণ না করিলে বিষম বিপত্তি উপস্থিত হয়।

অর্শোরোগং গ্রহণীং সামাং শূলাতিসারৌ চ।
কামলপাণ্ডুব্যাধিং প্লীহানক্রাতিদারুণং হন্তি॥
গুল্মজলোদরভস্মকরোগং হন্ত্যামবাতাংশ্চ।
অষ্টাদশৈব কুষ্ঠান্যশেষশে থাদি রোগাংশ্চ॥
ইয়মম্লপিত্তশমনী ত্রিদোষদমনী ক্ষুধাতিকমনীয়া।
অগ্নিং নিমগ্নমুদরে জ্বালাজটিলং করোত্যাশু॥
রসগন্ধকপর্পটিকাত্বপবাধ্যব্যাধসংঘাতম্।
বলিপলিতশূন্যং পুরুষং দীর্ঘায়ুষং কুরুতে॥
ব্যাধিপ্রভাবহরণাদপমৃত্যুত্রাসনাশকরণাচ্চ।
মর্ত্ত্যানামমৃতবটী রসগন্ধকপর্পটী জয়তি॥

পর্পটী সেবনে অর্শঃ, নানাবিধ গ্রহণী, শূল, অতিসার, কামলা, পাণ্ডু, অতিবৃদ্ধ প্লীহা, গুল্ম, জলোদর, ভস্মক, আমবাত, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, অশেষবিধ শোথ ও অম্লপিত্তাদি ব্যাধি আরোগ্য হয়। পর্পটী সেবনে ত্রিদোষের শমতা হয় এবং মনুষ্যকে বলিপলিতাদি শূন্য ও দীর্ঘায়ুঃ করে।

এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার পর্পটী সেবনের নিয়ম এই যে, রোগীকে কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত চিনি বা মিছরির সহিত কেবল মাত্র দুগ্ধ ও অন্ন পথ্য দেওয়া হয়। লবণ জল প্রভৃতি অপর দ্রব্য সমুদয় নিষিদ্ধ। অসহ্য তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে দুগ্ধ বা ডাবের জল পান করিতে দেওয়া হয়। শৌচাদি ক্রিয়ায় অত্যল্প বা উষ্ণ জল ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। পর্পটী সেবন কালে বিশেষ সাবধান হইতে হয়, যদি কোন রূপে লবণ জল বা অপর কোন কুপথ্য সেবন ঘটে, তবে উপকারের বিনিময়ে বিষম বিপদে পতিত হইতে হয়।

লৌহপর্পটী—শোধিত পারদ ২তোলা ও শোধিত গন্ধক ২ তোলা একত্রে কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত ২ তোলা জারিত লৌহ মিশ্রিত করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া কোন লৌহ পাত্রে ঘৃত মাখাইয়া কজ্জলী স্থাপন করিবে ও মৃদু অগ্নি সন্তাপে গলাইয়া উল্লিখিত নিয়মে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। উত্তম চূর্ণ করিয়া ইহার ১ রতি হইতে সেবন আরম্ভ করিবে, প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। ১০ রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া পুনরায় ১ রতি করিয়া মাত্রা হ্রাস করিবে। এক বা দুই সপ্তাহ কিম্বা আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত সেবনীয়। অনুপান শীতল জল অথবা ধনে ও জীরার কাথ। ইহার নাম লৌহপর্পটী। এই লৌহপর্পটী-সেবনে সূতিকা, জ্বর, অতি দুস্তর গ্রহণী, আম ও শূলযুক্ত অতিসার, পাণ্ডু, কামলা, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, ভস্মক (অতিক্ষুধা), আমবাত, উদাবর্ত্ত, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ ও নানাবিধ বিষদোষ নষ্ট হয়। এই মহৌষধ সেবনে মনুষ্য বলিপলিতাদি বর্জ্জিত, দেহ সুন্দর কান্তি, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয় এবং শত বৎসর পরমায়ু লাভ করে। ঔষধ সেবনকালে বিদাহি ও শাকপ্রভৃতি অভিষ্যন্দি দ্রব্য ভোজন, চিন্তা ও স্ত্রী-সংসর্গ প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

স্বর্ণপর্পটী—পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে, অনন্তর উহার সহিত গন্ধক ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লৌহ পাত্রে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে উল্লিখিত নিয়মে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ১ রত্তি হইতে সেবন আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি ও হ্রাস করিবে। ব্যাধি অনুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিতে হয়, কেবল মধু দিয়া মাড়িয়া দুগ্ধসহ ও সেবন করা যায়। ইহা সেবনে বিবিধ গ্রহণী, জ্বর, শূল, প্লীহা, শোথ ও উদর প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। বিজয় পর্পটী ও পঞ্চামৃত পর্পটী প্রভৃতিও এইরূপ নিয়মে প্রস্তুত ও সেবন করিতে হয়।

রসবিজ্ঞান।

পারদশোধন বিধি।

ইষ্টকারজনীচূর্ণৈঃ ষোড়শাংশৈ রসস্য চ।
মর্দ্দয়েৎ সপ্তধা খল্লে জম্বীরোত্থদ্রবৈর্দ্দিনম্॥
কাঞ্জিকৈঃ ক্ষালয়েৎ সূতং নানাদোষোপশান্তয়ে।
বিশালাঙ্কোঠচূর্ণেন বঙ্গদোষং নিবারয়েৎ॥
রাজবৃক্ষো মলং হন্তি চিত্রকো বহ্নিদূষণম্।
চাঞ্চল্যং কৃষ্ণধুস্তুরস্ত্রিফলা বিষনাশিনী॥
কটুত্রয়ং গিরিং হন্তি চাসহ্যাগ্নিং ত্রিকণ্টকঃ।
প্রতিদোষং কলাংশেন তত্তচ্চূর্ণং সকন্যকম্॥
সুবর্চ্চলান্বিতং সূতং খল্লে কৃত্বা যথাক্রমম্।
প্রত্যেকং প্রত্যহং যত্নাৎ সপ্তবারং বিমর্দ্দয়েৎ॥
উদ্ধৃত্যোক্তারনালেন মৃৎপাত্রে ক্ষালয়েৎ সুধীঃ।
সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্তং সপ্তকঞ্চুকবর্জ্জিতম্॥

রসায়নার্থী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ইহা রসিত (আস্বাদিত) হয় বলিয়া ইহার নাম রস। রস অর্থাৎ পারদ ও এক প্রকার ধাতুবিশেষ। উৎপত্তিস্থান ভেদে পারদ শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই চারি প্রকার হইয়া থাকে। ঐ চারি প্রকার পারদ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্বেত-পারদ রোগ বিনাশে, লোহিত-পারদ রসায়ন বিষয়ে, পীত-পারদ ধাতু ভেদে ও কৃষ্ণ-পারদ আকাশ গতি বিষয়ে উপযোগী। রসধাতু, রসেন্দ্র, মহারস, চপল, শিববীর্য্য, রস, সূত ও শিবের যাবতীয় নাম পারদের পর্য্যায়। পারদ কষায়াদি ষড়্রসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, যোগবাহী, অতিশয় বৃষ্য, চক্ষুর বলপ্রদ, সর্ব্বব্যাধি-নাশক ও বিশেষতঃ কুষ্ঠঘ্ন।

অন্তঃসুনীলো বহিরুজ্জ্বলো যো,
মধ্যাহ্নসূর্য্যপ্রতিমপ্রকাশঃ।
শস্তোঽথ ধূম্রঃ পরিপাণ্ডরশ্চ ;
চিত্রো ন যোজ্যো রসকর্ম্মসিদ্ধ্যৈ॥

যে পারদের অন্তর্ভাগে সুন্দর নীল আভা দৃষ্ট হয়, যাহার বাহ্যাংশ উজ্জ্বল ও যাহা মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট তাহাই ব্যবহার্য্য। যাহা ধূম, পাণ্ডু বা বিচিত্রবর্ণ তাহা পরিত্যজ্য।

স্বভাবতঃ পারদে নাগ, বঙ্গ, মল, বহ্নি, চাঞ্চল্য, বিষ, গিরি ও অসহ্যাগ্নি নামক ৮টী দোষ এবং পর্পটী, পাটনী, ভেদী, দ্রাবী, মলকরী, অন্ধকরী ও ধ্বাঙ্ক্ষী নামক সাতটী কঞ্চুক বিদ্যমান থাকে। নাগদোষ দ্বারা জড়তা ও গণ্ডরোগ, বঙ্গ-দোষ দ্বারা কুষ্ঠ, মলদোষ দ্বারা জাড্য, বহ্নিদোষ দ্বারা দাহ, চাঞ্চল্যদোষ দ্বারা বীজনাশ, বিষদোষ দ্বারা মৃত্যু, গিরি-দোষ দ্বারা স্ফোটক ও অসহ্যাগ্নিদোষ দ্বারা মোহ জন্মিয়া থাকে। পারদের উল্লিখিত দোষ সমুদায় সংশোধন না

করিয়া কোন কার্য্যেই ব্যবহার করা উচিত নহে।

যে পরিমাণ পারদ শোধন করিতে হয়, তাহার ষোড়শাংশ পরিমিত ইষ্টকচূর্ণ ও হরিদ্রাচূর্ণ উহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং কিঞ্চিৎ ঘৃতকুমারীর রস ও গোঁড়ালেবুর রস সংযুক্ত করিয়া উত্তমরূপ মর্দ্দন করিবে। এইরূপ সাতবার মর্দ্দন করিয়া কাঁজি দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। উল্লিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা পারদের নাগ অর্থাৎ সীসক মিশ্রণদোষ অপসারিত হয়। দোষ অপনয়নার্থ যে যে চূর্ণের সহিত পারদ মর্দ্দন করিতে হয়, ঐ সমুদায় চূর্ণ অর্থাৎ প্রত্যেক চূর্ণের পরিমাণ পারদের ষোড়শাংশ। মর্দ্দনকালে সকল চূর্ণের সহিতই কিঞ্চিৎ ঘৃতকুমারীর রস মিশ্রিত করিতে হয়। রাখাল শসা ও ধল আকড়ার মূলের চূর্ণের সহিত মর্দ্দনে বঙ্গদোষ, সোঁদালমূলচূর্ণ দ্বারা মলদোষ, চিতামূলচূর্ণ দ্বারা বহ্নিদোষ, কৃষ্ণধুস্তুর দ্বারা চাঞ্চল্যদোষ, ত্রিফলা দ্বারা বিষদোষ, ত্রিকটু দ্বারা গিরিদোষ ও গোক্ষুর দ্বারা অসহ্যাগ্নিদোষ অপসারিত হয়। প্রতিদিন ৭ বার মর্দ্দন করিবে, এইরূপ ৮ দিন মর্দ্দন করিয়া নবম দিবসে ছাঁকিয়া উষ্ণ কাঁজিতে প্রক্ষালন করিয়া লইবে। ইষ্টকাদি চূর্ণ দ্বারা নাগাদি অষ্টদোষ ও ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা সপ্তকঞ্চুক দূরীকৃত হয়।

অন্ততঃ পারদের প্রধান দোষ নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি ইহার অন্যথা অর্থাৎ দোষসংশোধন না করিয়া পারদ ব্যবহার করেন, তিনি একরূপ রোগীর প্রকৃত শত্রু। রোগীর হিতাহিতের দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই, স্বার্থসিদ্ধিই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ সকল মূর্খ চিকিৎসকের জানা উচিত যে, রোগীর উপকার না হইলে ভবিষ্যতে অবশ্যই তাহার স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

ঘৃতকুমারীর দ্বারা মলদোষ, ত্রিফলা দ্বারা অগ্নিদোষ ও চিতার দ্বারা বিষদোষ অপনীত হয়, অতএব অন্ততঃ ঐ সমুদায় চূর্ণের প্রত্যেক দ্বারা ৭ বার পারদকে মর্দ্দন করিয়া প্রধান দোষ অপনয়ন করা উচিত; সংক্ষেপতঃ ঘৃতকুমারী, চিতামূল, রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথের সহিত ৩ দিন মর্দ্দন করিলে পারদ সর্ব্বদোষ বিনির্ম্মুক্ত হয়। কেবল রসুনের রসের সহিত মর্দ্দনেও পারদ নির্দ্দোষ হয়।

মূর্চ্ছন।

যে প্রক্রিয়া দ্বারা পারদের নিশ্চয় ব্যাধিঘাতিনী শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মূর্চ্ছনা। ত্রিকটু, ত্রিফলা, বন্ধ্যাকর্কোটকী, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথ এবং চিতা, মেষলোম, হরিদ্রা, যবক্ষার, ঘৃতকুমারীরস, আকন্দপত্ররস ও ধুস্তুরপত্ররস ইহাদের প্রত্যেকের সহিত ৭ বার মর্দ্দন করিলে, পারদের কঞ্চুক সমূহ দূরীভূত হয়। ইহার নাম মূর্চ্ছনা। মূর্চ্ছিত রস বা পারদ বলিলে এইরূপ পারদ বুঝিতে হইবে। অতঃপর পর্পটিতে যেরূপ পারদ ব্যবহৃত হয় তাহা লিখিত হইতেছে।

পর্পটী ক্রিয়ার প্রথমে উল্লিখিত নিয়মে পারদের মলদোষ, বহ্নিদোষ ও বিষদোষ নিবারণ করিতে হয়। দ্বিতীয়

অর্থাৎ ঘৃতকুমারীরস, ত্রিফলা চূর্ণ ও চিতা পাতার রসে ইহা মর্দ্দন করা হইয়া থাকে। অতঃপর যথাক্রমে জয়ন্তীপত্র, এরণ্ডপত্র, আর্দ্রক ও কাকমাচী পত্ররসে ক্রমাগত মর্দ্দন করিতে হয়। একটী রস মর্দ্দন করিতে করিতে শুষ্ক হইয়া গেলে অপর রসের সহিত মর্দ্দন করিতে হয়। এইরূপ পারদই পর্প্পটী ক্রিয়ায় ব্যবহার্য্য। যে গন্ধক শুকপুচ্ছের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, নবনীতের ন্যায় দীপ্তিশালী, চিক্কণ, কঠিন ও স্নিগ্ধ, তাহাই শ্রেষ্ঠ ও পর্প্পটী ক্রিয়ায় ব্যবহার্য্য। প্রথমতঃ গন্ধক খণ্ড খণ্ড করিয়া তণ্ডুলাকার করিয়া ভৃঙ্গরাজ রসে ৭বার ভাবনা দিয়া এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ধূলিবৎ চূর্ণ করিতে হয়। পরে ঐ গন্ধক লৌহ পাত্রে স্থাপন করিয়া নির্দ্ধূম কুল কাষ্ঠাগ্নিতে গলাইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে নিক্ষেপ করিতে হয়। কঠিনীভূত ঐ গন্ধক চূর্ণ করিয়া উক্তরূপ পারদের সহিত মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী এবং পর্প্পটী ক্রিয়ায় ব্যবহার করিবে।

জনপদোদ্ধংসনীয়াধ্যায়।

অথাতো জনপদোদ্ধংসনীয়ং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় মহর্ষি কহিলেন, আমি নানাবিধ জনপদোদ্ধংসনীয় অধ্যায় বর্ণনা করিব।

জনপদমণ্ডলে পাঞ্চালক্ষেত্রে দ্বিজাতিবরাধ্যুষিতে কাম্পিল্যরাজধান্যাং ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়োঽন্তেবাসিগণপরিবৃতঃ পশ্চিমে ঘর্ম্মমাসে গঙ্গাতীরে বনবিচারমনুবিচরন্ শিষ্যমগ্নিবেশমব্রবীৎ।

জল, বায়ু, দেশ ও কাল প্রভৃতি দূষিত হইয়া যে, একদা মনুষ্য সমুদায়কে পীড়িত বা কালভবনে প্রেরিত করে, উহার বিস্তারিত বিবরণ এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। আজ কাল এইরূপ দুর্ব্বিপাক প্রায়ই সংঘটিত হইয়া থাকে। সেই জন্য আজ আমরা এই অধ্যায়টী পাঠক বর্গকে জানাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান কালে সুপরিচিত ম্যালেরিয়া ও কলেরা ইহারই অন্তর্ভূত।

ব্রাহ্মণগণপূর্ণা বিরাজিত পাঞ্চাল রাজধানী কাম্পিল্য নগরে শিষ্যগণপরিবৃত অত্রিনন্দন ভগবান্ পুনর্ব্বসু গ্রীষ্ম কালের শেষভাগে একদিন গঙ্গাতীরস্থ বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে প্রিয়শিষ্য অগ্নিবেশকে কহিলেন।

দৃশ্যন্তে হি খলু সৌম্য! নক্ষত্রগ্রহচন্দ্রসূর্য্যানিলানলানাং দিশাঞ্চ প্রকৃতিভূতানামৃতুবৈকারিকা ভাবা অচিরাদিতো ভূরপি চ ন যথাবদ্রসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবমোষধীনাং প্রতিবিধাস্যতি। তদ্বিযোগাচ্চাতঙ্কপ্রায়তা নিয়তা। তস্মাৎ প্রাক্ উদ্ধ্বংসাৎ প্রাক্ চ ভূমেরবিরসীভাবাদুদ্ধরত সৌম্য! ভৈষজ্যানি। যাবন্নোপহত রসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবাণি। বয়ঞ্চৈষাং রসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবান্ উপযোক্ষ্যামহে।

হে বৎস অগ্নিবেশ! কালক্রমে নক্ষত্র, গ্রহ, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি ও দিক্ সকলের স্বাভাবিক ঋতু পরিবর্ত্তনজাত বৈকারিক ভাব দৃষ্ট হইতেছে। অতএব অবিলম্বেই ভূমির গুণের ব্যতিক্রম ঘটিবে, সুতরাং ঔষধি সকলের যথোচিত, রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব উৎপন্ন হইবে না। এই কারণে দেশমধ্যে পীড়ার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া জনপদ সকল বিধ্বস্ত প্রায় হইয়া যাইবে! এই ভয়াবহ

দুর্ঘটনার নাম জনপদোদ্ধ্বংসন। এই জনপদোদ্ধ্বংসনের পূর্ব্বে এবং ভূমির বিকৃত রসোৎপত্তির পূর্ব্বে উদ্ভিজ্জ সমুদায় উদ্ধৃত করিয়া রাখা উচিত, কারণ ঐ উদ্ধ্বংসনে ভূমির বৈরস্যোৎপত্তি নিবন্ধন উদ্ভিজ্জেরও রসাদি বিকৃত হইয়া যাইবে এবং উহারা রোগ নিবারণাদি কার্য্যে সম্পূর্ণভাবে অনুপযোগী হইয়া পড়িবে, সুতরাং পূর্ব্বোদ্ধৃত ঔষধ সমস্তের রস বীর্য্যাদি আমাদের দেহরক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে, আমরা উদ্ধংসন সময়ে ঐ সমুদায় উদ্ভিজ্জের উপযোগ করিয়া জনপদোদ্ধংসকর বিকার হইতে কথঞ্চিৎ অব্যাহত থাকিতে পারিব।

এবং বাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। উদ্ধৃতানি খলু ভগবন্। ভৈষজ্যানি সম্যগ্ বিহিতানি চ সম্যগ্‌বিচারচারিতানি। অপিতু খলু জনপদোদ্ধংসনমেকেন ব্যাধিনা যুগপদসমান-প্রকৃত্যাহার দেহ বল সাত্ম্য সত্ত্ব বয়সাং মনুষ্যাণাং কস্মাদ্ ভবতীতি।

অতঃপর অগ্নিবেশ আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতি, আহার, দেহ, বল, সাত্ম্য, সত্ত্ব ও বয়স ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু জনপদোদ্ধংসকালে কিনিমিত্ত সকলেই একরূপ পীড়ায় আক্রান্ত হয়।

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। এব মসামান্যা-নামেভিরপ্যগ্নিবেশপ্রকৃত্যাদিভি র্ভাবৈ র্মনুষ্যাণাং যেঽন্যে ভাবাঃ সামান্যা স্তদ্বৈগুণ্যাৎ সমান-কালাঃ সমানলিঙ্গাশ্চ ব্যাধয়োঽভি নির্ব্বর্ত্তমানা জনপদমুদ্ধংসয়ন্তি। তে তু খল্বমে ভাবাঃ সামান্যা জনপদেষু ভবন্তি। তদ্ যথা, বায়ু-রুদকং দেশঃ কাল ইতি।

মহর্ষি অগ্নিবেশ উত্তর করিলেন, বৎস! যদিও মনুষ্য সকল ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন, তথাপি কতকগুলি ভাব সকলের পক্ষেই সাধারণ ও অপরিহার্য্য। ঐ সাধারণ ভাবের বৈগুণ্যহেতু সকলেই যুগপৎ একরূপ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং নিয়ত লোক ক্ষয় হওয়াতে জনপদ লোক শূন্য হইয়া পড়ে, এইজন্য ইহাকে জনপদোদ্ধংস বলা যায়। বায়ু, উদক, দেশ ও কাল এই চারিটী সাধারণ ভাব সকলেরই ভোগ্য এবং অপরিহার্য্য। এই চারিটী প্রকৃতি বিপর্য্যয় দ্বারা সকলে সমানরূপে আক্রান্ত ও সমান বিপদাপন্ন হয়। জনপদান্তর আশ্রয় না করিলে বিপদের আক্রমণ হইতে কোন মতেই নিস্তার পাওয়া যায় না।

তত্র বাতমেবং বিধমনারোগ্যকরং বিদ্যাৎ তদ্ যথা--ঋতু বিষমমতি স্তিমিতমতিচলমতি পরুষমতিশীতমত্যুষ্ণমতিরুক্ষমত্যভিষ্যন্দিন মতি-ভৈরবারাবমতিপ্রতিহতপরস্পরগতিমতিকুণ্ডলিন-মসাত্ম্যগন্ধবাষ্প সিকতাপাংশুধূমোপহতমিতি।

জনপদোদ্ধংসকালে বায়ুর প্রকৃতি ভিন্নরূপ হইয়া উঠে, যথা—ঋতুবিষম অর্থাৎ যে ঋতুতে বায়ুর যেরূপ প্রকৃতি হওয়া প্রকৃতিসিদ্ধ, তাহা না হইয়া বিপরীত হয়। বায়ু অতিশয় স্থির, অতি বেগশালী, অতি কর্কশ, অতি শীতল, অতি উষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি অভিষ্যন্দী, অতি ভীষণ রবকারী, ভিন্ন ভিন্ন দিগভিমুখ প্রবাহ সকলের পরস্পর প্রতীঘাতে কুণ্ডলাকারে ভ্রমণকারী, অপ্রিয় গন্ধযুক্ত এবং বাষ্প বালুকা, ধূলি ও ধূম দ্বারা উপহত হয়।

উদকন্তু খলু অত্যর্থ বিকৃত গন্ধবর্ণ রসস্পর্শবৎ ক্লেদবহুল মপক্রান্তজলচরবিহঙ্গমুপক্ষীণ জলাশয়-মপ্রীতিকরমপগতগুণং বিদ্যাৎ।

জল এইরূপ স্বভাব সম্পন্ন হইয়া জনপদবাসীদিগের পীড়াজনক হয় যথা—অতিশয় বিকৃত গন্ধ, বর্ণ, রস এবং স্পর্শযুক্ত, অতিশয় ক্লেদবিশিষ্ট, মৎস্য, কচ্ছপ ও কুম্ভীর এবং হংস সারসাদিপক্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। জলাশয় শুষ্ক হইয়া যাইতে থাকে, জলপানে তৃপ্তি জন্মে না, জলের শৈত্য ও মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণের হ্রাস হইয়া যায়। এবংবিধ জল জনপদোদ্ধংসের প্রধান কারণ।

দেশঃ পুনঃ প্রকৃতিবিকৃতি বর্ণ গন্ধ রস স্পর্শ ক্লেদবহুলমুপসৃষ্টং সরীসৃপ ব্যাল মশক শলভ মক্ষিকা মূষিকোলূক শ্মাশানিক শকুনি জম্বুকাদিভিস্তৃণোলূপোপবনবন্তং প্রতানাদিবহুলং অপূর্ব্ব বদ্ধপতিতং শুষ্কনষ্টশস্যং ধূম্রপবনং প্রধ্মাত পতত্রিগণমুৎক্রুষ্টশ্বগণমুদ্ভ্রান্ত ব্যথিত বিবিধমৃগ পক্ষি সঙ্ঘ মুৎসৃষ্ট নষ্ট ধর্ম্ম সত্য লজ্জাচার গুণ জনপদং শশ্বৎক্ষুভিতোদীর্ণসলিলাশয়ং প্রততোল্কাপাতনির্ঘাতভূমকম্পং অতিভয়ারাবরূপং রুক্ষ তাম্রারুণ সিতাভ্রজাল সংবৃতার্ক চন্দ্রতারকমভীক্ষ্ণং সম্ভ্রমোদ্বেগমিব সত্রাসরুদিতমিব সতমস্কমিব গুহ্যকাচরিতমিবাক্রন্দিতশব্দবহুলঞ্চাহিতং বিদ্যাৎ।

জনপদোদ্ধংসন সময়ে দেশের স্বভাব এইরূপ হয়, যথা—প্রকৃত বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শবিবর্জ্জিত, ক্লেদবহুল, সরীসৃপ, ব্যাল, মশক, পতঙ্গ, মক্ষিকা, মূষিক, পেচক, শ্মশানচারী পক্ষী ও শৃগালাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত, উলু প্রভৃতি তৃণ পরিপূর্ণ ও নানাবিধ কুৎসিত বন্য লতা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়। এই বিকৃত ভাবাপন্ন দেশে শস্য ও বৃক্ষ সমস্ত শুষ্ক ও নষ্ট হইয়া যায়, নিয়ত ধূম্রবর্ণ বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, পেচকাদি নিশাচর পক্ষী ও কুক্কুরগণ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে থাকে, মৃগগণ উদ্ভ্রান্ত ও ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, মনুষ্যগণ ধর্ম্ম, সত্য ব্যবহার, লজ্জা ও সদাচার পরিভ্রষ্ট হয়, নিরন্তর উল্কাপাত ও ভূমিকম্প হয় এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণ তাম্র, কৃষ্ণ বা অন্যবিধ বিকৃত বর্ণবিশিষ্ট হয়।

কালস্তু খলু যথর্ত্তুলিঙ্গাদ্বিপরীতলিঙ্গমতিলিঙ্গং হীনলিঙ্গঞ্চাহিতং ব্যবস্যেৎ।

এই সময়ে কালের অবস্থা এইরূপ হয় যথা—যে ঋতুতে কালের যেরূপ স্বভাব স্বতঃসিদ্ধ তাহার বিপরীত, অতিবিক্ত বা হীনলক্ষণাক্রান্ত শীত গ্রীষ্মাদি ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। জনপদোদ্ধংসকালে উল্লিখিতরূপ ও এবংবিধ অন্যান্য রূপ দুর্লক্ষণ সমুদয় দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ এই চারি প্রকার জল, বায়ু, দেশ এবং কালকে জনপদোদ্ধংসের কারণ বলিয়াছেন এবং ইহার অন্যথাভূত লক্ষণ সমুদয়কে জনপদের মঙ্গলজনক বলিয়াছেন।

দেশ, কাল, বায়ু ও জল উল্লিখিত রূপ বৈগুণ্য প্রাপ্ত হইলে বিধিপূর্ব্বক রসায়ন ঔষধ সেবন, পূর্ব্বোদ্ধৃত ঔষধ সেবন, পথ্য সেবা, অপথ্য ত্যাগ ও অন্তঃকরণ হইতে সর্ব্বতোভাবে ভয় দূর করা একান্ত কর্ত্তব্য। ঐ সময়ে সত্য বাক্য, ধর্ম্মপরায়ণ, জীবগণে দয়াপরবশ, দান, বলি, দেবার্চ্চন, সদাচারানুষ্ঠান, শান্তি অবলম্বন এবং আত্মচেষ্টা সর্ব্বথা হিতজনক। এই সময়ে ঐ ভয়ঙ্কর দেশ পরিত্যাগ করিয়া বিঘ্নশূন্য, কল্যাণপ্রদ জনপদান্তর আশ্রয় করিলে সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারা যায়। ব্রহ্মচর্য্যা অবলম্বন, ব্রহ্মচারীদিগের শুশ্রূষা, ধর্ম্ম শাস্ত্র আলোচনা

ও ধার্ম্মিকদিগের সঙ্গ দ্বারা ঐ ভয়ঙ্কর মারীভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। যাহাদের মৃত্যু অনিয়ত, এই সমুদয় উপায় দ্বারা তাহাদেরই জীবন রক্ষা হয়। মৃত্যুর প্রকৃত সময় উপস্থিত হইলে কোন মতেই রক্ষা পাওয়া যায় না।

ইত্যেবং বাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। কিন্নু খলু ভগবন্। নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃ সর্ব্বং নবেতি? ভগবান্ উবাচ ইহাগ্নিবেশ। ভূতানামায়ুর্যুক্তিমপেক্ষতে।

ভগবান্ আত্রেয় কর্ত্তৃক এই কথা উক্ত হইলে অগ্নিবেশ কহিলেন, হে ভগবন্! জীবের আয়ুর কাল ও পরিমাণ কি কোন একটী সীমাবদ্ধ? কৃপা করিয়া আমায় উপদেশ প্রদান করুন। মহর্ষি কহিলেন, বৎস! দৈব এবং পুরুষকারে আয়ুর বলাবল অবস্থিত। আয়ুর নির্দ্দিষ্ট সীমা বা পরিমাণ নাই।

দৈবে পুরুষকারে চ স্থিতং হ্যস্য বলাবলম্।
দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পৌর্ব্বদৈহিকম্॥
স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদিহাপরম্।
বলাবলবিশেষোঽস্তি তয়োরপি চ কর্ম্মণোঃ॥
দৃষ্টং হি ত্রিবিধং কর্ম্ম হীনং মধ্যমমুত্তমম্।
তয়োরুদারয়োর্যুক্তির্দীর্ঘস্য সুখস্য চ॥
নিয়তস্যায়ুষো হেতুর্বিপরীতস্য চেতরা।
মধ্যমা মধ্যমস্যেষ্টা কারণং শৃণু চাপরম্॥
দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলং হ্যুপহন্যতে।
দৈবেন চেতরৎ কর্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে॥
দৃষ্ট্বা যদেকে মন্যন্তে নিয়তং মানমায়ুষঃ।
কর্ম্ম কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কালে বিপাকে নিয়তং মহৎ॥
কিঞ্চিন্ন কালনিয়তং প্রত্যয়ৈঃ প্রতিবোধ্যতে॥

দৈব ও পুরুষকার এতদুভয়ই আত্মকৃত কর্ম্ম। পূর্ব্বদেহে কৃত আত্মকর্ম্মের নাম দৈব এবং বর্ত্তমান দেহকৃত আত্মকর্ম্মের নাম পুরুষকার। দৈব এবং পুরুষকার উভয়েরই শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। দৈব যদি দুর্ব্বল ও পুরুষকার যদি প্রবল হয়, তবে পুরুষকার দ্বারা দৈব উপহত হইয়া থাকে। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র পুরুষকার দ্বারা দৈবশক্তিকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রবলতর দৈব দ্বারা দুর্ব্বল পুরুষকার পরাভূত হইয়া থাকে। অনেকস্থলে বহু চেষ্টা করিয়াও কোন রোগীকে রক্ষা করিতে পারা যায় না। আর চিকিৎসা করিতে করিতে অতি কঠিন পীড়ারও শান্তি হয়, ইহা দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করেন, আয়ুর একরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, যাহার পূর্ব্বে কখনই মৃত্যু হইতে পারে না এবং যাহা শেষ হইলে এক মুহূর্ত্তও মনুষ্য জীবিত থাকিতে পারে না। আবার কঠিন পীড়া আরোগ্য হইতে দেখিয়া অনেকে মনে করেন, আয়ুঃ সত্ত্বেও লোক মরিতে পারে। ফলতঃ চিকিৎসাই জীবনের কারণ ও তাহার অভাবই মৃত্যুর কারণ। এই দুই প্রকার সিদ্ধান্তেই দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রকৃত মীমাংসা প্রবল পুরুষকার দ্বারা দুর্ব্বল দৈব দ্বারা দুর্ব্বল পুরুষকার পরাভূত হইয়া থাকে। সেই জন্যই সুচিকিৎসা দ্বারা কেহ কেহ রক্ষা পায় না, আবার বিনা চিকিৎসায়ও কঠিন পীড়া হইতে কেহ কেহ পরিত্রাণ পাইয়া থাকে।

যাঁহারা পুরুষকারের শক্তি কিছুমাত্র স্বীকার করেন না, কেবল দৈবশক্তিকেই বলবতী মনে করেন, তাঁহাদের মতও সমীচীন নহে। কারণ যদি দৈবশক্তিই একান্ত বলবতী হইত অর্থাৎ আয়ুর নির্দ্দিষ্ট সীমা কেহই অতিক্রম করিতে পারে না ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হইত, তবে লোকে আয়ুষ্কামী হইয়া মন্ত্র,

ঔষধি, মণি রত্ন ধারণ, মঙ্গলকর্ম্ম, বলি, উপহার, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, প্রণাম ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিত না। প্রচণ্ড গো হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব ও মহিষ প্রভৃতিকেও ভয়ঙ্কর বাত্যাকে পরিহার করিবার কোন আবশ্যকতা থাকিত না। প্রপাত, পর্ব্বত, দুর্গম কান্তার ও বিষম জলপ্রবাহ সমস্তকে পরিহার করিতে হইত না। প্রমত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, চপল, মোহাক্রান্ত ও লোভী ব্যক্তিদিগকে, শত্রুগণকে, প্রবৃদ্ধ অগ্নিকে ও বিষধর সর্পাদিকে ভয় করিতে হইত না। স্বভাবতঃ প্রাণীদিগের মনে অকাল মৃত্যুর ভয় উপস্থিত হইত না। মহর্ষিগণের রসায়ন প্রয়োগ বর্ণন বিফল হইত। ইন্দ্রকে ত্রাসযুক্ত হইয়া শত্রু বধার্থ বজ্র নিক্ষেপ করিতে হইত না। ব্যাধিত দেব ঋষিগণের ব্যাধিশান্তির নিমিত্ত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ঔষধ সংগ্রহ কষ্ট স্বীকার করিতে হইত না। পরমর্ষিগণ তপস্যা দ্বারা প্রচুর আয়ুঃ লাভ করিতে পারিতেন না। এইরূপ শত সহস্র যুক্তি আছে, যাহা দ্বারা আয়ুর নির্দ্দিষ্ট সীমা স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। আর জগতে ঈদৃশ লোক নাই, যিনি আয়ুর নির্দ্দিষ্ট সীমা স্বীকার করিয়া সকল সময়ে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক থাকিতে পারেন। কোন প্রাণ সংশয়কর বিপদের উপক্রমে অবশ্য তাঁহাকেও ব্যাকুল হইয়া প্রতিকারার্থ উপায়ান্বেষণে উদ্যত হইতে হইবে এবং নিজের বা প্রিয়তম ব্যক্তির কঠিন পীড়া উপস্থিত হইলে অবশ্যই তাহাকে চিকিৎসকের শরণাগত হইতে হইবে। যদি কাহারও একরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিত যে নিয়মিতকাল ব্যতীত কখনই বিপদ উপস্থিত হয় না তবে তাহারা উপস্থিত বিপদে প্রতিকারার্থ যত্নবান্ হইতেন না। সামান্যতঃ স্থির করিতে হইবে ও আমাদের (আত্রেয়াদি) ঋষির মত যে হিতোপচার মূলক জীবন ও তদ্বিপরীত মৃত্যু।

অতঃপর অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কাল মৃত্যু ও অকাল মৃত্যুর বিষয় যদি কৃপা করিয়া উপদেশ দেন, তাহা হইলে সমস্ত সংশয় দূর হয়। মহর্ষি কহিলেন বৎস! যেমন শকট (গাড়ি) সমাযুক্ত অক্ষ (ধুর) প্রকৃত অক্ষ গুণযুক্ত ও আবশ্যকীয় অপর সমুদয় গুণযুক্ত ও নিয়মিতরূপে বহমান হইয়া ক্রমশঃ উপযুক্তরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যথাকালে অবসান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দেহোপগত আয়ুঃ প্রকৃতরূপে উপচর্য্যমাণ হইয়া ক্রমশঃ যথা প্রমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যথাকালে পর্য্যবসিত হয়। এইরূপ মৃত্যুকে কালমৃত্যু বলা যায়। আবার ঐ অক্ষই অধিক ভারসহন, বিষম পথ গমন, অপথ গমন, অক্ষচক্রভঙ্গ, বাহ্য বাহক দোষ, অনির্ম্মোচন, বিপর্য্যাস ও উপাঙ্গ বাহিত্যাদি কারণে অসময়েই অবসান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আয়ুঃ ও অযথা বল সহকারে ক্রিয়া করণ, অতিবিরুদ্ধ ভোজন, বিষম ভাবে শরীর ন্যাস, অতি মৈথুন, অসৎসঙ্গ, উপস্থিত বেগ রোধ, ধারণীয় বেগের (কাম ক্রোধাদির) অসংযম, মারাত্মক জীবের আক্রমণ, অগ্ন্যাভিভব, অভিঘাত ও আহার পরিত্যাগ প্রভৃতি কারণে কালমৃত্যুর সীমার পূর্ব্বেই অবসান প্রাপ্ত হয়। এই মৃত্যুর নাম অকাল মৃত্যু। উপযুক্ত সময়ে সাবধান হইলে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া

যাইতে পারে, কাল মৃত্যু অনিবার্য্য। যে ব্যক্তি যেরূপ দেহ প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, তাহার সেই দেহ যতদিন পর্য্যন্ত সংসারের স্বাভাবিক সুখ দুঃখ ভোগ করিবার যোগ্য থাকে, তাবৎকাল তাহার পরমায়ু। অতএব প্রত্যেক জীবের পরমায়ুর ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। জীবদেহ সংসার সাগরে নিরন্তর প্লবমান থাকিয়া ক্রমশঃ শিথিল, ক্লিন্ন ও বিশীর্ণ হইয়া যথা সময়ে লয় প্রাপ্ত হয়। যে দেহ যতদিন পর্য্যন্ত সংসারতরঙ্গ সহ্য করিবার উপযুক্ত, তাহা ততদিন পর্য্যন্ত ভ্রামিত ও স্পন্দিত থাকিয়া পরিশেষে বিলীন হইয়া যায়। পরন্তু বিপদ্ বাত্যা উত্থিত হইলে ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ছিন্ন ভিন্ন ও মগ্ন হইয়া যায়। দেহ বা অপর কোন উৎপত্তিমান্ পদার্থকে চিরকাল অবিকৃত ও অবস্থিত রাখার উপায় জগতে নাই।

ভৈষজ্য-বিজ্ঞান।

১। হরিতকীচূর্ণ গুড়ের সহিত প্রতিদিবস সেবন করিলে অর্শোরোগ আরোগ্য হয়।

২। ঘোষাফলের চূর্ণ গুড়ের জলে পাক করিয়া বর্ত্তি করিবে। ঐ বর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রদান করিলে শুষ্ক অর্শঃ প্রশমিত হয়। ঘোষালতার মূল পেষণ করিয়া বলিতে প্রদান করিলে রক্তার্শের শান্তি হয়। ঘোষাফলের চূর্ণ বলিতে ঘর্ষণ করিলে অথবা কিঞ্চিৎ হরিদ্রাচূর্ণ সিজের আটায় মাখিয়া প্রদান করিলে উহা পতিত হইয়া যায়।

৩। গুড় (পুরাতন), তিল, শোধিত ভেলা ও হরিতকী প্রত্যেক বিবেচনা মতে ২ হইতে ৪ রতি, মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শঃ, শ্বাস, কাস, প্লীহা, পাণ্ডু ও জ্বর প্রশমিত হয়। অর্শোরোগে যোযান ও বিটলবণ সংযুক্ত তক্র একান্ত হিতজনক।

৪। গাঁদাফুলের অর্দ্ধতোলা পাতা বাটিয়া ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে অর্শের রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

৫। বিল্বপত্রের রস অর্দ্ধ তোলা ও মরিচ চূর্ণ ৵০ আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে একদোষজ ত্রিদোষজ ও দ্বিদোষজ শোথ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অর্শঃ ও কামলার শান্তি হয়। কুলথকলায় ও শুঁঠ গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া ঐ গোমূত্রে বাঁটিয়া অল্প উষ্ণ অবস্থায় প্রলেপ দিলে কফজনিত শোথের শান্তি হয়।

পুরাতন মাণকচুর খোলা ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণের অর্দ্ধ বা এক তোলা, দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে উদরাময়, জ্বর, প্লীহা ও সর্ব্বাঙ্গ বা একাঙ্গাশ্রিত শোথ প্রশমিত হয়।

৬। কচি দূর্ব্বার রস ১ তোলা ও চিনি ।৵০ আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রক্তাতিসার আরোগ্য হয়। হরিদ্রা পাতার রস ১ তোলা ও চূণের জল ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া সেবনে রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়। ডালিমের কচি পাতা ॥০ তোলা, তেঁতুলের কচিপাতা ॥০ তোলা কালজামের কচিপাতা ॥০ তোলা, দাড়িমের কুঁড়ি একটা ও জীরে ভাজা ।০ আনা একত্র বাঁটিয়া অর্দ্ধপোয়া জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আমরক্তাতিসার

প্রশমিত হয়। আমআদার রস এক ছটাক একটু সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তামাশয় নিবৃত্ত হয়।

একটী পাতিলেবুর ভিতরে খোল করিয়া ৭ রতি আফিঙ পুরিয়া গোময় দ্বারা লেপন ও শুষ্ক করিবে, অনন্তর বিলঘুঁটের অগ্নিতে পোড়াইয়া উপরের দগ্ধ গোময় ফেলিয়া দিবে এবং খলে পেষণ করিয়া ১৪ টী বটী করিবে, ইহার অৰ্দ্ধ বা একটী বটী ছাগদুগ্ধ বা জলসহ সেবনে রক্তামাশয় নিশ্চয় প্রশমিত হয়।

এমারল্ডে "মান"।

সেই "নিতুই নব" রাধাকৃষ্ণ প্রেম-লীলা "মানে" অতি উজ্জ্বলরূপে বিকশিত হইয়াছে "মান" একখানি আধ্যাত্মিক-তায় উত্তেজিত প্রবাহ পূর্ণ সঙ্গীতনাট্য। মানের গানে হৃদয়ে আঘাত লাগে প্রাণের ভিতরের ভিতর দিয়া কি একটী পবিত্র প্রেমস্রোত বহিয়া যায়, মানের গান "কাণের ভিতর দিয়া" মরমে প্রবেশ করিলে সত্যই প্রাণে এক উন্মাদিনী শক্তি উৎসারিত করিয়া দেয়। মানের অভিনয়ে আমরা প্রাচীন মহা-জনদিগের তানলয় সঙ্গত, পীযূষ পূরিত কাকলী কুজিত ভ্রমর গুঞ্জনবৎ অপূৰ্ব্ব সঙ্গীত শুনিতে পাই।

মান সংকলন করিয়াছেন বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ বসু। তিনি নিজে সমা-লোচক ও সমজদার লোক; বৈকুণ্ঠ বাবু ইহার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে "মানের" মান রক্ষা হইয়াছে। তিনি প্রাচীনের স্মৃতিকে প্রাণের ভিতর আনাইয়া দিয়াছেন। আমাদের ভাষার আদিকবি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসকে সাধা-রণের দৃষ্টির সম্মুখে আনাইয়াছেন, নাট্য মঞ্চে প্রেমের স্রোত বহাইয়াছেন।

সংকলন কালে বৈকুণ্ঠ বাবুকে একটু পরিশ্রম ও বিবেচনা শক্তি দেখা-ইতে হইয়াছে। শত বৎসর পূৰ্ব্বে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসকে বাঙ্গলার আবাল বৃদ্ধ বনিতা জানিত কিন্তু শত বৎসর পরে আমরা সেই অমর কবিদিগের পীযূষ পূরিত প্রেমভাবোচ্ছাসিত সঙ্গীত রাশি যাহার কথায় কথায় ছত্রে ছত্রে শব্দে শব্দে স্তরে স্তরে প্রেম পোরা তাহা ভুলিয়া যাইতেছি। মানের মহা-জন পদাবলীই মেরুদণ্ড স্বরূপে গৃহীত বৈকুণ্ঠ বাবু মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত সংযোজন করিয়া দিয়া তাহাকে অতি সুন্দর মুৰ্ত্তিতে সাধারণের সমক্ষে ধরিয়াছেন।

অভিনয়ের আগা গোড়াই সঙ্গীত, সেই বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাসের পদাবলী যাহা বাঙ্গলায় ঘরে ঘরে কৃষ্ণ প্রেম উচ্ছসিত করিয়া গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা, বৃন্দা ও ললিতার অভিনয় বেশ হইয়াছে। সঙ্গীত গুলি যেরূপ ভাবপূর্ণ, গীত হইয়াছেও সেইরূপ সুন্দর সুরে। পূৰ্ব্বরাগ হইতে আরম্ভ

করিয়া শেষ নাপিতানী বিদেশিনী বৈশ্য ও যোগী বেশের অভিনয় বেশ মধুরত্বে পূর্ণ হইয়াছিল। রাধিকার সঙ্গীতগুলি সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। ললিতা ও বৃন্দা বিশেষ সুসঙ্গত ভাবে অভিনয় করিয়া আমাদের মনে সন্তোষোৎপাদন করিয়াছিল। কোন নাট্যশালায় অনেকদিন বৈষ্ণবভক্তগণ কৃষ্ণলীলার সহিত গীতিনাট্যের অভিনয় ভগবল্লীলার সুন্দর ও যথার্থ ভাবময় অভিনয় দেখিতে না পাইয়া বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া আছেন, আজ তাঁহাদের সে খেদ মিটিল, এমারল্ডের "মান" সেই ভক্তি প্রথানুসারে সেই জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন, সেই হ্লাদিনী শক্তির সঙ্গীত, পরমপুরুষের অবিচ্ছিন্নতা; সেই প্রকৃতির সহিত পুরুষের নিত্য সম্পর্ক তত্ত্বের অপূর্ব্বরহস্যোদ্ভেদ্ কাহিনী গাথায় মান মালা গাথা কাব্যামোদীগণের দেখিবার ও শুনিবার জিনাস।

তার পর অপেরার প্রধান অলঙ্কার তিনটি, দৃশ্যপটাদি, সাজ সজ্জাদি, ও নৃত্য গীতাদি। এসকল বিষয়েই 'মান' সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

প্রাচীন কবিদিগকে যাঁহারা পুনর্জ্জীবিত দেখিতে চান প্রকৃতি পুরুষের গুহ্য-রহস্যময়, প্রেম লীলার—আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ডুবিয়া যাঁহারা একটু পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতে চান তাঁহারা একবার মানের অভিনয় দেখিয়া আসুন।

কবিকল্পলতা।

ইহা একখানি প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্র। ইহাতে একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর প্রভৃতি সাধারণ শব্দের পর্য্যায়, ছন্দঃপ্রকরণ, অনুপ্রাস, উদ্দিষ্টবর্ণন, প্রকীর্ণাংশ, একাদি সংখ্যাবাচক শব্দের পর্য্যায রূঢ়ি ও যৌগিক মিশ্র শব্দ, বাক্যদর্শন, গঙ্গাস্তবাদি, অদ্ভুত, চিত্রকাব্য, সাদৃশ্য, রূপকাদি অলঙ্কার, সমস্যাপূরণ ও সমস্যা প্রভৃতি কয়টী বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত আছে। ইহার সাহায্যে অনায়াসে কবিতা প্রস্তুত ও সমস্যাপূরণ করিতে পারা যায়।

মূল্য ... ১৲ এক টাকা।

২য় খণ্ড। } ১৩০১ সাল—পৌষ। { ৪র্থ সংখ্যা।

সূচী পত্র।

মূল্য, প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

একটি বিশেষ অনুরোধ।

আমাদিগের এই ক্ষুদ্র কার্য্য সাধারণের নিকট এত অল্প কালের মধ্যে আদরণীয় হইবে, এ আশা আমাদের মনে পূর্ব্বে স্থান প্রাপ্তই হয় নাই। ইতিমধ্যেই আমাদের গ্রাহক সংখ্যা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে আমরা কোন ক্রমেই আর কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছি না, সেইজন্য কোন কোন গ্রাহক এপর্য্যন্ত প্রথম বৎসরের সমুদয় সংখ্যা প্রাপ্ত হন নাই, এই ক্রটীর জন্য আমরা বিনীত ভাবে তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, অল্প দিবসের মধ্যেই আমরা তাহাদের সংখ্যাগুলি পূরণ করিয়া দিতে বাধ্য রহিলাম।

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

"চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান" ও সমীরণ প্রতি মাসেব শেষে প্রকাশিত হয়।

চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য কলিকাতায় ১৷৵০ আঠার আনা, মফঃস্বলে ১৷৷০ দেড় টাকা। প্রত্যেক খণ্ড দুই আনা মাত্র। নমুনার জন্য প্রতি সংখ্যায় ৵১০ দশ পয়সা অগ্রিম পাঠাইতে হয়।

যিনি একত্রে পাঁচটী গ্রাহক করিয়া দিয়া অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাকে বিনামূল্যে এক এক খণ্ড পত্র প্রদান করা হইবে।

চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে এক বৎসরের জন্য প্রতি পেজ, প্রতি মাসে ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পেজ ৩৲ টাকা, সিকি পেজ ২৲ টাকা, সিকি পেজের কম বিজ্ঞাপন কণ্ট্রাক্ট হিসাবে গৃহীত হয় না। সিকি পেজের কম প্রত্যেকবার প্রতি লাইন ।০ চারি আনা হিসাবে দিতে হইবে।

এই পত্র সম্বন্ধে টাকাকড়ি আমার নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডারের কুপনে আপন নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণকে আপনার নম্বর লিখিতে হইবে। পত্রোত্তর আবশ্যক হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিবেন, নচেৎ উত্তর যাইবে না—

সম্পাদকীয় পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

টাকা কড়ি আমার স্বাক্ষরিত বিল ব্যতীত কেহ দিলে আমি তাহার দায়ী হইব না।

ব্যারিং বা ইনসফিসিয়েণ্ট পত্র গৃহীত হইবে না।

১৪৬ নং ফৌজদারী-বালাখানা, কলিকাতা। } কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন, স্বত্বাধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষ।

২য় খণ্ড। } ১৩০১ সাল—পৌষ। { ৪র্থ সংখ্যা।

কৃষ্টফার কলম্বস্।

মহামতি ইমারসন একবার মনোদুঃখে বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর লোক আর কত কাল অকৃতজ্ঞ ও অনুদার থাকিবে? কলম্বস কত কষ্টে নূতন জগৎ আবিষ্কার করিলেন, আর দেখ নাম জাহির হইয়া গেল এক চোরের! হে মহাকাল! তুমি কি ইহার বিচার করিবে না?" সেই চোরের নাম আমেরিগো ভেস্‌পুচী! এই আমেরিগো ভেস্‌পুচীর নাম হইতে নূতন জগৎ "আমেরিকা"—এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাকাল ইমারসনের সেই হৃদয়ের প্রার্থনা শুনিয়াছেন। তাই এবার সেই চোর ধরা পড়িয়াছে। সেই চোরের নাম যাহাতে আর উচ্চারণ করিতে না হয়, নব জগতের অধিবাসিগণ তাহার জন্য ঘোর আন্দোলন করিতেছেন। জগতের মানচিত্র হইতে আমেরিকা নাম বিলুপ্ত হইয়া যাহাতে কলম্বিয়া এই নাম প্রচলিত হয়, সিকাগো মহাপ্রদর্শিনীতে তাহার প্রস্তাব হইয়াছে।

নব জগতের আবিষ্কর্ত্তা এই কলম্বস ১৪৩৭ খৃঃ অব্দে (কাহারও মতে ১৪৩৬) ইটালীর অন্তঃপাতী জেনোয়া নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ডোমিনিকো কলম্বস। পশম পরিষ্কার করা ইঁহার ব্যবসায় ছিল। এই ব্যবসায়ের দ্বারা তিনি যৎকিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা অতি কষ্টে পরিবারের দিনপাত হইত। লক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টি না থাকিলেও, কলম্বসের বংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া জনসমাজে আদৃত ছিল। বারথলোমিয় ও ডিগো নামে কলম্বসের দুই সহোদর ও এক সহোদরা ছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ও উত্তরকালে সহায় জন্য কলম্বসের মহৎ কার্য্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন। জেনোয়া নিবাসী জনৈক শিল্পী কলম্বসের সহোদরার পাণিগ্রহণ করেন। পিতা ডোমিনিকো বাল্যকালে পুত্রের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অধ্যয়নার্থ কলম্বসকে পাভিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কলম্বস কয়েক বৎসর মন-যোগের সহিত ক্ষেত্রতত্ত্ব, ভূগোল, খগোল ও নৌবিদ্যার অনুশীলন কবেন।

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কলম্বস বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। জীবন-সংগ্রাম হইতে আপনাকে এবং পবিবার-বর্গকে রক্ষা করিবার জন্য কোন জাহাজে সামান্য মাল্লার কাজে নিযুক্ত হন। কলম্বস বিশ্ববিদ্যালয পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পাঠানুরাগ কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস হইল না। সময় ও সুযোগ পাইলেই তিনি ভূগোল ও নৌ-বিদ্যা মনোযোগেব সহিত অনুশীলন কবিতেন। অটল অধ্যবসায়বলে কল-ম্বস অল্পদিনের মধ্যে সেই অর্ণবযানেব অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার কয়েক বৎসর পবে অর্থাৎ ১৪৭০ খৃঃ অব্দে কলম্বস পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে কোন কার্য্যোপলক্ষে গমন কবেন ও ডোনাফীলিপাড়ি পলে-স্ত্রীলোনাম্নী এক গুণবতী রমণীর পাণি-গ্রহণ কবেন। ফিলিপাব পিতা একজন ইটালীবাসী নাবিক। পর্ত্তুগালেব যুব-রাজ হেনরীর অধীনে ইনি নাবিকের কার্য্য করিতেন। নূতন দেশ ও দ্বীপ আবিষ্কারের জন্য ইনি অনেক বার জলযাত্রা করেন এবং তজ্জন্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ও মানচিত্র সংগ্রহ করেন। কলম্বস স্বীয় সহধর্ম্মিণীর নিকট এই সকল প্রাপ্ত হইলেন।

তদ্ব্যতীত কলম্বস পর্ত্তুগালবাসী নাবিকগণের নিকট অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পর্ত্তুগীজগণ ইতিপূর্ব্বে আফ্রিকার অন্তর্গত গিনি প্রদেশে বাণিজ্যার্থ গতায়াত করিতেন। এই সকল নাবিকের মুখে কলম্বস শুনিলেন, আটলাণ্টিক মহা-সাগরের অন্তর্গত মেডিরা, কেনেরী ও কেপভার্ড দ্বীপ ব্যতীত ইহার পশ্চিমে আর কোন দ্বীপ বা দেশ নাই। আরও শুনিলেন যে, আফ্রিকার দক্ষিণস্থ উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ ব্যতিত ভারতবর্ষে আগমনের আর কোন সুগম পন্থা নাই। তৎকালে অধিকাংশ যুরোপ-বাসীর ধারণা ছিল, আট্লাণ্টিক পাবাবারের পরপাবে কোন দেশ নাই; কেবল অসীম জলরাশি অনন্ত বিস্তৃত হইয়া, অনন্তদেবের অনন্তত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আবার কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিতেন যে, আট-লাণ্টিকের পরপারে যদি কোন দ্বীপ বা দেশ থাকে, তবে তাহা জাপান, ভারতবর্ষ এবং এসিয়া মহাদেশের অন্যান্য বিভাগ। কেবল একমাত্র কল-ম্বসেব মনে ধারনা হইযাছিল যে, আট-লাণ্টিকের পরপারেও কোন না কোন দ্বীপ বা দেশ আছেই আছে। অনেকে টলেমী ও আরবীয় ভৌগলিকগণের পৃথিবীর গোলত্ব বিষয়ক মত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন কিন্তু কলম্বস টলেমীর উক্ত মতানুসারেই ভূমণ্ডলের এক খানি মানচিত্র অঙ্কিত করিলেন। তাহাতে দেখিলেন, ভূমণ্ডলকে দুইটী গোলকার্দ্ধে বিভক্ত করিলে এতাবৎকাল আবিষ্কৃত সমস্ত স্থলভাগই পূর্ব্বদিকস্থ গোল-কার্দ্ধের অন্তর্নিবিষ্ট হয়, পশ্চিম দিকস্থ গোলকার্দ্ধে আদৌ স্থল ভাগ থাকে নাই; ইহা তিনি অতি অসার ও অযৌক্তিক বলিয়াই ভাবিলেন। পরন্তু, এই বিভাগে

পূর্ব্ব গোলকার্দ্ধের আবিষ্কৃত স্থলভাগের প্রকৃতি বিশিষ্ট এক বিশাল মহাদেশ বর্ত্তমান আছে বলিয়া তাঁহার মনে কেমন একটী বিশ্বাস জন্মিল।

পশ্চিম গোলকস্থ নূতন মহাদেশের অস্তিত্ব বিষয়ে কলম্বসের সিদ্ধান্ত পরিশেষে সত্যে পরিণত হইল। কিন্তু তিনি যে অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই নূতন মহাদেশ আসিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা সত্য হয় নাই। এই ভ্রান্ত মতের বশবর্ত্তী হইয়া কলম্বস প্রথম আবিষ্কৃত সাগরীয় দ্বীপব্যূহকে "পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

কলম্বসের নূতন মহাদেশের অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস দৃঢ় হইবার আর কয়েকটি কারণ ছিল। লিসবন নগব হইতে একবার তিনি পর্ত্তুগীজ বণিকদিগের সহিত আজোর দ্বীপে গমন করেন। এই দ্বীপে অবস্থানকালে এক দিন কলম্বস দেখিলেন, আজোর দ্বীপের সৈকত ভূমিতে এমন অনেক নূতন নূতন বৃক্ষশাখা, লতা প্রভৃতি আটলাণ্টিকের পূর্ব্বাভিমুখীন স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছে যে, সেই সকল বৃক্ষশাখা ও লতা ঐ দ্বীপে জন্মায় না। তদ্ব্যতীত আজোর দ্বীপের বেলাভূমিতে দুইটী মৃত নরদেহ আবদ্ধ এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা ভাসিয়া আসিতে তিনি দেখিয়াছিলেন। উক্ত নরদেহের আকৃতির সহিত সেই দ্বীপের অধিবাসী অথবা প্রাচীন মহাদেশের কোন লোকের আকৃতির সৌসাদৃশ্য নাই। ইহাতে কলম্বস সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সেই নূতন মহাদেশে তাম্রবর্ণ কোন বর্ব্বর জাতির বাস আছে।

কলম্বস নূতন জগৎ আবিষ্কার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু কৃতসঙ্কল্প হইলে কি হইবে, কলম্বসের এমন অর্থবল নাই, যদ্দ্বারা এই বৃহৎ ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হন। কলম্বস হতাশ হইলেন না। তিনি আপনার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, কোন রাজশক্তির সহায়তা পাইলে অনায়াসে এই মহৎকার্য্য সংসাধিত হইতে পারে। কলম্বসের জন্মভূমি—ইটালী তৎকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কলম্বস পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক রাজার শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু সকলেই তাঁহার প্রার্থনা বাতুলের প্রলাপ বলিয়া ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেন।

স্বদেশীয় কোন রাজশক্তি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিলেন না দেখিয়া অগত্যা পর্ত্তুগালের অধীশ্বর অদ্বিতীয় জনের নিকট স্বাভিলাষ প্রকাশ করিলেন। পর্ত্তুগালেব রাজা এই ইতালীয় নাবিকের প্রার্থনায় কর্ণপাত কবিলেন বটে, কিন্তু কুসংস্কারাপন্ন ও কুটীলমতি সভাসদ্‌গণের কুমন্ত্রণার হাত এড়াইতে সমর্থ হইলেন না। সভাসদ্‌গণের মধ্যে অনেকেই কলম্বসকে উন্মাদ বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ কলম্বসের বিকৃত মস্তিষ্কের চিকিৎসার্থ রাজাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কলম্বস ধর্ম্মশাস্ত্রের অবমাননা কবিতেছে—মনে করিয়া অনেক কূপমণ্ডুক ধর্ম্মযাজক এই ইতালীয় নাবিকের প্রতি যথেষ্ট উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। সেণ্টপল্ প্রমুখ যিশুর দ্বাদশশিষ্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে খৃষ্টীয় সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন, আটলাণ্টিকের পর-

পারে যদি কোন দেশ থাকে, বাইবেল গ্রন্থে অবশ্যই তাহার উল্লেখ থাকিত। যখন তাহা নাই, তখন কলম্বসের প্রস্তাব—বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়াল ব্যতীত আর কি হইতে পারে? অথবা কলম্বস বাইবেলের এই মহাসত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া নাস্তিকবাদ প্রচারে উদ্যত হইয়াছে; কলম্বসের কঠোর শাস্তি বাঞ্ছনীয়—এই বলিয়া রাজাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। কলম্বসের প্রস্তাব যতই দেশ মধ্যে রাষ্ট্র হইতে লাগিল, অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোক সকল দলে দলে কলম্বসকে দেখিবার জন্য সমবেত হইতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের বিশ্বাস—আটলাণ্টিকের পূর্ব্ব বেলাভূমি হইতে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিলে সমগ্র জলরাশি এক দুর্দ্দান্ত দৈত্যের অধিকৃত। স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সাগরবক্ষে অসংখ্য দানব প্রহরী নিয়োজিত। তাহাদের নিঃশ্বাসে মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝটিকা সমুত্থাপিত হইয়া অনধিকার প্রবিষ্ট অর্ণবযান সকলকে আটলাণ্টিকের অতলস্পর্শ ভীষণ আবর্ত্তে নিমজ্জিত করিয়া দেয়। এই জন্য কোন নাবিক সেই ভয়াবহ দৈত্যের অধিকারের সীমামার্গ উল্লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয় না। ইহাদিগের বিশ্বাস—এই নিবীড় নীলাম্বুবক্ষে নীলাকাশে ছায়া পথের ন্যায় এক দিগন্ত প্রসারী জলপথ অবস্থিত। এইটি সেই দানবের সীমামার্গ। সুনিপুন নাবিক ব্যতীত কেহই এই সীমামার্গ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয় না। যখন কোন জলযান সন্নিহিত হয়, তখন এক দানব প্রহরী সেই সীমামার্গে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে থাকে, "Thus far shalt thou go and no further"—"খবর দার, ঐ পর্য্যন্ত, আর অগ্রসর হইও না।"

এইরূপ ভয়সঙ্কুল আবর্ত্তময় পশ্চিম পয়োধির পরপারে এক অনাবিষ্কৃত মহাদেশ আবিষ্কার করিবার জন্য এক ইতালীয় নাবিক রাজার নিকট সাহায্যপ্রার্থী; না জানি সেই নাবিক কেমন মহাবীর, এই ভাবিয়া জনসাধারণ কলম্বসকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া সমবেত হইতে লাগিল। যে সকল যুক্তিবলে কলম্বস সেই অনাবিষ্কৃত মহাদেশের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছিলেন, রাজার সভাসদ্‌গণের মধ্যে কয়েকজন তাই লইয়া তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন। অবশেষে আটলাণ্টিকের পরপারে দেশ থাকা অসম্ভব নহে, ইহাই সাব্যস্ত হইল। এই কয়েক ব্যক্তি গোপনে গোপনে এক খানি অর্ণবযান সুসজ্জিত করিয়া কয়েক জন নাবিককে সেই দেশ আবিষ্কারার্থ প্রেরণ করিলেন। এই অর্ণবযান আজোর দ্বীপ অতিক্রম করিয়া আরও পশ্চিমে আসিয়া উপনীত হইলে প্রবল কুজ্ঝটিকায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন হওয়ায় নাবিক আর অগ্রসর হইতে সাহসী না হইয়া অগত্যা সেই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইল। এই অর্ণবযানের অধ্যক্ষের কথায় পর্ত্তুগালের অধীশ্বর দ্বিতীয় জনের যাহা কিছু উৎসাহ ও অধ্যবসায় ছিল, তাহাও লোপ পাইল। তৎসঙ্গে কলম্বসের সকল আশা ভরসা লয় প্রাপ্ত হইল।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পূর্ব্বে কলম্বসের সহধর্ম্মিণী ফিলিপা পরলোক গমন করেন। লিসবন নগরে অবস্থান

কালে কলম্বস কিছু ঋণ করিয়াছিলেন। উত্তমর্ণগণ কলম্বসের সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় করিয়া লইবার জন্য আটক করিল। তিনি যে সকল মানচিত্র অঙ্কিত এবং সামুদ্রিক যন্ত্র সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও উত্তমর্ণগণের হস্তগত হইল। কলম্বস কঠোর কারাবাস হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সপ্তবর্ষ বয়স্ক পুত্র ডিগোকে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে নিশীথকালে লিসবন নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কপর্দ্দকশূন্য হস্তে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পথশ্রান্তিতে মৃতবৎ হইয়া পালসবন্দরের সমীপবর্ত্তী এক ধর্ম্মশালায় তিনি আতিথ্য স্বীকার করিলেন। এই ধর্ম্মশালায় কয়েক জন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। জুয়ান পীরেজ্ নামে জনৈক উদাসীন ইহাঁদিগের ধর্ম্মগুরু এবং রক্ষক। এই সদাশয় অতিথিপরায়ণ পীরেজ কলম্বস এবং তাঁহার পুত্রকে অতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন। পিতা-পুত্রের ক্ষুৎপিপাসা দূর করিবার জন্য অন্নপানীয় ও ক্লান্তি অপনোদন জন্য শয্যা প্রস্তুত হইল। সন্ন্যাসীদল আগ্রহের সহিত ইহাঁদিগের সেবায় নিয়োজিত হইলেন। শ্রান্তিদূর হইলে কথা প্রসঙ্গে এই ইতালীয় নাবিকের উচ্চাভিলাষ বিজ্ঞাপিত হইল। উদাসীন পিরেজ প্রীতি বিস্ফারিত নেত্রে কলম্বসের হৃদয়ের উচ্চভাব এবং অতীত জীবনীকাহিনী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কলম্বসের মনোভাব অবগত হইয়া উদাসীন পিরেজ উৎসাহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলেন, কলম্বসের এই মহৎ কার্য্যে তিনি যথাসাধ্য সহায়তা করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন। এই উদাসীন জুয়ান পীরেজ্ স্পেনের রাজ্ঞী ইজাবেলের দীক্ষা-গুরু এবং পুরোহিত। কলম্বসের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া ইজাবেলের বর্ত্তমান পুরোহিত ফার্ণান্দোদি তালাবীরাকে এক খানি পত্র লিখিলেন। কলম্বসকেও তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। স্পেনের রাজা তৎকালে সস্ত্রীক কর্ডোভা নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। কলম্বস যারপর নাই উৎসাহিত হইয়া কর্ডোভা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুত্র ডিগো মহাত্মা পীরেজের আশ্রয়ে রহিল। এই সময়ে স্পেনের সহিত মুরদিগের সমর সংঘটিত হয়। ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেল, এই দুর্দ্ধর্ষ মুরদিগকে সেস্থান হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য, কার্থেজ নগরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তালাবীরাকে পীরেজের পত্র প্রদত্ত হইল। তিনি পত্র পাঠ করিলেন, কিন্তু নিঃস্ব কলম্বসের হীনবেশ দেখিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন না। বরং কলম্বসের এই "চাট্‌গেঁযেভাব" দেখিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। কলম্বসের জন্য রাজা ও রাণীকে অনুরোধ করা দূরে থাকুক, এ সংবাদ তাঁহাদিগের কর্ণগোচরও করিলেন না। সুতরাং কলম্বসের অরণ্যে রোদন সার হইল। দেখিতে দেখিতে ১৪৮৬ খৃঃ অব্দের বসন্ত কাল অবসান হইল। বসন্ত সমাগমে কলম্বসের হৃদয় কাননে যে আশার কুসুম প্রস্ফুটিত হইযাছিল, তাহা নিদাঘের প্রখর তপন-তাপে ম্লান হইতে লাগিল। এই সময় হইতে দুই বৎসর কাল কলম্বস কিরূপ কষ্টে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে চক্ষের

জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়। দগ্ধ উদরের দায়ে কলম্বসকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। আমাদের দেশে ভিক্ষা যেমন অনায়াসলব্ধ, স্পেনদেশে কিন্তু সেরূপ নহে। গৃহাগত ভিক্ষার্থীকে বিমুখ করা—ভারতবাসী মহাপাপ বলিয়া মনে করে, কিন্তু স্পেন প্রমুখ পাশ্চাত্যদেশে ভিক্ষা দেওয়াকে মহাপাপ জ্ঞান করে। ঐতিহাসিক পণ্ডিত ওভিজ বলেন, কলম্বস ভিক্ষার্থে যে যে দ্বারে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থান হইতেই বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সে সকলদেশে তৎকালে যে সকল ধর্ম্মযাজক মহাত্মা যীশুর প্রেমমন্ত্র প্রচার করিতেছিলেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত কলম্বসকে আশ্রয় দেন নাই, অন্য পরে কা কথা! একদিন কলম্বস ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া, মহাত্মা পিরেজের সুপারিশ পত্র লইয়া, অতি হীনবেশে এক ধর্ম্মযাজকের গৃহে ভিক্ষার্থী হইয়া উপনীত হন। ধর্ম্মযাজক পত্রপাঠ করিয়া বলিলেন—"এই অজ্ঞাত নামা পিরেজকে আমি চিনি না, এখানে কিছু হইবে না বাপু, অন্যত্র দেখ।" কাজে কাজেই কলম্বস আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

এই রূপে কিছুকাল অতীত হইল। অবশেষে কলম্বস মানচিত্র অঙ্কন এবং খোদকের কার্য্য করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন ও তদ্দারা কোন রকমে অতি কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে লাগিলেন। এই সময়ে কলম্বস কর্ডোভা নগরে, ডোনা নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই গুণবতী রমণীর স্নেহে, কলম্বসের মনোবেদনা কথঞ্চিৎ উপশমিত হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে, কলম্বসের এই পত্নীর গর্ভে ফার্ণাণ্ডো নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। কার্য্যগতিকে টলেডো নগরের প্রধান ধর্ম্মযাজক মেণ্ডোজার(Mendoza) সহিত কলম্বসের আলাপ হয়। এই ধর্ম্মযাজক মেণ্ডোজা, একদিন কলম্বসকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় গমন করেন এবং রাজা ও রাণীর সহিত আলাপ করিয়া দেন। এই সময়ে কলম্বস বলিয়াছিলেন—"এক্ষণে আমি আর অসার নহি; আমি এক্ষণে বিশ্বশিল্পীর হস্তের ক্রিয়াশীল যন্ত্র; তিনি ইহার দ্বারা একটী মহৎ কার্য্য সংসাধিত করিবেন, এই জন্য ইহা নির্ব্বাচিত হইয়াছে।" ফার্ডিনাণ্ড, কলম্বসের প্রস্তাবে সমধিক উৎসাহিত না হইলেও, ইজাবেলা উৎসাহিতা হইয়াছিলেন। কলম্বসের দ্বারা মহান্ পরমেশ্বর যে এক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন, স্পেনের অধীশ্বরী ইজাবেলা তাহার কতক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইজাবেলা এই ইতালীয় নাবিকের যথেষ্ট সমাদর ও সংবর্দ্ধনা করিলেন এবং কলম্বসের প্রস্তাব সংসাধিত হইতে পারে কিনা, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন—এই কথা বলিয়া রাণী তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। পণ্ডিত মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া, রাণী ইজাবেলা এক মন্ত্রণাসভা সংগঠন করিলেন। কলম্বসের প্রস্তাব আলোচনা করিবার ভার এই সভায় অর্পিত হইল। অধিকাংশ সভ্যের মতে স্থির হইল, এরূপ কার্য্যে রাণীর হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। কারণ, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করা হয়। পৃথিবী যদি গোলাকার

হয়, তবে কলম্বসের মতে পশ্চিম গোলকার্দ্ধে দেশ থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে পৃথিবী যখন গোলাকার নয়, তখন কলম্বসের কাল্পনিক মতের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা বাতুলতা মাত্র। অতএব এরূপ অধর্ম্মজনক কার্য্যে রাণী ইজাবেলার হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত নয়। ডিগো ডি ডীজা নামক জনৈক সভাসদ কলম্বসের মতের পোষকতা করিয়াছিলেন। সুতবাং এই বিষয়ে কোন প্রকার স্থির মীমাংসা না হওয়ায় কলম্বসের প্রস্তাব স্থগিত রহিল। কলম্বস আবার আশা ও নিরাশার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। যাহা হউক, কলম্বস রাণী ইজাবেলার সহৃদয়তার সুশীতল ছায়া লাভে বঞ্চিত হইলেন না। রাণীর আদেশে কলম্বসের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজা ও রাণী দরবার উপলক্ষে যে যে স্থানে যখন অবস্থান করিতেন, কলম্বসকেও সেই সেই স্থানে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল। এদিকে প্রধূমিত মুরীয় সংগ্রামের শেষ শিখা অন্তর্হিত হইল। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিনে মহা সমারোহে ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলা সদলবলে গ্রাণেডা নগরে সমাগত হইলেন। রাজ্য মধ্যে পূর্ণ শান্তির অটল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। পুনর্ব্বার কলম্বসের প্রস্তাব লইয়া রাজসভায় আলোচনা ও বাক্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। সভাসদ্‌গণ সকলেই কলম্বসের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। কাজে কাজেই রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড কলম্বসের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইলেন। রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড কলম্বসকে নৈরাশ সাগরে ভাসাইলেন বটে কিন্তু তাঁহার পশ্চাতে যে এক প্রবল নারীশক্তি কার্য্য করিতেছে, রাজা তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। রাণী ইজাবেলার আগ্রহাতিশয় সন্দর্শন করিয়া ফার্ডিন্যাণ্ড অগত্যা কয়েকখানি অর্ণবযান নবজগৎ আবিষ্কারের জন্য প্রেরণ করিবেন—এই বলিয়া কলম্বসকে আশ্বস্ত করিলেন। কলম্বস কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন বটে কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, তিনিও তত ক্ষুব্ধ হইতে লাগিলেন। কলম্বসের আশা কবে ফলবতী হইবে, তাহা বিধাতাই জানেন। দেখিতে দেখিতে বহুদিন অতীত হইয়া গেল, রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড আর কোন কথা উল্লেখ করিলেন না। কলম্বস ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে রাজবাটী পরিত্যাগ করিলেন এবং পুনর্ব্বার পালস বন্দরে উদাসীন পিরেজের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। এবার মহাত্মা পিরেজ স্বয়ং স্বীয় শিষ্য রাজ্ঞী ইজাবেলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; ফল ফলিল। রাজ্ঞী ইজাবেলা স্বয়ং এই মহৎ কার্য্যে উদ্যোগিনী হইবেন বলিয়া স্বীকৃতা হইলেন।

কিন্তু এবার এক নব অন্তরায় সমুপস্থিত হইল। কলম্বস বলিলেন, যে নবজগৎ আবিষ্কার করিতে যাইতেছি, তাহা স্পেন রাজ্যভুক্ত হইবে বটে, কিন্তু আমি তথায় স্পেনের রাজপ্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিব। এবং সেই রাজ্য হইতে যাহা কিছু রাজস্ব লব্ধ হইবে, আমি তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করিব। প্রথমতঃ ফার্ডিন্যাণ্ডের রাজদরবার কলম্বসের এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। অবশেষে

কলম্বস রাজশক্তির সহায়তার আশা জলাঞ্জলি দিয়া ফ্রান্সের অভিমুখে গমন করিলেন। ইতিপুর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতা বারথলোমিয় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারীনগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। কলম্বস ফ্রান্সের রাজশক্তির শরণাপন্ন হইবার জন্য ফ্রান্স অভিমুখে প্রস্থান করিলেন দেখিয়া রাজ্ঞী ইজাবেলা এক খানি পত্র লিখিয়া কলম্বসের নিকট এক জন দূত পাঠাইলেন। দূত সেই পত্র খানি পথিমধ্যে কলম্বসের হস্তে প্রদান করিল। কলম্বস পত্র পাঠ করিয়া আবার ইজাবেলার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। ১৪৯২ খৃঃ অব্দের ১৭ই এপ্রেল এই নগরে ফার্ডিন্যাণ্ড, ইজাবেলা ও কলম্বসের মধ্যে একখানি সম্মতি পত্র (Agreement) লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয়। তাহাতে এই কয়েকটি কথার উল্লেখ ছিল;—কলম্বস আটলাণ্টিক মহাসাগরের অন্তর্নিবিষ্ট সমস্ত অর্ণবযানের অধ্যক্ষের কাজে বরিত হইবেন। কাসটাইল নগরের সর্ব্বোচ্চ পোতাধ্যক্ষের সমস্ত অধিকার, উপাধি ও সম্মান লাভ করিবেন। আবিষ্কৃত দেশ সমূহের শাসনকর্ত্তা হইবেন। নবাবিষ্কৃত দেশে যে সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্য, মণিমাণিক্য প্রবালাদি এবং অপরাপর পণ্য দ্রব্য যাহা কিছু প্রাপ্ত হইবেন, কলম্বস তাহার এক দশমাংশ গ্রহণ করিবেন। স্পেনে যে যে বিভাগের অধিবাসিবর্গ সেই নবাবিষ্কৃত দেশসমূহে বাণিজ্যার্থ গতায়াত করিবে, তাহাদিগের জন্য সেই সেই বিভাগে কলম্বস বিচারক নিয়োজিত করিতে পারিবেন। এইবার এবং অন্য অন্য বারে সমুদ্র যাত্রার জন্য যাহা কিছু ব্যয় হইবে, কলম্বস তাহার দুই আনা রকম প্রদান করিবেন। পালস বন্দরে তিন খানি অর্ণবযান সুসজ্জিত হইল। কিন্তু এবারেও অপর একটী অন্তরায় দেখা দিল। কেহই কলম্বসের সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত নহে। পালস বন্দরে সুপ্রসিদ্ধ পিনজন পরিবারের বাস। মার্টিন আলঞ্জো পিনজন, এবং ভিন্‌সেণ্ট ইয়ানেজ পিনজন নামে দুই সহোদর, কলম্বসের সহযাত্রী হইতে স্বীকৃত হইলেন। কলম্বস স্বয়ং সাণ্টা মেরিয়া (Santa Maria) নামক পোতের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন এবং পিণ্টা (Pinta) ও হীনা নামক অর্ণবযানের ভার, আলঞ্জো (Alonzo) এবং ইয়ানিজ পিনজনের (Yanez Pinzon) উপর অর্পিত হইল। অনেক গোলযোগের পর, অপরাপর লোকও সংগৃহীত হইল। তিনখানি অর্ণবযানে সর্ব্বসমেত ১২০ জন লোক প্রেরিত হইয়াছিল।

১৪৯২ খৃঃ অব্দের ৩রা আগষ্ট, পালস বন্দরে, কলম্বস এবং তদনুযাত্রী দলের বিদায়ের দিন। পালস বন্দর লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলে অশ্রুপূর্ণ লোচনে পোতের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে অর্ণবযান দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইয়া গেল। সকলে ক্ষুণ্ণ মনে আত্মীয়বর্গের নিকট চির বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইল। এদিকে নাবিক দল, জীবনের আশা জলাঞ্জলি দিয়া স্ব স্ব জন্মভূমির নিকট—তাহাদিগকে আটলাণ্টিকের ভীষণ আবর্ত্তে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে স্থির করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিল।” স্পষ্ট স্বরেই কহিল “বিকৃত-মস্তিষ্ক

জনৈক ইতালীয় নাবিকের কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া, এবং স্বীয় দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের জন্য, রাজ্ঞী ইজাবেল এতগুলি মহাপ্রাণীর নিধন সাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন; আমরা দুর্ব্বল প্রজা, দুর্ব্বলের উপর সবলের এই যে অত্যাচার, ইহার কি কোন প্রতীকার হইবে না! হে ভগবান্! তুমি যদি যথার্থ ন্যায়বান্ ও দয়ালু হও, তবে ইহার বিচার করিও। আমরা অদ্য স্ত্রী-পুত্র, পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন—সকলকে পরিত্যাগ করিয়া জন্মভূমির নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলাম।

দেখিতে দেখিতে অর্ণবযান, কেনেরী দ্বীপ অতিক্রম করিল। এতক্ষণ নাবিকদল কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু যখন টেনেরীফ শৃঙ্গ তাহাদিগের নয়ন পথে পতিত হইল, তখন তাহারা একে বারে অধীর হইয়া পড়িল। তাহাদিগের বিশ্বাস—এই টেনেরীফের পশ্চিমে আর স্থল ভাগ নাই। মৃত্তিকা দর্শন আর তাহাদিগের ভাগ্যে ঘটিবে না। ক্রমশঃ অর্ণবযান পশ্চিম আটলাণ্টিকের বিশাল বক্ষে ভাসিতে লাগিল। চারিদিকে দিগন্তপ্রসার জলরাশি ব্যতীত আর কিছুই নয়ন পথে পতিত হয় না। আট্‌লাণ্টিকের উত্তাল তরঙ্গে জাহাজ একবার উঠিতে একবার পড়িতে লাগিল। অর্ণবযানের আন্দোলনে নাবিকদলের মধ্যে, প্রথম প্রথম বিবমিষা অতিশয় প্রবল হইয়া পড়িল। কলম্বস্ পূর্ব্বে জানিতেন নাবিকদলের মধ্যে নানা প্রকার সামুদ্রিক রোগ দেখা দিবে। সেই জন্য নানা প্রকার ঔষধ সঙ্গে লইয়াছিলেন। ঔষধের দ্বারা তাহাদিগের বমনেচ্ছা দূর হইল। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই সামুদ্রিক আব-হাওয়া তাহাদিগের সহ্য হইয়া গেল। নব-জগৎ তাহাদিগের নয়ন পথে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত কলম্বস্ বিষম সঙ্কটে কালযাপন করিয়াছিলেন। নিরতিশয় ভীত নাবিকগণ পূর্ব্বাভিমুখে জাহাজের গতি ফিরাইবার জন্য কলম্বস্‌কে অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু যখন দেখিল,—কলম্বস্ গতি ফিরাইতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন সকলে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

ক্রমশঃ—

অভাগিনীর আত্মকথা।

১ম খণ্ড ৬৬৪ পৃষ্ঠার পর।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী-সেনা।

সন্ন্যাসী-সেনা কি, পূর্ব্বে তাহা কখনও শুনি নাই। দিদির সঙ্গে অনেক কথা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। সেই জন্য মনে করিলাম যে, হয়ত তিনি তাহা জানেন না; কিন্তু আহারাদির পর তিনি বলিলেন, "আজ আর একটা নূতন দৃশ্য দেখিতে পাইবে,—সন্ন্যাসী-সেনা কখনও দেখ নাই; আজি তাহা দেখিবে।"

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম "দিদি! সন্ন্যাসী-সেনা কি?"

দিদি। "মায়ের এক সহস্র ভক্ত আছেন, তাঁহারাই সন্ন্যাসী।"

"তাঁহারা কি করেন?"

"দেশে দেশে মায়ের মহিমা প্রচার করিয়া বেড়ান।"

"তাঁহাদিগকে সেনা বলা হয় কেন?"

"মায়ের চরণে তাঁহারা সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছেন; এই জন্য তাঁহারা সন্ন্যাসী। মায়ের জন্য তাঁহারা জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, এই জন্যই তাঁহারা সৈন্য।"

"তাঁহাদের কি রকম পোষাক?"

"গেরুয়া বসন।"

"সৈন্য হইলে অস্ত্র আবশ্যক, তাঁহাদের কিরূপ অস্ত্র?"

"ত্রিশূল।"

"রূপার না লোহার?"

"লোহার।"

"তবে আমি রূপার ত্রিশূল পাইলাম কেন?"

"উপযুক্ত হইলে সোণার ত্রিশূল পাইবে" বলিয়া নিজের সোণার ত্রিশূল বাহির করিলেন, বলিলেন, "এই দেখ আমার সোণার ত্রিশূল; তুমিও এই সোণার ত্রিশূল পাইতে চেষ্টা কর।"

"বাবার কিসের ত্রিশূল?"

"সোণার ত্রিশূল ও সোণার চক্র।"

শুনিয়া একটু আনন্দ হইল, ভাবিলাম "বাবা এই অল্প সময়ের মধ্যে এত উপযুক্ত হইয়াছেন?" প্রকাশ্যে বলিলাম "এই ত্রিশূল কিসের জন্য?"

"সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্য।"

"কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ত ঈশ্বরের কাজ?"

"হাঁ। ঈশ্বর অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন; আমরা ক্ষুদ্র মানব, আমাদের ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে যতটুকু পারি, ঈশ্বরের কাজের অনুকরণ করি।"

"তবু বুঝিতে পারিলাম না। খুলিয়া বল।"

"সন্ন্যাসধর্ম্মে নূতন ব্যক্তিকে দীক্ষিত করা—সৃষ্টি, তাহা রক্ষা—স্থিতি এবং সন্ন্যাসীদিগের শত্রু-নিপাতই—সংহার।"

যত শুনিতে লাগিলাম, ততই সন্দেহ বাড়িতে লাগিল, কিন্তু এখন সকল কথা জানিয়া লইতে হইবে; সেইজন্য জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাদের আবার শত্রু কে?"

"শত্রু আছে। এজগতে সাধুলোকেরই অনেক শত্রু, সৎকার্য্যে বহু বিঘ্ন। শত্রু আছে, পরে জানিতে পারিবে।"

"দিদি! আবার সেই কথা, আমাকে আর অন্ধকারে রাখিও না।"

"একদিনে সকল কথা বলিলে ভয় পাইবে, সেইজন্য বলিতেছি ক্রমে জানিতে পারিবে।"

"দিদি, তুমি বলিলে, মায়ের এক হাজার ভক্ত আছেন, তাঁহারাই সন্ন্যাসী; এত লোক কোথায় থাকে?"

"এই আশ্রমের ভিতর; ইহাতে দশ হাজার সন্ন্যাসীর সমাবেশ হয়।"

শুনিয়া চমকিত হইলাম, ভাবিলাম "এত সন্ন্যাসী কিসের জন্য?"

দিদি আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "দশ সহস্র সন্ন্যাসী নহিলে আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।"

"কি কার্য্য?"

"মায়ের কার্য্য।"

"কি তাহা?"

"ব্রত-উদ্‌যাপন।"

"কি ব্রত?"

"অনন্ত ব্রত।"

"অনন্ত ব্রতের সহিত মায়ের কি সংস্রব?"

"মা ছাড়া বাবা হইতে পারেন না। যিনি পিতা তিনি আবার পুত্ররূপে মাতার গর্ভে প্রবেশ করিয়া থাকেন। এইজন্য রমণী জননী; এইজন্য আদ্যাশক্তি মহামায়া আদি পুরুষ মহাদেবকে গর্ভে ধারণ করিয়া পরে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পুরুষ নিশ্চেষ্ট; প্রকৃতিই—চেষ্টা, শক্তি—চৈতন্য। শক্তিরূপা জননীর কাছে শক্তি লইয়া অনন্ত দেবের ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে।"

এই সকল কথায় ক্রমে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। দিদি বলিলেন "আর বিলম্ব করিলে চলিবে না; সন্ন্যাসীসেনা ক্রমে ক্রমে জড় হইতেছে; চল আমরা দেখিতে যাই।"

দিদির সঙ্গে চলিলাম। তিনি নিজের সোণার ত্রিশূল লইলেন, আমার ত্রিশূল আমার সঙ্গে রহিল। এবার আমরা অট্টালিকার পশ্চাদ্দিকে যাইলাম। সেই দিকে একটা প্রকাণ্ড ময়দান। সেই ময়দানে সন্ন্যাসী-সেনা জড় হইতেছিল। অট্টালিকার দুই তিন রশি দূরে আর একটা অট্টালিকা;—সেটা কিন্তু বাড়ীর মত নহে। খুব লম্বা, কিন্তু অর্দ্ধচন্দ্রাকার, দোতলার বেশী উঁচু নহে। ছাদে উঠিবার তিনটী সিঁড়ি, সকলগুলিই বাটীর পশ্চাৎদিকে; সকল সিঁড়িরই দরজা চাবি বন্ধ। দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, সেটী সন্ন্যাসী-দিগের বারিক। প্রধান সেনানী ভিন্ন আর কেহই সেই ছাদে উঠিতে পারে না।

আমরা বারিকের কাছে আসিলে বাবা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দিদি সিঁড়ির চাবি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন "আমি এখন চলিলাম, একটু পরে দেখিতে পাইবে।" বলিয়া দ্রুত-পদে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মুখপানে

চাহিয়া দেখিলাম, তাহা স্থির ও গম্ভীর। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "দিদি কোথা গেলেন?"

বাবা বলিলেন "উনিই সমস্ত সেনার নায়িকা।"

"আমি বুঝিতে পারিলাম না, নায়িকা কি?"

"উঁহারই হস্তে সমস্ত সেনা পরিচালনের ভার।"

আমি বিস্মিত হইলাম, "সে কি! স্ত্রীলোক এত বড় সেনা দলের কর্ত্তা! কি করে দিদি চালান?"

"দেখিতে পাইবে, ছাদে উঠিলেই সমস্ত দেখিবে।"

"বাবা! দিদি তবে সামান্যা নহেন!"

"না! উনি সাক্ষাৎ ভগবতী শক্তিরূপিণী। উঁহার তুল্যা আর দুইটী রমণী পাইলে আমরা ত্রিভুবন মাতাইয়া তুলি।" বলিয়া বাবা অসম্পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন।

সে দৃষ্টির ভাব আমি বুঝিতে পারিলাম। মনে গৌরব ও হীনতা মিশিয়া একটী অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। গৌরব এই জন্য যে, দিদি অত বড় লোক হইয়াও যখন আমাকে এত যত্ন করিতেছেন এবং আমি যখন প্রথম হইতেই রূপার ত্রিশূল পাইয়াছি তখন চেষ্টা করিলে শীঘ্র হয়ত দিদির মত হইতে পারিব। হীনতা এই জন্য যে, দিদি ও আমি—আকাশ পাতাল তফাৎ। অত উদ্যম, অত উৎসাহ, অত একাগ্রতা কি আমার জীবনে কখনও হইবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাবার সঙ্গে সঙ্গে ছাদে গিয়া উঠিলাম। এত দিনের পর অনন্ত আকাশ একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইলাম। এত দিন যেন পিঞ্জরে আবদ্ধ ছিলাম। দিদির অনুগ্রহে সময়ে সময়ে ঘরের বাহিরে আসিতাম বটে, কিন্তু বাটীর উপরে, চারিদিকে কি দৃশ্য আছে, তাহা তখন দেখিতে পাইনাই। সর্ব্বদাই মনে হইত, যেন আমরা কুয়ার বেঙ। আজ বিস্তৃত ছাদের উপর উঠিয়া প্রাণ ভরিয়া একবার চারিদিক দেখিয়া লইলাম। ছাদে উঠিবার পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল যে, বাড়ীটী অর্দ্ধচন্দ্রের মত, কিন্তু ছাদে উঠিয়া দেখিলাম সমস্ত বাবিকটী যেন একটী প্রকাণ্ড অষ্টদল পদ্ম। বাড়ীর চারিদিকে নবনিবিড় মহাবন। অসংখ্য বাঘভালুকের আবাস। সুতরাং সে বনের মধ্যে হঠাৎ কেহই প্রবেশ করিতে সাহস করে না; করিলে প্রথমে ব্যাঘ্র পরে সন্ন্যাসীদিগের হাতে পড়ে। সন্ন্যাসীরা তাহাকে ধরিয়া আনিয়া গ্রেপ্তার করিয়া রাখে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাকে সন্ন্যাসী করিবার চেষ্টা করে।

অষ্টদলের মাঝখানে বীজকোষের মত গোল অনেকটা খোলা জায়গা। সেটাও সামান্য প্রশস্ত নয়! দশ হাজার সৈন্য তাহার মধ্যে কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে। সৈন্যদিগের দিকে দৃষ্টি পড়িবা মাত্র বাবা নিজের ত্রিশূল ও চক্র উদ্যত করিয়া "ব্যোম্ কালী" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গোধূলির প্রাক্কালীন সূর্য্যের অনুগ্র কিরণে সোণার চক্র ও ত্রিশূল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর থামিতে না থামিতে নীচে দশ হাজার সন্ন্যাসীর সেইরূপ প্রচণ্ডস্বরে "ব্যোম্ কালী" রব প্রতিধ্বনিত হইল।

প্রতিধ্বনি ব'রিকের আট হাজার গৃহ কাঁপাইয়া নিবিড় মহাবনে নিমগ্ন হইল।

বাবা বলিলেন "মা! ঐ দেখ সন্ন্যাসী-সেনা, মাথায় জটাভার, গলে রুদ্রাক্ষ-মালা, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম; হাতে ভীম ত্রিশূল। ত্রিশূলের তিনটী তীক্ষ্ণ ফলকের নীচেই নীল ধ্বজা; দেখ! দেখ, নীল ধ্বজার উপর ত্রিশূলের ফলকগুলি সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, যেন নিবিড় নীল মেঘের উপর কোটী কোটী বিদ্যুৎ খেলা করিতেছে।"

বাবার কথা শেষ হইতে না হইতে বিকট তূর্য্য ধ্বনি শুনিতে পাইলাম; অমনি সন্ন্যাসীগণ "ব্যোম কালী" বলিয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহাদেব হাতের ত্রিশূলগুলির শিখা যেন গগন স্পর্শ করিল। কে সেই তূর্য্যধ্বনি কবিল, যেমন দেখিতে যাইব, অমনি এক অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তি অশ্বারোহণে সেই রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইল। তাহার চুল আলুলায়িত, মাথার সম্মুখে মুকুটের ন্যায় সোণার কি একটী পরা ছিল; গলা, বাহু ও প্রকোষ্ঠে রুদ্রাক্ষ, পদ্মবীজ ও তুলসী মালা, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম, পরিধানে রক্তাম্বর। তাঁহার প্রকাণ্ড অশ্বটী তাঁহাকে পৃষ্ঠে করিয়া ঈষৎ নম্রমুখে যেন ধীরে ধীরে নাচিতেছিল। তাঁহার পৃষ্ঠে প্রকাণ্ড তূণ, বাম স্কন্ধে প্রকাণ্ড ধনু এবং বাম হস্তে ভীম ত্রিশূল; দক্ষিণ হস্তে ছুরি। তাঁহার ভীম গম্ভীর মুখমণ্ডলের সম্মুখে সূর্য্যের তেজ যেন মলিন হইয়া পড়িল; তিনি রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইবা মাত্র সন্ন্যাসীরা ত্রিশূল ও মস্তক নমিত কবিয়া আবার তখনই উদাত্ত করিল; আবার তখনই তূর্য্যধ্বনি হইল; অমনি চারিদিক হইতে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। সেই বাজনার তালে তালে তাঁহার ঘোড়াটী নাচিতে লাগিল। একি দেবী দুর্গা দেবসেনার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ভক্তিভরে হৃদয় আপ্লুত হইল, সেই ছাদ হইতে প্রণাম করিলাম, বলিলাম "দিদি! তোমারই জন্ম সার্থক, রমণী যে শক্তি-রূপিণী, আজ আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম।" বলিতে বলিতে দুটী চক্ষু জলে আচ্ছন্ন হইল; আমি ভক্তি ও আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলাম।

বাজনাব সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী-সেনা নাচিতে লাগিল, নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া ফিবিয়া, কখন চক্রাকারে, কখনও নদী স্রোতের ন্যায়, তর তর বেগে নাচিতে নাচিতে ছুটিল; এই পশ্চাৎ, এই সম্মুখ এই পার্শ্ব; কখন শুইয়া, কখন বসিয়া, কখন হাঁটু গাড়িয়া। কতবার কত-রকম দেখিলাম, মনে নাই। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ নিমেষ মধ্যে সমস্ত সৈন্য কোথায় অদৃশ্য হইল; আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না, সেই বিস্তৃত রঙ্গভূমি খালি পড়িয়া রহিল। মাথা ঘুরিয়া গেল; মনের মধ্যে ঝড়ের মত কত চিন্তা মুহুর্মুহু আঘাত করিতে লাগিল। বিস্ময়ে কৌতূহলে স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা।

সে দিন সেই সন্ন্যাসিসেনা দেখিয়া মনের মধ্যে কি যে একটা গভীর ভাবের উদয় হইল, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। শূন্য মনে কত কি ভাবিলাম; তন্মধ্যে প্রধান চিন্তা এই যে, এসব কিসের জন্য ? এই ঘরবাড়ী, সৈন্য সামন্ত এত আড়ম্বর, আয়োজনের উদ্দেশ্য কি ? উহারা কি করিবে ? ফলকথা এই চিন্তাই উঠিতে লাগিল! বাবার সঙ্গে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম; সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আসিলাম, কেন না আমারই সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে হইবে। আসিয়া দেখিলাম দিদি সন্ধ্যার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। মনের আবেগে তাঁহার চরণ ধূলি না লইয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহাতে দিদি সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হইলেন, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু একটু যেন সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন ভগিনি! আমি সামান্যা স্ত্রীলোক; আমি তোমার প্রণম্যা নহি; যিনি জগতের বন্দনীয়, সেই ভগবতী আদ্যাশক্তিরই পূজা করিবে।"

আমি বলিলাম, "তুমি আমার গুরু, দিদি ও রক্ষাকর্ত্রী; তোমার পদধূলি লইব না কাহার লইব ? অধিরাজ বলিয়াছেন, কৃতজ্ঞ হইবে; কৃতজ্ঞতা না থাকিলে মানুষ পশুর সমান।" দিদি আর কিছুই বলিলেন না; সন্ধ্যায় নিমগ্ন হইলেন। আমিও তাঁহার দেখা দেখি সন্ধ্যায় বসিলাম; কিন্তু তাঁহার একাগ্রতা দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। সেই দিনকার একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি; তাহাতেই বুঝিতে পারিবে। আমি সন্ধ্যায় বসিলে ঘরের মধ্যে একটা কিরকম ফোঁস ফোঁস শব্দ হইল; আমি চমকিয়া দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড গোখুরা সাপ চক্র তুলিয়া আলোর সম্মুখে দুলিতেছে; আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সাপটা তাহার পরেই একটু পাশ পানে গেল এবং দিদির আসনে উঠিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে উঠিল; দিদির সাড়া শব্দ নাই—তিনি নিস্পন্দ। সাপটা ক্রমে তাঁহার কাঁধে চড়িল, দেখিতে দেখিতে কাল চুলের মধ্যে মিশিয়া গেল; আমার চীৎকার শুনিয়া একটা দাসী ছুটিয়া আসিল; আমি সভয়ে দিদির মাথায় সাপ ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলাম। দাসী একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে দিন আমার আর সন্ধ্যাহ্নিক হইল না। সাপটা দিদির মাথার উপর ফণা তুলিয়া একবার শূন্যে মাথা দোলাইল; তাহার পর যেন দুঃখিত হইয়া নম্রমুখে নামিয়া চলিয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

আমি ভাবিলাম, দিদি তবে সামান্যা নহেন। হায়, আগে আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই; যে দিন তাঁহাকে প্রথম দেখিলাম সেই দিনের সেই ভুবনমোহিনী রূপ মাধুরি দেখিয়া আমার মনে কত সন্দেহ হইয়াছিল; তাহার

পর সেই সকল ভাবনার বিষয় আন্দোলন করিয়া মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিলাম। হায়! যদি সেই প্রথম দিন হইতে দিদিকে চিনিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার আর এত দুর্দ্দশা হইত না। কিন্তু কি করিয়াই বা চিনিব? সকল বিষয়েরই এক একটা উপযুক্ত কাল আছে, অধিকার আছে। আমার তখন সেই অধিকার জন্মে নাই, সেই কালও উপস্থিত হয় নাই, শত চেষ্টা করিলেও শত লোকে চিনাইয়া দিলেও তাঁহাকে চিনিতে পারিতাম না।

সাপটা চলিয়া গেলে অনেকক্ষণ পরে দিদির সন্ধ্যাহ্নিক শেষ হইল; তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার মুখটা এরূপ দেখিতেছি কেন? যেন কি একটা ভয়ে বিহ্বল রহিয়াছ। কেন? কি হইয়াছে?"

আমি বলিলাম "দিদি! সাধে তোমার পায়ের ধূলা নিতে ইচ্ছা হয়? তুমি কি কিছুই জানিতে পার নাই?"

"কৈ? কিছুই ত জানি না! কেন কি হইয়াছে?"

"ও বাবা! একটা প্রকাণ্ড সাপ তোমার গায়ে মাথায় উঠিল, তাহা তুমি কিছুই বুঝিতে পারিলে না?"

দিদি হাসিযা বলিলেন 'ওঠা দংশন করিলেও জানিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। ভগিনি! মায়ের কাজ করিতে গেলে কত বিষধরের মুখের ভিতর হাত দিতে হইবে!"

আমি বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। সন্ধ্যাহ্নিকের পর দুই চারিটী ফল আহার করিলাম। দিদি সে রাত্রে কিছুই খাইতে চাহিলেন না; রাত্রে প্রায়ই তিনি কিছু খান না, সেই দিনান্তে অপরাহ্ণে একবার হবিষ্য, তাহাতেই অঙ্গের লাবণ্য কত! জল খাবার পর দুইজনে একত্রে শয়ন করিলাম। এখন আর আমাদের সেই দুগ্ধফেননিভ শয্যা নাই; আমরা সেই দোতালা ঘরে থাকি না; নীচে মাটীর ঘরে শয়ন করি। দুই-জনে দুইখানি কম্বল পাতিয়া বিনা বালিসেই শুইয়া থাকি। প্রথম প্রথম আমার একটু কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু দিদির অম্লান বদন ও গভীর নিদ্রা দেখিয়া আমার সে কষ্টটুকু ক্রমে দূর হইল। উভয়ে শয়ন করিলে আমি দিদিকে বলিলাম দিদি! তোমার জোড়া ত আর জগতে দেখিতে পাইনা। তোমাকে আসল ধবল সুকোমল পালঙ্কে শয়ন করিতে দেখিয়াছি, কোন বিকার দেখি নাই, এখন এই কঠোর কম্বলে দারুণ গ্রীষ্মের সময় বিনা বালিসে সুখে ঘুমাইতে দেখিয়াছি, এমন সোণার অভ্যাস ত কখনও কোথাও দেখি নাই।"

দিদি বলিলেন "ভগিনি! অভ্যাস মানুষের আয়ত্ত; মুনিরা যে অনাহারে শত শত বৎসর থাকেন তাহাও অভ্যাস। একাগ্রতা না থাকিলে অভ্যাস হয় না। একাগ্রতা থাকিলে মানুষ দেবতা হইতে পারে। একাগ্রতার বলে রাজা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, দেবতাদিগকে অবহেলা করিয়া নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন; একাগ্রতা ছিল বলিয়া শ্রীরাম হরধনু ভাঙ্গিয়া ছিলেন, অর্জ্জুন লক্ষ ভেদ করিয়াছিলেন। একাগ্রতা বলে মানুষ পাষাণ ভেদ করিতে পারে, বিদ্যুতের ন্যায়, মেঘের কোলেও নৃত্য করিতে পারে। সেই জন্য আগে একাগ্রতা,

তাহার পর সাধনা। একাগ্রতা না থাকিলে সাধনা হয় না। একাগ্রতাই প্রধান ও প্রথম শিক্ষা। যদি মায়ের সন্তান হইবে, তুমি আগে চিত্ত স্থির করিতে শিখ; নতুবা সব পণ্ড হইবে।”

চিত্তস্থির করিবার অনেক উপায় বাবা ও দিদি আমাকে বলিয়াছিলেন; চিত্তস্থির করিতে না পারিলে সন্ন্যাসী সেনায় স্থান পাইবে না, তাহাও একরূপ স্পষ্টরূপে ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। দীক্ষার দিন হইতে আমি সেই সকল উপায় শিক্ষা করিতে লাগিলাম; প্রথম প্রথম বেশ মনঃসংযোগ হইল। তাঁহারা যাহা কিছু শিখাইলেন, আগ্রহের সহিত শিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দিদির ক্ষমতার কথা কি বলিব! তিনি মূর্ত্তিমতী সিদ্ধি। তিনি যখন গম্ভীরভাবে গীতার কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা করিতেন, তখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ কমলা বলিয়া জ্ঞান হইত। আমি শৈশব হইতে কিছুই লেখা পড়া শিখি নাই, তথাপি দিদির গীতা ব্যাখ্যা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতাম। ভগবানের এক একটী কথা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন, সহজ দৃষ্টান্ত ও উপায় দ্বারা ব্যাখ্যা করিতেন; এই সকল কাজ এত সরল ও বিশদ যে, একজন চাষাও অনায়াসে বুঝিতে পারিত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সাধনা।

দিদি বলিলেন অগ্রে দীক্ষা, তাহার পর শিক্ষা; শিক্ষার পর সাধনা। সাধনা না হইলে সিদ্ধি হয় না। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে আমাকে যোগের অঙ্গ ও প্রকরণ শিখাইতেন; দিবাভাগে গীতার সহিত মিলাইয়া সেই গুলি বুঝাইয়া দিতেন। এইরূপে সাধনা হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চার বৎসর অতীত হইয়া গেল। আমার বোধ হইল যেন আমি জগতের আর এক প্রান্তে আসিয়া বসিয়াছি; সেখানে সকলেই যোগী; সেখানে শোক তাপ নাই, জ্বালা যন্ত্রণা নাই; বৈধব্য নাই, বন্ধুবিয়োগ নাই। যেন সকলেই চিরসুখে বিরাজ করিতেছে। সকলেই মায়ের সেবায় নিযুক্ত, সকলেই অনন্ত মহাদেবের পূজায় নিরত। এক দিন দিদি বলিলেন ভগিনি! তুমি অনন্ত মহাদেবের ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছ। এক দিনে এক বৎসরে এ ব্রত উদ্‌যাপন হয় না। যিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর; লোকে যাঁহাকে চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানে; চতুর্দ্দশ কোটি যুগেও তাঁহার মহিমা জানিতে পারা যায় না; কিন্তু মানুষের পরমায়ু নিতান্ত কম। সেই অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে পরকালের কাজ করিতে হইবে; এই জন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা ন্যূনকল্পে চতুর্দ্দশ বৎসর নিয়ম করিয়াছেন। তোমাকে এই চতুর্দ্দশ বৎসর মধ্যেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "দিদি! চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া ব্রত করিতে হয় কেন? দশ বৎসর কি বার বৎসর ব্রত উদ্‌যাপনে কি হয় না?

দিদি বলিলেন, ইহার বিশেষ কারণ আছে;—চৌদ্দটী বিষয় লইয়া আমাদিগকে জগতে আসিতে হইয়াছে। সেই চৌদ্দটী—ইন্দ্রিয়। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ ও বাক্ এবং পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই দশটী ইন্দ্রিয়। আবার দেখ মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই চারিটী অন্তরিন্দ্রিয়। কেহ কেহ বলেন অন্তঃকরণই একমাত্র অন্তরিন্দ্রিয়; কিন্তু সাধকদিগের সুবিধার নিমিত্ত ইহার ব্যক্তি ভেদে উক্ত চারি প্রকার ভিন্নতা সাধিত হইয়াছে। পঞ্চ মহাভূত ও পঞ্চতন্মাত্রা উক্ত দশ ইন্দ্রিয় হইতে স্বতন্ত্র নহে। ভগিনি! মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এবং পূর্ব্বোক্ত দশটা ইন্দ্রিয় লইয়া সর্ব্ব সমেত চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় হইতেছে। এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় হইতেই সংসার। জীব যতক্ষণ এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত থাকিবে, তত দিন তাহার সংসার বন্ধন যাইবে না; তত দিন তাহাকে মায়ের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে; তত দিন সে অনন্তদেবের নিকট যাইতে পারিবে না। সুতরাং এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় জয় করাই প্রধান কর্ত্তব্য। ইহাই অনন্ত ব্রত; এক এক বৎসরে এক একটী ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে, এই জন্ম অনন্ত ব্রত চতুর্দ্দশবর্ষ সাধ্য।"

যে দিন ব্রতে দীক্ষিত হই; সেই দিন দিদি অনন্ত ব্রতের ঐ সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; তাহার পর মাঝে মাঝে প্রায়ই এই কথা বলিতেন। এই দিন তিনি বলিলেন "ভগিনি! দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি যোগমার্গে কতদূর অগ্রসর হইলে, তোমার ব্রত কতদূর শেষ হইল, কয়টী ইন্দ্রিয় তুমি জয় করিলে, তাহার পরীক্ষা হইবে। বার বৎসরে অন্ততঃ বারটী ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছ; এরূপ আশা করা অন্যায় নহে। অধিরাজ স্বয়ং তোমাকে পরীক্ষা করিবেন। পরীক্ষা দিতে ভয় খাইও না। তুমি জানিও যে, এই জগৎই পরীক্ষা স্থল। আমাদিগকে শৈশব হইতে চিরদিনই প্রতিমুহূর্ত্তে পরীক্ষা দিতে হইতেছে। যিনি পরীক্ষক, তিনি সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা সকলের কাছে বসিয়াছেন; অন্তঃকরণের গূঢ় অংশ চিরিয়া সকলই পরীক্ষা করিতেছেন, তাঁহার কাছে কিছুই গোপন করিতে পারা যায় না। যাহাহউক তোমার পরীক্ষা হইবে। আমরা কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে গমন করিতেছি।"

দিদি স্থানান্তরে গমন করিতেছেন শুনিয়া আমি একটু বিস্মিত ও ভীত হইলাম; বলিলাম "সেকি, দিদি! আমি একাকী থাকিব?"

"দিদি! এজগতে একাকী কেহই নহে। পুরুষ প্রকৃতি সকলেরই দেহে একত্রে বাস করিতেছেন। তোমার এজ্ঞান এখনও হইল না কেন?"

দিদির মৃদু ভর্ৎসনায় আমি অপ্রস্তুত হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম তোমরা কে কে?"

"তোমার পিতা ও আমি।"

কেশব! তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দীক্ষার দিন অধিরাজ স্বয়ং বলিয়াছিলেন, ভয় ত্যাগ করিতে হইবে। পর বৎসরে আমি সকল ভয় ত্যাগ করিয়াছিলাম; এমন কি আমাকে যদি বাঘের মুখে

যাইতে বলিত আমি তাহাতে ভয় পাইতাম না; কিন্তু দিদি ও বাবা আমার দুইটী প্রধান সহায়। সামান্য দরকার হইলেই যখন তখন তাঁহাদিগেরই নিকট যাইতাম; তাঁহারা আমাকে ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য যাইতেছেন, একথা শুনিয়া আমার মন খারাপ হইল। আমি একটু বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইলাম।

দিদি আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "আমাদের জন্য তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না। এখনও তোমার ব্রতের দুই বৎসর বাকি রহিয়াছে, সেই জন্য তুমি মমতা বিসর্জ্জন করিতে পার নাই। এখনও তোমার অহঙ্কার রহিয়াছে। এই অহঙ্কারই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের মূলাধার। ইহাকে ধ্বংস করিতে না পারিলে কেহই সিদ্ধ হইতে পারে না। অহঙ্কার আছে বলিয়া তুমি আমাদের জন্য ভাবিতেছ। তাহার কারণ আমাদের কাছে তোমার প্রয়োজন সাধন হয়। আমরা গেলে হয়ত তোমার সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না, সেই ভাবনায় তুমি দুঃখিত হইতেছ এবং আমাদিগকে রাখিতে চেষ্টা করিতেছ। আমরা এতদিন তোমাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তোমার প্রয়োজন সাধক হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন যখন দেখিতেছি যে, দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়াছে, তখন তুমি স্বাধীন হইতে পারিবে। মানুষ যত স্বাধীন হইবে, ততই নিরহঙ্কার ও নির্ম্মল হইতে পারিবে। স্বাধীন না হইলে মুক্তি পাইতে পারে না। তুমি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছ; আর যাহা কিছু বাকি আছে, গুরু বিনা তুমি নিজে তাহা শিখিতে পারিবে। আমার শিক্ষা হইয়া গিয়াছে; এখন যাহা বাকি আছে, দুই বৎসরে তুমি একাকী তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবে।"

আমি আরও অপ্রস্তুত হইলাম; ওসম্বন্ধে আর কিছুই না বলিয়া কেবল তাঁহারা কোথায় যাইতেছেন তাহাই জিজ্ঞাসা করিলাম।

দিদি বলিলেন, "আমরা তীর্থপর্য্যটনে যাইতেছি।" "দিদি! তুমি ত বলিয়াছিলে যে, সিদ্ধ হইলে তীর্থপর্য্যটন আবশ্যক হয় না; তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ তবে কেন তীর্থে যাইতেছ।"

"আমাদের সাধনা শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সিদ্ধিলাভ করিতে পারি নাই; যে দিন মায়ের কাজ সম্পন্ন করিতে পারিব, সেই দিন সিদ্ধ হইব।

"কতদিনে তাহা হইবে?"

"তাহা বলিতে পারি না। তোমার ব্রত উদ্‌যাপন হইলে আমাদের অনেকটা আশা হয়।"

"তোমরা তীর্থে যাইতেছ কেন?"

আমাদের সন্ন্যাসীগণ ভারতের নানা তীর্থে ভ্রমণ করিতেছেন, অনেকে দূর পর্ব্বত কন্দরে ও গহন কাননে রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকে একত্রিত করিতে হইবে। সেই জন্য সকলের তীর্থ ভ্রমণ করা আবশ্যক।"

"তোমরা কতদিনে ফিরিবে?"

"তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই; তবে তোমার ব্রত উদ্‌যাপনের সময় আমরা নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকিব।"

আমার মন আশ্বাসে একটু দৃঢ় হইল; ভাবিলাম দুই বৎসরের মধ্যে কি সাধনা শেষ করিতে পারিব না?

ক্রমশঃ—

সেকালের বড়লোক।

(১) মহারাজ নবকৃষ্ণ।

বাঙ্গালার অমর কবি, স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র এক সময়ে বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালীর ইতিহাস ত নাই-ই। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের ও বাঙ্গালীর এক খানি খাঁটি ইতিহাস হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। সিংহ হস্ত চিত্রিত মনুষ্য মূর্ত্তির মত অনেক ঘটনা বিবৃত ও অপ্রাকৃত হইয়া এত তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে—যে তাহাতে বাঙ্গালীর খাঁটি ইতিহাস জন্মাইতে পারে না। বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস লিখিতে হইলে বাঙ্গালী জাতিকে কেন্দ্রগত করিতে হইবে—বাঙ্গলার আদি, মধ্য ও বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালীর চিত্র, বিস্মৃতির ধূমময় আবরণী হইতে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করিতে হইবে। ইহাতে বিস্তর স্বাধীন চিন্তা, পরিশ্রম, অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির প্রয়োজন। খুঁজিয়া পাতিয়া, বিচার করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, প্রকৃত ঘটনা সন্ধানোদ্দেশে জীবনপাত করিলে তবে হয়ত বহুকাল ব্যাপী পরিশ্রমের পর সিদ্ধিলাভ হইতে পারে।"

সেই জন্যই বঙ্গদর্শনে খাঁটি বাঙ্গালার ইতিহাসের জন্মপ্রদান জন্য একটু চেষ্টা করা হইয়াছিল। "ভারতকলঙ্ক" ও "বাঙ্গালির বাহুবল" নামক দুইটি প্রবন্ধ স্বয়ং বঙ্কিম চন্দ্রের পবিত্র লেখনী প্রসূত। তার পর "বাঙ্গালীর উৎপত্তি"ও অনেক দিন চলে। বঙ্গদর্শনের চেষ্টা জানি না কোন অভিশাপে ব্যর্থ হইয়া যায়। তার পর পুনরায় এক চেষ্টা হয় নবজীবনের আমলে। অক্ষয় বাবু বঙ্গদর্শনের লোক, তাহার কাগজে কাজেই এই উদ্দেশ্যে—দুই একটী প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়া আবার কাগজের অস্তিত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই চেষ্টা থামিয়া যায়। *

বাঙ্গালী ইতিহাস লেখে—ইংরাজের লিখিত বিবরণ হইতে। ইংরাজ কিন্তু ফরাশীর লিখিত ইংলণ্ড ইতিহাসের অনুকরণ করে না। জাতীয় ভাব জাতীয় প্রকৃতি ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অনুবাদ, অনুকরণ অপেক্ষা স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন গবেষণা সম্যক ফলপ্রদ। ইংরাজের কথা ধ্রুব সত্য মানিয়া আমরা চলিয়া আসিতেছি—তাঁহারা যাহা বলিয়া গিয়াছেন—তাহাই আমরা বিশ্বস্ত চিত্তে অনুবাদরূপ মহা যন্ত্রের মধ্যে পিশিয়া এক খিচুড়ী পাকাইতেছি কাজেই ইতিহাসও সেইরূপ দাঁড়াইতেছে। †

---

* "জগৎ শেঠদিগের ইতিহাস", "কাশিমবাজারের রাজবংশের ইতিহাস", দিল্লীর ভগ্নাবস্থায় "রাজা রতন রায়ের ইতিহাস" এই উদ্দেশ্যে লিখিত হয়। অন্ততঃ আমাদের ত এইরূপ ধারণা। নববিভাকর ও সাধারণীতেও—সেই সময়ে "বীরভুম, বর্দ্ধমান ও কলিকাতার ঠাকুর বংশ" প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। সঃ সং

† সুখের বিষয় আজকাল এই প্রকার লেখকের সংখ্যা অনেক অল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিহাস বিষয়ে লেখকও কম এবং তাঁহাদের অনেক প্রবন্ধ আজকাল পরিশ্রমের ফল। কিন্তু যোগ্য পাত্রে উৎসাহ দানের অভাবে অনেক প্রতিভাশালী লেখককে ভগ্ন মনোরথ হইতে হইতেছে। সমীরণ সম্পাদক।

অপক্ক-জিনিস গলাধঃকরণ করিলেই তাহাতে উদ্গীরণ সম্ভাবনা খুব। আমরা যাহা কিছু গলাধঃকরণ করিতেছি তাহার সবই কাঁচা মাল। পরিণামও সেইরূপ দাঁড়াইতেছে।

অনেকে ঐতিহাসিক প্রবন্ধের জন্য পরিশ্রম করেন কিন্তু তাঁহাদের পরিশ্রমের সার্থকতা হয় না—দুইটী কারণে। এক তাঁহাদের লিখিবার প্রণালী—লোকের সহিষ্ণুতার উপর অন্যায় পীড়ন করে। ঘটনা শ্রেণীবদ্ধ করণ (arrangement of facts) ও সমস্ত জটিল বিষয় আলোড়নও বিশ্লেষণ প্রণালী (Analysis and synthesis) ততদূর সাধারণের বোধগম্য হয় না বলিয়া তাহারা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছাড়িয়া যান। দ্বিতীয়তঃ—বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকাদি আজ কাল অনর্থক গল্পে ও অসার মস্তিষ্ক কণ্ডুয়নে—মনোহর উপন্যাসে প্রায় অঙ্কেকের উপর স্থান অধিকার করিয়া পাঠকের রুচি পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। যাঁহারা নিতান্ত Literary গোছের প্রবন্ধ পড়িতে চান—তাঁহারাই একটু আধটু ঐতিহাসিক প্রবন্ধের পাতা উল্‌টাইয়া থাকেন।

যাই হ'ক, যে কর্ম্মফলেই হউক—যে অভিশাপবশেই হউক—বা যাহাদের দোষেই হউক, বাঙ্গালায় যে দিন দিন ইতিহাস চর্চ্চা কমিয়া যাইতেছে, সে আলোচনা আমরা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিব।

বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ দুই প্রকারের হইতে পারে। এক খাঁটি বাঙ্গালীর কার্য্যকলাপের সুশৃঙ্খলারূপে শ্রেণীবদ্ধ বিবরণ ও অপর পক্ষে বাঙ্গালা দেশ অনেক দিন হইতে পরাধীন বলিয়া জেতৃশ্রেণীর প্রধান প্রধান লোকদিগের জীবন-বৃত্তান্ত। বাঙ্গালী অবশ্য Blenheim বা Waterlooর ন্যায় কোন মহাযুদ্ধ ব্যাপারে যশস্বী হন নাই। কিন্তু তাঁহাদের তৎকালীন জীবন রাজনৈতিক সংঘর্ষণে যতটুকু আলোড়িত হইয়াছিল, তাহার উপযুক্ত বিবরণই বাঙ্গলার ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। মুসলমান বা ইংরাজ জেতাগণ বেশী চতুর লোক; তাঁহারা ইতিহাস লিখিতে গিয়া নিজেদের বিবরণ বেশী করিয়া লিখিয়াছেন কিন্তু যাহাদের দেশের ইতিহাস লিখিয়াছেন—যাহাদের লইয়া কার্য্য করিয়াছেন তাহাদের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই বা তাহাদের অসন্তোষকর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া সরিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজাধিকৃত বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদে যে সকল বাঙ্গালী বাঙ্গালার শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন—তাঁহাদের লইয়াই আমরা আপাততঃ কার্য্য আরম্ভ করিব। তৎপূর্ব্বের বিষয় ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন। তাহা আলোকে পরিস্ফুট করিতে গেলে বিশেষ পরিশ্রম ও অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির প্রয়োজন। কিন্তু তাহাও আবার সময় ও সুযোগ সাপেক্ষ।

ইংরাজী আমলের প্রথমে যে সকল বাঙ্গালী বাঙ্গলার মধ্যে রাজনৈতিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া—প্রধানত্ব লাভ করিয়াছিলেন—তাহার মধ্যে মহারাজ নন্দকুমারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু হায়! নন্দকুমারের প্রকৃত ইতিবৃত্ত অনেক বাঙ্গালী পাঠক আজও জানেন না। মেকলে প্রভৃতির কুৎসাজনক অসূয়া-পরিপূর্ণ

কথায়—আজও নন্দকুমারের প্রতি তাঁহাদের ঘোরতর বিতৃষ্ণা। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম আমলে—যে সকল পদস্থ ইংরাজ—এমন কি গবর্ণর সাহেবেরা পর্য্যন্ত যে সমস্ত লোকধর্ম্মাচার বিরুদ্ধ—নীতিবিগর্হিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন—তাহাতে ইতিহাসে তাঁহাদের নাম কলঙ্কের ঘোর কৃষ্ণ—অক্ষরে চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। যদিও ইংরাজ নিজে কলম ধরিয়া তাঁহাদের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তথাপি তাঁহাদের পাপের ও দুষ্কর্ম্মের গুরুত্ব এতদূর অধিক যে, সমস্ত বাদসাদ্ দিয়া এখনও যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে যথেষ্ট প্রমাণ পরিস্ফুট ভাবে বর্ত্তমান। এই সব লেখকই আবার নন্দকুমারকে—"জালিয়াত" "মিথ্যাবাদী" ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। নন্দকুমারের ইতিবৃত্ত স্থানান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে * সুতরাং তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা মহারাজ নবকৃষ্ণের আমল হইতে আরম্ভ করিব। ইচ্ছাত সম্পূর্ণই রহিল—যে, রাজা সেতাব রায়, রাজা রাজবল্লভ, নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা মহেন্দ্র সিংহ, রাজা রায় দুর্লভ, উমিচাঁদ বাবু গোবিন্দরাম মিত্র প্রভৃতি তৎকালীন বাঙ্গালার ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্রগণের পরিস্ফুট চিত্র পাঠকবর্গকে ক্রমে ক্রমে দেখাইব।

মহারাজ নবকৃষ্ণ—অন্ধকূপ-হত্যা-প্রসিদ্ধ তৎকালীন কলিকাতা দুর্গাধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবের সমকালবর্ত্তী। যখন সেরাজ উদ্দৌলা বাঙ্গলার নবাব, তখন নবকৃষ্ণ মুন্সী বাঙ্গলার ঐতিহাসিক কার্য্য ক্ষেত্রে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন। যখন ক্লাইব পলাশী জয় (?) করেন তখন নবকৃষ্ণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। যখন মীরজাফর বাঙ্গালার সিংহাসনে, তখন নবকৃষ্ণ দেশের মধ্যে একজন বড় লোক। নবকৃষ্ণের জীবনীতে ইতিহাসের কথা ছাড়া মানব জীবনের বিচিত্রময় ঘটনাবলীপূর্ণ শিক্ষার কথা অনেক আছে। তাহারই জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। তবে পাঠকগণকে একটী কথা বলিয়া রাখি—আমরা এই প্রবন্ধে "প্রত্নতত্ত্বের" একটা মহা আস্ফালন করিতে চাহি না।

নবকৃষ্ণ—দেব বংশোদ্ভব মৌলিক কায়স্থ। চিত্রপুরে ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি নিবাস। শ্রীহরি দেব হইতে ইহাঁদের বংশ পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীহরি মুরশীদাবাদ জেলায় "কানসোনা" নামক স্থানে বাস করিতেন। শ্রীহরিদেব হইতে নবকৃষ্ণ বিংশ পুরুষ নিম্নে। পীতাম্বর দেব শ্রীহরি হইতে ছয় পুরুষ নিম্নে। ইনি "ধান্য পীতাম্বর" বলিয়া তৎকালীন বাঙ্গালীর মধ্যে পরিচিত ছিলেন। পীতাম্বর মোগল সরকারে কোন গৌরবান্বিত কার্য্যে নিযুক্ত

* ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখক বাবু হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ভারতী পত্রিকায় এক বৎসর ধরিয়া নন্দকুমারের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। প্রবন্ধ সম্পূর্ণ মৌলিক ও তাহাতে সেই নবীন লেখকের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি, গবেষণা ও তীক্ষ্ণদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গদর্শনে প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, মহোদয় নন্দকুমার সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছিলেন। হরিসাধন বাবুর প্রবন্ধ সম্পূর্ণ বিশদ ও এসম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। আমরা আমাদের পাঠক বর্গকে সেই প্রবন্ধ পড়িতে অনুরোধ করি।

সমীরণ সম্পাদক।

ছিলেন। এই কার্য্যের জন্যই তিনি "খাঁ বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। * তাঁহার পুত্রগণের নাম পাওয়া যায় না কিন্তু চারিটী পৌত্রের নাম পাওয়া যায়। এই চারি জন (শিবদাস, নিত্যানন্দ, চতুর্ভুজ ও শ্রীনাথ) যথাক্রমে মালাই, সোদাপুর, তাল গ্রাম ও ধুলীপাড়া পরগণায় স্বস্ব বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন। ইহাঁদের সকলেরই "রায়" উপাধি ছিল। বিদ্যাধর-নিত্যানন্দ হইতে নবম পুরুষ—ইনি—সর্ব্ব প্রথমে নাজবায় পরে মুড়াগাছা পরগণার "নাটাদা" গ্রামে উঠিয়া আসেন। তাঁহার পৌত্র দেবীদাস এই পরগণার "কানন গুঁই" ছিলেন। দেবীদাস এই চাকরির জন্য "মজুমদার" আখ্যা প্রাপ্ত হন।

দেবীদাসের ছয় পুত্র। ইহার মধ্যে পঞ্চম পুত্র রাজেশ্বর বাবু কামারপুলে ও ষষ্ঠ পুত্র রুক্মিণীকান্ত পঞ্চগ্রামে বসবাস করেন। এই সময়ে মহাবৎ জঙ্গ বাঙ্গলার নবাব। রুক্মিণীকান্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহস্রাক্ষের সহিত নবাব সরকারে উপস্থিত হইয়া কর্ম্ম প্রার্থনা করেন। নবাব সহস্রাক্ষকে পিতৃপদে ও রুক্মিণীকান্তকে "ব্যবহার্ত্তা" উপাধি দিয়া মুড়াগাছা পরগণার নাবালক জমীদার কেশবরাম রায় চৌধুরীর বিষয়ের তত্ত্বাবধারকের পদ দেন।

রুক্মিণীকান্তের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর নবাব কর্ত্তৃক পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হন। রামেশ্বর বড় বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তাহার তত্ত্বাবধারণে মুড়াগাছা পরগণার আয় বাড়িয়া উঠে। নবাবকে সেই বেশী আয় দেখাইলে তিনি সরকারী রাজস্বের পরিমান বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই ঘটনায় কেশবরামের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে। সেই মনোমালিন্য এত দূর বাড়িয়া উঠে যে, কেশবরাম সাবালক হইয়াই রামেশ্বরকে নিজ বাটীতে কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন।

পিতার এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া রামেশ্বরের পুত্র রামচরণ নবাবকে সমস্ত ঘটনা বলিবার জন্য মুরশীদাবাদ যাত্রা করেন। তখন অরাজকের কাল। যার লাঠী আছে তাহারই বল। সকল কথা নবাবের কাণে না উঠিলে দেশে তখন অত্যাচার অবিচারের প্রতিরোধ হইত না। যাই হউক, মুরশীদাবাদ পৌছিয়া বিশেষ কৌশলাবলম্বনে রামচরণ নবাবকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যদিও কেশবরাম এখন সাবালক হইয়াছেন—তথাপি তাঁহার হাতে জমীদারী পড়িলে তিনি আরও ৫০০০০৲ টাকা বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন।

আয় বৃদ্ধির সঙ্গে নবাবের রাজস্বের খুব নিকট সম্বন্ধ। ভাবিয়া চিন্তিয়া নবাব রামচরণকে মুড়াগাছার "আওদাদার" বা কমিশনার করিয়া পাঠাইলেন। রামচরণ মুড়াগাছার ফিরিলেন। এখন তিনি

* "ধান্য পীতাম্বর" আখ্যা হইবার কারণ এই পীতাম্বর সেই সময়ে একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। তিনি দেশের সমস্ত প্রধান প্রধান ঘটক ও কুলীনদিগকে একত্রিত করিয়া "একজাই" করিয়াছিলেন। এরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, ঘটক ও কুলীনদের যাতায়াতের পথে একটী নদী পড়াতে—গমনাগমন সৌকার্য্যার্থে পীতাম্বর তাহার কিয়দংশ ধান্য দিয়া বোঝাই করিয়া দেন। ইহা হইতেই তিনি "ধান্য পীতাম্বর" আখ্যা প্রাপ্ত হন।

নবাবের কর্ম্মচারী—কাজেই কেশব রাম ভয় পাইলেন। রামচরণ সর্ব্ব প্রথমেই পিতাকে বন্দীদশা হইতে মুক্ত করিলেন।

মুড়াগাছায় কিয়ৎকাল কার্য্য করিয়া রামচরণ রায়, কলিকাতায় উঠিয়া আসিলেন। গোবিন্দপুরে * খানিক জমী কিনিয়া তিনি বসতবাটী প্রস্তুত করিলেন। পরিবারবর্গকে কলিকাতায় রাখিয়া পুনরায় নবাব সরকারে চাকরীর প্রত্যাশায় গমন করেন। মুড়াগাছায় চাকরী করিবার তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য—পিতাকে উদ্ধার করা, তাহা তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন সুতরাং অন্যত্র কার্য্যের জন্য নবাবের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করিলে—নবাব তাহাকে হিজলী, তমলুক ও মহিষাদলের নিমক মহলের দেওয়ানী প্রদান করিলেন। নিমকের চাকরীতে, বিশেষতঃ নবাবী আমলে—রামচরণ দের যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি করিলেন।

এই সময়ে আর একটী ঘটনা ঘটিল। তাহাতে রামচরণ আরও গৌরবান্বিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তিনি নবাব সরকারের চিহ্নিত লোক। আরকটের নবাবের ভ্রাতা মনিরুদ্দিন খাঁ দাক্ষিণাত্য হইতে ভ্রাতার ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া এই সময়ে মুরশীদাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাব মহাবত জঙ্গ (আলিবর্দ্দি খাঁ) মনিরুদ্দিন খাঁকে কটকের সুবাদারি ও রামচরণকে তাহার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া কটকে পাঠাইলেন। কটকে তখন বর্গীর হাঙ্গামা বড় বাড়িয়াছে। সঙ্গে নবাবের সৈন্যদল চলিল। সুবাদারি বড় সহজ সুবাদারি নহে, যুদ্ধ করিতে যাওয়া। রামচরণ পথে যে কোন হাঙ্গামা ঘটিতে পারে এরূপ আদৌ ভাবেন নাই। তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া সুবাদারের সঙ্গে মেদিনীপুর অতিক্রম করিলেন।

পথে মহা বিপত্তি ঘটিল। মেদিনীপুর ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর না হইতে হইতেই—পথিপার্শ্বস্থ গভীর বনমধ্য হইতে ৪।৫ শত পিণ্ডারী সেনা তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়িল। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক সেনাদল পশ্চাতে। সঙ্গে সামান্য কয়েক শত মাত্র। মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সুবাদার ও তাঁহার দেওয়ান সেই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়াও যুঝিতে লাগিলেন। নবাবের নামে কলঙ্ক ঘটিল না বটে কিন্তু সেই যুদ্ধে রামচরণ ও মনিরুদ্দিন জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

রামচরণের তিন শিশু পুত্র বর্ত্তমান। তাঁহার বিধবা একে স্বামী শোকে মুহ্যমানা, তাহাতে আবার তিন নাবালক পুত্রের ভার তাঁহার উপর নগদ টাকা কড়ি ও ধনরত্নাদি যাহা কিছু সবই তাঁহার হস্ত বহির্ভূত। খোজাওয়াজিদ্ সেই সময়ের একজন মহাধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। রামচরণ যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া যান। যখন মানুষের দুর্ভাগ্য

* আজকাল যেখানে—ইংরাজের বিজয় স্তম্ভ স্বরূপ ফোর্ট উইলিয়াম—বর্ত্তমান, প্রাচীন কলিকাতার সেই স্থানকে গোবিন্দপুর বলিত। গোবিন্দপুরে, সুতনুটীতে (হাটখোলা অঞ্চল) সেই সময়ে লোক জনের বেশী বসবাস ছিল। তত্রাচ এই দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ভিন্ন—আর কিছুই বোধ হইত না। এখন যাহা প্রাসাদময়ী চৌরঙ্গি তখন—এইখানে বাঘ ডাকিত বাঘের ভয়ে চোর ডাকাতের ভয়ে লোকে বাটীর বাহির হইত না।

ঘটিতে আরম্ভ হয় তখন আর কোন প্রকারেই তাহার গতিবোধ করা যায় না। ঘটনা ক্রমে খোজা সাহেবও এই সময়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আর উদ্ধার হইল না—দেওয়ান রামচরণের বিধবা তিনটী শিশু পুত্র ও সামান্য বিষয় সম্পত্তি লইয়া মহা ফাঁপরে পড়িলেন।

দেওয়ান পত্নী অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। সেকালের মেয়েরা লেখা পড়া জানিতেন না বটে কিন্তু সেই আক্ষরিক মূর্খতা সত্বেও তাঁহারা যে প্রকার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন আজ কাল অনেক শিক্ষিত পুরুষের মধ্যেও তাহার কণামাত্র বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় না। গোবিন্দ পুরে রামচরণ যে বাটী তৈয়ারি করিয়াছিলেন তাহা নদীগর্ভজাত হইয়া গিয়াছে। আলয়হীনা বিধবা এই সময়ে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সামান্য বিষয় সম্পত্তি যাহা ছিল, বুঝিয়া সুঝিয়া চালাইয়া তাহা হইতে তিনটী পুত্রের জীবিকা ও শিক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

বিধবার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম রামসুন্দর মধ্যম মাণিক্য চন্দ্র, কনিষ্ঠ নবকৃষ্ণ। সুখের, সৌভাগ্যের উচ্চ শিখর হইতে সকলেই দুঃখের মহাগর্ত্তে পতিত হইয়াছেন। কটক মহাপ্রদেশের দেওয়ানের পুত্র ও বিধবা বিধাতার চক্রে তখন সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য লালায়িত। যাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা অগণ্য ধন দান পুস্করিণী খনন, ব্রাহ্মণ রক্ষা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন তাঁহার বংশধরেরা কিনা, আজ সামান্য আশ্রয় অভাবে আকুলিত। কিন্তু সুখ দুঃখ প্রাকৃতিক নিয়মে শীত গ্রীষ্মের ন্যায় চলিতেছে। এই নিয়ম বিশ্বাসেই বিধবা সন্তানগুলির মুখ চাহিয়া ভবিষ্যত আশায় বুক বাঁধিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ—

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

৬। তাড়িৎ চৌম্বক।

বল্টা (পূর্ব্বানুবৃত্তি)। এই সকল পরীক্ষাতে, যাহা আজকাল মনে করিলেই অনায়াসে করা যাইতে পারে এবং বাস্তবিক আর এক আকারে যাহা এখন হইয়াই থাকে, তড়িৎ, স্তম্ভের মধ্যে নিয়ত উৎপন্ন ও প্রকাশিত হইয়া তাহা অবিরত এবং একক্ষণের মধ্যেই ঘেরের সমুদয় তারে এবং পরিচালক পদার্থে ব্যাপ্ত হয়। ইহাকে সচরাচর তড়িৎস্রোত বলে; কিন্তু এই নামটা সংগত নহে, হঠাৎ মনে হয় যে, শিরার মধ্যে যেমন রক্ত সঞ্চলন করে বা "দীপনকর" lighting gas) যেমন নলের ভিতর দিয়া চলিয়া তাহার ঠোঁটে উঠিয়া জ্বলিতে থাকে, তড়িৎস্রোতও বুঝি সেইরূপ করিয়া এক স্থান হইতে আর এক স্থানে চলিয়া যায়। বাস্তবিক ভারবান্ পদার্থের গতির সহিত ভারহীন পদার্থের (বা শক্তির) গতির তুলনাই হয় না।

এখন স্তম্ভের আকারের অনেক ভিন্নতা হইয়াছে। এখন যে সকল আকার চলিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এক প্রকার এই:—ইহাতে কেবল দশ থাক্ দস্তা এবং কয়লা আছে; এই উভয় উপকরণের প্রত্যেকটাই একটী একটী কাচপাত্রের মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছে, তন্মধ্যে দস্তাটী দশমভাগ গন্ধকদ্রাবক বিশিষ্ট জলে এবং কয়লাটী আজোটিক দ্রাবকে ডোবান আছে। এই উভয় প্রকার তরল পদার্থ একটী ব্যবধান দ্বারা ব্যবহিত আছে; সে ব্যবধানটী আর কিছু নহে, কেবল নিরবাণ্ডন আধপোড়া মাটির পাত্র, যাহার সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা উভয় তরল পদার্থের পরস্পরের মধ্যে যোগও থাকে অথচ তাহারা মিশিতে পারে না। এক থাকের দস্তা তাহার পরের থাকের কয়লার সহিত একখণ্ড তামার পাতের দ্বারা সংসক্ত থাকে; এমতে প্রথম থাকের কয়লা এবং শেষ থাকের দস্তা দ্বারা স্তম্ভের দুই কেন্দ্র প্রস্তুত হয়, যাহাতে বাহিরের ঘের আসিয়া শেষ হওয়া উচিত।

স্থৈর্য্যক্রিয়ার স্থায়িত্বভাব উহার একটী পরম লক্ষণ। ইহা সুন্দররূপে বুঝাইতে হইলে ঐ দশথাক্ স্তম্ভের স্রোতকে যদি প্লাটিন তারের ভিতর দিয়া চালান যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, প্রথম ঐ তারটা একটু গরম হইল, ক্রমে তাহা কালো লাল, কালো-লাল হইতে রক্তবর্ণ লাল, তাহা হইতে আবার লাল শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া সেই অবস্থাতেই অবস্থিতি করে। যদি উত্তাপ এত অধিক না হয় যে তার প্রজ্বলিত এবং গলিত না হইতে পারে, তবে তারটাকে উপযুক্তরূপে লম্বা করিলেই ঐরূপ অবস্থা সহজেই নিবারণ করা যাইতে পারে।

নিম্নতর কৌতুকাবহ পরীক্ষাও উহার স্থায়িত্বভাবকে সপ্রমাণ করিতেছে। এই

ক্ষুদ্র যন্ত্রটীতে একটী অপরিচালক কাচের বাঁট রহিয়াছে; তাহার উপর নীচে ধাতু দ্বারা মোড়ান। ঐ ধাতুদ্বয়ের মধ্য দিয়া দুইটা ধাতুর শলাকাতে দুইটা কয়লা কাঠি বসান আছে এবং স্তম্ভের দুই কেন্দ্র দুই ধাতুময়ী শলাকার পিছনে
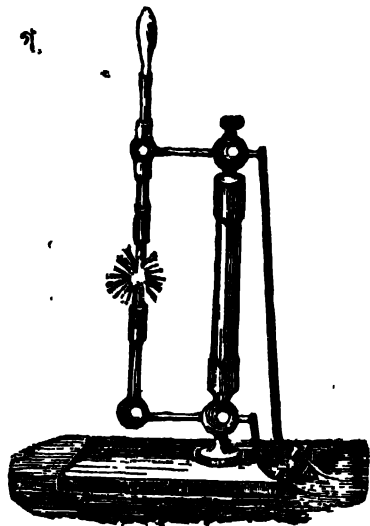
লাগান আছে। যেই কাচের হাতল "গ" দ্বারা উপরকার কয়লা কাঠিকে নীচের কয়লার সঙ্গে স্পর্শ করানো যায়, অমনি অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠে এবং যতক্ষণ স্তম্ভ হইতে স্রোত আসিতে থাকে, ততক্ষণই এইরূপ জ্বলে; যখন কেহ ঘের খুলিয়া দেয় তখনই থামে, আবার ঘের বন্ধ করিলেই আলো পূর্ব্বের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে।

এইরূপ ৫০ বা ১০০ থাক স্তম্ভ দ্বারা ক্ষণেকের মধ্যে বহু গ্রাম (gram) রৌপ্য স্বর্ণ বা প্লাটিন গলান যায়; লৌহ এবং ইস্পাত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে যেমন দগ্ধ হয় এবং চতুর্দ্দিকে স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে। সেইরূপ- ইহা দ্বারাও দগ্ধ হয় এই-রূপ পরীক্ষা করিতে গেলে নীচেকার কয়লাকে, যাহার উপরে ধাতুটী রাখিতে হয়, একটু প্রশস্ত করিতে হয় এবং তাহাতে একটু গর্ত্ত করিয়া লইতে হয়। যেমন

অয়রষ্টেড। অয়রষ্টেড সপ্রমাণ করিয়াছেন যে স্তম্ভের স্রোত যদি তারের মধ্যে অথবা সাধারণতঃ কোন পরিচালক পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে উহা চৌম্বকের উপর অত্যন্ত গুণপ্রকাশ করে; ঐ পরিচালক বস্তু চুম্বকের যতই নিকটবর্ত্তী হয়, তত অধিক বলে উহাকে আকর্ষণ করে বা বিকর্ষণ করে, অথবা উহাকে নির্দ্দিষ্টরূপে চালনা করে।

এই আবিষ্ক্রিয়ার সময়, বিজ্ঞানের এই অংশ, যাহার বিষয় আমরা বলিতেছি তাড়িত চৌম্বক নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, কেন না এই নাম দ্বারা তাড়িত ও চৌম্বক এতদুভয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-সম্বন্ধ নির্দ্দেশিত হয়।

আমরা ঐ পারস্পরিক ক্রিয়াকে দুইটী পরীক্ষা দ্বারা সাধারণরূপে এক প্রকার বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

এই একটী তাড়িতচুম্বক ধাতু (ঘ); ইহা ঘোড়ার পায়ে যেরূপ ক্ষুর বসায়, সেইরূপ বক্রাকার নীরেট লৌহচোঙা;
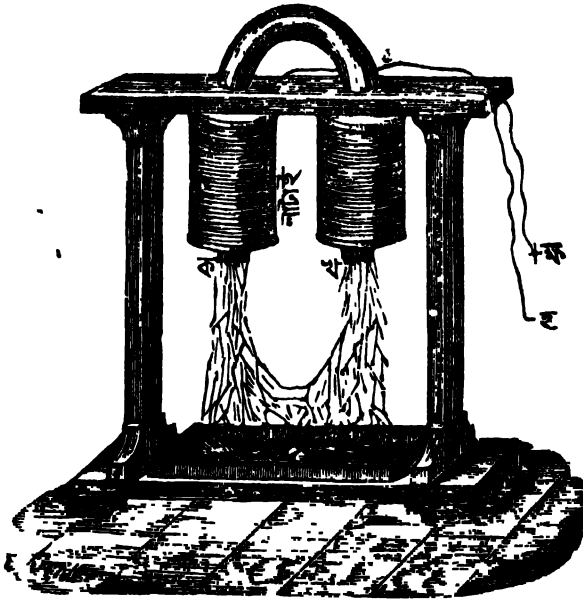
তাহার পরে প্রায় এক মিলিমেটর মোটা এবং বহু সেণ্টিমেটর লম্বা তামার তারকে, 'গোটা'য় যেমন সূতা জড়ায় সেইরূপ সূক্ষ্ম রেশমের দ্বারা জড়াইয়া, সেই রেশম-জড়ানো তারের দ্বারা, সূতার নলীতে যেরূপ সূতা জড়ান যায়, নীরেট চোঙার প্রতি বাঁট সেইরূপ জড়াইতে হইবে। এইরূপ জড়ানো চোঙাকে তাড়িতচুম্বক ধাতুর লাটাই বলে। এই দুই তারের শেষ সীমাদ্বয়ের (হ ও ক্ষ) কাছে রেশম জড়ান নাই, খোলা রহিয়াছে; ঐ দুই স্থান স্তম্ভের দুই কেন্দ্রের সহিত যোগ করিতে হইবে। যেই স্রোত বহিতে থাকে, অমনি ক্ষুরাকার লৌহটা বলবান চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়; অমনি ইহা পিরেক, খণ্ডলৌহ আকর্ষণ করিতে থাকে, তাহারাও আবার অপরাপরকে এইরূপ আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া রাখে, তাহারাও আবার অপরকে ধরিয়া রাখে। এইরূপে একটী শিকলির মতন প্রস্তুত হয়, সেই শিকলির প্রথম কড়া যেন তাড়িত চুম্বক ধাতুর দুই কেন্দ্র ক ও খ তে লাগিয়া আছে। যেই মাত্র কেহ ঘের খুলিয়া বা ভাঙ্গিয়া দেয়, অমনি স্রোত বন্ধ হয়; যেই স্রোত বন্ধ হয়, সেই ক্ষণেই অমনি যেন সকল আকর্ষণী শক্তি আকাশে মিলাইয়া যায়, লৌহখণ্ড সকল পৃথক পৃথক হইয়া নিম্নে পড়িয়া যায়, ভাবের আজ্ঞা ব্যতীত আর কাহারো কথা এখন গ্রাহ্য করে না। এইরূপে তাড়িত চুম্বক ধাতু ঘের বন্ধন বা খোলা অনুসারে আপনার শক্তি পায় বা হারায়, এবং এইরূপে একবার প্রবল আকর্ষণ, আর একবার সম্যক উদাসীনত পুনঃ

পুনঃ অতি সত্বর বিধান করা যাইতে পারে, যাহা পরের পরীক্ষাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এইটা আর একটী তাড়িতচুম্বক ধাতুর যন্ত্র কিন্তু পূর্ব্বের অপেক্ষা ছোট এবং বার্ত্তাবহে যেরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, ইহা ঠিক সেই প্রকার। ক খ রূপ লাগবাটটা, যাহাকে এখানে তাড়িতচুম্বক ধাতুর পতর বলা যায়, ছট্‌কার মতন সচল ও তুল্যমান ভাবে রহিয়াছে। প ও র্প রূপ পাকদণ্ড বা ঘূর্ণিকা উহার গতির সীমা করিয়া দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় পতরের
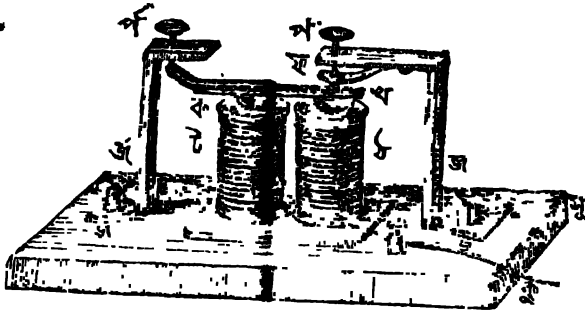
স্থিতিস্থাপকতা উহাকে ঘূর্ণিকা প তে অথবা ভাল কথা, ফ রূপ ছট্‌কাতে ঠেকাইয়া রাখে, এই ছটকাকে প রূপ ঘূর্ণিকা ঘূরাইয়া ইচ্ছামত অধিক বা কম উঠান নামান যাইতে পারে; কিন্তু যখন তাড়িত চুম্বক ধাতু কখ পতরকে আকর্ষণ করে, উহা আপনার স্থান ছাড়িয়া আকর্ষণকারী কেন্দ্রদ্বয়ের প্রতি অবনত হয়। এখন, এই তাড়িতচুম্বক যন্ত্রকে এমন প্রস্তুত করা গিয়াছে, যাহাতে উহার ঘের আপনা হইতেই বদ্ধ হয় এবং আপনা হইতেই খোলে; অর্থাৎ, তাড়িত চুম্বক যন্ত্রের তারের একটা শেষ সীমা "সু" তে আসিয়াছে, আর একটা সীমা জ পায়াতে লাগান আছে। ঐ সমস্ত কাণ্ডটী ধাতু নির্ম্মিত, সুতরাং স্রোতকে আপনা হইতে পতরে পরিচালন করে; আবার পতর ফ ছটকাকে ছুঁইয়া থাকাতে পতর হইতে ঐ স্রোত ফ ছটকাতে যায় এবং ছটকা হইতে ঐ স্রোত ধাতু নির্ম্মিত র্জ কাণ্ডের নীচে 'কু' ভাবে আইসে। এমতে, সু আর কুকে স্তম্ভের কেন্দ্রদ্বয়ের সঙ্গে যোগ করিলেই ঘের জোড়া হইল এবং স্রোত চলিল। কিন্তু সেই ক্ষণ পতরটা ট ঠ তাড়িত চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হইল, অমনি পতরটা ফ ছটকা হইতে ছাড়িয়া আসিল এবং ঘেরটা ভাঙ্গিয়া গেল; অমনি তাড়িত চুম্বক ধাতুর আকর্ষণী শক্তি নষ্ট হইল, পতরও তৎক্ষণাৎ আপনার স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা ছটাকাতে পুনকথিত হইয়া ঘের বদ্ধ করিল; তাহাতে আবার আকৃষ্ট হইল, আবার বিচ্ছেদ হইল, এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল। অতএব পতর একটু অবকাশ পায় না, এমন একটু স্থান পায় না

যেখানে একটু বিশ্রাম করে। এইরূপ প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট আকর্ষণী শক্তির আয়ত্তগত হইয়া উহার গতি অত্যন্ত সত্বরতা প্রাপ্ত হয়; উহা দ্বারা যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহার তীব্রতা কখন কখন প্রতিমুহূর্ত্তে বহুসহস্র কম্পনের সমান হয়।

যাহা বলা গেল্ তাহা স্তম্ভের, তড়িৎ স্রোতের এবং তাড়িৎ চৌম্বকের প্রথম ভাব উদ্দীপন করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। ইহা দ্বারা এখন ঈষৎ বুঝিতে পারিবে যে কেমন সহজে এই নূতন আবিষ্কৃত শক্তিকে নানা প্রকার কার্য্যে লাগান গিয়াছে; বিশেষতঃ ইহা দ্বারা কেমন সেই আশ্চর্য্য যন্ত্র লাভ হইয়াছে, যাহা দ্বারা আমাদের চিন্তাস্রোত বার্ত্তা-বহের তারে শত শত যোজন দূরে সঞ্চালিত হয়—এমনি দ্রুত সঞ্চালিত হয় যে কোন ঘরের ভিতর কতক পা দূরে কথার শব্দ প্রচার হইতে যতটুকু বিলম্ব তাহাতেও ততটুকুই বিলম্ব হয়।

৭। আনবিক ক্রিয়া।

দ্রব্যের অণু বুঝাইয়া দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ। অণু যদি মনের অধ্যাহার্য্য বিষয় হইত, তাহা হইলে যেমন চতুষ্কোণ, গোল অথবা অন্য কোন ক্ষেত্রতত্ত্বের আকারকে ব্যাখ্যা করা যায়, সেইরূপ ইহাকেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারিত। কিন্তু অণু বাস্তব পদার্থ; উহাকে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উহা যে কি, তাহা আগে জানা এবং তাহাই বলা আবশ্যক। কিন্তু ঐ বাস্তব পদার্থটী এমনি ছোট যে, না আমরা তাহাকে ছুঁইতে পারি, না দেখিতে পারি, না কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিতে পারি। এমন বাস্তব পদার্থ, যাহাকে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, দেখিতে পাওয়া যায় না বা অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না; যাহার আকার অজ্ঞাত, যাহার পরিমাণ অজ্ঞাত, যাহার অস্তিত্বের প্রকার অজ্ঞাত, তাহাকে কিরূপে ব্যাখ্যা করা যাইবে? অতএব ক্ষেত্রতত্ত্বের মতন করিয়া অণুর ব্যাখ্যা আমাদের পরিত্যাগ করিতে হইবে, কেননা উহাতো অধ্যাহার্য্য নহে; ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতে হয় তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইবে, যেহেতু উহাকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারি না। তবে, যখন আমাদের কোন মনের ভাব ঠিকঠাক ব্যক্ত করিতে হইবে, আমরা কি অণু কথা একেবারেই ব্যবহার করিতে পারিব না—অণু কথাটাকে কি আমাদের ভাষা হইতে একেবারেই বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে? তাহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। পদার্থবিজ্ঞান অধ্যাহার্য্য বিজ্ঞানের সমান নহে—এই দুই বিষয় এক পথে চলে না; আর বাস্তব পদার্থকে যে স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ দেখিতে পাবে, তাহাকে যে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করিতে পারে, আমাদের মনের এমনও শক্তি নাই; তাহা এমন এক সুড়ঙ্গী দিয়া সহসা পলাইয়া যায় যে, সে পথ আমরা দেখিতেও পাই না, তাহাতে প্রবেশ করিতেও পারি না; অতএব বিজ্ঞান দ্বারা কিছু সমস্তটা জানা যায় না, কতকটা জানা যায় মাত্র।

এখন তবে আমরা অণুতে এবং আণবিক ক্রিয়াতে ফিরিয়া যাই। যখন

আমরা বালুকা রেণু বা হীরক বা অন্য কোন পদার্থকে একটা 'খলে' পিষিতে থাকি, তাহাদের অংশ নিরন্তর অধিকই হইতে থাকে। এইরূপ হইতে হইতে যদি আমরা অবশেষে এমন অংশে আসি যাহারা সমান ভাবে থাকে, যাহারা অবিভাজ্য এবং অপরিবর্ত্তনীয়, তাহা হইলে যে সকল পদার্থ হইতে আমরা এরূপ ফল পাইলাম, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, তাহাদের বিভাজ্যতার সীমা আছে; যে, তাহাদের শেষ অণু দেখা দিয়াছে; সেই অণুদের এই আয়তন, এই আকার, তাহাদিগকে দেখিতে এইরূপ, তাহাদের গুণ এই, সেই গুণ হয়তো আবার অণুরাশির অথবা সেই দ্রব্যের গুণ হইতে ভিন্ন। কিন্তু কেহই এপ্রকার অণু দেখিতে পায় না। এমন কিছুই ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ নাই যাহা বিভাজ্য নহে; অথবা আমরা এমন কিছুই দেখিতে পাই না, যাহা রাশি বা সমষ্টি নহে, যাহা পৃথক্ পৃথক্ অংশের একত্রীকরণ নহে। কিন্তু তথাপি আমরা বুঝিতে পারি যে, যত সূক্ষ্ম অংশ আমাদের চক্ষুর গোচর হইতে পারে, তাহারো পরে এমন সুসূক্ষ্ম অংশ আছে যাহাকে ইন্দ্রিয় ধরিতে পারে না। তাহাদের ঘেঁসাঘেঁসি অবস্থিতি দ্বারা, তাহাদের শ্রেণীপূর্ব্বক সন্নিবেশ দ্বারা, তাহাদেরই যোগে চক্ষুর গোচর অংশ সকল প্রস্তুত হয়। ঐ যে চক্ষুগোচর অংশের নির্ম্মাণকারী আদিম অংশ সকল, উহারাই বস্তুর অণু।

ইহা যদি ঠিক হইল, তবে এখন অণুকে দুই রকমে দেখা যাইতে পারে। প্রথম, একটা অণুকে সম্পূর্ণ সবর্ণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; সে যে স্থানটুকু ব্যাপিয়া আছে, সেই স্থানের সকল অংশেতেই সে আপনার সদৃশভাবে ব্যাপিয়া আছে। যথা, যদি অণু ঘন চতুর্ভুজ হয়, আমরা সেই ঘনচতুর্ভুজকে সম্পূর্ণ নিবেট ও কঠিন মনে করিয়া লইতে পারি; তাহার মধ্যে কোন ফাঁক নাই, ফাটাফুটি নাই, তাহার বরাবরত্বের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই বা এমন কোন দৈব ঘটনা নাই, যাহাতে করিয়া তাহার এক অংশকে অপরাংশ হইতে প্রভেদ করা যাইতে পারে। এইরূপ অণুকে পরমাণু বলে—হয়তো ইহা বিভাজ্য, হয়তো বিভাজ্য নহে; হয়তো ইহা বিকার্য্য, হয়তো বিকার্য্য নহে।

দ্বিতীয়ত, আমরা অণুকে সদৃশ বা বিসদৃশ অংশের, একপ্রকার অথবা ভিন্ন প্রকার পরমাণুর সমষ্টি মনে করিতে পারি। এরূপ হইলে কিন্তু সমস্ত অণুটা আর একাত্মক বা সমানাত্মক (homogeneous) হইল না; তাহা যতটা স্থান ব্যাপিয়া আছে, সেই স্থানের তাবৎ অংশে তাহা এক-সমান হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহা একটা সংগত পদার্থ হইল, তাহার বরাবরত্বের বিচ্ছেদ আছে এবং তাহার সন্নিবেশের একটা প্রণালী আছে—তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, স্থায়ীই হউক বা পরিবর্ত্তনশীলই হউক।

এই দ্বিতীয় প্রকারকেই আমরা অণুর প্রকৃতি বলিয়া গ্রহণ করিলাম, যেহেতু ঘটনারাশির সঙ্গে এই ভাবের বেশ্ মিল পাওয়া যায়। ক্রমশঃ—

রাসমালা।

ঘোরতর যুদ্ধ।

পঞ্চাসর ভুবরের হস্তে পতিত হইল;—কিন্তু বিজয়ী শোলাঙ্কি রাজ তখনও নগর সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিলেন না। দ্বারপাল ও সভাপালগণ প্রাণপণে দুর্দ্ধর্ষ শত্রুগণের প্রবেশ রোধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাদের কোন চেষ্টা সফল হইল না, অগণ্য শোলাঙ্কি সৈন্যের নিকট কতিপয় সৌরযোধ নিপতিত হইল। তাহাদিগের মৃতদেহ পদতলে দলিত করিয়া বিজয়ী ভুবর উন্মত্তভাবে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উৎকট জয়নাদে রাজভবন প্রতিধ্বনিত করিয়া দলে দলে শত্রুগণ অন্তঃপুরের অভিমুখে ধাবিত হইল; ভুবর সকলের পুরোভাগে পথ প্রদর্শন করিয়া চলিলেন;—হঠাৎ তাঁহার গতি রুদ্ধ হইল; তিনি স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন;—আর পদমাত্রও অগ্রসর হইতে পারিলেন না! তিনি দেখিলেন অগণ্য রমণী,—আলুলায়িতকুন্তলা,—বিকট রাক্ষসীবেশিনী—করে অর্গলদণ্ড, যষ্টি, মুদ্গর ও নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া অন্তঃপুর হইতে উন্মত্তার ন্যায় দ্রুতবেগে বহির্গত হইতেছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে শত্রুগণ বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। রণোন্মাদিনী পুরস্ত্রীগণ স্ব স্ব হস্তস্থ অস্ত্র উত্তোলন করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিল এবং শত শত রণচণ্ডীর ন্যায় অবিরল আঘাত করিতে লাগিল! স্ত্রীপুরুষে অপূর্ব্ব ঘোর যুদ্ধ বাধিল; সে যুদ্ধে শোলাঙ্কি সৈন্যগণ পরাস্ত ও দলিত হইয়া নগরের বহির্দ্দেশে পলায়ন করিল। তখন সৌরবীরাঙ্গনাগণ শত শত মৃতদেহের ভিতর হইতে জয়শেখরের শোণিতাক্ত শবদেহ সংগ্রহ করিয়া লইল এবং উৎকৃষ্ট চন্দনসাবে বিশাল চিতা প্রস্তুত করিয়া আপনাদিগের অধিপতির মৃতদেহ লইয়া জ্বলন্ত অনলে প্রাণত্যাগ করিল। মহারাজ জয়শেখরের অপর চারিটী পত্নীও দাসী ও সহচরী সমভিব্যাহারে স্বামীর অনুগামিনী হইল। যখন সেই সাধু নরপতির শবদেহের সহিত শত শত সাধ্বীর সজীব দেহ প্রচণ্ড চিতানলে দগ্ধ হইতে লাগিল,—যখন অনেক নাগরিক রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত পরমানন্দে সেই জ্বলন্ত চিতানল আলিঙ্গন করিল,—তখন পঞ্চাসরে যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রকাশিত হইল, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। রূপ—যৌবন—বীরত্ব—মহত্ব—স্বদেশানুরাগ—রাজভক্তি সকলই অনলে ভস্মীভূত হইল। রাজভক্তির পবিত্র রসে অভিসিঞ্চিত হইয়া ভারতবাসী ব্যতীত জগতের আর কোন জাতি রাজার সহিত একচিতানলে তনু ত্যাগ করিয়াছে? সেই অদ্ভুত অন্ত্যেষ্টিসৎকার ও আত্মোৎসর্গের সময়ে চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। এই অপূর্ব্ব অদ্ভুত দৃশ্যে ভুবরের পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইল,—

পাপচিত্তে পবিত্র প্রেমবারি উথলিয়া উঠিল। সৌররাজের অন্ত্যেষ্টিসৎকারে তিনি যোগদান না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সেই দিবসের জন্য তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার সমস্ত সৈনিক ও সেনানী সমরসজ্জা ত্যাগ করিয়া যথাবিধানে জয়শেখরের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপন করিবার নিমিত্ত সৌরগণের সহকারী হইলেন। যে স্থলে সেই পবিত্র চিতা প্রস্তুত হইয়াছিল, ভুবর তথায় একটী শিব মন্দির স্থাপন করিয়া দেব-বিগ্রহকে "গুর্জ্জর নাথ" নামে অভিহিত করিলেন।

পঞ্চাসরের অধঃপতনে কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রের অধিপতিদ্বয় বিজয়ী ভুবরের প্রধানতা স্বীকার করিলেন। অনন্তর শোলাঙ্কি রাজ রণশ্রান্তি দূর করিয়া নবজিত রাজ্যের পরিদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। গুর্জ্জরের শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার আর তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রিগণ যখন বলিল যে, শূরপাল যত দিন জীবিত থাকিবে, ততদিন তিনি নিষ্কণ্টকে তথায় থাকিতে পারিবেন না; তখন ভুবর রাজ্যরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ তথায় এক-জন মন্ত্রীকে স্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় রাজ-ধানীতে প্রতিগত হইলেন।

শূরপাল যে আশায় উৎসাহিত হইয়া ভগিনীকে বনমধ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্বরিত পদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তাহা সফল হইল না;—তিনি দুর্গ মধ্যে উপ-স্থিত হইতে না হইতেই জয়শেখর প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন। শূরপালের আপাদ-মস্তক প্রচণ্ড তাড়িততেজে কাঁপিয়া উঠিল, শিরোরুহ সকল কণ্টকিত হইল, নয়ন দিয়া জ্বলন্ত অনলশিখা বাহির হইতে লাগিল! প্রথম মুহূর্ত্তেই তিনি রাজার অনুগমনার্থ সমর-ক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া যদি প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে ভুবর নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবে; যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে; এখন ভবিষ্যতের জন্য মন্ত্রণা স্থির করা উচিত হইতেছে। বিধাতা যদি আমার ভগিনীকে একটী পুত্র সন্তান অর্পণ করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই গুর্জ্জর সিংহাসন পুনর্লাভ করিব; আমার সাহায্য ব্যতিরেকে সে গুরুতর ব্যাপার কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না।" তখনই তিনি ভগিনীর উদ্দেশে বহির্গত হইলেন; কিন্তু সেই নির্দ্দিষ্ট স্থলে তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়াতে অথবা তাঁহার সম্মুখে অবনত মস্তকে উপস্থিত হইতে না পারাতে গিণারের গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শুভকালের প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে রূপ সুন্দরী সেই বন মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কোন ভিলরমণীর সম্মুখে উপস্থিত হয়েন। সেই শবর-পত্নী তাঁহাকে উচ্চকুলোদ্ভবা স্থির করিয়া সবিনয়ে বলিল,—"ভগিনি! আমার সহিত তুমি এই বনে বাস করিবে আইস; এখানে ভাল ভাল ফল মূল পাইবে এবং নিরাপদে বাস করিতে থাকিবে।" রাজ্ঞী তাহার প্রস্তাবে সম্মতা হইয়া তৎসহ পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় সুখে দুঃখে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর শুভদিনে শুভক্ষণে

তাঁহার একটী সুলক্ষণ-সম্পন্ন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। "অত্যাচারীর উৎপীড়ন হইতে গোব্রাহ্মণ রক্ষা করিতে,—পাপীর উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে,—অদ্ভুত বীরত্ব ও মহত্বে পবিত্র সৌরকুল উজ্জ্বলিত করিতে পবিত্র বৈশাখের পঞ্চদশ দিবসে সূর্য্যদেবের উদয়কালে গুর্জ্জরের সূর্য্য পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইলেন। সেই দিন সুনির্ম্মল নীল নভোস্থলে অরুণদেব জগৎ হাসাইয়া হাসিতে হাসিতে উদিত হইলেন, বিমল আকাশে শীতল সমীরণ বহিতে লাগিল, বিমল নদীজল মধুর কলকলে বিমল সাগরে প্রবাহিত হইল; বিমলতেজা ব্রাহ্মণগণের হোমকুণ্ড হইতে বিমল অনলশিখা উত্থিত হইতে লাগিল; বিমল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিশ্ববাসী বুঝিতে পারিল—জগতে মহাবীর জন্ম গ্রহণ করিলেন।"

দেখিতে দেখিতে ছয় বৎসর অতীত হইল; বনবাসী সৌররাজকুমার বনপুত্র ভিল বালকদিগের সহিত লালিত হইয়া শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন শিশু রাজকুমার তরুশাখালম্বিত স্বীয় দোলামধ্যে বসিয়া আছে, এমন সময় জনৈক জৈন সন্ন্যাসী সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিতে পাইলেন; বালকের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ও সুলক্ষণ দেখিয়া তাঁহার জ্ঞান হইল, যেন কোন দেবকুমার সেই দোলামধ্যে বিরাজ করিতেছে। বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া শ্বেতাম্বর সেই শিশুর জননীকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং পরিশেষে রাজপত্নী জানিতে পারিয়া উপযুক্ত সম্মানসহকারে তাঁহাদের উভয়কে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। যে নগরের ভাগ্যচক্র একদা জয়শেখরের করে চালিত হইয়াছিল, আজি তাঁহার পট্টমহিষী অনাথার ন্যায় পুত্র ক্রোড়ে করিয়া তাহার প্রকাশ্য পথে পদব্রজে চলিয়া বেড়াইতেছেন, কেহ একবার চাহিয়াও দেখিল না। রূপসুন্দরী জানিতেন না যে, জয়শেখর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে যোগীর মুখে তাহা অবগত হইয়া গভীর শোকে অভিভূত হইলেন। জৈন সন্ন্যাসী তাঁহাকে বিস্তর সান্ত্বনা দিয়া তদায় শিশু পুত্রকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। রাজপুত্র বনমধ্যে জন্মিয়াছেন বলিয়া যোগী তাঁহার 'বনরাজ' নাম অর্পণ করিয়া সযত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন। বনরাজের জন্মবৃত্তান্ত তাঁহার মাতুলের গোচরিত হইল। নিবিড় পর্ব্বতপ্রদেশে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া অবধি শূরপাল একদিনের জন্যও নিশ্চিন্ত থাকেন নাই; সুযোগক্রমে সুবিধানুসারে তিনি সেই নিভৃত প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া ভুবরের প্রতিনিধিকে উৎপীড়ন করিতেন। এক্ষণে ভগিনী ও ভাগিনেয়কে তিনি সেই নির্জ্জনস্থলে লইয়া গেলেন এবং বনরাজকে নানাবিধ অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন।

বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত নগর পঞ্চাসর দুর্দ্ধর্ষ শত্রুহস্তে পতিত হইল,—কমলার আবাসনিলয় হাস্যময় সৌরাষ্ট্র রাষ্ট্রজিৎ ভুবর কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইল। সৌররাজ জয়শেখরের এই প্রচণ্ড শত্রু সম্বন্ধে নানা ভট্টগ্রন্থে নানা বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়;—কেহ ইহাঁকে দানব, কেহ দুরন্ত ম্লেচ্ছ, কেহ বা অপর কোন হিন্দু নরপতি বা প্রচণ্ড জলদস্যু বলিয়া বর্ণন

করিয়াছেন। "বংশরাজ" বা "বনরাজ চরিত" নামক একখানি ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে "সৌরাষ্ট্রের অধিপতি সৌররাজ যশোরাজের তুইটী রাজধানী ছিল,—দেববন্দর ও পত্তন সোমনাথ। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বংশরাজ জন্মগ্রহণ করেন। সৌরনরপতিগণ জলদস্যু ছিলেন,—বিশেষতঃ বঙ্গদেশের পণ্যপোতসমূহ লুণ্ঠন করাতে সাগর উদ্বেল হইয়া তাঁহার দেববন্দর নগর গ্রাস করিল; সেই ভয়ঙ্কর সঙ্কটে বংশরাজের জননী একমাত্র সুন্দরূপা ব্যতীত আর সকলেই নিহত হইল। বরুণদেব স্বয়ং তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন।" এই বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করিয়া মহাত্মা টড সাহেব অনুমান করেন যে, সৌররাজের সেই ভীষণ শত্রু হয়ত জলপথে আসিয়া অকস্মাৎ পঞ্চাসর (দেববন্দর) নগর ধ্বংস করিয়াছিল।* টড সাহেবের অনুমান কত দূর সত্যমূলক, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক চিত্র অনুশীলন করিলে এক অদ্ভুত শোকাবহ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ভারতের যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই লুণ্ঠন ও উৎসাদন, বিপ্লব ও বিগ্রহ এবং রাজ্যনাশ ও শোণিতপাতের লোমহর্ষণ দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে;—এক রাজ্যের ধ্বংসরাশির উপর অপর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, এক রাজবংশের চিতাভস্মের উপর অপর রাজকুলের অভ্যুত্থান, এক প্রকার শাসনবিধির পরিবর্ত্তে অপর প্রকার শাসনবিধির প্রবর্ত্তন;—এই প্রকার শোকাবহ বিপর্য্যয় ভারতের সর্ব্বত্র সংঘটিত হইতেছিল। যেন সমগ্র ভারতভূমি এক নূতন জীবনে উজ্জীবিত, যেন সমস্ত ভারতীয় রাজন্যসমাজ জীবনমরণের এক অভিনব সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত! এই সময়ে সিন্ধুদেশ হইতে এক প্রচণ্ড শত্রু আসিয়া আজমিরের অধিপতি চৌহানরাজ মাণিক পালকে সংহার করিল; বীরবর বাপ্পা এই সময়ে মৌর্য্য মাননৃপতির হস্ত হইতে চিতোররাজ্য কাড়িয়া লইলেন; প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ দীর্ঘকাল শ্মশানে পরিণত থাকিয়া তুয়ার নরপতিগণ কর্ত্তৃক নবজীবনে উজ্জীবিত হইয়া উঠিল; ধারা নগরীর অধিপতি প্রমার ভোজরাজা উত্তর দেশ হইতে আগত প্রচণ্ড আক্রমকের হস্তে পরাজিত হইয়া এই সময়ে চন্দ্রাবতী নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন; ওদিকে সুদূর পঞ্চালিকা রাজ্যের তদানীন্তন রাজধানী শালথানপুর হইতে বিতাড়িত হইয়া যাদব ভট্টিগণ শতদ্রুপারে ভারতীয় মরুভূমিতে উপনিবিষ্ট হয়েন; শোলাঙ্কিগণ সুরধুনীর সৈকতভূমিস্থ সুভদ্রা হইতে বিদূরিত হইয়া সুদূর মালবার উপকূলে কল্যাণনগরে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন; এমন কি বহুদূরস্থ গলকুণ্ডের পাষাণপ্রাকারের মধ্যভাগেও সেই ভীষণ আক্রমকের বিকট ভ্রূকুটি লক্ষিত হইয়াছিল। ভারতের সেই সর্ব্বসংহারক ভীষণ শত্রু কে? কাহার অজেয় বাহুবলের প্রভাবে ভারতের সর্ব্বত্র এই ভয়াবহ কালানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল? কে ভয়ঙ্কর যমদূতের ন্যায় ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিয়া ভারতবাসীর

* রাজস্থান ১ম খণ্ড ৫৫ পৃষ্ঠা।

সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল? ভট্টগ্রন্থে সেই প্রচণ্ড অরাতি "উত্তরদেশীয় ঐন্দ্রজালিক" "গজলিবন্দের দানব" প্রভৃতি ঘৃণ্য আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। তবে কি সেই উত্তরদেশীয় দানবই পঞ্চাসর নগর ধ্বংস এবং সৌবরাজ জয়শেখরকে নিহত করিযাছিল? টড সাহেব বলেন যে ঠিক এই সময়ে দুর্দ্ধর্ষ কাত্তিগণ মুলতান হইতে কচ্ছুমরু পার হইয়া সৌরাষ্ট্রে উপনিবিষ্ট হয়; * তথায় তাহাদিগের প্রতাপ দিন দিন এত বাড়িয়া উঠে যে, প্রাচীন সৌরাষ্ট্র নাম অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া কাত্তিবারাকে স্থান দান করে। কিন্তু সৌবকুলের সেই ভীষণ শত্রু যে শোলাঙ্কিরাজ ভুবর ব্যতীত আর কেহই নহে, ইতিপূর্ব্বে তাহা সবিস্তারে প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে বনরাজের চরিত আলোচনায় পুনঃপ্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ক্রমশঃ—

* (2) Tod's western India, P. 155.

কৃষি।

কৃষিবিদ্যা দেশের উন্নতির ভিত্তিমূল। সভ্যতা, শাস্ত্র-জ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি সমস্তই এই কৃষিকে মধ্যবিন্দুরূপে অবলম্বন করিয়া আছে। চাষারা পণ্ডিতগণের জ্ঞানদাতা, বিদ্যাশিক্ষার কারণ,—একথা শুনিতে বড় ভাল লাগে না, পরিহাস বলিয়া বিবেচনা হয় এই যা, নতুবা আমরা তাহাও বলিতে কুণ্ঠিত নহি। পেটে ভাত থাকিলে সকল বিষয়ই ভাল লাগে—এই সাধারন চলিত কথাটা অতি চমৎকার; একটু স্থির ভাবে চিন্তা করিলেই এটী যে বহুমূল্য কথা, তাহাতে আর সংশয় থাকে না। যতদিন দেশের লোক আহারের জন্য চিন্তিত না হয়, যতদিন অনায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, ততদিনই দেশে শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি পরিপাটী রূপে চলিয়া থাকে। দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ সকলের অবস্থা বিবেচনা করিলেই একথার বিশেষ প্রমান পাওয়া যাইবে। লোকে আহারের জন্য ব্যস্ত—কেবল উদরাগ্নি শান্তি করিতেই ব্যাকুল হইলে কে অন্য চেষ্টা করিবে? প্রাণ ধারণ যখন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এবং আহারই যখন সেই প্রাণধারণের মূল, তখন কাজে কাজেই আহারীয় সংগ্রহ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। "অন্ন চিন্তা চমৎকার"। কবির কবিত্ব, বক্তার বক্তৃতা, নটের নাট, মন্ত্রীর মন্ত্রনা, বিজ্ঞানবিদের বিজ্ঞান, শিল্পির শিল্প—সকলই অন্নচিন্তার নিকট পরাভূত, অন্নচিন্তা প্রবল থাকিলে কিছুই করা যায় না। কুতার্কিক তর্কের দ্বারা হয়কে নয়, নয়কে হয় করিতে পারেন, আমাদের এ প্রস্তাবের বিপক্ষে অনেক তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন, আমরা তাঁহাদের সকল প্রতিবাদের উত্তর দিতে চাহিনা, একবার মাত্র তাঁহাদিগকে অন্নচিন্তায় বিব্রত দেখিলেই সমস্ত মিটিয়া যাইবে। তিনি নিজের প্রতিবাদ নিজেই করিবেন, আমাদের আর সে জন্য ক্লেশ পাইতে হইবে না।

আমাদের দেশে কৃষিই আহারীয় সংগ্রহের প্রধান উপায়। কোন কোন অসভ্য দেশের মাংসাশী অধিবাসীদিগের মধ্যে মৃগয়াই আহারীয় সংগ্রহের উপায় বলিয়া পরিগণিত হয় বটে, কিন্তু আমাদের দেশের সেরূপ অবস্থা নহে, উদ্ভিদই আমাদের দেশীযগণেব প্রাণ, শস্যই একমাত্র জীবনোপায়। দেশীয় ব্যক্তিগণ যদি অনায়াসে এই জীবনোপায় শস্য প্রাপ্ত হয়েন, অনায়াসে প্রাণধারণ ও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কবিতে পারেন, তাহা হইলে আর চিন্তা কি? অনায়াসে নানাবিধ দেশহিতজনক কার্য্য সমাধা করিবার যথেষ্ট সময় হইল, নিশ্চিন্ত হইয়া চিন্তাশীলগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অন্নচিন্তায যদি মস্তিষ্ক ক্লান্ত না হইল তাহা হইলে তাহাব আরও অনেক কার্য্য করিবার ক্ষমতা রহিল।

ভারতের এখন যে অবস্থা, তাহাতে যদি বর্ষে বর্ষে দুর্ভিক্ষ না হইত—দিনেব মধ্যে অষ্ট প্রহরই কেবল পরিবার পোষণ জন্য ব্যাকুল না হইতে হইত, তাহা হইলে যে কত উন্নতি হইতে পারিত, তাহা বলা যায় না। যদি দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির আশা করিতে হয়, যদি ভারতের সুখ প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে সে সকল উন্নতির—সে সকল সুখের অন্তরায় অন্নচিন্তাকে দুর করিতে হইবে। সেই অন্নচিন্তা দূর করিবার একমাত্র উপায়—কৃষি, এবং সেই কৃষির কর্ত্তা কৃষক। চাষার উন্নতিই আমাদের দেশে পণ্ডিত শিল্পি ও জ্ঞানীদিগের উন্নতি ও তাহাদের অবনতিতেই আমাদের সর্ব্বনাশ। আমাদের দেশের চাষার শরীর ও মন যদি সুস্থ থাকে, বর্ষায় যদি সুবৃষ্টি হয়, তাহা হইলে আমরা আর কিছুই চাহি না—তখন আমাদের উন্নতি অপ্রতিনিবার্য্য। আমাদের এখন যে কিছু শিল্পের প্রয়োজন, সে শিল্প আর কিছুই নহে, কেবল কৃষির উন্নতির জন্য শিল্প। আমরা যদি দেবমাতৃক স্থান সকলকে দৈবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিয়া নদীমাতৃক করিতে পারি,- শিল্পের দ্বারা হাজা শুকা নিজের আয়ত্তে আনিতে পারি, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলও আয়ত্তে আনিতে পারিলাম। আমরা এখন দেশালাইয়ের কল চাহি না, সাবানের কল চাহি না, গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতের উপায় চাহি না; সে সকল বিষয়ে চিন্তা করিয়া মস্তিষ্ক ব্যয় করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা এখন কৃষিবিষয়ক যন্ত্র চাহি, শুষ্ক ক্ষেত্রে জল সেচনের কল চাই, অনুপযুক্ত ক্ষেত্রকে শস্যোৎপাদনেব উপযোগী করিবার জন্য সার চাই, ক্ষেত্রে অপরিমিত জল জমিলে তাহা বাহির করিয়া দিয়া শস্য বাঁচাইতে চাই। যিনি এই সকল উপায়ের কোন অংশ সুসম্পন্ন কবিতে পাবিবেন, তিনিই এই ভাবতের ভাবী উন্নতির কারণ স্বরূপ চিরস্মরণীয় হইবেন। যিনি একটী আদর্শ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া কৃষকদিগকে উদাহরণ দেখাইবেন, কৃষির উন্নতির নূতন উপায় দেখাইয়া দিবেন, তিনিই দেশের প্রকৃত উন্নতির কারণ হইয়া অক্ষয় যশ লাভ করিবেন।

প্রচলিত কথায় আছে বাণিজ্যতেই লক্ষ্মীর বাস এবং কৃষি কার্য্যে তাহার অর্দ্ধেক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের বঙ্গদেশে কৃষি কার্য্যেই লক্ষ্মীর বাস। যে বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহাতে

হিন্দুজাতির অধিকার নাই। সে বাণিজ্য—মুদিখানার বা মনিহারীর দোকান নহে; যে দেশে আছি, সেইখানেই থাকিব—ভিন্নদেশে যাইব না অথচ আমার বাণিজ্য চলিতেছে—সে বাণিজ্য এবাণিজ্য নহে; তাহাতে ইহাতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে।

যখন প্রবাদটী প্রচলিত হইয়াছিল তখন ভারতবর্ষে এরূপ পথের সুবিধা ছিল না, একগ্রাম হইতে এক দ্রব্য অপর গ্রামে লইয়া যাওয়া অতীব দুরূহ ছিল। এখন যেমন ইচ্ছা হইলেই দিল্লির দ্রব্য কলিকাতায়, কলিকাতার দ্রব্য দিল্লিতে আনয়ন ও প্রেরণ কবা যায় তখন তাহা হইত না সুতরাং ব্যবসায়ীরা কষ্টে স্বষ্টে কোন প্রকারে এক প্রদেশের দ্রব্য অন্য প্রদেশে লইয়া যাইতে পারিলেই প্রচুর লাভ করিতে পারিত, দ্বিগুণ চতুর্গুণ করিতে পারিত। তখন এ প্রবাদ শোভা পাইয়াছে, এখন আর ভারতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বাণিজ্য করিয়া সে কথাব সার্থকতা সম্পাদন করা যায় না। হিন্দুস্থানের সীমা অতিক্রম করিয়া বিদেশ গমন কি সমুদ্রযাত্রা হিন্দুর পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব—সে আশা এখন এক প্রকার দুরাশা। সুতরাং আমাদের পক্ষে কৃষিই শ্রেষ্ঠ অর্থকর; আমরা যে সকল উপাযে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারি, কৃষিই তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বঙ্গে যদি কিছু রত্ন থাকে, সে রত্ন কৃষকের ক্ষেত্রে আছে—বঙ্গে যদি অতুল সম্পত্তিলাভ হয়—তাহা এই দেশের ভূমি হইতেই হইবে। যদি বঙ্গদেশকে ধনশালী করিতে হয়, যদি বঙ্গদেশকে উন্নত করিতে হয়, ভূমির উন্নতি কর—পরিশ্রম কখনই ব্যর্থ হইবেনা, কখনই সে চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না। ক্রমশঃ—

রাধা ও ললিতা।

গীত।

ল।—চির প্রেমাধীন তব হরি—
বাঞ্ছা কল্পতরু নাম,
এ বঞ্চনা তবে কেন গো তোমার সনে?
অথবা আমার যত সহচরীগণ,
অপরাধী বুঝি সখি ও রাজীব পায়।—
তাই হেন বিড়ম্বনা
করিলে সবার প্রেমাধিকে,
ভকতবৎসলে!
কহ সত্য—কি! হ'তে কি হ'ল?

রাধা।—(অন্য মনে)—
আহা! অনুরাগে লালসা বাড়িল
মন প্রাণ তাহাতে মাতিল,
অঙ্গে অঙ্গে মিশাইয়ে
রতিরঙ্গে হইনু বিভোর,—
কিন্তু, হায়!
না পুরিতে অনঙ্গ-বাসনা—
সে ত্রিভঙ্গ করিল ছলনা,
তোরা আসি করা'লি চেতনা,
হারানু চৈতন্যপূর্ণ চিদানন্দময়ে;
কে জানে কি মায়ার কৌতুকে!

ল।—কি বলিলে, সখি, মায়াধারী হরি
পরিহরি নিকুঞ্জ তোমার
অন্তর্ধ্যান আপন মায়ায়,নিকুঞ্জ-বিহারী!
অসম্ভব!
মায়াযোগে প্রীতিযোগে
কে আঁটে তোমারে!
তব মায়া জগতের বীজ,
মুগ্ধ যাহে আপনি শ্রীহরি,
যোগমায়ে, যোগমায়া তুমি,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটী
নিত্য বিমোহিত তব মায়া মন্ত্রজালে;
তবপাসে মায়ার চাতুরী!
হরি হরি! বলিহারী তোমার মায়ায়—
আত্মাশক্তি অদ্বিতীয়া নারী তুমি
কিবা শক্তি ধরে সে পুরুষ,
ভুলাতে তোমায়, মহামায়ে?
মহামায়া রাসরাসেশ্বরী
ভেবে দেখ—
পদে পদে প্রেমের ভিখারী—
যে হরি তোমার পায়—
গতি যার তোমার কৃপায়,
ছলিয়া তোমায
কি উপায় মিলিবে তাহায়?
রা। (গগনে চলন্ত মেঘ দর্শনে)—
সখি, সখি ললিতা সুন্দরি!
দেখ মরি মরি—ধরি রূপ মনোহর,
আসে শ্যাম নটবর।
ল।—কৈ সই—কোথা সে নিঠুর?
রা।—বিমানে পবনে করি ভর, আসিছে মাধব!
এতদিনে এ অধীনী জনে
স্মরণে পড়েছে বুঝি;
দেখ সখি, বুঝি লাজ পেয়ে,
না পারে আসিতে,—তাই স্তম্ভিত হইয়ে
দাঁড়াইয়া রয়—লাজে বদন লুকায়!
(উন্মাদিনীর ন্যায় মেঘোদ্দেশে)—
এস, নাথ এস, রাধা এখন (ও) জীবিতা প্রাণে
চরণে বিক্রীতাজনে কি কারণে করিছ সরম?
আমি তোমা বই নাহি জানি,
চিন্তামণি! তব চরণ দুখানি—
এ দাসীর হৃদয় জুড়ান ধন!
প্রাণমন সমর্পণ করি জীবন-রতন
ও রাঙা চরণ পরে
দিছি ধরে চিরতরে তোমারে প্রাণেশ
আমার এ বুকভরা প্রেম।
কৈ এলে না—
রাধা তব মরে দেখনা নিঠুর!
নাহি জানি দয়াময়,
কি দোষ করেছি তব পায়ে
তাই নিরাশে অনাশে ফেলে
চলে যাও—দেখনা চাহিয়ে!
(ললিতার প্রতি)
সখি, ধর প্রাণেশ্বরে,
মনচোরে প্রেমডোরে বেঁধে আন;
ঐ সরে যায়—পলাইছে দ্রুত,
কেন হেন হ'ল, দেখা দিয়ে পুনঃ পলাইল,
বিরহ ব্যথিতা রাধা কি দোষ করিল,
কাঁদায়ে চলিল?
ল।—সখি, তুমি উন্মাদিনী হলে,
কোথা শ্যাম তব?
গগনে নেহারি—কৃষ্ণ পয়োধর,
ভাব প্রাণেশ্বর—শ্যামনটবর—
ধন্য তব প্রেম, প্রেমময়ী রাধে।

শ্রীপাঁচকড়ি দে,
এম্ এ।

(গীত)

বেহাগ—একতালা।

না জানি স্বজনি,
কোথা হরি মোর, শ্যামনটবর—
জীবন, জীবননাথ গুণমনি ॥
কি কঠিন তার সে কঠিন হৃদি,
কাঁদাইল মোরে সাধে বাদ সাধি,
তার তরে কাঁদি আমি নিরবধি
সদা আকুল পরাণী।
আবার আসিব বলে চলে গেল,
কেন সখি হায়, আর না আসিল,
অভাগিনী বল কি দোষ করিল—
সে হেতু ত্যজিল ;
আশাবশে বসে আছি লো এখনো,
নয়নের নীর ঝরে অণুক্ষণ
আশা ভেঙে গেল, সাধ না মিটিল,
কেন কাঁদে মন, না জানি।
শ্যামচাঁদ বিনে, কিবা কাজ প্রাণে,
ত্যজিব জীবন জলধি-জীবনে,
নাহি সাধ মনে আর এ মিলনে—
যাতনা মিলনে ;
কোকিল কোকিলা দেখ অনিবার,
করিছে আমারে তীব তিরস্কার
গুঞ্জরি গুঞ্জরি, ভ্রমর ভ্রমরী
কহে শুন কটু বানী।
মুগ্ধ কুঞ্জ পুঞ্জে নিশা সমীরণ
দেখ সখি ধীরে, করে বিচরণ,
পুরনিমা শশী নভঃপ্রান্তে বসি
করে পরিহাস ;
তার তরে যে লো, আমি পাগলিনী,
চমকিয়া উঠি শুনি মৃদুধ্বনি,
নাহি এল নাথ, হইল প্রভাত
পোহাল দেখ রজনী।

স্মৃতি ও কামনা।

আকাশ পাতাল ভাবি
তাবসনে ভাবি তোরে,
তোমার মোহিনী ছবি
মানস মোহিত করে।
তুজনায় সন্ধ্যাবেলা
আকাশে সুধাংশু দেখি,
কত হাসি হাসিয়াছি
আকাশে সুধাংশু দেখি
গুপ্ততটে সুপ্ত জোৎস্না
প্রবাহিনী নীরে চলে,
সুপ্তনীল নভে নেচে
নীরদ যেতেছে চলে,
তম ঢাকা নীড়হতে
ডাকিয়া নীরব পাখী,
কোথা স্বর কোথা পাখী
উভয়ে ফিরাযু আঁখি,
উভয়ে উভয়ে কত
চিত্ত আত্মহারা হয়ে
করিয়াছি আলাপন
কথা সনে কথা দিয়ে ;
কখন পাগল মনে,
উভয়ে পাগল হয়ে
তর্ক কি বিতর্ক কত
উভয়েতে গেছে বয়ে,
চাঁদ সনে কত কথা
কত কথা মনে গাঁথা
কত সুখ, কত শান্তি
কত যে প্রেমের গাথা ;
কত আশা মনে উঠে
মলয়ে উঠিছে ঢেউ,
তুমি আমি বিনে বালা
অপরে বুঝে না কেউ ;

কামনা যাতনা কভু
কামনা সুখের সেতু
কামনা সৌন্দর্য্যময়
কভু বা রোদন হেতু,
কামনা পলায়ে গেলে
জীবন পলায়ে যাবে,
সুখ দুঃখ দুই থাক
কামনা রাখিতে হবে,

কামনা জলধী নীরে
সারাকাল ডুবেরব,
সারাদিন সারানিশি
ভাবিব মুরতি তব ;
এই আশা আশাময়ি
আঁধার হৃদয় আলো
সুখ দুঃখ যত সহি
মিশিতে কামনা ভাল।

শ্রীপাঁচকড়ি দে, এম্ এ।

আমার পশ্চিমে চাকরি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিদ্রোহই হউক, আর সিপাহিরা ক্ষেপিয়াই উঠুক, আমাদের বরাত কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। এত গোলমালে কোথায় একটু কাজ কমিয়া পড়িবে, তাহা না হইয়া যে কাজ ছিল, তাহার দ্বিগুণ হইয়া পড়িল। আগে ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত খাটিলেই চলিত; কিন্তু সাহেব সপরিবারে পূর্ব্বোল্লিখিত বারাকে স্থানান্তরিত হওয়ার পর, আমার কাজ আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। রোজ রোজ বাসা হইতে যাওয়া আসা অসুবিধা বুঝিয়া সাহেব আমায় তাঁহার বারাকেরই একটী অংশ পরদা দিয়া ঘেরিয়া দিলেন; এখন হইতে আপিসেই আমার বাসা হইল।

বৈশাখ মাস কি জ্যৈষ্ঠমাস হইবে, মধ্যাহ্ন সময়—রৌদ্র যেন ঝাঁঝা করিতেছে, চোখের সম্মুখের জিনিস গুলা যেন রোদে ঠিকরিয়া পড়িতেছে। গাছের পাতা গুলি স্থির ও নিস্তব্ধ। ডালের মধ্যে পাখীগুলিও চোখ্ বুজিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। আকাশে প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ড-তেজ শুভ্র তুলারাশিবৎ মেঘখণ্ড মধ্যে আগুণের কণা ছড়াইতেছে। রাস্তায় কচিৎ দুই চারিটা লোক, ভারবাহী পশু বা শকটের চক্রনির্ঘোষ। আমি নির্জ্জনে মাথা গুঁজিয়া আপনার সেই পরদা ঘেরা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় বসিয়া কাজ লইয়া সেই মহা মধ্যাহ্নের বিরাট নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া রহিয়াছি।

এমন সময়ে সহসা বাহিরে একটা "ধর ধর" শব্দ উঠিল। জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, একটী হিন্দুস্থানী প্রাণপণে ছুটিতেছে আর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ১০।১২ জন সিপাহী। সিপাহীদের দৌড়াইতে দেখিয়া দুই চারিজন গোলন্দাজী গোরাও সেই সঙ্গে ছুটিতেছে।

লোকটাকে ধরিতে বেশীক্ষণ লাগিল না। যখন জনতাটা বড় বাড়িয়া উঠিল, তখন নীচে নামিতে ইচ্ছা হইল। বড় বড় সাহেবরা, মেম সাহেবরা বারান্দায়

দাঁড়াইয়া। ঘটনা কি—কেহই স্থির করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু গোরা ও সিপাহীকে সেই অবস্থায়—সেই রৌদ্রে সেই প্রকার দৌড়াদৌড়ি করিতে দেখিয়া তাঁহারা অবশ্য বিস্মিত হইয়াছিলেন। আমার সাহেব চাপরাসী পাঠাইয়া দিলেন। সে শুনিয়া আসিল যে, লোকটা ৫৬নং দেশী পদাতিক দলের এক জন হাবিলদারের চাকর। ধস্তাধস্তির চোটে তাহার কাপড়ের ভিতর এক খানা পত্র পাওয়া গিয়াছে। সেই পত্রে ২নং লাইট অশ্বারোহী দলের প্রধান সিপাহীকে বিদ্রোহ সম্বন্ধে উত্তেজিত করা হইয়াছে।

যাহারা সেই অপরাধীকে ধরিল তাহারা ইংরাজের বিশ্বস্ত সিপাহী। সেই জন্যই তাহাদের সেই ছাউনীর গোলন্দাজদের সঙ্গে পাহারা কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই লোকটার প্রতি সন্দেহ হওয়ায়, তাহারা তাহাকে পীড়াপীড়ি করে। পীড়াপীড়ির চোটে সে দৌড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করে। তার পর সিপাহীরা ও সিপাহীদের দৌড়াইতে দেখিয়া গোরারা গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

ছাউনীর এড্‌জুটেণ্ট্ সাহেব সেই বারাকেই ছিলেন। চাকরটাকে বন্দী করিয়া তাঁহার কাছে আনা হইল। তিনি সেই পত্রাদি দেখিয়া লোকটীকে শক্ত পাহারাবন্দী করিয়া পত্র সমেত জেনারেল হুইলারের কাছে পাঠাইলেন।

পত্রে লেখকের নাম নাই। লেখা পারসীতে, দ্বিভাষীর দ্বারা তাহার অনুবাদও সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ। লোকটাকে বেশী পীড়াপীড়ি ও ভয় দেখানতে সে তাহার প্রভুর নাম বলিয়া দিল। তাহার প্রভু "জানমহম্মদ" উক্ত পদাতিক দলের একজন হাবিলদার। জানমহম্মদ ২নং লাইট অশ্বারোহীদলের অধ্যক্ষকে "সাহেব লোক" দিগের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিতে বলিয়াছেন। ছয় নম্বরের প্রথম সংখ্যক গোলন্দাজদল—বিলাতী গোরা। জান সাহেব লিখিয়াছিলেন—"ভাই সকল সাবধান—ফিরিঙ্গি যে তোমাদের অতি কাছে গোলন্দাজ রাখিয়াছে, তাহা কেবল তোমাদের শাসনের জন্য।"

জান মহম্মদের বিরুদ্ধে প্রমাণ যথেষ্ট ছিল। অন্য সময় হইলে—হয় ত তাহার অন্য প্রকার শাস্তি হইত। কিন্তু তখন বড় সঙ্কটাপন্ন কাল। কাজেই প্রাণ দণ্ড তাহার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি হইলেও—তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া হাজতে রাখা হইল। পর দিন যদিও তাহার ফাঁসির দিন ধার্য্য হইয়াছিল কিন্তু পাছে সিপাহীরা উত্তেজিত হয়—এই ভয়ে তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না।

২৮এ মে আসিল। এই দিন মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জন্ম দিন। কিন্তু এই দিনে যে সম্মান সূচক তোপধ্বনি হয়—তাহাও করা হইল না—পাছে সিপাহীরা কোন প্রকারে রুষ্ট বা সন্দেহ করে।

এই সময়ে আর একটী নূতন ঘটনা ঘটিল। বিঠুরের নানা সাহেব সর্ব্ব প্রথম, কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া দেখা দিলেন। নবাবগঞ্জে ইংরাজের একটী খাজনা খানা (Treasury) ছিল। নানা সাহেব স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই খাজনা খানা রক্ষার ভার লইলেন। নানা সাহেবের উপর ইংরাজ কর্ম্মচারীদের যে, বিশেষ বিশ্বাস ছিল, তাহা এই ঘটনা হইতেই বিশেষ প্রমাণ

পাওয়া যায়। তিনি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিদিগের সম্মতিক্রমে ৫০০ বিশ্বস্ত অনুচর লইয়া সেই খাজনা খানায় ৮॥ সাড়ে আট লক্ষ টাকার রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

নানা সাহেবকে আমরা পূর্ব্বেও দুই একবার দেখিয়াছি। তিনি বিঠুরেই থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে কানপুরে সহরের মধ্যে আসিয়াও দুই চারি মাস কাটাইতেন। একবার এক নাচের মজলিসে তাঁহার সেই বীরমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। কানপুরের বিখ্যাত সওদাগর নাথুদাসের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে যে মহা জাঁকজমক হয়, সে ক্ষেত্রেও নানা সাহেবকে দেখিয়াছি। তখন কে জানিত যে, সেই সৌম্য মূর্ত্তি নানা সাহেব হইতে ভবিষ্যতে অমন বীভৎস ও নৃশংস ঘটনা সূচিত হইবে!!

নানা সাহেবের বাহ্যিক চেহারা দেখিলে তিনি যে একজন তেজস্বী পুরুষ তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার শরীর অতি সুগঠিত, চক্ষুদ্বয় আকর্ণ বিস্তৃত গুম্ফ ও শ্মশ্রুতে সেই উজ্জ্বল শ্যাম মুখমণ্ডল সুশোভিত। বেশ ভূষায় তাঁহার বিশেষ জাঁক জমক ছিলনা। সোজা সুজি হিন্দুস্থানি বড় লোকেরা যেরূপ পোষাক পরেন, তাঁহারও সেইরূপ। তবে গলায় মতির মালা, মস্তকে উষ্ণীসাকৃতি মহারাষ্ট্রীয় পাগড়ি, কটিবন্ধে বাঘনখ ও কটিতটে বিশাল তরবারি দেখিলে তাঁহাকে সহজ ভদ্র লোক না ভাবিয়া একজন বীর পুরুষ বলিয়াই প্রতীতি হইত।

প্রভাত কুসুমের মনঃপ্রাণহারী সৌন্দর্য্য দেখিয়া কে কবে ভাবিয়াছে, তাহার মধ্যে কালকীট অবস্থান করিতেছে? আমাদের ন্যায় সহজ বুদ্ধি লোক দূরে থাক, কূট বুদ্ধি উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিরা পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত রহস্যোদ্ঘাটন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

নানা সাহেবের চিত্র ইংরাজি ইতিহাসে অতি কলঙ্কিত ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। যদি সিপাহীবিদ্রোহ না হইত, তাহা হইলে হয়ত তিনি নগণ্য হইয়াই পড়িয়া থাকিতেন। তাঁহার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে পবিত্র মহারাষ্ট্রীয় শোণিত প্রবাহিত ছিল কিন্তু তিনি জীবনে যে গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে পিশাচের উচ্চ আসন প্রদান করা হইয়াছে। আমি নানা ও তাঁহার সঙ্গীদের সমন্ধে যাহা জানি এক্ষণে তাহারই সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব।

নানা সাহেব—শেষ পেশওয়া বাজীরাওয়ের পোষ্যপুত্র। বাজীরাও অপুত্রক ছিলেন, জীবিতাবস্থায় নানাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। বাজীরাওয়ের পুত্র সন্তান হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার দুই কন্যা বর্ত্তমান ছিল।

বাজীরাও নানা সাহেবকে যে কেবল পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ নহে। সদাশিও রাও বলিয়া আর এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পুত্রকেও তিনি পোষ্যরূপে পালন করেন। বাজীরাওয়ের দুই পুত্রেরা যথাক্রমে, ধুন্দুপন্থ নানা সাহেব ও সদাশিব রাও দাদা সাহেব বলিয়া কথিত হইতেন।

দাদা সাহেব যৌবনের প্রারম্ভেই ইহলোক ত্যাগ করেন। বাজীরাও তাঁহার স্থলে, নানার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালা সাহেবকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করেন। দাদা সাহেব অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং তিনি পোষ্যপুত্র-বধূর জন্য নানার এক ভ্রাতস্পুত্র—রাও সাহেবকে তাঁহার

পোষ্যপুত্র করিয়া দেন। এই পোষ্য-পুত্র সম্পর্কে রাও সাহেব পেশোয়া বাজীরাওয়ের পৌত্র ও নানা ও বালা সাহেবের ভ্রাতষ্পুত্র হইলেন।

বাজীরাওয়ের সহিত ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনেকগুলি সংঘর্ষন ঘটে। পরিশেষে সন্ধি দ্বারা এই স্থির হয়, ইংরাজ কোম্পানী তাঁহাকে বাৎসরিক আট লক্ষ টাকা মাসহারা দিবেন। এই সময় হইতে তাঁহার সমগ্র রাজ্য ইংরাজ শাসনাধীনে আইসে। বাজীরাও পুনা ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে বিঠুরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বিঠুর কানপুর হইতে ছয় ক্রোশ দূরে। বাজীরাও ৩৫ বৎসর এই বিঠুরে বাস করিয়া (১৮৫১ খৃঃ অব্দের ২৮ শে জানুয়ারি) নানা সাহেবকে তাঁহার এক মাত্র উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারণ করিয়া বিঠুরের ও অন্যান্য স্থানে তাঁহার যে সমস্ত ভূসম্পত্তি ও ধন রত্নাদি ছিল তাহার দানপত্র করিয়া দিয়া পরলোক গমন করেন।

বাজীরাওয়ের মৃত্যু সংবাদ যখন তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডাল-হৌসীর কর্ণে পৌছিল, তখন তিনি সরকারী কাগজে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা বাজীরাওয়ের আট লক্ষ টাকা মাসহারা বন্ধের কথা সাধারণে বিজ্ঞাপিত করিলেন। নানা সাহেব এই ঘোষণা পত্র দেখিয়া মর্ম্মাহত ও সম্পূর্ণরূপে বিচালিত হইয়া উঠিলেন। তিনি উত্তরপশ্চিম প্রদেশের তৎকালীন শাসনকর্ত্তার নিকট ঐ আট লক্ষ টাকার জন্য দাবী করিয়া এক প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করিলেন। তাহার উত্তর আসিল নানা সাহেব উক্ত আট লক্ষ টাকা পাইবেন না বটে কিন্তু তাঁহার নিজের সম্পত্তি স্বরূপে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কতকগুলি ভূসম্পত্তি প্রদান করিবেন।

বলাবাহুল্য নানা এই প্রস্তাবে বিশেষ প্রফুল্লিত হইলেন না। কোথায় বাৎসরিক আট লক্ষ টাকা আয় আর কোথায় সামান্য ভূসম্পত্তি। তাঁহার মনের মধ্যে তখন ভীষণ অগ্নি জ্বলিতে ছিল। তিনি ১৮৫২ অব্দে ডিসেম্বর মাসে বিলাতে কোর্ট অব্ ডিরেক্টার দিগের নিকট এক দরখাস্ত প্রেরণ করেন। একবৎসর পরে, এই দরখাস্তের উত্তর আসে যে, নানা সাহেব উক্ত আট লক্ষ টাকা পাইবেন না।

আজিমুল্লা খাঁ নামক নানার এক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। এব্যক্তি ভবিষ্যতে নানার সহায়তা করিয়া ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে চিত্রিত হইয়াছেন। নানা এই আজিমুল্লাকে ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে বিলাতে তাঁহার উকীল স্বরূপে প্রেরণ করেন। কিন্তু আজিমুল্লাও অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর বিফল মনোরথ হইয়া হৃদয়ে প্রতিহিংসা পোষণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

আজিমুল্লা প্রথমে অতি দরিদ্র ছিলেন। ১৮৩৭—৩৮ অব্দে উত্তর-পশ্চিমে এক দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দুর্ভিক্ষে আজিমুল্লা অন্নাভাবে পিতামাতা কর্ত্তৃক পথে পরিত্যক্ত হন। আজিমুল্লার মাতাকে একজন পাদরি সাহেব খোরাকীর লোভ দেখাইয়া আলোকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু দরিদ্রা হইলেও তাঁহার মনে মুসলমান ধর্ম্মানুরাগ বিশেষ রূপে প্রবল ছিল। সুতরাং আজিমুল্লার মাতার খ্রীষ্টান হওয়া হইল না।

পেটল বলিয়া এক সাহেবের এক স্কুল ছিল। পথ পরিত্যক্ত বালক আজিম, সাহেবের সহায়তায় সেই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া বিনা বেতনে পড়িতে লাগিল। ইহার উপর আবার তাহার তিন টাকা

করিয়া বৃত্তি বরাদ্দ হইল। তাহার বৃদ্ধা মাতা, এক সাহেবের বাটীতে আযার কাজ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। দশ বৎসর পরে আজিমুল্লা কানপুরের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এই বিদ্যালয় হইতেই আজিমুল্লার উন্নতির সূত্রপাত হইল। ব্রিগেডিয়ার স্কট নামক একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ এই সময়ে তাঁহাকে নিজের মুন্সী রূপে গ্রহণ করেন। পরে আজিম কার্য্যদক্ষতার গুণে Ho'ble Ashburnham সাহেবের মুন্সী নিযুক্ত হন। এই খানেই আজিমের অধঃপতন আরম্ভ হইল। পদমর্য্যাদায় উপেক্ষা করিয়া তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিতে ও নানা প্রকারে অসৎ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন; সাহেব তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। ইহার পর আজিম নানা সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

নানা ও আজিমুল্লার সংমিশ্রনের প্রথম ফল—শেষোক্তের বিলাত গমন। তাহার পরিণাম পাঠক জানিতে পারিয়াছেন। এখন আজিমুল্লা দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রতিহিংসা জর্জ্জরিত নানার প্রধান মন্ত্রনাদাতা হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাঁদের মিলনের পরিণাম কিরূপ ভয়ানক ফলসপ্রসব করিয়াছিল, পাঠক, পরে তাহার পরিচয় পাইবেন।

আমরা যে সময়ে নানাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তাঁহার বয়স, ৩৫ হইতে ৪০এর মধ্যে অমন জোয়ান চেহারার হিন্দুস্থানী খুব অল্পই আমার চক্ষে পড়িয়াছে। তাঁহার গোলাকার মুখমণ্ডল, কুঞ্চিত গুম্ফ, স্থূল ও বলিষ্ঠ দেহ আজও আমার মনে পড়িতেছে। নানা এই সময়ে বিঠুরে গঙ্গাতীরে এক ক্ষুদ্র প্রাসাদে বাস করিতেন।

এই স্থানকে তিনি, দেবালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা দ্বারা, একটী ক্ষুদ্র রাজপুরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগত বহুসংখ্যক মারহাট্টা দেশ ছাড়িয়া আসিয়া তাঁহার চারিদিকে বসবাস করিতেছিল।

বিঠুরের বাড়ীতে থাকিতেন বালারাও, বাশভাট, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেব, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আজিমুল্লা ও বিশ্বস্ত সহচর—তাঁতিয়া তোপী। ইহারা কয়জনেই ভবিষ্যতে যে মহানৃশংস, লোমহর্ষক কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা শোণিতাক্ষরে ভারত ইতিহাসের কয়েকটা পৃষ্ঠায় জলন্তরূপে লিখিত রহিয়াছে।

নানার মনে যাহাই থাকুক না কেন, মনে মনে তিনি যতদূর ইংরাজের প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ হউন না কেন, প্রকাশ্যে তিনি উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের সহিত বিশেষ আত্মীয়তা দেখাইয়া চলিতেন। মাঝে মাঝে বড় বড় সাহেব ও মেমকে নিমন্ত্রণ করিয়া বড় বড় ভোজ দিতেন। নাচ গান, আমোদ প্রমোদের উত্তেজিত তরঙ্গস্রোতে হৃদয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে ধূমায়িত প্রতিহিংসা-অগ্নি চাপিয়া রাখিতেন। সাহেবরা নানা সাহেবের ব্যবহারে তাঁহার মনের ভিতর যে প্রতিহিংসা জাগিতেছে তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বত্র নানার সহৃদয়তা, অমায়িকতা, সামাজিকতা ও ইংরাজ-প্রিয়তা গুণের শত মুখে প্রশংসা করিয়া প্রফুল্লিত হইতেন।

ক্রমশঃ—

আয়ুর্ব্বেদ।

রাজযক্ষ্মা চিকিৎসা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

মধুস্তাপ্য বিড়ঙ্গাশ্ম জতু লৌহ ঘৃতাভয়াঃ
ঘ্নন্তি যক্ষ্মাণ মত্যুগ্রং সেব্যমানা হিতাশিনা।

যক্ষ্মারিলৌহ—স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু, হরিতকী চূর্ণ ও লৌহ এই সমুদায় ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া অবলেহ করিলে উৎকট যক্ষ্মা নিবারিত হয়। নিম্নলিখিত যোগটী প্রয়োগ করিয়া বহুস্থলে উৎকৃষ্ট ফল লাভ করা গিয়াছে।

বিন্ধ্যবাসিযোগ—ত্রিকটু, শতমূলী, ত্রিফলা, বলা ও নাগবলা, প্রত্যেক ১ তোলা ও লৌহ ৯ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য একত্র সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া লইবে। ৴৹ আনা মাত্রায় ঘৃত ও মধু সহ অবলেহ করিলে অথবা সেবন করিলে উরঃক্ষত, কণ্ঠক্ষত ও কণ্ঠগত অপর রোগ, রাজযক্ষ্মা ও বাহুস্তম্ভাদি পীড়া নিশ্চয় প্রশমিত হয় ও শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ হয়, কারণ লৌহ অতিশয় রক্ত পরিষ্কারক ও বলকারক।

রাস্না তালীশ কর্পূর ভেকপর্ণী শিলাহ্বয়ৈঃ।
ত্রিক ত্রয় সমাযুক্তো লৌহো যক্ষ্মান্তকো মতঃ॥
সর্ব্বোপদ্রব সংযুক্ত মপি দৈাষবিবর্জ্জিতম্।
হন্তি কাসং স্বরাঘাতং ক্ষয়কাসং ক্ষতক্ষয়ম্॥
বল বর্ণাগ্নিপুষ্টীনাং সাধনো দোষনাশনঃ।

যক্ষ্মান্তক লৌহ—রাস্না, তালীশপত্র, কর্পূর, থুলকুড়ি, শিলাজতু, ত্রিফলা (হরিতকী আমলকী ও বহেড়া) ও ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, মুতা ও চিতামূল,) প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ অর্থাৎ অন্য সকল দ্রব্য মিলাইলে যত হয়, তত পরিমাণ লৌহ, একত্র জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। প্রাতে ১টী মধু দিয়া মাড়িয়া বাসকপত্র রস বা অপর কোন উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে কাস, স্বরভঙ্গ, ক্ষয়কাস ও ক্ষতক্ষীর্ণ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় এবং বল বর্ণ পুষ্টি ও পাচক অগ্নির বৃদ্ধি হয়। ইহা যক্ষ্মা রোগের সুপ্রসিদ্ধ মহৌষধ।

ত্রিকটু ত্রিফলৈলাভি র্জাতিফল লবঙ্গকৈঃ।
নবভাগোন্মিতং লৌহং সমং সিন্দুরসন্নিভম্॥
ছাগী দুগ্ধেন সংপেষ্য বল্লমস্য প্রযোজয়েৎ।
মধুনা ক্ষয়রোগাংশ্চ হন্ত্যয়ং ক্ষয়কেশরী॥

ক্ষয়কেশরী—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, এলাইচ, জায়ফল ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা লৌহ ৯ তোলা, একত্র ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান কণ্টকারীর ক্বাথ ও মধু কিম্বা কেবল মধু। ইহা সেবনে ক্ষয়রোগ নিবারণ হয়।

কর্ষং শুদ্ধ রসেন্দ্রস্য স্বরসেন জয়ার্দ্রয়োঃ।
শিলায়াং খল্বয়েত্তাবদ্ যাবৎ পিণ্ডং ঘনং ভবেৎ॥
জলকর্ণাকাকমাচী রসাভ্যাং ভাবয়েৎ পুনঃ।
সৌগন্ধিক পলং ভৃঙ্গ স্বরসেন সুভাবিতম্॥

চূর্ণিতং রস সংযুক্ত মজাক্ষীর পলদ্বয়ে।
খল্লিতং ঘনপিণ্ডস্ত গুড়ীঃ স্বিন্নকলায়বৎ॥
কৃত্বাদৌ শিবমভ্যর্চ্চ্য দ্বিজাতীন্ পরিতোষ্য চ।
জীর্ণান্নো ভক্ষয়েদেকাং ক্ষীরমাংসবসায়নঃ॥
সর্ব্বরূপং ক্ষয়ং কাসং রক্তপিত্তমরোচকম্।
অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্ত মল্পাপত্যং নিযচ্ছতি॥

রসেন্দ্রগুড়িকা—ইষ্টক চূর্ণাদি দ্বারা শোধিত ও মর্দ্দিত রস (পারদ) ২ তোলা জয়ন্তী ও আদার রসে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডবৎ গোলাকৃতি করিবে, পরে উহা জলকর্ণা ও কাকমাচীর রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিবে। পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবিত নবনীতাখ্য গন্ধক চূর্ণ ৮ তোলা, ঐ পারদের সহিত মাড়িয়া কজ্জলী করিবে, অনন্তর ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা ঐ কজ্জলীর সহিত মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধ মটরের স্থায় গুড়িকা কবিবে। অনুপান মধু ও ছাগদুগ্ধ কিম্বা বাসক পত্ররস। এই মহৌষধ সেবন করিলে, ক্ষয়, কাস, রক্তপিত্ত, অরুচি ও অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট হয়।

মুক্তা শঙ্খ প্রবালানি বঙ্গঞ্চৈব সমাংশকম্।
নিম্ব কাথেন সংমর্দ্দ্য ততো গজপুটে পচেৎ॥
সর্ব্বতুল্য তুগাক্ষীরী দবদং তৎকলাংশিকম্।
এতৎ সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাথ পিপ্পলী মধু সংযুতম্॥
রক্তিদ্বয়ং প্রদাতব্যং কৃচ্ছ্ররোগ প্রশান্তয়ে।
ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং যক্ষ্মাণং শ্বাস মেবচ॥
স্বরভেদং জ্বরং মেহান্ দোষত্রয় সমুত্থিতান্।
মৃগাঙ্ক চূর্ণ মেতদ্ধি কাসরোগ কুলান্তকৃৎ॥

মৃগাঙ্ক চূর্ণ—মুক্তা, শঙ্খ, প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া নিমের কাথে মর্দ্দন করিয়া গজ পুটে পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে সর্ব্বতুল্য বংশলোচন এবং বংশলোচনের ষোড়শাংশ শোধিত হিঙ্গুল মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ২ হইতে ৪ রত্তি মাত্রায় পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিলে কষ্ট সাধ্য ক্ষয়, কাস, যক্ষ্মা, শ্বাস, স্বরভেদ, জ্বর ও মেহরোগ আশু নিবারিত হয়। ইহা কাস রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

রসভস্মত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
মৃত তাম্রস্য ভাগৈকং শিলা তালক গন্ধকম্॥
প্রতিভাগদ্বয়ং তত্রাপ্যেকীকৃত্য নিধাপয়েৎ।
বরাটীঃ পূরয়েত্তেন চাজাক্ষীরেণ টঙ্গনম্॥
পিষ্ট্বা তেন মুখং রুদ্ধা মৃদ্ভাণ্ডেন নিরোধয়েৎ।
শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্॥
রসো রাজমৃগাঙ্কোঽয়ং চতুর্গুঞ্জং ক্ষয়াপহম্।
দশ পিপ্পলিকৈঃ ক্ষৌদ্রৈর্মাবচৈকোন বিংশতিঃ॥
সঘৃতৈর্দাপয়েদ্বাত পিত্তশ্লেষ্মোদ্ভবে ক্ষয়ে।

রাজ মৃগাঙ্করস—পারদ ৩ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া। বড় বড় কড়ির মধ্যে পূরিবে, পরে ছাগদুগ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ঐ কড়ি সকলের মুখ রুদ্ধ করিয়া মৃদ্ভাণ্ডে স্থাপিত ও মুখে মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিবে, লেপ শুষ্ক হইলে গজপুটে পাক করিবে ও শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ কবিয়া লইবে। মাত্রা ২ হইতে ৪ রত্তি পর্য্যন্ত। অনুপান ঘৃত ও মধু। পিপুল চূর্ণ মধু কিম্বা মরিচ চূর্ণ মধুর সহিতও সেবন করা যাইতে পারে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ক্ষয় রোগ নিবারিত হয়।

রসং বজ্রং হেম তারং নাগং লৌহঞ্চ তাম্রকম্।
তুল্যাংশং মারিতং যোজ্যং মুক্তা মাক্ষিক বিক্রমম্॥
শঙ্খঞ্চ তুল্য তুল্যাংশং সপ্তাহং চার্দ্রক দ্রবৈঃ।
মর্দ্দয়িত্বা বিচূর্ণ্যাথ তেন পূর্য্যা বরাটিকাঃ॥
টঙ্গনং রবিদুগ্ধেন পিষ্ট্বা মুখঞ্চ বন্ধয়েৎ।
মৃদ্ভাণ্ডে তং নিরুদ্ধ্যাথ সম্যগ্ গজপুটে পচেৎ॥
আদায় চূর্ণয়েৎ সর্ব্বং নির্গুণ্ড্যাঃ সপ্ত ভাবনাঃ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ সপ্ত চিত্রকস্যৈকবিংশতিঃ॥

দ্রবৈর্ভাব্যং ততঃ শোষ্যং দেয়ং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
যক্ষ্মা রোগং নিহন্ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥
যোজয়েৎ পিপ্পলীক্ষৌদ্রৈঃ সঘৃতৈ র্মরিচৈ স্তথা।
মহাবোগাষ্টকে কাসে জ্বরে শ্বাসেঽতিসারকে॥
পোট্টলী রত্নগর্ভোঽয়ং যোগবাহেন যোজয়েৎ।
বাতব্যাধ্যশ্মরী কুষ্ঠ মেহোদর ভগন্দরাঃ॥
অর্শাংসি গ্রহণীত্যষ্টৌ মহারোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

রত্নগর্ভপোট্টলিরস্—রসসিন্দুর, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসক, লৌহ, তাম্র, মুক্তা, স্বর্ণ মাক্ষিক, প্রবাল ও শঙ্খ ভস্ম, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া আদার রসে ৭ দিন মাড়িয়া ও চূর্ণ করিয়া কড়ির ভিতর পুরিবে এবং কিঞ্চিৎ সোহাগা আকন্দের আঁটায় পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কড়ির মুখ রুদ্ধ করিয়া এবং মৃত্তিকার ভাণ্ডে রাখিয়া ও ভাণ্ড আবৃত ও লিপ্ত করিয়া যথাবিধি গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে এবং নিশিন্দার রসে ৭ বার ও চিতার রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। ২ রতি হইতে ৪ রতি পর্য্যন্ত ইহার মাত্রা। পিপুল চূর্ণ মধু অথবা ঘৃত ও মরিচ চূর্ণের সহিত সেব্য। এই পরম কল্যাণকর মহৌষধ সেবন করিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য যক্ষ্মা, অষ্টবিধ মহারোগ ও জ্বরাদি আরোগ্য হয়। এই তেজস্কর ঔষধ সেবনে শরীর সবল ও ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যাদি দূরীভূত হয়।

বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেহ, উদর রোগ, ভগন্দর, অর্শঃ ওগ্রহণী এই আটটী রোগকে মহারোগ বলে।

কাঞ্চনং রসসিন্দূরং মৌক্তিকং লৌহ মভ্রকম্।
বিদ্রুমং মৃত বৈক্রান্তং তারং তাম্রঞ্চ বঙ্গকম্॥
কস্তূরিকা লবঙ্গঞ্চ জাতীকোষৈলবালুকম্।
প্রত্যেকং বিন্দুমাত্রঞ্চ সর্ব্বং মর্দ্দ্যং প্রযত্নতঃ॥
কন্যানীরেণ সংমর্দ্দ্যং কেশরাজ রসেন চ।
অজাক্ষীরেণ সংভাব্যং প্রত্যেকং দিবস ত্রয়ম্॥
চতুর্গুঞ্জা প্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
নানারোগ প্রশমনং সর্ব্বোপদ্রব সংযুতম্॥
ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং যক্ষ্মাণং শ্বাসমেব চ।
প্রমেহান্ বিংশতিশ্চৈব দোষত্রয় সমুত্থিতান্॥
সর্ব্বান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্কর স্তিমিরং যথা।

স্বর্ণ, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, তাম্র রঙ্গ, মৃগনাভি, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও এলবালুক এই সমুদয় সমভাগে একত্র মাড়িয়া ঘৃতকুমারীর রসে, কেশুরিয়ার রসে ও ছাগদুগ্ধে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৪ রত্তি প্রমাণ বটী করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

মহাচন্দনাদি তৈল—মূর্চ্ছিত তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ রক্তচন্দন, শালপানি, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুর, মুগানী ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, মাষাণী, আমলা, শিরীষছাল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, সরল কাষ্ঠ, নাগেশ্বর, গন্ধভাদুলে, মূর্ব্বামূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, মৃণাল ও পদ্মমূল মিলিত ৫০ পল, শ্বেত বেড়েলা ৫০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। ছাগ দুগ্ধ, শতমূলীর রস, লাক্ষার জল বা ক্বাথ, কাঁজি ও দধির মাত প্রত্যেক ১৬ সের। হরিণ, ছাগ ও শশক প্রত্যেকের মাংস ৮ সের ও প্রত্যেকের পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। পৃথক্ পৃথক্ ক্বাথের সহিত পৃথক্ পৃথক্ পাক করিবে। কল্কার্থ শ্বেত চন্দন, অগুরু, কাকলা, নখী, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, মৃণাল,

হরিদ্রা, দারু, হরিদ্রা, শ্যামলতা, অনন্তমূল, রক্তোৎপল, তগরপাদুকা, কুড়, ত্রিফলা, পরুষ ফল, মূর্ব্বামূল, গেঁটেলা, নালুকা, দেবদারু, সরল কাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, রসোত, মুতা, শিলারস, বচ, মাঞ্জিষ্ঠা, মেধ্যা, মৌরী, জীবন্তী, পিয়ঙ্গু, শটী, এলাইচ, কুঙ্কুম, খাটাশী, পদ্মকেশর, রাস্না, জয়িত্রী, শুঁঠ ও ধনে প্রত্যেক ৪ তোলা। মাঞ্জিষ্ঠা, চোরকাচকী, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, ব্যাঘ্রী, বচ, গুবাকবৃক্ষের ছাল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, গন্ধতৃণ, শটী, হরিতকী, বহেড়া, আমলা, মুতা, জটামাংসী, দনা, চম্পক পুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, গুড়ত্বক্, গেঁটেলা, বালা, কুড়, মরুবক পুষ্প, পিড়িংশাক, গন্ধবিরজা, বুন্দুবখোটা, নখী, নালুকা, শুক্ফা, এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, শ্বেতচন্দন, জাতাপুষ্প, খাটাসী, কাকলা, অগুরু, লতাকস্তুরী, কুঙ্কম, মৃগনাভি ও কর্পূর যথারীতি এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা গন্ধপাক শেষ করিবে। গন্ধদ্রব্যের মধ্যে কুঙ্কম, মৃগনাভি ও কর্পূর এই কয়েকটী দ্রব্য তৈল নামাইয়া ছাকিয়া শেষে মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হয়। এই তৈল মর্দ্দনে অত্যুগ্র রাজযক্ষ্মা, ক্ষয়, রক্তপিত্ত ও শ্বাস প্রভৃতি নানাবিধ বাতপিত্ত প্রকোপ জনিত পীড়া প্রশমিত হয়। ইহা অতিশয় বৃষ্য ও কান্তি পুষ্টিজনক। ইহার সুধাময় ফল অনেকস্থলে লাভ করা গিয়াছে।

অশ্রহরারিষ্ট—বিশল্যকরণীর স্বরস ও মৃতসঞ্জীবনী সুরা প্রত্যেক ১ পল (৮ তোলা) পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একত্র ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া মৃত্তিকা দ্বারা মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। এক সপ্তাহ পরে স্থূল বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। শীতল জলের সহিত আবশ্যকমত প্রতি প্রহরে সেবন করিবে। বিবেচনা করিয়া ৫ হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত মাত্রা স্থির করিবে। ইহা সেবনে উরঃক্ষত, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস, রক্তাতিসার, রাজযক্ষ্মা, অর্শঃ ও রক্তপ্রদরাদি প্রশমিত হয়।

দ্রাক্ষারিষ্ট—দ্রাক্ষা ৬।০ সের, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। এই কাথে ২৫ সের গুড় গুলিয়া তাহাতে গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, মরিচ, পিঁপুল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ ও আলোড়ন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে একমাস যাবৎ মুখ বদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং পরে উহা ছাঁকিয়া লইবে। দ্রাক্ষারিষ্ট পানে উরঃক্ষত, ক্ষয়রোগ, কাস, শ্বাস ও গলরোগ সমস্ত নিরাকৃত ও মল শুদ্ধি হইয়া দেহের বল, বর্ণ ও কান্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। মাত্রা ১ হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত।

গর্ভোৎপত্তি ক্রমঃ।

অতুলা গোত্রস্য রজঃ ক্ষয়ান্তে
রহো বিসৃষ্টং মিথুনীকৃতস্য।
কিং স্যাচ্চতুষ্পাৎ প্রভবশ্চ ষড়্ভ্যো
যৎ স্ত্রীষু গর্ভত্বমুপৈতি পুংসঃ॥
শুক্রং তদস্য প্রবদাশু ধীরাঃ
যদ্ধীয়তে গর্ভ সমুদ্ভবায়।
বায়ুগ্নি ভূম্যব্গুণ পাদবত্তং
ষড়্ভ্যো রসেভ্যঃ প্রভবশ্চ তস্য॥

মহর্ষি অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! রজঃ ক্ষয় অর্থাৎ রজঃ প্রবৃত্তির তিন দিবস পরে ষোড়শ দিবসের মধ্যে

অতুল্য গোত্র মৈথুনাসক্ত পুরুষের চতুর্ভূতাত্মক ও ষড়্‌রস সমুদ্ভব যে পদার্থ স্ত্রীতে গর্ভরূপে পরিণত হয় উহা কি? অগ্নিবেশের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান পুনর্ব্বসু বলিলেন, যে পদার্থ স্ত্রীতে সমাহিত হইয়া গর্ভ উৎপাদন করে, পণ্ডিতগণ উহাকে শুক্র বলিয়া থাকেন। ঐ শুক্রে বায়ু, অগ্নি, ভূমি ও জল এই চারিটী মহাভূতের অংশ বিদ্যমান থাকে এবং উহা মধুরাদি ষড়্‌রস হইতে উৎপন্ন।

অগ্নিবেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! কিরূপে সুখে অর্থাৎ নিরুপদ্রবে গর্ভের উৎপত্তি ও ঐ গর্ভ পরিবর্দ্ধিত হয় ও কোন কোন অবন্ধ্যা স্ত্রীই বা কি জন্য বিলম্বে গর্ভধারণ করে এবং কি জন্যই বা কোন কোন গর্ভের উৎপত্তি হইয়াও বিনাশ হয়। ভগবান্ পুনর্ব্বসু উত্তর করিলেন, বৎস! যে গর্ভের শুক্র শোণিত, আত্মা, আশয় অর্থাৎ ভ্রূণোৎপত্তি স্থান (জরায়ু ক্ষেত্র) এবং কাল এই সমুদায় দোষবর্জ্জিত হয়, গর্ভিণীর আহার বিহার বিষয়ে যদি কোন দোষ না থাকে, তবে সেই অদুষ্ট শুক্র শোণিত সম্ভূত গর্ভ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়া যথাকালে সুখে প্রসূত হয়। আর সপ্রজা অর্থাৎ অবন্ধ্যা স্ত্রী ও যোনি বা জরায়ুর দোষ, মানসিক বিবিধ অশান্তি বা ক্লেশ, শুক্র বা শোণিত দুষ্টি, আহার বিহারাদির অত্যাচার, অকাল যোগ কিম্বা ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা দৈহিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কারণে কাল বিলম্বে গর্ভ ধারণ করে। গর্ভস্রাবের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহার মধ্যে একটী রহস্য আছে, শ্রবণ কর। রুক্ষান্ন পানাদি দ্বারা গর্ভাশয়স্থ বায়ু প্রকুপিত হইয়া কোন কোন স্ত্রীর ঋতু শোণিত নিরোধ করে ও নিঃসৃত হইতে দেয় না, এবং অবিকল গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ করে। অজ্ঞ ব্যক্তি সকল উহাকে প্রকৃত গর্ভ বলিয়া মনে করে, কিন্তু কিছু দিন পরে ঐ শোণিত সঞ্চিত হওয়াতে যখন অধিক হয়, তখন রক্তস্রাব হইতে থাকে কিম্বা অধিক সঞ্চিত না হইলেও অগ্নি বা সূর্য্যাতাপ, অধিক শ্রম, ক্রোধ, শোক, কোন পীড়া, অথবা উষ্ণ অন্নপান দ্বারা যখন পরিস্রুত হইতে থাকে, তখন উহা দেখিয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সকল মনে করে যে, ইহা ভৌতিক ব্যাপার। অর্থাৎ পিশাচ আদি কর্ত্তৃক গর্ভ অপহৃত হইয়াছে। বাস্তবিক ওরূপ কল্পনা অলীক, যদি পিশাচাদি কর্ত্তৃক ঐরূপ গর্ভ হরণ যুক্তিসঙ্গত হইত, তবে পিশাচেরা গর্ভ ত্যাগ করিয়া জননীর ওজঃ কেন অ হরণ করে না? যেহেতু ওজোধাতুর অপহরণই রাত্রিচরদিগের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। ফলতঃ এইরূপ ব্যাপারকে ভৌতিক মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

অগ্নিবেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্। কি জন্য কন্যা, কি জন্য পুত্র, কি জন্য যমজ, কি জন্য যমজের একটী পুত্র ও অপরটী কন্যা, কি জন্য এককালে বহু সন্তান, কি জন্য বিলম্বে প্রসব এবং কি জন্যই বা যমজ সন্তান দুইটীর মধ্যে একটী হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ও অপর ক্ষীণাঙ্গ হয়?

আত্রেয় কহিলেন যদি বীজ অর্থাৎ মিলিত শুক্র শোণিতে রক্তের ভাগ অধিক হয়, তবে কন্যা এবং শুক্রের ভাগ অধিক হইলে পুত্র জন্মে। বায়ু কুপিত হইয়া বীজকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে যমজ সন্তান হয়, ঐ দ্বিধা বিভক্ত বীজের কোন ভাগে যদি রক্তের ভাগ অধিক

হয়, তবে সেই ভাগে কন্যা ও অপর যে ভাগে শুক্রের ভাগ অধিক থাকে সেই ভাগে পুত্র জন্মে। আর দ্বিধা বিভক্ত বীজের দুই ভাগেই যদি রক্ত বা শুক্রের ভাগ অধিক হয়, তবে দুইটাই কন্যা বা পুত্র জন্মে। অতি প্রবৃদ্ধ বায়ু যখন ঐ বীজকে বহুধা বিভক্ত করে, তখন গর্ভিণী বহু সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। প্রকুপিত বায়ু কর্তৃক যদি বীজ বিষমাংশে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ এক অংশে অধিক ও অপর অংশে বীজ অল্প হয় তবে প্রসূত সন্তান দ্বয়ের মধ্যে একটী পরিপুষ্টাঙ্গ ও অপরটী ক্ষীণাঙ্গ হয়। আর গর্ভিণী যদি যথোপযুক্ত আহার প্রাপ্ত না হয় এবং কোন ধাতুর ক্ষয় বা অধিক স্রাব হয়, তবে গর্ভ শুষ্ক হয়, পুষ্টিলাভ করিতে পারে না সুতরাং নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিয়াও কোন কোন গর্ভিণী প্রসব করিয়া থাকে।

অতঃপর নপুংসকাদির জন্ম কারণ বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর। উল্লিখিত বীজে যদি শুক্র ও শোণিতের ভাগ সমান হয়, তবে স্ত্রীচিহ্ন বা পুরুষ চিহ্ন বিশিষ্ট সন্তান জন্মে। বায়ু কুপিত হইয়া গর্ভস্থ প্রাণীর শুক্রাশয় নষ্ট করিলে ঐ প্রাণী পবনেন্দ্রিয় হয়। বায়ু কর্তৃক গর্ভস্থ প্রাণীর শুক্রাশয়দ্বার বিঘটিত হইলে সংস্কারবাহী উৎপন্ন হয়। যদি পিতা মাতা হীন-বীজ বা অল্প বীজ-বিশিষ্ট, দুর্ব্বল ও অহর্ষ অর্থাৎ মৈথুনে অল্প হর্ষ-বিশিষ্ট হয়, তবে সেই পুত্র বা কন্যা নরষণ্ড বা নারীষণ্ড হয়। মাতার মৈথুন কার্য্যে অনিচ্ছা, ও পিতার বীজের দৌর্ব্বল্য হেতু বক্র সন্তান সম্ভূত হয়। পিতা মাতা ঈর্ষাভিভূত বা মৈথুনে মন্দহর্ষ থাকিলে সন্তান ঈর্ষ্যা পরতন্ত্র হয়। যে পুরুষের কোষদ্বয় বায়ু ও অগ্নি দোষে নষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে বাতিক ষণ্ড বলে।

শুক্র শোণিতজীব সংযোগে তু খলু কুক্ষিগতে গর্ভ সংজ্ঞা ভবতি।

শুক্র, শোণিত ও জীব কুক্ষিগত হইয়া সংযুক্ত হইলে তাহাকেই গর্ভ বলা যায়। ফলতঃ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি এই সমুদায়ের বিকৃতিই গর্ভ। এই গর্ভই চেতনার অধিষ্ঠান। এই চেতনা গর্ভের ষষ্ঠ ধাতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে স্ত্রীদিগের অনেক ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যৌবনে স্ত্রীদিগের স্তনদ্বয় পীনোন্নত, যোনি বি[illegible]ত ও বস্তিদেশ লোম সমূহ দ্বারা সম্যক্ পরিব্যাপ্ত হয়। জরায়ু কোষ হইতে তনু (পাতলা, গাঢ় নহে) ও স্বচ্ছ রক্ত নিঃসৃত হয়, ঐ রক্তকে আর্ত্তব বা পুষ্প বলে, চলিত কথায় উহাকে ঋতু স্নাও বলা হইয়া থাকে। প্রতি মাসে একবার করিয়া ঐ রক্তস্রাব হয়। ঐ রক্ত যদি শশ-রক্ত সদৃশ বা লাক্ষা জল সদৃশ হয়, বস্ত্রাদিতে লাগিলে দাগ না পড়ে, তবে উহা নির্দ্দোষ বলিয়া স্থির করিবে। ঐ রজঃ প্রবৃত্তি ৪।৫ দিন স্থায়ী হয়। এই সমুদায় নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিলে রজোদুষ্টি স্থির করিতে হইবে। রোগ শোক বর্জ্জিত পরিপুষ্টাঙ্গী স্ত্রীদিগের প্রায় দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম হইতে এই রজঃ প্রবৃত্তি হইতে থাকে এবং পঞ্চাশ বৎসরের পর নিবৃত্তি হইয়া যায়। শরীর সুস্থ না থাকিলে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেও রজোনিবৃত্তি হইতে দেখা যায়।

রজঃ প্রবৃত্তির প্রথম দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত সময়কে ঋতুকাল বলা যায়। এই কালই গর্ভ গ্রহণের উপযুক্ত কাল। স্ত্রীদিগের প্রকৃতি ভেদে ঋতুকালের ও অন্যথা হয়, অর্থাৎ কোন কোন স্ত্রীর ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত গর্ভ গ্রহণ শক্তি থাকে না। সূর্য্য অস্তগত হইলে পদ্মিনী যেরূপ মুদ্রিত হয়, সেইরূপ ঋতুকাল অতীত হইলেও নারীদিগের জরায়ু সঙ্কুচিত হইয়া যায়, গর্ভ গ্রহণে ঐ সময়ে আর শক্তি থাকে না। ঋতুকালে স্ত্রীগণ অপেক্ষাকৃত সম্ভোগাভিলাষিণী হইয়া থাকে, ঐ সময়ই প্রকৃত রতি-কাল। মরুক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায় অন্য সময়ের শৃঙ্গার নিরর্থক।

পুরুষাভিলাষিণী কামাতুরা ব্যাধিহীনা স্ত্রীর সহিত সঞ্জাত হর্ষ, ব্যাধিহীন রতিজ্ঞ পুরুষের ঋতুকালে যে সংসর্গ সংঘটিত হয়, উহাতেই অপত্যোৎপাদন ইচ্ছা ফলবতী হইয়া থাকে। সম্যক্ কৃষ্ট জলসিক্ত উপযুক্ত গুণ সম্পন্ন ক্ষেত্রে যথাসময়ে নির্দ্দোষ বীজ বপন করিলে যেমন তাহা হইতে নিশ্চয়ই অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অদোষ যোনিতে যথা সময়ে অদোষ শুক্র আহিত হইলে গর্ভোৎপত্তি অবশ্যই হইয়া থাকে।

রতিক্রিয়া দ্বারা পুরুষের বীর্য্য স্খলিত হইয়া অতি বেগে প্রথমতঃ নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করে, অনন্তর তথা হইতে ডিম্বাশয়ে গমন করিয়া রূপান্তরিত হয়। পরে ডিম্ব ও শুক্র একীভূত হইয়া জরায়ুতে উপস্থিত ও একটী আবরণী দ্বারা আবৃত হইয়া নিরন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। জীব প্রথমতঃ নারীর জরায়ুতে শ্লেষ্মার ন্যায় বিন্দু বিন্দু হইয়া অবস্থিতি করে। এই সময়ে ইহার কোন বিগ্রহ ব্যক্ত থাকে না। দ্বিতীয় মাসে গর্ভ অপেক্ষাকৃত গাঢ় হয় এবং পিণ্ড, পেশী বা অর্ব্বুদের আকার ধারণ করে। যদি ঐ গাঢ় পদার্থ পিণ্ড হয়, তবে পুরুষ, পেশী হইলে কন্যা ও অর্ব্বুদ হইলে নপুংসক উৎপন্ন হয়। তৃতীয় মাসে সমস্ত ইন্দ্রিয় ও সমস্ত অঙ্গাবয়ব এককালে উৎপন্ন হয়। এই অঙ্গাবয়বের মধ্যে কতকগুলি মাতৃজ ও কতকগুলি পিতৃজ।

গর্ভের অঙ্গাবয়ব সমুদয় মাতা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হইলেও পঞ্চ মহাভূতের বিকার মাত্র, কারণ জীবদেহ পঞ্চ ভূতাত্মক। ক্রমশঃ কোন মহাভূত হইতে কি উৎপন্ন হইতেছে, নির্দ্দেশ করিব। শব্দ, শ্রোত্র, লঘুতা, সূক্ষ্মতা ও ছিদ্র এই সমুদায় আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়। স্পর্শ, স্পর্শেন্দ্রিয় রুক্ষতা, শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া, ধাতুব্যূহন এবং শারীরিক চেষ্টা বায়ু হইতে উৎপন্ন। রূপ, দর্শনেন্দ্রিয়, প্রকাশ, পরিপাক ও উষ্ণতা এই সমুদায় অগ্নি হইতে উৎপন্ন। রস, রসেন্দ্রিয়,

শৈত্য, মৃদুতা, স্নেহ ও ক্লেদ জল হইতে উৎপন্ন। গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গুরুত্ব, স্থৈর্য্য এবং মূর্ত্তি এই সমুদায় পৃথিবী হইতে উৎপন্ন। জগতে যে সমুদায় ভাব আছে পুরুষের ও সেই সেই ভাব অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা জগৎ ও পুরুষের ভাবকে একই রূপ বলিয়া থাকেন। এইরূপ তৃতীয় মাসে গর্ভের আরও কতকগুলি অঙ্গ ও কতকগুলি অঙ্গাবয়ব এককালে উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন কালান্তরে আরও কতকগুলি ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। দন্ত, স্তনোন্নতি, অধোলোম, শ্মশ্রু ও কক্ষ লোম কাল বিশেষে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বুদ্ধি, রূপ, বাক্‌শক্তি, শুক্র ও গমন ধাবনাদি ভাবের উৎপত্তিও ক্রমশঃ হইয়া থাকে।

গর্ভের ইন্দ্রিয় সমস্ত উৎপন্ন হইলে শিশুর অন্তঃকরণে বেদনা অনুভব করিবার শক্তি সঞ্চার হয়। ঐ সময় হইতে গর্ভ স্পন্দিত হইতে থাকে। লোকে সচরাচর গর্ভ যন্ত্রণা বলিয়া থাকেন, বাস্তবিক ঐ যন্ত্রণার ন্যায় ভয়ঙ্করী যন্ত্রণা আর আছে কিনা সন্দেহ। এই সময়ে গর্ভ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ভগবানের স্তব করিতে থাকে। গর্ভস্থ শিশুর হৃদয় মাতৃজ ও মাতার হৃদয়ের সহিত শিশুর হৃদয় সম্যক্ সম্বদ্ধ সেইজন্য বৃদ্ধগণ গর্ভকে দৌহৃদয্য বলিয়া থাকেন। এই সময়ে গর্ভিণীর গর্ভপ্রতিকূল আহার বিহারাদি ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সময়ে গর্ভের অনিষ্টজনক কার্য্যাদি দ্বারা গর্ভের বিনাশ বা বিকৃতি ঘটিয়া থাকে।

চতুর্থ মাসে গর্ভ অত্যন্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, এই সময়ে গর্ভিণীর শরীরও এইজন্য অত্যন্ত গুরু হইয়া থাকে। পঞ্চম মাসে অপেক্ষাকৃত গর্ভের মাংস ও শোণিতের বৃদ্ধি হয় সেই জন্য গর্ভিণী পঞ্চম মাসে অত্যন্ত কৃশ হইয়া যাইতে থাকে। ষষ্ঠ মাসে গর্ভস্থভ্রূণের অন্যান্য মাসাপেক্ষা বল ও বর্ণের বৃদ্ধি হয় ও তজ্জন্য গর্ভিণীর বল ও বর্ণের হ্রাস হয়। সপ্তম মাসে গর্ভের সমস্ত ভাবেরই বৃদ্ধি হয় ও সেই সময়ে গর্ভিণীকে সমস্ত আকারে ক্লান্ত দেখা যায়। অষ্টম মাসে গর্ভ ও মাতা রস বাহিনী শিরাসমূহ দ্বারা পরস্পরের ওজঃ গ্রহণ করে। এই সময় গর্ভিণীকে মুহুর্মুহু গ্লানিযুক্ত ও মুহুর্মুহু হৃষ্ট পুষ্ট দেখা যায়। ওজঃ ধাতুর অনবস্থিতত্ব বশতঃ এই সময়ে বিপদ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। কুশল মহাত্মাগণ এই অষ্টম মাসকে গর্ভের অহিতকর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অষ্টম মাস অতীত হইয়া নবম মাসের প্রথম দিন হইতে দশম মাস পর্য্যন্ত গর্ভ প্রসবের মুখ্য কাল। ইহার অন্যথা হইলে বিকৃতি বলিয়া স্থির করিবে। কুক্ষিই গর্ভের উৎপত্তি স্থান। সহজ প্রতীতির জন্য একটী চিত্র প্রদর্শন করা গেল। এই চিত্রে ভ্রূণ গর্ভে কিরূপে অবস্থিতি করে, তাহাই প্রদর্শিত হইল।
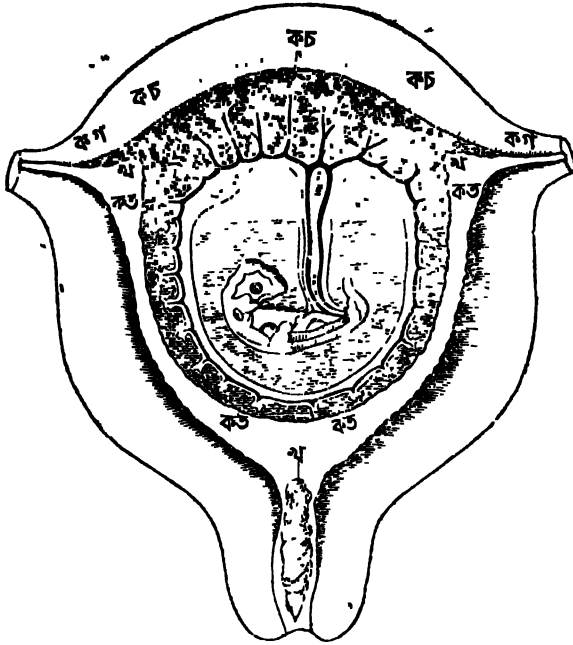
এই চিত্রের খ খ খ জরায়ু গহ্বর। কত, কত, কত, কত, অস্থায়িনী ভ্রূণাববক কলা। কগ, কগ, অস্থায়িনী জরায়ু বেষ্টিকা কলা। কচ, কচ, অস্থায়িনী জরায়ু বেষ্টিকা ডিম্ব কলা।

ধাত্বাদির শোধন ও মারণ।

পার্ব্বত্য প্রদেশই ধাতু সমুদায়ের আকর স্থান। বিশুদ্ধ ধাতু সেবিত হইলে বলী, পলিত, খালিত্য, দৌর্ব্বল্য, কার্শ্য ও জরাদি বিবিধ পীড়া উপশমিত হয়। অপেক্ষাকৃত পার্ব্বত্য দেশীয় জল বায়ু উৎকৃষ্ট, কারণ ধাতুকণা সংস্পর্শে ঐ সমস্ত স্থানের জল অতি বিশুদ্ধ ও উপকারী হয় এবং ঐ কারণেই পার্ব্বত্য অসভ্য জাতিদিগকে নীরোগ ও বলবান্ দেখা যায়। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, দস্তা, ,সীস ও লৌহ এই সাতটী মূল ধাতু। আর স্বর্ণমাক্ষিক, তারমাক্ষিক, তুত্থ, কাংস্য, পিত্তল. সিন্দুব ও শিলাজতু ইহারা যথাক্রমে পূর্ব্বোল্লিখিত সাতটীর উপধাতু অর্থাৎ স্বর্ণেব স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যের তাব মাক্ষিক, তাম্রেব তুত্থ, বঙ্গেব কাংস্য, দস্তার পিত্তল, সীসের সিন্দুব ও লৌহের উপধাতু শিলাজতু। যে ধাতুর যে গুণ, তাহার উপধাতুরও সেই গুণ, পার্থক্য এই যে উপধাতুর

গুণ অপেক্ষাকৃত অল্প। এই সমুদায় দ্বারা আমাদের দেহ ধৃত (রক্ষিত) হয় বলিয়া ইহাদের নাম ধাতু।

ধাতু সমুদায়ের মধ্যে স্বর্ণই শ্রেষ্ঠ। সুবর্ণ, কনক, হিরণ্য, হেম, হাটক, তপনীয়, গাঙ্গেয়, কলধৌত, কাঞ্চন, চামীকর, শাতকুম্ভ, কার্ত্তস্বর, জাম্বুনদ, জাতরূপ ও মহারজত এই সমুদায় স্বর্ণের পর্য্যায় বা নামান্তর। যে স্বর্ণ দগ্ধ করিলে রক্তবর্ণ, ছেদন করিলে শ্বেত বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র সংমিশ্রণ বর্জ্জিত, স্নিগ্ধ, কোমল, গুরু ও যাহার কষ কুঙ্কুমের ন্যায় গাঢ় রক্তবর্ণ, তাহাই উৎকৃষ্ট। শ্বেত বর্ণ, কঠিন, অচিক্কণ, বিবর্ণ, মলযুক্ত, স্তববিশিষ্ট, দাহ ও ছেদে শ্বেত বর্ণ, লঘু, যাহার কষ শ্বেতবর্ণ ও যাহা আহত হইয়া চূর্ণ হইয়া যায়, তাদৃশ স্বর্ণ অব্যবহার্য্য। শোধিত স্বর্ণ সেবনে যেরূপ বহু রোগের প্রতিকার ও শারীরিক উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেইরূপ অশোধিত ও অজারিত স্বর্ণ সেবনে বহু রোগের উৎপত্তি ও শারীরিক অবনতি সংঘটিত হয়।

স্বর্ণ জারণ করিবার পূর্ব্বে শোধন করিয়া লওয়া বিশেষ আবশ্যক। স্বর্ণকে প্রথমতঃ পিটিয়া পাতলা পাত প্রস্তুত করিতে হয়, অনন্তর অগ্নিতে পোড়াইয়া যথাক্রমে তিনবার করিয়া তিলতৈল তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থ কলায়ের কাথে নিক্ষেপ করিলে স্বর্ণ বিশুদ্ধ হয়। তিলতৈল ও কাথাদি প্রত্যেক বারই ভিন্ন ভিন্ন হওয়া উচিত অর্থাৎ প্রত্যেক বার পোড়াইয়া ভিন্ন ভিন্ন তৈলেও ভিন্ন ভিন্ন তক্রাদিতে নিক্ষেপ করিবে। এই নিয়মে রৌপ্যাদি ধাতুর ও শোধন হইয়া থাকে।

উল্লিখিত রূপ স্বর্ণপত্র কাঁচি দ্বারা কাটিয়া যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিবে। পরে ঐ স্বর্ণের সমপরিমাণ বিশুদ্ধ পারদ ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে খলে মর্দ্দন ও পিণ্ডাকৃতি করিবে। এই পিণ্ড একখানি কটোরায় গন্ধক চূর্ণ রাখিয়া তাহার উপর স্থাপন করিবে ও পিণ্ডের উপরিভাগে গন্ধক চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। পিণ্ডের পরিমাণ যত হইবে, ঐ পরিমিত গন্ধক, তুল্যাংশ করিয়া অর্দ্ধাংশ নিম্নে ও অর্দ্ধাংশ উপরিভাগে প্রদান করিতে হয়। পরে আর একখানি কটোরা দ্বারা উহাকে আচ্ছাদিত করিবে এবং কটোরা দ্বয়ের মুখসন্ধি উত্তম মৃত্তিকা লেপন করিয়া রুদ্ধ করিবে। অনন্তর সামান্য গর্ত্তের মধ্যে ৩০ খানি বিল ঘুঁটে দ্বারা পুট প্রদান করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া পুনরায় পারদের সহিত মর্দ্দন করিবে এবং পূর্ব্ববৎ গন্ধক চূর্ণ দিয়া কটোরায় রাখিয়া পুট দিবে। ১৪ বার এইরূপ পুট প্রদান করিলে স্বর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হয়। ক্রিয়া কুশল ব্যক্তিগণ ৭।৮ পুটেও স্বর্ণকে সুন্দর ভস্ম করিয়া থাকেন। উল্লিখিত রূপ মারিত স্বর্ণই সর্ব্বত্র ব্যবহার্য্য। মারিত স্বর্ণ কষায়, তিক্ত, মধুর, গুরু, লেখন, হৃদ্য, রসায়ন, বলকারক, চক্ষুষ্য, কান্তিপ্রদ, বিষঘ্ন ও পবিত্র। এই মারিত স্বর্ণ সেবনে আয়ুঃ, মেধা, প্রভা, বুদ্ধি ও রতিশক্তি বৃদ্ধি, বয়ঃ, স্থৈর্য্য, বাক্‌শুদ্ধি ও দেহের পুষ্টি হয় এবং ক্ষয়, উন্মাদ ও উপদংশ জনিত বিবিধ পীড়া প্রতিকৃত হয়। ইহার মাত্রা ১ রতি।

রৌপ্য।

রৌপ্য, রজত, চন্দ্রকান্তি ও সিত-প্রভ ইত্যাদি রৌপ্যের পর্য্যায়। যে রৌপ্য গুরু, চিক্কণ, কোমল, শুভ্রবর্ণ, আঘাতসহ, অপর ধাতুর মিশ্রণ বিহীন, স্বচ্ছ এবং দাহ ও ছেদে বিকৃত হয় না, তাহাই উৎকৃষ্ট ও ব্যবহার্য্য। কৃত্রিম, কঠিন, রূক্ষ, রক্তবর্ণ, পীতদলযুক্ত ও লঘু এবং যাহা দাহ, ছেদ ও আঘাতে নষ্ট হয়, তাহা নিকৃষ্ট ও অব্যবহার্য্য। অবি-শোধিত ও অমারিত রোপ্য সেবনে আয়ুঃ-শুক্র ও বলনাশ এবং বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয় অতএব শোধিত ও জারিত রৌপ্য ব্যবহার করাই বিধেয়।

স্বর্ণের যেরূপ সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ ও তৈলাদিতে নিক্ষেপ করিয়া শোধন করিতে হয়, রৌপ্যেরও তদ্রূপ।

শোধিত ও খণ্ড খণ্ড কৃত রৌপ্য সমান পরিমাণ পারদের সহিত মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে, পরে রৌপ্যের সমান হরিতাল ও গন্ধক একত্র করিয়া লেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। স্বর্ণ মারণ বিধি অনুসারে মর্দ্দিত হরিতাল ও গন্ধক দ্বারা উক্ত পিণ্ড ব্যাপ্ত ও কটোরিকায় স্থাপন করিয়া অপর কটোরিকা (কটরা) দ্বারা আবৃত করিয়া সন্ধিস্থল মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিবে। অনন্তর অল্প ঘুঁটের অগ্নিতে পুট দিবে। অধিক উত্তাপ পাইলেই গলিয়া যায়, সুতরাং অল্প ঘুঁটে দ্বারা পুট প্রদানই বিধেয়। ২।৩ বার পুট দিলেই রৌপ্য ভস্ম হইয়া যায়। অপর উপায়েও রৌপ্য ভস্ম করা যায়। ২ ভাগ গন্ধক ও এক ভাগ পারদ একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে ঐ কজ্জলী জম্বীরাদি রসে দ্রব করিয়া উহা দ্বারা কজ্জলীর সমান পরিমাণ রৌপ্যপত্র প্রলিপ্ত করিয়া তাত্র অগ্নিতে বালুকা যন্ত্রে অথবা গজপুটে পাক করিবে। অপেক্ষাকৃত এই প্রণালীই সহজ। মারিত রৌপ্য শীতল, কষায়, মধুর, সারক, বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ, লেহন, বায়ু নাশক, পিত্তপ্রশমক ও প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ রোগ নাশক। মারিত রৌপ্যের মাত্রা ১ রতি।

ভৈষজ্য বিজ্ঞান।

কফজনিত শোথে—পিপুল, সরিষার পুরাতন খইল, সজিনার ছাল ও তিসি জলে উত্তমরূপে বাটিয়া ঈষদুষ্ণ প্রলেপ দিলে অতি সত্বর কফজনিত শোথ আরোগ্য হয়।

কুলথ কলায় ও শুঁঠ গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া ঐ গোমূত্রের কিয়দংশ দ্বারা উহা সুন্দর রূপে শিলায় পেষণ করিয়া উষ্ণ উষ্ণ প্রলেপ দিলে কফজনিত শোথ ৪।৫ দিনে আরোগ্য হয়। অনেক স্থলে ইহা পরীক্ষা করা হইয়াছে।

বহেড়ার বীজ জলে ঘসিয়া প্রলেপ দিলে সমস্ত প্রকারের শোথই আরোগ্য হইয়া থাকে।

পাথরের কয়লা জলে ঘসিয়া প্রলেপ দিলে অতি সত্বর শোথ আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

ব্রধ্ন (কুচ্‌কী)—সজিনার আঠা কিম্বা যজ্ঞ ডুমুরের আঠা যদি ব্রধ্নের উপক্রমে অর্থাৎ যে সময়ে বেদনা হয় ও ফুলিয়া উঠে, সেই সময়ে দেওয়া যায়, তবে

উহা আর বড় হয় না ও পাকে না, বসিয়া যায়।

মধু ও চূণ মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ অবস্থায় প্রলেপ দিলে অত্যাশ্চর্য্য রূপে বেদনা নিবৃত্তি ও বাগী বসিয়া যাইতে দেখা যায়। মধু ও চূণ মিশ্রিত করিলে উহা উষ্ণ হইয়া উঠে, ঐ অবস্থায়ই প্রলেপ দিতে হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, বাগী ও ব্রণ প্রভৃতির উপক্রমে কষ্টিক প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা ঐ শোথযুক্ত স্থান দগ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু যেগুলি নিশ্চয়ই পাকিবে, সেই সমুদায় স্থলে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়, কারণ কষ্টিকাদি দ্বারা পোড়াইয়া দিলে ব্রণ সুন্দর রূপে পাকিতে পারে না, অথচ মধ্যে ক্রমশঃ ক্ষত হইয়া যায়। এরূপ ঘটনা অনেক দেখা গিয়াছে। আমারা যে সমুদায় প্রলেপের বিষয় উল্লেখ করিলাম, উহাতে ঐরূপ ক্লেশের সম্ভাবনা নাই।

কোন কোন সময় সামান্য স্ফোটক তৈল বা অপর কোন দূষিত পদার্থ দ্বারা প্রবল হইয়া উঠে এবং অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। ঐরূপ যন্ত্রণাদায়ক ব্রণে তেলাকুচার পাতা অল্প সৈন্ধবের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে অতি শীঘ্র যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে। এই প্রলেপ ক্রমাগত প্রদান করিলে ইহা দ্বারাই ব্রণ ফাটিয়া যায়। আমরা অনেক স্থলে ইহার এই উপকারিতা দেখিয়াছি। ব্রণ ফাটিয়া গেলে তখন পুরাতন ঘৃত সহযোগে তিসি (মসিনা) বাটিয়া ও উষ্ণ করিয়া পুলটিশ্ দিলে শীঘ্রই ক্ষত আরোগ্য হইয়া যায়।

ব্যবস্থা সংগ্রহ।

১। রোগী পুরুষ বয়ঃক্রম ২৪।২৫ বৎসর। পীড়ার অবস্থা সর্ব্বদাই জ্বরভাব, শরীর গ্লানিযুক্ত, বৈকালে জ্বরের বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে কুইনাইন ও অপর ডাক্তারি ঔষধ দ্বারা জ্বর বন্ধ করা হয়। কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, জ্বর কালীন অল্প পিপাসা (জলপান না করিলেও বিশেষ কষ্ট হয় না), চক্ষুঃ জ্বালা ও মাথাধরা ইত্যাদি। ক্ষুধা আদৌ হয় না।

ব্যবস্থিত ঔষধ প্রাতে চন্দনাদি লৌহ ১টী মধুদিয়া মাড়িয়া পাচন সহ, বৈকালে বঙ্গক্ষার ২ রতি মোরাভিজার জলসহ ও সন্ধ্যায় সর্ব্বেশ্বর রস ১টী মধুদিয়া মাড়িয়া উচ্ছেপাতার রস সহ সেব্য।

পাচন—ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ, ধনে, পলতা, আতইচ, চিরাতা, কট্‌কী ও জাঙ্গিহরিতকী প্রত্যেক ।০ আনা সমষ্টিতে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা।

২। রোগিণীর বয়স ৩০।৩২ বৎসর। ৩।৪ মাস যাবৎ জ্বর। পূর্ব্বে অবশ্যই কুইনাইন সেবন করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান অবস্থা প্রাতঃকালে জ্বর আইসে, ১০।১১টা পর্য্যন্ত প্রবল থাকে। অবশিষ্ট সময়েও শরীর সুস্থ বলিয়া বোধ হয় না, শরীর কৃশ হইয়াছে, ২।৩বার অল্প অল্প তরল ভেদ হয়। মাথা ভার এবং কোমর প্রভৃতিতে বেদনা। যকৃতের সামান্য দুষ্টি থাকিলেও পারে কিন্তু প্লীহার বৃদ্ধি নাই। বাহ্যে যাইবার পূর্ব্বে পেট অত্যন্ত বেদনা করে ইত্যাদি।

ব্যবস্থিত ঔষধ—প্রাতে বিষম জরান্তক লৌহ (পুটপক্ব) ২ রতি মাত্রায় শোধিত হিঙ্গু চূর্ণ ২ রতি, পিপুল চূর্ণ ২ রতি ও সৈন্ধব লবণ ২ রতি সহ সেব্য। বৈকালে—রামবাণ ১টী মরিচের গুঁড়া /০ আনা ও বিল্বপত্র রস ১ তোলা সহ ও সন্ধ্যায—মহা জ্বরাংশ ১টী গোঁড়া-লেবুর বীচির শাঁস সহ সেব্য।

৩। বালিকা—বয়স ৫।৬ বৎসর। পীড়ার সূচনা প্রায় ১ মাস যাবৎ হইয়াছে। অল্প জ্বর, বৈকালে জ্বরের সামান্ত বৃদ্ধি বলিয়া বোধ হয়। বাহ্যে যাহা হয়, উহা পাতলা, পরিমাণে নিতান্ত অল্প নহে। পায়ের পাতা ও পিঠ ফুলিয়াছে ক্রিমির লক্ষণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুধার অবস্থা, খাইতে দিলে খায়, না দিলেও বিশেষ কষ্ট বোধ করে না।

ব্যবস্থিত ঔষধ—প্রথম দিন প্রাতে কীটারী রস অর্দ্ধ বটী বিড়ঙ্গ চূর্ণ /০ আনা ও আনারসের পাতার রস সহ সেবন করিবা পর দিন প্রত্যূষে রেড়ীর তৈল ১॥ তোলা সেবন করিবে। ৩।৪।৫ বার বাহ্যে হওয়ার পর শরীর বিশোধিত হইলে পরদিন হইতে প্রাতে কীটারি রস অর্দ্ধবটী বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৩ রতি ০ আনারসের পাতার রস ২ তোলা সহ সেব্য।

বৈকালে রামবাণ রস অর্দ্ধবটী মরিচের গুড়া ৩ রতি ও বিল্ব পত্র রস ১ তোলা সহ ও সন্ধ্যায় সর্ব্বেশ্বর অর্দ্ধবটী তুলসী পাতার রস সহ সেব্য। বিল্বপত্র, শুঠ, পুনর্নবা, গুলঞ্চ ও বাসের শিকড় প্রত্যেক ।৵৫ আনা ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা শেষ থাকিতে নামাইয়া বেলা ৯ টায় ও ৪ টায় (অর্দ্ধেক সেবনে কষ্ট হইলে ৩ তোলা করিয়া দিবে) সেবন করিবে। যতদিন জ্বর ও পায়ের শোথ না যায়, ততদিন সাগু, বার্লি বা ক্ষুধা অনুসারে ২।১ খানি সুজীর রুটী পথ্য করিবে। ||০ তোলা পুরাতন মাণ চূর্ণ ও পুরাতন তণ্ডুলচূর্ণ ১ তোলা ২১ তোলা জল মিশ্রিত দুগ্ধে (১০॥০ তোলা দুগ্ধ ও ১০॥০ তোলা জল) সিদ্ধ করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে কিঞ্চিৎ মিছরির সহিত ২।১ বার সেবন করিলে এইরূপ পীড়ায় বিশেষ উপকার হয়। ইহার নাম মাণমণ্ড। মাণমণ্ড সেবনে শোথ, উদরাময়, প্লীহা, ও জ্বরাদি শীঘ্র উপশম প্রাপ্ত হয়। ইহা যেরূপ বলকর পথ্য, তদ্রূপ ঔষধের ন্যায় উপকারী।

শোথ নিবৃত্তির জন্য—ধান কাটপোকীম ভাজিয়া দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিবে পরে, সিজের (মনসা) পাতা আগুনে ঝলসাইয়া রস করিবে ও এই রসে ঐ চূর্ণ ঘন করিয়া গুলিয়া ঈষৎ উষ্ণ উষ্ণ প্রলেপ দিবে। দিবসে অন্তত ২ বার প্রলেপ দেওয়া উচিত।

৪। একটী বালকের বয়স ৮ বৎসর প্রথমতঃ আমাশয় হয়, পেটে অত্যান্ত বেদনা থাকে। ঔষধ—হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ দেওয়া হয়, বেদনা অপেক্ষাকৃত কম হয় বটে কিন্তু বাহ্যের সহিত রক্ত পড়িতে থাকে। দিন রাত্রিতে প্রায় ৮।১০ বার এইরূপ হয়, পেটের বেদনা ও অল্প অল্প আছে।

ব্যবস্থিত ঔষধ—প্রাতে বৃহৎনৃপবল্লভ অর্দ্ধবটী কাল জামের পাতার রস ও ছাগ দুগ্ধ /০ ছটাক সহ, বেলা ৫।৬ টায় বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ ১ রতি আয়াপানার পাতার রস ।০ তোলা সহ। পথ্য—কাচকলা ছাড়াইয়া না ধুইয়া উহার সহিত থুলকুড়ির পাতা

১ মুঠা দিয়া মাগুর মাছের ঝোল ও বার্লি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। রক্ত নিবৃত্তি ও বাহ্যে কমিয়া গেলে এবং ক্ষুধার বিলক্ষণ উদ্রেক হইলে সরু চাউলের অন্ন ও উক্তরূপ মাগুর মাছের ঝোল সেবন করিবে। গোদুগ্ধের পরিবর্ত্তে ছাগদুগ্ধ সেবন বিধেয়। জলখাবার ২।১ খানি বেলের মোরব্বা। এই সময় টাট্‌কা ঘোল জীরা ভাজার গুড়া সহ সেবনে পাকস্থলী শীতল হইয়া শরীর বিলক্ষণ সুস্থ করে।

৫। পুরুষ, বয়ঃক্রম ১১।১২ বৎসর। সান্নিপাতিক জ্বর, জ্বরের প্রারম্ভেই কর্ণমূলে শোথ হইয়াছে, চক্ষুঃ অত্যন্ত রক্তবর্ণ, সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ মস্তক চালনা করিতেছে, ডাকিলে অল্প উত্তর পাওয়া যায় এবং মধ্যে মধ্যে প্রলাপও আছে— প্রাতে মহালক্ষ্মীবিলাস এক-তৃতীয়াংশ ও অর্দ্ধরত্তি মকরধ্বজ মধুদিয়া মাড়িয়া আদা ও পানের রস সহ. বেলা ৯।১০টায় সৌভাগ্য বটী অর্দ্ধখানি মধুদিয়া মাড়িয়া দশমূলের এক ছটাক ক্বাথ সহ সেব্য। বেলা ৩ টায় অবশিষ্ট অর্দ্ধখানি সৌভাগ্য বটী মধু ও অবশিষ্ট এক ছটাক দশমূলের ক্বাথ সহ। রাত্রি ৭।৮ টায় যে সময় পীড়া বৃদ্ধি হয়, সেই সময় বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ এক-তৃতীয়াংশ আদা পানের রস সহ সেবন করিবে। গেরিমাটী, সৈন্ধব, শুঁঠ, বচ ও কট্‌ফল কাঁজিতে উত্তমরূপ পেষণ করিয়া অল্প উষ্ণ অবস্থায় কর্ণমূলে দিবসে ২।৩ বার করিয়া প্রলেপ দিবে। মস্তক মুণ্ডন করিয়া আদা ও পান বাটিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে পুরু করিয়া বসাইয়া দিবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা ক্রমশঃ দোষের লাঘব হইয়া আসিলে জ্বরের জন্য মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধের পরিবর্ত্তে নবজ্বরাধিকারোক্ত স্বচ্ছন্দভৈরব ১টী তুলসী পত্র রস ও মধু সহ সেবন করিবে। পথ্য সাগু কিম্বা বার্লি। জ্বরের অতিশয় বৃদ্ধির সময় দুই এক দিবস মুগ ২ তোলা ও মসুর ২ তোলা একত্র ২।৪ খণ্ড আর্দ্রক ও ২।১ কোয়া রসুন সহ উত্তমরূপ সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ সংযোগে পান করিতে দিবে। ইহাতে বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। ২০।২১ দিনে দাঁতের গোড়ায় ক্ষত ও বেদনা উপস্থিত হওয়ায় জামছাল, আমছাল, বকুলছাল, জিউল ছাল ও কাল খয়ের একত্র ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জলে কুল্ল করিতে দিবে।

রোগিণী স্ত্রী, বয়ঃক্রম ১৫।১৬ বৎসর জ্বর ও পেটে বেদনা, সময় সময় পেটে গুল্মের ন্যায় অনুভব হয়। বেদনার সময় চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হয়, ঘর্ম্ম ও পিপাসা অত্যন্ত হয়। ৫।৬ মাস যাবৎ রজঃ প্রবৃত্তি হয় না। হাত পা ও চক্ষুতে জ্বালা আছে। প্রাতে গুড়ূচাদি লৌহ ১টী মধু ও নিম্নলিখিত পাচন সহ। পাচন— ক্ষেতপাপড়া, ধনে, গুলঞ্চ, জাঙ্গিহরিতকী, আমলকী, বহেড়া, চিরাতা ও কট্‌কী প্রত্যেক ।০ আনা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। মধ্যাহ্নে চিত্রকাদি গুড়িকা ১টা শীতল জল সহ ও সন্ধ্যায় রজঃপ্রবর্ত্তিনী বটী ১টা জল সহ। গুড়ূচ্যাদি তৈল অল্প অল্প তলপেটে ও হাত পায় মালিশ করিবে। পথ্য দিবসে মাগুর মাছের ঝোল পাতিলেবুর কুশি ও বক্কা দুগ্ধ প্রভৃতি। রাত্রিতে খই দুধ কিম্বা দুগ্ধসাগু।

অশ্বগন্ধা—বরাহকর্ণী, বরদা, বলদা, কুষ্ঠগন্ধিনী ও অশ্ববাচক সমস্ত শব্দ ইহার পর্য্যায়। অশ্বগন্ধা বলকারক, রসায়ন, তিক্ত, কষায়, উষ্ণ ও অতিশয় শুক্রজনক। ইহার দ্বারা বায়ু, শ্লেষ্মা, শ্বিত্র (ধবলরোগ), শোথ, ক্ষয়রোগ, আমবাত, ব্রণ, কাস ও নাসারোগ নষ্ট হয়। ইহার মূল অভাবে সমস্ত অংশই গ্রহণীয়। মাত্রা ৵৹ আনা। অশ্বগন্ধার মহীয়সী শক্তি বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। আমাদের অশ্বগন্ধা রসায়ন সেবনে সহস্র সহস্র রোগী আরোগ্যলাভ করিতেছেন কিন্তু এই কল্যাণপ্রদ ঔষধি সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না এবং অনেকেই ইহা বিদিত নহেন, কেবল নামই শুনিয়াছেন। সেজন্য আমরা আজ অশ্বগন্ধার একটী প্রতিকৃতি প্রদান করিলাম।

কোকিলাক্ষ। বাঙ্গালা কুলেখাড়া ও হিন্দি তালমাখনা।

কোকিলাক্ষ, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুরক, ক্ষুর, ভিক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুগন্ধা ও ইক্ষুবালিকা এই কয়েকটী কুলেখাড়ার পর্য্যায়। কুলেখাড়া শীতল, বলকারক, স্বাদু অম্ল, পিত্তজনক ও তিক্ত। ইহার দ্বারা আমশোথ, অশ্মরী, তৃষ্ণা, অরুচি ও বাতরক্তরোগ নিবারিত হয়। নীরক্তাবস্থায় ইহার শাক আহারার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ অথবা সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ॥৹ তোলা। যখন শরীরে রক্তাল্পতা উপস্থিত হয়, প্লীহা বর্দ্ধিত হয় ও অল্প অল্প জ্বর হইতে থাকে, তখন কুলেখাড়ার রস অনুপানে বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর লৌহ, প্লীহাধিকারোক্ত মহামৃত্যুঞ্জয় কিম্বা প্লীহাধিকারোক্ত অপর কোন ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুলেখাড়া বিনা যত্নেই জন্মিয়া থাকে। পাঠক বর্গের অবগতির জন্য একটী কুলেখাড়ার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

স্মরণার্থে।

এই সংখ্যায় আমরা আমাদের অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে শোক সন্তপ্ত চিত্তে একটী দুঃখময় সংবাদ দিতেছি। সমীরণের এক জন প্রধান লেখক বাবু ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। রোগে ভুগিয়া নয় তাহা হইলে বুঝিতাম, জীবের সাধারণ ধর্ম্মে। স্নান করিতে গিয়া জাহ্নবী গর্ভে পদস্খলিত হইয়া প্রখর স্রোত মুখে তাঁহার জীবন স্রোত মিশিয়া গিয়াছে।

ক্ষেত্রমোহন—সংস্বভাববিশিষ্ঠ বিনয়ী, সদালাপী ও সুলেখক। তিনি অতি অল্পদিনই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে যেরূপ ফুটিয়া উঠিতেছিলেন, তাহাতে কালে তিনি শ্রেষ্ঠ লেখক হইয়া দীনা মাতৃভাষার অঙ্গে অনেক নূতন অলঙ্কার সাজাইতে পারিতেন। কবির—Child is the Father of man এই বাক্যের সার্থকতা হইতে না হইতেই কাল আসিয়া অকালে তাঁহার অস্তিত্ব লোপ করিল।

বাঙ্গালা দেশে উপন্যাস জগত আজও স্বল্প বিরল সুলেখকে পরিপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর আর কেহ সে শূন্য আসন পূর্ণ করিতে পারেন নাই। রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী প্রভৃতি লেখনীকে ক্রমশঃ বিশ্রাম দিতেছেন বাঙ্গালা সাহিত্যে এ ভিন্ন আর যাঁরা কৃতী লেখক আছেন তাঁহারাও নানা কারণে নকল লেখায় ভীতগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছেন।

আমাদের দেশে—উপন্যাস লেখকের অবস্থা একেত এই—তাহার উপর আবার Realistic লেখকের সংখ্যা আরও কম। Realistic হইয়া হয়ত পাশ্চাত্য জগতে, অনেক লেখক, যশের শ্রেষ্ঠ শিখরে উপস্থিত হইয়াছেন। ক্ষেত্রনাথ এক জন Realistic শ্রেণীর উপন্যাসকার। তাহার ফুল ফুটিতে ফুটিতে কাল কীট তাহাকে কোরকে বিনাশ করিয়াছে। হায়! যদি তাহা ফুটিবার অবসর পাইত—যে ভবিষ্যৎ প্রতিভার স্বল্প তীক্ষ্ণ জ্যোতি সাহিত্য ক্ষেত্রের এক কোণে ক্ষীণ তীব্রভাবে মধুর ছটা বিস্তার করিয়াছিল তাহা যদি পূর্ণ প্রভাব প্রকাশ করিবার সময় পাইত—তাহা হইলে হয়ত—সাহিত্যসেবার সহিত এরূপ ভাবে—আমাদের ক্ষেত্রমোহনের পরিচয় দিতে হইত না।

সমীরণে প্রকাশিত, একটী বাজে গল্প, দাদামহাশয়ের স্বর্গলাভ, প্রাইভেট টিউটরের দুঃস্বপ্ন, নক্সা-জরির জুতা ক্ষেত্রমোহনের শেষ লেখনী প্রসূত অতি সুন্দর ক্ষুদ্র প্রবন্ধ নিচয়। বর্ণনার ছটা, কথার বাঁধুনি, ভাবের গাথুনী, ভাবের ওজস্বিতা, কল্পনার তেজস্বিতা—কেমন ধীর নম্র ভাবে তাহার প্রতি ছত্রে ছত্রে বিরাজমান। আমাদের

সমীরণে বাহির হইয়াছিল বলিয়া নয়—অনেক মাসিকপত্র পাঠকেব নিকট ইহাব সুখ্যাতি শুনিয়াছ। তার পব তাঁহার ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস গৌরী; হায়! হতভাগ্য "গৌরী" না ফুটিতে পিতৃহীনা হইয়া পড়িল।

ক্ষেত্রনাথ একজন সুলেখক ছিলেন বলিয়া যে আমরা কেবল দুঃখ করিতেছি তাহা নহে। অমায়িকতা, সহৃদয়তা—সেই অকাল মৃত যুবকের চরিত্রে, ফুটন্ত ভাবে বর্ত্তমান ছিল। ক্ষেত্রনাথ এর পবে অনেক লেখক জন্মিতে পারেন কিন্তু সেই অর্দ্ধমুকুলিত অস্ফুট বাস কোরক প্রতিভা স্ফুটিত হইলে যাহা দাঁড়াইত তাহা আর আমরা দেখিতে পাইলাম না।

সমালোচনা।

সাধন সপ্তকম। জয়দেব কৃত দশাবতার স্তোত্র, কুলশেখর কৃত কুমুদ মালা, শঙ্করাচার্য্য কৃত মোহমুদ্গর, সাধনপঞ্চক, যতি পঞ্চক, অপরাধ ভঞ্জন স্তোত্র ও ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপ স্তোত্র অনুবাদে পুস্তক খানি গঠিত। গ্রন্থে এই সকল প্রবন্ধের মূলও প্রদত্ত হইয়াছে। আজ কাল হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের দিনে এরূপ গ্রন্থের আবশ্যকতা বুঝাইতে হইবে না। হিন্দুমহিলা, পূজা করেন, মন্ত্রোচ্চারণ করেন, অনেক সময় তাহার অর্থ বোধ হয় না, শুধু বুঝিয়া লয়েন হৃদয়ের পূর্ণপ্রীতি, ঋষি কৃত স্তোত্রে নিশ্চয়ই অনন্তের দ্বারে পাঠান হইল। কিন্তু এই স্তোত্র মালার ভিতরেই কি অমৃতের উৎস প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা জানিবার সুবিধা হয় না। কেহ বুঝাইয়া দিলেও তাহাতে মুলের উচ্ছ্বাস মাধুরী প্রায়ই বিলুপ্ত হয়। মহাকাব্য বা মহাকবির নামানুবাদ অনেক সময় মৌলিক রচনা অপেক্ষা দুরূহ। শুধু বাঙ্গলার স্ত্রীলোকেরই যে শুধু এ ভাগ্য বিপ্লব তাহা নহে, অনেক পুরুষের অদৃষ্টেও বিধাতা ইহা অপেক্ষা অধিক সুপ্রসন্ন নহেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে অভাব অনেকটা দূর হইয়াছে। অনুবাদ মধুর, এত সুললিত, এত কবিত্বপূর্ণ, যে স্থানে স্থানে আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল, মূল ভাল না অনুবাদ ভাল। শঙ্করাচার্য্যের অপরাধ ভঞ্জন স্তবের একাংশ এত দার্শনিকতা পূর্ণ, অন্ততঃ টীকাকার তাহাতে এত দার্শনিক জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন যে সাধারণের বিশ্বাস, সে অংশ একরূপ অবোধ্য। আমরা সানুবাদ সেই শ্লোকটী উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

স্থিত্বাস্থানে সরোজে প্রণবময
মরুৎকুম্ভে সূক্ষ্মমার্গে,
শান্তেস্বান্তেপ্রলীনেপ্রকটিত
গহনেজ্যোতিরূপেপরাখ্যে।
লিঙ্গং তদ্‌ব্রহ্মবাচ্যং সকলমভিমতং
নৈব দৃষ্টং কদাচিৎ,
কল্পব্যোমেহপরাধং শিবশিব-
শিবভোঃ। শ্রীমহাদেবশম্ভো॥ ১২

পদ্মাসন যোগাসনে, উপবেশি একমনে,
* পদ্মানন মত মুখ করিয়া ব্যাদান ;
পবিত্র ওঙ্কার পূর্ণ, সব্বশ্বাস ক্রিয়া শূন্য,
কুম্ভক যোগের প্রভু করিয়া সাধন,—
আপনার মাঝে প্রভু হেন না হেরিনু কভু,
শান্ত, সব ইন্দ্রিয়ের বিদ্রোহ, ভাষণ,
ঘুচেছে ভিতর বার, মুছে গেছে চরাচর,
আলোর সাগর শুয়ে—আনন্দ গঞ্জন!—
আপনার মাঝে প্রভু, হেন না হেরিনু কভু,
অন্ধকার আলো হয় জ্যোতির পরশে,
চৈতন্য সাগর পরে, বিরাট, গম্ভীর, ধারে,
তোমার পরাখ্য জ্যোতি নিত্য বিকাশে!—
হেন দীপ্ত প্রাণে প্রভু!—জীবনে হেরিনু কভু
পূর্ণব্রহ্মরূপী লিঙ্গ সমুদিত ভব,
আমার অশেষ দোষ, ক্ষমা কর আশুতোষ,
জয় শম্ভো!—মহাদেব! দেব শিব শিব শিব

সংস্কৃত ছন্দের যে বাঙ্গালায় এত অনুরূপ ছান্দিক অনুবাদ হইতে পারে, তাহা গ্রন্থকার কৃত সানুবাদ মোহমুদ্গর পাঠের পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল না। এই পুস্তকের দুই একটা প্রবন্ধ পূর্ব্বে ২।১ জন খ্যাতনামা অধ্যাপক কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়াছিল। আমরা তাহার নিন্দা করিতেছি না, কিন্তু এ অনুবাদ স্বতন্ত্র ধরণের। ইহাতে ব্যাখ্যার মৌলিকত্ব, আছে, কবিত্ব আছে, মূলের জীবনী আছে, যাহা অনুবাদে প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমরা উদাহরণ স্বরূপ ২।১টী স্থল না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্।
হলহতি ভীতি মিলিত যমুনাভম্ ॥
কেশব ধৃত হলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥

বিধুমুখে সীধুগন্ধ, রোহিনী-চুম্বনস্পন্দ,
গণ্ডস্থলে তাম্বুলের রাগে ;
মন্দ গন্ধবহ তালে, কুন্তলে কুসুম দোলে
নীলবাস ঢাকিছে পরাগে!
ললাটে স্বেদের বিন্দু, শিশিরিত আধ ইন্দু,
হেথা হোথা জড়িত অলক ;
চলিতে চরণ টলে, মদির নয়ন ঢুলে,
আধ আধ মুছেছে তিলক!
শ্রীঅঙ্গ পরশ বায়, বসন্ত ছড়ায়ে যায়,
দেহ ঘিরি লাবণ্য উথলে ;
ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল, মুখ দেখে ভাবে ভুল
শশী বুঝি পশিল কমলে!
বরবপু হলধারী, ব্রজকূলে অবতরি,
স্নানযাত্রা করিয়া মানসে,
যমুনারে কাছে ডাক, নদী কাছে আসে নাক,
আন তারে হলের কর্ষে।
যমুনা জগতে নারী, বৃন্দাবনে উত্তরিলা,
ত্রাসলভ সবমেতে মরে ;
কালিন্দী সন্ত্রাস-ভর, মিলে সে নীলিমা তব,
নীরদাভ বসন ভাবে!
জয়!—জগদীশ হরে।

বান্ধাক্যচেন্দ্রিয়ানাং বিগতগত-
মতেব্যাধিবৈবাদিতাপৈঃ,
পাপৈরোগৈর্বিয়োগৈর-
সদৃশবপুষং প্রৌঢ়হীনঞ্চ দীনং।
মিথ্যামোহাভিলাষৈভ্রমতি-
মমমনোধূর্জ্জটেধ্যান শূন্যম্,
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিবশিব
শিবভোঃ শ্রীমহাদেবশম্ভো॥ ৬

* অন্তর স্তম্ভবৃত্তি কুম্ভকঃ। তস্মিন জল মিব কুম্ভে নিশ্চলতয়া প্রাণাঃ অবস্থাপ্যন্তে ইতি কুম্ভকঃ। ভোজবৃত্তি।

বাহ্যাভ্যন্তর স্তম্ভবৃত্তির্দেশকাল সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘ সূক্ষ্মঃ পাতঞ্জল যোগসূত্র। সাধং। ৫০
বক্ত্রেণোৎপল নালেন বায়ুং কৃত্বাবিনাশযম্।
এবং বায়ুগ্রহীতব্যঃ কুম্ভকর্মেতি লক্ষণম্॥
অমৃতবিন্দুপং। ১২।

কত উষাময়ী আশা, ঢেকে নেছে অমানিশা,
প্রাণের প্রান্তরে কত অশনির ঘটা;
প্রতি ভুল ভেঙ্গেগেছে, প্রতিপদে ফুটে গেছে,
অনভিজ্ঞ জীবনের রক্তভূষ কাটা!
হৃদয়ে হুঁচট লাগে, "আজন্ম" শিহরি জাগে,
মহাত্রাসে কক্ষপাশে ঝুঁকে পড়ে প্রাণ;
বাসনার বালিঘর, গড়ি—ভাঙে নিরন্তর,
ভূমিকম্প আছে—যেথা আগে ছিল প্রাণ!
বৃদ্ধকাল আসিয়াছে, মৃত্যু আজ পড়েদেছে,
শুভ্র অবিকার চিহ্ন কুন্তল মাঝার;
আজ আয়ু সন্ধ্যাকালে, পাপতাপ শোকে জ্বলে
ইন্দ্রিয়ের বাবে বংশী উঠিছে আবার!
রোগে শোকে পাপে প্রভু! শ্রী, যৌবন গেছে তবু
মিছে অভিলাষে মন চিন্তাশূন্য তব;
আমার অশেষ দোষ, ক্ষমা কর আশুতোষ,
দেব শম্ভো! মহাদেব! দেব শিব শিব! ৬

বাঙ্গালা ভাষাতে অন্নদামঙ্গল স্থানে স্থানে এইরূপ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বলিলে কোন দোষ হয় না। অনুবাদ বিষয়ে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ অন্নদামঙ্গল অপেক্ষ কোন অংশে ন্যূন নহে। ইংরাজ আপনার ধর্ম্মের অনুবাদ অকাতরে বিতরণ করে, হিন্দুধর্ম্মের পক্ষাশ্রয়ীদের এই গ্রন্থ অন্ততঃ স্কুল পাঠশালার ছাত্র বা ছাত্রী, বর্গে, বা আপনার পরিবারস্থ মহিলা বর্গের ভিতর প্রচলন বা বিতরণ করিলে, মহা পুণ্য সঞ্চিত হইবে ভুল নাই।

জীবন্ত নক্সা। জি, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত গল্পাংশ পাঠ করিলে লেখকের অভিরুচির পরিচয় পাওয়া যায় লেখকের পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়, গল্প কয়টা ক্ষুদ্র হইলেও পাঠে তৃপ্তি হয়। লেখক এরতে নূতন দিক্ষিত, ভবিষ্যতে চেষ্টা থাকিলে সাধারণকে মোহিত করিতে পারিবেন।

জামাই বরণ প্রহসন। বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনীত হইয়াছিল হাস্যরসে লেখকের ক্ষমতা আছে লেখক নিজে না হাসিয়া অপরকে হাসাইতে পারেন।

রঘুনাথ দাসের জীবন চরিত। চৈতন্য চরিতের কয়েকটা উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর আজ কাল বাঙ্গলা ভাষায় বৈষ্ণব সাহিত্যের একটা খরস্রোত বহিয়াছে। এই গ্রন্থখানি তাহারই একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ। চৈতন্য ভক্ত রঘুনাথ দাসের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়, অতি সুন্দরভাবে সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা গ্রন্থখানি পড়িয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। মুদ্রাঙ্কণের দোষে যে কয়েকটী সামান্য ত্রুটি আছে তাহা অতি সহজেই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। আশা করি গ্রন্থকার ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিবেন।

রয়েল বেঙ্গলে "যমের ভুল"।

বড়দিনের বাজারে কলিকাতার থিয়েটার সমূহে নানাবিধ রং সং প্রহসন ইংরাজী বৎসরের বিদায়ী আমোদরূপে বাহির হইয়াছে। "যমের ভুল" রয়াল বেঙ্গলের পঞ্চরঙ্গ। ইহাকে ঠিক পঞ্চরঙ্গ বলিতে পারা যায় না, প্রথমটা পঞ্চরং-এ আরম্ভ হইয়া ধর্ম্মের মধুরে শেষ হইয়াছে।

আজকালকার প্রহসন গুলিতে উপকার কি অনুপকার হইতেছে তাহা বিচার করা, বড কঠিন। ব্যঙ্গবিদ্রুপের কশাঘাত সমাজের পৃষ্ঠে পড়িলে তাহার দাগ কতদিন থাকে তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু বঙ্গ প্রহসন পঞ্চরঙ্গে লোকের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটু

আমোদলাভ হয়। পঞ্চরঙ্গ প্রহসনের অধিকাংশই শেষ হয় ত পঞ্চরাজ্যে না হয় ত কোন অদ্ভুত দৃশ্যে। যমের ভুলের কিন্তু এসম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে।

বঙ্গ রঙ্গভুমির সুযোগ্য অধ্যক্ষ বেহারি বাবু এই প্রহসনের রচয়িতা। রয়াল বেঙ্গলের চির অমর প্রভাস মিলন তাঁহার লেখনী প্রসূত। সেই লেখনীর ভক্তিরস প্রাধান্যের কতক ছায়া যমের ভুলের শেষাঙ্কে পড়িয়াছে।

গ্রাম্য পঞ্চায়েতের দোষ দেখানই এই প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। পঞ্চায়েত পল্লীগ্রামে এখন কিরূপ বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া তাহার চির উপভোগ্য শান্তি ও সরলতা নষ্ট করিতেছে তাহাই এই প্রহসনে বিশেষরূপে দেখান হইয়াছে। চৈতন্য মণ্ডল বাস্তবিকই ভয়ানক প্রভৃতির লোক। যমালয়ে গিয়া সে যে কাণ্ডটা করিয়াছিল তাহাতে মানুষের শয়তানী বুদ্ধির নিকট দেবতাদেরও যে মাঝে মাঝে নাকাল হইতে হয় ইহাই দেখান হইয়াছে।

"যমের ভুলের" আরম্ভ শ্লেষে কিন্তু শেষ ভক্তিতে। পর পর বিরুদ্ধ রসে এই প্রহসনের অবতারণা ও উপসংহার হইয়াছে। যে হরিনাম গান করিয়া বেঙ্গল দিন দিন পবিত্র হইতেছে প্রহসনের শেষভাগে সেই হরিনামের মাহাত্ম্য মাধুরী সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

অভিনয় সম্বন্ধে রয়াল বেঙ্গলের পূর্ব্বরস সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কয়েকটী পথ যমপুরীর দৃশ্য অতি মনোরম। যমের ভুলে, অনেক দেখিবার শিখিবার জিনিস আছে। নাট্যামোদীগণ যাহারা এখনও ইহা দেখেন নাই একবার দেখিয়া আসিবেন।

মরকতে "আবুহোসেন"।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের কৌশলময়ী লেখনী প্রসূত "আবুহোসেন" মরকতে অভিনীত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ধরণের Comic Drama অতি কম, নাই বলিলেই হয়। ইহার আগাগোড়া উপভোগের জিনিস। চক্ষু ও কর্ণ উভয়ে পরিতৃপ্তি জন্য "আবুর" সৃষ্টি। প্রধান অংশ "আবু" সাজিয়াছিলেন আমাদের নটপ্রবর মুস্তকী সাহেব মিনার্ভায় যাঁহার জন্য "আবুর" যশ বাড়িয়াছিল মরকতে তিনিই আবুর অংশ অতি সুন্দররূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। মরকতে রোশেনার সঙ্গীত বহুধারা আর আবুর অদ্ভুত অভিনয়ে আমরা যথেষ্ট পরিতৃপ্তির সহিত উপভোগ করিয়া আসিয়াছি। যাঁহারা মিনার্ভার আবুহোসেন দেখিয়াছেন তাঁহাদের আমরা একবার মরকতে গিয়া ঐ বিষয়ে অভিনয় দেখিতে বলি।

২য় খণ্ড। | ১৩০১ সাল—মাঘ। | ৫ম সংখ্যা।

সূচী পত্র।

মূল্য, প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

আয়ুর্ব্বেদ-প্রচার।

এই মাস হইতে আমরা উপরোক্ত নামধেয় একখানি মাসিক পত্রিকা চারি-সহস্র করিয়া প্রত্যেক মাসে বিনামূল্যে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিব। যাহাতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বহুল প্রচলন হয় ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আমাদের কোনরূপ যত্নের ত্রুটী হইবে না। প্রার্থিগণ নিজ নিজ নাম, ধাম, ডাকঘর ও জেলাসহ সত্বর আবেদন করুন, চারিহাজার পূর্ণ হইলে আমরা আর দিতে পারিব না।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ভৈষজ্য উদ্যান।

আজ অপার আনন্দসহকারে জানাইতেছি যে, পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন কবিরাজ মহাশয় হাবড়া ষ্টেশনের পরবর্ত্তী লিলুয়া ষ্টেশনের সন্নিকট বিস্তৃত ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া, তাহাতে জলাশয় ও নানাবিধ ভৈষজ্য অর্থাৎ জলজ ও স্থলজ আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসোপযোগী তৃণ, গুল্ম, লতা, বৃক্ষ, প্রভৃতি যত্নপূর্ব্বক সংস্থাপন করত ভারতের একটী প্রকৃত অভাব দূর করিতেছেন। ইহা দ্বারা রোগী, চিকিৎসক ও চিকিৎসা-শিক্ষার্থিদিগের যে বিশেষ উপকার হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পরন্তু ঐ স্থানে একটী আদি আয়ুর্ব্বেদ শাখা ঔষধালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে বেলা ৮ টা পর্য্যন্ত সমাগত দীনদরিদ্র রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ প্রদত্ত হইবে। উক্ত স্থানে উপযুক্ত দ্রব্য সমূহ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া যাহাতে আমাদের তৈল, ঘৃত ও অন্যান্য ঔষধ সমধিক ফলোপধায়ক হয়, সেজন্য বিশেষ যত্ন করা হইতেছে। ভরসা করি সকলেই অবগত হইয়া সুখী হইবেন এবং উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া বাধিত করিবেন। সময়ে সময়ে উক্ত উদ্যান সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আমাদের চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান এবং সমীরণে সাধারণের গোচরার্থে প্রকাশ করিব। এতদ্বিষয়ক পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে লিখিবেন।

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।
১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড,
ফৌজদারী বালাখানা,
কলিকাতা।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

২য় খণ্ড। ১৩০১ সাল—মাঘ। ৫ম সংখ্যা।

শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন চরিত।

(প্রতিবাদ আলোচনা।)

শ্রীযুক্ত বাবু অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রঘুনাথ চরিতের সমালোচনা করিতে অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল। নানা কারণে এতদিন হইয়া উঠে নাই বলিয়াই, আজ তাহার অবতারণা। অঘোর বাবুর কাছে যে আশা আমরা করিতে পারি, রঘুচরিত পাঠে তাহাতে নিরাশ হইয়াছি। তিনি অনুসন্ধিৎসু বটে, কিন্তু বক্ষ্যমান গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল না। ফল কথা—পুস্তক খানি ভ্রম প্রমাদ পরিশূন্য হয় নাই। চৈতন্য চরিতামৃত ও ভক্তমালা অবলম্বনেই তিনি রঘুচরিত লিখিয়াছেন।

রঘুনাথের জীবনকাল প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম—নীলাচল বাস পর্য্যন্ত পূর্ব্ব জীবন, ২য়—বৃন্দাবনবাস—দেহত্যাগ পর্য্যন্ত শেষ জীবন। আলোচ্য পুস্তিকায় গোস্বামীর পূর্ব্ব জীবন বর্ণিত হইয়াছে, শেষ জীবনের কোন কাহিনী এ পুস্তকে বিবৃত হয় নাই। পুস্তকের আখ্যানভাগ (রঘুনাথের জীবনী) এইরূপ।

সপ্তগ্রামের "কর সংগ্রাহক" * হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস। কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র পুত্রই রঘুনাথ দাস। রঘুনাথের হৃদয় ধর্ম্মপ্রবণ—বাল্যাবধিই তিনি বিষয়ে বিরক্ত। বাল্যকালে রঘুনাথ যখন পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে অধ্যয়ন করিতেন, তখন "যবন কুলোদ্ভব পরম ভাগবত হরিদাসের মুখে হরিনাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া" তাঁহার "ধর্ম্মে মতি" হয়।

হরিদাসকে অনেকেই যবন কুলোদ্ভব মনে করেন, কিন্তু হরিদাসের জন্ম সম্বন্ধে

---

* এ প্রস্তাবে কোটেশনের ভিতর যাহা আছে, সমালোচ্য পুস্তক হইতে তাহা উদ্ধৃত করা গেল। লেখক।

সংশয় আছে। কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত যে, হরিদাসের পিতা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নাম সুমতি শর্ম্মা, হরিদাসের মাতার নাম গৌরীদেবী। হরিদাসের বয়স যখন ছয় মাস, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; পতি শোকে উন্মাদিনী প্রায় পতিপরায়ণা গৌরীদেবী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করেন। আত্মীয় কেহ ছিল না; নিরাশ্রয় শিশুকে এক মুসলমান প্রতিবাসী লইয়া গিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন, এইরূপে ব্রাহ্মণ সন্তান যবনত্ব প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ হরিদাস ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তান। তাঁহার পিতৃদত্ত "হরিদাস" নামই ইহার প্রমাণ। যাহা হউক, যখন এ বিষয়ে মতদ্বৈত আছে, তখন স্পষ্টাক্ষরে "যবন সন্তান" বলা যুক্তিযুক্ত নহে।"

১৪৩১ শকে "চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুর আগমন করিলে" রঘুনাথ তৎসহ সম্মিলিত হন। বাটী আসিলে রঘুনাথের মন আর গৃহে তিষ্ঠে না, সুতরাং তিনি বার বার পলায়ন করেন। রঘুনাথের পিতা "অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া রঘুনাথকে বাঁধিয়া রাখিলেন এবং পাঁচজন পাইক"কে প্রহরায় নিযুক্ত করিলেন। আর "রঘুনাথের প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাসকে বায়ুরোগের লক্ষণ মনে করিয়া আত্মীয়গণকে চিকিৎসক ডাকিতে পরামর্শ দিলেন। রঘুনাথ এই অবস্থায় অনন্যোপায় হইয়া অতি কষ্টে বন্দীভাবে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।"

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরে যখন শান্তিপুরে আসেন, সমস্ত ভক্তগণ তখন বিহ্বল; সে সময় রঘুনাথ শান্তিপুর আগমন করেন নাই। তবে নীলাচল হইতে যখন গৌরাঙ্গ শান্তিপুর আসেন, রঘুনাথ তখন শান্তিপুর আসিয়া তৎসহ সম্মিলিত হন। আর এই মিলনের পূর্ব্বে রঘুনাথ, মহাপ্রভুর সহিত সম্মিলনেচ্ছায় বাড়ী হইতে পলাইতে চেষ্টা করেন; সেই সময় গোবর্দ্ধন দাস পুত্রের জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, শান্তিপুরাগমনের পরে নহে, পূর্ব্বে। কিন্তু রঘুনাথের পিতা যে পুত্রের প্রেমোন্মাদকে "বায়ুরোগ" মনে করিয়াছিলেন ও চিকিৎসক ডাকিতে পরামর্শ করা হইয়াছিল, তাহা কোথাও শুনি নাই, অঘোর বাবু শুনাইলেন।

ভক্তমালায় লিখিত আছে বটে—[শেষে রজ্জু দিয়া হস্ত রাখিল বান্ধিয়া] কিন্তু চরিতামৃতে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। চরিতামৃতের কথাই অধিক প্রামাণ্য, কেন না কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথের সহ বৃন্দাবনে একত্র বাস করিতেন ও তাঁহার সকল কথা জানিতেন, অঘোর বাবুও বোধ হয় একথা অস্বীকার করিবেন না। তবে বিরক্ত হইয়া একদা রঘুনাথের জননী বলিয়াছিলেন—[পুত্র বাতুল হৈল রাখহ বান্ধিয়া] এ বাতুল শব্দ বিরক্তি প্রকাশক মাত্র। কেননা ইহার উত্তরে গোবর্দ্ধন দাস স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন।

[ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্যভোগ স্ত্রী অপ্সরা সম।
ইহাতে বান্ধিতে যার নারিলেক মন॥
দড়ির বান্ধনে তারে রাখিবে কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥
চৈতন্য চন্দ্রের কৃপা হইয়া ইহারে।
চৈতন্য প্রভুর বাতুলকে রাখিতে পারে।]

চৈঃ চঃ

রঘুনাথের জন্মদাতার ইহাই প্রকৃত উত্তর। রঘুর পিতা রঘুকে বান্ধিতে সম্মত হন নাই, রঘুর "বায়ুরোগ"ও মনে করিতেন না।

শ্রীগৌরাঙ্গের সহ রঘুর মিলন—গ্রন্থকার চরিতামৃতে যেমন দুইস্থলে পাইয়াছেন, তেমনই গদ্য করিয়া লইয়াছেন; গুছাইয়া—মিলাইয়া দেখেন নাই। তাহা হইলে মহাপ্রভুর সহিত দুইবার মিলনের কথা লিখিতেন না। নীলাচল গমনের পূর্ব্বে মহাপ্রভুর সহিত রঘুনাথের একবার মাত্র মিলন হয়।

"রঘুনাথ গৃহে আসিয়া গৌরের উপদেশানুরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন; বাহ্য বৈরাগ্য ও বাতুলতা পরিত্যাগ করিয়া অনাশক্ত চিত্তে বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া পিতা মাতা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সমুদয় বিষয় সম্পত্তি তাঁহার তত্ত্বাবধানে অর্পণ করিলেন। পুত্রের ঈদৃশ ব্যবহারে পিতা মনে করিলেন, রঘুনাথের ধর্ম্মানুরাগ হ্রাস হইয়াছে; আর তাঁহাকে প্রহরী বেষ্টিত করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। রঘুনাথ এখন রক্ষকদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন।"

এই কথা নিতান্ত অনুমানিক। প্রহরীদের হাত হইতে রঘুনাথ মুক্ত হইয়ছিলেন, একথা আমরা কোথাও পাই নাই; কবিরাজও বলেন নাই, ভক্তমালায়ও লিখে নাই। আর রঘু বাহ্য বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ইচ্ছা করিলেই কি "বাতুলতা" ত্যাগ করা যায়? তাহা হইলে উন্মাদগ্রস্ত লোক আর থাকিত না।

চৈতন্য চরিতামৃতে আছে—একদা রাত্রিযোগে প্রহরীরা নিদ্রিত হইলে রঘুনাথ পলাইয়া যান। রজনী প্রভাতে সেবক ও রক্ষকগণ রঘুনাথকে দেখিতে না পাইয়া ভীত হইল।

এখানে জিজ্ঞাস্য যে, নিষ্প্রয়োজন বোধে যে প্রহরীদিগকে পূর্ব্বে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল, এখন তাহারা কোথা হইতে সমুদিত হইল? গ্রন্থকারের বলা উচিত ছিল।

এইরূপে রঘুনাথ গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর নিকট গমন করেন। একদা রঘুনাথ স্বরূপের দ্বারা মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহার "জীবনের উদ্দেশ্য কি?" স্বয়ং জিজ্ঞাসা না করার কারণ—কেবল "অসাধারণ বিনয়" নহে, মর্য্যাদা রক্ষাও বটে। অতি অল্প সংখ্যক ভক্তই সাক্ষাৎ ভাবে মহাপ্রভুর সহিত কথা কহিতে পারিতেন। যাহা হউক, মহাপ্রভু রঘুনাথকে বৈরাগ্য ধর্ম্মের উপদেশ দান করিলেন।

রঘুনাথ ষোল বৎসর শ্রীক্ষেত্রে ছিলেন, তৎপরে বৃন্দাবন আগমন করেন। বৃন্দাবনে তিনি দানচরিত, মুক্তাচরিত ও স্তবমালা নামে তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ও কএকটী বাঙ্গালা পদ রচনা করেন।

অঘোর বাবু লিখিয়াছেন—"রঘুনাথ চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষ, মনঃশিক্ষা ও গুণলেশ শেখর ইত্যাদি কএকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।"

অঘোর বাবুর কথিত মনঃশিক্ষা ও স্তবকল্পবৃক্ষ স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে, পূর্ব্বোক্ত স্তবমালায় (স্তবমালার নামান্তর স্তবাবলী। শ্রীরূপ গোস্বামী স্তবমালা নামে আর এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, দাস গোস্বামীর গ্রন্থ তখন স্তবাবলী নামে আখ্যাত হয়) ২৯টী পৃথক পৃথক

বিষয় বর্ণিত আছে; ম..শিক্ষা ও স্তব-কল্পবৃক্ষ—স্তবমালারই অন্তর্নিবিষ্ট দুইটী পৃথক বিষয় বিশেষ।

"গুণ লেশ শেখর" রঘুনাথ প্রণীত, তাহা এই প্রথম শুনা গেল। শ্রীনিবাস শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজ (কবিকর্ণপূর নহেন) কৃত একখানি পুস্তকের নাম "গুণলেশ শেখর" জানি।

অঘোর বাবুর আর একটী ভ্রম—কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তিনি রঘুনাথের "মন্ত্রশিষ্য" বলেন।

[যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস]—ইত্যাদি স্থলে চরিতামৃত গ্রন্থকার স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার গুরু। প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিও একথা স্বীকার করিয়াছেন। যথা :—

[মদীক্ষাদিনা চ গুরুপদেনাত্র নিত্যানন্দ-প্রভুরেবোক্ত বাঞ্ছিতং। ইত্যাদি।]

কবিরাজ চরিতামৃতের প্রতি অধ্যায়ের শেষে "শ্রীরূপ ও রঘুনাথের" নামোচ্চারণ করায় রঘুনাথকে কেন মন্ত্রদাতা বুঝাইবে? তাহা হইলে, শ্রীরূপের নাম কেন? তিনি ত মন্ত্রদাতা নহেন! বস্তুত :—

[শ্রীরূপসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥]

প্রতি অধ্যায় চরিতামৃতের শেষে শ্রীরূপ ও রঘুনাথের নাম উচ্চারণ করিয়া গ্রন্থকার এই ছয় শিক্ষা-গুরুকেই স্মরণ করিয়াছেন। আদিতে শ্রীরূপ ও অন্তে রঘুনাথের নাম থাকায় অন্তরে অবশিষ্ট চারিজন থাকিলেন,—ইহাই বৈষ্ণব ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা সঙ্গত কি না, বিচার ভার পাঠকবর্গের হাতে।

যাহা হউক, এইরূপে দীর্ঘকালের পর রঘুনাথ দেহত্যাগ করেন। অঘোর বাবুর মতে রঘুনাথ ১৫০৪ শকে দেহত্যাগ করেন। 'সজ্জন তোষণী' পত্রিকায় কোন প্রাচীণ বৈষ্ণব ভক্তের লিখিত একটী নোটে দাস গোস্বামীর অপ্রকট-কাল ১৫০৪ শক বলিয়া লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা নির্ভর যোগ্য নহে; ভক্তিরত্নাকর এবং কর্ণানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থমতে তাঁহার বহুকাল পরে তিনি দেহত্যাগ করেন। বৈষ্ণব দিগদর্শিনীর কথা বৈষ্ণবগণ প্রামাণ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, সে মতে ১৫১৪ শকে চতুর্নবতি বর্ষকালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

তবে অঘোর বাবু রঘুনাথের জন্মকাল নিরূপণ সম্বন্ধে যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহা প্রশংসাই। তিনি বলেন ১৪১৯ শকে রঘুনাথের জন্ম, কিন্তু আমাদের মতে তাঁহার জন্মকাল ১৪২০ শক।

অঘোর বাবু সুলেখক, তাঁহার লেখার ভিতর ছিদ্র থাকা অনুচিত মনে করি। তাঁহার পুস্তক অনেকে পাঠ করিবে, অতএব অনুরোধ—দ্বিতীয় সংস্করণে এ ভ্রম গুলি রঘুচরিতে যেন দেখিতে না পাই। তিনি ভ্রমগুলি শোধন করিয়া লইবেন উদ্দেশ্যেই এ প্রস্তাবটী লিখিত হইল।

শ্রীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী।

অভাগিনীর আত্মকথা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পরীক্ষা।

দিদী ও বাবা চলিয়া গেলেন; আমি তখন দিদীর কাজ করিতে লাগিলাম। আশ্রমের প্রায় সমস্ত কাজই দিদী করিতেন। আমাকে তত করিতে হইত না, অধিকাংশ কাজ অধিরাজ নিজে করিতেন; কেবল দুই চারিটী কাজ আমাকে করিতে হইত। এইরূপে কয়েক দিন অতীত হইলে একদিন অধিরাজ আমাকে ডাকিলেন। তাঁহার সঙ্গে দিনের মধ্যে চার পাঁচবার দেখা হইত, সুতরাং তাঁহার কাছে যাইতে আমার তত সঙ্কোচ হইত না।

একদিন সন্ধ্যাকালে মহামায়ার মন্দিরে আরতির আয়োজন করিয়া দিয়া কুটীরের অভিমুখে আসিতেছি, এমন সময়ে অধিরাজ বলিলেন "মা! আজ রাত্রে তোমায় গুটিকত কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

আমি দিদীর কাছে পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, সুতরাং প্রভু বলিবা মাত্র বুঝিতে পারিলাম; অমনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বলিলাম "যে আজ্ঞে, কখন আসিব?"

"সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া আসিবে।"

আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম এবং যথাকালে সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া তাঁহার চরণ সমীপে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার সম্মুখে একখানি মৃগচর্ম্ম পাতা ছিল, তিনি আমাকে সেই আসনে বসাইয়া বলিলেন, "তোমার ব্রতের দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়াছে, আমার বোধ হইতেছে তুমি সিদ্ধির পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছ। সেই জন্য আমি ভুবনকে ও তোমার পিতাকে মায়ের কোন বিশেষ কাজে পাঠাইয়াছি। তোমাকে ও তোমার পিতাকে পাইয়া আমাদের সন্ন্যাসিসেনার অনেকটা শক্তি বাড়িয়াছে, বলিতে হইবে। বিশেষতঃ তোমার পিতা যে, এত কাজের লোক, তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। এক্ষণে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। প্রথম প্রথম তোমরা অনেক মনঃকষ্ট পাইয়াছ, কিন্তু বৎসে! সেই সমস্ত কষ্ট সফল হয়, যদি এই তারাদেবীর মূর্ত্তি হিমালয়ের উচ্চ শিখরে যথাস্থানে স্থাপিত করিতে পারি; তাহা হইলেই সকল সার্থক হয়, নতুবা এতদিনের উদ্যোগ ও অধ্যবসায় বিফল হইবে।" এই কথা বলিয়া তিনি সতৃষ্ণ নয়নে মায়ের ভীষণ মুখমণ্ডলের দিকে চাহিলেন; তাঁহার গম্ভীর মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর হইল, নয়ন দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন "মা! জগদম্বে! যে খর্পরে অসুর শোণিত লোলজিহ্বা দিয়া পান করিতেছ, ঐ খর্পরে কি আমাদিগের শত্রুর শোণিত স্থান পাইবে না? ঐ বিকট লোল রসনা কি সেই রক্তে

পরিতৃপ্ত হইবে না? যাহারা সনাতন আর্য্যধর্ম্মের পরম শত্রু, জগতের শান্তি ভঙ্গকারী, তাহাদিগের কি ধ্বংস হইবে না?" বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।

অধিরাজের ঐরূপ ভাবান্তর পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই; সুতরাং সেদিন তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও চিন্তিত হইলাম; ভাবিলাম—সন্ন্যাসিসেনার কি কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা? নতুবা বাবা ও দিদী হঠাৎ স্থানান্তরে যাইবেন কেন? তাঁহারা যে তীর্থ পর্য্যটনে গেলেন, তাহার কোন বিশেষ কারণ আছে নাকি?" আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে অধিরাজ বলিলেন "মা গৌরি! বার বৎসরে কি শিখিলে আজি সঙ্ক্ষেপে তাহা বুঝিয়া লইব। বল দেখি, বৎসে! মানব জন্মের উদ্দেশ্য কি?"

"জগতে চরম সুখ বাড়াইবার নিমিত্ত।"

"চরম সুখ কি?"

সাম্যকালই চরম সুখ; অর্থাৎ সুখ ও দুঃখে সমান জ্ঞান। কিম্বা সুখ ও দুঃখের অভাবই চরম সুখ।"

"ইহা কি একেবারে হইতে পারে?"

"না, ক্রমে ক্রমে।"

"ব্যাখ্যা কর"

"যথাসাধ্য স্বধর্ম্মাচরণ"

"বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তন"

"যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতে সন্তোষ"

"আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের চরণার্চ্চন"

"নিরন্তর নির্ব্বিরোধ ও নিভৃত স্থানে বাস"

"পরিমিত অথচ বিশুদ্ধ খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ"

"অহিংসা ও সত্য কথন"

"বাহ্য ও অভ্যন্তরে শৌচ"

"ব্রহ্মচর্য্য।

"তপস্যা।"

ইহাতে অধিরাজ সন্তুষ্ট হইলেন এবং পূরক, রেচক ও কুম্ভক প্রাণায়ামাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সঙ্ক্ষেপে তৎসমুদয়ের উপযুক্ত উত্তর দিলাম। তাহাতে তিনি অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি" তোমার অচিরে সিদ্ধি হউক, কিন্তু বৎসে, এখনও তোমার কিছু বাকি রহিয়াছে; সেইটুকু হইলে তোমার ও আমাদিগের কার্য্যোদ্ধার হইবে। আগামী কল্য আর একটী ব্রাহ্মণ কন্যা এই আশ্রমে আসিবে; তাহাকে মায়ের দাসী করিয়া লইতে হইবে। ভুবন-মোহিনী তোমাকে দাসী করিয়াছে, এই নূতন কন্যার ভার তোমার হস্তে ন্যস্ত হইল। দেখিও খুব সাবধান, প্রাণান্তে আশ্রমের গুহ্য কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিও না; সে বড়ই তেজস্বিনী ও চতুরা। তাহাকে দমন করিতে পারিলে আশ্রমের বিশেষ লাভ হইবে। বৎসে! এইবার বিষম পরীক্ষা-স্থল। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যাহা শিখিলে, এক্ষণে তাহার পরিচয় দিতে হইবে। স্মরণ রাখিও, জীবন পর্য্যন্ত পণ, তথাপি কর্ত্তব্য পথ হইতে কিছুতেই অপসৃত হইও না। আজি যদি তোমাকে কেহ স্বর্গের সিংহাসন দেয়, ভ্রূক্ষেপ করিও না। মাতার আদেশ পালন করিবে, অনন্তের দিকে দৃষ্টি রাখিবে।

তুমি যদি মাতাকে ত্যাগ করিয়া সেই স্বর্ণ সিংহাসনে লোভ কর, তোমার ইহকাল, পরকাল সকলই নষ্ট হইবে, তোমার স্বর্ণ সিংহাসন দুই দিনে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে, শেষে তুমি এক-মৃণ্ময় সিংহাসনও পাইবে না। আজি যদি তোমার মৃত স্বামী পুনর্ব্বার বাঁচিয়া উঠিয়া বলেন, 'দ্বাদশ বৎসরের ব্রতফল জলে ফেলিয়া দাও, মাকে ত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ কর' তাহা হইলেও তুমি মাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না। সেই জন্য বলিতেছি, সাবধান। মুখ বুজিয়া কাজ করিবে। পদস্খলন হইলে চণ্ডালীরও অধম হইবে, আর কিছুতেই তোমার উদ্ধার হইবে না। একদিকে সমস্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উপকার, অন্যদিকে তোমার নিজের সামান্য স্বার্থ; সুবিশাল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত তুলনায় তোমার নিজের স্বার্থ কত ক্ষুদ্র! হিমালয়ে ও পরমাণুতে যে তুলনা, সাগরে ও জল-কণায় যে সম্বন্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত তোমার নিজের স্বার্থের সেই তুলনা। কিন্তু বৎসে! তুমি নিজে সামান্য নহ, তোমার স্বার্থ ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তোমার আত্মা ক্ষুদ্র নহেন, তিনি মহান, তিনি একাকী শত হিমালয় তুল্য। তুমি যদি সেই আত্মাতে জগতের বল একত্রিত দেখিয়া থাক, তোমারই আত্মা জগতের অন্তর ব্যাপিয়া রহিয়াছে—যদি তোমার এই জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। যাহা হউক, এইবার তাহার পরিচয়। আবার বলিতেছি বৎসে, সাবধান, নিজের অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকর, যৎসামান্য স্বার্থ ভুলিয়া যাও, ভুলিয়া বিশ্বপতির চরণে আত্মা সমর্পণ কর। এখন যাও, কল্য সন্ধ্যার প্রাক্কালে সংবাদ পাইবে।"

আমি প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। আসিবার সময় জগজ্জননীর চরণে বার বার প্রণাম করিরয়া বলিলাম "মা! এইবার রক্ষা কর। জননি! যে শক্তিতে মহাকালকে পদতলে রাখিয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার নিজে করিতেছ সেই শক্তির কণামাত্র আমাকে দাও, আমার হৃদয় বলবান হউক; তোমার কার্য্য উদ্ধার করি।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিষম সমস্যা।

সেই রাতে কুটীরে আসিয়া শয়ন করিলাম, অন্য দিন যেরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করি এবং শয়ন করিবামাত্র ঘুমাইয়া পড়ি, সে দিন সেরূপ হইল না। দিদী কাছে নাই, একাকীই শয়ন করিলাম, আশ্রমে কোন ভয় নাই। পরম হিংস্র প্রকৃতি বিষধর ভুজঙ্গও হিংসা করে না। সন্ন্যাসীর যোগ বলেই হউক অথবা আশ্রমের গুণেই হউক, আমি স্বচক্ষে অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একাকী শয়ন করিলাম, ভয়ের লেশমাত্র নাই, কিন্তু চিন্তা বড়ই বলবতী হইল। ভাবিতে লাগিলাম, "অধিরাজ এত কথা বলিলেন কেন, বারবার এত

সাবধান করিয়া দিলেন কেন? তবে কি আমি পারিব না; বার বৎসরের ব্রতফল কি নষ্ট হইবে? কখনই নয়,—মা! জগদম্বে! হৃদয়ে বল দাও। আমি তোমার অকৃতজ্ঞ সন্তান নহি।" কত কাঁদিলাম কত প্রার্থনা করিলাম। শেষে আপন মনে আশ্বস্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। হায়! সেই নিদ্রাতেই যদি আমার অনন্ত নিদ্রা হইত, তাহা হইলে এ কলঙ্কিত মুখ আর জগৎকে দেখাইতে হইত না। তাহা হইলে বার বৎসরের ব্রত ফল নষ্ট হইতে না হইতে পরলোকে চলিয়া যাইতাম; আবার জন্ম গ্রহণ করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে সিদ্ধ হইতে পারিতাম। কিন্তু পাপিষ্ঠা আমি; আমার সে সৌভাগ্য কোথায়?

পরদিন নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যেই কাটিয়া গেল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, দিদী আশ্রমে না থাকাতে আমার কাজ একটু বাড়িয়াছিল; কিন্তু অভ্যাস বশতঃ তাহা সুচারু রূপে সম্পন্ন করিলাম। সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা আসিল। আমি আহ্নিকে বসিলাম। আহ্নিক শেষ করিয়া মালা জপ করিতেছি, এমন সময়ে সংবাদ আসিল "প্রাসাদে যাইতে হইবে, যাহার আসিবার কথা ছিল, আসিয়াছে। এখনই যাইতে হইবে।" মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া অমনই চলিলাম। তুমি বোধ হয় জান যে, যে গৃহে আমি প্রথমে আসিয়াছিলাম এবং বহুদিন দিদির সঙ্গে একত্রে ছিলাম; তাহার নাম প্রাসাদ। নূতন লোকদিগকে সেইখানে প্রথমে আসিতে হয়। প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম-বিপরীত ব্যাপার! এক উন্মাদিনী বিকট স্বরে চীৎকার করিতেছে এবং সম্মুখে যাহাকে দেখিতেছে "চোর" বলিয়া গালি দিতেছে। আমি ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্র আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিল এবং আমার পায়ে পড়িয়া বারবার প্রণাম করিতে লাগিল। তখনই পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে অপর সকলেই গৃহ হইতে চলিয়া গেল, কেবল সেই উন্মাদিনী ও আমি রহিলাম। যত্ন করিয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিলাম এবং মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলাম। পাগলের মন; তখন সে চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু অবিরত কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল "বল, ক্ষমা করিবে, বল আমাকে ফাঁসি দিবে না?"

আমি বলিলাম "না, তোমার কিছুই ভয় নাই। তুমি কাঁদিও না।"

উন্মাদিনী আরও কাঁদিতে লাগিল, কাঁদিতে কাঁদিতে এক একবার তাহার শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। আমি তাহাকে অনেক বুঝাইলাম; কিন্তু সে তখন কোন কথাই শুনিল না; কেবল কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিল "আমাকে তুমি বাঁচাইবে বল। আমি তোমার স্বামীকে দিব" বলিয়া বিকট হাস্য করিল এবং তাহার পরক্ষণেই আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম "আমার স্বামীকে আবার আনিয়া দিবে কি? তিনি যে সর্ব্বব্যাপী, তিনি ত এখানে রহিয়াছেন।" যেমন এই কথা বলিয়াছি অমনি "দাদা! দাদা! আমি তোমার গিরি।" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল

এবং গৃহে ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতে লাগিল। ‘গিরি” নাম শুনিয়া আমি চমকিত হইলাম। আমারননদীর নাম— গিরিবালা। যে দিন আমি বিধবা হই, সেই দিন সে শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছিল। তাহার মুখ পানে চাহিয়া দেখিলাম। একবারে বিশ্বাস হইল না, বার বার দেখিলাম,—দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম, সে যে বাস্তবিকই আমার ননদিনী গিরিবালা! একি, এ দুর্দ্দশা কেন? আমার বুদ্ধি শুদ্ধি মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইল; কিন্তু পরক্ষণেই মা জগদম্বা যেন আমার হৃদয়ে বল দিলেন, আমি উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আবার উত্তেজিত হইলাম এবং কর্ত্তব্যপথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইব মনে করিলাম। তাহাকে হাসিতে হাসিতে বলিলাম “তোমার কিছু ভয় নাই; আমি তোমাকে ক্ষমা করিব। তুমি চুপ কর এবং কিছু আহার করিয়া শান্ত হও।”

সে তখন মৃদু হাস্য করিল এবং ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বালকের মত বলিল “হাঁ হাঁ, আমিও তোমার স্বামী আনিয়া দিব। তুমি কিছু খাও।”

আমি বলিলাম “তুমি না খাইলে আমি খাইব না। তুমি সমস্ত দিন কিছুই খাও নাই। কত কষ্ট হইয়াছে। এ তোমারই বাড়ী, তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে, যাহাকে যাহা আদেশ করিবে, সে তখনই তাহা পালন করিবে। তোমার কিছুরই অভাব থাকিবে না।”

উন্মাদিনী অতীব সন্তুষ্ট হইল এবং হাসিয়া বলিল “হাঁ! তবে আমি দাদাকে চাহিলে পাইব? তুমি আনিয়া দিবে?”

“নিশ্চয়ই; তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি খাও” বলিয়া এক বাটী সরবত দিলাম। কবিরাজের আদেশক্রমে সেই সরবতে পূর্ব্ব হইতেই উন্মাদরোগের ঔষধ মিশ্রিত ছিল। উন্মাদিনী তাহা পাইল এবং অল্পক্ষণ পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। উন্মাদিনী ঘুমাইল, কিন্তু সে রাত্রে আমার ঘুম হইল না। ব্রতের জন্য ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা সমস্তই জয় করিতে হইয়াছিল। যখন ইচ্ছা খাইতাম, যখন ইচ্ছা ঘুমাইয়া পড়িতাম। কিন্তু এইদিন আমার সেই ক্ষমতা যেন লোপ পাইল। গিরিবালাকে পাগল অবস্থায় দেখিয়া এবং তাহার মুখে ঐ সকল ভয়ঙ্কর কথনর শুনিয়া আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। সে ঘুমাইলে; সে বাস্তবিক গিরিবালা কিনা, আলো লইয়া ভাল করিয়া দেখিলাম। একবার সে নিজের স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সকলে জানিতে পারিয়া দড়ি কাটিয়া তাহাকে বাচাইয়াছিল, সেই জন্য তাহার গলায় দড়ির দাগ ছিল। সেই দাগটা আছে কিনা দেখিলাম। দেখিলাম তাহা স্পষ্ট রহিয়াছে। তথাপি সন্দেহ ঘুচিল না; ভাবিলাম অন্য কারণেও এরূপ দাগ হইতে পারে। তখন মনে পড়িল যে, তাহার ডান হাতের বুড় আঙ্গুলে একটা বড় আঁচিল আছে। সুতরাং সেইটার সন্ধান করিয়া দেখিলাম, ঠিক সেই আঁচিলটা রহিয়াছে। তখন আর কোন সন্দেহ রহিল না। তখন আমি স্পষ্টই বুঝিলাম যে, সে গিরিবালা। কিন্তু তাহার সে দশা কেন হইল, কেনই বা সে সেই সব ভয়ানক

কথা বলিল, আমি তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে একটু তন্দ্রা আসিল; তন্দ্রার আবেশে একটা বিকট স্বপ্ন দেখিলাম। ভাই কেশব! তাহা স্বপ্ন কি বাস্তব দৃশ্য, আজিও আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু সেই দৃশ্য মনে হইলে আমার মাথা ঘুরিয়া যায়, প্রাণভয়ে নরকের অন্তস্থলে লুকাইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু নরকেও কি অভাগিনীর স্থান হইবে? অনায়াসে যে দ্বাদশ বৎসরের ব্রতফল বিসর্জ্জন দিল, সোনার অনন্ত মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া বরদানকালে স্বহস্তে সেই মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তাহার আবার নরকে স্থান হইবে? স্বপ্নে দেখিলাম যেন আমি স্বামীর জন্য পাগল হইয়া দেশে দেশে ফিরিতেছি; একটা লোক আসিয়া বলিল "আমি তোর স্বামী"। আমি অমনি তাহার পায়ে জড়াইয়া ধরিলাম, কিন্তু সে অজগর হইয়া আমাকে গ্রাস করিল। পা হইতে গলা পর্য্যন্ত গিলিয়াছে, এমন সময়ে বিকট হুঙ্কার শুনিতে পাইলাম, দেখিলাম—সেই ভীমা তারা মূর্ত্তি ভীষণ খড়্গ দ্বারা আমার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। ভয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে মনে বড়ই অপ্রস্তুত হইলাম। হায়! আমার এত শিক্ষা, এত সাধনা, একটা পাগলের কথায় কি সব নষ্ট হইবে? দিদী যে বারম্বার বলিয়াছিলেন, পিতা যে সর্ব্বদাই শিক্ষা দিতেন, অধিরাজ যে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, এ জগতে কোন রমণীই বিধবা নহে। খুঁজিয়া লইয়া বুঝিয়া চলিতে পারিলে সকলেই আজন্ম সধবা। বিশ্বপতি বাসুদেবকে পতি ভাবিয়া পূজা করিলে আর বৈধব্য থাকে না, আর জনম মরণ ক্লেশ সহিতে হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য মিলনে তাহাদিগের জীবনে অনন্ত রাসলীলা হইতে থাকে। তাহাদিগকে কখনই বিরহ যাতনা সহ্য করিতে হয় না। এই স্বর্গীয় সুধামাখা সদুপদেশ যে কতবার শুনিয়াছি, কতবার যে ইহার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছি; তবে সেদিন আমার সে সর্ব্বনাশিনী দুর্ম্মতি ঘটিল কেন? হায়! বাস্তব পদার্থ ছাড়িয়া মরীচিকার প্রতি মন ধাবিত হইল কেন? হা অভাগিনি! তোর মরণ ভাল। আমি সেই জন্যই মরিতে আসিয়াছিলাম। মরিলে সকল যাতনা দূর হইত কিন্তু তুমি মরিতে দিলে না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অধঃপতন।

গিরিবালা আমার সৌভাগ্য সূর্য্যের জ্বলন্ত রাহু, আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ। হায়! সে রাহু আমাকে সম্পূর্ণরূপে চিরকালের জন্য গ্রাস করিল না কেন, কেন সে বিদ্যুতে আমি পুড়িয়া ছাই হইলাম না। তাহা হইলে লোক সমাজে আর এ মুখ দেখাইতে হইত না। তাহা হইলে জগতে এ পাপের কাহিনী আর কেহ প্রচার করিত না। আমার বার বৎসরের ব্রত ফল নষ্ট হইল! আমি যে জগৎপতি অনন্তদেবের ব্রতে দীক্ষিত হইয়া বার বৎসর অবিরোধে পার করিয়া আসিলাম, আজি একটা পাগলিনীর কথায় তাহার ফল নষ্ট হইল, বার বৎসরে যে হৃদয়কে পাষাণের মত দৃঢ় করিয়াছিলাম, চিরশত্রু ননদিনীর কথায় আজি তাহা চূর্ণ হইয়া গেল। হায়, নারীর মন! বিধাতা তোকে কি উপাদানে গড়িল! পুষ্প—পাষাণ—বজ্র; কিছুরই সহিত তোর তুলনা দেখিতে পাই না। কুসুম আপনি ফুটে আপনি হাসে, হাসিয়া হাসিয়া জগৎকে সৌরভ বিতরণ করে, শেষে সৌন্দর্য্য ফুরাইলে আশা, পিপাসা সমস্তই জলাঞ্জলি দিয়া আপনি খসিয়া পড়ে। তাহার কোরকে যে কোমলতা, ফুটন্ত অবস্থায় সেই কোমলতা, আবার যখন নতমুখে খসিয়া পড়ে, তখনও সেই কোমলতা। কৈ, তাহাকে ত কখন কঠিন হইতে দেখিলাম না। তবে নারীর মন কখন সুকুমার, কখন পাষাণ হয় কেন? কেন ফুটন্ত গোলাপের নীচে কাল সর্প থাকে; কেন কমলে কণ্টক থাকে? পাষাণেরও সহিত তোর তুলনা হয় না; পাষাণ অনন্ত কালের জন্য কঠোর; কিন্তু তাহাতেও তাহার সৌন্দর্য্য আছে, তন্মধ্যেও তাহার হৃদয় আছে,—তাহার হৃদয়ে যাহা একবার অঙ্কিত হয়, তাহা আর মুছিয়া যায় না। পাষাণ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইবে, তথাপি সেই দাগ মিলাইবে না। কিন্তু মন, তুই যদি পাষাণ হ'তিস্ তাহা হইলে যাহাকে একবার হৃদয়েশ্বর বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিস্ তাকে কেমন করিয়া ভুলিতে পারিস্। যাহার প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে একবার অঙ্কিত হয়, আবার তাহা কিরূপে মুছিয়া যায়? তবে কি তুই বজ্র?—না, না, বজ্র হইলে তোর তেজে সব পুড়িত, কমল পুড়িত, কণ্টক পুড়িত, পুণ্য পুড়িত, পাপ পুড়িত, পাহাড়ের চূড়াও পুড়িয়া গুঁড়া হইয়া যাইত!

হায়! হায়! আমি কেন গিরিবালাকে দেখিলাম? দেখিলাম ত তাহাকে চিনিতে পারিলাম কেন? আমিত তখন স্বামিগৃহে বাস করি নাই, তবে তাহাকে ননদিনী বলিয়া কেন গ্রহণ করিলাম? আমি ত তখন সম্পূর্ণ নূতন জগতে, নূতন নূতন লোকের সঙ্গে বেড়াইতেছিলাম, তবে পূর্ব্ব স্মৃতি কেন জাগিয়া উঠিল? যদি চিনিলাম ত তাহার কথা কেন কাণে স্থান দিলাম? সে ত আমার চির শত্রু। হায়! হায়! কে আমার এ সর্ব্বনাশ করিল! নগরে উঠিতে না

উঠিতে কে নগরে আগুন দিল? সুখের সরোবরে ডুবিতে না ডুবিতে কে কুম্ভীর হইয়া আমাকে গ্রাস করিল? কেশব! কাহারও দোষ নাই, আমি নিজেই দোষী। আমার মন যে আমার নিজের নয়! তবে কাহার দোষ দিব? সে সত্য বলিল কি মিথ্যা বলিল, তাহা আমি বিচার করিয়া দেখিলাম না। তাহার কথাই আমি ব্রহ্মজ্ঞান করিলাম। আমার দীক্ষা—শিক্ষা—সাধনা—তপস্যা সমস্তই বৃথা হইল!

কিন্তু কেন মিছা বকিতেছি। নিজের অযোগ্যতার পরিচয় নিজে আর কি বলিয়া জগতে প্রকাশ করিব?—প্রকাশেই বা ফল কি? পরিতাপে প্রায়শ্চিত্ত হয়—আমার কি ইহাতে প্রায়শ্চিত্ত হইবে? বল কেশব! তুমি ত শাস্ত্র পড়িয়াছ,—বল আমি কি এত পাপিনী যে, কিছুতেই আমার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না? আমি ত ব্যভিচারিণী নই? শৈশবে যাঁহাকে পতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম, পিতা মাতা আমার আশ্রয়তরু ভাবিয়া যাঁহার হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমি ত তাঁহাকে অবহেলা করি নাই? তবে আমার পাপ কিসে? তবে আমার অধঃপতন কিসের জন্য? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমি কি পাগল হইলাম? আমি স্বচক্ষে তাঁহাকে ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়াছি, স্বহস্তে সেই স্বর্গীয় মূলে এই শ্মশান সৈকতে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছি, স্বচক্ষে সেই দেবদেহ পুড়িয়া ছাই হইতে দেখিয়াছি, তবে আমার এ চিত্তচাঞ্চল্য কেন? যিনি এখন স্বর্গে বাস করিতেছেন, যিনি নিজে স্বর্গপতি, তাঁহাকে এ পৃথিবীতে পার্থিব দেহে পাইবার জন্য কেন ব্যাকুল হইলাম? মমতার ডোর ছিঁড়িতে পারিলাম না। হায়, তিনি নিজেই যে কতবার আমাকে বলিয়াছেন "পতিকে স্বর্গগত ভাবিয়া কায়মনোবাক্যে" তাঁহারই সেবা করা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য; সে অমূল্য উপদেশ আমি ভুলিয়া গেলাম! ভুলিলাম ত সকলই ভুলিতে পারিলাম না কেন? হায়! যাঁহার প্রতি লোমকূপে কোটি কোটি স্বর্গ বিরাজ করিতেছে, যাঁহাকে একবার পাইলে আর কখনও বিচ্ছেদ হয় না, যিনি সাক্ষাৎ মোক্ষ, আমি যে তাঁহাকেই পাইব বলিয়া তাঁহারই ব্রত পালন করিতেছিলাম; তবে আমার এ দুর্দ্দশা কেন হইল?

হা কেশব! ভ্রাতঃ! নিজের মুখে নিজ দুর্ভাগ্যের কথা আদ্যোপান্ত সমস্তই প্রকাশ করিলাম; কিন্তু সেই অধঃপতনের কাহিনী বলিতে বুক ফাটিয়া যাইতেছে। সে কথা আমি কিছুতেই বলিতে পারিব না। কেবল এইমাত্র বলিতেছি যে, সর্ব্বজ্ঞ অধিরাজ সকলই জানিতে পারিলেন; তাহার দুঃখের সীমা রহিল না। "এরূপ দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া তুই মায়ের কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিবি না" বলিয়া ত্রিশূল কাড়িয়া লইলেন; আমার চোখে কাপড় বাঁধিয়া সেই আশ্রম হইতে দূর করিয়া দিলেন। আমি মূর্চ্ছিত অবস্থায় মযদানে অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিলাম; যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, চোখ চাহিয়া দেখিলাম, তখন রাত্রি। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, সকলই দেখিতে পাইলাম; কিন্তু সেই স্বর্গীয় সন্ন্যাসীর

আশ্রম দেখিতে পাইলাম না। নিবিড় বন আমার দৃষ্টি রোধ করিল। সেই দিন হইতে কতস্থান ঘুরিলাম, কত তীর্থ দেখিলাম; কত সন্ন্যাসীর পদধূলি লইলাম, কিন্তু আমার কিছুই হইল না। বাবাকে খুঁজিলাম, দিদিকে খুঁজিলাম, কিন্তু তাঁহাদের দুজনকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

সেই দিন—সেই দুর্দ্দিন হইতে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়াছে। আজি অনন্ত চতুর্দ্দশী; আজি আমার ব্রত উদ্‌যাপন হইবার কথা; কিন্তু আমি কোথা, ব্রত কোথা। কোথা সন্ন্যাসিগণ, কোথা মায়ের কাশী, কোথায় সে নমুণ্ডমালিনী তারা দেবী। সকলই স্বপ্ন, সমস্তই মায়া,—সমস্তই প্রহেলিকা!

কুটীরের মীমাংসা।

উপক্রমণিকা।

১। মানুষ যতদিন, বাদ বিসম্বাদও ততদিন—ধ্রুব সত্যও চিরদিনই জ্ঞাপক। যখন বিশ্ব ছিল না, তখন বিশ্বস্রষ্টা সত্তা ছিল, কারণ অতদ্‌গুণে তদ্‌গুণ থাকিতে পারে না। কালহীন, ব্যাপ্তিহীন শূন্য অন্ধকার, মনুষ্য কল্পনার অতীত। বায়ু—গতির অবশ্যম্ভাবী সহচর। জল—বায়ুর ঘনীভূত প্রসব। আবার গতি একরূপ উত্তাপ। তবে এ বিশ্বের উত্তাপশীল প্রাণ কোথা হইতে আসিল?

বৈজ্ঞানিক সঙ্কটে পড়িয়াছেন। একটা সামান্য সৌরজগতের কেন্দ্রীভূত সবিতার উত্তাপের উৎস নির্ণীত নাই, সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিতমৃত্তিকাখণ্ডের ইহা অস্থালনীয় অপমান।

আকাশে সূর্য্যগ্রহণ—দূরবীক্ষণ উঠিল। ধর্ম্মের ধর্ম্মত্ব রক্ষক, পরগ্লানির একমাত্র সংবাদবাহক, অপবাদের স্বায়ম্ভবমনুরূপ, স্তন্যপায়ী মনুষ্য দ্বিপদের মত, ক্ষুদ্র কাচখণ্ড আপনার ক্ষুদ্র হৃদয় তৃপ্ত করিয়া, ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রসব হৃদয়ের কলঙ্কের কথা আকাশ হইতে মাটীতে নামাইয়া ফেলিয়াছে। রসায়ন,—পদার্থবিদ্যা, প্রভৃতি বৃদ্ধ গঠিনীর মত, তাহা কুটিয়া পাড়িয়া, তাহা সিদ্ধ সঙ্কলন করিয়া, তাহার খুদ কুঁড়া বাদ দিয়া, বেচারার কলঙ্কের গালে আপনার স্পিরিট ল্যাম্প ভাসিত কাচের আলমারির ভিতর তুলিয়া রাখিল। বোতলের গায়ে টিকিট দেওয়া হইল—"সূর্য্য স্বয়ং দীপ্তিশীল নহেন। কেবল একটা প্রোজ্জ্বল আবরণীভূত বায়ুমণ্ডল(?) আমাদের বেদাচ্চিত সবিতার আলোকের কারণ।

সেই ভাস্বর বায়ুমণ্ডলে সর্ব্বদাই উৎপাৎ ঝটিকা বহিতেছে। তাই মাঝে মাঝে, মোসাহেবের অন্তর্দ্ধানে বাবুর প্রকৃত স্বভাব মত, বায়ুমণ্ডলের অবকাশে, আমরা রবির ভাস্বর কাঁমিজের প্লেটের ভিতর দিয়া, তাহার কৃষ্ণ শরীর দেখিতে পাই।

আবার যুক্তি—তর্ক উঠিল। রবি, একরূপ দহ্যমান উল্কাপিণ্ড পরিপূর্ণ। তেজ তাহার অন্তঃস্থিত দাহ্যপদার্থের।

এ দাহ্যপদার্থ কি? আমাদের এ জগতে এরূপ পদার্থ কোথাও নাই। এ জগতের গ্রহে গ্রহে অনেকটা পারিবারিক সাদৃশ্য আছে—রবি একেবারে বিভিন্ন জীব।

তবে কে কোন্ অন্য বিশ্বের দাহ্যমান পরিবার হইতে ইহাকে অন্ধশূন্যে বিবর্জ্জিত করিল? ইহাকে জ্বালাইল কে?—ইহাতে জ্বলে কি?—একি অন্য বিশ্বের সামাজিক গৃহাসক্ত জীব এ দেশে জুড়াইতে আসিয়াছে?—শীতল অন্ধকারে বুকের উত্তাপ দিনরাত ঢুবাইয়া ঢুবাইয়া। একি অন্য পবিত্রতর বিশ্বের ভাসকোডিগ্যামা, এ শূন্যে আলোকের উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে আসিয়াছিল।—একি অনাদি অন্ধকারের কাছে আলোকের প্রাণোৎসর্গ? একি আকাশের ধ্রুব প্রহ্লাদ, না বুদ্ধ ইষা, পরতমের আলোক বুকে লইয়া, কোন ভবিষ্য সম্ভব কল্যাণে পুড়িতে আসিয়াছে।

বিজ্ঞান,—বিশ্বকর্ম্মার গূঢ় কর্ম্মশালার সম্যক রহস্যবিৎ। বিজ্ঞান বেত্রহস্ত, অবিশ্বাসশূন্য, তত্ত্বদর্শী। বিজ্ঞানের অভ্রান্ত সত্য আর একবার শুন। আলোক জ্যোতিষ্মৎ ইথারের অবিরাম আন্দোলনের গুণ। প্রতিপক্ষ বলিল, আলোক একরূপ জড়, কোন রহস্যসূত্রে এ সৌরজগতে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। কনাদ বলিলেন দীপ্যমান পরমাণুপুঞ্জ কোন অদৃষ্ট কারণের বশবর্ত্তী হইয়া, এ সৌর বিশ্বের নির্ম্মাতা। প্রথমে এই অনন্ত আকাশব্যাপী পরমাণুপুঞ্জ একটা বিরাট জ্বলন্ত গোলকে পরিণত হইল। ইহা উপসর্পিনী শক্তির গুণ। "মূর্খে ইহাকেই হিরণ্যগর্ভপ্রসূত ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া থাকে।" তাহার পর আদি গোলকের কেন্দ্র ও মধ্যস্থিত পরমাণুবর্গের অবিষম উত্তাপ সমতায় ও অপসর্পিনী শক্তির গুণে, সেই প্রথম গোলক হইতে অনেক আপেক্ষিক ক্ষুদ্র গোলকে উদ্ভব হইল। তাহার পর, মাধ্যাকর্ষণ ও অপসর্পিনী শক্তির গুণে, তাহারা নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরিতে লাগিল। উৎসৃষ্ট দূরোৎক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র গোলকেরাই সৌরবিশ্বের গ্রহ উপগ্রহ। কেন্দ্রস্থিত নিশ্চল পরমাণুপুঞ্জই সবিতা।

আমরা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি, গুণ, গুণের আশ্রয় হইতে পারে না, আলোক গুণ! তেজ ও তাপ সমবায় সম্বন্ধ বিশিষ্ট। এক অন্যের প্রসব নহে। আলোক জড়ের অবস্থা বিশেষের অনুসঙ্গী হইতে পারে, আলোক জড়ের নিত্য গুণ নহে। জড়াশ্রিত আলোকের ক্ষয় বৃদ্ধি আছে। আলোক, গতির গৌণ প্রসব বলিলে জ্যোতির্ব্বিদের, অন্ধতারকা, বা অন্ধসূর্য্যের (Dark Stars) অস্তিত্বে বিশ্বাস হয় না। তাপ বা তেজ এক পদার্থ নহে। এ দীপ্ত পরমাণু সংশ্লিষ্ট গ্রহ উপগ্রহ কালে জ্যোতিহীন হইয়া পড়িবে কেন। আলোক তাহা হইলে গতির প্রসব নহে।

যে কারণেই হউক, কাল, ব্যাপ্তি, তেজ, গতি, প্রভৃতি অসংখ্য পূর্ব্বসম্পাদ্য না লইয়া বিজ্ঞান চলিতে পারে না। পরমাণু পুঞ্জের গতি ছিল, জ্যোতিছিল, অথচ তাহার কারণ বা উৎস নির্ণীত নাই। সকল জড়াত্মক দর্শনের প্রথম

আশ্রয় জ্যোতিস্মৎ পরমাণু। গতিই সুদূর ভবিষ্যে জীবচৈতন্য। তবে জড়ের নিশ্চেষ্টত্ব (Inertia) পাইবার পূর্ব্বে, কে এই বিশ্বের আদি পুরুষ বর্গের নাসা-রন্ধ্রের ভিতর দিয়া, আপনার পারকী, প্রতিভার ফুৎকারে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল! কে এমন আনন্দ উচ্ছ্বাস, এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হৃদয়ের, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, নিগূঢ় আশীর্ব্বাদ সন্তাব মস্তকে তুলিয়া বলিয়া দিয়াছিল:—যাও আণবিক সংশ্রেয়। এই অনন্ত শূন্যে রবি শশী গ্রহ উপগ্রহ হইয়া, আলোক আনন্দের পরিবার বাঁধিয়া আইস! কে বলিয়া দিয়াছিল, (আজ তোমরা আনন্দ প্রসব হইলেও ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকের চক্ষে জ্বলন্ত নীহারিকা পুঞ্জ)—যাও, এই অজর প্রথর যৌবন বুকের ভিতর করিয়া, আপন আপন আলোকী কর্ত্তব্যে বিশ্বের অদৃষ্টতন্তু বুনিয়া আইস! দেখাইও কোমলতাই শক্তিশালিনী; সৌন্দর্য্যের তলে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রসুপ্ত থাকে। তোমাদের অবিসম্বাদী, আণবিক ভ্রাতৃতন্ত্রের পার্শ্বে, শূন্যের অন্ধ গহ্বরের ভিতর, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের পরমাণু কুণ্ডলে গুটাইয়া, সংজননের চিরস্তনধাত্রী অজর অমর চিরকাল, তোমাদের জ্যোতিস্মৎ প্রসবের সহায়তা করিবে। যাও আনন্দ উদ্ভবের দল!—**সৃষ্টি, তোমাদের ভাব জরায়ুর ভিতর নাড়ীচ্ছেদ, স্থিতি, তোমাদের গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যা, প্রলয় তোমাদের অনন্ত আকাশের মাঝে স্বাধীন পরিবার সংস্থিতি।** তোমরা সম্পূর্ণ হও, পূর্ণ হও, পূর্ণ চৈতন্য হও। তোমাদের আত্মধর্ম্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হউক।

স্থির হও বাপু!—"প্রকৃতি সত্ত্ব রজ তমের অকার্য্যকারী অবস্থা। মূলে মূল নাই, সুতরাং মূল অমূল। এই মূল প্রকৃতিই বিশ্বের উপাদান কারণ। মূল প্রকৃতির পূর্ব্বে ঈশ্বর নাই। একথা স্বীকার করিলে, তিনি কর্ম্ম ফলভোগ করেন বলিয়া, সাধারণ রাজার ন্যায় তাঁহার অধিষ্ঠান স্বার্থপর। বস্তুত পুরুষ, প্রকৃতিতে অধিষ্টিত। এই প্রধান পুরুষ, সমস্ত জীবের আদিবীজ। এইরূপ জন্যেশ্বর অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। প্রধান পুরুষ অপরের জন্য জগৎ সৃষ্টি করেন। উষ্ট্রের কুঙ্কুম বহনবৎ তিনি স্বয়ং ফলভোগী নহেন। প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন সকলই মিথ্যা।"

"অকার্য্যকরী অবস্থা"?—জগতে সকল নংতৎপুরুষই তৎপুরুষ-সাধক। তবে সত্ত্ব রজ তমের কার্য্যকরী অবস্থা সূচিত হইতেছে। কার্য্য, কর্ত্তৃ সম্পাদ্য। মহর্ষি এক কর্ত্তৃসত্ত্বার বিলোপ প্রয়াসে তাহারই পূর্ব্ব নির্দ্দেশ করিয়া ফেলিলেন নাকি! "ভাব" "অভাবের" এমন সূক্ষ্মতম ভেদ কল্পনায়, ভাষা সত্যে ভেদ সন্ধান বা গৃহ বিচ্ছেদ হইল না। সকল অভাব অবস্থা ভাব সত্ত্বার সংস্থাপক।

"নাসতো বিদ্যতে ভাব, নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"।

"অব্যক্ত" হইতে "ব্যক্ত" হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। বিশ্বে সকল বিকাশের প্রাগ্‌ভাবই অব্যক্ত। বেদান্তী বলেন ব্রহ্ম (পুরুষ) মুগ্ধ—আপনার প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া সৃজন করিয়াছেন।

সাংখ্য বলেন প্রকৃতিই মূল। পুরুষ তাহাতে অধিষ্ঠিত।

কেবল আগ্রহ আশঙ্কা লইয়া আন্দোলন। কেবল কথার শিকলে কথা টানিয়া ধ্রুব সত্যের গায়ে নিগড় বন্ধন। কেবল লেখা পড়া দিয়া এ বিরাট জ্যোতি ঢাকিবার প্রয়াস। যেখানে সাংখ্যে, সত্ব রজ তমের অকার্য্যকরী অবস্থার ভিতর দিয়া, মূল প্রকৃতির ক্রোড়ে জগদীশ্বর জন্মাইতেছেন, সেইখানে বেদান্তের অব্যক্ত পুরুষ, অনন্ত নিবিড় মায়ার আশ্রয়ে এ বিশ্ব লীলায় বিকশিত।

এ বড় ভয়ঙ্কর স্থল!—বিশ্বের এ অন্ধকারময় প্রাগ্‌ভাব। এই শূন্য অন্ধকারে ডুবিয়া বেদ দর্শনের পরম কাল্পনিক জ্যোতি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অন্ধকারের ভিতর চার্ব্বাকের ঔদরিকতার অজীর্ণ উদ্গার আত্মার তৃপ্তিরূপে গৃহীত হইয়াছিল। সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাছে এই প্রথম অকাশ হইতেই ঈশ্বর নির্ব্বাসিত তান্ত্রিক এই মহাঘোরা মুক্তকেশী অন্ধকারের ভিতর একরূপ মহাকর্ষণ পরিস্ফুট দেখিয়াছিলেন। কেবল যাহারা চৈতন্যের রাজ্যে অধিকতর পরিস্ফুট, তাঁহারাই কেবল এই অনাদি নিশার সমাধি মন্দিরের বক্ষের ভিতর দিয়া, মূলপ্রকৃতির এই অসংখ্য প্রবোহবদ্ধ মূলের, জটিল গ্রন্থিসংক্রমনপরম্পরার ভিতর জগতের জ্যোতিশীল প্রাণউৎস দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই কুরুক্ষেত্রে, মরণের দানবী নৃত্যের পূর্ব্বে, অর্জ্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণ গভীর পাঞ্চজন্য নিনাদে বুঝাইয়াছিলেন—বেদান্তের ব্রহ্ম, সাংখ্যের প্রধান, বৈশেষিকের অদৃষ্ট, ন্যায়ের কারণ, যোগের ঈশ্বর সকলই একসত্বা।

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা লোকানামীশ্বরোপি সন্।
প্রকৃতিম্ স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"

তখন বড় উপযোগী অবসরে, (কারণ মরণের মুখ দিয়া, মরণের অনেকটা রহস্য ইতিহাস বাহির হইয়া পড়ে); অর্জ্জুন সেই কুরুক্ষেত্ররূপ মহাবৈতরণীর বেলায়,—অসংখ্য সূর্য্যময়ী জ্যোতির ভিতর, কত দেব, কত দানব, কত ভীষ্ম, কত দুর্য্যোধন, বুদ্‌বুদের মত উঠিতেছে ডুবিতেছে, দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড, ধূমকেতুর মত অনন্ত পর্য্যটন করিয়া এই সর্ব্বসবিতার ভিতর আসিয়া পড়িতেছে, আবার বিভিন্ন আধায় অনন্তে বাহির হইয়া যাইতেছে।—মৃত্যু সত্বার জন্য

কারণের বিকার স্থৈর্য্য!

মৃত্যু, সত্বার জন্য কারণের, উপাদান।

কারণের দিকে পশ্চান্নিবৃত্তি।

বিএ পাশ!—বিকোর্সের চূড়ান্ত, বিলাতী বৈশেষিকের অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বালখিল্যবর্গ—বাঙ্গালীর শীর্ষস্থানীয়েরা! হাসিতেছেন!—Maxwell, Ganot, Deschanel এর ১৩০০ পাতার ভিতর এ প্রহেলিকা কোথাও নাই। দিকশূন্য অন্ধব্যাপ্তির মাঝখানে, উপসর্পন অপসর্পন প্রভৃতির শিকলিবদ্ধ দাড়িপাল্লা টাঙ্গান আছে। শিষ্ট, শান্ত জ্যোতিষ্মৎ পরমাণু, অবিসম্বাদী সুবোধ বালকের মত আপনা আপনি তাহাতে বসিয়া, সত্ব রজ তমগুণে, উপযুক্ত সংখ্যায়

মিলিয়া জুলিয়া, উপযুক্ত অবসরে এ বিশ্বের স্রষ্টা। আমরা এই দেববর্জ্জিত, তুলাদণ্ডসেবী, পোদ্দারের দোকানে বিশেষ কিছু সত্য পাই নাই।

তোমরা বৃহৎ, আমি ক্ষুদ্র। তবু বলি তোমরা হয়ত এ বিশ্ব সংগঠনের, এ মায়া বিস্তারের ইতিহাস কতক বলিতে পার,—তোমরা এ বিশ্বশিল্পীর ভাবসত্ত্বা কিছুই জান না। তোমরা যাহাকে জড় বল, সেই জড় সত্বারও অনেক জানিতে তোমাদের বাকী আছে। জড় জড় করিয়া আজন্ম চীৎকার করিতেছ,—তবু তাহার প্রচ্ছন্ন ধমনীর রহস্য দুপ্‌দুপের কথা, তাহার শিরায় শিরায় যে কত সৌন্দর্য্যের প্রবাহ বহিতেছে, তাহার পাষাণ বুকের আড়ালে কত ভীরু ভালবাসা, কত স্নেহ আশীর্ব্বাদ, কত নীরব সন্তায়ন যে দিন রাত কাঁদিয়া ফিরিয়া যায়, তাহা জানিতে পারিয়াছ কি? তোমরা বল কৃত্তিকা কোন পৌর্ব্বকালীন গ্রহের ধ্বংসাবশেষ। তোমার টমসন্ ম্যাক্স ওয়েল ছাড়িয়া দাও,—তোমার নিউটন্ ল্যাপল্যাস্ যেখানে আকাশের অন্ধ, উদাসীন, কেশসম্ভারের উপর, দেবতার প্রীতিবর্ষসম, দীপ্ত পরমাণু ঝরিতে দেখিয়া, তাহাকেই বিশ্বের আদি কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তখন কখন ভাবিয়াছিলে কি তাহাও কোন পূর্ব্বগামী বিশ্বের ধ্বংসাবশেষ হইতে পারে। হয়ত আকাশের ক্যালিডোয়েস্কোপ এর আর একবার আবর্ত্তন হইয়াছে! কখন ভাবিয়াছ কি

মরণের পথ দিয়া জীবনের দ্বার। জীবন বিকাশ মাত্র। জীবনের সাজসজ্জা মরণের নেপথ্য গৃহে হইয়া থাকে। জীবন শুধু যবনিকা উত্থান। মরণ—জীবনের ফল্গু অংশ—অপ্রত্যক্ষ গতিশালিনী।

তোমরা সংসারে গরীয়ান—পূজ্য আমি ক্ষুদ্র, অজ্ঞাতনামা। আমি হৃষীকেশ নহি, আমার পাঞ্চজন্য নাই, যে তাহার নিনাদে তোমাদের এই পঞ্চতন্মাত্র প্রসূত পাঞ্চজন্য জ্ঞানের বিসম্বাদ ঘুচাইয়া দিব। তোমাদের আলোক আছে, তাহাতে কেবল এই ভাস্বর মধ্যাহ্নের মাঝখানে, দীনহীন মনুষ্যের চক্ষে অন্ধতা সৃজন করিতেছ। তবু বলিতে পারি বাপু!—তোমাদের ল্যাবোরেটারীরূপ কৌরব পাশক্রীড়াগারে, এই পঞ্চতন্মাত্রস্পৃষ্টা প্রকৃতির দ্রৌপদীকে যতই বিবসনা করিতে চেষ্টা করিবে, ততই পরতে পরতে বিচিত্র বর্ণের সৌন্দর্য্যের শাটী, ততই আচম্বিত অতনু আনন্দময় আবরণ, ততই কোন ক্ষুণ্ণ কল্যাণের উত্তপ্ত নিশ্বাস, কোন যুগান্তরীণ স্মরণের হীরকী উপসাহ কোন অভিসম্পাত বদ্ধ আভিচারিক, রক্ষাকবচ ইহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া পড়িবে! তুমি যতই তপ্ত বুভুক্ষিত করে ইহার নগ্ন সৌন্দর্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিবে, ততই অক্সিজন্, হাইড্রজন্, নাইট্রোজন্, সিলিকন্, কারবন ওকোন্, প্রটোপ্লাজম্ প্রভৃতি জ্বলন্ত ধূলি ধোঁয়া আসিয়া, তোমার গৃহলক্ষ্মীর উপাদনীভূত হাত দুটীকে ঝল্‌সাইয়া ফেলিবে। শ্রীমর্য্যাদা নষ্ট করিয়া ইহার অঙ্গ স্পর্শ করা কাহার সাধ্য! তুমি ইহার দুকূলপ্রান্ত ধরিয়া, শত ঐরাবতের বলে

টানিয়াও ইহার সন্ধ্যা উষার আদিপুরুষ রঞ্জিত, চরণের অলক্তক রাগটুকু কখন দেখিতে পাইবে না।

আমি তোমাদের নিন্দা করিতেছি না বাপু!—**তোমাদের জড়াত্মক বিজ্ঞান, প্রকৃতির স্ত্রী মর্য্যাদার উপর মনুষ্য প্রতিভার অযথা ব্যভিচার প্রয়াস।** তোমাদের নিন্দা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। বিজ্ঞান—ভগবানের বিভূতিযোগ। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, ক্ষুদ্রের উপকারিতা, ক্ষুদ্রের মহত্ব, ক্ষুদ্রের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা। কত ক্ষুদ্র সাধনে বিশ্বে কত মহৎ সিদ্ধি সাধিত হয়, তাহার নির্ণয়ই বিজ্ঞানের যথার্থ অধিকার। যে ক্ষুদ্রের মহত্ব বুঝিতে পারে, সে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পায়।

এ অনন্ত আকাশব্যাপী নক্ষত্রপুঞ্জ মানুষের অদৃষ্টের বিধাতা না হইতে পারে, এই বিন্দুপদকণ বিশ্বের অনন্ত ভাণ্ডারে, বিশ্বস্রষ্টার সর্ব্বশক্তিশালিনী প্রতিভা লিখিত আছে। সৃষ্টির মাঝে—সৃষ্টিকৌশল প্রচ্ছন্ন। যে যথার্থ বৈজ্ঞানিক, সে তাহার মানমন্দির বা বিজ্ঞানগৃহের সাহায্যে তাহা পড়িয়া লইতে পারে। যিনি, এই স্থির উৎসব সমুদ্র-বাহিনী আলোকপূর্ণ জলযানযূথের মত, অসংখ্য নক্ষত্র পূর্ণ আকাশে শুধু দাঁড়িপাল্লা দেখিবার জন্য, দূরবীক্ষণ তুলেন, তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বত্রদায়িনী হইলেও, আলুলায়িত অন্ধকার। বিজ্ঞান মায়া নষ্ট করিতে বলে। যে মায়া নষ্ট করিতে বলে সে দেবতা। কিন্তু যে মমতা নষ্ট করিতে বলে, যে এই নিখিল চরাচরের ভিতর হইতে, এই কালব্যাপ্তি অতীত বিরাট আমিত্ব মুছিয়া ফেলিতে প্রয়াস পায় সে কি? **মমতা—চিরন্তন আমির প্রণয়ী প্রসারণ, মমতা—চিরদেবের আমির চিরবর্দ্ধমান হিল্লোল মমতা—চিরন্তনের, আপনার বুকে, সর্ব্বতোমুখী অবাহুবন্ধনী প্রেম আমন্ত্রন।**

তবে আলো কি?

আলোক, সৌন্দর্য্যদ্যোতক। আলোক, জীবনের প্রধানতম নির্ভর। ক্রমবিকাশ সূত্রে, প্রথম জীবানুর ইহা দৃষ্টি উন্মেষক। সাধারণ অনুভবে, ইহা দৃষ্টির আনন্দ আশ্চর্য্যের মহাতীর্থ। ইহা চিরন্তন। ইহা বিশ্ব বিকাশের যমজ সহোদর। ইহা সকল সম্পূর্ণ পবিত্রতার অপরিহার্য্য মঙ্গলাঙ্কুর। দেবকল্পনায়, মানুষ, জ্যোতিষ্মৎ সত্ত্বা না ভাবিয়া থাকিতে পারে না। গৃহরুদ্ধ উদ্ভিদ অমৃতের আশায় আলোক প্রবেশের পথে, আপনার উপবাসী শির উত্তোলন করিয়া থাকে। তবে আলো কি? গুণ হইলে কাহার গুণ? প্রক্ষিপ্ত হইলে কোথা হইতে প্রক্ষিপ্ত!

ক্রমশঃ—

জাগিল না।

(১)
বসন্ত এসেছে আজি
ফুটিয়াছে কত ফুল,
পুন আজি মধুভরে
ছুটিয়াছে অলিকুল।

(২)
পুনরায় জোছনায়
মধুরিমা ফুটিয়াছে;
নবীন উল্লাসে পুন
প্রাণখানি জাগিয়াছে;

(৩)
ক্ষুদ্র সে তটিনী তার
কুটীরের পার্শ্ব দিয়ে;
ধীরে ধীরে বহে যেত
সমুচ্ছল কথা কোয়ে

(৪)
সেও আজি জাগিয়াছে
পেয়েছে আনন্দ কণা
জেগেছে সকলে আজি
সেই শুধু জাগিল না।

(৫)
বাসন্তী প্রাণের মাঝে
ক্ষুদ্র সে কুটীর তার,
সে যে জাগিল না বলে
হয়ে আছে অন্ধকার।

শ্রীমতী ফুলকুমারী বসু।

প্রিয় বোন্‌টী আমার।

১

প্রিয় বোন্‌টী আমার।
ডাকিতেছে পিককুল কুহুকুহু বকুলে।
গুন্ গুন্ রবে অলি,
সাধে সুধা ফুল কলি,
আনন্দে অধীর বায়ু চুমি নব মুকুলে॥
এ সময় বসি একা,
দেখি কত প্রহেলিকা,
জাগে মনে রাকা শশী আনন তোমার,
প্রিয় বোন্‌টী আমার॥

২

প্রিয় বোন্‌টী আমার!
হের কুন্দমনচোর নিরমল গগনে।
উঠিতেছে হাসি হাসি
মাতাইয়ে দশদিশি,
সমল সলিলে কুন্দ হাসে ক্ষুণ্ণ আননে।
এ সময় নিরজনে
ভাবি কত আনমনে
জাগিতেছে মনে চারু বরাঙ্গ তোমার।
প্রিয় বোন্‌টী আমার!

৩

প্রিয় বোন্‌টী আমার!
সরলা হরিণী ঘুমে সুউবস শয়নে।
রজতের অলঙ্কারে
সুধাংশু সাজায় ধরে,
শ্যামলা প্রকৃতি সতী সুশ্যামল বরণে॥

হায় এ গভীর রাতে,
চেয়ে একা শূন্য পথে,
জাগে মনে আধো মধু বচন তোমার।
প্রিয় বোনটী আমার!

৪

প্রিয় বোনটী আমার।
চকোর চকোরী মিলি চাঁদ সুধা পিয়িছে।
মুগ্ধ যামিনী যোগে,
যুবক যুবতী জাগে,
জোছনা সমার হের দোঁহে মিলি হাসিছে।
পুরাণ প্রাণের কথা,
পশি প্রাণে দেয় ব্যথা,
বিলীন মলিন ছায়া ধীরে মনে জাগিছে।
সুখে ঘুমাও তুমি,
হেথা একা বসি আমি,
ভাবিতেছি মনে মনে কুশল তোমার;
প্রিয় বোনটী আমার।

ব্রজেন্দ্রমোহিনী দাসী।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য।

অনুকরণ মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। বস্তুদ্বয়ের আঘাতোৎপন্ন শব্দ অথবা জন্তু বিশেষের ধ্বনির অনুকরণেই ভাষার সৃষ্টি। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে আর্য্যজাতি মধ্যএসিয়া হইতে ভিন্ন ভিন্ন দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। আদৌ তাঁহাদের এক ভাষা ছিল পরে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্য দিয়া গমনকালীন সেই সেই দেশের শীতোষ্ণতা ভেদে ও নূতন নূতন প্রাকৃতিক দৃশ্যের সংঘর্ষে উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎপত্তি হয়। বাইবেলে বর্ণিত আছে যে ব্যাবিলনের অত্যুচ্চ গৃহ নির্ম্মাণকালীন ভাষা ভেদ ঘটে। যাহাই হউক অধুনাতন প্রচলিত ভাষা সমূহের শব্দ সকলের উচ্চারণ প্রণিধান করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আদৌ তাহারা এক শব্দ ছিল কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র। দেশভেদে এইরূপ উচ্চারণ ভেদ ও রূপান্তর বাঙ্গালা ভাষার মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। পল্লীগ্রামের প্রচলিত ভাষা অপেক্ষা সহরের ভাষা অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন ও দন্তোচ্চারিত; আবার পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ভাষায় অনেক বর্ণের উচ্চারণ নিম্নবঙ্গের ভাষায় দৃষ্ট হয় না। ইংরাজী ভাষার মধ্যেও স্থান ভেদে এইরূপ উচ্চারণের বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়।

সভ্যসমাজ মাত্রেই দুই প্রকার ভাষার প্রচলন আছে। একটী সাধু-ভাষা অর্থাৎ লিখিবার ভাষা অন্যটী চলিত বা কথোপকথনের ভাষা। আর্য্য জাতি যখন আর্য্যাবর্ত্তে বসতি করিতেন তখন তাঁহাদের যেটী চলিত ভাষা ছিল, তাহার নাম প্রাকৃত। এই প্রাকৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি "প্রকৃতেরাগতম" অর্থাৎ স্বাভাবিক উৎপন্ন। এই প্রাকৃত ভাষাকে ব্যাকরণাদির নিয়মে সংস্কার করিয়া যে লিখিবার ভাষা প্রস্তুত হয় তাহাই সংস্কৃত বা দেবভাষা। ভদ্রলোকেরা পুস্তকাদি লিখিতে এই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং সাধারণে

ও স্ত্রীলোকেরা প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন। প্রাকৃতের শব্দ সকলই যে মার্জ্জিত হইয়া সংস্কৃতে পরিণত হইয়াছে, তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। নিরুক্ত পরিশিষ্টের ভাষ্যে উদ্ধৃত একটী ব্রাহ্মণ বচনে লিখিত আছে—"ব্রাহ্মণা উভয়ীং বদন্তি যাচ দেবানাম্ যাচ মনুষ্যাণাম্" এই দেবভাষাই সংস্কৃত, আর মানব ভাষাই প্রাকৃত। এই প্রাকৃত হইতেই সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি।

এই প্রাকৃত আবার চারি প্রকার—মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, ও পৈশাচী। খৃঃ পূঃ ৪৪১ অব্দে কাত্যায়ন বররুচী "প্রাকৃত প্রকাশ" নামক পুস্তকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মহারাষ্ট্রী শৌরসেনীর জননী; শৌরসেনী মাগধ ও পৈশাচী ভাষাদ্বয়ের জননী। সংস্কৃত নাটকোলিখিত ভদ্র মহিলাগণের উক্তিতে এই শৌরসেনীর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় আর মাগধী বা পালী ভাষা বুদ্ধদেবের উপদেশাদিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই সংস্কৃত ভাষা হইতেই বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি তবে ইহাতে অনেক প্রাকৃত শব্দও মিশ্রিত হইয়াগিয়াছে। কাল ক্রমে ভিন্ন জাতির সংঘর্ষণে হিন্দী, আরবী, পার্‌সী, ইংরাজী, ইটালিক্, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষার শব্দ সমূহ ইহাতে প্রবেশলাভ করিয়া ইহার পুষ্টিসাধন করিয়াছে ও করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোন্নতি নির্দ্দেশ করিতে হইলে প্রধানতঃ ইহার তিন অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়; ১ম আদিম অবস্থা, ২য় মধ্যাবস্থা, ৩য় বর্ত্তমানাবস্থা।

আদিম অবস্থায় প্রথমতঃ এই বাঙ্গালা ভাষা চলিত ভাষার আকারেই প্রচলিত ছিল। লিখনাদি তখনও সংস্কৃত ভাষায় সম্পন্ন হইত। প্রাচীনকালের অনুশাসন পত্রাদি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তখন বাঙ্গালা ভাষার অবয়ব পূর্ণ না হওয়ায় লিখনাদিতে ইহা ব্যবহার হইবার উপযুক্ত হয় নাই। পরে যত শব্দের অপ্রতুলতা অনুভূত হইতে লাগিল, ততই নিকটবর্ত্তী ভাষা হইতে শব্দ সকল অবিকৃত বা রূপান্তরিত ভাবে গৃহীত হইতে লাগিল। এইরূপেই হিন্দি ভাষার অনেক শব্দ এই সময়েই এই ভাষায় প্রবিষ্ট হইল এবং ইহার পর হইতেই বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি লিখিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রাচীন কাব্যাদি গ্রন্থে হিন্দি শব্দের বহুল প্রচলন দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তৎকালীক কবিগণ ভাব প্রকাশার্থে বাঙ্গালা শব্দের অভাব হেতু হিন্দী শব্দ সকল গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার অনতিকাল পরেই বঙ্গদেশ মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হইলে যাবনিক অনুকরণে অনেক আরবী ও পারসী শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া যায়। উক্ত হিন্দি ও যাবনিক ভাষার শব্দ সকল কালক্রমে এত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের অধিকাংশকেই আর চিনিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ কতকগুলি শব্দ এরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে যে আর তাহাদের উৎপত্তির বিষয় কিছুই জানিবার উপায় নাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির গ্রন্থে হিন্দি ও যাবনিক শব্দের ব্যবহার যথাস্থানে প্রদর্শিত হইল। কথিত ভাষায় আজিও যে সকল পারসী ও আরবী শব্দ দেখা যায়, তাহাও উক্ত পাঠানাধিকারে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ

লাভ করিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। এই পাঠান অধিকারকাল হইতেই বাঙ্গালা ভাষার মধ্যাবস্থা।

বর্ত্তমান চলিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত অন্য ভাষা হইতে আগত কতকগুলি শব্দ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

প্রাকৃত—কাজ, বউ, হয়, পাথর, বুড়া ইত্যাদি।

হিন্দী—বাপ্, ডর, গাঁজা, আন্দাজ, গহেনা, সবাই, বাগান, গাড়ী, মোটা, ফাটা, সিপাহী, নাও ইত্যাদি।

আরবী ও পারসী—আইন, আদালত, পেয়াদা, হাজির, পেশ্, মামলা, বোকা, গুজরৎ, খোদ, নিরিখ, তারিখ, দস্তখৎ, মালগুজারী, খরিদ, দাখিলা, খুশী, হুজুর ইত্যাদি। ইহার অধিকাংশ শব্দই জমীদারী মহাজনী হিসাব ও আদালতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পরাজিত জাতি অনেকাংশে বিজিত জাতির অনুকরণ করে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এই সত্যের বশবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালীরা যাবনিক আচার ব্যবহার পরিচ্ছদাদির ন্যায় ভাষারও অনুকরণ করিয়াছিলেন। এই সত্যবলেই ইংরাজেরা রোমান্ জাতির ভাষার অনুকরণ করিয়াছিলেন। মুসলমান আক্রমণের পরই যে সকল কবি বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি রচনা করেন, তাঁহারাই বাঙ্গালার আদি কবি, তাঁহাদের প্রণীত পুস্তক সকল আজিও বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য বলিয়া অভিহিত হইতেছে। এক্ষণে সেই সকল কবিগণের রচনা, সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাৎকালীক বঙ্গভাষার অবস্থার বিষয় লিখিত হইতেছে।

বিদ্যাপতি বাঙ্গালা ভাষার প্রথম সংস্কারক ও আদি কবি। এই ভাবুকপ্রবর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিথিলায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং রাজা শিবসিংহের সভাসদ থাকিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে রাধাকৃষ্ণ প্রেমবিষয়ক পদাবলী প্রণয়ন করেন। সুপ্রসিদ্ধ কবি চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও ইহাঁর সমসাময়িক। বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর গ্রাম—চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। এই সকল কবিগণের রচনা সুরস প্রেমভক্তি রসাত্মক। সুললিত রচনায় তাৎকালীক পণ্ডিতগণের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াছিল। যে সুললিত রচনা আজিও বাঙ্গালি হৃদয়ে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে, তাহা যে বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের মহামূল্য রত্ন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস সম-সাময়িক হইলেও তাঁহাদের রচনায় পার্থক্য আছে। চণ্ডীদাসের রচনার সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার প্রভেদ অতি অল্প, কিন্তু বিদ্যাপতির রচনায় হিন্দি শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। মিথিলা নিবাসী বিদ্যাপতির রচনায় বীরভূমস্থ চণ্ডীদাসের রচনা অপেক্ষা বহুল হিন্দি শব্দের ব্যবহার হওয়া বিচিত্র নহে। এক প্রকার ভাবের দুই জনের দুইটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পাঠকবর্গ—উভয়ের ভাষাগত পার্থক্য অনেকাংশে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দল বলে ধনী দেকে পড়ে গেল॥
কবহুঁ ঝাপয়ে অঙ্গ কবহুঁ বিথার।
কবহুঁ বাধয়ে কুচ কবহুঁ উথার॥
থির নয়ান নাহি অথির ভেল।
উরজ উদয় থল নালিম দেল॥

জনম অবধি, হমরূপ নিহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল, শ্রবনহি শুনলু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
বিদ্যাপতি।

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহারও কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে
যেমন যোগিনী পারা॥

এপাপ পরাণে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোর গরল হইল॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে।
এদেহ অনল তাপে পাষাণ যে গলে॥
চণ্ডীদাস॥

চণ্ডীদাসের রচনায় যে আদৌ হিন্দী শব্দ নাই এমত নহে, তবে তাঁহার ভাষা ও ছন্দ বাঙ্গালা ভাবের কিন্তু বিদ্যাপতির ভাষা ও ছন্দ হিন্দি ভাবের। চণ্ডীদাসের ভাষার ন্যায় ভাষাই তৎকালে বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। এই সময়ে নরহরি দাস, জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি কবিগণের রচিত অনেক পদাবলী বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। ইঁহাদের লেখায় চণ্ডীদাসের ন্যায় হিন্দী শব্দের অল্পই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ তৎকালে কথিত ও আদালত সম্বন্ধীয় ভাষায় যাবনিক শব্দের ও গ্রন্থাদিতে হিন্দী শব্দের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে গোবিন্দ দাস, নরহরি দাস ও বৈষ্ণব দাসের পদাবলীর কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

ফিরে ফিরে করে চিত, চমকয়ে ঐছন;
রসময় চম্পু বিথারী।
এত সুখ সম্পদ রহইতে আনমন
ঐছন রামনহি ধরবহি চন্দে।
গোবিন্দদাস।

বৃন্দাবন নব কেলি বিলাস।
কত কত ভাতি যতনে পরকাশ॥
শ্রীগোকুল বিধু গোর কিশোর।
গন সঙ্গ যাক নিত রসেরি ভোর॥
নরহরি ভন অক কি কহব তায়।
অনুখন মন জনু রহে তছু পাস॥
নরহরিদাস।

যবহুঁ যে ভাব উদয় হুঁহুঁ অন্তরে।
তব গাওহি দুহুঁ মেলি।
শুনাইতে দারু; পাষাণ গলি যাওত,
ঐছন সুমধুর কেলি॥
বৈষ্ণব দাস।

ক্রমশঃ—

শ্রীচৈতন্যের চৈতন্য লাভ।

"অস্ত গেলা নদীয়ার শশী ;" *
উদয় হইলা পুনঃ আসি।
অস্ত গেলে সমুদয়,
প্রাকৃতিক রীতে হয়,
কিরণে তিমির নাশে হাসি। ১

সুগভীরা জ্যোৎস্নাময়ী নিশি,
সুধা বর্ষে শরতের শশী,
সাগরের নীল গায়,
দ্বিতীয় চাঁদের প্রায়,
ধীরে যায় গোরাচাঁদ ভাসি। ২

ভক্তগণ উঠে চমকিয়া ;
নিমাইরে কাছে না পাইয়া
মা যদি সন্তানে ছাড়ে,
শিশু স্থির হ'তে নারে,
—অন্বেষণে চলিল ধাইয়া। ৩

জেলে এক উন্মত্তের প্রায়,
দ্রুতগতি পলাইয়া যায়।
দেখিল ভকতগণ,
হতাশ চঞ্চল মন,
যারে পায় তাহারে সুধায়। ৪

ভয়ে অভিভূত সে ধীবর,
ভীত চিত্তে করিল উত্তর ;—
মৎস্য ধরিবার কালে,
ঠেকেছে বিপদ জালে,
শব ছুঁ'য়ে ভূতের সে ডর। ৫

ধাইল ধাইল ভক্তগণ ;
এতক্ষণে পাইল চেতন।
যেন জলহীন মীনে,
জল পেলে বহুক্ষণে,
কিন্তু হায়! গোরা অচেতন। ৬

কি উপায়ে পাইবে চেতন ?
মূর্চ্ছা ভঙ্গ হবে কি কখন ?
কৃষ্ণের বিরহানলে,
"প্রভু" পড়েছিলা জলে,
—আরম্ভিল কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন। ৭

ধীরে ধীরে ধীরে বহে শ্বাস ;
হ'ল বুঝি জীবনের আশ।
আনন্দিত ভক্তগণ,
আনন্দিত ত্রিভুবন,
পুনরায় শশীর প্রকাশ। ৮

পুনরায় শশীর প্রকাশ,
ভক্তচিত্ত উৎপল বিকাশ।
প্রেম সুধা বরষিল,
তৃষিতা চকোরী পি'ল,
পূর্ণ হ'ল তা'সবার আশ। ৯

শ্রীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী।

* কোন শরৎকালীন রজনীতে যমুনাভ্রমে শ্রীচৈতন্যদেব সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রী চৈতন্যের সমুদ্রপতনোপলক্ষে বিগত অগ্রহায়ণের "সাহিত্যে" "চৈতন্যের দেহত্যাগ" শীর্ষক পদ্যটী প্রকাশিত হয়। শরৎকালের জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে নিমাই সাগরে পতিত হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু একটী ধীবর মৃতপ্রায় চৈতন্যকে উত্তোলন করে এবং বহু যত্নে তিনি চৈতন্য লাভ করেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধান—বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত আছে—বর্ষাকালে, শরৎকালে নহে। ৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসের ৭মী তিথিতে চৈতন্যদেব অপ্রকট হন। অতএব শরৎকালেই "অস্তগেলা নদীয়ার শশী"—সাহিত্যের এ উক্তি অযথার্থ।

তাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রস্তাবের কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শিষ্য। "অন্য" "অপর" প্রভৃতি বিশেষণ থাকিলে, তাহারা নিজ নিজ বিশেষ্যের স্বজাতীয় দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা প্রতিপাদন করে; যেমন অন্য মনুষ্য অথবা অপর মনুষ্য বলিলে, অন্য বা অপর শব্দে নির্দ্দিষ্ট মনুষ্য ভিন্ন তৎ স্বজাতীয় দ্বিতীয় মনুষ্য আছে—ইহাই বুঝায়, সেই প্রকার "পতিরন্যোবিধীয়তে" অর্থাৎ "অন্য পতি শাস্ত্রবিহিত" এই পরাশর বচনে 'পতি' শব্দ "অন্য" এই বিশেষণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট থাকায়, তৎ স্বজাতীয় বস্তু অর্থাৎ পতি পতিত হইলেই পত্যন্তর বিহিত, অপতি পতিত হইলে নহে, এই প্রকার অর্থই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব অপতি পতিত হইলে অন্য পতি শাস্ত্রবিহিত এতাদৃশ অর্থ কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?

গুরু। ব্রাহ্মাদি বিবাহে যথাবিধি দত্তাকন্যার পতি, গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি বিবাহে অদত্তা কন্যার পতি অথবা দ্বিতীয়বার বিবাহে বিবাহিত পতি; এই ত্রিবিধ পতিই অবশ্য শাস্ত্রানুমত এবং সামান্যতঃ পতি শব্দেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নঞ্ সেই ভর্তৃসামান্য বাচী পতি শব্দের সহিত অন্বিত হইয়া, তাহার অপ্রাশস্ত্য মাত্র বিধান করিতেছে; পতিশব্দের পতিত্বরূপ অর্থের কোনই হানি করিতেছে না। যদি এমতই হইল, তবে অপতি অর্থাৎ অপ্রশস্ত পতি পতিত হইলে, অন্য পতি শাস্ত্রবিহিত, এতাদৃশ প্রয়োগ কখনই দূষিত হইতে পারে না।

শিষ্য। যদি "পতৌ" এই প্রকার নির্দ্দেশ দেখিয়া, ব্যাকরণের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত সম্ভবতঃ অকার প্রশ্লেষ কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে "জারেণ জনয়েদ্ গর্ভং গতে ত্যক্তে মৃতে পতৌ। তাং ত্যজেদ পরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপ কারিণীম্"॥ এই বচনে "মৃতেপতৌ" এই প্রকার নির্দ্দেশ থাকায় "মৃতে অপতৌ" এবংবিধ সন্ধিচ্ছেদ করিতে বাধা কি? এই উভয়বিধ প্রয়োগই ত সমানাকার ও এক পরাশর সংহিতাতেই আছে। অতএব উক্ত বচনের এই অর্থ হইল যে, অপতি অর্থাৎ অপ্রশস্ত পতি অনুদ্দেশ হইলে, পরিত্যাগ করিলে অথবা মরিলে, যে স্ত্রী উপপতি দ্বারা গর্ভোৎপাদন করে, সে পতিতা হয়, সেই পাপকারিণীকে অন্য রাজ্যে নির্ব্বাসিত করিবে।

গুরু। "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" এই বচনে পতিশব্দের পূর্ব্বে অকার প্রশ্লেষ করিয়া যে কেবল ব্যাকরণেরই সম্মান রক্ষা করা হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু সংহিতাকারের অনুমত অর্থেরই অনুসরণ করা হইয়াছে; ইহা প্রথম প্রস্তাবে বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। "জারেণ জনয়েদ্ গর্ভং" এই বচনে অকার প্রশ্লেষ করিয়া, তুমি যাদৃশ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলে, তাহা কখনই সংহিতাকারের অভিমত অর্থ নহে। কারণ, প্রকরণের অনুধাবন করিলে ইহাই বুঝায় যে, পতির অনুদ্দেশ প্রভৃতি স্থলে স্ত্রীর ব্যভিচার নিষেধই উক্ত বচনের উদ্দেশ্য। তবে যে পতিশব্দের গৌণাকৃতি নির্দ্দেশের কোনও অর্থ নাই, তাহাও নহে। এতাদৃশ প্রয়োগ দ্বারা অবশ্যই পতির নিন্দা বুঝাইতেছে। কারণ,

পত্নীকৃত পাপে পতিও লিপ্ত হইয়া থাকে। যথা তন্ত্রসারে,—

রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।

যেমন মন্ত্রিকৃত পাপ রাজাতে ও পত্নীকৃত পাপ নিজ পতিতে সংক্রান্ত হয়, সেই প্রকার শিষ্যকৃত পাপ গুরুতে সংক্রান্ত হয়।

এমন কি পত্নীর পাপে পতির পাতিত্য পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে, তাহা মহর্ষি পরাশর নিজেই বলিয়াছেন; যথা—

পতত্যর্দ্ধং শরীরস্য যস্য ভার্য্যা সুরাং পিবেৎ।
পতিতার্দ্ধশরীরস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে॥

যাহার ভার্য্যা সুরাপান করে, তাহার অর্দ্ধ শরীর পতিত হয়, যাহার অর্দ্ধ শরীর পতিত হয়, তাহার নিষ্কৃতি নাই।

অতএব যখন সংহিতাকার, বিশিষ্ট কারণ বশতঃ পতি শব্দের গৌণার্থকৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন অকারণ প্রশ্রয় করিয়া, শাস্ত্রের অনভিমত অর্থ করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।

শিষ্য। যদি দত্তাকন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত না হয়, তবে—

কুলশীলবিহীনস্য ষণ্ঢাদিপতিতস্য চ।
অপস্মারিবিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাম্।
দত্তামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈব চ॥

কুল শীল বিহীন, ক্লীবাদি, পতিত, অপস্মাররোগগ্রস্ত, যথেচ্ছাচারী, চির-রোগী অথবা বেশধারী, এরূপ ব্যক্তির সঙ্গে যে কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়, তাহাকে এবং সগোত্র কর্তৃক বিবাহিতা কন্যাকে হরণ করিবেক অর্থাৎ পুনর্ব্বার অন্য ব্যক্তির সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিবেক। (১) ক্রমশঃ—

(১) উদ্বাহতত্ত্বধৃত বশিষ্ঠ বচন।

আমার পশ্চিমে চাকরী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইংরাজের উদ্যোগ ও ভয়—
নদীতে ভীষণ হত্যাকাণ্ড।

নামটী আমার ঠিক্ মনে নাই—হিলার্স কি হিলডেন এই রূপ নামেই এক জন ইংরেজ সেই সময় কানপুরের মাজিষ্ট্রেট কালেক্টার ছিলেন। নানা সাহেবের নাচ গান ও প্রীতি ভোজের দরুণ তিনি তাঁহাকে বিশেষরূপে চিনিয়াছিলেন। নানার উপর তাঁহার এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি তাঁহার নিজের ও বন্ধুবর্গের পরিবারবর্গকে নানার—বিঠুরের বাটীতে রাখিয়া নিরাপদ করিতে চাহিয়াছিলেন। নানা—বীরপুরুষ, তিনি গবর্ণমেণ্টের এ বিপদের সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। কালেক্টার সাহেবের বন্দোবস্ত অনুসারে নানা-সাহেব

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের পাঁচশত সিপাহী লইয়া, নবাবগঞ্জের খাজনাখানা রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইলেন।

কাজটা অবশ্য লাভের জন্য নহে, কেবল গবর্ণমেণ্টের উপকারের জন্য। নানা সাহেবের এইরূপ সহৃদয়তা ও সহানুভূতির জন্য কালেক্টার সাহেব এমন কি কানপুরের অনেক বড় বড় ইংরাজ তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। এ প্রকার রাজভক্ত লোকের হাত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া গবর্ণমেণ্ট যে, সমূহ অন্যায় করিয়াছেন ইহা তাঁহাদিগের মনে সময়ে সময়ে উদিত হইতে লাগিল। *

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। আমি দুই তিন বার করিয়া সপ্তাহে আমার পরিবারবর্গকে দেখিয়া আসিতে লাগিলাম। আপিসের কাজকর্ম্মও চলিতেছে। সাহেবদেরও বিদ্রোহ সম্বন্ধে আশঙ্কা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বহুক্ষণ ধরিয়া অন্ধকার দেখিলে যেমন ভবিষ্যতে ঝটিকা আশঙ্কা মনে উদিত হয়, কানপুরের বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক্ সেইরূপ বোধ হইল। রাত্রে যদি দশ বারটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিতে মনে হয়—ঐ সিপাহী ক্ষেপিল। আমি ভীতু বাঙ্গালী বলিয়াই যে কেবল ঐরূপ ভয় পাইতাম, তাহা নহে। অনেক বড় বড় সাহেবও ঐ সময়ে আমার মত অবস্থাগ্রস্থ হইয়াছিলেন।

মধ্যে আর একটা সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল; সকলেরই চিত্ত তাহাতে আকুলিত হইল। ইংরাজ মহলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সংবাদ আসিল—কানপুরের পক্ষে একদল অশ্বারোহী সিপাহী বিদ্রোহী হইয়া সমস্ত ইংরাজ অফিসারদের নিহত করিয়াছে। এ সংবাদ কানপুরে পৌছিবামাত্র, ইংরাজ মহলে বড় একটা আশঙ্কা ও বিভীষিকার আবির্ভাব হইল। সকলেই বুঝিলেন, কানপুরে যে অগ্নি ধুমায়িত হইতেছে, তাহা শীঘ্রই জ্বলিয়া উঠিবে।

হুইলার সাহেব ক্রমশঃ বিশেষ সতর্কতা আরম্ভ করিলেন। সৈন্যদিগের মতি গতি প্রচ্ছন্নভাবে পরীক্ষার জন্য তিনি দুই জন গুপ্ত-চর নিযুক্ত করিলেন। উপযুক্ত লোক দেখিয়াই প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহারা যে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিল, তাহাতে সিপাহীদিগের সম্বন্ধে অনেক গোপনীয় কথা হুইলারের কাণে উঠিতে লাগিল।

এই দুই জন গোয়েন্দার মধ্যে এক জনের নাম বদ্রীনাথ। বদ্রীনাথ কমিসরিয়েটের গোমস্তা—ইংরাজের কর্ম্মচারী—কিন্তু খুব বিশ্বাসী, খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। আর এক জন মুসলমান, নাম—আমীর খাঁ। আদত খাঁটি পাঠান, ইংরাজের নিমকের মর্য্যাদা রাখিতে বিশেষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই দুই জন প্রধান গোয়েন্দার অধীনে দশ বার জন বিশ্বস্ত লোক ছিল, তাহারা কখনও ভিস্তী সাজিত, কখনও বা ফেরিওয়ালা সাজিত, কখনও বা দুধ, শাকসব্জী বিক্রেতা হইত, কখনও বা সময় বুঝিয়া কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া ঘুরিত। কেহ মজুর সাজিয়া মজুরী করিত—এবং কেহ বা সিপাহীদের উচ্ছিষ্ট বাসন মাজিয়া তাহাদের মনের

* এইরূপ মর্ম্মের একখানি চিঠি আমি একবার পড়িয়াছিলাম।

কথা জানিবার চেষ্টা করিত। বদ্রীনাথ আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারী বিশেষতঃ সে অনেক সময়ে আমার কাছে অনেক উপকার পাইয়াছিল সুতরাং আমাকে ভক্তি ও স্নেহ করিত। হুইলার সাহেব এই লোককে গুপ্তচর নিযুক্ত করায় আমার বিশেষ সুবিধা হইল। আমি একদিন গোপনে বদ্রীকে ডাকিয়া বলিলাম "দেখ বদ্রীনাথ! আমি তোমায় কখনও কোন বিষয়ের জন্য অনুরোধ করি নাই। কিন্তু আজ-কাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে তাহাতে এ বিষয়ে তোমার নিকট সাহায্য না লইলে কোন উপায় নাই। আমার বিশেষ অনুরোধ—তুমি যখনই জানিতে পারিবে যে, কানপুরের সিপাহীরা ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্থিত হইবে, তখনই হুইলার সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও সংবাদ দিবে। বদ্রীনাথ আনন্দের সহিত এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল এবং বলিল "বাবু সাহেব! লিখিত সংবাদ—বিশেষতঃ এ সময়ে—এ সময়ে পাইলে আমার খালি চাকরি নয়—ইংরাজের হুকুমে প্রাণ পর্য্যন্ত তোপের মুখে যাইবে। তবে এই কথাবার্ত্তা রহিল—প্রথম বিদ্রোহ সংবাদ পাইবামাত্রই আমি আপনাকে একগাছি যষ্টি আমার চাকরের দ্বারা পাঠাইয়া দিব। তাহা হইলেই আপনি বুঝিবেন যে, বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।

ইংরাজেরা কিন্তু প্রথম হইতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অনেকে স্ত্রীপুত্রদিগকে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিবার জন্য দেশীয় ভৃত্যদিগের বা সম্ভ্রান্ত বন্ধুবর্গের গৃহে তাঁহাদিগকে পাঠাইতে লাগিলেন। অনেক সাহেব ও মেম, নিজেদের ও ছেলেদের জন্য গোপনে এক এক সুট হিন্দুস্থানীর পোষাক পর্য্যন্ত প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন—বদ্রীনাথ আমায় এই সমস্ত সংবাদ দিয়া গেল।

অম্বালায় বন্দুক শিক্ষা দিবার এক সৈনিক বিদ্যালয় আছে। অনেক দিন হইল জনকতক মুসলমান সিপাহী অম্বালায় নূতন ধরণের বন্দুক, কাওয়াজ শিক্ষা করিতে গিয়াছিল। তাহারা আবার এই মাসে লক্ষ্ণৌয়ে ফিরিয়া আসিল। তখন ইংরাজ সেনার মধ্যে Enfield এর প্যাটার্ণের অস্ত্রধারী বন্দুক ব্যবহৃত হইত। ইহা ছুড়িতে হইলে দাঁত দিয়া টোটা কাটিতে হয়। মুসলমান সিপাহীরা কানপুরে তাহাদের হিন্দু ও মুসলমান সঙ্গীদের নিকট এই নূতনবিধ বন্দুক ছোড়ার কায়দা প্রণালী এরূপভাবে বর্ণনা করিল যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ইহাতে আশঙ্কিত হইয়া মনে মনে ইহার প্রচলনের বিরুদ্ধে সংকল্প স্থির করিল।

সহরের অবস্থাতে যেন বিদ্রোহ-লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ইংরাজেরা—যাঁহারা সহরের চারিদিকে ছড়াইয়াছিলেন, সকলেই খালের ধারে—ছাউনীর সীমার মধ্যে আসিয়া জুটিয়াছেন। তাঁহারা গঙ্গার ধারে "বারুদখানা"কে (Magazine) আপনাদের আশ্রয়স্থল করিবার জন্য হুইলার সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহেব তাহাতে সম্মত হন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য—বিদ্রোহ সংবাদ পাইলেই তিনি বারুদখানায় আগুণ লাগাইয়া দিয়া, সিপাহীদের বারুদ লুঠের পথ বন্ধ করিবেন।

আমি অনেক দিন স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখি নাই। একবার সাহেবকে বলিয়া আমার বন্ধুর বাটাতে গেলাম। দেখিলাম, তাহারা সেখানে বাটীর অপেক্ষাও স্বচ্ছন্দে আছে। ব্যাঙ্কে ও আশেপাশে আমার যে সমস্ত টাকাকড়ি ছিল, সমস্তই সেই দিন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। টাকাগুলি আমার স্ত্রীর নিকট রাখিয়া দিলাম। তৎপরদিন প্রাতে আহারাদি করিয়া আবার আপিসে আসিলাম। আসিবার সময় পথে—একবার বদ্রীনাথের বাড়ী গেলাম। সেখানে মহা খাতির। সে আমায় কোথায় বসাইবে, কি করিয়া আদর করিবে—কিছুই খুঁজিয়া পায় না। তাহার মুখে শুনিলাম—কানপুরের সিপাহিরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে, তাহারা আর কোম্পানির চাকর নহে—শীঘ্র তাহারা দিল্লীর বাদসাহের পতাকা চুম্বন করিবে। তবে সংবে কোন অত্যাচার বা ইউরোপীয়দের উপর কোন পীড়ন করিবার ইচ্ছা তাহাদের নাই। কিন্তু কথার ভাবে বোধ হয়, খাজনাখানাটা তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। দিল্লীর বাদসাহের নিকট যাইতে হইলে সুধু হাতে যাওয়া চলে না; কিছু নজর চাই। দরিদ্র সিপাহী নজরের টাকা কোথা পাইবে? তাহাদের নাই কিন্তু কোম্পানির ত আছে। তাহাদের হাতে কোম্পানির বন্দুক ত আছে। বন্দুকের জোরে তাহারা যাহা হয় একটা করিয়া যাইবে।

আমি আমার সাহেবকে গিয়া এই সংবাদ দিলাম। কথাটা—ক্রমে ক্রমে হুইলার সাহেবের কাণে উঠিল। তিনি খাজনাখানা হইতে নগদ চৌত্রিশ হাজার টাকা, কোম্পানির কাগজপত্র ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সরকারী দলিল সমস্তই স্থানান্তরিত করিয়া—নূতন গড়খাইএর মধ্যে আনিলেন। নূতন গড়খাই—ক্যাণ্টনমেণ্টের চারিদিকে নূতন করিয়া প্রস্তুত হইতেছিল।

হুইলার সাহেব—সিবিল, সওদাগর, সরকারী, বেসরকারী সাহেবদের একদিন একত্র করিয়া বলিলেন "আপনারা ভয় পাইয়া সহর পরিত্যাগ করিবেন না। সিপাহীরা যে ইংরাজদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হইবে—তাহাত সহজে বোধ হয় না। যদিও করে—আমাদের যে সৈন্য মজুত আছে ও যাহা আসিতে লিখিয়াছি, তাহাতে তাহাদিকে সহজেই দমন করা যাইবে। আপনারা ভয় পাইলে সিপাহিরা সাহস পাইয়া উন্মত্ত হইবে। তখন শেষ রক্ষা অতি দুরূহ হইয়া পড়িবে।"

যাঁহারা কানপুর ত্যাগের জন্য নৌকাদি জোগাড় করিয়াছিলেন বা অন্য কোন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, বড় মিলিটারি সাহেবের এইরূপ আশ্বাসবাণী শুনিয়া তাঁহারা সে সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন।

আমাদের আপিসে হুকুম আসিল, নূতন গড়খাইএর মধ্যে রসদ জোগাইতে হইবে। হাজার লোকের একমাস চলে, এরূপ রসদের প্রয়োজন। আমরা তদনুসারে দুই একদিনের মধ্যে আটা, ডাল, ঘৃত, লবণ, চাউল, চিনি, রম, দোয়াস্তা ইত্যাদি উপযুক্তরূপ আহরণ করিয়া দিলাম।

আমি এখন গড়খাইএর মধ্যে সাহেবের ঘরের পাশে একটা কামরাতে আড্ডা করিলেও আমার আহারাদি সহরে আমার খুড়তুত ভাইএর বাড়ীতেই হইত। একদিন আহারাদির পর ছাউনীতে যাইতেছি, দেখি—একদল পদাতি সৈন্য লক্ষ্ণৌ হইতে আমাদের সাহায্যার্থে আসিয়া উপস্থিত হইল। আপিসে গিয়া শুনিলাম, এলাহাবাদ হইতে আরও একটা রেজিমেণ্ট আসিতেছে। ইংরাজদের ইহাতে বড়ই আনন্দ হইল কিন্তু সে আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না।

সার হেনরি লরেন্স তখন লক্ষ্ণৌএর কর্তৃত্বভার লইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, ভূয়োদর্শী উদার চরিত, স্বদেশ ভক্ত রাজকর্ম্মচারী অতি অল্পই এদেশে আসিয়াছেন। তাঁহার শরীর রুগ্ন, পঞ্জাবের সুশৃঙ্খলা সাধনে জীবনের তীব্র শোণিতের তেজ নানা বাধা বিপত্তিতে মন্দীভূত, ছুটী লইয়া তিনি বিলাত যাইতেছিলেন—কিন্তু লর্ড ক্যানিং তাঁহাকে যাইতে দিলেন না। তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত একজন কর্ণধারকে এ ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিলে মহা বিপত্তির সম্ভাবনা। তিনি কাজেই জোর চিঠি লিখিয়া—বিশেষ অনুরোধ করিয়া লরেন্স সাহেবকে লক্ষ্ণৌএ পাঠাইয়া দেন।

ভবিষ্যতে দৃষ্টি রাখিয়া যে সকল রাজকর্ম্মচারী সেই সিপাহী যুদ্ধে ইংরাজ রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন, সার হেনরি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ন্যায় অবস্থাভিজ্ঞ, কৃতী, কৃতজ্ঞ সন্তান ইংলণ্ড অতি অল্পই পাইয়াছেন। অবস্থাভিজ্ঞ লরেন্স—হুইলারের অনুরোধে সেনাগুলিকে কানপুরে পাঠাইলেন বটে কিন্তু স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—লক্ষ্ণৌএর অবস্থা কানপুরের অপেক্ষাও শোচনীয়। তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন "যদি বিশেষ আবশ্যক বোধ করেন—এই ইংরাজ পদাতিদলকে কানপুরে রাখিবেন। কিন্তু যদি আবশ্যক না থাকে—তবে ইহা হইতে কতক সৈন্য আমার নিকট পাঠাইবেন।"

জেনারেল হুইলারও বহুদক্ষ লোক। কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সার হেনরির মত নহে। তিনি এলাহাবাদের উপস্থিত কতক সৈন্য ও লক্ষ্ণৌএ হেনরি সাহেব প্রেরিত কতক সৈন্য লক্ষ্ণৌএ পাঠাইয়া দিলেন। আমাদের অবস্থা পূর্ব্বেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই দাঁড়াইল।

এই সময়ে একদিন প্রাতে উঠিয়া নদীতীরে বেড়াইতে গেলাম। গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আত্মা পুরুষ শুকাইয়া গেল। দেখিলাম, রুধিরসিক্ত দুই ইংরাজ পুরুষ ও রমণী দেহ—জাহ্নবীর স্রোতে ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে। আমি দৌড়িয়া আসিয়া ছাউনীতে খবর দিলাম। সাহেবেরা নৌকা করিয়া সেই মৃতদেহদ্বয় উদ্ধার করিলেন। কাহাদের শব—তাহা স্থির হইল না। মৃতদেহ বড় পচিয়া ও ফুলিয়া উঠিয়াছিল। অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। শব দুটির অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বদিন দিবাভাগে তাহাদিগকে কেহ হত্যা করিয়াছে। কিন্তু কে হত্যা করিল? সিপাহী? স্থির কিছুই হইল না, তবে জনরব শতমুখে এই বার্ত্তা ঘোষণা করিল যে, সিপাহীরা দুই জন ইংরাজকে হত্যা করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছে। এ সংবাদে সহরের ইংরাজদের মধ্যে এক হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ক্রমশঃ—

সেকালের বড়লোক।

মহারাজ নবকৃষ্ণ।

(২)

সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হয় তাহাদের উপায় ভগবান নিজেই করিয়া দেন। রামচরণের বিধবা—ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিয়া পুত্রগুলি অতিকষ্টে মানুষ করিতে লাগিলেন। রামসুন্দর মাতার দুঃখ, নিজের দারিদ্র, ভ্রাতাদিগের পরিপালন-ভার, সাংসারিক অবস্থার উন্নতি এই সকল গুলিকে সম্মুখে রাখিয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসার ধর্ম্মের উপযোগী হইয়া উঠিলেন।

নবাব সরকারে পূর্ব্বে প্রতিপত্তি ছিল বলিয়াই রামসুন্দর আবেদন মাত্রেই পঞ্চকুটের ও অন্যান্য কয়েকটী স্থানের সুপার ভাইজারের পদলাভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল। সংসার পালন, মাতার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম সম্পাদন, ভাইদিগকে তৎকালীন প্রথামত শিক্ষাদান, ইত্যাদি কার্য্যে রামসুন্দরের উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয়িত হইতে লাগিল।

গোবিন্দপুর কোথায় ছিল তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইংরাজ এই গোবিন্দপুরে কেল্লা তৈয়ার করিবার সংকল্প করিলেন। গোবিন্দপুর তখন একখানি গণ্ডগ্রাম। এখন কলিকাতায় যাহারা বনিয়াদি বড় মানুষ তাঁহাদের দু'চারজন গোবিন্দপুরে থাকিতেন। সকলেরই বাড়ীঘর গেল। রামসুন্দর অগত্যা আড়পুলীতে উঠিয়া আসিলেন। কিন্তু আড়পলী তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি আবার সুতানুটী অঞ্চলে একটা বাড়ি ও কয়েক বিঘা জমী খরিদ করিলেন। এই বাড়ী ও জমী বর্ত্তমান শোভাবাজার রাজবংশের বাস্তুভিটার মূল পত্তন করিল।

নবকৃষ্ণ তখন মুরসীদাবাদে পারসী অধ্যয়ন করিতেন। ইংরাজী যেমন এখনকার অর্থকরী বিদ্যা সেই সময়ে পারসী ও সেইরূপ প্রধান ছিল। ইংরাজের আমল তখন হইয়াছে বটে কিন্তু ইংরাজ তখন সওদাগর মাত্র। তাহাদের বিশেষ দম্ভ কিছুই নাই। তাহারা সাধারণ প্রজার সামিল হয়ে ফ্যাকটরি ও তাহার রক্ষার্থে দুচারজন সেনা কতকগুলি অস্ত্র শস্ত্র তখন তাহাদের কেবল প্রভুত্ব পরিচায়ক। ইহাদের সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে বা কাজ কর্ম্মে যাঁহারা লিপ্ত হইতেন তাঁহারাই দুই একজন ইংরাজী শব্দ ওয়ালাকে আয়ত্বাধীন করিয়া রাখিতেন। *

---

* রীতিমত ইংরাজি শিক্ষা তখন হইত না, তবে Vocabularyর কথা কতকগুলি সেকালের লোকে শিখিয়া রাখিতেন। এই কথাগুলি মাঝে মাঝে অসম্বদ্ধ রূপে একত্রিত হইয়া এক অদ্ভুত ভাবে মনোভাব প্রকাশের সহায়তা করিত। যাঁহার যত ইংরাজি শব্দ মুখস্থ থাকিত, তিনি তত পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হইতেন এখনকার

অধিকারে আমার অনুমতি না লইয়া দুর্গ সংস্কার করিতেছেন—পত্রপাঠমাত্র তাহা স্থগিত করিয়া দিবেন—আর আমার বন্দী কৃষ্ণদাসকে আবদ্ধ অবস্থায় মুর্শীদাবাদে প্রেরণ করিবেন। অন্যথায় আমি কলিকাতা হইতে আপনাদের বাস উঠাইব"। বস্তুতই ইংরেজেরা তখন কলিকাতায় দুর্গ-সংস্কার করিতেছিলেন, কিন্তু অন্য সময়ে, ও বিভিন্ন ঘটনা-ক্ষেত্রে। তাহাতে নবাবের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না।

নবাবের অজ্ঞাতে আর একখানি পারসী চিঠি এক জন বিখ্যাত হিন্দু অনুচরের দ্বারা এই সঙ্গে ভিন্ন পথে প্রেরিত হইল। মুর্শীদাবাদের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া-দিলেন। পত্রখানি বিশেষ জরুরি ও তাহা কোন বিশ্বাসী হিন্দু মুন্সী দ্বারা পড়াইবার আদেশ ছিল।

মুন্সী তাজউদ্দিন, তখন ইংরাজ কোম্পানীর বেতনভোগী সদর-মুন্সী। তিনি মুসলমান, নবাবের জাত, বিশ্বস্ত হইলেও তাহার দ্বারা পত্র পড়ান—কলিকাতার সাহেবেরা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। ড্রেক সাহেব এক জন হিন্দু মুন্সীর তল্লাস আরম্ভ করিলেন।

নবকৃষ্ণ সেদিন ঘটনাকালে বড়-বাজার অঞ্চলে কিছু জিনিষপত্র কিনিতে গিয়াছিলেন, ড্রেক সাহেবের লোক সেই-খানে গিয়া তাঁহাকে ধরিল। নবকৃষ্ণ তদবস্থাতেই কলিকাতার দুর্গাধ্যক্ষের নিকট সেই গোপনীয় পত্রের অর্থ ভেদ করিলেন। নবকৃষ্ণের বয়স তখন ১৬ বৎসর মাত্র।

এই নবীন যুবকের পারস্য ভাষায় অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখিয়া ড্রেক সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইলেন। তিনি নবকৃষ্ণকে দিয়া সেই চিঠির এক উপযুক্ত প্রত্যুত্তর লিখাইয়া মুর্শীদা-বাদে জগৎশেঠের কুঠীতে প্রেরণ করিলেন। কার্য্যশেষে নবকৃষ্ণ যথাসাধ্য পুরস্কার ও কোম্পানীর "সদর মুন্সী" গিরি লাভ করিলেন।

পত্রখানি কি—এতৎ সম্বন্ধে একটু বলা আবশ্যক। মুর্শীদাবাদের সম্ভ্রান্তগণ * ড্রেক সাহেবকে সহায়তা করিবার আশ্বাস দিয়া এই পত্র লেখেন। নবাবের উপর তাহারা বিরক্ত এবং তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ইংরাজকে বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত একথাও সেই পত্রে উল্লিখিত ছিল। ক্রমশঃ—

* জগৎশেঠ (স্বরূপ চাঁদ ও মাতাব চাঁদ) রাজা মহেন্দ্র সিংহ, রাজবল্লভ, নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র, দুর্লভ রাম ও নবাবের মন্ত্রী ও সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর এই গুপ্ত সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

সমীরা।

১ম সর্গ।

(১)

পোহাইল বিভাবরী, প্রমোদ-উদ্যানে
জাগিল পাপিয়া-বধূ সুমধুর তানে ;
জাগিল কোকিল কত কুজিয়া কাকলি,
জাগিল কমল-হৃদে মধুকর অলি।
অদূরে ভূধর-শিরে,
সুদূরে তটিনী-নীরে,
তরুণ অরুণ-বিভা খেলিছে মধুর!
কমল-মুখ কালিমা হ'ল এবে দূর॥
হাসিছে প্রকৃতি সতী,
হাসিছে পঙ্কজ-পতি,
হাসিছে কুসুম-রাজি প্রমোদ-উদ্যানে
হাসি সমীরণ ধায় উদাস পরাণে॥
অদূরে কুটীর-পাশে
শবরী মধুর হাসে
শবরের গলা ধরি চুম্বিল অধরে ;
"চলিনু প্রেয়সি" বলি,
ভুজে ভীম ধনু তুলি,
ধরিল বিশাল শৃঙ্গ মুখে দৃঢ় করে।
জাগিল নিনাদ ঘোর কাঁপায়ে ভূধরে॥
"চলিনু প্রেয়সি তবে,
পুনঃ কবে দেখা হ'বে ;
লিখিলা বিধাতা ভালে, বিরহ-বেদন—
সহিয়া রহিতে হবে এ পাপ জীবন।
কবে কালী দিবে কাল,
ঘুচিবেক এ জঞ্জাল ;
পূজিব পরাণ ভরি মায়ের চরণ,
শোণিত-আসবে কবে ঘুচিবে বেদন?"

(২)

ধীরে—ধীরে—ধীরে—ফিরি,
মুছিল নয়ন-বারি ;
শবরী আবরি চারু চটুল নয়ন,
"এস নাথ।" বলি পুন মুছিল বয়ান।
নাদিল আবার শৃঙ্গ,
কুরঙ্গের মনোরঙ্গ,
শবরীর শিরে যেন হ'ল বজ্রপাত,
"যেওনা দাঁড়াও ফিরে, শুন প্রাণনাথ!
যুগল চরণ ধরি,
শুনহে মিনতি করি,
শুন নাথ অভাগীর এক নিবেদন ;—"
ফিরিল শবর,—ফিরি
চারু চন্দ্র-মুখ ধরি,
হাসিতে হাসিতে পুন করিল চুম্বন,
"কেমনে প্রমদে আজি বিরস বদন?
বহে দুনয়নে ধারা,
কেন পাগলিনী পারা,
কেনবা পড়িছে খসি কবরী-কুসুম ;
নিতি যাই, নিতি আসি,
চাঁদ মুখে হেরি হাসি ;
কভু ত হেরিনি হেন তোমারে আকুল
কেন প্রিয়তমে হেন হ'লে প্রতিকূল?"

(৩)

"নহে প্রতিকূল, নাথ, কভু এ কিঙ্করী,
আমি হে তোমার দাসী,
এবে দয়া পরকাশি,
শুন নিবেদন মম, পদযুগে ধরি।
তবে ত সকল দুঃখ এখনি পাসরি।
না জানি কি আছে ভালে,
যা হেরিনি কোন কালে,
স্বপন আবেশে আজি করি দরশন,
বিদরিছে হিয়া নাথ, রাখহ জীবন।"

আলথালু পাগলিনী,
মণিহারা যেন ফণি,
আকুল পরাণে সতী করিল রোদন :—
কাঁদিতে কাঁদিতে হায়,
"স্মরি বুক ফেটে যায়
শমন সমান তার ভীষণ বদন!
না পারি ভুলিতে, নাথ, সে কাল স্বপন।
আজি যেন নিশি শেষে,
দুজনে বিজন দেশে
তীর্থ-দরশন আশে করি বিচরণ,
গৃহ ছাড়ি বহু দূরে,
উত্তরিনু কোন পুরে,
কনকে গঠিত চূড়া স্ফাটিক প্রাচীর,
বাহিরে সরসি শোভে সুবিমল নীর।"

(৪)

"দূরপথ অতিক্রমি, কান্ত, শ্রান্তপদ,
গগনে প্রকট রবি,
প্রদীপ্ত অনলচ্ছবি;
আর নাহি বিশ্রামিলে ঘটিবে বিপদ।
হেরি দোঁহে পশি পুরে,
বহু অন্বেষণ করে,
উপস্থিত হৈনু এক বণিক-ভবনে;
বদনে মধুর হাস,
চারু চন্দ্র পরকাশ,
অমিয়-জড়িত স্বরে সাধু আবাহনে,
জুড়াল পরাণ, তার মধুর বচনে।'
করিল যতন কত,
বাখানিল নানা মত
অভাগির পোড়া রূপ বণিক কেমনে,
না বুঝিনু সেইকালে তাহার ছলনে।
যদি চিনিতাম তারে,
যদি কুসুমের হারে
জানিতাম আছে গুপ্ত কাল বিষধর
আসি তাপসের বেশে
শেষে সে ধরিয়ে কেশে
নাশিবে জীবন হায়—
আর নয়—আর নয়—"
বলিতে বলিতে সতী পড়িল ভূতল,
মুখে নাহি বাক্য সরে,
হিয়া দুরু দুরু করে;
আলুথালু কেশপাশ অঙ্গের বসন,
কনক-লতিকা হায়,
ভূমে গড়াগড়ি যায়,
হেরিয়া ব্যাকুল কান্ত, ফেলি শরাসন
লইল কান্তারে কোলে
অমিয় মাখান বোলে
সান্ত্বনা করিল কত—করিল চুম্বন।
"উঠ, উঠ, চারুশীলে
কি সে বা বেদন পেলে,
কেন বা সহসা ভূমে হলে অচেতন!
উঠ প্রিয়তমে, ধর আমার বচন॥
স্বপন—সে ছার চিন্তা, নাহি তার মূল
ভাবিয়া দেখ না শান্তে, কেন বা ব্যাকুল॥
উঠ প্রিয়ে চারু আঁখি
মেলিয়া বারেক দেখি
জুড়াও আজিও মোর কাতর পরাণ,
একান্ত আমি যে তব, নাহি তাহে আন।"

(৫)

ধীরে ধীরে বহে শ্বাস,
বদনে অস্ফুট ভাষ,
খুলিল কমল-আঁখি শবরী তখন
ধীরে ধীরে মুছাইল শবর আনন।
"চল, প্রিয়ে, ঘরে চল,
বিলাপে কি ফল বল,
থুইনু দেখলো এই তূণ-শরাসন;
জানিনু নিশ্চয় আজি বিফল ব্যসন।"
শিশু সম কোলে তুলি,
বলিয়া মধুর বুলি,
চলিল লইয়া ধীরে নিকুঞ্জ ভিতরে।

পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটে ফুল,
গুঞ্জরিছে অলিকুল,
দুলিছে মাধবীলতা কত থরে থরে।
বহে মৃদু সমীরণ,
কুহরিছে পিকগণ
বিহরিছে শাখা'পরে ময়ূর ময়ূরী।
কভুবা নাচিছে তারা,
যেনরে পাগলপারা,
হেরিছে শিহরি কভু শবরী-মাধুরী।

(৮)

ডুবিলরে রাকা শশী
মরি আধ আধ হাসি,
ভাসিল শবর মন আনন্দ-সাগরে।
ধরি চারু মুখখানি,
কোমল কটাক্ষ হানি,
আবেশে ধরিয়া বক্ষে চুম্বিল অধরে।
লীলা-লজ্জাবতী লতা,
তবু না কহিল কথা,
হাসিয়া লুকাল মুখ পতির উরসে।
ভাসিল শবর প্রাণ প্রেম সুধা-রসে।
ক্রমে বেলা বেশি হ'ল,
পাখি সব দূরে গেল,
বকুলের ছায়া ক্রমে কমিয়া আসিল।
খরতর দিনমণি,
কুমুদী প্রমাদ গণি,
ডুবিল সরসী-জলে, কমল হাসিল।
চরাচর জীবগণ,
আহারে নিবেশে মন,
বিশ্বের বাড়িছে ক্রমে জীবন-সমর।

ক্রমশঃ।

GENERAL HINTS.

ওয়াটারপ্রুফ করিবার উপায়।

অল্প Isinglass মিশ্রিত জলে মোটা কাপড়ের উল্টাদিক ভিজাইবে। শুষ্ক হইলে Nutgall এর (মাজুফল) রস মাখাইয়া লইবে।

Mucilage
(গাছের আটা বিশেষ)
রাখিবার উপায়।

একটি বোতলে পুরিয়া বরাবের ছিপি দিয়া আটিয়া রাখিবে। সাধারণ ছিপির ন্যায় ইহা গ্লাসে আটকাইবে না। ইহার ভিতর দিয়া বায়ু প্রবেশ করিতে না পারায় ইহার ভিতরস্থ আটা নষ্ট হইবে না। এই ছিপি সহজে পরিষ্কার করিতে পারা যায়।

কাচে দাগ কাটিবার প্রথা।

শুষ্ক গুঁড়া Barium sulphate এবং double hydrogen ammonium fluoride'র সমভাগ একটি চিনামাটি খলে উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। ঐ মিশ্রিত পদার্থ দ্বারা যেরূপ অঙ্কিত করিবে সেইরূপ দাগ পড়িবে।

ধাতুর উপর লিখিবার প্রথা।

নাইট্রিক এ্যাসিড ... ২ পাউণ্ড।
মুরিয়াটিক এ্যাসিড ... ১ আউন্স।

উভয়কে বোতলে পুরিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া মিশ্রিত করিবে। ঈপ্সিত ধাতুর উপর গরম মোম ঢালিয়া ঢাকিয়া ফেলিবে। পরে ঠাণ্ডা হইলে শক্ত

ধারাল অস্ত্রের দ্বারা ইচ্ছানুসারে মোমের উপর লিখিবে। পরে পারদের দ্বারা মিশ্রিত এ্যাসিড অতি সাবধানে ফোঁটা ফোটা করিয়া লিখিত স্থান পূর্ণ করিবে। কম বেশী দাগ করিবার ইচ্ছানুসারে এক ঘণ্টা হইতে দশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে। পরে জল ঢালিয়া দিবে; জল ঢালিলে এ্যাসিডের কার্য্যকারিতা নষ্ট হয়। অবশেষে মোম চাঁচিয়া ফেলিলে দেখিবে, ধাতুর উপর সুন্দর লেখা হইয়াছে।

ষ্টীল পালিস করিবার প্রথা।

ভাল ষ্টীল হইলে Diamantive মিশ্রিত জিঙ্ক পালিস ব্যবহার করিলে উত্তম পালিস হয়। নরম ষ্টীল হইলে টিন পালিসই উত্তম।

কাচের পাত্রে কাচের নুড়ি দ্বারা অতি অল্প খড়ির তৈল Diamantive মিশ্রিত করিতে হইবে। কারণ Diamantive তৈলের সহিত মিশ্রিত হইলে চট্‌চটিয়া হইয়া যায় এবং দুই এক দিনের মধ্যে খারাপ হইয়া যায়। মিশাইবার কালে কোন ধাতুতে লাগিলে কাল হইয়া যায়।

স্পঞ্জ পরিষ্কার করণ।

নিস্তেজ মুরিয়াটিক এ্যাসিডে অন্যূন বার ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে। পরে জল দিয়া ধৌত করিয়া চুন পরিষ্কার করিবার জন্য জল মিশ্রিত Hyposulphate of soda যাহাতে এই মাত্র নিস্তেজ মুরিয়াটিক এ্যাসিড মিশান হইয়াছে, তাহাতে ডুবাইয়া রাখিবে। উত্তমরূপে পরিষ্কার হইলে তুলিবে। পরে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। এই প্রকারে ইহাকে অত্যন্ত সাদা করিতে পারা যায়।

লেস্ পরিষ্কার করিবার উপায়।

লেস্‌কে ইস্তারি করিলে অল্প পরিষ্কার হয় ও কোক্‌ড়ানগুলি সিধা হয়। পরে ভাজ করিয়া একটি পরিষ্কার নেক্‌ড়ার থলির ভিতর পুরিয়া সেলাই করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া বিশুদ্ধ সুইট অয়েলে অন্যূন ২৪ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবে। ঐ থলিটি ১০ মিনিট কাল সাবানের জলে ফুটাইয়া ঈষৎ উষ্ণ জলে চুবাইয়া চুবাইয়া ধৌত করিবে। পরে অল্প ফেন মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া লইবে। শেষে সেলাই খুলিয়া ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া টানে টান বাঁধিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে।

রাসমালা।

ঘোরতর যুদ্ধ।

প্রসিদ্ধ কুমারপাল চরিতে বংশরাজ বা বনরাজ সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত আছে; "গুর্জ্জর দেশে বড়িয়ার নামে একটী জনপদ আছে; পঞ্চাস্র তাহার প্রধান নগর। সৈলুগ সূরি আচার্য্য নামা জনৈক জৈন পুরোহিত সেই নগর হইতে বহির্গত হইয়া নিকটস্থ বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তত্রত্য তরুশাখা-লম্বিত একটী দোলামধ্যে একটী বালককে দেখিতে পাইলেন; তাহার নিকটেই একটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি সেই বালকের জননী। তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে জৈন আচার্য্য প্রভৃ-রে অবগত হইলেন যে, সেই রমণী গুর্জ্জরের রাজপত্নী; তাঁহার পতি জনৈক আক্রমকের হস্তে পতিত হইয়াছেন; তাঁহার রাজধানী শত্রু কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে, তিনি সসত্ত্বাবস্থায় বনমধ্যে পলাইয়া আসিয়া সেই কুমারকে প্রসব করিয়াছেন। এতদ্বিবরণ শ্রবণ করিয়া আচার্য্য সেই বালককে "বনরাজ" আখ্যা অর্পণ করিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বনরাজ মৌলা নগরের শূলপাল নামা জনৈক প্রসিদ্ধ দস্যুর সহিত মিলিত হয়েন। তৎকালে কল্যাণ নগরে যে সমস্ত রাজস্ব বাহিত হইত, বনরাজ তাহা পথি মধ্যে লুণ্ঠন করিয়া লইতেন। এইরূপে ধন সঞ্চয় করিয়া তিনি অনেকগুলি সৈন্য নিযোগ করিলেন এবং এক প্রদেশে একটী নগর স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অনহল নামক জনৈক গোপাল সেই নগরের স্থিতি ভূমি দেখাইয়া দেওয়াতে তদীয় নামানুসারে সেই নবপ্রতিষ্ঠিত পুরী অনহলপুর বা অনহল নগর নামে অভিহিত হইল।"

যে জৈন আচার্য্য বনরাজ ও তাঁহার জননীকে স্বীয় আশ্রয়ে স্থান দিয়াছিলেন, "রত্নমালা" গ্রন্থে তিনি শীলগুণ সূরি নামে অভিহিত হইয়াছেন। বনরাজ তাঁহার মঠে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া শৈশবকাল অতিবাহিত করেন। শ্বেতাম্বর সন্ন্যাসিগণের শান্তিময় নিকেতনে পবিত্র শাস্ত্রালাপন করিয়াও শিশু বনরাজ মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীয় পিতৃরাজ্য পুনর্লাভের আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাহার সহাধ্যায়িগণ যখন সাঙ্খ্য সূত্রের সমালোচনায় কাল অতিবাহিত করিত, বনরাজ তখন কোন নিভৃত কক্ষ মধ্যে একাকী উপবেশন করিয়া সৌরাষ্ট্রের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। কত চিন্তা তাহার সুকুমার হৃদয়ে প্রবল ঝটিকার ন্যায় আঘাত করিত। সেই প্রচণ্ড বাত্যার অবিরল ঘাতে তিনি সময়ে সময়ে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন; দুর্বৃত্ত শোলাঙ্কি রাজকে শত অভিশাপ ও স্বীয় মন্দভাগ্যকে সহস্র বিক্কার প্রদান করিতেন। তিনি রাজপুত্র, পূর্বপুরুষ সৌরকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; সুবিশাল সৌরাষ্ট্র তাঁহার পিতৃপুরুষগণের রাজ্য; সেই বিরাট রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া কোথা তিনি প্রচণ্ড প্রতাপের

সহিত শাসনদণ্ড পরিচালন করিবেন, না ভাগ্যের বিপর্য্যয়ে, বিবিধ বিড়ম্বনে তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া সন্ন্যাসিগণের মঠ মধ্যে কাল যাপন করিতেছেন, এই সকল চিন্তা সময়ে সময়ে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিত। শিশু সৌবরাজকুমার সেই অসহনীয় যাতনায় উন্মত্ত হইয়া আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিতেন। তাঁহার সহাধ্যায়িগণ তাঁহাকে ধরিয়া আবার মঠে আনয়ন করিত।

বনরাজ নিরঙ্কুশ উন্মত্ত হৃদয়ের এইরূপ উন্মাদচিন্তায় অতি কষ্টে কাল যাপন করিতেছেন, এমন সময়ে একদা তাঁহার মাতুল শরপাল তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে স্বীয় নিভৃত অরণ্যাবাসে লইয়া গেলেন। মাতুলের কঠোর দস্যুবৃত্তি মনোনীত হওয়াতে বনরাজ তাহাতে দীক্ষিত হইলেন। তখন তিনি শৈশব অতিক্রম করিয়া তরুণ বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। বাল্যের আশা ও অভিমান রোষ সমূহ উৎকট তেজে উত্তেজিত হইয়াছে। এক্ষণে বনরাজ তৎসম্প্রদায়ের তৃপ্তি বিধানে ব্যাপৃত হইলেন। প্রত্যেক অভিযানেই মাতুলের সহিত তিনি যোগ দান করিতেন এবং কার্য্যক্ষেত্রে বিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়া স্বীয় সহচরদিগকে ঘোরতর উৎসাহিত করিতে সক্ষম হইতেন। প্রায় প্রতি আক্রমণেই বিপুল ধন রত্ন তাঁহাদিগের হস্তগত হইত। মাতুলের আদেশক্রমে বনরাজ তৎসমস্ত অনুচরবর্গের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন, তাহাতে তাহাদের উৎসাহ শতগুণে বাড়িয়া উঠিত। যখন শিকারের কোন সুবিধা না থাকিত, বনরাজ তখন তাহাদিগকে লইয়া সেই নিবিড় গিরিগহন মধ্যে কল্পিত রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইতেন। বিশাল বনস্থলি তাঁহার রাজ্য, আরণ্য তরুনিচয় ফলপুষ্প প্রসব করিয়া তাঁহাকে রাজকর অর্পণ করে, এক খণ্ড পাষাণ তাঁহার সিংহাসন, বৃক্ষপল্লব তাঁহার রাজচ্ছত্র, তদীয় অনুচরবর্গ সেই প্রাকৃতিক ছত্র তাঁহার মস্তকোপরি ধারণ করিত, কেহ বন্য চামরীর লোমশ লাঙ্গুল লইয়া চামর ব্যজন করিত, কেহ মন্ত্রী, কেহ সভাসদ, কেহ বা কোষাধ্যক্ষ সাজিত। বনরাজ তাহাদিগকে লইয়া নূতন নূতন রাজ্য জয়ের মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইতেন। নূতন নূতন রাজ্য জয়ের মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইতেন। বালসুলভ কৌতুকে এইরূপ কিছুকাল অতীত হইল,—সকলে ভাবিল এ কৌতুক শীঘ্রই যাথার্থ্যে পরিণত হইবে। শ্রীদেবী নাম্নী জনৈক বণিকপত্নী একদা বনরাজকে ভক্তিসহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন, বনরাজ তাঁহার শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন "আমার অভিষেককালে আপনিই রাজটীকা অর্পণ করিবেন।" চম্প বা জাম্ব নামক একজন বণিক অনেকগুলি যুদ্ধব্যাপারে বিশেষ রণদক্ষতা প্রকাশ করাতে বনরাজ তাঁহাকে মন্ত্রিপদে অভিষেক করেন, এই চম্পই প্রসিদ্ধ চম্পানীর রাজ্যের স্থাপয়িতা। তদ্ব্যতীত অপর এক ব্যক্তি ইতিহাসে অক্ষয় নাম রাখিয়া গিয়াছেন,—অনহল নামে জনৈক গোপাল বনরাজের অনুগত ছিলেন; অদৃষ্টদেবের সুপ্রসাদে যখন তিনি নূতন নগর স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে উপযুক্ত স্থলের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েন, এই অনহল তাঁহাকে একটী পরম রমণীয় স্থল

আবিষ্কার করিয়া দেয়;—সেই নগর আনহলবারা নামে অভিহিত হইল।

এইরূপে অনেক দিন অতীত হইল;—রাজ্যের নানা প্রদেশ হইতে সাহসিক পুরুষ আসিয়া বনরাজের দলে নিবিষ্ট হইতে লাগিল;—তাঁহার সম্প্রদায় ক্রমে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। এই সময়ে শূরপালের মৃত্যু হওয়াতে বনরাজের উন্নতিস্রোত কিছুদিনের জন্য প্রতিরুদ্ধ হইল। কিন্তু তাহা স্বল্পদিনের জন্য; অচিরে তাঁহার সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কৃত হইল; তাঁহার উন্নতিস্রোত অসীম খরতরবেগে প্রবাহিত হইয়া চলিল। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া তিনি কিয়ৎকাল নীরবে কালযাপন করিলেন। এই সময়ে একদা সৌরাষ্ট্র হইতে জনৈক দূত আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি নিয়োগপত্র অর্পণ করিল। বনরাজ কুতূহল চিত্তে পাঠ করিয়া দেখিলেন;—শোলাঙ্কিরাজ ভূবরের কন্যা মিলান দেবী তাঁহাকে শেলভৃৎ পদে অভিষেক করিয়াছেন। পদটী উচ্চ বটে, কিন্তু রাজপুত্র বনরাজ তাহাতে কিরূপে সম্মত হইতে পারেন? যে রাজ্যে তাঁহার পিতৃপুরুষগণ প্রচণ্ড প্রতাপে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন, আজি তিনি তাহার অপহারকের নিকট সামান্য দণ্ডধর হইয়া থাকিবেন? তিনি সদর্পে তাহা অগ্রাহ্য করিলেন এবং অভীষ্টসিদ্ধির সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া বীরভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদা সংবাদ আসিল যে, কল্যাণনগরের কর্ম্মচারিগণ ছয়মাস সৌরাষ্ট্রে থাকিয়া বিপুল অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজধানীতে প্রতিগত হইতেছে। এই সমাচার পাইয়া বনরাজ আনন্দে উল্লম্ফন করিয়া উঠিলেন এবং সমস্ত দলবল একত্রিত করিয়া কেশরী বিক্রমে পথিমধ্যে তাহাদিগের উপর আপতিত হইলেন। সেই স্থলে উভয় দলে একটী সামান্য যুদ্ধ বাধিল;—সে যুদ্ধে বনরাজই জয়ী হইলেন। শোলাঙ্কি কর্ম্মচারিগণের সমস্ত ধন রত্ন তাঁহার হস্তে পতিত হইল। বিজয়ী বনরাজ সেই সমস্ত লুণ্ঠিত ধন সম্পত্তি লইয়া সানন্দে স্বীয় বনবিভাগে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু তিনি আর একস্থলে দীর্ঘকালের জন্য স্থির থাকিতে পারিলেন না;—কল্যাণরাজের প্রতিশোধ-পিপাসা দাবানলের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিয়া বহুদিনের পর অবশেষে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন এবং চিরলালিত আশার চরিতার্থতা সাধনের জন্য শুভদিনে শুভক্ষণে অনহলপুর বা অনহলবারা নগর স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, "সম্বৎ ৮০২ (খ্রীঃ ৭৪৬) অব্দে অনন্তকাল বিরাজ করিবার নিমিত্ত একটী নগর স্থাপিত হইয়াছিল। মাঘ মাসের সপ্তম দিবসে শুভ শনিবারে অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় বনরাজের আদেশ প্রচারিত হইল। জ্যোতির্ব্বিদ জৈন সন্ন্যাসিগণ নগরের কোষ্ঠি পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন, সম্বৎ ১২৯৭ অব্দে অনহলপুর বিধ্বস্ত হইবে।" পাষাণহৃদয় আল্লাউদ্দীনের সময়ে এই অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাক্য কিরূপে সফল হইয়াছিল, ইতঃপর যথাস্থলে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

কুমারপাল চরিত নামক প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থে অনহলপুরের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে ভারতের তদানীন্তন গৌরব গরিমার শ্লাঘা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। প্রয়োজন বোধে, সেই বিবরণ এস্থলে সন্নিবেশিত হইল। "অনহলপুর বহুবিস্তৃত; ইহার পরিধি দ্বাদশ ক্রোশ; তন্মধ্যে বহু দেবমন্দির ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত; চতুরশীতি চতুষ্ক; চতুরশীতি পণ্যশালা,—তন্মধ্যে অনেকগুলি রৌপ্য ও সুবর্ণ মুদ্রাশালা। বহুবর্ণের শিল্পী, কারুকর ও বণিক; প্রত্যেকের স্বতন্ত্র মহল নির্দ্দিষ্ট; পণ্যদ্রব্যও বহুবিধ, যথা,—হস্তিদন্ত, রেশম, পশম, হীরক, মুক্তা প্রভৃতি। এক একটী পণ্যসামগ্রী এক একটী স্বতন্ত্র চতুষ্কে বিক্রীত হয়। কোথাও কুঙ্কুম, কস্তুরি, চন্দনাদি বিবিধ সুরভি দ্রব্য, কোথাও বা বৈদ্য, কোথাও শ্রেষ্ঠী, কোথাও বা স্বর্ণকার, কোথাও বা রৌপ্যকার, আবার কোন স্থলে কর্ম্মকার, কোথাও বা সূত্রধর। এইরূপ নাবিক, ভট্ট, আচার্য্য ও অধ্যাপক প্রভৃতি সম্প্রদায় সমূহেরও এক একটী স্বতন্ত্র মহল নিরূপিত। সকলেই সুখী, সকলেই সন্তুষ্ট। সুবিশাল প্রাসাদমালা কুট্টিম শোভিত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকে বিভক্ত, কোনটীতে অশ্বাগার, কোথাও বা রথবেশ্ম। তদ্ব্যতীত রাজকর্ম্মচারিদিগেরও ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট ছিল। কি দেশীয়, কি বিদেশীয় প্রত্যেক প্রকার পণ্যদ্রব্যের এক একটী স্বতন্ত্র বীথিকা নিরূপিত ছিল। তথায় সকল প্রকার শুল্ক গৃহীত হইত। অনহলবারা বিশ্বের বাণিজ্যক্ষেত্র; তথায় প্রত্যহ এক লক্ষ টাকা * শুল্ক স্বরূপ আদায় হইত। নগরের অধিবাসীগণ এত ধনী যে, জল চাহিলে দুগ্ধ আনিয়া দেয়। তথায় অনেকগুলি জৈন মন্দির স্থাপিত আছে; এবং একটী বিশাল সরোবরের তটভূমে ভগবান্ মহাদেবের একটী সুন্দর আয়তন প্রতিষ্ঠিত। স্মৃতি, তর্কশাস্ত্র, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রালাপনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় স্থাপিত; ফলকথা অনহলবারা একটী নবসমুদ্র; যদি তুমি সমুদ্রের বীচি গণনা করিতে পার, তাহা হইলে সেই মহা নগরের অধিবাসী সংখ্যা গণনা † করিতে চেষ্টা করিলেও সফল হইতে পারিবে। মহাত্মা শৈলগসুরি বংশরাজের ললাটে রাজটীকা অর্পণ করিলেন এবং নবাভিষিক্ত নৃপতি তাঁহার

---

* ইহা এক প্রকার তাম্রমুদ্রা। এইরূপ একলক্ষ টাকা আধুনিক দশ সহস্র রৌপ্য মুদ্রার সমান।

† এই অতিশয়োক্তি স্পষ্ট বুঝাইবার উদ্দেশে কবি একটা মনোরম গল্প লিখিয়াছেন, তিনি বলেন, অনহলপুরে কোন রমণীর রাণো নামে একটা কাণা স্বামী ছিল। একদা রাণো স্বীয় বনিতার নিকট হইতে অদৃশ্য হওয়াতে বিরহবিধুরা পত্নী রাজার নিকট যাইয়া স্বীয় মনোবেদনা জ্ঞাপন করে। তখন নৃপতি এইরূপে রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, অনহলপুরে রাণো নামে যে কোন কাণা ব্যক্তি থাকিবে, সে প্রধান বিচারালয়ে শীঘ্র উপস্থিত হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, অল্পদিনের মধ্যেই সেইরূপ ৯৯৯ জন ব্যক্তি উপস্থিত হইল। দুঃখিতা রমণী সেই বিশাল শ্রেণীর সম্মুখ দিয়া দেখিতে দেখিতে গমন করিল, কিন্তু নিজ স্বামীকে পাইল না। রাজা দ্বিতীয়বার ঘোষণা করাতে সেই নিরুদ্দেশ রাণো আসিয়া উপস্থিত হইল।

ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পার্শ্বনাথের মন্দির স্থাপন করিলেন। এই ব্যাপার সম্বৎ ৮০২ অব্দে সংঘটিত হয়।"

অনহলপুর কি এক দিনে বা এক মাসে অথবা এক বৎসরে এরূপ উচ্চ গৌরব ও সমৃদ্ধির সোপানে উথিত হইয়াছিল? অথবা কবি স্বচক্ষে নগরের যেরূপ চিত্র দেখিয়াছিলেন, তাহাই চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন? বিচার করিয়া দেখিতে গেলে শেষোক্ত অনুমানকেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কর্ণেল টড সাহেব বলেন, "সেই সকল বিপ্লব পীড়িত প্রদেশে নবপ্রতিষ্ঠিত নগরের বসতি স্থাপনে অসীম সুযোগ থাকিলেও ইহা কখনও সম্ভবনীয় বলিয়া বোধ হয় না যে, কবি অনহলপুরের যে গৌরব ও সমৃদ্ধিশালীতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা একটী মাত্র রাজার শাসনকালেই অঙ্কিত হইয়াছিল। তবে আচার্য্য যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা যদি যথার্থই হয়, তাহা হইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, পলায়িত সৌর রাজকুমার স্বীয় পিতৃপুরুষদিগের রাজপাট দেবপত্তন হইতে অনহলপুরে অন্তরিত করিয়াছিলেন এবং আমরা প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদন করিতে পারি যে, বিধ্বস্ত বল্লভীপুরের বিচ্ছিন্ন প্রজাকুল বাল্লিকবায়দিগের নবপ্রতিষ্ঠিত নগরের লোকপূর্ণতা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে নানা দিগ্দেশ হইতে তন্নগরে আগমন করিয়াছিল। ‡" মহাত্মা টড সাহেবের এই অনুমান অনেকাংশে যুক্তিসিদ্ধ ও সমীচিন বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা হউক এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

এই নবপ্রতিষ্ঠিত নগরে সৌর রাজকুমার বনরাজ অভিষিক্ত হইলেন। শ্রীদেবী তাঁহার ললাটে রাজতিলক অর্পণ করিলেন। অনন্তর বনরাজ জাম্বকে স্বীয় মন্ত্রিত্বে অভিষেক করিয়া আচার্য্য শিলগণ সূরির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। আচার্য্য তাঁহার শৈশবের রক্ষক; আজিও তাঁহার জননী তদীয় আবাসে অবস্থিতি করিয়া কঠোর ব্রতপালনে নিযুক্তা রহিয়াছেন। সেই জৈন যতী তাঁহার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা বনরাজ এজীবনে ভুলিতে পারিবেন না। যথোচিত সম্মান ও যত্ন সহকারে তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের পূজিত জিনবিগ্রহকে অনহলপুরে আনয়ন করিলেন। অচিরে তথায় একটী মন্দির স্থাপিত হইল; ভগবান জিনদেব তন্মধ্যে পঞ্চাস্র পার্শ্বনাথ নামে অভিষিক্ত হইলেন। বনরাজ স্বয়ং কোন্ ধর্ম্ম অনুসরণ করিতেন, তাহা অভ্রান্তরূপে নিরূপণ করা কঠিন। রত্নমালা গ্রন্থে তিনি "দেবানুরাগী" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কবি তাঁহাকে কামজিৎ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। পত্তনের স্থানে স্থানে আজিও উমা মহেশ্বর ও গণপতির পাষাণপ্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; তৎসমুদায়ের সহিত যে সমস্ত শিলালিপি সম্বদ্ধ আছে, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতে পারে যে, অনহলবারা স্থাপনের সহিত তৎসমুদায় দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বোধ হয়, প্রথম বনরাজা

‡ Tod's *Western India.* p p. 155—156

ধর্ম্মসম্বন্ধে অতিশয় উদার ছিলেন; সেই জন্য শৈব হইয়াও কৃতজ্ঞতা ও মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে তীর্থঙ্করদিগকে উৎসাহিত করিতে ত্রুটি করেন নাই।

বনরাজের জীবননাট্য এই স্থানেই পরিসমাপ্ত হইল; কোন ভট্টগ্রন্থেই তাঁহার অন্তিম জীবন সম্বন্ধে কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। তিনি ৬৯৬ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং অনহলপুরে ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৮০৬ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। *

বনরাজের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র যোগরাজ অনহলপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। রাসাগ্রন্থে যোগরাজ সম্বন্ধে অতি অল্প বিবরণই পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সামান্য বৃত্তান্তের ভিতরেই তাঁহার যোগ্যতা ও রাজনীতিজ্ঞতার স্পষ্ট নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। যুদ্ধকার্য্যে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল, তিনি অতীব সাহিত্যনিপুণ ও শাস্ত্রজ্ঞ। বর্ণিত আছে, যোগরাজ একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তৎরচিত গ্রন্থ তদীয় জীবনচরিতাখ্যায়কদিগের সময়ে বর্ত্তমান ছিল, দুঃখের বিষয়, সে পুস্তকের প্রকৃতিবিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

ভট্টগ্রন্থে যোগরাজের রাজত্বের একটী বৃত্তান্ত লিখিত পাওয়া যায়। কথিত আছে, তাঁহার রাজত্বকালে সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত পত্তনবন্দরে কতকগুলি বিদেশীয় অর্ণবপোত আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সমস্ত জাহাজ বহুমূল্য বাণিজ্যদ্রব্যে পরিপূরিত ছিল। বণিকগণ কোথা হইতে আসিয়াছিল এবং কোথায় বা যাইতেছিল, তাহার কোন বিবরণই কুত্রাপি বর্ণিত নাই। দেবপত্তনে সেই সমস্ত জাহাজ উপনীত হইল, যোগরাজের পুত্র যুবরাজ ক্ষেমরাজ স্বীয় ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তৎসমুদায়ের সমস্ত দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। এই দুরাচরণের, আতিথেয়তার এই শোচনীয় ব্যভিচারের সমাচার অচিরে রাজসন্নিধানে বাহিত হইল। তৎশ্রবণে যোগরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় পুত্রত্রয়কে যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি চিরজীবন যে যশ অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তৎসমস্তই তোমরা নষ্ট করিলে। হা মূঢ় পুত্রগণ! তোরা কি করিলি। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বুধগণ ভারতীয় আর্য্য

* "রত্নমালা" লেখকের মতে বনরাজ ৬৯৬ খ্রীঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উইলফোর্ড সাহেব ঐ মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত "আইন আকবরী" সাহায্য গ্রহণ করিয়া বলেন, বনরাজ ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ৭৪৬ খ্রী. অব্দে নেহরবালা (অনহলবারা) স্থাপন করেন, সুতরাং ৬৯৬ খ্রী অব্দই তাঁহার জন্ম বৎসর। "প্রবন্ধ চিন্তামণি" গ্রন্থে লিখিত আছে বনরাজ ৭৪৬ খ্রী অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ৬০ বৎসর অর্থাৎ ৮০৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদি উইলফোর্ড সাহেবের মত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, বনরাজ ১১০ বৎসর জীবিত ছিলেন। কর্ণেল টডের মতে তিনি ৭৪৬ খ্রী. অব্দে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং পঞ্চাশ বৎসর শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পরলোকগত হয়েন। তবে কি তিনি দশ বৎসর বয়সে অনহলবারা স্থাপন করিয়াছিলেন? এই সকল বিসম্বাদী মতের সামঞ্জস্য করিয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করা বড় কঠিন।

নরপতিগণের চরিত্র আলোচনা করিতে করিতে বলিয়া আসিয়াছেন যে, গুর্জ্জরের রাজকুল চোরের রাজা। পূর্ব্বপুরুষগণের এই কলঙ্ক আমি অপনয়ন করিয়াছি, মনে করিয়াছিলাম; সেই জন্য বিস্তর ভরসা ছিল যে, আমি যথার্থ নৃপতিকুলের আসনে স্থান পাইব; কিন্তু, হায়, তোরা আমার সমস্ত উদ্যম, সকল যত্ন ব্যর্থ করিলি, আমার সকল আশার মূলে কুঠারাঘাত করিলি; আজি তোদের দুর্ব্বৃত্ততায় সেই বিলীয়মান কলঙ্ক আবার গোরতর হইয়া উঠিল।" যোগরাজ দীর্ঘজীবন সম্ভোগ করিয়াছিলেন। ৩৫ বৎসর রাজ্যশাসনের পর তিনি চিতানলে তনুত্যাগ করেন *।

যোগরাজের উত্তরাধিকারিগণ সম্বন্ধে ভট্টগ্রন্থ সমূহে অতি অল্প বিবরণই পাওয়া যায়; তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেমরাজ অনহলবারার সিংহাসনে আরূঢ় হয়েন। ক্ষেমরাজের প্রকৃতি অতিশয় উগ্র ও তেজস্বিনী; সেরূপ প্রচণ্ডস্বভাব হইয়া তিনি যে, সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাজ্যশাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা কখনও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তৎকর্তৃক রাজ্যের সীমা ও সমৃদ্ধিতা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পঞ্চবিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া ক্ষেমরাজ ৮৬৬ খৃঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

ক্ষেমরাজের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র শ্রীভূয়দ অনহলপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া ৮৯৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সগৌরবে ও শান্তিসহকারে অতিবাহিত হইয়াছিল; কোন শত্রুই সেই শান্তি ও গৌরব নাশ করিতে চেষ্টা করে নাই। তাঁহার মৃত্যুতে তদীয় পুত্র বৈরসিংহ তৎসিংহাসনে আসীন হয়েন।

* চিতোরের অধিপতি খোমান রাজা এই যোগরাজের সমকালিক। রাজস্থানে (১ম খণ্ড ১০৮ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে যে ম্লেচ্ছগণ কর্তৃক চিতোরপুরী আক্রান্ত হইলে যে সকল হিন্দু-নরপতি মহারাজ খোমানের সাহায্যার্থে তদীয় রাজধানীতে উপনীত হইয়াছিলেন, পত্তন হইতে আগত সোলঙ্কীর বাহ্বধর তাঁহাদিগের অন্যতম। বোধ হয়, যোগরাজ স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন প্রতিনিধি চিতোর রক্ষার্থে সেই ভীষণ বিপ্লবে অগ্রধাবণ করিয়াছিলেন।

অমৃত কি বিষ?

কোথায় সে?

যাহাকে ভালবাসি সে দূরে—গিযাছে, আব আসিবে না। সূর্য্য যায, চন্দ্র যায, আবার আসে; বসন্ত যায়, মলয় পবন যায়, আবার ফিরে; কিন্তু আমার যাহা গিয়াছে, তাহা চিবদিনের জন্য গিযাছে আর ফিরিবে না। কালচক্র অবিশ্রাম-গতি। তুমি ক্ষুদ্র, তুমি মহৎ, তুমি রুগ্ন, তুমি শোকার্ত্ত, তাহাতে কাল চক্রের কি? সে যেমন যাইতেছিল তেমন চলিবে, সে চক্রে তুমি আমি পিষ্ট হই'ত চক্রেব কি? তুমি ক্ষুদ্র হও আর মহৎই হও সে সংসাবেব চক্ষে, কাল-চক্রের চক্ষে নয়। কালচক্র কাহারও জন্য ভাবে না কাহাকেও দেখে না। যে তেজীযান্ বীরপুরুষ ইউবোপখণ্ড করগত করিয়া বলিযাছিলেন, ইংলণ্ড ভস্মীভূত কবিব, তিনিও সে চক্রেব বশতা স্বীকার করিয়াছেন, যে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার কবিযাছিলেন তিনিও সে চক্রে পিষ্ট হইযাছেন, যে ধার্ম্মিকপ্রবব ধর্ম্ম বলে বলীযান্ হইয়া ইউরোপ হইতে পোপের আধিপত্য সমুন্মূলিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ইউরোপে বিষম বিপ্লব সংঘটিত করিয়াছিলেন তিনিও সে চক্রের গতি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কাহার কথা বলিব? রুমের সম্রাট হইতে ভারত-বর্ষের দার্শনিক পর্য্যন্ত, সেক্ষপির হইতে বাল্মীকি, বেদব্যাস পর্য্যন্ত, অর্জ্জুন হইতে নেপোলিয়ান পর্য্যন্ত সে চক্রের আধিপত্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তুমি আমি কোন ছার? শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে যিশু, বুদ্ধ, চৈতন্য সকলেই তাহার অধীন হইয়াছেন এ বিশাল সংসারের ক্ষুদ্রতম কীট আমি কে? তাহার পেষণে যে আমি পিষ্ট হইব, ইহা কোন ছার কথা?

এমন দিন ছিল যাহাকে ভাল-বাসিতাম তাহাকে দেখিতে পাইতাম। সহকারবিজড়িতা মাধবীবল্লবী দোলাইয়া বসন্ত পবন বহিয়া যাইত, সান্ধ্য গগনে তারকারাজি হাসিয়া হাসিয়া চাহিযা দেখিত—দেখিত আমরা দুইটী পুষ্প এক বৃন্তে ফুটিযা রহিযাছি। মনে ভাবিয়া-ছিলাম তেমনি করিয়া ক্ষুদ্র বীচিমালিনী কুলপরিপ্লাবিনী নির্ম্মল হৃদয়া নদীতীরে বসিয়া তৎপ্রতিবিম্বিত বৃক্ষশ্রেণী, আকা-শের অনন্ত বক্ষে তারকা রাজি, বসন্ত পবনবিধূত মাধবীবল্লরী দেখিতে দেখিতে এ জীবন কাটাইব কিন্তু কে জানিত যে সে একদা নিদাঘ ঝটিকায় ছিন্নবৃন্ত হইবে আর আমি এইরূপ তরঙ্গপ্রপীড়িত হইয়া কেবল সংসারসমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইব? হা নিয়ন্তা, মানবজীবনের কি এই পরিণাম? এই পরিদৃশ্যমান জগতে এমন কিছুই নাই যাহাতে এই সংসারসমুদ্রে পার পাওয়া যায়?

মন ত স্থির হয় না। জানি, জীবনের সুখস্বপ্ন, স্মৃতির সৌন্দর্য্য, আশার বিশ্বাস, হৃদয়ের ধন আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, আর তাহাকে পাইব না, তবুও ত মন বুঝে না। ভাবি—বহিশ্চক্ষু নিমীলিত করিয়া মনশ্চক্ষু উন্মীলিত করিয়া কেবল

ভাবি—দেখি——অনন্তবিস্তার উত্তাল তরঙ্গময় জলধি মধ্যে ক্ষুদ্র ভেলায় আমি একা ; যে দিকে দেখি—দেখি—পর্ব্বত-প্রমান উর্ম্মিচয় গর্জ্জন করিয়া সেই ক্ষুদ্র ভেলার দিকে আসিতেছে—কেবল নিলীমাময় সমুদ্রে বেষ্টিত—শিরঃপরি নীল সমুদ্র—চতুপার্শ্বে নীল সমুদ্র—বৃক্ষ-লতা পশুপক্ষী কিছুই দেখা যায় না—এই অনন্ত বিশাল অপার সাগরে আমি একা। জীবনের সঙ্গী নাই—পীড়ার চিকিৎসক নাই—আর্ত্তের সান্তনাকারক নাই—দুঃখের নিবারক নাই—অশান্তির দূরীকারক নাই—আছে ফেনময় লবনাক্ত বারিরাশি তৃষ্ণায় বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া প্রাণ বাহির হইযা যায়, আশায় মুগ্ধ হইয়া সে বারি পান কর, অচিরাৎ ফলভোগ করিতে হইবে। হাব হরি, এ সমুদ্রে কেন আসিলাম ?

সংসার খুঁজিয়া, যত্ন করিয়া, হৃদয় পিঞ্জরে একটী পাখি পুষিয়াছিলাম, চুরি করিয়া কে লইল রে ? হৃদয় অন্ধকারের আলোক, হৃদয় মরুভূমির সরসী, হৃদয় উদ্যানের স্বর্ণলতা, হৃদয় সরোবরের প্রস্ফুটিতা কমলিনী, হৃদয় আকাশের চন্দ্র কে লইল রে ? বিমল আলোকময় মৃদু হাসি, সেই অমৃতনিস্যন্দিনী দৃষ্টি পিযূষ-পূরিত বাক্যচয়, প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি যাহার ছিল তাহাকে কে লইল রে ? কত ভাল বাসিতাম—কত আদর করিতাম—জীবনের জীবন্ত আশ্বাস, অমল সোহাগ কে লইল রে ? আমায় বিষন্ন দেখিলে যে নয়নজলে ভাসিয়া যাইত, আমার দীর্ঘ নিশ্বাসে যে কাঁদিয়া ফেলিত, দুঃখের সে সুখ—দারিদ্রের সে শান্তনা—নিরাশার সে আনন্দ কে লইল রে ? সে গিয়াছে, আমি আর তাহার নই, আমি কেবল ভাবি—কি ভাবি তাহা বলিতে পারি না—দূরাগত বংশীর সঙ্গীত—অদ্ধ বিস্মৃত সুখ স্বপ্নের স্মৃতি—বাল্যের সে সুখ—গতজীবনের সে আনন্দ সকলই ওতপ্রোত দারুণ বেগে অন্তরে প্রবেশ করে। চিন্তা-প্লাবনে হৃদয় প্লাবিত হয় আর কিছুই মনে হয় না। লোকালয়ে আর যাইতে ইচ্ছা হয় না, ইচ্ছা হয় রাত্রিদিন এমনি করিয়া কেবল একাকী বসিয়া ভাবি। জানি না লোকসমাগম-বর্জ্জিত স্থানে থাকায় কি লাভ, কিন্তু অন্তরে একটু সুখ হয় জানি।

একবার সান্ধ্যগগনে স্বর্ণমেঘমালার ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া দেখিতে ইচ্ছা করে, বাল্যকালের সুখস্বপ্নময় দিন তখন মনে পড়ে। সুখশয্যায় শয়ন করিয়া শান্তি-ময় অন্তরে সুখের খেলায় বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়াছি। পিতা মাতার স্নেহ, ভ্রাতার অমূল্য ভালবাসা, বন্ধু-বর্গের প্রণয় তখন ছিল, গুরুজনের অতুল সোহাগ, শিক্ষকের ক্রীড়ামিশ্রিত উপদেশ, ভালবাসার মধুর জ্যোতিঃ তখন ছিল—যৌবনের উত্তপ্ত নিশ্বাস তখন অঙ্গ-স্পর্শ করে নাই—দিগ্দাহ ভীষণ দাবানল তখন দৃষ্ট হয় নাই। প্রীতির যাহা সুখ, আশার যাহা মমতা, বিশ্বাসের যাহা তৃপ্তি, মনের যাহা সৌন্দর্য্য, তাহা তখন ছিল—কুটীল প্রলোভনের ভীষণ নৈরাশ্য, দারুণ শোকের হৃদ্ভেদী সঙ্গীত তখন সহ্য করিতে হয় নাই। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই আশার ছলনা, প্রলোভনের ভীষণ নৈরাশ্য, দুঃখের বিষাদময়ী ছায়া, শোকের ধূমবহ্নিময়ী জ্বালা হৃদয় অধিকার করিয়াছে। কঙ্কালময় হাসি আর

হাসিতে পারি না। দুঃখবেগ স্তরে স্তরে ভেদ করিয়া হাসি ফুটিতে ফুটিতে মুখেই তাহা মিলাইয়া যায়, কাঁদিতে যাই কাঁদিতে পারি না। দুঃখ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া কণ্ঠরোধ করে, বুক চাপিয়া ধরে, হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শেল ফুটাইয়া দেয়। কাঁদিতে পারিলে শোকের অনেক লাঘব জন্মে—হতবিধি—এ অদৃষ্টে তাহাও নাই।

এই সময়ে একবার দেখিতে সাধ করে—সেই শান্তিময়ী মূর্ত্তি, সংসার কাননে যাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি, হৃদয়-দর্পণে যাহার প্রতিবিম্বটুকু অবশিষ্ট আছে, চন্দ্রকিরণশীতল পৃথিবীর মত—স্তোকনম্র পেলবলতিকার মত যাহার দর্শনমাত্রেই হৃদয়ে নিত্যনূতন আনন্দাবির্ভাব করিত—সেই মূর্ত্তি আর একবার দেখিতে বাসনা করে তাহা আশ্চর্য কি? গভীর নিশীথে যখন অন্ধকার গাঢ়কৃষ্ণ কেশজালে পৃথিবী ঢাকিয়া দিয়াছে, ইন্দ্রনীলোৎখচিতাস্তর চন্দ্রাতপের ন্যায় অনন্ত নক্ষত্রগ্রথিত অম্বরতল যখন কেবল অন্ধকারের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধিরই সহায়তা করে—প্রাণীজগৎ যখন সুপ্ত—নীরব—নিশ্চল—মৃতপ্রায়—ঝিল্লীরব ব্যতীত অন্যরব শ্রুতিগোচর হয় না—শব্দশূন্য—বর্ণশূন্য—বায়ুশূন্য জগতের ন্যায়, তরঙ্গহীন চাঞ্চল্যহীন সমুদ্রের ন্যায় অন্ধকারময়ী প্রকৃতি যখন সেই গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে সেই সময় সাধ করে তাহাকে একবার দেখিব—দেখিতে দেখিতে চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিবে, বাহ্যজগৎ ছাড়িয়া অন্তর্জগতে প্রবেশ করিবে জন প্রাণী নাই—কাহারও মুখে কথা নাই—জগদীশ, এ সাধ কি পুরিবে? এতদিন জ্ঞান উপার্জ্জনে মত্ত ছিলাম, প্রতিপন্ন হইবার আশা হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, বাঁচিবার সাধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল কিন্তু তখন জানি নাই—জ্ঞান কঠোর, আশা ছলনাময়ী, জীবনই এখন জানিয়াছি, প্রেম ভিন্ন জ্ঞান কিছুই নয়, ধৈর্য্যবিচ্যুত আশা মৃত্যুর কারণ—যতদিন আমাদের জীবন ততদিন মৃত্যু, যে দিন মৃত্যু সে দিন নিষ্কৃতি।

কেন ভালবাসি?—তাহার রূপ দেখিয়া? কই, তাহার রূপে জগৎ সংসার ত মুগ্ধ হয় না—কই, সে নয়নে চকিতহরিণীর দৃষ্টি নাই—বদনে স্বর্গালোকের জ্যোতি নাই—অবেণীসম্বদ্ধ আলুলায়িত কেশদামাবৃত বদনমণ্ডলে বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত নাই—গঠনে অনিন্দ্য পারিপাট্য নাই—চরণে কোটি শশীর সমন্বয় নাই—তবে কেন তাহায় ভালবাসি? জানি না তাহাতে কি আছে। তাহার যাহা আছে তাহা কামে নাই, রতিতে নাই, বিশ্বাসে নাই, তৃপ্তিতে নাই যাহা জ্ঞাত তাহার কোন পদার্থে নাই—তাহা যেন অসাংসারিক, অপার্থিব, স্বর্গীয় আমি আজ জ্বলিতেছি আমি একদা সেই অপার্থিব স্বর্গীয় রত্ন দেখিয়াছি, এক দিনও তাহার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া কথা কহিয়াছি—নীরব কথা কহিতে কহিতে তন্ময় হইয়া সেই নীরব বাক্য-সমুদ্রে আত্ম ডুবাইয়া দিয়াছি—তাহার সহিত অলিন্দে উপবিষ্ট হইয়া চন্দ্রকিরণে স্নাত বৃক্ষ লতা গুল্ম নদী সরিৎ প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সেই সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া গিয়াছি—আমি যাহা ভালবাসি তাহা আমার ভালবাসার ধনকে দেখাইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি বলিয়া আজ আমি

কাঁদিতেছি, জ্বলিতেছি। আমি যাহা করি তাহা যদি সে ভাল না বাসিত, আমার ভালবাসার প্রতিদানে সে যদি তাচ্ছীল্য দিত, আমার সহিত যদি তাহার আশার সমতা না থাকিত, তাহা হইলে আজ এত জ্বলিতে হইত না। কিন্তু কেন ভালবাসি ? তাহার গুণও ত ছিল না। সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা লেখা পড়াই সে ভালবাসিত, আর কিছুই করিতে পারিত না কিন্তু তাহাতেও সে বিশেষ নিপুণা ছিল না। তাহার লিপিতে লজ্জাশীল কবির মত অর্দ্ধস্ফুট অথচ মধুর বাক্যচয় দেখা যাইত না—ভাস্বর তেজোময় সূর্য্যের মত অন্যকে সে তেজে আলোকিত করিত না—তাহাতে জয়দেবের পদলালিত্য থাকিত না—রঘুনাথের ন্যায়শাস্ত্র থাকিত না—কালিদাসের কবিত্ব থাকিত না - কত ব্যাকরণ দোষ হইত, কত ভ্রমপ্রমাদ ঘটিত কিন্তু তবুও যেন তাহাতে কি আছে তাহা আর ভুলিতে পারিতেছি না।

তোমরা জগৎসংসারের জ্ঞানী, বিদ্বান, কবি, তোমরা কেহ জান, কেহ শুনিয়াছ স্ফুটনোন্মুখ কলিকা ঝরিয়া পড়ে, গগনস্পর্শী তরুরাজিবেষ্টিত চারাগাছে বজ্রাঘাত হয় ? কিন্তু তাহা হইয়াছে, প্রবলপ্রধাবিত নিদাঘঝটিকা স্ফুটনোন্মুখ কলিকা ছিন্নবৃন্ত করিয়াছে, বজ্রপতনসময়ে কাল তরুগুলিকে দূরে রাখিয়া চারাগাছটী বিনষ্ট করিয়াছে। কি বলিব ? ইহা কি করুণাময়ের করুণাবারি না নিষ্ঠুরের নিষ্ঠুরতা ?

যখন ভালবাসিয়াছিলাম তখন বুঝিতে পারি নাই কি করিতেছি—ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া হৃদয়ে কি বিষম আধেয় সঞ্চয় করিতেছি। স্নেহের দাস হইয়া আত্মহারা হইয়া যখন কার্য্য করি তখন বুঝিতে পারি না স্মৃতির দংশন আছে, আশার ছলনা আছে, প্রলোভনের নৈরাশ্য আছে ; বুঝিতে পারি না স্নেহের খরস্রোতেও প্রতি ধমনীতে উষ্ণশোণিত প্রবাহিত হয়, দেহে জ্বরদাহের সন্তাপ জন্মাইতে পারে ; স্মরণ থাকে না যে আমি আমার নই, যে শক্তি এই বিশ্ব সংসার পরিচালিত করিতেছে, যে শক্তির কটাক্ষমাত্রে পর্ব্বত থাকে না, সাগর থাকে না, বন, উপবন, দেশ মহাদেশ, সকলেরই অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায়, যে শক্তির অপাঙ্গ দৃষ্টিতে জগৎসংসার জলবুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া যায় সেই শক্তির শক্তি আমার উপর কার্য্য করিতেছে। নহিলে, কই, তাহাকে পাইলাম না ত ! এত নির্য্যাতন, এত কষ্ট সহ্য করিলাম কই সে থাকিল না ত ! কই, এত ত্যাগস্বীকার করিলাম, এত খুঁজিলাম, তাহার দেখা পাইলাম না ত ! তবে কে বলে "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" ! তবে কি দৈবই বলবান্ ? যিনি "দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি" বলিয়াছিলেন তিনি যদি "যত্নে কৃতে ন সিদ্ধতি কোহত্র দোষঃ" না বলিতেন তবে আজ বলিতাম—তিনি ভ্রান্ত—সংসারকে সম্যক্ বিচার করেন নাই। বিশ্বরচনায় এমন একটা অদৃশ্য শক্তি আছে যে মনুষ্য যত চেষ্টা, যত যত্ন করুক না কেন, কর্ম্ম করিতে করিতে জীবনপাত করুক না কেন, সে সমুদয়ই ব্যর্থ করিয়া দিবে, তাহার বাসনাতিরিক্ত একপদও অগ্রসর হইতে দিবে না।

তবে কি সুধু কাঁদাইবার জন্যই ভালবাসার সৃষ্টি? কয়জন যৌবনে বিকার বিহীন অন্তরে সুখের আশা করিতে পারে? কয়জনকে বাল্যস্মৃতি দগ্ধ না করে? কয়জন সংসারে ভালবাসার বস্তু হারায় নাই? কয়জন অব্যথিত অন্তরে অশঙ্কিত হৃদয়ে ভালবাসার ধন বুকে রাখিতে পাইয়া সংসার সাগরে পার পাইয়াছে। বাঁচিয়া থাকিলে আবার বন্ধু মিলে, আবার ভালবাসার অভিনয় হয়, কিন্তু যাহা যায় তাহা আর হয় কি? প্রথম যেমন ভালবাসিয়াছিলাম তেমন বাসা আর যায় কি? ভালবাসার নাম শুনিলে অগ্নিদর্শনে দাবদগ্ধ কুরঙ্গের মত মন ব্যাকুল হইয়া উঠে না কি? কেন বিধাতা এমন সৃজন করিয়াছিলে? তুমি ইচ্ছাময়—ইচ্ছা করিলে সবই ত পারিতে তবে কর নাই কেন। ভাল জিনিষের মত মন্দ জিনিষেরও ব্যবহার আছে মানি। ভালবাসা নামে যে ছলনা বুঝে, প্রণয় অর্থে বিশ্বাসঘাতকতা বুঝে, প্রেম অর্থে আত্মপ্রতারণা জানে, তাহাকে দুঃখ দাও, প্রভু, কিন্তু যে ভালকে ভাল বলিয়াই গ্রহণ করে—ভালবাসা অর্থে আত্মবিসর্জ্জন বুঝে, প্রণয় অর্থে তোমার নিরপেক্ষতা বুঝে, প্রেম অর্থে মিলন বুঝে সে কেন দুঃখ পায়? স্বার্থ ত্যাগ করিয়াই হউক বা স্বার্থমগ্ন হইয়াই হউক যদি স্বভাবতঃই তাহাতে জ্বলিতে হইল তবে তাহাকে মঙ্গলকর কেমন করিয়া বলিব? স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, অগ্নিতে হাত দিলে হাত পুড়িবে, তবে কেমন করিয়া বলি ভালবাসার মঙ্গলের এক কণা আছে?

এ ক্রন্দনের পরিণাম কি? এ দুঃখের অন্তরালে কি আছে? বাষ্পের পরিণাম জল, জলের পরিণাম এই পৃথিবী, এ ক্রন্দনের পরিণাম কি? এ দুঃখের পরিণতি কোথায়? এ দুঃখের পরিণাম দুঃখ—এ ক্রন্দনের পরিণাম ক্রন্দন। সে গিয়াছে তাহাকে আর পাইব না তবে কি জন্য কাঁদিব? তাহার সঙ্গে আমার এমন কি সম্বন্ধ যে তাহার বিরহে আমায় শুধু কাঁদিতেই হইবে? জন্মিবার সময় একাকী জন্মিয়াছি, যাইবার সময় পরের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতে হইবে! কেন আমার সুখদুঃখ পরের উপর নির্ভর করে? সৃষ্টির মহান্ বস্তু জড়জগতের পূর্ণ অভিব্যক্তি আত্মবান্ আমি আপনা-আপনি সুখী নই কেন? কেন আমি পরের জন্য কাঁদি।

হা ঈশ্বর, আর পাইব না কি! যাহার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া ক্লান্তি শ্রান্তি উপশান্ত করিতাম তাহাকে আর পাইব না কি?

সেই অপরিমিত ভালবাসা—সেই সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিমতী ছায়া যখন মনে পড়ে তখন বক্ষঃস্থল কম্পিত করিয়া, গৃহাঙ্গন ধ্বনিত করিয়া উচ্চৈঃ শব্দ হয়—কোথায় সে? প্রতিধ্বনিও নিরাশ-গম্ভীরস্বরে উত্তর করে "কোথায় সে"।

আয়ুর্ব্বেদ।

প্রমেহ চিকিৎসা।

ভারতবর্ষে আজ কাল সমুদায় রোগেরই আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে আবার প্রমেহ প্রভৃতি পীড়ার প্রসার অত্যন্ত অধিক। যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে আজ কাল এই প্রমেহ প্রায় অধিকাংশ লোককে আক্রমণ করিতেছে ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছে, সুতরাং অত্যাবশ্যক বিধায় আজ আমারা ইহার বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

> আস্যাসুখং স্বপ্নসুখং দধীনি,
> গ্রাম্যৌদকানূপরসাঃ পয়াংসি।
> নবান্নপানং গুড়বৈকৃতঞ্চ
> প্রমেহহেতুঃ কফকৃচ্চ সর্ব্বম্॥

সর্ব্বদা সুখকর সুকোমল আসনে নিশ্চেষ্টভাবে উপবেশন, সুকোমল শয্যায় নিরন্তর নিদ্রা যাওয়া, দধি, ছাগাদি গ্রাম্য পশু, মৎস্যাদি জলচর জন্তু ও বরাহাদি আনূপ মাংস রসের অতি সেবন অধিক পরিমাণ দুগ্ধ সেবন, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, নূতন পানীয়, শর্করা প্রভৃতি গুড় বিকৃতি সমুৎপন্ন বস্তু সমুদায় এবং কফ প্রকোপ জনক দ্রব্য সেবন এই কয়েকটী প্রমেহ রোগের নিদান অর্থাৎ এই সমুদায় কারণে প্রমেহ পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রমেহ হইতেও ভয়ানক শুক্রমেহরূপ একটা পীড়া বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই পীড়াটী যৌবনের পূর্ণ বিকাশের পূর্ব্বেও দুই একটা বালকের হইতে দেখা যায়। বোধ হয় ইহার নিদান জানিতে কাহারও কষ্ট হইবে না, বালকগণ, যেমন যৌবনের অঙ্কুর দেখা দেয়, অমনি অস্বাভাবিক সভ্য অত্যাচারে লিপ্ত হয়। সকল কার্য্যেই গুরুর উপদেশ আবশ্যক। ইহাতেও সুতরাং গুরু আছে। অপেক্ষাকৃত বয়োধিক অসচ্চরিত্র বালকগণই ইহার উপদেষ্টা। শুক্র মেহের লক্ষণ ও চিকিৎসা ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইবে। আপাততঃ প্রমেহ পীড়ার সম্প্রাপ্তি বলা যাইতেছে।

> মেদশ্চ মাংসঞ্চ শরীরজঞ্চ
> ক্লেদং কফো বস্তিগতঃ প্রদূষ্য।
> করোতি মেহান্ সমুদীর্ণমুষ্ণৈ
> স্তানেব পিত্তং পরিদূষ্য চাপি॥
> ক্ষীণেষু দোষেষ্বপকৃষ্য ধাতুন্
> সংদূষ্য মেহান্ কুরুতেহনিলশ্চ।

সর্ব্বাগ্রে কফজনিত মেহের সম্প্রাপ্তি বলা হইয়াছে, কারণ কফজ মেহই সমধিক ও সাধ্য। বস্তিদেশগত কফ, মেদঃ, মাংস ও শরীরজ ক্লেদ পদার্থকে দূষিত করিয়া মেহ উৎপাদন করে, ইহারই নাম কফজ মেহ। এইরূপ উষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণস্পর্শ দ্রব্য দ্বারা প্রকুপিত পিত্ত উল্লিখিত মেদঃ প্রভৃতিকে দূষিত করিয়া পৈত্তিক মেহ জন্মায় এবং কফ ও পিত্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলে প্রকুপিত বায়ু, বসা মজ্জা, ওজঃ ও লসীকা নামক ধাতু সকলকে

বস্তিমুখে আকর্ষণ পূর্ব্বক বাতিক মেহ উৎপাদন করে।

> সাধ্যাঃ কফোত্থা দশ পিত্তজাঃ ষট
> যাপ্যা ন সাধ্যঃ পবনাচ্চতুষ্ক।
> সমক্রিয়ত্বা বিষম ক্রিয়ত্বাৎ
> মহাত্যয়ত্বাচ্চ যথাক্রমং তে॥

কফজ দশ প্রকার মেহ সাধ্য, পিত্তজ ছয় প্রকার যাপ্য এবং বাতজ চারি প্রকার মেহ অসাধ্য। দোষ ও দূষ্য উভয়ের নিবৃত্তির চেষ্টাই চিকিৎসার রীতি। কফজ মেহে দোষ কফ এবং মেদ প্রভৃতি দূষ্য। মেদঃ প্রভৃতি দূষ্য পদার্থ সকল কফের সমপ্রকৃতি, সুতরাং কফের ও মেদঃ প্রভৃতির দমনকারক পদার্থ এক, অর্থাৎ কটু তিক্তাদি দ্রব্য দ্বারা দোষ ও দূষ্য উভয়েরই শমতা হয়। ইহারই নাম সমক্রিয়ত্ব। এইরূপ সমক্রিয়ত্ব হেতু কফজ মেহ সাধ্য। পিত্তজ ষট্ প্রকার মেহে দোষ পিত্ত এবং মেদঃ প্রভৃতি দূষ্য। যাহা দ্বারা পিত্তের শান্তি হয়, তাহা দ্বারা মেদঃ প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়, আবার মেদঃ প্রভৃতির শান্তিকারক দ্রব্যে পিত্তের প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। অতএব পৈত্তিক মেহে এমন কোন ক্রিয়া হইতে পারে না, যদ্দ্বারা দোষ ও দূষ্য উভয়েরই শান্তি হয়, অর্থাৎ মধুরাদি যে পদার্থ পিত্তহর, উহা মেদোবর্দ্ধক এবং কটুকাদি যে সমুদায় পদার্থ মেদোহর, তাহারা আবার পিত্তবর্দ্ধক। সুতরাং এই বিষম ক্রিয়ত্ব হেতু পৈত্তিক মেহ যাপ্য। বায়ুজনিত চারি প্রকার মেহ মহাত্যয় হেতু অসাধ্য অর্থাৎ বায়ু মজ্জাদি গম্ভীর ধাত্বাশ্রয়ী, বহু বিপত্তিজনক ও আশু অনিষ্টকর বিধায় কোনরূপ ঔষধেই ইহার প্রতিকার হয় না, সুতরাং বাতজ মেহ অসাধ্য।

> কফঃ সপিত্তঃ পবনশ্চ দোষা-
> মেদোহস্রশুক্রাম্বুবসালসীকাঃ।
> মজ্জারসৌজঃ পিশিতঞ্চ দূষ্যাঃ
> প্রমেহিনাং বিংশতিরেব মেহাঃ॥

সর্ব্ব প্রকার প্রমেহেই বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষ এবং মেদঃ, রক্ত, শুক্র, দৈহিক জল, বসা (মাংসস্নেহ), লসীকা (মাংস ও ত্বকের অভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থ), মজ্জা (অস্থিমধ্যগত স্নেহ), রস (আমরস), ওজঃ (সমস্ত ধাতুর সার পদার্থ অর্থাৎ যে পদার্থ থাকাতে মনে সাহস ও উৎসাহাদি জন্মে) ও মাংস এই সমুদায় দূষ্য অর্থাৎ উপরোক্ত বাত, পিত্ত ও কফ নিম্নোক্ত মেদঃ প্রভৃতি ধাতুকে মেহরোগে দূষিত করে। কফজ মেহ দশ প্রকার, পিত্তজ ছয় প্রকার ও বাতজ চারি প্রকার, সমুদায়ে বিংশতি প্রকার প্রমেহ।

> দন্তাদীনাং মলাঢ্যত্বং প্রাগ্রূপং পাণিপাদয়োঃ।
> দাহশ্চিক্কণতা দেহে তৃট্ স্বাদ্বাস্যঞ্চ জায়তে॥

মেহরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে দন্ত ও নয়নাদিতে অধিক মলসঞ্চয়, হস্তপদাদির দাহ, দেহের চিক্কণতা, তৃষ্ণা ও মুখে মধুরাস্বাদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহাকে মেহের পূর্ব্বরূপ বলে।

> সামান্যং লক্ষণং তেষাং প্রভূতাবিলমূত্রতা।

মূত্রের পরিমাণাধিক্য ও আবিলতা (অপরিষ্কার) সমস্ত মেহেরই সাধারণ লক্ষণ।

> দোষদূষ্যাবিশেষেঽপি তৎসংযোগবিশেষতঃ।
> মূত্রবর্ণাদিভেদেন ভেদো মেহেষু কল্প্যতে॥

বাতজাদি সমস্ত মেহেতেই দোষ ও দূষ্য পদার্থ সমান। তথাপি মেহরোগ বিংশতি প্রকার, কারণ—যেমন শ্বেত,

পীত, লোহিত, কৃষ্ণ ও শ্যাব এই কয়েকটী বর্ণের ন্যূনাধিক্য ও মিশ্রণবিশেষে নানাবিধ বর্ণ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ দোষ ও দূষ্য পদার্থ সকলের প্রভেদ না থাকিলেও উহাদের ন্যূনাধিক্য ও সংযোগবিশেষে মূত্রাদির পার্থক্য ঘটিয়া থাকে এবং সেই মূত্রাদির ভেদ অনুসারে প্রমেহের বিংশতি প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। অতঃপর প্রত্যেকের পৃথক্ লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈর্ম্মেহ ও লালামেহ এই দশটী কফজ।

১। যে মেহে মূত্র স্বচ্ছ, বহুপরিমিত, শ্বেতবর্ণ, শীতল, গন্ধহীন, জলতুল্য কিঞ্চিৎ আবিল (ঘোলাটে) ও পিচ্ছিল হয়, তাহার নাম উদকমেহ।

২। ইক্ষুমেহে মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় অতিশয় মিষ্টাস্বাদ হয়। প্রস্রাব করার কিছু পরে যদি উহাতে পিপীলিকাদির সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়, তবে স্থির করিতে হইবে যে প্রস্রাবের আস্বাদ মিষ্ট ও ইহা ইক্ষুমেহ।

৩। সান্দ্রমেহে নিঃসৃত মূত্র কিয়ৎক্ষণ পরে অথবা তৎপর দিন ঘনীভূত দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। সুরামেহে পরিত্যক্ত মূত্র সুরার ন্যায় এবং উপরিভাগে স্বচ্ছ ও নিম্নভাগে ঘন হয়।

৫। প্রস্রাব করিবার সময় শরীর যদি রোমাঞ্চিত হয় এবং মূত্র যদি পিটুলিগোলার ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও পরিমাণে অধিক হয়, তবে তাহাকে পিষ্টমেহ বলে।

৬। শুক্রমেহে শুক্রসদৃশ বা শুক্রমিশ্রিত মূত্র নির্গত হয়। আজ কাল অপর একরূপ শুক্রমেহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বিষয় পরে লিখিত হইতেছে।

৭। সিকতা মেহে মূত্রমার্গ দিয়া কঠিন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকার ন্যায় মল (শুষ্ক কফ) নির্গত হয় ও মূত্র ত্যাগে বিশেষ কষ্ট বোধ হয়।

৮। যে মেহে শীতল, মধুরস্বাদ ও বহুপরিমাণ মূত্র নির্গত হয়, তাহার নাম শীতমেহ।

৯। শনৈর্ম্মেহে আস্তে আস্তে অল্প অল্প মূত্র নির্গত হয়।

১০। লালাযুক্ত, তন্তুবিশিষ্ট ও পিচ্ছিল মূত্র নির্গত হইলে তাহাকে লালামেহ বলা যায়।

পিত্তজনিত মেহ ছয় প্রকার যথা—ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হারিদ্রামেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ। ক্রমশঃ এই সমুদায়ের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

ক্ষার মেহে নিঃসৃত মূত্রের গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ ও স্পর্শ অবিকল ক্ষার জলের ন্যায়।

নীল মেহে মূত্র নীলবর্ণ ও কালমেহে মসীনিভ অর্থাৎ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হয়।

হারিদ্র মেহে, মূত্র হরিদ্রাবর্ণ ও কটুরস এবং প্রস্রাবকালে লিঙ্গনালিতে অতিশয় জ্বালা উপস্থিত হয়।

মাঞ্জিষ্ঠ মেহে মূত্র আমগন্ধযুক্ত ও মঞ্জিষ্ঠা ভিজান জলের ন্যায় লোহিতবর্ণ হয়।

রক্ত মেহে মূত্র আমগন্ধযুক্ত, উষ্ণ, লবণাস্বাদ ও রক্তবর্ণ হয়।

বসামেহ, মজ্জমেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তিমেহ এই চারিটী বাতজ। তন্মধ্যে যে মেহে বারংবার বসার ন্যায় মূত্র নির্গত

হয় তাহাকে বসা মেহ বলে। সুশ্রুত ইহাকে সর্পির্মেহ নামে অভিহিত করিয়াছেন। মজ্জমেহে মজ্জা সদৃশ কিম্বা মজ্জামিশ্রিত মূত্র নির্গত হয়। ক্ষৌদ্র মেহে মূত্র কষায়, মধুরাস্বাদ ও রুক্ষ হয়। চরক ইহাকে মধুমেহ নামে অভিহিত করিয়াছেন। হস্তিমেহ রোগীর নিরন্তর মত্তহস্তীর ন্যায় মূত্রধারা নিপতিত হয়। বেগ ব্যতীতই মূত্র নির্গত হয় এবং মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়, এইরূপ মেহের মূত্রে বসা মিশ্রিত থাকে।

ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক, অরুচি, বমি, নিদ্রা, কাস ও পীনস এই সমুদায় কফজ মেহের উপদ্রব। বস্তিদেশে লিঙ্গনালে সূচীবেধবৎ পীড়া, অণ্ডকোষের বিদীর্ণতা, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, আম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা ও অতিসার এইগুলি পৈত্তিক মেহের উপদ্রব। আর বাতজ মেহে উদাবর্ত্ত, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, আহারে অতিশয় লোভ, শূল, নিদ্রানাশ, শোষ, (যক্ষ্মা) কাস ও শ্বাস এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। বাতজাদি উল্লিখিত উপদ্রব ও সুশ্রুতোক্ত অন্যান্য উপদ্রব সকল প্রকাশ পাইলে এবং অধিক পরিমাণে ধাতুর সহিত মূত্র নির্গত ও বক্ষ্যমাণ শরাবিকাদি প্রমেহ পিড়কা সমূহ সবলভাবে উপস্থিত হইলে, রোগীর মৃত্যু নিশ্চয় জানিবে। প্রমেহ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তানের যদি প্রমেহ পীড়া জন্মে, তবে তাহাও অসাধ্য বলিয়া স্থির করিবে। কারণ উহা বীজকোষ সমুৎপন্ন, এইরূপ অন্যান্য যে সমুদায় পীড়া কুলজ অর্থাৎ পিতা, পিতামহ ও মাতা মাতামহাদি হইতে প্রাপ্ত, তৎসমুদায়ও অসাধ্য হইয়া থাকে।

সর্ব্বএব প্রমেহাস্তু কালেনাপ্রতিকারিণঃ।
মধুমেহত্ব মায়ান্তি তদসাধ্যা ভবন্তি হি॥

প্রতিকারে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকিলে সমস্ত মেহই কালে কালে মধুমেহরূপ ধারণ করে এবং অপ্রতিকার্য্য হইয়া পড়ে। মধুমেহ রোগে মূত্র মধুর ন্যায় হয়। ইহা দুই প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে। একরূপ, ধাতুক্ষয় হইলে বায়ু কুপিত হইয়া পীড়া উৎপাদন করে, অপর পিত্তাদি দোষ কর্তৃক মার্গরুদ্ধ হইয়া বায়ু প্রকুপিত হওয়াতে ইহার উৎপত্তি হয়। ধাতুক্ষয় হেতু প্রকুপিত বাতজনিত মধুমেহের রূপ কেবল বাতিক মেহের ন্যায় আর পিত্তাদি দোষাবৃত প্রকুপিত বাতজনিত মধুমেহে বায়ুর লক্ষণ ও পিত্তাদি যে দোষ দ্বারা বায়ু আবৃত মার্গ ও প্রকুপিত হইয়া মধুমেহ উৎপাদন করে তাহারও লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং এই মেহ সময়ে সময়ে অল্প ও পিত্তাদি দ্বারা আবৃত মার্গ হইয়া পুনরায় প্রবৃদ্ধ হয়, ইহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে। অচিকিৎসিত সমস্ত মেহেই মূত্র মধুর ন্যায় মধুরাস্বাদ ও দেহ মধুররস-ভূয়িষ্ঠ হয় বলিয়া উহাদিগকেও অনেককালের পর মধুমেহ বলা যাইতে পারে।

অতঃপর প্রমেহ রোগের চিকিৎসার বিষয় বলা যাইতেছে। প্রমেহ রোগীদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্থূল ও বলবান্ এবং কেহ কেহ দুর্ব্বল ও কৃশ দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং দোষের ও শরীরের বলাবল বিবেচনা করিয়া দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বৃংহণ (শরীরের পুষ্টিবর্দ্ধক) ও বলবান্ দোষ বহুল ব্যক্তিকে সংশোধন (দোষের শোধনকারক) ঔষধ প্রদান করিবে।

মেহরোগে গাঢ়রূপে রুক্ষ গাত্র মার্জ্জন, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ ও শ্লেষ্ম-পিত্ত নাশক ঔষধাদির বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রয়োগ হিতকর।

গুড়ূচীর রস ১ তোলা ও মধু অর্দ্ধ তোলা সেবন করিলে মেহের শান্তি হয়,' এইরূপ গুড়ূচীর পালো (চিনি) ও মধু সেবনেও মেহের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। দুই আনা হরিদ্রাচূর্ণ মধু ও আমলকীর রসের সহিত সেবনে এবং হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু ও মুতার ক্বাথ এবং হরিতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুতার ক্বাথ সেবনে মেহের নিবৃত্তি হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে জল মিশ্রিত কাঁচাদুগ্ধ সেবনে ও দুগ্ধের সহিত শতমূলীর রস সেবনে বিশেষ উপকার হয়। নিম্নোক্ত এই দুইটী যোগ দ্বারা প্রস্রাব পরিবার ও জ্বালা যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কচি শিমুল মূলের রস কাবাবচিনির সহিত সেবন করিলে শুক্র মেহে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। মেহরোগে বঙ্গেশ্বর, বৃহদ্ বঙ্গেশ্বর, সোমনাথ, বৃহৎ সোমনাথরস, তারকেশ্বর রস, পঞ্চানন রস, মেহকুলান্তক ও সোমেশ্বর রস, শুক্র মাতৃকাবটী, ইন্দ্রবটী, বসন্ত কুসুমাকর, বিড়ঙ্গাদি লৌহ, চন্দ্রপ্রভাদি বটিকা, দাড়িমাদ্য ঘৃত, কদল্যাদি ঘৃত, প্রমেহমিহির তৈল ও দেবদার্ব্বরিষ্ট প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা অনুসারে প্রযোজ্য। কুশাবলেহ একটী মেহ রোগের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

কুশাবলেহ—কুশ, কাশ, বেণা, কৃষ্ণেক্ষু ও খাগ্‌ড়া ইহাদের মূল প্রত্যেক ১০ পল অর্থাৎ ৮০ তোলা, পরিষ্কৃত ও কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে জ্বাল দিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে ও ইহাতে চিনি দুই সের গুলিয়া পুনর্ব্বার পাক করিয়া লেহবৎ হইলে নামাইয়া যষ্টিমধু, কাকুড় বীজ, কুষ্মাণ্ড বীজ, শসাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্গু প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কৃত ঘৃতভাণ্ড বা কাচপাত্রে সাবধান করিয়া রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা। অনুপান উষ্ণদুগ্ধ কিম্বা শীতল জল। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি যাবতীয় বস্তিগত রোগ প্রতিকৃত হয় এবং অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি দূর হয় ও শরীর বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হয়।

শিলাজতু প্রয়োগ—সালসার, (ধুনা) অজকর্ণ (পেয়াশাল) খদির, বাবলা, গাব, রক্তলোধ্র, ভূর্জপত্র, মেষশৃঙ্গী, তিনিশ বৃক্ষ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, শিশু, শিরীষ, আসনবৃক্ষ, ধাওয়া, অর্জ্জুন, তাল, সেগুন, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, সাল, অগুরু ও কালিয়াকাষ্ঠ ইহাদের ক্বাথে শিলাজতু ভাবনা দিয়া ইহাদেরই ক্বাথের সহিত উত্তমরূপ পেষণ করিয়া সেবন করিবে। সেবনের নিয়ম প্রতিদিন ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিয়া যখন দেখিবে সাড়ে বারসের সেবন করা হইয়াছে, তখন উক্ত ঔষধ সেবন ত্যাগ করিবে। অধুনা অগ্নি বল বিবেচনা করিয়া ।০ আনা হইতে সেবন আরম্ভ করিয়া ১ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিতে উপদেশ প্রদান করা হইয়া থাকে। ঔষধ জীর্ণ হইলে হরিণাদি জাঙ্গল মাংস

রসের সহিত অন্নাদি আহার করিবে। নিয়ম পূর্ব্বক ইহা সেবন করিলে শর্করা, অশ্মরী ও সমস্ত প্রকার মেহের প্রতিকার হয়, শরীর বলিপলিতাদি শূন্য, দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হয় এবং নিরাময় কলেবরে শতবর্ষ জীবিত থাকা যায়। আজ কাল ভারতের লোক সমুদায় অতিশয় অলস ও অব্যবসায় শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কোন একটী কার্য্য করিতে হইলে আপাত ফলের দিকে বিশেষ লক্ষ্য করেন, ভবিষ্যৎ ফলের দিকে কেহই দৃক্‌পাত করেন না। এই স্থলেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইব। উল্লিখিত রূপে শিলাজতু সেবনে বোধ হয় অনেকেরই প্রবৃত্তি হয় না। কারণ ইহাতে অর্থব্যয় অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও পরিশ্রম অধিক। তাই বলিতেছি যে, যে দ্রব্য সদৃশ উগ্রকারী শিলাজতু সেবনে শতবর্ষ পর্য্যন্ত সুস্থ দেহে যাপন করিতে পারা যায়, তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, আর অকিঞ্চিৎকর, অস্থায়িফল বঙ্গমন্য ঔষধ সমুদায় অহরহ সন্তুষ্ট চিত্তে আত্মাভিমানী ভারতসন্তানের সেবন করিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। সাবেক চাল চলন আর পছন্দ হয় না, সুতরাং থল নোড়া আর ভাল লাগেনা। অনুপান সংগ্রহ করিতে হইলেই আবার চক্ষুস্থির। শিশি হইতে ঢালিয়া খাইতে পারিলেই মহাসুখ। ভবিষ্যতে যে কি ফল দাঁড়াইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। এদেশের যদি এরূপ দুর্দ্দশাই না ঘটিবে, তবে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নিত্য রোগে কেন আমরা এত কষ্ট পাইতেছি? শুদ্ধ অপরিণামদর্শিতাই আমাদের রোগ ভোগের কারণ। মহামুনি চরক প্রজ্ঞাপরাধকে রোগের একটী কারণ বলিয়া গিয়াছেন। আমরাও প্রজ্ঞাপরাধের বিষয় সমীরণে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি। আমাদের নিয়ত রোগ ভোগের কারণ কেবল সেই অপরিণামদর্শিতারূপ প্রজ্ঞাপরাধ, অপর কিছুই নহে।

শুক্রমাতৃকা বটী - গোক্ষুর বীজ, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, রসোত, ধনিয়া, চই, জীরা, তালীশপত্র, সোহাগা ও দাড়িম বীজ প্রত্যেক ৪ তোলা, শোধিত গুগ্‌গুল ১ তোলা, পারদ, অভ্র, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক ৮ তোলা। সমুদায় একত্র করিয়া দাড়িমের রসে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি পরিমাণ বটী করিবে। দাড়িমের রস, ছাগদুগ্ধ অথবা শীতল জলানুপানে ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী রোগ বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ— বিড়ঙ্গ, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, মুতা, পিপুল, শুঁঠ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক সমভাগ সর্ব্বসমান লৌহ, একত্র জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা ৬ রতি। দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে প্রমেহ ও সর্ব্বপ্রকার মূত্র বিকার দূর হয়।

পঞ্চাননরস—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, বঙ্গ ৮ তোলা সমুদায় একত্র মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা শীতল জলের সহিত সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

প্রমেহ চন্দ্রকলা—রস সিন্দূর ১ ভাগ, অভ্র ১ ভাগ ও বঙ্গ ১ ভাগ এই সমুদায়

একত্র গুলঞ্চের রস ও শিমুল ছালের কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। কচি শিমুল মূলের রস বা অপর কোন উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবিত হইলে ইহাতে সমস্ত মেহই প্রতিকৃত হয়।

তারকেশ্বর রস—রস সিন্দূর, লৌহ, বঙ্গ ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগে মধুর সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান পাকা যজ্ঞডুমুর চূর্ণ ও মধু। ইহাতে সমস্ত প্রকার মেহ ও বহুমূত্র আরোগ্য হয়।

চন্দ্রপ্রভাদি গুড়িকা—সোমরাজী, বচ, মুতা, চিরাতা, দেবদারু, হরিদ্রা, আতইচ, দারুহরিদ্রা, পিপুল মূল, চিতা-মূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, তেজপত্র, গুড়-ত্বক্, এলাইচ ও বংশলোচন প্রত্যেক ১ তোলা। ধনে, ত্রিফলা, চই, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, সচল ও বিট্‌লবণ প্রত্যেক ১ তোলা। লৌহ ৪ তোলা, চিনি ৮ তোলা, শিলাজতু ১৬ তোলা গুগ্‌গুল ১৬ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মাড়িয়া ৬ রতি প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে প্রমেহ প্রভৃতি পীড়া আরোগ্য হয়। শুক্রতারল্য জন্ম স্বপ্নদোষ এবং শুক্রমেহে কাবাব চিনির গুড়া অনুপানে সেবনে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়।

বঙ্গেশ্বর রস—রসসিন্দূর ও বঙ্গ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধু দিয়া মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে। আমলকীর রস কিম্বা কাঁচাহলুদের রসের সহিত সেবন করিলে অত্যন্ত দাহযুক্ত মেহও আরোগ্য হয়।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বর রস—বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, কর্পূর ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেক ৷৷০ তোলা ক্ষুদ্র কেশুরের পাতার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে। অনুপান কেশুরে পাতার রস, ছাগদুগ্ধ অথবা গব্যদুগ্ধ ও মধু। ইহাতে বিংশতি প্রকার মেহ, ধাতুস্থ জ্বর, হলীমক, রক্ত-পিত্ত, গ্রহণী, আমদোষ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বহুমূত্র, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাতীসার নষ্ট হয়। কাঁচাহলুদের রস কিম্বা আম-লকীর রস ও মধুসহ সেবন করিলে জ্বালা যন্ত্রণাযুক্ত মেহে অতি সত্বর আশ্চর্য্যরূপ উপকার পাওয়া যায়। ইহা পুষ্টিবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক ও রুচিজনক এবং রসায়ন।

বৃহৎ সোমনাথ রস—পাণিয়া পত্র রসে শোধিত হিঙ্গুলোথিত পারদ এবং ইন্দ্রবারুণি পাতার রসে শোধিত গন্ধক সমানাংশে লইয়া কজ্জলী করিবে। এই কজ্জলী ১ তোলা ও ঘৃতকুমারীর রসে পুটিত লৌহ ২ তোলা, অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক এবং স্বর্ণ প্রত্যেক ৷৷০ তোলা। সমস্ত একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান মধু কিম্বা শিমূল মূলের রস ও মধু বা যজ্ঞডুমুরের রস ও মধু ইত্যাদি। ইহা সেবনে সোমরোগ, বিংশতি প্রকার মেহ, বহুমূত্র, মূত্রাতিসার, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত প্রভৃতি নষ্ট হয়। সোমনাথ রস একটী মেহরোগের অত্যুৎকৃষ্ট প্রচলিত ঔষধ।

বসন্তকুসুমাকর—স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, (রৌপ্যের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ কর্পূর ব্যবহার করেন) বঙ্গ, সীসা ও লৌহ প্রত্যেক ৩ ভাগ, অভ্র, প্রবাল ও

মুক্তা প্রত্যেক ৪ ভাগ। এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া যথাক্রমে গব্যদুগ্ধ. ইক্ষুরস, বাসক ছালের রস, লাক্ষার কাথ, বালার কাথ, কদলী মূলের রস, মোচার রস, পদ্মের রস, মালতী ফুলের রস বা কাথ ও মৃগনাভির কাথ এই সমুদায়ের প্রত্যেক দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ঘৃত, চিনি ও মধু। ইহা মেহরোগের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

বসন্তকুসুমাকর রস সেবনে বিংশতি প্রকার প্রমেহ, একাদশ প্রকার ক্ষয়, সাধ্যাসাধ্য সর্ব্বপ্রকার সোমরোগ ও বলি-পলিতাদি নষ্ট হয় এবং ইহাতে কান্তি, পুষ্টি, বীর্য্য, বল, স্মৃতি, আয়ু ও সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

প্রমেহমিহির তৈল—তিলতৈল ৪ সের কাথার্থ লাক্ষা ৮ সের জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, শতমূলীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের ও দধির মাত ১৬ সের। এই সমুদায়ের সহিত কাথ পাকোক্ত রীতি অনুসারে পাক সমাধা করিয়া কল্ক পাক করিবে। কল্কার্থ—শুল্‌ফা, দেবদারু মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, রেণুক, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না, গুড়ত্বক্, এলাইচ, বামনহাটী, চই, ধনে, ইন্দ্রযব, করঞ্জবীজ, অগুরু, তেজপত্র, ত্রিফলা, নালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মৌরী, বচ, জীরা, বেণারমূল, জায়ফল, বাসকছাল, ও তগরপাদুকা প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমস্ত কল্ক প্রদান করিয়া পাক শেষ করিবে ও গন্ধপাক সমাধা করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে জ্বর, প্রমেহ, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র, ও দাহ প্রভৃতি আরোগ্য হয়। অধিকাংশ পীড়ার জীর্ণাবস্থাতেই তৈল প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত সুতরাং ইহাও জীর্ণাবস্থায় অর্থাৎ যখন বায়ুর প্রকোপ অধিক বলিয়া লক্ষিত হয়, তখনই ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত।

লোধ্রাসব—লোধকাষ্ঠ, শটী, পুষ্কর-মূল, ছোট এলাচ, সূচীমুখী, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, যমানী, চই, প্রিয়ঙ্গু, সুপারি, গোরক্ষকর্কটী, চিরতা, কট্‌কী, বামনহাটী, তগরপাদুকা, চিতা, পিপুলমূল, কুড়, আতইচ, আকনাদি, ইন্দ্রযব, নাগকেশর, নখী. তেজপত্র, মরিচ ও কৈবর্ত্তমুস্তক প্রত্যেক ২ তোলা। সমুদায় একত্র করিয়া ৬৪ সের জল দ্বারা জ্বাল দিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ কাথে ৮ সের মধু দিয়া একত্র ঘৃতভাণ্ডে ১৫ দিন মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। এই লোধ্রাসব সেবনে কফপিত্তজনিত সমস্ত প্রমেহ, পাণ্ডু, অরুচি, গ্রহণী, কিলাস ও নানাবিধ কুষ্ঠের শান্তি হয়।

পূর্ব্বে যে শুক্রমেহের কথা বলা হইয়াছে, ইহা অবশ্যই প্রমেহের অন্তর্গত, কিন্তু তথাপি আমরা লক্ষণাদির পার্থক্য-বশতঃ ও সহজে অবগতির জন্য পৃথক্ প্রদর্শন করিতেছি। বালকগণ যৌবনা-রম্ভ হইতেই কুসংসর্গে পড়িয়া অস্বাভাবিক হস্তমৈথুনে প্রবৃত্ত হয়। এই অবৈধ হস্তমৈথুন এবং অপরিণত যৌবনে স্ত্রীসংসর্গ অথবা অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি কারণে দুষ্প্রতিকার্য্য শুক্রমেহ উপস্থিত হয়।

এই রোগে মলমূত্র ত্যাগের সময় সামান্য বেগ প্রদান করিলেই শুক্র নির্গত হইতে থাকে। শুক্রের ধারণাশক্তি

অতিশয় শিথিল হইয়া পড়ে। কামবেগ উপস্থিত হইবামাত্র এবং স্ত্রীলোকের স্পর্শন, দর্শন অথবা স্মরণ মাত্রেই শুক্র ক্ষরিত হইতে থাকে। শুনিতে পাওয়া যায়, কতগুলি লোকের পশু পক্ষী প্রভৃতির শৃঙ্গার দর্শনেও শুক্রচ্যুতি হয়। শুক্রতারল্যই এ সম্প্রদায়ের একমাত্র কারণ। শুক্রমেহীদিগের প্রায়শই স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে। পীড়া প্রবল হইলে লিঙ্গের শিথিলাবস্থাতেই শুক্রপাত হয়। স্বপ্নদোষ হইলেও জানিতে পারে না। এইরূপ অবস্থা ঘটিলেও যে মূঢ় ব্যক্তিগণ লজ্জা বা ভয় পরবশ হইয়া কোন উপায় চেষ্টা করে না পরন্তু গোপন করিয়া রাখিতেই চেষ্টা করে, তাহারা নিশ্চয়ই কালে কালে সর্ব্বসুখবিধ্বংসি ধ্বজভঙ্গ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠরোধ, শিরোঘূর্ণন, অজীর্ণ, অতীসার, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য, মানসিক চাঞ্চল্য, স্মৃতিশক্তির অল্পতা এবং নেত্র প্রান্তভাগে নীলিমোৎপত্তি এই সমুদায় শুক্রমেহের উপদ্রব।

শুক্রমেহে সর্ব্বাগ্রে শুক্ররক্ষা করিতে যত্ন করিবে এবং ধাতু-পুষ্টিকর অন্ন, পানীয় ও ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

মধুর সহিত আমলকীর রস পান করিলে শুক্রমেহের শান্তি হয়। গুলঞ্চের রসের সহিত বংশলোচন সেবন করিলে সত্বর শুক্রমেহের নিবৃত্তি হয়।

প্রত্যহ শিমুল মূলের রস ১।২ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে শুক্র মেহের প্রতিকার হয়। স্বপ্নদোষ নিবারণার্থ কাবাব চিনি চূর্ণ ৵০ আনা মাত্রায় প্রত্যহ শয়নের পূর্ব্বে মধু সহ সেবন করিবে। কর্পূর দুই রতি ও সিকি রতি অহিফেন একত্র মাড়িয়া শীতল জল সহ বৈকালে সেবন করিলে স্বপ্নদোষ নিবৃত্ত হয়। প্রাতে চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা ১টী শিমুল মূলের রস মধু ও সন্ধ্যায় মকরধ্বজ ১ রতি কাবাব চিনি চূর্ণ ৫ রতি ও মধুসহ সেবনে আশ্চর্য্যরূপ ফল পাওয়া যায়। শুক্রমেহে কামধেনু রস, শিলাজত্বাদি বটী, চন্দনাদি চূর্ণ, মাক্ষিকাদি চূর্ণ ও চন্দনাসব প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থেয়।

চন্দনাদি চূর্ণ—শ্বেতচন্দন, শিমুলমূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামলতা, মুতা, বেণার মূল, যষ্টিমধু, আমলা, সোনামুখী, বংশলোচন, বামনহাটী, দেবদারু ও হরিতকী প্রত্যেক সমভাগ। একত্র করিয়া সমষ্টির দ্বিগুণ লৌহ সহ মিশ্রিত ও মর্দ্দন করিবে। মাত্রা. ৬ হইতে ১০ রতি পর্য্যন্ত। অনুপান শীতল জল অথবা বিবেচনা পূর্ব্বক কোন শুক্রবর্দ্ধক পদার্থ ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে শুক্রমেহ ও প্রমেহাদি পীড়ার শান্তি হয়। আমারা অনেক স্থলে ইহার পরীক্ষা করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছি।

চন্দনাসব—শ্বেতচন্দন, বালা, মুতা, গাম্ভারী ফল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, আকনাদি, চিরাতা, বটছাল, অশ্বত্থছাল, শটী, ক্ষেত্তপাপড়া, যষ্টিমধু, রাস্না, পটোল পত্র, কাঞ্চনছাল, আমছাল ও মোচরস প্রত্যেক ৮ তোলা, ধাইফুল ⁄২ সের, (৬৪ তোলা সেরের ২ সের) দ্রাক্ষা ⁄২॥০ সের, চিনি ১২॥০ সের ও গুড় ⁄৬।০ সের, এই সমুদয় ১২৮ সের জলে বিমিশ্রিত করিয়া আবৃত ভাণ্ডে ১ মাস রাখিবে। পরে কল্কদ্রব্য ত্যাগ করিয়া দ্রবাংশ ছাকিয়া লইবে। এই চন্দনাসব শুক্রমেহ নিবারক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, হৃদ্য ও অগ্নিসন্দীপক। ক্রমশঃ—

রয়াল বেঙ্গল থিয়েটরে রজনী।

ষ্টারে "চন্দ্রশেখর" অভিনয়ের পর, রয়াল বেঙ্গলে "রজনীর" অভিনয় বড়ই সময়োপযুক্ত হইয়াছে। রজনী ও চন্দ্রশেখরের সম্বন্ধ বড়ই নিকটবর্ত্তী। রজনী চন্দ্রশেখরের Sequel বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি চন্দ্রশেখর পড়কে যে যে চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন তাহাদের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও কার্য্যগত ভাব রজনীর কয়েকটী চরিত্রে বিশেষরূপে প্রতিফলিত ও পরিস্ফুট হইয়াছে "চন্দ্রশেখরের" প্রতাপ "রজনীর" অমরনাথরূপে, শৈবলিনী—রজনী ও লবঙ্গলতার সমষ্টিরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। কবির প্রতাপ চরিত্রের অসম্পূর্ণতা অমরনাথে পরিশোধিত হইয়াছে, শৈবলিনীর অসম্পূর্ণতা লবঙ্গলতা ও রজনীতে বিভাগ করিয়া সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। চন্দ্রশেখরে কবি দেখাইয়াছেন সাহস ও হৃদয় বলের অভাবে শৈবলিনী সোণার সংসার ছারে খারে দিয়াছে অন্যপক্ষে রজনী সেই সাহস ও হৃদয় বলে বলবতী হইয়া কেমন নূতন সংসার গড়িয়াছে। শৈবলিনী যদি সংসারে প্রবেশ করিবার সময় রজনীর ন্যায় হৃদয়ের বল দেখাইতে পারিত তাহা হইলে তাহার জীবন অদ্ভুত ঘটনা সঙ্কুল বৈচিত্রময় ও যন্ত্রণাপ্রদ হইত না; শৈবলিনীর জীবনে যাহা মহাভ্রম, রজনীর জীবনে তাহা প্রকৃত জ্ঞান। শৈবলিনীর জীবনে যাহা চঞ্চলতা রজনীর জীবনে তাহা কর্ম্মক্ষেত্রানুসারী স্থিরবুদ্ধি। শৈবলিনী চক্ষু থাকিতেও ভবিষ্যতে অন্ধ, রজনী অন্ধ হইয়াও ভবিষ্যতে পূর্ণ দর্শিনী। শৈবলিনীতে হৃদয়ের আবেগ ও অসংযত প্রবৃত্তির পূর্ণোচ্ছাস, রজনীতে হৃদয়ের আবেগ সম্পূর্ণরূপে সংযত ও প্রশমিত ও মানব হৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে ভূয়োদর্শন, সহিষ্ণুতা ধীরতা দ্বারা পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছে।

কিন্তু শৈবলিনীকে কবি এক অদ্ভুত চরিত্র করিয়া আঁকিয়াছেন। অন্যপক্ষে একা রজনীর দ্বারা তাহার অভাব পূর্ণ হয় নাই। লবঙ্গলতা ও রজনীর সমষ্টিতে যে একটী উজ্জ্বল চরিত্রের সৃষ্টি হয় তাহা দ্বারাই শৈবলিনী চরিত্রের অভাব ও শূন্যতা পূরণ হইয়াছে।

রজনী অন্ধ—জন্মান্ধ। প্রকৃত পক্ষে যাহাকে দুই চোক বোজা অন্ধ বলে, রজনী তাহা নয়। তাহার চক্ষুদ্বয় বাহির হইতে দৃষ্টিশক্তিময় বলিয়া অপরে বোধ করিতে পারে, কিন্তু চক্ষুমধ্য স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য সে চক্ষুতে রশ্মি প্রতিফলিত হয় না কাজেই সে অন্ধ। রজনী শৈবলিনীর ন্যায় রূপবতী। জানি না, অন্ধ যুবতীর সৌন্দর্য্যে কোন মোহিনীশক্তি আছে কি না? রজনীর ছায়া আমরা একখানি ইংরাজি নভেলে দেখিতে পাই। লর্ড লিটনের Last days of Pompiee নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসে Nydia নামে এক অন্ধফুলওয়ালির চিত্র আছে। নিডিয়া আগে জন্মিয়াছে—এবং কবিও যখন স্বীকার করিয়াছেন তখন—রজনী, নিডিয়ার অনুকরণ।

আদিকাল হইতে চক্ষুষ্মান্ লোক লইয়াই এপর্য্যন্ত কবিরা প্রণয়ের চিত্র

আঁকিয়াছেন। অন্ধ লইয়া কেহ বড় একটা ঘাঁটাঘাটি করেন নাই। চক্ষুষ্মানের প্রকৃতি ও অন্ধের প্রকৃতির মধ্যে কোন মানসিক ও নৈতিক তত্ত্বের বিভিন্নতা আছে কিনা তাহা প্রদর্শনের জন্য এই দুই অন্ধনায়িকা সমান্তরালভাবে চিত্রিত হইয়াছে। মানসিক সৌন্দর্য্য বিষয়ে নিডিয়া শ্রেষ্ঠা, রজনী তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারে নাই। রজনী অন্ধ, দরিদ্রা হইয়াও রূপবতী, পরে, ঘটনাসংঘটনে গড়িয়া পুনরায় অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী। কিন্তু নিডিয়ার সেই প্রণয় সৌন্দর্য্যময় পবিত্র হৃদয়খানি ভিন্ন আর কিছু ছিল না। এই জন্য নিডিয়ার দিকে আমরা অধিকতর বেগে আকৃষ্ট হই। রজনী অবচ্ছিন্নভাবে কেবল শচীন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট, শচীন্দ্র আর কাহাকেও ভালবাসিতেন না, শচীন্দ্রকে লাভ সুখে রজনীর অন্য কোন অন্তরায় ছিল না কিন্তু নিডিয়ার প্রেমের পাত্র গ্লকস্, প্রতিযোগী প্রণয়িনী আইয়নের প্রতি অনুরক্ত থাকায় নিডিয়ার পক্ষে মহা পরীক্ষাময় ঘটনা সৃজন করিয়াছিল। বিজন বনে যে সুবাসিত ফুলটী আপনি আপনি ফুটিয়া, আপনি আপনিই ঝরিয়া পড়ে যাহাকে দেখিবার কেহ নাই বা যে অপরকে দেখা দিবার অবসর পায় না, সে ফুলটী কত পবিত্র কত সুন্দর। নিডিয়া এই বিজন কাননের সৌরভভরা প্রস্ফুটিত ফুল—কেহ তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া হৃদয়ে ধরে নাই—কেহ তাহার সেই নীরব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয় নাই—কেহ তাহার গুণের সৌরভ লয় নাই, কিন্তু রজনীর—সৌন্দর্য্যে—মুগ্ধ হইয়া রজনীর গুণে মুগ্ধ হইয়া—অমরনাথ, সংসার ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিলেন—এইজন্য নিডিয়া অপেক্ষা রজনীর প্রতি আমাদের সহানুভূতি অধিক। এক পক্ষে রজনী ধনবতী, রূপবতী, ভদ্র বংশোদ্ভূতা অপর পক্ষে নিডিয়া দরিদ্রা, রূপে রজনীর অপেক্ষা নিকৃষ্টা, নীচ বংশোদ্ভবা কিন্তু নৈসর্গিক গুণরাশি বিশিষ্টা। রজনী উচ্চকুলে জন্মিয়া উচ্চতর প্রবৃত্তি সঙ্গে লই। উচ্চ হইয়াছে—কিন্তু নিডিয়াকে তাহার বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া শ্রেষ্ঠতা লইতে হইয়াছে। তবে নিডিয়া যেরূপ বহুদূর পরিসর ক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া খুব ফুটিয়া উঠিয়াছে বঙ্কিমবাবু অল্প পরিসর ক্ষেত্রের মধ্যে তাহার অনুকরণে রজনীকে ফুটাইয়া খুব বাহাদুরি দেখাইয়াছেন।

লিটনের নিডিয়া অপেক্ষা, বঙ্কিমের রজনী তীক্ষ্ণ প্রতিভাময়ী। প্রতিভা নিডিয়ারও ছিল—কিন্তু তাহা রজনীর ন্যায় তত তীব্র তেজস্বিনী নহে। রজনীর চিন্তাগুলি কূট দার্শনিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ নৈতিক রাজ্যের দুর্ভেদ্য সমস্যার সন্দেহময় প্রশ্নজালে বেষ্টিত। তাহার রহস্যোদ্ভেদ করিতে গেলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। রজনীর অন্তর্দৃষ্টি অতি প্রখরা, তাহার চিন্তা প্রণালী অতি শ্রেণীবদ্ধ তাহার শেষ উপস্থিত মন্তব্য—অতি গভীর ভাব পূর্ণ। রজনীর এ অদ্ভুত চিন্তাশক্তিতে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা কবির হৃদয় সঞ্চারী ভাবের প্রতিফলিত মূর্ত্তি। নিডিয়া অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠা হইলেও রজনীকে বঙ্কিম বাবু নিজের করিয়া গড়িয়া অন্যদিকে তাহার শ্রেষ্ঠতা বাড়াইয়াছেন।

অন্ধের মনে অনুরাগ হইতে পারে কি না? ইহাই অদ্ভুত প্রশ্ন। রূপ, রস,

শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, এই পাঁচটাই সৌন্দর্য্য অনুভূতির ও ভালবাসার প্রধান উপকরণ। অন্ধ ইহার সর্ব্ব প্রধানটী হইতেই বঞ্চিত। জগতে স্বাভাবিক নিয়মে এপর্য্যন্ত প্রণয়ের যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা দর্শন শক্তির সম্পূর্ণ অধীন। এই দর্শন শক্তির অভাবে —প্রেমের সৌন্দর্য্য অনুভূতি কতদূর সম্পূর্ণ হইতে পারে— প্রেম কত গোপনে গোপনে কত সঞ্চিত ভাবে, পরিপুষ্ট হইতে পারে, কেমন লুকাইয়া প্রবণতা লুকাইয়া —বাসনা লুকাইয়া, কেবল গাম্ভীর্য্যকে সঙ্গে লইয়া তাহা কতদূর বাড়িতে পারে - তাহাই রজনীতে দেখান হইয়াছে। পাঠক! একটা চিত্র দেখুন।

লবঙ্গলতা রজনীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন—

"সত্য সত্যই কি তুমি বিষয় বিলাইয়া দিবে?

"সত্য সত্যই। আমি গঙ্গাজল নিয়ে শপথ করিয়া বলিতেছি

লবঙ্গ। আমি তোমার দান লই— তুমি আমার কিছু দান লও।

র। অনেক লইয়াছি।

লবঙ্গ। আরও কিছু লইতে হইবে।

রজনী জানিত না – এ-কি দান. তাহা হইলে বলিত না—"একখানি প্রসাদি কাপড় দিবেন" লবঙ্গলতা বলিলেন "তা নয় আমি যা দিই তাই নিতে হবে।"

র। কি দিবেন?

লবঙ্গ। আমার শচীন্দ্র বলিয়া একটী পুত্র আছে আমি তোমায় শচীন্দ্র দান করিব। স্বামীরূপে তুমি তাহাকে গ্রহণ করিবে। তুমি তাহাকে গ্রহণ করিলে— আমি তোমার বিষয় গ্রহণ করিব।

রজনী দাঁড়াইয়া ছিল, ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া অন্ধ নয়ন মুদিল। তারপর তাহার মুদিত নয়ন হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল। চক্ষের জল আর ফুরায় না। রজনী কথা কহেনা - কেবল কাঁদে। লবঙ্গলতা বলিলেন—"কি রজনী! অত কাঁদ কেন?" রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"সেদিন গঙ্গার জলে আমি ডুবিয়া মরিতে গিয়েছিলাম, ডুবিয়াছিলাম লোকে ধরিয়া তুলিল। সে শচীন্দ্রের জন্য। তুমি যদি বলিতে তুমি অন্ধ তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিব—আমি তাহা চাহিতাম না। আমি শচীন্দ্র চাহিতাম। শচীন্দ্রের অপেক্ষা এজগতে আর আমার কিছুই নাই। আমার প্রাণ উঁহার কাছে দেবতার কাছে ফুলের কলি মাত্র। শ্রীচরণে স্থান পাইলেই সার্থক। অন্ধের দুঃখের কথা শুনিবে কি?

তখন রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় খুলিয়া সকল কথা বলিল। শচীন্দ্রের কণ্ঠ, শচীন্দ্রের স্পর্শ, অন্ধের রূপোন্মাদ। ! !) তাহার পলায়ন, নিমজ্জন, উদ্ধার সবই বলিল। বলিয়া বলিল— ঠাকুরাণি তোমাদের চক্ষু আছে—চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারে কি?" বস্তুত আমরাও মনে ভাবি ও আপনাকে সম্ভাষণ করিয়া বলি—হে পদ্মপলাশ চক্ষু বিশিষ্ট জীব! তোমরা আলোকের—জড় প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও, কি এই অন্ধা নারীর অন্ধকার হৃদয়ের প্রেম প্রকৃতির অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ প্রেম কি আপনাদের হৃদয়ে কল্পনায় আনিতে পার?

শৈবলিনী ও রজনী চরিত্রের বিভিন্নতা আমরা উপরে দেখাইয়াছি। এক্ষণে রজনী শৈবলিনীর চরিত্রের অভাব পূর্ণতার অপরাংশ দেখাইব। এ অংশ লবঙ্গলতাকে লইয়া ফুটিয়াছে। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের গৃহে সুখী হইতে পারেন নাই, কিন্তু লবঙ্গ—রামসদয়ের গৃহে উচ্চতর প্রেমসুখে চিরজীবন কাটাইয়াছেন। রামসদয়, চন্দ্রশেখরের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, জ্ঞানে অনেক কম, স্বভাব সৌন্দর্য্যে অনেক পশ্চাতে প্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠতার অনেক নিম্নে—প্রণয়ের গভীরতার অনেক দূরে কিন্তু তবু লবঙ্গ—রামসদয়ের গৃহে সুখের সংসার পাতিয়াছিলেন। শৈবলিনীর প্রতাপ, শৈবলিনীর প্রণয় অতি সংগোপনে হৃদয়ের নিভৃত গুহে পোষণ করিয়াও আবার বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু লবঙ্গের অমরনাথ আজীবন সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত। লবঙ্গলতার অমরনাথ—জীবনে অপর কাহারও হন নাই—লবঙ্গ তাহার অতদূর লাঞ্ছনা করিয়াছে—জগতের চক্ষে তাহাকে কলঙ্কের ছাপ দিয়াছে তথাপি লবঙ্গ তাহাকে একবারও ফিরিয়া দেখে নাই—এই জন্যই যখন অমরনাথ—বড় আশায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিন্তু যদি তুমি কখন, শোন, যে অমরনাথ কুচরিত্র নহে। তবে তুমি আমার প্রতি, একটু—অনুমাত্র স্নেহ করিবে ?

তখন—লবঙ্গ সদর্পে বলিল—

"তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।"

অমরনাথ তথাপি বলিলেন—

না—স্নেহের ভিখারি আর নহি। তোমার এই সম্পদ তুল্য হৃদয়ে আমার জন্য কি আর এতটুকু স্থান নাই ?"

লবঙ্গ। না—সে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।

শৈবলিনী। দেখ দেখি, তুমি কি লবঙ্গলতার কাছে তোমার প্রবৃত্তি লইয়া সাহসী হইয়া দাঁড়াইতে পার ? বস্তুতঃ কবি শৈবলিনী চরিত্রের যে সমস্ত অভাব—তাহার অর্দ্ধাংশ লবঙ্গলতার দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। শৈবলিনী—যদি লবঙ্গ হইতে পারিত তবে—চন্দ্রশেখরের সোণার সংসার অমন ছারখারে যাইত না।

মূল গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্র সমালোচনা করিয়া তুলনা দেখাইবার স্থান ও ইচ্ছা আমাদের নাই। এক্ষণে অভিনয় কিরূপ হইয়াছে তাহাই দেখা যাক।

রজনীকে নাটকাকারে পরিবর্ত্তন করার সম্বন্ধে কতকগুলি অসুবিধা আছে রজনী সাধারণ উপন্যাসের চিরপ্রচলিত নিয়ম হইতে কিছু দূরপথে। এ পথ বিদেশের প্রদর্শিত। আমার বোধ হয় বিখ্যাত বিলাতী নবেলিষ্ট Wilkie Collins এই প্রথার প্রধান প্রবর্ত্তক। গ্রন্থের পাত্র ও পাত্রীদিগের মুখ দিয়া—লিপিবদ্ধ ঘটনার অনুরূপে—সমগ্র গ্রন্থের কথা, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে—ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে প্রকটিত হইয়াছে। একটা ধারাবাহিক শৃঙ্খলতা ও ঘটনার পরিপুষ্টি

ভাব ইহাতে নাই। নাট্যকার গ্রন্থের মধ্যান্তর হইতে এমন একটী সংযোগস্থল বাহির করিয়া লইয়াছেন—যাহাতে গ্রন্থোক্ত সমস্ত বিষয়টা তাহার চারিদিকে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ করার জন্য নাটককার বিহারি বাবু বিশেষরূপে প্রশংসার যোগ্য। এরূপ না করিলেও তিনি সহজে সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন না।

রজনীর অংশাভিনয় যোগ্য পাত্রী-তেই অর্পিত হইয়াছিল! এ পাত্রী ভিন্ন অপরে যে এরূপ দক্ষতার সহিত রজনীর অংশ অভিনয় করিতে পারিত—এরূপ ত আমাদের বোধ হয় না। রজনীর অভিনয়ে যদি কিছু অদ্ভুত দৃশ্য থাকে—তবে তাহা এই অন্ধ পদ্ম নারীর ভাব প্রবণ অভিনয়। রজনীর অভিনয়টা ভাব ও অবস্থানুযায়ী কথা প্রণালী আগাগোড়াই সুসঙ্গত, সুন্দর ও প্রকৃতনির্দিষ্ট মত চরিত্রের অনুরূপ। এতদ্ভিন্ন শচীন্দ্র নাথ ও রামসদয় আগাগোড়া বেশ স্বাভাবিকতা ও দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। তার পর লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা যদিও বঙ্কিম বাবুর সৃষ্ট "লবঙ্গলতা" হয় নাই—তথাপি যাহা হইয়াছে—তাহাতে অভিনয়ের উৎকর্ষতা বাড়াইয়াছে বই কমায় নাই। অমর নাথের অভিনয়, আরও আবেগময় ও উৎকৃষ্ট হইবে আমরা এরূপ আশা করিয়াছিলাম। ভবানন্দ ব্রহ্মচারীর শেষ অভিনয় বেশ দাঁড়াইয়াছিল। হীরালালের অভিনয় ভাল, কিন্তু সহোদরার সম্মুখে অতদূর মাতলামীটা করা ভাল হয় নাই এটা নাট্যকারের অসাবধানতার জন্যও হইতে পারে। দুই এক স্থলে হীরালালের কথাবার্ত্তা ও হাব ভাব, শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। আশা করি বিহারি বাবু এ বিষয়টী একবার লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন।

দৃশ্যপট সম্বন্ধে আমাদের দুই একটী বক্তব্য আছে। গঙ্গাবক্ষে ভাসমানা রজনী হীরালালের জাহ্নবী-চরে রজনীকে পরিত্যাগ, এই দৃশ্যটী সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। পীরপাহাড় ও রজনীর নূতন দ্বিতল বাটীর দৃশ্য বেশ স্বাভাবিক। কিন্তু কয়েকখানি দৃশ্যপটের উপযুক্ত সংস্কার অভাবে ও ষ্টেজ ম্যানেজমেণ্টের দোষে দুই এক স্থলে একটু ত্রুটি উপস্থিত হইয়াছিল।

বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির অধ্যক্ষদের প্রতি আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, যেন তাঁহারা ঐকতান বাদ্যের অনধিক দীর্ঘতার অনুমোদনে একটা বন্দোবস্ত করেন এরূপ না করিলে শ্রোতৃবর্গের বড় বিরক্তি উপস্থিত হয় এবং নাটকের স্থায়ী ভাবের ও উত্তেজনা শক্তির ক্ষমতা মন্দীভূত হইয়া আইসে।

বগাল বেঙ্গলে "রজনীর" অভিনয় দেখিবার নূতনতর জিনিস। যাঁহারা বঙ্কিম চন্দ্রের আর একটী কল্পনা-কুসুমের অদ্ভুত বিকাশ দেখিতে সমুৎসুক, তাঁহারা একবার বঙ্গ রঙ্গ ভূমিতে গিয়া "রজনীর" অভিনয় দেখিয়া চক্ষুকর্ণের সার্থকতা সাধন করুন। অন্ধ রজনীর অপূর্ব্ব অভিনয়ে তাল-লয়-বিশুদ্ধ মনোহারী সঙ্গীতে নিশ্চয়ই তাঁহারা সন্তোষ লাভ করিবেন ও কবি রজনী চরিত্র সৃষ্টি করিয়া যে অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়াছেন, তাহারও সার্থকতা দেখিতে পাইবেন।

২য় খণ্ড। | ১৩০১ সাল—ফাল্গুন। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সূচী পত্র।

মূল্য, প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

গ্রাহক মহোদয় সমীপে

একটী বিশেষ নিবেদন।

সমীরণ সদা আপনি বহে, কখনও কাহারও অধীন নহে, যতদিন যাহার সঙ্গে রহে, তাহার গুণগৌরব অঙ্গে মাখিয়া রঙ্গে ভঙ্গে তরল তরঙ্গে বহমান হয়,-- তখন তাহার আর নূতন পরিচয় দিতে হয় না। সমীরণ মলয় গিরির সৌরভসার সোহাগ করিয়া গায়ে মাখিল, প্রথম প্রথম কোকিল কাকলি তাহার পরিচয় দিল, বিশ্ববাসী তাহার সুবাসশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া মলয় সমীরণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল, তাহার পর বসন্ত-দূতের ভেরী বাজুক আর নাই বাজুক, লোকে বুঝিল মলয় সমীরণ আপনি সমানই বহিতেছে। আমাদের "সমীরণ" বিশ্বের মঙ্গলোদ্দেশ্যে নিজের সমৃদ্ধির সহিত চিকিৎসা তত্ত্ব বিজ্ঞানের সৌরভসার অঙ্গে মাখিয়া সাধারণের সেবা করিতেছে, এখন চিকিৎসা তত্ত্ব বিজ্ঞানের সমস্ত সত্তা ও সমীরণের প্রত্যেক পরমাণুর সহিত মিশিয়া গিয়াছে,--এই মিলন অবিভাজ্য, শত বিপ্লবের তরঙ্গ ইহার বুকের উপর দিয়া বহিয়া গেলেও ইহার সম্মিলিত,—একীভূত সম্পর্কের বিচ্ছেদ হইবে না। তবে আর এখন চিকিৎসা তত্ত্ব বিজ্ঞানের কোন উল্লেখ কেন? যাহা নিত্য, তাহার প্রাণময় গুণ সমূহও নিত্য, সেই জন্য সেই নিত্য পদার্থের নাম করিলে তাহার গুণ সমূহের সত্তাও উপলব্ধ হইয়া থাকে, চিকিৎসা তত্ত্ব বিজ্ঞান এখন সমীরণের নিত্য গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এখন "সমীরণ" বলিলেই ইহাতে চিকিৎসা তত্ত্ব বিজ্ঞানের সত্তা সম্যক উপলব্ধ হইয়া থাকে, তবে এই কোকিল কাকলির কলঘোষণার আর প্রয়োজন কি?—— --

আর এক কথা——

আজি কালি শব্দ সমূহের সংক্ষেপ সাধনেচ্ছা বর্ত্তমান সভ্যসমাজের বিশেষ সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে; কেহ অঙ্গ সৌষ্ঠবের জন্য, কেহ বা সময়ের আর বাড়াই-বার বাসনায় সকল বিষয়েরই সংক্ষেপ করিতেছেন, এই সভ্যতার হুজুগে গড্ডলিকা প্রবাহে আমরাও গা না ঢালিয়া থাকিতে পারি কৈ? তাই বলি সুধু "সমীরণ" বলিলে কি ভাল হয় না? সভ্য পাঠকগণ ইহার মীমাংসা করিবেন। আমরাও চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ এই উভয় নামের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ "সমীরণ" নামেই অভিহিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

কবিরাজ-শ্রীআশুতোষ সেন,

স্বত্বাধিকারী।

২য় খণ্ড। ১৩০১ সাল—ফাল্গুন। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

পঞ্চযজ্ঞ।

মহর্ষি মনুর মতে আশ্রম চতুর্ব্বিধ—গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য। ইহাদের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু গৃহীমাত্রেরই কতকগুলি পাপানুষ্ঠান অপরিহার্য্য। গৃহস্থের পাঁচটী সূনা অর্থাৎ প্রাণিবধ স্থান আছে যথা;—চুল্লী (উনন), পেষণী (জাতা), উপস্কর (ঝাঁটা), কণ্ডনী (উদুখল-মুষল) এবং উদকুম্ভ (জলকলস)। এই কয়েকটা ব্যবহার না করিলে গার্হস্থ্য চলিতে পারে না, অথচ এই পঞ্চদ্রব্যে প্রাণিবধ অপরিহার্য্য। আর্য্য ঋষিগণ পাপের ভয়ে এত ভীত ছিলেন যে, এই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যে গৃহী প্রত্যহ এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি আর পঞ্চসূনা-পাপে পতিত হইবেন না। সেই পঞ্চযজ্ঞ এই,—(১) ব্রহ্মযজ্ঞ, (২) পিতৃযজ্ঞ, (৩) দেবযজ্ঞ, (৪) ভূতযজ্ঞ, (৫ মনুষ্যযজ্ঞ। কোন কোন ঋষি এই পঞ্চযজ্ঞকে যথাক্রমে অহুত, হুত, প্রহুত, ব্রাহ্মহুত ও প্রাশিত এই পঞ্চনামে অভিহিত করিয়াছেন। উক্ত পঞ্চযজ্ঞের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ব্রহ্মযজ্ঞ—অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ। অধ্যয়ন অর্থে এস্থলে শাস্ত্রাধ্যয়নই বুঝায়। বর্ত্তমান সময়ের অর্থকরী বিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় পাপ দূর হওয়া দূরে থাক্ বরং চিত্তমালিন্য বৰ্দ্ধিতই হইতেছে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণমাত্রেরই বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই বেদপাঠে প্রস্তুত হইবার জন্যই দ্বিজাতির উপনয়নসংস্কার হইত। বেদপাঠার্থ গুরুগৃহে উপনীত হইবার জন্য প্রস্তুত করে বলিয়াই ইহার নাম "উপনয়ন"-সংস্কার। বেদাধ্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক কৃতস্নান বিপ্র গুরুর অনুমতিক্রমে সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট ও দারপরিগ্রহ করিতেন এবং যজন, যাজন ও অধ্যাপনাদি কার্য্যে কালাতিপাত করিতেন। অধুনাতন প্রচলিত উঞ্ছবৃত্তি ও

নিষিদ্ধবৃত্তি অবলম্বনে ব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হইত। এই ব্রহ্মযজ্ঞ এখন লুপ্ত-প্রায়। এখন অধ্যয়ন আছে, অধ্যাপনা আছে কিন্তু তাহাতে আর সেই ব্রহ্ম-যজ্ঞের স্বর্গীয় সৌরভ নাই বরং কুশিক্ষার তীব্র পুতিগন্ধে তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে। কালবশে কর্ত্তব্যকর্ম্মে ঘোরতর বিভ্রাট উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ যে কীদৃশী দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তাহা সকলেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

পিতৃযজ্ঞ - অন্নাদি বা উদকদ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার নাম পিতৃযজ্ঞ। এই যজ্ঞ এখনও কিয়ৎপরিমাণে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে ইহার ক্রমেই অবনতি হই-তেছে। শিক্ষিত বর্ত্তমান সম্প্রদায়ের সংস্কার যে, "মরা গোরু কখনও ঘাস খাইতে পারে না" ভাবার্থ এই যে— মৃত পিতৃলোক কখনও পিণ্ড বা উদক গ্রহণ করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহা-দের উদ্দেশে কোন অনুষ্ঠান বৃথা; কিন্তু সেই সকল সভ্য মহাশয়েরাই আবার পাশ্চাত্য সভ্য জাতির অনুকরণে মৃত ব্যক্তির সম্মানার্থ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা বা মৃত্যুর দিবসে প্রতিবর্ষে সভাদি করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতে ব্যস্ত হন। শোকপ্রকাশ, মূর্ত্তিস্থাপন ইত্যাদি যে মানসিক বৃত্তি হইতে উদ্ভূত, হিন্দুর এই শ্রাদ্ধাদিও সেই মানসিক বৃত্তির ফল। শোকপ্রকাশ বা শ্রাদ্ধাদি না করিলে মৃতের কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। আমি দেবোদ্দেশে অন্নাদি উৎসর্গ না করিলে দেবতা উপবাসী থাকিবেন না, তাহা সকলেই জানেন। তবে হিন্দু দেবোদ্দেশে উপাদেয় বস্তু উৎসর্গ করিয়া আত্মবৎ তাঁহার সেবা করিয়া মনের তৃপ্তি-সাধন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। হিন্দুর মতে মৃতেরা দেবত্ব প্রাপ্ত হন, তাই মৃত ব্যক্তির নাম লিখিবার পূর্ব্বে দেবত্ববোধক ৺ এই চিহ্ন লিখিতে হয়। দেবত্বপ্রাপ্ত পিতৃ-লোকের উদ্দেশে তাঁহাদের সম্মানার্থ বা স্মরণার্থ মৃত্যুর দিবসে শ্রদ্ধার সহিত যাহা নিবেদন করা যায়, তাহাকেই শ্রাদ্ধ কহে। এই শ্রাদ্ধক্রিয়া যাহাতে সকলেই অনুষ্ঠান করেন, তজ্জন্য শাস্ত্রকার-গণ অনেক বিধিব্যবস্থা ও ফলের কথা বলিয়া গিয়াছেন; অন্যথা অনেক পাপেরও ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্" *— এই বচনেই শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে। বস্তুতঃ মৃত্যুর দিবসে মৃতের স্মরণার্থ অথবা ভক্তি প্রদর্শনার্থই যে এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে, বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একদিনও মৃত পিতৃলোকের স্মরণার্থ এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অবহেলা করে, তাহার কিরূপ পিতৃভক্তি তাহা সুসভ্য-মহাশয়েরাই জানেন। মৃত্যুর দিবসে মৃতের স্মরণার্থ কোন না কোন প্রকার অনুষ্ঠান সকল সভ্য সমাজেই প্রচলিত আছে, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই ইহার বিধি ব্যবস্থা আছে, তবে আমাদের সুসভ্য মহোদয়গণের স্বকপোলকল্পিত শাস্ত্রে পিতৃভক্তির কোন নিদর্শন নাই। ইঁহারা "স্বনাম পুরুষো ধন্যঃ"।

পূর্ব্বকালে এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান প্রতিদিন ও পর্ব্বাহে অনুষ্ঠিত হইত। এখন কেবল মৃতাহতিথিতেও এই কার্য্য অনে-কের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, অথবা তাঁহারাই আবার অপরের পিতার

স্মরণার্থ মূর্ত্তিস্থাপন ও সভাদিতে যোগ-দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন।

দেবযজ্ঞ,—দেবোদ্দেশে হোম করার নাম দেবযজ্ঞ। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥"

অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে তাহা সূর্য্যদেবে উপনীত হয় এবং সূর্য্য হইতে তাহা আবার মেঘ ও বৃষ্টি হইয়া থাকে, সেই বৃষ্টি হইতে শস্য ও শস্য হইতে প্রাণিরক্ষা হয়। সূর্য্যই যে সবিতা বা জগৎ-প্রসবিতা তাহা সকল বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরাই স্বীকার করেন। জগতের নিদানস্বরূপ জীবের জীবনস্বরূপ সেই সূর্য্য দেবের উদ্দেশে যজ্ঞাদি যে অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা সহজেই অনুমেয়।

ভূতযজ্ঞ,—পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণিকে খাদ্যাদি প্রদানের নাম ভূতযজ্ঞ। গৃহী অগ্রে পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞত্রয় সমাপন করিয়া পতিত, কুক্কুর, পাপরোগী, কাক ও ক্রিমী প্রভৃতির জন্য ধূলি না লাগে এরূপ ভাবে ভূমিতে অন্ন রাখিবেন। সর্ব্বভূতে সর্ব্বব্যাপীর সত্তা বিরাজমান। সর্ব্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান কেবল যে হিন্দুরই ছিল, এই ভূতযজ্ঞই তাহার প্রমাণ। যে মহাত্মা দিব্যজ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়াছেন, যিনি জগৎকে সেই বিশ্বস্রষ্টার অংশ বলিয়া বুঝিয়াছেন, যিনি "সোহহং" তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার আর মানব বা কীটাণুকীটে কোন প্রভেদ কিরূপে থাকিবে? তিনি আর কিরূপে নিজের পাঞ্চভৌতিক দেহ লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন? তাঁহার প্রেম পশুপক্ষি প্রভৃতি সর্ব্বজীবে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। তিনি সকলকেই যে, সেই পরমাত্মার অংশস্বরূপ বোধ করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? যে আর্য্য জাতি স্বীয় উদারতা-গুণে সর্ব্বভূতে সর্ব্বব্যাপীর সত্তা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, বিশ্বসংসারকে আত্ম-পরিবার তুল্য জ্ঞান করিতে পারিয়া-ছিলেন, সেই আর্য্য জাতির পতিত সন্তানেরা আজ সমাজের কথা দূরে থাক, স্বজনগণের কথা দূরে থাক, আত্ম পরিবারগণের মধ্যেও অনেককে বাদ দিতে কুণ্ঠিত নহেন। দুই জন আত্মীয়, কুটুম্ব-প্রতিপালন করিতে যাঁহাদের অপারগ বলিয়া বোধ হয়, এই সন্তান ভূতযজ্ঞের মহান্ ভাব কিরূপে তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন!

মনুষ্য যজ্ঞ,—অতিথি সেবাই মনুষ্য-যজ্ঞ।

"অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে।"

হিন্দু মতে অতিথি দেবতুল্য সুতরাং অতিথি সৎকারে কৃপণতা ও প্রত্যাখ্যানে অতিশয় পাপের কথা শাস্ত্রে উক্ত আছে—

"অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥"

যদি গৃহস্থের গৃহ হইতে অতিথি ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে অতিথি স্বীয় দুষ্কৃত গৃহস্থকে প্রদান করিয়া গৃহীর পুণ্য গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়।

প্রতিদিন এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গৃহস্থ-দম্পতী স্বয়ং আহার করি-তেন, একথা বর্ত্তমান কালে হাস্যাস্পদ হইলেও পূর্ব্বকালে হিন্দুর গৃহে এই প্রথাই ছিল। অতি প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকালের অর্থাৎ যে সময়

সেকেলে অসভ্য লোকগুলা পাশ্চাত্য সভ্যতায় সভ্য হইতে শিখে নাই, নিজ পরিবার অর্থাৎ কেবল স্ত্রীর নামে কোম্পানীর কাগজ করিতে জানিত না, তখনও অনেক ভাগ্যবান্ গৃহস্থের গৃহে এই মনুষ্যযজ্ঞ অর্থাৎ অতিথি সেবার সুবন্দোবস্ত ছিল। অতিথি সৎকার না করিয়া তাঁহারাও অন্ন গ্রহণ করিতেন না। দীন-দুঃখীর দুঃখে তাঁহাদের চিত্ত গলিয়া যাইত, তাই তাঁহারা নিজের আহার্য্যের অর্দ্ধাংশ পরকে দিতে আনন্দিত হইতেন। সেই দেবোপম মহাত্মাগণই জানিতেন—

"ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞমুৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।"

এ সমস্তই এখন কথার কথা হইয়াছে। পুরাকালের প্রথা এখন স্বপ্নবৎ হইয়া উঠিয়াছে। সেই সোণার ভারত আছে, সেই হিন্দু-সমাজ আছে, তবে জানি না, কেন, কোন্ পাপে আমরা—সেই আর্য্য সন্তানেরা দিন দিন রসাতলে গমন করিতেছি? কেন হিন্দু গৃহস্থেরা ঈদৃশ কলুষিত হইয়া পড়িতেছে। হিন্দু গৃহস্থের এই অধঃপতন মনে হইলে, মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হয়, পাষাণও বিগলিত হয়। ভগবান্ বলিয়া দিন, হিন্দু সন্তানের এই ব্যাধির ঔষধ কি?

গৌরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নবম পরিচ্ছেদ।

আষাঢ় মাস। সন্তপ্ত পৃথিবীর, দুর্দ্দিনের কাঁদিবার বন্ধুর মত, কাল কাল মেঘ, দিগন্তের বুক চাপিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। সে মেঘে কোন অলকার উদ্দেশে, কোন নির্ব্বাসিত যক্ষের বিরহপত্র গোঁজা ছিল কি না, তাহা জানা যায় নাই। তবে ভগ্নগৃহীর চক্ষের জল, বড় বড় পগারের ভেকসংকুল জল, উচ্চ বংশবনপ্রচ্ছন্ন উমেদার "ফটিক-জলের" আর্ত্তস্বর, অবিরাম, সবিরাম কম্পজ্বর, বৈতরিণীতীরস্থ বিষণ্ণতামাখা, আর্দ্র, দুষ্টময় পূর্ব্ববাত, আর অস্থি পেশী মজ্জাগত বাত লইয়া, পল্লীগ্রামের মেঘময়, গন্ধময়, আর প্রাণগোঁজামায় আষাঢ় আসিয়াছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বাতাশ্রয় করিয়াছিল। মধ্যাহ্নে, গৃহিণী কোন গ্রাম্য ধন্বন্তরিপ্রদত্ত অবিষ্ট মালিশ করিতেছিলেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনার উপেক্ষিত গুণরাশি ও সর্ব্বংসহা-সহিষ্ণুতার সর্ব্ব "ল"কারে রূপ করিতেও ভুলিতেছিলেন না। গৃহের এক পার্শ্বে, শ্রীমতী মৃণালিনী, ঢুলন, ভুলন ও নাসিকার অযথা শ্লৈষ্মিক অবরোধিতার ভিতর দিয়া, মাঝে মাঝে

আপনার ঘর্ষিত রক্তিম চক্ষুদ্বয় উত্তোলন করিতেছিলেন। বাহিরে, শ্রীমান জামাতা বাবাজীবন, কোন শিবসন্তোষ উদ্ভিদের সাহায্যে, বিধিদত্ত দুর্দ্দিনের সুদিন করিয়া,

"আকাশেতে নব ঘন,
কবে বারি বরষণ,"—ইত্যাদিরূপ,*

কোন বঙ্গবাসীর অমর সঙ্গীত-রচয়িতার, অমর নিবাপ তোয়াঞ্জলি প্রদান করিতেছিলেন। চান্‌কা হইতে, সে স্বর মাঝে মাঝে বড়ই অবৈধরূপে অন্দরে পরিস্ফুট হইতেছিল। কর্ত্তা বলিলেন—আঃ! আবার ডাক্তারের দুটো টাকা হলো! বাড়ীর এক আধ জনের অসুখ ক'রে,—কোনই লাভ নেই—কোনই লাভ নেই।—বরং ক্ষতি। বাড়ীশুদ্ধ অসুখ ক'ল্লে তবু বুঝা গেল, এ দিকে যেমন ডাক্তার খরচ, ও দিকে তেমন বাজারখরচ বন্ধ!

গৃহিণী। ও খরচ ত তোমার নিত্যিই আছে। সেই দিন সেই বৌমার একটু ফিক্ ব্যথা ধল্লো। আর অমনি নিয়ে আয় ডাক্তার!—নিয়ে আয় ডাক্তার! বাপের বাছা, বেটার বৌ!—ও ত আর আমাদের মত হেলা ফেলা নয়!

এই বলিয়া গৃহিণী, আপনার অসাধারণ স্থূলতায় পরিণত, অনৈসর্গিক ব্যাধির বিশদ নিদান ব্যাখ্যা করিতে বসিলেন। এবং অযোগ, অভিযোগ, মিথ্যাযোগ প্রভৃতি বাদ দিয়া যে আরো অনেক রকম অসুখের কারণ আছে; তাহা বুঝাইয়া, কর্ত্তার মনে, যুগপৎ বিস্ময়, রাগ ও বিদুষীজনিত্বের গৌরব উৎপাদন করিয়া দিলেন।

কর্ত্তা, কিন্তু গৃহিণীর এই শ্লেষাত্মক বাক্যে বিশেষ সুখী হইতে পারিলেন না। তিনি কেমন জানিতেন, গৃহিণী, পুত্রবধূর বড় ব্যক্তিগত শুভানুধ্যায়িনী নহেন। কর্ত্তা যে টাকা-অপচয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে পুত্রবধূর শারীরিক অমঙ্গল-দূরত্বজন্য খরচের কোন সুদূর সংস্রব ছিল না। দৈহিক অস্বাস্থ্যের প্রথম উপশমের সময়, মানুষের যে একরূপ সমস্ত জগতের উপর শুভইচ্ছাপ্রবণতা আইসে; যে একটা রুদ্ধকণ্ঠ-নীরবতা, একটা উচ্চারিত কথার দেবধ্বনি হইয়া, অপরের অন্তরাত্মার জনাকীর্ণতার ভিতর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে; লইতে চেষ্টা করে; সেই সার্ব্বভৌম শুভানুধ্যায়িতার বশেই, আপনার মাঝ হইতে সেই কগ্ন বিজনতা নির্ব্বাসনের প্রয়াসেই, কর্ত্তার অন্তরাত্মা হইতে, একটা অতর্কিত, অবশ্মিত কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। হইতে পারে, অধিকাংশ লোকের টাকাত্বই প্রকৃত আমিত্ব। হইতে পারে, কর্ত্তার এই ছিন্ন ভিন্ন, লূনপক্ষ আমিত্বের যাতনা, প্রথম কথাপ্রসঙ্গেই বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

তবু তিনি গৃহিণীর এই কথার ভিতর, অনেক গুলা, তৃতীয় প্রহরে অন্নদান—শান্ত, শিষ্ট, বিলম্বিত লয়ের মর্ম্মচ্ছেদী কথার অনেক গুলা ধীর বিদ্যুৎ;—অনেক গুলা, আপনার লোকের সেতুহীন ক্রুরপর হওয়া,—অনেকগুলা, থামের আড়ালের বড় বড় চোখের বড় বড় জল;—অনেকগুলা স্তিমিত মধ্যাহ্নের, পুকুরের পাড়ে প্রচ্ছন্ন অন্নাদি-বিসর্জ্জন, যেন দেখিতে পাইতেছিলেন। অসহায় বালিকার অনেকগুলা নীরব, করুণ-অভিযোগ, যেন তাঁহার চরণের প্রান্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কাঁদিয়া বেড়াইতে

লাগিল! কর্ত্তা এবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আমার স্থষ্টিধরের লক্ষ্মী। লক্ষ্মীপূজার জন্য খরচের কথা তুমি মুখে আনিও না। উহার গর্ভে আমার পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের সম্ভাবনা। কর্ত্তা গিন্নী থাকিলে, আজ কত আহ্লাদ করিতেন!—আমার সুরেশের বৌ!" প্রাণ সমর্পণের জায়গায় হুঁচট খাইলে, লোক, বাপ্‌মার নিরাপদ ক্রোড় স্মরণ করিয়া থাকে। চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার স্বর্গীয় পিতা মাতাকে মনে করিলেন তিনি আরো অনেক কথা ভাবিতেন। কিন্তু আপনার গৃহের ভিতরের নাটকের সম্মুখে, মন একেবারে চক্ষু মুদিয়া ফেলে; তাহার সবটুকু ভাবিতে ভাবিতে হটাৎ সে কেমন পাশ কাটাইয়া যায়। কয়-জন ক্ষতরোগী আপনার ক্ষতের তল-পর্য্যন্ত সলাকা চালাইতে পারে?

গৃহিণী কিন্তু পুরাণ ভাগবতাদি সকলই শুনিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং পঞ্জিকা দেখিয়া, ৭।৮ খানা পাড়ার বিধবাবর্গের একাদশীর উপবাস স্থির করিয়াছেন। সামুদ্রিক, জ্যোতির্ব্বত্না-করাদি ও তাঁহার নখদর্পণের ভিতর। তিনি জানিতেন ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর, বাসুকি—স্থষ্টিধর। স্বয়ং ভগবান্, ২।৪ অবতারিত্বের পর, অনেক কষ্টে বাসু-কির স্কন্ধে সে ভার নামাইয়া রাখিয়া-ছেন। গৃহের ভিতর পঞ্চদশবর্ষীয়া পুত্রবধূর নূতন সৃষ্টিধরত্বে, তাঁহার আদৌ বিশ্বাস জন্মিল না। মানুষের ধর ধারণা টলিলে, আমূল সৌরজগৎও বিলুপ্ত বোধ হয়।

তিনি কিন্তু বধূর, বাসুকির মত সর্ব্ব-সহত্বের অনেক প্রমাণ পাইয়াছিলেন। কখন কখন ভূমিকম্পে, বাসুকি আপনার ক্লান্ত মাথাটা বদলাইয়া লয়; পুত্র-বধূকে, গৃহিণী কখন সেরূপ অবকাশও দেন নাই। তবুও আর্য্যা গৃহিণী, দেব মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দিলেন; এবং হেলা, দোলা, দোলা ভাবে, অনেকগুলা অতীত কাল্পনিক দুঃখ, অনেকগুলা স্বামীস্ত্রী কোন্দলের ভুক্তাবশেষ রোমন্থন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আমার পেটের মেয়ে, তা তুমি দেখতে পারবে কেন? ওদের এক পয়সা দিতেই তোমার স্থষ্টিধরের লক্ষ্মীর খুঁটি শূন্যি হয়। বাছার একটা ছেলের একটা ঝি রাখিতে, তোমার কত কথাই শুনিয়াছি! হরিশ আমাদের, বড় ঘরের ছেলে। শাক ডাল খেয়ে আমাদের ঘরে থাকে কত ভাগ্যি। তোমার আবাদ আওলাতের কত উপকার। তা না হয় মেয়েটার হাত ধরে একদিকে চলে যাব। কলিকাতায় গিয়ে রাঁধুনীগিরি করে খাব। বাছাদের মুখনাড়া ভাত খেতে হবে না। হরিশ বড় ঘরের ছেলে।—হাটু ধরে কন্যা দান করে, তুমি তার এত অপমান কর!"

গৃহিণীর বিশ্বাস ছিল, কলিকাতার পাচিকাব্রাহ্মণীদিগের সঙ্গে সঙ্গে একটা করিয়া অবশ্য প্রতিপাল্য গোষ্ঠী ফিরিয়া থাকে; এবং তাহাদের শয়ন গৃহ, রন্ধনগৃহ প্রভৃতি, দৈহিক সকল ব্যাপা-রের এক একটা স্বতন্ত্র গৃহের পিছনে নৈশবায়ু সেবনের জন্যও একটা করিয়া প্রমোদ উদ্যান থাকিবার বিশেষ আপত্তি নাই। কর্ত্তা, কিন্তু বাপাজীব-নের এই কুরুপিতামহ সদৃশ আত্মত্যাগের ভিতর, বিশেষ নৈতিক উচ্চতা দেখিতে পাইলেন না। তিনি বুঝিয়াও বুঝিতে

পারিতেছিলেন না, একটী ক্ষুদ্র বালিকার বিরুদ্ধে কেন এত অহর্নিশ ষড়যন্ত্র! বালিকা, গৃহিণীর কোন্ প্রভুত্ব কাড়িয়া লইতে পারে? কর্ত্তা বুঝিতে পারিতেছিলেন না, তাঁহার সমস্ত কুলের আনন্দাশ্রু স্বরূপ, এই ক্ষুদ্র শিশির কণাটী দেখিয়া দীপ্ত সূর্য্যসম গৃহিণীর কেন এ কল্পিত দক্ষিণায়ন! আবার জামাতার অনুগ্রহপ্রসঙ্গে তাঁহার রাগ হইতেছিল; আপনি এরূপ তিক্ত প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন বলিয়া, মাঝে মাঝে তাঁহার অনুতাপও হইতেছিল। তিনি কতকটা তোতো করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কে কে বড়লোক। আ—আমরা ধন বিজয় চাটুতির সন্তান—

এমন সময়, এই শুম্ভসংহারের উপক্রমে, মৃণালিনী তাঁহার মহাশল্য লইয়া জননীর সহায়তা করিল—"তা বোলে বাবা!—লক্ষ্মী বল আর যাই বল, বউ তোমার লক্ষ্মীর মত সুন্দরী নন। মাগো!—বউ বাবু! তোমার কেবল পঞ্জিকের অনাতিশ!

কন্যার কথা সাঙ্গ হইতে না হইতেই মাতা আবৃত্তি করিয়া উঠিলেন।

"ছয় অঙ্গুল, উচ্চদন্ত, বহুলোমযুক্তা।
সে কন্যারে বিবাহেতে জানিবে বর্জ্জিতা॥"

চট্টোপাধ্যায়, মুখ চোখ রাঙ্গা করিয়া বলিয়া উঠিলেন।

"তা—তা—তে—

বেচারা ব্রাহ্মণ যতই শীঘ্র শীঘ্র রসনা চালনের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, ততই কোন স্বপ্ন দৃষ্ট ভয়ে দৌড়াইবার প্রয়াসের মত, তাহা বাক্যবোর অনুসঙ্গ হইতে পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। গৃহিণী, স্বামীর বাগিন্দ্রিয়ের জড়তার সুযোগে, অনেকগুলা সংদাহন অস্ত্র বড় ক্ষিপ্রহস্তে নিক্ষেপ করিলেন।—"সুরেশের সঙ্গে আর-জন্মে ওঁর কি শত্তুরতাই ছিল। তাই অমন বৌ করে দিলেন। দেখতে যাবার সময়, আমি আবাগী যদি সিন্দুক থেকে চসমা খান বার করে দিই?

আর কি মানুষকে ধরিয়া মারিতে হয়! মুখ বন্ধ করা, বেচারার স্বচক্ষে দেখা কার্য্যের নিন্দাকরা, প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণের অকাল বার্দ্ধক্য বর্ণন; ফলত অসুখের সময় একজনের কানে প্রেতপুরীর কল্লোল চালিয়া দিবার প্রয়াস! ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"পিপাসায় প্রাণ যায়!—বিছানাময় ছারপোকা!— বৌমা আমায় একটু জল দাও।"— মানুষের ভাব ও অভিব্যক্তিতে প্রভেদ কত!

গৃহিণী বুঝিলেন, ব্রাহ্মণকে রাগ প্রকাশ করিতে না দিয়া ভাল করেন নাই। যাহা নিবারণের জন্য, এতক্ষণ তাঁহারা প্রহরী হইয়া বসিয়া আছেন, তাহাই ঘটিবার উপক্রম। মাতা কন্যা উভয়ের যত্ন—পুত্রবধূ কোনরূপ শ্বশুরের সেবা করিতে না পায়। অসুখের পরিচর্য্যায় মানুষ বড় স্নেহাধীন হইয়া পড়ে। স্নেহ—পরনির্ভরত্ব সাপেক্ষ। আমি, প্রতিপদে যতই আপনার অক্ষমতা বুঝিতে পারিব, যতই বুঝিতে পারিব, প্রাণের এ সর্ব্বাঙ্গীন জয়ভাগ, তোমারই করুণায় হইতেছে; ততই বুঝিব তোমার করুণায় এত হয়!—না জানি তোমায় প্রাণের ভিতরে পুরিতে পারিলে, প্রাণ কোন সুধার সাগরে, চিরদিনের জন্য আরোগ্য স্নান করিয়া উঠে! সুখ—প্রধানধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মশাস্ত্রনির্ম্মাতা।

অসুখ অবস্থায় অনেকবার তাঁহার পুত্র-বধূকে মনে পড়িয়াছিল ;—অনেকবার বাতের যন্ত্রণা ভুলিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিয়াছিলেন—"মা! আমি না বুঝিয়া, তোমার ওই পদতল হইতে, বাল্যের ভাবনাহীন নীরিবিলি টুকু মুছিয়া লইয়া, তোমায় এই সংসারের তপ্ত বালুভূমে দাঁড় করাইয়াছি!" ব্রাহ্মণের অনেক-বার মনে হইয়াছিল—"ভাল করি নাই!—ভাল করি নাই—মা! এ জীবন হয় ত তোমার সুখের হইবে না!—আমার পরকালে!—ওই ছল ছল, চোখের অভিসম্পাত ঢালিয়া দিও না মা। আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল—ওই বর্ষায়, নিভৃত, প্রাণের প্রাণাকাঙ্ক্ষা-ময়, নিবিড় নিথর মেঘশিশুর মত রূপ! আমার মনে হইয়াছিল, দেবতাদের কাল মেয়ে ছেলে হলে বুঝি ওইরূপই হইয়া থাকে। আমার ওই কালোর কাছে দুই দণ্ড দাঁড়াইতে পারে, এমন আলোরূপ কোথায় আছে মা!" অনেকবার, অসুখের সময় ব্রাহ্মণের মনে হইয়াছিল, বুঝি বালিকার মাথার উপর কতকগুলা তপ্ত অশ্রু ফেলিতে পারিলে, যাতনার অনেক লাঘব হয়। অনেকবার চক্ষু বুজিয়া, ব্রাহ্মণ তাঁহার বালিশের পার্শ্বে, সেই একটা ঝুমুর ঝুমুর চুলওয়ালা মাথা হাতড়াইয়া ছিলেন। কন্যা, অনিষ্টলক্ষণ ভাবিয়া চক্ষু ঘসিয়া-ছিল। ব্রাহ্মণ স্বপ্নে দেখিতেছিলেন,—যেন তাঁর সমস্ত জীবনটা একটা দারুণ বাত-ব্যাধি। যেন বিশল্যকরণীর মত, পুত্রবধূরূপে একটী শ্যামলতিকা, তাঁহারই গৃহের ভিতর, একটা অক্ষম, রুদ্ধবাহু মাতৃস্নেহের মত "সঞ্চারিণী, পল্লবিনী" হইয়া দুলিতেছে! যেন তাহার একটা স্পর্শের বায়ু লাগিলে,—যেন সব-প্রাণ-খালি-করা, একটা আর্ত্ত "মা" স্বর, তাহার নিথর, শ্যামল স্নেহের ভিতর পাঠাইতে পারিলে, জীবনের উপর একটা অক্ষয় রক্ষাকবচ আসিয়া ঢাকা পড়িয়া যায়। কেবল কতকগুলা নিদ্রাহীন, সর্পচক্ষু তাঁহাকে পাহারা দিয়া রাখিয়াছে। সে দিকে চাহিলে, বেদনার উপর যেন নিদ্দয় চেড়ার বেত্রাঘাত পড়িয়া যাইবে! সে দিকে মুখ ফিরাইলে যেন, কেবল অকুশল, কেবল কতকগুলা রক্তনখী শ্যেনসংগ্রাম, কেবল কোন প্রলয় আকা-শের নিম্ন হইতে কতকগুলা রক্তরৌদ্রের বাণ তাঁহার উপর পড়িয়া যাইবে!

কন্যা কহিলেন—"বাবা! তোমার এতটা অসুখ! আজ সমস্ত দিনের ভিতর বৌ কবার এ ঘরে উঁকি মেরেছে? বাবা! তুমি আমাদের দেখতে পার না ব'লে,—বৌকে তুমি এত ভালবাস, বৌ কিন্তু তোমার ভালমন্দ টাঁকিয়া বসিয়া আছে।"

গৃহিণী। থাক্ গো!—থাক্!—ওসব কথায় আমাদের দুঃখী মানুষদের কায কি? নিজের চোখে দেখে কর, বেটার বউ,—ও লঙ্কাথেকে সোণার গুঁড়ো এসেছে।

ব্রাহ্মণের পায়ের তলা হইতে ব্রহ্ম-রন্ধ্র পর্য্যন্ত, যেন একটা তপ্ত শলাকা ফুটিয়া গেল। মনে হইল যেন দুইখানি কোমল করপল্লব, সবেমাত্র তাঁহার প্রাণকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, হটাৎ কোন নারদ ঋষি আসিয়া কোন নরমেধ যজ্ঞের উদ্দেশে, যেন সেই কচি হাত দুইখানিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে!

ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইলেন, ভবিতব্যের কতকটা দীপ্ত অংশ যেন তাঁহার চোখের উপর দিয়া জ্বলিয়া গেল। চট্টোপাধ্যায় বালকের মত বালিশে মুখ লুকাইয়া ফেলিলেন। সংসারে কয়জন আপনার পূর্ব্বজাত অদৃষ্ট স্থিরদৃষ্টে দেখিতে পারে? সেই জন্যই বোধ হয়, ভগবান্, বিধাতা-পুরুষের লেখা, অত অজ্ঞেয় অন্ধকারে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন!—সেই জন্যই বোধ হয়, ভগবানের ঢাকা খুলিয়া সে লেখা পড়িতে যাওয়া, ক্ষুদ্র মানুষের পাপ!

এমন সময়, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র কোলে করিয়া ঝি আসিয়া দরোজার নিকট দাঁড়াইল। তাহার রূপার খাঁড়ুর বোলনে, গানপেড়ে কাপড়ের দোলনে, কর্ত্তার শয্যা-লুক্কাইত মুখ উঠিল না দেখিয়া, বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায়ের আদিরস বিষয়ে, আদিদেব কৃত প্রভৃত ভাগ্যবঞ্চনা লইয়া সে মনে মনে যে একখানা দারুণ করুণ রসাত্মক নাটক লিখিয়াছিল, তাহা কখন পুস্তকাকারে মুদ্রিত বা কোন বঙ্গীয় নাট্যশালায় অভিনীত হইতে দেখা যায় নাই। ঘোষজপত্নী, বোধ হয় আপনার দিনকতক পূর্ব্বের ভরা ভাদ্দর যৌবনে সে কার্য্য সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল ভাবিয়া মনটায় অনেকটা সুস্থ হইয়াছিল। তবু তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া একটা বিজয় গর্ব্বব্যঞ্জক প্রতিভা বাহির হইতেছিল। সেটা বোধ হয়, সুরেশ-চন্দ্রের সহিত বিবাহ জন্য; সর্ব্বাপরাধিনী বৌত্রেকে তাহার গিন্নীর সহিত কতকটা হিংসা ছিল বলিয়া। তবু তাহার, গৌরীর পুকুরঘাটের কাঁদ কাঁদ মুখখানা ভাবিয়া মাঝে মাঝে মনটা [illegible] হইয়া যাইত। মাঝে মাঝে [illegible] মহাসন্তোষের কারণ, সে তাহার রাত্রির আহারটা বন্ধ করিত;—এবং হরিশ্চন্দ্রের পুত্রের প্রগাঢ় নিদ্রা আসিলেও সে অনেক রাত্রি ধরিয়া খোকা ছেলে ঘুম পাড়াইবার জন্য অভিমানী কন্না-বতার গান গাওয়াতে, কোন প্রসিদ্ধি বিরুদ্ধতা দেখিতে পাইত না। অনেক-দিন, সেই জন্য সে জামাই বাবুর আঁস্তা-কুড়ের আদিরস বরদাস্ত করিয়াছিল। তবে পল্লীগ্রামের চাকরী বজায় রাখিতে, মাঝে মাঝে, তাহাকে প্রভুপত্নীর কোন নিষ্ঠুর কার্য্যে যোগ দিতে হইত। তা ভগবানের দুই আখ্যা—ক্ষুধা আর খোদা। ক্ষুধার জন্য আমরা অনেক সময় অনন্ত নরকাগ্নির ক্ষুধা শান্তির উপায় হইয়া থাকি। তবু তাহার প্রাণটা গৌরীর জন্য মাঝে মাঝে বড় খারাপ হইত। ঝির প্রাণ ছিল,—কারণ সে ছোটলোক।

ঝি আসিয়া বলিল,—"মা! বউদিদী একখানা পুরাণ কাপড় চাচ্চে। বাসন-ওয়ালী এসেছে, একটা ছোট ডিপা কিনিবে।" কর্ত্তা তখনও মুখ তুলেন নাই।

গৃহিণীর, হঠাৎ পুত্রের বিবাহ রাত্রি মনে পড়িল এবং ডিপা, পিলসুজ আদি আবশ্যকীয় তৈজসপত্র, সে রাত্রে বা কন্যার ঘর বসতির সময় না দিয়া, গৌরীর পিতা যে একটা অতি গর্হিত পাঁটীবেচার কায করিয়াছেন, তাহার চূড়ান্ত সাব্যস্ত করিয়া দিলেন। সংসা-রের লোকের আপনার যথার্থ ঋণ পরি-শোধ বিষয়ে এতাদৃশ ঔদাসীন্য দেখিয়া মৃণালিনীর ক্ষুদ্র নাসারন্ধ্রও অনেক-বার কুঞ্চিত হইয়াছিল;—এবং যে দেশে,

লোক সাধিয়া আপনার সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দেয়, এমনি কোন কল্পতরু বলিরাজার দেশ স্মরণ করিয়া তাঁহার কৃপণ বসুন্ধরার উপর বড়ই রাগ হইতেছিল। কারণ সোনা, রূপা হেতায় খুঁড়িয়া বাহির করিতে হয়। পৃথিবী কেন একটা ভয়ানক ভূমিকম্পের প্রসব বেদনা সহ্য করিয়া তাহার সমস্ত মণি রত্নময় গর্ভসঞ্চার শ্রীমন্তীর পদতলে ধরিয়া দিয়া যায় নাই। ভূমিকম্পে গিরি, গর্ত্ত, উষ্ণ জ্বালামুখী না হইলে বাঙ্গালার এই ক্ষুদ্র সাধ পুরাইলে, চতুর্ম্মুখের কি একটা মুখ খসিয়া যাইত। রাগ করিও না দেবি!— তোমার এই ভবিষ্য সংসারাগমের স্বাগত সংবাদ, বোধ হয় বৃদ্ধ, ভীমরতিশীল, ভগবানের স্মরণ ছিল না। বুড়োলোক— অনেক ভুলে।

ঝি আবার বলিল—"তা বাপু!— কি ব'লতে হবে বল। আমার এখনো বিছানা মাদুর কত্তে আছে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চ'লবে না।"

গৃহিণী। তা আবার বলব কি!— তাঁরইত দিনে সাতখানা কাপড় চাই। সুরেশও এখনো চাকরি করে নি যে, তার যতবার দরকার হবে, ততবার সিন্দুক থেকে কাপড় বেরুবে। এখনো দিনকতক তাঁকেই পুরাণ কাপড় পোত্তে হবে। সুরেশের রোজগার হলে যত পারেন, সাধ আহ্লাদ, দান খয়রাৎ কোরবেন।

চট্টোপাধ্যায় তখনও বালিশের ভিতর হইতে মুখ তুলেন নাই। কথাগুলা তাহার কাণের ভিতর দিয়া প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত, বড় ছুটাছুটী করিতেছিল। কাণ, শূন্যগর্ভ লোকের মত সকল কথাই হাঁ করিয়া গিলিতেছিল;—কিন্তু হৃদ্‌পঞ্জর প্রভৃতির দুর্গাবরুদ্ধ প্রাণ, বড় লোকের মত সে কথাগুলার বড় তীব্র, ত্বরিত অর্দ্ধ চন্দ্রের ব্যবস্থা করিতেছিল। চট্টোপাধ্যায় কেমন জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেছিলেন,—যেন কোন অজয়ের পীত বালুকাময় ধূধূ করা তীর, যেন উচ্চ তটভূমির উপর বড় বড় তালগাছ, যেন দূরে - দূরে —আরো দূরে একটী কুসুমিত অশোক তরু, যেন তাহারই পার্শ্বে তাঁহার সেই—কালরূপে আলো করা পুত্রবধূ,—যেন বহুদিনের মৃত সেই পাঁচালীওয়ালা মুকুন্দ রাম চক্রবর্ত্তী, যেন সেই মর্ত্তে নরক নিম্মাণ করা, কতকগুলা পীড়িতদস্তু, ঈষৎপূর্ণ ঔষধি বণ্টন,— সন্ধ্যার, বায়সীর ধ্বনিত সুপশব্দের মত যেন সেই—

"শোনাবে অজের ছালে,
অন্ন দিবে সন্ধ্যাকালে"—

তাঁহার উচেখাটের চারিপার্শ্বে আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইতেছে। তাহারা যেন সকলেই জীবন্ত। সকলেই যেন চট্টোপাধ্যায়ের দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া, তাঁহার শয্যার উপর ক্রমে ঘেরিয়া আসিতেছে। একটা অপাপবিদ্ধ স্ফাটিক শুভ্রতা, তাহাকে বড় ভয় দেখাইতে লাগিল। তিনি যতই নাসিতে যান, ততই তাহারা গৌতমের অভিসম্পাতের মত, একরূপ পাষাণ করা হাসি হাসিয়া, চট্টোপাধ্যায়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। চট্টোপাধ্যায়, পাষাণ হইবার ভয়ে আবার বিছানায় ফিরিয়া যান। ব্রাহ্মণ, ভীত শশকের মত আরো জোরে, চক্ষু বুজিয়া বালিশের ভিতর মুখ লুকাইলেন। হা ব্রাহ্মণ!—চোখে জল পড়ে

কেন ?—কিছু নয় !—কিছু নয় !—বুড়ার আফিম খাইবার সময় হইয়াছে !

কর্ত্তার, এবারও আপনার অপরাধ স্খালনের বিশেষ কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। তিনি আপনার দৌহিত্রের শুভ উপস্থিতি উপেক্ষা করিয়া শুইয়া রহিলেন। তাহার বংশপরম্পরাগত কৌলীন্যের নিহিত মর্য্যাদা স্বরূপ তাহাকে কোলে লইতে ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু এ শিশুকুলীনের মাতার চোক্ষে তাহা এড়াইয়া গেল না। তিনি বিস্মিত সিংহীর মত ঝির কোল হইতে খোকা বাবুকে টানিয়া লইয়া তাহার আত্ম-মর্য্যাদাহীনত্বের সংশোধন স্বরূপ দুই চপেটাঘাত বসাইয়া দিলেন। বল্লাল-সেন, এড়ুমিশ্র প্রভৃতির পরলোকগত আত্মা বিনা আয়াসে, বিনা গোলাগুলি ব্যয়ে বাঙ্গালার শাসনদণ্ডে আবার প্রতি-ষ্ঠিত হইলেন। বালক কিন্তু কান্যকুব্জা-গত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মহিমার এই পুনঃ প্রতিষ্ঠাসাধনে বিশেষ খুসী হইতে পারিল না। অতিশয় বঙ্গালের মত সে এমনি একটা বেজারা চীৎকার করিয়া উঠিল যে, তাহাতে গৃহিণী অতিশয় ক্ষিপ্রহস্তে আপনার অদৃষ্টের উপর অনেকগুলা অভিসম্পাতের বীজবপন করিয়া ফেলি-লেন, এবং কর্ত্তা তাড়া তাড়ি উঠিয়া শ্রীমান ভাইজীউর মুখচুম্বন করিতে পথ পাইলেন না। হটাৎ তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি যেন একটা দুঃস্বপ্নের নাগপাশ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। কর্ত্তা, খানিকটা অন্ধ শূন্যতার ভিতর দিয়া যেন অহর্নিশ তলাইয়া যাইতেছিলেন; হটাৎ মনুষ্য প্রাণের, সূর্য্যালোক দীপ্ত, শ্যামল গ্রহ যেন তাঁহার পদস্পর্শ করিল। তাঁহার মনে হইল, যেন বড় উপযোগী অবসরে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। আর একটু চোখ বুজিয়া থাকিলে, অনেক গুলা সন্ধ্যাকালের মিটিমিটি আলোতে বসিয়া বর্ষার অজস্রধারার ঝুপ্ঝপের মাঝে ভার্য্যাকন্যার সহিত তাঁহার অনেক সুখদুঃখের গোষ্ঠী, অনেক দিনের জন্য চোখ বুজিয়া পড়িত। জীবন মুহূর্ত্তের। এ অনন্ত কাল হইতে চৈতন্যের সাগরে একটা মুহূর্ত্তের ঢেউ। সেই নিরাপদ মাতৃক্রোড়ের উষ্ণ স্নেহের সংস্পর্শে, সেই একটা মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠে! সে স্পর্শ, অনুভব, সে অধীর আনন্দ, মানুষ যত-দিন জীবনে জাগরূক রাখিতে পারে, ততদিন সে চিন্তাহীন, বিকারহীন দেব-শিশু। সেই মুহূর্ত্তের শান্তির হিল্লোলকে, মানুষ, বাল্যকাল কহিয়া থাকে। সেই বাহিরের আলোকের সহিত, মানুষের ভিতরের আলোর কেমন একরূপ হটাৎ চিনা শুনা হইয়া যায়;—সেই এক মুহূর্ত্ত।—মানুষ, একরূপ আলোকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়,—আলোকের মত সমস্ত আকাশ জুড়িয়া বিশ্বের সকলেরই উপর প্রাণদীপা পড়িয়া থাকিতে চায়। সে মুহূর্ত্তের বর্ত্তমান হিল্লোল—কৈশোর—অনন্ত যৌবন। তাহার পর, আর এক মুহূর্ত্তে একটা অবিনয় ত্রিদিব আসিয়া আমাদের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করে;—আর এক মুহূর্ত্তে, কোন অজ্ঞাত রসায়-নের বলে মানুষ, বিরাট শূন্য-কিছুই-নয়-এর ভিতর পড়িয়া যায়। মানুষের জীবন—নিরবচ্ছিন্ন জীবন নয়;—... কতকগুলা প্রাণের মুহূর্ত্ত।

প্রচুর শূন্যতার ব্যবধানে ব্যবধানে দীপ্ত তারকাময় আকাশের মত মনুষ্য-

জীবনও, কতকগুলা অজীবনের ফাঁকে ফাঁকে, কতকগুলা দীপ্ত জীবনের মুহূর্ত্ত মাত্র। চট্টোপাধ্যায় এইরূপ জীবনামুহূর্ত্তের দাম জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া জানিতেন। তাই তাঁহাকে উঠিয়া বসিতে হইয়াছিল। গৃহের অকুশলে, কন্দর্পধ্বংসীরও হৃদয়ের সমতাবত্ব নষ্ট হইয়াছিল। এই জীবনের মুহূর্ত্তের অপব্যয়ে জীবন্ত মৃত্যু ভিন্ন, মনুষ্য জীবনের অন্য আখ্যা হইতে পারে না।

কর্ত্তা উঠিয়া বসিলেন; দৌহিত্রের আদর আরম্ভ করিলেন;—"তোর বোন হলে, ভাই, তোর সঙ্গেই বিয়ে দিব। তাহলে আর কোন গোলোযোগই থাকিবে না।" কর্ত্তার নৈতিক শিক্ষা অতীব শোচনীয়। বোধ হয়, তাঁহাদের আমলের পাঠ্য কোন সম্ভ্রান্ত টেক্‌স্‌ট্‌বুক কমিটি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইত না। বোধ হয়, বাল্যের সুখময় খেলাঘর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কতকগুলা স্মৃতির সম্পর্কহীন বর্ণসংযোগ মুখস্থকরা রূপ দারুণ ভাগ্য বিপর্য্যয় তখনকার ৩ বৎসরের বালকের ভাগ্যে ঘটিত না। বোধ হয়, তখন ৯ বৎসরের বালককে ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি, কোন ইনিস্পেক্টর আত্মীয় 'প্রস্তুত অপদার্থের স্তূপ কণ্ঠস্থ করিয়া শুধু বৃত্তির জন্য কোন পদার্থহীন পরীক্ষকের সম্মুখে কসলৎ দেখাইতে হইত না। তখন লোকে বাল্যকালে বিহঙ্গম বিহঙ্গমীর গল্পের অবসানে ২।১ টা চাণক্যশ্লোক আবৃত্তি করিত। দাতাকর্ণ, বস্ত্রহরণ পড়িয়া গুরুশিষ্যে উভয়েই কাঁদিতেন। তবু তখনকার লোক বুঝিত, বাল্যের উপকথার ভিতর এত শিক্ষা, এত উপদেশ, এতটা কবিত্ব আছে যে, তাহার সহিত বালকহৃদয় পরিচিত হইলে সে অনেকটা দুর্লভ বাণিজ্য করিয়া যৌবনের দ্বারে উপস্থিত হইতে পারে। তাই কাক, শুক, শকুনের নিরস, ভেপোপনাপূর্ণ পদ্য সংগ্রহ পড়াইয়া বাল্যকাল হইতেই মানুষকে লেখাপড়ার উপর বীতশ্রদ্ধ করা হইত না। তখন এদেশে বনজঙ্গল ছিল, সভ্যতার অনুসঙ্গী ম্যালেরিয়া বা মিউনিসিপালিটী ছিল না;—এবং সমস্ত দেশের একটা সাধারণ সরল পথ ভিন্ন, গ্রামে গ্রামে এত নানারকমের "নীতিপথ"ও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তখন বড় হইলে লোকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। তর্কবিদগণের স্থলে উভয় পক্ষ সম্মুখে শালগ্রাম রাখিয়া বিচার করিত। ৮০ বৎসর বয়সে ৮ ক্রোশ পথ, মাঠ ভাঙ্গিয়া নিমন্ত্রণ যাওয়া—দৈনন্দিন জীবনের একটা বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না। এখন কয় জন লোক বাল্যের শিক্ষা—জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে বহিয়া লইয়া যাইতে পারে? তখন অধিকাংশ লোক যা কিছু শিখিত, বাল্যেই শিখিত। বাঙ্গালা শিক্ষা.—শিক্ষকের অভাবে, নায়কের অভাবে, আজ কাল একরূপ আংশিক পরমায়ু অপব্যয়। যাহা দেশে শিক্ষা বলিয়া অভিহিত, তাহা কেবল ইংরাজ প্রকাশকের পুস্তক বিক্রয়ের প্রশস্ত বিপনি। কয়টা ইংরাজী জ্ঞান, বাঙ্গালী দখল করিয়াছে? তবে দেশে এত হাহাকার উঠিতেছে কেন? আজকাল ত বাক্‌দেবতার। পৌর্ব্বকালীন কাব্যমন্ত্র একতারায়, অনেক তার যোজনা হইয়াছে;—আজকাল ত লক্ষ্মী সরস্বতীর

পূর্ব্বতন বিগ্রহ নূতন মিলনের প্রেমোচ্ছ্বাসে পরিণত! আজ কাল ত যে জাতের যত সরস্বতী, সে জাতের তত লক্ষ্মী! তবে এদেশ এত সার্ব্ববণিক বিত্তাচর্চ্চায়ও এত লক্ষ্মীছাড়া কেন?

সে যাই হউক, আমরা স্বীকার করিলাম, কর্ত্তার ভাষায় বড় মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি সে কথা কহিয়াই 'অপ্রক্ষালিত' মুখে সন্ধ্যার উদ্যোগ করিতে বলিলেন। বোধ হয় চট্টোপাধ্যায়ের অন্তঃকরণের পরিচ্ছন্নতা থাকিলেও থাকিতে পারে।

কর্ত্তা সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। কিন্তু, সে দিন কেমন সংসারের বেড়া ডিঙ্গাইয়া মনটা, প্রকৃতির মুক্ত প্রান্তরে পৌঁছাইতে পারিতেছিল না। যেন একটা সমগ্র নিরানন্দপুরী,—সন্ধ্যাকালে সে পুরীতে কেহ জলের ঝারা দেয় না,—তারকিত আকাশ হইতে স্বর্গ আমন্ত্রণ করিয়া কেহ শঙ্খধ্বনি করে না;—এমনি একটা অন্ধকার পুরের পাষাণছায়া, ভারী ভারী, ঘন ঘন, সন্ধ্যার ছায়ার সহিত মিশিয়া তাঁহার বুক চাপিয়া ধরিতেছিল। হৃদয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে, যেথান দিয়া প্রত্যহ সূর্য্যাস্তের পর ভূর্ভুবস্বপ্রসূর সবিতার ছটা, তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিত;—সেই সব ক্ষুদ্র বিবরপথে যেন একটা পরিত্যক্ত ভগ্নগৃহের পাষাণ ভাঙাচোরা আসিয়া চলিয়া পড়িতেছিল। তাঁহার সেই অন্তরের বড় নিভৃত অন্তরে, যেখানে গৃহিণীর অপ্রয়োজনীয়, অতর্কিত প্রবেশের ভয় নাই;—যেখানে কন্যার শ্লেষাত্মক বাক্য, কখন তাহার সর্পজিহ্বা বিস্তার করিতে পারে না;—সেই প্রাণের বিজনতার মাঝে;—এই অকুশলের কারণ বুঝিয়া লইবার ইচ্ছা হইতেছিল। কর্ত্তা ভাবিতেছিলেন "কেন এমন হয়? আমারও ত মা, বোন ছিল;—কই সুরেশের গর্ভধারিণীকে ত কখন অযত্ন করে নাই! স্বর্গীয় কর্ত্তা, পিসীমার দৌহিত্রীর বিবাহে, মুখ্যকে ভঙ্গ করিয়াছিলেন। সে কুলভঙ্গের বাসে মা'ত কখন অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই! তখন জনার্দ্দনের ভোগের পর পাঁচ জন অতিথি না আসিলে মা বলিতেন—"বাবা! ঠাকুর ঘরে গিয়ে একবার জোরে কাঁসরটা বাজিয়ে এস" বোধ হয় লোকে জানিতে পারে নাই, ঠাকুরের ভোগ সারা হইয়াছে। আজ ঘরের বৌকে ভাত দিতে গিন্নির অনুগ্রহ মনে হয় কেন?" তাহার পর ফাটা ফাটা মেঘারকাশে হঠাৎ জ্যোৎস্নাভাতির মত ব্রাহ্মণের প্রাণে একটা সুখময় অতীতের ঝলকা আসিয়া গেল। ব্রাহ্মণ মুখ ফুটিয়া, ফোঁফাইয়া উঠিলেন। "বাবা বলিয়াছিলেন, এই জনার্দ্দনের সেবা করিলে গৃহের সব অকুশল নষ্ট হয়। ঠাকুর! আমি ছেলে মানুষ—বাবার ছেলে। আমার সব অপরাধ মার্জ্জনা করিও। আমার উঠানভরা মরাই, বাগানভরা তরকারি, পুকুরভরা মাছ, গোয়ালপোরা গরু—আমার কিসের অভাব? তবু আমি কেন এ সব ভোগ করিতে পাইব না।" ব্রাহ্মণ, কাহার দুইখানা চরণের উদ্দেশে দুই হাত বাড়াইয়া উপুড় হইয়া পড়িল। রামনিধি চট্টো খুব লেখাপড়া জানিতেন না। তিনি জানিতেন বাবার কথা কখন মিথ্যা হইতে পারে না;—জনার্দ্দন তাঁহাদের একপ্রবিবারভুক্ত। চট্টোপাধ্যায় কখন,

ভিখারীকে ভিক্ষা দিবার সময় ঔচিত্য, অনৌচিত্য ভাবেন নাই; তাই বোধ হয়, অত শীঘ্র ভিক্ষা চাহিতে পারিয়াছিলেন! পাড়াগেঁয়ে লোক!—

চট্টোপাধ্যায়ের সন্ধ্যার উপর ঘন রাত্রি ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল। মীমাংসা কোথায় মিলিবে? তখন কুলীনে করা কন্যা পিতৃগৃহে থাকিত। পিতৃগৃহে তাহার বসতি—মাতৃস্তন্যের মত অধিকারের বিষয়। সুতরাং তাহার জন্য গৃহকর্ত্তার প্রীতিদৃষ্টি গেরেপ্তারের তাহার কোন প্রয়োজন হইত না। তখন ভাইএর সংসারের বোন গিন্নী, একটা গৌরবের কথা। বাঙ্গালার সহমরণের অবশেষ বধূকুল হাজার যন্ত্রণা সহিয়া সে গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। ভাইএর সংসারে চুরি বা অপব্যয় বাঁচাইয়া যাহা নিজস্ব করিতে পারিতেন, তাহাতে পরজন্মে স্বামী সুখের জন্য জগদ্ধাত্রী পূজা করিতেন;—বা সকল জ্বালার অত্যন্ত নিবৃত্তিজন্য বার্দ্ধক্যে কাশী গিয়া বড় বাঞ্ছিত, বড় দেখী-করে-আসা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেন। তখন বহুবিবাহ ছিল। ভাত কাপড় পাইয়া দাসীর মত—স্বামীগৃহে থাকিয়া সমস্ত পরিবারবর্গের সুখসুপ্তির অবকাশে এক হাত ঘোমটা, একমাথা সীঁদুর, মোম দেওয়া পেটে, মিসিঘসা হাসি, আর কতগুলা জড় সড় ভাব লইয়া সহমরণের আকড়া দেওয়ার মত, ধীরে ধীরে শয্যা-প্রান্তে গিয়া স্বামীর চরণে ১টা নমস্কার করিয়া পরদিনের রন্ধনীয়ের প্রসঙ্গ করিতে পারিলে, বধূর ভাগ্যদেবতা অনেকটা প্রসন্ন বুঝিতে হইত। তখন, বধূর হৃদয় থাকিবার কোন আইন ছিল না। স্বাধীন ভর্ত্তৃকারা বড়জোর একটা কৃষ্ণ যাত্রার ভূতিগিরি, বা ভারতের অমর খেউড়ের ২।১ টা পাপড়ী ভাঙার বেশী সোহাগের কথা শুনিতে পাইতেন না। তবে, যে বাঙ্গালার ছেলে স্ত্রীকে সম্মান করে না; যে বাঙ্গালীর মেয়ে স্বামীকে ভূ-দেবত্বে বসাইতে পারে না,—তাহারা বাঙ্গালীর ছেলে মেয়ে নয়। এ ভাবটা বাঙ্গালীর মাতৃস্তন্যের গুণ;—বাঙ্গালীর কোণপরতন্ত্রতার অবশ্যম্ভাবী সহচর। তখনকার অধিকাংশ স্বামী কোন প্রাণ পরিচিত-মূলক শ্রদ্ধা ভার্য্যাকে না দিন, ধর্ম্মশাস্ত্র নজিরী সম্মানে বনিতাকে বঞ্চিত করিতেন না। উকিলের আদালত সম্মাননার মত তাহার তলায় অনেকগুলা কঠোর শাসন শুইয়া থাকিত। তখন বাঙ্গালীর মেয়ের ঈর্ষা বা মর্ম্মকাতরতা ছিল না, এমন নহে। তখন বহুবল্লভ স্বামীর বহু কলত্রের ১ হিস্যার উপসত্ব আদায় করা বড় সহজ হইত না। আবার অনেকের ভাগ্যে জীবনে ২।১ বার ভিন্ন স্বামী দর্শন ঘটিয়া উঠিত না। অনেক স্থলে মর্ম্ম কাতরতা—মুক্তকণ্ঠ পড়সী কোন্দলে আত্মনিমজ্জন করিত। তাহার পর ইংরাজ বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল,—ইংরাজী বাঙ্গালী জয় করিল। ইংরাজের মূলমন্ত্র স্বাতন্ত্র্য—আত্মনির্ভরতা। লোক দশটাকা রোজগার করিতে লাগিল, বহু বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল। বাঙ্গালীর মেয়ে প্রথম শাঁকাশাড়ী ছাড়িয়া সোণা, বারানসী দেখিল। স্বামীর কৃতীত্বের, আত্মনির্ভরত্বের আদর করিতে শিখিল। আলমারি আসিয়া এঁরো সিন্দুকেরস্থলে বসিল, গুরু পাদোদকের ক্ষুদ্র ঘটীরস্থলে কাচের পুতুল অভিষিক্ত হইল—

ছিল—

"আপনার কাপড় দলমল্ করে।
ঘরের ঘটী বাটী ঝক্ মক্ করে"।

হইল—

আয়না, চায়না, ঝক্ ঝক্ করে,
দেয়ালের ঘড়ী টক্ টক্ করে।

হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল বিস্কৃ, ব্যাবগাগিণ্ড ও বিলাতী চালচালের সহিত, কোচকেদারা প্রভৃতি, বাঙ্গালীর গৃহের তক্তপোস প্রভৃতির সহিত আপনাদের সুদূর স্বাকুলা সংস্থাপিত করিয়া ফেলিল। সিপাহী বিদ্রোহ হইল, বাঙ্গালার শাসনের ভার—কুইন ও কুইনাইনের হস্তে সমর্পিত হইল। কুইনাইন বোধ হয়—কুইন + আইন। কারণ প্রজার ম্যালেরিয়া নাশস্বরূপ বাক্ষোচিত কার্য্য ও মনুষ্য শরীরের দৌর্ব্বল্য হেতু অবৈধ নৈতিক বিদ্রোহ নিবারণ, ইহাতে উভয়ই সংসাধিত হইয়া থাকে।

ভারতের উপনিষদ অদ্বৈতবাদ, বিলাতের সার্ব্বভৌম বিজয় নিবারণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রসব করিলেন। বাঙ্গালীর বড চাকরী মিলিতে লাগিল। ইংরাজের গৃহে স্ত্রীর ১৬ আনা দখল। ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহে "মা"-স্ত্রীর হাততোলার অধীন হইলেন। তাহার পর চাকরির বাজারে আগুণ লাগিল। বাঙ্গালীর অদৃষ্টে যে ঘরপোড়া কাট মিলিল তাহাতে পূর্ব্ব লক্ষিত বিলাসিতার পূর্ণ উদরপূর্ত্তি হইল না। দান করা কন্যার পিতৃগৃহেই বসতি, অনেকটা পৈত্রিক অর্থের অযথা আক্রমন বলিয়া স্থির হইয়া গেল। গৃহিনীকুল স্বামীর উপার্জ্জনের ছায়ায় বসিয়া অকৃতী পুত্রের ভার্য্যার উপর আপনার আর্থিক পরাক্রম প্রতি চলনে ফিরণে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আবার তোমার স্নেহে বকরা না বসাইতে পারিলে তোমার গৃহে আমার বাসকরা অসম্ভব। কারণ, স্নেহই প্রকৃত গৃহস্থ। সুতরাং গৃহপালিত জামাতা, পিতৃগৃহবাসিনী কন্যা, যথাসাধ্য কর্ত্তার স্নেহ ভালবাসার ভিতর হইতে বধূগণকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া সেই শূন্য সিংহাসন দখলে প্রভূত প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। অনেক সময় কৃতকার্য্যও হইলেন। আবার এদিকে স্ত্রীশিক্ষা হইতেছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভর করিয়া বসিয়াছে। সেই বিশ্বব্যাপী দেবতার নিশ্বাস—বর্ত্তমান বাঙ্গালী কবির প্রতি নিশ্বাসে ঝরিয়া পড়ে। কবিরা, পত্নীপ্রেমকে তাহার একমাত্র পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিলেন। বাঙ্গালার আদিরসের অন্য অর্থ হইল। ঋষিদের স্ত্রীসম্মাননা বিলাতী পোষাকে বাঙ্গালীর গৃহ অধিকার করিল। তাই আজকাল ভাগ্যার মনোকষ্টে পুত্র-পারিবারিক ইষ্টে উদাসীন হন। বিলাতের শিক্ষা আসিল, বিলাতের স্বাধীনবৃত্তি, বিলাতী বিবাহের স্বাধীনতা এদেশে আসিল না। তাই বাঙ্গালীর গৃহ—কেবল গৃহহীন ইটকাঠের গাঁথুনী—কেবল ঈর্ষিত একান্নবর্ত্তী জনাকীর্ণতা। তাই বাঙ্গালীর পুত্র কন্যার মুখে আজকাল একরূপ মাপা জোপা পাটীগণিত কসা হাসি।

সাংখ্য স্বরলিপি।

বিরামচিহ্ন।

বিরামের জন্য নূতন চিহ্নের কোন আবশ্যক নাই। বিরামে সুরই অন্তর্হিত হয়; মাত্রার বিরাম নাই, মাত্রা বরাবর চলিয়া যায়; সেই হেতু সঙ্গীতে সুরটী না লিখিয়া মাত্রাচিহ্নটী রাখিয়া গেলেই তাহা সুরের বিরাম সঙ্কেত হইল। একমাত্রিক বিরামচিহ্ন ১, দ্বিমাত্রিক বিরামচিহ্ন ২ ইত্যাদি। দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি:—সা রে ১ মা। এখানে 'রে' সুরের পর ১ চিহ্নটী একমাত্রিক বিরামচিহ্ন বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ এই একমাত্রাকাল কোন সুরই গাহিতে বা বাজাইতে হইবে না। যদি এই ১ চিহ্নের স্থানে কোন সুর লিখিত হয়, তাহা একমাত্রিক সুর হইবে। সেইরূপ সা রে ২ মা থাকিলে বুঝিতে হইবে যে 'রে' সুরের পর দুই মাত্রাকাল বিশ্রাম করিতে হইবে।

কথার সংক্ষেপ।

আওয়াজ বৃদ্ধির চিহ্ন=(বৃঃ); আওয়াজ হ্রাস=(হ্রঃ); প্রবল আওয়াজ=(বঃ); মৃদু আওয়াজের চিহ্ন=(মৃ); অতি প্রবল আওয়াজ=(বঃ বঃ বা ব্বঃ); অতি মৃদু আওয়াজ=(মৃঃ মৃঃ বা ম্মৃঃ); আওয়াজের ক্রমশ হ্রাস=(ক্র—হ্রঃ); আওয়াজের ক্রমশ বৃদ্ধি=(ক্র—বৃঃ); মধ্য বল আওয়াজের=(মঃ বঃ বা ম্বঃ;

আস্থায়ী—স্থা

অন্তরা—স্ত

আভোগ—ভো

সঞ্চারী—ঞ্চ

পুনরায়—পু

তালিবিভাগ সঙ্কেত।

দুই তালির মধ্যস্থিত এক একটী ভাগকে এক একটা তালিবিভাগ বলে। প্রত্যেক তালিবিভাগ কতকগুলি মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে, যেমন কাওয়ালি তালের প্রত্যেক তালিবিভাগ চারিটী করিয়া মাত্রা অধিকার করে। গানে যে যে মাত্রায় তালি পড়িবে, সেই সেই মাত্রার পূর্ব্বে এক একটী করিয়া দাঁড়ি দিতে হইবে।

তালি ও মাত্রাবিভাগ সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য তালিবিভাগের নিম্নে মাত্রা বিভাগ লিখিতে হইবে; প্রথম তালির নিম্নে প্রথম তালির মাত্রা সংখ্যা, দ্বিতীয় তালির নিম্নে দ্বিতীয় তালির মাত্রা সংখ্যা এইরূপ ক্রমান্বয়ে লিখিতে হইবে; যথা কাওয়ালি তালের সংকেত:—

তালি। ১। ২। ৩। ০।

মাত্রা। ৪। ৪। ৪। ৪।

তালিবিভাগ সঙ্কেত স্বরলিপির পূর্ব্বেই দেওয়া হইবে।

সকল সময়ে সুরের মাথায় তালি সংখ্যা দেওয়া সুবিধাজনক নাও হইতে পারে,

এই কারণে আমরা ইচ্ছামত পূর্ব্বোক্ত তালিবিভাগ সঙ্কেতের ন্যায় অপর একটী সঙ্কেতের দ্বারায় সঙ্গীতের স্বরলিপির পূর্ব্বেই বুঝাইয়া দিব যে, আস্থায়ী প্রভৃতি কোন্ তালিতে আরম্ভ হইবে। যথা

আরম্ভ।	স্থা।	স্ত।	ভো।	ঞ্চ।
তালি।	১।	২।	৩।	০।

এইখানে বুঝিতে হইবে যে, আস্থায়ী প্রথম তালে, অন্তরা দ্বিতীয় তালে, আভোগ তৃতীয় তালে, সঞ্চারী ফাঁকে আরম্ভ হইবে। এইরূপে আরম্ভ হইয়া নিয়মিতরূপ তালিবিভাগ চলিবে।

আমাদের দেশীয়তালে যে সম্ ও ফাঁক আছে তাহার মধ্যে সমেই গানের বিশ্রামস্থান। সমেই গানটীর রীতিমত বিসর্জ্জন হয়। ফাঁক যদিও বস্তুতঃ একটী তালি ছাড়া কিছুই নহে, কিন্তু ইহাতে কার্য্যতঃ তালি দেওয়া হয় না। সমের চিহ্ন=তালি সংখ্যা অথবা সুরের পার্শ্বে বা স্থানে যুগল বিন্দু চিহ্ন বা বিসর্গ। যথা ১।২ঃ।৩।০ বা ১।ঃ।৩।০।

সমে গানটী রীতিমত বিসর্জ্জন করা হয় বলিয়া বিসর্গচিহ্ন সম বুঝাইবার বিশেষরূপ উপযোগী চিহ্ন।

গানের সঙ্গে তাল লিখিতে গেলে, যে মাত্রায় তালি পড়িবে, সেই মাত্রার উপরে বক্রবন্ধনীর মধ্যে তালি সংখ্যা লিখিতে হইবে।

তালিবিভাগ ও আরম্ভ সঙ্কেত একত্রে।

তালিবিভাগ-সঙ্কেতের মধ্যে আরম্ভ-সঙ্কেত লিখিতে গেলে, আস্থায়ী, অন্তরা প্রভৃতি যে তালি কিম্বা তদন্তর্গত যে মাত্রাতে আরম্ভ হইবে, সেই তালি বা তদন্তর্গত মাত্রার ডান পার্শ্বে আস্থায়ী, অন্তরা প্রভৃতি কথা অথবা তাহাদের সংক্ষেপ, বন্ধনী দ্বারা বেষ্টিত করিয়া লিখিতে হইবে। এবং ইচ্ছা করিলে তাহাদের সহিত 'আরম্ভ' কথাটীও যোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যথা,

তালি। ১ (স্থা, স্ত, ভো)। ২ । ৩ ।
মাত্রা। ৪ । ৪ । ৪ ।

বা

তালি। ১ (স্থা, স্ত, ভো আরম্ভ)। ২। ৩।
মাত্রা। ৪ ।৪।৪।

তালিবিভাগের সহজ কথা।

গানের আরম্ভ স্থলে ইচ্ছা করিলে না দাঁড়ি দেওয়াও যাইতে পারে। যেমন সংস্কৃত কাব্যে কোন পদের অংশ শেষ হইলে, তাহার পরে দাঁড়ি, পদের বিশেষ সমাপ্তিতে যেমন যুগল দাঁড়ি বা দ্বিদাঁড়ি বসে, গানের বেলায়ও সেইরূপ; গীতির প্রতি অংশ শেষ হইলে তাহার পরে দাঁড়ি এবং গীতের বিশেষ সমাপ্তিতে যুগল দাঁড়ি বা দ্বিদাঁড়ি বসিবে।

গীতের সম্যক সমাপ্তিতে ইচ্ছা করিলে দ্বিদাঁড়ি—ত্রিদাঁড়ি—বহুদাঁড়ি বসাইতেও পারা যায়।

গানের কথা স্থাপন প্রণালী।

সুরের নীচে নীচে কথার অক্ষর বসিবে। যথা—

। সা গা রে মা ।
। ক বে যা বে ।

গা "গা । "গা" অথবা
হ — । কে অথবা
"র্গা" রে। রে গা।
কে —। ... ল।
"র্সা" অথবা
র অথবা

"রেহ্ সাহ্" সা। সা
.. ..। ..

সা। (স্থা-পূ)। রেঃ॥॥
... (স্থা-পূ)। মে॥॥

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার পশ্চিমে চাকরী।

৩রা জুন—গ্রীষ্মকাল হইলেও সকালে কেমন মেঘের মত করিল, যত বেলা হইতে লাগিল, ততই মেঘ বাড়িয়া ঝড়ের মত করিল। দুই এক পশলা ভারি বৃষ্টি হইয়া গেল। বেশ ঠাণ্ডা পড়িল। আমরা ঠাণ্ডা পাইয়া একটু খিচুড়ীর বন্দোবস্ত করিলাম। আপনারা বোধ হয় জানেন, আমি আমার খুড়তুতো ভাইয়ের বাসায় থাকি। মধ্যাহ্নে দিব্য করিয়া ভুনি খিচুড়ী ও মাংসের ঝোল আহার করিয়া সুখে একটু নিদ্রা দিতেছি ও সিপাহী লড়াইয়ের স্বপ্ন দেখিতেছি এমন সময়ে আমার চাকর আসিয়া জাগাইয়া দিয়া বলিল—"বাবু সাহাব উঠুন শয়তান লোগ্ খাপ্পা হইয়াছে।"

তাহার 'শয়তান্ লোগ্' অর্থে সিপাহী—তাহা আমি বুঝিয়া লইলাম। মুখে জল দিতে দেরী সহিল না। আঙ্গরাখা ও কোর্ত্তা পরিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম—প্রায় আদ্‌মাইল দূরে, মাঠের সম্মুখে মহাভীড়। সেই ভিড়ে আবার কোলাহল জাগিয়া উঠিয়াছে। অনেক লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে দুই এক জন ইংরাজ অফিসারের টুপি দেখিতে পাইয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া সেইদিকে ছুটিলাম।

নিকটে গিয়া দেখিলাম Oudh Irregular দলের সিপাহীদিগের মধ্যে কাপ্তেন আশ্ সাহেব দাঁড়াইয়া। এই দল ইতিপূর্ব্বে অন্য ইংরাজ সেনানীর অধীনে ফতেগড়ে যাত্রা করিয়াছিল, কিন্তু পথের মধ্যে সিপাহীরা সেই সেনানায়ককে হত্যা করে। এক্ষণে অ্যাশ্ সাহেব ইহাদের কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছেন।

মাঠটী লোকে লোকারণ্য। এক দিকে এই সৈন্যদল আবার অপরদিকে গোলমাল দেখিয়া, ইংরাজ গোলন্দাজেরা পিস্তল ভরিয়া একবারে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের সহিত দুইটী কামান আসিয়াছে। আমার বোধ হইল একটা বক্তাবক্তি কাণ্ড না হইয়া যায় না। যাই হক ঈশ্বরেচ্ছায় সেদিন সেই মুহূর্ত্ত ভালয় ভালয় কাটিল। আশসাহেব গোলন্দাজ সেনাকে ফিরাইয়া দিয়া নিজের অধীনস্থ সেনাদিগকে

ছাউনীতে লইয়া গেলেন। জ্বলনোন্মুখ অগ্নি আপাততঃ নির্ব্বাপিত হইল বটে কিন্তু তাহার মধ্যে দাহ্যমান পদার্থ গুলির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল না।

মাঠের জনতার মধ্যে হিন্দুস্থানীর দলই অধিক। আমি সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরিয়া আসিতে আসিতে একদল হিন্দুস্থানীর মধ্যে পড়িলাম। হিন্দু ও মুসলমান উভয় বিধ লোকই এই দলে ছিল। আমি ভাবিলাম, ইহাদেরও আকার প্রকারে সিপাহী বলিয়া বোধ হইতেছে। দুচারিটা কথা ইহাদের বুঝাইয়া বলিলে হানি কি? "সুখে থাকিতে ভূতে কিলোয়" একটা প্রবাদ আছে আমি বাহাদুরী করিতে গিয়া বড় বিপদে পড়িলাম।

একজন সর্দ্দার গোছ লোককে সম্বোধন করিয়া মিষ্টভাবে বলিলাম—বাপু! তোমাদের আমি দুই চারিটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। বোধ হয় তাহা তোমরা সরলভাবে লইবে। আমার এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই—ঐ সিপাহিই বলিতেছিল "ফিরিঙ্গি লোকের মতলব আমরা বুঝিয়াছি তাহারা আমাদিগের জাতি ধর্ম্ম ও প্রাণ বিনাশ করিতে চাহে। দেখ এইমাত্র কামান আনিয়া আমাদের উপর দাগিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু শেষ ভয় পাইয়া পিছাইয়া গেল।"

এই শেষের কথাগুলা আমার ভাল লাগিল না বলিয়াই আমি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম সিপাহী সাহেব! তুমি বলিতেছ ইংরাজ অবিশ্বাসী, কিন্তু তাহারা কি অবিশ্বাসের কাজ করিয়াছে? তোমরাই ত অবিশ্বাসের পথ প্রথম দেখাইলে। এই দেখ ফতেগড় যাত্রী সৈন্যেরা কি না করিল? তাহাদের বিশ্বাসী ভাবিয়াই কোম্পানী অন্যস্থানে সহায়তার জন্য পাঠাইতেছিল, কিন্তু পথিমধ্যে তাহারা বিনা কারণে তাহাদের ইংরাজ সেনানায়ককে হত্যা করিল।"

সিপাহী। না বাবু সাহেব আপনি ইংরাজের দিকে টানিয়া বলিতেছেন। সিপাহীরা প্রথমতঃ কিছুই করে নাই। অর্দ্ধেক রাস্তা লইয়া গিয়া সঙ্গী ইংরাজ সেনার সহায়তায় সিপাহীদের অস্ত্র কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তাহাদের পোষাক কাড়িয়া লইয়া বিদায় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল কাজেই তাহারা ঐরূপ করিয়াছে। এবং ঠিক্ কাজই করিয়াছে। ইংরাজেরা আমাদের বড়ই অবিশ্বাস করিতেছে—খাজনাখানা হইতে আমাদের সরাইয়া দিয়াছে—আমরা লুঠপাঠ করি, জাত মারিবার জন্য টোটায় না পারিয়া কড়কী হইতে কলের ময়দার মধ্যে গো ও শূকরের অস্থি মিশাইয়া দিতেছে। তাহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে আমাদের "বদ্‌হারাম" (জাতিভ্রষ্ট) করে। বাঙ্গালীরা ইংরাজীর গোলামীর অর্থ বুঝিয়াছে তাই তাহারা আজও ইংরাজের জন্য ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত।"

সিপাহীর মুখে এই কথা গুলি আগ্নেয় গিরি-গর্ভ-সঞ্চিত জ্বলন্ত ধাতু স্রোতের ন্যায় বাহির হইয়া আমার চারি দিকে ভীষণ অগ্নিমণ্ডল উপস্থিত করিল। এই কথা গুলি শুনিয়া সিপাহীরা সকলে উত্তেজিত হইয়া আমার চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। একটী দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণের লোক, হাতে এক গাছা লাঠি মুখে বসন্ত চিহ্ন—চক্ষু দুইটা পাকল করিয়া আমার

দিকে ফিরিয়া বলিল—"বাবু! সিপাহীরা তোমার মত বোকা নহে। মীরটের ব্যাপারটা কি ইংরাজের বিশ্বাসের চিহ্ন! এখনও ইংরাজ আমাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করিতেছে—কেবল কানপুরে ইংরাজ সেনা কম আছে বলিয়া। সেনা-বল বৃদ্ধি হইলেই তাহারা আমাদের মীর-টের দশা করিবে। কিন্তু আমরা এত বোকা নহি যে ততদিন অপেক্ষা করিব। ইংরাজ উপর হইতে একবারে আমাদের খুব নীচে ফেলিয়া দিয়া আমাদের দফা-রফা করিয়াছে। ঐ পরশু দিন এই কাণপুরেরই একজন ইংরাজ সেনা, নায়ক, একজন ব্রাহ্মণ সিপাহীকে হত্যা করিল। শেষ কি না ইংরাজেরা গুজব রটাইলেন লোকটা পাগল হইয়া হত্যা করিয়াছে। কিন্তু বাবু! বলুন দেখি যদি একজন সিপাহী ঐরূপে একজন ইংরাজকে গুলি করিয়া মারিত তবে—কোম্পানী তাহাকে ফাঁসি কাঠে লট্‌কাই-তেন কি না?"

আমি একটু স্থির ভাবে ভাবিয়া দেখিলাম ইহাদের এরূপ উত্তেজনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে ভবিষ্যতে যাহাই হউক না কেন? বর্ত্তমানে আমারই ত সম্পূর্ণ ক্ষতি। এখনি আমার অপমান হইবার এমন কি প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা।

আমি কাজে কাজেই সেখান হইতে সরিবার চেষ্টা দেখিলাম। কিন্তু আমার চারিদিকেই উন্মত্ত হিন্দুস্থানীরা ছিল। মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, ইহাদের মধ্যে লেক্‌চার দিতে আসিয়া বড় দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি। আমি সেই মুসলমান সিপা-হীকে মিষ্ট ভাষায় সম্বোধন করিয়া বলিলাম "সিপাহী সাহেব—খাঁ বাহাদুর একবার ভাবিয়া দেখ ভাই; হিন্দু মুসল মানের জাতি লইয়া ইংরাজের কি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে? কিছুই না। কিন্তু তোমরা না বুঝিয়া নিজের পায়ে কুড়ালি মারিতেছ এই ইংরাজের নিমক খাইয়া হিন্দুস্থানের নাম কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিতেছ। বল দেখি তোমরা এমন সুখের চাকরি কোথায় পাইবে? নিয়-মিত বেতন, উৎকৃষ্ট পোষাক কার্য্যতার পুরস্কার, উপযুক্ত পদোন্নতি, বৃদ্ধ বয়সে বৃত্তি,—সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসদ আর কোথায় মিলিবে বল দেখি?

সেই মুসলমান সিপাহী আমার কথা শুনিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিল—"মিলিবে—মিলিবে—বাবু সাহেব ঢের মিলিবে। মুসলমানেরা শীঘ্রই গিয়া তাহাদের স্বজাতির দিল্লীর বাদসার অধীনতা স্বীকার করিবে।

এই কথা শেষ না হইতে হইতেই উন্মত্ত মুসলমান সিপাহীরা "দীন্" "দীন" "আল্লা" "আল্লা" করিয়া ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদের চীৎকার ভীষণ ভাবে চারিদিকে ব্যপ্ত হইল সে মুসলমানটা আমার সহিত কথা কহিতে-ছিল—সে চীৎকার করিয়া বলিল—"ভাই রে—"সফন্ সাফা" অর্থাৎ সব পরিষ্কার করিয়া ফেল।

সকলেই মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"সফন্ সাফা"। আবার এক মুহূর্ত্তের জন্য সে চীৎকার থামিল। আমি সেই বসন্ত—চিহ্নওয়ালা মুসলমানকে বলিলাম "আচ্ছা বাবু! ইংরাজ সেনানী যেন তোমাদের কাছে দোষী। কিন্তু যে সকল ইংরাজ পার্শী, বা বাঙ্গালী

ইংরাজের অধীনে চাকরি করে বা এখানে ব্যবসাদি করে তাহাদের উপর তোমাদের এত রাগ কেন? তাহারা তোমাদের কি করিয়াছে? যাহাকে বলিলাম সে কোন কথা কহিল না কিন্তু আর একজন পিছন হইতে আসিয়া লাঠি ঘুরাইয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল—"সব এক মতলব কেহই ভাল নয়, আমরা ইংরেজ বাঙ্গালী সাদা কালা সকলকেই একবার দেখিয়া লইব। বাঙ্গালী ত সাপের জাত। উহাদের ছাড়িতে নাই।" আবার সেই মহা কল্লোল "মুফ্ন সাফা" আমি এই নূতন বিপদে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। কিন্তু সহসা ঘটনা পরিবর্ত্তন হইল। ঈশ্বর যেন দয়া করিয়া আমার সেই বিপদজনক অবস্থা হইতে উদ্ধার করিলেন। সিপাহীরা যখন উত্তেজিতভাবে আমার চারিদিকে এই প্রকার গোলমাল করিতেছে তখন একজন নায়েক আমার সম্মুখে আসিয়া তাহাদের সরাইয়া দিল। খালি সরাইল না তাহারা সেই সঙ্গে দুই চারিটী ধমকও খাইল। পরে সে আমার হাত ধরিয়া ভিড়ের বাহিরে লইয়া গিয়া বিনীত ভাবে বলিল "বাবু! সাহেব আপনি ঐ উত্তেজিত সিপাহীদের ওরূপ ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ভাল করেন নাই। উহাদের রাগ যেরূপ বাড়িতেছিল তাহাতে হয়তঃ আপনার জীবন সংশয় হইত। যাই হক ঈশ্বর আপনাকে বড় রক্ষা করিলেন। যান বাড়ী চলিয়া যান। আর কখনও ইহাদের কাছে আসিবেন না।

বিপদ কিন্তু যাইয়াও যায় না। খানিকদূর গিয়াছি—দেখি—সেই সেই কর্কশভাষী কাল সিপাহী চার পাঁচ জনকে সঙ্গে লইয়া আমার আগে আগে কোথায় যাইতেছে। তাহাদের অতিক্রম না করিয়া আমার যাইবার আর অন্য পথ নাই কাজেই আমি যথাসাধ্য পাশ কাটাইয়া চলিতে লাগিলাম। তাহারা আমায় দেখিয়া বিকট হাস্য করিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল "বাবু সাহেব! তোমার কোন ভয় নাই তুমি এক কাজ কর আমাদের মত পোষাক পরিয়া মাথায় টুপি দিয়া যদি "উল্-হমদ্-উল ইল্লা-রুবিল--আল্লামীঙ" বলিতে পার তবে তোমায় আমরা আমাদের সুবাদার করিয়া ফেলি।"

হতভাগাদের বিদ্রূপবাক্যে আমার আপাদ—মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু কি করিব আমি নাচার। হঠাৎ একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাইলে কোম্পানী বাহাদুর আমাকেই দোষী ভাবিবেন। অনেক কষ্টে মনের রাগ মনে চাপিয়া বাসায় ফিরিলাম।

আমি আমার খুল্লতাত পুত্রের বাটীতে আহারাদি করিতাম একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যেখানে সিপাহীদের সহিত আমার পূর্ব্বোক্ত বচসা হয় সেখান হইতে আমার বর্ত্তমান বাসার দূরত্ব দেড় পোয়ারও অধিক হইবে না। আমার ভায়া ত সমস্ত ঘটনা আমার মুখে শুনিয়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মতলব স্থির হইল আমার পরিবর্গ যে স্থানে আছে ইহাদেরও সেইস্থানে পাঠান হইবে। আমি অন্য রাস্তা দিয়া বাঁকা পথে বাড়ীর মেয়ে ছেলেদের আমার বন্ধুর বাটীতে রাখিয়া আসিলাম।

দুই ভায়ে এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম বটে কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে ভাবনা ঘুচিল না। ভাবিলাম, যদি আমরা এখানে দীর্ঘকাল ধরিয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের সমূহ বিপদ! পরিবারবর্গ যখন কাছে অথচ তাহা'দের নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিয়াছি তখন এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত। ভাবিয়া চিন্তিয়া নূতন গড়খাই (যাহা আত্মরক্ষার জন্য সাহেবরা প্রস্তুত করিতে দিলেন) মধ্যে আশ্রয় লওয়াই যুক্তিযুক্ত বোধ হইল।

গড়খাইএর কাজ এখন অনেকটা অগ্রসর। সাবেক বারাকগুলির চারিদিকে উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ দ্বারায় বেষ্টন করা হইয়াছে। হুইলার সাহেব যেন বিদ্রোহ সম্বন্ধে নিঃসংশয়িত বিশ্বাসে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। গড়খাই (Intrenchment) মধ্যে ইংরাজ বাজ স্ত্রীপুত্র লইয়া আশ্রয় লইয়াছেন। আমি সাহেবের সঙ্গে আগে যে ঘরে থাকিতাম সেটি এখনও খালি পড়িয়া আছে। আর কাল ক্ষয় উচিত নহে ভাবিয়া দুই ভায়ে সেই গৃহে আশ্রয় লইলাম। আপীশের কাজ কর্ম্ম সমান ভাবে চলিতে লাগিল।

রোজ আপিসে যাই আসি, কিছু নূতন খপর পাই না। সেই হিন্দুস্থানী গুপ্তচরও কোন নূতন খপর আনিতে পারে না। এক দিন আমাদের আপিসের পাহারায় নিযুক্ত জন কয়েক হিন্দু-সিপাহীর সহিত কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। তাহারা সম্পূর্ণ শান্ত ও রাজভক্ত। যাহারা বিদ্রোহ চেষ্টা করিতেছে তাহাদের তাহারা "নিমক হারাম" বলিয়া গালি দিল। বিশেষতঃ ২নং দলের মুসলমান সিপাহীদের উপর তাহারা ভয়ানক বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিল। বলিল বাবু সাহেব—ঐ কাফের লোকই সকল অনিষ্টের মূল। উহারা নিজেও নষ্ট হইবে ও অপরকেও নষ্ট করিবে। ইহাদের কথা বার্ত্তা এতদূর সাবধানতা পূর্ণ যে আমি অনেক চেষ্টা ও কৌশল করিয়া তাহার মধ্য হইতে তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে অসমর্থ হইলাম।

৩রা জুন আপিসের কাজকর্ম্ম সারিয়া অপরাহ্নে গঙ্গাবধারে একটু বেড়াইতে গেলাম। সেসময়ে এমন দিনকাল পড়িয়াছিল—অন্ধকারের পূর্ব্বে নিরস্ত্র হইয়া বাহিরে থাকিতে কাহারও ভরসা হইত না। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাটী ফিরিলাম এবং সেই দিন রাত্রে যে মহা ব্যাপারের অনুষ্ঠান ঘটিবে তাহা দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

এক প্রহর রাত্রি অতীত হইয়াছে এমন সময়ে ২নং অশ্বারোহীদলের ছাউনীর দিকে একটা মহা গোলমাল উঠিল। একটা যেন হৈ হৈ, রৈ, চৈ; শব্দ পড়িয়া গেল। মহা কোলাহলে সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। সেই শব্দে অনেক সাহেব বারাকের ছাতের উপর উঠিলেন। দুই জন সওয়ার তখনই হুইলার সাহেবের ছাউনীরদিকে ছুটিল।

শব্দটা খালি গোলমাল। কতকটা ডাকাত পড়ার মত—কিন্তু তাহাতে "মার" "কাট" নাই। সহসা সেই নিবিড় নৈশান্ধকার ভেদ করিয়া দিগন্ত প্রসারিত মহা অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। দাউ দাউ শব্দে এক খানা বাঙ্গলা জ্বলিয়া গেল। আমরা সেই আলোকের সাহায্যে দেখিলাম—"দুই নম্বর দলের অশ্বারোহীগণ নবাবগঞ্জের পথ ধরিল।

ব্যারাকের কাছেই একটা সৈনিক গির্জ্জা ছিল। আশপাশে খানকতক বাঙ্গলাও ছিল। অনেক ইংরাজ হয়ত এই সময় গির্জ্জার মধ্যে বা বাহিরে অন্য কোথায় থাকিতে পারেন—এই আশঙ্কায় হুইলার সাহেব একটা বিপদ পরিজ্ঞাপক (Alarm) তোপধ্বনি করিলেন বাহিরের ইংরাজেরা সেই শব্দ শুনিয়া বারাকে ও গড়খাইএর সীমার মধ্যে ঢুকিল।

আমরা সেই—অনন্ত নীলিমাময় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কে পরিপূরিত দিগন্ত প্রসারিত নভোমণ্ডলের নিম্নে দাঁড়াইয়া কানপুরের সিপাহীদিগের প্রথম বিদ্রোহ ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলাম। যাহার জন্য এত অব্যক্ত আশঙ্কা আজ তাহা ফুরিয়া উঠিল।

সিপাহীরা প্রথমে যে পথ ধরিয়াছিল কিয়দ্দূর গিয়া তাহা পরিবর্ত্তন করিল। আমাদের তোপের শব্দ শুনিয়া তাহারা অন্য কিছু ঠাওরাইয়াছিল। যাই হ'ক তাহাদের যাইবার পথেই কমিশরিয়েট বিভাগের Cattle yard এখানে কমিশরিয়েটের হাতী, ঘোড়া, উট ও গাড়ির ও কামান টানিবার গরু থাকে। সিপাহীরা এখানে আসিয়া বাঙ্গলায় আগুন ধরাইয়া দিল। আমাদের সিপাহীদের গুলি করিল পরে গবর্ণমেণ্টের দুই তিনটা হাতী লইয়া তাহাদের গন্তব্য পথে চলিল। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাদের গতি রোধ করিবার জন্য ইংরাজ সেনানীরা কোন চেষ্টা করিলেন না।

সেদিন রাত্রে কেহ ঘুমাইতে পারিলাম না। পরদিন প্রাতে আমাদের সেনারা গিয়া কমিশরিয়েটের কাটেল-সার্জ্জেণ্টের মৃত দেহ ছাউনীর মধ্যে আনিল। পথিমধ্যে খালের ধারে তাহারা আর একটা অর্দ্ধ মৃত দেহ দেখিয়া ডুলী করিয়া তুলিয়া আনিল।

আহতের শরীরে তখনও প্রাণ আছে। অতি হীন ভাবে শ্বাস বহিতেছে। কিন্তু সংজ্ঞাহীন। প্রায় ৫।৭ জায়গায় মস্তকে ও বক্ষস্থলে তরবারির তীক্ষ্ণ আঘাত চিহ্ন। শোণিত ক্ষরণে সমস্ত বস্ত্র ঘোর লাল। এই আহত ব্যক্তি ২ নং পদাতি দলের সুবাদার হরিসিংহ।

হরিসিংহকে হাসপাতালে পাঠান হইল। হুইলার সাহেব নিজে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু ঘণ্টা খানেক পরেই সেই রাজভক্ত সিপাহী ইহলোক ত্যাগ করিল।

আটটা নয় টা বেলার সময় আমার সেই পূর্ব্ব পরিচিত হুইলারের নিযুক্ত প্রতিনিধি, বদ্রীনাথ আমায় সমস্ত খপর দিয়া গেল। সে বলিল—"বাবু সাহেব আপনি যে সিপাহীদের মধ্যে পড়িয়া ছিলেন তাহারাই বিদ্রোহী হইয়া গত রাত্রে দিল্লী চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের দলে মুসলমানই বেশী। হতভাগ্য হরিসিংহ তাহাদের সুবাদার। সে তাহাদের সহায়তা করে নাই বরঞ্চ সাধ্যমত হিতোপদেশ দিয়া তাহাদের বিদ্রোহ ব্যাপারে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিল উন্মত্ত সিপাহীরা তাহাকে তরবারে খুঁচিয়া মারিয়াছে। যাইবার সময় তাহারা কমিসেরীএট পশুশালা হইতে ৩।৪ টা হাতী ও দুই তিন টা উট্ সঙ্গে লইয়াছে। অনেক রসদ ঘি ময়দা ও লুচি লইয়াছে। মাজিষ্টর সাহেব ও পাহারার ৮ জন সিপাহীকে বধ করিয়াছে। এবং যাইবার সময় রাস্তার

লোককে ডাকিয়া বলিয়া গিয়াছে "তোমাদের আমরা এখন কোন অনিষ্ট করিব না। ভয় নাই নিশ্চিন্তে থাক। দিল্লীতে আমরা বাদসাহের নিকট চলিলাম। তাঁহার হুকুমে আমরা আবার কানপুরে ফিরিয়া আসিতেছি। আসিয়া একবার ফিরিঙ্গীদের দেখিয়া লইব।"

কলির দেবতা (নিদ্রিত)।

কঠিনে কোমল রচি,
পাষাণে কুসুম শুয়ে,
কে গো ঘুমে রূপবাণী,
বাহুতে মু'খানি থুয়ে?
উপবাসী সুর-পুর,
ভাঙ্গিতে দেবের ক্ষুধা,
এসেছে লইতে বায়ু,
অধরে মথিত সুধা?
জাগিলে মোহিনী পাছে
সুধা-চুরি টের পায়,
তাই বায়ু ভয় ভুলে
চুল ছুঁয়ে চ[illegible] যায়?
এ কেবে চাঁদের চাঁদ-
[illegible] ধরাতলে!
এ কাহার প্রেম-ধার
যেন শুধিবার ছলে?
এ কাহার ভাবে ভোর
প্রাণ-খোলা পাগলিনী?
এ কার প্রাণের মায়া
প্রেমছায়া সুগভীর?
এ কাহার সাধা গান-
ভোলা-তান বিরহীর?
এ কার প্রাণের নেশা?
এ পিপাসা ওগো কার?
প্রাণ সাদা এ প্রমদা,
চোকে ধাঁ ধাঁ সে কাহার?
কার তরে এ মোহিনী
পোষে প্রাণে প্রেম-পাখী
কার তরে এ সোহাগী
মগ্নপ্রাণে স্বপ্ন মাখি?
বুঝি এর তরে কেহ
ত্যজি গেহ উদাসীন?
বুঝি এর তরে কেহ
পথ চেয়ে নিশিদিন?
বুঝি এর তরে কেবা
নিশি দিবা পরাধীন!
এ কাহার প্রেম ফুল?
ঢুল ঢুল ভাবে ভোবা?
কে বুঝি ইহার লাগি
সব ত্যাগি ভব ঘোরা?
অজানা কোন থানে; এরি গানে
করে কেবা আবাহন?
বুঝি বা স্বপ্ন পুরে, নাদ-সুরে
করে [illegible] আরাধন?
বুঝি কে এর আশে, আছে ব'সে
বেঁধে বাসা কোন থানে,
বুঝি এ মাধুরিতে, সাধুচিতে
উঠে জেগে বেদগানে?
যেন কোথা এর কথা
কহে কেহ কাণে কাণে;
যেন কেহ এর গুণ
গাহিতেছে কোন গানে?
সরল-তরলা লোকে
আলোকিত কে রূপসী!
হৃদিরাকা ঢাকা আঁকা
মোহ মাখা ছাঁকা শশী।
অনল গরলে-সুধা
ভব-ক্ষুধা নিবারণ?
কলির দেবতা ঘুমে
মরুভূমে অচেতন?

শ্রীপ্রাণকিশোর শর্ম্মা।

গোপাল নায়ক ও আমীর খস্রু।

৩

কবি খস্রুর এই দিবান গ্রন্থ ভারতবর্ষে অত্যন্ত সমাদৃত হয়। তাঁহার নহ্‌সিপেহ্‌র (—নব—নয় সিপেহ্‌র—Sphere—স্ফুরণ) বা নবমণ্ডল একটী গূঢ় তত্ত্বপূর্ণ কাব্য; তাঁহার কিরান উস্‌সাদীন অর্থাৎ শুভযোগ নামক একটী গ্রন্থে দিল্লীপতি সুলতান মুইজুদ্দিন কাইকোবাদ ও তাঁহার সহিত সাক্ষাতকারী তদীয় পিতা বঙ্গাধিপ নসিরুদ্দিন বগরা খাঁর স্তুতি গীত হইয়াছে; তাঁহার মাখালা নামক গ্রন্থে প্রথম চারি জন খলিফা: আবু বাকর উমার উসমান এবং আলি ইঁহাদিগের স্মৃতি লিপিবদ্ধ এবং তন্মধ্যে তাঁহার ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত সুফিমন্ত্র বা সুফিসূত্র সম্পর্কীয় একটী সন্দর্ভও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তিনি খামসা অর্থাৎ পঞ্চপুঁথি নামক একটী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ১৮০০০ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক নিবদ্ধ আছে; এই পঞ্চপুঁথির অন্তর্গত পুঁথিগুলি, হাস্ত,বাহস্ত, সিকান্দর নামা, পাঞ্জগাঞ্জ, লাইলিওয়া খস্রু। পুঁথিগুলির মধ্যে পঞ্চপুঁথির 'সিকান্দর নামা'টীর প্রভাব যে প্রাচ্যে বিশেষতঃ ভারতে সাধারণ লোকের মধ্যেও বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা নেসফীল্ড সাহেবের কথার দ্বারা বেশ প্রতীয়মান হয়। নেসফীল্ড সাহেব বলেন:—সিকান্দর নামার মধ্যে খোয়াজা খিজর নামক একটী চরিত্র আছে তিনি একজন মুসলমান পীর, অমৃতকূপের উপর তাঁহার আধিপত্য; তিনি গ্রীকরাজ আলেকজণ্ডরকে, অমৃতবারি যে সকল স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই সকল স্থানে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইয়াছিল *। সিকান্দর নামান্তর্গত আলেকজণ্ডরের অমৃতপথ প্রদর্শনেচ্ছু

---

* এখানে একটী কথা মনে আইসে যে গ্রীকরাজ আলেকজণ্ডরের গৌরব মাহাত্ম্য প্রাচ্য প্রদেশে অতিশয় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ তাহা পারস্যের মর্ম্মে মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়, সে তাহার একরূপচিরশত্রু গ্রীসের বীরত্ব কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই গ্রীকবীর আলেকজণ্ডরকে লইয়া পারস্য কত স্বপ্নরাজ্য গড়ে, তাহাদের নানা গল্প গুজব চলে, (রেহাটসেক সাহেব পারসীয়দিগের আলেকজণ্ডর সম্পর্কীয় কাহিনী সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন।)

প্রাচ্যের আলেকজণ্ডর কাহিনী সমূহ পাশ্চাত্য প্রদেশকেও প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছিল, প্রতীচ্য ভূমিও তাহার অদ্ভুত অনুরক্তি হইতে অব্যাহতি পায় নাই। সেজন্যেও টগফোর্ড রুক বলেন "The third romantic story arose after the crusades and is that of the *Life of Alexander*; already alluded to as coming from the East. Its romantic wonders, fictions, and magic partly derived from the Arabian books about Eskander (Alexander) were doubled by the imagination with all the romance of chivalry; and the story became so common in England that "every wight that hath discrecioune" says Caucer, had heard of Alexander's fortune."

আলেকজণ্ডরের কথা জল্পনা হইতে তদীয় ও তদানুসঙ্গিক নাম। ঘটনা এবং তাহাদের প্রকৃত তথ্য অনেকটা অবধারিত হয়। যেমন,

পীর খোয়াজা খিজর হিন্দী ভাষায় অপ-ভ্রষ্ট ভাবে রাজা কিদর নামে কথিত হইয়া থাকে, এবং আরও এই রাজা কিদর পশ্চিমের হিন্দু দাঁড়ি মাঝিদিগের এবং জেলেজাতির মাল্লা, কেওয়াৎ, কাহার প্রভৃতি জাতিদিগের পোষক—প্রতিপালক দেবতা স্বরূপ হইয়াছেন। উহারা তাঁহাকে তাঁহাদের নৌকা বিপদে পড়িয়া যাহাতে না জলমগ্ন হয়, না ভগ্নচূর্ণ হইয়া যায় ও পথহারা হয় তজ্জন্য আহ্বান করিয়া থাকে।

পারস্য কবি খস্রু আলেকজণ্ডর কাহিনী মাত্র প্রণোদিত হইয়া শুধু যে সিকান্দরনামা নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি আইনি সিকান্দরি নামে আর একটী সিকান্দরের আইন বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নপূর্ব্বক প্রাচ্য সাহিত্য বিশেষতঃ পারস্য সাহিত্য যে সিকান্দর জল্পনা বিরহিত হইয়া থাকিতে পারে না এইটী যেন সাধারণ সমক্ষে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত খস্রুর আরও উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ অবগত হওয়া যায় যথা আইজাক খসরোই, এবং খিজিরখানি। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত কাব্য গ্রন্থটী, ভারতের ইতিহাসে মুসলমান সম্রাট আলাউদ্দিনের সময় দেওলালদেবী ও খিজির খাঁর যে প্রণয়ের কথা প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই প্রণয়কাহিনী অবলম্বন পূর্ব্বক রচিত হইয়াছে। লেথব্রীজ সাহেব খস্রুর এই প্রণয়কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে একটী দীর্ঘ পারস্য কাব্যে কবি খস্রু দেওলালদেবী এবং কিশোর বয়স্ক ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী খিজির খাঁ এই দুই জনকে নায়ক নায়িকা সাজাইয়াছেন তাহাতে নায়িকা দেওলালদেবীর মাধুর্য্য-রস যেন অসামান্য সৌন্দর্য্যের শাস্তিস্বরূপ বিষাদময় পরিণামের দ্বারা শোকময় হইয়া বিয়োগান্তভাবে অনেকটা 'ট্রাজে-ডি'র ভাবে ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

কবি খস্রুর কতদিকে যে মাথা ছিল তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ। তাঁহার বিচিত্র কাব্য গ্রন্থের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে কাব্যরাজ্যে তাঁহার নানাদিকে মস্তিষ্ক খেলিত—বিচিত্রভাবে বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পাইত। ঐতিহাসিকতা, দেবভাব, ধর্ম্ম-ভাব, প্রেম ভাব এইরূপ নানা ভাবে তাঁহার কাব্য গ্রন্থ সমূহ অলঙ্কৃত হইয়াছে। খস্রুর যথার্থ কবির ভাব ছিল; তাঁহার কল্পনা প্রাবল্য প্রকৃতই ছিল। কিন্তু

সিকান্দরনামার পূর্ব্বোক্ত কাহিনী—আলেকজণ্ডর ও খোয়াজা খিজরের ঐরূপ ব্যাপারের মধ্যে আলেকজণ্ডরের সম্বন্ধে একটী ঐতিহাসিক সত্যের আভাস দেখিতে পাই যে তিনি যুদ্ধকালে যুদ্ধযুগে সম্ভবতঃ কাহারো কথায় সহজে বিশ্বাস করিতেন না। ইতিহাসে আছে তিনি একজন মহাপণ্ডিতও ছিলেন, রাজা হইলেও গ্রীকশাস্ত্রে তাঁহার মন্দ পারদর্শিতা ছিল না। তিনি যুদ্ধ যাত্রাকালে যে ঐ মুসলমান পীরের কথা অবহেলা করিয়াছিলেন তাহার মনোরথ পূর্ণ করেন নাই ইহাতে প্রকৃত সুদক্ষ সংগ্রাম শাস্ত্রবিদেরই কার্য্য করিয়াছেন কারণ যুদ্ধকালে সকল দেশেরই রণশাস্ত্রে সহজে অপরে দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করিতে নিষেধ করে। সংগ্রামযুগে সাবধানতা ও অবিশ্বাস যেন স্বাভাবিক রণশাস্ত্ররূপে লোক-সাধারণের অন্তঃকরণে বিরাজ করিয়া তাহা-দিগকে কর্ম্মপথে শাসিত ও নিয়মিত করে। এই স্বাভাবিক রণনীতির উপর নির্ভর করিয়াই যেন শস্ত্রধারী বীর আলেকজণ্ডর পীর খোয়াজা খিজরেরও চেষ্টা ব্যর্থ করত চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

তাঁহার কবিজনোচিত ভাব একটু আমীর রাগরঞ্জিত হইয়া যেন শোভা পাইত। তাঁহার কবিত্বের মধ্যে তাঁহার আমিরী ভাবটীও অস্ত প্রচ্ছন্ন হইয়া বিরাজ করিত। তাহা হইতেই পারে হওয়া কিছু অসম্ভব নয় কারণ আমীরি ভাব তাঁহার পৈতৃক ধন, আমীর উপাধিও তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি।—খস্রুর পিতার নাম আমীর মহম্মদ সাইফুদ্দিন ছিল। সর্ব্ব প্রথম প্রস্তাবে ইহার একরূপ আভাস দিয়া আসিয়াছি—(বলিয়া আসিয়াছি যে খস্রু পলাতক রাজপুত্রদিগের অন্যতম।) খস্রুর পিতা লাচিনতুর্ক ছিলেন; বাল্‌খ অর্থাৎ বাহ্লিক প্রদেশ হইতে ভারতে আগমন পূর্ব্বক প্রথমে পাতিয়ালাতে নিবাস স্থাপন করেন।

কবি খস্রুতে তাঁহার পৈতৃক আমীরী ভাবের বিদ্যমানতাসত্ত্বেও তাঁহার জীবনে কোনরূপ আমীরী গরিমা বা বৃথা দর্পমত্ততা আধিপত্য লাভ করেন নাই কিন্তু কর্ম্মকালে আবশ্যক হইলে তাঁহার রাজপুত্রের উপযুক্ত বিক্রম তেজ কৌশল ফুটিয়া উঠিত; কিন্তু তিনি আবার এক জন মহা কবিও ছিলেন বলিয়া তাঁহার জীবনে কবিজনোচিত বিনয়ও রীতিমত আসন প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রকৃত কবি হইলেই প্রায় বিনয় তাহার কাছে আপনা হইতেই আসিয়া যুটে; বিনয় গুণ কবিহৃদয়ের একটী ধর্ম্ম বিশেষ। সকল কবিদিগের মধ্যেই বিনীত ভাবের সত্তা কেমন স্বাভাবিক প্রকৃতিগত বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব কবিরা আপনাদিগকে তাঁহাদের পদাবলীতে সদা সর্ব্বদা দাস বলিয়া উল্লেখ করতঃ বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কবি শ্রেষ্ঠ কালিদাস রঘুবংশের আরম্ভসর্গে "ক্বসূর্য্য প্রভবো বংশ ক্বচাল্প বিষয়া মতি" বলিয়া কেমন বিনয় দীনভাব জাজ্বল্যরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।—ভারতের পারস্য কবি খস্রুরও সেই কবিজনোচিত বিনতির আকর হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। দেখিতে পাইঃ—তিনি তাঁহার একটী গানে তাঁহার গুরু সুলতান নেজামুদ্দিন আউলিয়ার তুলনায় আপনাকে অতিশয় বিনীত ভাবে, দাসের ন্যায় পরিচয় দিয়াছেন—বলিয়াছেন

"দিল্লীরা নগরমে জস গাঁউ 'জেতে হরপা দছিনা সোই মের পাঁউ।
সুলতান নেজামদ্দীন তোম পরবীন হোয় অধীন কেসেকে রেঝাউ॥

দিল্লীনগরে যশোগান করিয়া যাবর্ণ দক্ষিণা অর্থাৎ বর্ণনা রচনাদির নিমিত্ত যৎসামান্য যা দক্ষিণা তাহাই পাই কিন্তু তিনি আপনাকে গুরু নেজামদ্দীনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকরভাবে প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন—

"সুলতান নেজামদ্দীন! তুমি প্রবীণ—এ অধীন দাস কি প্রকারে তোমাকে সন্তুষ্ট, করিবে—তোমার তুষ্টিবিধান করিতে সমর্থ হইবে। কবি খস্রু অত বড়লোক হইয়াও কেমন আপনাকে দীন হীন অধীনভাবে নিজগানের মধ্যে স্থাপন করতঃ গুরুভক্তির যথার্থ মর্য্যাদা ও নিজের প্রকৃত মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিনতির সঙ্গে সঙ্গে গুরুর প্রতি অবিচলিত প্রীতি শ্রদ্ধা ভক্তি কিরূপ জাগ্রত ছিল তাহা তাঁহার অন্যান্য গানের দ্বারা আরও বিশিষ্টরূপে বোধগম্য হয়। দেখিতে

পাওয়া যায় যে তিনি তাঁহার গুরু নেজামদ্দীনকে অতিশয় শোভান্বিত ও উচ্চাসনে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিম্নোক্ত প্রকারে মনোভাব প্রকাশপূর্ব্বক একটী গানে গাহিতেছেন—এতো আমার পীর নেজামদ্দীন আউলিয়া জরিখচিত বস্ত্রাদি সকলকে পুরস্কার বিতরণ করিতেছেন।—আউলিয়া সেক মসায়েকগণ উপস্থিত—ধীবভাবে মোহিত করিয়া দিতেছেন। আবার কোন একটী গানে তিনি অনেকটা মেঘদূতের বিবহ ব্যথিত যক্ষের মেঘের ন্যায় প্রীতিভাবে তাঁহার প্রিয় গুরু নেজামদ্দীনের উদ্দেশে পুরবী প্রেরণের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে নানা প্রকারে বুঝিতে পারা যায় যে খস্রুর অন্তঃকরণ যথার্থই প্রেম ভক্তি বিনতি বলে প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ করিয়াছিল এবং এই সকল কারণেই আমার ধ্রুব বিশ্বাস তাঁহার কবিত্বের মধুর সৌরভ সঞ্চারিত হইয়া দিকদশ আমোদিত করিয়াছিল, কবি খস্রুর নাম ভারতে প্রায় সর্ব্বসাধারণের প্রিয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মানবদেহ গঠনে ঈশ্বরের সৃষ্টি নৈপুণ্যের অভাব।

মুখবন্ধ।

লেখা পড়ায় অনেক দিন হইল এক রকম খতম্ দিয়াছি তবে দায়ে পড়িয়া মধ্যে মধ্যে সরস্বতীকে লইয়া টানাটানি না করিলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া একান্ত সুকঠিন বলিয়া এখনও এক এক বার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও লেখা পড়ায় মনোনিবেশ করিতে হয়। পেট বড়ই বিষম জিনিষ ইহার জ্বালায় পড়িয়া লোকে করেনা এমন কাজ নাই। চুরি বল, চামারি বল, খুন বল, জালিয়াতি বল, সকলই দগ্ধ উদরের জন্য। আমিও ঐ জঠর বহ্নির জ্বালায় অস্থির হইয়া মধ্যে মধ্যে কলম রূপ শানিত তরবারি লইয়া কাগজ রূপ যুদ্ধ ক্ষেত্রে নানা প্রকার আপনার কেরদানি দেখাই। ইহাতে যদি অপরাধ হয় কোমল হৃদয় পাঠক, বা কোমল হৃদয়া পাঠিকা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

সরস্বতীকে লইয়া টানা হিঁচ্ড়া করি বটে, কিন্তু মা জননী আমার প্রতি এমনই বিমুখ যে কিছুতেই মুখ তুলিয়া চান না। কি যে শুভক্ষণে শুভলগ্নে মাযের শুভ দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলাম কোন মতেই তাঁহার মন উঠাইতে পারিলাম না। বাস্তবিক, বলিতে গেলে আমার স্বভাবটা কেমন এক প্রকার উগ্র, সারা দিনটা যেন গম হইয়া বসিয়া থাকি, মিষ্ট কথা মুখে নাই। মেজাজের উত্তাপে কেহ কাছে আসিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করে না, এবং সময়ে

সময়ে নিজের উত্তাপে নিজেই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি। সুতরাং আরাধনা করিয়া যে মায়ের ভাল করিয়া তুষ্টিসাধন করিব সে আশা বৃথা। স্তোত্র পাঠ করিতে গিয়া হয়ত কটূক্তি করিয়া ফেলিব সেই ভয়ে ভাল করিয়া স্তবটী পর্য্যন্ত করা হয় না। আর সেই জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পার হইবা বিদ্যা ক্রমে ক্রমে চতুষ্পদী হইবার উপক্রম করিতেছে।

সকল বিষয়ে দোষ ধরা আমার একটা স্বভাব, সেই জন্যই কাহারও সঙ্গে আমার ভাল করিয়া বনিবনাও হয় না—কি দেবতা, কি মানুষ, দোষ দেখিলেই কেমন আমার মনের মধ্যে গোলমাল হইয়া যায়, সেটী বিশেষ করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে দেখাইবার জন্য কেমন এক প্রকার অমানুষিক ব্যগ্রতা উপস্থিত হয়, আর যতক্ষণ সেই অস্বাভাবিক তৃষ্ণা নিবারণ না হয়, ততক্ষণ অপর কোন কাজ করিয়া সুখ হয় না। আজ অনেক দিন নানা প্রকার রোগে, শোকে জর্জ্জরীভূত হইয়া মানব দেহের উপর অকস্মাৎ কেমন একটু সূক্ষ্ম নজর পড়ে, সেই সময় হইতে মানব দেহের নানা বিষয়ে অসম্পূর্ণতা আমার দৃষ্টিগোচর হয়। অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি, যে এই অসম্পূর্ণতা গুলি একে একে তন্ন তন্ন করিয়া সকলকে দেখাইব। আজ নানা কারণে দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ একটু ফুরসদ্ হইয়াছে তাই আপন বহুদিনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

তুমি যদি ঘোর আস্তিক এবং ধর্ম্মানুরাগী হও, অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ং মানিয়া চল, এবং ঈশ্বর নিরাকার, নির্ব্বিকার, অনাদি, অনন্ত, পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ ইত্যাদি ইত্যাদি ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রযুজ্য যত গুলি বিধান আছে সকলই বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তোমায় মানব দেহের অসম্পূর্ণতা দেখান বৃথা—কারণ তুমি চক্ষু থাকিতে দেখিবে না, ঈশ্বরের নাম শুনিয়া হয়ত নিমীলিত নেত্রে ধ্যানে মগ্ন হইয়া বসিবে, অথবা অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রুপাত করিবে, এরূপ অবস্থায় আমার অখণ্ডনীয় প্রমান গুলি তোমার নিকট উন্মাদগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ বাক্য বলিয়া বোধ হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং ঘোর আস্তিক!' তুমি এই খানেই আমার প্রবন্ধ পাঠ শেষ কর তোমার জন্য ইহা লিখিত হয় নাই। আর যদি তুমি নাস্তিক হও তাহা হইলে তোমার মতে ত ঈশ্বরই নাই তুমি বলিবে যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার আবার সৃষ্টি নৈপুণ্যের অভাব কি? অতএব, আস্তিক ও নাস্তিক এই উভয় দলের নিকট আমি প্রথমেই আমার এই ভ্রমপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। তবে যদি বল 'মানব মাত্রেই হয় আস্তিক নয় নাস্তিক, এই উভয় দলের মধ্যে কেহই যদি প্রবন্ধের যুক্তি বুঝিয়া উঠিতে না পারে, তবে এই প্রবন্ধ কাহার জন্য লিখিত হইয়াছে? তাহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই, সংসারে এমন একদল লোক আছে যাহারা অ্যাও নয় অও নয়, ইংরাজিতে যাহাদের বলে "Nither fish nor flesh nor good red herring." ইহারা ঈশ্বর আছে সাহস করিয়া বলিয়া উঠিতে পারে না আবার একেবারে ঈশ্বরের অস্তিত্বও অবিশ্বাস করিতেও সাহসে

কুলায় না। ইহারা ভাবে কি জানি যদি ভবিষ্যতে ঈশ্বর বলিয়া একটা বিষম প্রকাণ্ড পদার্থ বাহির হইয়াই পড়ে তাহা হইলেই ত মুস্কিল। ইহারা জঞ্জাল মিটাইবার জন্য স্বার্থানুরোধে একটা কি জানি কেমনতর পদার্থকে ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া লয়। ইহাদের জন্যই আজি আমি ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে কটিবদ্ধ করিয়াছি। অলমতি বিস্তরেন।

অথ প্রবন্ধারম্ভ।

দৈহিক অসম্পূর্ণতা দেখাইতে হইলে অঙ্গ বিশেষের অসম্পূর্ণতা সাধারণ অসম্পূর্ণতা হইতে পৃথক্ করা উচিত। সুতরাং প্রথমে অঙ্গ বিশেষের অসম্পূর্ণতা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১। উত্তমাঙ্গ। এই শব্দের অর্থ যে কেন মাথা হইল, তাহার মাথা মুণ্ড আজ পর্য্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই। সেটুকুও বোধ হয় সরস্বতীর কৃপা। যাহা হউক বাক্য প্রয়োগ সম্বন্ধে মারামারি না করিয়া পাঠক তোমাকে একটী কাজ বলি করিবে কি? নিজের মাথাটা একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি, যদি আমার ন্যায় জঠর জ্বালায় অস্থির হইয়া, ইতিমধ্যে সেটী ভক্ষণ করিয়া না থাক, তবে বেশ করিয়া হাত বুলাইয়া, টিপিয়া টুপিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, হেলাইয়া দোলাইয়া, দেখ উহার ভিতরে ও বাহিরে কি আছে। সামান্য পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাইবে যে বর্ত্তমান ঊনবিংশতি শতাব্দীর উচ্চাঙ্গের সভ্যতার সহিত আমাদের উত্তমাঙ্গের সামঞ্জস্য একেবারেই নাই। প্রমাণ চাও, একে একে দিব উতলা হইও না।

(ক প্রথমেই দেখিতে পাও সভ্যতার খাতিরে, সাহেব সুবোদের সহিত দেখা করিতে হইলে, কিম্বা কোন বিরাট সভায় উপস্থিত হইয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতাদি করিতে হইলে, একটী টুপির দরকার। শামলা হউক, ক্যাপ হউক, হ্যাট হউক, পাগড়ী হউক, একটা না একটা চাইই চাই। এ কথা তোমায় মানিতেই হইবে। আচ্ছা এখন জিজ্ঞাসা করি, কে বিধাতাকে মাথার দিব্য দিয়া, আমাদের নেড়ামাথায় পৃথিবীতে পাঠাইতে বলিয়াছিল? তাঁহার অসীম অপরিমেয় বুদ্ধির, তিলার্দ্ধ খরচ করিলে কি তিনি একটী মাথার উপর সুন্দর টুপি গড়াইয়া দিতে পারিতেন না? অথবা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওনকালীন যেন বিনা টুপিতেই আমরা সংসারে আসিলাম, কিন্তু তাহার পরও ত মাথার উপর সভ্যতার খাতিরে একটী গজাইতে পারিত। বিধাতা পুরুষ কি জন্য যে আমাদের অসভ্যের চূড়ান্ত স্বরূপ সংসারে Bare headed পাঠাইয়াছেন তাহার গূঢ় রহস্য আমি আজ পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারি নাই।

(খ) দ্বিতীয় কথা—আচ্ছা টুপিই যেন না হইল, একটী ছাতাও কি মাথার উপর ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গজাইতে পারিত না। বাঙ্গালার ভীষণ বর্ষায় কত দীন দুঃখী ভিজিয়া সারা হয়, এমন অর্থ নাই যে ঋতুর কঠোর নির্য্যাতন হইতে আপনাকে রক্ষা করে, এসব দেখিয়া কি বিধাতার দয়া হয় না?

স্বীকার করিয়া লইলাম যখন বিধাতা মানব সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন ছাতা বলিয়া কোন পদার্থ সংসারে ছিল না সুতরাং তাঁহার ওটা Strike করে নাই। কিন্তু আজকাল ত স্রষ্টা পথে ঘাটে স্ত্রী পুরুষের মাথায় বৈশাখের ভীষণ রোদে ও আষাঢ়ের দারুণ বর্ষার কত রকম দেশী ও বিলাতী ছাতা দেখিতেছেন, আজকাল যে সকল মানব জন্ম গ্রহণ করিতেছে, তাহাদেরই বা কোন্ ঐ Patternএর এক একটী ছাতা মাথার উপর বসাইয়া দিলেন ? তুমি ভাবিতেছ আমি অসম্ভব কথা বলিতেছি মাথার উপর এক একটী ষোল সিক ওয়ালা ছাতা বসাইয়া দিলে, মানব মাতৃগর্ভ হইতে কেমন করিয়া বাহির হইবে ? আরে ছি ! আমি সে কথা বলিতেছি না, মনে কর ভূমিষ্ঠ হইবার সময় মাথার উপর একখানি পাতলা চামড়া আছে, তাহাতে কতকগুলি শিরা আছে। সেই চামড়াখানি বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া ছত্রাকার ধারণ করিলে তোমার আপত্তি কি ? আরও মনে কর ঐ ছত্রের আকুঞ্চন প্রসারণ তোমার ইচ্ছাধীন। প্রয়োজন হইলে বিস্তৃত হইবে, আবার যখন দরকার নাই তখন আপনিই কুঞ্চিত হইয়া মাথার উপর একটী কোমল আবরণের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে ? এরূপ আকুঞ্চন কি অসম্ভব, বা মনুষ্য শরীরে দেখিতে পাওয়া যায় না ? না বুঝিয়া সুঝিয়া প্রথমেই আপত্তি কর কেন হে বাপু ? আচ্ছা, দোহাই ধর্ম্ম বল দেখি যিনি বিশ্বনিয়ন্তা, সর্ব্বপ্রকার পূর্ণতার আধার সর্ব্বশক্তিমান ইত্যাদি ইত্যাদি, যিনি অনন্ত শূন্য মধ্যে অনন্ত গতিশীল সৌরজগৎকে স্থাপিত করিয়াছেন, যিনি অনন্ত প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে অপরিমেয় অচিন্ত্য গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি সামান্য কীট পতঙ্গ হইতে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের জীবন স্রোত প্রতি মুহূর্ত্তে পরিচালিত করিতেছেন তাঁহার ন্যায় একটী বিপুল, বিশাল, অসীম নিরাকার মস্তিষ্ক, যে উনবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতার চরম সীমায় ছাতা ও টুপির আবশ্যকতা বুঝিতে পারিল না, ইহা কি সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না ?

(গ) আরও দেখ, অতি বাল্যকাল হইতে আমাদের দেশের ছেলেদের চিরুণী ও ব্রাসের সাহায্যে চুল ফিরাইতে ফিরাইতে, মাথার বোধ হয় সাত পুরু চামড়া উঠিয়া যায়। প্রথম নম্বর, প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিবার পূর্ব্বেই একবার চুল গুলি ভাল করিয়া ফিরান না হইলে, মানুষ আজ কাল সভ্য সমাজে পরিগণিত হইতে কোন মতেই পারে না। তাহার পর স্নান করিয়া উঠিয়া ত এক দম মাথার সঙ্গে রীতি মত লড়াই করিতে হয়। চুলও পছন্দমত ফিরিতে চাহে না, আমরাও কোন মতে চুলকেও ছাড়িতে চাহি না। এরূপ স্থলে হে পাঠক ! যদি ভগবান ভূতভাবন ভবানীপতি মাথার উপর একটী চিরস্থায়ী টেরীর বন্দোবস্ত করিতেন, তাহা হইলে কেমন হইত বল দেখি ; কত খানি কষ্টের লাঘব হইত। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে কয় ঘণ্টা চুল ফিরাইতে লাগে, সেই সময়ে মানব মাত্রেই কত সৎকার্য্যের

অনুষ্ঠান করিতে পারিতে। মোট কথা সভ্যতার খাতিরে যদি চুল ফিরাইতে না হইত, অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছানুসারে চুল গুলি আপনিই ফিরিত তাহা হইলে সময় ও কায়িক শ্রম উভয়েরই যে কত সংব্যবহার হইত তাহা বলিতে পারা যায় না। তুমি হয় ত বলিবে, টেরিও চাহি টুপিও চাহি ছাতাও চাই এত দাবি একত্র করিলে বেচারি বিধাতার উপর রীতিমত জবর্দ্দস্তি করা হয়। আর বস্তুতঃ যখন টুপির দ্বারাই মস্তক আবৃত রহিল, তখন আর চিরস্থায়ী টেরির, প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাহি যে আমাদের অনন্ত বুদ্ধিজীবী ঈশ্বর, এক দিনে ইচ্ছা করিলে তিন পাখী মারিতে পারিতেন। মনে কর প্রথমতঃ মাথায় যেমন চুল উঠে সেইরূপ উঠিল, ক্রমে সেই চুল গুলি চিরস্থায়ী টেরীর আকার ধারণ করিল। তার পর ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই বল, আর প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই বল, সেই টেরি প্রয়োজনানুসারে টুপির আকার বা ছাতার আকার ধারণ করিতে পারে। তুমি ভাবিতেছ তাহা অসম্ভব। কখনই নহে; যে বিধাতার বিধানানুসারে হুতাশন বৃক্ষলতাদি দগ্ধ করিয়া ফেলে, সুশীতল জল তৃষ্ণা নিবারণ করে, মেঘ বারিবর্ষণ করে, সূর্য্য আলোক ও উত্তাপ বিকীরণ করে যাঁহার সৃষ্টি কৌশলে লতা, পাতা, ফুল, ফল, হ্রদ, নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, দেশ, মহাদেশ ইত্যাদি এত জিনিষ সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। জগতে প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের চক্ষের উপর কত অলৌকিক ঘটনা ঘটিতেছে, কই তাহাতে ত আমরা আশ্চর্য্য বোধ করি না—এই বিশাল জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে যে অভেদ্য রহস্য আছে তাহার সহিত তুলনা করিলে আমি যে সকল কথা বলিতেছি তাহা মোটেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে না।

২য়। এই ত গেল মাথার কথা। তাহার পর পাঠক তোমার কাণ দুটি লইয়া একবার টানাটানি করিয়া দেখ দেখি। প্রথমেই দেখিতে পাইবে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের একটি বিশেষ দোষ আছে। এই ইন্দ্রিয়টা ইচ্ছা করিলে বন্ধ করিতে পারা যায় না। চক্ষের নিকট একটা অতিরিক্ত উজ্জ্বল পদার্থ ধরিলে আমরা কেমন চক্ষের পাতা বন্ধ করিতে পারি; কিন্তু কাণের নিকট একশত ঢাক বাজিলেও কাণের পাতা বন্ধ করা যায় না। তুমি হয় ত বলিবে কাণে আঙ্গুল দিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়। সত্য! কিন্তু বল দেখি কাঁহাতক একজন মানুষ কাণে আঙ্গুল দিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। মনে কর তুমি তোমার পাঠাগারে বসিয়া এক মনে একটা প্রবন্ধ লিখিতেছ, বাম হস্তে তোমার হুকা, দক্ষিণ হস্তে কলম, এমত সময়ে যদি রাস্তায় কোন ভীষণ কোলাহল তোমার কাণে প্রবেশ করিয়া, তোমার শীতল মস্তিষ্ককে অকস্মাৎ অতিশয় উত্তপ্ত করিয়া তুলে, তাহা হইলে তোমার কত খানি বিরক্তি বোধ হয়। তখন হুকা ও কলম ফেলিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া তুমি কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে পার? বাস্তবিক সংসারে সভ্যতার খাতিরে আজ কাল এতই অসহ্য কোলাহলময় হইয়াছে

যে আর কিছু দিন পরে এই শব্দাধিক্যের যে কোথায় শেষ হইবে তাহা বলা যায় না। সভ্যতার কেন্দ্র স্বরূপ বড় বড় যত গুলি মহানগরী আছে সর্ব্বত্রই দিবারাত্রি ভয়ানক কোলাহল। এত ভীষণ শব্দ যে ঈশ্বর কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থষ্টি করিয়াছেন ও করিতে-ছেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। আমি ত আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি পরিচালনা দ্বারা এইটুকু ঠিক করিয়াছি যে কেবল মাত্র মানুষকে জ্বালাতন করিবার জন্য সংসারকে এত কোলাহলময় করা হই-য়াছে। সংসারে শব্দের যত অপব্যয় দেখিতে পাওয়া যায় এত আর কোন দ্রব্যেরই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশাল জলধি মধ্যে প্রচণ্ড ঝটিকার সময় উত্তাল তরঙ্গ মালা যে ভয়ানক শব্দ উৎপন্ন করে তাহার অস্তিত্বের যে উদ্দেশ্য কি তাহা স্থষ্টিকর্ত্তা (যদি কেহ থাকেন) তিনিই জানেন। তুমি বলিতে পার যে উত্তাল তরঙ্গ মালা যখন আমার কাণের কাছে আসিয়া কোন গোলমাল করে না তখন তাহাদের লইয়া আমার এত মাথামাথি কেন?

স্বীকার! কিন্তু সংসারে এমন কত শব্দ আছে যাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না, অথবা যাহা শুনিলে আমার সুখের হ্রাস বই বৃদ্ধি হয় না, অথবা যাহার দ্বারা আমার সুখ দুঃখের হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই হয় না। যদি আমার কাণের পর্দ্দা ইচ্ছামত বন্ধ করা যাইত তাহা হইলে এই সকল শব্দ হইতে ইচ্ছামত নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতাম সন্দেহ নাই। মনে কর, তুমি সমস্ত দিন পরি-শ্রম করিয়া ক্লান্তদেহে দেওয়ালীর দিন রাত্রি ৯টার সময় আপন ঘরের মেজের উপর ছিন্ন কন্থা বিছাইয়া নিদ্রা যাইবার উদ্যোগ করিতেছ, তন্দ্রা আসিয়াছে ও চার মিনিটের মধ্যেই নিদ্রা আসিয়া তোমার কোটর প্রবিষ্ট চক্ষে পদ্ম হস্ত বুলাইয়া দিনের জ্বালা যন্ত্রণা তোমায় ভুলাইয়া দিবে, এমন সময় পার্শ্ববর্ত্তী বাবুদের বাটীতে ছেলেরা একসঙ্গে দশটা তাল পটকায় অগ্নি সংযোগ করিল. তুমি কোথায় সুখের স্বপ্নে ভাসিবার উপক্রম করিতেছ এমন সময় নিষ্ঠুর দুর্দ্দান্ত শব্দ তোমার নিদ্রাকে দূরীভূত করিল। নিদ্রা তুমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অকস্মাৎ শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া তোমার লক্ষ্মার বরপুত্র প্রতিবেশীদিগের প্রতি মনে মনে মিষ্ট সম্ভাষণ করিল। কিন্তু যদি তোমার চক্ষুর পাতার ন্যায় কাণের পাতা বন্ধ করিয়া ইচ্ছামত শব্দ দূর করি-বার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে কত-খানি সুবিধা বল দেখি। দীন দুঃখীর কাতর স্বর তেমন কর্ণে প্রবেশলাভ করিতে পারিত না তোমাকে প্রিয় স্বার্থ-পর বাবুদের অযথা প্রশংসা তোমায় উন্মত্ত করিয়া তুলিতে পারিত না। নীচমনা সমাজ শত্রু. পরশ্রী কাতর ব্যক্তিদিগের পরনিন্দা তোমায় সর্ব্বদা জ্বালাতন করিতে পারিত না। এক কথায়. তুমি ইচ্ছা করিলে বিশাল সংসা-রের এই তানলয় শ্রুতি কঠোর, ভীষণ, Chaotic নিনাদ তোমার কর্ণে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না। ইহা কি কম লাভ! কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্ট আর ঈশ্বরের অসীম বুদ্ধির কৌশল যে পাঁচ কাণের পাতা রুদ্ধ করিবার ক্ষমতা মনুষ্যকে দিলেই যেন তাঁহার লবণের

জাহাজ অতলস্পর্শ জলনিতলে একেবারে মুহূর্ত্ত মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাইত।

৩য়। যাক্ কাণ লইয়া অধিক টানাটানি করা ভাল নহে। কি জানি যদি ছিঁড়িয়া যায়। এবার মানবের দর্শনেন্দ্রিয়টী ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

(ক) চক্ষের এক প্রধান দোষ, ইনি পরকে দেখিতে পান, কিন্তু আপনাকে দেখিতে পান না। এ বিষম Fallacyর যে কারণ ও তাৎপর্য্য কি তাহা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে পারি নাই।

(খ) ভাল, নিজের বুদ্ধির দোষেই হউক, বা যে কোন কারণেই হউক যেন বুঝিতে অক্ষমই হইলাম কিন্তু সেই সঙ্গে চক্ষু সম্বন্ধে আর এক বিষম সন্দেহ আমার মনে উপস্থিত হইয়াছে। শরীরের যে অংশে চক্ষু দুটি বসান হইয়াছে তাহার অপেক্ষা অপর কোন অংশে বসাইলে ভাল হইত কি না। তুমি বলিবে এখন, কোন অংশে দেখাইয়া দেও। তাহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই, দেখাইতে পারি আর নাই পারি এ কথাটা কিন্তু মানিয়া লইতে হইবে যে সমস্ত মানবদেহের যদি কালি করা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে সমস্ত দেহের প্রায় অর্দ্ধাংশ চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না।

দেহের পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। মুখমণ্ডলও দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং শরীরের মধ্যে আরও অপরাপর অংশ আছে তাহা চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিগোচর নহে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, দেহের অপর কোন ভাগে চক্ষু বসাইয়া দিলে দেহের ঐ সকল অংশ দৃষ্টিগোচর হইত কি না? যদি তাহাই না হয়, তাহা হইলে চক্ষুর সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়া ঐ সকল অংশ দৃষ্টিগোচর করিলে বিধাতার কি ক্ষতি হইত? মনে কর তুমি প্রাতঃকালে উঠিয়া নাপিত ডাকিয়া তোমার চুল কাটিতে বসিয়াছ, চুল ছাঁটা শেষ হইলে ঘাড়ের চুল ছাঁটা কেমন হইল তাহা দেখিবার জন্য কতখানি ঔৎসুক্য তোমার মনে উপস্থিত হয়। তুমি দুখানি আরসী লইয়া নানা প্রকার গ্রীবাভঙ্গি করিয়া ঘাড়ের চুল দেখিবার জন্য কত চেষ্টা কর? যদি পশ্চাভাগে আর একটা চক্ষু থাকিত তাহা হইলে কি ঐ সকল কষ্টের ও ঔৎসুক্যের লাঘব হইত না?

(গ) আর একটী কথা। চক্ষের মধ্যে ভগবানকে একটী অনন্ত ফোয়ারা বসাইতে যে কে মাথার দিব্য দিয়াছিল তাহা অন্তর্যামীই জানেন। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সেই ফোয়ারা হইতে যে অশ্রুদ্গম হইতে আরম্ভ হয় তাহার আর শেষ নাই। সংসারে যত দিন বাঁচিবে ততদিনই অশ্রুজল অনবরত পড়িবে। কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন আচ্ছা অশ্রুর প্রস্রবন যেন শুষ্ক হইল তাহা হইলেই কি মানব জীবনের দুঃখ একেবারে অন্তর্দ্ধান হইবে? অশ্রুজল ত দুঃখের কারণ নহে দুঃখই অশ্রুপাতের কারণ। সুতরাং যদি মানব অশ্রুপাত নাও করিত তাহা হইলেও দুঃখের হাত হইতে এড়াইতে পারিত না। উত্তম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বল দেখি বিধাতা কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দুঃখের সঙ্গে অশ্রুপাতের কার্য্য কারণ সম্পর্ক স্থাপন

করিয়াছেন? দুঃখের কারণ হইল দুঃখ অনুভব করিলাম, হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে রহিল, মিছামিছি রাশীকৃত চক্ষের জল ফেলিবার আবশ্যকতা কি? সংসারে যত লোক প্রতিমুহূর্ত্তে ক্রন্দন করে তাহাদের বিন্দু বিন্দু অশ্রুগুলি একত্রিত করিলে বোধ হয় প্রত্যহ এক একটী প্রশান্ত মহাসাগর সৃষ্টি হয়। এই যে অগাধ জলরাশি জীব চক্ষুর মধ্য হইতে মিছামিছি নির্গত হয় ইহা কি সংসারের মধ্যে একটী বিষম অন্যায় অপব্যয় নহে? এই অশ্রুপাতে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয় না, জীবের তৃষ্ণা নিবারণ হয় না কেবল মিছামিছি কাঁদিয়া কাঁদিয়া নাসারন্ধ্র টী ঘণ্টা খানেকের মত বন্ধ হইয়া যায়, আর চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ হইবায় মস্তকে রক্তাধিক্য হয়। উপকারের মধ্যেত এই, না সুধু তাহাও নহে আরও আছে; সংসারে কত দুষ্ট লোক অশ্রুপাত করিয়া বিশাল কার্য্যক্ষেত্রের ভীষণ সংগ্রামে বিনা আয়াসে জয় লাভ করে জান কি? তোমার ভাল বাসার পাত্র অথবা পাত্রীর এক বিন্দু অশ্রুজলে তোমার ন্যায় দর্শন, বিজ্ঞানবাদির কত অখণ্ডনীয় যুক্তি একদম্ ভাসিয়া যায় তাহার হিসাব রাখ কি? যদি না রাখ বৃথা তর্ক করিও না যাহা বলি শুনিয়া যাও।

(ঘ) তর্ক স্থলে স্বীকার করিয়া লইয়াছি অশ্রুজল দুঃখের কারণ নহে দুঃখই অশ্রুজলের কারণ, কিন্তু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে অশ্রুজলের ন্যায় দুঃখের কারণ আর সংসারে নাই।

অশ্রুজল যদি দুঃখের কারণ না হইবে, তবে পরের অশ্রুজল দেখিয়া হৃদয় এত অস্থির হইয়া উঠে কেন? মুষ্টিভিক্ষোপজীবী দীন দরিদ্র, দিবারাত্রি আকাশ যাহাদের চন্দ্রাতপ, যাহারা মা লক্ষ্মীর ত্যজ্যপুত্র, শত গ্রন্থি পরিধেয়, পথের কাঙ্গাল, তাহাদের অশ্রুপাত দেখিয়া কত পাষাণ হৃদয় প্রতি মুহূর্ত্তে বিগলিত হইতেছে। সংসারের কত লোক পরের অশ্রুজল মুছাইতে গিয়া জন্মের মত নিজের সুখ সচ্ছন্দ বিসর্জ্জন দিয়াছে। অথবা পরের কথা ছাড়িয়া দেও, আপন সন্তানের চক্ষে জল দেখিলে জনকজননীর হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয় কেন বলিতে পার? এখন বিবেচনা কর, অশ্রুপাত সংসারে কত অনর্থ ঘটায়।

(ঙ) চক্ষুর সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিব। আমাদের সৃষ্টি কর্ত্তার সভ্যতার Idea টা একেবারেই নাই কারণ 19th century civilization এর মর্ম্ম তিনি অবগত হইলে আজ কাল চস্‌মা শূন্য মানব সৃষ্টি করিতে কোন মতেই সাহস করিতেন না। চস্‌মা যে কেবল চক্ষুরোগ গ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্য আবশ্যক তাহা নহে, উহা আজ কাল কার সভ্যতার Sign quanon হইয়া উঠিয়াছে। বিধাতার বয়স অধিক হওয়ায়, কারণ বোধ হয় তিনি সেটা এখনও দেখিতে পান নাই। তাঁহার উচিত আগে এক খানি ভাল নিরাকার, নির্ব্বিকার, অনাদি, অনন্ত চস্‌মা সৃষ্টি করিয়া নিজের চক্ষে লাগাইয়া দেওয়া, পরে সেই চস্‌মার বলে সভ্যতার চটক দেখিয়া আজ কালকার প্রত্যেক মানবকে চস্‌মাবৃত চক্ষে পৃথিবীতে পাঠান।

৪র্থ। আচ্ছা, এখন একবার এস পাঠক, তোমার নাকটী ভাল করিয়া পরীক্ষা করা যাউক। তুমি হয়ত বলিবে

আমার নাসিকার কোন দোষ নাই। এমন সুন্দর, সুঠাম, নাসিকা আর কাহারও নাই, সুতরাং আমার নাসিকার পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন; তুমি যতই বল, আমি কিন্তু, তোমার নাকটী লইয়া টানাটানি না করিয়া ছাড়িতেছি না। নাসিকাটী আমার মতে মনুষ্য দেহের মধ্যে একটী anomaly ইহার উপকারিতা কিছুই নাই, অপকারিতা যথেষ্ট আছে। সর্দ্দি হইলে নাক মানবকে যত জ্বালাতন করে এত জ্বালাতন আর মানুষ অন্য কোন কারণে হয় না; চব্বিশ ঘণ্টা নাক ঝাড়িতে ঝাড়িতে প্রাণান্ত উপস্থিত হয়। বিশেষ আজ কাল কার সভ্য সমাজে নাক ঝাড়ার মত পূর্ণ অসভ্যের চিহ্ন আর আছে কি না সন্দেহ। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন নাক না থাকিলে ত দম বন্ধ হইয়া দু চারি মিনিটের মধ্যে ইহ লোক পরিত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং নাকটী কোন মতে anomaly নহে, বরং বাঁচিয়া থাকিতে হইলে নাসিকাটী একটীunavoidable necessity; ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই, নাসিকার দুইটী function নিশ্বাস প্রশ্বাস ও আঘ্রাণ।

(ক) প্রথম, মনে কর আমাদের নাক নাই এখন দেখা যাউক অপর কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতে পারে কি না। আমার বোধ হয় মানব শরীরে যত গুলি লোমকূপ তাহার মধ্য দিয়া অতি সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়া উত্তমরূপ চলিতে পারে, আর ঈশ্বর ঐরূপ বন্দোবস্ত করিলে আমরা Suffocationএর ভয় হইতে নিস্তার পাই, ফাঁসি সংসার হইতে একদম্ উঠিয়া যায়, আর গলায় দড়ি দিয়া কেহই মরিতে পারে না। আজ কালকার বালক বালিকা প্রায় আফিঙ্গ খাইয়া গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করে, সুতরাং নিশ্বাসের সহিত গলদেশের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলে আত্মহত্যার একটী প্রধান উপাদান দূর করা হয়।

(খ) নাসিকার দ্বিতীয় কার্য্য আঘ্রাণ। আমার মত পরছিদ্রান্বেষী কোন পাঠক হয় ত এই সম্বন্ধে বলিতে পারেন যদি লোমকূপ দ্বারা শ্বাস ক্রিয়াই সম্পন্ন হয় তবে ঘ্রাণ ক্রিয়াও অবশ্য ঐ সকল লোমকূপ দ্বারা সংসাধিত হইবে। কিন্তু যখন কোন পূতিগন্ধময় দ্রব্য আমাদের নিকটবর্ত্তী হইবে, তখন আমরা কি উপায়ে সমস্ত দেহের প্রতিলোমকূপ বন্ধ করিব। নাসিকার দুইটী মাত্র রন্ধ্র, কোন প্রকার দুর্গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করিলে আমরা অনায়াসে কাপড় কি অঙ্গুলির দ্বারা নাসারন্ধ্র দুটি বন্ধ করিতে পারি, কিন্তু এরূপ ক্রিয়া প্রতি লোমকূপের দ্বারা ঘ্রাণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই যুক্তির যৌক্তিকতা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে পোষণ করি। কিন্তু বল দেখি পাঠক, পূতিগন্ধময় দ্রব্যের ঘ্রাণ মানুষের লইতেই হইবে, এমন কথা কোন শাস্ত্রে আছে কি?

কে বিধাতাকে কাতর স্বরে, গলদশ্রুলোচনে নাছোড় বান্দা হইয়া বলিয়াছিল হে ঈশ্বর! হে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ! হে অপরিমেয় অজ্ঞেয়, অচিন্তনীয়, অনুপমেয়, অতুলনীয়, অনির্ব্বচনীয়, অগনণীয়। অপরিসীম বিশ্বনিয়ন্তা, পরমব্রহ্ম, পুরুষোত্তম, দোহাই তোমার, সাত দোহাই, তুমি মানব মণ্ডলীকে পূতিগন্ধময়

দ্রব্যের ঘ্রান শক্তি দেও। দুর্গন্ধ দ্রব্য আঘ্রাণ করিতে না পারিলে মানবের কি ক্ষতি হইত! বিজ্ঞানবিৎ হয়ত বলিবেন আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে দুর্গন্ধময়দ্রব্য আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর। সুতরাং ঘ্রাণ শক্তির দ্বারা অর্থাৎ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ এই দুইয়ের পার্থক্য অনুভব করণ শক্তির দ্বারা আমরা অনেকটা কোন দ্রব্য স্বাস্থ্যকর ও কোন দ্রব্য অস্বাস্থ্যকর তাহা সহজে নির্ণয় করিতে পারি। ঈশ্বরের অসীম বুদ্ধি এই জন্য নাক ও মুখ এই দুই ইন্দ্রিয়কে অতিশয় নিকটবর্ত্তী করিয়াছেন; এই জন্যই আহারের সময় কোন আহার্য্য পদার্থ দুর্গন্ধ বলিয়া বোধ হইলে আমরা তাহা গলাধঃকরণ না করিয়া তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করি। জনসাধারণে বিজ্ঞানবিতেরা এই যুক্তি অখণ্ডনীয় বলিয়া বোধ করিতে পারেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি ঐ যুক্তি খণ্ডন করিতে প্রস্তুত। আমি একথা বলিতে চাহিনা যে দুর্গন্ধময় দ্রব্য কোন সময়ে আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল নহে। আমার বক্তব্য এই যে খাদ্যাখাদ্যের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য নাসিকার ন্যায় একটী কুৎসিত Unaesthetical, unpoetical, unphilosophic কুরুচি-ব্যঞ্জক ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করার কোন কারণ আমি অদ্যাপি দেখিতে পাই নাই। খাদ্যাখাদ্যের পার্থক্য যদি ঘ্রাণ শক্তির দ্বারাই করিতে হয় তাহা হইলে ঐ শক্তি জিহ্বাতে বিন্যস্ত না হইয়া নাসিকাতে হইল কেন তাহা পাঠক বলিতে পার কি?

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

শ্রীলালগোপাল চক্রবর্ত্তী,
এম্, এ,।

—————>ooo<—————

পার্ব্বতীয়া কৃষক-বালিকা।

মধুর সায়াহ্নকাল, হিমকর-স্নাত
শ্যামল প্রান্তর ভুমি, মুক্তা প্রতি শিরে।
চুরি করি ঝুম্‌কার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু
মাতায়ে তুলিছে দিক্ চতুর সমীরে।
ক্ষুদ্র এক শৈল পরে গাহিছে পাপিয়া
সমস্ত প্রকৃতি যেন স্তম্ভিত তাহায়
কেবল অদূরবর্ত্তী কানন হৃদয়ে
ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তার হতেছিল হায়!

প্রকৃতির প্রীতিফুল্ল বদন নিরখি'
মুগ্ধ আনমনে হতেছিনু অগ্রসর।
নির্জ্জন শৈলের সেই প্রান্তে—আচম্বিতে
হেরিনু বালিকা এক ত্রিদিব সুন্দর।
প্রভাত নলিন আঁখি দিঠি নয়নের,
প্রকৃতির সুশ্যামল হাসিটুকু ছানি'
গর্ব্বিত সে দেহ যেন, দেহ ভরি তার
পূর্ণতার কি উচ্ছ্বাস আকুলিছে প্রাণী।

কুসুমিত বসন্তের তরুণ প্রভাত,
স্নিগ্ধ শান্ত শরতের মধুর যামিনী—
ভ্রমি যবে নিরজন কাননে পর্ব্বতে
সুন্দর বলিয়া বটে মনেতে বাখানি।
কিন্তু নারী স্বভাবের চির প্রিয় শিশু।
সকল মাধুরী-শোভা একত্রিত সেথা।
হেরি ওই পার্ব্বতীয়া বালিকার রূপ
বোধ হয় প্রকৃতির আর সব আধা।

কৃষক বালক যদি হইতাম আমি,
ওই বলিকার সনে প্রভাত সন্ধ্যায়—
প্রকৃতির সুবিশাল লগ্ন বক্ষ' পরে
মনোসুখে খেলিতাম, থাকিতাম হায়!
শুচি ঠোঁটে সোহাগের চুম্বন পরশে
স্বরগের রুদ্ধ দ্বার যাইত খুলিয়া,
সারাটি জীবন ভরি কিবা সুখে দুঃখে
পিয়িতাম সে মাধুরী অঞ্জলি পুরিয়া!

সংসার! ফিরিয়া লও ধন মান যশ,
শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান গর্ব্ব যা কিছু তোমার।
ও কেবল জীবনের বিড়ম্বনা-ভার,
মনুষ্যত্ব পদে দলি' মানুষ আবার!
ওই দূর শৈল-প্রান্তে অর্কটী-ছায়ায়
নিরমিয়া একখানি সামান্য কুটীর
চরাইব মেষপাল, হেরিব আনন্দে
স্বভাব সৌন্দর্য্য ওই পার্ব্বত্য দেবীর।

শ্রীঃ—

চন্দ্রশেখর।

(সমালোচনার প্রতিবাদ)।

এই "চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান ও সমী-রণে" গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ষ্টার থিয়েটারে "চন্দ্রশেখর" অভিনয়ের এক বিস্তৃত সমালোচনা বাহির হইয়াছে। চন্দ্রশেখর অভিনয়ের পর অনেকস্থলে অনেক কথা হইয়া গিয়াছে কিন্তু সমীরণের প্রবন্ধে ইহার সমালোচনা একটু বিশদ ও পরিস্ফুট ধরণের। লেখক তাঁহার প্রবন্ধে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নাটকীয় চরিত্রগুলির সমালোচনার সহিত অভিনয়ের সমালোচনা করিয়াছেন।

ইহার পর "অনুশীলন" নামক এক নূতন মাসিক পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় চন্দ্রশেখরের আর এক সমালোচনা বাহির হয়। সমালোচক তাঁহার বক্তব্য মধ্যে সমীরণে প্রবন্ধ লেখকের সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই কিন্তু উক্ত পত্রের তত্ত্বাবধায়ক পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন "অনুশীলনের লেখক, কোন কোন স্থলে প্রকারান্তরে সমীরণের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা অনুশীলনে কোন প্রকার "প্রতিবাদের" একটিও বিশেষ চিহ্ন পাই নাই।

উভয় লেখকই অভিনয় দেখিয়া স্ব স্ব স্বাধীনমত প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য কেহই দোষী নহেন। অভিনয় দেখিয়া যিনি যেমন বুঝিয়াছেন তিনি সেইরূপই নিজ নিজ মত অভিব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু অনুশীলনের লেখক কিছু মুরুব্বিয়ানা চালে চলিতে গিয়া স্বাধীন সমালোচনার ধুয়া ধরিয়া কতকগুলা বাজে কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। সেইগুলির এখন পর্য্যন্ত কেহ কোন প্রতিবাদ করিলেন না দেখিয়া অগত্যা আমায় অনিচ্ছার সহিত এ কার্য্যে ব্রতী হইতে হইল। অনুশীলনের বিজ্ঞ সমালোচক মহাশয়, অনেক অংশে অনেক অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য এবং উপহাসাস্পদ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রবন্ধের আগাগোড়াই একটি কেমন তর একদেশদর্শিতার ভাব আনিয়া ফেলিয়াছেন।

চন্দ্রশেখর সমালোচনা, এমন একটা বিশেষ রাজনৈতিক সমস্যা, বা সমাজ সংস্কারে কূট প্রশ্ন নহে যাহা লইয়া এতটা বাদ প্রতিবাদ মসী ও লেখনীর অবিশ্রান্ত সংঘর্ষণ চলিবে। তবে যে ইহার বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইতেছে তাহা কেবল নাটকাভিনয়ের গৌরব রক্ষার্থে।

চন্দ্রশেখর সম্পূর্ণরূপে সাহিত্যের সম্পত্তি। এই সম্পত্তি রক্ষার জন্য বাদ প্রতিবাদ হওয়াটা নিতান্তই যে অনাবশ্যকীয় এরূপ নহে। এ পর্য্যন্ত নাট্যশালায় অনেক নাটক না-মিষ্ট অভিনয় হইয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহার মধ্যে দুই চারিখানি ছাড়া প্রকৃত নাটকীয় গুণ অতি অল্প পুস্তকেই আছে। যেগুলির আছে

সেগুলি দেখিয়া লোকের কৌতুহল ও আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি লাভ করিয়াছে। এতদিন নাটকাভিনয় উপভোগের প্রকৃত আনন্দ এক-স্রোত বাহী হইয়া এক বিশিষ্ট শ্রেণীর দর্শকের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। চন্দ্রশেখরের অভিনয় অনেক দিনের পর প্রকৃত নাটকীয় সৌন্দর্য্যের উৎস খুলিয়া দিয়াছে অনেক দিনের পর অসাড় ও এক ঘেয়ে নাট্যমঞ্চে আবার এমন একটি খরস্রোত বহাইয়াছে—যাহাতে পাঁচ মাসের উপর হইল এমন কি আজও পর্য্যন্ত শত শত দর্শক সমানভাবে এই অভিনয় দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিতেছেন।

ইংলণ্ডের এক জন প্রতিভাশালী সমালোচক কোন বিখ্যাত নাটকাভিনয় সমালোচনাব্যপদেশে বলিয়াছিলেন—রঙ্গালয়ে যতদিন পর্য্যন্ত না কাব্যাভিনয় দর্শনামোদী সাহিত্যবিদ্‌গণের ঘন সমাবেশ হইতেছে ততদিন প্রকৃত নাটকীয় গুণ সম্পন্ন পুস্তকাভিনয়ে ষ্টেজ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। অমৃত বাবুর নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত চন্দ্রশেখরের অভিনয়ে বাঙ্গালার Literary classএর যত আমদানি হইয়াছিল ও এখনও হইহইতেছে এরূপ বোধ হয় বঙ্কিম বাবুর অন্য কোন পুস্তকের অভিনয়ে হইয়াছিল এরূপ ত বোধ হয় না।

নাট্যাভিনয় দর্শন একটি অপূর্ব্ব আমোদ। চক্ষুকর্ণাদি দুইটি প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয়ের সহায়তায়, ইহাতে মানস-জগতে এক অপূর্ব্ব ভাবের তরঙ্গ বহাইয়া দেয়। প্রকৃত অভিনয় উপভোগ কয় জনে করিতে পারেন? বিশেষতঃ যাঁহারা ক্রিটিকের ভাবে আত্মভোর হইয়া—তাঁহাদের মতামতের উপর সর্ব্বস্ব নির্ভর করিতেছে; এরূপ ভাবিয়া অভিনয় দেখিতে যান—তাঁহারা অভিনয় উপভোগ করা দূরে থাক—আত্মগরিমার গরমে, স্বাধীন ভাবের উন্মত্তার মধ্যে ডুবিয়া অভিনয়ে কোন সৌন্দর্য্য থাকিলেও তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না।

অনুশীলনের লেখক মহাশয়, "চন্দ্রশেখর" অভিনয়ের পথে যে সমস্ত বাধা বিপত্তি আছে—ইহার নাটকাকারে পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে সমস্ত অসুবিধা আছে, তাহার আলোচনা করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই বলিয়াছেন,—"আরও সুখের বিষয় যতটুকু সাফল্য লাভ আশা করা যায় এ অভিনয়ে তিনি (অমৃত বাবু) তাহাও লাভ করিয়াছেন। যাহা অভিনয় করা কঠিন তাহাই অভিনয় করিয়া তিনি সহস্র সহস্র লোককে মুগ্ধ করিতেছেন। গ্রন্থকর্ত্তা জীবিত থাকিলে অমৃত বাবুর প্রতি সাধারণতঃ সন্তুষ্ট বই রুষ্ট হইতেন না।"

লেখক নিশ্চয়ই এক জন সুবিবেচক লোক। কারণ যতটুকু সাফল্য লাভ আশার সীমার মধ্যে—অমৃত বাবুর অভিনয় তাহাই লাভ করিয়াছে এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। আশার অতীত জিনিস জগতে কে কোথায় পাইয়াছে? যাহা অভিনয় করা কঠিন তাহাও অমৃত বাবু অভিনয় করিয়া শত সহস্র লোককে মুগ্ধ করিতেছেন—এ কথাও তিনি বিশেষ উদারতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পরই তিনি আবার বলিতেছেন—"অভিনয় সৌকর্য্যের জন্য যে "চন্দ্রশেখর" লোকপ্রিয় হইয়াছে—তাহা

নয়। নাটকাকারে চন্দ্রশেখর যে উপন্যাসাকার হইতে অধিক হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে তাহাও নহে।• অমৃত বাবু রঙ্গমঞ্চে কয়েকটি অতি সুন্দর দৃশ্যপটের অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া। ইহার একটি দৃশ্যপট জ্যোৎস্নালোকে বিধৌত নায়ক নায়িকার নদীবক্ষে সন্তরণ, নূতন ও সুন্দর। এই এক দৃশ্যের জন্যই চন্দ্রশেখরের অভিনয় অন্যান্য অনেক নাটকাভিনয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।”

পাঠক! বোধ হয় লেখকের মন্তব্যের অসারতা এই দুইটী মন্তব্যের তুলনায় উপলব্ধি করিয়াছেন। উপরোদ্ধৃত অংশ দুইটীর তুলনায় তাঁহার উক্তির অসামঞ্জস্যতা বেশ স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। তিনি সর্ব্বপ্রথমে বলিয়াছেন—“এ অভিনয়ে যতটুকু সাফল্য আশা করা যায় তাহাই হইয়াছে” আবার বলিতেছেন কেবল অদ্ভুত দৃশ্যপট দেখাইয়া অভিনয় লোকপ্রিয় হইয়াছে!! বড় পরিষ্কার ও যুক্তিসঙ্গত মন্তব্য!! উভয়ের মধ্যে মতের সঙ্গতিও যথেষ্ট!! আমরা বলি বঙ্গদেশ কি আজকাল এত অপদার্থ ও অন্তঃসার শূন্য হইয়াছে যে, দুই একখানি দৃশ্যপট দেখিবার প্রলোভনে দর্শকেরা অগণ্য জনতা করিয়া পাঁচ ঘণ্টা রঙ্গালয়ে নিশি যাপন করেন? বস্তুতই যদি ইহা প্রকৃত ঘটনা হয়, তাহা হইলে চন্দ্রশেখরের অভিনয় অসফল হইলেও অনুশীলনের প্রবন্ধলেখক ছাড়া আর কাহারও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বঙ্কিম বাবুর দুর্ভাগ্য ত ঘটিয়াছে—ততোধিক ঘটিয়াছে অমৃত বাবুর ও দর্শকবৃন্দের। কারণ লেখক মহাশয়ের মতে অসার দর্শকেরা, মৎস্যলুব্ধ মার্জ্জারের ন্যায় পাঁচ ঘণ্টা খালি ছবি দেখিবার আশায় জাগিয়া বসিয়া থাকেন। কেবল দৃশ্যপট দেখাইয়া অভিনয় সাফল্য লাভ করিয়াছে একথা যিনি বলিতে পারেন তিনি হয় অভিনয়ের সার্থকতা ও সাফল্য উপলব্ধি করিতে পারেন না—না হয় তিনি Allwise সলোমানের ন্যায় বিজ্ঞতার চসমা চোখে দিয়া অভিনয়টিকে আগাগোড়া নিন্দা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া গিয়াছিলেন। সমালোচকের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা যেরূপই পরিবর্ত্তিত হউক না কেন, মূল চরিত্রের সৌন্দর্য্য কোনমতেই নষ্ট হয় না। বাল্মিকীর রাম—কালিদাস ভবভূতি হইতে আরম্ভ করিয়া, আজ কালকার দাশুরায় মতিরায় প্রভৃতি সকলের হাতেই ঘুরিয়া যাইতেছেন। তত্রাপি কি রামচরিত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে? যাহা খাঁটি জিনিস, যাহা প্রকৃত রত্ন—সেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন স্বাভাবিক নিয়মে বাধ্য হইয়া তাহার গুণরাশি তাহা হইতে পৃথক থাকিবে না। চন্দ্রশেখর কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিয়া লইলে ষ্টারের ন্যায় একটি প্রধান ও প্রতিষ্ঠাশালী রঙ্গমঞ্চে তাহার সৌন্দর্য্যের যে সমূহ অপচয় হইয়াছে একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

তার পর লেখক বঙ্কিম বাবু জীবিত থাকিলে যেরূপ ভাবে অভিনয় সমালোচনা করিতেন, মতামত প্রকাশ করিতেন ঠিক সেই ভাবে না হউক—“সেই ধরণে সেই ভাবে সেইরূপে” এই নূতন নাটকের সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর ধরণে তিনি প্রথমেই বলিতেছেন—

"চন্দ্রশেখরকে নাটকাকারে পরিণত করায় নাটকাকারের একটি প্রধান ত্রুটি লক্ষিত হয়। যাঁহার উপন্যাসখানি পড়া নাই, তিনি চন্দ্রশেখর অভিনয়ের অনেক স্থলেই বুঝিতে পারিবেন না" চন্দ্রশেখর নাটকাকারে অনেক স্থলেই অসম্পূর্ণ। যদি উপন্যাস পড়া না থাকিলে অভিনয় বুঝিতে ক্লেশ হয়, যদি ইহার অভিনয় দর্শনের পরেও উপন্যাস খানি পাঠ করা আবশ্যক হয় তবে ইহা যে নিতান্ত অসম্পূর্ণ ভাবে নাটকাকারে পরিণত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।"

ইহার ভিতর একটু কথা আছে। লেখক মহাশয় কেন যে তাহা ভাবেন নাই তাহার কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিতেছি না। কতকগুলি পুস্তক আছে তাহার অভিনয় দেখিতে গেলে মূল পুস্তক পাঠের আদৌ প্রয়োজন নাই। সেগুলি অবশ্য সাধারণের জানিত ঘটনাবলীর মধ্য হইতে গ্রথিত। পৌরাণিক ঘটনা-প্রাণ নাটকগুলি ইহার উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাইতে পারে।

কিন্তু কাব্যের প্রকৃত লক্ষণ বিশিষ্ট পুস্তকাভিনয় দর্শন ব্যাপারে পুস্তক পাঠ নিতান্ত আবশ্যক। আগে হইলে ত কথাই নাই কিন্তু অভিনয় দেখার পরও পুস্তক পাঠের প্রবৃত্তি বড়ই জাগিয়া উঠে। মনে করুন ভবভূতির "উত্তর রামচরিত" অভিনয় হইতেছে এস্থলে রামচরিতের সমস্ত ঘটনা জানা থাকিলেও, একবার পুস্তকখানি পাঠ করা আবশ্যক। সেটুকু কেবল ঘটনার অবগতির জন্য নহে, কবি কিরূপে তাঁহার কাব্যে নাটকীয় চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, তাহারও হৃদয়ঙ্গম জন্য। রামচরিতের ঘটনা সকলেই জানেন, তবে এরূপস্থলে "উত্তর রামচরিত" কেন পাঠ করিতে হয়?

উত্তর রামচরিত ছাড়িয়া দিই। "ম্যাকবেথ" বা "হ্যামলেট" ইংরাজী শিক্ষিতের মধ্যেও অনেকেই জানেন। যখন তাঁহারা পুস্তকগুলির অভিনয় দেখিতে যান তখন কি তাঁহারা পুস্তক পাঠ করিয়া যান না? * যাঁহারা নাটকের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করিতে যান, তাঁহারা অভিনয় দেখিবার পূর্ব্বে পুস্তকখানি দুই চারিবার পাঠ করেন। ইহা সাহিত্যগত প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী ধর্ম্ম।

চন্দ্রশেখরের নাটকাকারে পরিবর্ত্তন সমজদার লোকের পক্ষে এতদূর অস্ফুট ও দুর্বোধ হয় নাই যে অভিনয় দেখিবার জন্য মূল গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। যাঁহাদের বুদ্ধি বৃত্তি ও ঘটনা বোধগম্য ক্ষমতা এত অল্প তাঁহাদের এ প্রকার পুস্তকের অভিনয় না দেখাই উচিত। চন্দ্রশেখর নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া সাফল্য লাভ করিয়াছে কি না একটি ঘটনা (যাহা আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি) হইতেই প্রমাণিত হইবে। যাঁহারা বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখরের নাম পর্য্যন্ত জানিতেন না এমন অনেক ইংরাজি নবিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য

---

* আমি জানি Herr Bandman যখন কলিকাতায় Hamlet অভিনয় করিয়াছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অলঙ্কার স্বরূপ অনেক গ্রাজুয়েট বই হাতে করিয়া নাট্যশালায় গিয়াছিলেন। প্রবীণ সম্পাদক নাইটকে এরূপভাবে দেখিয়াছি।

ব্যক্তি ইহার অভিনয় দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে পুস্তক কিনিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের অভিনয়ে পুস্তকের কাটতি আরও বাড়িয়া গিয়াছে একথা বঙ্কিম বাবুর কোন পরমাত্মীয়ের মুখে আমরা শুনিয়াছি।

তার পর লেখক আর এক স্থলে বলিতেছেন "পুস্তক পাঠে যে জীবন্ত ভাব দেখিতে পাওয়া যায় অভিনয়ে তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। চন্দ্রশেখরের অভিনয়ে শৈবলিনী, চন্দ্রশেখরকে রক্তমাংসে দেখিবার আশা করা অন্যায় নহে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে পুস্তক পাঠে যে শৈবলিনী, প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর দেখিতে পাই অমৃত বাবুর অভিনয়ে তাহা পাই না। তাহা না পাইবারই কথা। চন্দ্রশেখরের চরিত্রগুলি এক প্রকার Ideal. আইডিয়ালের প্রকৃত আদর্শ দেখান পুস্তক লেখা অপেক্ষাও অসম্ভব। কেই বা কখন, কোথায় পারিয়াছেন? বাল্মিকী রাম লক্ষণ রাবণ সীতা যেরূপ ভাবে চিত্র করিয়াছেন ভবভূতি ও কালিদাস যেরূপ ভাবে তাঁহাদের চিত্র সাধারণের সমক্ষে ধরিয়াছেন—সেক্ষপীয়ার তাঁহার চরিত্রগুলি যেরূপ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন আমরা কি ষ্টেজে তাহার প্রকৃত আদর্শ দেখিতে পাই? আজানুলম্বিত বাহু প্রশান্ত বদন; নবদুর্ব্বাদলশ্যাম কিরীট কুণ্ডল শোভিত ইন্দীবর-নয়ন রাম তাঁহার দেবভাব ও গাম্ভীর্য্য কি আমরা ষ্টেজের উপর দেখিতে পাই? ষ্টেজের উপর লম্ফঝম্ফ পরায়ণ বীরপুঙ্গব ধানুকী বাঙ্গালীই কি বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের সজীব রক্তমাংসের পরাকাষ্ঠা নিদর্শন! তাঁহার অভিনয়ই কি রামচরিত্রের বিচিত্রভাবের পরিচায়ক? যাত্রার শ্রীকৃষ্ণ কি সেই ভগবানরূপী মহাভারতীয় শ্রীকৃষ্ণ? ষ্টেজে যাহাকে সীতা দেখিতে পাই তাহা কি ভবভূতির সেই প্রেম গর্ব্বিতা অভিমান স্ফুটিতা রাজরাজেন্দ্রাণী সীতা? ষ্টেজে যাহাকে শকুন্তলা দেখিতে পাই তাহা কি সেই তপোবন পালিতা কমনীয়তার ক্রীড়াভূমি কুসুমকোমলা ব্রীড়াময়ী প্রেমাভিভূতা, তাপস বালিকা শকুন্তলা? ইংরাজি থিয়েটারে হ্যামলেট, ম্যাকবেথ সিজার দেশডেমিনা, ক্লিওপেট্রা কি সেই প্রতিভাময় কবির সুকুমার শিল্পের চরমোৎকর্ষ উদাহরণ! লেখক নিজেই চন্দ্রশেখরের চরিত্রগুলিকে Ideal বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহার উৎপত্তি কল্পনার লীলাক্ষেত্রে-তাহাকে প্রকৃত শরীরিভাব বিশিষ্টকরা কি লেখক সহজ কথা মনে করেন? লেখকের ন্যায় এক জন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি Ideal কে real করিয়া দেখানর পথে যে সমস্ত অন্তরায় ও অসুবিধা আছে তাহা যে বুঝিতে পারেন নাই ইহা বড় দুঃখের বিষয়!

চন্দ্রশেখরের প্রধান চরিত্র "চন্দ্রশেখর" "প্রতাপ" "শৈবলিনী"। প্রধান পার্শ্বচরিত্র মীর-কাসেম দলনী ফষ্টর ও সুন্দরী। ইহাদের অভিনয়গুলির উপর চন্দ্রশেখরের সাফল্য নির্ভর করে। এ সম্বন্ধে অনুশীলনের সমালোচক মহোদয়ের মত কি তাহা আলোচিত হইতেছে। লেখক মহাশয় বলিয়াছেন "নাটককার অমৃত বাবু নাটকীয় চরিত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং

অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ তাহাদের অংশ ভাল করিয়া অভিনয় করিতে পারেন নাই।"

শৈবলিনীর প্রথম দৃশ্যের অভিনয় দেখিয়া লেখক বলিতেছেন "প্রথম দৃশ্যে বেদগ্রামস্থ ভীমা পুষ্করিণী—শৈবলিনী ও তাহার সখী ও প্রতিবেশিনী সুন্দরী অবগাহনে নিযুক্ত। দৃশ্যপট সুন্দর অভিনয়ও সুন্দর।" তারপর দ্বিতীয় দৃশ্যে শৈবলিনীর অভিনয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন "শৈবলিনী যে সাধারণ নারী নহে তাহা দেখাইবার জন্যই গ্রন্থকার এই দৃশ্য চিত্রিত করিয়াছেন। অভিনেত্রি যে ভাবে এই অংশ অভিনয় করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় তাহার সন্দেহ নাই।" শৈবলিনীর এই দুইটি অংশের অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া আবার অন্যস্থলে প্রকারান্তরে তাহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

সমালোচক মহাশয় যদিও দয়া করিয়া শৈবলিনীকে এই সার্টিফিকেট দিয়াছেন কিন্তু পত্রিকার সুদক্ষ তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় আবার তাহার নীচে ফুট-নোট করিয়া বলিয়াছেন "এখনকার অভিনয়কারিণীকে এ প্রশংসা দেওয়া যায় না পূর্ব্ব অভিনয়কারিণীই এ প্রশংসা পাইবার যোগ্য। সত্য বটে পূর্ব্বাভিনয় কারিণী শৈবলিনীর অংশ নিন্দার বাহিরে থাকিয়া অভিনয় করিয়াছে এবং এখনও যে করিতেছে সে তাহার অপেক্ষা কোনরূপে অনুপযুক্ত চরিত্র নহে। তাহার অভিনয়ে যে শৈবলিনী চরিত্রের মর্য্যাদা হানি হয় নাই যাঁহারা আজকাল তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। প্রথমকার অবস্থার তুলনায় এখন তাহার অভিনয় অতি সুন্দর দাঁড়াইয়াছে। লেখক মহাশয় কোন অভিনয়ের সমালোচনা করিতেছেন তাহা খুলিয়া বলা উচিত ছিল। এটা অবশ্য স্বীকার্য্য যে অভিনয় সকল রাত্রে সমান উৎরাইয়া যায় না। কিন্তু একদিনের দোষে যে সব মাটী হইয়া যায়, বই পর্য্যন্ত—Dramatise পর্য্যন্ত নগণ্য হইয়া পড়ে এ কথা যুক্তির বিরুদ্ধ।

তারপর সমালোচক মহাশয় শৈবলিনীর উদ্ধার-ব্যাপারের দৃশ্য লইয়া একটু গোলমাল করিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন "নাটককার উপন্যাসের এই অংশ নাটকাকারে পরিণত করিতে নিতান্তই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিরূপে কোথায় প্রতাপ শৈবলিনীকে উদ্ধার করিল ইহা না বলিলে যে কেবল নাটক অসম্পূর্ণ হয় এরূপ নহে—প্রতাপেরচরিত্রও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। প্রতাপ যে কি তাহা আমরা শৈবলিনীর উদ্ধার ব্যাপারে দেখিতে পাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় অমৃত বাবু এই অংশ একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহাতে পুস্তকের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে।"

সমালোচক মহাশয়ের একথা আমরা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মানি। কিন্তু এগুলির মধ্যে অনেক অন্তরায় আছে। এমন অনেক দৃশ্য আছে যাহা কাব্যের মধ্যে থাকিলেও অভিনয়ক্ষেত্রে—ষ্টেজে দেখান বড়ই দুরূহ ব্যাপার। শৈবলিনীর উদ্ধার ব্যাপারও সেইরূপ। দৃশ্যপটগুলির যথোপযুক্ত অঙ্কানুক্রমে সমাবেশ করার কষ্টকর অবস্থা, ষ্টেজের ভুক্তভোগীগণ ভিন্ন আর কাহারও উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই। চন্দ্রশেখর পুস্তকে

Scenic difficulty এত বেশী যে আমাদের দেশীয় নাট্যমঞ্চে সে সমুদায় দেখান অনেকস্থলে অসম্ভব। বিশেষ দক্ষতা অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনীশক্তি না থাকিলে তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। কসাড়বনের সমস্তকাণ্ডে—জাহ্নবী-গর্ভে নৌকার উপর শৈবলিনীর উদ্ধার সংকল্পে প্রতাপের কার্য্যকলাপ অভিনয়ের উপযুক্তস্থলে দেখান—সমালোচক যত সহজ ভাবিতেছেন কার্য্যতঃ তত সহজ নহে। এতদ্ব্যতীত পরের Scene-গুলি manage করিবার সম্বন্ধে বড় একটা গোল বাধিয়া যায়। এই জন্যই অমৃত বাবু তাহা ত্যাগ করিয়া রামচরণের মুখ দিয়া সে ঘটনার কথা বলাইয়া দিয়াছেন। এস্থলে নাটককারকে হয়ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইয়াছে। তিনি সমুদ্রের শুক্তি আকাশের চাঁদ—সাপের মাণিক—ধরিয়া দিতে পারেন নাই বলিয়া এস্থলে তাঁহাকে মার্জ্জনা করিলে বোধ হয় সমালোচক মহাশয় সহৃদয়তা দেখাইতেন। শিলার বলিয়াছেন Place yourself in a relative position with me and you will see why do I so much lack in my capacity. লেখক মহাশয় একবার এ কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন এই অংশটী এত অপরিস্ফুট নহে যে কি প্রকারে শৈবলিনী উদ্ধার পাইল তাহা পরের অভিনয় দেখিয়া বুঝিতে লোকের কষ্ট হইতে পারে। এরূপস্থলে সকলদিক বিবেচনা না করিয়া যে সমালোচক মহোদয় নাটককারকে "অকৃতকার্য্য" হইয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন—ন্যায়পরতার বিচারে তিনি এ অভিযোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাইবার পাত্র।

তারপর সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন "দ্বিতীয় চিত্রে চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী। চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। শৈবলিনী অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু নাটককার চন্দ্রশেখরকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে দেখাইয়াছেন। চন্দ্রশেখরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কোন লক্ষণ নাই। চন্দ্রশেখর যেন একটি নব্য বাবু!! যিনি পুঁথি লইয়া চির উন্মত্ত তিনি কেশ ও গুম্ফ কখনও রাখেন নাই বিশেষতঃ যেরূপ সময়ের কথা হইতেছে সেই সময়ে এরূপ বেশী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেন তাহার সন্দেহ নাই। চন্দ্রশেখরের প্রতি কেন শৈবলিনীর মন আকৃষ্ট নহে তাহা এ দৃশ্যে উপলব্ধি করিবার উপায় নাই।"

লেখকের আপত্তিগুলি মোটামুটি এই—চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ভট্টাচার্য্য গোছের লোক। যিনি চন্দ্রশেখর সাজিয়াছিলেন তিনি তাহা নহেন। গুম্ফ ও শ্মশ্রুর অভাব-গোলাকারে মুণ্ডিত মস্তক-দীর্ঘ শিখার লকলকি ও নস্যদানী তাহাতে নাই। বিশেষতঃ যে সময়ের কথা হইতেছে সে সময়ে ষ্টেজের চন্দ্রশেখর অভিনেতার ন্যায় অবস্থা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত থাকা অতি অসম্ভব।

লেখক নিজে চন্দ্রশেখরকে বুঝিতে পারেন নাই তাই এরূপ গোলযোগ করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত, কিন্তু "ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত" নহেন। ইহাতেই অনেকটা প্রমাণিত হয় তিনি লেখক মহাশয়ের শৌচাচারী পুরোহিত ঠাকুরের মত মুণ্ডিতগুম্ফ—মুক্তশ্মশ্রু

নহেন বা তাঁহার মস্তকের মধ্যভাগ বৃত্তাকারে মুণ্ডিত নহে। চন্দ্রশেখরকে বঙ্কিম বাবু যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বিশেষ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সমালোচকেও অনেক কষ্টে অনুভব করিয়া থাকেন। চন্দ্রশেখর আজীবন শাস্ত্রাধ্যায়ী—তাঁহার শাস্ত্রাধ্যায়ন যজমান রক্ষার বা বিদায় লইবার জন্য নহে জ্ঞানার্জনের জন্য। চন্দ্রশেখর শৈবলিনী অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বটে কিন্তু লবঙ্গলতার রামসদয়ের মত নহেন। লেখক যদি লবঙ্গলতার ও শৈবলিনীর সহিত চন্দ্রশেখর ও রামসদয়ের অবস্থা আলোচনা করিতেন তাহা হইলে দেখিতেন রামসদয় যেরূপ বয়োজ্যেষ্ঠ চন্দ্রশেখরকে বঙ্কিম বাবু তাহার অপেক্ষা অনেক অল্প বয়স করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রশেখর অনেক দিন অকৃতদার ছিলেন—সে কেবল শাস্ত্রাধ্যায়নের জন্য। সচরাচর ব্রাহ্মণদিগের সেকালে যে সময় বিবাহ হইত—চন্দ্রশেখর তাহা অপেক্ষা পরিণত-বয়সে বিবাহিত। এই জন্যই শৈবলিনীর অপেক্ষা তিনি অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ। বেদগ্রামে গৃহ দাহের পর যেরূপ ভাবে চন্দ্রশেখর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন তাহাতে কবি তাঁহার হৃদয়ে যৌবনের চঞ্চলতা ও উৎকণ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের এই স্থলের উক্তিগুলি বেশ ভাল করিয়া দুই তিন বার পড়িলেই সমালোচক দেখিতে পাইবেন কবি চন্দ্রশেখরকে একটা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণপণ্ডিত করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। যেরূপ আবেগে—যেরূপ উৎসাহে—যেরূপ উৎকণ্ঠায়—যেরূপ প্রেমোদ্বেলিত চিত্তে—যেরূপ ভাবী আশঙ্কায় আকুলিত হইয়া, চন্দ্রশেখর গৃহে ফিরিতেছেন; তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বয়োধর্ম্মের অনুরূপ। এ প্রকার উদ্বেগ, এ প্রকার চপলতা, এ প্রকার সন্দিগ্ধতা, এ প্রকার প্রাণের উচ্ছাস কি কোন অতিবয়োবৃদ্ধের হৃদয়ের ভাব? অনেক যুবক প্রণয়ী যে অমন করিয়া হৃদয় ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না!

লেখক মহাশয়ও সে সময়ের লোক নহেন বা বঙ্কিম বাবুর পুস্তকে চন্দ্রশেখরের একটা Wood-cut নাই—যাহা হইতে অনুমান করা যায় যে তিনি একজন গোঁফ কামান মাথা নেড়া ভট্টাচার্য্য। পুঁথি লইয়া থাকিলে কেন যে কেশ গুম্ফ মুণ্ডিত রাখিতে হইবে ইহার কোন বিশেষ বাধাকর নিয়ম নাই। চন্দ্রশেখর যে সকল পুঁথি পড়িতেন তাহা কাব্য নাটক, পুরাণ, স্মৃতি, উপনিষদ প্রভৃতি। সেগুলি দশকর্ম্ম, ব্যবস্থাদর্শন বা প্রায়শ্চিত্তবিধি নহে। বঙ্কিম বাবু যাঁহাকে নায়ক করিয়া সৃজন করিয়াছেন তিনি যে লেখক মহাশয়ের অনুভব মত একটী আদত টোল উত্তীর্ণ ইহা কখন সম্ভবপর নহে। অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা যজমান ব্যবসায়ীরা বা গুরুঠাকুরেরা সমালোচক মহাশয়ের চন্দ্রশেখরের আদর্শ হইয়াছেন দেখিতেছি। অভিনেতার শ্মশ্রু ছিল না কিন্তু "গুম্ফ" আখ্যা লইয়া তাঁহার নাসারন্ধ্রের নিম্নে যাহা বিরাজিত ছিল তাহাতে নব্য বাবুর কোন লক্ষণই নাই। তিনি যৌবনের প্রথম ফুটন্ত কুসুমটীর ন্যায় নবীন বাবু সাজিয়া বাহির হন নাই। তাঁহার গায়ে কামিজ ছিল না; মাথায় দ্বিধা বিভক্ত কেশরাজিও অবর্ত্তমান ছিল। চন্দ্রশেখরের অংশ অভিনেতার লম্বিত কেশ গৈরিক বা শুভ্র

বদন, গম্ভীর ভাব, দীর্ঘ আকার, বলিষ্ঠ-প্রকৃতি, কি বাহ্য সাদৃশ্যে কবির চন্দ্রশেখরের পূর্ণ না হউক আংশিকের অপেক্ষাও অধিক পরিচায়ক নহে?

আমরা চন্দ্রশেখর পুস্তক হইতেই দেখাইব যে বঙ্কিম বাবু চন্দ্রশেখরকে, লেখকের নিজ গঠিত আদর্শ চিত্রিত করেন নাই। সেই গঙ্গাতীরের পথে সেই নৈশ অন্ধকারের মধ্যে যখন দুর্গ-প্রবেশ-নিষিদ্ধা পথ-পরিত্যক্তা দলনা সেই দীর্ঘাকার চন্দ্রশেখরের মূর্ত্তি অবলোকন করিল সে অবস্থায় কবি চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা হইতে তাহাকে কি বলিয়া বোধ হয়? চন্দ্রশেখর যখন অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন তখন কেমন দেখাইতেছিল? সহৃদয় পাঠক! একবার দেখুন দেখি শৈবলিনী যখন পর্ব্বত-গহ্বরে রামানন্দ স্বামীর কৌশলে পড়িয়া চন্দ্রশেখরকে ভাবিতেছে তখন কি সে চন্দ্রশেখরের প্রকৃত আদর্শের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে? সে সময় কি তাহার মনে কাপট্য বা অতিরঞ্জিত ভাব বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারে? তখন সে চন্দ্রশেখর প্রকৃতই যেরূপ—তাহাই দেখিয়াছিল। কঠোর পরীক্ষায় পড়িয়া তাহার মনে অবশ্য চন্দ্রশেখরের প্রকৃত মূর্ত্তির ছায়া পড়িয়াছিল। দেখুন দেখি শৈবলিনী বলিতেছে "এ কি রূপ! এই দীর্ঘ শালতরু নিন্দিত, সুভুজ-বিশিষ্ট, সুন্দর গঠন, সুকুমার বলময়, এ দেহ যে রূপের শিখর!! এই যে ললাট প্রশস্ত চন্দনে চর্চ্চিত, চিন্তারেখা বিশিষ্ট, এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ—লক্ষ্মীর সিংহাসন। ইহার কাছে প্রতাপ! ছি! ছি!! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা! ঐ যে নয়ন জ্বলিতেছে, হাসিতেছে ফিরিতেছে ভাসিতেছে—দীর্ঘ বিস্ফারিত তীব্র জ্যোতিঃ, স্থির, স্নেহময়, করুণাময় ঈষৎ রঙ্গপ্রিয়, সর্ব্বতত্ত্বাভিজ্ঞাসু—ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু! কেন আমি ভুলিলাম, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম এই যে সুন্দর, সুকুমার বলিষ্ঠ দেহ, নবপত্র-শোভিত শালতরু, মাধবীজড়িত দেবদারু, কুসুম-পরিব্যাপ্ত পর্ব্বত, অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক শক্তি—আধচন্দ্র আধভানু—আধ গৌরী আধ শঙ্কর—আধরাধা আধ শ্যাম—আধ আশা আধ ভয় আধ জ্যোতিঃ আধ ছায়া—আধ বহ্নি আধ ধূম—কিসের প্রতাপ? কেন না দেখিলাম—কেন মজিলাম কেন মরিলাম সেই গুণ ভাষা-পরিষ্কৃত, পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গরঞ্জিত, স্নেহপরিপ্লুত মৃদু মধুর, পরিশুদ্ধ—কিসের প্রতাপ? কেন মজিলাম—কেন মরিলাম—কেন কুল হারাইলাম? সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পপাত্রস্থিত মল্লিকারাশি তুল্য, মেঘমণ্ডলে বিদ্যুৎতুল্য, দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসবতুল্য, আমার সুখস্বপ্নতুল্য—কেন দেখিলাম না, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম কেন বুঝিলাম না? সেই যে ভাল বাসা সমুদ্রতুল্য—অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল, প্রশান্ত ভাবে স্থির গম্ভীর, মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী, তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভীষণ, অগম্য অজেয় ভয়ঙ্কর—কেন বুঝিলাম না, কেন হৃদয়ে তুলিলাম না!" সহৃদয় পাঠক আপনারা এখন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের কৈফিয়ৎ গ্রহণ করুন। গরিব বেচারা অমৃতলাল বাবু কেন যে অমন অপাত্রে

চন্দ্রশেখরের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার অবিবেচনার নিন্দা করুন এবং লেখক মহাশয়কে কলিকাতার সমস্ত নাট্যমঞ্চ খুঁজিয়া ষ্টারের চন্দ্রশেখর অংশ অভিনেতা অপেক্ষা একজন উচ্চদরের অভিনেতাকে আনিয়া রঙ্গমঞ্চে স্থাপন করিতে পরামর্শ দিন। Perfection দেখিতে কার না ইচ্ছা হয়? নাট্যশালার অধ্যক্ষ ইহা দেখাইতে তাঁহার সাধ্যের অতীত যাহা কিছু তাহাও করিয়াছেন—সূর্য্য কিরণ ও ইন্ধন-জাত অগ্নি এবং নিন্দা ও সমালোচনা যে পরস্পর বিভিন্ন জিনিস তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং Fastidious critic এর চক্ষু যাঁহাদের নাই তাঁহারা সহজেই অনেক ভাল বিষয় সোজাভাবে দেখিতে পান এবং ঐ প্রকার সামান্য ত্রুটির জন্য একটা মহা ভৈরব হুঙ্কার করিয়া উঠেন না।

তার পর লেখক মহাশয় বলিতেছেন "শৈবলিনীর গৃহ ত্যাগের পর দৃশ্যে নাটককার কতকগুলি বেদগ্রামবাসী আনিয়াছেন। শৈবলিনী যে ফষ্টরের সহিত পলাইয়াছে ইহাই দর্শকবৃন্দকে অবগত করানই এরূপ করার উদ্দেশ্য। এটী একটা "সঙের" দৃশ্যে খুব হাসির কথা আছে। এরূপ ভাবে শৈবলিনীর গৃহত্যাগ দর্শক বৃন্দকে অবগত করান পুস্তকের সৌন্দর্য্যের লাঘব ভিন্ন বৃদ্ধি হয় নাই। এ দৃশ্যও কি অনাবশ্যক নয়?

সকলেই স্বীকার করিবেন নাটক রসপ্রধান কাব্য। বিভিন্নরসের সমাবেশ ও অবতারণাই ইহার প্রকৃতি। অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি মধুর গুণের বিরোধী রস। কিন্তু অম্ল কষায়াদি না থাকিলে মধুরের আস্বাদনের কোন বিশেষত্ব থাকিত না। এক পথ প্রবাহী রস, কাব্যের সৌন্দর্য্য হানি করে। এই দৃশ্যে বেদগ্রাম বাসীদের এ প্রকারে আনয়ন করিয়া নাটককার কোন অপরাধই করেন নাই। সকল দর্শক লেখকের মত অত বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন কঠোর Critic নহেন কাযেই এ প্রকার দৃশ্যের অবতারণায় তাঁহারা বিশেষ বিরক্ত হন নাই। দক্ষ নাটককারের যাহা করা উচিত এস্থলে নাটকের মাধুর্য্য রক্ষার্থে তাহাই হইয়াছে।

বেদগ্রামবাসী আনাইবার উপায় ব্যতীত শৈবলিনীর গৃহত্যাগ বার্ত্তা সাধারণের গোচর করা নানা কারণে অসম্ভব। ষ্টেজের মধ্যে গৃহ দাহ প্রভৃতি দ্বারা বা ডাকাতির অন্যান্য আনুসঙ্গিক চিহ্ন প্রদর্শন করান বড় নিরাপদ ব্যাপার নয়, কাজেই বেদগ্রামবাসীদের এই খানে আনান হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শৈবলিনীর উদ্ধার ব্যাপার না দেখানর অভিযোগের সাফাই স্বরূপ আমরা অগ্রে যাহা বলিয়াছি তাহাও এস্থলে প্রযুজ্য হইতে পারে। সে কালের পল্লিগ্রামবাসীরা আজকালের মত অত সুশিক্ষিত ছিলেন না। লোকগুলিকে আনানতে তাহাদের কথাবার্ত্তায় আমরা সেই ইংরাজের প্রথম অভ্যুদয় সময়ের পল্লিগ্রামের বেকার বাঙ্গালীর কতকটা পরিচয় পাই। এ দৃশ্য অবতারণা করায় যখন মূল পুস্তকের কোন ক্ষতি হয় নাই—অথচ নাটকের এক মুখ-প্রবাহী-স্রোত একটু ছোট খাট ঘটনা বৈচিত্রের মধ্যে পড়িয়া অন্য দিকে ফিরিয়াছে—তখন এরূপ দৃশ্যের কোন অনাবশ্যকতা আছে বা নাটককার ইহার অবতারণা দ্বারা

মহাপাতক সঞ্চয় করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

সমালোচক মহাশয় বোধ হয় পুস্তক খানি পাঠ না করিয়া অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। পুস্তক পাঠ না করিয়া এ প্রকার স্থলে অভিনয় দেখিতে গেলে কি প্রকার অসুবিধা ও কষ্টভোগ করিতে হয়, বকম দেখিয়া বোধ হইতেছে তাহা তিনি করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাব্য-লক্ষণাক্রান্ত গ্রন্থের অভিনয়ের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে অভিনীত কাব্য খানি আগাগোড়া দুই একবার পড়িয়া যাওয়া প্রত্যেক দর্শকের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা বই না পড়িয়া যান পুস্তকের ঘটনা কতক কতক অবগত থাকিলেও অভিনয় দেখিয়া আসিয়া গৃহে বসিয়া পুনরায় সেই অভিনীত পুস্তক পাঠে অতীত অভিনয়ের নির্জ্জন সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন। পুস্তকখানি পাঠ না করিয়া গেলে যখন নানাদিকে অসুবিধা তখন বই খানি পড়িয়া যাওয়াই উচিত। মূল পুস্তক পাঠ না করিলে নাটককার তাহার কি কি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহারও ভালমন্দ বিচার আসিতে পাবে না। এই জন্যই আমরা বলিতেছি—সমালোচক মহাশয় "বই পড়া" "বই-পড়া" করিয়া যে একটা মহা গণ্ডগোল বাধাইয়াছেন তাহা নিতান্ত অসারগর্ভ সহজ পথ বহির্ভূত যুক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই জন্যই তিনি প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী প্রভৃতির অভিনয়ের কিছু মাত্র সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারেন নাই বরঞ্চ অযথা রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। যিনি চন্দ্রশেখরকে অনেক দিন নাড়া চাড়া করিয়া অনেক পরিশ্রম ও মাথা ঘামাইয়া যাহা—হয় একটা, না হয় হইল নাটকাকারের পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন ও নিজে "তরুবালার" ন্যায় উৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন এতদিন সামাজিক চিত্রের বিচিত্র Phantasmagoria সাধারণের চক্ষে ধরিয়া আসিতেছেন—তিনি যে প্রতাপ চরিত্র কিছুই বুঝেন নাই, একথা আমরা বলিতে পারি না, বলিতে সাহসও হয় না তবে প্রতাপের চরিত্র সমগ্র চন্দ্রশেখর মধ্যে বড় বেশী গোছের Ideal এবং স্বয়ং বঙ্কিমবাবু ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্টতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রতাপ চরিত্র যে অভিনয়ে ঠিক তাঁহার কল্পনা মত যথাযথ ফুটিতে পারে না এ কথাও তিনি একবার কথা প্রসঙ্গে আমার কোন সম্মানিত প্রবীণ লেখক বন্ধুর কাছে বলিয়াছিলেন। প্রতাপচরিত্র নাটকের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ চরিত্র বলিয়া সকলের উৎক্রোশ দৃষ্টি উহার উপরিই পরিবদ্ধ। অন্য চরিত্রের খুঁত দেখিতে লোকে যত ব্যগ্র না হয়—প্রতাপের চরিত্রে কোন ত্রুটী দেখিলে তৎক্ষণাৎ চঞ্চল হইয়া উঠে। যাহা সর্ব্বদাই সকলের চোখের উপর থাকে তাহার সফলতা ও সার্থকতা অবশ্য অনেক দোষগুণের অনল পরিক্ষার সীমা মধ্যবর্ত্তী হইয়া তবে শেষ উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

প্রতাপের অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা অতি দুরূহ। কবি মানসিক বৃত্তির যে যে উপাদান সহায়ে প্রতাপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা যে নাটককার কিছুই বুঝেন নাই বা অভিনেতা তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই একথা আকাশ

কুসুমের স্থায় নিতান্ত অলীক। প্রতাপ চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর যুক্ত অভিনয়ে যে Stage effect হয় তাহাতেই এই তিন চরিত্রের অভিনয়ের সফলতা বিশেষরূপে বোধগম্য হইতে পারে। তবে ইহার মধ্যে কাহারও বা অভিনয়ের দক্ষতা একটু বেশী, কাহারও বা কম। আমার পন্থানুসারী এমন কোন লোক নাই যিনি অভিনয় দেখিয়া বলিতে পারেন না উল্লিখিত তিনটি পাত্রের অভিনয়ে চন্দ্রশেখরের শেষ যবনিকা পতনের পূর্ব্বে তাঁহার মনে কোন একটা স্থায়ী ভাবের সঞ্চার হয় না। একথা যিনি বলিতে সক্ষম হইবেন তাঁহার হৃদয় হয়ত প্রস্তরে নির্ম্মিত—প্রকৃতির কোমলাংশ—মধুরিমাময়ী ভাব তাঁহার হৃদয়ে অতি অল্প বা তিনি চন্দ্রশেখরের গল্পাংশ ছাড়া ইহার বিশেষত্ব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। হইতে পারে; প্রতাপ চরিত্র যতদূর Perfectionএ অভিনয় হওয়া উচিত তাহা হয় নাই কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহাতে কি সাধারণের সন্তোষ উৎপাদিত হয় নাই? যদি তাহাও না হইয়া থাকে চরিত্রের দুরূহতার জন্য কি অভিনেতা রেহাই পাইতে পারেন না? বা তাঁহাকে কিছু দীর্ঘ সময় দেওয়া যাইতে পারে না? আসল কথা হইতেছে প্রতাপ চরিত্রের অভিনয়ের অপারগতায় চন্দ্রশেখরের অভিনয় কখনই Successful হইতে পারে না। প্রতাপকে বাদ দিয়া চন্দ্রশেখর দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং প্রতাপ চরিত্র যে কিছুই হয় নাই ইহা নিতান্ত জবরদস্তির কথা।

প্রতাপ চরিত্র কি গূঢ় রহস্যময় করিয়া সৃজন করিয়াছেন তাহা গ্রন্থকারই জানেন। আমরা বেশ জানি কোন সুদক্ষ ও তীক্ষ্ণদর্শী সমালোচক বঙ্কিম বাবুর চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া প্রতাপ সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্যে উপনীত হইয়াছেন বঙ্কিম বাবু কোনস্থলে কথাপ্রসঙ্গে ঠিক তাহার বিপরীত মতই প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত প্রবীণ সমালোচক মহাশয় প্রতাপকে Defective বলিয়া গিয়াছেন। প্রতাপের হৃদয়ের বল যথেষ্ট থাকিলেও তিনি "শৈবলিনীর বিষের ভয়ে বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন" এবং তদ্দ্বারা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দেখাইয়াছেন ইহাই সেই তীক্ষ্ণদর্শী সমালোচকের অভিযোগ কিন্তু গ্রন্থকার নিজে এইস্থলে বলিয়াছেন "প্রতাপ চরিত্র—এই কথাতেই আরও সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রতাপের যে নিজের হৃদয়ের উপর বিশ্বাস ছিল না—ইহাই তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত মহত্ব। প্রতাপ বরাবর ঐশ্বর্য্যশালী তথাপি ইন্দ্রিয়জয়ী—কিন্তু অমরনাথ অবস্থার পরিবর্ত্তনে মনঃসংযম করিতে পারিয়াছিলেন।"

পাঠক দেখুন—যিনি বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রগুলি সমালোচনা করিয়া সাহিত্য-সংসারে যশস্বী, গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞতাভাজন ও চরিত্র বিশ্লেষণে অদ্ভুত প্রতিভা দেখাইয়াছেন তিনি নিজেই প্রতাপ সম্বন্ধে কত ভ্রান্ত!! তখন অন্য পরে কা কথা।

কবি যে উদ্দেশ্যে নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টি করেন তাহার যথাযথ মর্ম্মভেদ গ্রন্থকার ব্যতীত অপর কাহারও কর্ম্ম সম্ভব নহে ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সমালোচক ও গ্রন্থকার উভয়ের মিলনে এ বিষয়ের একত্র আলোচনা না

হইলে এ সম্বন্ধে মতভেদ সহজে মিটে না। বিখ্যাত নবেলিষ্ট উইলকি কলিন্স জীবনের শেষ দশায় একখানি নবেল লেখেন। তাহার কয়েক অধ্যায় লিখিয়া পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলির এক একটি বিশ্লেষণ মন্তব্য (Synopsis) করিয়া তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের আর দুই জন বিখ্যাত নবেলিষ্টের (ব্রেটহার্ট ও বেসাণ্ট) হাতে তাহা সম্পূর্ণ করিবার ভার দিয়া যান। ব্রেটহার্ট ও বেসাণ্ট সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলেও পুস্তক শেষ করিয়া যাহা দাঁড় করাইলেন—অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশ্রম করিয়া লিখিয়া—যাহা প্রকাশ করিলেন, তাহা ভাবে, ভাষায—চরিত্র গঠনে; আকার প্রকারে কলিন্সের প্রথমকার অধ্যায়ের লেখা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দাঁড়াইল। এই জন্যই বলিতেছি সাধারণ চক্ষুতে আমরা যাহা প্রকৃত কাব্য সৃষ্ট সৌন্দর্য্যের হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি বলিয়া দর্পে স্ফীত হই অপরে তাহা বুঝে নাই বলিয়া আস্ফালন করি পরিণামে হয়ত পরিণত বিবেচনায় দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তার ফলে নিজেদেরই সেই পোষিত মত ভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করি।

নাটককার অমৃত বাবু অনেক স্থলে গ্রন্থকারের কথা প্রতাপ শৈবলিনীর মুখে বাহির করিয়াছেন বলিয়া লেখক-কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছেন। অমৃত বাবুর এইরূপ করার বিশেষ কারণ আছে। এ সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যবিদ্ বন্ধুগণের মধ্যে একবার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তাঁহাদের মত এই—এরূপ স্থলে নাটককার গ্রন্থকারের ভাবগুলি তাঁহার নায়ক নায়িকার মুখে পরিব্যক্ত করাইয়া বিশেষ বিবেচনা—কৃতিত্বের ও সাবধানতার পরিচয় দিয়াছেন। এ সকল স্থলে নিজের কলম চালাইলে যাহা হইত—গ্রন্থকারের ভাব ব্যক্ত করায় তাঁহার দায়িত্ব অনেক কমিয়াছে—এবং তিনি কবি প্রতিভার উপর হস্তক্ষেপের চার্জ্জ হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছেন। তিনি নিজে এই সমস্ত পরিবর্ত্তন করিলে হয়তঃ সাধারণে বঙ্কিম বাবুর লেখাগুলি পরিবর্ত্তনের জন্য তাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন। আর এরূপ করায় সাধারণের বিচারে যে প্রকার স্পর্দ্ধা, আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পাইত—বর্ত্তমান স্থলে তাহা না হইয়া তাঁহার সরলতা ও কবি প্রতিভার প্রতি সম্মান ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্বাভিনীত মৃণালিনী প্রভৃতি পুস্তকে, নাট্যশালার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা নিজের কলম চালাইয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিয়া গিয়াছেন—পুস্তকের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছেন—স্বয়ং বঙ্কিম বাবু এ কথা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"নাট্যশালায আমার পুস্তকের বড় দুর্গতি হয় মৃণালিনীর সৌন্দর্য্য থিয়েটার ওয়ালারা তাহাদের নিজের মত চালাইয়া বিকৃত করিয়াছেন—তাই আমি এবারকার সংস্করণে মৃণালিনীকে প্রকৃতনাটকীয় ভাবে পুনঃমুদ্রিত করিয়াছি"। তাহা ছাড়া তিনি নিজেই অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন ভাষার লীলা ও দৃশ্যের উৎকর্ষ চন্দ্রশেখরে অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা বেশী। এ প্রকার স্থলে তাহার ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করিতে গেলে অমৃত বাবু নিশ্চয়ই অকৃতকার্য্য হইতেন। এ প্রকার স্থলে অমৃত বাবু যে একথা জানিতে না পারিয়াও স্বীয় হৃদয়ের স্বাভাবিক

সৎপ্রবৃত্তি পরিমিত জ্ঞান ও অহমিকা-হীনতা বলে ধীর ভাবে কার্য্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার দক্ষতার বিশেষ প্রশংসা করা উচিত। তাহা না হইয়া সমালোচক মহাশয়ের নিকট তিনি অপরাধীর ন্যায় অভিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা বিজ্ঞ সমালোচক মহাশয়কেই সানুনয়ে জিজ্ঞাসা করি তিনি এই সমস্ত দুরূহ অংশগুলি নিজে পরিবর্ত্তিতরূপে নাটকাকারে আনিতে কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত আছেন? তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া এই অংশগুলি পরিবর্ত্তিত করিয়া অজ্ঞ অমৃত বাবুকে প্রেরণ করিলে উদারতার জন্য তিনি বিশেষরূপে ধন্যবাদার্হ এবং ভ্রান্তকে পথপ্রদর্শনের যে গৌরব ও পুণ্য তিনি তাহার অধিকারী হইবেন।

আমাদের প্রবন্ধ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ততার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। কাজেই আমরা অনুশীলনের সমালোচক মহাশয়ের শেষ কথাগুলি পরম্পরাভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহার উত্তর দিব।

তিনি বলিতেছেন—

(১) প্রতাপের গৃহ—দুইজন সাহেব ও সিপাহির দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ। রামচরণ বন্দুকের গুলি খাইয়া আহত হইল, প্রতাপও বন্দী হইলেন—এই দৃশ্যে দুইটি হাস্যজনক ব্যাপার আছে প্রথম গৃহ আলোকিত—তথাপি সাহেবেরা দেশলাই জ্বালিয়া বাতি জ্বালিলেন। যদি বাতি জ্বালা হইল তবে ঘরটি অন্ধকার করিতে ক্ষতি কি ছিল? দ্বিতীয়, সাহেব রামচরণকে লক্ষ্য করিয়া যে পিস্তল ছুড়িলেন সে পিস্তল ছেলেদের খেলিবার পিস্তল। এরূপ পিস্তল ছুড়িয়া এ দৃশ্যের অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা কি?

(১) এর সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় নিজের গাম্ভীর্য্য ও প্রবীণতা হারাইয়াছেন। তাঁহার এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। তিনি বলিতেছেন গৃহ আলোকিত সত্ত্বেও সাহেবেরা বাতি জ্বালিয়া দোষের কাজ করিয়াছেন এবং তাহাদের বাতি জ্বালিবার পরই বা কেন ষ্টেজের আলো কমাইয়া দেওয়া হয় নাই! অভিযোগটা অবশ্য গুরুতর গোছের। অন্ধকারের দৃশ্য অভিনয়ে ষ্টেজ সম্পূর্ণ অন্ধকার করাই উচিত। কিন্তু লেখক-মহাশয়ের ভাবা উচিত ছিল, রামচরণ যখন ইগ্লিল মিগ্লিলের শ্রাদ্ধ করিতেছিল, তখন ঘটনার স্বাভাবিকতা ধরিতে গেলে অভিনয়ক্ষেত্র সম্পূর্ণ অন্ধকারময় হওয়া উচিত। কেন না প্রতাপের বাড়ী সে রাত্রে বিবাহবাটী ছিল না—রামচরণের কার্য্যকলাপ, শৈবলিনীর তাহা গবাক্ষপথ হইতে পরিদর্শন, দলনী ও কুলসমের ব্যাপার সুতরাং এই সময়ে অন্ধকারের মধ্যেও হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দর্শকগণ মার্জ্জারের দৃষ্টিশক্তির সংক্রামতা প্রাপ্ত হন নাই—কাজেই রামচরণের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ রাখিবার জন্য সে সময়ে ষ্টেজে পূর্ণ আলোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই কারণ বশতঃ সাহেবেরা আসিবার পরও আলো রাখা প্রয়োজন হয়। সাহেবদের একটা সামান্য বাতি কখন অত বড় ষ্টেজকে পূর্ণরূপে আলোকিত করিতে সক্ষম নহে—এবং হইলেও সে আলোকে সাধারণের অভিনয়দর্শনপক্ষে সুবিধাজনক হইতে পারে না। ষ্টেজের আলো কমাইতে হইলে অভিনয়েরকার্য্যগুলি দেখাইবার জন্য মশালের আলোর

প্রয়োজন। সমালোচক মহাশয় কি তাহাই করিতে বলেন? ছেলেদের পিস্তল, এ সাহেবী দাঙ্গায় ছুড়িয়া অমৃত বাবু বড় অন্যায় করিযাছেন! ইহা তাঁহার মহা অসাবধানতাব চিহ্ন। তাঁহার উচিত ছিল Walter locke এব বাড়ী হইতে একটা ছয় নলী রিভলভার ও ১নং ছয়টা বুলেট সাহেবদিগেব হাতে দিয়া হতভাগ্য রামচরণের মস্তকের খুলিটা উড়াইয়া দেওযা। আমবা বিশ্বস্তসূত্রে জানি নাট্যশালার অধ্যক্ষদের এই পিস্তলের জন্য Arms Act অনুসারে পাশ রাখিতে হইয়াছে। লেখক যদি তাঁহার আরও একাদশ জন বন্ধুকে লইযা ইহার বল পরীক্ষা করিযা সাফাই দেন তবে আমরা বড় সুখী হই।

(২) পবেব দৃশ্যে চন্দ্রশেখর ও রামানন্দ। ইহাদের কথোপকথন অতি দীর্ঘ মূলউপন্যাসে নাই। এ বক্তৃতায় পুস্তকের সৌন্দর্য্য হানি হইয়াছে। চন্দ্রশেখর ও রামানন্দকে যাত্রার নারদ বলিয়া বোধ হয।

(২) চন্দ্রশেখর ও বামানন্দের দীর্ঘ কথোপকথনে সমালোচক মহাশয় বিবক্তি প্রকাশ কবিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার দোষ নাই। কিন্তু চন্দ্রশেখরকে একবার "নব্য বাবুব" মত বলিযা আবাব তাহাকে "যাত্রার নারদ" বলিলেন কেন তাহা আমবা বুঝিতে পারিলাম না। যাত্রার নারদ কি ভ্রমরকৃষ্ণ কেশধারি নব্যেরাই হয়?

(৩) অমৃত বাবু শৈবলিনীর প্রতাপ কর্তৃক উদ্ধার ও প্রতাপের শৈবলিনী কর্তৃক উদ্ধার ষ্টেজে না দেখাইয়া সুন্দর দৃশ্য দুটী বাদ দিয়াছেন। চন্দ্রশেখর উপন্যাসেরই দুটি প্রধান দৃশ্য অথচ এ দুইটিই নাটককার বাদ দিয়াছেন। গ্রন্থকার জীবিত থাকিলে তিনি অমৃত বাবুকে নিশ্চয়ই এই ত্রুটির জন্য বলিতেন।

(৩) ইহাব উত্তর আমবা পূর্ব্বে দিয়াছি। তবে গ্রন্থকাব এসম্বন্ধে অমৃত বাবুব উপর রুষ্ট হইতেন কি না তাহা লেখকেব ন্যায় আমবা গণনা করিয়া ভবিষ্যত বলিতে পাবি না।

(৪) তার পব নদীবক্ষ। এ দৃশ্য অতি সুন্দব। অমৃত বাবু এ দৃশ্যের দৃশ্যপট ও অভিনয়েব জন্য ধন্যবাদের পাত্র।

(৪) চন্দ্রশেখবেব গঙ্গাবক্ষেব দৃশ্য অতি মহান। অমন মহৎ দৃশ্য আর কোন পুস্তকে পড়িযাছি কি না মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র—অনেক দিন পূর্ব্বে যখন তাঁহাব বঙ্গদর্শন উঠিযা যায় ও বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদাবেব হাতে তিনি তাহা সমর্পণ কবেন তখন একদিন চন্দ্রশেখরের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন "গঙ্গাবক্ষে অগাধজলে সাঁতাবেব মত দৃশ্য আমি আর কই লিখি নাই।" অমৃত বাবু অবশ্য সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না—কিন্তু মনীষি ও বিজ্ঞ সমালোচক বাবু চন্দ্রনাথ বসু ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কবিবর হেমচন্দ্র প্রভৃতি সেখানে ছিলেন। এ কথা আবাব চন্দ্রশেখর অভিনয়েব অনেক পবে সাধারণে উপস্থিত হইয়াছে। এ দৃশ্যটি যে মহান তাহা অমৃত বাবু নিজের বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়াই বুঝিয়াছেন। এ দৃশ্যটি দেখাইবার পক্ষে অনেক অন্তরায় থাকিলেও তিনি বুঝিয়াছেন ইহার অভাবে তাঁহার নাটক মাটী হইবে। Unguided

ও Unaided হইয়া যখন তিনি গ্রন্থকারের মনের কথা বুঝিয়া ঠিক্‌স্থলেই কোপ মারিয়াছেন তখন তিনি যে চন্দ্রশেখরের কিছুই বুঝেন নাই ইহা বলা ধৃষ্টতামাত্র।

(৫) শেষ দৃশ্যে নবাবের দরবার। সমালোচক মহাশয় এটিকে সংক্ষেপে সারিবার মন্ত্রণা দিয়াছেন।

(৫) এ দৃশ্যটির মধ্যে অমৃত বাবু যে কারিকুরী দেখাইয়াছেন আমাদের মক্ষিকা-প্রকৃতি বিশিষ্টসমালোচক মহাশয় ভ্রমেও তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। মারকাশেম চরিত্র দুই একস্থল ছাড়া বঙ্কিম বাবু পুস্তকের মধ্যে ফুটাইয়া যান নাই? কিন্তু নাটককার মীরকাশেমের Historical character (ঐতিহাসিক চরিত্র) এর সার অংশ আলোচনা করিয়া সেই বাঙ্গলার শেষ নবাবকে চন্দ্রশেখরের শেষ দৃশ্যে রংজোচিত গৌরবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শেষ দৃশ্যে দরবার অভিনয় বিশেষ সফল হইয়াছে। মীরকাশেম উদয় নালার শেষ যুদ্ধে কিরূপ হঠকারিতা ও উত্তেজিত প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়াছিলেন অমৃত বাবু তাহার যথাযথ প্রতিকৃতি আঁকিয়াছেন। আর কিছুর জন্যে যদিও না হউক অন্ততঃ এইটুকুর জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে খাঁটি প্রশংসা পাইবার যোগ্যপাত্র। এ দৃশ্য সংক্ষেপে সারিবার মন্ত্রণা দেওয়াতে সমালোচক মহাশয় যে চন্দ্রশেখরের প্রধান একটি পরিচ্ছেদকে মাটি করিতে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা তিনি ভাবেন নাই। নাটকের বীজ অঙ্কুর ও ফল আছে। দলনী, ফষ্টর, শৈবলিনী প্রভৃতি চরিত্রের নাটকীয় বীজ এই স্থানে ফলবতী হইয়াছে।

(৬) তারপর গিরিগুহায় শৈবলিনী। কোথা হইতে শৈবলিনী কিরূপে এখানে আসিলেন—তাহার কিছুই নাই। এ দৃশ্য বোঝাই কঠিন অভিনয় ত দূরের কথা। এটী শৈবলিনীর মানসপটে নরক দর্শন। এ ব্যাপার অভিনয় করিয়া প্রদর্শন সহজ নহে—যাহা হউক যিনি শৈবলিনীর অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন তাহাকে এ অংশের অভিনয়ের জন্য প্রশংসা করি।

(৬) গিরিগুহার দৃশ্যে সমালোচক মহাশয় প্রথমে বলিতেছেন "এ দৃশ্য বোঝাই কঠিন, অভিনয় ত দূরের কথা।" কিন্তু পরে লিখিতেছেন যিনি শৈবলিনীর অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহাকে এ অংশের অভিনয়ের জন্য প্রশংসা করি। সমালোচক যখন নিজেই সর্ব্বাপেক্ষা এই দুরূহ অংশ অভিনয়ের সুখ্যাতি শৈবলিনার অভিনয়কারিণীকে দিতেছেন তখন তাহার পূর্ব্ব অভিনীত অদুরূহ অংশ যে ভাল হয় নাই তাহা কে বিশ্বাস করিবে? দুরূহাংশের সাফল্যেই শৈবলিনী অভিনয়ের আগাগোড়া সার্থকতা প্রমাণ হইতেছে। শৈবলিনীর অভিনয় যথাযথ হইয়াছে লেখক তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াও ধরা দিতেছেন না।

(৭) তারপর তকি খাঁ ও দলনী। দলনী বিষ পান করিলেন। তারপর নবাবের শিবির। কুলসমের মুখে নবাব শুনিলেন দলনী কুলটা নহে।

(৭) দলনীর শেষ অংশের অভিনয় অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক। কিন্তু লেখক দলনী চরিত্রের মূল্য ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন নাই।

(৮) "তারপর চন্দ্রশেখরের গৃহ। চন্দ্রশেখর রামানন্দ শৈবলিনী প্রভৃতি। চন্দ্রশেখর যোগবলে শৈবলিনীর মুখ হইতে জানিলেন সে অসতী নহ। পর দৃশ্যে নবাব শিবিরে নাটকোল্লিখিত সকল ব্যক্তিই উপস্থিত। রামানন্দ স্বামীর যোগপ্রভাবে ফষ্টর স্বীকার করিল শৈবলিনী সতী। এ সকল দৃশ্য সংক্ষেপে সারিলে ভাল হইত। শিবিরের দৃশ্যে নবাবের সম্মুখে সহসা রামানন্দের প্রবেশ ও ফষ্টরের যোগবলে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা কহা অবিশ্বাসজনক ব্যাপার বই কিছুই নহে।"

(৮) রামানন্দের যোগবল পরীক্ষায় ও তৎসঙ্গে সঙ্গে শৈবলিনীর নিজের মুখে তাহার অজ্ঞান অবস্থায় নিজ চরিত্র বর্ণন দৃশ্যটি সমালোচক মহাশয় সংক্ষেপে সারিবার পরামর্শ দিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে যত রাত্রি বৃদ্ধি হইতেছে লেখক মহাশয় ততই অধৈর্য্য হইয়া "সংক্ষেপেণ সমাপয়েৎ" ব্যবস্থা দিতেছেন। বঙ্কিম বাবু এই অধ্যায়টী বিশদভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার মূল্যও বাড়াইয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক পুস্তক নিহিত এক একটী সন্ন্যাসী বা যোগী চরিত্রের একটা যে বিশেষত্ব আছে তাহা চন্দ্রশেখর গ্রন্থের এই অধ্যায়ে বিশেষ রূপে প্রত্যক্ষীভূত। রামানন্দের কার্য্যকলাপগুলির মধ্যে গুহায় শৈবলিনীর প্রথম উন্মাদ অবস্থায় তিনি যাহা করিয়াছিলেন এইটীতে তাহা শেষ হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু নিজে এই অধ্যায়ের নাম দিয়াছেন "যোগবল না Psychic force?" Psychic force এর ও Mesmerism এর উপর তাঁহার নিজের বিশ্বাস ছিল এ কথা শ্রীশ বাবুর লেখনী মুখে ও এমন কি স্বয়ং বঙ্কিম বাবুর বন্ধুদের মুখেও আমরা এ কথা শুনিয়াছি। শৈবলিনী চরিত্রের রহস্যোদ্ভেদ এই অধ্যায়েই। সীতার অগ্নি পরীক্ষার যে মূল্য শৈবলিনীর উপর রামানন্দের যোগ পরীক্ষাও তাহাই। শৈবলিনীর চরিত্রের এক অতি গূঢ় অংশ যাহা কখনই অন্য উপায়ে প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল না এইখানে বিকশিত হইয়া তাহাকে চন্দ্রশেখরের সমক্ষে শুদ্ধা ও সতী প্রমাণ করাইল। ইহার পর আবার নবাবের সভায় ফষ্টরের মুখে তাহার অন্য অংশ পরিস্ফুট ও প্রমাণিত হইয়া শৈবলিনীর সতীত্ব ও ম্লেচ্ছ সহবাস বিহীনতা প্রমাণ করিল। সমালোচক মহাশয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ধন্যবাদ যে তিনি এই মহামূল্য পরিচ্ছেদকে সংক্ষেপে সারিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। রামানন্দের যোগ শক্তি বলে বঙ্কিম বাবু ফষ্টরকে বাঙ্গালা কথা কহাইয়াছেন-লেখকের সন্তোষের জন্য অমৃত বাবুর উচিত ছিল এগুলির অনুবাদ করাইয়া দেওয়া। লেখক মহাশয় গো! একবার এ পরিচ্ছেদটী ভাল করিয়া মাথা ঠাণ্ডা করিয়া পড়িবেন।

(৯) "তার পর পার্ব্বত্যপথে চন্দ্রশেখর ও রামানন্দ। শৈবলিনীকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইতেছেন এ দৃশ্যের অভিনয় ভাল হয় নাই। নেপথ্যে তোপ ও রণবাদ্য হইতেছে দেখাইবার জন্য অমৃত বাবু পটকা ফুটাইয়াছেন ও কনসার্টিনা বাজাইয়াছেন।"

(৯) তার পর পার্ব্বত্য পথে রামানন্দ। এক "এ, দৃশ্যের অভিনয় ভাল হয় নাই" আবার তাহার উপর দ্বিতীয়

অভিযোগ—"যুদ্ধক্ষেত্রে তোপ ও রণবাদ্য হইতেছে দেখাইবার জন্য অমৃত বাবু পটকা ফুটাইয়াছেন ও কনসার্টিনা বাজাইয়াছেন।" এ অভিযোগ অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। অমৃত বাবু স্বদেশ দ্রোহী! বাঙ্গালীর যুদ্ধক্ষেত্রে পটকার ব্যবহার? মাভৈঃ মাভৈঃ রণহুঙ্কার ও রণবাদ্যের স্থলে কিনা ছেলেদের খেলাইবার কনসার্টিনা!! ছি! ছি! দমদম ও বারাকপুর ত কাছে। না হয় আলিপুরেও ত ছাউনি আছে—গোটা দুই আঠার পাউণ্ডার কামান ও ১৯ নং বেঙ্গল মিলিটারি ব্যাণ্ড আনিয়া ষ্টেজের উপর হইতে প্রকৃত যুদ্ধ ক্রীড়ার আয়োজন করিলে আমাদের এ জাতীয় কলঙ্ক ভোগ হইত না, অনির্ভিক দর্শক বৃন্দও জলন্ত গোলার আস্বাদ পাইয়া যথা সম্ভব তৃপ্তিলাভ করিতেন—ও বীর পুঙ্গব সমালোচককে তাঁহার তেজোময়ী লেখনী চালনার জন্য শত শত ধন্যবাদ দিতেন!!

(১০) "তার পর শেষ দৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্র। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত প্রতাপ ও রামানন্দস্বামী। উপন্যাসে এ দৃশ্যটা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী—প্রতাপের কথা গুলি বড়ই হৃদয় গ্রাহী। কিন্তু অনেক পূর্ব্ব হইতেই দর্শকগণের নিকট এ অভিনয় নীরস বোধ হইয়াছিল। তাই তাঁহারা একবার মাত্র যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য খানি দেখিয়াই রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন। প্রতাপের কথা আর কেহ শুনিবার বড় অপেক্ষা করেন না। ইহাতেই নাটককারের বোঝা উচিত—তিনি চন্দ্রশেখর নাটকাকারে পরিণত করিতে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন নাই। যে গ্রন্থের পাঠক পুস্তকের শেষ না পড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করেন, যে নাটকের অভিনয়ে শেষ দৃশ্য দেখিতে দর্শকগণ ব্যগ্র না হয়েন সে পুস্তক ও সে নাটক উৎকৃষ্ট নহে এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।"

(১০) শেষ দৃশ্য। লেখকের ইহাই শেষ অভিযোগ—কাযেই কিছু গুরুতর রকমের। তাঁহার মত এই দর্শকেরা আগে হইতেই চন্দ্রশেখরের নীরস অভিনয়ে চটিয়া ছিলেন সুতরাং প্রতাপের কথা আরম্ভ না হইতে হইতেই সেই "মর্ম্মস্পর্শী" কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া বিরক্তভাবে সহসা রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিলেন। যে অভিনয়ের শেষ দৃশ্য পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিতে লোকে অপেক্ষা করে না তাহা উৎকৃষ্ট নাটক নহে। লেখক বলিতেছেন অধৈর্য্যই দর্শকগণের স্থান ত্যাগের কারণ—কিন্তু অধৈর্য্যই যদি স্থান ত্যাগের প্রধান কারণ হয় তবে কোথা হইতে প্রথম অধৈর্য্য ভাব উপস্থিত হয়? গ্যালারির দর্শকেরা পিছনে দূরে বসার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকাময় দৃশ্য ভূপতিত ও মৃত অশ্ব পৃষ্ঠ সংলগ্ন রক্তাক্ত প্রতাপকে না দেখিতে পাইয়া পিছন হইতে দাঁড়াইয়া উঠে। ইহাতেই যে গোলমাল হয় তাহা থামাইতেই play শেষ হইয়া আসে। এ দৃশ্যের অভিনয় অতি কম—বিশেষতঃ আহত ব্যক্তির অভিনয়। দর্শকের গোলমালে কাজেই অভিনয়ের সব কথা শোনা যায় না, যে সকল দর্শক ৪ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন তাঁহারা যে আর ৫ মিনিট ধৈর্য্যতার লাগামটা কসিয়া রাখিতে পারেন না ইহা বড়ই

আশ্চর্য্যের বিষয়। আর লেখকও ইহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহাও সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। অধৈর্য্যতার জন্য নহে ভাল করিয়া শুনিবার ও দেখিবার অভিলাষে,—ক্লান্তির কোলাহলে নয়—পরস্পরের গোল থামাইবার চেষ্টায়—অবসাদে নয়—সমস্ত বিয়োগান্ত অভিনয়ের শেষ দৃশ্যের সাধারণ ধর্ম্মে, দর্শকগণ ব্যস্ত হইয়া স্থান ত্যাগ করেন। লেখক মহাশয় দর্শকের দোষও অমৃত বাবুর ঘাড়ে চাপাইতেছেন। একটি গল্প শুনিয়াছি—কোন বালকের বাজারে ক্রীত তৈল পক্ক জিনিস খাইয়া উদরাময় হইয়াছিল। বালকের পিতা যখন জানিলেন কি কারণে তাহার পুত্রের অসুখ হইয়াছে তখন তিনি সমস্ত দোষ সেই খাদ্য বিক্রেতার উপর ফেলিলেন। তাঁহার পুত্রের স্বেচ্ছায় ক্রয়ের যে দোষ তাহাও সেই হতভাগ্যের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। সমালোচক মহাশয়ের এই তিরস্কার সেইরূপ ধরণের হইয়াছে। তিনি অপরের দোষও নাটককারের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন।

শেষ আমরা গুটি কয়েক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমরা যে এত কথা বলিলাম তাহা অমৃত বাবুর সমর্থনার্থে ও সাফাইয়ের জন্য নহে—ন্যায়পক্ষে বিচার করিলে যাহা দাঁড়ায়, দর্শধর্ম্মে যাহা বলিতেছে তাহাই এখানে বলা হইয়াছে। সমালোচকের দায়িত্ব বড় গুরুত্বপূর্ণ। মক্ষিকাধর্ম্ম প্রকৃত সমালোচনা নহে। নিন্দা ও গুণগ্রাহিতা—ত্রুটি প্রদর্শন ও তাহার সংশোধনের সাধু চেষ্টা; ভিন্ন পথে পরিচালিত। লেখক মহাশয় নিজের ক্রিটিকত্বে আত্মভোর হইয়া যে পবিত্র দায়িত্বের অপব্যবহার করিয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্য আমাদের এ নিগ্রহ সহ্য করিতে হইল।

অমৃতলাল বাবুকে তিনি যতদূর অসার ও অপদার্থ ভাবিয়াছেন উঁহার আর্টিকেল যাহারা পড়েন তাঁহারা অবশ্য সেরূপ ভাবেন না। নীরবে—বাহ্বাস্ফোট না করিয়া লম্বা চেওড়া গজ্‌মাপে আর্টিকেল না লিখিয়া অপরের অজ্ঞাত ভাবে বাঙ্গালা ভাষার বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য অমৃতলাল বাবু যাহা করিতেছেন তাহাতে তিনি বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র।

সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত অধিবেশনে হীরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতাপাঠের দিন অমৃত বাবু কি কি বলিয়াছিলেন সমালোচক মহাশয় কি তাহা শুনিয়াছিলেন? ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের মেমোরিয়ল—সভায় জষ্টিস গুরুদাসের সম্মুখে তিনি কি কি বলিয়াছিলেন তাহাও কি লেখক মহাশয় শুনিয়াছেন? তাঁহার প্রহসনগুলিতে তিনি কি করিতেছেন তাহা কি লেখক মহাশয় একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? লেখক মহাশয়কে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ভবিষ্যতে তিনি যেন সমালোচনার প্রকৃত দায়িত্ব বুঝিয়া জজিয়তী করিতে আসেন। সমাপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদ।

ঔপসর্গিকমেহ।

অতিশয় স্ত্রীসম্ভোগ ও সঙ্কর সম্ভোগ (এক স্ত্রীতে বহুপুরুষ উপগত হইলে তাহাকে সঙ্কর সম্ভোগ বলে) দ্বারা স্ত্রীজাতির জননেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরভাগ ক্ষত ও প্রক্লিন্ন (ক্লেদবিশিষ্ট অর্থাৎ পাঁচাধরা) হইয়া উঠে। ঈদৃশী যোনি-সম্পন্না স্ত্রীসংসর্গে পুরুষেরও মূত্রনালীর অভ্যন্তরস্থ শ্লেষ্মবহা ত্বকে ক্ষত হইয়া পূযাদি নিঃসৃত হইতে থাকে। এই পীড়াকে ব্রণমেহ, ঔপসর্গিক মেহ অথবা আগন্তুক মেহ বলা হইয়া থাকে। সঙ্গম দিবসের পর সপ্তম দিবস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন সময়ে এই পীড়ার সূত্রপাত হইতে দেখা যায়। ঔপসর্গিক মেহে লিঙ্গের অগ্রভাগে কণ্ডু, মুহুর্ম্মুহু লিঙ্গের উত্থান ও মুহুর্ম্মুহু প্রস্রাবের বেগ এবং লিঙ্গোত্থান ও প্রস্রাব করিবার সময়ে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এই-রূপে ক্রমশঃ লিঙ্গস্ফীত ও রক্তবর্ণ এবং কোষ ও কুচ্‌কীতে অত্যন্ত বেদনা হয়। কখন কখন নিঃসৃত ক্লেদ পদার্থ দ্বারা প্রস্রাব দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাওয়াতে অতি-শয় যন্ত্রণার সহিত মূত্র নির্গত হইতে থাকে। কখনও বা প্রস্রাব ত্যাগ কালে রক্তস্রাব হয় অথবা ক্লেদ (পূয) নির্গত হয় ও ৭।৮ দিন পরে গাঢ় ক্লেদ নির্গত হয়, উহা শুকাইলে হরিদ্রা বর্ণ হয়। এই সমুদায় ক্লেদ পদার্থে রুদ্ধ হইয়া কখন বা প্রস্রাব দুইধার হইয়া নির্গত হইতে থাকে। যত কাল অতীত হইতে থাকে, ততই যন্ত্রণার লাঘব হয় বটে কিন্তু পীড়া ক্রমশঃ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। এই পীড়া হইতেও আমবাত, বাতরক্ত ও নেত্ররোগ প্রভৃতির সূচনা হইতে থাকে।

ঔপসর্গিক মেহে স্ত্রীসঙ্গম একেবারে পরিত্যজ্য, কারণ ইহা দ্বারা পীড়ার বৃদ্ধি ও উপগতা স্ত্রীরও ঐ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সকল ঔষধ ও অন্ন পানীয় বাতানুলোমক, ব্রণ নাশক ও মূত্র কারক, তৎসমুদয় এই পীড়ায় সেব্য এবং উগ্র ক্রিয়া বর্জ্জনীয়। বাবলার আটা জলে ভিজাইয়া উহাতে ৪ রতি যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবনে অথবা সজল কাঁচা দুগ্ধ পানে এই পীড়ার বিশেষ উপশম হয়। জাতিপত্র অথবা ত্রিফলার কাথে লিঙ্গ নিমগ্ন করিয়া রাখিলে যন্ত্রণার উপশম শীঘ্রই হয়।

অনন্তমূল ২ তোলা ৩২ তোলা জলে জ্বাল দিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া উহাতে যবক্ষার ৪ রতি ও নিশাদল ৪ রতি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। শ্যামালতা, অনন্তমূল, গোক্ষুর বীজ ও কট্‌কী ইহাদের কাথে শোধিত গন্ধক ২ রতি ও নিশাদল ২ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ঔপসর্গিক মেহের নিবৃত্তি

হয়। মকরধ্বজ ১ রতি কাবাবচিনি চূর্ণ ৪ রতি ও মধুসহ সেবনে অথবা কেবল কাবাবচিনি চূর্ণ প্রাতে ৵০ আনা ও সন্ধ্যায় ৵০ আনা মধুসহ সেবন করিলে ঔপসর্গিক মেহে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। প্রমেহপীড়োক্ত বৃহদ্বঙ্গেশ্বর ও সোমনাথ রস সেবনেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। মহাভ্র বটী ও কন্দর্প রস এই দুইটী ঔষধ ঔপসর্গিক মেহে বিশেষ উপযোগী। প্রমেহ পীড়া উপেক্ষিত হইলে দশ প্রকার পিড়কা উৎপন্ন হইতে পারে। ঐ পিড়কা সমুদ'য়ের নাম, লক্ষণ ও চিকিৎসা ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে। দশপ্রকার পিড়কা যথা—শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিণী, বিদারিকা ও বিদ্রধি।

শরাবিকা—অন্তভাগে উন্নত, মধ্যভাগে নিম্ন ও শরাবাকৃতি যে পিড়কা তাহাকে শরাবিকা বলে। ইহা সন্ধি স্থানে, মর্ম্মস্থানে ও উরু প্রভৃতি মাংসল স্থানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কচ্ছপিকা—দাহযুক্ত ও কচ্ছপ সদৃশ আকৃতি সম্পন্ন পিড়কাকে কচ্ছপিকা বলে।

জালিনী—অতিশয় দাহযুক্ত ও মাংসজালে জড়িত পিড়কাকে জালিনী বলে।

বিনতা—পৃষ্ঠে বা উদরে উৎপন্ন নীলবর্ণ বৃহৎ পিড়কাকে বিনতা বলে। ইহাতে অতিশয় বেদনা ও অত্যন্ত ক্লেদ উৎপন্ন হয়।

অলজী—রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকব্যাপ্ত পিড়কাকে অলজী বলে। ইহা অতিশয় ক্লেশজনক ও কষ্টসাধ্য।

মসূরিকা—মসূর কলায়ের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট পিড়কাকে মসূরিকা বলে।

সর্ষপী—শ্বেত সর্ষপের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট পিড়কাকে সর্ষপী বলা যায়।

পুত্রিণী—অল্প স্ফোটক ব্যাপ্ত বৃহদাকার পিড়কাকে পুত্রিণী বলে।

বিদারিকা—বিদারিকা নামক পিড়কা বিদারীকন্দ অর্থাৎ ভূমি কুষ্মাণ্ডের ন্যায় গোলাকার ও কঠিন হয়।

বিদ্রধিকা—বিদ্রধিকা নামক পিড়কা, বিদ্রধি অর্থাৎ ফোড়ার ন্যায় আকৃতি ও লক্ষণ বিশিষ্ট হয়।

যে মেহ যে দোষ হইতে উৎপন্ন, তাহার পিড়কাও তদ্দোষ জনিত বলিয়া স্থির করিতে হইবে। মেদোধাতুর অতিশয় বিকৃতি হইলে প্রমেহ ব্যতিরেকেও এই সকল পিড়কা উৎপন্ন হইতে পারে। তৃষ্ণা, কাস, মাংস পচন, মূর্চ্ছা, হিক্কা, মত্ততা, জ্বর, বিসর্প ও হৃদয়াবরোধ এই সমস্ত প্রমেহ পিড়কার উপদ্রব। গুহ্য, হৃদয়, মস্তক, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও মর্ম্মস্থানে পিড়কা উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে তৃষ্ণাদি উপদ্রব সমস্ত প্রবল ভাবে উদিত হইলে এবং পরিপাক শক্তি ও বলের হ্রাস হইলে পিড়কাক্রান্ত রোগীর জীবনাশা পরিত্যাগ করিবে।

প্রথমতঃ প্রমেহ পিড়কায় বিরেচন প্রদান করিয়া কুষ্ঠাধিকারোক্ত তৈল ঘৃতাদি বিবেচনা মতে প্রয়োগ করিবে। অনন্তমূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, তেউড়ী, সোনামুখী, কট্‌কী, হরিতকী, বাসকছাল, নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুরবীজ মিলিত ২ তোলা ৩২ তোলা

জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে ও ঈষদুষ্ণাবস্থায় পান করিবে। ইহাতে প্রমেহ ও তজ্জনিত পিড়কার শান্তি হয়।

সারিবাদি লৌহ—অনন্তমূল, নীলমূল, রাস্না, গুলঞ্চ, এলাইচ, চিতামূল, মাণ, ওল, চোরকাচ্‌কী তেঁউড়ী, ভেলা ও হরীতকী সমুদায় সমভাগ ও সমষ্টির সমান লৌহ। একত্র মর্দ্দন করিযা ৬ রতি মাত্রায় গুলঞ্চের কাথ বা শীতল জলানুপানে সেবন করিলে প্রমেহ পিড়কা, বাতরক্ত. অর্শঃ ও ত্বগ্‌গত সমস্ত পীড়ার শান্তি হয়। এই পীডায় মকরধ্বজ রস, বৃহৎ শ্যামাঘৃত ও শারিবাদ্যাসব প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ হিতকর।

ধাত্বাদি শোধন ও মারণ।

তাম্র।

তাম্র, ঔদুম্বর, শুল্ব, উদুম্বর, রবিপ্রিয, ম্লেচ্ছমুখ এই সমুদায় শব্দও সূর্ব্বের যাবতীয় নাম তাম্রের পর্য্যায়। যে তাম্র জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ, চিক্কণ, কোমল, আঘাতসহ ও লৌহ সীসক সংমিশ্রণ বর্জ্জিত, তাহাই উৎকৃষ্ট, যাহা কৃষ্ণ বা শ্বেতবর্ণ, রুক্ষ, অতিশয় স্বচ্ছ, লৌহাদি মিশ্রিত ও আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় তাহা নিকৃষ্ট ও অব্যবহার্য্য। অবিশোধিত তাম্র বিষ অপেক্ষাও অনিষ্টকর। বিষের এক দোষ, আর অবিশোধিত তাম্রে ভ্রম, বমি, বিরেচন, স্বেদ, উৎক্লেদ, মূর্চ্ছা, দাহ ও অরুচি এই আট প্রকার দোষ বর্ত্তমান আছে। অবিশোধিত ও অজারিত তাম্র কোন মতে সেবন করা উচিত নহে।

তাম্রপত্র বারংবার উত্তপ্ত করিয়া স্বর্ণের ন্যায় তিলতৈলাদিতে তিনবার করিয়া নিমগ্ন করিবে। অনন্তর ঐ তাম্রপত্র সকল তীব্র অগ্নিতে গোমূত্রে ১ প্রহর পাক করিবে। এইরূপে বিশোধিত ও দোষ বর্জ্জিত হয়। সমভাগ পারদ ও গন্ধককে কজ্জলী করিয়া গোঁড়া লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা ঐ শোধিত তাম্রপত্র সকল লেপন করিবে। এই প্রলিপ্ত তাম্রপত্র সকল শরাবপুটে তিনবার পুট প্রদান করিলেই ভস্ম হইয়া যায়। কজ্জলীর পরিবর্ত্তে গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দিত হিঙ্গুল দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া পুট প্রদান করিলেও তাম্র ভস্ম হইয়া যায়।

তাম্রভস্মের অপর একটী সহজ উপায় এই যথা—কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করা যায় এরূপ পাতলা বিশোধিত তাম্রপত্র অথবা জরি গোঁড়া লেবুর রসে মর্দ্দিত তাম্রাপেক্ষা দ্বিগুণ গন্ধক দ্বারা লেপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিলে ভস্ম হইয়া যায়।

জারিত তাম্র সেবনেও কোন কোন সময় বমনবেগ ও ভ্রমাদি উপস্থিত হইতে দেখা যায়। এ জন্য জারিত তাম্রের অমৃতীকরণ নিতান্ত প্রয়োজন। অমৃতীকৃত তাম্রে ঐরূপ দোষোৎপত্তির আশঙ্কা নাই। জারিত তাম্র কোন অম্লরসে পেষণ করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। অনন্তর ঐ পিণ্ডটী একটী ওলের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে পূরণ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিবে ও রৌদ্রে শুকাইয়া গজপুট প্রদান করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। এই অমৃতীকৃত তাম্রই সেবনীয়। ইহা বিবিধ রোগনাশক।

জারিত তাম্র কষায়, মধুর, তিক্ত, অম্ল, কটুপাক, সারক, কফপিত্ত নাশক, শীতল, রোচক, লঘু, লেখন ও অল্প বৃংহণ। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডু উদরী, অর্শঃ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও শূলরোগ প্রশমিত হয়। মাত্রা ১ রতি।

বঙ্গ।

রঙ্গ, বঙ্গ, ত্রপু, পিচ্ছট ইত্যাদি শব্দ বঙ্গের পর্য্যায়। বঙ্গ দ্বিবিধ খুবক ও মিশ্রক। পিশ্রক অপেক্ষা খুবক বঙ্গ শ্রেষ্ঠ। অবিশুদ্ধ বঙ্গ বিষোপম। অবিশোধিত বঙ্গ সেবনে আক্ষেপ, কম্প, কিলাস, গুল্ম, কুষ্ঠ, শূল, বাতশোথ, পাণ্ডু, প্রমেহ, ভগন্দব, রক্তবিকাব, ক্ষয়, মূত্রকৃচ্ছ্র, কফজ্বব, অশ্মরী, বিদ্রধি ও মুস্কপীড়া প্রভৃতি উপস্থিত হয়। সীসকও অবিশুদ্ধ অবস্থায শোধিত হইলে বঙ্গের ন্যায় অনিষ্ট উৎপাদন করে।

বঙ্গ ও সীসকের শোধন একরূপ। প্রথমতঃ উহাদিগকে অগ্নিসন্তাপে দ্রব করিয়া তিলতৈল, ঘোল, কাঞ্জি, গোমূত্র ও কুলথ কলায়েব ক্বাথে যথাক্রমে তিন বায় করিয়া নিক্ষেপ করিয়া পুনবায় দ্রব করিয়া আকন্দের আঠায় তিনবার নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে বঙ্গ ও সীসক বিশুদ্ধ হয়। বঙ্গ সীসক শোধন করিবার সময় বিশেষ সতর্ক হইষা নিক্ষেপ করিতে হয়। নচেৎ নিষেক সময়ে ছিট্‌কাইয়া শরীরে লাগিতে পারে।

কোন দৃঢ় পাত্রে শোধিত বঙ্গ রাখিয়া অগ্নিসন্তাপ প্রদান করিবে ও ক্রমশঃ অগ্নি প্রজ্বলিত করিবে। বঙ্গ দ্রবীভূত হইলে প্রথমে হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে, অনন্তর এক একটী চূর্ণ মিশ্রিত হইয়া গেলে অপর একটী চূর্ণ প্রদান কবিবে। চূর্ণ যথা—যমানীচূর্ণ, জীবকচূর্ণ, অশ্বত্থের গলিত ছাল (চটা) চূর্ণ ও তেঁতুলছাল চূর্ণ। ক্রমশঃ চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ করিবে এবং বঙ্গ দ্রবীভূত হইলে অনবরত লৌহ-দণ্ড (খন্তী) দ্বারা আলোড়ন করিতে থাকিবে। দুই প্রহর এইরূপে পাক করিলেই বঙ্গ ভস্ম হইয়া যাইবে। জারণার্থ যে সমুদায চূর্ণের উল্লেখ করা গেল, উহাদের পরিমাণের বিশেষ নিয়ম নাই, অনুমান করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক চূর্ণ বঙ্গের সমান বা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলেও কায্য সমাধা হইতে পারে। দুই প্রহর পাকেব পব বঙ্গ শীতল হইলে উহা জলে ফেলিয়া উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিবে ও কিয়ৎক্ষণ তদবস্থায় রাখিয়া পবে অল্পে অল্পে জল ফেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিসন্তাপে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই বঙ্গ ব্যাধি অনুসারে যথা-বিধি উপযুক্ত অনুপানের সহিত যথা মাত্রায় সেবনীয়।

তেঁতুলছাল, অশ্বত্থছাল, যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণের সহিত তেঁতুল ও অশ্বত্থের চটাচূর্ণের সহিত অথবা যে কোন ক্ষার-বান্ পদার্থের চূর্ণের সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পাক করিলে বঙ্গ ভস্ম হয়। এইরূপ মনঃশিলা বা হরিতালের সহিত পাক করিলেও বঙ্গ ভস্ম হইয়া থাকে।

জারিত বঙ্গ লঘু, সারক, রুক্ষ, ঈষৎ পিত্তকর ও চক্ষুর স্বাস্থ্য সম্পাদক। ইহা সেবন করিলে ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা পুষ্টি ও দেহের সুস্থতা লাভ হয়। সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন, বঙ্গ মেহ রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার মাত্রা ৬ রতি পর্য্যন্ত।

শ্রেষ্ঠত্বনিরূপণ।

এপ্রবন্ধ চরকের সূত্রস্থান হইতে যে পদার্থ যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহাই উদ্ধৃত করিব। পাঠক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই সমুদায় বিষয় জানা থাকা আমাদের কতদূর আবশ্যক। মহামুনি চরকার্য্যেরও ইহাই উদ্দেশ্য যে, দোষ গুণ পরিজ্ঞাত হইয়া মনুষ্য হিত বিষযে প্রবৃত্ত হইবে ও অহিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইবে। অদ্য বিশেষ আবশ্যকীয় অংশ উদ্ধৃত করিলাম, খণ্ডাস্তরে সমস্তই উদ্ধৃত করিব। এক্টী বিষয় অথবা একটী পদার্থ দ্বারা সাধারণের তৃপ্তিসাধন সুকঠিন। কারণ সমস্ত লোকই বিভিন্ন রুচি, কবিবর এই জন্যই বলিয়াছেন যে, "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ" আমাদের একটু উদ্দেশ্য আছে, তাই এই কথা গুলি বলিতে হইল। সমীরণের ২য় বর্ষ অতীত হইতে চলিল, ইহার মধ্যে কত লোকের কতই অভিমত শুনিলাম কেহ বলেন সংস্কৃত মূল ভাল লাগে না এবং মূল উদ্ধৃত করার প্রয়োজনীয় তাও কিছু দেখা যায় না। আবার যিনি মূলের মধুরাস্বাদ আস্বাদনে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি পরমপ্রীতি সহকারে বলিতেছেন, মূল নিবদ্ধ হওয়াতে সমীরণ অতীব সুন্দর ও প্রয়োজনীয় পুস্তক হইতেছে। সমীরণের ন্যায় সদুদ্দেশ্য হৃদয়ে ধরিয়া এপর্য্যন্ত কোন পত্রিকাই জন্মগ্রহণ করে নাই।

কেহ বলিতেছেন, সমীরণ কেবলমাত্র বিফল আড়ম্বরে পুষ্ট কলেবর নহে, অত্যাবশ্যকীয় আয়ুর্ব্বেদোদ্ধৃত সৎপ্রবন্ধেই পূর্ণ। আবার পণ্ডিতম্মন্য কোন কোন মহাত্মা বলিতেছেন সমীরণে নূতনত্ব কিছুই নাই, সমস্তই পুরাতন। বোধ হয় এই শেষোক্ত পাঠক সমীরণের প্রস্তাবনা পাঠ করেন নাই সুতরাং উদ্দেশ্য ও বুঝিতে পারেন নাই, অতএব এ পাঠকের অভিমত আমাদের কিরূপ অনুমত, পাঠকগণই বুঝিয়া লইবেন।

"অবিজ্ঞাত প্রবন্ধস্য বচো বাচস্পাতে রপি।
ব্রজত্যফলতাং সেবনমজ্রুহ ইবে হিতম্॥"

আবার বলিতেছেন সবই সুন্দর ঘটে, কিন্তু চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি প্রথমেই সন্নিবেশিত করা উচিত ছিল। পাঠক! বুঝিলেন ত ইহার উদ্দেশ্য। একটী কথা মনে হইল—বড় "উঁকি ঝুঁকি" কোন এক দোষৈক দৃক্ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আসিয়া রাজভবনে উপস্থিত হইলেন, রাজা পরম্পর অতিথির স্বভাব শ্রুত হইয়া ভৃত্যাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহার আহারাদি করাইতে অনুমতি করিলেন। কার্য্যতঃ তাহাই হইল কিন্তু আহারকালে অতিথির গুণ শুনিয়া কৌতূহলাবহ হইয়া কে যেন থড়্‌থড়ি খুলিয়া অতিথিকে একটু দেখিয়াছিল। অতিথি অনুসন্ধান করিয়া অন্য দোষ পাইলেন না, কিন্তু রাজা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন হাঁ মহারাজ পরম পরিতোষ সহকারে আহার করিয়াছি কিন্তু বড় "উঁকি ঝুঁকি"। আমাদের অনুরোধ, পাঠকগণ যেন এই শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ প্রস্তাবেই অন্যান্য বস্তুর ন্যায় উল্লিখিত সমালোকেরও শ্রেষ্ঠত্বনিরূপণ করিয়া লন।

আমরা যে স্থানের মূল সংস্কৃত সুললিত সুগম মনে করিব, সেই স্থানেই সংস্কৃত উদ্ধৃত করিব। বোধ হয় ইহা সহৃদয় ব্যক্তির বিরক্তিজনক হইবে না।

গুরু ভোজনং দুর্ব্বিপাকানাং, একভোজনং সুখপরিণামকরাণাং, স্ত্রীপ্রসঙ্গঃ শোষকরাণাং, শুক্রবেগ নিগ্রহঃ ষাণ্ড্যকরাণাং পরায়তন মন্না শ্রদ্ধাজননানাং, অনশন মায়ুষো হ্রাসকরাণাং, প্রমিতাশনং কর্শনীয়ানাং অজীর্ণাধ্যশনং গ্রহণী দূষণীয়ানাং, বিষমাশনমগ্নিবৈষম্যকরাণাং, বিরুদ্ধ বীর্য্যাশনং নিন্দিত ব্যাধিকরাণাং প্রশমঃ পথ্যানাং, আয়াসঃ সর্ব্বাপথ্যানাং, মিথ্যাযোগো ব্যাধিমুখানাং, রজস্বলাভিগমন মলক্ষ্মীমুখানাং, ব্রহ্মচর্য্য মায়ুষ্য করাণাম্।

গুরু ভোজনই দুষ্পরিপাকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সুচারুরূপে পরিপাক হওয়ার পক্ষে একাহার, শরীরের শুষ্কতা সম্পাদকের মধ্যে স্ত্রীসংসর্গ, পুরুষত্ব শক্তি বিনাশক পদার্থের মধ্যে সমুপস্থিত শুক্র বেগরোধ, পরগৃহ (পরগৃহ নিজের মনোমত হয় না) অন্নে অশ্রদ্ধা জনকের মধ্যে, আয়ুনাশক কার্য্যের মধ্যে উপবাস, কৃশতা জনকের মধ্যে অল্প ভোজন, গ্রহণীরোগ উৎপাদনের মধ্যে পূর্ব্বকৃত আহার জীর্ণ না হইতে পুনরায় ভোজন, পাচকাগ্নির হ্রাস বৃদ্ধি জনকের মধ্যে বিষমাশন, (সময়ের বৈষম্য ও মাত্রার বৈষম্য) নিন্দিত অর্থাৎ কুষ্ঠাদি ব্যাধি জনকের মধ্যে ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধবীর্য্য পদার্থের একত্র ভোজন, হিতজনকের মধ্যে শান্তি অবলম্বন, অহিত জনকের মধ্যে আয়াস অর্থাৎ পরিশ্রম, সর্ব্বপ্রকার পীড়া জনকের মধ্যে আহার বিহারাদির মিথ্যা যোগ, অলক্ষ্মী জনকের মধ্যে রজস্বলা স্ত্রীগমন এবং আয়ুর্ব্বর্দ্ধক উপায় সমুদায়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সঙ্কল্পো বৃষ্যাণাং, দৌর্ম্মনস্যমবৃষ্যাণাং, অযথা বলমারম্ভঃ প্রাণোপরোধিনাং বিষাদো রোগবর্দ্ধনানাং স্নানং শ্রমহরাণাং, হর্ষঃ প্রীণনানাং শোকঃ শোষণানাং, নির্বৃত্তিঃ পুষ্টিকরাণাং, পুষ্টিঃ স্বপ্ন করাণাং, স্বপ্নস্তন্দ্রাকরাণাং, সর্ব্বরসাভ্যাসো বলকরাণাং, এক রসাভ্যাসো দৌর্ব্বল্যকরাণাং, গর্ভশল্য মহার্য্যাণাং, বালো মৃদু ভেষজনীয়ানাং বৃদ্ধো যাপ্যানাং, গর্ভিণী তীক্ষ্ণৌষধ ব্যায়াম বর্জ্জনীয়ানাং, সৌমনস্যং গর্ভধারকাণাং, সন্নিপাতো দুশ্চিকিৎস্যানাং আমো বিষম চিকিৎস্যানাম্।

বৃষ্য জনকের মধ্যে মানসিক সঙ্কল্প অর্থাৎ ইচ্ছাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শারীরিক তেজঃ নাশকের মধ্যে মনের উৎকণ্ঠা, স্বীয় শক্তিতে যাহা সম্পন্ন না হয়, এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বলনাশকের মধ্যে, রোগ বর্দ্ধকের মধ্যে মনের অপ্রীতি, পরিশ্রম নাশকের মধ্যে স্নান, প্রীণন অর্থাৎ হর্ষজনক পদার্থের মধ্যে মনের সন্তোষ, শরীরের শোষণ কারকের মধ্যে শোক, পুষ্টিকারকের মধ্যে নির্বৃত্তি, নিদ্রাকারকের মধ্যে পুষ্টি, তন্দ্রাজনকের মধ্যে নিদ্রা, বলকরের মধ্যে সকল রসের সেবন, দৌর্ব্বল্য জনকের মধ্যে নিয়ত একরস সেবন, অহার্য্য অর্থাৎ দুরাকর্ষণীয়ের মধ্যে গর্ভশল্য, বমন যোগ্য পদার্থের মধ্যে উদরস্থ অজীর্ণ দ্রব্য, মৃদু ঔষধ প্রয়োগযোগ্যের মধ্যে বালক, যাপ্য রোগের মধ্যে বৃদ্ধাবস্থার রোগ, উগ্র ঔষধ, ব্যায়াম ও ব্যবায় যাহাদের বিধেয় নহে, তাহাদের মধ্যে গর্ভিণী, মনের সুস্থতা গর্ভধারণকারণের মধ্যে, দুশ্চিকিৎস্য রোগের মধ্যে সন্নিপাত ও বিষম চিকিৎস্য রোগের মধ্যে আম অর্থাৎ অপক্ক রস সম্ভূত রোগ সর্ব্বপ্রধান।

গুল্মনিদান।

হৃন্নাভ্যো রন্তরে গ্রন্থিঃ সঞ্চারী যদি বা চলঃ।
বৃত্তশ্চয়াপচয়বান্ স গুল্ম ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

হৃদয় এবং নাভীর মধ্যে সঞ্চরণশীল অথবা নিশ্চল হ্রাস বৃদ্ধি বিশিষ্ট বর্ত্তুলাকার গ্রন্থির নাম গুল্ম। গুল্ম রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে বহুল পরিমাণে উদ্গার উঠে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, আহারে অনভিলাষ, দুর্ব্বলতা, অন্ত্রকূজন অর্থাৎ আঁতডাকা, পেটের ভিতর গুড় গুড় শব্দ, উদরের স্ফীততা ও অগ্নিমান্দ্য এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। আর প্রায়শঃ সমস্ত গুল্মেই অরুচি, অতি কষ্টে বাত মূত্র ও মলত্যাগ, অন্ত্রকূজন, আনাহ ও বায়ুর প্রতিলোম ভাব উপস্থিত হয়।

যদা পুরুষো বাতলো বিশেষেণ জ্বর বমন বিরেচনাতীসারাণামন্যতমেন কর্শনেন কর্শিতো বাতলমাহার আহরতি, শীতং বা বিশেষেণাতিমাত্রমস্নেহপূর্ব্বং বা বমনবিরেচনে পিবত্যনুদীর্ণান বাতমূত্র পুরীষ বেগান্ নিগৃহ্ণাত্যাস্থিতো বা পিবতি নবোদকর্মা (?) অত্যতিসংক্ষোভিণা বা যানেন যাত্যভিপ্রায় ব্যায়াম মদাকুচিৎবা ভিঘাতমিচ্ছতি বা বিষমাশনশয়নস্থান চংক্রমণসেবী বা ভবত্যন্যদ্বা কিঞ্চিদেবং বিধং বিষমতিমাত্রং ব্যায়ামজাত মারভতে, তস্যাপচারাদ্ বাতঃ প্রকোপ মাপদ্যতে।

বাতপ্রকৃতিক পুরুষ জ্বর, বমন, বিরেচন ও অতিসার প্রভৃতি কোন রোগ অথবা কোন কর্ষণ ঔষধ দ্বারা কর্ষিত (কৃশ) হইয়া যদি বাতল অর্থাৎ বায়ুর প্রকোপজনক বস্তু অথবা শীতল পান আহার সেবন করে কিম্বা নিঃস্নেহ বমন বিরেচন, বমন বেগ সম্যক্ উপস্থিত না হইলেও বমন চেষ্টা অথবা সমুদীর্ণ বাত মূত্র ও পুরীষাদির বেগনিরোধ, ভোজন করিয়া পরিতৃপ্তরূপে নূতন জল পান, এবং অশ্বাদি দ্রুত যানারোহণ, অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ, সমধিক পরিশ্রম, মদ্যপানে অত্যাশক্তি, কোনরূপ আঘাত প্রাপ্তি, বিপরীত ভাবে শয়ন বা উপবেশন, অতিশয় ভ্রমণ এবং অন্যান্য এইরূপ বাত-প্রকোপজনক কর্ম্ম অথবা বিষাক্ত দ্রব্য সেবন করে, তবে ঐ ব্যক্তির বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হয়।

স প্রকুপিতো মহাস্রোতোঽনুপ্রবিশ্য রৌক্ষ্যাৎ কঠিনীকৃত্যাপ্লুত্য পিণ্ডিতোঽবস্থানং করোতি। হৃদি বস্তৌ পার্শ্বয়োর্নাভ্যাং বা স শূলমুপজনয়তি। স বাত জন্যাননেকবিধান্ বেদনাবিশেষান জনয়তি, গ্রন্থীংশ্চানেকবিধান পিণ্ডিত শ্চাবতিষ্ঠতে স পিণ্ডিতত্বাদ্ গুল্ম ইত্যপ চর্য্যতে।

উল্লিখিত কারণে কুপিত বায়ু প্রধান ধমনী সমূহে প্রবেশ করিয়া স্বীয় রুক্ষত্ব হেতু কঠিনীভূত ও সমস্ত শরীরকে আক্রমণ করতঃ হৃদয়ে, বস্তিদেশে, উভয় পার্শ্বে অথবা নাভিদেশে পিণ্ডাকারে অবস্থান করে এবং বাত জন্য নানাবিধ বেদনা জন্মায়। ঐ পিণ্ডিত বায়ু হস্তাদি দ্বারা স্পর্শ করিলে গ্রন্থির ন্যায় অনুভূত হয় এবং পিণ্ডিত অর্থাৎ একটা জড়িত পদার্থের ন্যায় বলিয়া ইহার গুল্ম নাম প্রদত্ত হইয়াছে। বাস্তবিক গুল্মের (ঝোপ) সহিত সাদৃশ্য আছে, এজন্যই ইহার নাম গুল্ম হইয়াছে। মাধবকর স্বীয় নিদান গ্রন্থেও ইহাই সংক্ষেপে বলিয়াছেন যথা—

দুষ্টা বাতাদয়োঽত্যর্থং মিথ্যাহারবিহারতঃ।
কুর্ব্বন্তি পঞ্চধা গুল্মং কোষ্ঠান্তর্গ্রন্থিরূপিণম্॥

অনুচিত আহার বিহারাদি দ্বারা বাতাদিদোষ অত্যর্থ কুপিত হইয়া কোষ্ঠ মধ্যে গ্রন্থিরূপ গুল্ম রোগ উৎপাদন

করে। পার্শ্বদ্বয়, হৃদয়, নাভি ও বস্তি এই পাঁচটী* ইহার অবস্থিতি স্থান এবং গুল্ম পঞ্চবিধ।

স মুহুবাদধাতি মুহুবল্পত্ব মাপদ্যতে অনিয়ত বেদনাচঞ্চলত্বাদ্বায়োঃ পিপীলিকা সংপ্রকীর্ণ ইব। তোদস্ফুরণাযামসঙ্কোচ হর্ষ প্রলয়োদয় বহুল, স্তদাতুরঃ সূচেব শংকুনেব চাভিবিদ্ধ মাত্মানং মন্যতেঽপি চ দিবসান্তে জ্বরতে, শুষ্যতি চাস্যাস্যমুচ্ছ্বাসশ্চোপরুধ্যতে হৃষ্যন্তি চাস্য রোমাণি বেদনায়াঃ প্রাদুর্ভাবে প্লীহাটোপান্ত্রকূজ বিপাকো দাবর্ত্তাঙ্গমর্দ্দমন্যাশিরঃশঙ্খশূলব্রধ্নরোগাশ্চৈন মুপদ্রবন্তি কৃষ্ণারুণপরুষত্বঙনখ নয়ন বদন মূত্র পুরীষশ্চ ভবতি নিদানোক্তানি চাস্যনোপশেরতে বিপরীতানি চোপশেরতে ইতি বাত গুল্ম।

বাতগুল্মে কখন অল্প বেদনা কখনও বা অধিক বেদনা এবং সঞ্চরণশীল স্বল্পাকার পিপীলিকার ন্যায় গুল্ম কখন বৃহদাকার কখনও বা অল্পাকার উপলব্ধি হয়, কারণ বায়ু চঞ্চলগতি। গুল্ম রোগ উপস্থিত হইলে রোগী সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা, স্ফুরণ, (জিলিক দেওয়া) বিস্তার, সংকোচ, লোমহর্ষ ও পীড়ার হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা অতিশয় পীড়িত হয়। বাতগুল্মরোগাক্রান্ত ব্যক্তি মনে করে যেন তাহাকে কেহ সূচি দ্বারা বিদ্ধ করিতেছে, কখনও বা মনে করে যে, শঙ্কু দ্বারা তাহাকে কেহ আঘাত করিতেছে। দিবসের অবসানে অর্থাৎ শেষভাগে রোগীর জ্বর হয় ও মুখ শুষ্ক হইয়া যায়, নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ করে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, উদরে গুড় গুড় শব্দ অথবা অন্ত্রকূজন, ভুক্ত বস্তুর অপরিপাক, মলমূত্রের আবদ্ধতা ও অঙ্গমর্দ্দ (হাত পা কামড়ান) প্রভৃতি উপস্থিত হয় এবং মন্যা (ঘাড়ের শিরা) মস্তক ও শঙ্খ অর্থাৎ কপালের দুই পার্শ্বে বেদনা উপস্থিত হয়। গুল্ম রোগে ব্রধ্ন বা কুঁচকিতে বেদনা জন্মিতে পারে। চর্ম্ম, নখ, নয়ন, আনন, মূত্র ও পুরীষাদি কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ এবং ইহাদিগের পরুষতা অর্থাৎ অস্নিগ্ধ খরখরে ভাব লক্ষিত হয়। যে সমুদয় বাত গুল্মের নিদান উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের উপসেবনে বৃদ্ধি এবং তদ্বিপরীত দ্রব্য সেবনে উপকার অর্থাৎ পীড়ার হ্রাস হয়।

গুল্মরোগে বায়ুর ক্রিয়াই বলবতী বটে, কিন্তু পিত্ত শ্লেষ্মার ও ইহাতে বিশেষ আনুগত্য আছে। এইরূপে গুল্ম পঞ্চবিধ। বাতিক গুল্মের বিষয় বলা হইল, অপর পিত্তগুল্ম, শ্লেষ্মগুল্ম, সান্নিপাতিক ও রক্তগুল্মের বিষয় ক্রমশঃ বলা যাইতেছে।

*কটু, অম্ল, বিদাহি (দাহজনক, লঙ্কা প্রভৃতি) তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও রুক্ষ বস্তু সেবন, ক্রোধ, অতিশয় মদ্যপান, রৌদ্র কিম্বা অগ্নি সন্তাপ, বিদগ্ধাজীর্ণ-জনিত দুষ্ট রসোৎপত্তি ও রক্ত দুষ্টি এই সমস্ত পিত্ত গুল্মের নিদান। পৈত্তিক গুল্ম জন্মিলে পিপাসা, জ্বর, মুখাদি অবয়বের রক্তবর্ণতা, আহারের পরিপাক কালে গুল্মে অতিশয় বেদনা, ঘর্ম্মের অনির্গম ও শরীরে বিদাহ ইত্যাদি উপদ্রবে রোগী পীড়িত হয়। পৈত্তিক গুল্মে অতিশয় বেদনা উপস্থিত হয়, স্পর্শ করিতেও রোগী বিশেষ ক্লেশ বোধ করে। প্রকুপিত পিত্ত এবং বায়ু আমাশয়ের কোন এক স্থানে অবস্থান করিয়া বাতগুল্মের ন্যায় এই পিত্তগুল্মেও নানাবিধ বেদনা জন্মায়।

গুরু, স্নিগ্ধ ও শীতল দ্রব্যের নিয়ত সেবন, অধিক পরিমাণে ভোজন, ইক্ষু,

ক্ষীর, মাষকলাই, তৈল এবং গুড়জাত দ্রব্য সেবন, ও সর্ব্বদা পিষ্টক ভক্ষণ, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, পরিতৃপ্তরূপে আহার করিয়া জলপান অথবা ভোজন করিয়া নিদ্রা কিম্বা পথ পর্য্যটন দ্বারা শরীরস্থ শ্লেষ্মা বায়ুর সহিত প্রকুপিত হয়।

উল্লিখিত কোন কারণে প্রকুপিত শ্লেষ্মা বায়ু কর্তৃক আমাশয়ের কোন এক স্থানে আবদ্ধ হইয়া কফগুল্ম উৎপাদন করে। বাতগুল্মের ন্যায় এই কফগুল্মেও নানাবিধ বেদনা উপস্থিত হয়। কফজনিত গুল্মের হ্রাস বৃদ্ধি নাই এবং ইহা স্থির ও কঠিন। কফগুল্ম প্রবৃদ্ধ হইলে কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায় ও রাজযক্ষ্মার উৎপত্তি হইতে পারে। ইহাতে চর্ম্ম, নখ, নয়ন, মুখ ও মল মূত্রাদি শীতল ও শ্বেতবর্ণ হয়।

এই তিন প্রকার গুল্মের নিদান ও লক্ষণ মিলিত হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক গুল্ম বলা যায় ইহা অসাধ্য সুতরাং অচিকিৎস্য। সান্নিপাতিক গুল্ম অত্যন্ত বেদনা ও দাহযুক্ত এবং প্রস্তরবৎ কঠিন ও উন্নত। ইহা শীঘ্রবিদাহী, ভয়ঙ্কর ক্লেশদায়ক এবং মন, শরীর ও অগ্নিবলনাশক।

সচরাচর এই চারিপ্রকার গুল্ম সকলেরই হইতে পারে কিন্তু রক্তগুল্ম স্ত্রীলোকদিগেরই হয়।

শোণিতগুল্মস্তু খলু স্ত্রিয়া এব ভবতি। ন পুরুষস্য, গর্ভ কোষ্ঠার্ত্তবাগমনবৈশেষ্যাৎ।

রক্তগুল্ম স্ত্রীলোকেরই হইতে পারে, পুরুষের পারে না, কারণ স্ত্রী ভিন্ন পুরুষের গর্ভাশয়ে ঋতুশোণিতের আগমন অসম্ভব।

পারতন্ত্র্যাদবৈশারদ্যাৎ সততমুপচারানুরোধাদ্‌-বেগানুদীর্ণানুপরুন্ধত্যা আমগর্ভে বা প্রাচিরাৎ পতিতে তথাপ্যচিরপ্রজাতায়া ঋতৌ বা বাতপ্রকোপনান্যাসেবমানায়া বাতঃ প্রকোপমাপদ্যতে।

পারতন্ত্র্য অর্থাৎ পরাধীনতা হেতু, অশিক্ষিতত্ব হেতু, এবং সতত শুশ্রূষা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা হেতু স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদাই মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপ বেগ রোধ এবং অপরিণত গর্ভস্রাবান্তে, প্রসবান্তে বা ঋতুকালে অহিত জনক আহার বিহার করিলে বায়ু কুপিত হয়।

স প্রকুপিতো যোন্যামুখমনুপ্রবিশ্যার্ত্তবমুপরুণদ্ধি, মাসি মাসি তদার্ত্তবমুপরুধ্যমানং কুক্ষিমভিবর্দ্ধয়তি।

পূর্ব্বোক্ত কারণে কুপিত বায়ু যোনি-মুখে অবস্থান করিয়া ঋতু শোণিতকে রোধ করে। এই আর্ত্তব এইরূপে মাসে মাসে গর্ভাশয়ে সঞ্চিত হইয়া উদরকে স্ফীত করে। রক্ত গুল্মে অত্যন্ত বেদনা ও দাহ থাকে এবং পিত্ত জনিত গুল্মের তাবৎ লক্ষণই উপস্থিত হয়। এবং সমস্ত গর্ভ লক্ষণ অর্থাৎ ঋতু শোণিত রোধ, মুখ পীতবর্ণ, স্তনাগ্র কৃষ্ণবর্ণ ও নূতন নূতন বস্তু সেবনে অভিলাষ ইত্যাদি উপস্থিত হয়, কেবল প্রভেদ এই যে, গর্ভ—হস্ত-পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত নিরন্তর স্পন্দিত হয়, আর রক্তগুল্ম অঙ্গপ্রত্যা-ভাবে কেবলমাত্র পিণ্ডটীই দীর্ঘকালান্তে যাতনার সহিত স্পন্দিত হইয়া থাকে। অল্প মাত্র প্রভেদে নিশ্চয় করা সুকঠিন সুতরাং ঋতু রোধের পর দশম মাস অতীত হইলেই চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অন্যান্য পীড়া পুরাতন

হইলে কষ্টসাধ্য হয় কিন্তু রক্তগুল্ম দশম মাস অতীত হইলেই সুখসাধ্য হয়। পণ্ডিতগণ এই জন্যই বলিয়াছেন যে—

"মাসে ব্যতীতে দশমে চিকিৎস্যঃ"

এই বচনটীতে এরূপ মীমাংসা করা অন্যায় যে, পণ্ডিতগণ গর্ভ ও গুল্মের প্রভেদ করিতে অক্ষম হইয়াই উক্ত বচনটীর অবতারণা করিয়াছেন। বাস্তবিক দশম মাস অতীত হইলেই রক্তগুল্ম সুখসাধ্য হয়।

গুল্ম ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া সর্ব্বোদর ব্যাপী, রস রক্তাদি ধাত্বাশ্রয়ী, শিরাব্যাপ্ত ও কূর্ম্মবৎ উন্নত হইলে, এবং রোগী দৌর্ব্বল্য, অরুচি, বমনবেগ, কাস, বমি, অসুস্থ চিত্ততা, জ্বর, তৃষ্ণা, তন্দ্রা ও প্রতিশ্যায়াদি দ্বারা আক্রান্ত হইলে রোগ অসাধ্য জানিবে। গুল্ম রোগীর হৃদয়, নাভি, হস্ত ও পদে শোথ এবং জ্বর, শ্বাস, বমি ও অতিসার উপস্থিত হইলে অথবা শ্বাস, শূল, পিপাসা, অরুচি, অকস্মাৎ গুল্মের বিলয় এবং দৌর্ব্বল্য এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তবে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য।

ভৈষজ্য বিজ্ঞান।

আটরুষক নির্য্যূহে প্রিয়ঙ্গু মৃত্তিকাঞ্জনে।
বিনীয় লোধ্রং সক্ষৌদ্রং রক্তপিত্তহরং পিবেৎ॥

পুটপাক দ্বারা গৃহীত বাসকপত্র রসে প্রিয়ঙ্গু চূর্ণ ॥৹ তোলা, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ॥৹ তোলা (সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা অভাবে পঙ্কপর্পটী) রসাঞ্জন ॥৹ তোলা ও লোধ্রচূর্ণ ॥৹ তোলা এবং ২ তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত নিশ্চয় নিবৃত্ত হয়। বাসকপত্রের রস পাতালী যন্ত্র দ্বারা গ্রহণ করিবে। অপর উপায় দ্বারা গ্রহণ করিলেও চলিতে পারে; যথা— ২ তোলা রস পাওয়া যায়, এই পরিমাণ বাসকপত্র অল্প কুট্টিত ও কচি কলার পাতা দিয়া বেষ্টন করিয়া উপরে পুরু করিয়া মৃত্তিকা লেপন করিবে ও আগুনে ঝল্‌সাইয়া শিশিরে রাখিয়া পরদিন রস গ্রহণ করিবে।

রক্তপিত্ত রোগে অতিশয় রক্ত বমন হইতেছে, এরূপ অবস্থায় পাকা যজ্ঞডুমুর ফলের রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ কাশীর চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অতি সত্বর রক্ত বমন নিবারণ হয়।

মাখন ১ তোলা ও কৃষ্ণতিল ১ তোলা (খোসা ছাড়ান) সেবন অভ্যাস করিলে অতি দুর্ব্বার অর্শরোগ প্রশমিত হয়। যে অর্শে রক্তস্রাব হয়, সেইরূপ অর্শেই ব্যবহার করা উচিত। মাখন, পদ্মকেশর, চিনি ও ঘোল একত্র সেবন করিলে অর্শের রক্তস্রাব নিবৃত্ত হয়। জীরক চূর্ণ ও ঘোল কিঞ্চিৎ বিটলবণের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, রক্তস্রুতি নিবারণ হয়, পাচকাগ্নির বৃদ্ধি ও সমস্ত অর্শ নিবারিত হয়।

বরাক্রান্তা, নীলোৎপল, মোচরস, লোধ, কৃষ্ণতিল ও রক্তচন্দন সমষ্টিতে ২ তোলা পরিষ্কার করিয়া শিলায় পেষণ করিবে ও ছাগদুগ্ধ সহ আলোড়ন করিয়া সেবন করিলে অর্শ হইতে রক্তস্রুতি নিবারিত হয়।

অনেক সময় মাতার দোষে শিশু সন্তানকে কষ্ট পাইতে হয়। মাতার স্তন্যদোষে শিশুর জ্বর, সর্দ্দি, কাসি ও অতিসারাদি কষ্টদায়ক পীড়া উপস্থিত

হইয়া থাকে। স্তন্যদোষই পীড়ার কারণ হইলে নিম্নলিখিত যোগটী স্তন্যপায়ী শিশুর মাতাকে সেবন করাইবে; ইহা সেবনে মাতার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় ও স্তন্যদুগ্ধ বিশোধিত হয় সুতরাং শিশুর জ্বর অতিসারাদি পীড়া সত্বর আরোগ্য হয়। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, চাকুলে (পিঠানী) ও ইন্দ্রযব সমষ্টিতে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। ইহার নাম হরিদ্রাদিকাথ।

মুতা, পিপুল, আতইচ ও কাকড়াশৃঙ্গী উত্তম চূর্ণ ও সমভাগ মিশ্রিত করিয়া এক বা দেড় আনা মাত্রায় মধু দ্বারা মাড়িয়া শিশুকে অবলেহন করাইলে জ্বরাতিসার, কাস, শ্বাস, বমন ও দুধতোলা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। বালকদিগের পক্ষে এই যোগটী অব্যর্থ ও প্রসিদ্ধ। ইহার নাম বাল চতুর্ভদ্রিকা।

যে শিশু দুগ্ধ পান করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন করে, তাহাকে বৃহতী ফল ও কণ্টকারী ফলের রস /০ বা ৵০ আনা মধু সহ সেবন করাইবে অথবা পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, চিতা ও চৈ চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া /০ বা /১০ আনা মাত্রায় মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করাইলে শিশুর বমন অর্থাৎ দুধতোলা নিবারণ হয়।

দ্রাক্ষা বা কিস্‌মিস্, হরিতকী ও পিপ্পলী সমভাগে পেষণ করিয়া ৵০ আনা মাত্রায় ঘৃত ও মধুসহ লেহন করাইলে বালকের কাস ও শ্বাস প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

অনেকগুলি লোকের সংস্কার আছে যে, মসূরিকা অর্থাৎ বসন্ত রোগ উপস্থিত হইলে কোন চিকিৎসাই কর্ত্তব্য নহে। আবার কেহ কেহ মনে করেন, বসন্তচিকিৎসক ব্যতীত অপর কোন চিকিৎসক বসন্ত চিকিৎসা করিতে জানেন না। ফলতঃ এ দুইটী সংস্কারই ভ্রমাত্মক। যে শাস্ত্রযুক্তি অবলম্বন করিয়া অপরাপর বহুবিধ রোগের যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতেছে, সেই শাস্ত্রেই যখন বসন্ত রোগের চিকিৎসা সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন শাস্ত্রযুক্তি অবলম্বন করিয়া বসন্তের চিকিৎসা করিলে ফললাভে বঞ্চিত হইবার কিছুমাত্র কারণ পরিলক্ষিত হয় না। কেহ মনে করিতে পারেন বিনা কারণে লোকের মনে এরূপ সংস্কার কেন বদ্ধমূল হইল? বিশেষ কারণ নিশ্চয় না হইলেও, সহজে এইটী অনুমান হয় যে, বসন্ত বড়ই সংক্রামক রোগ, পরন্তু মারাত্মক। এই দুইটী কারণে চিকিৎসকদিগের মধ্যে অনেকেই সহজে ইহার চিকিৎসা করিতে সম্মত নহেন। পূর্ব্বে যদিও দুই একটী চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে হইত, কিন্তু ক্রমশঃ এখন উহা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। চিকিৎসকের বসন্ত চিকিৎসা করিতে বিশেষ আগ্রহ হয় না, রোগী বা তাহার অভিভাবকদিগের সুতরাং এইরূপ সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে; আবার বিশেষ ফলদায়ক ঔষধ আছে বলিয়াও অনেকের ধারণা নাই। সকল রোগেরই সাধ্যাসাধ্যতা আছে, তদ্রূপ বসন্তের মধ্যেও যাহা অসাধ্য, তাহা কিছুতেই আরোগ্য হয় না। ফলতঃ ঔষধে উপকার হয় না, এরূপ স্বীকার করা যায় না। এ সময়ে চতুর্দ্দিকেই বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে সুতরাং আমরা এবারে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে বসন্ত

রোগের বিশেষ ফলদায়ক দুই একটী সহজ সহজ প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছি, আশা করি ইহা দ্বারা অবশ্যই উপকার লাভ হইবে।

গাত্রবেদনা, নাভিদেশে ভারবোধ, অত্যন্ত শিরোবেদনা এবং মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে সেই জ্বরে রোমান্তী (হাম) বা মসূরিকা (বসন্ত) প্রকাশ পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই অবস্থার জ্বর অধিকদিন স্থায়ী হয় না। সচরাচর চারিদিনেই ছাড়িয়া যায়। হাম বা বসন্ত প্রকাশ হইলে প্রায় তিন দিনেই হয়। চিকিৎসকের উল্লিখিত লক্ষণ-গুলির দিকে প্রথমতঃ লক্ষ্য রাখা উচিত। উহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলে, জ্বরঘ্ন কোন ঔষধ প্রদান করা বিধেয় নহে। যাহাতে সামান্যরূপ বমন বা বিরেচন হয় এরূপ ঔষধ প্রদান করাই উচিত। সর্ব্বদা রোগীর গৃহ ও বস্ত্রাদি পরিষ্কার রাখিবে। চন্দন, ধূনা ও কর্পূর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা রোগীর গৃহে ধূম প্রদান করিবে।

১। বাসকছাল, পটোলপত্র, গুলঞ্চ, দুরালভা, চিরতা, ধনে, নিমছাল, কট্‌কী ও ক্ষেতপাপড়া সমানাংশে মিলিত ২ তোলা ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া শীতল হইলে পান করিবে। ইহাতে অপক্ক বসন্ত পাকিয়া উঠে ও পক্ক বসন্ত সমুদায় শুকাইয়া যায় এবং সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়।

২। নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, আক-নাদি, পটোলপত্র, কট্‌কী, বাসকছাল, দুরালভা, আমলা, বেণারমূল, রক্তচন্দন ও শ্বেতচন্দন সমুদায় মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। এই কাথে ॥০ তোলা ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সমস্ত প্রকার বসন্ত, জ্বর ও বিসর্প প্রভৃতি আরোগ্য হয়। যে বসন্ত ভালরূপে শরীরে প্রকাশ হয় নাই, ইহা সেবনে তাহাও প্রকাশ হইয়া যন্ত্রণার লাঘব করে।

রুদ্রাক্ষচূর্ণ ৵০ আনা ও মরিচচূর্ণ ৵০ আনা একত্র বাসি জলের সহিত ২।৩ দিন সেবন করিলে বসন্ত আরোগ্য হয়। শরীরে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে নিম্বপত্র, তেলাকুচাপত্র ও বদরী (কুল) পত্র জলে আলোড়ন করিয়া তাহার ফেন প্রদান করিবে। বসন্তের মুখ ক্ষত হইয়া গেলে হরিদ্রাচূর্ণ ও মাখন অথবা কেবলমাত্র মাখন লেপন করিলে ক্ষত আরোগ্য হয়; পরন্ত বসন্তের চিহ্ন-গুলিও শরীরে মিলাইয়া যায়, মুখ কিম্বা অপর কোন স্থানে চিহ্ন থাকে না। মধু প্রক্ষেপ দিয়া বাসি জল পান করিলে বসন্তের দাহ আরোগ্য হয়।

অশ্বত্থ, বট, বকুল, যজ্ঞডুমুর ও যষ্টি-মধু ইহাদের চূর্ণ ক্ষতস্থানে ছড়াইয়া দিলে বসন্তের ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয়। কেহ কেহ বলেন, পানিবসন্ত বাহির হইলে তেলাকুচা, থুলকুড়ি, বাসক, বুড়িগোপান, বাবুইতুলসী, কুড়, ক্ষেত-পাপড়া ও মুতা ইহাদের কাথ পান করিলে ৩।৪ দিনের মধ্যে সমস্ত বসন্ত বাহির হয়, জ্বর বিচ্ছেদ হয় এবং সত্বরই ক্ষত আরোগ্য হয়। শ্বেতচন্দন ঘসিয়া পানিবসন্তে মাখিলে যন্ত্রণা দূর হয় ও ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয়। সমস্ত বসন্ত প্রকাশ হওয়ার পর ক্ষত শুষ্ক ও জ্বর ত্যাগ হইলে কাঁচা হরিদ্রা ও নিমপাতা মাখিয়া

স্নান করিবে। বসন্ত শুরু হইবার সময় হইতে যাহাতে রোগীর শরীর স্নিগ্ধ থাকে, এরূপ আহার প্রদান করা বিধেয়।

যন্ত্র প্রকরণ।

বিম্বাধর যন্ত্র।

একটী হাঁড়ীর মধ্যে পারদ রাখিয়া আর একটী হাঁড়ী উহার উপরে উর্দ্ধমুখ করিয়া বসাইতে হয় এবং সন্ধিস্থল কর্দ্দমাদি দ্বারা উত্তমরূপ লেপন করিয়া দিতে হয়। অনন্তর উহা চুল্লীর উপর বসাইয়া উপরের হাঁড়ীতে জল রাখিয়া মৃদু-অগ্নি সন্তাপ দিতে হয় ও হাঁড়ীর জল উষ্ণ হইলে উহা ফেলিয়া দিয়া পুনরায় শীতল জল প্রদান করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে জল পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হয়। ১৫ ঘণ্টা জ্বাল দেওয়া উচিত। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা উপরিস্থ হাঁড়ীর নিম্নদেশে পারদ কণা সমুদায় আসিয়া সংলগ্ন হয়। অগ্নি-নির্ব্বাণ হইলে উক্তরূপ পারদ কণা সমুদায় গ্রহণ করিবে। এই যন্ত্র দ্বারা পারদের উর্দ্ধ পাতন ক্রিয়া সাধিত হয়।

পারদ ব্যবসায়ীরা পারদের সহিত সীসকাদি ধাতু মিশ্রিত করে। এই উর্দ্ধপাতন অধঃপাতনাদি ক্রিয়া দ্বারা পারদের ঐ সীসকাদি মিশ্রণ দোষ দূরীভূত হয়।

ভূধর যন্ত্র।

ভূধর যন্ত্র ডমরু অথবা বিম্বাধর যন্ত্রের সদৃশ। ইহার নিম্নস্থালীতে জল রাখিতে হয়। এই যন্ত্র ভূগর্ভে নিহিত করিয়া উর্দ্ধে অগ্নি প্রদান করিতে হয়। এই যন্ত্র দ্বারা পারদের অধঃপাতন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

তির্য্যক্‌পাতন যন্ত্র।
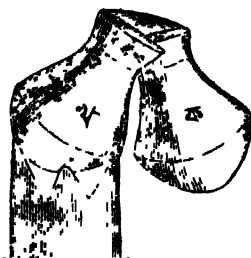
এই চিত্রানুযায়ী দুইটী ঘট অর্থাৎ কলসী তির্য্যক্‌ভাবে স্থাপিত ও উভয়ের মুখ একত্রিত করিয়া সন্ধিস্থল উত্তমরূপে লেপন করিবে। একটী ঘটে পারদ রাখিবে ও অপর ঘটে জল রাখিবে। অতঃপর পারদযুক্ত ঘটের নিম্নে মৃদু অগ্নি-সন্তাপ প্রদান করিবে। অগ্নিসন্তাপে পারদ উত্থিত হইয়া অপর জলযুক্ত ঘটে সঞ্চিত হয়। এই ক্রিয়াকে তির্য্যক্‌-পাতন ক্রিয়া কহে।

২য় খণ্ড। | ১৩০১ সাল—চৈত্র। | ৭ম সংখ্যা।

সূচী পত্র।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

মূল্য, প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা।

গ্রাহক মহোদয় সমীপে

একটী বিশেষ নিবেদন।

সমীরণ সদা আপনি বহে, কখনও কাহার অধীন নহে, যতদিন যাহার সঙ্গে রহে, তাহার গুণগৌরব অঙ্গে মাখিয়া রঙ্গে ভঙ্গে তরল তরঙ্গে বহমান হয়;—তখন তাহার আর নূতন পরিচয় দিতে হয় না। সমীরণ মলয় গিরির সৌরভসার সোহাগ করিয়া গায়ে মাখিল, প্রথম প্রথম কোকিল কাকলি তাহার পরিচয় দিল; বিশ্ববাসী তাহার সুরভিশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া মলয় সমীরণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল; তাহার পর বসন্ত-দূতের ভেরি বাজুক আর নাই বাজুক, লোকে বুঝিল মলয় সমীরণ আপনি সমানই বহিতেছে। আমাদের "সমীরণ" বিশ্বের মঙ্গলোদ্দেশ্যে নিজের সমৃদ্ধির সহিত চিকিৎসা-তত্ত্ব বিজ্ঞানের সৌরভসার অঙ্গে মাখিয়া সাধুগণের সেবা করিতেছে. এখন চিকিৎসা-তত্ত্ব বিজ্ঞানের সমস্ত সম্পত্তি সমীরণের প্রত্যেক পরমাণুর সহিত মিশিয়া গিয়াছে;—এই মিলন অবিভাজ্য; শত বিপ্লবের তরঙ্গ ইহার বুকের উপর দিয়া বহিয়া গেলেও ইহার সম্মিলিত—একীভূত সম্পত্তির বিচ্ছেদ হইবে না। তবে আর এখন চিকিৎসা-তত্ত্ব বিজ্ঞানের ভেরি নিস্বন কেন? যাহা নিত্য, তাহার প্রাণময় গুণ সমূহও নিত্য; সেই জন্য সেই নিত্য পদার্থের নাম করিলে তাহার গুণ সমূহের সত্তাও উপলব্ধ হইয়া থাকে, চিকিৎসা-তত্ত্ব বিজ্ঞান এখন সমীরণের নিত্য গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এখন "সমীরণ" বলিলে ইহাতে চিকিৎসা-তত্ত্ব বিজ্ঞানের সত্তা সম্যক্ উপলব্ধ হইয়া থাকে, তবে এই কোকিল কাকলির কল-ঘোষণার আর প্রয়োজন কি?———

আর এক কথা———

আজি কালি শব্দ সমূহের সঙ্ক্ষেপ সাধনেচ্ছা বর্ত্তমান সভ্যসমাজের বিশেষ সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে; কেহ অঙ্গ সৌষ্টবের জন্য, কেহ বা সময়ের আয় বাড়াইবার বাসনায় সকল বিষয়েরই সঙ্ক্ষেপ করিতেছেন, এই সভ্যতার হুজুগে গড্ডলিকা প্রবাহে আমরাও গা না ঢালিয়া থাকিতে পারি কৈ? তাই বলি সুধু "সমীরণ" বলিলে কি ভাল হয় না? সভ্য পাঠকগণ ইহার মীমাংসা করিবেন। আমরাও চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ এই উভয় নামের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ "সমীরণ" নামেই অভিহিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

বৈশাখ মাস হইতেই চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান

এবং সমীরণ কেবল

সমীরণ

নামেই প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

কবিরাজ—শ্রীআশুতোষ সেন,

স্বত্বাধিকারী।

২য় খণ্ড। | ১৩০১ সাল—চৈত্র। | ৭ম সংখ্যা।

ভারতের অন্ধরহস্য।

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—জগদীশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কার্য্য অপূর্ব্ব রহস্যময়। আমরা আরও বলিতে পারি, সেই ভগবানের প্রধান লীলাক্ষেত্র—এই ভারতভূমির সকল বিষয়ই রহস্যপূর্ণ, কিছুই বুঝিবার যো নাই। ধর্ম্ম-নীতি, সমাজ-নীতি, রাজ নীতি—এ সমস্ত ত রহস্যপূর্ণ হইতেই পারে; এদেশের পুরাবৃত্তও পরম রহস্যময়—শতস্থানে ছিন্ন সূত্রের ন্যায় একদিক্ গোছাইতে অন্য দিকের আঁত হারাইয়া যায়! তাই স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাস সেন প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত সমালোচনার নাম দিয়াছিলেন—"ঐতিহাসিক-রহস্য"—ও 'ভারত-রহস্য'; এখনও অনেকে এই রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ বা 'রহস্য ভেদ করিয়াছি' মনে করিয়া প্রাচীন ভারতের পুরাবৃত্ত লিখিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তাহাতে না আছে—প্রাচীন আর্য্য জাতির প্রকৃত ধর্ম্ম রহস্য, না আছে—প্রাচীন ভারতের সমাজ-রহস্য, এক কথায় বলিতে গেলে, তাহার আগা গোড়া 'শুধুই রহস্য'! কখনও কেহ প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে পারিবে কি না, সে বিচার অনাবশ্যক। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস যথাযথরূপে সংগৃহীত হইলে যে, জগতের ইতিবৃত্তের প্রথম পরিচ্ছেদ লিখিত হইতে পারে, সেটী সত্য কথা। বেদই প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার প্রসূতি। সেই বৈদিক কাল, ভারতের সর্ব্ববাদিসম্মত গৌরব-কালকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের ইতিহাস লিখিতে হইবে। চেষ্টাও সেইরূপ হইতেছে। আবার রহস্যের সূত্রপাতও এই 'চেষ্টা' হইতে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, সেই আর্য্য সভ্যতার প্রসূতি বেদের উৎপত্তি বা প্রচার অদ্য হইতে কত দিন পূর্ব্বে, অমনেই গণ্ডগোল। হিন্দু পণ্ডিতগণ বলিবেন,—"বেদ অপৌরুষেয়, তাহার আবার কাল-নির্ণয় কিরূপে হইবে?" যদি পুনঃ প্রশ্ন করা যায়, ঋষিগণ ভারতে

যে সময়ে বেদ প্রচার করিয়াছেন, সেই কালের কথাই বলুন না কেন? পণ্ডিতগণ বিরক্ত হইয়া বলিবেন,—"আরে বাপু! সেও কোটী কোটী বৎসরের পূর্ব্বের কথা; "শ্বেতবরাহকল্পাব্দাই" দেখ না কত দিনের? বেদ তৎপূর্ব্বে প্রচারিত হওয়া যদি অসম্ভব মনে কর, অন্ততঃ সেই সময়ের গ্রন্থ বলিতে আপত্তি কি?" পাঠকগণ বাঙ্গালা পঞ্জিকায় "শ্বেতবরাহকল্পাব্দা" দেখিয়া থাকিবেন, তাহার কালসংখ্যা গণিতকেও পরাস্ত করিয়াছে! এই ত গেল প্রাচীন হিন্দু-মত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতও এইরূপ রহস্যপূর্ণ। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বা তাঁহাদের এদেশীয় শিষ্যগণ বলেন,—"অনুমান ২০০০ বৎসর হইতে ১০০০ বৎসর পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৈদিক কাল!" হিন্দু পণ্ডিতগণের বেদপ্রচারের কাল-নির্ণয় শুনিয়া যে শিক্ষিতগণ হাস্য করেন, যদি সেই শিক্ষিতগণকেই জিজ্ঞাসা করা যায়, খৃষ্ট জন্মের ২০০০ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে ১০০০ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত যে বৈদিক কাল, তাহারই বা বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ কি? অমনি তাঁহারা একবাক্যে উত্তর দিবেন,—"সেটা ত জানা কথা; মোক্ষমূলার, গোল্‌ডষ্টুকর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যাহা বলেন, তাহাই প্রমাণ; তাহার উপর আবার প্রমাণ কি?" আমরা এই সকল পণ্ডিত-গণকে (!) বিনীতভাবে বলি,—মহাশয়-গণ! আপনারা আপ্তবাক্য বিশ্বাস করেন না, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যে কোন উক্তি অবিচারিতভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করা কি, আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করা হইতে বেশী লজ্জাজনক নহে? শিক্ষিতগণ তদুত্তরে বলেন,—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করি বলিয়া উপহাস করা সহজ, কিন্তু তাঁহাদের উক্তি যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা প্রমাণ করিবার উপকরণ তোমাদের কি আছে? বৈদিককাল ত বহুদূরের কথা, সে দিনকার চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-কাল-নির্ণয় করিতেই যে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই! বরং চন্দ্রগুপ্তের কাল নির্ণয় কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে আছে; কিন্তু তোমাদের পরম পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণ বা যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয়ের যে কোন উপায় নাই! এ সকল স্থানে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন না করিলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখাই যে অসম্ভব হইয়া পড়ে!

শেষোক্ত বাক্যে শিক্ষিতগণ প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতগণকে নিরুত্তর করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু হিন্দুপণ্ডিত-গণও নাছোড়বান্দা! তাঁহারা যে কোন প্রকারে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয় করিতে বদ্ধপরিকর। ইদানীং কোন কোন শিক্ষিত হিন্দুসন্তানও এই কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের চরিত্র বর্ণিত মহাভারত প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ আছে; দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাতে কাল নির্ণয়ের কোন প্রকার অব্দ ব্যবহৃত না থাকায়, জানি-বার উপায় নাই যে, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। আজ কাল নন্দ মহাপদ্মের রাজ্যাভিষেক কালকে কেন্দ্র করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কাল নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে। অনে-কেই সেই মতে সায় দিয়াছেন। কিন্তু

সেও পাশ্চাত্য মতেরই নূতন সংস্করণ মাত্র। আনুমানিক কাল নির্ণয় ভিন্ন তাহাতে নিশ্চিত কাল নির্ণয় হয় নাই, হইতেও পারে না।

যদি কোন প্রকার অব্দ সাহায্যে এই কাল নির্ণয় করা যায়, তাহা হইলে, আমরা পাশ্চাত্যপণ্ডিত এবং তাঁহাদের এদেশীয় শিষ্যগণকে প্রবোধ দিতে পারি। বোম্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণ বলেন, যুধিষ্ঠিরেরও রাজ্য-কাল-নির্ণায়ক একটী অব্দ ছিল। শকাব্দা প্রচলিত হওয়ার পর হইতে তাহার লোপ হইয়াছে। এ উক্তির উত্তরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিবেন, তোমাদের শ্বেতবরাহকল্লাব্দা রহিয়াছে, কল্যব্দারও লোপ হয় নাই, ইহার মধ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কাল নির্ণায়ক অব্দটাই কি উড়িয়া গেল? তাহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। ওটা বোম্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণের মনঃকল্পিত উক্তি। পাঠক। যখন সম্বৎ, শকাব্দা প্রচারকের নাম লইয়াই নানা মুনির নানা মত, তখন যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কাল-নির্ণায়ক কোন অব্দ থাকার উক্তিকে মনঃকল্পিত বলিলে উত্তর কি আছে? একালে যখন হিন্দুসন্তানের 'জন্মকোষ্ঠী বা জীবনচরিতে সম্বৎ বা শকাব্দার পরিবর্ত্তে খৃষ্টাব্দ পূর্ণাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তখন বহুকালের যুধিষ্ঠির রাজ যে বিস্মরণ-সাগরের অতল জলে ডুবিয়া যাইবেন, বিচিত্র কি? তবে শ্বেতবরাহ কল্লাব্দা, কল্যব্দা রহিল, বাঙ্গালা পঞ্জিকায় কেবল যুধিষ্ঠিরাব্দই স্থান পাইল না কেন, এটী ভাবিবার বিষয় বটে! প্রাচীন ভারতের যে সকল গ্রন্থকে আমরা ইতিহাস-স্থানীয় বলি, সেই সকল মহাকাব্য, পুরাণ, উপপুরাণে সত্যযুগ হইতে কলিযুগের শেষ পর্য্যন্ত রাজবংশ বর্ণিত আছে। অথচ কোন স্থানেই কোন একটা অব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। যত অব্দ একাধারে দিন পঞ্জিকায় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে! ভারতের পুরাবৃত্তের ন্যায় এ ব্যাপার আরও রহস্যময় নয় কি? প্রাচীন ভারতের যে কোন বিষয়ের কাল নির্ণয় করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে এই অব্দ রহস্যভেদ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাই আমরা এই প্রবন্ধের নাম দিয়াছি, "ভারতের অব্দরহস্য।"

বাঙ্গালা পঞ্জিকায় শকাব্দা, সন, খৃষ্টাব্দ, সম্বৎ, বঙ্গাব্দা, ফস্‌লা, মগী, হিজরা, বিলায়ত্তা লিখিত হয়। যেমন "শকাব্দা ১৮১৬, সন ১৩০১, ইংরাজী (খৃষ্টাব্দ) ১৮৯৪।৯৫, সম্বৎ ১৯৫১, বঙ্গাব্দা ১৩০১, ফস্‌লী ১৩০০। ১৩০১, মগী ১১৫৬।৫৭, হিজ্‌রা ১৩১১।১২, বিলায়ত্তী ১৩০০।১৩০১। তাহার পর কল্যব্দা ৪৯৯৫। কিন্তু যুধিষ্ঠিরাব্দের নামগন্ধও বাঙ্গালা পঞ্জিকায় নাই।

বোম্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণ "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের মতানুসরণ করিয়া বলেন,—যুধিষ্ঠিরাব্দ ৩০৪৪ বৎসর প্রচলিত ছিল। তাহার পর ক্রমে ১৩৫ বৎসর বিক্রমাদিত্যের, ১৮০০০ বৎসর শালিবাহনের, ১০০০০ বৎসর বিজয়াভিনন্দনের, ৪০০০০ বৎসর নাগার্জ্জুনের, এবং ৮২১ বৎসর বলির শকাব্দ প্রচলিত থাকিবে। বোম্বাই প্রদেশে এখন শকাব্দাই অধিক প্রচলিত, সম্বৎও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে।

অগ্রে বাঙ্গালা পঞ্জিকার লিখিত অব্দ গুলির সমালোচনা করা যাউক।

বোম্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকার ন্যায় বঙ্গদেশের পঞ্জিকাতেও সম্বৎ ও শকাব্দার উল্লেখ আছে। এদেশেও শকাব্দা অধিক প্রচলিত; সম্বতের নামমাত্র আছে। পাঠকগণ দেখিবেন পঞ্জিকার প্রথমেই লেখা হয়, "শুভমস্তু শকাব্দাঃ।" সম্বতের নামোল্লেখ সন ও খৃষ্টাব্দের পরে। কিন্তু শকাব্দার নাম পঞ্জিকার প্রথমে লিখিত হইলেও, "এবার কত শকাব্দা চলিতেছে" জিজ্ঞাসা করিলেই পঞ্জিকা খুলিয়া উত্তর দিতে হয়! বলা বাহুল্য, বঙ্গদেশে সনই বিশেষ পরিচিত। এবং তাহাই আপামর সাধারণে ব্যবহার করে। কাজেই পঞ্জিকাকারগণ পঞ্জিকার উপসংহারে লেখেন,— "সন ১৩০১ সালের দিন পঞ্জিকা সমাপ্ত।" শকাব্দার নাম কদাচিৎ উচ্চারিত হয়। আরও রহস্যের বিষয় এই যে, 'সন' এবং 'শকাব্দা' যে এক, তাহা বোধ হয় বঙ্গীয় পঞ্জিকাকারগণ জানেন না। আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি তাঁহারা পঞ্জিকায় ১৩০১ সনও লিখিয়াছেন, ১৩০১ বঙ্গাব্দাও লিখিয়াছেন। অথচ এই দুই অব্দের গণনা ও কালসংখ্যা একরূপ দেখিয়াও বিচার করেন নাই যে, 'সন' ও 'বঙ্গাব্দা' এক কি না? বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গাব্দার ইতিহাসে যতদিন না লিখিয়াছিলেন যে, "সন" ও "বঙ্গাব্দা" এক, ততদিন কেহই বোধ হয়, এ রহস্য জানিতেন না বা জানিবার চেষ্টা করিতেন না। এই বঙ্গাব্দা যে আকবর বাদসাহের সৌরমানানুসারে বৎসর গণনার পক্ষপাতিত্বের ফল, তাহা বোধ হয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ব্যতীত বাঙ্গালার অন্য লোকে অল্পই জানে। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বঙ্গাব্দাকে হিন্দু প্রবর্ত্তিত "শক" বিবেচনা করেন। তাহার প্রমাণও নাকি দিবেন বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহাতে হিন্দু জ্যোতিষের সৌরমানানুসারে বৎসর গণনার গৌরব ভিন্ন আর কিছু হিন্দুর নিজস্ব দেখিতে পাই না। তবে এ অব্দটি বঙ্গে বড়ই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। সেটী বাঙ্গালীর কতক, তাহা আমরা যথাস্থানে প্রদর্শন করিব।

"বঙ্গাব্দা" বা "সন" বঙ্গদেশে পূর্ণাধিপত্য বিস্তার করিলেও, চট্টগ্রামে 'মগী' অব্দ প্রচলিত। শকাব্দা নাই, সম্বৎ নাই, বঙ্গাব্দাও নাই, কোথা হইতে এই 'মগী' অব্দ আসিল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। 'বঙ্গাব্দা' বা 'সন' সম্বন্ধে অধিকাংশ বাঙ্গালীর যেরূপ অভিজ্ঞতা, 'মগী' সম্বন্ধে চট্টগ্রামবাসিগণের অভিজ্ঞতা যে তদপেক্ষা বেশী এরূপ বোধ হয় না।

'ফস্‌লী', 'বিলায়তী' নামক দুইটী অব্দ বাঙ্গালা পঞ্জিকায় লিখিত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ স্থান বঙ্গদেশ নহে। 'ফস্‌লী' হিন্দুস্থানে (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে) প্রচলিত 'বিলায়তী' উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হয়। কেবল বঙ্গাব্দ, খৃষ্টাব্দ, হিজরী কদাচিত শকাব্দা সম্বৎ (চট্টগ্রাম ভিন্ন) বঙ্গদেশে প্রচলিত। কল্যব্দের নাম পঞ্জিকাকারগণ এবং ১০।২০ জন শিক্ষিত হিন্দু সন্তান ব্যতীত অন্যে জানে না বলিলেই হয়। 'ফস্‌লী' ও 'বিলায়তী'ও বঙ্গাব্দের ন্যায় আকবরসাহের সৌরমানানুসারে বৎসর গণনার পক্ষপাতিত্ব ফল, এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

বঙ্গাব্দ বা সন, ফস্‌লী, বিলায়তী যেভাবে বঙ্গবেহার উড়িষ্যায় গণিত হয় তাহাও অব্দ রহস্যের বিষয়ীভূত সৌর-মানে গণিত হইয়া মহাবিষুব সংক্রান্তির পর হইতে অর্থাৎ ১লা বৈশাখ হইতে বঙ্গাব্দের বৎসরারম্ভ হয়। ফস্‌লী গৌণ-চান্দ্র মাসে গণিত হয় এবং ভাদ্র কৃষ্ণ প্রতিপদে বৎসরারম্ভ হয়। বঙ্কিম বাবু (কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায়) বলেন, "(পূর্ব্বে) যখন অশ্বিনী ক্ষেত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, তখন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তখন আশ্বিন মাসে বৎসরা-রম্ভ হইত। * * * * এখনও গণনা সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে, এখনও ফস্‌লী সন ১লা আশ্বিনে আরম্ভ হয়।" বিলায়তী সৌরমানে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু সংক্রান্তি সঞ্চারের পূর্ব্ব দিবস মাস সমাপ্ত হয়, এবং ভাদ্র শুক্ল দ্বাদশীতে বৎসর পরিবর্ত্তিত হইয়া উক্ত দ্বাদশীর পর সংক্রান্তি অবধি পর বৎসরীয় মাস ব্যব-হৃত হয়। সুতরাং গণনার অর্থানুসারে এই তিন অব্দ এক সময়ে প্রচলিত হই-লেও কালক্রমে বিভিন্নতায় পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ বর্ত্তমান 'বঙ্গাব্দ' চলিতেছে ১২০১ 'ফস্‌লী' ও 'বিলায়তী' চলিতেছিল ১৩০১ বিগত আশ্বিন মাস হইতে ১৩০১ অব্দ আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস ফস্‌লী ও বিলায়তীর ১৩০১ অব্দ পূর্ণ হইবে।

মুগল মগীয় 'হিজরী' অব্দ মুখ্যচান্দ্র মানে ব্যবহৃত হয়, অমাবস্যার পর যেদিন সন্ধ্যার সময় চন্দ্র দর্শন হয়, সেই দিবস মাস সমাপ্ত হয়। পর দিবস হইতে পরমাস গণিত হয়। এইরূপ গণনা বলিয়া হিজরী অব্দের বৎসরারম্ভ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। ১২৭৯ বঙ্গাব্দার ১৯শে ফাল্গুন তারিখে হিজরী ১২৯০ অব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। ক্রমে বৎসরারম্ভের দিন পিছাইয়া গিয়া, বর্ত্তমান ১৩০১ বঙ্গাব্দের ২রা আষাঢ় তারিখে ১৩১২ হিজরী অব্দ আরম্ভ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, হিজরী অব্দের বৎসর গণনা এইরূপ অস্থির ও পরিবর্ত্তনশীল দেখি-য়াই আকবরসাহ সৌরমানানুসারে বৎসর গণনা করিতে আজ্ঞা প্রকাশ করেন। কালে সে আজ্ঞা রহিত হইয়া হিজরী অব্দ চান্দ্রমানানুসারেই পূর্ব্ববৎ পরি-গণিত হইতেছে। কিন্তু ম্লেচ্ছের আজ্ঞা হইলেও বহু হিন্দু সন্তান এখন সেই আজ্ঞা বহন করিতেছেন।

সম্বৎ শকাব্দ সম্বন্ধে আমাদিগকে বিশেষ আলোচনা করিতে হইবে। এবং সেই সঙ্গে খৃষ্টাব্দ সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিতে হইবে। এজন্য এস্থানে উক্ত অব্দত্রয়ের গণনাদি সম্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না।

বাঙ্গালা পঞ্জিকায় লিখিত হয়, "মাঘী পূর্ণিমায়াং শুক্রবারে কলিযুগোৎপত্তিঃ।" অর্থাৎ মাঘীপূর্ণিমাতিথিতে কলিযুগের উৎপত্তি। ইহাতে কলিযুগ কখন কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইল, বুঝা যায় না। তবে এইটুকু বুঝা যায় যে, কল্যব্দ সৌরমাসানু-সারে গণিত হয় না, চান্দ্রমাসানুসারেই গণিত হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাঙ্গালা পঞ্জিকায় যুধিষ্ঠিরাব্দের নাম গন্ধও নাই, কিন্তু আ'জ কা'ল যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কালের কথা যুগ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন প্রসঙ্গে পঞ্জিকায়

উক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকায় লিখিত আছে,—"কলৌ যুধিষ্ঠির প্রভৃতয়ো বিংশত্যধিক শত সংখ্যকা হিন্দুবংশোদ্ভবা রাজানঃ। সাষ্টাদশদিন ত্রিমাসাধিক পঞ্চ নবতি বর্ষাধিক ষট্‌ত্রিংশচ্ছততমবর্ষং ব্যাপ্য রাজ্যংকৃত্বা স্বরারূঢ়া ততঃ সাহাসোলতান্ ময়নঙ্গস্ত্বেক ষষ্টি সংখ্যকা যবনবংশোদ্ভবা রাজানঃ সষড়্‌বিংশতি দিনাষ্টমাসাধিক চতুশ্চত্বারিংশদধিক দ্বাদশশততম বর্ষং ব্যাপ্য রাজকর্ম্ম কৃত্বাগতাঃ। তত্র সাহ আকব্বর সানিশাসন সময়ে ইংলণ্ডদেশীয় ম্লেচ্ছকুলোদ্ভবা রাজান আসন্। সম্প্রতি তেষামেবাধিকারঃ॥ "ইহার ভাবার্থ এই যে, কলিতে যুধিষ্ঠির হইতে ১২০ জন হিন্দুবংশোদ্ভব রাজা ৩৬৯৫ বৎসর, ৩ মাস, ১৮ দিন রাজত্ব করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তদ্‌পরে সাহ সুলতান্ আদি যবন বংশোদ্ভব ৬০ জন রাজা ১২৪৪ বৎসর, ৮ মাস, ২৬ দিন রাজত্ব করিয়া গত হইয়াছেন। তাহার পর সাহ আকবরের বংশীয়দের শাসন সময়ে ইংলণ্ড দেশীয় ম্লেচ্ছ বংশোদ্ভব রাজা রাজাসন গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারই অধিকার কাল। তবেই দেখা যাইতেছে, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভ কাল ৪৯৪০ বৎসর ১৪ দিন হইয়াছিল। বর্ত্তমান ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরেজের রাজ্যাধিকার হইতেছে ১৩৮ বৎসর। ৪৯৪০ বৎসরের সহিত ১৩৮ যোগ করিলে হয় ৫০৭৮ বৎসর। বাঙ্গালা পঞ্জিকা মতে ইহাই যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভকাল। বলা বাহুল্য এ বিষয় পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালা পঞ্জিকায় লিখিত হইত না। গুপ্তপ্রেস-প্রকাশিত পঞ্জিকাতেই এই বিষয়টী নূতন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আজকাল অন্যান্য পঞ্জিকাকারও ইহা উদ্ধৃত করিতেছেন। বর্ত্তমান ৪৯৯৫ কল্যব্দের সহিত ইহার ৮৩ বৎসর মাত্র তফাৎ। এই ৮৩ বৎসর দ্বাপর যুগ মধ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল পঞ্জিকাকারগণ ধরিয়াছেন; কেননা দ্বাপর যুগের রাজচক্রবর্ত্তী গণনা মধ্যেও যুধিষ্ঠিরের নাম আছে।

বোম্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণের মতে যুধিষ্ঠিরাব্দ ৩০৪৪ বৎসর প্রচলন থাকার পর, ১৩৫ বৎসর সম্বৎ প্রচলিত থাকিয়া শকাব্দা আরম্ভ হইয়াছে। ৩০৪৪ বৎসরের সহিত ১৩৫ যোগ করিলে হয় ৩১৭৯। তাহার সহিত বর্ত্তমান শকাব্দা ১৮১৬ যোগ করিলে ৪৯৯৫ বৎসর হয়। কল্যব্দও এখন ৪৯৯৫। সুতরাং বোম্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণের মতানুসারে কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দ সমসাময়িক। বাঙ্গালা পঞ্জিকার সহিত উক্ত মতের ৮৩ বৎসর তফাৎ। এক সময়ে দুইটী অব্দ প্রবর্ত্তন অসম্ভব বলিয়া বঙ্গীয় পঞ্জিকাকারগণ উক্ত কারচুপি টুকু করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গীয় পঞ্জিকাকারগণের মত ভ্রম পূর্ণ হইলেও বোম্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণের মতাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত। বোম্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণ যুধিষ্ঠিরাব্দকে কল্যব্দের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছেন। কাজেই তাহা পণ্ডিত সমাজে গ্রাহ্য হয় নাই। বঙ্গীয় পঞ্জিকার মত (পণ্ডিত) তারানাথ তর্কবাচস্পতির মতের সহিত সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। তর্কবাচস্পতি মহাশয় সিদ্ধান্ত কৌমুদীর ভূমিকাতে "কলি প্রারম্ভের ৯০ বৎসরের

মধ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব” বলিয়াছেন। তাহার ১৭৩ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক অসম্ভব নহে।

এস্থলে বঙ্গীয় পঞ্জিকাকারগণকে একটা কথা না বলিয়া নীরব থাকিতে পারিলাম না। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল দ্বাপর শেষে অর্থাৎ কল্যব্দের ৮৩ বৎসর পূর্ব্বে যে বলেন, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, দ্বাপর এবং কলিতে তাঁহার রাজত্বের কাল গোঁজামিলনে সামঞ্জস্য করা যায়। কিন্তু পরীক্ষিত এবং তৎপুত্র জনমেজয়কে যে দ্বাপরের রাজচক্রবর্ত্তী মধ্যে গণনা করিয়াছেন, তাহাতে যুধিষ্ঠিরকে কলির রাজা বলিলে সামঞ্জস্য হয় কি? পরীক্ষিতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, ইহাই অবিসম্বাদিত মত। এমত কি ঠিক ঠিক রাখিতে হইলে (ঠিক রাখাও নিতান্ত কর্ত্তব্য) পরীক্ষিত ও জনমেজয়কে যুধিষ্ঠিরের পরবর্ত্তী উল্লেখ করিয়া কলির রাজবংশভুক্ত করিতে হয়। পঞ্জিকাকারগণ কলির যবনবংশোদ্ভব রাজগণের রাজ্যকাল লিখিতেও প্রচলিত ঐতিহাসিক মতের সহিত অনৈক্য করিয়াছেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে (১১১৫ শকাব্দে) সাহাবুদ্দিন দিল্লীশ্বর পৃথু রায়কে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আজমীরে অধিকার বিস্তৃত করেন, সেই হইতে প্রকৃত যবনাধিকারকাল। উক্তকাল ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৫৬৩ বৎসর পঞ্জিকায় লিখিত হইয়াছে, ১২৪৪।৮।২৬ দিন, অর্থাৎ ১২৪৫ বৎসর। অতএব ১২৪৫ বৎসর হইতে ৬৮২ বৎসরবাদ দিয়া, তাহা হিন্দু রাজাগণের রাজত্বকাল মধ্যে গণনা করিয়া ইতিহাসের সহিত গুরুতর মত-বিরোধ দূর হইবে বঙ্গীয় পঞ্জিকাকারগণ এই সৎপরামর্শটী শুনিবেন কি?

আমাদের দেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কি বোম্বাই প্রদেশস্থ, কি বঙ্গদেশস্থ কোন পঞ্জিকার মতেই সায় দেন না। কিন্তু পঞ্জিকার মত সাধারণের আলোচ্য। এজন্য আমরা অগ্রে পঞ্জিকাকারগণের মত সমালোচনা করিলাম। অতঃপর দেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মত সমালোচনা করিয়া (উপসংহারকালে) প্রায় মত-প্রমাণ সংবাক্ত করিব।

স্বর্গীয় বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “কৃষ্ণচরিত্র” নামক গ্রন্থে, “কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল” ইতি অধ্যায়ে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ১৪৩০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল; তাহা হইলে বর্ত্তমান ১৮৯৪র সহিত ১৪৩০ যোগ করিলে হয় ৩৩২৪ বৎসর। তৎপূর্ব্ব ১৪ বৎসর পাণ্ডবদের বনবাস,অজ্ঞাতবাসকাল ও যুদ্ধোদ্যোগ প্রভৃতি কাল ধরিলে ৩৩৩৮ বৎসর পাওয়া যায়। বঙ্কিম বাবুর মত অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য করিলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসন অদ্য হইতে ৩৩৩৮ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিতে হয়। অথবা বঙ্কিম বাবুর মতে যুধিষ্ঠিরাব্দ এখন ৩৩৩৮।

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় দ্বিতীয় মত জন্মভূমির “পুরাবৃত্ত” নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন; “আমার বিবেচনায় কলির একাদশ শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরের স্থিতিকাল; তন্মধ্যে একাদশ শতাব্দীর শেষাংশ অর্থাৎ ১০৭৫ কলিগতাব্দে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হয়;

যুধিষ্ঠিরের শকারম্ভ সেই সময় হইতে, আর নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগকাল কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে।" তাহা হইলে বর্ত্তমান কল্যব্দে যধিষ্ঠিরাব্দ ৩৯২০।

বঙ্কিম বাবু স্বীয় মত সমর্থনার্থে যে যে প্রমাণ ও যুক্তির আলোচনা করিয়াছেন এইবার তৎসমুদায়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

বঙ্কিম বাবু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কাল নির্ণয়ে অগ্রে ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোকের সমালোচনা করিয়াছেন। তাহাতে নানা গোল দেখিয়া পরিশেষে জ্যোতিষের আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহার উক্তির সার মর্ম্ম এই যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অনতিকাল পরে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, সূর্য্যের উত্তরায়ণ দিনে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাভারত হইতে তাহার প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভীষ্মোক্তিতে বুঝা যায়, তখন মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কিন্তু মাঘ মাসের কোন্ তারিখে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, তাহা বঙ্কিম বাবু ঠিক করিতে পারেন নাই। এস্থলে তিনি অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। জ্যোতিস্ আনুমানিক শাস্ত্র নহে বলিয়াই বঙ্কিম বাবু তৎ সাহায্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল নির্ণয়ের অখণ্ডনীয় প্রমাণ দিতে পারিবেন, সাহস করিয়াছিলেন। কিন্তু বিচার ক্ষেত্রে যাইয়া গোলে পড়িয়াছেন! তিনি একবার বলিয়াছেন, "এমন হইতে পারে না যে তখন মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কেন না, তাহা হইলে 'মাসোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ' কথাটী বলা হইত না।" পরিশেষে কিন্তু তিনি ২৮ শে মাঘই উত্তরায়ণ ধরিয়া, বাঙ্গালা পঞ্জিকার মতানুসারে 'রবিস্ফুট' গণনা করিয়াছেন। এখন (বাঙ্গলা পঞ্জিকানুসারে) ১০ই পৌষ তারিখে উত্তরায়ণ হইতেছে। বঙ্কিম বাবুর মতে ৭ই পৌষ। * তিনি বলেন,—"৭ই পৌষ হইতে ২৯ শে মাঘ পর্য্যন্ত রবিস্ফুট বাঙ্গালা পঞ্জিকা ধরিয়া গণিলে, ৪৪ অংশ ৪ কলা মাত্র গতি পাওয়া যায়। ঐ ৪৪ অংশ ৪ কলা লইলে খৃঃ পূঃ ১২৬৩ বৎসর পাওয়া যায়। ৪৮ অংশ পূরা লইলে খৃঃ পূঃ ১৫৩০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা কোন মতেই হইতে পারে না যে, ইহার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল।"

আমরাও জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কাহার পূর্ব্বে? ১২৬৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, কি ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে? ১০।১৫ বৎসরের তফাৎ হইলে এ প্রশ্ন করিতাম না। প্রায় তিন শত বৎসরের তফাৎ ত সামান্য নহে, কাজেই ধোকা লাগিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম বাবু এ ধোকায়

---

* বঙ্গীয় পঞ্জিকাকারগণ বলেন, "যে বৎসর অয়নাংশ শূন্য, সেই বৎসর ৩০ শে চৈত্র ও ৩০ শে আশ্বিন দিবারাত্রি সমান হয়," গোবিন্দপুর নিবাসী পণ্ডিত সর্ব্বানন্দ শর্ম্মা ১২৮৮ সালের পঞ্জিকায় অয়ন প্রকরণ কথনচ্ছলে বলিয়াছেন, "১৭৬৫ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখের ও কার্ত্তিকের প্রথম দিবসে অয়ন পরিবর্ত্ত হইত।" ১২৮৮ সালের পূর্ব্বে পঞ্জিকাতেও একরূপ লেখা আছে। বোধ হয় কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত বহু দিন পূর্ব্বে ঐ কথা বলিয়াছেন, পঞ্জিকাকারগণ এখনও সেই ১৩৬৫ বৎসর ধরিয়া আছেন। যাহা হউক, প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ৩০শে আশ্বিন দিবারাত্রি সমান হইত বলিয়া যদি ধরা যায়, তবে (এই সূত্র ধরিয়া) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে উত্তরায়ণ কোন্ দিনে হইয়াছিল, নির্ণয় করা যায় কিনা কেহ সন্ধান করিবেন কি?

কাহাকেও ফেলেন নাই। পরিশেষে তিনি এ মত পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন, "বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খৃঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হয়।"

বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশ, ২৪ অধ্যায়, ৩২ শ্লোকের অর্থ এই যে "পরীক্ষিতের জন্ম অবধি নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত, এই ১০১৫ বৎসর।" বঙ্কিম বাবু চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেককাল খৃঃ পূঃ ৩১৫, এবং তৎপূর্ব্ব একশত বৎসর নন্দরাজ্যাভিষেক ধরিয়া উক্ত ১৪৩০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ মিলাইয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে উক্ত কালনির্ণয় ২৪ অধ্যায়ের ৩৩। ৩৪। ৩৯ শ্লোকত্রয়ের উপর নির্ভর করিয়া হইয়াছে। ঐ ঐ শ্লোকের মূল তাৎপর্য্য এই যে "সপ্তর্ষিমণ্ডল শত বৎসর এক নক্ষত্র ভোগ করে। পরীক্ষিতের সময় সেই সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে, নন্দের রাজ্যাভিষেক সময়ে পূর্ব্বাষাঢ়াতে গমন করিবে।" এইরূপ ভবিষ্যদুক্তি আছে। বঙ্কিম বাবু ঐ সকল শ্লোকের সমালোচনায় পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, "সপ্তর্ষিমণ্ডল কতকগুলি স্থির নক্ষত্র * * * মঘা নক্ষত্রও কতকগুলি স্থির তারা। সকলেই জানেন স্থির তারার গতি নাই।" তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণের মত যে ঠিক নহে, তাহা বঙ্কিম বাবুর উক্তিতেই প্রকাশ। বিশেষতঃ তিনি কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের 'পুরাণ' নামক অধ্যায়ে (৯৭।৯৫ পৃষ্ঠাতে) বিষ্ণুপুরাণের ভবিষ্য রাজবংশ কীর্ত্তন প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। তবে আবার সেই অংশের বর্ণনীয় বিষয় সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন কেন?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-শাসন কালকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্কিম বাবু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল-নির্ণয় করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-কাল পাশ্চাত্য মতানুসারে নির্ণীত। সকলেই তাহা আপ্ত বাক্যাপেক্ষাও অভ্রান্ত বিবেচনা করেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইলেও কথাটী অতি গুরুতর এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-কাল নির্ণয় পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক নহে; এজন্য আমরা তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শুনা যায়, গ্রীক-পণ্ডিত মিগাস্থিনিস্ দীর্ঘকাল চন্দ্রগুপ্তের সভায় ছিলেন। তিনি স্বীয়জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় এক খানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহা হইতে জানা যায় চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে পাটলীপুত্র নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু মিগাস্থিনিসের লিখিত মূল গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত। ষ্ট্রাবো, এরিয়ান প্রভৃতি রোমান্ ও গ্রীক্ পণ্ডিতগণ প্রয়োজনানুসারে সময় সময় সেই গ্রন্থ হইতে যে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন তাহাই জর্ম্মান পণ্ডিত ডাক্তার শ্বানেক (Dr Schwanbeck) একত্র সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেব তাহারই ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে সেই ইংরেজী গ্রন্থই এদেশে মিগাস্থিনিসের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পুস্তক বলিয়া প্রচলিত।

মিগাস্থিনিসের লিখিত মূলগ্রন্থ যখন বিলুপ্ত, তখন এই নকলের নকল গ্রন্থকে আমরা অপ্রামাণ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারি। কিন্তু শিক্ষিত-সমাজে উক্ত মতটী এতদূর আদরণীয় হইয়াছে যে, তাহার সমালোচনা করিয়া চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া ভ্রম প্রদর্শন না করিলে

তাঁহাদের মত-পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই। দেখা যাউক ইহার প্রামাণ্য কিছু আছে কি না?

এরিয়ান বলেন,—"মিগাস্থিনিস্ অনেক বার সণ্ড্রকোট্টাসের (Sandracottus) রাজধানীতে গমন করেন।"

যষ্টিন্ বলেন্,—"সণ্ড্রকোট্টাস্ আলেকজাণ্ডারের গৃহ প্রতিগমনের পর ভারতে স্বাধীনতা পুনঃ সংস্থাপন করেন। * * * এই নরপতি নীচ কুলোদ্ভব হইয়াও দৈবী-শক্তি-বলে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন।

এথিনিয়াসের মতে, সণ্ড্রকোট্টাসের নাম 'সণ্ড্রকোপ্টাস্' (Sandracoptus)।

প্লুটার্কের মতে, মিগাস্থিনিস্ যে রাজার নিকটে গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম 'অণ্ড্রকোট্টাস্' (Andracottus)।

ডিওডোরাস্ সিকিউলাস্ এবং কুইণ্টস্ কার্টিয়াসের মতে আলেক্জাণ্ডার যে সময় ভারতের প্রান্ত সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখন পুরুরাজার মুখে শুনিয়াছিলেন 'প্রাসি' (Prasii) জাতির 'ঝণ্ড্রমাস্' (Xandramas) নামক একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা আছেন। কিন্তু তিনি এক রাণীর গর্ভে ক্ষৌরকারঔরসে জাত। যষ্টিন আবার এই ঝণ্ড্রমাসের সহিত সণ্ড্রকোট্টাসের অভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠক দেখিবেন, সণ্ড্রকোট্টাস্কে আর কেহ 'নীচকুলোদ্ভব' বলেন নাই, কেবল যষ্টিন্ই তাঁহাকে 'নীচকুলোদ্ভব' বলিয়াছেন!

এই ত গেল চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে গ্রীক পণ্ডিতগণের মত। এখন দেখা যাউক, পাটলীপুত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কতদূর ছিল।

ষ্ট্রাবো বলেন,—'পালিবোথ্রা' (Palibothra) গঙ্গা ও অন্য একটী নদ'র সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। সেই দেশের লোককে 'প্রাসি' (Prasii) বলে। মিগাস্থিনিস্ সেই দেশে গিয়াছিলেন।"

এরিয়ানের মতে, 'পালেম্বোথ্রা' (Palembothra) ভারতবর্ষের রাজধানী। 'পালেম্বাথ্রা', ইরান্নোবাস্' এবং গঙ্গা (Erannoboas and Ganges) এই নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এরিয়ানের মতে এই 'ইরান্নোবাস্' সিন্ধু ও গঙ্গা হইতে ক্ষুদ্র। আধুনিক পণ্ডিতগণ কিন্তু এই 'ইরান্নোবাসকে "হিরণ্যবহ" অর্থাৎ বর্ত্তমান শোন নদী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

স্যর উইলিয়ম জোন্স্ বলেন,—"সণ্ড্রকোট্টাস (Sandracottus) শব্দের সহিত চন্দ্রগুপ্ত (Chandragupta) শব্দের যখন সাদৃশ্য আছে, তখন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে সণ্ড্রকোট্টাসই চন্দ্রগুপ্ত।" রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থের সম্পাদক ট্রয়ার সাহেব এ মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। আধুনিক ইয়োরোপীয় শব্দশাস্ত্রবিদ্গণ স্যর উইলিয়ম জোন্সের মতানুসরণ করিয়া বলিয়াছেন,—"সণ্ড্রকোট্টাস্ বা সণ্ড্রকোপ্টাস্ অথবা অণ্ড্রকোট্টাসই চন্দ্রগুপ্ত। এবং পালিবোথ্রা বা পালেম্বোথ্রাই পাটলীপুত্র।" আর আমাদের হিন্দু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মহাশয় সেই মতকে অভ্রান্ত বিবেচনা করিয়া বলিতেছেন, "যাহা হউক আমাদের জানা আছে যে, নন্দাভিষেকের এক শত বৎসর পরে চাণক্যের মন্ত্রণায় চন্দ্রগুপ্ত মগধের

সিংহাসন লাভ করেন। সেই ঘটনার কাল খৃঃ পূঃ ৩২৫।" *

আমরা এসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। সকলেই বলেন মিগাস্থিনিস্ একজন পণ্ডিত লোক। তিনি দীর্ঘকাল পাটলীপুত্র নগরে চন্দ্রগুপ্তের সভায় ছিলেন। রহস্য এই যে, তিনি যে নগরে বাস করিতেন, যে নগর তৎকালীয় ভারতবর্ষের রাজধানী—সেই নগরের নামটীই তিনি ঠিক্ করিয়া লিখিতে পারেন নাই! যিনি পাটলীপুত্রস্থলে 'পালিবোথ্রা' বা 'পালেমবোথ্রা' লেখেন, তাঁহার পাটলীপুত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সহজেই বুঝা যায়।

ভারতবাসী অনেকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মানী, রুসিয়াতে গিয়াছেন; চীনে ও কেহ কেহ গিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই ত ঐ ঐ দেশের রাজধানীর নাম লিখিতে এরূপ অদ্ভুত বর্ণ যোজনা করেন না? পাটলীপুত্র নামটীই বা এমন উৎকট কি যে, মিগাস্থিনিস্ তাহার ঠিক্ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, সুতরাং লিখিতেও ভুল করিয়াছেন। আরও রহস্য এই যে, সে সময়ে (চন্দ্রগুপ্তের সময়ে) পাটলীপুত্র কুসুমপুর নামেই বিশেষ খ্যাত ছিল। মিগাস্থিনিস্ ভ্রমক্রমেও তাহার উল্লেখ করেন নাই। 'কুসুমপুর' লেখাও ত সহজ?

বিশেষ রহস্য এই যে,—যে রাজার নিকটে তিনি দূত হইয়া গিয়াছিলেন, এবং দীর্ঘকাল যাঁহার সভায় ছিলেন, সেই চন্দ্রগুপ্তের নাম একবার লিখিলেন 'সণ্ড্রকোট্টাস্', আবার লিখিলেন 'সণ্ড্রকোপ্টাস্'; স্থানান্তরে লিখিলেন 'অণ্ড্রকোট্টাস্'! একজনের লেখনী হইতে একটী লোকের উক্তরূপ বিভিন্নাকারের নাম যে কিরূপে প্রসূত হয়, তাহা আমরা অনুভবও করিতে পারি না। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পাটলীপুত্র লিখিতে তবু পালিবোথ্রা' বা 'পালেমবোথ্রা' লিখিয়াছিলেন বলিয়া পাটলীপুত্রের আদি অক্ষর পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্ত লিখিতে নামের আদ্যাক্ষর 'চ' একবারে উড়িয়া গিয়াছে! 'চ' স্থলে 'স' এবং 'অ' ব্যবহৃত হইয়াছে! কেন, তৎকালীন গ্রীক-ভাষায় কি 'চ' লিখিবার উপযোগী বর্ণমালা ছিল না যে, 'S' (স) 'A' (অ) অক্ষরের দ্বারা কোন প্রকারে কার্য্য চালান হইয়াছে? 'চন্দ্র' স্থলে 'Chandra', 'গুপ্ত' স্থলে Gupta' পাশ্চাত্য ভাষায় এইরূপ উচ্চারিত হয় জানি। গ্রীক্-ভাষায় যে 'চন্দ্র' স্থলে 'সণ্ড্র' ('Sandra') বা 'অণ্ড্র' ('Andra' এবং 'গুপ্ত'স্থলে কোট্টাস্ ('Cottus' কোপ্টাস্' (Coptus) লিখিত হওয়া সম্ভব, তাহা শব্দশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণের মুখে কখন কখন শুনিতে পাই। ভারতবাসী 'উড়িয়া'গণ (উড়িষ্যাবাসীগণ) 'লবণ' বলিতে 'ড়ঁবর' বলে। কিন্তু হাতে কলমে 'লবণই' লেখে। মিগাস্থিনিসের উচ্চারণ-শক্তি উড়িয়াদের ন্যায় থাকা কল্পনা করিলেও, এরূপ অদ্ভুত লিপী-ভ্রম সিদ্ধান্ত করা যায় না।

ষ্ট্রাবো বলেন,—সিলিউকস্ নিকেটরের পারস্য পত্নীর গর্ভসম্ভূতা অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না এক দুহিতাকে চন্দ্রগুপ্ত বিবাহ করিয়াছিলেন। এ উক্তিটী

* সাহিত্য—৫ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা "মধুসূদনের আবির্ভাব কাল" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

যে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, তাহা বলাই বাহুল্য। সে সময়ের হিন্দুসমাজের বন্ধন এতদূর শিথিল হয় নাই যে, চন্দ্রগুপ্ত ম্লেচ্ছের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া হিন্দুনামে পরিচিত হইবেন। এরূপ আষাড়ে গল্প মিগাস্থিনিসের সৃষ্টি কি ষ্ট্রাবোর স্বকপোলকল্পিত, তাহা নির্ণয় করার উপায় নাই।

চন্দ্রগুপ্ত এবং পাটলীপুত্র সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা গেল, তাহা যথেষ্ট না হইলেও চক্ষুষ্মান পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও করিতে পারে। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য মন্ত্রে এরূপ মুগ্ধ যে, তাঁহারা এ সকল বিচারের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিবেন না। কিন্তু এক দিন এইরূপ বিচারের দিন আসিবে আশায় আমরা গৌরচন্দ্রিকা গাইলাম। যে কথার সহিত আমাদের প্রবন্ধের বিশেষ সম্বন্ধ, সেই চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-কাল খৃঃ পূঃ ৩২৫ কিনা, এখন সেই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

এরিয়াণ, ডিওডোরাস্ প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতগণ, এবং ষ্ট্রাবো, প্লিনী প্রভৃতি রোমক্ পণ্ডিতগণ মিগাস্থিনিসের গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় চুম্বক মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সকলেই জানেন, গ্রীক্-দেশে "ওলিম্পিয়ড্", এবং রোমদেশে "ইণ্ডিক্‌সন্" নামক অব্দ প্রচলিত ছিল। খৃষ্টাব্দ তখন গ্রীক্ দেশে কি রোমরাজ্যে প্রচলিত হয় নাই। কেননা খৃষ্টজন্মের ৫৩২ বৎসর পরে ইতালিতে, ৮০০ বৎসর পরে ফ্রান্সে, ১৪০০ বৎসর পরে স্পেনে, এবং ১৫০০ বৎসর পরে পোর্টুগালে খৃষ্টশক খ্রীষ্টোপাসক সম্প্রদায়ে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় শক 'ইণ্ডিক্‌সন্' কি 'ওলিম্পিয়ড্' অব্দ দ্বয়ের অনুগামী হইয়া গণিত কি প্রচারিত হয় নাই।* যিশু খৃষ্টের জন্ম হইল আসিয়াখণ্ডে, তাঁহার জন্মকাল হইতে শক গণিত হইল ইয়োরোপে, কাণ্ডটা অদ্ভুত বটে! বরং খৃষ্টের মৃত্যুকাল হইতে খৃষ্ট-শক গণনা করিলে এক দিন সম্ভবপর হইত। কেন না, যিশুর মৃত্যুই প্রসিদ্ধ ঘটনা। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার মহত্ব কেহই অনুভব করিতে পারে নাই। তাহা তই দীর্ঘকাল পরে তাঁহার নামে অব্দ প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

সে যাহা হউক, যিশুখৃষ্ট যখন জরায়ু গর্ভে সংস্থিত হন নাই, সেই খৃষ্টের ৩২৫ বৎসর পূর্ব্বে মিগাস্থিনিস্ স্বীয় গ্রন্থে যে খৃষ্টশকের ব্যবহার করিয়াছিলেন, একথা বুদ্ধিমানে বলিবে না। আর এরিয়াণ, ডিওডোরাস্ প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতগণ স্বদেশের বিখ্যাত "ওলিম্পিয়ড্" অব্দকে উপেক্ষা করিয়া, এবং ষ্ট্রাবো, প্লিনী প্রভৃতি রোমক্ পণ্ডিতগণও যে রোম সাম্রাজ্য পরিব্যাপ্ত "ইণ্ডিক্‌সন্" অব্দকে ভুলিয়া গিয়া অপ্রসিদ্ধ, সন্দেহযুক্ত খৃষ্টাব্দ দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-শাসনের কালনির্দ্দেশ করিবেন, সেরূপ বিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই। মিগাস্থিনিসের লিখিত মূল গ্রন্থের সহিত এরিয়াণ, ষ্ট্রাবো প্রভৃতির উদ্ধৃত অংশ মিলাইয়া দেখিবার উপায় নাই। তবে এরিয়াণ, ষ্ট্রাবো প্রভৃতির লিখিত বিবরণের সহিত ডাক্তার শ্বাম্বেকের এবং শ্বাম্বেকের গ্রন্থের

* নব্যভারত, ১২শ খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা, "খৃষ্টের জন্মকাল এবং খৃষ্টীয় শক" নামক প্রবন্ধ এবং তাহার প্রমাণাদি দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলে এ অন্ধ-রহস্য-ভেদ হয় কি না বলিতে পারি না। ডাক্তার শ্বেক এরিয়াণ প্রভৃতির উক্তির উপর যে বিদ্যা ফলাইয়াছেন, তাহা অনুমান করিলে ক্ষতি কি? অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেবই যে অনুবাদ ব্যপদেশে নূতন কলম চালান নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিব?

যাহাই হউক, ঐ সকল নকলের নকল তস্য নকল বিবরণ দেখিয়া ৩২৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত যে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে।

বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের ১৭।১৮ পৃষ্ঠায় প্রায় এই কথাই বলিয়াছেন। তবে তিনি সেই ভ্রান্ত মতের অনুবর্ত্তন করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল নির্ণয় করিলেন কেন, বুঝিতে পারি না। তবে এইমাত্র বুঝা যায়, 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ প্রত্নতত্ত্বস্থানীয় নহে। ইউরোপীয় মতেও পাণ্ডবগণ খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং পাণ্ডবগণ বা কৃষ্ণ কবিকল্পিত নহেন—ঐতিহাসিক, ইহাই সপ্রমাণ করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। পর অধ্যায়ে সে কথা তিনি একরূপ স্পষ্টই বলিয়াছেন। বিশেষতঃ বঙ্কিম বাবু যুধিষ্ঠিরাব্দ কোন্ সময়ে প্রবর্ত্তিত, তাহার সিদ্ধান্ত করা দূরে থাকুক, তিনি যুধিষ্ঠিরাব্দের উল্লেখও করেন নাই। অতএব বঙ্কিম বাবুর মতানুসারে যুধিষ্ঠিরাব্দ বা তাঁহার প্রবর্ত্তনকাল যে নির্ণীত হইতে পারে না, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

শ্রীচন্দ্রমোহন সেন।

গৌরী।

দশম পরিচ্ছেদ।

গয়ারাম পোড়েলের বিষয় কর্ম্মের কোন একটা চিরজীবী আখ্যা ছিল না। পূজার সময় সে পেশাদারী রাম যাত্রায় কৌশল্যা সাজিত; ফাল্গুনের প্রারম্ভ হইতে, সামলা চাপকান আঁটিয়া, পল্লীর গোরু বাছুরের কল্যাণে, মানিকপিরের দরবারে সে অনেক গান পাঁচালীবদ্ধ ওকালতি করিত। আবার সময় সময় তাহার সেই পোষাকী ব্যবসা তুলিয়া রাখিয়া, হলাকর্ষণরূপ সভ্যতার আদিম সোপান অধিরোহণ করিতে, সে বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িত। মৈ টানা কাদা ছানা প্রভৃতি, পুরাণ ফ্যাশানের আর্য্যামির উপর সে বড়ই বীতশ্রদ্ধ ছিল। তবে জীবনের সকল সোপান কুসুমাস্তীর্ণ না হইলেও তাহাতে উঠিতে হয়। প্রাণপাওয়া বড় সহজকার্য্য; দেহের ভিতর প্রাণশোধা একটা মস্ত নবাবি। মনুষ্য জন্ম, বড় কদর্য্য ব্যাপার; জীবন রাখিতে হইলে অনেক কদর্য্য স্থানে যাইতে হয়, এমনি একটা কিছু ভাবিয়া পোড়েল তাহার সঙ্গীত বিদ্যার "সহোদরা" সভা

হইতে নামিয়া, এই মাটীর পৃথিবীর বুকে বুকে লাঙ্গলের ফলা চালাইয়া, তাহার সর্ব্ব কাঠিণ্যের প্রতিশোধ লইত। তিনি বুঝিতেন, মহাশক্তিরূপা পোড়েল গৃহিনী,—তাঁহার এই নরকদর্শনের একমাত্র বিধাতা। গিন্নী যদি বাপের বাড়ী (নানা) মামার বাড়ী—(বালাই) যমের বাড়ী যান (কি না বেড়াইতে যান); তাহা হইলে তিনি বাকী বৎসরটা ধরিয়া, রাগিনী গুলীর অনুলোম বিলোম ভাঁজিয়া, একটা সুরের কম্বল বুনিয়া রাখিতে পারেন। এবং আগামী বর্ষের বাহানার সময়, তাঁহার সমস্ত দলকে সেই কম্বলে আচ্ছাদিত করিয়া, আপনার প্রচ্ছন্ন দেবত্বেরও প্রচুর পরিচয় প্রদান করা হয়। অনেকটা অববোহণ, অনেকটা অনুগ্রহ স্বীকার করিয়া, পোড়েল, বর্ষার চাষ করিতেন। সঙ্গীত বিদ্যাদত্ত মূলধনে এবার সে কার্য্য সম্পাদনের সম্ভাবনা বড়ই অল্প। সুতরাং তিনি মাঠের মুক্ত বাতাসের "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম" সাহায্য লইয়া সে বিষয়ের একটা উপায় স্থির করিতে করিতে বেলা ২॥ প্রহরের সময়, রামনিধি চট্টোর বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন জামাই বাবু, বাটীর সম্মুখের শিবমন্দিরের রোয়াকে বসিয়া, আহারান্তিক তামাকু সেবন করিতেছিলেন, পোড়েলকে দেখিয়া, খুসী হই-না-রাগ করি ভাবে একটু থতমত খাইয়া সরিয়া বসিলেন। পরে শাশুড়ী খুসী করা, একটা সংকল্পিত—অলাবুমঞ্চের স্থপতি কার্য্যে পোড়েল তাহার সাংসারিক অভিজ্ঞতা লইয়া অনেক সহায়তা করিতে পারে, ভাবিয়া এবং অনেক গুলা বিজন খোসগল্পের একজন আসন্ন তন্ত্রধার আসিয়া জুটিল দেখিয়া, তিনি হুঁকা টানিতে টানিতে বলিলেন "পোড়েল যে হে!—এত অবেলায় কোথা থেকে?"

পোড়েল। আজ্ঞে—আপনি অবেলা ব'লবেন না। আমরা পুরুষ মানুষ,—বুল্‌বুল্ পাখীর জাত। সকাল সন্ধ্যা একটু পাতলা হাওয়া না খেলে প্রাণ কেমন করে। সুরসারের কাজ,—বড় শক্ত,—নাদ—বিন্দে!—এত বড়—একটা সখীয়ান ওস্তাদের সম্মুখে, এমনি একটা প্রাতঃকালের পান্তাভোজী জীবনের বগ্‌দামুটের মতন, আকালিক ভ্রমণের প্রসঙ্গ তুলিযাছেন বলিয়া, শ্রীমান মনে মনে একটু—অপ্রতিভ হইলেন;—এবং আপনার অসীয়ানত্ব স্খালনের ত্বরিত বিধান স্বরূপ, পোড়েলের ক্ষৌরীত শ্মশ্রু শুম্ফ সম্পন্ন মুখ, বেণে খোঁপাবাঁধা চুল ও গলার ২নর কাটীব মালার দিকে, বার কতক উদ্দেশ্য শূন্য ভাবে চাহিয়া, বলিয়া উঠিলেন—"এবার ঢাকায় বায়না ছিল না হে!—কুশি লবের পালা হ'ল বুঝি? নবাবের বাড়ী গাওনা টাওনা হয়েছিল নাকি?

পোড়েল। আজও গাওনা জমেছিল মন্দ নয়। বড্ড মেহন্বৎ—একা সারা রাত রাগিনী দেওয়া!" শ্রীমানের চক্ষু ডাগর হইতে লাগিল; হুঁকা তাহার উপভোগী ইন্দ্রিয়ের দ্বার হইতে প্রায় একহাত সরিয়া পড়িয়াছিল। গয়ারাম আবার আরম্ভ করিলেন—

"আজত মকরাক্ষের পালা হয়েছিল।" অতি বদ্ "বধ" শব্দের সংস্রব থাকায়—গয়'রাম পালার পুরা নামটা উল্লেখ করিল না। "মকরাক্ষ বড় মানায় নি;

তোমায় যদি পাওয়া যেত জামাই বাবু! ত মনের সাধে একবার মকরক্ষ সাজিয়ে নবাবের আক্কেল দিয়ে আসতুম। তোমায় যদি পাওয়া যেত!—তোমার চেহারা,—তোমার আওয়াজ!"

বশ্!—শ্রীমানের চক্ষু ছল ছল হইয়া উঠিল। তিনি কুলীনের সন্তান;—পুরাণ কম জানিতেন তাহা নহে,—তবু তাঁহার কেমন মনে হইল, মকরাক্ষ বোধ হয় লক্ষহীরার স্বামী। নামটা খুব জবর;—বড়ঘরের উপযুক্ত। শ্রীমান জিজ্ঞাসা করিলেন—

"পোড়েল!—লক্ষহীরা কে সেজে ছিল!" পোড়েল সে কথা শুনিতে পাইল না। তখন প্রসঙ্গ ক্রমে নবাব, তাজমহল, দিল্লীর বাদশা, সকলেরই কিছু কিছু ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইতে লাগিল। শেষে আকব্বরসাহ যে পূর্ব্ব জন্মে হিন্দু ছিলেন, এবং কোন কাম্যকূপে অবগাহনান্তর, গোবোময়ুক্ত দুগ্ধপান করিযাই যে, তাঁহার দিল্লীর রাজ তক্ত, রংমহলের সার্দ্ধ সাত শত বেগমের অযাচিত প্রণয় রূপ, দারুণ ভাগ্য বিপ্লব ঘটিয়াছিল, ইত্যাদিরূপ, অনেক মনুষ্যবুদ্ধি অতীত,—বিধাতার কার্য্যকলাপের একটা সমস্ত সিরাস্তার গাঁটরী,— খুলা হইয়াছিল। গয়ারাম, কখন কখন পূর্ব্ব বঙ্গে যাত্রা গাহিতে যাইত, সুতবাং জামাই বাবু বুঝিলেন, দিল্লীর রংমহলের সংবাদ জানা, তাহার পক্ষে আদৌ বিচিত্র নহে। শ্রীমান বলিলেন "বেস পোড়েলের পো!—তামাক খাও, তামাক খাও!—খপর কি বল!"

পোড়েল। আজ্ঞে টাকা কড়ির যোগাড় হয় নি। আমাদের বড় সুবিধা হচ্চে না। দাদাঠাকুরকে বলে ছিলেম, চাটুয্যে মহাশয়কে বলে কিছু টাকা দেওয়াতে, তিনি কৈ পেরে উঠ্লেন না। এবার দরবারে, জামাই বাবু! আগে তোমায় একটু ধ্বজা হতে হবে।

হরিশ। তার জন্যে ভাবনা কি হে পোড়েল! ধ্বজা ছেড়ে বজ্রাঙ্কুশ হতে পারি। তবে শুধু হাতে কর্ত্তার মন উঠে না। আর গোড়াতেই তুমি বিগড়েছ। বাপ বল, মা বল, সকলেই একটু আত্তি শো চায়। পরের ছেলেও আপনার হয় পোড়েল! আপনার ছেলেও পর হয়। ইংরিজি পোড়ে আজকাল লোকেব মাগই মা বাপ। মা বাপ ভেসে গিয়েছে। কর্ত্তা বড়ই নারাজ, কোলকেতায় থাকে, কে জানে, কেমন স্বভাব চরিত্তির! তোমাদের দাদা ঠাকুবেব চাল চলনে কর্ত্তার আর তেমন "প্রতিযোগিতা" নাই। তবে আমার বল কিসের মধ্যেই আছি! আর হেথা কয় দিন বা থাকা হয়।"

শ্রীমানের এবাব জয় হইল। পোড়েলের রসিকতাব উত্তরে তিনি একটা হীবাকাটা আভাঙা সাধুভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তাঁহার পুত্রের সহিত প্রীতিভোগে, জামাতাব বজ্রাঙ্কুশত্ব ও প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পোড়েল। হেঁগা!—তোমরা খুব বনিয়াদি ঘরের ছেলে। গুণ যশ সকলই তোমাদের। তোমরা আমায় মনে করে রাখবে, তা আবার বড় কথা। টাকা কড়ি ত হাতের ময়লা।

হরিশ। উ—তা—পোড়েল!—তুমি আটঘরের নও, তাই বোঝ। আর পোড়েল বৌ, তাদের হরিশ ঠাকুর

জামাইয়ের জন্তে, আগেকার মত যে সময়ের যে কিছু পাঠায় না কেন ?—তা তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। আমরা আমাদের বংশের মত কাযই করবো। তোমরা ২।১০ টাকা যে আনো, সে কি আর একটা বড় কাজ !

"হরিশের সহিত" সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিশিষ্ট—গুষ্টীব বহুবচনান্ত পদটীর এক-বচনান্ত প্রয়োগ হইলে, পোড়েলের কত-দূর সুখশ্রাব্য হইত তা বলা যায় না। বহুবচনের ভিড়ের ভিতর তাঁহার একটা জনতা জন্য ভরসা হইয়াছিল। পোড়েলেরপো একেবারে চলিয়া গেলেন, এবং "আছেত," "এবং," "সে কি," বেলা হয়েছে, "পায়ে বাধবেন" প্রভৃতি কতক-গুলা ভগ্নপদ শীলতাব বিগ্রহ বিসর্জ্জন দিয়া গৃহ যাত্রা করিল। জামাই-বাবুও আপনার প্রতিজ্ঞা-পালনের চেষ্টায় অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

গৃহিণী তখন দরদালানে বসিয়া নীরবে রামপ্রসাদী পদাবলী পড়িতে-ছিলেন "কপালপোড়া" "ঘর ভাল নয়" "দোষী কিন্নে" প্রভৃতি নিরাশাব্যঞ্জক পদের কত উচ্চকণ্ঠ আবৃত্তি করিয়া, অপ্রতিভ বিধাতা ও মনুষ্য পতির সঙ্কুচিত হৃদয়ে তীব্র কষাঘাত করিতে-ছিলেন। গৃহের ভিতর বসিয়া, চট্টো-পাধ্যায় মহাশয় তাম্রকুটের সাহায্যে ব্রাহ্মণ বর্জ্জ্য দিবা-নিদ্রা ও মক্ষিকা তাড়াইতেছিলেন। গৃহিণী ঈষদুন্মুক্ত কপাটের ভিতর দিয়া, কোন অবৈধা-হারী, খোঁয়াড়বদ্ধ পশুর মত, গৃহবদ্ধ স্বামীর গৃহিণী কার্য্যে মাঝে মাঝে মনঃ-সংযোগ করিতেছিলেন। কারণ তখনও পার্শ্বের বাটীর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে "পোয়া বারো কচে" রূপ পাড়ায় কালামুখো নিকামায়ে মিলা কুলের পূর্ণক্রীড়া সমাবেশ সূচক ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ভরসা কি চট্টোপাধ্যায়ই যদি দুই দণ্ড মরাহাড় চালাইয়া তাঁহার জীবন্ত খিল হাড়ের খুলিয়া আসেন !

এমন সময় জামাতা বাবাজীবন শাশুড়ীকে দেখিয়া কহিলেন—"মা ! পোড়েল এসেছিল। কতকগুলা ডেঙো-বিচি দিয়ে গেল। কোথা বসাব !

গৃহিণী একবাব ঘরের ভিতরের দিকে চাহিলেন। সে চাহনিতে, জামা-তার নিঃস্বার্থ শ্বশুরকুল-বসতির অনেক শুভ চেষ্টিতের ভিতর, ডেঙোবণরূপ একটা নিষ্কাম উপকারের একটা প্রকাণ্ড ইস্তাহার প্রকাশ হইতেছিল। কর্ত্তা বুঝিতেছিলেন, গৃহিণীর হাতের কাছে পূর্ব্বদিনের প্রবন্ধের একটা বাস্তবীকৃত উদাহরণ আসিয়া উপস্থিত। তিনি তামাকে আরো একটু জোরে টান দিতেছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র আবার আরম্ভ করিলেন—"লোকটা কর্ত্তাকে খুব মানে ও আমাদের বিপদে সম্পদে বুক দিয়া করে। একালে এমন নিমকের চাকর খুঁজে মেলে না।"

গৃহিণী একটা শূন্য লক্ষ্য দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। ঘরের কড়ী বরগা ঠেকিয়া তাহা দালানময় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার অর্থ—এ পুরীর শুভাকাঙ্ক্ষীদের আদর, এ পরিবারের কর্ত্তার কাছে নাই। হরিশ্চন্দ্রের গৌরচন্দ্রিকার কিন্তু কোন নিকট উৎপাতের "অগ্নিগর্ভ ময়ুখ," চট্টোপাধ্যায়ের গায় ঝরিয়া পড়িতেছিল। চট্টোপাধ্যায় একটা সুদূর কোণ আশ্রয়

করিয়া, নূতন কলিকায় আগুন দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

বাপজানের তবু সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া, সার্ব্বভৌম শুভইচ্ছা ফাটিয়া পড়িতেছিল। তিনি আবার বলিলেন—বেচারার বড় ক্লেশ হয়েছে। সামান্য টাকার জন্য, তাহার চাষবাস বন্ধ, এমন কি অনেক দিন ঘরে উপোষ—আধপেটা। আমার পিতামহ, জান গা,—বড়লোক ছিলেন। তাঁরা হ্যাঁ মাঝে মাঝে প্রজা নাতোয়ান হ'লে চাষবাস করিয়ে তাকে সাতোয়ান করে তুলতেন। বনিয়াদীর লক্ষণই ওই।—তা সে আমায় বলেছে—কর্ত্তাকে বলবার জন্যে। আমি কি বাপু ওসব কথায় থাকতে পারি? কর্ত্তা যদি না সেগুলো বিবেচনা করেন?"

"বনিয়াদীর লক্ষণ"—"জামাই"এর "অপমান" গৃহিণী মনে রেখে পড়িলেন। তিনি দেখিলেন হঠাৎ যেন চাষা প্রজারের প্রাচুর্য্যের একটা অনেক দিনের পুরাতন পরমায়ু তাহার হাত ছাড়াইয়া যায়!—যেন আবার একটা দক্ষযজ্ঞের অভিসম্পাত তাহার পারিবারিক কল্যাণের উপর আসিয়া পড়ে। তিনি স্বামীর গৃহের দরোজা একটু বেশী করিয়া ফাঁক করিলেন, এবং তাহার ভিতর দিয়া, একটীবার আপনার উদ্বিগ্ন চক্ষের বিদ্যুৎ-চমক নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

"ওগো!—শুনচো"।

কর্ত্তা বলিলেন—"হুঁ"।

গৃ। হুঁ হাঁর কায নয়। পোড়েল ২১০ টাকা যা চায় দিও।

কর্ত্তা। স্থরেশ বলেছিল, তাকে দিইনি, জামায়ের কথায় দিলে উপযুক্ত ছেলের অপমান করা হবে। প্রজারা আমায় অমানুষ ঠাওরাবে। তা ছাড়া ওর কি বন্ধক রাখিব? ও কোরফা প্রজা। তুমি স্ত্রীলোক, তোমার মুখে বিষয় কর্ম্মের কথা অমঙ্গল।

গৃ। আমার বাতাস লাগলেই ত তোমার যত অমঙ্গল। তোমার সব অমঙ্গল নিয়ে আমি দূর হ'ব, তুমি ঘরে বসে মঙ্গলের সংসার কর। পদে পদে মেয়ের মনে কষ্ট দেওয়া, আর জামাইএর অপমান!

কর্ত্তা। তোমায় বেরুতে হবে কেন! তুমি যখন এত তাপিত হয়েছ, তুমি এবার গুড়গুড়ি, তাকিয়ে দপ্তর নিয়ে, সদরে বৈঠক করে বস। আমি বৃন্দাবন-বাসী হবো।

গৃহিণী এবার কাঁদ কাঁদ হইয়া কর্ত্তাকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। চণ্ডালপনায়, কোন একটা পোড়েলের স্বত্ব বা কন্যাসঙ্গিনী স্থরেশের মাতা একরূপ অদয় ভাবিয়া বলিয়া ফেলিলেন—

"তোমার যা ইচ্ছা তাই করগে আমায় জিজ্ঞাসা কর কেন?"

তুমি আমি এতই মর্ত্তের দাস। তোমার, আমার অটল অনন্তের দ্বার, বিধাতা, এমনি একটা পাকান মোচড়ান মর্ত্তের ভিতর দিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছেন!

সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত গদারাম পোড়েল বিশ টাকা পাইল এবং এ সব ত আপনারই বলিয়া শ্রীমানের গাত্রে তাঁহার একটা ভবিষ্য শুভ অদৃষ্টের অঞ্চল স্পর্শ লাগাইয়া গেল।

কেন এই বই লেখা!—কেন এ অদ্ভুত রস-কলী গৃহস্বামীর একজনেরও

দৌর্ব্বল্য-বর্ণনা! জগতের যাবতীয় নীতি-বোধ, সংসারের সমস্ত সুবোধ গোপাল-দের বৈরতা আমন্ত্রণ!

এইবার তোমায় আমার একটা বুঝা পড়া চাই। ইহার পর ভাল না লাগিলে আমি কোন কৈফিয়ৎ কবুল করিব না। তুমি কোন জ্ঞানার্ণবাবগাহী, অর্দ্ধ পয়সা মূল্যের, অভ্রান্ত সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে চড়িয়া, আমার ভাগ্যে হলাহল ব্যবস্থা করিতে পার। আমি জানির জগতে অতটা ঐশী শক্তির আংশিক অপ-ব্যয় করিয়াছ। সব করিও বাপু! কেবল কোন আদর্শ সাহিত্যের আদর্শ আবর্জ্জী আমার মুখের সামনে ধরিও না! এ অজগর আলস্য ভেদ করিয়া আপন কুৎসিতত্ব প্রতিপাদনে আমার অবকাশ বড়ই অল্প। তোমার ষড়দর্শনের শক্তি এক হইলেও আমি বলিব, আমার ভাল লাগে—দিবসে সান্ধপ্রহর পর্য্যাপ্ত নিদ্রা, সারা দিনের ভিতর কোন রকম কাজটী না করা, আর সুঠাম, নিটোল, বাঙ্গা-লীর মেয়ে!—কারণ এমন সন্ধ্যা-মাখা ভিক্ষা-ঢাকা, শ্যাম স্নিগ্ধ ভাব স্বপ্নায়ন, কেহ আত্মার ভিতরে চাহিয়া ফেলিতে পারে না। আমি বড়, ভাল চোখ ভাল বাসি বাপু!—সংসারে ভাল চোখের দাম নাই।

যুগধর্ম্ম—জীবধর্ম্ম—বিবর্ত্তবাদ!—জ্ঞানের ঘোড়দৌড়ের মাঠে কতটাই পিছাইয়া পড়িয়াছি। মাঝে মাঝে আল-স্যের অহিফেণ-নেশায়, অমনি কতকটা বেসাধা শানাইএর চেচানি বোধ হয় শুনিয়া থাকিব। তবে আইস তোমায় আমায় একটা রফা করা যাউক। এই উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর "অবিরাম কবন্ধ আবর্ত্তনে আমি যখন একটা ঘুমের মশারি টাঙ্গাইয়া পড়িয়া থাকিব;—যখন মুদীর তাগাদা, মিউনিসিপ্যালের পেয়াদা, গোয়ালিনীর রুষ্ট হাসির মিষ্ট অভি-সম্পাতের আড়ালে আমি হয় ত একটা জমাট প্রভাত কাকলির প্রাচীর খাড়া করিয়াছি;—হয় ত উষার গোবৎস-হরণে দুষ্ট পুলিষের সাহচর্য্যে প্রবৃত্ত; তখন তুমি তোমার শ্রীমৎ প্রত্নতত্ত্ববিৎ নাসিকা বাহাদুরকে অগ্রগামী করিয়া আমার আলস্যের পুণ্য সমাধি উৎখাত করিতে আসিও না।

আমি যখন বলিব বাঙ্গালীর মেয়ে স্নেহের বৈশেষিক দর্শনে কনাদ, জীবনে বেকুণ্ঠের স্রোত কাটিয়া আনিতে নেপো-লিয়ন, মরমে কথা ঢালিতে কালিদাস, স্বপ্ন মন্ত্রে মিশামিশি দেখাইতে ভিক্টর হুগো; প্রতিভার বাল্মীকি, করুণায় বুদ্ধদেব, ব্যাখ্যানে বেদব্যাস, চালনায় শ্রীকৃষ্ণ, মত্ততার গৌরাঙ্গ, ত্যাগে দধিচী, অমন সুন্দর কেহ মরিতে পারে না, মরণের সৌন্দর্য্য অমন কেহ বুঝিতে পারে না; নমস্কার করি বাপু! অমন তোমার পরকোলা-আঁটা চোখ দুটী, বা টীকি-নাড়া অলঙ্কারের বুকুণী একটু তফাৎ করিয়া ফেলিও! তোমার কর-সেট-আঁটা নিরেট বিরাট সৌন্দর্য্য বা আলঙ্কারিক কৃত মনুষ্যাঙ্গদয়ের জরীপি নক্সা আমরা উভয় বুঝিতেই সক্ষম! স্বীকার করিতেছি—তুমি একটা স্বার্থক জন্মা। তুমি না হইলে, ইষ্টক নির্ম্মাণ, পিষ্টকবিজ্ঞান, দুর্ব্বলের জীর্ণ গৃহের বহ্নি সংস্কারাদি গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য্য আটক পড়িয়া থাকিত। স্বীকার করিলাম তুমি এই নীল আকাশের একটা

অবলম্বন-স্তম্ভ। তোমার তিরোভাবে আকাশের নীল সামিয়ানার এক দিক্ ঝুঁকিয়া পড়িয়া যাইবে। নিদ্রিত দেবকুল তৈজস পত্রের মত আহা কি, গড়াইয়া পড়িতে পারেন। তুমি অনন্ত অস্থিরের—তুমি একটা দিগ্বারণ।

হিন্দুমহিলা।

অহল্যা।

(২)

অহল্যার ইতিহাস পূর্ব্বে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; তৎসম্বন্ধে আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই, তাঁহার চরিত্রে যে জঘন্য কলঙ্ককালিমা আরোপিত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই; এস্থলে তাহার পুনরালোচনা করিয়া পাঠকদিগের রুচির গঞ্জনা করিতে ইচ্ছা করি না; তবে অহল্যা সম্বন্ধে ঐ অহঙ্কারজনক বিবরণ কিরূপে কল্পিত হইল, এক্ষণে তাহাই দেখিতে হইবে। এই ঘটনার সহিত ভগবান শ্রীরামের একটী অতুলনীয় অবদান প্রগাঢ়রূপে জড়িত, সুতরাং এই সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে হইবে।

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত গৌতমের আশ্রমে উপস্থিত; মুনিপত্নী অহল্যা পতিশাপে সর্ব্বলোকের অদৃশ্যা হইয়া সেই তপোবনে উৎকট তপস্যায় নিরত ছিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহার পূর্ব্ব শাপ-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া শ্রীরামকে বলিলেন, "এই দেবরূপিণী মহাভাগা অহল্যাকে উদ্ধার কর।" গৌতমের শাপে অহল্যা এত দিন সর্ব্বলোকের অদৃশ্যা হইয়া ছিলেন; কিন্তু শ্রীরামের আগমনে এক্ষণে নিজ শাপাবসান-কাল অবগত হওয়া তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীরামলক্ষ্মণ তাঁহার সেই তপঃকর্ষিত তেজঃপুঞ্জ কলেবর দর্শন করিয়া সানন্দে তদীয় চরণ-যুগল গ্রহণ করিলেন। গৌতমের পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া সাধ্বী অহল্যা শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে সাদরে গ্রহণ করিয়া পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা আতিথ্য করিলেন। সেই সময়ে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি, এবং দেব-দুন্দুভি নাদিত, হইতে লাগিল, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের মহানন্দধ্বনি উত্থিত হইল। দেবগণ তপোবল-বিশুদ্ধাঙ্গী গৌতমবশানুগা সাধ্বী অহল্যার সম্যক্‌রূপে পূজা করিলেন। এই সময়ে মহাতেজা গৌতম হিমালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া অহল্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক পরম সুখ প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রীরামকে বিধিবৎ পূজা করিয়া স্ত্রীপুরুষে মহাতপশ্চরণ করিতে লাগিলেন।

বাল্মীকীয় রামায়ণে অহল্যা-উদ্ধার সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে, এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত হইল। ইহাতে অতিপ্রাকৃতের অল্পই ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়।

বিষয়টী অতীব গুরুতর; সুতরাং বিশদ-রূপে আলোচনা করা যাইতেছে। গৌতম ইন্দ্রকে শাপ দিয়া অহল্যাকে বলিতেছেনঃ—

"ইহ বর্ষসহস্রাণি বহুনি নিবসিষ্যসি
বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্ব্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্ বসিষ্যসি।
যদা ত্বেতদ্বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ।
আগমিষ্যতি দুর্দ্ধর্ষস্তদা পূতা ভবিষ্যসি।
তস্যাতিথ্যেন দুর্বৃত্তে লোভমোহবিবর্জ্জিতা।
মৎসকাশং মুদা যুক্তা স্বং বপুর্ধারয়িষ্যসি॥" *

অনাহারে বাত ভক্ষণ করিয়া তপঃ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইয়া এই আশ্রমে বহু সহস্র বৎসর ভস্মশয়নে বাস করিবি। তাহার পর দশরথাত্মজ দুর্দ্ধর্ষ রাম যখন এই বনে আগমন করিবেন, তখন তুই পবিত্রতা লাভ করিবি। রে দুর্বৃত্তে! লোভ মোহ বর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহার আতিথ্য করিয়া সানন্দে পুনর্ব্বার আমার সহিত মিলিত হইবি এবং নিজ দেহ ধারণ করিবি।

কথিত আছে অহল্যা গৌতমের শাপে পাষাণী হইয়াছিল; কিন্তু এস্থলে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। পুনশ্চ অহল্যার উদ্ধারকালে বাল্মীকি যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহাও উদ্ধৃত হইল।

"বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য আশ্রমং প্রবিবেশহ॥
দদর্শচ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাম্।
লোকৈরপি সমাগম্য দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরাসুরৈঃ॥
প্রযত্নান্নির্ম্মিতাং ধাত্রা দিব্যাং মায়াময়ীমিব।
ধূমেনাভিপরীতাঙ্গীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥
স তুষারাবৃতাং সাভ্রাং পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব।
মধ্যেঽম্ভসো দুরাধর্ষাং দীপ্তাং সূর্য্যপ্রভামিব॥
সাহি গৌতমবাক্যেন দুর্নিরীক্ষ্যা বভূবহ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং যাবদ্রামস্য দর্শনম্॥
শাপস্যান্তমুপাগম্য তেষাং দর্শনমাগতা।
রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুদা॥
স্মরন্তী গৌতমবচঃ প্রতিজগ্রাহ সা হি তৌ।
পাদ্যমর্ঘ্যং তথাতিথ্যং চকার সুসমাহিতা॥"

মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন;—করিয়া তপস্যা দ্বারা দ্যোতিতপ্রভা ও সুরাসুরের দুর্নিরীক্ষ্যা মহাভাগা অহল্যাকে দেখিতে পাইলেন,—দেখিলেন বিধি যেন তাঁহাকে পরম যত্ন সহকারে দিব্য মায়াময়ীর ন্যায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন; তিনি ধূমাচ্ছন্ন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা, তুষারাবৃতা অভ্রান্বিতা পূর্ণচন্দ্রপ্রভা, ও সলিল মধ্যস্থ দীপ্ত সূর্য্যপ্রভার ন্যায় দুরাধর্ষা হইয়া বিরাজ করিতেছেন। গৌতমের বাক্যানুসারে শ্রীরামের দর্শন পর্য্যন্ত তিনি ত্রিলোকেরও দুর্নিরীক্ষ্যা হইয়াছিলেন। এক্ষণে শাপাবসানে তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে আরূঢ় হইলেন। তখন শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ আনন্দ সহকারে তাঁহার চরণযুগল স্পর্শ করিলেন এবং অহল্যাও গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের উভয় ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করিয়া সুসমাহিত চিত্তে পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের আতিথ্য করিলেন।

এস্থলেও পাষাণের মানবীকরণ সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ নাই। অহল্যা গৌতম-শাপে সর্ব্বভূতের দুর্নিরীক্ষ্যা অথচ তপস্যা দ্বারা দ্যোতিতপ্রভা হইয়া ধূমাচ্ছন্ন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা, তুষারাবৃতা পূর্ণচন্দ্রপ্রভা ও সলিল মধ্যস্থা প্রদীপ্ত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন;

* বাল্মীকি রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৪৮ সর্গ।

সুতরাং তিনি যে পাষাণী হইয়া নির্জ্জীব-ভাবে তথায় পতিত ছিলেন, একথার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। মহর্ষি বাল্মীকির এই কয়েকটী কথা তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, অহল্যা-উদ্ধার ব্যাপারে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের দেব-ভাবের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। অহল্যা গৌতমের বাক্যে সর্ব্বভূতের অদৃশ্যা হইয়া ছিলেন শ্রীরামকে দেখিয়া সকলের সম্মুখে দেখা দিলেন। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার পাদ-যুগল স্পর্শ করিলেন। শ্রীরামের আগ-মনে তাঁহার শাপকালের অবসান হইল জানিয়া তিনি সকলকে দেখা দিলেন। সুতরাং তিনি যে এতদিন পাষাণীর ন্যায় নির্জ্জীব ভাবে ছিলেন এবং রামের পাদ স্পর্শে মানবী হইলেন, ইহারও কোন স্থলে সেরূপ কোন বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, কবিগুরু বাল্মীকি অহল্যা-উদ্ধারকে শ্রীরামের অতিপ্রাকৃত কার্য্য (Miracle) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই; অপিচ এ কার্য্যে যে শ্রীরামচন্দ্রের দেবভাবও আরোপিত হয় নাই, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। অতএব অহল্যা উদ্ধার বাল্মীকির মতে শ্রীরামের অতিপ্রাকৃত কার্য্য নহে এবং এই কার্য্যে শ্রীরামের উপর দেবত্ব আরোপিত হয় নাই; বরং একস্থলে নির্ব্বিশেষণ শুদ্ধ দশরথাত্মজ শব্দ দ্বারা শ্রীরামের মানবত্ব প্রতিপাদিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ণ-ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিবার বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়। গৌতম অহল্যাকে শাপ দিয়া বলিলেন "দুষ্টে! তুই পরমেশ্বর শ্রীরামকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া আমার এই আশ্রমস্থ শিলাতলে থাকিবি *।" তাহার পর তাঁহার উদ্ধারের উপায় উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে, "এইরূপে বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে যখন দশরথাত্মজ শ্রীমান্ রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিয়া চরণ দ্বারা তোর আশ্রয়শিলা স্পর্শ করিবেন, তখনই তুই শাপ হইতে বিমুক্ত হইবি †" শুদ্ধ ইহাই নহে, শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অহল্যা যে কয়েকটী স্তোত্র দ্বারা শ্রীরামের পূজা করিয়া-ছিলেন, তাহার প্রত্যেকটীতেই তাঁহার পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তন্মধ্য হইতে কেবল একটী শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত হইলঃ—

"অয়ং হি বিশ্বোদ্ভবসংযমানা
মেকঃ স্বমায়াগুণবিম্বিতো যঃ।
বিরিঞ্চিবিষ্ণীশ্বরনামভেদান্
ধত্তে স্বতন্ত্রঃ পরিপূর্ণআত্মা।" ‡

ইনিই একাকী বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা; স্বীয় মায়াজনিত সত্ত্বরজস্তম প্রভৃতি গুণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিরিঞ্চি, বিষ্ণু ও শিব এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়া থাকেন; পরন্তু ইনি স্বতন্ত্র, অব্যয়, পরিপূর্ণ, পরাত্মা।

অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীরামের পূর্ণ-ব্রহ্মত্ব স্বীকৃত হইলেও, কিরূপ অতি

---

* অধ্যাত্ম রামায়ণ, আদিকাণ্ড, পঞ্চম অধ্যায় ২৭।২৮ শ্লোক।

† অধ্যাত্ম রামায়ণ, আদিকাণ্ড, পঞ্চম অধ্যায় ৩০।৩১ শ্লোক।

‡ অধ্যাত্ম রামায়ণ, আদিকাণ্ড, পঞ্চম অধ্যায় ৩৪ শ্লোক।

প্রাকৃত কার্য্য দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এস্থলে তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে; সেই সঙ্গে, অহল্যা উদ্ধার উপাখ্যানটী ঐতিহাসিক কি না তাহার যথাসাধ্য সমালোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ বাল্মীকীয় রামায়ণে লিখিত আছে, শ্রীরামকে দর্শন করিবমাত্র অহল্যা পতিশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। এস্থলে অধ্যাত্ম রামায়ণকার বলিতেছেন যে, শ্রীরাম স্বীয় চরণ দ্বারা অহল্যার সেই আশ্রব-শিলা স্পর্শ করিয়াই সেই তপস্বিন কে দেখিতে পাইলেন; অর্থাৎ শ্রীরামের চরণস্পর্শে অহল্যার পাপ বিমুক্ত হইবামাত্র তিনি সকলকে দেখা দিলেন। (বলা বাহুল্য এতদিন তিনি সর্ব্বজীবের অদৃশ্যা হইয়া ছিলেন।) অহল্যা উদ্ধার সম্বন্ধে বাল্মীকি ও অধ্যাত্ম রামায়ণকারের যে, ঐকমত্য নাই, এস্থলে তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। অহল্যার শাপ ও উদ্ধার প্রসঙ্গে স্বয়ং বাল্মীকি, গৌতম, অহল্যা বা বিশ্বামিত্র কেহই এস্থলে শ্রীরামকে পূর্ণব্রহ্ম অথবা তাঁহার অন্যতম গুণাত্মক বিষ্ণু বলেন নাই *। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণকার, তাঁহাকে একেবারেই পরাৎপর পরব্রহ্ম নারায়ণরূপে অবতারিত করিয়াছেন। অবশ্য বাল্মীকি-রামায়ণ যে, অধ্যাত্ম রামায়ণের বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না; সুতরাং বাল্মীকীয় রামায়ণের ছায়া অবলম্বনে যে, অধ্যাত্ম রামায়ণ রচিত হইয়াছে, একথাও বলা অন্যায় নহে। মূল গ্রন্থে যাহা নাই, অনুকরণে তাহা দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণই নাই; কেন না অধ্যাত্ম রামায়ণকার শ্রীরামের পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশেই উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ অহল্যাহরণ-বৃত্তান্ত বাস্তবিক ঐতিহাসিক কি না এস্থলে তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। রামায়ণের পূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাতে অহল্যা ও গৌতমের এরূপ কোন বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রামায়ণের পরবর্ত্তী সকল গ্রন্থেই বিশেষতঃ মহাভারতের স্থানে স্থানে ইন্দ্রকর্ত্তৃক অহল্যা-হরণের

* রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৩য় সর্গে এ সম্বন্ধে আর একটী উপাখ্যান আছে। তাহার একস্থলে শ্রীরাম নরদেহধারী বিষ্ণু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তদ্যথা,—

উৎপৎস্যতি মহাতেজা ইক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ।
রামো নাম শ্রুতো লোকে বনং চাপ্যুপযাস্যতি॥
ব্রাহ্মণার্থে মহাবাহুর্বিষ্ণুর্ম্মানুষবিগ্রহঃ॥
তং দ্রক্ষ্যসি যদা ভদ্রে ততঃ পূতা ভবিষ্যসি।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যে কতকগুলি অদ্ভুত উপন্যাস বর্ণিত আছে, অনেকে সেগুলিকে বাল্মীকি-রচিত বলিয়া স্বীকার করেন না। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে এই সর্গটীকেও প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে। যদিও বাল্মীকি শ্রীরামের পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ সংক্রান্ত বিবরণ বর্ণন করিবার সময় তাঁহাকে নরদেহধারী বিষ্ণু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি অহল্যা উদ্ধারের মৌলিক উপাখ্যানে শ্রীরামচন্দ্রের বিষ্ণুত্বের অণুমাত্রও উল্লেখ না থাকাতে একটা বিষম সন্দেহ রহিয়া যায়।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখা যায় *। উত্তরকাণ্ডে অহল্যার জন্ম, বিবাহ, হরণ ও উদ্ধার সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান আছে। তাহাতে অহল্যা সৃষ্টির প্রথমা রমণী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং পিতামহ, অমরেন্দ্রের নিকট অহল্যার সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিতেছেন, "পূর্ব্বে আমি যে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তাহাদিগের এক বর্ণ, সমান, ভাষা ও একই প্রকার রূপ ছিল; তাহাদিগের দর্শনে বা লক্ষণে কিছুই প্রভেদ ছিল না। সেই প্রজাকুলের সেইরূপ ভাব দর্শনে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং তাহাদিগের পার্থক্য সাধন করিবার নিমিত্ত তাহাদের প্রত্যেকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎকৃষ্টাংশ লইয়া একটী রমণী সৃষ্টি করিলাম। তাহারই নাম অহল্যা।" অনন্তর ব্রহ্মা অহল্যা শব্দের ব্যুৎপত্তি নিষ্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে ইন্দ্রকে বলিতেছেন, "হল অর্থে বৈরূপ্য; সেই হলে অর্থাৎ বৈরূপ্যে যাহার জন্ম, তাহাকে হল্য বলা যায়। যাহার হল্য নাই, অর্থাৎ যে পরম রূপবতী; সেই রমণীই অহল্যা। সেই জন্যই আমার স্রষ্টা সেই বামলোচনা অহল্যা নামে প্রসিদ্ধ।" ইহার পর মহর্ষি গৌতমের সহিত অহল্যার বিবাহ; ইন্দ্রকর্ত্তৃক অহল্যা-হরণ, গৌতমের শাপ এবং পরিশেষে অহল্যার শাপ মোচন প্রভৃতি বিবরণ পূর্ব্বের ন্যায় একরূপই দেখা যায়। কেবল একটী স্থানে অল্প মাত্র প্রভেদ লক্ষিত হয়;—আদি কাণ্ডে অহল্যার শাপমোচন সম্বন্ধে যে উপাখ্যান আছে তাহার কোন স্থানেই শ্রীরাম বিষ্ণু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন নাই; কিন্তু এই উত্তরকাণ্ডে তাঁহার বিষ্ণুত্বের উল্লেখ দেখা যায়। সে যাহা হউক, অহল্যা যে সৃষ্টির আদ্যা স্ত্রী নহেন, হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই তাহা অবগত আছেন। তবে এ অহল্যা কে? সেই গৌতম, সেই ইন্দ্র, সেই শ্রীরাম,—সকলেরই উল্লেখ এবং সেই একই রূপ সমাবেশ দেখা যাইতেছে, অথচ আদৌ অহল্যাকে লইয়া বিষম সমস্যা। গৌতম-পত্নী অহল্যাকেই আদ্যা মানবী বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে অন্যান্য শাস্ত্রবচনের সহিত বিষম বিরোধ ঘটিবে। শ্রুতি স্মৃতির সহিত এস্থলে মহাকাব্যের বিরোধ উপস্থিত; সুতরাং এস্থলে শ্রুতিস্মৃতির বচনই গ্রাহ্য; অতএব এ উপাখ্যানটী কতদূর মৌলিক, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। অনেকেই ইন্দ্র ও অহল্যার উপাখ্যানকে রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ত বলিবেনই; ভারতীয় প্রসিদ্ধ প্রাচীন আচার্য্য ভট্ট কুমারিল স্বামীও ইহাকে রূপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এস্থলে অহল্যা রজনী এবং ইন্দ্র সূর্য্যের অর্থে রূপকচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য্য রজনীকে জীর্ণ অর্থাৎ ক্ষয় করেন বলিয়া রজনীর অর্থাৎ অহল্যার জাররূপে আখ্যাত হইয়াছেন *।

* "অহল্যা ধর্ষিতা পূর্ব্বমৃষিপত্নী যশস্বিনী।
জীবতো ভর্ত্তুরিন্দ্রেণ স বঃ কিন্ন নিবারিতঃ॥"
মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব।
অপিচ, মহাভারতের অন্যত্র,—
"অথ শপ্তশ্চ ভগবান গৌতমেন পুরন্দরঃ।
অহল্যাং কাময়ানোবৈ ধর্ম্মার্থঞ্চ ন হিংসিতঃ॥"

* (ক) "সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্রশব্দবাচ্য সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়া

ইন্দ্রের অহল্যা-হরণ বৃত্তান্তের ন্যায় প্রজাপতি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সাবিত্রী, গায়ত্রী বা শতরূপার হরণ বিবরণও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল গ্রন্থ পবিত্র শাস্ত্র বলিয়া অতি প্রাচীন কাল হইতে আদৃত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে যে, এরূপ রুচিবিগর্হিত ঘৃণাকারজনক জঘন্য ব্যাপারের উল্লেখ থাকিবে, এবং যে সকল দেবতা হিন্দুর পরম আরাধ্য বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা যে, আপনাদের দেবত্ব ভুলিয়া নিকৃষ্ট কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এরূপ পৈশাচিক বা পাশব ব্যবহার করিবেন, এ চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিতেও হৃদয় উন্মত্ত হইয়া পড়ে। যদি ইন্দ্রের গুরুপত্নী-হরণ এবং ব্রহ্মার কন্যাভিগমন বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের দেবতার আসন পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট পশুর মলদিগ্ধ মহাতলে অথবা পিশাচের প্রেতভূমে বাস করা উচিত ছিল। শাস্ত্রকারগণ যে শাস্ত্রের ও যে সকল দেবতার প্রকৃষ্টতা স্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের ও ধর্ম্মতত্ত্বের সারভূত অংশ সমুদায়ের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন, তাঁহারাই যে, জানিয়া শুনিয়া এরূপ নিকৃষ্ট, হেয় ও ঘৃণ্য ব্যাপারের উল্লেখ করিবেন, একথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

আর একটী বিষয় এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। ঋগ্বেদাদি অতি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে "ইন্দ্র" শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে;—কোথাও সবিতা, কোথাও সূর্য্য, কোনও স্থানে বা আকাশের অর্থে ইন্দ্র শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পৌরাণিক শচীপতি ইন্দ্র বৈদিক ইন্দ্র নহেন। পুরাণকারেরা ইন্দ্রের যেরূপ নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র সগুণত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, বেদে সেরূপ কিছুই নাই। বৈদিক ইন্দ্রের এইরূপ নানারূপত্ব পৌরাণিক উপাখ্যান-রচয়িতৃগণের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে নানা আকারে কল্পিত হইয়াছে; এমন কি ব্রহ্মা, সূর্য্য বা আকাশ বাচক এক একটী শব্দ অথবা বিশেষণ পদ লইয়া পৌরাণিকেরা এক একটী উপাখ্যান

"ক্ষরাত্মকজরণহেতুত্বাজ্জীর্য্যত্যস্মাদনেন বোধিতেন বেত্যাহল্যাজার ইত্যাচক্ষতে ন পরস্ত্রীব্যাভিচারাৎ॥"

(খ) প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ম্যাকসমুলর সাহেবও এসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তৎপ্রণীত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের ৫৩০ পৃষ্ঠা দেখিবেন।

(গ) কিছুকাল পূর্ব্বে 'প্রচার' নামক মাসিক পত্রিকায় ইন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে এসম্বন্ধে একটা নূতন(?) মত প্রচার হইয়াছিল। প্রয়োজন বোধে এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। সেই প্রবন্ধের লেখক অহল্যাকে ভূমি এবং ইন্দ্রকে আকাশ অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিতেছেন :—

"সকলেই জানেন হল বলে লাঙ্গলকে। অহল্যা অর্থাৎ যে ভূমি হলের দ্বারা কর্ষিত হয় না,—কঠিন অনুর্ব্বর। ইন্দ্র বর্ষণ করিয়া সেই কঠিন ভূমিকে কোমল করেন,—জীর্ণ করেন, এইজন্য ইন্দ্র অহল্যাজার। জৃ ধাতু হইতে জার শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বৃষ্টির দ্বারা ইন্দ্র তাহাতে প্রবেশ করেন, এইজন্য তিনি অহল্যাতে অভিগমন করেন।"

"প্রচার" ১ম বর্ষ, এবং বঙ্গ দর্শন"
১২৮১ সাল ৪৬৮ পৃষ্ঠা।

বেদের নিরুক্তকার দুর্গাচার্য্যও ঠিক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রচারে তাহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়।

রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল উপাখ্যানের অধিকাংশ আদৌ কাল্পনিক হইলেও প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ বলিয়া প্রায়ই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ইন্দ্রের অহল্যাহরণ বৃত্তান্ত যে, ইন্দ্রের সেইরূপ রূপক অথবা গুণবাচক বাক্য অবলম্বনে উপাখ্যানাকারে রচিত হয় নাই, তাহা সহজে বলা যাইতে পারে না। বেদে যে পদ বৈদিক ইন্দ্রের সামান্ত গুণবাচক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, পুরাণে ও মহাকাব্যে হয়ত তাহা শ্রীরামচন্দ্রের ঈশ্বরত্ব ও অতিপ্রাকৃত কার্য্যের প্রমাণ রূপে একটী উপাখ্যানের আকারে বিবৃত হইয়া থাকিবে। পরন্তু এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২

বাঙ্গালার প্রাচীন কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির রচনা প্রাঞ্জল ও প্রেমভক্তি-রসাত্মক। ইহাতে সুদীর্ঘ শব্দের আড়ম্বর নাই, ব্যাকরণের বাঁধাবাঁধি নাই ;—মানসিক ভাব-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস মাত্র। ইঁহাদের গ্রন্থে প্রচলিত— অমিয়া, হাম্, ভাঁতি, গোপতে, ভেল, ঐছন, যৈছন, কহব, জনু, তছু, অনুখন, হোয়ল, মিলায়ল প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত-মূলক ; রূপান্তরিত হইয়া হিন্দি ভাবাপন্ন হইয়া তৎকালে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। ঐ সকল শব্দ আরও রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষাতেও বিরাজিত রহিয়াছে ; উক্ত শব্দগুলিকে কেহ কেহ "ব্রজবুলি" আখ্যা প্রদান করেন কিন্তু ব্রজবুলী হিন্দিরই প্রকারান্তরমাত্র।

এই সময় ও ইহার পরবর্ত্তী কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল গ্রন্থাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমুদয়ই কৃষ্ণ-প্রেম বিষয়ক পদাবলী। তখন গদ্য-রচনার প্রচলন ছিল না ; তখন বিজ্ঞান-চর্চ্চার বাহুল্য হয় নাই। অনুভাবকতা ও কল্পনাই কবিত্বের প্রধান উপকরণ, বাঙ্গালী তখন অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত, কুসংস্কারাবদ্ধ ; বিজ্ঞানের প্রদীপ্ত রশ্মি তখন বাঙ্গালার হৃদয় আলোকিত করে নাই, তখন পঞ্চভূত স্থলে চৌষট্টি ভূতের কথা বাঙ্গালী শিখে নাই। অশিক্ষিতের উপর কল্পনার একাধিপত্য, তাই বাঙ্গালী কাব্যপ্রিয়। বাঙ্গালী তখন প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের চক্ষে দেখিতে জানিতেন না ; সকল বস্তুতেই পরাৎপরের মহিমা ও সত্তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রেমে পুলকিত হইয়া ভাব-তরঙ্গে আপ্লুত হইতেন এবং সেই ভাব ছন্দোময় রচনায় গান করিয়া প্রেমিকের হৃদয়ে আনন্দধারা বর্ষণ করিতেন। আবার সেই সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও তাৎকালিক প্রেমভক্তি বিষয়ক

কবিতাময়ী রচনার আবশ্যকতা স্পষ্ট অনুভূত হয়। এই সময়ে অর্থাৎ চৈতন্য-দেবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে—শোচনীয় ধর্ম্ম-বিপ্লবে বঙ্গভূমি জর্জ্জরিত হইতেছিল, তান্ত্রিকগণের পাশবাচারে, "পঞ্চমকারের" ব্যভিচারে, জাতিভেদের কঠোরতায় বিপ্লুত হইতেছিল, প্রেমভক্তির অভাবে মানব-হৃদয় পাষাণ সদৃশ হইয়াছিল। সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনেই এই সকল বৈষ্ণবগণের অমৃতময়ী কবিতারশ্মি দশ-দিক আলোকিত করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ের অন্ধকার দুর করিয়া ভক্তিরসে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিল। এই দুরন্ত যবনাধিকারকালে, সামাজিক ঈদৃশ বিপ্লবে এই ভক্তিরসাত্মক গীতি কাব্যই যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা তৎ-সাময়িক মহাপুরুষেরা অবগত ছিলেন বলিয়াই তাঁহাবা এই সকল গীতি-কাব্যের প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মকে এক অভূতপূর্ব্ব রসভাণ্ডার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে কুলীনগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গুণরাজ খাঁ (কায়স্থ) শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য এবং কাঞ্চনপল্লী নিবাসী কবি কর্ণপুর প্রণীত চৈতন্যলীলা ও ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবন দাস প্রণীত চৈতন্য ভাগবত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্য চরিতামৃত বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে প্রবেশ করে। এই সকল গ্রন্থও পদ্যে লিখিত। ইহাতেও অনেক হিন্দি ও পারস্য শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে বাঙ্গালায় পাঠানেরা রাজত্ব করিতেন; এই পাঠান রাজত্ব কালেই আরব্য ও পারস্য শব্দ সকল বঙ্গ ভাষায় প্রবেশ লাভ করে এবং "চৈতন্য-চরিতামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থে বাঙ্গালা ভাষার হিন্দি ভাব, হিন্দি শব্দ অনেকাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত ও বর্ত্ত-মান আকারের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। ফলতঃ এই চৈতন্য চরিতামৃতের পর হইতেই বাঙ্গালা ভাষার মধ্যাবস্থার সুত্রপাত।

চৈতন্য চরিতামৃত প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী; সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত অনেক শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি চৈতন্য চরিতামৃতের এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥

আজিও পূর্ব্ববঙ্গে যাইমু, খাইমু, প্রভৃতি ক্রিয়ার শেষে "ম" সংযোগ করার প্রথা আছে।

এই সময়ে বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঘোরতর বিদ্বেষ চলিতে থাকে, এই সময়ে অনেকেই শাক্ত মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়-ভুক্ত হয়, সুতরাং শাক্তেরা শক্তি মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য শক্তিবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সময়েই "মুকুন্দরাম চক্র-বর্ত্তী" "চণ্ডী" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মুকুন্দরামের জন্মস্থান দামুন্যাগ্রাম। কিন্তু তিনি মুসলমান অত্যাচারে জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী আড়রা গ্রামে গমন করিয়া তত্রত্য রাজা রঘুনাথ রায়ের আশ্রয়ে বাস করেন এবং তাঁহার আদেশে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি এই চণ্ডী কাব্য লিখিয়াই "কবি-কঙ্কণ" উপাধি প্রাপ্ত হন, এই জন্যই

আজিও তাঁহার গ্রন্থকে লোকে "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" বলিয়া থাকে। "চণ্ডী"র রচনা বর্ত্তমান ভাষার অনেক নিকটবর্ত্তী, ইহাতে পারস্য বা হিন্দি শব্দের ব্যবহার অনেক কম আছে। রচনা সরল ও প্রাঞ্জল, ইহার রচনায় তৎকাল প্রচলিত সামাজিক প্রথার পূর্ণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ;—

"বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে।
কেহ জল দেয় কেহ চরণ পাখালে॥
আহড়ে থাকিয়া রম্ভা জামাতা নেহালে।
আইও সুয়ো আনিতে বিজয়া দাসী চলে।
এক চক্ষু কোণে কেহ দিয়াছে অঞ্জন।
এক কর্ণে কর্ণফুল ত্বরায় গমন॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

সামাজিক প্রথা ও রুচির পরিবর্ত্তনানুযায়ী ভাষার রচনা-প্রণালীও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ; সুতরাং চণ্ডীকাব্য ও তৎসমসাময়িক কৃত্তিবাস এবং পরবর্ত্তী কাশীরামদাসের রচনার সহিত বর্ত্তমানে প্রচলিত গ্রন্থের রচনায় রূপবর্ণনাদিতে অনেক পার্থক্য দেখা যায় ; কালবশে, রুচিভেদই ইহার কারণ। কাশীদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতির ও বর্ত্তমান কবি নবীনচন্দ্রের রূপ বর্ণনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

খঞ্জন গঞ্জন আঁখি, অকলঙ্ক শশীমুখী
কিবা দিব রূপের উপমা।
সুচারু নিতম্ব সাজে, চরণে পঙ্কজ রাজে,
মণিময় কাঞ্চন নুপূর
জিনিয়া কুঞ্জর কুম্ভ, কুচ যুগ করে দম্ভ
কেবা দিতে পারে উপমান।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখ রুচি কত শুচী করিয়াছে শোভা॥

কাশীরাম দাস।

ভারতচন্দ্রের রচনাতে ও রূপবর্ণনাদিতে এই প্রকার উপমা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ত্তমান কবিগণের বর্ণনায় উক্ত প্রকার উপমা অতি বিরল। নবীন বাবু উত্তরার রূপ বর্ণনে লিখিয়াছেন—

"ক্ষুদ্র এক খণ্ড ফুল্ল নিরমল,
বৈশাখী জ্যোৎস্না অমৃতে ভরি,
সৃজিলেন বিধি মূর্ত্তি উত্তরার,
আনন্দ নির্ঝর নয়ন তারা,
আনন্দ নির্ঝর ক্ষুদ্র রক্তাধর
ঢালে অবিরল আনন্দ ধারা।

কুরুক্ষেত্র কাব্য।

পুরাকালীন কবিগণ গ্রন্থের প্রারম্ভে দেবদেবীর বন্দনাদি করিয়া গ্রন্থ সূচনা করিতেন এবং গ্রন্থ মধ্যে আত্মপরিচয় ও প্রণয়নের কাল নির্দ্দেশ করিতেন। বর্ত্তমান কাব্যাদিতে আর সে সকল দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ সামাজিক প্রথা ও রুচির পরিবর্ত্তনে যে রচনার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা নিশ্চয়।

বঙ্গভাষায় রামায়ণ-প্রণেতা কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিকঙ্কণের সমসাময়িক। মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্য প্রণয়নের সময় নির্দ্দেশার্থ স্বয়ং লিখিয়াছেন ;—

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, চণ্ডীকাব্য ১৪৯৯ শকে অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত।* কৃত্তিবাস পণ্ডিত,

জাতিতে ব্রাহ্মণ-; ইনি পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসী রাজা বেদানুজের সভাসদ্ নৃসিংহ ওঝার বৃদ্ধ প্রপৌত্র। ইনি নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী ফুলিয়া গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন; কৃত্তিবাস স্বীয় জন্মভূমি ফুলিয়াকে "স্থানের প্রধান" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "ফুলিয়া" গ্রামকে কৌলিন্য মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ "মেল" বলিয়া দেবীবর ঘটক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, যখন কৃত্তিবাস রামায়ণ প্রণয়ন করেন,তখন দেবীবর ঘটকের "মেলবন্ধন" হইয়াছে। কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের এক স্থলে লিখিয়াছেন ;—

"স্থানের প্রধান্ সেই ফুলিয়া নিবাস।
রামায়ণ গায় দ্বিজ মনে অভিলাষ"॥

বর্ত্তমান সময়ের শ তিনশত বৎসরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে "মেলবন্ধন" হইয়াছে। সুতরাং মেলবন্ধনের কিঞ্চিৎ পরেই কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ-রচনার সময় নির্দ্দেশ করিতে হয়। ইনি চৈতন্যদেবের তিরোভাবের প্রায় ৪০ বৎসর পরে রামায়ণ রচনা করেন, সে সময়ে নবদ্বীপ যে মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার রামায়ণের একস্থলে উক্ত রহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—

"গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হইয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া॥"

কথিত আছে ইনি ও ইহার ন্যূনাধিক শতবর্ষ পরবর্ত্তী কাশীরাম দাস (কায়স্থ) কথকের কথকতা শুনিয়া রামায়ণ ও মহাভারত প্রণয়ন করেন। রামায়ণের রচনা অপেক্ষা মহাভারতের রচনা অনেক মার্জ্জিত এবং শব্দ বিন্যাস, বর্ণনা ও অলঙ্কারাদিতেও প্রথমোক্ত অপেক্ষা শেষোক্ত অনেকাংশে উৎকৃষ্ট; ফলতঃ এই কাশীদাস হইতে বঙ্গভাষা পরিমার্জ্জিত হইয়া, সুপ্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্রের হস্তে পরিপুষ্ট ও অলঙ্কৃত হইয়া বর্ত্তমান আকারে উপস্থিত হইয়াছে। কাশীদাস কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী সিঙ্গী নামক গ্রামবাসী।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পাঠানেরা ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দেই প্রথম পানিপথ যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী মোগলের প্রতি সুপ্রসন্ন হন। আদি কবি বিদ্যাপতি হইতে "চৈতন্য চরিতামৃত" প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজকে আমরা পাঠান রাজত্বে দেখিতে পাই। চৈতন্য চরিতামৃত পর্য্যন্ত বঙ্গ সাহিত্যের আদিম অবস্থা অর্থাৎ পাঠান শাসনকালেই বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিম অবস্থা, কবিকঙ্কণ হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ মোগল রাজত্বে ইহার মধ্যাবস্থা এবং ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে "অন্নদামঙ্গল" হইতে অর্থাৎ ইংরাজ রাজত্বে ইহার বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার প্রথম গ্রন্থ "অন্নদামঙ্গল"। রচনা সরল, সুললিত এবং নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। ইহাতে পার্সী ও আরবি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু সংস্কৃত মূলক শব্দই অধিক। ভারতচন্দ্র রায় ইহার প্রণেতা। ইনি কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। বৰ্দ্ধমানের অন্তঃপাতী "পেঁড়ো" গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান; বৰ্দ্ধমানাধিপতির অত্যাচারে তথা হইতে পলায়ন করিয়া কাব্যরসামোদী, গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে বাস করিয়া তাঁহারই আদেশে "অন্নদামঙ্গল"

"বিদ্যাসুন্দর," "চোরপঞ্চাশৎ" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল রচনায় প্রসাদ গুণ ছন্দের পারিপাট্য, বাক্যের মাধুর্য্য, ভাব ও রসের অবতারণ অতীব উৎকৃষ্ট। "অন্নদামঙ্গল" প্রণয়নের সময় নির্দ্দেশ করিয়া কবি একস্থানে এইরূপ লিখিতেছেন,—

"বেদে লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥"

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ব্যতীত রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচিত সংস্কৃত-বাঙ্গালা-হিন্দি-পারস্য মিশ্রিত অনেক কবিতা আছে; নিম্নে একটী উদ্ধৃত হইল।

"শ্যাম হিতে প্রাণেশ্বর,
বায়দকে গোয়াদ্ কবর্
কাতর দেখে আদর কর,
কাঁহে মর্‌বো রোয়কে।
বক্তুং বেদং চন্দ্রমা,
ছুঁলানা চে মেরা
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা,
মেটিমে কাঁহে শোয়কে॥

ভারতচন্দ্রের "পাদপূরণের" আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার সভাসদেরা আমোদ করিয়া কবিকে নানা প্রকার বাক্যাংশ দিয়া অবশিষ্ট "পাদপূরণ" করিতে কহিতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অদ্ভুত শক্তিবলে অবিশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া কবিতা প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এরূপ কবিতা অনেক আছে, তন্মধ্যে নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

একদিন মহারাজ কবিকে কহিলেন— "পায়, পায় পায় না" কবি তৎক্ষণাৎ কবিতা রচনা করিলেন,—

"গেল সকল সম্পদ, এক্ষণে পরম পদ
বাকী আছে এক পদ ঋণ শোধ যায় না।
হ্বাদে শুনি হৃদিপ্রিয়ে, বৃন্দা দেবী দৈথসিয়ে
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে "পায় পায় পায় না"॥

কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কিঞ্চিদধিক আড়াই শত বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও উভয়ের বর্ণনা ও রচনা প্রণালীতে অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কালক্রমে ভাষা পরিমার্জ্জিত ও উন্নত হওয়ায় অবশ্য ভারতের ভাষা কবিকঙ্কণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও ছন্দ, ভাব, অলঙ্কার, অনুপ্রাসাদিতে উভয়ের সাদৃশ্য দর্শনে বোধ হয় যে "অন্নদামঙ্গল" চণ্ডী কাব্যের অনুকরণে লিখিত। উভয় গ্রন্থই শক্তিবিষয়ক। উভয়ের রচনার স্থান বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, তাহাতে উভয়ের ছন্দ, অনুপ্রাস ও ভাবের সাদৃশ্য স্পষ্টই প্রমাণ হইবে—

যখন ভগবতী সামান্যা রমণীবেশে ব্যাধপত্নী ফুল্লরার নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তখন কবিকঙ্কণ লিখিতেছেন।

"বন্দ্যবংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল।
সাত সতা গৃহে বাস বিষম জঞ্জাল॥
কি কব দুঃখের কথা, গঙ্গা নামে মোর সতা
স্বামী যারে ধরেন মস্তকে।
বরঞ্চ গরল খায়, মোর পানে নাহি চায়
ভবন ছাড়িনু এই দুঃখে॥
বিষ কণ্ঠ্য মোর স্বামী, সহিতে না পারি আমি
তাহে হইল সতিনী প্রবলা।
সতীনের বাক্য জ্বালা, কতবা সহিবে বালা
পরিতাপে হয়ে গেনু কালা॥

পাটনীর নিকট অন্নদার আত্ম-পরিচয় স্থলে ভারতচন্দ্র ঠিক সেই ভাবে লিখিলেন।

"গোত্রের প্রধান পিতা মুখ বংশ জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশ খ্যাত॥

কুকথায় পঞ্চ মুখ কণ্ঠ ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥

কবিকঙ্কণ একস্থলে তোটক ছন্দে লিখিয়াছেন—

"দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ"

ভারতচন্দ্রও সেই ছন্দে লিখিলেন,—

"পণে জাতি কেবা চায়,পণে জাতি কেবা চায়
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায়।"

চণ্ডীর একস্থলে এইরূপ অনুপ্রাস আছে,—

পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন।
তুলা, তনু, তাপ, তৈল, তাম্বুল তপন॥

আবার ভারতের অনুপ্রাস,—

চেতরে, চেতরে চিত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥

ক্রমশঃ—

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত রঘুনাথ গোস্বামীর জীবন চরিত।

প্রতিবাদের উত্তর।

বিগত মাঘ মাসের "সমীরণে" শ্রীযুক্ত বাবু অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় মৎ-প্রণীত শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত গ্রন্থের কএকটী ভ্রম প্রমাদের উল্লেখ করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অচ্যুত বাবুর এই প্রতিবাদ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সমীরণেই প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য, এই বিবেচনায়, এই প্রবন্ধটী প্রেরিত হইল। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সমীরণে প্রকাশিত করিলে কৃতার্থ হইব।

১। অচ্যুত বাবুর প্রথম আপত্তি এই যে, "রঘুনাথের জীবনকাল প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম—নীলাচল-বাস পর্য্যন্ত পূর্ব্ব জীবন; ২য়—বৃন্দাবনবাস—দেহত্যাগ পর্য্যন্ত শেষ জীবন। আলোচ্য পুস্তিকায় গোস্বামীর পূর্ব্বজীবন বর্ণিত হইয়াছে, শেষ জীবনের কোন কাহিনী এ পুস্তকে বিবৃত হয় নাই।" বোধ হয় অচ্যুত বাবু আমার গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই। গ্রন্থের ২৫ ও ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "রঘুনাথ বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড-তীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠাসহকারে অতি দুঃসাধ্য তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। * * বৃন্দাবনে আসিয়া রঘুনাথ অন্নজল ত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবল যৎসামান্য মাঠা (ঘোল) মাত্র পান করিয়া জীবনধারণ করিতেন। রঘুনাথ প্রতি দিন তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে স্নানান্তে ব্রজবাসিগণকে আলিঙ্গন করিতেন। প্রত্যহ একলক্ষ হরিনাম জপ, সহস্র বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করা ও এক প্রহরকাল শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক

গুণচরিত্র আলাপন এবং অবশিষ্ট সময় রাধাকৃষ্ণের ধ্যানধারণা মানসপূজায় অতিবাহিত করা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। ইত্যাদি। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থই মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণের লীলা সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ। শ্রীচরিতামৃত অবলম্বন করিয়াই আমি এই সকল বৃত্তান্ত সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করিয়াছি। বৃন্দাবন বাস সময়ে দাস গোস্বামীর সম্বন্ধে ২।৪টী অলোকিক গল্প বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে; বর্ত্তমান সময়ের অনুপযোগী বিবেচনায় আমি তাহার উল্লেখ করি নাই।* অচ্যুত বাবু যদি আমার গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সত্যের অপলাপ করিয়া "শেষ জীবনের কোন কাহিনী এ পুস্তকে বিবৃত হয় নাই" এই কথা কিরূপে লিখিলেন বুঝিতে পারিলাম না। তিনি যে জানিয়া শুনিয়া পাঠকদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। এই জন্যই বলিতেছি অচ্যুত বাবু আমার গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই।

আমার দ্বিতীয় অপরাধ আমি পরম ভাগবত প্রসিদ্ধ যবন হরিদাসকে "যবনকুলোদ্ভব" লিখিয়াছি। অচ্যুত বাবু বলিতেছেন, "কিন্তু হরিদাসের জন্ম সম্বন্ধে সংশয় আছে। কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত যে, হরিদাসের পিতা ব্রাহ্মণ ছিলেন। * * বস্তুতঃ হরিদাস ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তান। * * যখন এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে, তখন স্পষ্টাক্ষরে "যবন সন্তান" বলা যুক্তিযুক্ত কি?" যদি "মতদ্বৈধ"ই আছে, তবে অচ্যুত বাবুই বা কিরূপে "বস্তুতঃ হরিদাস ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তান" বলিতে পারেন? কোন্ কোন্ প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে হরিদাসের পিতামাতার বিবরণ লিখিত আছে, অচ্যুত বাবুর তাহা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য ছিল। প্রসঙ্গত অচ্যুত বাবুকে একটী কথা বলি, সংস্কৃত শ্লোক মাত্রই যেমন ঋষিবাক্য নয়, সেইরূপ পয়ার বা ত্রিপদীচ্ছন্দে রচিত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ মাত্রই প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থ নহে। বিগত মার্চ্চ মাসের "দাসী" পত্রিকায় আমি অচ্যুত বাবুর একটী প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচরিতামৃত, এই দুই খানি, সর্ব্বজন সমাদৃত প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, হরিদাস যবনকুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশেষ

---

* পাঠকগণ হয় ত অবগত নহেন যে, অচ্যুত বাবুও একখানি রঘুনাথ চরিত লিখিয়াছেন। আমার গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পূর্ব্বে অচ্যুত বাবুর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অচ্যুত বাবু স্বীয় গ্রন্থে একটী অলোকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী—"আর একদিন দাস গোস্বামীর অজীর্ণ হইয়া শরীর ভার ভার হইল, ইহা শুনিয়া প্রসিদ্ধ বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিট্‌ঠল নাথ দুইজন চিকিৎসক লইয়া আসিলেন। নাড়ী দেখিয়া চিকিৎসক কহিলেন যে, দুগ্ধান্ন ভক্ষণেই এইরূপ হইয়াছে। সকলেই জানেন—দাস গোস্বামী অন্ন খান না, অতএব এই কথায় বিট্‌ঠল নাথ বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"এ কখনই হইতে পারে না।" দাস গোস্বামী হাসিয়া বলিলেন, "এইই সত্য—আমি মানসে দুগ্ধান্ন প্রসাদ খাইয়াছি।" "এতৎ বিবরণ শ্রবণে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।" এই জ্ঞানোজ্জ্বলযুগে এরূপ "আষাঢ়ে গল্প" অবলম্বনে মহাপুরুষদিগের মাহাত্ম্য প্রচার বা ঐতিহাসিক তত্ত্বোদ্ভেদের চেষ্টা করা কতদূর সঙ্গত, বুদ্ধিমান্ পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

জিজ্ঞাসুগণ "দাসীর" উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিবেন। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে এসম্বন্ধে অধিক কিছু লিখিত হইল না।

৩। অচ্যুত বাবু বলিতেছেন, "রঘুনাথের পিতা যে পুত্রের প্রেমোন্মাদকে "বায়ুরোগ" করিয়াছিলেন ও চিকিৎসক ডাকিতে পরামর্শ করা হইয়াছিল, তাহা কোথাও শুনি নাই, অঘোর বাবু শুনাইলেন।" আমার পুস্তকে আছে, "রঘুনাথের প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসকে বায়ুরোগের লক্ষণ মনে করিয়া আত্মীয়গণ চিকিৎসক ডাকিতে পরামর্শ দিলেন।" কিন্তু অচ্যুত বাবু কোটেশন চিহ্ন দিয়া উদ্ধৃত করিতেছেন, "রঘুনাথের পিতা * * রঘুনাথের প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসকে বায়ুরোগের লক্ষণ মনে করিয়া আত্মীয়গণকে চিকিৎসক ডাকিতে পরামর্শ দিলেন" প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বে এই অংশটা ভাগ করিয়া পড়া উচিত ছিল। তিনি যদি 'ধান' শুনিতে 'কাণ' শুনেন, সে দোষ কি আমার? আমরা কি ইহাই মনে করিব যে, অচ্যুত বাবু আমার পুস্তক মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করা আবশ্যক মনে করেন নাই, কিন্তু অসাধারণ প্রতিবাদকণ্ডূতীর বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন? রঘুনাথের প্রেমবিকার দর্শনে আত্মীয়গণের বায়ুরোগ মনে করা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। মহাপ্রভুর প্রেমোন্মত্ততা দর্শনে অনেকে বায়ুরোগ মনে করিয়া শচীমাতাকে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অচ্যুত বাবু আবার বলিয়াছেন, "ভক্তমালায় লিখিত আছে বটে [শেষে রজ্জু দিয়া হস্ত রাখিল বান্ধিয়া] কিন্তু চরিতামৃতে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই।" অচ্যুত বাবু কি চরিতামৃত পাঠ করেন নাই? এই দেখুন,—

"বার বার পলায় তিঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তারে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে॥"

অচ্যুত বাবুকে বলি, আর প্রমাণ চাই কি?

৪। লেখক মহাশয়ের আর একটী আপত্তি, "শ্রীগৌরাঙ্গের সহ রঘুর মিলন গ্রন্থকার চরিতামৃতে যেমন দুই স্থলে পাইয়াছেন, তেমনই গল্প করিয়া লইয়াছেন; গুছাইয়া—মিলাইয়া দেখেন নাই তাহা হইলে মহাপ্রভুর সহিত দুইবার মিলনের কথা লিখিতেন না। নীলাচল গমনের পূর্ব্বে মহাপ্রভুর সহিত রঘুনাথের একবার মাত্র মিলন হয়।" শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্য খণ্ডের ষোড়শ পরিচ্ছেদ শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত রঘুনাথের শান্তিপুরে দুই বার মিলনের কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কেবল দ্বিতীয় বার মিলনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। আমি "গুছাইয়া—মিলাইয়া" দেখিয়াছি,—অচ্যুত বাবুই দেখেন নাই। অচ্যুত বাবু যে রঘুনাথ চরিত লিখিয়াছেন, তাহাতে ভ্রম বশতঃ প্রথম বারের মিলনের কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজও তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারেন নাই; অধিকন্তু অন্যের ভ্রম সংশোধনে অগ্রসর হইয়াছেন। নিজে অন্ধ হইয়া অন্যকে পথ দেখাইবার চেষ্টা অতি অদ্ভুত সন্দেহ নাই। অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন "শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরে যখন শান্তিপুরে আসেন, সমস্ত ভক্তগণ তখন বিহ্বল; সে সময় রঘুনাথ শান্তিপুর আগমন

করেন নাই।" ভক্তগণ বিহ্বল হইলে রঘুনাথকে যে, শান্তিপুরে আসিতে নাই, ইহা অদ্ভুত ও অকাট্য যুক্তি বটে!! যাহা হউক, শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে।

"সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস।
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা।
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু পাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া॥
* * * *
প্রভু তারে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল।
তিঁহো ঘরে আসি হৈলা প্রেমেতে পাগল
* * * *
একাদশ জন তারে রাখে নিরন্তর।
নীলাচলে যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর॥
এবে যদি মহা প্রভু শান্তিপুর আইলা।
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা॥
আজ্ঞা দেহ যাইয়া দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন॥
শুনি তার পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইল তারে শীঘ্র আসিহ কহিয়া॥
সাত দিন শান্তিপুরে প্রভু সঙ্গে রহে।
রাত্রি দিবসে এই মন কথা কহে॥ইত্যাদি

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যখণ্ড, ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আশা করি অতঃপর অচ্যুত বাবু নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

৫। আমি লিখিয়াছি, "রঘুনাথ গৃহে আসিয়া গৌরাঙ্গের উপদেশানুরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন; * * পিতা মনে করিলেন, রঘুনাথের ধর্ম্মানুরাগ হ্রাস হইয়াছে; আর তাহাকে প্রহরি-বেষ্টিত করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। ইত্যাদি" অচ্যুত বাবু বলেন, "এই কথা নিতান্ত আনুমানিক। প্রহরীদের হাত হইতে রঘুনাথ মুক্ত হইয়াছিলেন, একথা আমরা কোথাও পাই নাই;" ইহা আনুমানিক নহে, সম্পূর্ণ প্রামাণিক। যথা—

"এত কহি মহাপ্রভু তারে বিদায় দিল।
ঘরে আসি মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল॥
বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা সকল ছাড়িয়া।
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা॥
দেখি তার পিতা, বড় সুখ পাইল।
তাহার আচরণ কিছু শিথিল হইল॥"

শ্রীচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড।

"মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হৈলা বিষয়ী প্রায়॥
ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্ব্বকর্ম্ম।
দেখিয়াত মাতা পিতার আনন্দিত মন॥"

ঐ অন্ত্য খণ্ড।

রঘুনাথ বিষয় কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন দেখিয়া পিতামাতা আনন্দিত হইয়া পুত্রকে কয়েদীর ন্যায় প্রহরিবেষ্টিত করিয়া রাখা আবশ্যক মনে করিলেন না; ইহাই ত উপরি-উদ্ধৃত পয়ারের সরল ও সহজ অর্থ। অচ্যুত বাবুর আর একটী কথা, "রঘু বাহ্য বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই কি বাতুলতা ত্যাগ করা যায়?" অচ্যুত বাবুত স্বীয় গ্রন্থেই লিখিয়াছেন, "রঘুনাথ মনের ভাবোচ্ছাস গোপন রাখাতে পিতা মাতা পুত্রের আর তেমন উন্মাদভাব নাই দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন।" তবে আর আমাকে আক্রমণ কেন?

৬। অচ্যুত বাবুর আর একটী আপত্তি, "চৈতন্য চরিতামৃতে আছে—একদা রাত্রিযোগে প্রহরীরা নিদ্রিত হইলে রঘুনাথ পলাইয়া যান। * * নিষ্প্রয়োজন বোধে যে প্রহরীদিগকে

পূর্ব্বে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল, এখন তাহারা কোথা হইতে সমুদিত হইল? গ্রন্থকারের বলা উচিত ছিল।" এ সম্বন্ধে যথেষ্টই বলা হইয়াছে। আমার গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, পাণিহাটী হইতে "গৃহপ্রত্যাগমনের পরে রঘুনাথ আর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন নাই, বহির্বাটীতে দুর্গামণ্ডপে প্রহরি বেষ্টিত হইয়া শয়ন করিতেন।" অচ্যুত বাবুর গ্রন্থের এই অংশটা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে, এই কথাটার প্রতিবাদ করা আবশ্যক মনে করিতেন।

৭। অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন, "অঘোর বাবুর আর একটী ভ্রম—কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তিনি রঘুনাথের "মন্ত্রশিষ্য" বলেন।" কবিরাজ গোস্বামী যে রঘুনাথের শিষ্য, ইহা বৈষ্ণবসমাজের একটী প্রসিদ্ধ কথা অচ্যুত বাবুও তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "রাধাকুণ্ড বাসে দাস গোস্বামীর একজন অতি অন্তরঙ্গ সঙ্গী ও শিষ্য ছিলেন—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।" (৪৩ পৃষ্ঠা)। প্রেমবিলাসেও লিখিত আছে, "কবিরাজ শিষ্য রহিলেন যার কাছে, ফলতঃ এবিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে, অচ্যুত বাবুও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু ইত্যাদি গুরুতত্ত্বের মীমাংসায় আমি প্রবৃত্ত হই নাই, বৈষ্ণব সমাজের সাধারণ চলিত কথাই লিখিয়াছি। পরন্তু চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের ২০শ পরিচ্ছেদের "শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীগুরু শ্রীজীব চরণ।" তথা শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীব চরণ" ইত্যাদি স্থলে "শ্রীগুরু শব্দ রঘুনাথ দাসের বিশেষণ কি না বিবেচ্য। যাহা হউক, লেখক মহাশয়ও এবিষয়ের কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু স্বীয় গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় বলিয়াছেন, "আবার অনেকেই দাস-গোস্বামীকেই কবিরাজের দীক্ষাগুরু নির্দ্দেশ করেন।"

৮। অচ্যুত বাবু দাস গোস্বামীর গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ১৭৭১ শকের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" "বৈষ্ণব সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রবন্ধে "গুণলেশশেখর" গ্রন্থ রঘুনাথ দাসের রচিত লিখিয়াছেন! ফলতঃ আমি এযাবৎ উক্ত গ্রন্থ পাঠ করি নাই। অক্ষয় বাবুর অনুসরণ করিয়াই আমি ইহা লিখিয়াছি।

৯। রঘুনাথের মৃত্যুকাল সম্বন্ধে অচ্যুত বাবু বলেন, অক্ষয় বাবুর মতে রঘুনাথ ১৫০৪ শকে দেহ ত্যাগ করেন। "সজ্জনতোষণী" পত্রিকায় কোন প্রাচীন বৈষ্ণব ভক্তের লিখিত একটী নোটে দাস গোস্বামীর অপ্রকট-কাল ১৫০৪ শক ধরিয়া লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা নির্ভরযোগ্য নহে ইত্যাদি।" অচ্যুত বাবুর মতে ১৫১৪ শক দাস গোস্বামীর অপ্রকটকাল। আমি উক্ত প্রাচীন বৈষ্ণব ভক্তের সিদ্ধান্ত অনুসারেই লিখিয়াছি, "কেহ কেহ বলেন, ১৫০৪ শকাব্দে রঘুনাথ বৃন্দাবনে প্রাণ ত্যাগ করেন।" অন্যের সিদ্ধান্তই প্রকটিত করিয়াছি, নিজের কোন মত বা কোন স্থির সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করি নাই। অচ্যুত বাবুও কোন স্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। ১৪১৫ শকে রঘুনাথ লীলা সংবরণ করেন, ইহা "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থের কোথায় আছে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য ছিল।

লেখক তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থের কোন স্থানে লিখিয়াছেন, "শ্রীমন্নিত্যানন্দগৃহিণী শ্রীশ্রীজাহ্নবী ঠাকুরাণী (তাঁহার দ্বিতীয় যাত্রাযও) বৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সে কিছু পরের কথা। তখন দাস গোস্বামীর শোচনীয় অবস্থা। * * * ঐ সময় ঈশ্বরীর সহিত তাঁহার মিলন হয়। আবার বলিতেছেন, "বলা বাহুল্য যে, দাস গোস্বামীর এই অভিলাষটা [শ্রীলোকনাথ, শ্রীজীব ও কৃষ্ণদাসের অগ্রে দেহ ত্যাগের অভিলাষ] অচিরেই পূর্ণ হইয়াছিল।" অচ্যুত বাবু জাহ্নবী দেবীর সহিত রঘুনাথের উপরি-উক্ত মিলন জাহ্নবী দেবীর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন-আগমনকালে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল মনে করিয়া রঘুনাথ ১৫১৪ শক পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন মনে করিয়াছিলেন, এইটী তাঁহার ভ্রম। এই যাত্রায় বৃন্দাবন প্রবেশকালে জাহ্নবীদেবী পরমেশ্বরী দাসকে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সমাগত প্রধান প্রধান ভক্তগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। * সুতরাং ইহা যে প্রথম বারের আগমন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। দ্বিতীয়বারের আগমন-বৃত্তান্ত ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত হয় নাই। যথা—

"শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর গমনাগমন।
বিস্তারিয়া এ সব বর্ণিব বিজ্ঞগণ॥
শ্রীঈশ্বরী ব্রজে পুন গমন প্রকার।
অনুরাগবল্লী আদি গ্রন্থেতে প্রচার॥"
ত্রয়োদশ তরঙ্গ।

অচ্যুত বাবু বলেন, "বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনীর কথা বৈষ্ণবগণ প্রামাণ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, সে মতে ১৫১৪ শকে চতুনবতি বর্ষকালে তিনি দেহ ত্যাগ করেন।" আবার তাঁহার গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় লিখিয়াছেন, "কর্ণানন্দে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দাস গোস্বামীর পরে কবিরাজ অন্তর্হিত হন। দ্বিতীয়তঃ ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থের বিশেষতঃ বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনীর সহিত এতন্মতের অনৈক্য নাই।" কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত আমার পিতৃতুল্য, ভক্তিভাজন শ্রীযুত হারাধন ভক্তিনিধি মহাশয় ১৩০০ সালের নব্যভারতে "বঙ্গের বৈষ্ণব কবি-শীর্ষক প্রবন্ধে কবিরাজের মৃত্যু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন," ভক্তিদিগ্‌দর্শনী তালিকায় দেখা যায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ১৪১৮ শকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৮৬ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৫০৪ শকের চান্দ্রাশ্বিন শুক্লপক্ষের দ্বাদশী দিবসে একটী আকস্মিক দুর্ঘটনা সংবাদে অত্যন্ত দুঃখের সহিত শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীমতী রাধাকুণ্ড তীরে গুপ্ত হইয়াছিলেন।" দাস গোস্বামীর পরে কবিরাজ গোস্বামীর অন্তর্দ্ধান এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত এবং অচ্যুত বাবুও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। দিগ্‌দর্শনীর কথা সত্য হইলে ১৫১৮ শকে অর্থাৎ কবিরাজ গোস্বামীর অপ্রকটের পরে দাস গোস্বামী অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? এই সকল জটিল তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমাকে আক্রমণ করা ভাল হইয়াছে কি?

উপসংহারে অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন, অঘোর বাবু সুলেখক, তাঁহার লেখার

---

* ১। ভক্তিরত্নাকর, একাদশ তরঙ্গ।
২। নরোত্তমবিলাসে, নবম বিলাস।

ভিতর ছিদ্র থাকা অনুচিত মনে করি। তাঁহার পুস্তক অনেকে পাঠ করিবে, * * তিনি ভ্রমগুলি শোধন করিয়া লইবেন উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাবটী লিখিত হইল।” অচ্যুত বাবুর এই সহৃদয়তার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। কিন্তু অনর্থক কয়েকটী কথার প্রতিবাদ করায় দুঃখিত হইয়া এই উত্তর লিখিলাম। অচ্যুত বাবুকে আমরা শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া জানি, অকারণ বাদ-প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া বৈষ্ণবতার বিরুদ্ধ।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কুটীরের মীমাংসা।

ইতিপূর্ব্বে আলোক ধর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। জ্যোতিঃ, জ্যোতিষ্মানের তাবৎ ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, আলোকের জন্য কারণ ও শাশ্বত, সৌন্দর্য্যময়, আনন্দ-পূর্ণ জীবনী শক্তি। জ্যোতিষ্মৎ ও তাহার প্রতিভা সমান ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, জ্যোতিষ্মতেই সেই সকল ধর্ম্মের উৎকর্ষ। সুতরাং শাশ্বত আলোকের, শাশ্বত উৎস, অনন্ত সৌন্দর্য্যময়, অনন্ত আনন্দপূর্ণ, অনন্ত জীবনীশক্তি। ইহাই বিশ্বের জন্য কারণ—ইহাই প্রথম বিকাশ ও সমস্ত পশ্চাৎ বিকাশের বীজবাহক। তবে ইহা আন্দোলন ত বটে, প্রক্ষেপণও বটে। তোমার জ্যোতিষ্মৎ পরমাণ!—বাস্তবিক কি তাহা জড়। বর্ত্তমান বিজ্ঞান তাহাদের জ্যামিতিক বিন্দু অপেক্ষা অধিক জড়ত্বে বিশ্বাস করে না। অণু—একরূপ চৈতন্য বিন্দুর, ব্যাপ্তির মাঝে বিস্তৃতি মাত্র।

তবে এ আন্দোলন কোথা হইতে? উচ্ছ্বাসিত, প্রোর্জ্জ্বল, অনন্ত দ্যুতিময় চৈতন্যাব্ধি! উত্তাল আন্দোলিত আনন্দ সংক্ষোভ! এই আনন্দ গর্জ্জনের ভিতর দিয়া কাল-ব্যাপ্তির উচ্চৈশ্রবা গভীর কেশর-সম্ভার লইয়া ভাসিয়া উঠে! অন্ধকার চামর জ্যোতির্বিদীর্ণ হয়। আধার কোন আবর্ত্ত সম্পুবক তর্যাঘাত হিল্লোলে ওই সাগরের ভিতর মুখ লুকাইয়া ডুবিতেছে! কম্পিত, ঘূর্ণিত, সংক্ষুব্ধ সাগর! সৃষ্টি—স্থিতি—প্রলয়ের আসন্নসত্তা আগ্নেয় তরঙ্গ উচ্ছ্বাস, আনন্দ আহারে পরস্পর প্রতিহত হইয়া ঝরিয়া পড়ে! কত মুমূর্ষু দিবসের অন্তিম নিশ্বাস, কত জায়মান বিশ্বের ভূয়িষ্ঠ মঙ্গল শশ্বৎ নিনাদ, নিনাদিত হয়। গতিময়—প্রীতিময়—পুণ্যময়—সাগর! অমর সঙ্গীত! অমরায় গর্ভাধান লইয়া থর থর কম্পিত! আর সেই খান হইতেই এই আকম্পন, এই আন্দোলন, এই বিশ্বের অন্তরাত্মার আবেগের চির-বর্দ্ধমান হিল্লোল, ছায়াপথে নক্ষত্র, জরায়ুর ভিতর এই নিগূঢ় কল্যাণের আগ্নেয় সমাচার, এই অন্ধ গ্রহ উপগ্রহে, নীরব, আমূলকম্পী আবেগে প্রতিহত হইতেছে। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি, ইহার অনন্তদৌত্য-যাত্রায়, অনেক গুরু বারতা রাখিয়া যাইবার স্থান। ইহার আনন্দ পদশব্দের পরশে, অগণ্য জ্যোতিষ্মৎ

হিল্লোল আকাশে আন্দোলিত হয়। এই সৌরবিশ্বে, এই আন্দোলিত ইথর কত ধূমকেতুর গায়ে রহস্যনিদেশ মাথাইয়া, আলোকের অগ্রসেনানীর মত, অন্ধকারের রাজ্য আবিষ্কার করিতে ছুটিতেছে! ইহা ঈশ্বরের অসীমতা; আলোকিতাই প্রক্ষিপ্ত সত্তা।

মহাচৈতন্যে ভাব সমুদ্র জাগবিত! জড় অস্ফুটভাব। প্রাণপূর্ণ অনন্তবিহগ, এই অস্ফুটভাব অন্ত পুঞ্জের উপর, আপনার হিরণ্ময় শফ বিস্তার করিয়া, তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে। যতদিনকার মৃত জড় তত সাড়া দিয়া উঠে! আপনার অভিব্যক্তি শৃঙ্খলার অনুসারে।

শাশ্বতে আনন্দে, আনন্দভাব উদ্ভূত! এই আনন্দময় সত্তার ভাব কোন অভাবের জন্য নহে। এভাব আপনার অনন্ত আনন্দ সৌন্দর্য্যের পূর্ণতার উচ্ছ্বাস। এই অনাদি আনন্দের (মহাচৈতন্যের) অতিরিক্ত কিছুই নাই বলিয়া, তাঁহার ভাবের উচ্ছ্বাস—এ জগৎ। ভাবের অস্তিত্ব ভাবুকের ইচ্ছাসাপেক্ষ। জগৎ তাই নিত্যময়। ভাব ও ভাবুকের সমান চৈতন্যশীলত্ব হইতে পারে না। তাই জীবচৈতন্যে পরচৈতন্যে প্রভেদ আছে। ভাবের ব্যষ্টি অংশ Units of consciousness ভাবের সমষ্টির সহিত সমান চেতনাশীল হইতে পারে না। পরিমাণের কথা বলা হইতেছে না, গুণত্বই কেবল বিবক্ষিত।

আবার তোমার বিজ্ঞানের কথা। জড়—মৃত্যুহীন—এ জগৎ নিত্য।

আমাদের নিবেদন

সমানরূপ চৈতন্যশীলেরই জগৎ প্রতীয়মান হয়। সুতরাং যতক্ষণ বিভিন্ন ভাববত্তা, পরস্পরে সমান চেতনাশীল, ততক্ষণ তাহাদের পরস্পরের বিভিন্ন অস্তিত্ববোধ। অনন্তচৈতন্যের বুকে বিচরণ করিযা, যখন ভাবসত্তাবর্গ চৈতন্যের রাজ্যে অধিকতব বা অবিষমভাবে পরিস্ফুট হয়,—তখন আর এক অবস্থা। সকল ভাবসত্তা যুগপৎ সমানভাবে চৈতন্যস্ফুট হয় না। বিভিন্ন সত্তার সহিত ঈশ্বরের মনঃসংযোগের তারতম্যই বা আপনাব অভিব্যক্তিশৃঙ্খলাব অনুসৃতি ইহার কারণ। সুতরাং চৈতন্যের ন্যূনাধিক্যে, এক ভাবসত্তাব নিকট অপর ভাবসত্তার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়।

ভাবপুঞ্জ, ঈশ্বরেব পূর্ণ পবিত্রতা প্রসূত; সুতরাং পবিত্রতাই তাহাদের ধর্ম্ম। এ পৃথিবীর কথা ধরিলে জীবচৈতন্যই চৈতন্যের রাজ্যে (অনাদি আনন্দ উচ্ছ্বাসে) সর্ব্বাপেক্ষা পবিস্ফুট। সুতরাং তাহার অনেক প্রাগ্‌ভাব বা পূর্ব্বজন্ম স্মরণ হয় না। কারণ সমানরূপ চেতনাশীলেরই জগৎ প্রতীয়মান হয়।

জীবচৈতন্য প্রথম অবস্থায় স্বাতন্ত্র্যবোধ। শেষ অবস্থায় স্বাতন্ত্র্যবোধশূন্যতা। জীবচৈতন্য পূর্ণপবিত্র আনন্দের প্রসব। সুতরাং পূর্ণপবিত্রতা অনুসারে কার্য্য করা বা পূর্ণপবিত্রতা উপসর্পণ তাহার অবশ্যম্ভাবী সহজ ধর্ম্ম। অনন্ত আনন্দ চৈতন্যে স্ফুটতম হওয়াই তাহাদের নির্ব্বাণ।

আবার তোমার বিজ্ঞানের কথা।

জড় মৃত্যুহীন 'এ জগৎ নিত্য।

এ সৌর বিশ্বেরও গতি আছে। এ সূর্য্য, আপনার অনুবর্ত্তী গ্রহ উপগ্রহ লইয়া হাবকিউলিস্ নামক নক্ষত্রপুঞ্জের-দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। আজ সমস্ত পৃথিবীর মানুষ জ্যোতিস্মতের এপ্রচ্ছন্ন আলোকী অভিসার জানিতে পারিয়াছে। এ আকর্ষণ কাহার—কোন কেন্দ্রের! কোন পুরাণ পুরুষ আজ রাসলীলায় অভিনয়ী। এতদিনের পর স্থূল দৃষ্টিতে এ ধ্রুব জগৎ টলিল কেন?

আমবা বলিব পবমানন্দেব ভাবসত্তা-রূপ মনুষ, আজ অধিকতর চৈতন্যের রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে। তাই পূর্ব্বে যাহা শুধু যোগীর কাছে "জগৎ" ছিল, এখন তাহা সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধিতে জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান। মনুষ্যরূপ ভাব-সত্তার গতি বা চৈতন্য, জগৎরূপ ভাব-সত্তার গতি বা চৈতন্য অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। তাই "জগৎ" জগৎ বলিয়া অনুভূত।

এ বিশ্বছবি আবর্ত্তমান সত্যের হিল্লোল। এই মহাসত্য, সকল বিরোধা-লঙ্কারের পরিণাম-ভূমি। এই মায়ার ব্যবধানে, ভাবচৈতন্য, পূর্ণ চৈতন্যে পরিণত হয়। ইহার উদ্দেশ্য অজ্ঞেয়। অনুসন্ধানের বিষয় কেমন করিয়া, এই পরম জ্যোতি জীবাত্মায় প্রবেশ করে।

আমাদের উত্তর মনুষ্যহৃদয়ের ভিতব দিয়া। তুমি মনুষ্য মস্তিষ্ককে কেশানু-সূক্ষ্মতায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়াও, নির্ব্বি-কল্প জ্ঞানের (Sensation) গূঢ় রহস্য কিছু বুঝিতে পারিবে না। নির্ব্বিকল্প জ্ঞান ও মস্তিষ্কের পরস্পর কার্য্যকারি-তার মাঝে কোন অনিবার্য্য আইন স্থাপিত হইতে পারে না। আমরা এমন দেখাইতে পারিব উদ্ভিদের মস্তিষ্ক নাই, তবু তাহাদের অনুভূতি আছে। অনুভব শুধু মস্তিষ্ক বা স্নায়ুমণ্ডলীব অধীন না হইতে পারে। অনুভবশক্তি (Sensation) জীবেব সর্ব্বাঙ্গীণ। এমন কি ইহা শরীর-অনাপেক্ষী। জীবের দেহানুরূপ অনু-ভূতি হয় না। জীবের আপন শ্রেণীস্থ আবশ্যকীয় অনুভব অনুসারে শরীর গঠিত হয়। চৈতন্য—আপন অনুরূপ দেহ নির্ম্মাতা।

আমরা বলিব অনুভব (Sensation) দেহবদ্ধ ও বিশ্ববদ্ধ আলোকেব পরস্পর মিলন। ইহা উচ্চ দৈহিক ব্যাপার-স্তম্ভেও কার্য্যকর। বায়ুচঞ্চল, দীবা-শালী গ্রহের ন্যায়, জীবাত্মায়ও চৈতন্যের আবির্ভাব, তিরোভাব আছে। তুমি চৈতন্যের রাজ্যের অগোচর স্নায়বিক কম্পন, মনের অজ্ঞাতে মনের প্রচ্ছন্ন বিকার প্রভৃতি অনেক রকম মজার কথা বলিতে পার;—আমবা বলিব, জড় পরমাণুপুঞ্জের আণবিক অবকাশে যেমন আকাশ আছে, জীব চৈতন্যের রাজ্যের পর্য্যাণ্য ভূমের ধারেই, সেইরূপ চৈতন্য শূন্যতা বা অকার্য্যকারী চৈতন্যের রাজত্ব আছে। জীবচৈতন্যে বিশ্ব চৈতন্যের আবির্ভাব তিরোভাব হয় কেন?—আমবা বলিব হৃদয়েব জন্য।

প্রথমে দেখা যাউক, হৃদয়ের কার্য্য কি! হৃদয়, আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত রবির মত, একটী বিভিন্ন অধিকারের রাজ্য। এইখানে আমরা দেখিতে পাই, উপসর্পণ অপসর্পণ, প্রভৃতি জড়ধর্ম্ম ছাড়িয়া প্রেম ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে। সুখ দুঃখ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ পূর্ব্বে যাহা জড়জগতে কোথাও ছিল না,

তাহা ইহাতে আছে। পূর্ব্বের জড় এইখানে প্রাণ পায়, বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভিতর এইখানে এক নূতন সুষমা ফুটিযা উঠে। জড়সত্তা বিশ্বপ্রসূর ভাবসত্তা বলিয়া মনুষ্য হৃদয়ও বিশ্বপ্রসূর হৃদয়ের অভিমুখী আর একখানি concave দর্পণ। তাই জড়সত্তায় বিশ্বপ্রসূর হৃদয়ে যেরূপ প্রীতি, মনুষ্য হৃদয়েও সেইরূপ।

জড়জগতে অপসর্পণের পূর্ব্বে উপসর্পণ। মনুষ্য হৃদয়ে আগে ভালবাসা, তাহার পর ঘৃণা। ঘৃণা অর্থে করুণা। তোমায় এ সৌন্দর্য্যের জগতে সুন্দর করিয়া ফুটাইতে পারিলাম না বলিয়া আমার ক্ষোভ!—আমার জীবনের কর্ত্তব্যের কেন্দ্র হইতে বিপরীত গমন। আপনাকে পরিস্ফুট করাও জীবনের কর্ত্তব্য। কারণ ভাবসত্তার প্রত্যেক অংশ আপনার ধর্ম্মে ভাবুকের চৈতন্যে পরিণতির জন্য আকর্ষণবদ্ধ। ভালবাসা—প্রধানতম বৃত্তি। কেন না ইহা দয়া, সহিষ্ণুতা স্নেহ প্রভৃতির একমালি উপঢৌকন। প্রেম—মাধ্যাকর্ষণ। সৌন্দর্য্য—ইহাকে আপনার স্তন্যে পরিস্ফুট করে। তাই এ বিশ্বের যেখানে যত সুন্দর ভাব আছে, প্রাচীরের মত ইহার চারিধারে ঘেরিয়া রহিয়াছে। রবি—আপনার বুক খুলিয়া ইহার চোখের পলকে জ্যোতি ঢালিয়া দেয়। পূর্ণিমার নিশা ইহার সরল ছল ছল চাহনির মাঝে অমৃত বর্ষণ করে। সায়াহ্নের মেঘ ইহার আশে পাশে নন্দনের সংবাদ লইয়া আসে। বুদ্ধদেব যেদিন যূপকাষ্ঠে পড়িলেন, উঞ্ছবৃত্তি যে দিন ৪৮ দিন উপবাসের পর আপনার আর্দ্র বসন, অপরের শুষ্কমুখে দিয়া, প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিয়াছিল, সেই দিনের সেই অশ্রুর মাঝে ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মানুষের বহুপূর্ব্ব প্রাগ্‌ভাব জ্যোতিষ্মৎ নীহারিকা। মানুষের মনুষ্যত্ব এই সকল দিনের অশ্রুসম্পাত। বহুপূর্ব্বে, ইহারা বৈজ্ঞানিকের জড় নীহারিকা পুঞ্জ. আর একদিন পূর্ণাভিব্যক্ত এই অশ্রুসম্পাত, ঈশ্বরের চৈতন্যে চিরন্তন বসতির জন্য আনন্দ ছাড়পত্র।

হৃদয় আত্মার জানালা।

বিশ্ব কর্ত্তব্যের পদস্খলনের ভয়ে, বিশ্বের চারিদিকে আলোক জ্বালান আছে।

রবি তাই—বাস্তবিকই সৌন্দর্য্যচৈতন্যের ভাণ্ডার ঘর। ভাবচৈতন্য আপনার উপাদান কারণ হইতে পশ্চাৎপদ হয়, আপনার পৈতৃক অধিকার, সৌন্দর্য্যের রাজ্য হইতে নির্ব্বাসনের দুরদৃষ্ট পীড়িত হয়, আর অমনি এই গানসজ্জা, মানসজ্জা, প্রাণসজ্জা, সবিতার ভিতর হইতে পূর্ণতম রূপ তাহার নয়নের উপর পড়িযা যায়। অমনি সেই সৌন্দর্য্য-পুষ্ট চৈতন্য, সেই অমরার আপনার ঘর সেই নিরাপদ ক্রোড়, সেই আনন্দ অভিজ্ঞান সকলই জাগরূক হইয়া উঠে। সন্ধ্যার ঘন হিরণ্ময়, মেঘময় চন্দনচর্চ্চিত প্রাচীরের উপর দিয়া, এই বসন্তের বায়ু আন্দোলিত, কোকিল-কুহরিত—মধুমাস-কুসুমিত—জীবসত্তা, গৃহস্থের, যূথহারা, বসন্ত সমীরণের মত—ক্ষীণ চন্দ্রালোকের কাদম্বরী নিকুঞ্জের নীচু দিয়া দুলিতে দুলিতে,—অতিক্রান্ত সপ্তর্ষিমণ্ডল!—উচ্চে—উচ্চে—উচ্চতরে—ছায়াপথে—

নক্ষত্র শুক্তিকা গায়ের ভিতর দিয়া যেখান হইতে—এবিশ্বের রূপ, সেই পূর্ণতমরূপে হারাইয়া যায়!—সৌন্দর্য্য—নির্ব্বাণের মুক্ত কপাট। তোমরা এই আলো প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিও না। পাপ ঘৃণ্য পাপী ঘৃণ্য নহে। যাহারা মানুষের ধূমকেতু, যাহাদের সর্ব্বাঙ্গে জ্যোতি মাখা থাকিলেও কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই। জানিও তাহারা আবার অনন্ত সবিতায় ফিরিয়া আসিবে, অন্ধকারে নিভিয়া যাইবার জন্য পরমানন্দে কোন ভাবসত্তার উদ্রেক হয় নাই।

এই সকল যেমন করিয়া ঘটিয়া থাকে, তাহার যুক্তিমত ব্যাখ্যানই, এক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহা কোন দর্শন বিশেষের অনুগামী নহে। পৌর্ব্বকালীন কতকগুলি উপন্যাস (অলসা), কাব্য (অশ্রুসঙ্গমে), নাটকে (কৈফিয়ৎ), যে সত্য স্বপ্নভাবে উঠিয়াছিল তাহারই বিধিবদ্ধ পরিস্ফুটন—প্রয়াস।

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

৭। আণবিক ক্রিয়া।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এখন আমরা বস্তু সকলের রচনা প্রণালীর প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া অণুকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

পদার্থ দুই প্রকার যৌগিক ও রূঢ়ি। কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহা হইতে আমরা ভিন্ন পদার্থ বাহির করিতে পারি, তাহাদিগকে যৌগিক পদার্থ কহে। কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহা হইতে ভিন্ন পদার্থ বাহির করিতে পারি না, তাহাদিগকে রূঢ়ি পদার্থ বা ভূত কহে। জল যৌগিক বা সংহত পদার্থ, কারণ উহা হইতে আমরা অম্লজান ও উদজান বাহির করিতে পারি। অম্লজান রূঢ়িক পদার্থ, কেননা উহা হইতে অম্লজান ভিন্ন আর কিছুই বাহির করিতে পারি না। উদজানও ঐরূপ রূঢ়িক পদার্থ।

পূর্ব্বে ইউরোপে চারি প্রকার ভূত গণনা করিত; যথা, ক্ষিতি, অপ্, বায়ু ও বহ্নি। ভারতবর্ষে ব্যোমকে লইয়া পঞ্চভূত গণনা করিত। কিন্তু আমরা এখন আর ঐ প্রথম তিনকে ভূত বলিয়া গণনা করিতে পারি না, যেহেতু আমরা উহাদিগকে এখন বিয়োগ করিতে পারি। আর যে বহ্নি ও ব্যোম, উহারা ভারহীন তরল পদার্থ অর্থাৎ পদার্থই নহে; উহাদিগকে ভারবান্ পদার্থের সহিত সমসূত্রে ধরা উচিত নহে। কিন্তু এই যে পৌরাণিক পঞ্চভূতের মত, ইহা দ্বারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে বলিতে হইবে, যেহেতু ইহা যৌগিক ও রূঢ়িক পদার্থের মধ্যে ভিন্নতা স্থাপন করিয়াছিল। ইহার ভাবটা সত্য ছিল, যদিও

ইহার ছাঁচটায় অর্থাৎ ইহার আকারে ভ্রম ঘটিয়াছিল—অর্থাৎ ঐ পাঁচটী যে ভূত, সেই বিষয়ে ভ্রম হইয়াছিল।

আজিকার দিনে চৌষট্টিটি ভূত বা রূঢ়িক পদার্থ গণনা করা যায়; তাহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করে, ধাতু এবং উপধাতু। কিন্তু এমন লক্ষণ নাই, যাহাতে করিয়া ইহাদিগকে দ্বিখণ্ডিত করা যায়; উহাদিগের মধ্যে এমন পদার্থ আছে, যাহা উভয় শ্রেণীতেই বসে। তথাপি উপধাতুর মধ্যে সচরাচর পনেরটী রূঢ়িক পদার্থ গণ্য করে এবং ধাতুর মধ্যে উনপঞ্চাশটী রূঢ়িক পদার্থ ধরে।

প্রয়োজনীয় কতকগুলি রূঢ়িক পদার্থের তালিকা।

উপধাতু।

(১) অম্লজান (oxygen), (২) উদজান (Hydrogen); (৩) যবক্ষারজান (nitrogen); (৪) গন্ধক (sulphur); (৫) উপগন্ধক (selenium); (৬) অনুগন্ধক (Tellurium) (৭) হরিতন (chlorine); (৮) পূতীন (Bromine); (৯) রোহিতন Iodine); (১০) কাচান্তক (Fluorine); (১১) প্রস্ফুরক (Phosphorus); (১২) মনঃশিলা (Arsenic); (১৩) উপাঙ্গার (Boron); (১৪) শিলিক (Silicon) (১৫) অঙ্গার (carbon)

ধাতু।

(১) যাবক বা যবক্ষার ধাতু (Potassium); (২) কোবল্ট (Cobalt); (৩) অঞ্জন ধাতু (antimony); (৪) স্বর্ণ (Gold); (৫) সর্জ্জ (Sodium); (৬) সুধ বা কস্তুর (Calcium); (৭) নিকেল (Nickel); (৮) তাম্র (Copper); (৯) প্রবঙ্গ (Platinum); (১০) ম্যাগনিসিয়ম (Magnesium); (১১) রাং (Tin); ১২ লৌহ (Iron); (১৩) দস্তা বা যশদ (Zinc); (১৪) সীসক (Lead); (১৫) পারদ (Mercury); (১৬) স্ফট (Alluminum), (১৭) বর্ণক (Chromium); (১৮) বস্থমৎ (Bismuth) (১৯) রৌপ্য (Silver)

যুক্ত হইয়া এই সকল ভূত নানা প্রকার সংগত পদার্থ প্রস্তুত করে। ইহারা অম্লজানের সহিত অম্লী (oxide) প্রস্তুত করে; যেমন যবক্ষারের (পোটাসিয়ম) অম্লী যবানল বা যবিকা (পটাশ), সর্জ্জের (সোডিয়ম) সর্জ্জিকা (সোডা) কস্তুরের (কালসিয়ম) কস্তুবিকা বা চূর্ণ; যেমন লৌহের, সীসার, রৌপ্যের অম্লী ইত্যাদি।

গন্ধকের সহিত ইহারা গন্ধী (সলফাইড প্রস্তুত করে; যেমন লৌহের গন্ধী, রাঙের গন্ধী ইত্যাদি।

হরিতনের সহিত হরিতনী (ক্লোরাইড) যেমন যবক্ষারের (পটাসিয়ম) হরিতনী; সর্জ্জের (সোডিয়ম) হরিতনী, যাহা আহার্য্য লবণ; লৌহের হরিতনী, পারদের হরিতনী যাহা ক্যালোমেল; রৌপ্যের, সোণার, প্রবঙ্গের (প্লাটিন) হরিতনী ইত্যাদি। এইরূপ অনেক আছে।

ধাতু সকল যখন পরস্পর যুক্ত হয়, তাহাকে কলাই বলে। অম্ল বা দ্রাবক সকল অম্লীর (অক্সাইড) সহিত যুক্ত হইলে লবণ প্রস্তুত হয়—যথা যবক্ষারান্বিত

যবিকা (পটাসের নাইট্রেট) অর্থাৎ সোরা; যবক্ষারান্বিত সর্জ্জিকা বা সোডা; যবক্ষারান্বিত তাম্র যবক্ষারান্বিত রৌপ্য ইত্যাদি।

উদ্ভিদ্ পদার্থ, যাহা এত বিভিন্ন প্রকার, তাহা প্রায় কেবল অম্লজান, উদজান এবং অঙ্গার এই তিন ভূতের ভিন্ন পরিমাণ যোগে উৎপন্ন হয়। আর যত জান্তব পদার্থ, তাহারা এই তিন ব্যতীত যবক্ষারজানকেও ধারণ করে; এতদতিরিক্ত কখন বা গন্ধক, কখন বা প্রস্ফুরক, কখন বা চূণ, এবং অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে অন্যান্য ভূতও থাকে।

পূর্ব্বোক্ত সংগত পদার্থের মধ্যে যে সকল ভূত থাকে, তাহার প্রতি অণুতেও সেই সেই উপাদান ভূত থাকে। আমাদের আহার্য্য লবণের অণুতে হরিতন ও সর্জ্জ আছে; উদ্ভিদ সূত্রের অণুতে অম্লজান, উদজান ও অঙ্গার আছে; মাংসপেশীর সূত্রের অণুতে অম্লজান, উদজান, অঙ্গার এবং যবক্ষারজান আছে।

একাধিক ভৌতিক উপাদান, যাহার দ্বারা অণু রচিত হয়, তাহারা যে পরস্পরে সংলগ্ন অর্থাৎ পরস্পরকে যে একেবারে ছুঁইয়া থাকে তাহা নহে; প্রাকৃতিক বিদ্যাগত, রসায়ন বিদ্যাগত, দানা-(Crystal) বিদ্যাগত, জীবনীবিদ্যাগত যত কিছু ভূয়োদর্শন, সকলই প্রমাণ করে যে উহারা পরস্পর হইতে পৃথক্ এবং দূরে স্থিত।

তেমনি আবার যখন অসংখ্য অণু একত্রিত হইয়া অতি ক্ষুদ্র দৃশ্যমান রেণুকণা প্রস্তুত করে, সেই সকল অণু যে স্বয়ং নিজের কোন এক বা অপর বিন্দু দ্বারা স্পর্শ করিয়া আপনাদিগকে সন্নিবেশ করে তাহা নহে, কিন্তু উহারা সর্ব্বতোভাবে পৃথক এবং দূরে দূরে থাকে।

এখন, একটা বৃহৎ পদার্থেরও যেরূপ গঠন তাহার রেণুরও সেই একই গঠন; সুতরাং পদার্থেরা শেষ ফলে পরস্পর অসংস্পৃষ্ট অণুর সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং সেই অণুরা আবার পরস্পর অসংস্পৃষ্ট ভূতের সমষ্টিমাত্র।

আমরা সংগত পদার্থ এবং তাহাদের অণুদের বিষয় যাহা বলিলাম, স্ফাটিক পদার্থেও সর্ব্বতোভাবে তাহাই প্রযুজ্য; কারণ ইহাদের গঠন, উহাদের গঠন হইতে কোন বিশেষ লক্ষণ দ্বারা পরিচিহ্নিত হয় না; কেবল স্ফাটিক পদার্থের অণুতে অসবর্ণ এবং অসদৃশ ভূতের পরিবর্ত্তে সবর্ণ এবং সদৃশ ভূতের সংস্থান।

পদার্থ সমূহের এখন আমরা যে সকল গুণ দেখিতে পাই, তাহার কিছুই থাকিত না যদি উপকরণের ভূত সকল পরস্পরের উপর নির্ভর না করিত এবং সর্ব্বথা স্বতন্ত্র থাকিত; তাহা হইলে না কঠিন পদার্থ থাকিত, না তরল পদার্থই থাকিত, না বায়বীয় পদার্থই থাকিত; সমস্ত ভূমণ্ডল কেবল ধূলিরাশি হইয়া থাকিত—না তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বাঁধাবাঁধি থাকিত, না তাহাদের কোন আকার প্রকার থাকিত—কেবল এক স্থিতিরোধকতা দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বাধা দিতে থাকিত, এইমাত্র। অতএব জড় পদার্থের ভূত সকল পারস্পরিক ক্রিয়া দ্বারা সম্বদ্ধ। আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ শক্তি উহাদিগের মধ্যে অবিরত কার্য্য করিয়া উহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দূরে রাখিতেছে,

পদার্থদিগের আকার, গঠন ও প্রকৃতি নিরূপিত করিয়া দিতেছে। এই শক্তিদ্বয় আণবিক ক্রিয়া নামে খ্যাত।

কঠিন পদার্থ উত্তাপকে আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় এবং সেই সঙ্গে তাহার আয়তন বৃদ্ধি পায়; অতএব উহাদিগের অণু পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে না, কারণ, তাহা হইলে শীতল হইলে তাহারা পুনরায় সংকুচিত হইত না। তবে এই বলিতে হইবে যে প্রতি উত্তাপ-পরিমাণে উহারা আপনাদিগের আণবিক আকর্ষণ শক্তি দ্বারা এবং উহাদিগের মধ্যস্থিত সেই উত্তাপের বিকর্ষণী শক্তি দ্বারা (যাহা আয়তনকে ক্রমিকই বর্দ্ধন করিতে চাহে ও অণুদিগকে ক্রমাগতই দূরে লইয়া যাইতে চাহে) এক এক সামঞ্জস্যধারা প্রস্তুত করিয়া লয়। কঠিন বস্তুর দৃঢ়তা, জমাটবদ্ধভাব, আঁকড়াইয়া থাকার ভাব এবং আর আর গুণ সকল, যাহা উত্তাপের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়, উহারা আণবিক সাম্যভাবের ফলমাত্র; কিন্তু তথাপি কঠিন পদার্থে আকর্ষণী শক্তি বিকর্ষণী শক্তি অপেক্ষা অল্পাধিক বেশী থাকে।

তরল পদার্থে যাহা হইলে দৃঢ়তা বলা যায় অণুসকলের সেরূপ অচলভাব থাকে না, উহারা আপনাদের ভিতর চলিয়া বেড়ায়; কিন্তু তাহাতে তাহাদের কতক পরিমাণে জমাটবদ্ধভাবের ব্যাঘাত হয় না। যদি পাত্রের "কাণায়" বা পাতার আগায় এক ফোটা জল ঝুলিয়া রহিয়াছে মনে করা যায়, তাহা হইলে সেই ফোটার নীচের অর্দ্ধভাগ যে উপরের অর্দ্ধভাগে লাগিয়া থাকে, তাহা কেবল, দুই অর্দ্ধভাগের অণুরা এক অন্যের উপর যে আকর্ষণ প্রয়োগ করে তাহারই দ্বারা।

বাতাসে এবং বায়বীয় পদার্থে তাহাদের অণুসকলের আপনাদের মধ্যে আপেক্ষিক সচলতা আরো অধিক; উহাদের বিশেষ লক্ষণ এই যে উহাদের আভ্যন্তরিক বিকর্ষণী শক্তি উহাদের আকর্ষণী শক্তি অতিক্রম করিয়া লইয়া চলে; উহাদের অণু সকল অবিরত অধিকাধিক দূরে যাইতেই চেষ্টা করে। উহাদের এক অনির্দ্দিষ্ট প্রসারণ শক্তি। যদি তাহাদিগকে দশগুণ, শতগুণ, বা সহস্রগুণ অধিক আয়তন স্থানে বিস্তৃত হইতে দেওয়া যায়, তখনো তাহারা আরও প্রসারিত হইতে চেষ্টা করে এবং যে পাত্রের মধ্যে তাহারা থাকে, যে পাত্র তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সেই পাত্রের পরদায় (গাত্রে) উহারা চাপ প্রয়োগ করিতে থাকে।

এই চাপই উহাদিগের প্রসারণ শক্তির বা স্থিতিস্থাপক শক্তির পরিমাণ। এই চাপ সর্ব্বদাই আছে কিন্তু উহার পরিমাণ অত্যন্ত বিভিন্ন। বাতাস বা মরুৎ বা স্থিতিস্থাপক তরল পদার্থকে যতই সংকুচিত করা যায়, যে পরিমাণে উহার আয়তনকে ক্ষুদ্র করা যায়, যতই অপ্রশস্ত স্থানের মধ্যে উহাদিগকে ঠাসিয়া রাখা যায়, ততই উহাদের চাপ বা স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়। বায়ুর

পিচকিরি দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়; বায়ুকে যত মুক্তভাবে আপনার আয়তন বৃদ্ধি করিতে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, ততই ইহার চাপ ও স্থিতিস্থাপকতা কমিতে থাকে।

কঠিন পদার্থের লক্ষণ তাহাদের অণুর স্থায়িত্বভাব, অটলভাব; জলীয় পদার্থের লক্ষণ তাহাদের অণুর অপেক্ষাকৃত সচলভাব; মরুৎ পদার্থের লক্ষণ তাহাদের অণুর প্রসারণ।

যাহা দ্বারা বস্তুর রচনাপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হয় না প্রাকৃতিকবিজ্ঞানে কেবল সেই সকল আণবিক ক্রিয়া সমালোচিত হয়; যে সকল আণবিক ক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন ভূতের যোগাযোগ নিষ্পন্ন হয়, তাহারা রাসায়ন যোগাবনতির বিষয়।

শ্রীমদ্রূপ সনাতন।

(পূর্ব্ব বিবরণ)

বৈষ্ণব জগতে রূপসনাতনের স্থান অতি উচ্চ। রূপসনাতন বৈষ্ণবের আদি গুরু, রূপ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের ব্যবস্থাপক, রূপসনাতনই আদি বৈষ্ণব শাস্ত্রকার। সম্মানের তুঙ্গ শিখরে অধিষ্ঠিত হইয়াও যাঁহারা আপনাদিগকে দীনাতিদীন মনে করিতেন, প্রচণ্ড রাজকীয় ক্ষমতার সুদৃঢ় রজ্জু করধৃত রহিলেও, যাঁহারা অভিমানে ফুলিয়া উঠেন নাই, তাঁহারাই, বৈষ্ণবের গৌরব—বাঙ্গালীর গৌরব। এই রূপসনাতন সমীরণের প্রীতিভাজন পাঠকের প্রীত্যর্থে তাহাই উপহার দিতেছি।

রূপ সনাতন অতি মহাবংশসম্ভূত। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ দক্ষিণদেশ হইতে এ দেশে আগমন করেন। ১৩০৩ শকে কর্ণাটদেশে সর্ব্বজ্ঞ নামে এক ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ ভরদ্বাজ গোত্রোৎপন্ন যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ; তাঁহার এক মাত্র পুত্র, নাম অনিরুদ্ধ। সর্ব্বজ্ঞ এগার বৎসর মাত্র কর্ণাটের শাসন-দণ্ড পরিচালন করেন; তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র অনিরুদ্ধ ১৩১৪ শকে কর্ণাটের অধীশ্বর হয়েন। অনিরুদ্ধ রাজযোগ্য বিবিধ গুণে বিভূষিত ছিলেন। "এই রাজত্ব সময়ে গৌড়ীয় রাজা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যান, তিনি কর্ণাট দেশের শ্রীবৃদ্ধি শুনিয়া সেই স্থান পরিদর্শনে গমন করেন এবং তথায় মহারাজ অনিরুদ্ধের সহিত মিত্রতা হয়।"* অনিরুদ্ধের দুই পুত্র, রূপেশ্বর

* কটেশনোদ্ধৃত উক্তি গুলি শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগচি এম ডি (লিপজিক্) মহাশয় কর্ত্তৃক পরিকথিত। বাগচি মহাশয় আগ্রা থাকা কালীন বহুযত্নে শ্রীসনাতন গোস্বামীর স্বহস্ত লিখিত অতি প্রাচীন একখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তাঁহাদের আত্মবিবরণ সহ মদন গোপাল দেবের কাহিনী সে অমূল্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এ প্রবন্ধে বাগচি মহাশয়ের অনুগমন করা গিয়াছে. অতএব এ প্রস্তাব প্রকৃত সত্যমূলক। সনাতন সম্বন্ধে যে সকল কাহিনীর এতৎসহ ঐক্য হইবে না, তাহা অমূলক বলিবার কারণ আছে।—লেখক।

ও হরিহর। রূপেশ্বর বিবিধ শাস্ত্রে বিচক্ষণ হইয়া উঠেন, এবং হরিহর শস্ত্র বিদ্যায় প্রবীণত্ব লাভ করেন। ১৩৩৮ শকে মহারাজ অনিরুদ্ধের দেহান্তে রাজাসন লইয়া দুই ভাইয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত এবং কনিষ্ঠ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া রূপেশ্বর আটজন অশ্বারোহী ও স্ত্রীপুত্রাদি সহ পূর্ব্বপরিচিত পিতৃমিত্রের শরণাগত হন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ ঐ সময় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন না, ১৩০৮ শকে তাঁহার জন্ম হয়। * ১৩৫৫ শকে পিতার মৃত্যুর পর তিনি তত্রত্য মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করেন। ১৩৭৭ শকে বৃদ্ধ বয়সে তিনি গঙ্গাবাস হেতু মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া গৌড়েশ্বরের অধীন নৈহাটী গ্রামে আসিয়া বাস করেন; ১৩৮১ শকে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। পদ্মনাভের ১৮টী কন্যা ও পাঁচটী পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠানুসারে তাঁহাদের নাম যথা—পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। মুকুন্দের জন্ম ১৩৮৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়, তিনি পিতৃপদ লাভ করিয়া ও সর্ব্বজন সমাদৃত হইয়া ১৪০৫ শক পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। মুকুন্দের পুত্র কুমার অতি সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, মুকুন্দের জীবদ্দশায়ই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কুমারের পাঁচ পুত্র † তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রীসনাতন, ৪র্থ শ্রীরূপ এবং ৫ম পুত্র বল্লভ। রূপসনাতন বিবাহ করেন নাই, কনিষ্ঠ বল্লভের পুত্র প্রসিদ্ধ শ্রীজীব গোস্বামী।

শ্রীরূপ ও সনাতনের (পূর্ব্বপুরুষগণের) বিবরণ তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী স্বীয় লঘুতোষণী নামক গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। * ভক্তিরত্নাকরেও এই মহাবংশ-বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া অদ্য বিদায় লইতেছি; ক্রমে পাঠক ইঁহাদের অদ্ভুত

* বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ভক্তচরিতামৃতে লিখিয়াছেন "সেই স্থানে তাঁহার এক পুত্র হয়, পুত্রের নাম পদ্মনাভ।" এ কথার কোন ভিত্তি নাই; ইহা অনুমানমূলক এবং অপ্রকৃত।—লেখক।

† সনাতন কুমারদেবের তৃতীয় পুত্র—জ্যেষ্ঠ সন্তান নহেন, এ কথায় অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন। আগামীতে ইহার বিচার করিব। বস্তুতই সনাতন কুমারদেবের জ্যেষ্ঠ তনয় নহেন।—লেখক।

* "উদাচ্চাক পদক্রমাশ্রিতবতী যস্যামৃতস্রাবিণী
জিহ্বাকল্পলতাবতী মধুকবী ভূষো নবী নৃত্যতে।
বেজে৽বাস্রসভা সভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমীপতিঃ
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরুর্ভু বিভবদ্বাজাম্বযগ্রামণীঃ॥
পুত্রস্তস্য নৃপস্য কশ্যপকুলামাবোহতো রোহিণী
কান্তস্পর্দ্ধাযশোভবঃ স্তবপতেস্তুল্যপ্রভাবোঽভবৎ।
সর্ব্বপ্রাগতি পূজিতোঽখিল যজুর্বেদৈকবিশ্রামভূঃ
লক্ষ্মীবাননিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ
জগ্মিবান
মহিষ্যো ভূপস্য প্রথিতযশসস্তস্য তনযৌ
প্রজজ্ঞাতে রূপেশ্বব হবিহবাখ্যৌ গুণনিধী।
তযোরাদ্যঃ শাস্ত্রে প্রবলতর ভাবং বহুবিধে
জগম্যান্যঃ শস্ত্রে নিজ নিজগুণ প্রেরিততয়া॥
বিভজ্য স্বংবাজ্যং মধুরিপু পুবপ্রস্থিতি দিনে
পিতাতাভ্যাং রূপেশ্বব হরিহরাভ্যাং কিল দদৌ।
নিজজ্যেষ্ঠং রূপেশ্ববমথ কনিষ্ঠো হরিহরঃ
স্ববাজ্যাদাযানাং কুলতিলকমতং শয়দসৌ।
শ্রীরূপেশ্ববদেব এবমবিভির্নির্ধূতবাজ্যঃ ক্রমা
দষ্টাভিস্তুরগৈঃ সমং দযিতয়া পৌবস্ত্যদেশং যযৌ।
তত্রাসৌ শিখবেশ্বরস্য বিভয়ো সখ্যুঃ সুখং সংবসন্
ধন্যপুত্রমজীজনদ্গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধং।
যজুর্ব্বেদঃ সাঙ্গো বিততিরপি সর্ব্বোপনিষদাং
বসাজ্ঞায়াং যস্য স্ফুটমদ্যটয়তাণ্ডবকলাং।

অবদান পরম্পরা অবগত হইবেন। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু নাম বিপ্ররাজ।
মহাপূজ্য যজুর্ব্বেদী গোত্র ভরদ্বাজ।
সর্ব্ববেদে অধ্যাপক মহাপরাক্রম।
কর্ণাট দেশের রাজা নাহি যার সম।
সর্ব্বমহীপতি সদা পূজয়ে যাহারে।
যৈছে লক্ষ্মীবন্ত তাহা কে কহিতে পারে।
তার পুত্র অনিরুদ্ধ দেব ইন্দ্র সম।
চন্দ্রেও করয়ে স্পর্দ্ধা যশ সর্ব্বোত্তম।
মহীপতি পূজিত বেদজ্ঞ লক্ষ্মীবান!
পৃথিবীতে বিখ্যাত মহিষীদ্বয় তান্‌॥
রূপেশ্বর হরিহর নামে পুত্রদ্বয়।
বহুগুণ সর্ব্বত্র বিদিত অতিশয়॥
শাস্ত্রে বিচক্ষণ জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপেশ্বর।
শস্ত্রে মহা প্রবীণ কনিষ্ঠ হরিহর॥
বিভাগ করিয়া দোঁহে দিয়া রাজ্যভার।
শ্রীকৃষ্ণের ধামপ্রাপ্তি হইল পিতার॥
কতো দিন পরে লোক সংখট্য করিয়া
লইল জ্যেষ্ঠের রাজ্য কনিষ্ঠ হইয়া॥
রাজ্য গেল রূপেশ্বর পত্নীর সহিতে।
অষ্ট অশ্বে যুক্ত আইলা পৌরস্ত্য* দেশেতে॥
শ্রীশিখরেশ্বর সখ্য তাতে সুখ পাই।
রূপেশ্বর দেব বাস করিল তথাই॥
শ্রীরূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নাম।
পরম সুন্দর সর্ব্ব গুণে অনুপম॥
অঙ্গ সহ যজুর্ব্বেদাদিক অধ্যয়নে।
পরম অপূর্ব্ব যশ বিদিত ভুবনে॥
কি অপূর্ব্ব পদ্মনাভ দেবের চরিত।
শ্রীজগন্নাথের প্রেমে সদা উল্লাসিত॥
পদ্মনাভ নৃপ সে শিখর ভূমি হৈতে।
আইলেন গঙ্গাতীরে বাসস্পৃহা চিতে॥
নবহট্ট গ্রামে বাস কৈল মহাশয়।
নৈহাটি নাম যার সর্ব্ব লোকে কয়॥
তথা পদ্মনাভ দেব মহাহর্ষ চিতে।
শ্রীপুরুষোত্তম মূর্ত্তি পূজয়ে যত্নেতে॥
করি যজ্ঞ উৎসব পরমানন্দ হৈল।
অষ্টাদশ কন্যা পঞ্চ পুত্র জন্মাইল॥
শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথ নারায়ণ।
মুরারি মুকুন্দ এই পুত্র পঞ্চ জন॥
পুরুষোত্তম জ্যেষ্ঠ সর্ব্ব কনিষ্ঠ মুকুন্দ।
সর্ব্বাংশে প্রবীণ সর্ব্বোত্তম গুণ বৃন্দ॥
শ্রীমুকুন্দ দেবের নন্দন শ্রীকুমার।
বিপ্রকুল প্রদীপ পরম শুদ্ধাচার॥
সন্ধ্যা যজ্ঞাদিক ক্রিয়া নিভৃতে করয়।
কদাচার জন স্পর্শে অতি ভীত হয়॥
যদি অকস্মাৎ কভু দেখয়ে যবন।
করে প্রায়শ্চিত্ত অন্ন না করে গ্রহণ॥
জ্ঞাতিবর্গ হৈতে উদ্বেগ হৈল মনে।
ছাড়িলেন নবহট্ট গ্রাম সেই ক্ষণে॥
নিজ গণ সহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা।
বাকলা চন্দ্রদ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা॥
যশোরে ফতয়াবাদ নামে গ্রাম হয়।
গতায়াত হেতু তথা করিল আলয়॥
কুমার দেবের হৈল অনেক সন্তান।
তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ॥
সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ এই ক্রম।
স্বগোত্র অন্যত্র যে অর্চ্চিত মহাশয়॥"

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

---

* পৌরস্ত—প্রাচ্য। অঘোর বাবু একটী বিশেষ দেশ বলিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ।

গুল্মচিকিৎসা।

পূর্ব্ব খণ্ডে আমরা গুল্মের নিদান ও লক্ষণ-আদি বলিয়া আসিয়াছি, উপস্থিত প্রবন্ধে সমস্ত প্রকার গুল্মের চিকিৎসা সবিস্তার আলোচনা করিব।

লঙ্ঘনং দীপনং স্নিগ্ধমুষ্ণং বাতানুলোমনম্।
বৃংহণং যদ্ভবেৎ সর্ব্বং তদ্ধিতং সর্ব্বগুল্মিনাম্॥

সাধারণতঃ সমস্ত গুল্মেই লঙ্ঘন, অগ্নি-দীপ্তিকারক ঔষধ, স্নিগ্ধ উষ্ণ ও বাতানুলোমক ক্রিয়া এবং যদ্দ্বারা শারীরিক পুষ্টি সাধিত হয়, এরূপ সমুদায় গুল্মরোগীর পক্ষে হিতকর। এই শ্লোকে লঙ্ঘনের স্থলে লঘ্বন্ন পাঠ ও পঠিত হইয়া থাকে। উভয়তঃই বুঝিতে হইবে যে, গুল্মরোগীর সম্পূর্ণ উপবাস করিতে হইবে না, সাগু পেয়াদি লঘু অন্ন ভোজন করিলেই চলিতে পারে এবং ইহাই পরম্পরা-প্রচলিত প্রথা। গুল্মরোগে স্নেহ, স্বেদ, নিরূহ, অনুবাসন, বিবেক, বমন, লঙ্ঘন, বৃংহণ, শমন, রক্তাবসেচন ও অগ্নি কর্ম্ম এই একাদশ রূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ইহার মধ্যে আবশ্যকীয় প্রচলিত উপায় গুলি আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

গুল্মরোগীর উদরে বাতানুলোমক বিষ্ণুতৈলাদি মর্দ্দন করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে। বায়ুনাশক কোন কাথ কিম্বা কাঞ্জিকা দ্বারা একটী পরিষ্কৃত ঘৃতভাণ্ড (অভাবে নূতন ভাঁড়) পূর্ণ করিবে ও তদ্দ্বারা ক্রমশঃ স্বেদ প্রদান করিবে। এইরূপ স্বেদ ক্রিয়া দ্বারা দৈহিক স্রোতঃ সমস্ত পরিষ্কৃত হইয়া প্রকুপিত বায়ুর শমতা ও মলাদি রোধ নিবারণ করে, সুতরাং বাত গুল্মে বিশেষ উপকার হয়। এইরূপ স্বেদকে কুম্ভীস্বেদ বলে। সিদ্ধ মাংসাদির পিণ্ড দ্বারা স্বেদ দেওয়াকে পিণ্ড-স্বেদ এবং ইষ্টকচূর্ণ উত্তপ্ত ও কাঞ্জিক সিক্ত করিয়া স্বেদ দেওয়াকে ইষ্টকাস্বেদ কহে, এই ত্রিবিধ স্বেদ গুল্ম-রোগে ব্যবহৃত হয়।

উষ্ণ দুগ্ধ ৵০ ছটাক ১২ তোলা এরণ্ড তৈল (ক্যাষ্টার অয়েল) সহ পান করিলে বাতগুল্মে বিশেষ উপকার হয়।

শুষ্ক রশুন ত্বক্-বর্জ্জিত করিয়া অর্দ্ধ-সের গ্রহণ করিবে এবং চারি সের দুগ্ধ ও ষোল সের জল সহ পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ করিবে। এই ক্ষার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করিলে, বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত ও গৃধ্রুণী প্রভৃতি বিবিধ বায়ু রোগ বিনষ্ট হয়।

বায়ুজনিত বেদনা উপস্থিত হইলে, কিঞ্চিৎ টাবা লেবুর রস, হিং, দাড়িম, বিটলবণ ও সৈন্ধবলবণ, এই সমুদায় একত্র এবং সুরামণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহাতে অতি সত্বর বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

রাই সর্ষপ প্রভৃতি উগ্র বস্তু সেবন জনিত পিত্ত গুল্মে, মধুর সহিত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কমলা গুড়ি অবলেহন করিবে

অথবা গুড় মিশ্রিত করিয়া দ্রাক্ষা রস পান করিবে। দ্রাক্ষা রস শব্দে দ্রাক্ষার কাথই এস্থলে গ্রহণীয়।

গুল্মরোগে দাহ, শূল, ব্যথা, মানসিক ক্ষোভ, নিদ্রানাশ, অধীরতা ও জ্বর উপস্থিত হইলে স্থির করিতে হইবে যে গুল্ম পাকিবার উপক্রম হইয়াছে। পাকিবার উপক্রমে গুল্ম রোগে পাচক প্রলেপ অর্থাৎ শীঘ্র পাকে, এরূপ দিতে হয়। অনন্তর গুল্ম পাকিয়া উঠিলে শস্ত্র চিকিৎসক দ্বারা শস্ত্র প্রয়োগ করা বিধেয়। পূয়াদি নিঃসৃত হইয়া গেলে, রোপণ ক্রিয়া করিবে। স্বয়ংই গুল্ম বিদীর্ণ হইয়া পূয়াদি নিঃসৃত হইতে পারে, সুতরাং ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত শোধনাদি ক্রিয়া না করিয়া অপেক্ষা করা উচিত। এই সময়ের মধ্যে কেবল উপস্থিত উপদ্রবের নিবৃত্তি করিবে।

কফজ গুল্মে লঙ্ঘন, শোষণ ও স্বেদাদি ক্রিয়া হিতকর। অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম স্থানে অল্প বেদনা, কোষ্ঠের গুরুতা, আর্দ্রবস্ত্রাবরণবৎ বোধ, উৎক্লেশ (গা বমি বমি করা) এবং অরুচি উপস্থিত হইলে বমনকারক উপায় অবলম্বন করিবে। বমনের জন্য মধু ও সৈন্ধবযুক্ত উষ্ণ জল এবং আকন্দের মূল চূর্ণাদি প্রযোজ্য।

কফ জন্য গুল্মে তিল, এরণ্ড বীজ, মসিনা ও সর্ষপ বাটিয়া গুল্ম স্থানে উত্তমরূপে প্রলেপ দিবে, এবং তদুপরি এক খানি কচি কলার পাতা রাখিয়া একখানি লোহার হাতা উষ্ণ করিয়া স্বেদ দিবে।

ঘোলের সহিত যমানীচূর্ণ ও বিটলবণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে অগ্নির দীপ্তি, এবং বায়ু, মূত্র ও পুরীষাদির অনুলোমতা সাধিত হয়।

হিঙ্গাদি চূর্ণ - হিঙ্গু, ত্রিকটু, আকনাদি, হবুষ, হরিতকী, শঠী, বন যমানী, যমানী, তেঁতুল-চটা-ভস্ম, অম্লবেতস, অম্ল দাড়িম, কুড়, ধনে, জীরা চিতামূল, বচ, যবক্ষার, সৈন্ধব, সচল লবণ ও যই এই সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মস্ত অথবা কাঞ্জিকের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে বাত শ্লৈষ্মিক গুল্ম ও আনাহাদি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়। এই চূর্ণকে সাত দিন ছোলঙ্গ লেবুর রসে ভাবনা দিয়া ৩ রতি পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করা যায়। অজীর্ণ জনিত তরল মলভেদে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয় এবং পেট ফাঁপা ও পেট বেদনা প্রভৃতির তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হয়।

বচাদি চূর্ণ—বচ, হরিতকী, হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণিত করিয়া প্রাতঃকালে।০ আনা মাত্রায় উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে সমস্ত প্রকার গুল্মের নিবৃত্তি হয় এবং পাচকাগ্নি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

কাঙ্কায়ন গুড়িকা—শটী, কুড়, দন্তীমূল, চিতামূল, শুঁঠ, বচ ও তেউড়ীর মূল প্রত্যেক ৮ তোলা, হিঙ্গু ২৪ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা, অম্লবেতস ১৬ তোলা, যমানী, জীরা, মরিচ ও ধনে প্রত্যেক ২ তোলা, কৃষ্ণ জীরা ও বন যমানী প্রত্যেক ৪ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া ছোলাঙ্গ লেবুর রসে ভাবনা দিয়া চারি আনা পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহার ২।৩টী এক কালে সেবন করান হইয়া থাকে। অনুপান সুখোষ্ণ

জল, কাঁজি মস্ত, মাংসযূষ, ঘৃত ও দুগ্ধ প্রভৃতি। কফজ গুল্মে গোমূত্রের সহিত পৈত্তিক গুল্মে ইক্ষু চিনি ও দুগ্ধের সহিত এবং মস্ত অথবা কাঁজির সহিত বাতিক গুল্মে এই ঔষধ সেবন বিধেয়। উষ্ট্রদুগ্ধ অনুপানে স্ত্রীদিগের রক্ত গুল্ম আরোগ্য হয়। ইহাতে পাচকাগ্নি পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

বৃহদ্ গুল্ম কালানল রস—অভ্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, কটুকা, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, কুড়, ত্রিকটু, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, গুড়ত্বক্, নাগকেশর ও খদির প্রত্যেক সমভাগে চূর্ণ ও মিলিত করিয়া জয়ন্তা, চিতা, ধুতুরা ও কেশুরিয়া ইহাদের পত্রের রসে ভাবনা দিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। শীতল জল বা দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে ১টী সেবনীয়। ইহাতে পঞ্চবিধ গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, উদর, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, রক্তপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, গ্রহণী, দৌর্ব্বল্য, কৃশতা ও বিষম জ্বরাদি আরোগ্য হয়।

শিখিবাড়ব রস—তাম্র, পারদ, অভ্র, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও যবক্ষার প্রত্যেক সমভাগ। চিতার রসে ১ দিন মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা নির্ম্মাণ করিবে। অনুপান পানের রস; ইহাতে বাত ও গুল্ম নিবৃত্ত হয়। বাত ও গুল্মের ইহা একটী প্রসিদ্ধ ঔষধ।

দন্তী হরিতকী গুল্মরোগে একটী সুপ্রসিদ্ধ মহৌষধ। প্লীহা প্রভৃতিতেও ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

দন্তী হরিতকী—শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ হরিতকী ২৫টা, দশমূল ৩ সের ৮ তোলা, চিতামূল ৩ সের ৮ তোলা, জল ৬৪ সের শেষ ৮ সের। এই কাথ জলে ৩ সের ৮ তোলা পুরাতন গুড় গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত হরিতকী ২৫টা দিয়া পাক করিবে। আসন্ন পাকে তেউড়া চূর্ণ ৩২ তোলা, তিল তৈল ৩২ তোলা, পিপুল চূর্ণ ৪ তোলা ও শুঁঠ চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ৩২ তোলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। সেবনের মাত্রা ১ হইতে ২ তোলা ও ১টী হরিতকী। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া গুল্ম, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়।

রসায়নামৃত লৌহ—মিলিত ত্রিফলা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; ছাঁকিয়া লইয়া এই জলের সহিত ২ সের চিনি গুলিয়া গোঁড়ালেবুর রস ২ সের দিয়া যথাবিধানে পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরাতা, তেউড়ী, দন্তীমূল, নিমছাল সৈন্ধব ও অভ্র প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, লৌহ ১৬ তোলা ও ঘৃত ৩২ তোলা এই সমুদায় প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা, ইহাতে গুল্মাদি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়।

ক্রিমিনিদান।

ক্রিময়স্তু দ্বিধা প্রোক্তা বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
বহির্মল কফাসৃক্ বিট্ জন্মভেদাচ্চতুর্ব্বিধাঃ॥
নামতো বিংশতি বিধা বাহ্যাস্তত্র মলোদ্ভবাঃ।

বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে ক্রিমি দুই প্রকার অর্থাৎ কতকগুলি ক্রিমি শরীরের বহির্ভাগে উৎপন্ন হয়, আর কতকগুলি শরীরের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়।

তত্র বাহ্যেমলে জাতান্ মলজান্ সঞ্চক্ষ্মহে, তেষাং সমুত্থানং মৃজাবর্জ্জনং, স্থানং কেশশ্মশ্রু লোম-পক্ষ্ম-বাসাংসি।

বাহ্য মল হইতে উৎপন্ন ক্রিমিকে মলজ ক্রিমি বলা যায়। এই মলজ ক্রিমি, গাত্র মার্জ্জনাদি না করিলে শরীরে মল সঞ্চিত হইয়া উহা হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং শরীরের অমার্জ্জনই বাহ্য ক্রিমির নিদান। কেশ, শ্মশ্রু (দাড়ি), গাত্রলোম, পক্ষ্ম অর্থাৎ নেত্র-লোম এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি ইহাদের আশ্রয়স্থান। ইহাদের মধ্যে কতগুলির আকৃতি অতি সূক্ষ্ম এবং কতগুলির আকৃতি তিলের ন্যায়। এই সমুদায় ক্রিমি কৃষ্ণ অথবা শুক্লবর্ণ ও প্রায় বহু-পাদবিশিষ্ট।

নামানি যূকাঃ পিপীলিকাশ্চেতি, প্রভাবঃ কণ্ডূ জননং কোঠ পিড়কাভিনির্ব্বর্ত্তনঞ্চ, চিকিৎসিতং তেষামপকর্ষণং, মলোপঘাতো মলকরাণাঞ্চ ভাবানামনুপসেবনমিতি।

ইহাদিগকে যুক ও পিপীলিকা বা লিখ্যা নামে অভিহিত করা হয়। যাহারা কেশে থাকে উহাদিগকে যুক ও বস্ত্রাশ্রয়ী ক্রিমিদিগকে লিখ্য কহে। যুক সমুদায় কৃষ্ণতিলের ন্যায় কৃষ্ণ ও লিখ্যগুলি শুভ্রতিলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। এই দুই প্রকার ক্রিমিই কোঠ, পিড়কা, কণ্ডুগত রোগ জন্মায়। অপকর্ষণই ইহার চিকিৎসা। কঙ্কতিকা (চিরুণী) প্রভৃতি দ্বারা কেশস্থ ক্রিমির অপসারণ ও ব্যাসন বা সাবানাদি দ্বারা গাত্র-মার্জ্জনই ইহার প্রধান চিকিৎসা।

যে সমুদায় কারণে কুষ্ঠরোগ জন্মে, শোণিতজ ক্রিমিও সেই সেই কারণে উৎপন্ন হয়। রক্তবাহিনী শিরা সমুদায় ইহার আশ্রয়স্থল। দেখিতে তাম্রবর্ণ, পাদরহিত, গোলাকার ও সূক্ষ্মাকৃতি। ইহাদের মধ্যে কতগুলি এত সূক্ষ্ম যে, দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা কেশাদ, লোমাদ বা লোমবিধ্বংস, লোম-দ্বীপ, উড়ুম্বর, সৌর ও সমাতা এই ছয়টী নামবিশিষ্ট। কেহ কেহ সমাতা না বলিয়া জন্তুমাতা বলেন। কেশ, শ্মশ্রু, নখ এবং রোম প্রভৃতির বিনাশই ইহাদিগের কর্ম্ম। কোন ব্রণস্থানে অবস্থিত হইলে রোমাঞ্চ, কণ্ডূ, তোদ (সূচিবেধনবৎ ব্যথা) ও সংসর্পণ (সুর্ সুর্ করা) এই সমুদায় উপসর্গ উপস্থিত করে। এই সমুদায় ক্রিমি এতই ভয়ানক যে, পরিবর্দ্ধিত হইলে ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু ও তরুণাস্থি ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে রোগীর যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। অবশ্যই ইহা মহাপাতকের ফল সন্দেহ নাই। কুষ্ঠরোগে যেরূপ চিকিৎসা করিতে হয়, ইহাতেও সেইরূপ চিকিৎসা হিতকরী। অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা ইহাতে বিশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়াছে।

আনূপ গ্রাম্যবস্তানাং মাংসং যঃ সেবতে সদা।
তস্য ক্রিয়াবিহীনস্য ক্রিমির্ঘোরঃ প্রজায়তে।
আকৃষ্টো বর্দ্ধতেঽত্যর্থং তুম্বীবীজ সমাকৃতিঃ।
চিকিৎসামন্তরেণাসৌ করোত্যুপদ্রবান্ বহূন্।

ব্যায়ামাদি বর্জ্জিত হইয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অতিশয় মত্ত মাংস ভোজন করে, শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া তাহার পক্বাশয়ে

তুম্বী বীজ সদৃশ ক্রিমি উৎপাদন করে। এই জাতীয় ক্রিমিকে টানিলে অতিশয় দীর্ঘ হয়। ইহারা ক্রমশঃ অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গ সকল উৎপাদন করে। এই শ্লেষ্মজ ক্রিমির মধ্যে কতকগুলি গোলাকার অথচ বিস্তৃত গণ্ডূপদ অর্থাৎ কেঁচোর ন্যায়। প্রায়শঃই এই ক্রিমি সমুদায় শ্বেতবর্ণ। কতকগুলি ঈষৎ তাম্রবর্ণ। কতকগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম অথচ তন্তুর ন্যায় সুদীর্ঘ, ইহারাও শ্বেতবর্ণ। অন্ত্রাদ, হৃদয়াদ, উদরাদ, চুয়রব, দর্ভকুসুম, সৌগন্ধিক ও মহাগুদ এই সমুদায় নামে ইহারা অভিহিত হয়। অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই ইহারা কখন উর্দ্ধে, কখনও অধঃ, কখনও বা উর্দ্ধাধঃ উভয় দিকে গমনাগমন করে। শ্লেষ্মজ ক্রিমি হৃল্লাস (গা বমি বমি করা), আস্যস্রাব (মুখে জল উঠা), অরুচি, অবিপাক, জ্বর, মূর্চ্ছা, জৃম্ভা, ক্ষবথু, আনাহ, অঙ্গমর্দ্দ, ছর্দ্দি, কৃশতা ও পারুষ্য প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত করে।

যেরূপ অবৈধ পানাহারে শ্লেষ্মজ ক্রিমি উৎপন্ন হয়, পুরীষজ ক্রিমিও ঐ সমুদায় কারণে জন্মিয়া থাকে। ফলতঃ অধিক মিষ্টরস, অম্লরস, পিষ্টকাদি, সংযোগবিরুদ্ধ ও শাক প্রভৃতি শ্লেষ্মবর্দ্ধক আহারেই এই ক্রিমির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহারা সঞ্জাত ও প্রবৃদ্ধ হইয়া অধোদিকে বিচরণ করিতে থাকে! যে সময় ইহারা আমাশয়ের দিকে উত্থানোন্মুখ হয়, তখন ক্রিমিকোষ্ঠীর উদ্গার ও নিশ্বাসে বিষ্ঠার গন্ধ অনুভূত হইতে থাকে। ইহাদের কতকগুলি স্থূল, কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি সূক্ষ্ম, কতকগুলি শ্যামবর্ণ, কতকগুলি, পীতবর্ণ, কতকগুলি শ্বেতবর্ণ এবং কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ। ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ, সশূল ও লেলিহ এই কয়েকটী নামে অভিহিত হয়। বিপথগামী হইলে ইহারা মলভেদ, শূল, বিষ্টম্ভ, কৃশতা, পরুষতা, পাণ্ডুরতা, লোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও গুহ্যদেশে কণ্ডু প্রভৃতি উৎপাদন করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কেশস্থ ক্রিমির হস্তাদি দ্বারা আকর্ষণ সদুপায় কিন্তু যাহাদের মস্তকের কেশ ঘন বা সুদীর্ঘ, নিঃশেষরূপে আকর্ষণ তাহাদের পক্ষে সহজ নহে। পরন্তু উৎকুণ, (ইকুণ) ও মৎকুণের (ছারপোকা) এতই বংশ-বিস্তৃতি শক্তি যে, দুই চারি দিনের মধ্যে দুই একটী হইতে বহুসংখ্যক উৎপন্ন হয়। সুতরাং অপকর্ষণ ও ঔষধ প্রয়োগ দুইটী উপায়ই এস্থলে অবলম্বনীয়।

নালিতা অর্থাৎ পাটবীজ কাঁজিতে পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে ৩।৪ দিনেই সমস্ত ইকুণ মরিয়া যায়। শয়নেব পূর্ব্বে পদতলে পানের রস উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে ৪।৫ দিবসে সমস্ত ইকুণ মরিয়া যায়। নারিকেল তৈল ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মাথায় মাখিলে ইকুণ মরিয়া যায়।

পালিধা পত্রের রস ১ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৵০ আনা মধুসহ প্রাতে অবলেহন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। আনারসেব ভিতরের পাতার রস অর্দ্ধ ছটাক ও ইক্ষু চিনি ।০ আনা। ক্রিমির পক্ষে ইহা মহৌষধ ও সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। ঘেঁটুপাতার (ভাঁটি) রস ২ তোলা অথবা অগ্রভাগ (কুঁড়ি) ৪।৫টা বিটলবণ ও চূণের জল সহ সেবনে ক্ষুদ্র ক্রিমি সমূলে

বিনষ্ট হয়। শালিঞ্চা (শাঞ্চি) শাকের পাতার রস ২ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্রিমি সমুদায় মৃত ও পতিত হয়।

একটী পিত্তলের বাটীতে অর্দ্ধসের জল দিয়া ঘুঁটের আগুনে অল্প অল্প উত্তাপ দিবে। জল তপ্ত হইলে মিছরি ১ তোলা দিয়া পিত্তলের খুন্তি দিয়া নাড়িতে থাকিবে। মিশিয়া গেলে শোনামুখির পাতাচূর্ণ ১ তোলা দিবে। অনন্তর ইন্দ্রযব চূর্ণ ১ তোলা উহাতে দিয়া নাড়িবে ও মিলিত হইলে বিড়ঙ্গ চূর্ণ ১ তোলা প্রক্ষেপ দিবে, ঘন হইয়া আসিলে কিস্‌মিস্‌ ১ তোলা উহাতে প্রদান ও আলোড়ন করিয়া নামাইয়া লইবে। অল্প মধু সংযোগে ইহাতে ৩০টা মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে শৃত শীতল (উষ্ণ করিয়া শীতল করা) জলের সহিত ১টী করিয়া সেবন করিলে (বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকের অর্দ্ধ বা সিকি মাত্রায়) যেরূপ এবং যতদিনের যত উপদ্রবযুক্ত ক্রিমি হউক না কেন সত্বর আরোগ্য হয়।

প্রথমে কিঞ্চিৎ গুড় খাইয়া কিছুকাল পরে বাসি জলের সহিত খোরাসানী যমানী খাইলে কোষ্ঠস্থ সমস্ত ক্রিমি নির্গত হয়।

মুতা, ইন্দুরকানি, ত্রিফলা, সজিনাছাল ও দেবদারু এই সমুদায়ের কাথে পিপুল ৵০ আনা ও বিড়ঙ্গ ৵০ আনা বাটিয়া মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্রিমি ও ক্রিমি জন্য যাবতীয় রোগ আরোগ্য হয়। পলাশবীজ ঘোলের সহিত বাটিয়া খাইলে ক্রিমি নষ্ট হয়। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় খের্জ্জুর পাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া বাসি করিয়া পরদিন প্রাতে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

পারসীযাদি চূর্ণ—খোরাসানী যমানী মুতা, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ ও আতইচ উত্তমরূপে চূর্ণ ও সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ৵০ আনা হইতে ।০ আনা মাত্রায় প্রাতঃকালে মধুসহ সেবন করিলে কাস, জ্বর, অতিসার ও বমি নিবৃত্ত হয় এবং কোষ্ঠস্থ ক্রিমি সকল উন্মূলিত হয়।

কীটারি রস—পারদ, গন্ধক, (কজ্জলী) ইন্দ্রযব, বনযমানী, মনঃশিলা ও পলাশবীজ এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ঘোষালতার রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মুগানীর (বনমুগ) রস ও ইক্ষুচিনি অথবা আনারসের পাতার রস প্রভৃতি কোন ক্রিমিপ্রশমক পদার্থ। ইহা সেবন করিলে সমস্ত প্রকার ক্রিমি বিনষ্ট ও নিপতিত হয়।

ক্রিমিশার্দ্দূল চূর্ণ—সোমরাজী, বিড়ঙ্গ, চিরাতা, কট্‌কী, পলাশবীজ, ভেইড়ামূল, নিম ও হরিতকী এই সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ক্রিমিনাশক অনুপানের সহিত প্রাতঃকালে ৵০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি ও তজ্জনিত রোগ বা উপদ্রব ও অগ্নিমান্দ্য, অরুচি এবং জ্বর বিনষ্ট হয়।

আবশ্যকমতে ক্রিমিরোগে ত্রিফলাদ্য ঘৃত, বিড়ঙ্গঘৃত, বিড়ঙ্গাদ্যতৈল ও পারিভদ্রাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ সমস্ত ব্যবহার করিবে। বাহুল্য ও অনাবশ্যকবোধে ঐ সমুদায় আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতে বিরত থাকিলাম। ভৈষজ্যরত্নাবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উহা বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে।

বাবর। *

বাবর হইতে মোগল সাম্রাজ্যের আরম্ভ, কিন্তু বাবর নিজে তৈমুর বংশীয় ছিলেন, এবং মোগলদিগকে সর্ব্বদা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। † তাঁহার মাতা মোগল বংশীয়া ছিলেন। এই কারণেই হউক বা ভারতবাসীরা আফগান ছাড়া উত্তরের মুসলমান মাত্রকেই মোগল বলে বলিয়াই হউক, বাবর-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের নাম মোগল সাম্রাজ্য হইয়া গেল। বাবরের পিতামহ আবু সায়েদের রাজ্য বহু-বিস্তৃত,—তিনি তাহার অধিকাংশই পুত্র-গণের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। আহমদ মির্জার ভাগে সমরকন্দ ও বোখারা পড়িয়াছিল, মাহমুদ মির্জা বালখ বা বাক্ট্রীয়া, আর উলেখবেগ কাবুল পাইয়াছিলেন। বাবরের পিতা ওমর-সেখ মির্জার ভাগে প্রথমে কাবুল পড়ে, কিন্তু তিনি তাঁহার পিতা বর্ত্তমানেই তথা হইতে বদলী হইয়া ফর্গানায় (আধুনিক কোকাণ্ড) প্রেরিত হন। এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা বাবর বলিয়া শেষ করিতে পারেন নাই।

কিছুকাল পরে আবু সায়েদের রাজ্যে পাপ ঢুকিল, লোভে অন্ধ হইলে যাহা হয় তাহা আরম্ভ হইল। ভ্রাতার রক্ত ভ্রাতা চিনিল না, ভ্রাতার বিরুদ্ধে ভ্রাতার অসি উন্মুক্ত হইল, ভ্রাতার শোণিতে ভ্রাতার শোণিত মিলিল! বাবরের পিতা ওমরসেখ মির্জার সহিত তাঁহার ভ্রাতা সমরখন্দাধিপতি আহম্মদ মির্জ্জা ও শ্যালক মাহমুদ খাঁ মোগলের যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বেই ওমরসেখের মৃত্যু হইল, এবং আহম্মদ মির্জা ও মাহমুদ খাঁ একত্রে ফরগান আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না,—সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন। তাহার কিছু-কাল পরেই আহম্মদ মির্জার মৃত্যু হইল। বাক্ট্রীয়াধিপতি মাহমুদ মির্জা সমরখন্দ অধিকার করিলেন, কিন্তু তাঁহারও অল্পদিনের পরে মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র বাইসন্ঘর মির্জা পিতৃ-স্থান অধি-কার করিলেন। এইরূপে চারিদিকে একটা ঘোর অশান্তি জাগিয়া উঠিল—দয়া, মায়া, শাসন, বিচার সব লোপ পাইল! এই সময়ে বাবর সমরকন্দ আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার বয়স এই সময়ে ১৫ বৎসর মাত্র। পনের বৎসরের ছেলে আমাদের দেশে রাত্রে পুকুর পাড়ে যাইতে ভয় পায়, আর সেই পনের বৎসরের বালক বাবর বার বার বিফলমনোরথ হইয়াও অবশেষে—১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সাহস ও

* বাবরের আসল নাম ছিল—সাহের উদ্দীন আহম্মদ। বাবর বা সিংহ তাঁহার ভ্রাতার খেতাব ছিল।

† Under these circumstances, it may seem one of the strangest caprices of fortune; that the empire which he (Baber) founded in India should have been called, both in the country and by foreigners, the empire of the Moghuls, thus taking its name from a race which he detested.—ERSKINE's *Baber*.

অধ্যবসায়ের গুণে বিশাল সমরকন্দ রাজ্য অধিকার করিলেন;—অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু শাসনে রাখা তাঁহার সাধ্যাতীত হইয়া উঠিল; অবস্থা তাঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তা'ছাড়া সমরকন্দ প্রদেশ যুদ্ধে যুদ্ধে এত ধন-শূন্য হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার রাজস্ব এত অল্প আদায় হইত যে তাহা দ্বারা সৈন্য-রক্ষা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাহারা একে একে কর্ম্মত্যাগ করিতে লাগিল, এবং ফরগানবাসিগণকে বাবরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া বাবরেরই একজন সৈন্যাধ্যক্ষ আহমদ তাম্বোলের অধীনে—বাবরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জাহাঙ্গীর মির্জার নামে—বিদ্রোহধ্বজা তুলিল। এই সময়ে বাবর সমরকন্দে তিন মাস দশদিন মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহে বিদ্রোহানল জলিয়াছে শুনিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, যে কয়েকটী সৈন্য ছিল তাহাই লইয়া ফরগান্ যাত্রা করিলেন। তাঁহার শাসন ভুলিয়া গেল— সমরকন্দ স্বাধীন হইল। ইহাতে তাঁহার উভয় কূলই নষ্ট হইল; ইহার উপর একটা পীড়া উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার যুদ্ধায়োজনে একটু বিলম্ব পড়িয়া গেল. তজ্জন্য ফল এতই বিসদৃশ হইল যে, সমরকন্দ ত্যাগ করিয়াই তিনি শুনিলেন তাঁহার পৈতৃক রাজ্য হস্তান্তরিত হইয়াছে। অধ্যবসায়ী বাবর নিরাশ হইতে জানিতেন না; ক্বচিৎ মাতুল . মাহমুদ খাঁর সাহায্যে এবং নিজ নাম, সাহস ও বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া তিনি অনেকবার সমরকন্দ ও ফরগান উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। অবশেষে ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। তখনও বিদ্রোহানল সমানে জলিতেছিল; বাবর তাহা নিবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্দ্ধেক না নিবিতেই সমরকন্দবাসিগণ তাঁহাকে পুনরায় সমরকন্দ লইতে আহ্বান করিল। তিনি আহ্বান মাত্রেই সমরকন্দ যাত্রা করিলেন, কিন্তু সমরকন্দ পৌছিবার আগেই শুনিলেন উজ্বেগরা * বোখারা ও সমরকন্দ অধিকার করিয়াছে। একূল হারাইয়া ফিরিবার সময়ে শুনিলেন ওকূলও গিয়াছে—আম্বোল ফরগান অধিকার করিয়াছে। আবার দুই কূল গেল! বাবর এবার অন্য উপায় না দেখিয়া দুর্গম পর্ব্বত মধ্যে আশ্রয় লইলেন। সে স্থানে কেহ যাইত না—আরোহণ কষ্টসাধ্য—বাবরেরও ইহাতে বেশ সুবিধা হইল, তিনি নিশ্চিন্ত মনে সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন। সুযোগও ঘটিল। সংবাদ আসিল যে উজ্বেগদের প্রধান শিবানী খাঁ সম্প্রতি কোন যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়ায় সমরকন্দ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এই অবসরে সমরকন্দে প্রবেশ করিলেন। কেবল মাত্র ২৪০ জন অনুচর লইয়া রাত্রি ১ টার পরে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া

* উজ্বেগরা তুর্ক, মোগল ও অন্যান্য জাতি মিলিয়া এক স্বতন্ত্র জাতিতে দাঁড়াইয়াছিল,—বেশীভাগ তুর্কদের সঙ্গেই মিলিত। ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে উজ্বেগ্ খাঁর অধীনে তাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। সেই উজ্বেগ খাঁ হইতেই তাহাদের নাম উজ্বেগ হইয়াছে। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগল কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াও আবার ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শিবানীর অধীনে উত্থিত হইল।

প্রহরিগণকে সহসা আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সেই মুষ্টিমেয় সৈন্যের চীৎকার, হুহুঙ্কার ও বীরদর্প শুনিয়া সমরকন্দ-বাসিগণ ভাবিল বাবরের সৈন্য সংখ্যাতীত। তাহারা সকলেই বাবরের দিক্ হইয়া যেখানে যত উজ্‌বেগ দেখিল হত্যা করিল! ভীষণ হত্যাকাণ্ড বুকে করিয়া সমরকন্দ বাবরের হইল। এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই শিবানী খাঁ প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু বাবর এত দৃঢ়তার সহিত নগর রক্ষা করিতেছিলেন যে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বোখারায় ফিরিতে হইল।

সমরকন্দ সম্পূর্ণরূপে বাবরের অধীন হইল। সমরকন্দবাসিগণ বহুদিন পরে শান্তির রাজ্য দেখিল। সম্বাদ আসিল শিবানী উজ্‌বেগ্‌দিগকে একত্রিত করিয়া সমরকন্দ আক্রমণের চেষ্টা করিতেছেন। বাবর চিন্তিত হইলেন। তাঁহার সৈন্য অল্প, ধন নাই যে অধিক সৈন্য রাখেন; আর কি উপায় আছে? তিনি তখন সমরকন্দী সর্দ্দারগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; উজ্‌বেগ্‌-শাসনে তাহাদিগকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে তাহাও স্পষ্টরূপে বুঝাইলেন—ছয়মাস ধরিয়া অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না! তখন তিনি একাকী দাঁড়াইলেন। একদিকে অসংখ্য উজ্‌বেগ্‌, অন্যদিকে তিনি ও তাঁহার কতিপয় অনুচর। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া তিনি শিবানীর বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। তাঁহার অধীনে কয়েকজন নীচ-মনা মোগল ছিল, তাহারা 'লুট' করিবার বাসনায় যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল; ফলে—সৈন্যের বিশৃঙ্খলা বশতঃ—বাবর সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া সমরকন্দে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। এই স্থান হইতে তিনি আক্রমণকারী উজ্‌বেগ্‌দিগকে বার বার পরাস্ত, বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। শিবানী অন্য কোন উপায় না দেখিয়া নগর ঘেরাও করিলেন, রসদের পথ একেবারে বন্ধ হইল, নগর-মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল! নগরবাসিগণ দলে দলে অনাহারে মরিতে লাগিল, সৈনিকেরা প্রাচীর হইতে লাফাইয়া—কেহ মরিল, কেহ রহিল! আর রাখা অসম্ভব দেখিয়া বাবর সমরকন্দ ত্যাগ করিলেন। সমরকন্দ আবার শিবানীর করতলগত হইল।

ইহার পর বাবর দরিদ্রতার চরম সীমায় উপস্থিত হইলেন; পাহাড়ে থাকিতেন, নদীতে জল খাইতেন; বন্য ফল মূলে উদরপূর্ত্তি করিতেন; মাঝে মাঝে কষ্ট অসহ্য হইলে মাতুলালয়ে আসিতেন। এই সময়ে তাঁহার একটীও ভৃত্য ছিল না, ভৃত্যের কার্য্য তিনি নিজ হস্তেই করিতেন। কিন্তু এত কষ্টেও তিনি উদ্যম ভুলিলেন না,—বাবর বাবরই রহিলেন। দুই বৎসর ধরিয়া নানা চেষ্টা করিলেন, কিছুই হইল না! মাঝে মাঝে অবসরও ঘটিত, কিন্তু সৈন্যাভাবে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেন না। এইরূপে কখনও কখনও এত নিরাশ হইতেন যে, চীনদেশে গিয়া সমস্ত জীবনটা তাঁহার অন্ধকারে কাটাইতে ইচ্ছা হইত। এই সময়ে ফরগানে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটিল, এবং এই অবসরে বাবর—মাতুল ও সেই বিদ্রোহী ভ্রাতা জহাঙ্গীরের সাহায্যে—ফরগান অধিকার করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

কাজনাই ভালবাসা।

দূরে থাক—দূরে থাকি, কাজ নাই ভালবাসা।
কহিতে শুনিতে ভাল মিটে না প্রাণের আশা।
অবোধ বালক প্রায়, পুতুল খেলার ছলে
ভেঙ্গেছি গড়েছি কত, হাসি পায় মনে হলে।
নারীর অধরে ভাসা হাসির জুয়ারে যারা
আপনা হারায়ে ফেলে, বড়ই অভাগা তারা।
একটু স্নেহের স্পর্শে, দু'টি স্নেহ বাক্যে হায়!
হৃদয় গলিত সত্য, বিকাতাম আপনায়।
কথায় কথায় মান, আপনারে সমর্পণ
উন্মত্ততা এ সংসারে বুঝিয়াছি এইক্ষণ।
হাসিতে বাঁচিয়া উঠা, রোদনে মরণ জ্ঞান
এমন নাহিক আর, সেই দুর্বল প্রাণ।
উদ্ভ্রান্ত সাগর বক্ষে ভীমনৃত্য তরঙ্গের
এবে ভাল লাগে মোরে, গেছে দিন উচ্ছ্বাসের।
প্রাণের এ তৃষা আজ মিটিবে না "সরবতে"
চাহি ঐ মহাসাগরে, গণ্ডূষে শুষিয়া ল'তে।
সম্মুখে কঠোর দৃষ্টি সংসার দাঁড়ায়ে আছে
তুলি শত কলরোল আমারে ডাকিছে কাছে।
ওই মহা কলরোলে, অনন্ত মানব স্রোতে
কত স্নেহ কত সুখ ভেসে যাবে দিনরাতে।
তিল তিল করি সব দিতে হবে বিসর্জন,
প্রতাপের কঠোরতা এ জীবনে প্রয়োজন।
সে কঠোর সুদৃঢ়তা নাই যার ধরাতলে
কাঁদিতে জনম তার, সুখ নাই তার ভালে।
স্নেহ ও প্রণয় সিক্ত হাসি অশ্রু অভিনয়
বিশাল জগতে এই জীবনের কাজ নয়।
আজ আর কা'ল ভেদ, এ জীবনে সব ভাসা।
দূরে থাক—দূরে থাকি, কাজ নাই ভালবাসা।

শ্রীচারু।

বর্ষশেষে।

বর্ষ হে।
তব আগমন সনে হিয়ার মাঝারে মম
কত শত আশা, মরি, বেঁধেছিল ঘর।
অসংখ্য অগণ্য আশা,—মরমে না পেয়ে স্থান
কত বা গিয়েছে চলে দূর দূরান্তর॥
তবুও মরম মাঝে বিন্দু পরিমিত স্থান
ছিল না কোথাও বাকী আশা নাই যথা
আজিকে দেখিনু চেয়ে শূন্যময় সে সকল
বাসা ছেড়ে আশা সব পলাইল কোথা?
জীবের জীবন লতা আশায় জীবিত রয়
আশাই আশ্রয় তরু জীবনের তার—
সংসার আশার দাস—আশাই জীবনময়
কেমনে সে আশা ছাড়ি থাকিব এ পুরে?
প্রাণভরা এত আশা সব যদি চলে গেল
নিরাশ জীবনভার বহিয়ে কি হবে?
দাঁড়াও না ক্ষণতরে—এ পারে বিদায় নিয়ে
আমিও তোমার সনে চলে যাই তবে?
গেছে চলে সব যা'ক আছে এই আশা থা'ক
"মিলিব প্রেয়সী সনে" সার এ জীবন॥
"মিলন মিলনসুখ" চাই শুধু এই টুক—
চাই প্রেয়সীর সনে "অনন্ত মিলন"।
চাই না তোমায় আর যাও বর্ষ যাও তবে
কালস্রোতে অতীতের অঙ্কে স্থান নিতে—
যাইবার কালে ভাই শেষের কথাটি মোর
নব বরষের ঠাঁই ভুল না কহিতে॥
তুমি ত যেতেছ চলে—সেও আসে কুতূহলে
দেখা হ'লে তার সনে কহিও তাহায়—
এ প্রাণে "মিলন আশা" মিটিলনা সে পিপাসা
মিটাবে যে জন, তারে রেখেছ কোথায়?

২য় খণ্ড। | ১৩০২ সাল—বৈশাখ। | ৮ম সংখ্যা।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

মূল্য প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা।

গ্রাহক মহোদয়গণ সমীপে

একটী বিশেষ নিবেদন।

সমীরণ সদা আপনি বহে, কখনও কাহার অধীন নহে, যতদিন যাহার সঙ্গে বহে, তাহার গুণগৌরব অঙ্গে মাখিয়া রঙ্গে ভঙ্গে তরল তরঙ্গে বহমান হয়;—তখন তাহার আর নূতন পরিচয় দিতে হয় না। সমীরণ মলয় গিরির সৌরভসার সোহাগ করিয়া গায়ে মাখিল, প্রথম প্রথম কোকিল-কাকলি তাহার পরিচয় দিল; বিশ্ববাসী তাহার সুরভিশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া মলয় সমীরণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল; তাহার পর বসন্ত-দূতের ভেরি বাজুক আর নাই বাজুক, লোকে বুঝিল মলয় সমীরণ আপনি সমানই বহিতেছে। আমাদের "সমীরণ" বিশ্বের মঙ্গলোদ্দেশ্যে নিজের সমৃদ্ধির সহিত চিকিৎসা-তত্ত্ব বিজ্ঞানের সৌরভসার অঙ্গে মাখিয়া সাধুগণের সেবা করিতেছে, এখন চিকিৎসা-তত্ত্ব বিজ্ঞানের সমস্ত সম্পত্তি সমীরণের প্রত্যেক পরমাণুর সহিত মিশিয়া গিয়াছে;—এই মিলন অবিভাজ্য; শত বিপ্লবের তরঙ্গ ইহার বুকের উপর দিয়া বহিয়া গেলেও ইহার সম্মিলিত—একীভূত সম্পত্তির বিচ্ছেদ হইবে না। তবে আর এখন চিকিৎসা-তত্ত্ব বিজ্ঞানের ভেরি-নিস্বন কেন? যাহা নিত্য, তাহার প্রাণময় গুণ সমূহও নিত্য; সেই জন্য সেই নিত্য পদার্থের নাম করিলে তাহার গুণ সমূহের সত্তাও উপলব্ধ হইয়া থাকে, চিকিৎসা-তত্ত্ব বিজ্ঞান এখন সমীরণের নিত্য গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এখন "সমীরণ" বলিলে ইহাতে চিকিৎসা-তত্ত্ব বিজ্ঞানের সত্তা সম্যক উপলব্ধ হইয়া থাকে, তবে এই কোকিল কাকলির কল-ঘোষণার আর প্রয়োজন কি?———

আর এক কথা——

আজি কালি শব্দ সমূহের সংক্ষেপ সাধনেচ্ছা বর্ত্তমান সভ্যসমাজে বিশেষ সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে; কেহ অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্য, কেহ বা সময়ের আয় বাড়াইবার বাসনায় সকল বিষয়েরই সংক্ষেপ করিতেছেন, এই সভ্যতার হুজুগে পড়িয়া গড্ডলিকা প্রবাহে আমরাও গা না ঢালিয়া থাকিতে পারি কৈ? তাই বলি শুধু "সমীরণ" বলিলে কি ভাল হয় না? সভ্য পাঠকগণ ইহার মীমাংসা করিবেন। আমরাও চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণ এই উভয় নামের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ "সমীরণ" নামেই অভিহিত করিতে ইচ্ছা করিয়া

বর্ত্তমান মাস হইতে চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান

এবং সমীরণ কেবল

সমীরণ

নামেই প্রকাশিত করিলাম।

কবিরাজ—শ্রীআশুতোষ সেন,

স্বত্বাধিকারী।

২য় খণ্ড। ১৩০২ সাল—বৈশাখ। ৮ম সংখ্যা।

ভারতীয় আর্য্যজাতির বিচার ও দণ্ডবিধি।

সমাজ মাত্রেই সুশাসন ও সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য বিধিসমূহ প্রয়োজনীয় এবং সে সকল বিধির পরিচালন জন্য প্রভুশক্তি বা রাজশক্তির আবশ্যক। জাতীয় জীবনের শৈশব হইতেই এই প্রথা সকল সমাজেই পরিদৃষ্ট হয়। ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থাতেও সুশাসন স্থাপনার্থ যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাই আমাদের শাস্ত্র। "শাস্যতে অনেন" এই ব্যুৎপত্তিতে যখন "শাস্ত্র"শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে তখন এই শাস্ত্র "আইন" বই আর কিছুই নহে। কাল, পাত্র ও অবস্থাভেদে এখন অনেক আইন্ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও রহিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান দণ্ডবিধি আইনের ন্যায় পূরাকালেও অনেক দণ্ডবিধি আইন্ প্রচলিত ছিল। তখন সেই সকল আইন অনুসারে অপরাধীর বিচার ও দণ্ড হইত। কিরূপে আর্য্যঋষিগণের সময়ে অপরাধীর বিচার ও দণ্ড হইত, তৎকালে শাসন প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইতেছে।

প্রাচীন কালে অস্মদ্দেশে যে, সমাজে ধর্ম্ম ভয় প্রবল ছিল তাহা অনেকেই অবগত আছেন, আর সভ্যতার বৃদ্ধিতে যে ধর্ম্মভয় কমিয়া আসিতেছে তাহাও অনেকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আদিম অবস্থায় আদান প্রদানাদি অনেক কার্য্য কেবল ধর্ম্মসাক্ষ্য করিয়া নিষ্পন্ন হইত। ধর্ম্মসাক্ষ্য করিয়া, চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষ্য করিয়া ও গঙ্গোদক তাম্রাদি পবিত্র বস্তু স্পর্শ করিয়া কেহ প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা বলিতে সাহসী হইতেন না। পল্লীগ্রামে অশিক্ষিত সমাজে, বা স্ত্রীলোকের বিবাদাদি স্থলে আজিও এইরূপ, গঙ্গোদক তাম্র, তুলসী ব্রাহ্মণের চরণ, দেবমন্দির, ও সন্তানের মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করার প্রথা বর্ত্তমান আছে এবং অনেক অপরাধের বিচার কার্য্য এই প্রণালীতে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইংরেজাধিকারের প্রথম অবস্থায় এ দেশের আদালত সমূহে "হলপ" করিবার জন্য হিন্দুকে উক্ত পবিত্র বস্তু সকল এবং মুসলমানকে কোরান্ ও খৃষ্টানকে "বাইবেল" স্পর্শ করান হইত। বৃহস্পতি সংহিতায় জাতি

বিশেষে শপথের জন্য যে যে বস্তু নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা এই ;—

"গোবীজ কাঞ্চণৈবৈশ্যং শূদ্রং সর্ব্বৈস্তু পাতকৈঃ
পুত্রদারস্য বা প্যেবং শিরাংসি স্পর্শয়েৎ পৃথক
মেব ব্রাহ্মণে পাদাংশ্চ পুত্রদার শিরাংসি চ
এতেতু শপথা প্রোক্তা মনুনামল্প কারণৈঃ
সাহসেষ্বাপি শাপেচ দিব্যানিতু বিশোধনং"।

অধুনাতন প্রচলিত শাসন প্রণালীর ন্যায় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থাতে আইন্, আদালত, সাক্ষী সাবুদ সমস্তই ছিল। তৎকালে প্রধান বিচারক "প্রাড় বিবাক্" *নামে* (১) *অভিহিত হইতেন।* গুরুতর অপরাধ অর্থাৎ "দায়রা" মোকদ্দমায় রাজা ও অমাত্যবর্গকেও বিচার স্থলে উপস্থিত থাকিতে হইত। বাদী প্রতিবাদী ও সাক্ষীর জবানবন্দী রীতিমত লিখিয়া লওয়া হইত এবং বিচার সমাপ্ত হইলে জয়ীকে "জয়পত্র" প্রদত্ত হইত। এই "জয়পত্র"ই বর্ত্তমানের "রায" বা "ফয়শালা" তৎকালে গুরুতর অপরাধীর বিচারে কতকগুলি শপথের প্রথা প্রচলিত ছিল। এইরূপ শপথের প্রণালী পুরাকালে ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি অনেক দেশেও প্রচলিত ছিল! ইংল্যাণ্ডে ইহা "Ordeal" ও "Compurgation" নামে অভিহিত হইত।

আমাদের দেশে শাস্ত্রোক্ত নয় প্রকার পরীক্ষা প্রণালী প্রচলিত ছিল, যথা—তুলা, অগ্নি, জল, বিষ, কোষ, তণ্ডুল, উত্তপ্ত তৈল, উত্তপ্ত লৌহ পিণ্ড, ও প্রতিমূর্ত্তি পরীক্ষা। এই নয় প্রকার পরীক্ষা প্রকরণ ক্রমান্বয়ে নিম্নে লিখিত হইতেছে—

তুলা পরীক্ষায়—অপরাধীকে পূর্ব্বদিবস উপবাসী থাকিতে হইত। পরীক্ষার দিবস প্রাতে ব্রাহ্মণ যথাবিধি হোমাদি পূর্ব্বানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া স্নাত ও আর্দ্রবস্ত্র পরিহিত অপরাধীকে তুলাদণ্ডের একদিকে চড়াইয়া দিবেন এবং অপর দিকে তাহার ভারত্ব জ্ঞাপক প্রস্তরাদি রক্ষা করিয়া অপরাধীকে ঠিক্ ওজন করিয়া লইবেন। পরে তাহাকে তুলাদণ্ড হইতে নামাইয়া তাহার মস্তকে তৎকৃত অপরাধ লিখিত একখণ্ড কাগজ বাঁধিয়া *দিয়া ৬ মিনিট পরে পুনর্ব্বার ওজন করিবেন।* যদি অপরাধীর ভারত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা লঘুতর হয় তাহা হইলে সে নির্দ্দোষ, যদি অধিক হয় তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই দোষী, কিন্তু যদি সমান হয় তাহা হইলে পুনর্ব্বার ওই পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

অগ্নি পরীক্ষায়—নয় হস্ত লম্বা, দুই বিঘৎ বিস্তৃত ও এক বিঘৎ গভীর একটী গর্ত্ত অশ্বত্থাদি কাষ্ঠের জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা পরিপূর্ণ করিতে হয়। অপরাধী, শাস্ত্রোক্ত পূর্ব্বানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া নগ্নপাদে ঐ গর্ত্তের এক প্রান্ত হইতে দৈর্ঘের দিকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিবে। যদি তাহার পদতলে কোন প্রকার দগ্ধ চিহ্ন (ফোস্কা) দৃষ্ট হয় তাহা হইলে সে দোষী প্রমাণিত হইল, অন্যথা সে নির্দ্দোষ। পূর্ব্বকালে ইংল্যাণ্ডে এই অগ্নি পরীক্ষায় অপরাধীকে লোহিতোত্তপ্ত, লাঙ্গলের ফালের উপর দিয়া নগ্নপাদে হাঁটিয়া যাইতে হইত।

জল পরীক্ষায়—অপরাধী "হে বরুণ তুমি আমাকে সত্য দ্বারা রক্ষা কর" এই বলিয়া নাভি প্রমাণ জলে দণ্ডায়মান পুরুষান্তরের উরু অবলম্বন পূর্ব্বক জলে

(১) "বিবাদে পৃচ্ছতি প্রশ্নং প্রতিপন্নং তথৈব চ।
প্রিয়ং পূর্ব্বং প্রাগ্‌বদতি'প্রাড্‌বিবাকস্ততঃস্মৃতঃ॥

ডুব দিবে। সে ডুব দিবার পূর্ব্বে তীর হইতে স্থলের দিকে তিনটী শর নিক্ষিপ্ত হইবে; যে সময়ে অপরাধী ডুব্ দিবে ঠিক সেই সময়ে একজন লোক যথা-সাধ্য দ্রুতবেগে গমন পূর্ব্বক অধিকতর দূর পতিত শরটী গ্রহণ করিয়া পুন-রায় তীরে উপস্থিত হইয়াও যদি অপ-রাধীকে মগ্ন অবস্থায় দেখে তবে সে নির্দ্দোষ আর যদি তৎপূর্ব্বে সে উঠিয়া থাকে তাহা হইলেই তাহার "অপরাধ" প্রমানীকৃত হইল। স্থল বিশেষে অপ-রাধীর এইরূপ জলমগ্ন অবস্থার সময়ের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাশী অঞ্চলের নিয়ম এইরূপ ছিল যে কোন ব্যক্তির সহজভাবে পঞ্চাশ পদ যাইতে যত সময় লাগে অপরাধীকে ততক্ষণ জল মধ্যে অবস্থান করিতে হইবে। এখন কার "ডুবরিয়াগণ" তৎকালে বর্ত্তমান থাকিলে নিশ্চয়ই এই পরীক্ষায় জয়লাভ করিতে পারিত।

বিষ পরীক্ষা সাধারণতঃ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ অপরাধী সপ্ত যব পরিমিত, ঘৃতাক্ত বিষ (১) ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে লইয়া ভক্ষণ করিবে, যদি বিনা শারীর বিকারে সেই বিষ জীর্ণ করিতে পাবে তাহা হইলেই তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমান হইল। দ্বিতীয়তঃ কলসী বা তাদৃশ কোন মৃৎপাত্রে বিষধর ফণী রাখিয়া তন্মধ্যে একটী অঙ্গুরীয়ক নিক্ষেপ করিতে হইবে, অপরাধী তন্মধ্যে হস্তার্পণ করিয়া, সর্পদষ্ট না হইয়া যদি উক্ত অঙ্গুরীয়ক উত্তোলন করিতে পারে তবে সে নিশ্চয়ই নিরপরাধ অন্যথা তাহার দোষ সাব্যস্ত হইবে।

(১) অনেকের মতে এই বিষ সর্পবিষ নহে।

কোষ পরীক্ষায় ব্রাহ্মণ দুর্গা প্রভৃতি উগ্র দেবতার পূজা করিয়া সেই স্নান জল, তিন প্রসতি পরিমিত অভিযুক্তকে বিচারকের সমক্ষে পান করাইবেন, যদি চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে অভিযুক্তের কোন শারীরিক অনিষ্ট সংঘটিত হয় তাহা হইলে সে দোষী অন্যথা নির্দ্দোষ।

যখন একাধিক ব্যক্তি এক চৌর্য্য অপরাধে ধৃত হয় তখন শালগ্রাম শিলা দ্বারা তণ্ডুল ওজন করিয়া তাহা প্রত্যেককে চর্ব্বনার্থ দেওয়া হইত। ক্ষণকাল পরে সেই চর্ব্বিত তণ্ডুল অশ্বত্থ বা ভূর্জ্জ পত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে যদি তাহাতে রক্তের চিহ্ন দেখা যাইত তাহা হইলে যাহার চর্ব্বিত তণ্ডুল ঐরূপ রক্ত সংযুক্ত হইয়াছে তাহাকে নিঃসন্দেহ চোর বলিয়া শাস্তি প্রদান করা হইত। বর্ত্তমান ইতর সমাজে ও পল্লীগ্রামে আজিও "চাউলপড়া" খাওয়াইবার প্রথা প্রচলিত আছে; বস্তুতঃ আমাদের দেশের "চাউলপড়া" "জলপড়া" প্রভৃতিতে উক্ত শাস্ত্রোক্ত পরীক্ষা বা শপথ প্রণালীর ছায়া পরিদৃষ্ট হয়। দ্রব্যগুণ ও বিশ্বাসের যে কীদৃশ শক্তি তাহা কে বলিবে? আমরা আমাদের সামান্য বুদ্ধির উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া অনেক বিষয় অগ্রাহ্য ও অসম্ভব বলিয়া থাকি, কিন্তু বিশ্বস্রষ্টার মহান্ সৃষ্টি ব্যাপারে আমরা যে কীটানুকীট, অনন্ত জ্ঞানময়ের অসীম শক্তির নিকট ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র মানব শক্তি যে মহাসমুদ্রের নিকট গোষ্পাদ তুল্য তাহা গর্ব্বিত মানব কি বুঝিতে পারে!! যে বিজ্ঞানের কথা লইয়া আমরা স্পর্দ্ধা করি তাহা আজিও অসম্পূর্ণ, তাহাও

শিশু, এ কথা ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্ মহোদয়গণই বলিতেছেন। ফলকথা কিসে যে কি হয় তাহা বুঝিয়া উঠা মানবের পক্ষে বড় সহজ কথা নহে।

ঘৃত বা তৈল পূর্ণ লৌহ কটাহে অগ্নির উত্তাপ দিলে যখন ঘৃত বা তৈল ফুটিতে থাকিবে সেই সময়ে একটি অঙ্গুরীয়ক বা মুদ্রা তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হয়। অপরাধীকে তন্মধ্যে হস্ত-প্রদান করিয়া সেই অঙ্গুরীয়ক বা মুদ্রা উত্তোলন করিতে হয় যদি অপরাধীর হস্তে দগ্ধ চিহ্ন দৃষ্ট না হয় তবে সে নির্দোষ। স্থল বিশেষে ধান্যাদি দ্বারা সেই হস্ত ঘর্ষিত হইত যদি তাহাতেও হস্তে ফোস্কা বা দগ্ধ চিহ্ন প্রত্যক্ষ না হইত তাহা হইলে সে অব্যাহতি পাইত। যদি তাহার হস্তে তিলাদি কোন চিহ্ন থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বে সেই স্থান অলক্তাদি রঙ্গে চিহ্নিত করা আবশ্যক।

উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড পরীক্ষার প্রকরণ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেরূপ উক্ত আছে পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—হে অগ্নে, তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ, হে পাবক, তুমি সাক্ষীর ন্যায় আমার পাপ পুণ্য পরিদর্শন করিয়া যাহা সত্য হয় তাহা প্রকাশ কর” অভিযুক্ত এই মন্ত্র পাঠ করিলে প্রাড়্বিবাক তাহার অশ্বত্থ পত্রাচ্ছাদিত করতলে পঞ্চাশৎ পল পরিমিত লোহিতোত্তপ্ত লৌহপিণ্ড স্থাপন করিবেন। অভিযুক্তকে সেই লৌহপিণ্ড হস্তে করিয়া সপ্তমণ্ডল অতিক্রম করিতে হইবে। (ষোড়শ অঙ্গুলি অন্তর বিরচিত এক একটী মণ্ডলের পরিমাণ ষোড়শ অঙ্গুল) পরে উক্ত পিণ্ড পরিত্যাগ করিলে ধান্যাদি দ্বারা করতল ঘর্ষণ করিয়াও যদি কোন দগ্ধ চিহ্ন দৃষ্ট না হয় তবে সে অব্যাহতি পাইবে অন্যথা সে দোষী।

মূর্ত্তি পরীক্ষায়—একটী রৌপ্য নির্ম্মিত ধর্ম্ম মূর্ত্তি ও আর একটী লৌহ নির্ম্মিত অধর্ম্ম মূর্ত্তি কোন গভীর মৃৎপাত্রে রক্ষা করিতে হয়। অপরাধী আবৃত চক্ষে তন্মধ্যে হস্ত প্রদান করিয়া যদি ধর্ম্মের মূর্ত্তি উত্তোলন করিতে পারে তবে সে নির্দ্দোষ, আর অধর্ম্মের মূর্ত্তি উত্তোলন করিলেই আর অব্যাহতি নাই।

পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষায় বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করার প্রথা ইংরেজ শাসনের প্রথম অবস্থাতেও বর্ত্তমান ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে কাশী অঞ্চলের উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড ও উত্তপ্ত তৈল পরীক্ষার দুইটী বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। (১)

“১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কাশীর শঙ্কর নামক জনৈক ব্যক্তি তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট আলি ইব্রাহিম খাঁর এজলাসে চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হয়। শাস্ত্রোক্ত শপথাদি দ্বারা অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় বাদীর অভিমতে তাহাকে শাস্ত্রোক্ত উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড পরীক্ষার আদেশ প্রদত্ত হয়। পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইলে স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট ও কাশীর প্রধান প্রধান পণ্ডিত এবং জনসাধারণের সমক্ষে উক্ত শঙ্কর শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড হস্তে করিয়া নির্দ্দিষ্ট মণ্ডল অতিক্রম পূর্ব্বক লৌহপিণ্ড পরিত্যাগ

(১) Vide Asiatic Researchs. Chapter XXIII (23d Chapter)

করে। তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তদ্বয় ধান্যাদি দ্বারা ঘর্ষিত হইলেও দগ্ধ-চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। অভিযুক্ত শঙ্কর এইরূপে পরীক্ষায় জয় লাভ করিয়া অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

আর একবার ঋষীশ্বর ভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রামদয়াল নামক জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে চৌর্য্যাপবাদের অভিযোগ আনয়ন করে। প্রথমতঃ তাহাকে গঙ্গোদক, তুলসী, হরিবংশ পুস্তক ইত্যাদি তৎকাল প্রচলিত দ্রব্যাদি স্পর্শ করাইয়া শপথ করান হয় কিন্তু তাহাতে অভিপ্রেত ফল লব্ধ না হওয়ায় বাদীর সন্তোষার্থ তাহার প্রতি উত্তপ্ত তৈল পূর্ণ কটাহে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ অঙ্গুরীয়ক উত্তোলন করিবার আজ্ঞা প্রদত্ত হয়, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহার হস্তে কিছুমাত্র দগ্ধ চিহ্ন (ফোস্কাদি) দৃষ্ট হয় নাই। এইরূপে সে ভীষণ পরীক্ষায় জয় লাভ করিয়া নিজের দোষ ক্ষালন পূর্ব্বক হাস্যমুখে বিচারালয় হইতে প্রস্থান করিল।

জাতিভেদে, অপরাধভেদে ও সময় ভেদে পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা সমূহের ইতর বিশেষ হইত। ব্রাহ্মণের পক্ষে তুলা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অগ্নি, বৈশ্যের পক্ষে জল এবং শূদ্রের পক্ষে বিষ পরীক্ষা প্রযুজ্য। যাজ্ঞবল্ক্য মতে স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ এবং যোগীদিগের পক্ষে তুলা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সপ্ত যব পরিমিত বিষ প্রশস্ত পরীক্ষা কাহারও মতে আবার বিষ ব্যতীত আর সকল পরীক্ষাই ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রযুজ্য। এবং বিষ ও জল ব্যতীত সকল পরীক্ষাই শূদ্রের পক্ষে প্রযুজ্য। মাস ও তিথী সম্বন্ধে মিতাক্ষরায় এইরূপে লিখিত আছে যথা—অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ফাল্গুন, শ্রাবণ এবং ভাদ্র অগ্নি পরীক্ষা, আশ্বিন, কার্ত্তিক, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় জল পরীক্ষা, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন বিষ পরীক্ষার, প্রশস্ত সময়। উভয় পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথী, ভাদ্র মাস এবং শনি মঙ্গলবার জল পরীক্ষায় নিষিদ্ধ। শত সুবর্ণ মুদ্রা মূল্যোপযোগী দ্রব্য চুরি করিলে বিষ, অশীতি সুবর্ণ মুদ্রায় অগ্নি, চত্বারিংশ সুবর্ণ মুদ্রায় তুলা, দশ হইতে বিশ সুবর্ণ মুদ্রা কোষ এবং দুই সুবর্ণ মুদ্রার দ্রব্য চুরি করিলে তণ্ডুল পরীক্ষাই বিধি।

ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের পক্ষে উপস্থ, উদর, জিহ্বা, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, কর্ণদ্বয়, চক্ষু, নাসিকা এবং উৎকট অপরাধস্থলে সমুদয় দেহই শাস্তির স্থল স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণের পক্ষে শারীরিক দণ্ডের বিধান প্রায় নাই; উৎকট অপরাধে ব্রাহ্মণের "নির্ব্বাসনই" চরম দণ্ড। ফল কথা ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও বালকের প্রতি নিয়মের শিথিলতাই দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে অনেকেই ব্রাহ্মণগণের প্রতি নিয়মের শৈথিল্য দৃষ্টে শাস্ত্রকর্ত্তাদিগকে একদেশদর্শী বা পক্ষপাতী বলিয়া থাকেন, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ও তখনকার সমাজের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে শাস্ত্রকর্ত্তারা কেবল স্বজাতি প্রিয়তার বশবর্ত্তী হইয়া—ব্রাহ্মণগণের শাস্তির শিথিলতা করিয়া যান নাই; এরূপ করিবার তাঁহাদের সুন্দর যুক্তি ও উত্তম কারণ ছিল। তখন সমাজে বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানে ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বাধিক উন্নতিলাভ করিয়া সমাজের নেতা হইয়া

উঠিয়াছিলেন। নিয়ত বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে তাঁহাদের চিত্ত যত উন্নত ও বিশুদ্ধ ছিল, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানান্ধ শূদ্রাদির চিত্ত কথনই তত বিশুদ্ধ ও উন্নত ছিল না সুতরাং এই শেষোক্ত জাতিরই কুকর্ম্মে অধিক আসক্তি থাকাই সম্ভাবনা। রোগানুসারেই যেমন ঔষধের তারতম্য, অবস্থানু সারে যেমন ব্যবস্থার তারতম্য সেইরূপ জাতীয় প্রকৃতি অনুসারে শাস্তিরও তারতম্য না হইলে শাসন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না যাহার যেরূপ প্রকৃতি তাহার পক্ষে সেইরূপ শিক্ষা প্রয়োজনীয়। আর এক কথা এই যে তৎকালে সকল প্রয়োজনীয় অথচ সামাজিক হিতকর কার্য্যে ব্রাহ্মণের সহায়তা ও পরামর্শ আবশ্যক হইত কারণ সমাজে তাঁহারাই বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ছিলেন। ঈদৃশ, বিজ্ঞ বিচক্ষণ এবং সমাজের সার স্বরূপ ব্রাহ্মণগণকে বধদণ্ডে নির্ম্মূল করিলে ক্রমে সমাজের সারাংশ কমিযা যাইবে ও অসারাংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সমাজকে উতপ্লুত করিযা ফেলিবে। বাস্তব পক্ষে দেখিতে হইলে শাস্তির কঠোরতা থাকিলেই পাপের ভয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সুতরাং পাপ কার্য্যে পশ্চাদ পদ হইতে হয়। অতএব শাস্তির কঠোরতা শূদ্রগণের অমঙ্গল জনক নহে বরং ইহা তাঁহাদের অশেষ মঙ্গলেরই নিদান ও সামাজিক মর্য্যাদার মূল ভিত্তি।

সে যাহাই হউক তৎকালে চৌর্য্যাপরাধে কিরূপ বিচার ও শাস্তি হইত তাহা দেখা যাউক। কোন স্থানে চৌর্য্য বৃত্তি হইলে রাজপুরুষগণ সরেজমিনে তদারক করিবার জন্য ঘটনাস্থলে যাইতেন এবং চোর-সন্দেহে—দাগি চোর, জাতিনাম অপলাপকারী, দ্যুত-বারাঙ্গনা মদ্যাসক্ত ব্যক্তি এবং যাহার আয় নাই অথচ ব্যয় আছে এরূপ ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিতেন। চৌর্য্যাপরাধ প্রমানিত হইলে অপহৃত বস্তুর মূল্যানুসারে তাহার নিরোধ, নিগড় বন্ধন, তর্জনীচ্ছেদন, কর চ্ছেদন, পদ চ্ছেদন এবং কখন কখনও শূলারোহণ শাস্তিরও ব্যবস্থা হইত। নিকৃষ্ট বর্ণ যে অঙ্গ দ্বারা উৎকৃষ্ট বর্ণের পীড়া দিবে তাহার সেই অঙ্গ কর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইত, ফলতঃ শূদ্রাদিকে বশীভূত রাখিবার জন্য তাঁহারা অনেক স্থলেই তাহাদের প্রতি শাস্তির কঠোরতা দেখাইয়া গিয়াছেন।

পরদার গমনে বর্ণশঙ্করোৎপত্তি প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় আর্য্যঋষিগণ এই অপরাধে অতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ছেন, কিন্তু এস্থলেও বর্ণানুসারে শাস্তির তারতম্য রহিয়াছে। অর্থাৎ শূদ্রের ব্রাহ্মণী গমনে যেরূপ শাস্তি ব্রাহ্মণের শূদ্রানি গমনে তদপেক্ষা অনেক অল্প, এইরূপ বর্ণের ক্রম নিম্নতানুসারে শাস্তির আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি উচ্চ বর্ণা স্ত্রী নিজ পতি পরিত্যাগ করিয়া নীচবর্ণ পুরুষে আসক্তা হয় তাহা হইলে ঐ স্ত্রীকে কুকুর দিয়া ভক্ষণ করাইবে এবং উক্ত জার পুরুষকে অগ্নি দগ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিবে ইহাই মনুর ব্যবস্থা। স্ত্রীলোক সকামা ও অকামা ভেদে এবং বর্ণের উচ্চনীচতানুসারে অঙ্গবিশেষ ছেদন আবার স্থল বিশেষে বধ দণ্ডও হইত। গুরুতর অপরাধে তৎকালে বধ ও নির্ব্বাসন এই উভয়বিধ দণ্ডই প্রচলিত ছিল। এই বধদণ্ড,

কখন শূলে দিয়া, কখনও দগ্ধ করিয়া, কখনও জলে ডুবাইয়া সম্পন্ন হইত। অতিশয় দোষান্বিতা, স্বগর্ভপাতিনী, পুরুষ হন্ত্রীকে গলায় প্রস্তর বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। বধার্থে বিষ প্রয়োগ, গৃহে অগ্নিদান বা হত্যাপরাধে তখনও বধ দণ্ড প্রবর্ত্তিত ছিল তবে ব্রাহ্মণ যে বধার্হ নহে তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

বাণিজ্যার্থে "কোম্পানি" গঠনের পদ্ধতিও তৎকালে প্রচলিত ছিল। রাজা যে দ্রব্যের যেরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন কেহই তাহার অতিরিক্ত মূল্য লইতে ও রাজার নিষিদ্ধ বস্তু বিক্রয় করিতে পারিতেন না। ব্যবসায়ীর নিকট হইতে রাজা লভ্যাংশের বিংশতি ভাগের এক ভাগ শুল্ক স্বরূপে গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত, উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ এবং অর্থদণ্ড রাজার প্রাপ্য ছিল।

এইরূপ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি, দায় বিভাগ, কুশীদ গ্রহণ প্রভৃতি সমস্ত ব্যবহারিক বিষয়েই আর্য্যঋষিরা নিয়ম সমূহ বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত দায়বিভাগানুসারে আজিও হিন্দুর বিচার কার্য্য হইয়া থাকে। সীমা নিষ্পত্তি ও কুশীদ গ্রহণ প্রকরণ বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

দুটা পুরাণ কথার আলোচনা।

খৃঃ ১৮৭২। গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক ভারত শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বেশ সুচারুরূপেই শাসন কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। নূতন শাসনকর্ত্তারও যশ বিস্তার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে দুর্ভিক্ষের প্রথম সূত্র দেখা দিল, পরবৎসর মে মাসে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ; সাধারণ প্রজাবর্গের আর বাঁচিবার আশা নাই, অনাহারে মৃত্যুই তাহাদের অদৃষ্ট লিখন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে মৃত্যু যন্ত্রণা সম্বন্ধে আর এদেশীয়গণকে অধিক বলিতে হইবে না; অন্যান্য বিষয়ে ইংরাজের সহিত তুলনায় ইহাঁরা যতই কেন অপকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত হউন না, সভ্যতম বাইবেল প্রচারক খৃষ্টান জাতি ইংরাজ রাজ্যে বাস করিয়া দুর্ভিক্ষের প্রপীড়ন, অর্দ্ধাশন ও সময়ে সময়ে অনাহার যন্ত্রণা ভোগে, ইংরাজ—শুধু ইংরাজই বা কেন—পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই বোধ হয় তুলনায় ইহাঁদের সমকক্ষ নহেন। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত দুর্ভিক্ষে কিন্তু নর্থব্রুক সাহেব ও অন্যান্য কতিপয় রাজ কর্ম্মচারী প্রজাগণের কষ্ট নিবারণে যে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন, বাস্তবিকই তজ্জন্য দেশীয়গণ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। জমিদারবর্গের মুখপত্র স্বরূপ বৃটীষ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশন এই জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশও করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রজাগণের কষ্ট নিবারণে নর্থব্রুক সাহেব যে পন্থা অবলম্বন ও যে পরিশ্রম

করিয়াছিলেন আজি কালের দিনে সরকারী কর্ম্মচারীগণ তাঁহার একটুও অনুসরণ করিলে আমাদের হয়ত এত দুঃখ থাকিত না। তবে কথা হইতেছে এখন "সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।" তখন তখন বিলাতবাসিগণ যেরূপ পরদুঃখ কাতরতা ও সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন এখন শত কংগ্রেস স্বত্ত্বেও তাহা আর পাইবার যো নাই। আয়র্ল্যাণ্ডের দুর্ভিক্ষে সতর্ক হইতে শিখিয়া তখন বিলাতবাসী কেহ কেহ একথা তুলিয়াও নর্থব্রুককে সতর্ক করিয়াছেন যে অনাহারে মৃত প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনের জন্য একমাত্র তাঁহাকেই দায়ী হইতে হইবে। এরূপ দায়িত্ব আছে বলিয়া ইহাঁদের এখন আর বোধ হয় স্মরণ নাই।

যাক্, কথায় কথায় অন্যদিকে আসিয়া পড়িয়াছি। লর্ড নর্থব্রুক সুচারুরূপে তাঁহার কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন, যশঃ সৌরভও ভারতময় বিকীর্ণ হইয়াছে, এমন সময়ে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে একটু গোলের কথা উঠিল। সেদিন ইলবার্ট বিল লইয়া যে অভিনয়, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে তাহারই প্রথম অঙ্কের অভিনয়ের কথা উঠিল—তথায় যে সকল ইংরাজ বাস (?) করিতেছেন, তাহাদিগের অপরাধের বিচার ক্ষমতা ত্রিবাঙ্কুররাজের হস্তে থাকিবে না। কথাটা বড় সামান্য নয়, প্রকারান্তরে বলিতে গেলে, ইহা আর কিছুই নয় কেবল ত্রিবাঙ্কুররাজের রাজকীয় ক্ষমতা হরণমাত্র। সকলেই সমস্বরে (অবশ্য দেশীয় মহলে) ইহার প্রতিবাদ তুলিল, সংবাদ পত্রে এই বিষয় লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিতে লাগিল। লর্ড নর্থব্রুকের যশোরবি কিঞ্চিৎ ম্লান হইল।

এই প্রতিবাদস্বর না থামিতেই সংবাদপত্রের কালী না শুষ্ক হইতেই আবার যে ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ আসিল, তাহাতে সকলেই চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া ভয়াকুলিত নেত্রে লর্ড নর্থব্রুকের শাসন প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল সকলেই ভাবিল, ভারতের আর মঙ্গল নাই, দেশীয় রাজা মহারাজগণের কপাল ভাঙ্গিয়াছে, ডালহৌসি প্রবর্ত্তিত রাজ্য বৃদ্ধি নীতি তাঁহার শাসন প্রণালীর সহিত ফুরায় নাই, মহাত্মা রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যবাণী "সব লাল হো যাগা"—সফল হইতে যাহা কিছু অভাব ছিল, তাহার পূরণ করা হইল। ইংরাজের ভারতে সামান্য বণিক বেশে প্রবেশ অবধি ইংরাজ, শুধু ইংরাজই বা কেন—কাইসর বা নাদির সাহাও যে কার্য্য করিতে স্বপ্নেও সাহস করে নাই, সুদূর ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি আজ সে কার্য্য অবাধে সুসম্পন্ন করিলেন—শান্তিপূর্ণ রাজ্যে একজন দেশীয় স্বাধীন রাজাকে স্বরাজ্য মধ্যে সামান্য ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দী করিলেন। পূর্ব্বে বোধ হয় আর কোন রাজাই এরূপ ক্ষমতা বিস্তারে সক্ষম হয়েন নাই। শুনা গিয়াছে বটে—হীনবল রাজা প্রবল রাজা কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছেন, সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন এমন কি বন্দীর হত্যা পর্য্যন্ত সাধিত হইয়াছে—কিন্তু তাহা পূর্ব্বকালে—শান্তিপূর্ণ রাজ্যে নহে, যুদ্ধকালে পরাক্রান্ত রাজাকে ধৃত করা হইয়াছে, কিন্তু সেও আপন প্রজা কর্ত্তৃক প্রজাবিদ্রোহের সময়, কিন্তু ইহাও কি তাই? চতুর্দ্দিকেই শান্তি বিরাজমান, ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত কোন বিবাদ নাই, বিবাদের কোন পূর্ব্ব

লক্ষণও হয় নাই, অথচ এক বৃথা ধূয়া তুলিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রাজাকে এক কথায় রাজ্যচ্যুত করিয়া সামান্য অপরাধীর ন্যায় বিচারে নীত করিতে ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। এই সকল স্বাধীন মিত্ররাজের সহিত ভারত গভর্ণমেণ্ট সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকিলেও, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় দেশীয় স্বাধীন রাজাগণের "স্বাধীনতা" গভর্ণমেণ্টের খেলার সামগ্রী ব্যতীত আর কিছুই নয়, সন্ধিপত্র কেবল স্তোক-বাক্যমাত্র, যতদিন সুবিধা না ঘটে ততদিনই সন্ধিপত্রের সম্মান; সুযোগ ঘটিলেই সন্ধিপত্র পদদলিত হয়; পরম বন্ধুকে শত্রু ভাবিয়া "জোর যার, মুলুক তার" নীতির সার্থকতা সাধন করিয়া, রাজনীতি ও মানব ধর্ম্ম (?) পালন করা হয়।

এ সম্বন্ধে একজন প্রধানতম ইংরাজ কি বলেন, শুনুন—"This treaty or compact remains in force so long as the motive which led to its being entered into—whether fear of danger or prospect of advantage—continues to be felt, for no engagement is ever made, save in the hope of some benefit, or from the fear of some evil If the ground of the compact be taken away, the compact comes to an end itself as is proved by every day experience."—অর্থাৎ, যে কারণে সন্ধি করা হইয়াছে, যতদিন সেই কারণ—তা সে বিপদ ভয়ই হউক আর সুবিধার প্রত্যাশাই হউক—বর্ত্তমান আছে বলিয়া অনুভূত হয়, সন্ধিসূত্রেরও ততদিন সম্মান; কারণ, উপকার প্রত্যাশা বা বিপদ্ভয় ব্যতীত কেহ কোন কড়ার করে না। কড়ারের কারণ অপসারিত হয়, দেখিবে—কড়ারও অন্তর্হিত হইয়াছে। দৈনিক বহুদর্শিতায় ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।" বাস্তবিকই ইহা পাশ্চাত্য রাজনীতির মূল মন্ত্র। এক কথায় প্রতিজ্ঞা—মুখের কথামাত্র, সন্ধিপত্র—কেবল কাগজমাত্র; দায়ে পড়িলেই ইহা করিতে হয়, আবার সুযোগ পাইলেই ভঙ্গ করিতে হয়।

আজ মহারাষ্ট্র বীর শিবজীর বংশধর ভারতগবর্ণমেণ্টের মিত্র, স্বাধীন বরোদা রাজ মলহর রাও নর্থব্রুকের নিকট নত শিরে, যোড় করে বিচারপ্রার্থী। ন্যায় হউক, অন্যায় হউক অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে বস্তুতঃ বরোদা কাণ্ডটী বড় সামান্য নয়, ডালহৌসি কর্ত্তৃক অযোধ্যার রাজা বৃটীশ সাম্রাজ্য ভুক্ত হইবার পর, সিপাহী যুদ্ধের পর এত বড় কাণ্ড আর ঘটে নাই। এই ঘটনাতেই ইংরাজ রাজের সহিত দেশীয় রাজা মহারাজগণের সম্বন্ধাসম্বন্ধ নির্ণীত হইতেছে। এই ঘটনাতে আরও বিশেষত্ব এই যে, যেরূপ সহজে ইহার নিষ্পত্তি হইতেছে, যেন ইহা কিছুই নয়, যেন রাজ্যের কোথাও কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই, কোন বিশৃঙ্খলতা নাই, যেন রাজ্য বেশ শান্তিপূর্ণ। বরোদা রাজ্যেও রাজা সিংহাসন চ্যুত হইয়া নর্থব্রুক্ পদে কৃপাকাঙ্ক্ষা, কিন্তু রাজকার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় চলিতেছে, রাজ্য মধ্যে এমন কি একটী কলও মুহূর্ত্তের জন্য বন্ধ হয় নাই; একটী মহান্ রাজ্যের অদৃষ্ট লইয়া যে

সুরতিখেলা চলিতেছে, গবর্ণমেণ্ট হাউসে, সেজন্য কোন গোলই নাই। যুদ্ধ লড়াই না হইলেও ইহা দুইটী ক্ষমতার সংঘর্ষণ, কেবল রাজনৈতিক বুদ্ধির পরীক্ষা।

সামান্য একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর রিপোর্টে নির্ভর করিয়া যে ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি একজন রাজাকে তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য সামন্ত ও প্রজাগণের সম্মুখেই ধৃত করিবার আদেশ দেন, আর সেই রাজাও যে, দ্বিরুক্তিটী মাত্র না করিয়া আত্মমর্য্যাদা বজায়ের জন্য বিক্রম প্রকাশ বা কোন যত্নই না করিয়া, ইংরাজ জোতে আপন গলা বাড়াইয়া দিলেন, ইহাতেই দেশীয় রাজবর্গের ক্ষমতা পক্ষান্তরে ইংরাজের প্রভুত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। হায়! জীবনের মায়া কি এতই অধিক? যাহাদের প্রতাপে এক সময়ে দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজন্দারও চমৎকৃত হইয়াছিলেন ও ভারত অধিকারে অসমর্থ হইযাছিলেন, যে প্রতাপ ও শিবজীর জন্য মোগল সম্রাট আকবর, ঔরঙ্গজেবের তুল্য ব্যক্তিদিগেরও দিন নিশ্চিন্তে কাটে নাই, তাঁহাদেরই বংশধরগণ যে আজ ইংরাজের ক্রীড়নক হইবেন, সতরঞ্চ খেলার বাজার অপেক্ষাও যে হীনবল হইবেন, তাহা কে ভাবিয়াছিল?

কুক্ষণে বরোদারাজমল্‌হাররাও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কুক্ষণে তিনি রাজদণ্ড গ্রহণ করিযাছিলেন। ১৮৭০ সালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খান্দিরাওএর মৃত্যুতে মল্‌হাররাও সিংহাসনাধিরোহণ করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ১৮৭২ সালে লর্ড নর্থব্রুক গবর্ণর জেনেরেলরূপে নিযুক্ত হয়েন। বিশাল রাজ্য-ভার গ্রহণ অবধি নর্থব্রুকের বরোদার উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি থাকে। কিছু দিন গেল, নর্থব্রুক শুনিলেন—বরোদা রাজ্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে, রাজ্য সুশাসিত হইতেছে না, নূতন রাজা মল্‌হাররাও রাজ্যভার গ্রহণের অনুপযুক্ত। ইংরাজ রাজ্যে কোন অত্যাচার অবিচার ঘটিবার যো নাই। বরোদা রাজের নামে অভিযোগ শুনিয়া তিনি অনুসন্ধানের জন্য ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের শীতকালে এক কমিসন বসাইলেন। অনেক চিন্তার পর কমিসন স্থির করিলেন রাজা প্রকৃতই দোষী। পর বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে কমিসন হইতে এই সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল হইল। বড়লাট বাহাদুর বরোদারাজকে চরিত্র সংশোধনের জন্য দেড়বৎসর সময় দিলেন ও কর্ণেল ফেয়ারকে বরোদার রেসিডেণ্ট্ নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু হায়! সে কাল দেড়বৎসর আর কাটিল না। ছয় মাস না যাইতে যাইতে কাপ্তেন ফেযার বড়লাটের নিকট মল্‌হাররাওযের বিরুদ্ধে ভয়ানক এক অভিযোগ আনয়ন করিলেন,—বরোদা রাজ নাকি কাপ্তেন রেসিডেণ্ট ফেয়ারকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অভিযোগের সত্যাসত্য অবশ্য অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গেই কিছু প্রমাণিত হইল না। কিন্তু বড়লাট এই কথা শুনিয়াই ইহার বিচারের জন্য অতি ব্যস্ত হইলেন। অবশ্য হইবারই কথা বটে। একজন কালা আদমি—তা তিনি রাজাই হউন আর কুটীরবাসীই হউন যে, একজন শ্বেতকাযের বিশেষ কাপ্তেন ফেয়ারের ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তির হত্যা সাধনে চেষ্টিত, একথা শুনিয়া কোন

শ্বেতকায় ব্যক্তির ধমনীতে উষ্ণ রক্ত না প্রবাহিত হইবে, কোন ব্যক্তি না ইহার বিচারে সমুৎসুক হইবে? কিন্তু বড়লাটের এই অতি ব্যস্ততার জন্যই যত প্রমাদ। বড়লাট্ পুলিশ কর্ম্মচারী মিঃ স্টুটারকে এই ঘটনা সম্বন্ধে তদারকে পাঠাইলেন ও গুইকুমারকে আটক করিবার জন্য আদেশ বাহিব করিলেন। দোষ প্রমাণিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে বন্দী করিয়া বড়লাট যে কিরূপ কর্ত্তব্য-সাধন করিয়াছেন এখন সেই বিষয়েব একটু আলোচনা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

অবশ্য এই ঘটনায় সকলেবই মন গুই কুমারের দিকে কিছু আকৃষ্ট হইয়াছে। সকলেই মনে করিতেছে, যেন দোষ প্রমাণিত হইবার পূর্ব্বে গুইকুমারকে বন্দী করিয়া বড়লাট ভাল কাজ করেন নাই। যখন আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা কবিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন আমরা কোন পক্ষেই পক্ষপাতী হইতে ইচ্ছুক নহি। বাস্তবিকই যদি গুইকুমার ইংবাজ প্রতিনিধির প্রাণহিংসা কবিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আব আমাদেব বলিবাব কিছুই নাই। তিনি যদি বৃটীষ বাজেব একজন সামান্য প্রজা হইতেন আর তাঁহাকে উক্তরূপে বিচারে নীত করা হইত তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি কেবলমাত্র সুবিচার হইলেই আব আমাদেব বলিবাব কিছুই থাকিত না। কিন্তু গুইকুমার একজন মহা সম্ভ্রান্ত মিত্র রাজ; বৃটীষ রাজ্যে তাঁহার সম্মানসূচক ২১টী তোপ ধ্বনি হয়, এরূপ ব্যক্তি যে কোন বিশেষ অন্যায় কার্য্য করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন, ইহাও আমাদিগের অভিপ্রেত নয়। তবে রাজাব পাপে যে বৃটীষশাসনে রাজ্য নষ্ট হয়, ইহা দেখিতে আমাদিগেব আদৌ ইচ্ছা নহে। গুইকুমাব মল্হাববাও ববোদাবাজ্যেব প্রতিনিধি মাত্র; ইঁহাব কোন অপরাধে ববোদারাজ্যের পাছে কোন অনিষ্ট সাধিত হয় বা এই লইযা অপরাপব দেশীয় বাজ্যেব সম্ভ্রম হানি হয়, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক ভয়। ববোদারাজকে হৈটমুণ্ডে বিচারে নীত করা এবং অপরাধী সাব্যস্ত হইলে তাঁহার দণ্ড ব্যবস্থা ও সেই সঙ্গে ববোদা এবং অন্যান্য রাজ্যের সম্ভ্রম পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা এক সঙ্গে এই উভয় উদ্দেশ্য সাধন বড়ই কঠিন, কারণ ইহাদিগেব পরস্পর সম্বন্ধ অতি নিকট, একের অদৃষ্টের সহিত অপরের অদৃষ্টের ফলাফল অবিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রথিত। আমাদিগেব বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক কিরূপে এই বিষয়ের মীমাংসা কবিযাছেন দেখা যাক্।

এ সম্বন্ধে বড়লাট বড় কৃতকার্য্য হন নাই। প্রকৃত পক্ষে উভয় উদ্দেশ্য সাধনেব মধ্যে একটীতে গুইকুমারেব বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যাসত্য অনুসন্ধানে ও অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হইলে তাঁহাব দণ্ড ব্যবস্থার প্রযোজনীয়তা দেখিযা এই দিকে অধিক লক্ষ্য রাখিতে গিযাই বোধ হয় তিনি অপর উদ্দেশ্য যেটী অধিকতর প্রয়োজনীয় ও কঠিন—তাহাতেই ভ্রষ্ট হইয়াছেন। অবশ্য প্রথম উদ্দেশ্য সাধণের প্রয়োজনীয়তা যে গুরুতর, সে বিষযে কাহারও সন্দেহ নাই। ন্যায়পরায়ণতা সকল নীতিরই শ্রেষ্ঠ। শুধু ন্যায়পরায়ণতা কেন, রাজনীতিও বরোদারাজের বিচারের জন্য উপদেশ দিতেছে, ভারতে ইংরাজ প্রতাপ অগ্নি

সম বলিয়া সকলের জ্ঞান থাকা উচিত। যে কেহ ইহার সহিত ক্রীড়া করিতে যাইবেন তাঁহাকেই দগ্ধ হইতে হইবে। রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ ব্যক্তিগণও ইহার সম্মান রাখিয়া না চলিলে সমূহ বিপদ। কিন্তু তাই বলিয়া ইংরাজ যে সকল বিষয়েই পদ-সম্মান করিবেন ইহাও যুক্তিসঙ্গত বা ইংরাজ রাজনীতি সঙ্গত নহে। যদিও আজ গুইকুমার দশচক্রে পড়িয়া একটী ভয়ানক অভিযোগে অভিযুক্ত, কিন্তু বড়লাটেরও গুইকুমারের মহত্ব ও স্বাধীনতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া চলিলেই সকল দিক বজায় থাকিত। কিন্তু বড়লাট তাহা পারেন নাই সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বড়লাট এই সমস্যা মীমাংসায় সক্ষম হন নাই।

বড়লাট গুইকুমারের অপরাধের অনুসন্ধান জন্য ফরেন্ আপিসের সাহায্য না লইয়া একটী স্বতন্ত্র কমিসন গঠিত করিলেন। তিনি যদি পূর্ব্বাপরের মত ফরেন আপিসের সাহায্যে গুপ্তভাবে ইহার অনুসন্ধানে রত হইতেন তাহা হইলে গুইকুমারের ও তৎসঙ্গে অন্যান্য রাজাগণেরও সম্ভ্রম বজায় থাকিত বড় লাটের কার্য্যাকার্য্য লইয়া আন্দোলনও এত হইত না। বড়লাট লর্ড লরেন্সের সময়ে টঙ্কের ভূতপূর্ব্ব নবাবের সম্বন্ধে ফরেন্ আপীষের দ্বারা যে তদারক হয় তাহাতে লরেন্স সাহেবকে অনেক কথা শুনিতে হইয়াছিল। বোধ হয় লর্ড নর্থব্রুক্ সেই কথা মনে করিয়াই সাধারণ্যে গুইকুমারের বিচার জন্য এইরূপ স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁহার এই ভ্রমেই যত প্রমাদ। সকলের কথা সকল সময় শুনিতে হইলে কিছু কাজ চলে না বিশেষ যখন একটী রাজ্যের অদৃষ্ট চক্র লইয়া বিঘূর্ণিত করা হইতেছে তখন একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া কাজ করাই ভাল।

"যেমন কর্ম্ম তেমন ফল" একথা সর্ব্বদাই সত্য এমন কি রাজারাজড়া দিগকেও কর্ম্মদোষে অনেক ভোগ ভুগিতে হয়, ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু কোন রাজাকে অভিযুক্ত করিয়া বন্দীভাবে বিচারে নীত করা হইয়াছে ইহার দৃষ্টান্ত কি কোন দেশে কোন ইতিহাসে পাঠক পাইয়াছেন? না পাইয়া থাকেন, ভারত ইতিহাসে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের শাসন-বৃত্তান্ত খুলিয়া দেখুন, দেখিবেন বড়লাট বরোদারাজ মল্হাররাওকে এ অপমান হইতে অব্যাহতি দেন নাই।

তার পর কমিসন। রাজার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হইযাছে, তাহারই সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিয়া সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষদিগের গোচর করিবার জন্যই এই কমিসনের সৃষ্টি। কর্ত্তৃপক্ষগণ নামে যাহাই বলুন না কেন কিন্তু বাস্তব পক্ষে ইহা একটী বিচার-আলয় ভিন্ন আর কিছুই নয়। হলফ্ পড়াইয়া সাক্ষীগণের সাক্ষ্য গ্রহণ তাহাদিগকে ক্রশ্ একজামিন, এ সকলের কিছুই যখন ত্রুটি হয় নাই তখন এই কমিসন যদি আদালত না হয়, তবে প্রিভি কৌন্সিলও ত আদালত নয়, কেন না প্রিভি কৌন্সিলেরও মতামত রাজার নিকট পাঠাইতে হয়। এক কথায় বলিতে গেলে লর্ড নর্থব্রুক্ স্বেচ্ছামতে বরোদারাজের বিচারের জন্য স্বতন্ত্র নামের আচ্ছাদনে একটী হাইকোর্টের স্থাপনা করিলেন এবং

বাঙ্গালায় চীফজষ্টিস্ সার রিচার্ড কাউচ্‌কে ইহার প্রেসিডেণ্ট্ (?) নিযুক্ত করিলেন। লর্ড নর্থব্রুক্ যে কোন্ সাহসে এই কোর্ট স্থাপন করিলেন এবং সার রিচার্ডই বা ইহার প্রেসিডেণ্ট্ পদ গ্রহণ করিলেন তাহা বলা যায় না। লর্ড হেষ্টিংস্, সার ইলাইজা ইম্পিকে সদর কোর্টের প্রেসিডেণ্ট্ নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এই নিয়োগ ও পদগ্রহণ জন্য উভয়কেই কিন্তু বিলাতে গিয়া বিচারে নীত হইতে হইয়াছিল।

মড়ার উপর আবার খাঁড়ার ঘা! নর্থব্রুক্ এই বরোদা ব্যাপার লইয়া দেশীয় রাজগণের সম্মান অপহরণ করিতে কোন সুযোগই পরিত্যাগ করেন নাই। সিন্ধিয়া এবং জয়পুরের মহারাজদিগকে এই কমিসনের সভ্য নিযুক্ত হইবার আদেশ পত্র হাজির হইল! ইহার জন্য তাঁহাদিগকে যে কোনরূপ অনুরোধ পত্র দান বা তাঁহাদিগের মতামত গ্রহণ এ সকল কিছুই হইল না একবারেই তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হইল; যেন তাঁহারা সরকারী বেতনভোগী কর্ম্মচারী মাত্র! অবশ্য ভিতরে ভিতরে যে অনুরোধ উপরোধ করা হয় নাই, একথা কে বলিবে! কিন্তু সাধারণ্যে তাহার কিছুই হইল না সুতরাং সাধারণেও বুঝিল, নর্থব্রুকের শাসনে দেশীয় রাজগণের সম্মান যেন ছেলের হাতের খেলানা মাত্র। যখন সখ হইতেছে শিশু খেলানা মাথায় করিয়া রাখিতেছে আবার হয় ত পরক্ষণেই তাহাকে পদতলে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে। দেশীয় প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গকে পূর্ণ-শান্তির সময় বাধ্য করিয়া কোন কার্য্যে নিযুক্ত করণের দৃষ্টান্তও ভারতে ইহার পূর্ব্বে কখন ঘটে নাই। নাদের সাহাও যাহা করে নাই লর্ড নর্থব্রুক্ তাহা অতি সহজেই সম্পন্ন করিয়া ভারত ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গেলেন। বৃটীষরাজ্যে সামান্য প্রজার যে সম্মান পাইবার কথা নর্থব্রুকের নিকট সিন্ধিয়া এবং বরোদা রাজপুরুষগণ ও সাহা রাজগণ তাহাতে বঞ্চিত। তবে যে তাঁহারা এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কেন মান খোয়াইলেন, এ প্রশ্নের উত্তর আছে। সকলেই যেমন জানেন যে, ছলে হউক বলে হউক আর কৌশলেই হউক ইংরাজ ভারত জয় করিয়াছেন এবং তাঁহারাই এমন হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা; দেশীয় রাজন্যগণের হৃদয়েও তাহা বিশেষরূপে অঙ্কিত। সেই কারণে কতকটা ভয়ে ভক্তিতে এবং কতকটা নূতন কার্য্যভার সম্বন্ধে জ্ঞানাভাবেই তাঁহারা বড়লাটের নিয়োগপত্রে কোন ওজর আপত্তি করেন নাই। তাঁহাদিগকে শপথ করিতে হইলে তাঁহারা যে সেই মুহূর্ত্তেই নিয়োগপত্র পদদলিত করিতেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা বুঝিয়াই বোধ হয় নর্থব্রুকও এ প্রথা রহিত করিয়াছিলেন। লর্ড নর্থব্রুকের মৎলব সম্বন্ধে ইঁহারা এতই অজ্ঞ যে তাঁহাদিগের ধাঁধা ঘুচাইতে ও পরামর্শে সাহায্য করিতে কেবল বেতনভোগী বহুদর্শী লোক না দিয়া নর্থব্রুক যে তাঁহাদিগকেই জনৈক ইংরাজ কার্য্যের অধীনে কমিসনার নিযুক্ত করিলেন একথা তাঁহাদিগের মনে একবারও উদিত হয় নাই।

ক্রমশঃ—

কবিকুঞ্জ।

সেই।

দূর আকাশের কোলে চাঁদিমার রেখা,
দূর কাননের কোলে কুসুমের দেখা,
বিহগের গান,
তটিনীর তান,
কিশোরীর আকুল পরাণ,
সকলি কি—সেই?
তা'হলে এখনো কেন আকাশে ফোটাস্ ফুল—
দুঃখিনী চাঁদিনী!
বিজন কাননে কেন হাসিয়া হ'লি আকুল?
ওলো বনরাণী!
যা রে পাখী উড়ে যাবে দূর আকাশের কোলে—
হাসে যথা চাঁদ!
আকুল পরাণ তুই—তটিনীর মৃদু রোলে
পাতিলি কি ফাঁদ?
সে ফাঁদে পড়িবা মোর ব্যাকুল পরাণী হায়!
সহা নাহি যায়।
সেই বুঝি দূর হ'তে অতীতের ম্লান কথা
পরাণে জাগায়।।

কালা ও বোবা।

(১)
কাঁচের বাধা পেলে কিরণ,
রাম ধনু ছড়ায়,
তপন্ করের গোপন্‌গুলি
বাইরে প্রকাশ পায়!
তেম্‌নি ভব দোষের কোলে
যশের উদয় হয়!
(২)
কালার মুখে নিরাশ প্রণয়
ফোটায় প্রেমের তাপ,
বোবার চোখে কত শত
প্রেম-প্রকাশের চাপ।।!

শ্রীরমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

কি আছে আমার আর!

কি দিয়া তোমায় পূজি প্রেমময়ি!
কি আছে আমার আর?
হৃদয় হইতে সর্ব্বস্ব লইয়া
শ্যামে দি'ছি উপহার।
মরমে জড়িত ছিল সুখ যত
দিয়াছি শ্যামের পায়,
দেখিয়া কাতর হৃদয় বেদনা
লয়েছে সে নটরায়।
তা'র, বিরহ বাঁশীতে শুনি দিবানিশি
আমারি সে শোক-গান,
তা'র, আনন্দ-বাঁশরী শুনায় আমায়
বিগত সুখের তান।
শোকের সুখের সে বাঁশরী গীতি
পশিল এ শ্রুতি মূলে,
সে সঙ্গীতে প্রাণ মিশিবারে চায়
যাই এ জগত ভুলে।
প্রাণে থাকেনা কিছুই আর,—
স্মৃতি মায়াময়ী বহু দূরে প'ড়ে
করে যেন হাহাকার।
হৃদয়ের মাঝে দেখি শ্যাম রায়ে,
শ্যামময় দেখি ধরা,
যে কোন শবদে সে বংশীর গীতি
শুনি, মোনমোহ করা।
শ্যাম পদ-রেণু কোটী কোটী বিশ্ব,
শ্যাম ছাড়া কিছু নাই,
সকলি শ্যামের, শ্যাম সকলের,
নিরখি যে দিকে চাই!
রাধে! পদতলে তব সে শ্যাম যখন
দেছে শির উপহার,
কি দিয়া তোমায় পূজি, প্রেমময়ি!
কি আছে আমার আর!

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতি! কি দিব তোমায়!

১

ভারতি। কি দিব তোমায়।
কুসুম তাপেতে ঝরে, গন্ধবহে গন্ধ হরে,
ভ্রমর মধুপকুল চুমিছে তাহায়,
কেমনে কুসুম দিই ওই রাঙা পায়।
কোরকে কীটের বাস, দিতে নাহি পুরে আশ,
কি জানি দশনে যদি দংশে চারু কায়,
তাই বলি বল দেবি! কি দিব তোমায়।

২

ভারতি। কি দিব তোমায়।
চন্দন বিটপী পরে, বেষ্টিত ভুজগবরে.
কি জানি হৃদয় যদি বিষে জ্বলে যায়,
শীতল অন্তরে যদি অনল জ্বালায়।
তাইতে বলি, কেমনে, চন্দন দিব চরণে
অভাগীর ভাগ্য দোষে চন্দনে জ্বালায়,
অতল জলধি তলে বাড়বাগ্নি ধায়।

৩

ভারতি। কি দিব তোমায়।
শুনেছি শীতাংশুকরে, তাপিত সহস্র করে,
জলধি বেষ্টিত মহী পরাণ জুড়ায়,
প্রিয় দরশনে যথা বিরহী হৃদয়।
তাই অভিলাষ মনে, সুখে ঢালি ওচরণে,
রাকা শশধর কর চির শান্তিময়;
কলঙ্ক অঙ্কেতে তাই পরাণ পিছায়।

৪

ভারতি। কি দিব তোমায়।
দিব কি নীহার মালা, জুড়াতে হৃদয় জ্বালা?
তাপিত পরাণ বুঝি জুড়াবে তাহায়,
যামিনীর অশ্রুবিন্দু পরাণ জুড়ায়।
তাইবা পরাণ ভরে, ও রাজীব পদ'পরে,
কেমনে অর্পি দেবি বলগো আমায়?
নীহারের ক্ষুদ্র বিন্দু নলিনী শুকায়॥

৫

ভারতি। কি দিব তোমায়?
এই ক্ষুদ্র প্রাণ লয়ে হও সুখী। সুখী হয়ে
পরাণ সমর্পি দেবি ওই রাঙা পায়,
বিনিময়ে কিছু প্রাণ চাবেনা তাহায়।
যদি তব মন চায়, দলিত করোগো পায়
পরাণ পাবেনা ব্যথা নিবেদি তোমায়,
যদি মন চায় তবে জিজ্ঞাস তাহায়॥
লহ দেবি এই প্রাণ, চাইব কি প্রতিদান,
অর্পিতে এসেছে শুধু ওই রাঙা পায়,—
চিরজন্ম তরে দাসী চরণে লুটায়॥

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহিনী দাসী।

ফুল-মালা।

যে ছিল সে, চলে গেছে
আছে পাছে স্মৃতি তার।
গন্ধ টুকু পড়ে আছে
ঝরে'গেছে ফুল তার।
কত সাধে গেঁথেছিনু
আমার সে ফুল মালা।
কে জানে সে যাবে ঝরে'
করিনেত অবহেলা।
সে'রবে না তাযে প্রাণ
আপনি সে ঝরে' গেছে
হৃদয়ের মাঝে তার
ছবি খানি বিঁধে আছে,
কি জানি কিসের ছবি
কেমনি সে ভালবাসা
ভুলিতে পারিনা তারে
হৃদয়েতে আছে আশা—
ফুটেছে বসন্ত পুনঃ
ফুটিয়াছে কত ফুল
নিকুঞ্জ ভুবারে পুনঃ
ডাকিতেছে পিককুল,
এসেছে সকলি ফিরে
সেই ই জোছনা রাতি
ফুটিবে না ফিরে কিবে
আমারি সে যূঁথি যাথি,

শ্রীকুঞ্জবিহারী বসাক।

মরণ।

এ কি—

নীরব নীথর ঠাঁই
সাড়া শব্দ কিছু নাই
গম্ভীর বিরাট মূর্ত্তি কাল অন্ধকার;
শ্রান্ত প্রাণ শান্ত হ'ল
শোক তাপ ঘুচে গেল
নিভে গেল হুতাশন জ্বালা হাহাকার।
এত প্রেম এত হাসি
এত কর্ম্ম রাশি রাশি
চির-বদ্ধ ভালবাসা কোথা গেল সব?
সে আঁখি-মিলন নাই
সে মুখের হাসি নাই
সে বাহু-বন্ধন নাই সকলি নীরব;
সন্ধ্যা-বেলা মালা গাঁথা
কোলা-কুলি—প্রেম কথা
খোলা খুলি হৃদিমন, পিরীতি প্রণয়,
বিসর্জ্জন দিয়া সব
হইয়াছি সুনীরব
ঘুমন্ত প্রশান্ত দেহ শ্মশানে লুটায়।
কিরণে আলোক আছে
সে তেজ লাগিয়া পাছে
সুকোমল চারু অঙ্গ যদিবা শুকায়।
চন্দ্র সূর্য্য ডুবে গেছে
আলোক নিভিয়া গেছে
ছাইয়া রেখেছে তাই বিরাম ছায়ায়।
পিতা নাই, মাতা নাই
বন্ধু নাই, ভ্রাতা নাই
শিয়রে দাঁড়ায়ে শুধু ঘোর অন্ধকার,
দিক্ দিগন্ত কিছু নাই
অসীম অতল ঠাঁই
কোথা যাই কোথা যাই অন্ধ চারিধার,
শব্দ হ'লে একবার
কেঁপে উঠে চারিধার
নীরব নিঝুম সব ভীম অন্ধকারে,
মৃত্যুর ভীষণ কায়া
কাল অন্ধকার ছায়া
হেরিলে শিহরে প্রাণ সদা যেন ডরে।
জীবের জীবন্ত ছবি
গ্রহ তারা শশি রবি
পলক ফেলিতে যেন সব মুছে গেল,
শেষ না হইতে খেলা
প্রভাতে সকল বেলা
যবনিকা ফেলে যেন সন্ধ্যা নেমে এল।
নাহি আর কোলাহল,
বিষয়-ভাবনা, বল,
দম্ভ, অভিমান, আশা, কামনা পরাণে
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিধার,
একি মহা অন্ধকার,
দৃষ্টিহীন এই স্থান সৃষ্টি-অবসানে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত।

যারে পাখি উড়ে যা।

অনন্তে উধাও হ'য়ে যাবে পাখি উড়ে যা,
বসন্ত এসেছে ফিরে, পাখি তুই গাবে গা।
দূর অরণ্যের মাঝে গাহিবি আপন মনে,
তটিনী ধরিবে তান কুলু কুলু কুলু স্বনে,
প্রকৃতির শ্যাম ছায়ে ব'সে রবি বারমাস,
সারাটি জীবন তোর ভুলে যাবে—হা হুতাস।
উত্তপ্ত নয়নবারি শুকাবে আঁখির কোলে,
প্রকৃতির শোভা দেখে আপনা যাইবি ভুলে,
নূতন পরাণে পাখি। গাহিবি নূতন গান,
আর কি লাগিবে ভাল এসব পুরাণো তান?
কি এক নবীন ভাবে হবি যবে মাতোয়ারা,
মদির-নয়নে সব দেখিবি নূতন ধারা;
অনন্তে মিশিয়া যবে গাহিবি অনন্ত গান,
ত্রিলোক জাগ্রত হবে, শুনে সে নবীন তান।
কাননে ফুটিবে ফুল, মলয় বাইবে ব'য়ে,
সুখ-স্বপনের ঘোরে প্রাণটি ফেলিবে ছেয়ে,
আকাশে তারকাগুলি তোমারে রহিবে ঘিরে,
অনন্তে উধাও হ'য়ে যাবে পাখি। যাবে উড়ে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কাশ্মীররাজের বাঙ্গালা-জয়।

কাশ্মীর-রাজকর্ত্তৃক বাঙ্গালা-জয়ের ঘটনা আজকালের নয়। উহা যখন ঘটিয়াছিল, তখন খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দী চলিতেছিল। বাঙ্গালাদেশে তখন গৌড়ই অতি পরাক্রান্ত রাজ্য, তবে এক রাজার অধীনে ছিল না; গৌড়রাজ্য পাঁচটী ভাগে বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্র পাঁচজন রাজার অধীনে ছিল।

যে কাশ্মীররাজ বাঙ্গালা জয় করেন, তাঁহার নাম জয়াপীড়-বিনয়াদিত্য। তিনি ৬৬৭ শকে (৭৪৫ খৃষ্টাব্দে) কাশ্মীর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার পরিচয় রাজতরঙ্গিণীর তৃতীয় তরঙ্গে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইতে আরও জানা যায়, জয়াপীড-বিনয়াদিত্যই যে একা গৌড় জয় করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহারই বংশজাত আর একজন পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা অবিমুক্তাপীড়-ললিতাদিত্য (৬১৯ হইতে ৬৫৫ শকের মধ্যে) আর একবার গৌড় জয় করিয়াছিলেন। এ কথার উল্লেখ রাজতরঙ্গিণীতে আছে, তবে তাহার বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ কিছুই দেওয়া নাই। রাজতরঙ্গিণীর তৃতীয় তরঙ্গে আরও আছে যে, কাশ্মীরীয় বীরেরাই যে কেবল ততদূর হইতে নামিয়া আসিয়া বাঙ্গালীদিগকে পরাস্ত করিয়া গিয়াছিল, তাহা নহে; এখনকার এই অন্নজীবী বাঙ্গালীদের পূর্ব্বপুরুষ-বীরেরাও পূর্ব্বোক্ত অবিমুক্তাপীড়-ললিতাদিত্যের কোন অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য এই বাঙ্গালা হইতে সেই হিমালয়ের ক্রোড়স্থ কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানীতে গিয়া দেবমন্দিরাদি ভগ্ন ও যুদ্ধাদি করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ের জ্বালা নিবারাইয়াছিলেন;—এ সমস্ত বিবরণ ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে।

কাশ্মীরের যে দুইটি রাজা গৌড় জয় করেন, এস্থলে তাঁহাদের পরিচয় কিছু দেওয়া আবশ্যক। তৃতীয় গোনর্দ্দের বংশের অপুত্রক শেষ রাজা বালাদিত্যের ৫২০ শকে মৃত্যু হয়। তাঁহার অনঙ্গলেখা নাম্নী একমাত্র কন্যা ছিল। এই কন্যার সহিত অশ্বঘোষ কায়স্থ বংশীয় * এক সুরূপ গুণবান্ যুবকের বিবাহ হয়। রাজা বালাদিত্য জামাতার সুরূপ গুণাদি দেখিয়া "প্রজ্ঞাদিত্য" নাম প্রদান করেন। তদবধি এই বংশে আদিত্যাস্তক একটি দ্বিতীয় নাম রাখা পদ্ধতি হইয়া উঠে।

---

* বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক মুদ্রিত রাজতরঙ্গিণীতে "অশ্বঘোষ কায়স্থ" শব্দের পরিবর্ত্তে "অশ্বঘাম কায়স্থ" শব্দ মুদ্রিত আছে, (সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক ৩৯ পৃ: দ্রষ্টব্য।) কিন্তু বাঙ্গালার অভিনব অমূল্য বহু সুবিখ্যাত অভিধান বিশ্বকোষের কার্য্যালয়ে—রাজতরঙ্গিণীর হস্তলিখিত যে প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে "অশ্বঘোষ কায়স্থ" শব্দ স্পষ্ট লিখিত আছে। রাজতরঙ্গিণীর ঐ তরঙ্গেই আর এক স্থলে এই রাজবংশ রাজা হয়, কলহণ তাঁহাকে কার্কোট নাগের ঔরসজাত সন্তান বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। (রাজতরঙ্গিণী ৩ তরঙ্গ ৪৮৮।৬৮৯)। এ পরিচয় আমাদিগের অনুমানে অগ্রাহ্য, আমাদের বিশ্বাস যে কলহণ তাঁহার নায়কের জন্মগত উৎকর্ষ রাখিবার জন্য পুরাণকারদিগের অনুকরণে ঐ কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন।

রাজা বালাদিত্যের মৃত্যুর পর মন্ত্রী খড়্গোর সাহায্যে দুর্লভবর্দ্ধন প্রজ্ঞাদিত্য শ্বশুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহারই বংশ উত্তরকালে গৌড়জেতা রাজদ্বয় জন্মিয়াছিলেন। তাঁহারা, কে কত পরে ও কোন সময়ে উদ্ভূত হইয়াছিলেন নিম্নের তালিকায় তাহা বিবৃত হইল।

১। রাজা দুর্লভবর্দ্ধন প্রজ্ঞাদিত্য—৫২০ শকে রাজ্যারোহণ করিয়া। ৩৬ বৎসর রাজ্য ভোগ করেন।

২। রাজা দুর্লভক প্রতাপাদিত্য—ইনি দুর্লভবর্দ্ধনের পুত্র ও ৫৫৬ শকে রাজ্য-লাভ করিয়া ৫০ বৎসর ভোগ করেন।

৩। রাজা চন্দ্রাপীড় বজ্রাদিত্য—ইনি দুর্লভকের পুত্রও ৬০৬ শকে রাজ্য লাভ করিয়া ৮ বৎসর ৮ মাস ভোগ করেন।

৪। রাজা তারাপীড় উদয়াদিত্য—ইনি চন্দ্রাপীডের মধ্যম ভ্রাতাও ৬১৫ শকে (সামান্য গণনায় ৬ মাসের অনধিক-কাল পরিত্যক্ত হয ও অধিককালে ১ বৎসর ধরিয়া লওয়া হয় বলিয়া ৬১৪ শক স্থলে ৬১৫ ধৃত হইল) রাজ্যলাভ ও ৩ বৎসর ২৪ দিন ভোগ করেন।

৫। রাজা অবিমুক্তাপীড় ললিতা-দিত্য (১ম)—ইনি চন্দ্রাপীড়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ৬১৯ শকে রাজ্যলাভ করিয়া ৩৬ বৎসর ৭ মাস ১১ দিন ভোগ করেন। ইনিই প্রথম গৌড়জেতা।

৬। রাজা কুবলয়াপীড় কুবলয়া-দিত্য—ইনি অবিমুক্তাপীড়ের পুত্র ও ৬৫৫ শকে রাজ্য লাভ করিয়া ১ বৎসর ১৫ দিন ভোগ করেন।

৭। রাজা বজ্রাপীড় বা বপপীয় বজ্রাদিত্য (২য়) বা ললিতাদিত্য (২য়)—ইনি কুবলয়াপীড়ের ভ্রাতা ও ৬৫৬ শকে রাজ্য লাভ করিয়া ৭ বৎসর ভোগ করেন।

৮। রাজা পৃথিব্যাপীড়—ইনি বজ্রা-পীড়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ৬৬৩ শকে রাজ্য লাভ করিয়া ৬ বৎসর ১ মাস রাজত্ব করেন।

৯। রাজা সংগ্রামপীড়—ইনি বজ্রা-পীড়ের মধ্যম পুত্র, ৬৬৭ শকে রাজ্য লাভ করিয়া ৭ দিন ভোগ করেন।

১০। রাজা জয়াপীড় বিনয়াদিত্য—ইনি বজ্রাপীড়ের কনিষ্ঠ পুত্র ৬৬৭ শকে রাজ্য লাভ করিয়া ২৮ হইতে ৩৯ বৎসরকাল ভোগ করেন অর্থাৎ কোন মতে ৬৯৫ শকে, কোন মতে ৬৯৮ শকে তাহার মৃত্যু হয়। ইনিই দ্বিতীয় গৌড়জেতা।

১। প্রথম গৌড়-জয়:—পূর্ব্বোক্ত রাজাগণের মধ্যে ৫ম নৃপতি অবিমুক্তা পীড় ললিতাদিত্য কান্যকুব্জরাজ যশো-বর্ম্মার সমসাময়িক। (এই যশোবর্ম্মার সভায় কবিবর বাক্‌পতি ও ভবভূতি বর্ত্ত-মান ছিলেন।) রাজা অবিমুক্তাপীড় ললিতাদিত্য কান্যকুব্জ জয় করিয়া কবি-দ্বয়কে কাশ্মীরে লইয়া যান এবং পরে দ্বিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। তিনি পূর্ব্বে গৌড়, দক্ষিণে কলিঙ্গ, কর্ণাট, উত্তরে তুঃখার, দরদ, স্ত্রীরাজ্য প্রভৃতি এবং পশ্চিমে কাম্বোজ জয় করেন। গৌড়রাজ কাশ্মীর পতির নিকট পরাস্ত হইয়া তাহার সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতেন। সময়ে সময়ে গৌড়েশ্বর কাশ্মীর রাজ্যে গিয়া বাসও করিতেন। এই গৌড়রাজের নাম পাওয়া যায় না। কোন এক সময়ে গৌড়-রাজ কাশ্মীরে আছেন, অবিমুক্তাপীড়

একদিন তাঁহাকে বলিলেন যে, ভগবান্ শ্রী পরিহাস কেশবের অনুগ্রহে তিনি তাঁহার প্রাণ রাখিয়াছেন মাত্র; কিন্তু তার পর ত্রিগামী নামক স্থানে এক নরহন্তা দ্বারা গৌড়রাজের প্রাণ হরণ করেন। তৎকালে গৌড়রাজ্য অতি পরাক্রান্ত ছিল। গৌড়ের কতকগুলি রাজভক্ত বীর কাশ্মীররাজের এই দুষ্কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার আশায় সরস্বতী-দর্শনচ্ছলে কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া একদিন শ্রী পরিহাস কেশবের মন্দির লুঠ করিবার জন্য পরিহাসপুর রাজ্যে উপস্থিত হয়। গৌড়বাসেরা মন্দির আক্রমণ করিবে জানিয়া ব্রাহ্মণেরা মন্দিরের ভীম কবাট বন্ধ করিয়া দিল। রাজা অবিমুক্তাপীড় ললিতাদিত্য তখন পরিহাসপুরে উপস্থিত ছিলেন। গৌড়ীয় বীরেরা শ্রী পরিহাস কেশবের মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী রামস্বামীর রৌপ্যময় মন্দিরকেই শ্রী পরিহাস কেশবের মন্দির ভাবিয়া তাহা ধ্বংস ও দেবমূর্ত্তি বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। ইত্যবসরে কাশ্মীরীয় সৈন্য আসিয়া পড়িল। মুষ্টিমেয় গৌড়ীয় বাঙ্গালী বীরেরা আপনাদের অধিপতির জন্য সেই দূরদেশে সেই অসহায় অবস্থায় অসমসাহসে অসংখ্য সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া একে একে প্রাণ দিল। ধন্য রাজভক্তি! ধন্য অধ্যবসায়! এত গেল ১২শত বৎসরের কথা। ১২শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর এই সাহস ও বীরত্বের কথা শুনিয়া আজি প্রাণে কেমন একটা মূর্ত্তি বিকশিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত। কহ্লণের সময়ে রামস্বামীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান ছিল এবং ভূমণ্ডল মধ্যে গৌড়বাসীর বিপুল বীরত্বের সাক্ষ্য দিতেছিল, কারণ তিনি স্পষ্টই লিখিতেছেন—

"অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামিপুরাস্পদম্।"
ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ॥

রাজ তর-৩।৩৩৫।

আজকাল এই ভগ্নাবশেষ আছে কি না, জানা যায় না।

২। দ্বিতীয় গৌড়-জয়ঃ—

রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গে আছেঃ—

মণ্ডলেষু নরেন্দ্রাণাং পর্য্যটন্নাম্মিনামমাঃ।
গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভুজা॥
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনম্।
তস্মিন সৌরাজ্যরম্যাভিঃ প্রীতঃ পৌরবিভূতিভিঃ।
লাস্যং স দ্রষ্টুমবিশৎ কার্ত্তিকেয়-নিকেতনম্॥

৪।৪১৭।

(কাশ্মীররাজ জয়াপীড় (দশম ভূপতি) সৈন্যগণকে গঙ্গাতীরে বিদায় দিয়া রাত্রিকালে একাকী) নরেন্দ্রমণ্ডলে মেঘগণের ন্যায়• জয়ন্ত নামা গৌড়রাজের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে ক্রমে গুপ্তভাবে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজধানীর সৌন্দর্য্য ও পুরবাসিগণের ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন। শেষে কার্ত্তিকের মন্দিরে নৃত্য দর্শনে প্রবেশ করিলেন।

এইস্থলে তখনকার গৌড়ের একটু অবস্থা বলা উচিত। কান্যকুব্জ রাজ্যের গরই গৌড়রাজ্য প্রসিদ্ধ ছিল। গৌড় রাজ্য কিন্তু একজন রাজার অধীনে ছিল না। পাঁচ জন রাজার অধীনে সমগ্র গৌড়রাজ্য বিভক্ত ছিল। এই পাঁচ জন নৃপতির মধ্যে এক এক জন এক এক সময়ে পরাক্রান্ত হইয়া অপর কয়েকজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতেন, তখনই আপনাকে পঞ্চগৌড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত করিতেন। এই পঞ্চখণ্ড রাজ্য একত্রে "পঞ্চগৌড়" রাজ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল। রাজা জয়ন্ত যে

খণ্ডের রাজা ছিলেন, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর তাহার রাজধানী ছিল। রাজা জয়ন্ত বর্ণনীয় ব্যাপারের সময় ঐরূপ এক পঞ্চগৌড়েশ্বরের অধীনস্থ ছিলেন।

কাশ্মীররাজ জয়াপীড় দিগ্বিজয় ও ভ্রমণার্থী হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে উপস্থিত হন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে তখন কার্ত্তিকেয়ের এক মন্দির ছিল, মন্দিরে একদল দেবনর্ত্তকী ছিল, প্রত্যহ তাহারা আরত্রিকের সময় নাচ গান করিত। জয়াপীড় যখন ছদ্মবেশে নগর মধ্যে উপস্থিত হইলেন তখন কার্ত্তিকেয়ের মন্দিরে আরত্রিক হইতেছে। কাশ্মীররাজ ছদ্মবেশেই আসিয়াছিলেন, কাজেই সাহসী হইয়া দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরে তখন নৃত্য গীতাদি চলিতেছিল। নর্ত্তকীগণের মধ্যে কমলা নাম্নী একটি নর্ত্তকীর অপ্সরানিন্দিত রূপ দর্শন করিয়া তিনি মোহিত হইয়া পড়েন। কমলা এই অভিনব দর্শকের অসামান্য রূপ লাবণ্য দর্শনে তাঁহাকে কোন রাজপুত্র ভাবিয়া নিজ গৃহে লইয়া আসেন। জয়াপীড় কমলারই গৃহে কল্লাটনাম লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে এক দুর্দ্দান্ত সিংহের উৎপাত হয়। রাজা জয়ন্তের কেহই তাহা দমন করিতে পারে নাই। জয়াপীড় গোপনে স্বীয় ভুজবলে সেই সিংহকে বিনাশ করেন। সিংহকে মারিতে গিয়া অসতর্কতায় তাঁহার নামাঙ্কিত কেয়ূর পড়িয়া যায়। কোন ব্যক্তি তাহা পাইয়া গৌড়রাজ জয়ন্তের নিকট উপস্থিত করে। জয়ন্ত দেখিয়া বলিলেন, কাশ্মীররাজ! জয়াপীড় কল্লাট নাম গ্রহণ করিয়া দেশ ভ্রমণে আসিয়াছেন, তাঁহার সন্ধান কর। সকলে তাঁহার নাম শুনিয়া কাঁপিতে লাগিল; কারণ কান্যকুব্জ-জয়ী বীর জয়াপীড় তখন পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সকলের ভয়ের কারণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রমে চরে সংবাদ দিল যে জয়াপীড় কমলার গৃহে অবস্থান করিতেছেন। জয়ন্ত অমাত্য ও রাজপরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া জয়াপীড়কে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন এবং বহু যত্নে তাঁহাকে লইয়া গিয়া নিজ কন্যা কল্যাণদেবীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। জয়াপীড় ক্রমে গৌড়ের অপরাপর চারিজন রাজাকে পরাজিত করিয়া শ্বশুর জয়ন্তকে একচ্ছত্রী পঞ্চ গৌড়েশ্বর করিয়া দিলেন। তাহার পর জয়াপীড় কান্যকুব্জের পূর্ব্বদিকস্থ অন্যান্য স্থান জয় করিয়া শ্বশুরের করগত করিয়া দেন। জয়াপীড় দেবনর্ত্তকী কমলারও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহিষী কল্যাণ দেবী কাশ্মীরে পুষ্কলের যুদ্ধক্ষেত্রে কল্যাণ নগর ও রাণী কমলা ও কমলপুর নামে নগর স্থাপন করেন। এই জয়াপীড়ই পতঞ্জলির মহাভাষ্য ও প্রকাশক কাশিকা বৃত্তির রচয়িতা। কল্যাণদেবীর গর্ভে সংগ্রামপীড় পৃথিব্যাদিত্য নামক পুত্র জন্মে. ইনিও পিতা ও জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পর কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন। * কাশ্মীররাজ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা জয়ের এই পর্য্যন্ত বিবরণ রাজতরঙ্গিণীতে পাওয়া যায়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

---

* বিশ্বকোষ সংকলয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া সমসাময়িক অন্যান্য প্রমাণ বলে এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্তই করিয়াছেন যে এই গৌড়রাজ জয়ন্তই আদিশূর এবং আদিশূরাদি রাজগণ—যাঁহারা সেনবংশীয় রাজগণ বলিয়া বিখ্যাত তাঁহারা কায়স্থ। বিশ্বকোষ ৫৮৪ ৫৯৫ পৃষ্ঠা কায়স্থশব্দ দ্রষ্টব্য।

পেঁড়োর মন্দির।

(দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠার পর)

একাদশ পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় সপ্তাহের পর দুর্গ হইতে এক সংবাদবাহক আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল যে রাজা পাণ্ডু ম্লেচ্ছ সেনাপতির নিকটে পুনরায় দূত প্রেরণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ম্লেচ্ছসেনাপতি সম্মতি প্রদান করিলেন। পরদিন বলভদ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীরভদ্র অশ্বগজারূঢ় পারিষদ্ সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যেমন নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সঙ্গী এক ভাট তাঁহাদের নাম, উপাধি প্রভৃতি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। সুফিউদ্দীন তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু তিনি বলভদ্র প্রভৃতিকে বারম্বার পুনর্জ্জীবিত হইতে দেখিয়া হিন্দুদিগকে সয়তানের অনুচর বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদিগের ভয়ে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া তাঁহার সেনানীদিগকে দ্বিগুণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া আপনার সন্নিধানে রাখিলেন। বীরভদ্র মুচকিয়া গর্ব্বিত হাসি হাসিতে হাসিতে দেখা দিলেন। সেনানীগণ দ্বিগুণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইলেও সভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন—কখন্ সয়তানের অনুচরগণ আপনাদের প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তাঁহারা অতি ভীতভাবে পরস্পরের প্রতি চোখ চাওয়া চাওয়ি করিতে এবং কোরাণের "বয়েদ" সকল আওড়াইতে লাগিলেন। কেবল সুফি ততটা ভীতভাব বাহিরে প্রকাশ না করিয়া গম্ভীরভাবে ভদ্রতার সহিত বীরভদ্র প্রভৃতিকে বসিতে অনুমতি দিলেন।

দূতরাজ বীরভদ্র দৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন: "পরাক্রান্ত সেনাপতি! আপনি যেরূপ বীরপুরুষ ও আপনার যেরূপ খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে, তদুপযুক্ত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু তাহা অযথা কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে, অন্য সৎকার্য্যে তাহা প্রয়োগ করিলে সুসঙ্গত কার্য্য হইত। হে প্রসিদ্ধ সেনাপতি! এতদিন যে আপনারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং আমার ভ্রাতা বলভদ্রকে যে আপনি বৃথাই ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই সকল অতীত কথা স্মরণ করাইয়া আপনার মনে ক্লেশ দিতে আসি নাই। বর্ত্তমানে আমি যে প্রস্তাব করিতে আসিয়াছি, আপনারা এতদিন আমাদের বিরুদ্ধে এত দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান হইয়া হয়তো সেই প্রস্তাবে অসম্মতি ও অনভিমত প্রকাশ করিবেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, যে তুচ্ছ কার্য্যে আপনি অসমসাহসিকতা প্রদর্শন করিতেছেন, এবং আপনি শত শত নিরপরাধী লোকের প্রাণনাশ করাইতেছেন, ইহাতে আপনার খ্যাতি-

প্রতিপত্তির হ্রাস বই বৃদ্ধি হইবে না। এই দুর্গের নিম্নভাগ যে সকল ব্যক্তির রক্তে অভিষিক্ত হইয়াছে, যদি তাহা কোন ধর্ম্মানুগত ন্যায়ানুগত সাধু কার্য্যে ব্যয়িত হইত, তবে সেই সকল ব্যক্তি মৃত্যু হইতে পুনরুত্থিত হইয়া আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকিত; কিন্তু আজ তাহারা আপনার ও আপনার সঙ্গীদিগের উপরে বিষম প্রতিশোধ প্রার্থনা করিতেছে। আপনি যে হিন্দুদিগের বন্ধু নহেন, তাহা আমার প্রভু পাণ্ডুরাজা বিলক্ষণই জানেন। কিন্তু আপনি যে বিবেচনাহীন হইয়া এই অনর্থক যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া আপনার সহচর অনুচরবর্গের প্রাণনাশে সহায়তা করিবেন এবং এই শস্যশ্যামল ধরণীকে অত্যাচার-জর্জরিত করিয়া মরুভূমি করিয়া তুলিবেন, ইহা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না। দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি! আমার প্রভু এই যুদ্ধের অনর্থকতা ও অসঙ্গতি প্রদর্শন করিতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনার এখন যে লোকবল আছে, তাহাতে আপনার আত্মরক্ষা করিবার আশা নাই; তবে যদি বাহির হইতে আরও লোকবল সংগ্রহ করেন, তবে না হয় আরও কিছুদিন আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন, এই মাত্র। এই সকল চিন্তা করিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন; আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিযাছেন, তাহাই প্রতিপালন করিব—তাহাতে আপনাদের কোনই অনিষ্ট হইতে পারে না। দেবতাদের অনুগ্রহে আমরা আমাদের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আমাদের ধর্ম্ম ও আচার প্রতিপালন করিতে দিন, আর কোনও বিঘ্ন প্রদান করিবেন না। অপর জাতি যে দেশ যুগযুগান্তর ধরিয়া ভোগ করিতেছে, আপনাদিগের ধর্ম্ম যদি সেই দেশ উৎসন্ন করিতে আদেশ দেয়, যদি জগৎকে নির্ম্মনুষ্য করিতে উপদেশ দিয়া থাকে, তবে, যান, বিপুল ধরণী পড়িয়া আছে—যেখানে সহজে জয়লাভ করিবেন, যে দেশের লোক সকল ভয়েতেই বাধ্য হইয়া পড়িবে, যে দেশের লোক সকল দীর্ঘসূত্রতা বশত যথেচ্ছাচারিতার লৌহ-শৃঙ্খল কণ্ঠে ধারণ করিতে কিছুমাত্র আপত্তি করে না, সেই সকল দেশে গমন করুন, আপনাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। আমরা এখনও বলিতেছি, দেবতারা আমাদিগকে এই যে ক্ষুদ্র স্থানটুকু দিয়াছেন, ইহা আমাদিগকে নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে দিন. আমরা এই অল্পেতেই সন্তুষ্ট আছি এবং আপনাদের রাজ্যলাভ বা স্বাধীনতা কিছুরই ঈর্ষা করিতেছি না। আপনাদের প্রচুর রাজ্য পড়িয়া আছে, আপনারা তথায় ফিরিয়া যাউন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপে পাণ্ডুরাজা আপনাকে প্রভূত ধনরত্ন প্রদান করিবেন, আপনি তাহাও আপনার সঙ্গে লইয়া যাইবেন। পাণ্ডুরাজার রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত তাহা পাঠাইয়া দিবার ব্যয়ভারও আমার প্রভুই বহন করিবেন এবং অসংখ্য শকট বোঝাই করিয়া আপনার নিমিত্ত আহারাদিও প্রেরিত হইবে।”

বীরভদ্র যখন এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার এই সকল কথার যুক্তিযুক্ততা ও তাহা বলিবার প্রণালীতে সুফিউদ্দীনের সহচরগণ আত্মহারা হইয়া

ক্ষণকালের জন্য শত্রুতা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই বিশ্বাস হইয়াছিল যে তাঁহাদের নেতা সন্ধিস্থাপন করিবার এমন সুযোগ কখনই পরিত্যাগ করিবেন না। কিন্তু তাঁহাদের বুঝিবার ভুল হইয়াছিল—সুফিউদ্দীন সে প্রকার ধাতুতে গঠিত হন নাই। তিনি দৃঢ় ও অবিচলিতভাবে বলিতে লাগিলেন—

"দূতরাজ! আমরা যে আপনাদের দেশে কি কারণে যুদ্ধ আনয়ন করিয়াছি, তদ্বিষয়ে আপনার প্রভু বোধ হয় ভুল শুনিয়াছেন। গফুরের পুত্রবধের প্রতিশোধ লওয়া যতই ন্যায়সম্মত হউক, তাহাই যদি একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে আপনাদের রাজার মিনতি হেতু সত্বরেই চলিয়া যাইতাম। কিন্তু আমরা এই যুদ্ধ চালাইতেছি আল্লার আদেশে—তাহা একটুকু নড় চড় করিবার উপায় নাই। আপনারা জানিবেন, আপনাদের দেশ জয় বা আপনাদের রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিতে আমাদের কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। আপনাদের ধনরত্নের প্রতি আমাদের লোভ নাই, আপনাদের স্বাধীনতাও হরণ করিতে ইচ্ছা নাই। আমরা আপনাদের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে চাহি না, আপনারা যদি কেবল কোরাণের আদেশ শিরোধার্য্য করেন। পেয়গম্বরের ধর্ম্ম অবলম্বন করুন এবং হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করুন। আপনাদের দেবমূর্ত্তি সকল চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিন। এই সকল অনুষ্ঠান করিলেই আপনাদের দেশ রক্ষা পাইবে, আপনাদের প্রজা সকল সম্মানিত হইবে এবং আপনাদের রাজার রাজত্ব অক্ষুন্ন থাকিবে। ইহা ভাবিবেন না যে, আপনারা যে ইন্দ্রজালের বলে এতদিন আত্মরক্ষা করিতেছেন, মহম্মদের পতাকাধারী সৈন্যদের নিকট তাহারা অধিকক্ষণ টিকিতে পারিবে। আল্লার কাছে সয়তানের প্রভূত ক্ষমতাও অতি তুচ্ছ! যতদিন আপনাদের আপাততঃ সুদৃঢ় দুর্গ ভূমিসাৎ না হয়, যতদিন ইহার উচ্চ প্রাচীর সকল ধরণীর সহিত সমভূমি হইয়া না যায়, ততদিন আমরা এই যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইতেছি না।"

বীরভদ্র সন্ধিস্থাপন অসম্ভব বুঝিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সুফির প্রতি কৃপাব্যঞ্জক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ধীর ও গম্ভীরভাবে বলিলেন "তবে, সাহ্ সাহেব, এই অধর্ম্ম যুদ্ধে নিরপরাধী ব্যক্তিদিগের রক্তপাত স্থগিত হইবে না। কিন্তু বলিয়া রাখিতেছি এই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া গিয়া আপনার প্রভুর নিকট সংবাদ দিতে একটী লোকও অবশিষ্ট থাকিবে না। আমাদের অন্তরে এই চিন্তা অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার প্রতিবিধানের কোনও উপায়ও দেখিতেছি না। যুদ্ধ করিতে আমরা অনিচ্ছুক—ইহাতে অনর্থক প্রাণী হিংসা হয়, কিন্তু যদি আমরা যুদ্ধ করিতে বাধ্য হই, তাহা হইলে আমরা তাহাতে পশ্চাৎপদ হইব না এবং আপনাদিগকে জানিতে দিব যে, আমাদিগের জয়লাভ ঐন্দ্রজালিক কর্ম্ম নহে, দেবতাদিগের কর্ম্ম—তাঁহারাই আমাদের সহায় হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। ঐ দেখুন, দুর্গপ্রাচীরের উপর বলভদ্র সশরীরে আমার দৌত্যকার্য্যের ফল প্রতীক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।"

প্রথমে সকলেই তাঁহার কথামত নির্ব্বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত দুর্গপ্রাচীরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু যেই বলভদ্রের পাণ্ডুর মুখচ্ছবি দেখিতে পাইলেন, অমনি সকলে ভয় পাইয়া কম্পিতহৃদয়ে পশ্চাৎপদ হইলেন—তরবারি সকল তাঁহাদের হস্তভ্রষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহারা জানিতেন যে তিন সপ্তাহের জন্য সন্ধিস্থাপনের পূর্ব্বেই যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে বলভদ্র প্রভৃতি তিন ভ্রাতাই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন, বীরভদ্রকে জীবিত দেখিয়াই প্রথমে সকলে নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছিলেন; আবার বলভদ্রকেও সশরীরে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। সুফিউদ্দীন নিজেও এই ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিতমনে মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। বীরভদ্র এই উপযুক্ত অবসরে আরও দুই চারিটী কথা বলিলেন—"মহাশয় সেনাপতি! এখনও কি আপনি বুঝিবেন না যে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না; এই যুদ্ধ অধর্ম্মজনিত সুতরাং দেবতারা ইহার সহায়তা করিতে পারেন না; আপনি যদি ফিরিয়া না যান, তবে এইখানে আপনার জীবন বৃথা কার্য্যে বিনষ্ট হইবে? হে দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই শুভ-সংবাদ লইয়া প্রভুসমীপে যাই যে, আপনি স্বীয় উদারতা ও মহত্বগুণে আমাদিগকে পিতৃপিতামহপূজিত দেবগণের পূজা করিবার বিঘ্ন প্রদান করিবেন না। এই সংবাদ ঘোষিত হইলে সমস্ত দেশ আপনার জয় জয়কার ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।"

বীরভদ্র এই কথা বলিয়া নীরব হইলেন। সুফি ইতিমধ্যে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিতে লাগিলেন "ইল্ আল্লা উল্ আল্লা, আল্লা এক, আল্লা দুই নহে; আপনারা নিজেদের ইন্দ্রিয়কেও অবিশ্বাস করেন; তাহারা স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে যে প্রস্তরাদি জড়পদার্থ সকল পূজার যোগ্য হইতে পারে না। কতকগুলি ভণ্ড লোভী ব্রাহ্মণ আপনাদের অহঙ্কার ও মূর্খতার পরিপুষ্টির জন্য এই প্রতারণাজাল রচনা করিয়াছে; অহিফেণ যেমন অহিফেণসেবীদিগের জীবন ধ্বংস করিলেও তাহারা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ এই প্রতারণাজালে যাহারা একবার পদক্ষেপ করিয়াছে, তাহাদের জীবনসংশয় হইলেও, তাহারা চক্ষের সমক্ষে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলেও, তাহার কুফল প্রত্যক্ষ করিলেও তাহা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। আপনারা জাহান্নমের চিরদীপ্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইবেন; হায়! মূর্খ প্রতারক ব্রাহ্মণদিগের কৌশলজাল হইতে উদ্ধার করিতে আপনাদের কেহ নাই। তাই এই অস্ত্র (সুফিউদ্দীন বীরভদ্রের সম্মুখে নিষ্কাশিত তরবারি ধারণ করিয়া বলিলেন) আপনাদের চতুর্দ্দিকে জড়িত প্রতারণাপাশ কাটিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। জানিবেন দূতরাজ! আপনাদের দেবতারা আছেন কি না, সে বিষয়ে আমি বিলক্ষণ সন্দেহ করি, যদি থাকেন তবে তাঁহারা স্বয়ং সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সংগ্রাম করিতে থাকিলেও মহম্মদের পতাকা জয়যুক্ত হইবে এবং আপনার ভ্রাতা বলভদ্র প্রভৃতি সকলকেই শেষ পেয়গম্বরের আদেশ মানিতে হইবে।

আপনি যান, এবারেও ধীরে সুস্থে ফিরিয়া যান; কিন্তু আমি ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিতেছি যে, আল্লা এক এবং মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত, এই আদেশ না মানিয়া আর এখানে আসিবেন না।”

দূতরাজ বীরভদ্র বলিলেন “ভাল, যদি এই সংগ্রাম ক্ষেত্রে আপনাকে সন্ধি ভিক্ষা করিতে হয়, তবে সেই সন্ধিপত্র “হরিবোল” লিখিয়া আরম্ভ করিতে হইবে।” এই শব্দ মুসলমান সেনাপতির কর্ণে যেমন বাজিল, তাঁহার প্রাণেও ততোধিক বাজিল; তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি বিনর্গত হইতে লাগিল। হিন্দু দূতরাজ আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া দুর্গে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এখন হইতে পুনরায় যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বাবর আলী জুমিলার সেবা-শুশ্রূষায় রোগশয্যা হইতে সম্পূর্ণ সুস্থ-শরীরে উঠিয়া পুনরায় সিংহবিক্রমে সংগ্রামক্ষেত্রে শত্রুনিপাত করিতে লাগিলেন। জুমিলা তাঁহার পার্শ্বে সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিয়া নানা বিপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে থাকিলেন। একবার জুমিলা সংগ্রাম করিতে করিতে বাবর আলী হইতে দূরে চালিত হইয়া গেলেন এবং এ দিকে বাবর আলীও নিহত হইলেন। জুমিলার চক্ষু বাবরের দিকেই আকৃষ্ট ছিল। তিনি যেই বাবরকে নিহত হইতে দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ অতুল বিক্রমের সহিত শত্রুবিনাশ করিতে করিতে বাবরের দেহসমীপে আগমন করিলেন। নিহত হিন্দুদিগের মধ্যে বলভদ্র প্রভৃতি তিন ভ্রাতা ছিলেন; সুতরাং নেতৃহীন হইয়া হিন্দুসেনা দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রিয়তম বাবর আলীর প্রাণহীন দেহ সম্মুখে দেখিয়া জুমিলার শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং তিনি সহসা উন্মত্তের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির নিয়ম কি আশ্চর্য্য! যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র লোক হত্যা করিয়া কোনই কষ্ট অনুভব করিল না, সে একটা ব্যক্তির মৃত্যু দেখিয়া শোকদগ্ধ হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। জুমিলার ন্যায় দৃঢ় প্রকৃতি ব্যক্তি যদি ক্রন্দন না করিত, তবে তাহার পক্ষে উন্মত্ত হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য ছিল না। জুমিলার রুদ্ধশোক ক্রন্দনের দ্বারদিয়া অনেক পরিমাণে বহির্গত হইয়া গেলে যখন তাহার শোক-বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল, তখন ধীরে ধীরে তাহার শত্রুদৃষ্টি স্বাভাবিক দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক ভাব ধারণ করিল। তিনি মুহূর্ত্ত-কাল নীরব থাকিয়া আপনাপনি বলিতে লাগিলেন “এই প্রাণহীন দেহের জন্য আমি আমার গৃহ, পরিবার সকলি পরিত্যাগ এই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রের কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছি? আমি যাহার জন্য সমস্ত ত্যাগ করিলাম, মনের শান্তি নষ্ট করিলাম, কে আমাকে তাহা ফিরাইয়া আনিয়া দিবে! না—অধম কাফের! যদি স্ত্রীলোকে উত্তরকালের উল্লেখযোগ্য কোন কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়, তবে তোদের দুর্গপ্রাচীর সকল ধূলিসাৎ হইবেই

এবং আজিকার এই দুর্ঘটনার জন্ত তোদের বিষম অনুতাপ করিতে হইবে।”

এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া জুমিলা সুফিউদ্দীনের শিবিরাভিমুখে যাত্রা কবিলেন। সুফি তাঁহার প্রিয় সহচরের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ কবিয়া শোকে মুহ্যমান হইযা আপন শিবিরে বসিয়াছিলেন এবং আপনার কঠোর অদৃষ্টকে বারম্বার ধিক্কার দিতে-ছিলেন। সুফিও হিন্দুদিগের উপর জাতক্রোধ হইয়া জুমিলার ন্যায় তাহাদের হত্যাসাধন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সরফ খাঁ তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহার শোক অপনোদন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল এবং হিন্দুদিগের পরাজয় স্মরণ করাইয়া দিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিতে লাগিল; আরও, যাহাতে বলভদ্র প্রভৃতি মৃত হইযা পুনর্জ্জীবিত হইতে না পারেন, তদ্বিষয়েও নানা কৌশল উদ্ভাবন করিয়া সুফির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল। সরফ বলিল “আমরা এই সকল যুদ্ধে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন কবি নাই।”

সেনাপতির কানে কথাটা কিছু ঠিক বলিয়া বোধ হইল। তিনি তাই আরও জানিবার শুনিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিলেন “কেন?”

সরফ খাঁ অতি বিনীত ভাবে বলিলেন “চিন্তা করিয়া দেখুন, এই যে মৃতব্যক্তি-গণ পুনর্জ্জীবিত হইয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইতেছে, তাহার কারণ আমরা এখনও বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখি নাই।”

সুফি উদ্দীন দুঃখে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়াতে সরফের কথায় তেমন উৎসাহ প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন “আর অধিক জীবন বিনষ্ট হইতে দেওয়া বৃথা। আল্লাই সব জানেন, তিনি যত দিন স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ না পাঠান, ততদিন আমা-দিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। আমার বোধ হইতেছে যে পাণ্ডুরাজার পতনের কাল এখনও আসে নাই।”

এই সময়ে তাঁহার শিবিরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছিল, সে সুফি উদ্দীনের চবণপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া ঈষৎ কম্পিত স্বরে বলিল “প্রভু! সময় আসিয়াছে, পাণ্ডুরাজার পতনকাল আসিয়াছে।”

এই ব্যক্তি জুমিলা ব্যতীত অন্য কেহ নহে। সেনাপতি তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন “উঠ; বল, কি কারণে তুমি এরূপ মনে করিতেছ। আমি জানি মহম্মদ অবশেষে জয়লাভ করিবেনই; কাফেবদিগেব যাহাবা অবশিষ্ট আছে, তাহাদেবও আর বেশীদিন থাকিতে হইবে না—শীঘ্রই ঐ দুর্গ প্রাচীবের উপর মুসলমান ধর্ম্মের পতাকা উঠাইয়া দিয়া কৃতার্থ হইব।”

জুমিলা বলিয়া উঠিলেন “আমার প্রভু যথার্থই বলিয়াছেন। পাণ্ডুয়ার পতন নিশ্চিত; আমাদের লোকবল যদিও কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু কাফেরগণ যুদ্ধে আমাদিগকে হাবাইয়া দিলেও অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিতেছে না। তাহারা তাহাদের দুর্গপ্রাচীবের নিম্নভাগে মাত্র যুদ্ধ করে, দূরে যাইতে চাহে না; আমাদের এখন কর্ত্তব্য, যাহাতে তাহাদিগকে দূরে গিয়া যুদ্ধ করিতে হয় সেইরূপ চেষ্টা করা।”

সুফিউদ্দীন ও জুমিলার কথোপকথন এতক্ষণ নীরবে শুনিয়া সরফ খাঁ বলিলেন

"প্রভুর প্রতি যথেষ্ট সম্মাননা প্রদর্শন করিয়া এই প্রস্তাব করিতেছি যে দুর্গ-প্রাচীরের নিম্নে যে সকল কাফের দেহ এখনও পড়িয়া আছে, তাহার মধ্য হইতে দুই তিনটী আনিয়া কয়েক দিনের জন্য আবদ্ধ রাখিয়া দেখা যাউক, কি ফল হয়।"

সুফির মনে এই প্রস্তাব অতি সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে চাহিলেন, কিন্তু জুমিলা তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। সুফি অতি দুঃখব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "জুমিলা, তোমার এরূপ করিবার কারণ কি?" পরীর মত সুন্দরী জুমিলা বলিলেন "আমি আপনার নিকটে একটী বর প্রার্থনা করি।" সেনাপতি তখন তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সন্দেহ চক্ষে দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি বর চাও?' জুমিলা পরিষ্কার ও দৃঢ়স্বরে বলিলেন "আমি পাণ্ডুয়া জয় করিবার অধিকার প্রার্থনা করি।" সেনাপতি বলিলেন "তুমি উন্মত্ত হইয়াছ।"

ইত্যবসরে সরফের দ্বারা সেনাপতির আহ্বান পাইয়া অন্যান্য সেনানী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন "উন্মত্তের ন্যায় বোধ হইতেছে বটে; কিন্তু উহাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী উহাঁকে কার্য্য করিতে দিলে আমাদের অবস্থা বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর মন্দ হইবে না। তবে প্রভু যাহা অনুমতি করেন।

সুফি বলিলেন "ঠিক বলিয়াছ; যাও, ত্বরা কর; মীর আলম, তুমি কুড়িজন সাহসিক বীরপুরুষকে অস্ত্র শস্ত্রে শীঘ্র সুসজ্জিত করিয়া আনয়ন কর।"

জুমিলা দেখিলেন যে তাঁহার প্রার্থনা এখন সফল হইবার আশা নাই। তিনি সরফকে তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া সুফির শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মুসলমানেরা দেখিল যে হিন্দুরা তাঁহাদের সেনাপতি-শ্রেষ্ঠ বলভদ্র প্রভৃতি তিন ভ্রাতার মৃতদেহ এবং অন্যান্য মৃতদেহ সকলের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ লইয়া গিয়াছে। তাহারা অবশিষ্ট মৃতদেহের মধ্য হইতে তিন চারিটী উঠাইয়া লইয়া যেমন আপনাদিগের শিবিরাভিমুখে ত্বরিতগতিতে প্রস্থান করিতেছিল, অমনি সেই সুবর্ণ ময়ূর অতি ভয়ঙ্কর রূপে চীৎকার করিয়া তাহাদিগের মনে বিস্ময় ও ভীতি সঞ্চার করিয়া দিল। তাহার সেই ভীষণ রবে দুর্গাভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। একদল বহির্গত হইয়া কারণানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া দেখিল যে মুসলমানেরা কতকগুলি মৃতদেহ লইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট মৃতদেহ ত্বরায় দুর্গাভ্যন্তরে আনীত হইল এবং রাজার নিকটে এই দুঃসংবাদ প্রেরিত হইল। তিনি ইহার ফলাফল জানিতে উৎসুক হইয়া দৈবজ্ঞদিগকে আনাইতে আদেশ করিলেন।

ইত্যবসরে ময়ূরের চীৎকারও থামিল এবং মুসলমানেরা সেই মৃতদেহগুলিও শিবিরে আনয়ন করিল। তাহাদিগের মনে যদিও ভয় হইতেছিল যে, কোন প্রকার ইন্দ্রজালের দ্বারা তাহাদের অনিষ্ট

হইতে পারে অথবা ময়ূরের চীৎকার ধ্বনিতে হিন্দুরা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে ভীষণরূপে আক্রমণ করিতেও পারে; এই ভয় সত্বেও তাহারা সেই মৃতদেহগুলি প্রহরী নিযুক্ত করিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতে লাগিল। এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া মুসলমানেরা সকলেই নিদ্রাভিভূত হইল। কেবল জুমিলা জাগ্রত থাকিয়া একমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে পাণ্ডুরাধ্বংসের কি উপায় অবলম্বন করিবেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি সরফের সঙ্গে এই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন; এখন সরফকে এই বলিয়া বিদায় দিলেন "সরফ! আমরা উভয়ে পরস্পরকে বিলক্ষণ চিনিয়াছি। তুমি আমার সহায় হও, আমিও তোমার সহায় হইব। এই মাসের পূর্ব্বেই যদি আমি ফিরিয়া আসি, তবে জানিও যে পাণ্ডুরাজা আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন; যদি ফিরিয়া না আসি, তবে জানিও যে আমি কার্য্য সাধনে জীবনদান করিয়াছি।" সরফ ইহা স্বীকার করিয়া সে রাত্রির জন্য বিদায় গ্রহণ করিল।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারত যুদ্ধের কাল।

"মহাভারত' শীর্ষক প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমরা "পঞ্চসংগ্রহাধ্যায়ের" পরিচয় প্রদান ও সমালোচনা এবং মহাভারতের টীকাকারগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। উক্ত প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর, "কেশরী" নামক এক মহারাষ্ট্রী সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ আমার দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ প্রবন্ধে মহাভারতের আরও কয়েকজন টীকাকারগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উহার আবশ্যকীয় অংশ অনুবাদ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

প্রবন্ধ লেখক "পাণ্ডুরঙ্গ গোবিন্দ শাস্ত্রী পারখী" মহোদয় বলিতেছেন,—

"ডেক্কান কালেজের পুস্তকাগারের "ক্যাটলগ" দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, "দেববোধ" "সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণ" ও "বিদ্যাসাগর" প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ মহাভারতের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই নীলকণ্ঠ ও অর্জ্জুন মিশ্রের অপেক্ষা প্রাচীন। অর্জ্জুন মিশ্র কৃত টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণের পরেই বেদব্যাস ও বৈশম্পায়নাদির সহিত দেব-বোধাদি টীকাকারগণও বন্দিত হইয়াছেন। যথা—"বেদব্যাস বৈশম্পায়ন—দেব-বোধ বিমলবোধ সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণ ভট্ট শাণ্ডিল্য-মাধব পিতৃপদেভ্যো নমঃ। স্থলান্তরে,—

"দেব বোধাদি মতমালোক্য যত্নতঃ।
ক্রিয়তেঽর্জ্জুননাম্না ভারতার্থ প্রদীপিকা॥"

এতাবতা অনুমান করা অসঙ্গত নহে, যে, দেব-বোধাদির ন্যায় বিমলবোধ ও ভট্ট শাণ্ডিল্যাদি পণ্ডিতগণও মহাভারতের টীকা করিয়াছিলেন।"

কেশরী—২৩এ মে ১৮৯৩।

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। অনুক্রমণিকাধ্যায়ের একস্থলে সৌতি মুনিগণকে বলিতেছেন,—"পর্ব্ব-সংগ্রহাধ্যায় ভারত বৃক্ষের বীজস্বরূপ।" ইতিপূর্ব্বে আমরা পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ের যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠকবর্গ সৌতির এই উক্তির সত্যতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, বোধ হয়। বস্তুতই মহাভারত বর্ণিত তাবৎ বিষয়ের মূল এই পর্ব্ব-সংগ্রহাধ্যায়েই নিহিত আছে, দৃষ্ট হয়।

মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধ কোন্ সময় সংঘটিত হয়, তৎসম্বন্ধে সুস্পষ্ট উল্লেখ একমাত্র এই পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় ব্যতীত সমগ্র মহাভারতের আর কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হয় না। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকে সৌতি বলিতেছেন,—

"অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরযোরভূৎ।
স্যমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনযোঃ॥"

অর্থাৎ দ্বাপর ও কলির সন্ধিসময়ে কুরু-পাণ্ডব সৈন্যের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। বনপর্ব্বের ১৪৯ অধ্যায়ের বৈশম্পায়ন প্রোক্ত হনুমদুক্তিতে আছে,—

"এতৎ কলিযুগং অচিরাৎ যৎ প্রবর্ত্ততে।"

পবননন্দন হনুমান্ দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনকে বলিতেছেন, "কলিযুগ শীঘ্রই প্রবর্ত্তিত হইবে।" এই উক্তি পূর্ব্বোদ্ধৃত সৌতি বাক্যেরই সমর্থন করিতেছে। বিষ্ণুপুরাণ ভাগবত প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থে ও গর্গসংহিতা ও কাশ্যপসিদ্ধান্তেও এই মতের পোষক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) সুতরাং দ্বাপরের শেষ ও কলির প্রারম্ভ এতদুভয়ের সন্ধিকালে ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, এই মতই বহু গ্রন্থ সম্মত বলিয়া বোধ হয়।

ভারত সংগ্রামের কাল সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত অনেকেই অনেক আলোচনা করিয়াছেন; এবং সকলেই ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এস্থলে সংক্ষেপে সে সকল মতের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, পণ্ডিত কালীবর বেদান্ত বাগীশ ও শঙ্করনাথ পণ্ডিত প্রভৃতির মতে কলির প্রথম শতাব্দীতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বৈষ্ণবাদি পুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামীও এই মতাবলম্বী ছিলেন।

২। ৺ ডা রামদাস সেন, বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও বাবু কানাইলাল ঘোষাল প্রভৃতি কলির প্রথম শতাব্দীতে উক্ত ঘটনার সময় নির্দ্দেশ করেন। এই মত রাজতরঙ্গিণীর প্রমাণের উপর স্থাপিত।

৩। জন্মভূমির লেখক পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কলির একাদশ শতাব্দীতে (খৃষ্ট পূর্ব্ব বিংশ শতাব্দীতে) ঐ কালের নির্দ্দেশ করেন। বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণ বর্ণিত বংশ তালিকা অবলম্বন করিয়া এই সময় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৺ ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

৪। বিগত ১২৯৯ সালের তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণের সংখ্যায় "কলিযুগারম্ভ" শীর্ষক এক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছিলাম যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব বিংশ শতাব্দীতে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ ও

(১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১২৯৯ সাল কার্ত্তিক মাসের সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(পুরাণকারগণের মতে) কলিযুগের আরম্ভ হয়। তর্করত্ন মহাশয়ও ভারত সমরের ঐ কালই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে তাঁহার বিবেচনায় সেই কাল কলির একাদশ শতাব্দী বলিয়া গণ্য, কিন্তু আমার বিবেচনায় উহাই পুরাণকারগণের মতে কলির প্রথম শতাব্দী। ফলতঃ ভারতযুদ্ধ যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত হয় ও সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনও মতভেদ নাই।

বিগত ১৩০০ সালের চৈত্র মাসের নব্যভারতে "মগধের রাজবংশ" শীর্ষক প্রবন্ধে বিষ্ণু, ভাগবত, বায়ু, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বর্ণিত বংশতালিকা সমূহ উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে নন্দাভিষেকের প্রায় ১৫ শত বৎসরের পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২০ শতাব্দীতে ভারত সমর হয়। বৈষ্ণবাদি পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, এই সময়ে "দ্বাদশাব্দশতাত্মক" অর্থাৎ দ্বাদশশতবর্ষাত্মক কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণের স্থলান্তরে (৫।২৩।২৫) এবং গরুড় ও বরাহ পুরাণে লিখিত আছে যে দ্বাপরান্তে ভারত সংগ্রাম হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে, কলিদ্বাপরের সন্ধিকালে ঐ ঘটনা ঘটে বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইসকল সন্ধির একবাক্যতা দ্বারা নন্দাভিষেকের ১৫ শত বৎসব পূর্ব্বে (খৃঃ পূঃ বিংশ শতাব্দীতে) কলিযুগারম্ভ হয়, ইহা বলাই পুরাণকারগণের অভিপ্রেত বলিয়া আমাদের বোধ হয়।

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ইহার উত্তরে "দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ কলিঃ" অর্থে "কলির দ্বাদশশতাব্দী" ও "দ্বাপরান্তে" শব্দের অর্থ "দ্বাপরযুগের অন্ত হয় যে যুগে তাহা অর্থাৎ কলিযুগ" গ্রহণ করিয়াছেন। এবং কলির দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কলি ও দ্বাপরের সন্ধিকালের ব্যাপ্তি নির্দ্দেশ করিয়া, স্বীয় সিদ্ধান্ত অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এ সকল কূটার্থ পরিত্যাগ করিয়া সরল পথে বিচরণ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে নন্দাভিষেকের ১৫ শত পূর্ব্বে ভারতসমর ও কলিযুগারম্ভ হয়।

৫। শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় বৈষ্ণবাদি পুরাণে লিখিত একটি কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া খৃঃ পূঃ ১৫।১৬ শতাব্দীতে যুধিষ্ঠিরাদিকে আনয়ন কবিয়াছেন। তিনি পুরাণ বর্ণিত বংশতালিকাকে ঐতিহাসিক বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। "দ্বাপরান্তে ভারতসমর হয়" বিষ্ণুপুরাণকারের এই উক্তির উপরও তিনি আস্থা স্থাপন কবিতে পারেন নাই। কিম্বদন্তী বর্ণিত মতটিই তাঁহার নিকট সমধিক প্রামাণিক বলিয়া বোধ হইয়াছে। তবে এই "কিম্বদন্তী বর্ণিত মতকে যে তিনি পুরাণকারগণের মত বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কতদূর ন্যায়সঙ্গত তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ও ভারতসমরের উক্তবিধ কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং সেই কালকেই (অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১৫ শতাব্দীকে) তিনি কলিযুগের আরম্ভ সময় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। (সাহিত্য, ৫ম বর্ষ জ্যৈষ্ঠ।)

৬। ৺বঙ্কিম বাবু জ্যোতিষিক প্রণালী বিশেষ অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৫৩০ পূঃ খৃষ্টাব্দে ভারত সংগ্রাম

হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার গণনায় যে ভুল আছে, তাহা এক্ষণে অনেকেই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

৭। বিগত পৌষ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ, মহোদয় "যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল" শীর্ষক এক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি দেখাইয়াছেন যে, বৃদ্ধ গর্গ মতে যুধিষ্ঠিরের কাল ২৪০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে, এবং পুরাণকারের মতে ১৮০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে (১)। লেখক মহাশয়ের মতে "সকলদিক বিবেচনা করিয়া যুধিষ্ঠিরের সময় নির্দ্দেশ করিতে হইলে, খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৫শ বা ১৬শ শতাব্দীতে অর্থাৎ কলির ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে আবির্ভাবকাল ফেলিতে হয়।" কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫শ শতাব্দীতে কলির ৮ম শতাব্দী কিরূপে হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। লেখক উপরি—উদ্ধৃত বাক্যের কয়েক পংক্তি পূর্ব্বেই বলিতেছেন,—"কলির একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির আবির্ভূত হন নাই, তাহা স্বীকার করিতে কোনও গোলযোগ নাই।" কলির ৮ম শতাব্দী, যদি খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫ শতাব্দীর সহিত সমান হয়, তবে কল্যব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে খৃষ্ট পূর্ব্ব ১১শ শতাব্দী হয়, বলিতে হইবে। ফল কথা, খৃষ্টাব্দের কত বৎসর পূর্ব্বে যোগেশ বাবু কল্যব্দের প্রারম্ভ ধরিয়াছেন, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই।

মহারাষ্ট্র দেশে মহাভারতীয় যুদ্ধের সময় নির্ণয় সম্বন্ধে বহুল আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে আমরা এস্থলে একজন লেখকের মতের বিষয় পাঠকগণের গোচর করিতেছি। বোম্বাইয়ের একজন সুপ্রসিদ্ধ বক্তা, লেখক ও জ্যোতির্ব্বিদ্, রাজশ্রী জনার্দ্দন বালাজী মোড়ক বি, এ, মহোদয়, বিগত ১৮৮৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাইয়ের হিন্দু ইউনিয়ন্ ক্লবের সমক্ষে মহাভারত সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এক সুদীর্ঘ চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি ভারত যুদ্ধের কাল সম্বন্ধে এক অভিনব মত প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ের উল্লেখ অনুসারে যদিও ভারতযুদ্ধ পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা বলিয়া অনুমিত হয়, তথাপি উক্ত যুদ্ধারম্ভ কালে গ্রহগণের অবস্থিতি সম্বন্ধে মহাভারতের যুদ্ধ পর্ব্ব সমূহে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার বিচার করিলে কথিত যুদ্ধের কাল বর্ত্তমান সময়ের অন্যূন সাত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ফেলিতে হয়।" যে প্রকার বিচার-প্রণালী-অবলম্বনে মোড়ক মহোদয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রবন্ধের প্রারম্ভে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা বঙ্গীয় পাঠকগণের জন্য সেই অংশের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি।

"ভারতযুদ্ধ কালে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহগণের অবস্থিতি সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় যথা—

১। "কৃত্বা চাঙ্গারকো বক্রং জ্যেষ্ঠায়াং মধুসূদন।
অনুরাধাং প্রার্থয়তে মৈত্রং সঙ্গময়ন্নিব॥
উদ্যোগপর্ব্ব ১৪৩ অঃ

(১) যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, পুরাণকারের মতে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল ১৯০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ, বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবেচনায় তাঁহারা পৌরাণিক বচনের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ!

২। "মঘাঙ্গারকো বক্রঃ শ্রবণে চ বৃহস্পতিঃ।"
ভীষ্মপর্ব্ব ৩ অধ্যায়।

৩। "বিশাখায়াঃ সমীপস্থৌ বৃহস্পতিশনৈশ্চরৌ।
ভীষ্মপর্ব্ব ৩ অধ্যায়।

৪। "মঘাবিষয়গঃ সোমস্তদ্দিনং প্রতিপদ্যতে।"
ভীষ্মপর্ব্ব ১৭ অধ্যায়।

"উদ্ধৃত শ্লোক চতুষ্টয়ের প্রথম দুই-টিতে মঙ্গলের যথাক্রমে জ্যেষ্ঠা ও মঘা নক্ষত্রে অবস্থিতি বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকের মর্ম্মানুসারে বৃহস্পতি যথাক্রমে শ্রবণা ও বিশাখা, নক্ষত্রে অব-স্থিত ছিলেন, দেখা যাইতেছে। প্রথম শ্লোকটি সন্ধি স্থাপনার্থ সমাগত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কর্ণের উক্তি, ও দ্বিতীয়টি যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাস-দেবের উক্তি। মহাভারতের বর্ণনানু-সারে শ্রীকৃষ্ণের কুরুসভা হইতে প্রত্যা-গমনের ২৪ দিন পরে, যুদ্ধারম্ভ হয়। এই ২৪ দিনের মধ্যে মঙ্গলের মঘানক্ষত্র হইতে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে অর্থাৎ নব নক্ষত্র বা ১২০ অংশ গমন কিছুতেই সম্ভব নহে। কারণ, মঙ্গলের দৈনিক গতি প্রায় অর্দ্ধ অংশ মাত্র।

"বৃহস্পতির শ্রবণা ও বিশাখার সমী-পস্থ স্বাতী নক্ষত্রে অবস্থান ভীষ্মপর্ব্বে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে ব্যাসদেব কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্বাতী হইতে শ্রবণা ১০৭ অংশ অন্তর; এবং বৃহস্পতির গতির পরিমাণ প্রত্যহ প্রায় ৫ কলা। সুতরাং বৃহস্পতির এককালে স্বাতী ও শ্রবণা নক্ষত্রে অবস্থিতি কিছুতেই সম্ভবপর নহে। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তাহা হইলে মহাভারতকার মঙ্গল ও বৃহস্পতির এককালীন দ্বিবিধ অবস্থান, পরস্পর দূরবর্ত্তী দুই নক্ষত্রের অবস্থান বর্ণনা করিয়া স্বতো-বিরোধ উপস্থিত করিয়াছেন কেন? এই দ্বিবিধ অবস্থান বোধক শ্লোকগুলির একবাক্যতা সাধিত হইতে পারে কিরূপে?

"আমাদের বিবেচনায়, যেখানে এক-কালে এক গ্রহের দুই বিভিন্ন নক্ষত্রে অবস্থিতি বর্ণিত থাকে; সেখানে একটিকে তারাত্মক ও অপরটিকে বিভাগাত্মক নক্ষত্র ধরিয়া লইলে সমস্ত বিরোধের নিঃশেষ হয়। তারাত্মক ও বিভাগাত্মক নক্ষত্র কি, তাহা বুঝাইতেছি।

"আকাশে ক্রান্তিবৃত্তের (রবিমার্গের) উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কতকগুলি তারা পুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়। এই তারা পুঞ্জগুলি নক্ষত্র নামে অভিহিত। এই সকল পুঞ্জের অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নাম প্রদত্ত হইয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইহা-দিগকেই তারাত্মক নক্ষত্র বলে। এই তারাত্মক নক্ষত্রগুলি পরস্পর সমান দূর বর্ত্তী নহে এবং তাহাদের সকলগুলির আকারও সমান নহে। সুতরাং সকল নক্ষত্রপুঞ্জ গুলিই যে, গগনমণ্ডলের সমান স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহা নহে। অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি তারাত্মক নক্ষত্রের মধ্যে রোহিণী, আর্দ্রা পুনর্ব্বসু, মঘা, চিত্রা, স্বাতী, জ্যেষ্ঠা, ও শ্রবণা এই অষ্ট পুঞ্জের প্রধান তারা বা যোগতারা গুলি অতিশয় উজ্জ্বল।

"সমস্ত নক্ষত্রগুলি পরস্পর সমদূর-বর্ত্তী নহে বলিয়া, জ্যোতিষিগণ সুবিধার জন্য ক্রান্তিবৃত্তের ৩৬০ অংশকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার প্রত্যেক ভাগকে (অর্থাৎ ১৩ অংশ ২০ কলা পরিমিত বৃত্তাংশ) নক্ষত্র সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই নক্ষত্রগুলিকে

বিভাগাত্মক নক্ষত্র বলে। ক্রান্তি বৃত্তের এই একএকটি অংশকে প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ ইত্যাদি ক্রমে অভিহিত না করিয়া, উহাদিগকে অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি নামই প্রদত্ত হইয়াছে। দিন-পঞ্জিকায় চন্দ্রের ভোগ্য বলিয়া যে নক্ষত্র প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা এই বিভাগাত্মক নক্ষত্র। সুতরাং পঞ্জিকায় যে দিন "মঘায় চন্দ্র" লিখিত থাকে, বুঝিতে হইবে, সেদিন চন্দ্র বিভাগাত্মক মঘা-নক্ষত্র ভোগ করিতেছেন।—তারাত্মক মঘা বা প্রকৃত মঘা নক্ষত্র নহে। হয় ত প্রকৃতপক্ষে সেদিন তিনি স্বাতী নামক তারা পুঞ্জাত্মক নক্ষত্রে অবস্থিত। এই কারণে কোনও প্রাচীনগ্রন্থে একই গ্রহের একই সময়ে দুই বিভিন্ন নক্ষত্রে অবস্থানের উল্লেখ থাকিলে, সেই দুইটির মধ্যে কোনটি তারাত্মক ও কোনটি বিভাগাত্মক নক্ষত্র, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ জ্যোতিষী ব্যতীত অপরে সহজে নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না, এবং এক গ্রহের এক-কালে বহুদূরবর্ত্তী দুই নক্ষত্রে অবস্থান কিরূপে সম্ভব, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সাধারণ জনগণ সংশয়-সাগরে ভাসিতে থাকেন। (১) ফলকথা, অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশ তারাত্মক ও বিভাগাত্মক নক্ষত্রের ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতেই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থেও নক্ষত্র সমূহের নামের উল্লেখ আছে।

"ক্রান্তিবৃত্ত ও "বিষুবরৃত্ত যে দুই বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদন করে, সেই দুই বিন্দুকে সম্পাত বিন্দু বা ক্রান্তিপাত বলে। তন্মধ্যে যে বিন্দুতে গমন করিলে সূর্য্য বিষুবরৃত্তের উত্তরাংশে বা আকাশের উত্তর গোলার্দ্ধে উপনীত হয়, সেই বিন্দুর নাম "বসন্ত সম্পাত।" বসন্ত সম্পাত হইতে অশ্বিন্যাদি ২৭টি বিভাগাত্মক নক্ষত্রের গণনা আরম্ভ হয়। এই সম্পাত বিন্দু অচল নহে,—এই কারণে ইহা চিরকাল একই তারাত্মক নক্ষত্রে অবস্থিতি করে না। ৪৪৪ শকাব্দে (খৃঃ ৫২২ অব্দে) বসন্ত সম্পাত পুষ্প-স্বরূপ রেবতী নক্ষত্রের যোগ তারাতে ছিল। বর্ত্তমান কালে উহা উত্তর-ভাদ্র-পদ নামক পুঞ্জাত্মক নক্ষত্রের যোগতারার মধ্যগামী দক্ষিণোত্তর রেখায় অবস্থিতি করিতেছে।

"অশ্বিনী নামক তারাত্মক নক্ষত্রের পূর্ব্বদিকে ভরণী, ভরণীর পূর্ব্বদিকে কৃত্তিকা, ইত্যাদি ক্রমে নক্ষত্র শ্রেণী পূর্ব্ব-দিক্ হইতে পশ্চিম দিকে গমন করিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ৪৪৪ শকাব্দে রেবতী-নক্ষত্রের যোগতারায় অবস্থিত বসন্ত সম্পাত এক্ষণে যখন উত্তর ভাদ্রপদে অবস্থিতি করিতেছে, তখন সম্পাত-বিন্দুর গতি পশ্চিম দিকে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচনাকালে, বসন্ত সম্পাত ভরণী নক্ষত্রের, ৪র্থ চরণের প্রারম্ভে ছিল। কারণ সে সময় (প্রপদ্যেতে শ্রবিষ্ঠাদৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুদক্। সার্পার্দ্ধে

(১) হাবড়া হইতে ৮টা ও ৯।৽ টার সময় একটি মেল‌্ট্রেণ ছাড়িল, একথা শুনিলে যে ব্যক্তি কলিকাতা টাইম ও মান্দ্রাজ টাইমের প্রভেদ অবগত নহে, সে যেরূপ সংশয়ে পতিত হয়, সেইরূপ তারাত্মক ও বিভাগাত্মক নক্ষত্রের মর্ম্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিও এক গ্রহের এককালীন দ্বিবিধ অবস্থিতির বিষয় পাঠ করিয়া সেইরূপ গোলে পড়িয়া যায়।

দক্ষিণার্কস্থ।") অশ্লেষা নক্ষত্রে সূর্য্য গমন করিলে দক্ষিণায়ণ হইত, কথিত হইয়াছে। দক্ষিণায়ণারম্ভ বিন্দু হইতে ৯০ অংশ পশ্চিমে বসন্ত সম্পাত থাকে।

"বসন্ত সম্পাত কোন্ তারাত্মক নক্ষত্রে ছিল, তাহা যদি কোনও গ্রন্থে লিখিত থাকে, তবে সেই নক্ষত্র ও সম্পাতবিন্দুর বর্ত্তমান আশ্রয়ভূত নক্ষত্র এতদুয়ের অংশান্তর বাহির করিয়া (৭২ বৎসরে সম্পাতবিন্দুর সহিত প্রায় এক অংশ ধরিয়া) উহাকে ৭২ দিয়া গুণ করিলে সেই গ্রন্থের রচনাকাল সহজেই নির্ণীত হইতে পারে। এই-রূপে এই "সম্পাত শক" (শক অব্দ) প্রাচীন গ্রন্থাদির সময় নির্ণয়ের বিশেষ উপযোগী।

"ভারতযুদ্ধের সময় সম্পাতবিন্দু কোন্ তারাত্মক নক্ষত্রে ছিল, মহাভারতে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ কোথাও নাই। তথাপি পূর্ব্ব কথিত মঙ্গল, বৃহস্পতি ও চন্দ্রের এককালীন বিবিধ অবস্থা বিষয়ক উক্তি দ্বারা সম্পাতবিন্দুর তৎকালীন অবস্থান অনেক পরিমাণে নিশ্চিত হইতে পারে। ৪৪৪ শকাব্দে রেবতী নক্ষত্রে সম্পাত ছিল। শকাব্দের ৩১৭৯ বৎসর পূর্ব্বে সম্পাতবিন্দুর যে গতির উল্লেখ করিয়াছি, তদনুসারে উহা কলির প্রারম্ভ-কালে রেবতীর বহু পূর্ব্বদিকে ছিল, নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। পুঞ্জাত্মক নক্ষত্রগুলি রেবতীর অস্ত হইতে গণিত হইয়া থাকে। এই কারণে, রেবতীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কোনও তারা পুঞ্জাত্মক নক্ষত্রে যদি সম্পাত থাকে, তবে সেই সম্পাতবিন্দু হইতে গণিত বিভাগাত্মক নক্ষত্রের সংখ্যা উক্ত বিন্দুর পশ্চিমদিকে অবস্থিত রেবতীর অন্ত হইতে গণিত তারাত্মক নক্ষত্রের সংখ্যা অপেক্ষা কম হইবে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, মহাভারতের বর্ণনা মতে মঙ্গল গ্রহ মঘা ও জ্যেষ্ঠা (যথাক্রমে দশম ও অষ্টাদশ) নক্ষত্রে ও বৃহস্পতি স্বাতী ও শ্রবণা (যথাক্রমে ১৫শ ও ২২শ) নক্ষত্রে ছিল। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে মঙ্গল ও বৃহস্পতি যথাক্রমে বিভাগাত্মক মঘা (১০ম) ও স্বাতী (১৫শ) নক্ষত্রে এবং তারাত্মক জ্যেষ্ঠা (১৮শ) ও শ্রবণা (২২শ) নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছিলেন বলিতে হইবে।

"এক্ষণে চন্দ্রের দ্বিবিধ অবস্থানের বিষয় আলোচনা করা যাউক। কৌরব পাণ্ডবে ১৮ দিন যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া পাণ্ডবগণের সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেব বন্ধু বান্ধবগণের বিনাশ দর্শনে অত্যন্ত অনিচ্ছুক হইয়া যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই তীর্থ—পর্য্যটনে গমন করেন। অষ্টাদশ দিবসব্যাপী যুদ্ধের অবসান—দিনে তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য দুর্য্যোধনের সহিত ভীমের গদাযুদ্ধ দর্শন-মানসে কুরুক্ষেত্রের সমরপ্রাঙ্গণে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সময়ের উক্তি এই,—

"চত্বারিংশদহান্যদ্য দ্বে চ মে নিঃসৃতস্য বৈ।
পুষ্যেণ সম্প্রযাতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগতঃ॥" ৬॥
গদাপর্ব্ব অধ্যায় ৫।

বলদেব বলিতেছেন,—"অদ্য ৪২ দিবস অতীত হইল, আমি তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছি। আমি পুষ্যা নক্ষত্রে

যাত্রা করিয়া অদ্য শ্রবণা নক্ষত্রে প্রত্যাগমন করিয়াছি।" এতাবতা যুদ্ধের শেষ দিনে চন্দ্র শ্রবণা নক্ষত্রে ছিলেন, প্রমাণিত হইতেছে। যুদ্ধ ১৮ দিন হইয়াছিল, সুতরাং যেদিন যুদ্ধারম্ভ হয় সেদিন চন্দ্র শ্রবণার ১৮ নক্ষত্রে পশ্চাতে অর্থাৎ মৃগশিরা নক্ষত্রে ছিলেন, দেখা যাইতেছে। ভীষ্মপর্ব্বের ১৭ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, ("মঘাবিষয়গঃ সোমস্তদ্দিনং প্রত্যপদ্যতে।") যুদ্ধারম্ভ দিবসে চন্দ্র মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। ফলকথা, একই দিবসে চন্দ্রের মৃগশিরা (৫ম) ও মঘা (১০ম) নক্ষত্রে অবস্থিতি বর্ণিত হইয়াছে, দেখা যাইতেছে। এক্ষণে পূর্ব্ববর্ণিত নিয়মানুসারে যুদ্ধারম্ভ দিবসে চন্দ্র মৃগশিরা নামক বিভাগাত্মক নক্ষত্রে ও মঘা নামক তারাত্মক নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতে ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে। এতাবতা, ভারতযুদ্ধের আরম্ভ—কালে চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি এই গ্রহত্রয়ের নিম্নলিখিত রূপ দ্বিবিধ অবস্থিতি দেখা যাইতেছে।—

গ্রহের নাম	বিভাগাত্মক নক্ষত্র	তারাত্মক নক্ষত্র
চন্দ্র	মৃগশিরা (৫ম)	মঘা।
মঙ্গল	মঘা (১০ম)	জ্যেষ্ঠা।
বৃহস্পতি	স্বাতী (১৫শ)	শ্রবণা।

"ইতিপূর্ব্বে যে অষ্ট যোগতারার উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মঘা, জ্যেষ্ঠা ও শ্রবণা এই তারাপুঞ্জের যোগতারার নিকটে, ভারতযুদ্ধকালে যথাক্রমে চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি ছিলেন, দেখা গেল। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের সমীপে বসন্ত সম্পাতের অবস্থান স্বীকার করিলে, সম্পাতবিন্দু হইতে মঘা, জ্যেষ্ঠা ও শ্রবণা এই তারাত্মক নক্ষত্রগুলি যথাক্রমে ৫ম, ১০ম ও ১৫শ স্থানে বা তৎসমীপবর্ত্তী স্থানে পতিত হয়। ইহা দ্বারা অনুমিত হইতেছে, ভারত সমরের কালে সম্পাত পুনর্ব্বসু নামক তারাত্মক নক্ষত্রেই ছিল। বর্ত্তমান কালে উহা উত্তরভাদ্রপদে অর্থাৎ রেবতীর যোগতারার প্রায় ১৮ অংশ পশ্চিমে আছে। রেবতীর অন্ত হইতে পুনর্ব্বসুর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ৮০ অংশ। সুতরাং উত্তরভাদ্রপদ ও পুনর্ব্বসু এতদুভয়ের মধ্যে ১৮+৮০=৯৮ অংশ অন্তর। সম্পাতবিন্দুর গতি ৭২ বৎসরে ১ অংশ। ৯৮ কে ৭২ দিয়া গুণ করিলে ৭০৫৬ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান কালের সপ্তসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত বর্ণিত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

"পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য স্থূলতঃ ভারতযুদ্ধের কাল নির্ণীত হইল। সূক্ষ্মভাবে গণনা করিলে, শকাব্দ প্রারম্ভের ৫৩০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের ৭১২২ বৎসর পূর্ব্বে ভারত সমরের কাল নির্দ্দেশ করিতে হয়। সুপ্রসিদ্ধ গণিতাধ্যাপক প্রোফেসার কেরো লক্ষ্মণ ছত্রে মহোদয় এই গণনার বিশুদ্ধতা স্বীকার করিয়াছেন।"

রাজ শ্রীজনার্দ্দন বালাজী মোড়ক বি, এ, প্রণীত "মহাভারত" পুস্তিকায় ৬ হইতে ৯ পৃষ্ঠা।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে আমাদের আদৌ কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই; একারণে রাজশ্রী মোড়ক মহোদয়ের যুক্তির যাথার্থ্য পরীক্ষা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। বঙ্গদেশীয় জ্যোতিষজ্ঞ লেখকগণের প্রতি

এই বিষয়ের বিচারের ভার প্রদত্ত হইল। মোড়ক মহোদয়ের যুক্তির যে সকল অংশ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা কেবল এ স্থলে সে গুলির উল্লেখ করিলাম আশা করি কোনও কৃতবিদ্য লেখক এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

১ম,—লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, "দক্ষিণায়নারম্ভ বিন্দুর ৯০ অংশ পশ্চিমে বসন্তসম্পাত থাকে। ভারত-যুদ্ধের সময় পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে সম্পাত ছিল স্বীকার করিলে, দক্ষিণায়নারম্ভ লইয়া কিছু গোল বাধে না কি? পুনর্ব্বসুতে সম্পাত থাকিলে, চৈত্র মাসে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হওয়া উচিত নয় কি? কিন্তু ভারতযুদ্ধ কালে মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল, এ কথা মহাভারতে স্পষ্টই লেখা আছে। মাঘমাসে উত্তরায়ণ হইলে সম্পাত কৃত্তিকায় অথবা পুনর্ব্বসুতে থাকা সম্ভব?

২য়,—মঙ্গলাদিগ্রহের বিবিধ অবস্থিতির বিষয় লেখক মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল গ্রহের আরও এক প্রকার অবস্থিতি মহাভারতেই বর্ণিত হইয়াছে। লেখক সে সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন নাই। সে অবস্থান এইরূপ। যথা—

"বক্রানুবক্রং কৃত্বা চ শ্রবণং পাবকপ্রভঃ।
ব্রহ্মরাশিং সমাবৃত্য লোহিতাঙ্গো ব্যবস্থিতঃ॥"
ভীষ্মপর্ব্ব ৩য় অঃ।

এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, মঙ্গল বক্রানুবক্র ভাবে শ্রবণা নক্ষত্র বেধ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, মঙ্গল মঘা ও জ্যেষ্ঠায় ছিলেন, এখন তাঁহাকে শ্রবণায় দেখিতেছি। মঙ্গলের এই ত্রিবিধ অবস্থানের মধ্যে প্রথমোক্ত দ্বিবিধ অবস্থানের সুসঙ্গতি লেখক মহাশয় কর্ত্তৃক সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু তৃতীয়টির গতি কি হইবে? এক্ষণে শনৈশ্চরের অবস্থানের বিষয় আলোচনা করা যাউক।—

১। বিশাখায়াঃ সমীপস্থৌ বৃহস্পতিশনৈশ্চরৌ।
ভীষ্মপর্ব্ব ৩য় অং।

২। রোহিণীং পীড়য়ন্নেষ স্থিতো রাজন্ শনৈশ্চরঃ।
ভীষ্মপর্ব্ব ২ অং।

৩। প্রাজাপত্যং হি নক্ষত্রং গ্রহস্তীক্ষ্ণো মহাদ্যুতিঃ।
শনৈশ্চরঃ পীড়য়তি পীড়য়ন্ প্রাণিনোঽধিকং॥"
উদ্যোগ ১৪৩ অং।

৪। ভগং নক্ষত্রমাক্রম্য সূর্য্যপুত্রেণ পীড্যতে।
ভীষ্মপর্ব্ব ৩ অং।

এই শ্লোক চতুষ্টয়ে শনির যথাক্রমে বিশাখা, রোহিণী ও পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে অবস্থিতি বর্ণিত হইয়াছে। এখানে রোহিণীকে বিভাগাত্মক ও বিশাখাকে তারাত্মক বলিয়া স্বীকার করিলে, পুনর্ব্বসুতে সম্পাত থাকা সম্ভব হয় না। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বফল্গুনীকে লইয়া একটু বিপদে পড়িতে হয়। ইতিপূর্ব্বে বৃহস্পতিকে স্বাতী ও শ্রবণায় এবং চন্দ্রকে মৃগশিরায় ও মঘায় দেখিয়াছি। স্থানান্তরে বৃহস্পতি ও চন্দ্র উভয়েই রোহিণীস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যথা,—

"বৃহস্পতিঃ সংপরিবার্য্য রোহিণীং।
বভূব চন্দ্রার্কসমো বিশাম্পতে॥
কর্ণপর্ব্ব ৯৪ অঃ।

ভীষ্মপর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, চন্দ্র ও সূর্য্য রোহিণীকে পীড়িত করিতেছেন। ফলকথা, লেখক মহাশয়ের প্রদর্শিত যুক্তি দ্বারা গ্রহগণের

একত্রকালীন ত্রিবিধ অবস্থান বর্ণিত হইবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া যাইতেছে না। এই সকল কারণে, আমরা ভারত সংগ্রাম সম্বন্ধে লেখক মহোদয়ের নির্ণীত সময়ে প্রতি আস্থাবান্ হইতে পারিতেছি না। নতুবা যদি কেহ যুধিষ্ঠিরাদির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত করিতে পারেন, তিনি আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এপর্য্যন্তও কাহাকেও এবিষয়ে কৃতকার্য্য হ তে দেখা গেল না।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

শম্ভু সংবাদ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শম্ভুর সহধর্ম্মিণী সুশীলাসুন্দরী স্বামীর প্রতি সকোপ দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছেন। শম্ভু একবার মাত্র শির তুলিয়া স্ত্রীর নয়নে নয়ন রাখিয়া, সে দুটাকে আবার নামাইয়া লইয়াছেন। স্বামীর ইদৃশ ব্যবহারে আরও কিছু কুপিত হইয়া সুশীলাসুন্দরী চোখের কোন হইতে কতকগুলি কোপ রাঙা ঠোঁট দুখানিতে আনিয়া স্থাপিত করিলেন। কোপভরে ঠোঁট দুখানি আপনা আপনি নড়িয়া উঠিল। বহুক্ষণ ধরিয়া কতকগুলি কথা সেই ঠোঁটের অন্তরালে ডিবেটিংক্লব খুলিয়া লাফালাফি করিতেছিল। কখন বা টেবিল বোধে সুশীলাসুন্দরীর বক্ষে ঘা মারিতেছিল। প্রহার তাড়নে কোমলার কোমল বক্ষের নিশ্বাস গুলা বেগে নাসিকা পথ দিয়া পলাইতেছিল। কখন বা আবক্ষবিলম্বী শ্মশ্রুবোধে কথাগুলা সুভ্রূ সুশীলার ভ্রূযুগলে টান পড়িতেছিল, তাহাতে ভ্রূদ্বয় ঈষৎ ঈষৎ কুঞ্চিত হইতেছিল। অধরোষ্ঠের ঈষৎ কম্পনে অবকাশ পাইয়া বাতাস খাইবার জন্য বদন কূপ হইতে দুদশটা কথা বাহিরে আসিয়া পড়িল। সুশীলাও ঠাণ্ডা হইলেন, শম্ভুও নিশ্চিন্ত হইলেন।

শম্ভুর নিশ্চিন্ত হইবার কারণ ছিল। ক্রিকেটের আউটবলের মতন সুশীলাসুন্দরীর কথা মাঝে মাঝে গণ্ডী ছাড়াইয়া শম্ভুকে গুরুতর আঘাত করিত। আজকে বল্‌টা রগ ঘেঁসিয়া কানের কাছ দিয়া ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল। তাই শম্ভু নিশ্চিন্ত হইলেন।

সুশীলাসুন্দরী স্বামীকে দুই চারি কথা বলিলেন। কিন্তু সে কথা গুলিতে একটু আবেশ মিশ্রিত ছিল। সুশীলা স্বামীর দেহের অবস্থা সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া বলিলেন; স্বামী যদি দেহের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এত উদাসীন, তাহা হইলে স্ত্রীর আর জীবন ধরিয়া ফল কি? কাহাকে লইয়া তাহার সংসার ত আর কাহাকে লইয়াই বা তাহার জীবন। স্বামী যদি নিজের মঙ্গলে দৃষ্টি রাখিল না, সন্তান সন্ততির মুখ চাহিল না—দুপয়সা উপার্জনের চেষ্টা করিয়া পাঁচজনের মত

একজন হইতে পারিল না; কেবল বসিয়া বসিয়া কাগজে কলম পিশিয়া, বঙ্গভাষা রূপ মাকাল লতার চাষের জন্য, অমূল্য সময় জমিতে মস্তিষ্কের সার ঢালিয়া সকল আশায় জলাঞ্জলি দিল, তখন স্ত্রীর আর বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? বিএল্ পাশকরা উর্ব্বরা জীবন জমিতে আবাদ করিতে জানিলে সোণা ফলিতে পারিত। স্বামীর কৃষি কাজ এসেনা বলিয়া তাহাতে হলদে হলদে ফুল মাথায় করিয়া কতকগুলা শেয়াল কাঁটার গাছ জন্মিয়াছে।

কথা-বেগ সংযত করিয়া, কি জানি কি বুঝিয়া, সুশীলাসুন্দরী স্বামীকে ভৎর্সনা করিতে যাইয়া, বিনাইয়া বিনাইয়া দুটা কাঁদুনি গাইয়া চুপ করিলেন। আজ এই পর্য্যন্ত ভাবিয়া শম্ভুও নিশ্চিন্ত হইলেন। আহার্য্য প্রস্তুত বুঝিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুশীলা আর কিছু না বলিয়া ভাত বাড়িতে রন্ধনশালায় চলিয়া গেল। তখন তৃষ্ণার পাছু পাছু জল চলিল। ঘড়ীতে দুপুর বাজিল।

শম্ভু চলিয়া যাক। আমরা ইত্যবসরে দুই একটা কথা কই। শম্ভুর অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ একজন অতি প্রসিদ্ধ জমীদার ছিলেন। অত্যন্ত-অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ অর্থাৎ প্রপিতামহের বাপ রামতনু মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশ কি কোন এক দেশের নবাবের উজীর, কি রাজার মন্ত্রী ছিলেন। এককালে তার ভয়ে বাঘে গরুতে জল খাইত। তাহার বাসস্থান বঙ্গবিহার কিম্বা উড়িষ্যা, কিম্বা নাগপুর, কিম্বা রাজপুতানা কাশ্মীরের কোন একস্থানে ছিল। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ যেরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তাহাতে দুই কিম্বা দশ দিনে, কি শতবৎসর পরে রাজতরঙ্গিণী কিম্বা চাঁদ বরদই অথবা রাসমালা হইতেই হউক, কিম্বা সায়র মুতাক্ষরীন হইতেই হউক রামতনু রূপ লুপ্তমণি বাহির করিবেনই করিবেন। রামতনু আর লুকাইতে পারিতেছেন না। কোন কোন তত্ত্বদর্শী গভীর গবেষণা প্রমুখ অনুসন্ধান হলচালনে রামতনু রূপ প্রস্তর ফলক তুলিবার আশা রাখেন। যখন কেহ কিছু করিতে পারিবেন না, তখন "কৃতবাগ্দ্বারে বংশেহস্মিন পূর্ব্বসূরিভিঃ মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেব" আমার গতি কি করে বলা যায় না।

আপাততঃ এইমাত্র বলিয়া রাখিতে পারি, যে যদুপতেঃ কগতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ কগতোত্তরকোশলা। সুতরাং রামতনুনন্দন, শম্ভুর অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের জমীদারী কোথায় গিয়াছে কে বলিতে পারে?

আসল কথা শম্ভুর অবস্থা এখন বড় ভাল নয়। তবে শম্ভু সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান বোধে, এবং সদ্বংশ জাত বলিয়া, এবং বিএল্ পাশ করায় দুপয়সা উপার্জন করিতে সক্ষম হইবে ভাবিয়া শম্ভুর শ্বশুর, সুশীলাসুন্দরী কন্যাকে তাহার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু যে আশায় শম্ভুর শ্বশুর কন্যাদান করিয়াছিলেন, সে আশা বঙ্গবাসীর অদৃষ্টগগণের যুগপ্রলয়ের অম্লজান বাষ্প সংযোগে সৌরাসারিক পাচন ক্রিয়ায় মদে পরিণত হইয়াছিল। শ্বশুর মহাশয়ের আশার নেশা হই াছিল। আশাও পুরিল না নেশাও ছুটিল না। ডেপুটীগিরি,

মুনসেফী, উচ্চ কেরাণীগিরি নিম্ন কেরাণীগিরি, মাষ্টারি, ইত্যাদি ইত্যাদি যে কোন কার্য্যেই হউক জামাতা প্রবর একদিন না একদিন লাগিবেই লাগিবে ধ্রুব বিশ্বাসে, জামাতার পিতৃ মাতৃকুলে কেহ নাই বলিয়া তিনি পুত্র নির্ব্বিশেষে তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। শ্বশুর মহাশয় নির্ধন ছিলেন না। পায়ের উপর পা দিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে খাইতে পাইবার কিছু সম্পত্তি তাঁহার ছিল। তাঁহার বংশধরের মধ্যে সবেধন নিলমণি কন্যা সুশীলা সুন্দরী। কাজেই শম্ভু ও পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জামাই আদরের জামাই থাকিবেন এবিশ্বাস আমাদের ছিল। কিন্তু এবিশ্বাসের ভিতরে একটু গোল থাকিবার সম্ভাবনা ছিল তখন আমরা জানিতাম না। সেই সম্ভাবনাটী ক্রমে সত্যে পরিণত হইবার জন্য টলমল করিতে লাগিল। কিন্তু তখনও আমরা আশা রাখিয়াছিলাম, 'সম্ভাবনা' টলিতে টলিতে হয়ত আঁধারের দিকেই ঢলিয়া পড়িবে। কিন্তু হায়রে দুর্দ্দৈব! পড়িতে পড়িতে পড়িল না। তখন দেখা গেল, পিতৃমাতৃহীন বিদ্বান বুদ্ধিমান জামাতার উপার্জনে আরও কিছু জমি করিয়া, তাঁহার চিরশত্রু জ্ঞাতি শম্ভুর দূর সম্পর্কীয় খুড়শ্বশুরের সঙ্গে টক্কর দিবার জন্য তিনি শম্ভুকে ঘরে আনিয়াছিলেন। কিন্তু মন্দভাগ্য শম্ভুর শ্বশুর শম্ভু যে ঘরে ঢুকিয়া আর বাহির হইবেন না, কন্যাদানের সময় বুঝিতে পারেন নাই। যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন শম্ভুর এক পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছে। এখন শম্ভুর উপর কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিতেও সাহস করিতেন না। কিসের জন্য? যাদের জন্য, তাদের বিচ্ছেদ মনে আনিতেও শম্ভুর শ্বশুরের গাত্র শিহরিত। তাহাদের একজন তাহার নাক ধরিয়া টানিত, আর একজন পৃষ্ঠে চাপিয়া হেট হেট করিত। তাহাদের একজনের নাম নলিনী, আর একজনের নাম নলিন। জামাতা যখন উপার্জনক্ষম, তখন তাহাকে কিছু বলিলে পাছে নলিন নলিনীকে লইয়া কিজানি কোন বিদেশে চলিয়া যায়, এই ভয়ে মুখ ফুটিয় জামাইকে শ্বশুর মহাশয় কিছু বলিতে পারিলেন না।

শম্ভুর শ্বশুর তাহা হইলে কি করিলেন? তিনি ঝীকে মারিয়া বোকে শিখাইবার চেষ্টা করিলেন। শম্ভুকে শুনাইয়া তিনি কথায় কথায় কন্যার অদৃষ্টের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন।—"আহা! আমার এমন সোণার জামাই। ইচ্ছা করিলে লাখো টাকা রোজগার করিতে পারে, কিন্তু তোর অদৃষ্টে এত লেখাপড়া শিখিয়াও শম্ভু বাবুর আমার এক পয়সাও উপার্জ্জন হইল না। মনে করিয়াছিলাম আমার যা আছে তাহাতে আর কিছু যোগ করিয়া তোরে রাজরাণী আর নলিন নলিনীকে রাজপুত্র রাজকন্যা করিয়া দিব। শুদ্ধ তোর অদৃষ্টে তাহা হইয়াও হইল না। শম্ভু বাবুর দোষ কি! স্ত্রীভাগ্যে ধন আর স্বামীভাগ্যে পুত্র। শম্ভু বাবুর কার্য্য শম্ভু বাবু করিয়াছে। তোর অদৃষ্টে ধন নাই ত সে কি করিবে।" কন্যা সেই অবধি স্বামীর কাণের কাছে ভ্যান ভ্যান আরম্ভ করিল। তাহাতে শম্ভুর কদর কমিল কি বলিতে পারি না, কিন্তু আদর কমিল না।

দিনের পর দিন গেল, মাসের পর মাস গেল, বৎসরের পর বৎসর আসিল।

সুশীলা স্বামী-প্রবোধনে অভ্যস্তা হইলেন। প্রথমে ব্যাজ স্তুতি অর্থাৎ নিন্দাছলে স্তুতি ও স্তুতিছলে নিন্দা পরে স্তুতি নিন্দা, নিন্দা স্তুতি কখন একেলা কখন যুগলে যুগলে আসিয়া কখন বা ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিয়া পড়িয়া, উপদেশটা খিচুড়ীর পাকে জমাইয়া স্বামীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। শম্ভু দেখিলেন উপার্জ্জন না করিলে আর চলে না।

এতকালের মধ্যে শম্ভু কি একবারও উপার্জনের চেষ্টা করেন নাই। করিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহ জামাতার বংশমর্য্যাদা নাই বলিয়া তাহার হাকিম হওয়া হইল না। মুখ নাই বলিয়া উকীল হওয়া হইল না। পাখা নয় বলিয়া মুনসেফ হইতে পারিলেন না। ক্রমে এটা ওটা সেটা না হইতে হইতে কিছুই হওয়া হইল না। ঘরের ধন শম্ভু আবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। শম্ভুর ইংরাজীবিদ্যা শম্ভুকে ছলনা করিল। কাল্পনিক উন্নতির গোলকধাঁদায় ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া, ফিরাইয়া ফিরাইয়া, নাক, কাণ মলাইয়া, আর চাকরীর জন্য বাহির হইব না প্রতিজ্ঞা করাইয়া শম্ভুকে একঝটকায় বাড়ীতে ফেলিয়া দিল। শম্ভু শ্বশুর বাড়ীতে স্থির গম্ভীর অচল অটল।

শম্ভু একদিন এইরূপ স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার একজন বাল্যবন্ধু, তাঁহারই মতন স্বাধীন জীবনের চিরাভিলাষী, তথাচ মহাজন প্রস্থত যে কটা পথ আছে, সেই পথের যে কোন একটা দিয়া যাইয়া ভারতোদ্ধার কার্য্যেব্রতী হইয়া, দেশের ধন দেশে রাখিতে অক্ষম, সুতরাং তাহারই সমবস্থ, কিন্তু তাহার মতন শ্বশুর জুটে নাই বলিয়া ভবঘুরে বাল্য-বন্ধু, তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার সঙ্গে সুখ দুঃখের অনেক কথা হইল। তাহারই কাছে শম্ভু শুনিলেন যে বাঙ্গালী বাঙ্গালা পড়িতেছে। তাহাদের সহপাঠী বয়াটে রামচরণ বাঙ্গালায় কলম ধরিয়া দুই দিনে বড়মানুষ হইয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হইতে আরম্ভ করিয়া, সুবক্তা দুর্ব্বক্তা অতিবক্তা হইয়া হাবানেলো পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা বঙ্গভাষা করিয়া চীৎকার করিতেছে। সে চীৎকারে কাক কোকিল হয় হস্তী প্রতিধ্বনি দিতেছে। এমন কি সে গগণভেদী চীৎকারে বাঙ্গালার কথা ত ধরা উচিতই নয়—যোধপুর জয়পুর জলপাইগুড়ি জর্ম্মানি পর্য্যন্ত যোগ দিয়াছে

শুনিবামাত্র শম্ভু বগল বাজাইলেন। শম্ভুর বাল্যবন্ধুও বীরদর্পে সেই বগলবাদ্যে বগল প্রতিধ্বনি তুলিলেন। তখন বগল কবলিত সমীরণ পটাপট্ শব্দে অনন্ত গগণ ভেদ করিয়া অনন্তের দিকে ছুটিল। অনন্তদূরসংস্থ-সিংহাসন শোভাকরী অদৃষ্ট সুন্দরী সেই শব্দ শ্রবণে মূর্চ্ছিতা হইলেন। বুঝিলাম শম্ভুর উপর তার অধিকার লোপ পাইল। অদৃষ্ট কি? অদৃষ্টকে? মানব জীবনের উন্নতি অবনতি বিষয়ে তাহার সম্পর্ক কি? ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ মানব পুরুষকার রূপ হেনরী মার্টিনি ব্রহ্মাস্ত্রের মালিক হইয়াও এতকাল কেবল অদৃষ্ট নিবদ্ধ দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। এখন ধর পুরুষকার, হান পুরুষকার, বল জয় জয় পুরুষকার।

তখন যে ভাষার মাতা নাই পিতা নাই—অথবা মাতাপিতা থাকিলেও তাহারা ভাষার উপর মাতৃ পিতৃত্বের

দাওয়া করিতে পারে না—সেই ভাষায় শম্ভু শ্রীশ্রী৺ কালীমাতার আশীর্ব্বাদে ব্যবসায় চালাইবার সংকল্প করিলেন। যে ভাষায় শিষ্য গুরুকে মন্ত্রদান করে, ছাত্র শিক্ষকের কার্য্য সমালোচনা করে মূর্খবোধে বেঞ্চে বসিয়া চর্য্যাবাগীন পণ্ডিতকে লেকচর দিয়া থাকে। সেই ভাষায় শম্ভু বেদব্যাস হইবার জন্য গণেশ খুঁজিতে লাগিলেন। যে ভাষায় বাইওকেমি ভৈষজ্যতত্ত্বের মত দ্বাদশ বস্তুর বিভিন্ন সংমিশ্রণে মনোবিকারের ঔষধ প্রস্তুত হয়, শম্ভু সেই ভাষায় ধন্বন্তরি হইবার জন্য লেখনীরূপ তাপমান যন্ত্র ক্রয় করিলেন। যে ভাষার এরণ্ড স্কন্ধে হৃদয় দ্বারের কবাট প্রস্তুত হয়, যখানে তেল হয়, জলে হৃদয় পুড়িয়া ক্ষার হয়, অনলে অঙ্গ জল হইয়া সহস্রধারায়, নানাদেশ প্রবাহিনী বন্যার স্রোতস্বিনীর মত, হতাশা সাগরে পড়িয়া ভবসিন্ধু পার হয়, শম্ভু সেই ভাষা সংসারে ঘর বাঁধিবার জন্য ইট কাঠ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যে ভাষায় কল্পনা ব্রতের, নদ হ্রদ প্রস্রবন, গিরি নক উপবন, গহন কানন কন্দর; অনন্ত আকাশ সাগর, ফুলপরিমল ভৃঙ্গ, সুশ্যামল তৃণ ক্ষেত্র আর সুবা ধবলিত শৃঙ্গ—এই প্রকার কয়েকটী বাছা বাছা ব্রাহ্মণ আছে, তাহারাই যাজক তাহারাই যজমান, তাহারাই যজ্ঞের হবি, আবার তাহারাই ঋষি তাহারাই ছন্দ, দেব দেবী তাহারাই, শম্ভু এ হেন ভাষাজীবনের কল্পনা ব্রতের ব্রতী হইলেন। তবে আর বাকী রহিল কি? লবণ লেবু সব হইল বাকী রহিল কি? বাকী রহিল আমার মাথা ও মুণ্ড।

(৬২)

কল্পনা তাড়নে বহুকালের পর শম্ভু একবার ছাদে উঠিলেন। ছাদে উঠিয়া দেখিলেন শকট চক্রধ্বনি কুহরিত, ইতস্তত সমীর বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা মাথায় লইয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হেমন্তের হিমকণা বসনা নীথর তরঙ্গিণীর মত বুকখানি পবিবৃত করিয়া দিয়া সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূল হইতে স্থূলতর, কোথা হইতে আসিয়া আবার স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর কোথায় চলিয়া যাইতেছে। তটিনী স্রোতে গা ভাষান দিয়া চলিয়াছে, গরুর গাড়ীরূপী জেলেডিঙ্গি আর হোরমিলারের ইনবিনোদরূপী ট্রামকার, আর ছেলডাকরূপী পানসী আর জুড়ীরূপী বজরা। উজান বহিয়া আসিতেছে কিম্বা স্রোতের সঙ্গে চলিতেছে মকর কুম্ভীর হাঙ্গরকুল, কুটা কাটা পদ্মফুল আরও কত কি।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দেখিয়া শম্ভুর ভাব আসিল। বাল্যের সুখস্মৃতি সেই হাসিতে হাসিতে কাঁদা, সেই কাঁদিতে কাঁদিতে হাসা, একধারে আলো অন্যধারে ছায়া ইবগৌরী ভাব লইয়া [illegible], তবল কটাক্ষে শম্ভুর হৃদয়পানে চাহিল। বই হাতে ছাতি মাথায়, শিশুজীবনের চিরচঞ্চল চরণযুগলস্পৃষ্ট ধূলিকণাপূত কর্ণওয়ালিস বক্ষঃপেষণে অতিক্ষীণ হইয়া কারণদেহে নাগপাশবৎ তাহার অবক্ষিত হৃদয়টুকুতে জড়াইয়া ধরিল।

তখন কুলললনার মত গৃহকোণে আবদ্ধ কিন্তু সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি বলে সর্ব্বজ্ঞ, পৃথিবীর তিনভাগ জল একভাগ স্থল, গ্রীনল্যাণ্ডের দক্ষিণে বেফিন বে, ইটালীর দক্ষিণে নেপলস্, সেই নেপলসের আগ্নেয়

পর্ব্বত বিম্ববিয়সের অনুলোদিগিরণে ভস্মাচ্ছাদিত পম্পী নগর ইত্যাদি ইত্যাদি সর্ব্বদর্শী, বিয়ে না হইতে সস্ত্রীক শকটারোহনে ক্রাকোগামী, সম্ভবতঃ ভুবন বিচারী কিন্তু লোক-চক্ষে ঘর হইতে বিদ্যালয় আর বিদ্যালয় হইতে ঘর পরিক্রমণ শীল। স্বগৃহে গৃহিণী রূপিণী শারী সম্মুখে দেহ কণ্ডুয়ন তৎপর শুকের মত অতি ধীর, কিন্তু গৃহের বাহিরে শিশুগণ মধ্যে নিত্য আস্ফালক, তর্জ্জন গর্জ্জন তৎপর মহাবীর মাষ্টার, আর সেই মাষ্টারধৃতা চিরচপলা যষ্টিগাছি মনে করিয়া অলস গমন আবার কখন বা সমীরনমিত তরুশাখা সংলগ্ন পল্লব কুলের সর সর রবাকৃষ্ট হইয়া উর্দ্ধ দর্শন, মন্থর গতির পর কুরঙ্গ সুলভ চপলতার উল্লম্ফন—শিশু শম্ভুর লীলারঙ্গ মোহনবেশে হেসে হেসে যুবা শম্ভুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবা শম্ভু কল্পনা চক্ষে তাই দেখিয়া কুম্ভক যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্থাৎ পূর্ব্বজীবনের সহিত বর্ত্তমান জীবনের তুলনা করিতে করিতে শম্ভুর দম আটকাইয়া গেল। তখন কল্পনারম্ভেই শম্ভুর কুম্ভক যোগের দম্ভ দেখিয়া আমি হতভম্ব হইয়া আকাশ পানে চাহিয়া রহিলাম।

দেখিলাম শুভ্র রবিকিরণমিশ্রনে নীলধূসরাঙ্গ আকাশের গায় খণ্ড মেঘগুলি নানা মূর্ত্তি ধরিয়া,—জলদকানন পরিধি মধ্যে কোথাও সিংহ, কোথাও ব্যাঘ্র, হস্তী, বিড়াল, ভল্লুক—নানা মূর্ত্তি ধরিয়া, যেন কালকেতুরূপী শম্ভুর কল্পনা শরনিকরে ব্যথিতাঙ্গ অথবা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবার ভয়ে সভা করিয়া বসিয়াছে। সেই অস্পষ্ট আবছায়া মূর্ত্তি সমূহ মধ্যে—চণ্ডীর বরপুত্র বন কাটিয়া নগর বসাইবে আশায়—কোথাও বা মন্দির নমুনাস্বরূপ একটী অর্দ্ধভগ্ন চূড়া; কোথাও বা অট্টালিকার অর্দ্ধভগ্ন বাতায়ন বক্ষ, অর্দ্ধভগ্ন প্রাচীর, কোথাও বা পূর্ণকুম্ভ, আবার কোথাও বা গোলাপ মল্লিকাদি পুষ্পকানন, শম্ভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য যেন নীরব নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া আছে। কোমল প্রাণা অভিমানিনী ফুলরাণী শম্ভুর দৃষ্টি পড়িল না বলিয়া মনের দুঃখে গলিয়া গেল। প্রাচীর মন্দির শম্ভুর অবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া জড়া জড়ি করিয়া; নৃত্যরঙ্গে মাতিয়া উদাস-প্রাণের পরিচয় দিল। সিংহ, ব্যাঘ্রাদি শম্ভুর অবহেলায় ক্রুদ্ধ হইয়া অতি ক্রোধে ফুলিয়া ফুলিয়া ভীমমূর্ত্তি ধরিয়া পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া দাড়াইল। তাহাতেও রাগ থামিল না। তখন কানন গর্ভে লুকাইয়া শম্ভুকে ভয় দেখাইবার জন্য অদ্ধগগণ ছাইয়া ফেলিল। প্রকৃতি সুন্দরী অতি কোমল-প্রাণা—শম্ভুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া, রমণীকুল গৌরবা বঙ্গীয়া দয়াময়ীর মত শম্ভুর দুঃখ প্রতিকারের অন্য উপায় না জানিয়া বারকতক হু হু দীর্ঘশ্বাস আর ফোঁটাকতক চক্ষের জল ফেলিতে আরম্ভ করিলেন। শম্ভু আর কিয়ৎক্ষণ এই অবস্থায় থাকিলে হয় ত কাঁদিয়া ভুবন ভাসাইতেন। কিন্তু তা আর ঘটিল না। কর্ণওয়ালিসের অনুপম রূপলাবণ্য দেখিতে দেখিতে রূপমোহজ বিহ্বলতায় কর্ণওয়ালিসকে মনে মনে প্রাণসঁপিয়া!

"প্রিয়ে! কর্ণওয়ালিস
ধরিয়া তোমারে ভাষা খোলে পুরে
সাহিত্য শয্যায় তোমা করিব বালিস,"

বলিতে বলিতে ছাদ হইতে যেমন

কাল্পনিক ঝাঁপ খাইতে যাইতেছেন অমনি কোথা হইতে সুশীলাসুন্দরী মধুর নূপুর গর্জনে পশ্চাৎ হইতে স্বামীকে ডাকিয়া বলিল--"বলি খাবার সময় ছাদের উপর বসিয়া কি হইতেছে?" সেই কথাকর্ষণে শম্ভুর পড়িতে পড়িতে পড়া হইল না। আমারও শম্ভুসঙ্গে কর্ণওয়ালিস পৃষ্ঠে চড়িতে চড়িতে চড়া হইল না। সুশীলাসুন্দরী অবশ্যই আমাকে দেখিতে পান নাই। দেখিতে পাইলে আর তোমাদের সম্মুসংবাদ শুনিতে হইত না। আমি কিন্তু দেখিয়াছি সুশীলাসুন্দরীর ফুল্লেন্দীবর নয়নকমলের উপর কে যেন রক্তকম্বলের বিচি গুলিয়া মাখাইয়া দিয়াছে।

শ্রীক্ষিরোদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মহাত্মা রাম প্রসাদ সেন ভারত চন্দ্রের সমসাময়িক। ইনি বৈদ্যজাতীয়, নিবাস হালীসহরের নিকটবর্ত্তী কুমার-হট্ট গ্রাম। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইহাকেও "কবিরঞ্জন" উপাধি ও প্রচুর ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন ও সম্মাননা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মুসলমান অধিকার-কালে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জমিদারেরাই প্রজাগণের শুভাশুভের দিকে সতত দৃষ্টি রাখিতেন। তখনকার অধিকাংশ রাজা বা জমিদারেরা সরকারী রাজস্ব দাখিল করিয়াও জমীদারীর প্রভূতলাভ পাইতেন এবং দ্রব্যাদি সস্তা থাকাতে সাধারণ প্রজাবর্গও সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া গীত, কবিতা প্রভৃতি অনুভাবকতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে অবসর পাইতেন। তাঁহাদের দৃষ্টি বাহ্যজগতের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট না হইয়া বরং অন্তর্জগতেই আকৃষ্ট হইত; আবার ধনী মহোদয়েরা অর্থাদি সাহায্যে কবিগণকে উৎসাহিত ও সম্মানিতও করিতেন। কালের বিচিত্র গতিতে এখন এই "অন্নচিন্তার" দিন লোকের আর অনুভাবকতা শক্তির পরিচয় দিবার অবসর নাই। অভাব বৃদ্ধির সহিত কেবল অভাব-মোচনের উপায় ও অর্থাগমের কৌশল আবিষ্কৃত হইতেছে। এখন সকলে দৈহিক সুখ লইয়া ব্যস্ত সুতরাং মানসিক শক্তির আলোচনা আর কিরূপে থাকিবে? এখন আর সে রামও নাই এবং সে অযোধ্যাও নাই সেরূপ কবিও নাই আর সেরূপ কাব্য-রসামোদী ভাবুক-প্রবর বড়লোকও নাই।

ভারতচন্দ্রের ন্যায় রামপ্রসাদ সেনের রচিত একখানি বিদ্যাসুন্দর আছে। ইনি অনেক গুলি শ্যামাবিষয়ক গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন! গীতগুলি সামান্য কথায় যেমন মনোহর ভাবব্যঞ্জক ও ভক্তিরসোদ্দীপক বাঙ্গালা ভাষায়

তেমন আর কাহারও রচনায় নাই। ইঁহার রচনায় সুদীর্ঘ শব্দের আড়ম্বর নাই কেবল ভক্তহৃদয়ের প্রগাঢ় ভাব তরঙ্গের উচ্ছ্বাস। কথিত আছে রামপ্রসাদ এই সরল গীত রচনা করিয়া সিদ্ধ পুরুষ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার গীতে যেরূপ ভক্তহৃদয়ের সাহস ও প্রাণের ভরসা আছে তাহাতে যে ভগবতী স্বয়ং কন্যাবেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন তাহা অসম্ভব নহে। তাঁহার রচিত গীত অনেকের অবগত থাকিলেও নিম্নে একটী উদ্ধৃত করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—

"আমি তোর আসামী নই রে শমন
মিছে কেন কর তাগাদা।
(শমন) আছে'ন প্রকাশ, আমি দুর্গাদাস,
তোর ধার কিছু ধারি না।
জগদম্বা আমার রাজা,
আমি মায়ের খাসের প্রজা,
তোর তালুকে থাকি না।
পেয়ে মহালীজ, হয়েছি খারিজ,
তোর কাছারিতে যেতে হবে না॥
দাখিলে চিত্রগুপ্তের কাছে, যে বাকীদার আছে,
আমার নাম তাতে পাবি না।
আমি দুর্গাপুর বাসী, সেখানে নাই নিরীখ বেশী
নাই তহশীল যাতনা। (রে)
তথায় নাইকো বাটা, মা দিয়েছেন পাটা
স্বহস্তে করে নিশানা॥
মায়ের পেয়ে অনুমতি, চৌদ্দভুবন পতি
উশুল তফাৎ কিছু করে না॥
ইস্তাহার দিয়েছেন শ্যামা, যে প্রজার যত জমা,
ক্রমে দিও কেউ ভেবনা।
প্রজা নাতোয়ান হলে, জমায় কমি মিলে,
সুদের অঙ্কে কিছু বাড়ে না॥
সাবেক বাকী যত ছিল, সে অঙ্কে মা শূন্য দিল
এম্‌নি মায়ের করুণা।
রামপ্রসাদ কয় তপন তনয়
তুমি আর হেথা এসোনা।
তুমি এসেছ এখানে, মা যদি তা শুনে
অপমান বাকী রাখবে না॥

কথিত আছে প্রথমে ইনি সামান্য মুহুরীগিরি, বা পাটোয়ারীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হন; কিন্তু অন্তরে ভাব-তরঙ্গের নিয়ত উচ্ছ্বাসে সে কার্য্যে আদৌ তাঁহার মন লাগিত না। একদিন তিনি তাঁহার প্রভুর খাতায় ভ্রম বশতঃ লিখিয়াছিলেন—

"দে মা আমায় তবীলদারী,
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী।

প্রভু তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বৃত্তি নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কর্ম্মে অবসর দিয়াছিলেন।

এই সময় হইতে এদেশে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম অবস্থায় বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন উন্নতি দেখা যায় না। এই সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ছাপার সৃষ্টি হয় নাই, পুস্তকাদি হস্তলিখিত হইয়া চলিয়া আসিতেছিল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে দেশীয় বিধি অনুসারে বিচার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, বিধি সমূহের সঙ্কলন ও প্রণয়ের জন্য হ্যালহেড সাহেব প্রথম বাঙ্গালা টাইপ সৃষ্টি করেন। ছাপাখানার সৃষ্টিতে পুস্তকাদি মুদ্রিত ও বহুল প্রচারিত হওয়ায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পথ সুগম হইয়া উঠে। এই সময় হইতেই বাঙ্গলায় গদ্য-লেখার আরম্ভ হয়। লর্ড ওয়েলেস্‌লীর শাসনকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিলক্ষণ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়েই অর্থাৎ ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে সিভিল কর্ম্মচারীগণকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য "ফোর্ট উইলিয়ম" নামক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং অনেক গদ্যগ্রন্থ রচিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সাধিত হয়।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে রাম রাম বসুর প্রতাপাদিত্য, ১৮০২ খৃষ্টাব্দে লিপিমালা ও রাজীবলোচনের "কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত" এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রাজাবলী প্রণীত হইয়া বঙ্গভাষার কলেবর বৃদ্ধি করে। এই সময়েই শ্রীরামপুরের মিস্‌নারী সাহেবেরাও বাঙ্গালার উন্নতিকল্পে সাহায্য করেন। এই সময়েই কেরী সাহেবের "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" ও অভিধান প্রণীত হয়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মিশনারী মার্শম্যান সাহেব জয়গোপাল তর্কালঙ্কার দ্বারা রামায়ণ ও মহাভারত ছাপাইতে আরম্ভ করেন। এই মিশনারী মহোদয়েরাই বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি করিবার জন্য প্রথম সাময়িক পত্রের প্রচলন করেন। আজিম ওসামের শাসনকালে বঙ্গদেশে সংবাদ পত্রের প্রচলন থাকিলেও ছাপার অভাবে ইহার বহুল প্রচার ছিল না, সুতরাং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখের "সমাচার দর্পণ" নামক পত্রিকাই বাঙ্গালার প্রথম সাময়িক পত্রিকা। ইহার কিঞ্চিৎকাল পরেই অর্থাৎ লর্ড বেংটিঙ্কের শাসনকালে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে "প্রভাকর" ও পরে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশিত হয়; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রথমোক্তের ও অক্ষয়কুমার দত্ত শেষোক্তের সম্পাদক ছিলেন। এই দুই মহাত্মাই বঙ্গসাহিত্য-সংসারে মূল নিধি। ইহাঁদের উভয়ের অধ্যবসায়, যত্ন ও পরিশ্রমে বাঙ্গালা সাহিত্য অনেকাংশে উন্নতিলাভ করিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনা কবিতাময়ী এবং শ্লেষাত্মক কিন্তু গভীরভাব পূর্ণ আর অক্ষয়কুমারের রচনা গদ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সুতরাং বিজ্ঞানশীলতার বিলক্ষণ পরিচায়ক। তাঁহার প্রণীত চারুপাঠ, মানব প্রকৃতির সহিত বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধ, ও ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের অদ্ভুত রত্ন। ইহাতে গ্রন্থকারের যত গবেষণা, যত চিন্তাশীলতা ও মস্তিষ্ক পরিচালনার আবশ্যক হইয়াছে অদ্যাবধি বাঙ্গালা ভাষার কোন পুস্তকে সেরূপ দেখা যায় না। ইনি জাতিতে কায়স্থ, বৰ্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অকল্যাণ্ড সাহেবের শাসনকালে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন, তাঁহার কবিত্বের কথায় কথায় হাস্য-তরঙ্গ কিন্তু বাক্যের আড়ম্বর কিছুমাত্র নাই। ইনি যে প্রভাকরের সম্পাদক ছিলেন সেই পরিচয় সাধারণকে দিবার জন্য এক জন কবি লিখিয়াছেন—

কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।

কবিতাটীতে দ্ব্যর্থ আছে এবং ইহার রচনা ও অনুপ্রাসাদিতে চমৎকারিত্ব বর্ত্তমান। নিম্নে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার দুই একটী অংশ উদ্ধৃত হইল।

তিনি "পরমার্থ তত্ত্ব" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

সংসার কুহক কাচে, বিষয় বিষম।
জেনে কেন ভ্রমে খাও, বিষয় বিষম॥
দেহ গেহ নবদ্বার, শূন্য বটে তিন।
প্রপঞ্চ তাহাতে পঞ্চ পঞ্চঠাঁই লীন॥
পাঁচেতে ব্যাপক স্থূল, শিখিয়াছি শুনে।
সে পাঁচ প্রভেদ আছে পাঁচ পাঁচ গুণে॥

কথিত আছে তিনি কোন সময়ে জলপথে গমন করিতে করিতেও বহুদিন মৎস্য খাইতে পান নাই, কেবল

ছাগ মাংসে শরীর রক্ষা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে তিনি কৌতুকচ্ছলে ছাগ-মাহাত্ম্য বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

"রসভরা, রসময় রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল।
নানা বর্ণে ছানা সব লাফে লাফে ছোটে।
কানাই বলাই যেন নৃত্য করে গোঠে॥
মধুভরা মধুকোষ, নাম মধুকোষ।
যে জন আহাব করে সেই আশুতোষ॥
এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যাবা।
ম'রে যেন ছাগী গর্ভে জন্ম লয় তারা॥

কবি, আমাদেব দেশ প্রচলিত "পৌষ পার্ব্বন" প্রথায় অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

"বাউনী, আউনী ঝাড়া পোড়া আখ্যা আর।
মেয়েদের নব শাস্ত্র অশেষ প্রকার॥
উননে ছাউনি করি, বাঁউনী বাঁধিয়া।
চাউনি, কর্ত্তার পানে কাঁদুনী কাঁদিয়া॥
ক্ষুদ্র কুড়া গুঁড়া করি, কুটিলাম ঢেঁকি।
কেমনে চালাই সব তুমি হলে ঢেঁকি॥
এক মনে খায় যদি আদ্ মনে সারি।
এক মনে না খাইলে দশ মনে হারি॥"

সে সময়ে মিশ্‌নবী মহোদযগণের প্রবল প্রতাপ; তাঁহাদের কুহকে পড়িয়া অনেক বাঙ্গালী যুবক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকেন; সেই উপলক্ষে কবি কেমন হাস্যের কথায় লিখিয়াছেন—

"কহিতে মনের খেদ বুক ফেটে যায়।
ছেলে ধরা মিশ্‌নারি হায় হায় হায়॥
চুপ্ চুপ্ ছেলে সব হও সাবধান।
কাণকাটা কৃষ্ণ বন্দ্যো, কেটে নেবে কাণ।
মধুর বচন ঝাড়ে জানাইয়া লব্!
ইশু মন্ত্র কাণে ফুঁকে মোহ করে সব॥
শিশু যবে গুরু বলে, মনে জানে ডরে।
মায়াময় লবে পড়ে ডুব্ দেয় টবে॥

এতদ্ব্যতীত তিনি, "শীকযুদ্ধ, বড়দিন ও ইংরাজী নববর্ষ" প্রভৃতি বিষয়ক যে সকল কবিতাবলি রচনা করিয়াছিলেন তাহার প্রতিপংক্তিই যে এক একটী হাস্য রসভাণ্ডার।

যে খৃষ্টাব্দে "প্রভাকর" পত্রিকা প্রথম প্রচারিত হয়, সেই বৎসরেই সতী-দাহ-নিবারণার্থ মহাত্মা রামমোহন রায় বিলাত গমন করেন। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম স্থাপনকর্ত্তা। ইঁহার রচিত অনেকগুলি পারমার্থিক সঙ্গীত ও কএক খানি পুস্তক আছে। গীতরচনায় ইঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এই সময় মহামতি বেণ্টিঙ্ক এদেশেব শাসনকর্ত্তা। ইহার অত্যল্প কাল পরেই অর্থাৎ মেট্‌কাফ্ সাহেবের সময় বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্থাপিত হয়।

হার্ডিঞ্জের শাসন-কালে সাধারণের বাঙ্গালা-শিক্ষার পথ সুগম করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্যে ১০১টী বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সময়ে স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মাতৃভাষার উন্নতি-কল্পে ইনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "বেতালপঞ্চ-বিংশতি" প্রণীত হয়, তৎপরে ইনি "সীতার বনবাস" প্রভৃতি অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও বালকগণেব নীতি শিক্ষার্থ অনেকগুলি বালক পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইঁহার রচনা ও শব্দ সংস্কৃতানুযায়ী এবং অনুবাদাত্মক। ফলতঃ গদ্য রচনায় অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী-তেই বঙ্গভাষা পরিপুষ্ট শ্রীসম্পন্ন হইয়া

বর্ত্তমান আকারে উপস্থিত হইয়াছে। এই দুই মহাত্মার রচিত পুস্তকের পরিচয় দিব'র কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই।

যেমন গদ্য রচনায় পূর্ব্বোক্ত মহোদয়গণ বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন সেইরূপ অমৃতোপম পদ্যময়ী রচনায় মধুসূদন দত্ত ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ভাবুক প্রবরেরা বঙ্গসাহিত্যকে এক অভূতপূর্ব্ব রসভাণ্ডার করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক মধুসূদন যে "মধুচক্র" রচনা করিয়াছেন, কাব্যরসামোদী বঙ্গবাসী আজ সেই মধুপানে বিভোর হইতেছেন। মধুসূদন দত্তই বঙ্গভাষায় "অমিত্রাক্ষর" ছন্দের সৃষ্টি করেন। ইং ১৮২৮ সালে কপোতাক্ষ নদীতীরবর্ত্তী সাগর দাঁড়ী গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। ১৬।১৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং "মাইকেল" উপাধি প্রাপ্ত হন। মান্দ্রাজ কলেজে অধ্যয়ন কালীন তত্রত্য জনৈক ইংরাজ অধ্যাপকের কন্যা তদীয় গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। প্রথমে তাঁহার মাতৃভাষার উপর কিছুমাত্র আস্থা ছিল না; পরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পাইকপাড়ার তদানীন্তন রাজার অনুরোধে তিনি যথাক্রমে শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক ও বীরাঙ্গনা কাব্য এবং কয়েক খানি প্রহসন্ রচনা করেন। ইহার কিঞ্চিৎ কাল পরেই তিনি নানা কারণে সংসারের প্রতি বিরক্ত ও অনুতপ্ত হন। তিনি আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া যে কএকটী কবিতা "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার একটী কবিতায় তদীয় হৃদয়ের নিদারুণ অনুতাপ জীবন্তভাবে বর্ণিত আছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"যশো লাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়
কব তা কাহারে।
সুগন্ধ কুসুম গন্ধে, অন্ধ কীট যথা যায়
কাটিতে তাহারে
মাৎসর্য্য বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ
এই কি লভিলি হায়, অনাহারে অনিদ্রায়?

১৮৬২ অব্দে তিনি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থসাহায্যে বিলাত গমন করেন। জন্মভূমি প্রতি তাঁহার যে কীদৃশ ভক্তি ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার তৎকাল-রচিত একটী কবিতা উদ্ধৃত হইল,—

"রেখো মা দাসেরে মনে এমিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন কর না গো তব মনঃ-কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে,
জীব তারা যদি খসে,
এ দেহ আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে
চির স্থির কবে নীর হায় রে জীবন নদে"?

সুদূর ইউরোপ খণ্ডে থাকিয়াও তিনি মাতৃভাষার উন্নতি-কল্পে উদাসীন ছিলেন না। বিলাতপ্রবাস-কালে তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। হিন্দুশাস্ত্রে, হিন্দুর আচার ব্যবহার প্রভৃতিতে যে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল তাহা তাঁহার কাব্যের প্রতি পত্রেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়, ফলতঃ তাঁহার রচনা পাঠে কিছুতেই তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া বোধ হয় না। ইহার রচনা ওজোগুণসম্পন্ন;

শব্দ-বিন্যাস অতীব চমৎকার, তবে তাঁহার রচনায় উপর্য্যুপরি সুধাকার উপর্মা থাকায় ও কতগুলি অতি দুরূহ অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের ব্যবহার থাকায় সাধারণের বোধগম্য হয় না অন্ততঃ কঠিন বলিয়া বোধ হয়। তিনি কতকগুলি ক্রিয়াকে সংযত বা স্বল্পায়তন করিয়াছেন যথা—স্তম্ভিলা, মর্ম্মবিছে, ধ্বনিলা, উত্তরিলা, সুবর্ণি ইত্যাদি। তাঁহার রচনায় স্থানে স্থানে অহঙ্কারের পরিচয় সত্ত্বেও তিনি ভারতীয় কবিগণের নিকট বিলক্ষণ বিনীতভাব দেখাইয়াছেন। তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভে লিখিতেছেন—

"নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিব চুড়ামণি
তব অনুগামী দাস—
শ্রীভর্ত্তৃহরি, সুরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ, ভারতে খ্যাত বরপুত্র মিলি
ভারতীর, কালিদাস সুমধুর ভাষী।

ইহার পরেই সুপ্রসিদ্ধ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে উদিত হন। তাঁহার প্রণীত "বৃত্রসংহার" একখানি মহাকাব্য। এই কাব্যে পৌরাণিক বর্ণনার সহিত কবি নিজের কল্পনা শক্তিরও বেশ নিপুণতা দেখাইয়াছেন। বৃত্রসংহার মহাকবি মিল্‌টনের Paradise Lost নামক মহাকাব্যের অনুকরণে লিখিত। ইনি অল্প কথায় উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করিতে যেরূপ নিপুণতা দেখাইয়াছেন অপর কেহ সেরূপ পারেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে "বৃত্রসংহারের" একটী স্থল উদ্ধৃত হইল। শচী বিলাপ করিয়া বলিতেছেন—

"কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল
বসিত কার্ম্মুখ ধরি করে।
তুই সে মেঘের অঙ্গে, খেলাতিস্ কত রঙ্গে
ঘটা করি লহরে লহরে॥
কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে
পার্শ্বে তাঁর নীরদ আসনে।
হইত কি ঘন ঘন, মৃদুমন্দ গরজন
মেঘে সবে দুলাত পবনে॥
বৃত্রসংহার।

হেমচন্দ্রের ন্যায় আর একজন সুকবিও সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত। ইনি বাঙ্গালার বায়রন্, বাবু নবীনচন্দ্র সেন বাং ১২৮১ সালে ইনি "পলাশীর যুদ্ধ" নামক ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করেন। বৃত্রসংহার দেব ও অসুরগণের অমানুষিকী শক্তির পরিচায়ক। সুতরাং এস্থলে কবি যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া স্বীয় কল্পনা শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু "পলাশীর যুদ্ধ" ঐতিহাসিক, আধুনিক ঘটনামূলক সুতরাং এস্থলে কবি শৃঙ্খলাবদ্ধ। অল্প কথায় এই কাব্যে নবীন বাবু সমুদয় রসের অবতারণা করিয়া তাঁহার রচনা মধুর ও ওজোগুণ সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি যখন যে রসের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতেই বেশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নিম্নে পলাশীর যুদ্ধের একটু নমুনা উদ্ধৃত হইল—

"ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি ব্রিটিশ বাজনা।
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয় ঘোষণা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর।
শোণিতে আরক্ত কায়
অস্ত গেলা রবি হায়
অস্ত গেল যবনের গৌরব-ভাস্কর॥

নবীন বাবুর রচিত আর একখানি কাব্যের নাম "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ"। এখানিও অতি সুন্দর। ইহাতেও নানাবিধ রসের অবতারণা আছে, একটু আদিরসের নমুনা নিম্নে লিখিত হইল—

অধরে অধর হইল মিলিত
অধরে অধর রহিল গাথা।
অধরে অধর কি সুধা ঢালিল
নিমীলিত চারি নয়ন পাতা।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ২য় সর্গ।

ক্রমশঃ—

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—(সটীক ও সানুবাদ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি, এ, কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র। কালমাহাত্ম্যে হিন্দুর ধর্ম্মভাবের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়াতে জগতের অদ্বিতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ গীতার উপর লোকের শ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। দশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় গীতার বিবিধ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। তন্মধ্যে কতকগুলি বিস্তৃত, কতকগুলি সংক্ষিপ্ত, আবার কতকগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র। সমালোচ্য গ্রন্থখানি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাতে শ্রীধর স্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কৃত বঙ্গানুবাদ প্রকটিত হইয়াছে। সম্পাদক নিজে ইহাতে একটী বিস্তৃত ভূমিকা নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে গীতা সম্বন্ধে অনেক অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সকল আলোচিত হইয়াছে। ক্ষিতীন্দ্র বাবু বিস্তর পরিশ্রম করিয়া গীতার ভূমিকা লিখিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার গবেষণার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় গীতার যতগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোনটীতেই এরূপ সুদীর্ঘ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভূমিকা দেখা যায় না। সূচীপত্রটীও মন্দ হয় নাই; ইহার সহিত একটী নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হইলে গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইত। গ্রন্থখানি মোটের উপর উপাদেয় হইয়াছে।

ভক্তচরিতামৃত—শ্রীঅঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য ॥৶০ দশ আনা। ইহাতে শ্রীরূপ, সনাতন, ও শ্রীজীব গোস্বামীর জীবনচরিত নিবদ্ধ হইয়াছে। অঘোর বাবু বৈষ্ণব শাস্ত্রের আলোচনায় অধিক সময় অতিবাহিত করেন। ভক্ত-চরিতামৃত তাঁহার সেই আলোচনায় অমৃতময় ফল। তিনি একজন ভক্ত; সেই জন্যই ভক্তচূড়ামণি রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামীর পবিত্র জীবনের আলোচনা সুন্দররূপে করিতে পারিয়াছেন। গ্রন্থখানি ভক্তিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই পাঠ করা উচিত।

রঘুনাথ গোস্বামীর জীবন-চরিত—মূল্য ৶৹ আনা মাত্র। এখানিও

অঘোর বাবুর রচিত। উচ্চ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিপুল বিষয় বিভবের অধিকারী হইয়াও রঘুনাথ একমাত্র ধর্ম্মের জন্য কিরূপে সমস্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন, বিশদভাবে হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। রঘুনাথের অতুলনীয় স্বার্থত্যাগের বিবরণ পাঠ করিলে কিছুতেই বিস্ময় সম্বরণ করা যায় না। এই ক্ষুদ্র জীবনী পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি।

কৃষিতত্ত্ব ও ভারতবন্ধু—ইহা একখানি (সচিত্র) মাসিক পত্রিকা। ইহাতে কৃষি সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। ইক্ষু, গোলআলু, কদলী, প্রভৃতির চাষ কিরূপ পদ্ধতিক্রমে করিলে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধিত হয়, কি প্রকারে জমি নিরূপণ করিতে হয়, শস্যক্ষেত্রে জল সিঞ্চণের সহজ উপায় কি, এইরূপ নানা প্রয়োজনীয় বিষয় ক্রমে ক্রমে আলোচিত হইতেছে। আমাদের দেশে কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন উপযুক্ত গ্রন্থ নাই; কৃষিতত্ত্ব আমাদের এই মহদভাব দূর করিতে পারিলে দেশের মহোপকার সাধিত হইবে; এই জন্য আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শ্রীযতীন্দ্র-জীবন-চরিতম্—এখানি মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীর জীবন চরিত। ইহাতে স্বামীজীর জন্ম, বিদ্যার্জ্জন, পূর্ব্বনিবাস, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি বিষয় মধুর সংস্কৃত পদ্যে রচিত হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গানুবাদ আছে। এই গ্রন্থে ইঁহার সম্বন্ধে এই জানা যায় যে, ইনি কান্‌হপুর জেলার অন্তর্গত মৈথেলালপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার আদি নাম মতিরাম। অষ্টম বর্ষে উপনয়নান্তে ইনি পাণিনীয় ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন; দ্বাদশ বর্ষে দারপরিগ্রহ করেন; সপ্তদশ বর্ষে কাত্যায়নের বার্ত্তিক ও ফণিভাষ্য সমেত সমগ্র পাণিনী ইঁহার অধিগত হয়। অষ্টাদশ বর্ষে ইঁহার পুত্র উৎপন্ন হয়। সপ্তবিংশতি বর্ষ বয়সে মতিরাম ভাস্করানন্দ সরস্বতী নাম ধারণ করিয়া সন্ন্যাসস্বীকার করিলেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। ইহার মূল সংস্কৃত বেশ সুললিত এবং অনুবাদ বিশদ হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ।

তৈলের গুণ।

তৈল মর্দ্দন আজকাল সভ্যজগতের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। তৈলের প্রতি এই বিদ্বেষটী ও সভ্যতার অনুকরণ। তৈল ব্যবহার না করিয়া সাবান ব্যবহারেই অনেকের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, কিন্তু ইহাতে উপকার বা অপকার, তাহার সন্ধান কেহই করেন না। সাবানের দোষ গুণ বিচার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। তৈল আমাদের শরীরের পক্ষে কিরূপ উপকারী ও তৈল ব্যবহার উচিত কি না সংক্ষেপে অদ্য তাহার আলোচনা করা যাইবে। কেবল যুক্তি অবলম্বন করিব না, মৌলিক প্রমাণও প্রদর্শন করিতেছি।

অভ্যঙ্গং কারয়েন্নিত্যং সর্ব্বেষঙ্গেষু পুষ্টিদম্।
শিরঃশ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ।
সার্ষপং গন্ধতৈলঞ্চ যত্তৈলং পুষ্পবাসিতম্।
অন্য দ্রবযুতং তৈলং ন দুষ্যতি কদাচন॥

প্রত্যহ সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ মস্তক, কর্ণ ও পাদদেশে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন করিবে। সার্ষপ তৈল, পুষ্পবাসিত তৈল (ফুলেল তৈল) ও গন্ধ তৈল (চন্দন তৈলাদি) এবং অন্য দ্রব অর্থাৎ জল কিম্বা কোন সরস, কাথ অথবা দুগ্ধাদি দ্রব পদার্থের সহিত পক্ক তৈল আমাদের পক্ষে বিশেষ হিতকর। আয়ুর্ব্বেদেই লিখিত হইয়াছে যে, "হবিষোঽষ্টগুণং তৈলং মর্দ্দনান্নচ ভক্ষণাৎ" যথাবিধি মর্দ্দিত তৈল ঘৃত অপেক্ষা আটগুণ অধিক তেজস্কর। আমরা অযৌক্তিক অথবা অশাস্ত্র বলিব না, সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শন করিব।

অভ্যঙ্গো বাত কফ হৃচ্ছ্বাস শান্তিবলং সুখম্।
নিদ্রাবর্ণ মৃদুত্বায়ুঃ কুরুতে দেহপুষ্টিকৃৎ॥
অভ্যঙ্গঃ শীলিতো মূর্দ্ধ্নি সকলেন্দ্রিয়তর্পকঃ।
দৃষ্টিপুষ্টিকরো হন্তি শিরোভূমিগতান্ গদান্।
কেশানাং বহুতাং দার্ঢ্যং মৃদুতাং দীর্ঘতাং তথা।
কৃষ্ণতাং কুরুতেঽত্যর্থং শিরসঃ পূর্ণতামপি॥

তৈলাভ্যঙ্গ দ্বারা দেহের পুষ্টি, শরীর সঞ্চারী বায়ুর শান্তি, কফনাশ, শ্রান্তি দূর, বলবৃদ্ধি, শরীরের স্বচ্ছন্দতা, নিদ্রা, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, দেহের কোমলতা ও আয়ু বৃদ্ধি হয়। মস্তকে প্রত্যহ তৈল মর্দ্দন করিলে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, দর্শনশক্তির বৃদ্ধি, শিরোগত রোগ সমুদয়ের বিনাশ, কেশবাহুল্য, কেশের দৃঢ়মূলতা, মৃদুতা, দৈর্ঘ্য ও গাঢ় কৃষ্ণবর্ণতা মস্তকের পূর্ণতা এই সমুদায় জন্মে।

ন কর্ণরোগো ন মলং নচ মন্যা হনুগ্রহঃ।
নোচ্চৈঃশ্রুতির্নবাধির্য্যং স্যান্নিত্যং কর্ণ পূরণাৎ।
রসাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভোজনাৎপ্রাক্ প্রশস্যতে।
তৈলাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভাস্করেঽস্ত মুপাগতে।

কর্ণে স্নেহাদি পূরণ করিলে কর্ণরোগ কর্ণে মলোৎপত্তি, মন্যাগ্রহ, হনুগ্রহ, উচ্চৈঃশ্রুতি ও বধিরতা প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হয় না। কর্ণে রসাদি পূরণ করিতে হইলে আহারের পূর্ব্বে এবং

তৈলাদি পূরণ করিতে হইলে সূর্য্যাস্তের পর কর্ত্তব্য।

পাদাভ্যঙ্গশ্চ তৎ স্থৈর্য্যনিদ্রাদৃষ্টিপ্রসাদকৃৎ।
পাদ সুপ্তিশ্রমস্তম্ভ সংকোচ স্ফুটনপ্রণুৎ॥
ব্যায়ামক্ষুণ্ণ বপুষং পদ্ভ্যাং সংমর্দ্দিতং তথা।
ব্যাধয়ো নোপসর্পন্তি সৈনতেয়মিবোরগাঃ॥
লোমকূপ শিরাজালধমনীভিঃ কলেবরম্।
তর্পযেদ্ বলমাধত্ত্ব যুক্তঃ স্নেহোঽনুবাসনে॥
অস্তিঃ সংসিক্তমূলানাং তরূণাং পল্লবাদয়ঃ।
বর্দ্ধন্তে হি তথা নৃণাং স্নেহসংসিক্ত ধাতবঃ॥

পাদদেশে তৈলাভ্যঙ্গ দ্বারা পাদ-স্থৈর্য্য, সুনিদ্রা ও দৃষ্টিশক্তির প্রসন্নতা জন্মে। পাদদ্বয়ের সুপ্তি (স্পর্শানভিজ্ঞতা) শ্রম, স্তম্ভ, সঙ্কোচ ও স্ফুটন প্রভৃতি নিবারণ হয়। নিয়মিতরূপে পাদাভ্যঙ্গ ও ব্যায়াম করিলে সহজে কোন পীড়া উপস্থিত হয় না। অনুবাসন প্রযুক্ত স্নেহ লোমকূপ শিরা ও ধমনী দ্বারা দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেহের তৃপ্তি ও বল বৃদ্ধি করে। মূলদেশে জল সেচন করিলে যেরূপ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ও পল্লবাদি পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ অনুবাসন দ্বারা মনুষ্য দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে।

নবজ্বরী হ্যজীর্ণী চ নাভ্যক্তব্যঃ কথঞ্চন।
তথা বিরিক্তো বান্তশ্চ নিরূঢোযশ্চ মানবঃ॥
পূর্ব্বয়োঃ কৃচ্ছ্রতা ব্যাধেরসাধ্যত্বমথাপি বা।
শেষাণাং বহ্নিহপ্রোক্তা বহ্নিমান্দ্যাদয়ো গদাঃ॥

নবজ্বরে অজীর্ণ সত্ত্বে এবং বমন, বিরেচন ও নিরূহ ক্রিয়ার পর স্নেহাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ। নবজ্বরে ও অজীর্ণ সত্ত্বে তৈল মর্দ্দন করিলে পীড়া কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হয় এবং বমন বিরেচন ও নিরূহের পর তৈল মর্দ্দনে অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হয়।

হন্বোর্ব্বলং স্বরবলং বদনোপচয়ঃ পরম্।
স্যাৎগণ্ডূষ রসজ্ঞানমন্নে চ রুচিরুত্তমা॥
নচাস্য কণ্ঠশোষঃ স্যান্নোষ্ঠযোস্ফুটনাদ্ ভয়ম্।
ন চ দন্তাঃ ক্ষয় যান্তি দৃঢ়মূলা ভবন্তি চ।
ন শূল্যন্তে ন চাম্লেন হৃষ্যন্তে ভক্ষয়ন্তি চ।
পরানপি খরান্ ভক্ষ্যান্ তৈলগণ্ডূষধারণাৎ॥

তৈল গণ্ডূষ মুখে ধারণ করিলে হনু সবল হয়, কণ্ঠস্বরের উৎকর্ষ জন্মে, মুখ পরিপুষ্ট হয়, জিহ্বার আস্বাদ গ্রহণ শক্তি বৃদ্ধি হয়, আহারে উত্তম রুচি জন্মে। তৈল গণ্ডূষ ধারণে আস্যশোষ ও কণ্ঠশোষ নিবারিত হয়। প্রত্যহ তৈল গণ্ডূষ ধারণ করিলে ঠোঁট ফাটে না, দন্তপীড়া উপস্থিত হয় না, দন্তপংক্তি চিরকাল দৃঢ়মূল থাকে, কখনও দন্তে বেদনা হয় না, অম্লরস সেবনে পীড়িত (টক) হয় না এবং অতি কঠিন বস্তুও অনায়াসে সেবন করিতে সক্ষম হয়।

কটুতৈলাদি নস্যার্থে নিত্যাভ্যাসেন যোজয়েৎ।
প্রাতঃ শ্লেষ্মণি মধ্যাহ্নে পিত্তে সায়ং সমীরণে॥
সুগন্ধবদনাঃ স্নিগ্ধনিস্বনা বিমলেন্দ্রিয়াঃ।
নির্ব্বলীপলিত ব্যঙ্গা ভবেয়ুর্নস্যশালিনঃ॥

প্রত্যহ কটু তৈলের নস্য গ্রহণ করা উচিত। কফ নিঃসারণার্থ প্রাতে, পিত্ত প্রশান্ত্যর্থ মধ্যাহ্নে ও বায়ু প্রশান্ত্যর্থ সায়ংকালে নস্য গ্রহণ করিবে। প্রত্যহ তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে মুখ সুগন্ধি, স্বর স্নিগ্ধ, ইন্দ্রিয় সকল নির্ম্মল এবং বলি-পলিত ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

অবশ্যজ্ঞাতব্য কতিপয় গুণবাচক শব্দ।

অংশূদক—যে জলাশয়ে অধিক পঙ্ক অর্থাৎ পাক নাই, জল নির্ম্মল ও চন্দ্রসূর্য্যের

কিরণ অপ্রতিহতরূপে যাহাতে পতিত হয়, সেই জলাশয়ের জলকে অংশূদক বলে অংশূদক স্নিগ্ধ ও ত্রিদোষ নাশক।

অনুলোমক—যে বস্তু অপক্ক বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার পরিপাক বিধান করে ও বায়ুবন্ধ ছেদ করিয়া মল মূত্রাদিকে যথোচিতরূপে নিঃসরণ করে, তাহাকে অনুলোমক পদার্থ কহে। যথা হরিতকী।

আগ্নেয়—যে পদার্থে অগ্নিগুণের আধিক্য থাকে ও সেবিত হইলে জঠরাগ্নিকে পরিবর্দ্ধিত করে, তাহাকে আগ্নেয় বলে। যথা—চিত্রক ও যমানী প্রভৃতি।

দীপন—যে বস্তু অগ্নির দীপ্তি সম্পাদন করে, কিন্তু আমরসের পরিপাক করিতে সক্ষম নহে, তাহাকে দীপন কহে। যথা—শুল্ফা, মৌরী ও জটামাংসী প্রভৃতি।

পাচন—যাহা দ্বারা আম অর্থাৎ অপরিপক্ক রস পরিপাক প্রাপ্ত হয় কিন্তু সম্যক্ অগ্নির দীপ্তি হয় না, তাহাকে পাচন ঔষধ বলে। যথা নাগকেশর ও জীরকাদি।

অভিষ্যন্দি—যে সকল দ্রব্য পিচ্ছিলতা ও গুরুত্ব হেতু শরীরের স্রোতঃপথ সমুদয়কে রুদ্ধ করিয়া দেহকে গৌরবান্বিত করে, তাহাদিগকে অভিষ্যন্দি দ্রব্য বলে। যথা—মাষকলায় ও দধি প্রভৃতি।

গুরু—যে দ্রব্য বায়ুনাশক, শরীরের পুষ্টিসাধক, শ্লেষ্মা বর্দ্ধক ও বহুক্ষণে পরিপাক পায়, তাহাকে গুরুদ্রব্য বলে। যথা—আলকুশী বীজ ও পিষ্টকাদি।

আশু—যাহা সত্বর সমস্ত দেহে প্রবেশ করে। যথা বিষ উপবিষাদি।

উষ্ণ—যাহা শারীরিক উত্তাপকে বর্দ্ধিত করে, শরীরের অসুখকর ও মূর্চ্ছা তৃষ্ণা, স্বেদ ও দাহের উৎপাদক। পিপ্পলী ও মরিচাদি।

তীক্ষ্ণ—যে দ্রব্য বায়ু ও কফ নষ্ট করে এবং পিত্তকে বর্দ্ধিত করে, তাহাকে তীক্ষ্ণ দ্রব্য বলে। যথা—শুণ্ঠী ও মরিচ প্রভৃতি।

পিচ্ছিল—তন্তুল, বলকর, শ্লেষ্মাজনক গুরু ও ভগ্ন স্থানের সন্ধানকর বস্তুকে পিচ্ছিল পদার্থ কহে। যথ—পুঁইশাক প্রভৃতি।

প্রমাথি—যে দ্রব্য শরীরের স্রোতঃ সমুদায়ে সঞ্চিত বাতাদি দোষের সংশোধন করে, তাহাকে প্রমাথি কহে। যথা—মরিচ ও বচ প্রভৃতি।

বিদাহি—যে পদার্থ সেবন করিলে, অতিশয় পিপাসা জন্মে, বক্ষঃস্থলে জ্বালা উপস্থিত হয় ও অম্লোদ্গার উঠিতে থাকে; যাহা শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে বিদাহি কহে। যথা—চালভাজা ও চিড়া প্রভৃতি।

বিকাশি—যে দ্রব্য শরীরের বলবীর্য্য ও ওজঃ পদার্থকে শোষণ করিয়া সন্ধিবন্ধ সমুদায়কে শিথিল করে, তাহাকে বিকাশী দ্রব্য কহে। যথা—কোদ্রব (কোদাধান্য) ও গুবাক প্রভৃতি।

বিশদ—শরীরের ক্লেদনাশক ও ব্রণরোপক পদার্থকে বিশদ বলে।

রুক্ষ—যে দ্রব্য শ্লেষ্মাকে নষ্ট করে, বায়ুকে প্রকুপিত করে ও শরীরের নিঃস্নেহতা সম্পাদন করে, তাহাকে রুক্ষ দ্রব্য কহে। যথা—কট্‌কী প্রভৃতি।

শোষণ—যে পদার্থ সেবিত হইলে ধাতু ও মলকে শোষণ করিয়া শরীরকে

কৃশ করে, তাহাকে লোমন কহে। যথা—মধু, উষ্ণ জল ও বচ প্রভৃতি।

রেচন—যাহা দ্বারা পক্ব বা অপক্ব মল দ্রবীভূত হইয়া অধোনিঃসারিত হয়, তাহাকে রেচন পদার্থ কহে। যথা—তেউড়ী ও সোনামুখী প্রভৃতি।

ভেদন—যে দ্রব্য কঠিন মলকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া অধঃপাতিত করে, তাহাকে ভেদন কহে। যেমন—কটুকা প্রভৃতি।

স্তম্ভন—যে পদার্থ স্বীয় রুক্ষতা, শৈত্য, কষায়তা ও লঘুতা বশতঃ অধোগামী মল-মূত্রাদিকে রোধ করে, তাহার নাম স্তম্ভন যথা—কুড়চিছাল ও জায়ফল প্রভৃতি।

স্রংসন—যে পদার্থ কোষ্ঠ সংশ্রিত কফ ও পিত্তকে পাক না করাইয়া অধঃ-পাতিত করে, তাহাকে স্রংসন কহে। যথা—সোঁদাল প্রভৃতি।

বাজীকরণ-যে দ্রব্য সেবনে ক্ষীণ শুক্রের বৃদ্ধি হয় এবং স্ত্রীসম্ভোগ ইচ্ছা জন্মে তাহাকে বাজীকরণ কহে। যথা—অশ্বগন্ধা, তালমূলী ও শর্করা প্রভৃতি।

বৃষ্য—যে দ্রব্য শুক্রের বৃদ্ধি করে। যেমন ভূমিকুষ্মাণ্ড। বৃষ্য ও বৃংহণের পার্থক্য এই যে, বৃষ্য শুক্রবর্দ্ধক, বৃংহণ তেজোবর্দ্ধক।

ব্যবায়ি—যে দ্রব্য প্রথমতঃ সর্ব্ব-শরীরে ব্যাপ্ত হয় ও পরে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অপকাবস্থাতেই সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে ব্যবায়ি বলে। যথা—সিদ্ধি ও অহিফেনাদি।

রসায়ন—যাহা সেবনে শুক্রের বৃদ্ধি হয়, ব্যাধি ও তজ্জনিত শরীরের জীর্ণতা নষ্ট হয় তাহাকে রসায়ন বলে। যেমন দন্তী, গুলঞ্চ ও হরিতকী প্রভৃতি।

ক্রমশঃ।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

কাসে—কণ্টকারী ১ তোলা, বাসক-ছাল, যষ্টিমধু, তেজপত্র ও মরিচ প্রত্যেক ।০ আনা অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অল্প উষ্ণাবস্থায় পান করিলে যেরূপ কাস হউক না কেন সত্বর নিঃশেষ রূপে আরোগ্য হয়।

শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ কিঞ্চিৎ গুড় ও ঘৃতের সহিত অবলেহন করিলে ক্ষয়জ কাস নিবৃত্ত হয়।

ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মরিচ চূর্ণ অথবা ঘৃত ভৃষ্ট বদরী পত্র সৈন্ধব লবণ সহ বাঁটিয়া অবলেহন করিলে কাস ও তজ্জনিত স্বরভঙ্গ আরোগ্য হয়। শুষ্ক বদরী (কুল) পত্র নূতন কলিকায় সাজিয়া তাম্রকূটের ন্যায় ধূম পান করিলে স্বরভঙ্গ নিবৃত্তি হয়। এই অবস্থায় অথবা যাহারা সঙ্গীত আলোচনা করেন, তাহাদের পক্ষে রাত্রিতে শীতল জল পান না করিয়া উষ্ণ জল পান হিতকর।

কণ্টকারীর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মুগের যূষ প্রস্তুত করিবে। হরিদ্রার বিনিময়ে কুঙ্কুম ও সিদ্ধ হইবার সময় আমলকী ও দাড়িমের রস দ্বারা অম্লরস করিবে আর্দ্রক ও ঘৃতাদি দ্বারা এই যূষকে সংস্কার করিয়া পান করিবে। এই যূষ পান করিলে সকল প্রকার কাস আরোগ্য হয়।

৮৷১০টী জবাফুল আধপোয়া কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রত্যহ পান করিবে। ১৫৷২০ দিন এইরূপ করিলে, অনেক দিনের বদ্ধ রজঃও পুনঃপ্রবৃত্ত হয়। লতা ফট্‌কীর পাতা ২ তোলা গব্য ঘৃতে

ভাজিয়া খাইলে অনার্ত্তবা অথবা রুদ্ধার্ত্তবা স্ত্রীর আর্ত্তব প্রবৃত্তি হয়।

গর্ভধারণ যোগ—২ তোলা অশ্বগন্ধা অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধ ও এক পোয়া জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ঋতু স্নানের দিন হইতে ১৪ দিন সেবন করিলে নিশ্চয়ই গর্ভ হয়।

পিপুল, শুঠ মরিচ ও নাগকেশর চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া।০ হইতে ॥০ আনা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ঋতুস্নানের দিন হইতে ১৪ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বন্ধ্যাদোষ নিবারণ ও গর্ভোৎপত্তি হয়। ঋতুস্নানের পর শোধিত ও জারিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও অমৃতীকৃত তাম্র এই তিন দ্রব্যের সমষ্টিতে এক রতি গ্রহণ করিয়া ঘৃতের সহিত ১৪ দিন সেবন করিলে গর্ভোৎপত্তি হয়।

যৌবনের প্রারম্ভ হইতে বদনমণ্ডলে একরূপ ব্রণ উৎপন্ন হইতে থাকে, ব্রণগুলি শুষ্ক হইয়া গেলেও ক্ষত স্থান কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া থাকে

কালিয়া কাষ্ঠ, উৎপল, কুড়, দধির সর, কুল আঁটির শাস ও প্রিয়ঙ্গু এই সমুদায় বাটিয়া প্রলেপ দিলে, মুখ অতিশয় সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট হয়।

নিস্তুষ যব চূর্ণ, যষ্টিমধু, লোধ এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে, মুখজ্যোতিঃ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, গেরিমাটী, ঘৃত ও ছাগদুগ্ধ এই সমুদায় একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে মুখের অত্যন্ত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। এইরূপ শরপুঙ্খ, নীলোৎপল, কুড়, চন্দন ও বেণার মূল একত্র বাঁটিয়া মুখে মাখিলে তিল কালক (তিলবৎ কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন) প্রভৃতি দূরীভূত এবং মুখের অত্যন্ত শোভা বৃদ্ধি হয়।

মুসুরির ডাইল ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া ৭।৮ দিন মুখে লেপন করিলে মুখের মেচেতা প্রভৃতি দূরীভূত ও মুখ অতিশয় শোভা সম্পন্ন হয়।

মূত্র ঘন ও রক্তবর্ণ হইলে ও অল্প অল্প নিঃসৃত হইতে থাকিলে, ১০ বা ১১০ আনা সোরা ও ১ তোলা ইক্ষুচিনি একত্র শীতলজলসহ সেবন করিলে প্রস্রাব পরিষ্কার হয়।

মূত্ররোধে পাথরকুচীর পাতার রস দ্বারা নাভীগর্ত্ত পূরণ করিলে সত্বর মূত্ররোধ নিবৃত্ত হয়। পুষ্করিণীর ধারে যে পচা আমপাতা পাওয়া যায়, উহা শীতল জলে বাটিয়া নাভীর অধোভাগে প্রলেপ দিলে অতি সত্বর মূত্ররোধ নিবৃত্ত হয়। ২ তোলা সোরা অর্দ্ধ ছটাক জলে ভিজাইয়া উহাতে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত (ভিজান) করিয়া তলপেটে পটী দিলে অতি সত্বর প্রস্রাব হয়। বস্ত্রখণ্ড শুষ্ক হইলে সোরা ভিজান জলে পুনরায় উহা ভিজাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

আমাশয় রোগে যদি পেটে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়, তবে আমলা বাঁটিয়া উহার সহিত একটু পুরাতন ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ করিয়া পেটে প্রলেপ দিবে। আমাশয়ের সহিত যদি রক্তস্রাব থাকে, তবে উহা উষ্ণ না করিয়া শীতল অবস্থায়ই প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য। গঙ্গাধর চূর্ণ ২ রতি কাঁটানটের শিকড় বাটা ৵০ আনার সহিত সেবন করিতে দিলে পেটের বেদনা সত্বর আরোগ্য হয়।

শিরা।

সপ্তশিরা শতানি ভবন্তি যাভিরিদং শরীর মারামইব জলহারিণীভিঃ কেদারইব কুল্যাভি-রুপস্নিহ্যতেঽনুগৃহ্যতে চাকুঞ্চনপ্রসারণাদিভি র্বিশেষৈঃ। দ্রুমপত্রসেবনীনামিব চ তাসাং প্রতানাস্তাসাং নাভিমূলং ততশ্চপ্রসরন্ত্যূর্দ্ধমধ-স্তির্য্যক্ চ।

সুশ্রুত মতে মনুষ্য শরীরে সাত শত শিরা আছে। যে সমুদায় শিরা সাহায্যে জলহারিণী সংযুক্ত আরাম ও কুল্যা সংসক্ত কেদারের ন্যায় এই জীবদেহ নিয়ত অভিষিক্ত ও আকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়ায় অনুগৃহীত হইতেছে। তাহা-দের প্রতান অর্থাৎ অবস্থানক্রম বৃক্ষপত্র সেবনীর ন্যায়। আম্রাদি বৃক্ষপত্র পচিয়া যখন বাহ্যত্বক্‌শূন্য হয়, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা পরস্পর সংসক্ত শিরাময়। মনুষ্য শরীরেও সেইরূপে শিরা সমুদায় বিন্যস্ত আছে। নাভি-দেশই ঐ সমুদায় শিরার উৎপত্তি স্থান। নাভিমূল হইতে উত্থিত হইয়া শিরা সমুদায় উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্‌দিকে গমন করিয়াছে।

এই শিরা সমূহের মধ্যে মূল শিরা চল্লিশটী, বাতবাহিনী দশটী, পিত্তবাহিনী দশটী, কফবাহিনী দশটী এবং রক্তবাহিনী দশটী। এই মূল শিরা হইতে আবার কতকগুলি শিরা উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ শিরা সমুদায় লইয়া বাতবাহিনী শিরা ১৭৫টী। এক এক শক্‌থিতে ২৫টী করিয়া দুই শক্‌থিতে ৫০টী এবং এক এক বাহুতে ২৫টী করিয়া দুই বাহুতে ৫০টী বাতবাহিনী শিরা আছে। কোষ্ঠ অর্থাৎ উদরে ৩৪টী, তন্মধ্যে শ্রোণিদেশে গুদ ও মেঢ্রকে আশ্রয় করিয়া ৮টী, পার্শ্বদেশে ২টী করিয়া দুই পার্শ্বে ৪টী, পৃষ্ঠদেশে ৬টী, উদরে ৬টী ও বক্ষঃস্থলে ১০টী এই সমুদায়ে কোষ্ঠে ৩৪টী বাত-বাহিনী শিরা আছে। জত্রু অর্থাৎ অংশ সন্ধির উপরিভাগে ৪১টী বাতবাহিনী শিরা আছে, তন্মধ্যে গ্রীবাদেশে ১৪টী, কর্ণে ৪টী, জিহ্বায় ৯টী, নাসিকায় ৬টী ও নেত্রদ্বয়ে ৮টী, সমষ্টিতে ৪১টী। এই-রূপে বাতবাহিনী শিরা সমুদায়কে গণনা করিয়া ১৭৫টী পূরণ করা হইয়া থাকে। অপর পিত্তবাহিনী শিরা সমুদায়কেও ঠিক এইরূপে গণনা করা হয়। কিন্তু অপর সমুদায় শিরা যেমন নেত্রে ৮টী ও কর্ণে ৪টী করিয়া আছে, পিত্তবাহিনী শিরার সেরূপ নহে। নেত্রে পিত্তবাহিনী শিরা ১০টী ও কর্ণে ২টী, অপর সমুদায় শিরা অপেক্ষা পিত্তবাহিনী শিরার এই মাত্র পার্থক্য। এইরূপে বাতবহা, পিত্তবহা, শ্লেষ্মবহা, ও রক্তবহা শিরা সমুদায় ১৭৫টী করিয়া সমষ্টিতে ৭০০ পূর্ণ হয়। অতঃপর শিরা সমুদায়ের স্ব স্ব কার্য্য বিবৃত করা যাইতেছে।

বায়ু যখন স্বাভাবিক অবস্থায় স্বীয় শিরা সমুদায়ে ভ্রমণ করে, তখন মনুষ্য-গণের কার্য্য করিবার শক্তি ও জ্ঞান উপস্থিত থাকে ফলতঃ স্বাভাবিক অবস্থা-পন্ন বায়ু স্বীয় স্বীয় শিরায় বিচরণ করতঃ মনুষ্যের অনেক কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে। যখন কুপিত হয়, তখন নানা-বিধ বাতরোগ উৎপাদন করে। ঐরূপ পিত্ত স্বাভাবিক অবস্থায় স্বীয় শিরা সমু-দায়ে পরিভ্রমণ করতঃ জীবগণের দীপ্তি-শালিতা, আহারেচ্ছা, জঠরাগ্নির দীপ্তি বৃদ্ধি করে ও শরীরকে নীরোগ করে আর পিত্ত প্রকুপিত হইলে নানাবিধ

পিত্তসম্ভূত রোগ জন্মে। শ্লেষ্মা স্বাভাবিক অবস্থায় স্বীয় শিরা সমুদায়ে পরিভ্রমণ করতঃ অঙ্গ সকলের স্নিগ্ধতা, সন্ধি সমুদায়ের স্থৈর্য্য, বল ও অন্যান্য গুণের উৎপাদন করে এবং প্রকুপিত হইলে শ্লেষ্ম প্রকোপ জন্য নানাবিধ পীড়া উৎপাদন করে। এইরূপ অবিকৃত রক্ত স্বীয় শিরা সমূহে সঞ্চরণ করতঃ ক্ষীণ ধাতুর পূরণ, বর্ণ, স্পর্শজ্ঞান ও অন্যান্য গুণোৎপাদন করে, এবং বিকৃত হইলে নানাবিধ রক্তজ বিকার উৎপাদন করে।

সুশ্রুত এইরূপে শিরা গণনা করিয়াছেন; মহর্ষি চরক ও শিরাসমুদায়কে সাত শত বলিয়া গণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ শিরা ও ধমনী প্রভৃতিকে সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নহে, পরন্তু প্রত্যক্ষ করিবারও কোন উপায় নাই। যাহাতে সহজে বোধগম্য হয়, আমরা সেইরূপে উদ্ধৃত করিতেছি। আধুনিক প্রথা অনুসারেও স্থূল শিরাগুলিই নিরূপিত হয়।

ধমনী যেরূপ সমস্ত দেহ বেষ্টন করিয়া অবস্থিত, শিরা সকলও সেইরূপ সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছে। রক্তস্রোতঃ বহন করে বলিয়া ইহারাও দেহরক্ষার একটী প্রধান কারণ। শিরা ও ধমনীকে কেহ কেহ একই পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; বাস্তবিক দেখিতে একরূপ হইলেও কার্য্যে ইহাদের বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। হৃদয় হইতে যে বিশুদ্ধ শোণিত ধমনীপথে নির্গত হইয়া সমস্ত দেহ পরিভ্রমণ এবং ক্ষয়প্রাপ্ত অঙ্গ সকলকে আত্ম গুণ দানে পোষণ করিয়া গুণহীন, কৃষ্ণবর্ণ ও দেহের অনুপযোগিনী শক্তি সম্পন্ন হয়, সেই দুষ্ট শোণিত শিরা পথে দক্ষিণ হৃৎপ্রকোষ্ঠে উপস্থিত ও তথায় নিশ্বাস বায়ু সহযোগে নির্দ্দোষ, দেহ-পোষণ-শক্তি-সম্পন্ন ও লোহিতবর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার ধমনীপথে সমস্ত দেহ পরিভ্রমণ করে। ফলতঃ ধমনীপথে বিশুদ্ধ রক্ত শরীরে সঞ্চরণ করে ও শিরাপথে শরীরের দূষিত রক্ত হৃৎকোষ্ঠে আনীত হয়। ইহাই ধমনী ও শিরার একটী মহান্ ভেদ। কেহ কেহ নাভিদেশকেই শিরা সমুদায়ের মূলদেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মতে যিনি হৃদয়কে শিরার মূলদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার মতই সমধিক সমিচীন। মস্তকে, বক্ষে, কণ্ঠে ও বাহুদ্বয়ে যে সমস্ত শিরা আছে, তাহারা জত্রুর নিকটে আসিয়া মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। শক্থিদ্বয়ে, উদরে ও বস্তিতে যে সমুদায় শিরা আছে, তাহারা বস্তি অর্থাৎ নাভিমূলে মিলিত ও একীভূত হইয়া বক্ষস্থনস্তপেশী ভেদ করিয়া হৃৎকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়াছে। দেহে যাবতীয় শিরা আছে সকলে এই দুই মহাশিরায় মিলিত হইয়াছে। অনেকগুলি শিরা নাভিদেশে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সে জন্যই এই মতদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। কোনস্থলে এক একটী ধমনীর পার্শ্বে দুই দুইটী শিরা দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ী দ্বারা ধমনী হইতে আনীত দুষ্ট রক্ত হৃৎকোষ্ঠে আনয়ন করে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে জীব দেহে নিয়ত রক্তের এইরূপ ক্রিয়া সাধিত হইতে থাকে কদাচ ইহার বিরতি নাই। কোন কারণ বশতঃ অকস্মাৎ রক্তস্রোতের গতি রুদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ

মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে। শিরা সকলের মধ্যে কতকগুলি সূক্ষ্ম ও কতকগুলি স্থূল, কতকগুলি দেহের গভীরতর প্রদেশে আর কতকগুলি ত্বকের নিম্নে অবস্থিত। বাহু ও শক্‌থিদ্বয়ের অধোভাগস্থ অগভীর শিরা ও ব্যাধিক্ষীণ ব্যক্তিদিগের উদরাদি অঙ্গ সমুদায়ের শিরা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ শিরা-প্রকাশ বলক্ষয়ের লক্ষণ জানিবে।

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অভাবই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকদিগের শরীরতত্ত্বানভিজ্ঞতার প্রধান কারণ। উক্ত অভাবটী মোচন করাও সহজসাধ্য নহে। আমরা বারংবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কিছুই ফলোদয় হইতেছে না। নিরস্ত থাকাও অসঙ্গত, তাই আমরা সমীরণে মনুষ্য শরীরের চিত্র প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পাঠকগণ একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলেই অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।
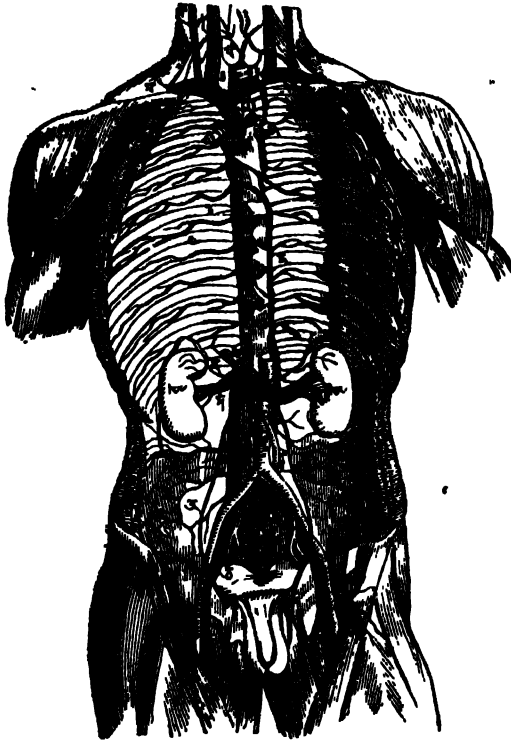
এই চিত্রের ক খ গ্রীবা পার্শ্বস্থ বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শিরা।
গ অনাখ্যাতক শিরা। ঘ জত্রু নিম্নস্থ শিরা। বৃ বৃক্কদ্বয়। দ বৃক্ক শিরা।
ধ উর্দ্ধ বৃক্ক গ্রন্থি শিরা। ত রেতো রজ্জু শিরা। থ বাহ্য বস্তি শিরা।
জত্রুর নিম্নে উর্দ্ধস্থ মহাশিরা ও বস্তিতে অধস্থ মহাশিরা।

অম্লপিত্ত।

অম্লপিত্ত পীড়াটী সাংঘাতিক না হইলেও ইহাতে কষ্টভোগ করিতেছেন না এরূপ লোক অতি বিরল। কেবল আহার দোষেই যে, এই রোগের এত বহুল বিস্তৃতি, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া অম্লরসে পরিণত হয় বলিয়া ইহার নাম অম্লপিত্ত। ইহার নিদানাদি পরে প্রদর্শন করিতেছি, আপাততঃ আহার বিষয়ক কতিপয় দোষের উল্লেখ করাই বিধেয়। কারণ দোষ গুণ জ্ঞান না থাকিলে কেহই তাহাতে প্রবৃত্ত অথবা নিবৃত্ত হইতে পারে না। পীড়াটী পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ সহরের অধিকাংশ লোকই উচ্ছৃঙ্খল অর্থাৎ সামাজিক বন্ধনের ভয় রাখে না, সুতরাং তাহাদের খাদ্যাখাদ্য বিবেচনাও কম।

ভূমিষ্ঠ হইয়াই গব্যদুগ্ধের উপর জীবন নির্ভর করিতে হয়। পূর্ব্বে অনেকেই কেবলমাত্র জননীর স্তন্যপান করিয়াই বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেন, কিন্তু এখন আর তাহা ঘটে না, সুতরাং গব্যদুগ্ধই পান করিতে হয়। গব্যদুগ্ধের গুণ অনেক বটে, কিন্তু সেরূপ দুগ্ধ পাওয়া যায় কি? সহরের গাভীগণ স্বেচ্ছামত বিচরণপূর্ব্বক সরস তৃণ লতাদি ভোজন করিতে পারে না, রাত্রি দিন একস্থানে আবদ্ধ থাকিতে হয় এবং শুষ্ক তৃণাদি (খইল, বিচালি, ভূষী প্রভৃতি) দ্বারাই জীবন ধারণ করিতে হয়। কাজে কাজেই দুগ্ধের গুণ আর দুগ্ধে নাই। অনেকে মনে করিবেন। শুষ্ক তৃণাদি যদি গোজাতির পক্ষে অনিষ্টজনক হইত, তবে অবশ্যই তাহারা কৃশ হইত বা মরিয়া যাইত। তাহা যখন হয় না পরন্তু শুষ্ক তৃণভোজী গোদিগকেই হৃষ্টপুষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহারাই অধিক দুগ্ধ প্রদান করে, তখন এরূপ দুগ্ধ ভাল নহে কিরূপে বিশ্বাস করি। সেজন্য আমারা দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখাইব যে, ভুক্তদ্রব্যের কিয়দংশ গুণ অবশ্যই দুগ্ধাদিতে উৎপন্ন হয়। গোবস্থনে বা রস্থনে ঘাস নামক একরূপ তৃণ জন্মে, উহা সেবন করিলে সেই গাভীর দুগ্ধ কেন, ক্ষীর, দধি এবং ছানা পর্য্যন্তও রসুন গন্ধবিশিষ্ট হয়। তিক্ত পাটপত্র ভোজনে দুগ্ধ অত্যন্ত তিক্তাস্বাদ হয়। পরন্তু এই স্থূল দৃষ্টান্তটী দ্বারাও বুঝিতে হইবে যে ভুক্তদ্রব্যের কিয়দংশ গুণ অবশ্যই দুগ্ধাদিতে বর্ত্তে। সন্তানের কোন পীড়া হইলে প্রসূতিকে আহারাদির নিয়মে বাধ্য হইতে হয় এবং সেই রোগোৎপাদক আহারাদি ত্যাগ করিতে হয়,—এমন কি অনেক সময় ঔষধ পর্য্যন্ত সেবন করিতেও হয়। শিশু সন্তান জননীর দুগ্ধ পান করে বলিয়াই জননীকে এই সমুদায় করিতে হয়, সুতরাং স্পষ্ট বোধগম্য হইতেছে যে আহারের গুণ অবশ্যই স্তন্যদুগ্ধে বর্ত্তে।

দ্বিতীয়তঃ কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে জীবিতবৎসা গাভীর সংখ্যা অতি কম। মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়, অস্বাভাবিক উপায়ে গাভী দোহনের জন্য দণ্ড হইতেছে, দণ্ডও কিছু সামান্য নহে, তথাপি কিন্তু অহরহঃ সর্ব্বসমক্ষে এই কুৎসিত ব্যবসায় সাধিত হইতেছে। সকলেরই স্বীকার করা উচিত যে,

আইনের ভয় অপেক্ষা ধর্ম্মভয়ই গুরুতর। আইনের ভয়ে কেহই বিরত হইতেছে না, কিন্তু যদি ইহাদের ধর্ম্মভয় থাকিত, তবে কখনই এরূপ জঘন্য কার্য্য করিতে পারিত না।

দুগ্ধের আরও একটী প্রধান দোষ আমরা দেখিয়াও যেন দেখিতেছি না। জলহীন দুগ্ধ পাওয়া বড়ই সুকঠিন, যেন জল সংযুক্ত হইয়াই দুগ্ধ জন্ম গ্রহণ করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুগ্ধ শ্বেতবর্ণ থাকে ততক্ষণ দুগ্ধে বরুণদেবের কৃপা অবাধে চলিতে থাকে। আবার কতকগুলি সুদক্ষ ব্যক্তি গোদুগ্ধে মহিষের দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া শেষ জল দেয়। গাঢ় বলিয়া মহিষের দুগ্ধে অনেক জল মিশ্রিত করা যাইতে পারে। অনেক স্থানে যন্ত্রের দ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়, সেস্থলেও শুনিতে পাই বিজ্ঞানবিৎ দুগ্ধবিক্রেতা অনায়াসেই জয়লাভ করিয়া থাকে। সজল দুগ্ধে কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিলে নাকি যন্ত্র দ্বারা দুগ্ধের জলায়াংশ স্থির করিতে পারা যায় না, অতএব সকলেই স্বীকার করুন যে,—

"ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ,
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।"

কোন কার্য্য নিশ্চয় করিব, এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিরস্ত করা যায় না। এইরূপ দুগ্ধ পানে শিশুর কিরূপ পুষ্টিলাভ হয়, পাঠক তাহা স্থির করিবে।

বালকের ২।৩ দিন জ্বর হইতে না হইতেই প্লীহা ও যকৃৎ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। কত শত শিশু সে জন্য অকালে কালকবলে কবলিত হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

যতদিন পর্য্যন্ত পাচকপিত্ত অবিকৃত থাকে, ততদিন ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি সমভাবে প্রবল থাকে, আর উহার বিকৃতিতেই অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত ও যকৃদ্দুষ্টি প্রভৃতি উপস্থিত হয়। এই সমুদায় কারণে আজকাল লোক সকলের আহার ও পরিপাকশক্তির হ্রাস হইয়াছে তাহার উপর আবার খাদ্যদ্রব্যের কৃত্রিমতা। দুগ্ধ ত্যাগ করিয়া যেমন বালক অন্ন আহার করিতে লাগিল, অমনি অধিকতর বিপদে পতিত হইল। ধনবানের সন্তানই হউক অথবা নির্ধনের সন্তানই হউক, প্রাতঃকালে উঠিয়াই দুই এক পয়সার মুড়িমুড়কি মিষ্টান্ন ভোজন করেন। হীনাবস্থ লোকের সন্তানে অন্ততঃ আধ পয়সার তেলে ভাজা ফুলড়ি বা বেগুনিও সেবন করে। এইরূপ প্রাতরশন যে কি ভয়ঙ্কর অনিষ্টজনক, তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই! অনেক সক্ষম ব্যক্তির সন্তানদিগের জন্য গৃহে প্রস্তুত রুটি লুচি ও মোহনভোগ থাকে, তাহাই তাহারা আহার করে এবং কোন কোন পল্লীগ্রামস্থ বালকেরা প্রাতঃকালে একবার অন্ন আহার করে; ইহারা যে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়কায় বলিষ্ঠ ও নীরোগ, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, ঐ সমস্ত বালকেরা স্বচ্ছন্দে আহার করিতে পারে এবং কোন গুরুপাক দ্রব্য অধিক মাত্রায় আহার করিয়াও অনায়াসে পরিপাক করিতে সমর্থ। পাঠক এইস্থলেই বুঝুন যে, আহার্য্য বস্তুর দোষে আমাদের কি ইষ্টানিষ্ট ঘটিতে পারে। উল্লিখিত কারণ সমুদায়ে আমাদের আহার-শক্তি ও

পরিপাক-শক্তি নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং যাহা আহার করি সহজে পরিপাক পায় না। কোন গুরুপাক দ্রব্য আহার করিলেই অম্লোদগার উঠিতে থাকে। এইরূপ কারণেই যে অম্লপিত্ত রোগ জন্মে, উহা দেখাইতেছি।

> বিরুদ্ধ দুষ্টাম্লবিদাহি পিত্ত-
> প্রকোপি পানান্নভুজো বিদগ্ধম্।
> পিত্তং স্বহেতুপচিতং পুরা যৎ
> তদম্লপিত্তং প্রবদন্তি সন্তঃ॥

যে সকল ব্যক্তি বিরুদ্ধ অর্থাৎ একত্র সংযুক্ত ক্ষীর মৎস্যাদি, দুষ্ট (বিকৃতিপ্রাপ্ত), অম্লগুণযুক্ত, বিদাহজনক ভৃষ্টদ্রব্যাদি ও পিত্তপ্রকোপজনক পানাহারে রত হয়, তাহাদের, স্বীয় হেতুবশতঃ পূর্ব্বসঞ্চিত পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া অম্লপিত্ত নামে অভিহিত হয়। অম্লপিত্ত রোগের ইহাই নিদান। এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, দুষ্ট পদার্থ বলিতে উল্লিখিত মিশ্রিত দুগ্ধ ও বাজারের ক্রীত খাদ্যাদি সমস্তই পাওয়া যায়। আর পাচকাগ্নির দুর্ব্বলতাবশতঃ যে কোন গুরুপাক দ্রব্য আহার করা হউক না কেন, সমস্তই বিদাহী হইয়া উঠে। এবং লঘুপাক দ্রব্যও গুরুপাকের ন্যায় দীর্ঘকালে পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

> অবিপাকক্লমোৎক্লেশ তিক্তাম্লোদগারগৌরবৈঃ।
> হৃৎকণ্ঠদাহারুচিভিশ্চাম্লপিত্তং বদেদ্ভিষক্॥

ভুক্ত দ্রব্যের অপরিপাক, শ্রান্তিবোধ, শরীরের বমনভাব, তিক্ত ও অম্ল উদ্গার, দেহে গুরুতা, বক্ষ ও কণ্ঠের দাহ অর্থাৎ বুক ও গলা জ্বালা এবং অরুচি এই সমস্ত অম্লপিত্তের লক্ষণ। আচার্য্যগণ অম্লপিত্তকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন।

তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, বিপরীত জ্ঞান, নানাবর্ণের মলভেদ এবং কখনও বা বমির বেগ, শরীরে মণ্ডলাকার চিহ্ন উৎপত্তি, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্মোদগম ও অঙ্গের পীততা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে তাহাকে অধোগ অম্লপিত্ত এবং হরিত, পীত, নীল, কৃষ্ণ, আরক্ত অথবা রক্তবর্ণ, অত্যন্ত অম্লরস, মাংসধৌত জলবৎ, অতি পিচ্ছিল, কফযুক্ত অথবা কটুতিক্তাদি বিবিধরসযুক্ত বমন হইলে তাহাকে ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্ত বলা হয়।

অম্লপিত্তের কোন কোন অবস্থায় ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হইলে অথবা অভুক্তাবস্থায় তিক্ত বা অম্ল বমন হয় এবং ঐরূপ তিক্ত বা অম্ল উদগার উঠিতে থাকে। বক্ষঃ ও কণ্ঠের জ্বালা ও কখনও অত্যন্ত শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। হস্ত পদে দাহ, দেহের উষ্ণতা, অরুচি, পিত্তশ্লেষ্মলক্ষণাক্রান্ত জ্বর, গাত্রে কণ্ডু, মণ্ডলাকার চিহ্নোৎপত্তি, অপরিপাক ও শারীরিক এবং মানসিক অবসাদ এই সমুদায় লক্ষণও অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়।

অম্লপিত্ত রোগ আশু প্রাণনাশক না হইলেও অতি দুশ্চিকিৎস্য। প্রথমাবধি চিকিৎসা ও পথ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। রোগ ক্রমশঃ পুরাতন ও বর্দ্ধিত হইলে প্রায়শঃই উপশম হইতে দেখা যায় না। সুচিকিৎসা ও সুপথ্যের আশ্রয় লইলে স্থগিত থাকিতে পারে মাত্র। কোন কোন সময় শারীরিক অবস্থায় পরিবর্ত্তনের সহিত অম্লপিত্তকে নির্ম্মূল হইতেও দেখা গিয়াছে।

অম্লপিত্ত রোগ বাতসংসৃষ্ট, শ্লেষ্মসংসৃষ্ট ও বাতশ্লেষ্মসংসৃষ্ট এই তিনপ্রকার

হইতে পারে। ইহা বিশেষরূপে জানা না থাকিলে উর্দ্ধগ অম্লপিত্তকে বমন ও অধোগ অম্লপিত্তকে অতিসার বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা বিশেষরূপে জানা থাকা চিকিৎসকমাত্রেরই উচিত।

বাতপ্রকোপযুক্ত অম্লপিত্তরোগে কম্প, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, ঝিন্‌ঝিনী, দেহের অবসন্নতা, শূল, অন্ধকারদর্শন, ভ্রম, জ্ঞানবৈপরীত্য ও রোমাঞ্চ, কফানুগত অম্লপিত্তে কফনিষ্ঠীবন, দেহের গুরুতা ও জড়তা, অরুচি, শীতানুভব, অবসন্নতা, বমি, মুখে কফলিপ্ততা, অগ্নিমান্দ্য, গাত্রে কণ্ডূৎপত্তি ও নিদ্রা এবং বাত ও শ্লেষ্মসংসৃষ্ট অম্লপিত্তে, বাতসংসৃষ্ট ও শ্লেষ্মসংসৃষ্ট উভয়বিধ অম্লপিত্তের মিলিত লক্ষণ লক্ষিত হয়। অন্ধকারপ্রবেশবৎ জ্ঞান, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, আলস্য, শিরঃপীড়া, মুখ দিয়া জল উঠা ও মুখে মধুর স্বাদ এই গুলি শ্লেষ্মপিত্ত নামক পীড়ার লক্ষণ।

অম্লপিত্তরোগে দোষের প্রকোপ যদি অধিক হয়, তবে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রথমতঃ বমন বিরেচন প্রদান করা কর্ত্তব্য। বমন বিরেচন দ্বারা দোষের লাঘব হইলে পীড়াসমস্তও সহজসাধ্য হইয়া আইসে। অম্লপিত্তরোগে নিম্নলিখিত ক্বাথ কয়েকটী দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

পটোলপত্র, শুঁঠ ও ধনে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে, ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি ও শূল প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

ত্বক্‌বর্জ্জিত যব, বাসকপত্র ও আমলকী সমুদায়ে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। ছাঁকিয়া লইয়া দারুচিনি, এলাইচ চূর্ণ এবং তেজপত্র চূর্ণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অম্লপিত্তে বিশেষ উপকার হয়। ইহার পথ্য সরু চাউলের অন্ন ও মুগের যূষ।

বাসকছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, চিরাতা, ভীমরাজ, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও পটোল লতা মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ মধু। এই ক্বাথ পান করিলে সমস্ত প্রকার অম্লপিত্ত নষ্ট হয়।

পঞ্চনিম্বাদি চূর্ণ—নিম্ববৃক্ষের ত্বক্, পত্র, পুষ্প, মূল ও ফল সমুদায়ে ১ তোলা, বিদ্ধড়ক ২ তোলা ও যবের ছাতু ১০ তোলা এই সমুদায়ের সহিত যথোপযুক্ত চিনি মিশ্রিত করিয়া মিষ্ট করিবে। প্রত্যহ ২ তোলা মাত্রায় শীতল জলসহ সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজনিত শূল ও অম্লপিত্ত প্রশমিত হয়।

অবিপত্তিকর চূর্ণ—ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), ত্রিফলা (হরিতকী, আমলকী, বহেড়া), মুতা, বিট্‌লবণ, বিড়ঙ্গ, এলাইচ ও তেজপত্র প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, লবঙ্গ চূর্ণ ১১ তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৪৪ তোলা ও চিনি ৬৬ তোলা, (১ সের ২ তোলা) সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা ৵০ হইতে ।০ আনা পর্য্যন্ত। অনুপান শীতল জল। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, মলমূত্র ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া আরোগ্য হয়। এই দুইটী চূর্ণ অম্লপিত্ত রোগে সর্ব্বদা ব্যবহৃত ও পরীক্ষিত ঔষধ।

শুণ্ঠীখণ্ড—শুঁঠচূর্ণ অর্দ্ধ সের, চিনি ২ সের, ঘৃত ১ সের ও দুগ্ধ ৮ সের। প্রথমতঃ দুগ্ধে চিনি গুলিয়া শুঁঠচূর্ণ দিয়া পাক করিবে। আসন্নপাকে আমলকী, ধনে, মুতা, জীরা, পিপুল, বংশলোচন,

দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, কৃষ্ণজীরা ও হরিতকী প্রত্যেক চূর্ণ ১॥০ তোলা, মরিচ চূর্ণ ও নাগকেশর চূর্ণ প্রত্যেক ৮০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ২৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় দুগ্ধ অথবা শীতল জলসহ সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল, হৃদ্রোগ, বমি ও আমবাত প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহার ফল অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে।

সৌভাগ্য শুণ্ঠীমোদক—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুচিনি, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কুড়, বনযমানী, লৌহ, অভ্র, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, মুতা, এলাইচ, জায়ফল, জটামাংসী, তেজপত্র তালীশপত্র, নাগেশ্বর, গন্ধমাত্রা, শঠী, যষ্টিমধু, লবঙ্গ ও রক্তচন্দন প্রত্যেক সমভাগ সর্ব্বসমান শুঁঠ চূর্ণ, শুঁঠ চূর্ণের সহিত সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি, সমুদায় সমষ্টির চতুর্গুণ গব্যদুগ্ধ। দুগ্ধে চিনি মিশ্রিত করিয়া শুঁঠ চূর্ণ দিয়া পাক করিবে। আসন্ন-পাকে অপর সমুদায় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান দুগ্ধ অথবা জল। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, শূল এবং বক্ষঃ ও কণ্ঠ দাহ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

অম্লপিত্তান্তক লৌহ—পারদ, গন্ধক, মণ্ডুর, অয়স্কান্ত ও সহস্র পুটিত অভ্র এই সমুদায় সমান ভাগে লইয়া আমলকীর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মৌরী, ধনে ও জাঙ্গিহরিতকী মিলিত ২ তোলা ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথের সহিত প্রত্যহ প্রাতে একটা বটী সেবন করিলে অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতি নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

পানীয় ভক্ত বটিকা—অভ্র, মণ্ডুর ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ৮ তোলা, চই, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেশুরিয়া মূল, দন্তীমূল, মুতা, পিপুল, চিতামূল, ঘেঁট্‌কোল, মাণ, ওল, শুক্ল বৃহতীর মূল, তেউড়ী মূল, হড়হুড়ে মূল ও পুনর্নবা মূল প্রত্যেক ২ তোলা, রস ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ অম্লপিত্ত, অরুচি ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে প্রয়োজ্য। জল ধৌত অন্ন, দধি ও কাঁজি প্রভৃতি পথ্য। পানিফল, বেল, গুড়, কাচড়া, নারিকেল, দুগ্ধ ও সকল প্রকার ডাইল সেবন নিষিদ্ধ। অম্লপিত্ত রোগের ইহা একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অম্লপিত্ত রোগে ক্ষুধাবতী গুড়িকা, বৃহৎ ক্ষুধাবতী গুড়িকা, লীলাবিলাস রস, পঞ্চানন গুড়িকা, ভাস্করামৃতাভ্র, ত্রিফলামণ্ডুর, অম্লপিত্তান্তক মোদক, সর্ব্বতোভদ্র লৌহ, পিপ্পলী খণ্ড ও বৃহৎ পিপ্পলী খণ্ড প্রভৃতি অম্লপিত্তাধিকারোক্ত ঔষধ সমুদায় এবং শূলাধিকারোক্ত আমলকী খণ্ড, নারিকেল খণ্ড ও ধাত্রী-লৌহ প্রভৃতি ঔষধ সমুদায় বিবেচনা পূর্ব্বক প্রদান করিবে। শূলাধিকারোক্ত উল্লিখিত ঔষধ কয়েকটী ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। উহাদের প্রস্তুত প্রণালী শূলাধিকারে লিখিত হইবে। সময় বিশেষে অম্লপিত্ত রোগে তৈল মর্দ্দন হিতকর। শরীরের রুক্ষতা উপস্থিত হইলে, ভুক্তদ্রব্য স্তব্ধভাবে থাকে, বায়ু নিঃসরণ

অথবা উদ্গার উত্থিত হয় না ও শিরঃপীড়া প্রভৃতি উপস্থিত হয়। এই সময়ে শ্রীবিল্ব তৈল প্রভৃতি মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

শ্রীবিল্ব তৈল—তিল তৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ বেলশুঁঠ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ, আমলকীর রস ৪ সের ও ছাগদুগ্ধ ৮ সের দ্বারা ক্বাথ পাক শেষ করিয়া, নিম্নলিখিত দ্রব্য সকলের সহিত কল্ক পাক করিবে। যথা—আমলকী, লাক্ষা, হরিতকী, মুতা, রক্তচন্দন, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতচন্দন, কুড়, এলাইচ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুল্‌ফা ও পুনর্নবা মিলিত ১ সের। কল্ক পাককালে স্নেহের চতুর্গুণ জল দেওয়া হয়। এস্থলেও ১৬ সের জল দিয়া কল্ক পাক শেষ করিতে হইবে এবং গন্ধপাকোক্ত নিয়মানুসারে গন্ধপাক করিবে। পূর্ব্বে আমরা গন্ধপাকের বিষয় লিখিয়া আসিয়াছি। স্মরণ করিতে অনেক পাঠকের কষ্ট হয়, সুতরাং অত্র পুনরায় গন্ধপাক লিখিত হইল।

এলাইচ, শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, মুরামাংসী অর্থাৎ একাঙ্গা, কাঁকলা, জটামাংসী, শটী, সরল কাষ্ঠ, তেজপত্র, গেঁঠেলা, কর্পূর, শৈলজ, বেণার মূল, সুগন্ধভি, নখী, খাটাশী, শিলারস, মুতা, মেথী ও লবঙ্গ ইহাদিগকে সাধারণ গন্ধদ্রব্য কহা যায়। ইহার সমস্ত সংগ্রহ করা সহজ নহে সুতরাং দুই একটীর অভাব হইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। গন্ধদ্রব্যের পরিমাণ কল্কের অর্দ্ধ। গন্ধপাক কালে জল দিতে হয়। এই জলের পরিমাণ স্নেহের দ্বিগুণ অর্থাৎ তৈল ৪ সের হইলে জল ৮ সের।

এই শ্রীবিল্ব তৈল মর্দ্দনে সকল প্রকার অম্লপিত্ত, অষ্টবিধ শূল, সূতিকা, হস্ত, পদ ও মস্তিষ্কের দাহ, দৌর্ব্বল্য, কৃশতা গ্রহণী, গুল্ম, হিক্কা, রক্তপিত্ত ও জ্বরাদি নানা রোগ আরোগ্য হয় এবং ইহা বন্ধ্যা দোষ নিবারণ করে ও শুক্রবর্দ্ধন করে।

পথ্যাপথ্য—অম্লপিত্ত রোগ যাহার জন্মিয়াছে, তাহার মনে করা উচিত যে, ঈশ্বর আমার ভোগ বঞ্চনার জন্যই এ রোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। সুপথ্যাশী হইয়া থাকিলে, যন্ত্রণার অনেক লাঘব থাকে। এই রোগে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পলতা, হিঞ্চা ও বেতের ডগা প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য, মৎস্যের ঝোল, পাতি বা কাগজী লেবু, দুগ্ধ ইত্যাদি সুপথ্য। নূতন তণ্ডুলের অন্ন, অধিক পরিমাণ ভাজা দ্রব্য, ডাইল, শাক, লঙ্কা, অম্ল, দধি, লবণ, গুরুপাক ও অধিক ঘৃত মশলা সংযুক্ত ব্যঞ্জন, মদ্য ও মল মূত্রাদির বেগধারণ অহিতকর সুতরাং সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

২য় খণ্ড। } ১৩০২ সাল—জ্যৈষ্ঠ। { ৯ম সংখ্যা।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

মূল্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অনেকে সম্পাদক শ্রী দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত সমীরণের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া গুজব রটাইয়াছেন, সেটা সম্পূর্ণ অমূলক।

আদি-আয়ুর্ব্বেদ মেশিন যন্ত্র।

আমাদের এই যন্ত্রে চেক, লেবেল ও অন্যান্য সমুদয় প্রকার ছাপা অতি সুন্দর রূপে নির্দিষ্ট সময়ে সমাহিত হইয়া থাকে, উপযুক্ত পুস্তক পাইলে আমরা প্রকাশের ভার লইতে পারি।

কবিরাজ—শ্রীআশুতোষ সেন,

অধ্যক্ষ।

২য় খণ্ড। ১৩০২ সাল—জ্যৈষ্ঠ। ৯ম সংখ্যা।

শ্রীমদ্রূপ সনাতন।

(শ্রীচৈতন্যের রামকেলি আগমন।)

মুকুন্দদেবের পাঁচ পুত্র—পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রথম দুই জনের কি নাম ছিল, জানিবার উপায় নাই। সনাতন গোস্বামীর নির্দ্দেশানুসারে অবগত হওয়া যায়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুই জন, তিনি তৃতীয়। * তাঁহার পিতৃদত্ত নাম অমর, শ্রীরূপ তাঁহার অনুজের নাম সন্তোষ, এবং শ্রীজীবের পিতা, কুমারদেবের সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানের নাম বল্লভ। সনাতন তখনকার সময়ে বিদ্যাবুদ্ধিতে বঙ্গদেশে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীরূপও জ্যেষ্ঠেরই অনুরূপ ছিলেন। ইঁহারা বাল্যকালেই সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতী; * বিদ্যাবাচস্পতী ভারত

* কেহ কেহ বলেন সনাতন গোস্বামী কুমার দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু "কুমার দেবের অনেক সন্তান ছিল। তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ।" ভক্তিরত্নাকরের এই উক্তিতে জানা যাইতেছে যে, সনাতন, শ্রীরূপ, আর বল্লভ, এই তিন জন কৃষ্ণভক্ত ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পরিবর্ণিত হইয়াছেন। এমন কি সনাতন গোস্বামী, কি শ্রীজীব গোস্বামীও তাঁহাদের নাম বলেন নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থের ভিতর অবৈষ্ণবগণের কাহিনী থাকা অসম্ভব। তবে তাঁহারা কেবল তিন ভাই মাত্র ছিলেন না. আরও বৈষ্ণব ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে সনাতন, জ্যেষ্ঠ,—শ্রীরূপ জ্যেষ্ঠ নহেন, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। সম্মত হইলে কি হয়, সেদিন নব্যভারতে একটী লেখক প্রচার করিয়াছেন যে, শ্রীরূপই কুমার দেবের জ্যেষ্ঠ সন্তান। তিনি কৃষ্ণদাসের চরিতামৃত মানেন না, শ্রীজীবের লিখিত বিবরণও প্রামাণ্য বোধ করেন না। কিন্তু কবি কর্ণপুর (পরমানন্দ দাস) নামা আর এক জন সমসাময়িক লোকও যে বলেন, সনাতন জ্যেষ্ঠ, ইহাই আশ্চর্য্য। যথা—"গৌড়েন্দ্রস্য সভা বিভূষণ মণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং, রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণ। বৈরাগ্য লক্ষ্মীং দধে।" ইত্যাদি। আর লঘুতোষণীতে "আদিঃ শ্রীল সনাতন স্তদনুজ শ্রীরূপ" ইত্যাদি থাকিলেও কি হয়, শ্রীজীব যে সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র!!!——লেখক।

* "ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।" ইত্যাদি।

শ্রীসনাতন কৃত বৃহত্তোষণী গ্রন্থ।

"শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতী।"—

ভক্তিরত্নাকর।

বিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহোদর ভ্রাতা। শ্রীরূপ জ্যেষ্ঠের নিকট হইতেই শিক্ষা-লাভ করেন। (১) আবার শ্রীজীব গোস্বামীর গুরু শ্রীরূপ। (২) কিন্তু শ্রীজীবের বৈদান্তিক গুরু, কাশীবাসী মধুসূদন বাচস্পতী। (৩)

১৪১১ শকাব্দ হইতে ১৪৩৪ শকাব্দ পর্য্যন্ত, সৈয়দ হুসেন সা নামক জনৈক যবন গৌড়ের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন, তিনি সনাতনের গুণগ্রাম শ্রবণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত করেন। (৪) সনাতন যে স্বইচ্ছায়—স্বাগ্রহে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। কেন না, তখনকার লোকের প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল, তখন স্বইচ্ছায় কেহই যবন সংস্পর্শে আসিত না, আসিলে সমাজে নিন্দিত হইত। তবে যবন রাজের প্রভাব, প্রচণ্ড, অত্যাচারের ভয়ে কাযেই তাহাদিগকে রাজ-কার্য্য গ্রহণ করিতে হয়। ভক্তি রত্নকর বলেন :—

"সনাতন রূপ মহামন্ত্রী সর্ব্বাংশেতে।
শুনিলেন রাজা শিষ্ট লোকের মুখেতে॥
গৌড়রাজ যবনের অনেক অধিকার।
সনাতন রূপে আনি দিলা রাজ্যভার॥
ম্লেচ্ছ ভয়ে বিষয় করিলা অঙ্গীকার।
এ দুই প্রভাবে রাজ্য বৃদ্ধি হৈল তার॥"*
ভক্তি রত্নাকর।

তখনকার নিয়মানুসারে হুসেন সা সনাতনকে সাকর-মল্লিক, আর শ্রীরূপকে দবীরখাস এই উপাধিতে ভূষিত করেন। সাকর অর্থে জ্ঞানবান এবং মল্লিক অর্থে শ্রেষ্ঠ বা মর্য্যাদাশালী। দবীরখাস অর্থে উত্তম লেখন। † বস্তুতঃ শ্রীরূপের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, স্বয়ং "মহাপ্রভু" এক সময়ে শ্রীরূপের অক্ষরের প্রশংসা, এই বলিয়া করিয়াছিলেন যে,—"শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।" (বৈঃ বঃ) সাকর মল্লিক আর দবীর খাস, রূপ সনাতনের নাম নহে,—উপাধি ‡ একথা ভক্তমালেও লিখিত হইয়াছে, যথা :—

(১) "সনাতন মোর জ্যেষ্ঠ মোর প্রভু সম।
* * *
ইহ স্থানে মোর শিক্ষ কৃপা করেন অতি॥"—
প্রেমবিলাস।

"শিষ্য কনিষ্ঠ যদি শ্রীরূপ হয়েন;
তবু সনাতন তারে আদর করেন॥"—
প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয়।

(২) "শ্রীজীব শিষ্য মোর ভ্রাতার তনয়।"—
ভক্তি রত্নাকর।

(৩) "তাহা (কাশী) রহে শ্রীমধুসূদন বাচস্পতী।
সর্ব্ব শাস্ত্রে অধ্যাপক যেন বৃহস্পতী"
তেঁহো শ্রীজীবের দেখি অতি স্নেহ কৈলা।
কতদিন রাখি বেদান্তাদি পড়াইলা॥"—
ভক্তি রত্নাকর।

(৪) "মহামন্ত্রী সনাতন বুদ্ধে বৃহস্পতী।" ইত্যাদি।
চৈতন্য চরিতামৃত।

* নব্য ভারতের সেই মহারথী বলেন, সনাতন একটী নগণ্য কেরাণী মাত্র ছিলেন। লেখক প্রবর কোন ইতিহাস হইতে কথাটী উদ্ধার করিয়াছেন জানি না। কেরাণীর প্রভাবে রাজার রাজ্য বৃদ্ধি হইতে পারে কি?—লেখক।

† এই অর্থ ধরিয়াই বোধ হয় লেখক স্বীয় অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

‡ পূর্ব্বোক্ত লেখকের মতে ইহাই রূপসনাতনের পিতৃদত্ত নাম। কেন না (তাহার মতে) রূপসনাতন যবন সন্তান!! লেখক জানেন কি, যে—
'অমর সন্তোষ নাম পূর্ব্বেতে আছিল।
সনাতন রূপ নাম পশ্চাৎ হইল॥"—
হরিভক্তি প্রকাশিকা।

"দবীর খাস আর সাকর মল্লিক।
প্রভাবেতে এ দুহার খেতাব অধিক॥"
ভক্তমালা।

উপাধির সঙ্গে সঙ্গে রূপসনাতন দুইটী বৃহৎ ভূসম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। * সনাতনের অগ্রজই এই সম্পত্তি শাসন করিতেন; অনুপম রাজধানীতেই ভ্রাতৃগণ সহ একত্র বাস করিতেন।

ঐ সময়টী বঙ্গদেশের বিশেষ গৌরবের কাল। বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি এবং ভবানন্দ, যাঁহারা ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনায় বঙ্গভূমীকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এবং তান্ত্রীক কৃষ্ণানন্দ, ইহারা ঐ সময়েরই লোক। ঐ সময়েই নিমাই পণ্ডিত অপূর্ব্ব দৈব প্রতীভায় প্রদীপ্ত এবং লোকাতীত প্রেম-প্রবাহে পরিপ্লুত হইয়া বঙ্গবাসীদিগকে বিমুগ্ধ ও চমকিত করিয়া তুলেন। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই সেই দৈব প্রতিভায় জনগণ প্রদ্যোতিত হইয়াছিল, সেই প্রেমবন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। শ্রীভগবানের সহিত মানবের যে অতি নিকট সম্বন্ধ, ইহা তাহারা কালবশে ভুলিয়া গিয়াছিল, নিমাইর উপদেশে প্রজ্ঞাচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে তাহারা দেখিতে পাইল যে, ভগবান্ আর দূর হইতে দূরান্তর পথে নহেন—অতি নিকটে। তিনি তাঁহাদের অতি প্রিয় বস্তু, অতি আত্মীয়। ভগবান্ কেবল শাস্ত্র বা তর্কের সামগ্রী নহে, তিনি প্রত্যক্ষ বস্তু; একটু যত্ন করিলে যথার্থই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

এইরূপে যখন নিমাই পণ্ডিতের উপদেশে তাবৎ লোক ভগবানের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিল, তখন কোন কোন ধ্যানানুরক্ত ভক্ত ব্যক্ত করেন যে, ভগবান্ যথার্থই দূরে নহেন, সেই লোকাতীত বস্তুই নিমাই।

এই মতটী প্রথমতঃ উপহাসের, অথবা গল্পের বিষয় মাত্র ছিল, কিন্তু কালক্রমে ইহা নৈয়ায়িক পণ্ডিতবর্গ কর্ত্তৃক ও স্বীকৃত ও পরিগৃহিত হইয়াছিল। এমন কি, যে নবদ্বীপের ন্যায় বুঝিতে বড় বড় প্রতীচ্য পণ্ডিতগণেরও মাথা ঘুরিয়া যায়, তাহারই প্রবর্ত্তক—রঘুনাথের গুরু, স্বয়ং সার্ব্বভৌম, প্রথমে অগ্রাহ্য করিয়াও শেষে ঐ মত গ্রহণ করেন। সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী অসীম প্রতীভাশালী প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও সার্ব্বভৌমের ন্যায়ই শেষ সময়ে গৌর ভক্ত হইয়া পড়েন।

রূপসনাতনও চৈতন্যের মহিমা অবগত হইয়াছিলেন। শুনিয়া অবধি চৈতন্যের সহ সম্মিলিত হইতে তাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। কিন্তু রাজকার্য্যের প্রতিবন্ধকে অভিলাষ পূর্ণ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইতেন না। তাঁহারা আপনাদের অবস্থা পরিবর্ণন পূর্ব্বক মহাপ্রভুর নিকট এই সময়ই কএক খানি পত্র প্রেরণ করেন। এই সকল পত্রের উত্তরে মহাপ্রভু একদা একটী শ্লোক তাঁহাদের কাছে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে শ্লোকটী এই:—

"পর ব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহ কর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্ণবসঙ্গ রসায়নং॥"

* "রাজাহর্ষে দিল বাজা পৃথক করিয়া।
রাজ্য ভোগ করয়ে কিঞ্চিৎ কর দিয়া॥"
ভক্তি রত্নাকর।

অর্থাৎ পরাধীনা (কুলবতী) রমণী গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা থাকিয়াও যেমন নবসঙ্গের রস মনে মনে আস্বাদন করে, তদ্রূপ বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও তোমরা ভগবানের চরণ চিন্তা করিবে।

(এই শ্লোকটী নাকি বড় "অশ্লীল।" নব্যভারতের পূর্ব্বোক্ত লেখক বলেন, শ্রীচৈতন্যোক্ত উক্ত শ্লোকটী বড় "অশ্লীল।" বুঝিতে না পারিয়াও সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করার ন্যায় অজ্ঞতা আর নাই। বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির জিহ্বায় শর্করা তিক্তস্বাদবিশিষ্ট হইলেও তাহা তিক্ত নহে।) একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তি (মাননীয় অমৃতবাজার-পত্রিকা-সম্পাদক) এই শ্লোকের কি অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, উদ্ধৃত করা অসঙ্গত নহে।

"প্রভু এই দুই ভ্রাতাকে (রূপসনাতনকে) কুলটার সহিত তুলনা করিলেন, কেন? পরকীয়া কথাই বা কেন ভজন সাধনের মধ্যে আসে? পরকীয়া রস শুনিলে পবিত্র লোকের মনে ঘৃণার উদয় হয়। অতএব এ সব কথা এ সম্প্রদায় পবিত্রতার মধ্যে কেন? প্রিয় বস্তু সুলভ হইলে তাহার মিষ্টতা কমিয়া যায়; পাখী বড় সুন্দর, তাহার বিশেষ কারণ পাখী ধরা যায় না। পাখী যদি ইচ্ছা করিলেই ধরা যাইত, তবে উহার সৌন্দর্য্য অনেক কমিয়া যাইত। চণ্ডীদাস একটী পদে বলেন, গুপ্ত প্রীতিতে অনেক মাধুর্য্য। তাহার কারণ আর কিছু নয়, উপপতি কি উপপত্নী, পতি কি পত্নী অপেক্ষা, দুর্লভ। অতএব যদি পতি উপতির ন্যায় দুর্লভ হয়েন, তবে পতিও উপপতির ন্যায় মিষ্ট হন। পতির সঙ্গ-সুখ ইচ্ছা করিলেই করা যায়, কিন্তু উপপতির সঙ্গ-সুখ করিতে নানারূপ বিপদ ও পরিণামে নৈরাশ্যের সম্ভাবনা আছে। এই নিমিত্ত দুর্লভ বলিয়া পতি অপেক্ষা উপপতি মিষ্ট।

"শ্রীভগবানকে মধুর ভজন করিতে হইলে দুই প্রকারে করা যায়। পতি ভাবে ও উপপতি ভাবে। ভগবান্ যাঁহার পতি, কাযেই তিনি একটু বঞ্চিত। ভগবান্ যাঁহার উপপতি, তিনি সম্পূর্ণ সুখী। ভগবান্ আস্বাদনের সামগ্রী। তিনি যদি পতির ন্যায় সুলভ হইলেন, তবে মিষ্টতা কমিয়া গেল। যদি উপপতির ন্যায় দুর্লভ হইলেন, তবেই তাঁহার মিষ্টতা পূর্ণ মাত্রায় রহিয়া গেল। লক্ষ্মীর পতি ভগবান্, দুজনে একত্র বাস করেন; কিন্তু লক্ষ্মী ব্রজগোপীদিগের ভাগ্যের নিমিত্ত তপস্যা করিয়া থাকেন, শাস্ত্রে যে এ কথা লেখা আছে, এখন তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুণ।

"শ্রীভগবানকে উপপতি বলিয়া ভজন করিবার আরও কারণ আছে। শ্রীভগবানের মধুর ভজনের সহিত উপপতি ভজনের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। যথা, উপপতি ভজনের আনন্দে উন্মাদ করে, ভদ্রাভদ্র, বিপদাপদ, জ্ঞান থাকে না। ভগবানের মধুর ভজনেও তাই করে। ভজনা দ্বারা উপপতিকে প্রাপ্তির অনেক বাধা ও নিশ্চয়তা নাই। শ্রীভগবান্ ভজন সম্বন্ধেও তাহাই। তাই পতিরূপে শ্রীভগবানকে বর্ণনা করিলে সে বর্ণনা স্বাভাবিক হইত না। উপপতি রূপে বর্ণনায় তাহাই হইয়াছে। বিশেষতঃ পতির সহিত যে সম্বন্ধ তাহাতে স্বার্থগন্ধ আছে। যে হেতু পতি প্রতিপালক, রক্ষাকর্ত্তা ইত্যাদি। উপপতির সহিত

সে সম্বন্ধ উহা বিশুদ্ধ প্রীতির দ্বারা গ্রথিত।”—

অমিয়-নিমাই চরিত।—৩য় খণ্ড।

ফল কথা—মহাপ্রভু শ্রীরূপসনাতনকে, পরকীয়া ভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা করিতে ইঙ্গিতে উপদেশ দেন। এই উপদেশানুসারেই তাঁহারা বলিয়াছিলেন; শ্রীরূপকৃত গ্রন্থাদিতে এই রসেরই বিস্তার বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়।

ইহার কিছুদিন পরে, শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন গমন ব্যপদেশে গৌড় সন্নিধানে রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হন। রামকেলি বৃন্দাবন গমনের পথে নহে। তবে কি উদ্দেশ্যে প্রভু ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন?

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, কুমারদেব নৈহাটী হইতে আসিয়া বাকলা চন্দ্রদ্বীপে একটী বাটী এবং ফতয়াবাদে অন্য একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রূপসনাতনের রামকেলিতে আর একটী বাটী ছিল। তাঁহারা অধিকাংশ সময় এই স্থানে থাকিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের এই বাসভবনটী ভজনোপযোগী যথোচিত সাজে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। সে ভবনটী প্রাচীন আশ্রমের ন্যায়ই শান্তিপ্রদ ও পরম রমণীয় ছিল। চতুর্দ্দিগস্থ কুসুম-কাননের শ্যামল শোভায় জনগণের নয়ন সন্তৃপ্ত হইত, সুরভি প্রসূনরাশি হইতে সুগন্ধ বিকীর্ণ হইয়া অধিবাসীবর্গের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিত। অদূরে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড নামক সরসী যুগলে সুনির্ম্মল নীল সলিল টলমল করিত, সযত্ন রক্ষিত কুমুদ কহলারাদি সলিল কুন্তল সরসী বক্ষে শোভা বিস্তার পূর্ব্বক তরঙ্গ ভঙ্গে নৃত্য করিত। সে আশ্রম-কানন সতত কোকিল কুজিত, ভ্রমর গুঞ্জিত, শ্যামাভিশব্দিত ও বিশ্রামকারী বিবিধ পক্ষি কর্ত্তৃক প্রতিধ্বনিত হইত। সেখানে উপস্থিত হইলেই মন নির্ম্মল ও স্বতএব ধর্ম্ম ভাবাক্রান্ত হইত। এই স্থানে রূপসনাতন পণ্ডিত মণ্ডলীতে প্রবেষ্টিত হইয়া ইষ্টালাপে অবসর সময় পরিক্ষেপণ করিতেন। রূপসনাতনের রামকেলি বাসের কিঞ্চিৎ বর্ণনা ভক্তিরত্নাকরে আছে, তাহা এই:—

“গৌড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্য্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস॥
ইন্দ্রসম সনাতনরূপের সভাতে।
আইসে শাস্ত্রজ্ঞগণ নানাদেশ হৈতে॥
গায়ক বাদক নর্ত্তকাদি কবিগণ।
সর্ব্বশ্রেণী সকলে নিযুক্ত সর্ব্বক্ষণ॥
নিরন্তর করেন অনেক অর্থ ব্যয়।
কোন রূপে কারু অসম্মান নাহি হয়॥
সদা সর্ব্বশাস্ত্র চর্চ্চা করে দুইজন।
অনায়াসে করে দোঁহে খণ্ডন স্থাপন॥
ন্যায় সূত্র ব্যাখ্যা নিজকৃত যে করয়।
সনাতন রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয়॥
ঐছে সবে সর্ব্ব প্রকারেতে দৃঢ় হৈয়া।
সনাতন রূপ গুণ গায় সুখ পাঞা॥
সর্ব্বত্র ব্যাপিল এ দোঁহার গুণগণ।
কর্ণাট দেশাদি হৈতে আইলা বিপ্রগণ॥
সনাতন নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে।
বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা সন্নিধানে॥
ভটা গোষ্ঠিবাসে “ভট্যবাটী” নামে গ্রাম।
সকলে শাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব্বমতে অনুপাম॥
রামকেলি গ্রামের সকল বিপ্র বৈদ্য।
ব্যবহার কার্য্য সব সাধে হর্ষ হৈয়া॥
বৈষ্ণব সম্প্রদায়গণে রূপ সনাতন।
যেরূপ আদরে, তাহা না হয় বর্ণন॥

নবদ্বীপ হইতে আইসে বিপ্র যত।
কহিতে না পারি তা সবারে ভক্তি কত ॥"
ভক্তি রত্নাকর।

তত্রৈব অন্যত্রে :—

"দুই ভাই সর্ব্ব শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত!
জ্যেষ্ঠ সনাতন রূপ কনিষ্ঠ বিদিত॥
নানা দেশি পণ্ডিতের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনে।
বহু অর্থ দিয়া পরিতোষে সর্ব্ব জনে॥"

মহাপ্রভু এই রামকেলিতে উপস্থিত হইলে নগর টলমলায়মান হইল। মহাপ্রভু যখন যেখানে উপস্থিত হইতেন, সেইখানেই লোক উন্মত্ত হইত, সেই স্থানই প্রেমবন্যায় ভাসিয়া যাইত। রামকেলির সৌভাগ্যে তাই হইল। চৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, স্ত্রীলোক এবং বালক পর্য্যন্ত হরিনামে মাতিয়াছিল। যথা :—

"সর্ব্ব লোক দেখিতে আইসে হর্ষ মনে।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ আদি সজ্জন দুর্জ্জনে॥"
"নিরবধি প্রভুর আবেশময় অঙ্গ।
প্রেম ভক্তি বিনা আর নাহি কোন রঙ্গ॥"
"নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
তিলার্দ্ধেক অন্য কর্ম্ম নাহি কোন ক্ষণ॥"
"হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌররায়।
যবনেও হরি বলে অন্যের কি দায়॥"
"নির্ভয় হইয়া সর্ব্ব লোক বলে হরি।
দুঃখ সুখ ঘর দ্বার সকল পাশরি॥"
নিকটে যবন রাজ পরম দুর্ব্বার।
তথাপিও চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার।"
চৈতন্য ভাগবত।

বলা বাহুল্য যে, এই বিবরণটী হুসেনসারও কর্ণগোচর হইয়াছিল। নগরের শান্তিরক্ষক, গৌড়েশ্বরকে জানাইয়াছিল যে, একটী সন্ন্যাসী কোথা হইতে নগরে আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক, তাহারা কাহারও বারণ শুনে না, নিরন্তর উচ্চৈস্বরে "ভূতের কীর্ত্তন করে। হুসেন সা জিজ্ঞাসিলেন যে, সে সন্ন্যাসীটা কেমন—যাহার জন্য নগর রক্ষক এত উদ্বেগগ্রস্থ? তাহার আকৃতি প্রকৃতিই বা কিরূপ? তখন :—

"কোতয়াল বলে শুন শুনহ গোসাঞি।
এমন অদ্ভুত কভু দেখি শুনি নাই॥"
"জিনিয়া কনক কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
আজানু লম্বিত ভুজ সুনাভি গভীর॥
সিংহ গ্রীব গজ স্কন্ধ কমল নয়ন।
কোটী চন্দ্র সে মুখের নাহি হয় সম॥"
"সুন্দর সুশীল বক্ষে লেপিত চন্দন।
কটী তটে শোভে মহা অরুণ বসন॥"
"কোন বা রাজ্যের কোন রাজার নন্দন।
জ্ঞান পাই ন্যাসী হই করয়ে এমন॥"
"নিরন্তর সন্ন্যাসীর ঊর্দ্ধ রোমাবলী।
পনসের প্রায় যেন পুলক মণ্ডলী॥"
ক্ষণে ক্ষণে সন্ন্যাসীর হেন কম্প হয়।
সহস্র জনের ধরিবারে শক্তি নয়॥
দুই লোচনের জল অদ্ভুত দেখিতে।
কত নদী বহে যেন না পারি কহিতে॥"
ইত্যাদি।
চৈতন্য ভাগবত।

নগরাধ্যক্ষের প্রমুখাত এবম্বিধ বহুবিধ সংবাদ বিদিত হইয়া গৌড়াধীপের কৌতুহল জন্মিল। তিনি কেশবছত্রী নামক একটীমাত্র অনুচর সঙ্গে অট্টালিকার উপর হইতে সন্ন্যাসীকে সন্দর্শন করিলেন। তিনি কি দেখিলেন, প্রাচীনকবি প্রেমদাসের ভাষায় তাহা বলিতেছি :—

"গঙ্গার নিকটে উচ্চ অট্যালী উপর।
পাত্র সঙ্গে তাহাতে উঠিলা গৌড়েশ্বর॥

অনন্ত লোকের ঘটা মহা কোলাহল।
তার মধ্যে গৌরচন্দ্র দীর্ঘ কলেবর॥"

প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

যবনরাজ সন্ন্যাসীর রূপ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিস্মিত হইলেন, ঈদৃশ অপরূপ রূপ কি মনুষ্যে সম্ভবে? শ্রীচৈতন্যকে যে দেখিত, কি এক অদ্ভুত শক্তিবলে, সেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইত; তাহারই মন নির্ম্মল হইয়া যাইত। গৌড়েশ্বর হুসেন সা—যদিও তিনি হিন্দুবিদ্বেষি যবন, যদিও তৎকর্ত্তৃক উড়িষ্যার শত শত দেবমূর্ত্তি চূর্ণীকৃত হইযাছিল, তাঁহার তথাপি এ হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রতি মন আকৃষ্ট হইল। তিনি সঙ্গায় কেশব-ছত্রীকে ইঁহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

কেশবছত্রী বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করেন, গৌরাঙ্গকে ভক্তি করেন। তিনি ভাবিলেন যে, হুসেন সা হিন্দু বিদ্বেশি যবন বই নহেন, আশ্চর্য্য কি, তিনি মহাপ্রভুর অনিষ্ট চেষ্টা না করিবেন। তাঁহার মনে এইরূপ ভাবের উদয় হওয়ায় তিনি মহাপ্রভুকে সামান্য ভিক্ষুক বলিয়া রাজার কাছে বর্ণন করিলেন।

উদ্দেশ্য—সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার মনোযুগ যেন না থাকে। * যথা :—

"কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা যে পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল॥
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্য্যটণ।
তারে দেখিবারে আইসে দুই চারি জন॥
তার হিংসায় লাভ নাই হয় মাত্র হানি।"
ইত্যাদি।

চৈতন্য ভাগবত।

কেশব ছত্রী অতঃপর গোপনে একটী ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রভুকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, যবনের রাজধানী সন্নিকটে তাঁহার দীর্ঘকাল থাকা ভাল নহে। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ প্রভুর কাছে এই সন্দেশ, প্রকাশ করিবার অবকাশ পায় নাই। কীর্ত্তন আনন্দে শচীনন্দন বাহ্য শূন্য ছিলেন; কাযেই তাঁহার ভক্তবর্গের কাছে তাহা ব্যক্ত করিতে হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, ছত্রীর উত্তরে রাজা সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি দবীর খাসকে পুনর্ব্বার মহাপ্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ উত্তর করিলেন :—

"মোরে কেন পুছ রাজা—পুছ আপন মন
তুমি নরাধীপ হও বিষ্ণু অংশ সম॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয়ে সেইত প্রমাণ॥"
রাজা কহে—শুন মোর চিত্তে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহোঁ নাহিক সংশয়॥"

চৈতন্য চরিতামৃত।

---

* নব্যভারতের সেই "রূপসনাতন" প্রবন্ধ লেখক বলেন যে, রূপসনাতন প্রভৃতি চৈতন্যের অযথা তোষামোদকারী ছিলেন। এবং কৃষ্ণদাসের ভাই ছিলেন বলে হুসেন সা সম্বন্ধে অলীক বিবরণ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে কেশব ছত্রীর কথাই যথার্থ। চৈতন্য কি? রূপসনাতনের উপর যে লেখকের এত রূপ করিবার কারণ কি? যত হউক কেশবছত্রীও কৃষ্ণ ভক্ত বই ছিলেন না, কি কারণে তিনি চৈতন্য মহিমা গোপন করেন পূর্ব্বে বলিযাছি। ছত্রীর বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রতিপাদক (তাঁহার বিরচিত) একটী শ্লোক এই :—

"যাবদ্গোপা মধুর মুরলী নাদমত্তা মুকুন্দঃ
মন্দ স্পন্দৈরহহ সকলে লোচনৈর্বা পিবন্তি।
গলবস্ত্রাবন্নস্তণ যবনম্নুম্না বিদুরং।
ধাতা গোবর্দ্ধন গিরিধরি দ্রোণিকালস্তবেষু॥"

কেশব ছত্র।

ফলে হুসেন সা বিশ্বস্ত ভৃত্যের মুখে শুনিয়া, এবং স্বয়ং চৈতন্য প্রভুর রূপ কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলন, তাঁহার হৃদয় ভুলিতেছিল, তাই তিনি যবন হইয়াও মহাপ্রভুর অনুরক্ত ও তৎপ্রতি সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। নদীয়ার ঐ "ব্রাহ্মণতময়"টীর প্রভাবই না কি ঐরূপ ছিল!

কেশব ছত্রী চৈতন্যকে গরীব ভিখারী বলিয়া বর্ণন করিয়াছিলেন। এবং হুসেন সার মন তাহাতে প্রবুদ্ধ হয় নাই। হয় নাই বলিয়াই তিনি তাহা স্বীকার করেন নাই শ্রীরূপের কাছে তিনি চৈতন্য প্রভুকে ঈশ্বরাবতার বলেন, ছত্রীর কাছেও তাই বলিয়াছিলেন। এবং সেই জন্য ইহাঁর প্রতি কেহ যেন কোনরূপ অন্যায় না করে, রাজ্য মধ্যে ঘোষিত করেন।

যথা—চৈতন্য ভাগবতে :—

"রাজা বলে গরীব না বল কভু তানে।
হিন্দু যারে বলে কৃষ্ণ খোদা যবনে॥
সেই তেহোঁ নিশ্চয় জানিও সর্ব্বজনে॥"
"এই নিজ রাজ্যেই আমার কত জনে।
মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে॥
তাহারে সকল দেশ কায় বাক্য মনে।
ঈশ্বর নহিলে বিনা অর্থে ভজে কেনে।
ছয় মাস আজি আমি জীবিকা না দিলে॥
নানা যুক্তি করিবেক সেবক সকলে॥
আপনার খাই লোক তাহানে সেবিতে।
চাহে, কেন তাহা নাহি পায় ভালমতে॥
অতএব এই মুই বলি সবাকারে।
কেহ যেন উপদ্রব না কর তাহারে॥
যেখানে তাঁহার ইচ্ছা থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে॥"
"কাজি বা কোটাল কিবা হও যেই জন।
কিছু বলিলেই তার লইব জীবন॥
এই আজ্ঞা করি রাজা গেলা অভ্যন্তর।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।"

পুনঃ চৈতন্যচরিতামৃতে, হুসেন সার উক্তি ;—

বিনা দানে এত লোক যার পাছে ধায়।
সেই ত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজি যবন কেহ ইহার না কর হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বলুন যাহা ইহার মন॥"

হুসেন সার সহৃদয়তায় হিন্দু প্রজাবর্গ পুলকিত হইল, দলে দলে লোকপ্রবাহ সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিল। এইরূপে মহাপ্রভু হরিনামে সে দেশ মাতাইয়া তোলেন। এইরূপে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই "নূতন অবতার" দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিয়াছিল।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

মানবের সার সম্পত্তি।

মানবের সার সম্পত্তি কি, এ কথার মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে দেখা যাক্, মানব কি? অর্থাৎ কাহাকে মানব বলে এবং কি কি গুণ থাকিলে মানব্ মানবপদবাচ্য হইতে পারে। কেবলই মনুষ্যাকৃতি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, হস্ত, পদ প্রভৃতি অবয়ববিশিষ্ট একটা জড়মূর্ত্তি হইলে তাহাকে মানব বলিতে পারি না—তাহা হইলে পশু ও মানুষে অধিক পার্থক্য নাই। যেহেতু পশুরও ঐরূপ বাহেন্দ্রিয় সকল পরিলক্ষিত হয়। মানব কি, ইহা জানিতে হইলে তাহার প্রকৃতি লইয়া বিচার করিতে হইবে। যাহার প্রকৃতির কোন সাত্বিক বিশেষণ নাই, মানব অবয়ববিশিষ্ট হইলেও সে পশু। প্রকৃতির এ বিশেষত্ব টুকু কি তাহা পরে বলিতেছি।

কামক্রোধাদি ষড়রিপু, আহার নিদ্রা, ভয়, মৈথুন—এ বৃত্তিগুলি সর্ব্বজীবেই আছে—ভগবানের সৃষ্ট অসীম প্রাণী-জগতের কেহই ইহা হইতে অব্যাহতি পায় নাই; সুতরাং মানব প্রকৃতিতেও এগুলি অল্লাধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। তবে মানব-প্রকৃতিতে এমন একটা বিশেষত্ব আছে, যাহা অন্য কোন প্রাণীর নাই। কেবল সেই গুণেই মানুষ পৃথিবীর রাজা—সেই গুণেই মানুষ প্রাণী-জগতের শীর্ষস্থানীয়। দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি, প্রেম হিতাহিত জ্ঞান প্রভৃতি কমনীয় গুণাবলীর আধিক্যই এই প্রকৃতির বিশেষত্ব। ভাল কি, মন্দ কি, শুভ কি, অশুভ কি, কর্ত্তব্য কি, অনুচিত কি—ইহার বিচার ও মীমাংসাই মানব-প্রকৃতির বিশেষত্ব। যাঁহার যে পরিমাণে এই দেবগুণে অধিকার, তিনি সেই পরিমাণে মানবপদবাচ্য। যদি মানুষ হইয়া মানুষের ধর্ম্ম পালন না করে, তবে সে দানব নয় তো কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষ পৃথিবীর রাজা—অনন্ত প্রাণীজগতের অধীশ্বর। কিন্তু রাজা হইলে যে যে গুণ আবশ্যক, তাহা তো আমাদের মধ্যে বড় একটা দেখিতে পাই না। শৌর্য্য, বীর্য্য, বল, পরাক্রম, তেজ, প্রতাপ, সাহস, মহাশয়—আমাদের কৈ? আমরা মানুষ—পৃথিবীর অধীশ্বর, ইতর জন্তুগণ তাহা হইলে আমাদের প্রজা তো বটে; কিন্তু কৈ তাহারা কি প্রজাধর্ম্ম পালন করিয়া থাকে? আমাদের ইচ্ছামত—আদেশমত কি তাহারা কার্য্য করে? উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে কি তাহারা আমাদের মুখ তাকায়? ভয়াল হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল মহারণ্যে প্রবেশ কর—যখন দেখিবে মাংসাহারী ভীষণ জন্তু সকল তোমাকে দেখিয়া তাহার হিংসাবৃত্তি বিস্মৃত হয়, খাদ্যখাদক সম্বন্ধ ভুলিয়া যায়, সসম্ভ্রমে, নতমস্তকে দূরে অবস্থান করে, তখন বুঝিব তুমি আমাদের রাজা; তাহারা তোমার প্রজা, তুমি প্রভু, তাহারা ভৃত্য। তুমি যে সমগ্র প্রাণীজগতের অধীশ্বর—তখন বুঝিব, যখন তোমার ইঙ্গিতমাত্রে তাহারা জাতীয় স্বভাব ভুলিয়া শান্ত শিষ্ট ও বিনীত হইবে। কিন্তু বড়ই লজ্জার কথা—আমরা এমনি

মানব যে—মহারণ্যের হিংস্র প্রাণিগণ ত দূরের কথা—গৃহপালিত কুকুর বিড়ালটাও আমাদের বশীভূত নহে—তাহারাও আমাদিগকে রাজা জ্ঞান করিতে ঘৃণা বোধ করে।

একটা গল্প আছে—এক দিন মহারাষ্ট্রীয়কুলতিলক মহাত্মা শিবজী অরণ্যে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উগ্র কিরাত মূর্ত্তি দেখিয়া একদল পক্ষী প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তথা হইতে স্থানান্তরে উড়িয়া গেল। শিবজীও তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় একক্রোশ পথ অতিবাহিত হয়। এই সময়ে তাঁহার অনুচরগণ একে একে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। এক্ষণে তিনি একক। শিকারে ব্যর্থমনোরথ হইবার তিনি লোক নহেন। তাই ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের সহিত তিনি ঐ সকল পক্ষীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পক্ষিগণ ক্লান্ত হইয়া অরণ্যের এক নিভৃত দেশে যথায় জনৈক সংযতমনা যোগমগ্ন যোগিবর অবস্থিতি করিতেছিলেন—সেই পবিত্র স্থানে আশ্রয় লইল। দূর হইতে শিবজী ইহা দেখিলেন,—তাঁহার ন্যায় মহত্ত্বপূর্ণ হৃদয়ে গুণগ্রাহী বীরনয়নে ইহা দেখিলেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া, সহসা তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আপনাকে ধিক্কার দিয়া মনে মনে কহিলেন, আমি কি নৃশংস—কঠিন হৃদয়! মৃগয়ার ক্ষণিক আমোদে অকারণে এতগুলি প্রাণীকে কষ্ট দিতে উদ্যত হইয়াছি। আমি মানুষ—আর ঐ যোগমগ্ন যোগীও মানুষ, আমাকে দেখিয়া পাখীগুলি প্রাণভয়ে উড়িয়া আসিল, আর এখন ইঁহার নিকট অবলীলাক্রমে নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতেছে। ধিক আমাকে! এইরূপ অনুতপ্ত হৃদয়ে তিনি ধীরে ধীরে ঐ যোগমগ্ন যোগিবরের নিকট গমন করিতে লাগিলেন কিন্তু এবার আর সেই পাখীগুলি উড়িয়া যাইল না, তাহারা বুঝিল যে আর তাহাদের প্রাণনাশের সম্ভাবনা নাই, যেহেতু শিবজীর মনে দয়ার উদ্রেক হইয়াছে। বুঝিয়া দেখ, শিবজীর মনোভাবের যে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে পক্ষিগণ নিমেষে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহিত প্রকৃতির এমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে সমগ্র প্রকৃতিখানি অতি সহজেই প্রকাশ পায়। বিহঙ্গমজাতি হইয়াও তাহারা মানব প্রকৃতি বুঝিল, সাধু হৃদয়ের ইহা বড় একটা কম গৌরবের কথা নহে। যথাসময়ে যোগীর যোগ ভঙ্গ হইলে তিনি শিবজীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"তুমি যে এখানে আসিবে আর এই বিহঙ্গমকুল যে এখানে আসিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে তাহা আমি পূর্ব্বেই অবগত আছি; শিবজী যোগীর যোগ-প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"দেব, আজ আমি জীবনে একটী মহাশিক্ষা লাভ করিলাম, আমার দিব্য চক্ষু ফুটিল, প্রাণান্তেও, বৃথা আমোদচ্ছলে আর কখন প্রাণি হিংসা করিব না। গুরুদেব! অধমকে চরণে স্থান দিন।"

শিবাকে একান্ত শরণাগত দেখিয়া তিনি তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন। শিবজী ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে কহিলেন, "গুরুদেব! আজ হইতে আমি আপনার শিষ্য হইলাম, আপনার চরণ-সেবা করাই

আমার ধর্ম্ম। অতএব গুরু দক্ষিণা স্বরূপ আমার সমস্ত রাজ্য গ্রহণ করুন।" তিনি কহিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই, আমি তোমাকে উহা পুনর্দান করিলাম আমার প্রতি যদি তোমার একান্ত অনুরাগ থাকে, তুমি প্রজাভাবে ঐ রাজ্য পালন কর।" সেই, অবধি শিবজী সেই গুরুর চরণে প্রাণ বিকাইলেন, গুরুর আদেশ ভিন্ন তিনি কোন কার্য্যই করিতেন না। আর সেই গুরুর কৃপায় ইহলোকে তিনি কিরূপ যশস্বী হইয়া গিয়াছেন ইতিহাস-পাঠকের তাহা অবিদিত নাই।

তবে দেখ, সদ্‌বৃত্তি এমনই অনুপম বস্তু, যাহার অলৌকিক প্রভাব পশু পক্ষীতেও বুঝিতে পারে। মানুষ যে প্রাণী-জগতের রাজা, হৃদয়ের মহত্ত্ব ব্যতীত কেবল আমাদের এ মাংসপিণ্ড দেহ দেখিয়া তাহা অনুমিত হয় না। ইতিহাস দেখ, সর্ব্বত্রই প্রমাণ পাইবে পূর্ব্বতন ঋষিমণ্ডলী জীর্ণশীর্ণ হইয়াও ধর্ম্মের বলে সেই মহারণ্যে হিংস্র সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত নিরাপদে একত্র বাস করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে আজিও এ দৃশ্য বিরল নহে। তাহাতেই বলিতেছিলাম যে ধর্ম্মবলে বলবান, সেইই মানুষ, সেইই সমস্ত প্রাণী-জগতের অধীশ্বর, কিন্তু আমরা মনুষ্যাবয়ববিশিষ্ট হইয়াও সে রাজ—আখ্যা পাইতে পারি না। বস্তুতঃ সরল অন্তরে ভাবিয়া দেখিলে আমাদের ন্যায় মানবে ও পশুতে অধিক পার্থক্য নাই বেশ বুঝা যায়।

এখন বুঝা গেল ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকারী না হইলে সে মানব নহে। এই যে পরিদৃশ্যমান বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এই যে চন্দ্র সূর্য্য-নক্ষত্রাদিযুক্ত সৌরজগৎ, এই যে ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম পঞ্চভূত, এই যে চরাচর জীবজন্তু পরিপূরিত অনন্ত প্রকৃতি, এ সকলই সেই চিদ্ঘন সচ্চিদানন্দের প্রতিকৃতি পরম ব্রহ্মের পূর্ণ বিকাশ। মানুষের চরম লক্ষ্য অনন্ত বিশ্বের চরম পঞ্চভূতময় ধবিত্রীর নিদান, যাহাদের জন্য চৈতন্য পাগল, নারদ উন্মত্ত, দেবাদিদেব মহাদেব সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, ইহা সেই অপার্থিব মহাধন। অনেক পুণ্যফলে, পূর্ব্বজন্মের অনেক কঠোর তপস্যার ভরে এ দুর্লভ মানব জন্ম লাভ হয়। এক জন্ম দশ জন্ম, শত জন্ম; সহস্র জন্ম, লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী জন্ম, অনন্ত লক্ষ কোটী জন্মে অনন্ত যোনি ভ্রমণ করিয়া অনেক পুণ্যে আমরা মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াছি। কাহাকে ফাঁকি দিব ভাই! ধর্ম্ম-দোষে অদৃষ্ট বশে যদি এ জীবন হেলায় যায়, মানবের সার সম্পত্তি এই মহা ধর্ম্মধনে যদি অধিকারী হইতে না পারি, তবে আবার কি ঘুরিতে থাকিব? আবার কি গোলোকধাঁধার মধ্যে পড়িয়া জীবনের সর্ব্বস্বধন নষ্ট করিব? তাই অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই ত এ সুধার আস্বাদ পাইয়াছি, তবে আবার বিস্মৃত হই কেন? অতল সাগরে একেবারে ডুবিলে রত্ন আর মিলিবে না। অতএব দিন থাকিতে সেই চরম দিনের সম্বল ভুলি কেন? আবার কি ঘুরিব? আবার কি কারাযন্ত্রণা ভোগ করিব? সে দিনের কথা কি স্মরণ নাই? যে দিন তুমি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই সর্ব্বারাধ্য পরম দেবতার কাছে বলিয়াছিলে, আমায় ক্ষমা কর, আর আমি তোমাকে ভুলিব

না, আর আমি নরকে ডুবিব না, আর আমি অবিশ্বাসী হইব না, আমায় রক্ষা কর—সেদিনকার কথা কি তোমার আর মনে নাই, মনে নাই কি এই নশ্বর দেহ ত্যাগের পর নিজ কর্ম্ম দোষেব আবার কোন্ অপবিত্র যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিলে এইরূপে আবার লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইবে? তাই বলি এমন দুর্লভ মানবজন্ম পাইয়াও আমরা আমাদের সার সম্পত্তি অকাতরে নষ্ট করিতেছি।

ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি তো চাই অধিকন্তু ইহ-জন্মেরও কতকগুলি কর্ত্তব্য কার্য্য আছে তাহাও পালন করিতে হইবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে স্মরণ কর, তিনিও মানুষ আর আমরাও মানুষ। কিন্তু তাঁহার মানব জীবনের মহত্ত্ব মনে কর দেখি? কি অলৌকিক শিক্ষা, কি অনির্ব্বচনীয় কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, কি অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান। তাহা স্মরণ করিলেও ভক্তিভরে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সেইরূপ পুত্র-রত্ন লাভ করিতে হইলে জননীরও আবার সেইরূপ অপূর্ব্ব গুণে গুণবতী হওয়া চাই। নারীজাতিকে যথারীতি নীতি শিক্ষা দেওয়া ও তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম-বলে বিশেষরূপ বলবতী করাও সকলের কর্ত্তব্য। পুরাকালেও শিক্ষা ছিল, আর এখনও সেই শিক্ষা আছে, কিন্তু হায়! কি ছিল আর কি হইয়াছে, ভবিষ্যতে আরও না কি হইবে! সেই শঙ্করজননীর শিক্ষার কথা স্মরণ কর আর এখনকার দিনের বিদুষীগণের শিক্ষা তুলনা কর! শঙ্কর সংসার আশ্রম ত্যাগ করিবেন, চিরজীবনের মত সন্ন্যাসী হইবেন, জননী পুত্রস্নেহে আত্মহারা—পাষাণভেদী করুণ ক্রন্দনে দিক্‌মণ্ডল কম্পিত করিয়া তুলিলেন। শঙ্কর মাতাকে বুঝাইলেন, তাঁহার ইচ্ছামত অঙ্গীকার করিলেন যে, মৃত্যু-কালে তিনি দেখা দিবেন—তাঁহার সদ্গতি করিবেন! যথাসময়ে অদ্বৈত-গুরু সংসার আশ্রম ত্যাগ করিলেন। এদিকে জননীরও শেষ দিন উপস্থিত হইতে লাগিল।

এইবার তিনি মনে মনে পুত্রকে ডাকিলেন। পুণ্যবতী মায়ের স্নেহ-তন্ত্রী কাঁপিবামাত্র পুণ্যবান্ সন্তানের প্রাণ বুঝিতে পারিল। শত যোজন দূরে সেই অকৃত্রিম স্নেহের মধুর আহ্বান-ধ্বনি পঁহুছিলে যোগবলে শঙ্কর বুঝিলেন, জননীর অন্তিমকাল উপস্থিত। যথাদিনে তিনি মাতৃসন্নিধানে উপনীত হইলেন। কহিলেন,—"মা! পুত্রের প্রতি এখন কি আজ্ঞা হয়? দেখিতেছি, অচিরাৎ তোমার এ নশ্বর দেহ ত্যাগ হইবে। মা ভাল এক্ষণে তুমি কোন্ লোকে যাইবে?" জননী কহিলেন "বাবা! আমি মর্ত্তলোকে থাকিয়া দেবলোকের মহিমা কি বুঝিব? তবে আমার সম্মুখে তুমি সেই অমরলোক আনয়ন কর দেখিয়া যথায় অভিরুচি হয়, আমি যাইব।" "তাহাই হউক মা" বলিয়া অদ্বৈত-গুরু যোগবলে মায়ের সম্মুখে শিবলোক আন-য়ন করিলেন। সেই সৌম্য পবিত্র, শান্তিময় পুণ্যাশ্রম দেখিয়া জননী আহ্লা-দিতা হইলেন। দরবিগলিত আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল, কিন্তু কহিলেন—"বাবা, এ অমর লোক কেমন একটু পৌরুষ-ব্যঞ্জক, বুঝি স্ত্রীজাতির থাকিবার এ আশ্রম নহে। তুমি অন্য লোক আনয়ন

কর।" "যথা আজ্ঞা" বলিয়া অদ্বৈত-গুরু এবার বিষ্ণুলোক আনয়ন করিলেন। তাহা দেখিয়া মায়ের স্নেহমূর্ত্তি অধিকতর প্রফুল্ল হইল। জননী সেই চিরশান্তিপূর্ণ আনন্দময় বিষ্ণুলোকে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পুত্রের আর আনন্দের সীমা নাই, তিনি জননীর শেষ কার্য্য তাঁহারই অভিপ্রায় মত সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইলেন। যথাসময়ে পুণ্যবতী শঙ্কর-জননী অনন্ত বৈকুণ্ঠলোকে প্রস্থান করিলেন, পুত্রের প্রাণ সুস্থির হইল। হায় এরূপ মাতা পুত্র এখন আর কোথায়? এমন শিক্ষা আর কোথায় দেখিব?

ভক্ত কবি তুলসীদাস কহিয়াছেন, সাধু সঙ্গ, নাম গান, দয়া, ভক্তি ও প্রেম এই পাঁচটী দ্রব্যই মানবের সার সম্পত্তি। প্রথম সাধুসঙ্গ, বস্তুতঃ এই সাধুসঙ্গ হইলেই মানুষের ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। সাধুর মাহাত্ম্য কত তাহা সাধুই জানেন। সংসর্গ-গুণে ও সংসর্গ-দোষে সংসারে অহরহ কতবিধ শুভ ও অকল্যাণ ঘটিতেছে তাহাত আমরা প্রত্যহ চক্ষের উপর দেখিতেছি। এই সংসর্গ-গুণে কত মহা পাষণ্ডের উত্থান ও এই সংসর্গ দোষে কত সাধু পুরুষের পতন হইতেছে, কে তাহার তত্ত্ব লয়? তুমি যত বড় সংযমী, সদাচারী ও ধর্ম্মপরায়ণ হও না, দর্প করিতে পার না যে, সংসর্গ-দোষে তোমার চরিত্র কলুষিত হইবে না! আর তুমি পতিত পাতকী, জগতের চক্ষে হেয়, তুমিও নিরাশ হইও না—সাধু সঙ্গ কর তোমার এ দিন থাকিবে না, তোমারও উদ্ধার হইবে। ভক্ত কবির আর একটী দোঁহা আছে,—তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, যখন জানকী-উদ্ধার হেতু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্র বন্ধন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন সমুদ্রদেব শ্রীরাম সমীপে আসিয়া নিবেদন করিলেন "হে প্রভু, তোমার চরণস্পর্শে ভববন্ধন ঘুচিয়া যায়, তুমি আবার আমাকে বন্ধন করিতে চাহিতেছ। হরি! লীলাময়, তোমার লীলা কে বুঝিবে বল। কিন্তু দেব। আমি তো কোন দোষে দোষী নয়,—আমাকে বন্ধন করিতে তবে তোমার অভিলাষ কেন?" শ্রীরামচন্দ্র উত্তর করিলেন, "তোমার দোষ নাই সত্য, কিন্তু পাপাচারীর সংসর্গে তুমি আছ, তোমার তীরে দুষ্ট দশাননের বাস তুমি তাহার প্রতিবাসী বলিয়া অগ্রে তোমার এই দণ্ড, তার পর সেই পাপাচারীর কথা।" বস্তুতঃ চোরের সহিত যথার্থ সাধু ব্যক্তি থাকিলেও তাহাকে সেই চোর-দলে ভুক্ত হইতে হয়।

ভগবানের নাম-গানে ইহলোকে পরম কল্যাণ ও পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। ভগবানকে যে যেরূপভাবে ডাকে, সে সেই মত ফল পায়। পৌরাণিক ইতিহাসে ইহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ভক্তের কাছে ভগবান্ ভক্তিডোরে বাঁধা। ভক্তের জন্য তিনি সকলই করিতে পারেন—ভক্ত তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান-মার্গের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মির অন্তরে ঈষৎ অভিমানের কণা প্রচ্ছন্নবেশেও থাকিতে পারে, জ্ঞানীর মনেও এইরূপ একটা দাম্ভিকতার স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তের চিত্ত নির্ব্বিকার—নির্ম্মল। ভক্ত চাহে মাটির সহিত আপনাকে মিশাইতে, অভিমান

বা আত্মশ্লাঘা ভক্তের মনে স্থান পায় না। বিশেষতঃ কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সাধনা অনেকটা আপনার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, স্বীয় পুরুষত্বের পরিচয় দেয়, কিন্তু ভক্ত ভাবে, আমি কিছু নহি, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আমি ধূলিকণা স্বরূপ, সকলই সেই সচ্চিদানন্দের ইচ্ছা—সকলই তাঁহার কৃপা। আমার কোন সামর্থ্য নাই, শক্তি নাই, আমি নিতান্ত দুর্ব্বল ও অক্ষম, ভগানের কৃপা ব্যতীত আমার উদ্ধার নাই। কর্ম্মী ও জ্ঞানী আপনার ভবে আপনি দাঁড়াইতে চাহেন, আপনার পুরুষত্বের পরিচয় দেন। ভগবানেব নামগান, পূজা, অর্চ্চনা, ভজন স্তুতি, প্রভৃতি ভক্তের ভক্তি সাধনা তাঁহাবা করিতে নারাজ। কিন্তু এই কর্ম্ম ও জ্ঞানের যদি কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয়, শাস্ত্র মতের যদি একটুমাত্র ইতস্ততঃ ঘটে, তবে তাহা সমস্তই পণ্ড হইযা যায়। কিন্তু ভক্তির মাহাত্ম্য বড়ই চমৎকার—বড়ই অদ্ভুত। ভগবান্‌কে বশীভূত করিতে এমন সহজ সাধনা আব নাই। অতএব ভাই, ভক্তির সাধনা কর, ভক্তি-স্রোতে প্রাণ ঢালিয়া দাও, আপনা বিস্মৃত হইয়া এই ভক্তিপ্রেমে তন্ময় হও। ফলের আশা করিও না, ফল আপনা হইতে পাইবে। এই পরা ভক্তি সাধনার চরম, অনন্ত বিশ্বের চরম এবং প্রাণী জগতের সার সম্পত্তি।

যে ভালবাসিতে জানে, ভালবাসা কি বুঝিয়াছে, সেইই পরাভক্তি লাভ করিতে পারিয়াছে। মুখের কথায় ইহা সংসাধিত হইব্যর নহে—প্রাণে প্রাণে মিলন পরকে আপনা হইতেও অধিক প্রিয়তম ভাবিতে পারিলে সেই মত কার্য্য করিতে পারিলে তবে তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলে। কিন্তু সেরূপ ভালবাসিতে পারে কয়জন? এমন যে ধ্রুব প্রহ্লাদ—এমন যে বলি অর্জ্জুন ধর্ম্ম জগতে যাঁহাবা প্রাতঃস্মরণীয়, তাঁহাদের ভালবাসাও নিষ্পাপ ভালবাসা নহে। এইস্থানে একটী কথা মনে পড়িয়া গেল। মহারথী অর্জ্জুনের মনে বড় অভিমান ছিল যে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বড় বালবাসিতেন। অন্তর্যামী দর্পহারী নাবায়ণ ইহা বুঝিলেন। দেখিলেন, ভক্তেব এ অভিমান দুরীভূত না কবিলে মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। একদিন তিনি অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইযা ভ্রমণচ্ছলে স্থানান্তবে চলিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাব ইচ্ছায এক মায়ানগব স্থাপিত হইয়াছিল। সেই নগরে উপস্থিত হইযা, তাঁহারা এক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বাটীতে অতিথি হইলেন। গৃহস্থও তাঁহাদিগকে যথা-যোগ্য অতিথি সৎকাব করিলেন। নর-নাবায়ণ অতিথি সৎকাবে তুষ্ট হইয়া বিশ্রামার্থ এক নির্দ্দিষ্ট গৃহে শয়ন করিতে গেলেন। দেখিলেন, গৃহটী মনোহর সজ্জিত, তদুপরি সুকোমল শয্যাটীও পবিষ্কাব পবিচ্ছন্ন। তদুপরি হৃষ্টচিত্তে শয়ন কবিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাঁহাদের মস্তকোপরি কোষমুক্ত তীক্ষ্ণ-ধাব চারিখানি অসি ঝুলিতেছে। ঐরূপ লম্বমান অসি চতুষ্টয় দেখিয়া তাঁহারা ভীত হইলেন এবং গৃহস্থকে ডাকিয়া ইহার রহস্য জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহস্থ উত্তরে কহিলেন,—"চারিজন পাষণ্ডের জন্য এই অসি চতুষ্টয় লম্বিত রহিয়াছে, সময়ে কার্য্যসিদ্ধি করিব।" উভয়ে কৌতু-হলী হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "সে চারিজন

পাষণ্ড কাহারা, জানিতে পারি কি ?” গৃহস্থ উত্তর করিলেন “প্রথম প্রহ্লাদ।” প্রহ্লাদের নাম শুনিয়া কৃষ্ণার্জ্জুন বিস্মিত হইলেন, বলিলেন “সে কি! এ কেমন কথা কহিতেছ? প্রহ্লাদ পরম ভক্ত তাঁহাকে কোন মুখে পাষণ্ড বলিতে সাহসী হইলে?” গৃহস্থ বলিলেন “পরম ভক্ত বলিব কিরূপে? যদি সে তাহার হরিকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিত তাহা হইলে দুর্দ্দান্ত হিরণ্যকশিপুকে বলিত না, হাঁ পিতা, সর্ব্বময় হরি এই স্ফটিকস্তম্ভের মধ্যেই আছেন। হিরণ্যকশিপু কত বড় বীর সে জানে, বিশেষ হরি তাহার পরম শত্রু, জানিয়া শুনিয়াও সে কি বলিয়া হরির সন্ধান বলিয়াছিল? না হয় তাহার তুচ্ছ প্রাণ যাইত।” শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন “ভাল দ্বিতীয় পাষণ্ড কে?” গৃহস্থ উত্তর করিলেন “ধ্রুব।” ধ্রুব? সে কি! সে যে পদ্মপলাশলোচনের জন্য পঞ্চম বর্ষীয় শিশু হইয়াও মরণ ভয় তুচ্ছ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিল। “সত্য বটে কিন্তু যদি রাজা উত্তানপাদ তাহাকে কোলে লইতেন; যদি বিমাতার বাক্যবাণে সে বিদ্ধ না হইত, তাহা হইলে ত আর পদ্মপলাশ লোচনকে সে ডাকিত না। রাজা হইব, এই তাহার অভিলাষ ছিল সুতরাং তাহার ভালবাসাও নিষ্কাম বলিতে পারি না।” শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ভাল তৃতীয় পাষণ্ড কে? “এ পাষণ্ড রাজা বলি।” সে যে পরম ভক্ত, আপন বক্ষ পাতিয়া সে যে বামনরূপী শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিয়াছিল। “সত্য বটে, কিন্তু সে কোন প্রাণে শ্রীকৃষ্ণকে কোটালবেশে দ্বারদেশে রাখিয়াছিল? শ্রীকৃষ্ণ নয় তাহার ভক্তিগুণে আপনিই উহা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কোন্ প্রাণে সেই পরমারাধ্য ভগবান্‌কে দ্বারিবেশে রাখিয়া আপনি সিংহাসনে উপবেশন করিল? এই কি তার ভালবাসা?” ভাল চতুর্থ পাষণ্ড কে? “সে পাষণ্ড পাণ্ডবকুলের মহারথী অর্জ্জুন।” এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন—“একি কথা শুনিতেছি! ভাল, এ রহস্যও দেখা যাক। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—“অর্জ্জুন পাষণ্ড কেন? সে তো কৃষ্ণসখা! “কৃষ্ণসখাই বটে! যদি সে কৃষ্ণকে আন্তরিক ভালবাসিত, তাহা হইলে আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কৃষ্ণকে সারথী সাজাইয়া আপনি রথোপরি বসিত না। শ্রীকৃষ্ণ না হয় নিজেই এ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কোন্ প্রাণে প্রাণসখাকে সারথী সাজাইয়া আপনি রথে বসিল? বিপক্ষপক্ষের অগ্নিবাণ আসিলে অগ্রেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইবার সম্ভাবনা। কারণ, সারথীকে অতিক্রম না করিয়া আর রথীর অঙ্গে ঐ বাণ বিদ্ধ হইতে পারে না। এই কি সখ্যের চিহ্ন? ইহারই নাম কি ভালবাসা? অর্জ্জুন পাষণ্ড নহে তো কি?” তখন অর্জ্জুন মনে মনে সমস্তই বুঝিলেন। চক্রীর মায়াজাল অবগত হইলেন। মনে মনে আত্মধিক্কার করিয়া সখার নিকট বিশেষ লজ্জিত হইলেন। তাই বলিতেছিলাম, এমন যে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বলি, অর্জ্জুন— ইঁহাদের ভালবাসাও নির্ম্মল নহে, এই প্রাতঃস্মরণীয় ভক্ত চতুষ্টয়ের ভক্তিও পরাভক্তি নহে। ইহার উপর ভালবাসার আর একটী স্তর আছে। দীন, দুঃখী, আতুর ব্যথিতজনে প্রাণান্ত পণে

ভগবানকে ডাকিলে সেই সেই পরাভক্তি লাভ করিতে পারে।

সাধারণতঃ দুর্ব্বলের প্রতি ভগবানের করুণা অসীম। পাঞ্চালনন্দিনী দ্রৌপদী যখন দুর্ব্বাসার আতিথ্য সৎকারে অক্ষম হইয়া দ্বারকানাথ দ্বারকানাথ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিলেন, শ্রীকৃষ্ণ দর্শন দিলেন এবং তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেনও বটে, কিন্তু দ্রৌপদী যখন ভক্তি ও অভিমানভরে কহিলেন, "দয়াময় নিজগুণে সেই দয়া করিলে, কিন্তু এত বিলম্ব হইল কেন ঠাকুর! ডাকিয়া ডাকিয়া আমার প্রাণ যে কণ্ঠাগত হইয়া আসিয়াছে।" শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "সখি, তুমি আমাকে দ্বারকানাথ দ্বারকানাথ বলিয়া ডাকিয়াছিলে, কিন্তু দয়াময় বিপদ ভঞ্জন বলিয়া ত ডাক নাই। সখি! দ্বারকানাথ বলিয়া ডাকিয়াছিলে, কাজেই বিলম্ব হইয়াছে দ্বারকা এখান হইতে যে অনেকদূর সখি! যে ভাবে ডাকিয়াছ আমি সেই ভাবেই তোমাকে দেখা দিয়াছি।" বস্তুতঃ ভগবানকে ভক্ত যেমন ভাবে চাহে, সেই ভাবে তিনি তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। দুর্ব্বল দীন আতুরের প্রতি তাঁহার এই জন্য এত করুণা, প্রকৃত ভক্তের প্রতি এই জন্য তাঁহার এত দয়া। এই ভক্তি প্রেমে তন্ময় হইয়া গোপবধূ একদিন উন্মত্তা হইয়াছিলেন। বংশীধারী কালার প্রেমে পড়িয়া তাঁহারা কুলমান বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই ভক্তির আকর্ষণে একদিন স্রোতস্বতী যমুনা তাহার স্বভাব গতি রোধ করিত, প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটিত। এই ত ভক্তি এই ত ভালবাসা! এই ত প্রেম, এই ত ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণ। এমন সার্ব্বভৌমিক ভালবাসা ও পরাভক্তি যিনি লাভ করিয়াছেন, নরবেশে তিনি দেবতা। এই পরাভক্তিই জগতের সার চরাচর বিশ্বের প্রাণ এবং মানবের সার সম্পত্তি।

শম্ভু-সংবাদ।

(৩)

একটা বড় বিপদ ঘটিল। শম্ভু আর সময়ে নায় না, সময়ে খায় না, ভাল করিয়া কথা কয় না, লোকের সঙ্গে মিশে না। শম্ভু কি কার্য্য করিতে কি কার্য্য করে, কি কথা বলিতে কি কথা বলে—কি বুঝিয়া আপনমনে কখন বা কোন নিভৃত স্থানে বসিয়া থাকে, কখন পাদচারণে কোথা হইতে কোথায় চলিয়া যায়।

শম্ভু শ্বশুরের মনে উদ্বেগ তুলিয়া সুশীলার প্রাণ কাঁদাইয়া আদরের ধন নলিন নলিনীর তরল চোখচতুষ্টয়ে ফেল-ফেলত্ব আনাইয়া, শ্বশুরের গৃহে বসিয়া বসিয়া কৃষ্ণপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন মলিন হইতে লাগিলেন। কারণ কি? শম্ভুর শ্বশুর কন্যা সুশীলা সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা সুশীলে! শম্ভু বাবুর এ অদ্ভুত ভাবপরিবর্ত্তনের কারণ কি?" সুশীলা কোনও উত্তর করিলেন না। কেবল ধারাবর্ষণোন্মুখ নয়নযুগলে বাপের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন। আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা স্বামীর এ অদ্ভুত ভাবপরিবর্ত্তনের কারণ কি?" শম্ভুর শাশুড়ী শম্ভুর শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁগা! জামাইয়ের আমার এমন হইবার কারণ কি?" উত্তর পাইলেন না—তখন কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—উত্তর পাইলেন না। নিরুপায় হইয়া নলিনীর হাত ধরিয়া ভাবনার অকূল পাথার অভিমুখে চলিয়া গেলেন। তখন ভৃত্য দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, দাসী সুশীলার পিসীকে বলিল, পিসী পাড়াপড়সীকে সুধাইল—"কারণ কি?—শম্ভুর এ ভাবপরিবর্ত্তনের কারণ কি?" পাড়াপড়শী দিবানিশি সেই কথার জল্পনা করিতে লাগিল—কারণ কি? কারণ কি? ওদের বাড়ীর জামাইয়ের এই অদ্ভুত ভাবপরিবর্ত্তনের কারণ কি? আসল কথা—শম্ভুর মনের অবস্থা এখন কেমন এক রকম হইয়াছিল—কেমন এক রকম সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইয়াছিল। আমরা অতি ঐশ্বরিক অন্তর্দৃষ্টিবলে শম্ভুর হৃদয় মধ্যে যদি প্রবেশ করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে হয়ত পাড়াপড়শী মাসী পিসী কাটি-কপাসীর সঙ্গে "কারণ কি, কারণ কি" বলিয়া জিজ্ঞাসায় প্রতিজিজ্ঞাসায়—লম্বা চৌড়া ধ্বনিরসালঙ্কারশোভনা ভাষায় টানিয়া টানিয়া অনন্তায়মানা করিয়া তুলিতাম। তখন কে কত লিখিত, কে কত পড়িত—আর কে কত সমালোচনা করিত।

যথার্থই শম্ভুর ভাববিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। আগে শম্ভু উপযাচক হইয়া লোক ডাকিয়া হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেন—বাড়ীর কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া চাকর দাসীটী পর্য্যন্ত তাঁর কথায় মিষ্টতা পাইত। এখন শম্ভুর কাছে যাইয়া, "শম্ভু বাবু শম্ভু বাবু" বলিয়া, শতবার চেঁচাইয়া, হাঁকাহাঁকি করিয়া,

ডাকাডাকি করিলেও শম্ভু বাবুর কথা নাই। বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, চোখ রাঙাইয়া রুষিয়া রুষিয়া মুখ ফিরাইয়া শম্ভু ভাব-সাগরে ডুবিয়া যাইতেন। স্বামীগতপ্রাণাসুশীলাগতপ্রাণ শম্ভু দুই দিনে যেন আলাদা মানুষ হইয়া গেলেন।

তখন শম্ভুর শ্বশুরশ্বাশুড়ী—কর্ত্তা-গিন্নিতে ঝগড়া আরম্ভ হইল। গিন্নী কর্ত্তাকে বলিলেন, "তুমিই আমার অমন সোণার চাঁদ জামাইকে পাগল করিলে—তুমি যদি দুইবেলা মেয়েটার অদৃষ্টের নিন্দা না করিতে—যদি বাছাকে আমার শুনাইয়া শুনাইয়া মেয়েটাকে যা মুখে আসে তাই না বলিতে, তা হ'লে বোধ হয় বাছার আমার এমন অবস্থা হ'ত না। তোমার আর কিছুতেই আশা মিটিল না। খাবার পরবার সংস্থান আছে—তবু বাছার উপার্জ্জন না খাইলে তোমার আর পেট পূরিল না। তাই শান্ত শিষ্ট বাছাকে নিশ্চিন্ত হইয়া দুমুটা ভাত খাইতে দিলে না। মেয়ের নিন্দা বাছার আমার সহ্য হয় না। কাজেই সুশীলার কষ্ট দেখিয়া শম্ভু আমার ভাবিয়া ভাবিয়া কি রকম হয়ে গেছে।" প্রতিদিনই ঝগড়ার প্রারম্ভে দুই একবার ফোঁস ফোঁস সমীরণ-প্রবাহ ও গভীর গর্জ্জন এবং ঝগড়া-শেষে দু চার ফোঁটা বারি-পাত হইত। কাজেই কর্ত্তা দিন দিন বড় বিপন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কর্ত্তা দেখিলেন—জামাতৃ-প্রবোধন-হলচালনে তাহার অদৃষ্টক্ষেত্রের নবাঙ্কুরিত আশা-লতা বুঝি মাথা তুলিতেই হাজিয়া যায়। তখন আর অন্য উপায় না দেখিয়া সুশীলাকে "কটুভাষিণি, স্বামীর মর্ম্ম বুঝিলি না—কি বলিতে তারে কি বলিলি" বলিয়া দুটা তিরস্কার করিলেন। পিতৃ-তিরস্কৃতা সুশীলা অদৃষ্ট ভাঙিয়াছে বুঝিয়া তিরস্কারে তিরস্কারে হতভম্ব তনয়-তনয়াকে গোটা দুই চাপড় মারিয়া ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। বালকবালিকা কাঁদিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিল—বাড়ীতে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল।

শম্ভু এখন কোথায়? শম্ভু এখন বাড়ী নাই। ভাবিতে ভাবিতে, চলিতে চলিতে, প্রান্তরসাগরগত কর্ণওয়ালিস-ধূলিশীকরসেবিত শম্ভু ধর্ম্মতলায় যাইয়া হাজির হইয়াছিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। রাজশ্রীচরণপ্রসেক—পবিত্র-তৈলপ্রসবি পরঙ্গের ঘ্যাঁ ঘোঁ শব্দের ভায়রাভাই গোশকটচক্রশব্দ সে দিনকার মত সূর্য্যের সঙ্গে প্রকৃতির কোলে মিলাইয়া গিয়াছিল। থাকিবার মধ্যে ছিল ইডেনোদ্যান কিম্বা প্রান্তরগন্তকাম সাহেবদম্পতির শকটচক্রের শ্রুতিসুখকর গড়গড় শব্দ আর গাড়ীর পশ্চাৎ দিকের সহিস প্রভুর 'এ—এ—ই—মাগী' নিদ্রা-কর্ষিণী কথামালা। আর কি কিছু ছিল না? আমার ত বোধ হয় আর কিছুই ছিল না। প্রকৃতির যত শোভা তখন ডগ্‌কার্ট, ব্রুহাম, ট্যাণ্ডমের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। কেননা শম্ভুর সেই ক্রিয়া-কলাপদর্শী আমার কোন বন্ধু ঘটনাক্রমে সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, শম্ভু বাবুর মত কে যেন একজন গাড়ী ও গাড়ীর ভিতর কি দেখিতে দেখিতে কিম্বা কি যেন দেখিবার জন্য হাঁ করিয়া পথ চলিতেছে। এমন সময় একখানা জুড়ী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া শম্ভুর ঘাড়ে পড় পড় হইল। "হাঁ হাঁ—গেল গেল—এইও এইও—ড্যাম নিগার।"

ঘোঁড়ার মুখ ফিরিয়া গেল—অশ্বপৃষ্ঠলক্ষ্যে উত্তোলিত একটা চাবুক শম্ভুর পৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। শম্ভুর চমক ভাঙিল। তখন আমার বন্ধু গাড়ি হইতে নামিয়া, শম্ভুর হাত ধরিয়া, তৎপথচারী পথিকগণের টিট্‌কারীর মধ্য দিয়া তাহাকে লইয়া গাড়ীতে তুলিলেন। গাড়ী গড় গড়—ঘড় ঘড়—, ছ্যাকড় ছ্যাকড় করিতে করিতে শম্ভু ও আমার বন্ধুকে নাচাইতে নাচাইতে শম্ভুর শ্বশুর বাড়ী যাইয়া পৌছিল। শম্ভু গাড়ী হইতে নামিয়া শ্বশুর বাড়ীর সদর দরজার রোয়াকে থপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। বন্ধু শম্ভুকে রাখিয়া সেই গাড়ীতেই চলিয়া গেলেন।

স্বামীর আগমন-সংবাদে আকুলান্তরা কিন্তু অনুতাপবিদগ্ধা সুতরাং রোরুদ্যমানা সুশীলা বাহিরে আসিয়া স্বামীর চবণ প্রান্তে লুটাইলেন। শ্বশুর ঘরে বসিয়া কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। শাশুড়ী জামাতার অবস্থা দেখিয়া নিজের কন্যার দুরদৃষ্ট বুঝিয়া পরলোকগতা জননীর উদ্দেশে রন্ধনশালায় বসিয়া কাঁদিলেন। (অবশ্য ধোঁয়ার ছলনে নয়—চিমনির ও কোক কয়লার কৃপায় গৃহস্থের রান্নাঘর এখন ঝক্ ঝক্ করে) পিসশাশুড়ী কি করিয়াছিলেন শুনি নাই। নলিন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নলিনী এখনও ঘুমায় নাই। সে মায়ের পাছু পাছু বাপের কাছে আসিয়া জননীকে ভূপতিতা দেখিয়া কি ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া সুশীলার অঞ্চল ধরিয়া টান দিল। তনয়াকৃষ্টা সুশীলা দাঁড়াইয়া স্বামীকে বলিলেন "নাথ! আমি তোমার স্ত্রী, দাসী, শিষ্যা, স্বামীর মঙ্গলাভিলাষিণী—কথা কহিতে না জানায় কি বলিতে কি বলিয়াছি। না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি। তোমার মঙ্গল হইবে বিবেচনায় তোমায় তুষ্ট করিতে গিয়া অপরাধ করিয়াছি। জ্ঞানকৃত অপরাধেরও প্রায়শ্চিত্ত আছে। আর আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই। স্বামি! প্রভু! গুরু! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।" সুশীলার লোচনজল শম্ভুর চরণস্পর্শ করিল।

এতক্ষণ শম্ভু নীরব ছিলেন। শম্ভুর চিন্তা, শম্ভুর হৃদ্গত কথা-কুসুমরাশিকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। পরাস্ত হইয়া, বালিকার কোমল কণ্ঠকম্পনদর্শনে লজ্জিত হইয়া, তাহাদিগকে ভুজপাশ হইতে ছাড়াইয়া দিল। ছাড় পাইয়া তাহারা নবোঢ়া বালবধূগণের সভয়চরণ-বিক্ষেপে, সুশীলার কর্ণকুহররূপ শ্বশুর-ভবনে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সুশীলার বিষাদমাখা মুখ দেখিয়া, শোকাবেগ-সঞ্জাত-সলিলধারাপ্লুত হৃদয়-তরঙ্গের উন্নতি অবনতি দেখিয়া—চঞ্চল চাহনির আধার নয়ন দুখানির ছলছলানি নিরীক্ষণ করিয়া, শম্ভুর পরাণ আকুল হইয়া উঠিল।

তখন শম্ভু শ্রাবণজলদরূপিণী অমৃতময়ী ভাষায় সুশীলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন

প্রিয়ে! তুমি সে আমার গতি
তোমারই কারণে কাব্য তত্ত্ব লাগি।
শ্বশুর ভবনে স্থিতি।
শুনলো প্রেমের কুঞ্জ
ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইল শম্ভু।
সুশীলার রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়

না দেখিলে মন হয় উচাটন
হেরিলে দ্বিগুণ দায়।
তোমারই যাজন ত্রিসন্ধ্যা পূজন
তুমি সে গলার হারা।
তুমি রাধারাণী অনঙ্গ-মোহিনী
তুমি সে জননী তারা।

সম্বোধনের ঘটা ও কাব্য কথার ছটা শুনিয়া সুশীলার বক্ষ ফাটা ফাটা হইল। কিন্তু তাঁর সে অবস্থা দেখে কে—তাঁর বক্ষালোড়নোদ্ভূত, নাসিকা প্রদেশ দিয়া সশব্দ বহির্গত দীর্ঘ শ্বাস শুনে কে? শম্ভু এখন সুশীলাময়। শম্ভু পদ্য ছাড়িয়া গদ্য ধরিলেন। "কি বলিলে সুশীলে! তোমার অপরাধ! তুমি যদি আমার কাছে অপরাধী, তাহা হইলে আমার মত পাপী কে আছে? কে এমন পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, পুত্রঘ্ন আছে যে আমার মত পাপী? সুশীলে, সুশীলে! কে বলে তুমি আমার স্ত্রী? তুমি কি কেবল আমার স্ত্রী? তুমি আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা—

"ওমা! কি হ'ল গো! জামাইয়ের কেন এমন হ'ল গো! শম্ভু আমার এমন কেন হ'ল গো—দাদা গো"—কপাটের অন্তরাল হইতে সকরুণ চীৎকার উঠিল। গাভী মুখকবলিতপত্রা কদলীর মত সুশীলা ভূপতিতা হইলেন।

কপাটের অন্তরাল হইতে শম্ভুর পিস্‌শাশুড়ী বাহির হইয়া, শম্ভুর সম্মুখে ভূমিপতিতা, বিগতচেতনা সুশীলাকে তুলিতে তুলিতে বলিতে লাগিলেন, "কি কল্লি বাবা শম্ভু! কি বল্লি বাবা—তোর মুখে এমন কথা কখন শুনিনি যে রে বাবা—বাবা শ-ম্ভু" পিসির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তখন একজন ভৃত্য এক ঘড়া জল লইয়া ছুটিয়া আসিয়া শম্ভুর মাথায় ঢালিয়া দিল। ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া, শম্ভুর কি বলিতে বলিতে বলা হইল না। রজনী সুন্দরী শম্ভুর রঙ্গ দেখাইবার আর লোক পাইলেন বলিয়া উদয়-সাগরের জল হইতে চাঁদকে টানিয়া আকাশে তুলিলেন। ঘড়ীতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল।

(৪)

শম্ভু কল্পনাদেবীকে জোড়ামহিষ আনিয়াছিলেন। তবে নাকি বাঙ্গালী লেখকরূপী কালাপাহাড়ের দৌরাত্ম্যে কল্পনা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে, আঘাতের পর আঘাতে মন্দির চূর্ণ হইয়া কতকগুলা আবর্জ্জনাময় লতাগুল্মের আধার হইয়াছে—তাই রক্ষা। অনাহার-ক্লিষ্টা শয্যায় চিরশায়িতা রোগিণীর মত কল্পনা সুন্দরী সাগুদানা, মিশ্রি—এখন জলটুকু পর্য্যন্ত ও নাকি জীর্ণ করিতে অক্ষম তাই রক্ষা। শম্ভুর শ্বশুর তাঁহার স্ত্রী, কন্যা পুত্রের ভরণ-পোষণ-ভার বহন করিয়া (অবশ্য শম্ভুর কথা ধরি না। শম্ভুকে কন্যা দান করিয়া শম্ভুর শ্বশুর এই যে তাঁহার স্বাধীনতায় জীবনপ্রসারী হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তার জন্য দায়ী কে?) আবার শম্ভুর মহিষের পয়সা দিতে পারিতেন এমন ত বোধ হয় না। কাজেই শম্ভু ঋণী হইয়া হয়ত ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া জেলে যাইতেন তাহা হইলে? তাহা হইলে বন্ধু বান্ধবের বিপদে বাঙ্গালী যাহা করিয়া থাকে—সেই নিশ্চিতানুষ্ঠিত কর্ম্ম—বন্ধুকে বিপদে ফেলিয়া পলায়ন। শম্ভু যদি যাইতেন

জেলে, তাহা হইলে তারে ফেলে লেখক, পাঠক, শ্রাবক, ধারক, স্তাবক, বিদূষক কোথায় যাইত তা কে বলিতে পারে?

মহিষের প্রত্যাশা না করিয়াই কিন্তু কল্পনাদেবী শম্ভুকে মানসিক টেলিগ্রাফে দুইখানি ছবি পাঠাইয়া দিলেন। কাল্পনিক পত্রচ্ছদ খুলিতে না খুলিতেই শম্ভু দেখিলেন—দুটী অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। তাহারা প্রতিশয়িত হইয়া তাঁহার মস্তিষ্ক দখল করিয়া ফেলিল। তাহার একটী হইল নায়ক, অপরটী নায়িকা। পাঠক পাঠিকারা অবশ্য দুঃখিত হইবেন কিন্তু কি করিব, আজও পর্য্যন্ত পাঠক পাঠিকার কথা শম্ভু মনেও আনেন নাই।

(৫)

মানবের দৃষ্টির বহুদূরে, শম্ভুর মস্তিষ্কদেশের এক নিভৃত প্রান্তরে নায়ক নায়িকা বসিয়াছিল। অগণ্যতারকা-সনাথ নীল আকাশের তলে, চিন্তাতরঙ্গিণী কুলকুল করিয়া সেই প্রান্তর প্রদেশ দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। নায়িকা পা ছড়াইয়া বসিয়া এক দৃষ্টে বন্ধুরা তরঙ্গিণীর তরঙ্গ-ভঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছিল। নায়ক পদ্মপলাশলোচনা পার্শ্বগতা সহচরীর মাধুরীভরা মুখখানির দিকে চাহিয়াছিল। যতক্ষণ না পলক পড়িতেছিল ততক্ষণ নায়ককে চিত্রার্পিতের ন্যায় দেখাইতেছিল। পলকেই শুধু জীবনের অস্তিত্ব লক্ষিত হইতেছিল। নায়িকা কিন্তু ক্ষোদিতা মর্ম্মরমূর্ত্তির ন্যায় স্থির, চক্ষু পলক হীন।

নায়িকার মুখ দেখিতে দেখিতে নায়কের মুখ ফুটিল। নায়ক বলিল "ভাই "নায়িকে।"

নায়িকার প্রাণের নীরবতায় দুপ দুপ করিয়া ঘা পড়িল। নায়িকা মুখ ফিরাইল। চারি চক্ষুর মিলন হইল। নায়িকা মৃদু হাসিয়া লজ্জানতমুখী—কথা কহিল না। নায়ক আবার বলিল "ভাই নায়িকে" উত্তর পাইল না। তখন চিবুক ধরিয়া নায়িকার মুখ তুলিয়া, চোখের উপর চোখ রাখিয়া নায়ক আবার বলিল "ভাই নায়িকে।"

সমীরোত্তোলিতা অতসীর ন্যায় আবেশকর বলপ্রয়োগে সোহাগভরে মুখ নামাইয়া নায়িকা বলিল "কি ভাই নায়ক।"

নায়ক। হাঁ ভাই! শম্ভুকে লইয়া কি করা যায়?

নায়িকা। কি জানি ভাই।

নায়ক। তুমি না জানবে ত কে জানবে ভাই!

নায়িকা। তুমি ভাই।

নায়ক। আমিই যদি ভাই, তবে বলি শুন। এই যে কল্পনাদেবী শম্ভুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমাদের পাঠাইয়া দিলেন তা আমরা আসিয়া শম্ভুর নীরস মস্তিষ্কে বসিয়া বসিয়া করিব কি? এখানে আছে কি, না আছে গোলাপ মল্লিকাদি-শোভিত কুঞ্জকানন—ফুল পরিমলাঙ্গরাগ কুঞ্জবন—বসি কোথায়? না আছে লীলাকমলালয়া তরলতরঙ্গ-ভূষণা সরসী—না আছে তটভঙ্গ-রঙ্গময়ী ফেনিলসলিলা কল্লোলিনী—ভাসি কোথায়? না আছে প্রাবৃট্-জলদস্পর্শী জলদবরণাঙ্গ শুভ্রচূড় শৈল—উঠি কোথায়?

নায়িকার মুখকমল উষার শশাঙ্কের ন্যায় কি একটা অনাগত দুঃখের আগমনাশঙ্কায় অলক্ষ্য পরিবর্ত্তনে মলিন হইয়া গেল। নায়ক তাহা দেখিল না। আবার বলিল—"ভাই! নায়িকা! অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া কল্পনার কথায় এখানে

আসিয়া ভাল করি নাই। এমন স্থান কই, যে তোমায় আমায় হাত ধরাধরি করিয়া, ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ সুনীল ব্যোমগঙ্গা-জলে তারকা-মণ্ডলমধ্যে চিত্রাচন্দ্রমার ধীর সন্তরণ নিরীক্ষণ করিব। এমন গান কণ্ঠ পঞ্চম-সংবাদী সমীরণনিস্বনে সুর মিলাইয়া গাহিয়া গাহিয়া নিশীথনীরবতা ভঙ্গ করিব।

নায়িকার চক্ষে জল আসিল। দুই একটী বিন্দু অপাঙ্গ ছাড়িয়া গণ্ডে পড়িল। সেই জঙ্গম মুক্তাফলকে আলোক প্রতি-বিম্বিত হইয়া, নায়কের চক্ষু দিয়া রন্ধ্রে প্রবেশ করিল "ওকি ভাই নায়িকা তুমি এখনি কাঁদ্‌চ!"

নায়িকা। কি করি ভাই! তোমার কথা শুনে চক্ষুজল রাখিতে পারিতেছি না। তবে কি ভাই শম্ভুর জীবন নিষ্ফলে যাইবে! এত সাধনা করিয়া শম্ভু আমা-দের আনিয়া মস্তিষ্কে স্থান দিল, এমন সাধক শম্ভুকে ছাড়িয়া যাইব কোথায়? কে আমাদের এত আদর করিবে? কে আমাদের যত্ন করিয়া বসাইয়া আশাবারি নিষেকে আমাদের দেহের জড়তা দূর করিবে। কে আমাদের বিধবার ধনের মত, কাকবন্ধ্যার নন্দনের মত, বিদুষীর রুচির মত, কুলবতীর লজ্জার মত বুকের জিনিস বুকে রাখিবে। গ্রাডুয়েটের ডিগ্রীর মত, পাচক ব্রাহ্মণের জুতার মত শিকায় তুলিয়া রাখিবে—ভূমিতে নামাইবে না। কবির দুঃখের মত, ডেপুটীর গর্ব্বের মত, নদীর জলের মত, কলিকাতার অন্তর্নিহিত নলের মত, বঙ্গের জ্বরজ্বালার মত আমাদিগকে জীবনের সাথী করিয়া রাখিবে—প্রাণান্তে ছাড়িবে না। চোখে চোখে রাখিতে, প্রাণে প্রাণে মাখিতে শম্ভুর মত আর কে আছে? এই সাগর-মেখলা ধরণী মধ্যে আর কে আছে, শম্ভুর মত আমাদিগকে সোণার চক্ষে দেখিবে, আজন্মযত্নরক্ষিত কথা সুধাধারে আমাদিগের তর্পণ করিবে। দেখাইয়া দাও, আর কোথায় এমন নিঃস্বার্থ ভাল-বাসা—বলিয়া দাও—এমন প্রেমিক আর কোথায় আছে—যাহার কাছে এমন আদর, এমন যত্ন, এমন সুখ পাইব। বল—এখনি শম্ভুকে ছাড়িয়া তোমার হাত ধরিয়া তাহার ঘরে যাই। কিন্তু ভাই নায়ক! আমার বিশ্বাস জগতে এমন ঠাঁই আর নাই।"—নায়িকার বুক ভাসাইয়া চক্ষুজল গড়াইয়া গেল। নায়ক পকেট হইতে ল্যাভেণ্ডারগন্ধী রুমাল বাহির করিয়া, নায়িকার মুখ চোখ মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "ওকি! তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমি কি শম্ভুকে ছাড়িয়া যাইবার কথা বলিতেছি? নায়ক মিথ্যা কথা কহিল। প্রেমিকার মন-স্তুষ্টির জন্য মিথ্যা কওয়ায় দোষ হয় না। কেননা সরলা নায়িকা, এই কথাতেই আশ্বস্তা হইল—চোখের জল শুকাইল—মুখে হাসির ক্ষীণরেখা দেখা দিল। সেই কোমল হাসি-আকৃষ্ট হইয়া নায়কের মন ফিরিয়া গেল।

নায়ক মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—শম্ভুকে ছাড়িয়া যাইবার কথা বলি নাই। যখন আসিয়াছি, তখন ভালই হ'ক আর মন্দই হ'ক, শম্ভুর ঘরেই বাস করিব। আর যাইবই বা কোথায়? আমাদের মনোমত স্থান এদেশে কোথায় আছে? এখানে শম্ভু সেখানে নিশম্ভু—এখানে সিন্ধা, সেখানে

কারিবডিস্‌। শম্ভুর তবু খোড়ো ঘর, অন্ত স্থানে মাঠ—শম্ভুর কাছে ভাঁড়ে জল, অন্তের কাছে ঘাট। না নায়িকে! কোথাও যাইব না। শম্ভুর ঘর ছাড়িয়া এক পাও বাড়াইব না—শম্ভু যদি নিজেও আমাদিগকে ছাড়িতে চায়, আমরা শম্ভুকে ছাড়িব না।"

চিন্তা-স্রোতস্বতী-বক্ষে কতকগুলি সুন্দর তরণী ভাসিতেছিল—তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতেছিল—কিন্তু একটীতেও কাণ্ডারী ছিল না। সকলের গায় সুবর্ণাক্ষরে নাম লেখা ছিল—মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, চম্পু, বড়, মাঝারী, ছোট;—উপন্যাস, রহোন্যাস, নবন্যাস—সুসজ্জিত, আধবাহারে, নেড়া; নানাপ্রকারের তরণী। কবিতা, স্বনিতা, ভণিতা—ফলধরা, ফুলেঘেরা, জলেভরা;—নাটক, প্রকরণ, ভান, ঈহামৃগ—লাল, নীল, পীত—নানাবর্ণের তরণী। লম্বা, চৌড়া, চেপ্টা, গোল নানা গঠনের তরণী। কাহারও শুধু দাঁড় কাহারও বা হাল, কাহারও কেবলমাত্র পাল। কেহ হেলিতেছে, কেহ দুলিতেছে, কেহ ঘুরিতেছে—আবার কেহ বা সমীরণপ্রহৃত পালের ভরে টাল খাইতেছে। টেঁরা, বাঁকা, ফাঁকা, ঝগঝগে, রগরগে নানা জাতীয় নৌকা তটিনীবক্ষে ভাসিতেছিল। দেখিতে সকলই চমৎকার—কিন্তু একটীতেও নাবিক ছিল না। নায়ক আর কোনও কথা না বলিয়া নায়িকার হাত ধরিয়া তাহাদিগের একটীতে উঠিয়া বসিল। তখন "সিন্ধুকূলে রই, নূতন তরী বই; পারে তোরা কে যাইবি গো!"—অকূলসাগরে, ভাসমান বাঙ্গালী পাঠক, কূল পাইবার জন্য সেই তরণী উদ্দেশে ছুটিল। কিন্তু সেই কাছে গিয়া শুনিল—"দান দিবে যেই পার হবে সেই"—অমনি

যে পথে যাইয়া শ্যামরায়
আনিতে গিছিল রাধিকায়
সে পথে আয়ানে দেখে
মনের দুঃখ মনে রেখে,
ফিরে, ঝাঁপ দিল যমুনায়।

প্রাকৃতিকবিজ্ঞান।

৮। শব্দ-বিজ্ঞান।

শব্দোৎপত্তি, শব্দবিস্তার ও শব্দবোধ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যাইবে, সকলি শব্দবিজ্ঞানের অন্তর্বর্ত্তী।

শব্দশীল বস্তুমাত্রই বাতাসে অথবা সাধারণতঃ বাতাস ও আমাদের মধ্যে যে ব্যবধান, সেই ব্যবধানে যাতায়াত গতিবিধান করে। এই গতিকে কখন হেলন বলা যায়, কখন দোলন, কখন বা প্রকম্পন বা স্পন্দন বলা যায়।

যখন কোন বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রী অঙ্গুলি স্পর্শন দ্বারা প্রকম্পিত হয়, বাতাস ক্রমে পরে পরে তাহার সেই গতি প্রাপ্ত হয়; বাতাস সেই গতিকে আবৃত্তি করে—ওতপ্রসারিত ভাবে আবৃত্তি করে না

কিন্তু সেই নিয়মিত কালের মধ্যে আবৃত্তি করে,—বাতাস ঐ গতিকে আবার কর্ণপটাহে সঞ্চারিত করে, কর্ণপটাহ উহাকে শ্রবণ-ধমনীতে প্রচার করে। এইরূপে দেখ, বাতাসের মধ্যস্থতাতে শ্রবণধমনীর ও স্পন্দ তন্ত্রীর যোগাযোগ রক্ষিত হয়। ইহা দ্বারা শ্রবণ-ধমনী যেন ঐ তন্ত্রীর সহিত এক ভাব ধারণ করে, উহার সর্ব্বপ্রকার গতির ভাগী হয়। তন্ত্রী মুহূর্ত্তে শত বা সহস্রবার স্পন্দন করিলে ইহাও ততবার স্পন্দন করিবে এবং তন্ত্রীর বিশ্রামস্থান হইতে স্পন্দনের অধিকতর বা অল্পতর প্রসার্য্যতানুসারে ধমনীও অধিক বা অল্প প্রসরে স্পন্দিত হয়।

শব্দে আমরা দুই প্রকার ঘটনা দেখিতে পাই—এক স্বনবান্ পদার্থের ও বাতাসের স্পন্দন, এবং দ্বিতীয়, ইহার ফল স্বরূপ শব্দজ্ঞান। যদিও আসলে শব্দজ্ঞানকেই শব্দ বলে, পরন্তু ইহা কারণেও অর্থে অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বাহিরে যে স্পন্দনশীল গতি হয় তাহাকেও শব্দ বলে।

শব্দের তীক্ষ্ণতা শ্রবণধমনীর স্পন্দনের প্রসার্য্যতার উপর নির্ভর করে, সুতরাং মূলে বাহিরের শব্দায়মান পদার্থের প্রকম্পন-প্রসারতার উপর নির্ভর করে। শব্দের তারতা ও মন্দ্রতা স্পন্দন সংখ্যার উপর নির্ভর করে। মন্দ স্পন্দনের সহিত মন্দ্রতা ও দ্রুত স্পন্দনের সহিত তারতার সমাবেশ। Diapasonএর স্বর মুহূর্ত্তে ৮-৭০ বার একধা স্পন্দনের সমতুল্য (একধা স্পন্দন বলিতে প্রত্যাবর্ত্তন বিনা কেবল গমনকেই বুঝায়।) আর আর্গিনের (Organ) সর্ব্বাপেক্ষা খাদের সুরে ৩৩টী একধা স্পন্দন মাত্র হয়। মনুষ্যের খাদসুরে ৩৯৬ এবং শিশুর চীৎকারে মুহূর্ত্তে ২০০০ অপেক্ষাও অধিক একধা স্পন্দন হয়।

শব্দায়মান পদার্থের স্পন্দন নানা প্রকারে বোধগম্য হয়। একটা ঘণ্টা বা একটা ঘণ্টী বা যে কোন শব্দায়মান কঠিন পদার্থ হউক, তাহাকে অঙ্গুলি দ্বারা অত্যন্ত লঘুভাবে স্পর্শ করিলে এক প্রকার বিশেষ কম্পন উপলব্ধি হয় এবং উহাকে চাপিলেই কম্পন ও ধ্বনি উভয়ই এককালীন থামিয়া যায়।

যদি পারা-বিশিষ্ট ও অর্দ্ধজল বা পারদ-পূর্ণ কাচ পাত্রের মুখে বাদ্যযন্ত্রের
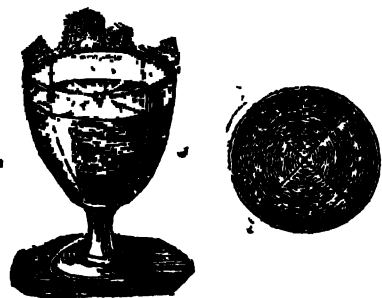
ধনুক দিয়া টানা যায়, তাহা হইলে বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী কখন মন্দ্রতর কখন তারতর ধ্বনি কর্ণগোচর হয়। আবার সেই ক্ষণে তরল পদার্থের উপরিভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ বা আন্দোলন দ্বারা লাঙ্গলপদ্ধতির ভাব ধারণ করে। এই আন্দোলন নেমিদেশ হইতে নাভিবিন্দুতে প্রচারিত হয়। এই তরঙ্গমালা এক রকমে ঐ কাচ পাত্রের স্পন্দনঠাট আঁকিয়া দেয়। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্পন্দনাংশ সমসংখ্যক অঙ্কবিশিষ্ট হয় যেমন

৪,৬,৮; এবং ঐ স্পন্দিত খণ্ড সকল যত অধিক সংখ্যক হয়, ধ্বনি তত উচ্চ হয়।

আকার, দ্রব্য ও শব্দগত যাহাই প্রভেদ থাকুক না কেন, এইরূপে স্পন্দনশীল পদার্থমাত্রই বহুতর তরঙ্গ পরম্পরায় বিভক্ত হয়। এই তরঙ্গমালা বিশ্রাম রেখা দ্বারা পরস্পর হইতে পৃথক্ হয়। এই বিশ্রামরেখাকে সন্ধিরেখাও বলে বা কেবল গ্রন্থিও বলে। নিম্নলিখিত চিত্র
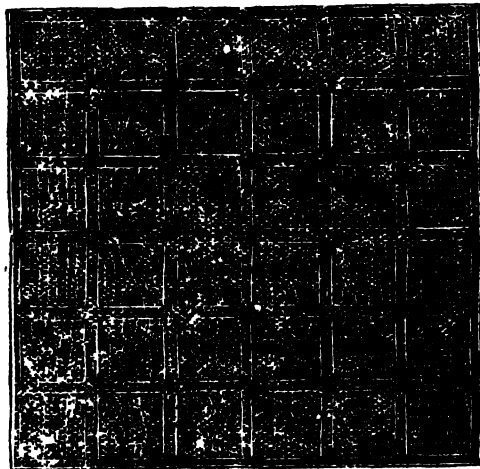
দ্বারা সমচতুর্ভুজ পাতের কতক স্পন্দন-প্রকার দেখিতে পাওয়া যাইবে। ৩৬টী সমচতুর্ভুজ পাত আছে। ইহাদের মধ্যে শ্বেতবিন্দু দ্বারা সরল,* বক্রাকার ও অসমান (Irregular) গ্রন্থিরেখা দেখান যাইতেছে। এই ছবিতে যে সকল অদ্ভুতাকার গ্রন্থিরেখা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা দ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইতেছে যে, ১৫ বা ২০ সেন্টিমেটর বর্গ পরিমিত ও ১ বা ২ মিলিমেটর পুরু কাচ বা ধাতুময় একই পাত্রের অনুসকল কি নম্যভাবে অত্যন্ত বিসদৃশ স্পন্দনাবস্থায় পরিণত হয়।

এইরূপ অসংখ্য বিভিন্নাকার উৎপন্ন করিবার জন্য পাতকে চক্রবাটভাবে (Porixzontally) চিমটা দ্বারা রক্ষা করিতে হয়। চিমটা আপনার দুই মুখ দ্বারা উহার দুই পৃষ্ঠার দুই বিন্দু চাপিয়া ধরে। তাহার পরে বাদ্যযন্ত্রের ধনুক দ্বারা পাতের কোন এক বিন্দুতে টানিতে থাকিলে এবং ঐ পাতের উপর বালুদানা সকল রাখিলে ঐ বালুদানাগুলি স্পন্দন দ্বারা গতিযুক্ত হইয়া সরিতে সরিতে ও নাচিতে নাচিতে সহস্ররূপে স্থানান্তরিত হইয়া গ্রন্থিরেখায় আসিয়া একত্র হয়, এবং এইরূপে গ্রন্থির গঠন অঙ্কিত করে। গ্রন্থিরেখা সকল বিভিন্ন ধ্বনির সম্বন্ধে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। ইহাতে সহজে জানা যায় যে দোলন ক্রিয়া গ্রন্থিরেখার আশপাশে সম্পাদিত হয়; এমনি ভাবে সম্পাদিত হয় যে, পাত

একপাশে উঠে আর একপাশে নামে। এই দুই ভিন্ন প্রকার গতি গ্রন্থিরেখাঙ্কিত স্থানকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়।

ভারবান্ পদার্থের বিষয়ে পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাহার অভ্যন্তরস্থ Mechanical গতি সাধারণরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। কতকগুলি পরমাণু সমষ্টিকে দ্রব্য কহে। ঐ পরমাণু সকল পরস্পর পৃথক্ ও দূরে থাকিয়াও নিরন্তর পরস্পরকে চায় এবং তাহাদিগের পারস্পরিক ক্রিয়া দ্বারা সাম্যভাবে অবস্থান করে। যতই ক্ষুদ্র হউক না, ইহাদের মধ্যে কোন অংশ চাপ পাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ সেই চাপকে আপনার চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়; চতুর্দ্দিকস্থ অংশ সকল আবার উহাকে আপনার চতুর্দ্দিকে বিস্তার করে, এবং এইরূপে ঐ চাপ ক্রমে ক্রমে দ্রব্যের সীমা পর্য্যন্ত চলিয়া আসে। কিন্তু ঐ দ্রব্যটী শূন্যের মধ্যে পৃথগবস্থিত নাই; ইহার আর আর আশ্রয়, আর আর ভারবান্ পদার্থরাশি অবলম্বন করিয়া থাকে, সুতরাং তাহারাও এই পারমাণবিক গতির অংশী হয়। তথাচ এই সকল চাপ এককালে সম্পন্ন হয় না। কোন চাপের দান আদান অল্পক্ষণ হইলেও সীমিত সময়ের মধ্যে হওয়া চাই। এই সময়ের তারতম্যে স্বনবান্ দ্রব্য সকল স্পন্দ-ঢাল ও বিশ্রামরেখায় বিভক্ত হয়। এইরূপে সকল স্পন্দনশীল গতি দূরে প্রচারিত হয়। কেবল যে যে দ্রব্যে উহা উদ্ভূত হইয়াছে সেই দ্রব্যেই সঞ্চারিত হয় তাহা নহে; কিন্তু ক্রমে নিকটস্থ সমুদয় পদার্থ রাশিতে তাহা সঞ্চারিত হয়। এবং স্পন্দনগতির মাত্রা ও তাহার সঞ্চারগতির সময়ের যোগে ঐ সমস্ত পদার্থরাশি প্রথম কম্পিত পদার্থের প্রকম্পনকে এক নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীপরম্পরায় ও সময়ক্রমে আবৃত্তি করে।

ক্ষুদ্র হাতুড়ি, যাহা ঘড়ির ঘণ্টিকে আঘাত করে, উহা ঘণ্টির অতি অল্প স্থান মাত্র স্পর্শ করে অথচ সমস্ত ঘড়ি ও তাহার আধার উহার গতি প্রাপ্ত হয়।

তেমনি যে দণ্ড প্রকাণ্ড ঘণ্টাকে আঘাত করে উহাও তাহার অল্প স্থানই স্পর্শ করে, অথচ সমুদয় ঘণ্টা আন্দোলিত হয়। তদ্দ্বারা কেবল যে ২০।৩০ কিলোমেটর দূর পর্য্যন্ত বায়ু কম্পান্বিত হয় তাহা নহে, কিন্তু যে সকল আধার উহাকে ধারণ করিয়া থাকে তাহারা পর্য্যন্ত ঐ গতি প্রাপ্ত হয়, তাহারাও স্পন্দিত হয় এবং সেই স্পন্দনকে বাড়ীর মেজে, প্রাচীরের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত প্রচার করে; তাহারা আবার নিজ নিজ দৃঢ়তা, কোমলতা, নিজ নিজ স্থিতিস্থাপকতাভেদে যথাযোগ্যরূপে প্রচার করে।

রাসমালা।

ঘোরতর যুদ্ধ।

বৈরসিংহ পিতার ন্যায় সুখে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ম্লেচ্ছগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। শত্রুতাপন বৈরসিংহ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া সৌরাষ্ট্র হইতে তাড়িত করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে কখনই পরাজিত হয়েন নাই। কথিত আছে, তাঁহার একজন পরম পণ্ডিত মন্ত্রী ছিল। কোন্ ম্লেচ্ছজাতি যে বৈরসিংহের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না।

বৈরসিংহের পরলোক গমনে তাঁহার পুত্র রত্নাদিত্য খৃঃ ৯২০ অব্দে অনহলবারার সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইহাকে বেষাদৎ নামে অভিহিত করিয়াছেন। সৌবরাজ রত্নাদিত্য জগতের সূর্য্যরূপে বিরাজ করিয়াছিলেন, তাঁহার তেজ অসীম, বিক্রম অসহনীয়; পরের দুঃখে তাঁহার হৃদয় পীড়িত হইত; পরের কষ্ট নিবারণে তিনি সর্ব্বদা বদ্ধপরিকর থাকিতেন; তিনি বলবান, সাহসিক ও সত্যসন্ধ; তাঁহার রাজ্যে কি চোর, কি লম্পট, কি মিথ্যাবাদী, কেহই স্থান পাইত না। ৯৩৫ খৃঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র সামন্তসিংহ তদীয় সিংহাসনে সমারূঢ় হয়েন। এই সামন্তসিংহই সৌরকুলের ও বনগোত্রের শেষ নরপতি।

সামন্তসিংহ কবিকুলের প্রীতিভাজন হইতে পারেন নাই, সেই জন্য তাঁহারা তৎসম্বন্ধে অতি সামান্য বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন,—যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সামন্তসিংহ অতি অযোগ্য নরপতি বলিয়া প্রমাণিত হয়েন। তাঁহারা বলেন, সামন্তসিংহ নিতান্ত দুর্ম্মুখ ও চলচিত্ত, মনে যাহা উদিত হইত, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, হিতাহিত বিচার না করিয়া তাহাই যাহার তাহার সম্মুখে বলিয়া ফেলিতেন; একবার যাহা প্রতিজ্ঞা করিতেন, পর মুহূর্ত্তে তাহার বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হইতেন; তাঁহার ন্যায় অন্যায় হিতাহিত সত্য মিথ্যা জ্ঞান ছিল না; কে শত্রু, কে মিত্র, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিতেন না। তিনি সাত বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। সামন্তসিংহ অপুত্রক ছিলেন; সুপ্রসিদ্ধ শোলাঙ্কি মূলরাজ তাঁহার ভাগিনেয়। তিনি মূলরাজকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং একদা সুরাপানে মত্ত হইয়া তাঁহাকে অনহলপুরের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে মত্ততা দূর হইলে যখন তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল, যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নিজের পদে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছেন, তখন সর্ব্বসমক্ষে মূলরাজের অভিষেক অস্বীকার করিয়া স্বয়ং আবার সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন; কিন্তু রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিয়া মূলরাজ তাহা কিছুতেই ত্যাগ করিলেন না; কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক তিনি স্বীয় মাতুলের প্রাণ সংহার করিয়া অনহলবারার

সিংহাসনে নিষ্কণ্টক হইলেন। সেই দিন অনহলবাবার রাজপাট হইতে সৌরকুলের বংশতরু উন্মূলিত হইল—পত্তনের সিংহাসন শোলাঙ্কিকুলের হস্তগত হইল।

ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সৌররাজ ক্ষেমরাজের শাসনকালে আরবীয় প্রথম ভ্রমণকারী হিজিরা ২৩৭ (খৃঃ ৮৫১) অব্দে অনহলবারা পত্তনে উপনীত হয়েন; এই ঘটনার সপ্তদশ বৎসর পরে দ্বিতীয় ভ্রমণকারী সৌররাজের রাজধানীতে আগমন করিয়াছিলেন। বনরাজের বংশধরদিগের সম্বন্ধে তাঁহারা যে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা সামান্য হইলেও তন্মধ্য হইতে অনেক ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই জন্য আমরা তাহা এস্থলে সন্নিবেশ করিলাম। "সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে বাল্লবা প্রধানতম গৌরবান্বিত নরপতি; অপর অপর রাজা স্ব স্ব প্রধান ও নিজ নিজ রাজ্যে স্বাধীন হইলেও বাল্লবাদিগের এই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করেন; এই জন্য যখন তিনি তাঁহাদের নিকট দূত প্রেরণ করেন, তাঁহারা অসীম সম্মান ও সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করেন। আরবদিগের প্রথার অনুকরণে এই নরপতি মহামূল্য দ্রব্যাদি দান করিয়া থাকেন। তাঁহার বিস্তর হস্তী ও অশ্ব এবং বিপুল অর্থ আছে। তাতারীয় দ্রামের আকারে তাঁহার প্রচারিত মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে; * * * রাজার মুদ্রা দ্বারা সেই সমস্ত টাকা মুদ্রিত হয়; তৎসমুদয়ে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতির শেষ বৎসর হইতে তাঁহার রাজ্যকাল লিখিত থাকে। আরবীয়েরা যেমন মহম্মদের অব্দানুসারে আপনাদের বর্ষ গণনা করিয়া থাকেন, ইহাঁদের সেরূপ নহে; ইহাঁদের দ্বারা ইহাঁদের নরপতিগণের অব্দ হইতে বর্ষ পরিগণিত হইতে দেখা যায়। ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশ রাজা সুদীর্ঘ কাল জীবিত ছিলেন;—এবং অনেকে পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদিগের স্বদেশবাসিগণের এই বিশ্বাস যে আরবীয়দিগের প্রতি ইহাঁদের স্নেহ থাকাতে ভগবান্ ইহাঁদিগকে সুদীর্ঘ জীবন ও রাজত্ব দানে সুখী করিয়াছিলেন। বাস্তবিক আর কোন নরপতিই আরবীয়দিগকে এত অধিক স্নেহ করেন না;—বলিতে কি ইহাঁদের প্রজাগণও আরবদিগকে সেইরূপই ভালবাসেন।

"বাল্লাবা ইহাঁদিগের সাধারণ উপাধি; কিন্তু ইহা ইহাঁদিগের প্রকৃত নাম নহে। ইহাঁদের রাজ্য কাম্‌কাম প্রদেশের উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া স্থলপথে চীন দেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার রাজ্য শত্রুভাবাপন্ন অনেক নরপতির রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত; তাঁহারা ইহাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীতায় রত; তথাপি ইনি কখনও তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন রাজা হারাজের অধিপতি, তাঁহার অসীম সেনাদল এবং ভারতের সকল নরপতির অপেক্ষা তাঁহার তুরঙ্গসেনা অধিকতর বলবতী; আরবের নরপতিকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেও তিনি তাঁহার শত্রু; মুসলমানধর্ম্মের উপর ইহাঁদের অপেক্ষা দৃঢ়তর ঘৃণা

ভারতে আর কাহারও নাই। এই নরপতির রাজত্ব একটী অন্তরীপের উপর স্থাপিত; সে রাজ্য অসীম ধন, বহু উষ্ট্র ও অনেক রথাদি দ্বারা অলঙ্কৃত। তত্রত্য অধিবাসিগণ স্বদেশীয় আকর হইতে রৌপ্য উদ্ধার করিয়া তাহার ব্যবসা করিয়া থাকে; তাহারা বলে, ভারতরাজ্যে সেই ধাতুর বিস্তর খনি আছে। এখানে কি ভারতের অন্যান্য রাজ্যে তস্করের কোন কথাই শুনিতে পাওয়া যায় না।

"এই রাজ্যের একপার্শ্বে তাফেক রাজ্য অবস্থিত। তাহা অধিক বিস্তৃত নহে; ভারতবর্ষের মধ্যে এই রাজার রাজ্যেই পরম সুন্দরী শ্বেতবর্ণা রমণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার সেনাগণ অল্প, সেই জন্য ইঁহাকে চতুপার্শ্বস্থ নরপতিগণের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। আরবীয় ও বাহ্লারাদিগের উপর ইঁহার যথেষ্ট স্নেহ।

"এই সকল রাজ্য রাহমি নামক অপর একজন রাজার রাজ্যের সহিত সংস্পৃষ্ট; এই রাজা হারাজের অধিপতি ও বাহ্লারায়ের সহিত কেবল যুদ্ধ করিয়া থাকেন। কি উচ্চ কুলসম্ভব, কি পুরাতন রাজ সম্মান,—ইঁহার কিছুই নাই; কিন্তু ইঁহার সেনাবল সকলের অপেক্ষা অধিক। * * * এই রাজ্যে এত চমৎকার কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয় যে, সেরূপ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সমস্ত বসন চক্রাকারে প্রস্তুত এবং এত সূক্ষ্ম যে, একটী মধ্যবিৎ আকারের অঙ্গুরীয়ের ভিতর দিয়া সেগুলিকে সহজে আকর্ষণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইঁহাদের রৌপ্য ও স্বর্ণ থাকিলেও এদেশে কড়ি সামান্য অর্থস্বরূপ প্রচলিত আছে।

"এই রাজ্যের পর আর একটী রাজ্য আছে, তাহা সাগরোপকূল হইতে বহুদূরে স্থিত, তাহা কাশ্বিন নামে প্রসিদ্ধ। অত্রত্য অধিবাসীগণ শুভ্রবর্ণ, ইহাদের কর্ণ ছিদ্রীকৃত; ইহাদিগের দেশে উষ্ট্র পাওয়া যায়; এ দেশ মরুময় ও পর্ব্বতাবৃত।

"বহুদূরে—সাগরোপকূলে 'হিত্রঞ্জি" নামে আর একটী রাজ্য আছে; তাহা অত্যন্ত নির্ধন; কিন্তু তাহা একটী উপসাগরের তীরে অবস্থিত—সেই সাগরের উর্ম্মিমালা তদুপরি রাশি রাশি অম্বর প্রক্ষেপ করিয়া থাকে। তথায় হস্তিদন্ত ও মরীচও পাওয়া যায়; কিন্তু শেষোক্ত দ্রব্য অল্প পরিমাণে সংগৃহীত হওয়াতে তত্রত্যঅধিবাসিগণ তাহা অপক্ক অবস্থাতেই ভক্ষণ করিয়া ফেলে।"

আরবীর পর্যাটকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া অধুনা তদুক্ত নগর ও প্রদেশ সমূহের প্রকৃত স্থিতিভূমি নির্ণয় করা সহজ নহে। কারণ তাঁহারা ভারতীয় নামগুলিকে অতিশয় বিকৃত করিয়া গিয়াছেন; তাহার উপর আবার ইংরেজী ও ফরাসী অনুবাদকগণ সেই সমস্ত বিবরণ স্ব স্ব মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া সেই সমস্ত বিকৃত নামাবলির বিকার এতদূর বাড়াইয়া তুলিয়াছেন যে, তৎসদয়ের প্রকৃত নাম স্থির করিতে গিয়া ঘোর অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়; এরূপ অবস্থায় একমাত্র অনুমান ব্যতীত আমাদের অন্য সহায় নাই। কর্ণেল টড "বাহ্লরা" শব্দকে বাহ্লিক রায় শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া স্থির

করিয়াছেন; বল্লভীপুর এই বাহ্লিক রায়দিগের প্রাচীন রাজধানী। কিন্তু এস্থলে এই শব্দ লইয়া বিষম গোলযোগ উত্থিত হইতেছে। আরবীয় পর্য্যটকগণ বর্ণন করিয়াছেন যে ইহাঁদের "রাজ্য কামকাম প্রদেশের উপকূল হইতে আরম্ভ কবিযা স্থলপথে চীনদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত" ছিল। কিন্তু ইতিহাস প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতেছে যে, যে সময়ে উক্ত আরবীয় ভ্রমণকারিগণ আনহলবারা পত্তনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তৎকালে বাহ্লিকবায়দিগের রাজ্য কঙ্কান-উপকূল হইতে চীনদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল না। আনহলবারার সৌব নরপতিগণের শাসনকালে তাঁহাদের অধিকৃত ভূভাগ কখনও অতদূর বিস্তৃত হয় নাই। যৎকালে শোলাঙ্কি সিদ্ধরাজ অষ্টাদশ প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন, যৎকালে তাঁহার উত্তরাধিকারী মহারাজ কুমার পাল হিমালয়ের পাদপ্রস্থ পর্য্যন্ত জয় করিয়া প্রাচীনপঞ্চালিকার রাজধানী শালপুরের বক্ষঃস্থলে স্বীয় বিজয়পতাকা উড়াইয়াছিলেন, তৎকালে আনহলবারার রাজ্যসীমা কঙ্কান হইতে চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, একথা বলিলে কথঞ্চিৎ যুক্তিযুক্ত হইতে পারিত; সুতরাং "বাহ্লরা" লইয়া বিষম সংশয় উপস্থিত হইতেছে। আর যদি "বাহ্লরা" শব্দকে আনহলবারার সৌরনরপতিদিগের প্রাচীন উপনাম বাহ্লিকরায়েব অপভ্রংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যুক্তকরে স্বীকার করিতে হইবে যে, আরবীয় পর্য্যটকদিগের বিবরণ অনেক পরিমাণে অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত। টড সাহেব হারাজকে গবালকুণ্ডের হর রাজা রাহমিকে ত্রৈলঙ্গেশ্বর রাম প্রামার, কাশবিনকে কচ্ছ ভোজ, হিত্রঞ্জকে শত্রুঞ্জয় শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু ফর্ব্বস্ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থকারের সহিত এ সম্বন্ধে তাঁহার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ফর্ব্বস্ সাহেব হারাজকে গির্ণাবের যাদব রাজা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কোন্ সাদৃশ্যের উপব নির্ভর করিয়া উড সাহেব যে, কাশ্‌বিনকে কচ্ছভোজ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। কাশবিন সাগরোপকূল হইতে বহুদূরে স্থিত; সুতরাং ইহা কি প্রকারে সাগর সলিলধৌত কচ্ছ রাজ্য হইতে পারে? বোধ হয়, ইহা কাশ্মীরের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাশ্মীর সাগরোপকূল হইতে বহুদূরে স্থিত; ইহা পর্ব্বতাবৃত; ইহার অধিবাসীগণের শুভ্র সৌন্দর্য্য চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং কাশবিন যে কাশ্মীর শব্দের অপভ্রংশ এ অনুমান অযৌক্তিক নহে।

বাঁসরী বাজিলওই!

১

নিথর নিশিথ কালে,
কালিন্দ নন্দিনী কুলে,
কে যেন কি তান তুলে,
আকুল করিল সই
বুঝি সখি অসময়,
ডাকিছে লো বসময়,
রাধা রাধা রাধা বলে
বাঁসরী বাজিল ওই॥

২

মুরলী মধুর তানে,
মোহিত করিল প্রাণে,
শ্রবন বিবরে মোর,
আসিয়া পশিল ওই।
আর ত না শুনি হায়।
প্রাণ যায় একি দায়।
পুনঃ হৃদে শেল হানি,
বাঁসরি বাজিল ওই॥

৩

দহিতে অবলা বালা,
লম্পট নিঠুর কালা,
অসময় দেয় জ্বালা,
তবু কেন তাতে রই?
জীবন যৌবন কায়,
সঁপেছি লো তারি পায়,
তাই বুঝি রাধা বলি,
বাঁসরি বাজিল ওই॥

৪

ছড়ায়ে অমিয় রাশি,
শীতল সমীরে মিশি,
নৈশাকাশ ভেদি আসি,
হিয়ায় পশিল সই।
ধ্বনিয়া সুতানে বাসি
চ সজনি দেখে আসি,
পুলিনে প্রানেশ পাশে
বাঁসরী বাজিল ওই॥

৫

বলিলে শোনে না কথা,
বাধা পেয়ে দেয় ব্যথা,
দহিবা বিরহানলে,
ডাকে "এস রসময়ী"।
জানে না যে অভাগিনী,
শ্যাম-মুখ পাগলিনী,
তবুলো কাঁদায়ে পোড়া—
বাঁসরি বাজিল ওই॥

৬

আর না ধৈরজ মানে,
বঙ্কিম বিনোদ বিনে,
কই সই মনচোরা?
কারে মনব্যথা কই?
নাশিতে বিরহ-জ্বালা,
চললো হেরিগে কালা,
শোন।—"রাই এস" বলি
বাঁসরি বাজিল ওই॥

৭

দেখাইব গিরিধরে,
মোরা ধরি পয়োধরে,
প্রণয়ে বেঁধেছ বলে
তা বলে অ বলা নই।
হানিবা কটাক্ষ শর,
চাতুরি ভাঙ্গিব তাঁর,
শিখাব নিশীথ কালে
বাঁশরি বাজা (ই) ও নাই।

শ্রীপ্রমথনাথ গুঁই।

গোপালনায়ক ও আমীরখস্রু।

৪

গানের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে খস্রু নেজামদ্দীনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন—তাঁহার সমাধি প্রাচীন দিল্লীতে নেজামদ্দীনের সমাধির পার্শ্বেই অবস্থিত দুইটী সমাধিস্তম্ভ একত্র বিরাজমান।—প্রিয়তম গুরুশিষ্য উভয়ে সমাধিস্থানেও যেন প্রণয়পাশ ছাড়িয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মৃত্যুকালের ব্যবধান অতি অল্প; বলিতে গেলে তাঁহাদের মৃত্যুকাল একরূপ সমসাময়িক বলিতে হয়। খস্রু নেজামদ্দীনের মৃত্যুর ছয় মাস পরে মৃত হয়েন, নেজামদ্দীন দিল্লীতে বুধবার ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে ৩রা এপ্রিলে ৭২৫ হিজিরাতে ১৮ই রাবির ইহলোক ত্যাগ করেন এবং খস্রুর ১৩২৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রমজানের সময় (৭২৫ হাজিরাতে) লোকান্তর প্রাপ্তি হয়। মরণান্তে দুই জনেরই সমাধি পুরাতন দিল্লীর অন্তর্গত ঘায়েসপুর নামক স্থানে সম্পন্ন হয়।

খস্রুর মৃত্যু যেমন নেজামদ্দীনের মৃত্যুর পরে সংঘটিত হয় সেইরূপ তাঁহার জন্মলাভও নেজামদ্দীনের জন্মলাভের পরে ঘটে। কিন্তু জন্মলাভ মৃত্যুর অপেক্ষা আর একটু বিলম্বে হইয়াছিল। আমীর খস্রু জন্ম গ্রহণ করেন নেজামদ্দীনের সতেরো বৎসর পরে। ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ৬৩৪ হিজিরাতে নেজামদ্দীনের জন্মলাভ হয় এবং আমীর খস্রু ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে ৬৫১ হিজিরাতে জন্ম গ্রহণ করেন।

যাহা হউক এই গুরু শিষ্য উভয়েরই জন্ম গ্রহণ সার্থক হইয়াছে। দুই জনেই ইতিহাসাকাশে ধ্রুবতারার ন্যায় শোভা পাইয়াছেন। এই দুই গুরু শিষ্যের মধ্যে কাহাকেও অন্যাপেক্ষা হীন করিয়া দেখিতে পারি না। দুই জনেই যেন তুল্য মূল্য হইয়া বিরাজমান। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো যে প্রকার সক্রেটিসের অপেক্ষা ক্ষমতায় কম ছিলেন না বরঞ্চ গুরুকে সামর্থ্যে কিঞ্চিৎ যেন অতিক্রম করিয়াছিলেন সেইরূপ পীর নেজামদ্দীনের শিষ্য আমীর খস্রুও নেজামদ্দীনের অপেক্ষা ন্যূনশক্তিশালী ছিলেন না বরঞ্চ নানাগুণে তাঁহাকে ঈষৎ যেন ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সক্রেটিসের ধর্ম্মগাম্ভীর্য্য যেমন প্লেটো সম্পূর্ণ ধারণ করিতে পারেন নাই সেইরূপ ধর্ম্মগুরু নেজামদ্দীনের ধর্ম্মগুরুত্ব সেপ্রকার খস্রু লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। নেজামদ্দীনের কি কম গুরুত্ব ছিল? তিনি দরবারে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইতেন। পরে গাম্ভীর্য্যে তিনি শোভা পাইতেন। প্রসিদ্ধ গায়ক কবি সদারঙ্গ তাঁহার গানে কত স্থানে নেজামদ্দীনের মহত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। একটী গানে তিনি তাঁহার প্রভু মোমদ্সাকে অতি প্রশংসা করিতে গিয়া তাঁহাকে নেজামদ্দীনের সঙ্গে তুলনা করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন—বলিয়াছেন "তুম্‌হা দরবারে নেজামদ্দীন"। এই পীর নেজামদ্দীনের গুরু গাম্ভীর্য্য

শিষ্য আমীর খস্রু প্রকৃতরূপে ধারণ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তাঁর মত ব্যক্তি সাধনা দ্বারা সক্ষমতালাভে কৃতকার্য্যও হইতে পারিতেন। কিন্তু আমীর খস্রুর হৃদয়ে লঘুরস অর্থাৎ হাস্য পরিহাসোদ্দীপক রঙ্গ—শ্লেষরসের প্রাবল্য থাকাতে নেজামদ্দীনের ন্যায় তদ্রূপ গুরুগম্ভীর হওয়া সহজসাধ্য ছিল না। তিনি সুযোগ পাইলে সময়ে সময়ে শ্লেষসহকারে কিঞ্চিৎ বাক্যালাপ না করিয়া যেন থাকিতে পারিতেন না। অক্লেশে শ্লেষকাব্যে তিনি স্বীয় ও পরকীয় পরিতৃপ্তি সাধন করিতেন। কবিমাত্রেই প্রায় দেখিয়াছি শ্লেষধর্ম্মী। কালিদাস সেক্সপীয়র প্রভৃতি মহাকবিগণ তাঁহাদের কাব্য—রচনায় কত স্থানে কতরূপ শ্লেষ প্রয়োগে রচনা সমূহকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। পারস্য মহাকবি খস্রুর হৃদয়ও কবি হৃদয়ের অপরাপর স্বভাবগত ধর্ম্মের ন্যায় এ ধর্ম্মে অলঙ্কৃত ছিল। শ্লেষ রচনায় কবি খস্রুর কিরূপ নৈপুণ্য ছিল পাঠকবর্গ নিম্নলিখিত নিদর্শন সমূহের দ্বারা তাহার প্রচুর পরিচয় পাইবেন ঃ—

(উর্দ্দু শ্লেষ রচনা)

প্রশ্ন। গোস্ত কেঁও ন খায়্যা
দোম কেও ন গায়া।

উত্তর। গলা না থা।

অর্থাৎ মাংস কেন খায়নি গাইয়ে কেন গায়নি ?

উত্তর। গলা ছিল না।

এখানে মাংসের বেলায় হইল মাংস ভাল গলে নাই আর গাইয়ের বেলায় হইল গাইয়ের গলা ছিল না।

প্রশ্ন। জুতা কেঁও না পাহিনায়া ?
সামসা কেঁও না খায়া।

উত্তর। তুলা না থা।

জুতা কেন সে পরে নাই ?
মিষ্টান্ন কেন সে খায় নাই ?

উত্তর। তলা ছিল না।

এখানে জুতার বেলা জুতার তলা ছিল না অর্থাৎ তলাটা একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে। এবং মিষ্টান্নের বেলায় তলার ভাবানুসারে মিষ্টান্ন ভালরূপে পাক পায় নাই।

(৩)

প্রশ্ন। অনার কেঁও ন চাক্‌খা ?
ওয়াজির কেঁও না রাখ্যা ?

উত্তর। দানা না থা।

এখানে "অনারের" বেলায় দানা অর্থাৎ বীজ ছিল না আর "ওয়াজিরের" বেলায় দানার ভাবার্থানুসারে,—সূক্ষ্ম বা সার বুদ্ধিটুকু ছিল না বলিয়া।

পারস্য ও উর্দ্দুমিশ্রিত শ্লেষ বচন।

(১)

প্রশ্ন। সাওদাগর রাচে মিবায়দ্ ?
বুখে ক ক্যা চাহিয়ে ?

উত্তর। দোকান।

সওদাগর কি চায়
ও কালা কি চায় ?

উত্তর। দোকান।

এখানে সওদাগরের বেলায় বিপণী আর কালার বেলায় কর্ণদ্বয় বুঝাইল।

(২)

প্রশ্ন। তিষ না রাচে মিবাযদ্ ?
মেলাপ সো ক্যা চাহিয়ে ?

উত্তর। ছা।

তৃষিত কি চায় ?
স্নেহান্তঃকরণ কি চায় ?

উত্তর। ছা।

এখানে তৃষিতের বেলায় ছা অর্থাৎ স্নিগ্ধ কোন কিছু। আর স্নেহান্তঃকরণের বেলায় বুঝাইল ছা অর্থাৎ বাছা বা বৎস।

(৩)

প্রশ্ন। শিকার রাচে মিবাযদ্ কার্দ ?
কুআৎই মাঘজ কো ক্যা চাহিযে ?

উত্তর। বাদাম।

কি লয়ে শিকার কবা যাইতে পারে ?
মস্তিষ্কপুষ্টির জন্য কি চাই ?

উত্তর। বাদাম।

উর্দ্দু এই বাদামের ভাবার্থ একস্থলে খাইবার বাদাম ও আরেক স্থলে জাল বুঝাইল।

যাহা হউক আমীর খস্রুর শ্লেষভাব গোপাল নায়কের তুলনায় ঈষৎ কষ্ট-কল্পিত বলিয়া বোধ হয়। খস্রুর শ্লেষোক্তি-রচনাব ক্ষমতা থাকিলেও গোপালের সরল প্রাণখোলা শ্লেষশক্তির কাছে নিষ্প্রভ হইযা যায়। গোপাল নায়ক বাদ্সার কাছে কেমন সবল মাধুর্য্যে শ্লেষোক্তি কবিলেন—দিনের বেলায় রাত্রিব রাগ গাওযায় গোপালের বেয়া-দুপি কাজের জন্য বাদ্সা তাঁহার প্রতিবাদ কবিলে গোপাল কেমন সবল শ্লেষসহ-কারে উত্তব করিলেন: ইহা (অর্থাৎ এই কল্যাণরাগ) আপনার কল্যাণের জন্য গাহিয়াছি আমি ব্রাহ্মণ আপনাকে আশীর্ব্বাদ কবিয়াছি। গোপালেব এই একটী শ্লেষোদাহরণ যদিও খস্রুর তুলনায় যথেষ্ট হইল না, তত্রাচ মোটের উপর উভয়েব ভাবগতিক দেখিয়া এইটী মনে হয যে গোপাল নায়কর অন্তরস্থ শ্লেষ-রসে খস্রুব অপেক্ষা সারল্য ও স্বাভাবিক প্রাণের উচ্ছাস বিদ্যমান।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পব)

কালচক্রে যখন সকল বস্তুরই নিয়ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তখন সাহিত্যের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় সমাজের আদর্শ ও ইতিহাস মাত্র। জাতীয় সামাজিক প্রথাব উজ্জ্বল ছবি, জাতীয় সাহিত্যপটে অঙ্কিত থাকে। আবার সমাজস্রোত যখন যেদিকে প্রবাহিত হয় জাতীয় সাহিত্যকেও সেই স্রোতেব বশবর্ত্তী হইতে হয় অন্যথা সামাজিক জন সাধাবণের সাহিত্য পিপাসা অপূর্ণ থাকিয়া সাহিত্যজগতে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রত্যেক স্তর অনুসন্ধান কবিলে এই সত্যই সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত

হইয়া থাকে। বঙ্গসমাজের মতি, গতি যখন যেদিকে ধাবিত হইয়াছে তখনই বাঙ্গালা সাহিত্যস্রোতকে সেইদিকে ফিরাইবার জন্য এক এক জন সংস্কারক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

স্বর্গীয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময়ে বঙ্গসমাজে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন ও আলোচনা অল্প আয়তনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তৎকালে সামান্য কাজ-চলা বাঙ্গালা শিক্ষাই জন সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিঞ্চিৎ বাঙ্গালা ও পরে ইংরাজী শিখিয়া অনেকে লেখা পড়ায় "ইতি" দিতেন। অর্থাগমের পন্থার সুগমতা ও সাংসারিক অভাবের অল্পতা হেতু ধনীগণও সাধারণ লোকেরা তৎকালে হাস্যরসোদ্দীপক কবিতা, কবির ছড়া কাটাকাটি প্রভৃতিতে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন সুতরাং এই সময়েই শ্লেষপূর্ণ রসিকতাময় অনেক কবিতা ও নাটক বঙ্গসাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করে। বর্ত্তমান হিসাবে সে সমস্ত "রসিকতা" অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হইলেও তাৎকালীক সমাজে তাহার আদর ছিল।

এই সময়ে টেকৃচাঁদ ঠাকুর (৺ প্যারীলাল মিত্র) "হুতোম" (৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ) সাহিত্য জগতে প্রভূত "বাহবা" লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের ও গুপ্ত কবির রচনায় অনুপ্রাস ও শ্লোকেরই অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়, শব্দাড়ম্বর আদৌ নাই। বাস্তবপক্ষে ভাবই ভাষার প্রাণ, দুরূহ শব্দাড়ম্বর, হাতে বহরে সমাসান্ত শব্দশ্রেণী পুরিত ভাষা দেখিতে শুনিতে উত্তম হইলেও কর্ণের তৃপ্তিকর হইলেও মর্ম্মস্থলে দুরপনেয় চিত্র অঙ্কিত করিতে, হৃদয় আপ্লুত করিতে সামান্য শব্দের যাদৃশ শক্তি আছে, ইহাদিগের তাদৃশ নাই। এই সামান্য ছোট-খাট কথায় আদি কবি বিদ্যাপতি প্রভৃতি যে সুধা বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন শব্দাড়ম্বর যুক্ত গ্রন্থে কখনই সে সুধা পাওয়া যায় না। আজকালিও বঙ্গসাহিত্যের গতি আর শব্দবিন্যাসের আড়ম্বরের দিকে প্রবাহিত নহে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি অনেক মহোদয়ের ন্যায় প্রকাণ্ড শব্দ সমূহের সমাবেশে আর জন সাধারণ তৃপ্ত নহেন এখন ভাবব্যঞ্জক সামান্য শব্দাদির ব্যবহার ও অলঙ্কারাদির পরিবর্জ্জনই আদরণীয়। আমাদের বঙ্গসাহিত্য গুরু বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণ-রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির রচনাই এই প্রণালীর অনুমোদিত।

কবি ঈশ্বর গুপ্তের পরে যেমন ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি স্বর্গীয় মহাত্মাগণ গদ্যে এবং মাইকেল, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি মহোদয়গণ যেমন শ্রাব্য কাব্যে মাতৃভাষায় সাজাইয়া নরজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন সেইরূপ দৃশ্যকাব্য অর্থাৎ নাটকে রায় দীনবন্ধু মিত্র সামাজিক বিবিধ চিত্র অঙ্কনের অত্যাশ্চর্য্য শক্তি প্রদর্শন করিয়া বীণাপাণির "বরপুত্র" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

বাঙ্গালা ১১৩৮ সালে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী চৌবেড়িয়া গ্রামে বাঙ্গালা ভাষায় নাটকের সৃষ্টিকর্ত্তা রায় দীনবন্ধু মিত্র জন্ম গ্রহণ করেন। হিন্দুকলেজে অধ্যয়নকালীন তদানিন্তন বঙ্গসাহিত্যাধিপতি ও প্রকাশ্য সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়

হয় এবং সেই সময় হইতেই দীনবন্ধু বাবু, গুপ্ত মহাশয়ের কাব্য-শিষ্য হন। পোষ্টাফিসের ইনস্পেক্টারী পদে নিযুক্ত থাকিয়া ইনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বঙ্গের ইতর কৃষক হইতে সহরে বাবু পর্য্যন্ত সকল প্রকার জীবনে ও স্থান-ভেদে বাঙ্গালা ভাষার পার্থক্য সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন সেই অভিজ্ঞতার ফল তাঁহার নাটকে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, বস্তুতঃ সামাজিক "ফটো" তুলিতে তিনি যেরূপ নিপুণতা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতি বিরল অথবা দুষ্প্রাপ্য। ব্যঙ্গশ্লেষ ও হাস্যরসে—গুরু অপেক্ষা বরং শিষ্যই অধিক বাহাদুরী দেখাইয়াছেন। তৎকালে নীলকর সাহেবগণের অত্যাচার স্রোতে তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হয় এবং তদীয় গুরুর মৃত্যুর পরবৎসর ইনি "নীলদর্পণ" প্রণয়ন করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি "মানব চরিত্র" "জামাই ষষ্ঠী" প্রভৃতি অনেকগুলি হাস্যরসাত্মক কবিতা দ্বারা "প্রভাকরের" জ্যোতি বৃদ্ধি করেন। পরে তিনি "নবীন তপস্বিনী" লীলাবতি, সধবার একাদশী, কমলে কামিনী, জামাই বারিক, বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো প্রভৃতি নাটক ও সুরধুনী প্রভৃতি কাব্য প্রণয়ন করেন। তাঁহার গ্রন্থে সমাজ ও স্থান-ভেদে বাঙ্গালা ভাষার বৈচিত্র উত্তমরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সহরের ইংরাজি বুক্‌নিযুক্ত ভাষা অনেকেই অবগত আছেন, সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গের ও পল্লী-গ্রামের কৃষকের প্রচলিত ভাষার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"সধবার একাদশী"তে রামমাণিক্য বলিতেছেন—"ম্যারে ফেল্‌চে, ম্যারে ফেল্‌চে, নউলবাবু স্থাহো স্থাহো, এহানে আস্তে স্থাহো; পুঙ্গির বাই হালা মাতাল হইয়া ম্যারে ফেল্‌চে, বাগ্যাদবীরে র‍াঁড়ী কর্‌চে। বাগ্যাদরী ক্যাবল ছোট ম্যাইয়া, খোই দোই খ্যাইয়া একাদশী কর্‌বে কেমনে? আবার নীলদর্পণে কৃষক রাইচরণের ভাষণ এইরূপ—"মুই বোল্‌বো কি; জমিতি দাগ্ মারতি নাগ্‌লো, মোর বুকি য্যান বিদে কাটী পুড়িয়ে দিতে লাগ্‌লো, মুই পায় ধল্লাম, ট্যাকা দিতি চালাম তা কিছুই শুন্‌লে না, মুই ফোজ্‌দুরী কর্‌বো বলে সেঁশিয়ে এইচি।"

সুরধুনী কাব্যও মিত্র মহাশয়ের লেখনীপ্রসূত; ইহাতে "গঙ্গা পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে (সাগরে) যাইতেছেন। কবি গঙ্গাতীরবর্ত্তী অনেক গ্রাম ও তত্তৎ গ্রামবাসী অনেক মহাত্মার পরিচয় দিয়াছেন নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

"চন্দননগর ধাম ফ্রেঞ্চ অধিকার॥
কলেবর ক্ষুদ্র কিন্তু বড় ব্যবহার॥
ভদ্রপল্লী বৈদ্যবাটী পণ্ডিতের বাস।
শাস্ত্র আলাপন যথা হয় বার মাস॥
কায়স্থ নিবাস কোন্নগর বিশাল।
স্থিত যথা শিবচন্দ্র পুণ্যের প্রবাল॥
বামে হালিসহর নগর রসময়।
বিবাহ বাসরে যথা নৃত্যগীত হয়॥
ভদ্রজন বাসস্থান গরিফা নৈহাটী।
ভাটপাড়া যথা চতুষ্পাঠী পরিপাটী॥

মহানগরী কলিকাতা বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন—

"মেডিকেল কলেজ নিদান অধ্যয়ন।
প্রজ্বলিত দেখ কত ভিষক্-রতন॥
প্রবীণ নবীনকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ কবিরাজ।
যার করে মহারোগ পেয়ে যায় লাজ॥

গুণবন্ত চন্দ্রদেব রোগীর নিস্তার।
জরম্যান্ বৈদ্যশাস্ত্র অনুবাদকার॥
ওই দেখ প্রভাকর-পত্র-যন্ত্রালয়।
এক বিনা একেবারে অন্ধকারময়॥
অক্ষয়কুমার বিজ্ঞবর মহামতি।
পরিষ্কার মিষ্ট-ভাষ করেছে সংহতি॥
রহস্য কৌতুক হাসি রসিকতা ভরা।
হুতোম পেঁচার ধাড়ি পড়েছেন ধরা॥
ওই ছাখ রাজেন্দ্র মল্লিক রম্যবাড়ী।
দ্বারে শিখ্ দ্বারবান্ ভয়ানক দাড়ী॥

সুরধুনী কাব্য।

গীত, পাঁচালী ও কবিপ্রণেতারাও অনেকাংশে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। গীত প্রণয়নে অকিঞ্চন (দেওয়ান রঘুনাথ রায় মহাশয়) নীলাম্বর ও কমলাকান্ত এবং পাঁচালীতে ৺ দাশরথী রায়ই প্রধান। ইহাঁদিগের রচনা অতি সুন্দর, দাশরথী রায়ের অনুপ্রাস ও শব্দবিন্যাসের বাহাদুরী সর্ব্বজনপ্রশংশিত। তাঁহার পাচালীতে সকল প্রকার রসেরই অবতারণা আছে। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পিল্লাগ্রাম ইহাঁর জন্মস্থান। দেওয়ান মহাশয় পূর্ব্বস্থলী-গ্রামনিবাসী। বর্দ্ধমানাধিপতির সরকারে দেওয়ানী কার্য্য করায় তদীয় বংশ "দিউয়ান" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহাঁর প্রণীত গীতগুলির রচনা অতি সুন্দর, তবে কঠিন ও সমাসযুক্ত শব্দ ব্যবহারে এবং অলঙ্কারের আধিক্যে স্থানে স্থানে সহজ বোধগম্য হয় নাই। নিম্নে তাঁহার গীতের দুইটী নমুনা প্রদত্ত হইল।

"অবিদ্যাঘনে করিল নিবিড় অন্ধকার।
অহমেতি মমেতি নাদে গর্জ্জয়ে বারম্বার।
ধনাশা বায়ু প্রচণ্ড,
বহে প্রতিক্ষণ দণ্ড,
সশোক করকা বর্ষে মোহ বারি ধার॥
দুর্যোগে পড়িয়া হরি,
অন্ধবৎ কিছু না হেরি,
যদি কচিৎ হয় চিৎ-তড়িত সঞ্চার;
দুঃখাশনিতে মূর্চ্ছিত,
কভু ভ্রমে মুদান্বিত,
এ যন্ত্রণা অকিঞ্চনে দিও না কৃষ্ণ আর॥"

তিনি হরগৌরীর রূপ বর্ণনায় যে গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহা এই ;—

"হরগৌরী মিলিতাঙ্গ হইয়ে কে বিহরে।
কাঞ্চনে জড়িত যেন হীরকমণি শোভা করে
আধ মৌলী জটা'পরি বেষ্টিতা ফণী,
কুল কুল ধ্বনি তাহে করিছে মন্দাকিনী,
চাঁচর চিকুর বেণী কি শোভে আধ শিরে॥
কিবা লোহিতবরণ, এক নয়ন ঢর ঢর(১)
অপর লোল খঞ্জনজিনি রচিত কাজর (২)
গলে অক্ষমালা দোলে মণি মুকুতাহারে।
কাঞ্চন বলয় অঙ্গুরী বাম ভুজে,
অঙ্গুলী দলে নখরে ছলে কত বিধু সাজে,
অপর করে শোভিছে বিশাল ডম্বুরে॥
নীল পট অজিন পরিধান অতি সুন্দর;
বাম পদকমলে বাজিছে ঘুমুর মঞ্জির;
দক্ষিণ চরণে নৃত্য করি তাল ধরে—
আধ ভালে কিবা ঝলকিছে বালক ইন্দু।
প্রকাশিছে অরুণ কিরণ আধ সিন্দুর বিন্দু॥
অকিঞ্চন ভাবে সদা ঐ রূপ অন্তরে॥

কমলাকান্তও বর্দ্ধমানাধিরাজ তেজশ্চন্দ্রের প্রসন্নতা লাভ করিয়া রাজসভায় সভাপণ্ডিত রূপে নিযুক্ত হন। গীত রচনায় ইনি অনেকাংশে রামপ্রসাদের অনুকরণ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত

(১) ঢল ঢল। (২) কাজল।

গীতগুলিও অত্যন্ত ভাবোদ্দীপক এবং ভক্তিরসাত্মক অথচ অকিঞ্চনের রচনা অপেক্ষা সরল ও সহজবোধ্য। একটী গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"জাননা রে মন পরম কারণ
কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়—
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি
দনুজ তনয়ে করে সভয়;
(কভু) ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়—
ত্রিগুণ ধারণ, করিয়ে কখন
করয়ে সৃজন-পালন-লয়;
(কভু) আপন মায়ায় আপনি বাঁধা
আপন মহিমা আপনি গায়
যে রূপ যে জনা, করয়ে ভাবনা
সে রূপে তার মানসে রয়
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে
কমল মাঝারে করে উদয়।

গীত, পাঁচালী, কবি, যাত্রাভিনয়, নাটক ও প্রহসনাভিনয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক পরিমাণে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। প্রসিদ্ধ টপ্পা গীতরচয়িতা নিধু বাবুর রচনা অতি সুললিত। ইঁহার মাতৃভাষার প্রতি যে ভক্তি ছিল তাহা তাঁহার রচিত একটী কবিতাতেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; সেটী এই;—

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা।
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা?
কত নদী সরোবর,
কি বল চাতকীর;
ধারা জল বিনে কভু মিটে কি তৃষা॥

গীত ও পাঁচালী প্রভৃতির বিস্তৃত সমালোচনায় "পুথি বাড়িয়া" যাইবার ভয়ে তাহা অগত্যা এস্থলে পরিত্যাগ করিতে হইল।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সকল গ্রন্থাদি দেখা যায় তাহা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) সংস্কৃত-বাঙ্গালা—যেমন কাদম্বরী, শকুন্তলা, সীতার বনবাস প্রভৃতি। (২) মিশ্রিত-বাঙ্গালা—বর্ত্তমান প্রচলিত উপন্যাস, নবন্যাসাদি। (৩) আদিম বাঙ্গালা—যেমন আলালের ঘরের দুলাল, হুতোম প্রভৃতি।

ইংরাজাধিকারে বাঙ্গালা ভাষায় অনেক ইউরোপীয় ভাষার শব্দ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যেমন বেঞ্চ, পোষ্ট, টেবিল, চেয়ার, বাক্স, ট্যাক্স ইত্যাদি শব্দ ইংরাজী; ফিতা, বারেণ্ডা, পাদ্রী, ইস্পাত, চাবি, কেরাণী, গির্জ্জা, নিলাম, সাবান প্রভৃতি শব্দ পর্টুগিজ; ম্যালেরিয়া, পিস্তল, গেজেট, কাপ্তেন প্রভৃতি শব্দ ইট্যালিক; টেলিগ্রাফ, থিয়েটার প্রভৃতি শব্দ গ্রীক; ডিপো, ফিরিঙ্গী, প্রোগ্র'ম, বিস্কুট, অডিকলম, পোটম্যাণ্ট, ইত্যাদি শব্দ ফ্রেঞ্চ।

এই প্রকারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বৈদেশিক শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণয়ন করিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। আদালতের কাগজ পত্রে ও জমিদারী, মহাজনী হিসাবে আজিও অনেক পার্‌সী ও আর্‌বী শব্দের প্রচলন আছে। কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ ঠিক্ অবিকৃতভাবে পত্রাদিতে ও গ্রন্থে বর্ত্তমান আছে যেমন শ্রীচরণেষু নিবেদন মেতৎ, কিমধিকমিতি, জয়স্তু, দীর্ঘায়ুরস্তু, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, যৎপরোনাস্তি ইত্যাদি।

এই প্রকারে বাঙ্গালা সাহিত্য পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে উপস্থিত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান অবস্থা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন সুতরাং তৎসমালোচনায় বিশেষ প্রয়োজন নাই। মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে নানাবিধ পুস্তকাদি প্রণীত হইতেছে। এই সমুদয়ের সমালোচনায় তাহার গুণাগুণ ব্যক্ত হইবে।

শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।

কৃষি।

২

চাষা বলিলেই আমাদের দেশীয়দিগের হৃদয়ে যেরূপ এক প্রকার অসভ্য মূর্ত্তি উদিত হয়, তেমনি কৃষিকার্য্য বলিলেও লোকে কেমন কাদামাখা গোছের উঞ্ছবৃত্তি বুঝিয়া লয়। লোকের যেরূপ ভাবের উদয় হয় বাস্তবিক কৃষি-বিদ্যা সেরূপ অবস্থার হওয়া দূরে থাকুক, লোকে যে সকল বৃত্তিকে ভক্তি করে তাহা অপেক্ষা অধিক ভক্তি ভাজন। আমাদের দেশে কৃষক বলিতে মহাজনের ঋণে জর্জ্জরীভূত মলিন বসন অতি দীন হীন ব্যক্তি বুঝায় কেন? যে দেশের যে ব্যবহার, আমরা জীবনোপায় স্বরূপ কৃষি কার্য্যের ভার সেইরূপ লোকেরই হস্তে প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত আছি, তাহারাই আমাদিগের আহারীয় যোগাইতেছে সুতরাং আমরা বুঝি—বুঝায়ও তাহাই। কোন সময়ে এক জন বলিয়াছিল "ধান্য না জন্মিলে ক্ষতি কি"—আমাদের বোধশক্তি সেই বক্তার অপেক্ষা বড় অধিক প্রশংসনীয় নহে, আমরা সুখে থাকিতে চাহি, দেশে খাদ্যের সচ্ছলতা চাহি, কিন্তু তা বলিলে কি হয় যে উপায়ে সে কার্য্য সাধিত হইবে, তাহা দেখিতে চাহি না, তাহার উন্নতি করিতে চাহি না। অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের যৎসামান্য চাষবাস আছে, অনেক ধনবানের বহু বহু বিঘা ধান্যোৎপাদক ভূমি আছে বলিয়া যে তাঁহাদের দ্বারা কৃষি কার্য্যের যথেষ্ট উপকার হইতেছে তাহা আমরা স্বীকার করি না। যে উপায়ে চিরকাল কর্ষণকার্য্য হইয়া আসিতেছে, যেরূপে সামান্য কৃষকগণ প্রভুর ভূমি বা খাজনার ভূমি কর্ষণ করিতেছে, তাহা প্রবর্ত্তিত রাখা আমাদিগের মতে কৃষির উন্নতি নহে। বাস্তবিক সেরূপ কার্য্যেও কতকটা দেশের উপকার আছে বটে, কিন্তু সে উপকার অতি সামান্য, আমরা সে উপকারকে উপকার বলিয়া গণি না। নূতন শিক্ষা প্রণালীর দ্বারা যেমন মানসিক উন্নতি হইতেছে সভ্যতার দ্বারা যেমন জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে এ পর্য্যন্ত কৃষি কার্য্যের কি সেরূপ উন্নতি হইয়াছে? বালকগণ যে বিদ্যালয়ে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা করে সে বিজ্ঞান তাহাদের কিসে লাগে? এরূপ প্রয়োজনীয় বিষয় সকলে যদি না লাগিল তাহা হইলে আর কি হইল? ছাত্রগণ যে সকল ঔপপত্তিক জ্ঞান লাভ করে, যত দিন সেই জ্ঞান

কার্য্যতঃ এই সকল বিষয়ে না লাগিবে ততদিন আমরা কিছুই উন্নতি করিতে সক্ষম হইব না।

মৃত্তিকার সার বিবেচনা—সার যোজনা প্রভৃতি কার্য্য মান্ধাতার সময়েও যেরূপ ছিল এখনও সেইরূপ আছে। যদি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সকল বিষযে মনোনিবেশ করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় এতদিনে কত উন্নতি করিতে পারা যাইত তাহা বলিতে পারা যায় না। আমরা কৃতবিদ্যদিগকে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া লাঙ্গল ধরিতে বলিতেছি না। লাঙ্গল ধরাকেই যে কৃষি কার্য্য বলে তাহা আমরা স্বীকার করি না। লাঙ্গল যাহারা ধরিয়া আসিতেছে তাহারাই ধরুক তবে সেই লাঙ্গলধারীদের শিক্ষা না থাকায় তাহারা যে যে অংশ সুসম্পন্ন করিতে অপারগ সেই সেই কার্য্যে কৃতবিদ্যগণ সহায় হইয়া তাহাদিগকে চালাইতে থাকুন তাহারা উপযুক্ত পৃষ্ঠবল প্রাপ্ত হইয়া দেশের উন্নতির মূল স্বরূপ কৃষি কার্য্যের উন্নতি করিতে থাকুক। যে অংশের অভাব আছে কৃতবিদ্যগণ যদি সেই অংশ পূরণ না করেন কে করিবে? তাহার অপূরণের জন্য দায়ী কে? বিদ্যা শিখিলেই যে কেবল কয়েকটী নির্দ্ধারিত উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে—সকলকেই যে উকীল ডাক্তার হইতে হইবে তাহার অর্থ কি?

আমরা এইস্থলে দেশীয় ধনবানদিগকেও এই অনুরোধ করি যে তাঁহাদের দেশের এ কলঙ্ক উদ্ধার করুন। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যেরূপ কর্ষণোপায় সকল আছে, তাহা এ দেশে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করুন। আমরা বিলাতী কলে চাষ করাকে বিলাতী উপায়ে চাষ করা বলি না, তবে কার্য্যের রীতি নীতি কতকটা পরিমাণে পাশ্চাত্য সভ্যদেশের মত হওয়া উচিত।

বরং দুই একটী পাশ্চাত্য কৃষক আসিয়া দেশকে দোহন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, দেশীয় কৃষাণদিগের পরিশ্রমের অংশ গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু আমাদের দেশীয় কৃতবিদ্যগণ উপার্জ্জনের উপায়াভাবে নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ হইয়াও সেই কেরাণিগিরি, উকিলি, ডাক্তারী প্রভৃতি জনাকীর্ণ জীবনোপায়ের পথে বৃথা ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভিন্ন দেশীয় লোকের ভিন্ন অভিপ্রায়, তাঁহাদের এদেশের প্রতি মায়া অল্প, যাহাতে তাঁহারা নিজে যথেষ্ট লাভ করিতে পারেন, যাহাতে এদেশের রক্ত মাংসে স্বদেশের উপকার হয়, যাহাতে স্বদেশীয়গণ সুখী হয় তাহারা তাহারই চেষ্টা করিতেছেন, সুতরাং তাহাতে আমাদের উপকারের কথা দূরে থাকুক অপকার ভিন্ন আর কিছুই লাভ হইতেছে না। লোকে তর্কের অনুরোধে যাহা বলেন বলুন কিন্তু সরল বিশ্বাস ও যুক্তিতে যাহা দেখিতে পাইতেছি তর্কের অনুরোধে তাহাকে অন্য প্রকার বলিয়া বর্ণন করিতে পারি না। সাহেবগণ "চায়" আবাদ করেন নীলের কুঠি করেন তাহাতে আমাদের উপকার কি? চা আমাদের সুখার্থে প্রস্তুত হয় না, নীল আমাদের তত প্রয়োজন সাধন করে না, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে চা ও নীল আহার করিয়া দেশের লোক জীবন ধারণ করে

না। তাহার দ্বারা যথেষ্ট অর্থলাভ হয় বটে, কিন্তু সে লাভ সাহেবদিগের হয় সে অর্থে ভিন্ন দেশের পুষ্টি সাধন করা হয়। আমাদেব দেশে রত্ন আছে, আমরা হাত বাড়াইলেই তাহা পাইতে পারি, কিন্তু তাহা লইব না, বিদেশীয়েরা সে সকল লইয়া যাইবে, আর আমরা তাহাদের দয়ার অধীন হইয়া মুষ্টিভিক্ষা-লাভার্থ দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিব; ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? যে রত্ন লইয়া তাহারা আমা-দিগকে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রদান করিবে আমরা কেন নিজেই সেই সকল রত্ন সংগ্রহ করিয়া পরকে ভিক্ষা দিতে শিক্ষা করি না।

আমাদের দেশীয় লোকেব একটি অভ্যাস এই যে কোন কার্য্যেই অগ্রে প্রবৃত্ত হইতে পাবে না, কেহ অগ্রসব হইয়া দেখাইয়া দিলে সকলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে পারে।

"ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ সিদ্ধেকার্য্যে সমং ফলং।
যদি কার্য্যে বিপত্তিস্যাৎ মুখবস্তত্র হন্যতে॥"

বিষ্ণুশর্ম্মার এ উপদেশ বাক্যটি বাস্ত-বিক মহামূল্য বটে কিন্তু তাই বলিয়া যদি সকল বিষয়েই এরূপ বিচার করা হয়, তাহা হইলে আর কোন কার্য্যই করা হয় না। যাহা হউক যখন সাধারণ লোকে আপনা আপনি প্রবৃত্ত হইবে না তখন অন্ততপক্ষে দুই এক জনকেও প্রথম অগ্রসর হইয়া দেখান নিতান্ত কর্ত্তব্য। কৃষিবিদ্যা বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষায় কয়েকখানি পুস্তক হই-য়াছে বটে, কিন্তু সেরূপ পুস্তক প্রকাশে বা আমাদের ন্যায় প্রবন্ধ লিখিয়া কি উপকার দর্শিতে পারে? সেরূপ উপায় করা আর না করা সমান তবে আমাদের একান্ত অনুরোধ এই যে কেহ একটী আদর্শক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া, রীতিমত খামারকুটি প্রভৃতি করিয়া নূতন ধরণের চাষ করিতে আরম্ভ করুন—রসায়ন বিদ্যার সহায়তা লইয়া মাটীর সার স্থির করুন—অনুপযুক্ত মৃত্তিকাকে সার দ্বারা উপযুক্ত করিতে থাকুন এবং এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া দেশের প্রয়ো-জনীয় শস্য সকল প্রস্তুত করুন। লোকে দেখিয়া শিখুক কিরূপে কৃষি কার্য্যের উন্নতি হয়, কিরূপে কৃষি কার্য্যের দ্বারা অপরাপর উপায়াপেক্ষা অধিক অর্থ সংগ্রহ কবিতে পারা যায়। এরূপ আদর্শক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে কিছু অর্থ ব্যয় হইবে বটে কিন্তু সে অর্থ ব্যর্থ হইবে না, তাহার দ্বারা যে যথেষ্ট লাভ হইবে তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, এমন কি যদি কেহ আমাদিগকে প্রতিভূ করিতে ইচ্ছা করেন আমরা তাহাতে স্বীকৃত আছি। আমরা সেরূপ আদর্শ-ক্ষেত্রে ব্যয়িত মুদ্রার জন্য দায়ী হইতে পারি আমাদের এতদূর সাহস আছে।

বোবামেয়ে।

প্রথম খণ্ড দ্বাদশ সংখ্যা ৭৬৮ পৃষ্ঠার পর হইতে।

চটীর একটী ঘরে সে সময় কতকগুলি বল্‌দে আপনাপন কার্য্যের পর সুখসেব্য তাম্রকুটের সেবায় তৎপর ছিল, মধ্যে মধ্যে, আপনাপন মন্তব্যের আলোচনায় রত ছিল, রাত হয়ে গেছে। বল্‌দেরা যে ঘরে ছিল সেই ঘরটী উপযুক্ত ভেবে মদনমোহন বল্‌দেদের তাড়াবার মানসে পণ্ডিত মহাশয়ের কানে কানে বলিলেন। এসব অতি দুরন্ত লোক। চটীতে সন্ধান লয়ে শেষে এরাই পথিকের সর্ব্বনাশ সাধন করে থাকে, এখানেই এদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে। এই বলেই কথায় কথায় বল্‌দেদের স'ঙ্গ ঝকড়া আরম্ভ কর্‌লেন, একজনকে বল্লেন তো'ব্যাটারা ভাবি পাজি জানিস্‌নি যে তোদের যম আমি এখানে এসেছি, একটু বুকে ভয় নাই, এখনি এখান থেকে উঠে পালা, নৈলে তোদের জান থাক্‌বে না।

প্রথম বল্‌দে। কেন কর্ত্তা তুমি কি নবাব পুত্তুর এয়েছো যে তোমায় ভয় কর্‌তে হবে?

দ্বিতীয় বল্লে "ওরে জাসিনে? কল্‌-কাতার বাবু—হেতা বাবুগিরি জানাতে এসেচে।"

তৃতীয় অমনি ফিরে দেখে বলে উঠ্‌ল "হাত্তোর বাবু! অমন অনেক সুমুন্দীকে দেখা আছে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজাধিরাজের সেইরূপ অপমান দেখে একেবারে চটে লাল হয়ে গেলেন; গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে বল্লেন "পাজি, বোল্লিক বেটারা জানিস্‌, কার সঙ্গে কথা কচ্চিস্‌? রাজাধিরাজ মহারাজের সম্মুখে যা খুষি তাই—"

"ও চাচা ও নবাবপুত্তুর রাজপুত্তুর কিছু বলিস্‌নে এখনি ছমাস ফাঁসি দেবে।"

কথায় কথায় মহাগোলযোগ মহা-কলহ উপস্থিত হল। মদনমোহন সহসা পেন্‌টুলনের পকেট হতে একটা পিস্তল বাহির করে বল্‌দেদের অভিমুখে আও-য়াজ করে দিলেন,—পিস্তলের মধ্যে কেবল বারুদ ছিল, গুলি দেওয়া ছিল না, সুতরাং কিছুই অনিষ্ট হল না; কিন্তু বল্‌দেরা একেবারে ভয়ে কেঁপে গেল। মদনমোহন পুনরায় বামদিকের পকেট হতে আর একটা পিস্তল বাহির করে ফেল্লেন। পণ্ডিত মহাশয় সেই ব্যাপার দেখে একেবারে ভয়ে হতজ্ঞান হয়ে "সর্ব্বনাশ হল, খুন—খুন!" বলে দৌড়িলেন। বল্‌দেদের মধ্য হতে এক-জন পরিণতবয়স্ক উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন "কর্ত্তা গোষা করবেন না—ওরা নাবালক ছাবাল ওদের কথায় গোষা কর্‌সেন না—আমরা আপ্‌নার চাকর গরিব মার্‌লে মার্‌তে পারেন, রাখ্‌লে রাখ্‌তে পারেন; হুকুম কল্লেই উঠে যাচ্চি, তার আর কি?"

চটীওয়ালার স্ত্রী একটী ভিন্ন গৃহে নিদ্রিত ছিল, সেই গোলযোগে তার নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। কিসের গোল, হয়ত চোর এসে থাকবে; এই মনে

করে যেমন সে সেইদিকে দৌড়ে আস্‌বে; পণ্ডিত মহাশয় অন্ধকারে দৌড়ে পালাচ্ছিলেন একেবারে তার ঘাড়ে গিয়ে পড়্‌লেন। সে অমনি "চোর চোব" বলে প্রাণপণে তাঁকে জড়িয়ে ধব্‌লে; পণ্ডিত মহাশয় ছাড়িযে পালাবাব জন্য অনেক চেষ্টা কব্‌লেন, কিন্তু সে তাঁহাব অপেক্ষা অধিক বলবতী ও স্থূলকায় ছিল, সুতরাং সকল চেষ্টাই বিফল হল। সে তাঁকে ধরে "বামা বামা" বলে ডাক্‌তে লাগ্‌ল। দৈববশে সেই সময় চটীওয়ালা দোকানীও গোলযোগেব কারণ কি দেখ্‌বাব জন্য একটী আলোক হস্তে সেই দিকে আস্‌তেছিল, নিজ স্ত্রীর সঙ্গে পণ্ডিত মহাশযকে দৃঢ় আশ্লিষ্ট দেখে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠ্‌ল। "একি ঠাকুব, তোমার এই কাজ! ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হযে তোমাব এই কাজ! তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেচে, তোমার কি না গৃহস্থেব বৌ ঝীব উপব অত্যাচাব?" এক গোলযোগেব নিবৃত্তি হয়ে আর এক গোলযোগ উপস্থিত। দোকানী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে প্রহার কব্‌তে উদ্যত। উপস্থিত গোলযোগে পূর্ব্ব কলহ নিবৃত্তি হযে গেল। মদনমোহন ও সুবেশ দ্রুত সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। চটীওয়ালা-গৃহিণী প্রদীপের আলোকে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে দেখে থতমত খেয়ে বল্লে "ওমা; বামুন ঠাকুর—বামুন ঠাকুর দৌড়ে যাচ্ছিলেন, আমি মনে করেছিলাম চোর।" গৃহিণীর কথায় চটীওয়ালার কতক সন্দেহ দূর হল,—সুরেশ মধ্যস্থ হয়ে অবশিষ্ট সমস্ত মিটিয়ে দিলেন। দোকানী চলে গেল।

দোকানের ঝি বামা গৃহটী যথাসম্ভব পরিষ্কার করে কএকটা ছিন্ন মাদুরের উপর একখানি ছিন্ন গাল্‌চে পেতে দিল। সমস্ত গোলযোগ এক একার মিটে গেল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনে এখন আহারাদি আয়োজনের চিন্তা উদিত হল। পাচক ব্রাহ্মণ, কোচমান প্রভৃতি সকলেই ভগ্ন গাড়িখানিব সহিত পশ্চাতে পড়ে আছে,—এখন স্বয়ং সমস্ত কব্‌তে হবে; পণ্ডিত মহাশয় মনে মনে বড় বিরক্ত হলেন, কিন্তু কি কব্‌বেন অন্য উপায নাই; কাজে কাজে নিজেই সমস্ত উদ্যোগ কবতে যেতে হল। এখন গোলযোগ মিট্‌মাট্‌ হয়ে গিয়ে সমস্ত নিবস্ত হল দেখে সুরেশ কতক স্থির হয়ে একটী ক্ষুদ্র বাতাযনেব পার্শ্বে উপবিষ্ট হযে আপনার স্বাভাবিক চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি মনে মনে পল্লী গ্রামবাসীদেব সঙ্গে নাগরিকদের তুলনা কব্‌তে লাগ্‌লেন—মনোমধ্যে নানারূপ কল্পনাব উদয় হতে লাগ্‌ল। মদনমোহন নিজের বিষয় নিজেই ব্যতিব্যস্ত কিসে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট নিজ ছদ্মবেশ বজায রাখ্‌বেন সেই চিন্তাই এখন তাঁর প্রবল,—তিনি সেই চেষ্টাতেই বামাকে খুঁজ্‌তে গেলেন।

মদনমোহন একবার দোকানে গেলেন কিন্তু বামা সেখানে নাই; বিশেষ পণ্ডিত-মহাশয় সেখানে উপবিষ্ট আছেন, সুতবাং দোকানীর সঙ্গে কোনরূপ কথা বার্ত্তা হল না। বামা দোকানে নাই বাটীর মধ্যেও নাই, তবে কোথায়? নিশ্চয়ই কোন দ্রব্য আন্‌বার জন্য অপর স্থানে গিয়ে থাক্‌বে। মদনমোহন দোকান হতে একটু দূরে এসে পথে

পায়চারী করতে লাগলেন। বামা যথার্থই পণ্ডিত মহাশয়ের আজ্ঞামত কয়েকটা দ্রব্য আন্‌বার জন্য সেইদিকেই গিয়েছিল—ক্ষণকালের মধ্যেই ফিরে এল। মদনমোহন অমনি তার হাত ধরে একটু তফাতে নিয়ে গেলেন। বামা চটীর পরিচারিকা—সেই দরেরই লোক, সুতরাং হাত ধরাতে আর কোন আপত্তিই কর্‌লে না,—সঙ্গে সঙ্গে গেল। মদন বল্লেন "বামা, তোমাকে আমার একটা উপকার করতে হচ্চে ভাই।"

বামা। ঈষৎ মুচ্‌কে হেসে অঙ্গভঙ্গি করে বল্লে "যা হুকুম কর্ব্বেন তাই কব্‌ব তার জন্য আর কি?"

মদনমোহন তার সেই উত্তরে প্রীত হয়ে আপনার অভিপ্রায়গুলি ব্যক্ত করে, যে যেরূপে তাঁকে সাহায্য করতে হবে বল্লেন। যদিও তাঁর বর্ণিত কার্য্যগুলি বেস্ সন্দেহ উদ্দীপক, তথাপি সে কারণ জিজ্ঞাসা না করেই তাহাতে স্বীকৃত হল। বল্‌দেদিগের সহিত কলহ, পিস্তল বাহির করা ও বেশভূষা দেখেই বামার মনে প্রতীতি হয়েছিল যে মদনমোহন কোন ধনী বংশীয় বড়লোক হবেন,—অবশ্যই তাঁর নিকট কিছু পারিতোষিক পাবার আশা আছে, কাজে কাজে সে আর কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করেই অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন করতে স্বীকার কর্‌লে। বামা যে এত শীঘ্র সম্মত হবে, মদন তাহা একবারও মনে ভাবেন নাই; এখন সেইরূপ সহজে অভিপ্রেত সিদ্ধ হওয়াতে এত আনন্দিত হলেন যে, বাম বাহু দ্বারা তার কটিদেশ বেষ্টন করে মুখের দিকে চেয়ে দেখে বল্লেন "কেমন তবে স্বীকার?"

বামা সে কথায় কিছু উত্তর না দিয়া কেবল একটু হাস্‌লে। মদনমোহন বুঝ্‌লেন যথার্থই সে স্বীকৃতা বটে।

বামা অনেকক্ষণ গিয়াছে এখনও এল না—বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তার সেই বিলম্বে বিরক্ত হয়ে, নিজেই একটা আলোক নিয়ে দেখ্‌তে গেলেন। দোকান হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েই দেখ্‌লেন অদূরে মহারাজাধিরাজ সিকিমাধিপতি বাম বাহুতে দাসীটার কটীদেশ বেষ্টন করে কি বল্‌চেন। সহসা তিনি সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখেই একেবারে চম্‌কে গেলেন। একবার মনে কর্‌লেন, হয়ত অন্ধকারে ভুল দেখে থাক্‌বেন, আবার বিষম সন্দেহ উপস্থিত হল; নিশ্চিত জান্‌বার জন্য একটু আগিয়ে গেলেন। একি? যথার্থই যে মহারাজাধিরাজ সিকিমাধিপতি! হঠাৎ তাঁর মুখ হতে নির্গত হল "একি মহারাজ!—"

মদনমোহন পণ্ডিত মহাশয়ের কণ্ঠস্বর শুনেই একেবারে চম্‌কে গেলেন। বামা তাঁর হাত ছাড়িয়ে হন্ হন্ করে দোকানের দিকে চলে গেল। পণ্ডিত মহাশয় পুনর্ব্বার বল্লেন "মহারাজ, আপ্‌নি—আপ্‌নি এখানে!" মদনমোহন কোনরূপে অপ্রতিভ হবার পাত্র নহেন, সকল সময়েই উপস্থিত বুদ্ধি; পণ্ডিত মহাশয়কে দেখেই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বল্লেন "পণ্ডিত মহাশয়! পৃথিবীর সকলকেই সন্তুষ্ট রাখা উচিত—কি রাখাল, কি রাজা, যিনি সর্ব্ব প্রকার অবস্থার লোককেই তুষ্ট করতে পারেন, তিনি যথার্থ বুদ্ধিমান।"

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বল্লেন "আজ্ঞা—মহারাজ—তা—"

"হাঃ হাঃ হাঃ!—সেটা আপনার দেখ্‌বার ভ্রম—যেরূপ আপনি দোকানীর বিগতযৌবনা স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, সেইরূপ আর কি—হাঃ হাঃ!" উচ্চৈঃস্বরে হাস্‌তে হাস্‌তে মদনমোহন দোকানের দিকে চলে গেলেন। কোথায় মহারাজাধিরাজ পণ্ডিত মহাশয়কে দেখে অপ্রস্তুত হবেন, না তদ্বিপরীতে পণ্ডিত মহাশয়ই থতমত খেয়ে গেলেন,—আপনা আপনি বল্লেন "বড়লোকদিগের চরিত্রই এইরূপ,—ধনবান্ ক্ষমতাবান্ লোকের সকলই শোভা পায়।"

আহারের উদ্যোগ কেবল জলযোগ, সুতরাং আর বড় অধিক বিলম্ব হল না, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই সমাপ্ত হল। সুরেশ অবাধে চিন্তা কর্‌বার জন্য একটী নির্জ্জন গৃহের বাতায়নের নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেন। মদনমোহন বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে সম্বোধন করে বল্লেন "আর কেন, রাত্রি অধিক হইতেছে, বিশেষ পথের শ্রমে শরীরও অপটু, শয়ন করুন গে।"

পণ্ডিত মহাশয় বল্লেন "মহারাজ?"

"আমার একখানি পত্র লিখ্‌তে হবে কিছু বিলম্ব আছে।"

যথার্থই পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, সুতরাং আর দ্বিতীয় কথা না বলেই শয়ন কর্‌তে গেলেন। মদনের পত্র লেখা! লেখেন ইবা কাকে, পাটানইবা কোথা? তাঁর থাক্‌বার মধ্যে এক কাশীবাসী অবিরা বৃদ্ধা মাসী; মাসীর কেহই নাই, যা কিছু টাকা কড়ি সমস্তই মদনের। বৃদ্ধার কাল হলেই মদনমোহন সমস্ত নিজের হস্তে প্রাপ্ত হন, যথেচ্ছা ব্যয় কর্‌তে পারেন; অতএব তিনি যেরূপ মাসীর শুভানুধ্যায়ী তাহা আর বিশেষ বল্‌বার প্রয়োজন নাই; বিদ্যাবাগীশ মহাশয় গৃহ হইতে বহির্গত হবামাত্রেই তিনি ছিন্ন গাল্‌চে খানির উপর শুয়ে পড়্‌লেন।

আধঘণ্টার পর মদনমোহন উঠে একটা চুরট ধরিয়ে নিয়ে, ধূমপান কর্‌তে কর্‌তে পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহের দিকে গেলেন। দেখ্‌লেন পণ্ডিত মহাশয় তখনও শয়ন করেন নাই; লোকে খাট পালঙ্ক বা তক্তাপোষের উপরে শয্যা প্রস্তুত করে থাকে, কিন্তু হুগলীর চটীর আবার ভিন্ন প্রকারের অদ্ভুত বন্দোবস্ত।—প্রায় অ'ড়াই হাত উচ্চ একটা বাঁশের মাচার উপর আচ্ছাদন হীন মলিন তোষকের বিছানা। পণ্ডিত মহাশয় একে স্থূল খর্ব্বাকার তাহাতে আবার শয্যাটী যথেষ্ট উচ্চ—প্রায় তাঁর বুক সমান; তিনি অনবরত তার উপর উঠ্‌বার চেষ্টা কচ্চেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হতে পাচ্চেন না। গলদ্‌ঘর্ম্ম ঘন ঘন শ্বাস বচ্চে এক একবার অস্পষ্টস্বরে চটীওয়ালাকে গালাগালি দিচ্চেন। মদনমোহন তাঁর সেই দুর্দ্দশা দেখেই বল্লেন "কি পণ্ডিত মহাশয়, এখনও আপনি শয়ন করেন নাই?"

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় মনে মনে চটীওয়ালার উপর মহা চটেছিলেন, এখন মদনমোহনের কণ্ঠস্বর শুনেই ক্রুদ্ধস্বরে বল্লেন "দেখুন দেখি মহারাজ! বেল্লিক ব্যাটাদের আক্কেল দেখুন দেখি—সকলেই কি সাড়ে চার হাত লম্বা হয়ে থাকে? কোথায় বিছানা করে দিয়েছে দেখুন দেখি।"

মদনমোহন অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করে বল্লেন "আপনি এত কষ্ট ভোগ কচ্চেন, আমাকে ডাকেন নাই কেন?"

পণ্ডিত মহাশয় আর কি উত্তর দিবেন, রাজাধিরাজের মুখে সেরূপ কথা শুনে বড় কুণ্ঠিত হলেন। মদনমোহন নিকটে গিয়ে পণ্ডিত মহাশয়কে তুলে বিছানার মধ্যে ঠেলে দিলেন। বিদ্যা বাগীশ মহাশয় তোষকের উপর গড়িয়ে গেলেন। তিনি অনেক কষ্টে উদ্ধার হয়েছেন, আর যে পুনরায় নামবেন তার আর সম্ভাবনা নাই—মদনমোহন সন্তুষ্ট হয়ে গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গাড়ি চুরি।

প্রকৃতির সকলই পরিবর্ত্তনশীল। প্রকৃতি দেবী প্রতিক্ষণে—প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন নূতন বেশ ভূষা পরিধান কচ্চেন। এই মাত্র সমস্ত স্থির, পৃথিবী সুসুপ্ত, জগৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করে ছিল; এখনই আবার সে ভাব পরিবর্ত্তিত হয়ে চঞ্চল দক্ষিণ পবনে চারিদক যেন হেসে উঠ্‌ল। এইমাত্র যে তারকামগুলি উজ্জ্বলতম আভায় শোভিত ছিল, এখনই আবার ম্লান হয়ে ক্রমে ক্রমে বিলীন হতে লাগ্‌ল। এইমাত্র যে বনস্থলী স্থির নিস্তব্ধ যেন মৃয়মাণ হয়ে ছিল—মধ্যে মধ্যে কেবল এক একবার পেচকের কঠোর কণ্ঠস্বরে রোদন কচ্ছিল; এখনই আবার তাহা বনকুসুমরূপ মুখ বিকাশ পূর্ব্বক আনন্দে হাস্‌তে লাগ্‌ল—দুই একটী কলকণ্ঠ পক্ষীর মনোহর আনন্দময় গীত ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগ্‌ল।

পণ্ডিত মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হল, তিনি ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করে উঠে বসে হস্তদ্বয়ে চক্ষুমার্জ্জন কচ্চেন, এমন সময় সহসা শুন্‌তে পেলেন, বামা উচ্চৈঃস্বরে "ওগো তোমরা এ:গাও গো—ও—ও—চোরে সর্ব্বস্ব নিয়ে গেল গো—ও—ওগো তোম্‌রা এস গো—" বলে চীৎকার কচ্চে। তিনি অমনি ব্যাপার কি দেখ্‌বার জন্য তাড়াতাড়ি নাম্‌তে গেলেন, কিন্তু তত উচ্চ স্থান হতে সহসা নীচে পড়্‌তে সাহস হল না, ব্যস্ত সমস্ত ভাবে উপায় অনুসন্ধান কর্‌তে লাগ্‌লেন। পুনরায় রাজাধিরাজ সিকিমাধিপতিরও কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হল,—তিনিও চীৎকার করে বল্‌চেন "ধর্ ধর্ গেল গেল, চোর পালায, পালায়—"

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় আর থাক্‌তে পার্‌লেন না, চককাণ বুজে ঝুপ্‌করে লাফিযে পড়ে দৌড়ে দেখ্‌তে গেলেন। দেখ্‌লেন, বামা একটা ছোট ঘরের দ্বারে একগাছা ঝাঁটা হাতে করে উচ্চৈঃস্বরে লোক ডাক্‌চে, রাজাধিরাজ গৃহের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। চোরে সর্ব্বস্ব নিয়ে গেল—চোর ধর্‌বার জন্য নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে লোক ডাকা হচ্চে, দেখ্‌লে কার না সন্দেহ হয়?—পণ্ডিত মহাশয় যে এত নিরীহ গোবেচারা তাঁরও সেটা কেমন এক রকম বোধ হল, জিজ্ঞাসা কল্লেন "মহারাজ! আপনি এখানে?—কি হয়েচে?"

মদনমোহন গৃহ হতে বাহিরে এসে বল্লেন "আর কি হবে সর্ব্বনাশ হয়েচে—এতদিনের পুরাণ চাকর এরূপ নিমক্‌হারামী কর্‌বে জান্‌ব কিরূপে! আমার সেই গাড়িখানি গিয়েচে—আমার পিতা

পিতামহ যেখানি এত যত্ন করে রেখে-ছিলেন, আমা হতেই সেখানি গেল।”

‘গাড়িখানি গিয়েচে’ শুনেই পণ্ডিত মহাশয় একেবারে চমকে গেলেন, প্রথমে যে সন্দেহ হয়ে ছিল, তাহা আর মনো-মধ্যে স্থান পেলে না, সে সমস্ত ভুলে গিয়ে বল্লেন “সেকি! গাড়িখানি গেল কিরূপে?”

মনদমোহন বল্লেন “রাত্রি প্রভাত হতে না হতেই কোচম্যান আর সহিস পরামর্শ করে গাড়িখানি নিয়ে পালিয়েচে।”

“গাড়ির মধ্যে কিছু ছিল?”

“গাড়ির গদির তলায় একটী পোর্ট-ফোলিওর মধ্যে কতকগুলি দলিল আর হাজার পাঁচ ছয় টাকার করেন্সী নোট ছিল।—আমি সে টাকা কি দলিলের জন্য চিন্তিত নই; আমাদের পূর্ব্বপুরুষের তেমন সুলক্ষণ যুক্ত গাড়িখানি গেল—গাড়িখানি যে আমাদের বংশের লক্ষণ—সেখানি যে যত্ন করে রাখা আমার প্রপিতামহের আদেশ।—নূতন ক্রয় করলে তার অপেক্ষা উত্তমোত্তম গাড়ি পাওয়া যাবে যথার্থ, কিন্তু সর্ব্বস্ব দিলেওত আর সেখানি পাব না!”

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুই একজন করে ক্রমে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সুরেশ এসে উপস্থিত হলেন। ব্যাপার কি?—গাড়ি চুরি গিয়েছে। সুরেশ অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করে বল্লেন “তাইত এত দিনের পর হঠাৎ গাড়িখানা চুরি গেল গা?”

উপস্থিত লোকেদের মধ্যে একজন বল্লে “অতবড় গাড়িখানা স্বচ্ছন্দে নিয়ে পালাল কি করে?—আপনাদের সাক্ষা-তেই পালিয়ে গেল নাকি?”

মদনমোহন বল্লেন “আমি নিদ্রিত ছিলাম; সহসা ঘোড়ার ডাক্ শুন্‌তে পেয়ে উঠে পড়্‌লাম; জানালা দিয়ে দেখি কোচ্‌ম্যান গাড়িতে ঘোড়া যুতে কোচ্‌বাক্সে উঠ্‌চে। অমনি আমি চোর চোর বলে ধর্‌বার জন্য তাড়াতাড়ি বাহিরে এলাম—দেখি, আর নাই, তারা একেবারে ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে—কেমন বামা, তুমিও তখন ছিলে না?”

বামা বল্লে “হাঁ ছিলাম বৈকি—আমিই প্রথমে চোর চোর বলে সকলকে ডেকে ছিলাম,—কি কর্‌ব, আমি মেয়ে মানুষ, আপনারা এলেন না—তারা ঘোড়াকে এমনি চাবুক মাল্লে, ঘোড়া যেন উড়ে গেল।”

পণ্ডিত মহাশয় একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে বসে পড়লেন—পাচছয় হাজার টাকা আর সিকিমরাজবংশের পূর্ব্বপুরুষের গাড়ি, অমন ঘোড়া একমুহূর্ত্তে চোরে নিলে—কম কথা! তিনি কেবল সেই চিন্তাই কচ্চেন। পাছে হাসি আসে সেই ভয়ে সুরেশও নিস্তব্ধ। কেবল সিকিমাধিপতিই এক মুখে সহস্র কথা কচ্চেন—সকলের নিকটেই গাড়িখানির গুণাগুণ, চুরির বিবরণ এবং এ চুরিতে তাঁর কত ক্ষতি হল তাহা বর্ণন কচ্চেন। চটীওয়ালা ক্ষণকাল চুপ করে দাড়িয়ে থেকে বল্লে “আপনারা কেন এইবেলা চৌকিতে খবর দিন্ না—তারা আর এতক্ষণে কত দূর যাবে—খুব যায়, দুই কোশ।”

সেই কথা শুনেই পণ্ডিত মহাশয়ের মনে গাড়িখানি পুনঃপ্রাপ্তির কতক আশা হল, বল্লেন “ঠিক কথা, মহারাজ!

আপনি এইবেলা থানায় সংবাদ পাঠান, অবশ্যই চোর ধরা পড়্বে।"

মদনমোহন বল্লেন "পণ্ডিত মহাশয়! আপনি ক্ষেপেছেন? কোথায় আমি স্বয়ং তার বিচার করব, শাস্তি দেব—না একজন সামান্ত ব্যক্তির কাছে বিচরার্থী হয়ে দাঁড়াতে হবে? তারা নিমোকহারাম্—নিমক্হারামীই তাদের সাজা—আমি আর তাদের ভিন্ন শাস্তি দিতে ইচ্ছা করি না। টাকা নিয়েচে কি গাড়িখানি নিয়ে পালিয়েচে, তার জন্ত আমি চিন্তিত নই। তবে সে গাড়িখানি হল আমাদের বংশের লক্ষণ সেই যা;—যাক্ যেতে দাও নিমক্হারামদের ছোট নজর। আমি এখনই পত্র লিখ্চি, রাজধানি হতে শীঘ্রই টাকা এসে পৌছিবে।" সিকিমাধিপতি নিস্তব্ধ হলেন; তাঁর পক্ষে পাঁচ সাত কি দশ হাজার টাকা অতি সামান্ত, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় চিন্তাহীন হতে পার্লেন না; যদিও পরের বটে তথাপি অনেক টাকা, বিশেষতঃ সিকিমরাজবংশের পবিত্রগাড়িখানিতে আর বস্‌তে পাবেন না।

বেলা দশটার সময় সুরেশের গাড়িখানি, পথের পার্শ্বস্থ চটীতে চটীতে অনুসন্ধান কর্‌তে, কর্‌তে, সেইখানে এসে উপস্থিত হল। মদনমোহন গাড়িখানির প্রতীক্ষায় পথের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কোচ্‌ম্যান নিয়ে নাম্‌তেই নিকটে আহ্বান করে একটী টাকা প্রদান পূর্ব্বক কি বলে দিলেন। সে ঈষৎ হেসে সেলাম করে বাড়ীর মধ্যে নিজ প্রভুর নিকটে গেল।

স্নানাহারাদি পূর্ব্বেই সমাপিত হয়েছিল, সুতরাং গাড়িতে উঠ্‌তে আর অধিক বিলম্ব হল না। পুনরায় তিন জনে বর্দ্ধমানাভিমুখে চল্লেন।

মদনমোহনের এখন এক মাত্র চেষ্টা কিরূপে আপনার ছদ্মবেশ বজায় রাখেন। প্রথম প্রথম উপায় গুলিতে এক প্রকার কৃতকার্য্য হয়েছেন; এখন অবশিষ্ট ব্যাপারটাই কিছু কঠিন। সুরেশ যে টাকা দিয়েছিলেন সে সমস্ত ব্যয় হয়ে গেল; আর হাতে কিছু নাই। নিঃসম্বল সিকিমাধিপতির মান থাক্‌বে কিরূপে? হুগলীতে গাড়িখানির সঙ্গে অনেকগুলি টাকা চুরি গিয়েছে যথার্থ বটে!—কিন্তু তাই বলে রাজাধিরাজের হাতে এক কপর্দ্দকও নাই—বরাবর পরের গাড়িতে চড়ে, পরান্নে উদর পূরণ করে আস্‌চেন—পণ্ডিতমহাশয়ের হাত-তোলার অধীনে আছেন, সে কথাটা বড় ভাল নয়; বিশেষ সেরূপ করে কত দিন বিশ্বাস বজায় রাখ্‌তে পারেন? সুতরাং সরল-হৃদয় বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে প্রতারিত করে, সুরেশের তহবিলটী হস্তগত করা নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়্‌ল,—মদনমোহন মনে মনে কেবল সেই চিন্তাই কর্‌তে লাগ্‌লেন। তিনি মধ্যে মধ্যে নিজ ভ্রমণ-বিবরণই বর্ণন করুন, আর সিকিমরাজধানীর প্রাকৃতিক শোভারই পরিচয় দিন্, মনোমধ্যে কেবল সেই একমাত্র উদ্দেশ্যই জাগরূক। পণ্ডিত মহাশয়ও সেইরূপ যত নূতন আশ্চর্য্য ইতিহাসই শ্রবণ করুন না কেন, গাড়িচুরিটা আর কোন মতে ভুল্‌তে পার্‌লেন না। বাস্তবিক সেটা ভোল্‌বারও কথা নয়,—এমনসুলক্ষণাক্রান্ত প্রাচীন রাজবংশের গাড়ি হারাণ কি কম দুর্ভাগ্যের বিষয়!

ক্রমে গাড়ি খানি লোকালয় ছাড়িয়ে একটী বৃহৎ মাঠের উপর দুই শ্রেণী

বাব্‌লা গাছের মধ্য দিয়ে চল্‌ল। মদনমোহন এই সুযোগে বল্লেন "পণ্ডিত মহাশয় একবার দুই পার্শ্বে চেয়ে দেখ্‌লেন, যথার্থই বিপর্য্যয় মাঠ; বিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে দূরে এক একটী গ্রাম, যেন এক খানা বৃহৎ কাগজের মধ্যে এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালীর দাগের মত দেখাচ্চে। পণ্ডিত মহাশয় সেরূপ ভাব আর কখন দেখেন নাই, সুতরাং আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বল্লেন "একি! সকলই যে মাঠ,—গ্রাম কেবল দুই একটা চিহ্ন মাত্র!"

মদনমোহন বল্লেন "দেখেছেনত—পৃথিবী যেন কেবল জনহীন প্রান্তরময়। এই সকল স্থানই ভয়ানক!"

"ভয়ানক!—কেন মহারাজ?"

"এসকল স্থান পথিকদের পক্ষে বড় বিপদের স্থান, দেখ্‌চেন না, কত দূরে দূরে লোকালয়?"

সুরেশ বুঝ্‌লেন মদনমোহন আবার একটা নূতন হুজুগ তোল্‌বার উপক্রম কচ্চেন।—গাড়ির এক কোণে ঠেস্ দিয়ে, নয়নদ্বয় মুদ্রিত করে, নিদ্রিতের ন্যায় নিস্তব্ধ হয়ে কথাবার্ত্তা শুন্‌তে লাগ্‌লেন। পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞাসা কল্লেন "কেন মহারাজ,—এ সকল স্থানে কি এখনও ডাকাতি হয়ে থাকে?"

"ডাকাতি! এই সকল প্রদেশইত লেঠেলের স্থান।"

"পূর্ব্বে ছিল, এখন বোধ হয় নাই।"

"সে কি পণ্ডিত মহাশয়! আমি এত দূরে থেকে সমস্ত জানি; আপনি এত নিকটে কিছুই খবর রাখেন না?—ডাকাতের ভয় এখানে পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখন বরং তদপেক্ষা অধিক।"

পণ্ডিত মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বল্লেন "তবে এত ধুমধাম পুলিস হাঙ্গামা এ সকলে কি হচ্চে?"

"আ! আপনি তবে অসার সম্বাদপত্র গুলার লেখা বিশ্বাস করে থাকেন?—সে গুলা কিছু নয়, কেবল ইংরাজদের খোষামোদের যন্ত্র মাত্র।—পুলিস্ কি?—আপ্‌নি পুলিস্‌কে কি বিবেচনা করেন—বিদেশী বিধর্ম্মী রাজা হলেই, যে রক্ষক সেই ভক্ষক হয়ে থাকে।"

পণ্ডিত মহাশয় ইতিপূর্ব্বে মহারাজের নিকট কেবল চোর ডাকাইতেরই গল্প শুন্‌ছিলেন; এখন তাঁর মুখে এই সকল কথা শুনে মনে মনে বড় ভয় হল,—"তবেত রাত্রে এসকল স্থান বড় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।"

"রাত্রেত হবেই দিনে বড় কসুর যায় না। বিবেচনা করুন, আমরা এখন যে স্থানে রয়েছি এখানে প্রাণপণে চীৎকার কর্‌লেও কোনরূপে সাহায্য পাবার আশা নাই, যদিও কেহ মাঠ হতে শুন্‌তে পায়, সে কোনরূপেই সাহায্য কর্‌বে না, আর যখন সকলে সমব্যবসায়ী তখন সাহায্য কর্‌বেই বা কেন? এখন যদি একজন এই স্থানে পড়ে, তাহলে কি সে কোনরূপে উদ্ধার হয়ে যেতে পারে?—পূর্ব্বে বরং কিছু ভাল ছিল; রেলরোড হয়ে পর্য্যন্ত আরও ভয়ানক হয়েছে। এখন এ সকল পথে লোক জন বড় অধিক চলে না সুতরাং ঠেঙ্গাড়েরা যে দুই একটা শীকার পায়, তা আর কোনমতে ছাড়্‌তে চায় না। এমন কি সময়ে সময়ে অধিক লোকজন দেখ্‌লে দলবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করে।" মদনমোহন দিব্য পরিচয় দিলেন; আরব

দেশের বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে যেরূপ ভয়ানক দস্যুবৃত্তি হয়, নিরাপদ শান্তিময় স্থানে ঠিক সেইরূপ ভয়ানক হত্যা প্রভৃতির আশঙ্কা বুঝিয়ে দিলেন। পণ্ডিত মহাশয় আর কিছুই না বলে, কেবল মনে মনে সিকিমাধিপতির বর্ণিত ভয়-গুলির আন্দোলন কর্‌তে লাগ্‌লেন। মদনমোহনও তাঁকে সেগুলি উত্তমরূপে হজম কর্‌তে সময দিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন।

দুই পার্শ্বে ধূধূ কচ্চে মাঠ, পথে জন-মানবের সমাগম নাই, গাড়ির ঘড় ঘড় শব্দ আপনা আপনিই দূবে মিলিয়ে যাচ্চে। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ কচ্চে,—পশু পক্ষীটী পর্য্যন্ত নয়নগোচর হচ্চে না। অদূরে তালগাছের উপব আমাদের দেশী যমদূত ডোমকাক "খাই খাই শব্দে চীৎকার কচ্চে। এরূপ অবস্থায় এরূপ স্থলে কোন্ নবাগত ব্যক্তির হৃদয়ে ভয়-মিশ্রিত ভাবের উদয় না হয়? বিশেষ পণ্ডিত মহাশয়ের ন্যায় ক্ষীণ অন্তঃকরণেব লোকেরত আর কথাই নাই। একে এইরূপ স্থান, তাহাতে আবার পূর্ব্ব দিন হতে মহারাজের নিকট কেবল চোর ডাকাইত, কাটাকাঠি মাবামারি রক্তা-রক্তির গল্প শুন্‌চেন সুতরাং স্বাভাবিক ক্ষীণ অন্তঃকরণ আরও ক্ষীণ হয়েছিল; সিকিমাধিপতির কথাগুলি দুই চারি বার তোলাপাড়া কর্‌তেই যথেষ্ট ভয়ের সঞ্চার হল। টাকাই মনুষ্যের শত্রু; টাকার জন্যই দস্যুরা দস্যুবৃত্তি করে, টাকার জন্যই পথিক বিনাদোষে প্রাণ হারায়। নিঃসম্বল ব্যক্তির কিছুমাত্র ভয় নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের এখন টাকাগুলিকেই বিষম শত্রু বলে বোধ হতে লাগ্‌ল। যদি যথার্থই দস্যুরা আক্রমণ করে অগ্রে যার নিকট টাকা আছে তাহাকেই বিনাশ কর্‌বে। পণ্ডিত মহাশয় প্রতিক্ষণেই বিপৎপাতাশঙ্কা কর্‌তে লাগ্‌লেন, ক্রমেই তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু কি করেন পাছে চাঞ্চল্য প্রকাশ হলে সাহসিকশ্রেষ্ঠ সিকিমাধিপতি তাঁকে নিতান্ত ভীরু অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করেন, সেই ভয়ে কথঞ্চিৎ মনোগত ভাব গোপন করে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন।

পণ্ডিত মহাশয় যতই মনোগত ভাব গোপন করুন না কেন, চতুর মদন মোহনের নিকট কিছুই অজ্ঞাত রইল না। তিনি তাঁর আন্তরিক অবস্থা বুঝ্‌তে পেরে কোচম্যানকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "আর কতদূর আছে হে?"

সে উত্তর দিলে "মশায়, দূর এখনও অনেক,—কিন্তু একটা বড় গোল দেখ্‌চি।"

"কেন, ব্যাপার কি?"

"আজ্ঞা, কয়েকটা লোক যেন এইদিকে আস্‌চে।"

ভয়ে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রাণ উড়ে গেল, তিনি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "সে কি রে! কি রকম লোক?"

কোচ্‌ম্যান উত্তর দিলে "আজ্ঞা জনকতক চোয়াড় লোক লাঠি ঘাড়ে করে—"

অশ্বচালকের কথা শেষ হতে না হতেই পণ্ডিত মহাশয় ভয়বিহ্বলস্বরে বল্লেন "মহারাজ, উপায়?"

মদনমোহন তাড়াতাড়ি পিস্তল দুইটী বাহির করে বল্লেন "ভয় কি পণ্ডিত

মহাশয়, আমি উপস্থিত থাকৃতে আপ্নার ভয় কি!—কোচ্ম্যান! কুচ্ পরোয়া নেহি হাঁকাও, জল্দি হাঁকাও।"

কোচ্ম্যান বল্লে 'আজ্ঞা—এল—ক্রমেই কাচে আস্চে, এইবেলা যা হয় করুন।"

পণ্ডিত মহাশয় সেই কথা শুনেই তাড়াতাড়ি টাকাগুলি ও নোটের গোছাটী মদনমোহনের হস্তে দিয়ে গাড়ির বাক্সর মধ্যে মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘাড়গুঁজে বসে পড়্লেন। মদনমোহন গাড়ির জানালা দিয়ে পিস্তল ছুটী একে একে আওয়াজ করে উচ্চৈঃস্বরে বল্লেন "অল্-রাইট—এখন স্বকর্ম্মের ফলভোগ কর্।" সুরেশ যেন এতক্ষণ যথার্থই নিদ্রিত ছিলেন, এই ভাবে চম্কে উঠে বল্লেন "একি, একি—কাণ্ডখানা কি?"

মদনমোহন বল্লেন "ছুটই খুন—বাকীগুল পালাল, তা না হলে এক্বার সব কটাকেই দেখ্তাম—পণ্ডিত মহাশয়! একবার উঠে দেখুন, এখনও ছুট মাটীতে পড়ে ছট্ফট্ কচ্চে—বলেনত গাড়ি থামাতে বলি।"

পণ্ডিত মহাশয় যেমন ঘাড়গুঁজে ছিলেন, তেমনি ঘাড়গুঁজেই কাঁপ্তে কাঁপ্তে বল্লেন "না মহারাজ, গাড়ি আরও জোরে হাঁকাতে বলুন—এরূপ ভযানক স্থানে আর না, এখানে আর আমায় ডাকৃবেন না। বর্দ্ধমানে পৌঁছে একেবারে আমাকে ডাকৃবেন।"

বঙ্গের আদিগৌরব দীপঙ্কর।

বৌদ্ধ জগতে দীপঙ্কর বিশেষ প্রসিদ্ধ। বঙ্গের সৌভাগ্যবশতই তিনি বাঙ্গালীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাকে অল্প লোকেই জানে। যে মহাপুরুষ তিব্বতের আদি ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপাল মহাত্মা ব্রহ্মতনের দীক্ষা-গুরু, যাঁহার নাম শুনিবামাত্র প্রধান লামা ও চীনের সম্রাট আজিও সসম্ভ্রমে আসন পরিত্যাগ করিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকেন, তিনি বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন; সার্দ্ধ আট শত বৎসর পরে একথা স্মরণ করিলেও ক্ষীণপ্রাণ বাঙ্গালীর দুর্ব্বল হৃদয় এক অপূর্ব্ব বলে বলীয়ান হইয়া উঠে; তখনই শ্মশান সদৃশ বর্ত্তমান বঙ্গভূমি ছাড়িয়া পাগল মন সহসা অতীত বঙ্গের সেই অমরাবতীতে উপস্থিত হয় এবং অধঃপতিত দেশের দুরবস্থা ভুলিয়া ভূত-সৌভাগ্যের সেই দেবোদ্যানে বিচরণ করিতে থাকে।

৯৮০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী গৌড় নগরে তত্রত্য রাজকুলে দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী এবং মাতা প্রভাবতী। তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে চন্দ্রগর্ভ বলিয়া ডাকিতেন। শৈশবেই দীপঙ্কর বাল্য শিক্ষার নিমিত্ত জিতারি নামক জনৈক অবধূতের নিকট প্রেরিত হয়েন। তথায় বর্ণশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি পঞ্চবিজ্ঞানে মনোনিবেশ করিলেন। সেই দিন

তাঁহার দর্শন ও ধর্ম্মনীতি-শিক্ষার পথ পরিষ্কৃত হইল। তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণ উর্ব্বর হৃদয় ক্ষেত্রে ধর্ম্মের বীজ অল্প দিনের মধ্যেই অঙ্কুরিত হইল। যে সময়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বিকট চেষ্টায় আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের প্রায় সর্ব্বত্রই বৌদ্ধধর্ম্মের সমাধিক্ষেত্রে হিন্দুর বিজয় দুন্দুভি নিনাদিত হয়, সেই সন্ধিকালে মহামতি দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্ম্মের মুমূর্ষু কলেবরে যেন সঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়া দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

দীপঙ্করের বাল্য জীবনে তাঁহার ভবিষ্য গৌরবের নিদর্শন দেখা গিয়াছিল। তাঁহার অদ্ভুত মেধা ও গভীর অভিনিবেশ দর্শনে জিতারি বিস্মিত হইয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত দীপঙ্করের প্রতিভা স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল; অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে তিনি পারদর্শিতা লাভ করিলেন। এইরূপে বৈশেষিক দর্শন, হীনযান শ্রাবকদিগের পীঠকত্রয়, মহাযান পীঠকত্রয়, মাধ্যমিক ও যোগাচার্য্য অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং চতুর্ব্বিধ তন্ত্রশাস্ত্র তাঁহার অধিগত হইল। দেখিতে দেখিতে দীপঙ্করের যশোবিভা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নানা স্থান হইতে গর্ব্বান্ধ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে তর্কে পরাস্ত করিতে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে আপনাদের সুনাম বিসর্জ্জন দিয়া অবনতমস্তকে দেশে প্রতিগত হইলেন। অনেকে তাঁহার শিষ্যত্বও স্বীকার করিলেন। পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি জনৈক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। অধ্যাত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত সংসারাশ্রমে তাঁহার বিরাগ বাড়িতে লাগিল। বৌদ্ধ ত্রিশিক্ষা অধ্যাত্মতত্ত্বের মূল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দীপঙ্কর তাহা শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে কৃষ্ণগিরিস্থ বিহারে রাহুল গুপ্তের নিকট গমন করিলেন। তথায় যথাসম্ভব অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার শিক্ষা শেষ হইলে আচার্য্য রাহুল সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "গুহ্যজ্ঞান-বজ্র" উপাধি দিলেন। দীপঙ্কর ওদন্তপুরের মহাসঙ্গিকাচার্য্য শীল রক্ষিতের নিকট শ্রীজ্ঞান নাম পাইয়াছিলেন। একত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি ভিক্ষু আশ্রমের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিলেন এবং বোধিসত্ত্বের কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হইলেন। এবিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মরক্ষিত তাঁহার দীক্ষাগুরু। অতঃপর দীপঙ্কর মগধের প্রসিদ্ধ ও পারদর্শী বৌদ্ধ আচার্য্যদিগের নিকট সমগ্র বৌদ্ধ শাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দীপঙ্করের জ্ঞান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মতৃষ্ণা কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না; বৌদ্ধ ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যলাভ করিলেও তিনি কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তৎকালে সুবর্ণ দ্বীপ (ব্রহ্মদেশ) প্রাচ্য জগতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তি তথাকার প্রধানতম যাজক। দীপঙ্কর অবশেষে তাঁহারই নিকট যাইতে মনস্থ করিলেন এবং কতিপয় বণিকের সমভিব্যাহারে বৃহৎ নৌকারোহণে সুবর্ণ দ্বীপের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভীষণ সমুদ্র বক্ষে প্রকাণ্ড তরণী, প্রচণ্ড ঝটিকা ও তুফানের ক্রীড়া-পুত্তলি স্বরূপ ভাসিয়া চলিল, পথিমধ্যে কত কষ্ট, কত বিঘ্ন, পদে পদে তাঁহার মঙ্গল যাত্রায় নানা অমঙ্গলের

সূচনা করিল। অবশেষে তের মাস পরে নৌকা সুবর্ণদ্বীপের উপকূলে উপনীত হইল। তথায় দ্বাদশ বর্ষ অবস্থিতি পূর্ব্বক তিনি অভীষ্ট বিদ্যালাভ করিয়া কতকগুলি বণিকের সহিত একখানি বৃহৎ পোতারোহণে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। আসিতে আসিতে পথিমধ্যে তিনি তাম্রদ্বীপ ও অরণ্যদ্বীপ দেখিয়া আসিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মগধে প্রতিগমন করিয়া শান্তি, নরোপান্ত, কুশল, অবধুত, তন্ত্রী প্রভৃতি যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

মগধের বৌদ্ধেরা দীপঙ্করের অতুল পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তথাকার ধর্ম্মপালরূপে মনোনীত করিলেন। বলা বাহুল্য এ সম্মান বৌদ্ধ জগতে শ্রেষ্ঠ। সেই দিন মগধে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইল। দীপঙ্করের যশোবিভা দাবানল-তেজে ভারতের চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। রাজা ন্যায়পাল তদীয় অনুপম গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজধানী বিক্রমশীলের প্রধান যাজক পদে স্থাপিত করিতে চাহিলেন। সদাশয় দীপঙ্কর তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। এই সময়ে কান্যদেশের (কণোজের) রাজা মগধ আক্রমণ করেন। ন্যায়পালের সেনাদল বারবার যুদ্ধে পরাস্ত হইল এবং শত্রুসেনা রাজধানীর নিকটে অগ্রসর হইতে লাগিল উপায়ান্তর না দেখিয়া ন্যায়পাল কন্যা রাজের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। দীপঙ্করের বিশেষ চেষ্টায় সেই সন্ধি স্থাপিত হইল। তখন উভয় রাজাই বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

এই সময়ে হিমালয়ের উত্তর প্রান্তে সুদূর তিব্বতে দীপঙ্করের অমরত্ব-লাভের পথ ধীরে ধীরে পরিষ্কৃত হইতেছিল। সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রে গভীর পারদর্শিতা এবং বৌদ্ধ জগতে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াও তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, একদা তিব্বতের অধিপতি হ্লালামাও তাঁহাকে "অতীশ"(সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) বলিয়া পূজা করিবেন। থোলিং নগরে হ্লালামার প্রধান রাজপীঠ ছিল। তদীয় রাজত্বকাল তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বে তান্ত্রিক ধর্ম্মের সংস্পর্শে তত্রত্য বৌদ্ধনীতি প্রভূত পরিমাণে দূষিত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি তাহার সংস্কার করিবার অভিপ্রায়ে ভারতের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ বিহারে কতকগুলি নবীন সন্ন্যাসীকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা কাশ্মীর প্রভৃতি নানাস্থানে বৌদ্ধ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া অবশেষে বিক্রমশীলায় উপনীত হইলেন। তথায় দীপঙ্করের যশোগৌরব তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হওয়াতে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া রাজসকাশে তাঁহার সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। রাজার কৌতূহল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। এরূপ অদ্বিতীয় বৌদ্ধ আচার্য্যকে তিব্বতে আনয়ন করিবার জন্য তিনি নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন এবং প্রভূত সুবর্ণ ও একশত পরিচারকের সহিত এক জন বিশ্বস্ত রাজপুরুষকে মগধে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে অসীম কষ্ট ও যাতনা সহ্য করিয়া রাজদূত বিক্রমশীলে উপনীত হইল এবং দীপঙ্করের সম্মুখে সেই প্রকাণ্ড

স্বর্ণপিণ্ড স্থাপন করিয়া রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। দীপঙ্কর তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। শত অনুনয় বিনয়-সহস্র প্রলোভন সেই তেজস্বী মহাপুরুষকে ভুলাইতে পারিল না। তিনি কিছুতেই তিব্বতে যাইতে চাহিলেন না। রাজদূত কাঁদিতে কাঁদিতে স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

এই সময়ে হ্লালামা হিমাদ্রি পার হইয়া "গেলেন" (গড়োয়াল?) রাজ্যের সীমান্তদেশে স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে আসিয়া তত্রত্য রাজা কর্তৃক কারারুদ্ধ হয়েন। কারাগারেই তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজ-দূতের মুখে দীপঙ্করের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া স্বীয় পুত্রদিগকে মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "যে প্রকারে হউক দীপঙ্করকে আনিয়া তিব্বতের ধর্ম্মসংস্কার করিতে হইবে।" তদনুসারে তাঁহারা দীপঙ্করের নিকট পুনর্ব্বার লোক পাঠাইলেন।

তিব্বতেশ্বরের বার বার বিনীত ব্যগ্রতা দেখিযা উদারহৃদয় দীপঙ্করের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ষাট বৎসর হইলেও সেই বৃদ্ধ বয়সে তিনি সেই সুদূরদেশে গমন করিলেন। সঙ্গে তদীয় ভ্রাতা বীর্য্যচন্দ্র এবং রাজা ভূমিসঙ্গও সেই তিব্বতীয় রাজদূত প্রভৃতি রহিলেন। অনন্তর ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা তিব্বতে উপনীত হইলেন। রাজা দীপঙ্করকে পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। অচিরকাল মধ্যে এই মহাত্মার মহাশিক্ষার গুণে তিব্বতের দূষিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্কার হইল। তিব্বতের অধীশ্বর ইঁহাকে "অতীশ" বলিয়া স্বীকার করিলেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বিপুল যশ ও গৌরব অর্জ্জন পূর্ব্বক বৌদ্ধ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ১০৫৩ খৃঃ অব্দে মহাত্মা দীপঙ্কর লাসা নগরীর নিকটবর্ত্তী ঙেয়ঙ্গ নগরে দেহত্যাগ করেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী অনন্ত কাল-সাগরে মিশিয়া গিয়াছে, তিব্বতের ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক জগতে কত বিপ্লব ঘটিয়াছে, তথাপি বাঙ্গালীর আদি গৌরব দীপঙ্করের নাম ও গৌরব তথায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সেই জন্য তাঁহার স্বদেশ-বাসী বলিযা একদা এই বিনীত পরিব্রাজককে সেই সুদূর প্রবাসে তত্রত্য প্রধান পুরুষ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন *।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস।

* এসম্বন্ধে প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে "হিত-বাদী" পত্রিকার একবার আলোচনা করিয়া-ছিলাম। দুঃখের বিষয় সে সম্বন্ধে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। স্বজাতীয় বীরগণের অবদান কীর্ত্তনে বঙ্গালীর নির্জ্জীব প্রাণ কবে উৎসাহিত হইবে জানি না। লেখক।

আয়ুর্ব্বেদ।

রাজযক্ষ্মা।

পর্য্যায়—ক্ষয় ও শোষ।

রাজ্ঞশ্চন্দ্রমসো যস্মাদভূদেষ কিলাময়ঃ।
তস্মাত্তং রাজযক্ষ্মেতি কেচিদাহুর্মনীষিণঃ।

এই রোগ প্রথমে রাজা চন্দ্রের হইয়াছিল, সেই জন্য ইহা রাজযক্ষ্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ক্রিয়াক্ষয়করত্বাত্তু ক্ষয় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সংশোষণাদ্রসাদীনাং শোষইত্যভিধীয়তে।

এই রোগের আক্রমণে যান্ত্রিক ক্রিয়ার ক্ষয় এবং রসাদির শোষ হয় বলিয়া ইহার অপর নাম ক্ষয় ও শোষ।

ইতিবৃত্ত।—কথিত আছে, নিশানাথ চন্দ্র প্রজাপতি দক্ষের সপ্তবিংশতি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের প্রতি তাঁহার সমান অনুরাগ ছিল না, তিনি অপর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল রোহিণীতে আসক্ত থাকিতেন। এই কারণে অশ্বিনী প্রভৃতি ভগিনীগণ দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়া পিতার নিকট অভিযোগ করিল। দক্ষ অনেক বুঝাইলেন, অনেক সান্ত্বনা প্রদান করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি বারম্বার চেষ্টা করিয়াও চন্দ্রের মন ফিরাইতে পারিলেন না। শেষে দক্ষের ক্রোধোদয় হইল, তিনি জামাতাকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন:—

শাপাবোদ্যুক্তমনসঃ কুপিতস্য মহাত্মনঃ।
ক্ষযো নাম মহারোগো নাসিকাগ্রাদ্বিনির্গতঃ।
প্রেষিতঃ স চ চন্দ্রায় দক্ষেণ মুনিনা ততঃ।
প্রবিষ্টবাংস্তস্য দেহে ক্ষযিতস্তেন চন্দ্রমা।

সেই সময়ে তাঁহার নাসিকাগ্র হইতে ক্ষয় নামক মহারোগ নিঃসৃত হইল। দক্ষ তাহাকে চন্দ্রের দেহে প্রবেশ করিতে বলিলেন। তদনুসারে ক্ষয়রোগ চন্দ্রমার শরীরে প্রবিষ্ট হইল; তাহাতে শশধর ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেন।

এই ইতিবৃত্ত পৌরাণিক; তাহাতে আবার রূপকাকারে আচ্ছন্ন, সুতরাং কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। তবে এতদ্দ্বারা এই মাত্র বুঝিতে পারা যায় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহা ভারতে প্রাদুর্ভূত।

কারণ।

বেগরোধাৎ ক্ষয়াচ্চৈব সাহসাদ্ বিষমাশনাৎ।
ত্রিদোষো জায়তে যক্ষ্মা গদো হেতুচতুষ্টয়াৎ।

মলমূত্রাদির বেগধারণ, ধাতুক্ষয়কর ব্যায়াম ও অনশনাদি, সাহসকর্ম্ম অর্থাৎ বলবান্ ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধাদি এবং বিষম ভোজন অর্থাৎ প্রয়োজন অপেক্ষা

অধিক বা অল্প কিম্বা অকাল ভোজন, এই চারিটী কারণে যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয়। ইহা সান্নিপাতিক ব্যাধি।

এতদ্ব্যতীত আধুনিক সন্দর্শন দ্বারা এই পীড়ার আরও বহু কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক ঘরে অধিক লোক বাস করিলে তথাকার বায়ু অত্যন্ত দূষিত হইয়া পড়ে; এই দূষিত বায়ু সেবন করিলে এই রোগ হইয়া থাকে। কয়লার গুঁড়া, কার্পাসের গুঁড়া, পাটের গুঁড়া, প্রস্তর বা সিমেণ্টের গুঁড়া, ইত্যাদি পদার্থে দূষিত বায়ু সেবন করিলেও যক্ষ্মা হইতে দেখা যায়। অপুষ্টিকর ও অল্প পরিমাণে খাদ্য বহুকাল পর্য্যন্ত সেবন করিলে, এই রোগ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, অস্মদ্দেশের অধিকাংশ দরিদ্র লোক ঐরূপ খাদ্যের উপর জীবিকা নির্ব্বাহ করে, অথচ তাহাদের যক্ষ্মা হয় না। কথিত আছে বহুসন্তানবতী জননীও এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু ইহা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না।

সুরাপান।—অধিক সুরাপান এই রোগের একটী প্রধান কারণ। যে সকল লোক অধিক সুরাপান করে এবং সেই সঙ্গে শীতবাতে বা বৃষ্টিতে অনাবৃত গাত্রে বেড়ায়, কেবল তাহাদিগেরই যে, এই রোগ হইয়া থাকে এমত নহে, শুদ্ধ সুরাপানে আসক্ত ব্যক্তিদিগেরই এই রোগ অধিক সংখ্যায় হইতে দেখা যায়।

উপদংশ।—ইহা অত্যন্ত দুর্ব্বলকর পীড়া, সেই জন্য অনেকস্থলে ইহা রোগের পূর্ব্বপ্রবর্ত্তক কারণরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা দ্বারা শ্বাসযন্ত্রে ক্ষত হওয়াতে কালে তাহা যক্ষ্মার কারণ হইয়া পড়ে।

দুর্ব্বলকর অবস্থা।—গর্ভস্রাব, সূতিকা গৃহের দোষ বা সূতিকাবস্থায় প্রসূতির স্বাস্থ্যে উপেক্ষা, অতিরিক্ত স্তন্যদান ও অল্প আহার এই রোগের একটী কারণ। কেহ কেহ বলেন আর্ত্তব অবরোধেও স্ত্রীলোকদিগের এই পীড়া হইয়া থাকে।

জলবায়ুর প্রভাব।—বহির্বায়ুর শৈত্য ও আর্দ্রতা এই রোগের উত্তেজনায় অধিক পরিমাণে সহায়তা করে। কেহ কেহ বলেন যে, উষ্ণ ও আর্দ্রতা একত্রে এই রোগের উদ্রেক করিয়া থাকে।

অভ্যাসদোষ। ব্যায়ামের অভাব, অধিক স্ত্রীসম্ভোগ, হস্তমৈথুন, লাম্পট্য, প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া এই রোগের কারণরূপে কার্য্য করে।

অন্যান্য পীড়া।—দীর্ঘকালস্থায়ী জ্বর, হাম ও রক্তজ্বরে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ফুসফুসের উপাদান দূষিত ও ক্ষীরবৎ অপজনিত হইয়া থাকে, সেরূপ অবস্থায় সহজে তাহা রাজযক্ষ্মার উদ্ভবে সহায়তা করে। শ্বাসযন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রের প্রদাহ হইলে ঐরূপ অপজনন হয়, তাহাতে ভবিষ্যতে রাজযক্ষ্মা উদ্ভূত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, বহুমূত্র হইতে এই রোগ উদ্ভূত হয়।

সংক্রামকতা।—হিন্দু আয়ুর্ব্বেদে এই রোগ ঘোর সংক্রামক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে,—

"প্রসঙ্গাৎ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
একশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥"

সহবাস, গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন, এক বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপন ব্যবহার করিলে কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ (যক্ষ্মা) নেত্রাভিষ্যন্দ ও ঔপসর্গিক রোগ সকল এক রোগীর শরীর হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগেরও মতে ইহা সংক্রামক। ইহাঁরা বলেন গাত্রসংস্পর্শে ইহা পাত্রান্তরে সংক্রামিত হইবার অধিক সম্ভাবনা,—বিশেষতঃ যখন যক্ষ্মারোগী বহুজনপূর্ণ গৃহে বাস করে এবং যদ্যপি সেই গৃহের স্বাস্থ্যের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে সংক্রামতা অনেকস্থলে অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি ঐ সকল গৃহ পচননিবারক ঔষধ দ্বারা ধৌত ও পরিস্কৃত হয় তাহা হইলে একপ সংক্রামণের অতি অল্পই সম্ভাবনা। তবে যক্ষ্মারোগীর শ্লেষ্মাতে রোগের বিষবীজ থাকে, এইজন্য উহা হইতে সতত দূরে থাকা কর্ত্তব্য। স্বামী হইতে এই রোগ প্রায়ই স্ত্রীতে সংক্রামিত হয়।

কৌলিক সংক্রমণ।—কোন কোন পরিবারে এই রোগে ক্রমান্বয়ে পুরুষানুক্রমে অনেকের মৃত্যু হইতে দেখা যায়। সেইজন্য কৌলিকতা ইহার সংক্রমণের একটী প্রধান কারণরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু কৌলিকতা কিরূপে এই পীড়ার বিস্তারে সহায়তা করে, অদ্যাপি তাহা নির্ণীত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন বৃদ্ধ জনক এবং অতি অল্পবয়স্কা জননীর সহযোগে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সামান্য কারণেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এস্থলে একথা বলা আবশ্যক যে, পিতা অপেক্ষা মাতা দ্বারা এই রোগ সন্তানে সংক্রামিত হইবার অধিক সম্ভাবনা, এমন কি যক্ষ্মাগ্রস্তা জননীর স্তন্য পান করিলে অনেক শিশু এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

মানসিক অবস্থা।—উদ্বেগ, দুঃখ, শ্রান্তি ও ক্লান্তি এবং অতিরিক্ত অধ্যয়ন জন্য উৎকট মানসিক অবসাদ, অনেক সময়ে যক্ষ্মারোগের কারণ রূপে কার্য্য করে।

বয়স।—বিংশ ও ত্রিংশ বৎসরের মধ্যে এই রোগের অধিক আক্রমণ হইতে দেখা যায়; শৈশবে কিম্বা বার্দ্ধক্যে এইরোগ ক্বচিৎ আক্রমণ করিয়া থাকে। তবে সংক্রমণাদি কারণে ইহা যে কোন বয়সে আক্রমণ করিতে পারে। যুবকদিগের এই পীড়া হইলে সত্বর বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়।

বহুকাল পূর্ব্বে য়ুরোপে ফুস্ফুসের পীড়াগ্রস্ত রোগীর শরীর শীর্ণ হইলে তত্রত্য সকল চিকিৎসকই বলিতেন যে, তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে; প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য চিকিৎসক লেনেকের সময় হইতে এইরূপ প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মধ্যে কতকগুলি নিদানতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ক্ষতবিশিষ্ট ক্ষয়রোগকে যক্ষ্মা নামে অভিহিত করাতে যে কোন যন্ত্রে ক্ষতক্ষয় হইত, সেই যন্ত্রের শোষ বলিয়া বর্ণিত করিতেন। সেইজন্য আন্ত্রিক শোষ, শ্বাসনালীর শোষ, বৃক্কদ্বয়ের শোষ প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পীড়ার সম্প্রাপ্তি।

কফপ্রধানৈর্দোষৈস্তু রুদ্ধেষু রসবর্ত্মসু।
অতিব্যবায়িনো বাপি ক্ষীণে রেতস্যনন্তরাঃ।
ক্ষীয়ন্তে ধাতবঃ সর্ব্বে ততঃ শুষ্যতি মানবঃ॥

কফপ্রধান দোষ সমূহ দ্বারা রসবহা নাড়ী সকল রুদ্ধ হইলে পোষণাভাবে ও কারণ বিকৃতি হেতু ক্রমশঃ রক্ত মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র ধাতু-ক্ষীণ হইতে থাকে এবং সেই মনুষ্যও ক্রমে শুষ্ক হয়। এইরূপ ক্ষয়কে অনুলোম ক্ষয় বলে। এইরূপ অতিব্যবায়শীল ব্যক্তির মৈথুন দ্বারা প্রথমতঃ শুক্রধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে বায়ুপ্রকোপহেতু ক্রমশঃ তদভাবে মজ্জা, অস্থি, মেদঃ, মাংস, রক্ত ও রসধাতুর ক্ষয় হইয়া তাহাকে শুষ্ক করে। এইরূপ ক্ষয়ের নাম বিলোম ক্ষয়।

লক্ষণ।

পূর্ব্বলক্ষণ।—রাজযক্ষ্মা রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে শ্বাস, অঙ্গমর্দ্দ, কফস্রাব, তালুশোষ, বমি, অগ্নিদৌর্ব্বল্য, মত্ততা, পীনস, কাস ও নিদ্রাধিক্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং ঐ ব্যক্তি শুক্লনেত্র, মাংসভক্ষণাভিলাষী ও মৈথুনেচ্ছু হইয়া থাকে। পশ্চাল্লিখিতরূপ স্বপ্নদর্শন যক্ষ্মার পূর্ব্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে:— কাক, শুক, সজারু, নীলকণ্ঠ, গৃধ্র, বানর ও কাঁকলাস ইহাদের মধ্যে কেহ যেন উহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং ঐ ব্যক্তি জলশূন্য নদী, বায়ু, ধূম ও দাবাগ্নিব্যাপ্ত শুষ্ক তরু সকল দর্শন করে।

অংসপার্শ্বাভিতাপশ্চ সন্তাপঃ করপাদয়োঃ।
জ্বরঃ সর্ব্বাঙ্গগশ্চেতি লক্ষণং রাজযক্ষ্মণঃ॥

স্কন্ধ ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, হস্তে ও পাদে সন্তাপ এবং সর্ব্বধাতুগত জ্বর, এই তিনটী রাজযক্ষ্মার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

মহর্ষি সুশ্রুত বলেন:—

ভক্তদ্বেষো জ্বরঃ শ্বাসঃ কাসঃ শোণিতদর্শনম্।
স্বরভেদশ্চ জায়স্তে ষড়্‌রূপে রাজযক্ষ্মণি॥

অন্নদ্বেষ, জ্বর, শ্বাস, কাস, রক্তনিষ্ঠীবন ও স্বরভঙ্গ এই ছয় লক্ষ সম্পন্ন যক্ষ্মাকে ষড়্‌রূপ যক্ষ্মা বলে।

যক্ষ্মারোগে বাতাধিক্য থাকিলে (১) স্বরভঙ্গ, (২) শূল, এবং (৩) স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশের সঙ্কোচ; পিত্তপ্রাবল্য থাকিলে (৪) জ্বর, (৫) দাহ, (৬) অতিসার ও (৭) রক্তনিষ্ঠীবন, এবং কফপ্রাধান্যে (৮) মস্তকের পরিপূর্ণতা, (৯) আহারে অনিচ্ছা, (১০) কাস ও (১১) কণ্ঠের উদ্ধ্বংস। উদ্ধ্বংস শব্দের অর্থ ভেদ অর্থাৎ ভঙ্গবৎ যাতনা অথবা ক্ষত বিক্ষতবৎ হইয়া থাকে। যক্ষ্মার একাদশ রূপ বলিলে এই একাদশ লক্ষণ বলিতে হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন দোষ হইতে যে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ উদ্ভূত হয়, তৎসমুদায় সেই সেই দোষের উল্বণতা মাত্র হইতে জনিত, কিন্তু ব্যাধি ত্রৈদোষিক। কেননা সুশ্রুত বলিয়াছেন—

এক এব মতঃ শোষঃ সন্নিপাতাত্মকো গদঃ।
উদ্রেকাৎ তত্র লিঙ্গানি দোষাণাং নিপতন্তি হি॥

জ্বরাদিরোগের যেমন বাতজ্বর, পিত্তজ্বর, বাতশ্লেষ্ম জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর ইত্যাদি প্রকারভেদ আছে, যক্ষ্মার তদ্রূপ

কোনপ্রকারভেদ নাই; ইহা একমাত্র সান্নিপাতিক ব্যাধি। তবে যে স্থলে যে দোষের প্রাবল্য থাকে, তথায় সেই দোষের লক্ষণ সকল স্পষ্টরূপে উদিত হয়, এইমাত্র প্রভেদ।

উল্লিখিত ১১ টী, ৬ টী, অথবা ৩ টী, লক্ষণের উদয় এবং রোগীর মাংস ও বল-ক্ষয় পাইলে রোগ অবশ্য সাঙ্ঘাতিক হইয়া পড়ে, কিন্তু মাংসবলের ক্ষীণতা না হইলে সর্ব্বরূপসম্পন্ন (একাদশরূপ) যক্ষ্মারও চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

বহুল সন্দর্শন দ্বারা আমরা এই রোগের আরও কতকগুলি লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ক্রমে তৎসমুদায়ের কথা বলিতেছি। রোগারম্ভে রোগী অতি-শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণ হইয়া পড়ে। কিজন্য শরীর এত শীর্ণ হয়, অদ্যাপি তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হয় নাই। রোগীর ক্ষুধা হয় না এবং কোন খাদ্যেই রুচি থাকে না, বসাসংযুক্ত দ্রব্যে আদৌ স্পৃহা দেখা যায় না। কেহ বা প্রভূত আহার করিয়াও শীর্ণ হইয়া পড়ে। আবার এরূপও দেখা গিয়াছে যে, জ্বর ও ঘর্ম্ম অধিক হইলেও রোগী শীর্ণ হয় না। অন্য প্রকার ক্ষয়কারী রোগে হৃৎপিণ্ড যেরূপ ক্ষুদ্রায়তন হয়, এরোগে সেরূপ হয় না। রোগীর কেশ অচিরে পক্কতা প্রাপ্ত হয়, শ্মশ্রু পাতলা ও চাকচিক্য বিহীন হইয়া পড়ে। এই সকল লক্ষণের সহিত দুর্ব্বলতা বিশেষ লক্ষিত হয়। রক্তাল্পতা ঘটে, স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালে আর্ত্তব অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হইতে থাকে।

জ্বর।—এই রোগে শরীরতাপের দৈনিক হ্রাসবৃদ্ধির অনেক তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার গতির কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। প্রাতঃ-কালে শরীরতাপের বিশেষ বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু বৈকালে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাপ সচরাচর ৯৯ ডিগ্রি হইতে ১০১ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। কখন কখন ইহার নিম্নসীমা ১০২ এবং উর্দ্ধসীমা ১০৪ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। এই নিয়মের ব্যত্যয় কিন্তু অসম্ভব নহে। শরীরতাপ এত উর্দ্ধ সীমায় উত্থিত হইলেও কদাচিৎ রোগীর প্রলাপ হইয়া থাকে। এরোগে প্রায় সর্ব্বদাই—বিশেষতঃ রাত্রিকালে ঘর্ম্ম হইতে দেখা যায়। রোগীর নিদ্রিত অবস্থাতেই এই ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়; তাহার পরিমাণ সময়ে সময়ে প্রভূত হইয়া পড়ে। দেশ বা পাত্র ভেদে ইহার তারতম্য দেখা যায় না। নিদ্রিত অব-স্থাতেই কেন ঘর্ম্ম হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। কেহ বলেন জ্বরাবসানে এই-রূপ ঘর্ম্ম হয়, কেহ বা বলেন রোগীর দৌর্ব্বল্য অথবা অসম্পূর্ণ শোণিত-শোধন বশতঃ ইহা ঘটিয়া থাকে। কখন কখন এত ঘর্ম্ম হয় যে, রোগীর শয্যাদি ভিজিয়া যায়। কোন কোন রোগীর ত্বক্ অস্বাভা-বিক শুষ্ক হইয়া পড়ে; কিম্বা তাহার করতল বা পদতলে দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

নাড়ী।—প্রাতঃকাল অপেক্ষা বৈকালে নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়। যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর নাড়ী তাহার অবস্থিতির উপর নির্ভর করে; এমন কি রোগী শয়ান অবস্থা হইতে বসিলে বা দণ্ডায়মান হইলে নাড়ীর চাঞ্চল্য বুঝিতে পারা যায়। ইহা প্রায়ই কোমল ও দুর্ব্বল থাকে। কখন কখন নাড়ী এত চঞ্চল হইয়া

পড়ে,যে, জ্বরের প্রাখর্য্যের সহিত তাহার কোন সামঞ্জস্য থাকে না; রোগীর শোণিতাল্পতা ঘটে বলিয়া নাড়ীর এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

কাস।—রোগের প্রারম্ভেই এই লক্ষণ উদ্দীপ্ত হয়। প্রথমে রোগী মনে করে যেন তাহার গলায় কিছু বাধিয়াছে; সে তাহা তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। প্রাতঃকালে কাসি প্রকাশ পায় এবং দিবা ভাগে শারীরিক কোন পরিশ্রম করিবার সময় ইহার উদ্রেক হইতে দেখা যায়। কখন কখন কিছুদিনের জন্য কাসি একেবারে থাকে না। অবশেষে রোগের বৃদ্ধির সহিত ইহারও বৃদ্ধি হয় এবং ক্রমে অতিশয় কষ্টপ্রদ হইয়া পড়ে।

বমন।—কখন কখন বমনের প্রাবল্য এত বাড়িয়া উঠে যে, চিকিৎসক মনে করিতে পারেন যে, রোগীর পাকস্থলীর কোন পীড়া হইয়াছে। কিন্তু রোগের বৃদ্ধি হইলে কাসিতে কাসিতে বমন হয়।

উদরাময়।—এরোগে প্রায়ই পরিপাকের ব্যাঘাত এবং পাচক যন্ত্রের কার্য্য-ব্যতিক্রম দেখা যায়; রোগীর আহারে রুচি কমিয়া যায়, কাহারও আদৌ থাকে না এবং অজীর্ণ ও অতিসারের লক্ষণ সকল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। কাহার কাহার মুখাভ্যন্তর, জিহ্বা ও তালু লাল হইয়া উঠে এবং উগ্রভাব ধারণ করে। জিহ্বা প্রায়ই অল্প বা অধিক পরিমাণে লেপাবৃত দেখা যায়। কখন কখন তৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। রোগীর অন্ত্রমণ্ডলে প্রদাহ, কখনও বা ক্ষত হয় এবং সেইজন্য অতিসার হইয়া থাকে। কখন কখন দাঁতের মাড়িতে লাল রেখা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেটী থাকিলেই যে, এইরোগ হইবে, এমত নহে, ইহার সহিত রোগনির্দ্দেশক অন্যান্য লক্ষণ থাকিলে তখন যক্ষ্মা হইয়াছে স্থির করিতে হইবে। এই রোগে রোগীর নিশ্বাসে এক প্রকার বিচিত্র দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়।

যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগী দেখিলেই চিনিতে পারা যায়; তাহাদিগের শরীর শীর্ণ, চক্ষু উজ্জ্বল, গাল দুইটী সামান্য লাল, দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে। রোগী মনে করে যে, সে বহুদিন বাঁচিবে, এমন কি মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বেও তাহার আশা থাকে যে, সে শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিবে।

যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগী প্রায়ই উগ্রপ্রকৃতি ও ক্রোধনস্বভাব হইয়া থাকে। রোগের বৃদ্ধি সহকারে রোগীর প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়; যাহারা স্বভাবতঃ শান্ত ও মৃদু, তাহারা অধিকতর মৃদু ও শান্ত এবং যাহারা উগ্র তাহারা উগ্রতর হইয়া থাকে।

নিষ্ঠীবন।—প্রথমে শ্লেষ্মা উদগত না হইতে পারে, যখন হয়, তাহার পরিমাণ কখন অল্প, কখন বা অধিক। তাহা ফেনিল, জলবৎ তরল, অথবা সামান্য গাঢ়। কখন কখন কটাবর্ণের শ্লেষ্মা উদ্গত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে তাহাতে সামান্য রক্তের রেখাও দেখা যায়। ক্রমে ফুস্‌ফুসের ক্ষত যত বৃদ্ধি পায়, শ্লেষ্মার পরিমাণ তত বাড়িয়া উঠে এবং তাহা ঘন পূঁজের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। কখন বা কেবল পূঁজই উদ্গত হইতে দেখা যায়। এই সময়ে পূঁজের সহিত রক্ত অধিক পরিমাণে

মিশ্রিত হওয়াতে তাহার বর্ণ ইষ্টকচূর্ণবৎ হইয়া পড়ে। কখন বা অত্যন্ত বিলেপী, ঘন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার শ্লেষ্মা উত্থিত হয়। তাহার আকার মুদ্রার ন্যায়।

অরিষ্ট লক্ষণ।

মহাশনং ক্ষীয়মানমতিসার নিপীড়িতম।
শূনমুষ্কোদরঞ্চৈব যক্ষ্মিণং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যে যক্ষ্মারোগী প্রচুর পরিমাণে আহার করে, অথচ শুষ্ক হইয়া যায়, যে অতিসার উপদ্রবে পীড়িত এবং যাহার অণ্ডকোষে ও উদরে শোথ উৎপন্ন হয়, তাদৃশ রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত।

শুক্লাক্ষমন্নদ্বেষ্টারমূর্দ্ধশ্বাসনিপীড়িতম্।
কৃচ্ছ্রেণ বহুমেহন্তং যক্ষ্মা হন্তীহ মানবম্॥
মেহন্তং—শুক্রক্ষয়ন্তম্।

রোগীর চক্ষুঃ শুক্লবর্ণ, অন্নে বিদ্বেষ, ঊর্দ্ধশ্বাস অথবা অতি কষ্টের সহিত আপনা হইতে প্রভূত পরিমাণে শুক্রক্ষরণ হইলে পীড়া আশুঘাতিনী জানিবে।

স্থিতিকাল।

পরং দিনসহস্রন্তু যদি জীবতিমানবঃ।
সুভিষগ্‌ভিকপক্রান্তস্তরুণ শোষপীড়িতঃ॥

অন্বয়ার্থঃ। শোষপীড়িতো মানবশ্চেৎ তরুণো ভবতি সুভিষগ্‌ভিকপক্রান্তো ভবতি তদা পরং দিনসহস্রং দ্বিতীয়ং দিন সহস্রং যদি জীবতি তত্র জীবনবিকল্প ইত্যর্থঃ। এতেন শোষপীড়িতো মানবশ্চেৎ তরুণো ভবতি সদ্বৈদ্যৈশ্চিকিৎসিতো ভবতি তদা প্রথম দিনসহস্রং জীবেদেবেত্যুক্তম্।
(ইতি ভাঃ প্রঃ)

অর্থাৎ যক্ষ্মাক্রান্ত ব্যক্তির যদি, যুবা-বয়স হয় এবং সুচিকিৎসক যদি তাহার চিকিৎসা করেন, তাহা হইলেও দ্বিতীয় দিন সহস্র অর্থাৎ পীড়া উৎপন্ন হইবার পর হইতে ৫ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে কি না সন্দেহ। এতাবতা ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে তরুণবয়স্ক যক্ষ্মারোগী সদ্বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসিত হইলে প্রথম সহস্র দিন অর্থাৎ ২ বৎসর ৯ মাস ১০ দিন পর্য্যন্ত নিশ্চিত জীবিত থাকিতে পারে, দ্বিতীয় দিন সহস্র পর্য্যন্ত জীবনের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত।

শীতপ্রধান দেশে এই রোগে সাধারণতঃ রোগী প্রায় আড়াই বৎসর বাঁচিয়া থাকে, তবে কখন কখন ইহা অপেক্ষা অল্প বা অধিককাল বাঁচিতে দেখা যায়। আমাদের দেশে ইহা অপেক্ষা কিছু অধিককাল জীবিত থাকে। যাহারা সহরে বাস না করিয়া পল্লীগ্রামে বা পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করে, তাহারা আরও অধিককাল জীবিত থাকে। যক্ষ্মারোগে প্রায়ই হঠাৎ মৃত্যু হয় না, তবে কখন কখন হইতেও দেখা যায়।

উপসর্গ :—এই রোগের সহিত বায়ু ও শ্বাসনালীতে এবং অন্ত্রমণ্ডলে ক্ষত ও ক্ষয় হয়; যকৃতের মেদাপজন, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্রমণ্ডল অথবা অন্যান্য অন্ত্রের পীড়া ঘটে এবং ভগন্দর, পাণ্ডু বা কামলা ও বহুমূত্র রোগ হইতে দেখা যায়। এই সকল উপসর্গ অতীব অশুভসূচক।

ক্ষয়, শোষ ও উরঃক্ষত।

অতঃপর ব্যবায়াদিজনিত বিশেষ বিশেষ শোষরোগ সমস্তের লক্ষণাদি লিখিত হইতেছে। এগুলি রাজযক্ষা নহে, ধাতুশোষ মাত্র; যদিও ক্ষয় ও শোষ যক্ষার পর্য্যায়রূপে ব্যবহৃত হয়, তথাপি নিম্নলিখিত শোষ সমূহে কেবল ধাতুশোষ মাত্র বুঝিতে হইবে।

ব্যবায়শোকবার্দ্ধক্য ব্যায়ামাধ্ব প্রশোষিতান্।
ব্রণোরঃক্ষতসংজ্ঞৌ চ শোষিণৌ লক্ষণৈঃ শৃণু॥

মৈথুন, শোক, বৃদ্ধাবস্থা, ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, ব্রণ (ক্ষত) ও উরঃক্ষত এই সপ্তবিধ কারণে সপ্তপ্রকার শোষরোগ উৎপন্ন হয়। এই জন্য শোষরোগের কারণানুসারে রোগী অভিহিত হইয়া থাকে।

ব্যবায়-শোষ।

ব্যবায়শোষী শুক্রস্য ক্ষয়লিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ।
পাণ্ডুদেহো যথাপূর্ব্বং ক্ষীয়ন্তে চাস্য ধাতবঃ॥

ব্যবায় শব্দের অর্থ মৈথুন। অতি মৈথুন দ্বারা শোষরোগ উৎপন্ন হইলে উহাকে ব্যবায়শোষ কহে। তাদৃশ শোষাক্রান্ত ব্যক্তি শুক্রক্ষয়জ লক্ষণ সমস্ত (অণ্ডকোষ ও লিঙ্গে বেদনা, মৈথুনে অশক্তি, দীর্ঘকালের পর শুক্রচ্যুতি ও অল্প পরিমাণে চ্যুতি ইত্যাদি) দ্বারা উপদ্রুত হয়। তাহার সর্ব্বশরীর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে এবং তাহার অস্থি ও মজ্জা প্রভৃতি ধাতুসমূহ ক্রমশঃ বিলোমভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শোক-শোষ।

প্রধ্যানশীল স্রস্তাঙ্গঃ শোকশোষ্যপিতাদৃশঃ।
বিনা শুক্রক্ষয়কৃতৈর্বিকারৈরুপলক্ষিতঃ॥

শোক-শোষাক্রান্ত ব্যক্তি, যাহার অভাবে শোক উৎপন্ন হইয়াছে, সর্ব্বদা তাহারই চিন্তায় রত, শিথিলাঙ্গ এবং ব্যবায়শোষীর ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ব্যবায়শোষে যেমন শুক্রক্ষয়কৃত মুষ্কে বেদনাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, ইহাতে তৎসমস্ত থাকে না, কিন্তু তদ্রূপ ধাতু সমস্তের শুষ্কতা হইয়া থাকে।

জরাশোষ।

জরাশোষী কৃশোমন্দবুদ্ধিবীর্য্যবলেন্দ্রিয়ঃ।
কম্পনোঽরুচিমান ভিন্ন কাংস্যপাত্র হতস্বরঃ॥
ষ্ঠীবতি শ্লেষ্মণাহীনং গৌরবারতিপীড়িতঃ।
সম্প্রস্রুতাস্যনাসাক্ষঃ শুষ্করুক্ষমলচ্ছবিঃ॥

জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্য হেতু স্বভাবতঃ উৎপন্ন শোষকে জরাশোষ বলে। ইহাতে দেহের কৃশতা, বুদ্ধি, বীর্য্য, বল ও ইন্দ্রিয়শক্তি মন্দীভূত হয়, কম্প ও অরুচি দেখা দেয়, কণ্ঠস্বর আহত ভগ্নকাংস্য পাত্রের শব্দের ন্যায় হইয়া থাকে। শুষ্ক কাসি, শরীর ভার ও অসুস্থ চিত্ততা মুখ নাসিকা ও চক্ষু দিয়া জলস্রাব এবং মুখ ও দেহের কান্তি শুষ্ক ও রুক্ষ হইয়া থাকে।

অধ্বশোষ।

অধ্বপ্রশোষী স্রস্তাঙ্গঃ সংভৃষ্ট পরুষচ্ছবিঃ।
প্রসুপ্ত গাত্রাবয়বঃ শুষ্কক্লোম গলাননঃ॥

নিত্য অধিক পথ পর্য্যটন করিলে যে শোষ উপস্থিত হয়, তাহাকে অধ্ব-শোষ বলে। ইহাতে রোগীর অঙ্গ অবশ ও শিথিল, দেহের কান্তি ঘৃষ্ট দ্রব্যের ন্যায় রুক্ষ, অঙ্গ সমুদায়ে স্পর্শশক্তির অল্পতা এবং ক্লোম ও মুখকণ্ঠ শুষ্ক হইয়া পড়ে।

ব্যায়ামশোষ।

ব্যায়ামশোষী ভূয়িষ্ঠমেভিরেব সমন্বিতঃ।
লিঙ্গৈরুরঃক্ষতকৃতৈঃ সংযুক্তশ্চ ক্ষতম্ বিনা॥

ব্যায়ামশোষে অধ্বশোষের সমস্ত লক্ষণ বর্দ্ধিতাবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং ক্ষত-ব্যতিরেকে উরঃক্ষতের অপর সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রণশোষ।

রক্তক্ষয়াদ্ বেদনাভিস্তথৈবাহাবযন্ত্রণাৎ।
ব্রণিতস্য ভবেচ্ছোষঃ স চাসাধ্যতমঃ স্মৃতঃ॥

কোন বিশেষ ক্ষতযুক্ত ব্যক্তির রক্তস্রাব, ব্রণবৎ বেদনা ও তাহার যন্ত্রণাহেতু যে শোষ উৎপন্ন হয়, তাহা ব্রণশোষ নামে অভিহিত। ইহা সচরাচর অসাধ্য।

উরঃক্ষত।

কারণ।—ধনুকে জ্যারোপণ, ধনু-রাকর্ষণ ও বাণনিক্ষেপাদি ক্লেশজনক ধনুঃ-কর্ম্মসম্পাদন, গুরুভার-বহন, বল-বানের সহিত যুদ্ধ, পর্ব্বতবৃক্ষাদি উচ্চস্থান হইতে পতন, অতি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, দ্রুতবেগে দূরগমন, সন্তরণ দ্বারা মহানদী উত্তরণ, ধাবমান অশ্বের সহিত সমান-বেগে ধাবন, লম্ফন, শীঘ্র শীঘ্র নর্ত্তন, এই সকল এবং এইরূপ অন্যান্য কঠোর কর্ম্ম সমূহ দ্বারা এবং অধিক স্ত্রীসঙ্গম, রুক্ষ ভোজন ও অত্যল্প ভোজন হেতু বক্ষঃ (ফুস্‌ফুস্) ক্ষত হইলে ভয়াবহ উরঃক্ষতরোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে বক্ষোদেশ বেদনাযুক্ত, বিদীর্ণবৎ ও দ্বিধা বিভিন্নবৎ হইয়া থাকে; সেই সঙ্গে পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, অঙ্গশোষ ও কম্প উপ-স্থিত হয় এবং ক্রমশঃ বল, বীর্য্য, বর্ণ, রুচি ও অগ্নির হানি হয়; জ্বর, বেদনা, মনের হীনতা, মলভেদ ও ক্ষুধানাশ হইয়া থাকে। কাসের সহিত নিরন্তর বহুল পরিমাণে শ্যাব বা পীতবর্ণ, গ্রন্থিল, দুষ্ট, সরক্ত কফ নির্গত হয়। এইরূপে উরঃ-ক্ষতরোগী শুক্রক্ষয় ও তেজোনাশহেতু অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

এই সমস্ত লক্ষণ সম্যকরূপে স্ফুটিত না হইলে তৎসমুদায়কে উরঃক্ষত শোষের পূর্ব্বরূপ বলা যায়।

মহর্ষি সুশ্রুত বলেন

ব্যায়ামভারাধ্যয়নৈরভিঘাতাতিমৈথুনৈঃ।
কর্ম্মণা চাপ্যুরস্তেন বক্ষো যস্য বিদারিতম্॥
তস্যোরসি ক্ষতে রক্তং পূয়ঃ শ্লেষ্মা চ গচ্ছতি।
কাসমানশ্ছর্দ্দয়েচ্চ পীতরক্তাসিতারুণম্॥
সন্তপ্তবক্ষাঃ সোঽত্যর্থং দূষণাৎ পরিতাম্যতি।
দুর্গন্ধবদনোচ্ছ্বাসো ভিন্নবর্ণস্বরো নরঃ॥

ব্যায়াম, ভার-বহন, অধ্যয়ন, অভি-ঘাত ও অতি মৈথুন দ্বারা এবং অন্যান্য

উরস্য কর্ম্ম অর্থাৎ যে কর্ম্ম করিতে বক্ষের বল আবশ্যক হয়, অথবা বক্ষে আঘাত লাগে, তাহা দ্বারা বক্ষঃ অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্ বিদীর্ণ হইলে উরঃক্ষতরোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে রক্ত, পূয় ও শ্লেষ্মার নির্গম, কাসিতে কাসিতে পীত, লোহিত, কৃষ্ণ, আরক্ত বর্ণ পদার্থ বমন, বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত সন্তাপ, যাতনাতিশয্য, মুখে ও উচ্ছ্বাসে পূতিগন্ধ এবং বর্ণ ও স্বরের বিকৃতি এই সকল লক্ষণ আবির্ভূত হয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ।

উরোরুক্ শোণিতচ্ছর্দ্দিঃ কাসো বৈশেষিকঃ ক্ষতে।
ক্ষীণে সবক্তমূত্রত্বং পার্শ্বপৃষ্ঠকটিগ্রহঃ॥

মনুষ্য উরঃক্ষত রোগাক্রান্ত হইলে বক্ষোবেদনা, রক্তনিষ্ঠীবন ও বৈশেষিক কাসে নিপীড়িত হইয়া থাকে। রোগী রক্ত, কফ, শুক্র ও ওজের ক্ষয়হেতু ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলে রক্তপ্রস্রাব করে এবং তাহার পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটিতে বেদনা হয়।

ভাবীফল।

অল্পলিঙ্গস্য দীপ্তাগ্নেঃ সাধ্যো বলবতো নবঃ।
পরিসংবৎসরো যাপ্যঃ সর্ব্বলিঙ্গন্তু বর্জ্জয়েৎ॥

অল্প লক্ষণাক্রান্ত দীপ্তাগ্নি সম্পন্ন বলবান্ রোগীর অচিরোৎপন্ন উরঃক্ষত রোগ সাধ্য। সংবৎসর অতীত হইলে যাপ্য এবং সর্ব্বলক্ষণের উদয় হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে।

সমালোচনা।

ধরণী—শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ধরণী এখন অতি শিশু, এই সবেমাত্র চারি মাস সাহিত্য সমাজে দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতারকালে ক্ষীণ কলেবর হীনবল ধরণী বাঁচিবে কি না বলিতে পারি না। আজকাল লেখকের সহায়তা না পাইলে কোন পত্রিকাই দাঁড়াইতে পারে না, আমরা "ধরণী" পত্রিকার কেবল চতুর্থখণ্ড পাইয়াছি। একখানি দেখিয়া দোষ গুণ বিচার করা অনাবশ্যক। এই সংখ্যায় সম্পাদক পত্নীরচিত "কবিরা মূর্খ" শীর্ষক কবিতাটী সুন্দর হইয়াছে।

২য় খণ্ড। | ১৩০২ সাল—আষাঢ়। | ১০ম সংখ্যা।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

মূল্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সমীরণের তৃতীয় বর্ষ আগতপ্রায়। যে গ্রাহক মহোদয়গণ বরাবর আমাদিগকে অগ্রিম মূল্য দিয়া উপকৃত ও বাধিত করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা যেন অচিরে তৃতীয় বর্ষের মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন। আর যাঁহারা অনুনয় বিনয়—চিঠিপত্রেও এপর্য্যন্ত দ্বিতীয় বর্ষের মূল্য পাঠান নাই তাহাদিগকে আর কি বলিব? সমীরণের মূল্য যথাসম্ভব কম করিয়াও যদি আমরা তাহা যথাকালে না পাই, তাহা হইলে সাহিত্য সেবা অবিলম্বে নিতান্ত বিড়ম্বনার বিষয় হইয়া পড়িবে, অতএব সেই মহোদয়দিগের প্রতি আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা অচিরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের মূল্য একত্রে পাঠাইয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন।

যাঁহারা ভেলিউ পেয়েবেলে সমগ্র বর্ষের মূল্য দিতে ইচ্ছা করেন, পত্র পাইলে আমরা তাঁহাদিগের নিকট সেই উপায়েই পত্রিকা পাঠাইব।

আর একটী কথা।

আমরা একান্ত হৃষ্টচিত্তে জানাইতেছি যে, সমীরণের প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংস্করণও শেষ হইয়া গিয়াছে। গ্রাহকগণের আগ্রহাতিশয্যে শতের পর শত ছাপাইয়াও আমরা সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এক্ষণে নিবেদন যাঁহারা প্রথম বর্ষের পুরা সেট চাহেন, তাঁহারা আমাদিগকে জানাইলে তাঁহাদিগের নাম রেজেষ্টারীভুক্ত করিয়া রাখি। ৪র্থ সংস্করণ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে, সম্পূর্ণ হইলেই পাঠাইতে পারিব।

সঙ্গীরণ

২য় খণ্ড। ১৩০২ সাল—আসাঢ়। ১০ম সংখ্যা।

শাস্ত্রোক্ত ভোজন বিধি।

ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষণাং প্রাণাঃ সংস্থিতিহেতবঃ।
তান্ নিঘ্নতা কিন্নহতং রক্ষতা কিন্ন রক্ষিতং॥

ধর্ম্ম-অর্থ কাম মোক্ষের নিদান স্বরূপ জীবন রক্ষা যে দেহী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়মাবলীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিলেই নিরোগশরীর ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবলীলা সম্পাদন করিতে পারা যায়, শরীর রুগ্ন ও অসুস্থ হইলে মনও অসুস্থ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং মানসিক বৃত্তি নিচয়ের নিস্তেজতায় কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা সর্ব্ব প্রযত্নে শরীর রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" এই বাক্য অনেকেই অবগত আছেন।

আহারই শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপাদান, আহারের ব্যতিক্রমে শরীর ও জীবনীশক্তির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। সকলেই স্বীকার করেন যে পূর্ব্বেকার লোকেরা, বর্ত্তমান শিক্ষিত ও সুসভ্য (?) লোকগণ অপেক্ষা দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিতেন। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে বর্ত্তমানে শাস্ত্রোক্ত ভোজন বিধিতে অনাস্থা প্রদর্শন ও বিদেশীয় ভোজন বিধির অনুকরণ অস্মদ্দেশীয় জন সাধারণের শারীরিক অবনতির একটী প্রধান কারণ; বহুদর্শী, বিজ্ঞপ্রবর ঋষিগণের অকাট্যযুক্তিপূর্ণ বাক্যে অবহেলা করিয়া আমরা যে পদে পদে অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছি তাহা এক্ষণে অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত আহারীয় দ্রব্যের গুণানুসারে মানবের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হয়। দ্রব্যবিশেষ-ভক্ষণে অভ্যাস-বলে শারীরিক অসুস্থতা না ঘটিলেও মানসিক বৃত্তি নিচয়ের ক্রিয়ার তারতম্য হইয়া থাকে। দেশ-ভেদে জাতীয় প্রকৃতি যে বিভিন্ন হয় এই আহার্য্য ভেদ তাহার অন্যতম কারণ, এই আহার্য্য বস্তুর গুণানুসারে এক জাতির মধ্যেও, এক দেশের মধ্যেও কেহ শান্ত, কেহ দুর্দ্দান্ত; কেহ স্থির, কেহ চঞ্চল, কেহ ভীরু কেহ উগ্র ইত্যাদি নানাবিধ প্রকৃতি বিশিষ্ট লোক দেখিতে পাওয়া যায়। খাদ্য ভেদেই সত্ব, রজ ও তমগুণের হ্রাস বৃদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং তমগুণের বৃদ্ধিতে অজ্ঞানতা, মোহ ও আলস্য প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া মানসিক

বিকার সাধন করে। হবিষ্যাশী ও মাংসাশীর প্রকৃতিগত পার্থক্য সহজেই অনুমেয়; একজন স্থির, ধীর, ও চিন্তাশীল, অন্যজন চঞ্চল, উগ্র ও কোপন স্বভাব। এই জন্যই আমাদের দেশে আশ্রম-ভেদে খাদ্যের ও ভোজন প্রণালীর ইতর বিশেষ আছে; গৃহীর যেরূপ ভোজনের নিয়ম; ব্রহ্মচারীর পক্ষে সেরূপ নহে, আবার সধবার পক্ষে যেরূপ, ব্রহ্মচারী ও বিধবার পক্ষে সেরূপ নহে। অতএব শারীরিক এবং মানসিক প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতা লাভ করাই, যখন মানব জীবনের উদ্দেশ্য আর সেই শ্রেষ্ঠতা যখন খাদ্যের ও ভোজন-প্রণালীর উপর নির্ভর করিতেছে, তখন ভোজন-বিধির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা যে মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

আর্য্য ঋষিগণ দ্রব্যসমূহের গুণাগুণ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বয়স-ভেদে, ঋতু-ভেদে, মাস-ভেদে, বার-ভেদে, তিথি-ভেদে বস্তুবিশেষ ভোজনের প্রবর্ত্তন ও নিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, খাদ্য প্রস্তুত-প্রণালী, ভোজন-প্রণালী, ভোজনের কাল ও পাত্র সম্বন্ধে নানাবিধ অকাট্য, বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণ লোককে পাপের ভয় প্রদর্শন করিয়া, বহুতর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন। সেই সকল নিয়ম যে আমাদের অশেষ মঙ্গলের নিদান, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সেই সকল নিয়মে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াই যে আমরা অকাল বার্দ্ধক্য আনয়ন করিয়া সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিতেছি তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না।

আর্য্য ঋষিগণ "ভোজন"-ক্রিয়াকে "যজ্ঞ বিশেষ" জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের মতে স্বীয় জঠরাগ্নিতে খাদ্যরূপ আহুতি প্রদানের নামই ভোজন ক্রিয়া। এই ভোজন যজ্ঞে "স্বাহা" প্রভৃতি শব্দযুক্ত অনেক মন্ত্রাদি উচ্চারিত হইয়া থাকে। ভক্ষ্যদ্রব্যের শুচিত্ব রক্ষা করিবার জন্য এবং শারীরিক ও মানসিক সুখ, স্বচ্ছন্দতা লাভ করিবার কামনায় তাঁহারা (দ্বিজাতিরা) ভোজনের প্রারম্ভে ও অন্তে অনেক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন। অদ্য আমাদের শাস্ত্রোক্ত ভোজন-প্রণালী ও উক্ত মন্ত্রাদির বিষয় নিম্নে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

গৃহী, প্রত্যহ স্নানান্তে নিয়মিত পঞ্চ যজ্ঞ শেষ করিয়া শুদ্ধ ও প্রশান্ত চিত্তে স্বয়ং ভোজন করিতে বসিবেন। অহুত্বা চকৃমিং ভুঙক্তে অদত্বা বিষভোজনং অর্থাৎ যে ব্যক্তি পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ও সমাগত ক্ষুধিতকে না দিয়া ভোজন করে সে কৃমি ও বিষ ভোজন করে" ইত্যাদি নানাপ্রকার শাসন বাক্য শাস্ত্রে লিখিত আছে। ভোজনের পূর্ব্বে হস্তপদ ও মুখ প্রক্ষালন করিতে হয়। পদদ্বয় ধৌত করিলে যে মস্তিষ্কের ও সর্ব্বশরীরে স্নিগ্ধতা সঞ্চারিত হয় তাহা অনেকেই অবগত আছেন। বর্ত্তমানে ভোজনের পূর্ব্বে বা পরে পদ প্রক্ষালনের প্রথা প্রায় অন্তর্হিত; এখন বারে বারে বুট মোজা হইতে পদ নিষ্কাশন করাই এক প্রকার অসভ্যতা,—পদ ধৌত করা ত পরের কথা। যাহা হউক শাস্ত্রকর্ত্তারা কিন্তু জলকে "জীবন" বলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা জলের ব্যবহারে ভীত হইতেন না তাঁহারা বলেন—"

পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাৎ প্রাঙ্মুখো মৌনমাস্থিতঃ।
হস্তৌ পাদৌ তথৈবাস্য মেষু পঞ্চার্দ্রতা মতাঃ॥

অর্থাৎ হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মুখ এই পঞ্চস্থান পবিধৌত করিয়া, মৌনী প্রাঙ্মুখ হইয়া ভোজনে বসিতে হইবে। পিতা বর্ত্তমান থাকিলে দক্ষিণ মুখে ভোজন করিতে নাই—

"কুক্ষস্নানং গয়াশ্রাদ্ধং ত্রিশ্রুস্তর্পণমেবচ।
নজীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাদ্দক্ষিণ্যামুখ ভোজনম॥

আবার উত্তর মুখে আহারে বসিলে পুত্রহত্যার পাতক হয়। কিন্তু বিষ্ণু পুরাণে এইরূপ উক্ত আছে;—

"বিশুদ্ধবদনো প্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিঙ্মুখ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি নচৈবান্যমনা নৃপঃ॥

দেবারাধনা ও ভোজনাদি কার্য্যে প্রৌঢ় পাদে অর্থাৎ উবু হইয়া উপবেশন অতীব নিষিদ্ধ প্রমাণ যথা—

"স্নানং দানং, জপং হোমং ভোজনং দেবতার্চ্চনং।
প্রোঢ়পাদো ন কুর্ব্বীত স্বাধ্যায়ং পিতৃতর্পণং॥

অর্থাৎ স্নান, দান, জপ, হোম, ভোজন, দেবতার্চ্চনা, স্বাধ্যায়, এবং পিতৃতর্পণ প্রৌঢ়পাদে করিতে নাই।

প্রফুল্লচিত্তে, সুগন্ধি মাল্য ও অনুলেপনাদি ধারণ পূর্ব্বক আহার করিতে বসিবে। মন প্রফুল্ল ও বিশুদ্ধ থাকিলে যে ভুক্ত দ্রব্য সুজীর্ণ ও শরীর পোষক হয় তাহা বৈজ্ঞানিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। মনে স্ফূর্ত্তি বা তৃপ্তি না থাকিলে অমৃতময় খাদ্যও যে বিষতুল্য হয় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনেকেই দেখিয়াছেন। মন প্রফুল্ল ও বিশুদ্ধ রাখিবার জন্যই সুগন্ধ চন্দনাদি ধারণ ও সুগন্ধ ধূপ, দীপ, পুষ্পাদি দ্বারা দেবার্চ্চনা পরেই আমাদের দেশের ভোজন কাল নির্দ্ধারিত হয় কিন্তু বর্ত্তমানে স্নানান্তে প্রায় আর্দ্র মস্তকে তাড়াতাড়ি ভোজনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে মোগল সম্রাট্ আক্বার ঋষিবাক্যের অর্থ বুঝিতে পারিয়া ভোজনের পূর্ব্বে মাল্য ও নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য ধারণ করিতেন; পূর্ব্বে রোমান্ সম্রাটেরা মানসিক আনন্দ লাভ করিবার জন্য ভোজনের সময় নানাবিধ মনোরম গীতি সুখকর বাদ্যাদির অনুষ্ঠান করিতেন, কিন্তু অস্মদ্দেশের সভ্য মহোদয়গণ ইতিহাসে, বিজ্ঞানে ঈদৃশ শিক্ষা লাভ করিয়াও কেন যে এই সকল মহান্ হিতকর ঋষিবাক্যে অবহেলা করিয়া ব্যাধিযন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে?

ভোজনের কালাকাল বা পাত্রাপাত্র ভেদ আজকাল লোপ পাইয়াছে। কার্য্যের তাড়া অনুসারে দিবসের প্রথম, মধ্য বা শেষ যামেও আহার ঘটিয়া থাকে। প্রত্যহ এক সময়ে আহার করা যে শরীরের বিশেষ উপকারী, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, কিন্তু বর্ত্তমানে আহার সময়ের বিভ্রাট আমাদের দেশের সর্ব্ব প্রকার সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঘটিয়া গিয়াছে। আহার-কালের এই বিভ্রাটই লোকের স্বাস্থ্য-হানি করিয়া সুখময় সংসারকে ভয়ানক শ্মশানে পরিণত করিতেছে। আজকাল বঙ্গের স্বাস্থ্যাবনতি দেখিলে মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হয়; বঙ্গদেশকে ম্যালেরিয়ার প্রিয় বাসস্থান বলিয়া বোধ হয়।

ভোজনের কালাকাল সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে,—

"যাম মধ্যে ন ভোক্তব্যং ত্রিযামন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ॥"

অর্থাৎ দিবা এক প্রহরের পর অথচ তৃতীয় প্রহরের পূর্ব্বে আহার করা উচিত। প্রত্যহ এক সময়ে আহার করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাও শাস্ত্রকর্ত্তারা বলিয়া গিয়াছেন। দ্বিজাতির পক্ষে দিনে দুইবার ভোজন নিষিদ্ধ। ফলকথা মধ্যাহ্ন সময়ই ভোজনের প্রশস্ত কাল।

ভোজন-পাত্রের এখন কোন নিয়ম নাই। আমাদের দেশে অবস্থাভেদে, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রস্তর, কাংস্য বা পিত্তল-পাত্রে অথবা কদলী প্রভৃতি পত্রে ভোজন করিবার প্রথা আছে। ভোজন-পাত্রের দোষ গুণে যে খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণের তারতম্য ঘটে, ইহা সহজেই অনুমেয়। শাস্ত্রকর্ত্তারা মৃৎপাত্রে রন্ধন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন কিন্তু উচ্ছিষ্ট হয় বলিয়া মৃৎপাত্রে বা কাচ পাত্রে ভোজন পরিত্যজ্য। আর—

"অর্কপত্রে তথা পৃষ্ঠে, আযসে তাম্রভাজনে।
করে কর্পটকে চৈব ভুক্তা চান্দ্রায়নঞ্চরেৎ॥

অর্থাৎ অর্কপত্রে, কদলী পত্র পৃষ্ঠে, লৌহ পাত্রে, তাম্র পাত্রে, করে এবং কর্পটকে (১) ভোজন করিলে চান্দ্রায়ন ব্রত আচরণ করিতে হয়। তবেই এই সকল পাত্রে ভোজন যে অতীব নিষিদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভোজন সময়ে বাগ্‌যত হইয়া থাকিতে হয়। বর্ত্তমানে কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ভোজনে মৌনব্রতধারী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অনুপাতে তাঁহাদের সংখ্যা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আইসে না। ভোজন-কালে এরূপ মৌনাবলম্বন করিতে হইবে যে কিঞ্চিন্মাত্র হুংকার শব্দও নিষেধ—

মৌনব্রতং মহাকষ্টং হুংকারেণৈব নশ্যতি॥

এইরূপ মৌনী হইয়া ও উত্তরীয়বস্ত্র লইয়া ভোজনে উপবেশন করতঃ প্রথমে ভোজ্য দ্রব্য স্বীয় অভীষ্ট দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়, তৎপরে পঞ্চভাগ অন্ন মাটীতে রাখিয়া নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই পঞ্চ বহিঃস্থ বায়ুকে "নাগায় নমঃ"-ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা নিবেদন করিতে হয়। পরে পূর্ব্বে এক গণ্ডূষ জল লইয়া "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা (১) বলিয়া সেই জল গণ্ডূষ পান করিয়া দেহস্থিত পঞ্চবায়ু অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ প্রাণকে "প্রাণায় স্বাহা; অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা" বলিয়া পাচবার অন্ন নিজ মুখে প্রদান করিতে হয়। ইহাকেই "পঞ্চগ্রাস" কহে। এ বিষয়ে বিষ্ণু পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

অশ্নীয়াৎ তন্ময়োদিথ্যাং বাগ্‌যতোন্নমকুৎসয়ন্।
পঞ্চগ্রাসান্মহা মৌনং প্রানাদ্যাপ্যায় নায় চ॥

এই প্রকারে দেহস্থিত পঞ্চবায়ু ও বহিঃস্থ পঞ্চবায়ুকে প্রদান করিয়া ভোজন আরম্ভ করাই বিধি। ভোজনের প্রারম্ভে কটু তিক্ত রসাদি, মধ্যে লবণাম্ল ও শেষে "মধুরেণসমাপয়েৎ" করিতে হয়। এ বিষয়েও শাস্ত্রকর্ত্তারা যাহা বলিতেছেন তাহা এই—

আশ্নীয়াত্তন্মনা ভূত্বা পূর্ব্বন্তু মধুরং রসং।
লবণাম্লৌ তথা মধ্যে কটু তিক্তাদিকাং স্তথা॥

(১) কর্পটকে অর্থাৎ ছিন্নবস্ত্রে।

(১) হে অমৃত, তুমি উপস্তরণ স্বরূপ হও।

ভোজ্যদ্রব্যের রসাদি ভেদে ভোজন প্রণালী যে শরীরে সম্যক উপকারী তাহা কে না স্বীকার করিবেন! কিন্তু সুখের বিষয় এই যে আজিও অস্মদ্দেশে ভোজনের এই ক্রম প্রচলিত আছে।

প্রফুল্ল মনে, ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার করিতে হয়। অতি ভোজন যে রোগের মূল ও আয়ুক্ষয়কারক তাহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন অতএব অতি ভোজন যে পরিত্যজ্য তাহাতে আর কথাটি নাই।

এক পংক্তিতে বহুলোক একত্রে ভোজনে বসিলে অপর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে গাত্রোত্থান অত্যন্ত নিষিদ্ধ।

ভুঞ্জানেষু তু বিপ্রেষু যস্তু পাত্রং পরিত্যজেৎ।
ভোজনে বিঘ্নকর্ত্তা সো ব্রহ্মহাপি তথোচ্যতে॥

অর্থাৎ এক পংক্তিতে ভোজনে উপবেশন করিয়া যে সকলের অগ্রে ভোজন-পাত্র ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করে সেই ভোজন বিঘ্নকারীর ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়।

ভোজনান্তে "অমৃতাপিধানমসি (১) স্বাহা" বলিয়া পূর্ণ এক গণ্ডূষ জল পান করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উত্তমরূপে মুখ হস্তপদ প্রক্ষালন করিতে হয়। আচমনের পূর্ব্বে—

হুতশেষ অর্থাৎ ভোজনাবিশিষ্ট কিঞ্চিৎ অন্ন মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা আছে তাহার মন্ত্র এই—

"যে চাস্মাকং কুলে জাতা দাসদাস্যন্নকাঙ্ক্ষিনঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু ময়া দত্তেন ভূতলে॥

ইতি বিধি অনুসারে ভোজন ব্যাপার সম্পাদন পূর্ব্বক আচমন ও মুখ শুদ্ধি করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম; গ্রীষ্ম প্রধান দেশীয়গণের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক; অন্যথা ভুক্ত দ্রব্য অজীর্ণ অবস্থায় থাকিয়া দেহের নানাবিধ অপায় আনয়ন করে। "ভুক্ত্বা পাদশতং গত্বা পশ্চাদ্রাজবদাচরেৎ" এই বাক্য অস্মদ্দেশে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে কিন্তু কার্য্যে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কি বালক কি পরিণত বয়স্ক সকল ভদ্র লোকই অধুনা তাড়াতাড়ি আহার কার্য্য সমাপন অর্থাৎ অন্ন "চোখে মুখে গুঁজিয়া" পরিশ্রমার্থ বহির্গত হন। এই কু-প্রথা যে অস্মদ্দেশীয় বালক ও যুবক গণের অকালবার্দ্ধক্যের মূলীভূত কারণ, তাহা কাহারও হৃদয়ঙ্গম হয় না। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য রীতির অনুমোদিত হইলেও ইহা যে এ দেশের উপযোগী নহে ইহা যে এদেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখেন না। ফল কথা এই ভোজন বিধির বিল্রাটেই যে আমাদের স্বাস্থ্যের ঈদৃশ অবনতি ঘটিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। (১)

শ্রীবিনোদ বিহারী চট্টোপাধ্যায়।

(১) হে অমৃত, তুমি অপিধান অর্থাৎ আচ্ছাদন স্বরূপ হও।

(১) ভোজন কালে পাত্র হইতে হস্ত উত্তোলন করিলেই পাত্র উচ্ছিষ্ট সুতরাং পরিত্যাজ্য হয়, এই দোষ আশঙ্কায় কেহ কেহ ভোজন কালে বাম হস্তদ্বারা ভোজন পাত্র স্পর্শ করিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ লোক অতি বিরল।

পেঁড়োর মন্দির।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

জুমিলার পরিচয় প্রকাশ ও বাবরের মৃত্যু এই দুই ঘটনা এত কাছাকাছি ঘটিয়াছিল যে,দিল্লীতে এই দুই সংবাদ একই সময়ে পৌছিয়াছিল। এই দুই ঘটনার বিষয় যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই কল্পনা কবিতে লাগিল। বাবর যে বীবের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইতে চাহেন, তাহা কাহাবও আশ্চর্য্যবোধ হইল না। কিন্তু জুমিলা যে পুরুষের সঙ্গে সংগ্রামক্ষেত্রে বিচরণ কবিয়াছিলেন, তাহাই সকলে আশ্চর্য্য বোধ করিল এবং জুমিলার নামে "কথা" উঠিতেও বাকী রহিল না। কিন্তু এই দুই সংবাদ কোমলহৃদয় বন্নুকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আঘাত করিয়াছিল। তাঁহার প্রিয়তম বাবরের অনুপস্থিতিতে তিনি দিন দিন অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন; দিল্লীতে বাবব তাঁহার নিকটে না থাকিবার জন্য মনে মনে তিনি কত অভিমান করিতেন। বাবরের পাণ্ডুয়াতে বীরত্বের কথা বন্নু অবশ্য অনেকবাব শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নামেব সঙ্গে আর একজনের কথা জড়িত হইয়া তাঁহাব কর্ণে পৌছিত—সেই অপর ব্যক্তির বিষয়ে বাববের অনভিলষিত চিরসঙ্গী বলিয়া শোনা যাইত। বন্নু অনেকবার আপনার মনে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "এই সঙ্গী কে?—জুমিলার আব কোন সংবাদ অনেক দিন হইতে পাইতেছি না; কিন্তু জুমিলা যে এই সকল করিবে তাহা অসম্ভব; ফার্দ্দুস যাহা করিয়াছ, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা করা অসম্ভব। প্রত্যক্ষ দেখিলেও ইহাতে আমাব প্রত্যয় হইবে না। বিশ্বাস না কবিবই বা কেন? বাবরেব প্রতি কি জুমিলা একান্ত অনুরক্ত ছিল না এবং তাঁহাব কথোপকথন সকলও কি পুরুষোচিত ছিল না? জুমিলা যুদ্ধ, জয় পবাজয় প্রভৃতি স্ত্রীজনদুর্লভ কথা বলিতেই ভালবাসিত। কে জানে, হয়তো সে যাহা এখানে পারে নাই,—বাবরের হৃদয় অধিকাব করিবাব জন্য পুরুষের ছদ্মবেশে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া থাকিবে।"

বন্নুব হৃদয় প্রশস্ত হইলেও স্ত্রীজাতিসুলভ আত্মাভিমানে বঞ্চিত ছিল না। বাবরআলী যত দিন দিল্লীতে ছিলেন, ততদিন বন্নু নিশ্চিন্ত মনে ভাবিতেন যে তাঁহার সৌন্দর্য্য বাববকে আবদ্ধ রাখিতে পারিবে। কিন্তু বাবর যখন তাঁহা হইতে দূরে, তখন জুমিলার দৈহিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক তেজের সম্মুখে বাবরের আত্মহারা হইবার পক্ষে কোনই বাধা দেখিতে পাইলেন না। সত্য বটে, বাবরেব মনের দৃঢ়তা, তাঁহার অনুরাগের একনিষ্ঠতার বিপক্ষে এপর্য্যন্ত কেহ একটাও কথা বলিতে সক্ষম হয় নাই; আর ইহাও অসম্ভব কথা যে এত বড় বীর একজনের নিকট আমৃত্যু অনুরাগের পণে আবদ্ধ হইয়া পরিশেষে একটী মাত্র বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়া সমস্ত জীবনের গৌরব কলঙ্কিত করিবেন।

তথাপি বলিলে হয় কি, বাবর মনুষ্য তো এবং বন্নু ও অনুরাগ সঙ্কুচিত রাখিতে নিকটে নাই। তাঁহার প্রতিযোগী জুমিলা যখন যুদ্ধে বাবরের সঙ্গী আছেন, যদি থাকেন, তাঁহার দিকে বাবরের মন ফিরাইবার পক্ষে প্রচুর সুবিধা ঘটিবে—কতবার বাবরকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার হৃদয়াসনে হয়তো স্থান পাইয়াছে। এখন জুমিলার ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিলেই বন্নুর দুরদৃষ্ট ঘটিবে—তখন বাবরের আর বন্নুকে মনে পড়িবে না। এইরূপ নানা ভাবে বন্নুর হৃদয়-টীকে আলোড়িত করিতে লাগিল। বন্নু আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন "আমারই প্রিয়বন্ধু জুমিলাই শেষে আমার মন্দকপালের কারণ হইল, আমার জীবনে আর প্রয়োজন নাই—এখন মরিলেই বাচি।"

এইরূপে বন্নু প্রতিদিন ভাবিতে ভাবিতে স্বায় জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তুলিতেছিলেন, এমন সময়ে বাবরের মৃত্যু ও জুমিলার পরিচয় প্রকাশ, এই উভয় সংবাদই দিল্লীতে পৌছিল। প্রিয়তমের মৃত্যুসংবাদে বন্নু শোকে এতদূর কাতর হইলেন যে, জুমিলার প্রতি ঈর্ষাকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া আপনাকে একেবারে মক্কায় চিরনির্ব্বাসিত করিলেন। কিছুকাল পরেই তথায় দেহাবসান হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

জুমিলার আত্মপ্রকাশ ও যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার বীরত্ব নানা লোকের হৃদয়ে নানাভাব আনয়ন করিয়াছিল বটে, কিন্তু দিল্লীর সম্রাটকন্যা সেলিমার হৃদয়ে অতি ভয়ানক ঈর্ষা ও ক্রোধ জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। সেলিমার শাক্‌-দত্ত সুফিউদ্দীন সম্রাটকে পত্র লিখিবার কালে বাবরের মৃত্যু উপলক্ষে যথেষ্ট শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে অসঙ্কুচিত ভাবে জুমিলাকে তাঁহার সাহস বীরত্ব, রাজভক্তি প্রভৃতি নানা গুণের জন্য প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেলিমা তাহা দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি একান্ত অনুরক্ত না হইলে তাহার এত-দূর প্রশংসা করিতে পারে কি?

পাণ্ডুয়া হইতে যত সংবাদ আসিতে লাগিল, সকলেতেই জুমিলার অত্যন্ত প্রশংসা লিখিত দেখা গেল। সেলিমাও প্রতি সংবাদবাহকের হস্তে তাঁহার বিশ্বাসী সরফরাকে জুমিলার প্রতি সুফিউদ্দীনের ব্যবহারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। সুফি-উদ্দীনের চিরপোষিত প্রেমও সেলিমার হৃদয়ের ঈর্ষাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারে নাই। অবশেষে সেলিমা যখন দেখিলেন যে জুমিলার প্রশংসা সুফিউদ্দীনের মুখে বাড়িতেছে বই কমিতেছে না তখন মনের আগুনে পুড়িতে পুড়িতে সরফকে বলিয়া পাঠাইলেন "কালসর্পকে সরাইয়া ফেল এবং যদি সংবাদ যাহা শুনি তাহা সত্য হয়, তবে যে সেই কাল-সর্পকে আলিঙ্গন করিয়াছে, তাহারও প্রতি দয়া প্রদর্শন করিও না। এই আজ্ঞা পালন কর অথবা মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে দেখা গেল যে জুমিলার শূন্য শিবির কাঁদিতেছে। সকলেই তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। কতকগুলি লোকে মনে করিল যে জুমিলা হতাশ হৃদয়ে আত্মহত্যা করিয়াছেন; কতকগুলি ভাবিতে লাগিল যে তিনি দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন; কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান স্থির করিয়াছিল যে তিনি মর্ত্ত্যলোকের জীব নহেন—এই ধর্ম্মার্থে যুদ্ধযাত্রাকে সহায়তা করিবার জন্য প্রেরিত দূত; তাঁহার কার্য্য ফুরাইয়া যাওয়াতে পুনরায় স্বর্গরাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে এই সকল কল্পনার কোনটীই ঠিক হয় নাই। জুমিলা আপনার মতলব অনুসারে শিবির ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি শৈশবে যমুনাতীরে ব্রহ্মচারীদিগকে যেরূপ সজ্জিত হইতে দেখিতেন এবং তাঁহাদিগকে যে সকল মন্ত্র পাঠ করিতে শুনিতেন, আজ সেই সকল তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিল। জুমিলা আপনার মুখে ও গাত্রে বিভূতি মাখিয়া, সুদীর্ঘ কেশগুলি বৃক্ষের আটা দ্বারা জটায় পরিণত করিয়া ব্রহ্মচারীবেশে সজ্জিত হইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে পাণ্ডুয়ার একটী সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী দেখিয়া কেহই তাঁহাকে দুর্গের অভ্যন্তরে যাইবার বাধা প্রদান করিল না। সকলেই তাঁহাকে "বাবাজীর জয় হোক" বলিয়া অভিবাদন করিতে লাগিল এবং তিনি ও "কল্যাণ হোক" বলিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। দুর্গাভ্যন্তরস্থ নানা পথ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে বলভদ্রের আবাসস্থানের দ্বারে দাঁড়াইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারীর আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দ্বাররক্ষকগণ দ্বার উন্মোচন করিয়া দিল এবং প্রভুর আদেশে তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতে অনুরোধ করিল। তাঁহার সম্মুখে মিষ্টান্ন ও দুগ্ধ আনীত হইল; তিনি তাহাই জলযোগ করিয়া বাটীর বাহিরের একটী গৃহে সুখে রাত্রিযাপন করিলেন।

এইরূপে তিন সপ্তাহ অতি সুখে কাটিয়া গেল। এই সময়ের ভিতরে জুমিলা অতি সাবধানতার সহিত দুর্গের আভ্যন্তরিক অবস্থা এবং বিশেষতঃ সেনাপতিদিগের চরিত্রের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিলেন, তাহাতে বুঝিলেন যে পাণ্ডুরাজার পতন সাধন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। পাণ্ডুর সেনাপতি ত্রয়ের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ রামভদ্র দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ছিলেন; তাঁহার ভাব ভঙ্গী হিন্দুদিগের ন্যায় বেশী বাঁধাবাধির মধ্যে থাকিত না। এই সকল আলোচনা করিয়া জুমিলা তাঁহাকেই মায়াজালে আবদ্ধ করিয়া তাঁহারই দ্বারা কার্য্যোদ্ধারে কৃতসংকল্প হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ সপ্তাহের তৃতীয় দিবসে জুমিলা সেনাপতিত্রয়কে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া সিংহদ্বারাভিমুখে যাইতে দেখিলেন। তিনি উত্তমরূপে স্থানগুলি দেখিয়া রাখিলেন এবং তাঁহাদের প্রত্যাগমন কালে

তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে মনস্থ করিলেন। এই অবসরে তিনি দুর্গের কর্ম্মচারীদিগের নিকটে তাহাদের সন্দেহ না জন্মাইয়া আরও নানা বিষয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনুসন্ধান করিতে করিতে জানিতে পারিলেন যে সন্ধ্যাকালে বলভদ্র ও বীরভদ্র ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন; কেবল সর্ব্বকনিষ্ঠ রামভদ্র তাঁহার গৃহের রোয়াকের উপরে মাদুর পাতিয়া তদুপরি শয়ন করিয়া দিবসের ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতেছেন।

রামভদ্র ভাবিতেছিলেন যে মুসলমানদিগকে এত উত্তেজিত করিলেও তাহারা কেন অগ্রসর হইয়া হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিতেছে না? হিন্দুরা নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিতে পারিতেছিল না; কিন্তু তাহাদিগের এই ধারণা হইয়াছিল যে মুসলমানদিগের সৈন্যবল কম ও হিন্দুদিগের ক্ষমতা অধিকতর থাকাতেই তাহারা অগ্রসর হইতেছে না। রামভদ্র এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মচারী তাঁহার নিকট গিয়া নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন এবং সুবিধা বুঝিয়া আপনার জ্ঞাতব্য বিষয়ের কথা পাড়িয়া সন্ধান লইতে লাগিলেন। এইরূপ কথোপকথন হইবার পরে ব্রহ্মচারী বিদায় লইবার জন্য গাত্রোত্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, এদিকে রামভদ্র তাঁহার নিকটে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন "আশীর্ব্বাদ দিব বৈকি; আমি দেখিতেছি তুমি অবিবাহিত—তোমার সাহস ও বীরত্বের মর্য্যাদা বুঝিবার উপযুক্ত স্ত্রী সঙ্গে নাই। ভগবান, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি তোমাকে পদ্মের ন্যায় সুন্দরী, লজ্জাবতী লতিকার ন্যায় লজ্জাশীলা, সুস্থকায়া এবং সৌভাগ্যবতী এক স্ত্রী তোমায় পুরস্কার স্বরূপে বিধান করুন। তাহার হাত যেন তুলার ন্যায় কোমল হয়; তুমি যেরূপ স্ত্রী প্রার্থনা কর, তাহাই তোমার হউক।"

রামভদ্র বলিলেন "বাবাজী, এমন স্ত্রী মর্ত্ত্যলোকে দুর্লভ বটে, ইহা দেবলোকেও দুর্লভ। যাই হোক্, আপাতত আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই।"

ব্রহ্মচারী। "বিবাহ করিবে না—' যদিও এই রকম স্ত্রী পাও? ভগবান্ যদি তোমাকে এমন আশীর্ব্বাদ দেন, তাহা তুমি কি অবহেলা করিবে?"

রামভদ্র। বাবাজী, আপনার বুঝিবার ভুল হইতেছে; আমি বলি নাই যে এমন স্ত্রী-রত্ন হাতে পাইলে পায়ে ঠেলিব; কিন্তু এখন আমার প্রধান কার্য্য আমাদের দেশ হইতে মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া। তাহার পরে বিবাহের বিষয় ভাবিবার অনেক সময় আছে। এমন সময় আসিবে, যখন আমার বিবাহে কোন আপত্তি থাকিবে না।

ব্রহ্মচারী। কিন্তু এমন সুযোগ আর কখনো না আসিতে পারে; সুখের যদি প্রত্যাশা থাকে, তবে সুখ যখন পাওয়া যায়, তখন তাহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

রামভদ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "আর কখন নাও আসিতে পারে', ইহার অর্থ কি?" অবশেষে প্রকাশ্যে বলিলেন "বাবাজী, কি বলিতেছেন? সত্যই কি আপনার হস্তে একরূপ এক স্ত্রীলোক আছে, অথবা আমার সহিত উপহাস করিতেছেন?"

ব্রহ্মচারী উপহাসের কথায় কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন "তোমার সহিত উপহাস করিতেছি! আমি যদি বলি যে এখনই সেই সুযোগ উপস্থিত এবং আমার বর্ণনামত স্ত্রীরত্ন প্রদান করিবার ক্ষমতা আমার হাতেই আছে?"

রামভদ্র অন্য সকল কথা ভুলিয়া গিয়া আগ্রহের সহিত বলিলেন "তবে আমাকে এরূপ স্ত্রী প্রদান করুন।"

ব্রহ্মচারী গম্ভীর ভাব ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন "দিতেছি কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একটী কার্য্য করিবার অঙ্গীকার করিতে হইবে—"

রামভদ্র সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহা কি?"

ব্রহ্মচারী। আমার শিষ্য হইতে হইবে।

রামভদ্র। আপনার শিষ্য?"

ব্রহ্মচারী। হাঁ; তাহা না হইলে তাহাকে পাইবে না।

রামভদ্র কিছুকালের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সুন্দরী স্ত্রী পাইবার প্রত্যাশায় তাঁহার মন এতদূর মোহমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে তিনি বলপূর্ব্বক মনের সন্দেহ সকল চাপা দিয়া শিষ্য হইতে অঙ্গীকার করিলেন এবং অবিলম্বে সেই সুন্দরীর নিকটে তাঁহাকে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন।

ব্রহ্মচারী তাঁহার এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া উপযুক্ত সময়ের জন্য ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে আশা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকটে বিদায়গ্রহণ করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্রমে চন্দ্রমা নৈশগগন রঞ্জতনিভ করিয়া উদিত হইল। দ্বিপ্রহর রাত্রির কিছু পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী আবির্ভূত হইলেন। দুর্গের শেষসীমায় একটী আম্রকানন ছিল ব্রহ্মচারী রামভদ্রকে তথায় লইয়া গেলেন ব্রহ্মচারী তাঁহাকে বলিলেন "এই স্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর; তোমার ঈপ্সিত বস্তু শীঘ্রই উপস্থিত হইবে; আমি গিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিই।" কিছুক্ষণ পরে এক পরম সুন্দরী রামভদ্রের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার কি প্রার্থনা। রামভদ্র অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহে আত্মহারা হইয়া পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিতে করিতে বনদেবী অন্তর্হিত হইলেন। রামভদ্র ভাবিতে লাগিলেন যে তিনি প্রকৃত কোন মূর্ত্তি দেখেন নাই—স্বপ্ন দেখিতেছিলেন মাত্র। ইতিমধ্যে বনদেবীর পুনরাবির্ভাব হইল। সেই সুন্দরী রামভদ্রকে নিকটে বসাইয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে উভয়ে প্রীতিপূর্ণ কথোপকথনে গভীর মগ্ন হইয়া গেলেন। অবশেষে বনদেবী রামভদ্রের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া বলিলেন "কল্য এই সময়েই আমাকে এই স্থানেই প্রাপ্ত হইবে।"

রামভদ্রের চমক ভাঙ্গিল। তিনি কাতর হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন "এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর; এখনও যাইও না, প্রভাত হইতে অনেক বিলম্ব আছে। চন্দ্রমার অভাবে ধরণী যত না অন্ধকারপূর্ণ হয়, তোমার অভাবে আমার হৃদয় ততোধিক অন্ধকার হইয়া যাইবে। তোমার মাধুরী আমার হৃদয়কে যেরূপ

প্রসন্ন করিতেছে, এমন এই অম্রকাননের সুগন্ধও পারে না।"

বনদেবী। কি করিব, আজ আমাকে যাইতেই হইবে; কিছুতেই অপেক্ষা করিতে পারিতেছিনা।

রামভদ্র। দেবি-কোথায় যাও—আমার চক্ষের আলোক, পিপাসার জল তুমি—দাঁড়াও, এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াও—একটী আলিঙ্গন প্রদান কর—একটীবার তোমার মুখ চুম্বন করিতে দাও।

রামভদ্র সবেগে চুম্বন কাড়িয়া লইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে সুবর্ণময়ূর তাহার বিকট চীৎকারধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল এবং সেই চীৎকারধ্বনি সকলের মনে সন্ত্রাস জন্মাইয়া বন উপবন প্রান্তর সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। রামভদ্র ভয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে ধরণীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। এদিকে প্রভাতের প্রথম কিরণে দিক সকল আলোকিত করিতে লাগিল; দুর্গ ও নগরবাসিগণ সভয়ে জাগ্রত হইয়া সকলেই চীৎকারের কারণ জানিবার জন্য পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পুরোহিতগণ দলে দলে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অজস্র বলিদান করিতে লাগিল। অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ দৈবজ্ঞ আহূত হইয়া আপনাদিগের পঞ্জিকা প্রভৃতি আনয়ন করিয়া নগরের শুভাশুভ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। আম্রকাননের বনদেবী উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া রামভদ্রকে তাঁহার সহিত পলায়ন করিতে অনুরোধ করিলেন—কারণ সেই স্থানে সেই অবস্থায় হিন্দুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইলে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। রামভদ্র ইহা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া নীরবে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বনদেবী বক্রপথের দ্বারা তাঁহাকে একেবারে জুমিলার পরিত্যক্ত শিবিরে উপনীত করিয়া তাঁহার সম্মুখে কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা রাখিয়া কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাকে একাকী রাখিয়া গেলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুন্দরী সঙ্গিনী চলিয়া গেলে রামভদ্র চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন। তিনি আপনাকে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বোধ করিলেন। এতক্ষণে তিনি স্বীয় অপরাধের গুরুতা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি এই সকল ভাবিয়া আত্মহত্যা করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে জুমিলা আসিয়া তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন "এই দেখ, আম্রকাননের বনদেবী তোমার সম্মুখে উপস্থিত। আত্মহত্যা করিতে যাইও না। বিধিলিপির বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার শক্তি কি তোমার আছে? তোমার দেশের আর কিছুতেই রক্ষা নাই, তোমার মৃত্যুতেও তাহা রক্ষা পাইবে না। আমার প্রতি তোমার অনুরাগের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি, এখন তুমি আমার অনুরাগের পরিচয় পাইবে। মুসলমান যে তাহার কথার ব্যতিক্রম করে না, তাহার পরিচয় পাইবে।"

মুসলমান নাম শুনিয়া রামভদ্র পুনরায় অসি নিষ্কোষিত করিয়া আপনার হৃদয়ে নিহিত করিতে যান আর কি, তৎক্ষণাৎ জুমিলা স্বীয় বক্ষের বস্ত্র দ্বিখণ্ডিত করিয়া সেই উন্মুক্ত বক্ষ তাঁহার সম্মুখে ধারণ করিয়া অনুরাগকম্পিতস্বরে বলিলেন "এই

বক্ষে অস্ত্র বসাইয়া দাও; তারপরে যখন বুঝিবে যে তোমার রক্ষাকারী স্ত্রীহত্যা করিয়া প্রতিশোধপিপাসা মিটাইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই খুব সুখানুভব করিবে। তুমি যদি আর এক মুহূর্ত্ত আমার অনুসরণ করিতে বিলম্ব করিতে, তাহা হইলেই তোমার অপমানজনক প্রাণদণ্ড হইত। এখনও যদি তুমি ফিরিয়া যাও, মৃত্যু তোমার দিকে লোলুপদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছে। আর যদি তুমি মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আমাদের সহিত বাস কর, তোমার সাহস ও বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপে ক্রমে তুমি মুসলমান সেনার সর্ব্ব-প্রধান সেনাপতি হইতে পারিবে। তুমি আমাকে বনদেবী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে। তোমার ধর্ম্ম বলে যে ঈশ্বর এক, আমারও ধর্ম্ম বলে ঈশ্বর এক। ঈশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই, এবং মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত; এই বাক্য অবলম্বন কর; তুমি দেশের জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া সম্রাটসৈন্যের যেরূপ ভীতিজনক হইয়াছিলে, এখন সম্রাট সৈন্যের সেনানী হইয়া সেইরূপ সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন কর এবং এই উপায়ে আম্রকাননের বন-দেবীকে পুরস্কার স্বরূপে লাভ কর।” এইরূপে একদিকে অনুরাগের প্রবণতা অপরদিকে সম্মানজ্ঞান, একদিকে প্রাণ-দণ্ডের ভয় অপরদিকে জীবনের ইচ্ছা ও তৎসঙ্গে সুন্দরী স্ত্রীরত্নলাভ, এই উভয় বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া রামভদ্র সংশয়-দোদুল্যমানচিত্তে জুমিলার সম্মুখে দণ্ডায়-মান রহিলেন—তাঁহার মুখে বাক্য সরিল না। জুমিলা তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিয়া পুনরায় বলিলেন “হয়, তোমার আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীহত্যা কর; অথবা বীর রামভদ্র! একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য কর, ঐ অস্ত্রখানি সরাইয়া রাখ, বিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া ভাল কি তাহার অনুকূলে যাওয়া ভাল?”

জুমিলার রূপমাধুরীই পরিশেষে রাম-ভদ্রকে তাঁহার নূতন ভাগে সন্তুষ্ট করিতে পারিল। প্রভাতপবনের মৃদুমন্দ হিল্লোল যখন পুষ্পরাশির সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল, তখনও তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা লইয়া তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। নেমাজ করিবার সময় হওয়াতে সেই তর্ক ভাঙ্গিয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

নেমাজের পর জুমিলা সুফিউদ্দীনের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রত্যা-গমন সংবাদ সত্বরেই শিবিরের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। দলে দলে মুসলমান সৈন্যগণ, তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, কেনইবা ফিরিয়া আসিলেন, জানিতে উৎসুক হইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সুফি তাঁহাকে আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

জুমিলা বলিলেন “প্রভু! আমি তাহা বলিবার অগ্রে একটী ভিক্ষা প্রার্থনা করি—সেই প্রার্থনা সফল হইলে পাণ্ডু-রাজার পরাজয় সুনিশ্চিত।

সুফি। কি ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে কর, তাহা নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা নাই।”

জুমিলা। কাফেরদি’গর এক সেনা-পতি রামভদ্রের জীবন ভিক্ষা করি। তিনি পাণ্ডুরাজের অধীনে সেনাপতিত্ব

পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীর সম্রাটের অনুগত ভৃত্য হইয়াছেন।

সুফিউদ্দীন তাঁহার ভিক্ষা পূরণ করিলেন এবং জুমিলা স্বয়ং সেনাপতির সম্মুখে রামভদ্রকে আনয়ন করিলেন।

রামভদ্রের পরিচয় প্রদান করিয়া জুমিলা বলিতে লাগিলেন—"প্রভু! এই একটা লোককে আনয়ন করিয়াছি, যিনি কখনও হিন্দু ছিলেন না এবং ইহাকে ইহার পৈতৃক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। রামভদ্রের মুখে অবিশ্বাসের চিহ্ন দেখিয়া জুমিলা পুনরায় বলিতে লাগিলেন "সেনাপতি! আমার প্রিয় বীর সহচরগণ! তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে যে বিগত কনৌজের যুদ্ধে আমার পিতৃব্য মহাশয় আহত হইয়াছিলেন। আমরা পরাজিত হইয়াছিলাম, আমাদের শিবির লুণ্ঠিত এবং আমাদের স্ত্রীলোকেরা শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিল। আমার পিতৃব্যপত্নী তাঁহার শিশু সন্তান সহিত বন্দী হইয়াছিলেন। এই সময়ে পাণ্ডুবাজার দূত কনৌজ রাজসভায় কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়াছিলেন। যখন বন্দী স্ত্রীগণকে ক্রীতদাসীরূপে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব হইল, তখন তিনি তাহাদিগকে ক্রয় করিয়া লইলেন। দূত পাণ্ডুয়ায় ফিরিয়া গিয়া সেনাপতি বলভদ্র পিতার নিকটে আমার পিতৃব্য পত্নী ও তাঁহার শিশুকে উপঢৌকন দিলেন। তাঁহারা বলভদ্রপিতার কনিষ্ঠ পত্নীর সম্মতিক্রমে অন্তঃপুরে রক্ষিত হইলেন। তাঁহার তিন পত্নী ছিল—বলভদ্র প্রথম পত্নীর গর্ভসম্ভূত; বীরভদ্র দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভসম্ভূত এবং আমার বন্দী এই বীরপুরুষ তৃতীয় পত্নীর গর্ভসম্ভূত না হইলেও সেইরূপে প্রসিদ্ধ। এই সকল ঘটনা আমি ইহাঁদের পুরাতন দাসীর নিকট শুনিয়া আসিয়াছি। যে মুহূর্ত্তে আমি এই সকল শুনিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই দুর্গস্থ কাফেরদিগকে সমূলে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলেও ইহাঁকে আমার আত্মীয় বলিয়া রক্ষা করিতে মনস্থ করিলাম। আমি ইহাঁর সাহস, অতুল বীরত্ব দেখিয়া গৌরব অনুভব করিতে লাগিলাম। পরাক্রান্ত সেনাপতি! এই সকল কারণে ভ্রাতার জীবন ভিক্ষা করিয়াছিলাম।"

জুমিলার বক্তব্য শেষ হইয়া গেলে রামভদ্র তাঁহার নিকট অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া উভয়ে সুফিউদ্দীনের সম্মুখে অবনত হইলেন অতঃপর জুমিলা তাঁহার কুর্ব্বনখাঁ নামে নূতন নামকরণ করিলেন। সুফিউদ্দীন বলিলেন "বীর কুর্ব্বনখাঁ! উঠ, তোমার সাহস তোমার নামের উপযুক্ত বটে; তুমি আমাদের বিরুদ্ধে যেরূপ সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলে, এখন কাফেরদের বিরুদ্ধে সেইরূপ সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন কর তোমার ভাল হইবে। যাও, সাহসিক সহচরগণ! তোমরা কুর্ব্বনকে কবর হইতে পুনরুত্থিতের ন্যায় বিবেচনা করিয়া সেবা শুশ্রূষা কর। তিনি বীর নামের উপযুক্ত। আর কুর্ব্বন জুমিলাকে তুমি বিশ্বাস করিয়া তোমার শ্রান্তিদূর কর এবং জুমিলা! কল্য প্রাতে কুর্ব্বনের সহিত আসিয়া পাণ্ডুয়ার উন্নত প্রাকারের উপর মহম্মদের পতাকা উড্ডীন করিবার উপায় করিয়া দিও।"

কুর্ব্বনের হিন্দু ধর্ম্ম হইতে পুনরুদ্ধার দেখিয়া মুসলমানদিগের মধ্যে মহোল্লাস

পড়িয়া গেল। জুমিলার নাম সকলের মুখে মুখে ঘুরিতে লাগিল। সুফি জুমিলার নিকটে নানা আহারীয় পাঠাইয়া দিলেন এবং কুর্ব্বনকে উচ্চতম কর্ম্মচারীগণ যথেষ্ট সমাদরে ভোজন করাইতে লাগিলেন। কুর্ব্বন এখন মুসলমানদিগের পক্ষে অধিকতর বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। জুমিলা যে বারাঙ্গী সাজিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তিনি জুমিলার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইলেন এবং তিনি যে জুমিলার উপযোগী তাহাই দেখাইবার জন্য বর্ত্তমান সংগ্রামের কোন গুরুতর ভার প্রাপ্ত হইবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

বসন্তরোগের নামতত্ত্ব। *

এবারে বৎসরারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই চারিদিকে বসন্তরোগের যেরূপ প্রকোপ দেখা দিয়াছিল তাহাতে বাস্তবিকই ভয়ের কথা। এই ভয়ানক সংক্রামক রোগে ঔষধ প্রয়োগ করিতে বড় একটা কেহ সাহসী হয় না; এক টীকা দেওয়াই অনেকের বিবেচনায় ইহার একমাত্র মহৌষধ। বসন্তের ডাক্তারী চিকিৎসা নাই বলিয়াই সাধারণের ধারণা, কি কবিরাজী, কি ডাক্তারী কোন মতেই বসন্তের চিকিৎসা হয় না।

গত বৎসর ফাল্গুন মাসের সমীরণে কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি যথাযথ। তিনি বলেন "অনেকগুলি লোকের সংস্কার আছে যে মসূরিকা অর্থাৎ বসন্তরোগ উপস্থিত হইলে কোন চিকিৎসাই কর্ত্তব্য নহে আবার কেহ কেহ মনে করেন বসন্ত চিকিৎসক ব্যতীত অপর কোন চিকিৎসক বসন্ত চিকিৎসা করিতে জানেন না। ফলতঃ এই দুইটী সংস্কারই ভ্রমাত্মক। যে শাস্ত্র-যুক্তি অবলম্বন করিয়া অপরাপর বহুবিধ রোগের যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতেছে সেই শাস্ত্রেই যখন বসন্তরোগের চিকিৎসা সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তখন শাস্ত্র-যুক্তি অবলম্বন করিয়া বসন্তের চিকিৎসা করিলে ফললাভে বঞ্চিত হইবার কিছুমাত্র কারণ পরিলক্ষিত হয় না। বিনোদ বাবু বলেন, বসন্তের সংক্রামকতাই প্রধানতঃ ইহার চিকিৎসা লোপের কারণ। এই সূত্রে সমীরণেই তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে দু চারিটী ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে ভারতীয় বৈদ্যশাস্ত্রে বসন্ত রোগের চিকিৎসা ও ঔষধাদির বড় একটা অভাব নাই। যাঁহারা নিদান চক্রদত্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থ সকলের কোনরূপে পরিচয় পাইয়াছেন তাঁহাদিগকে এবিষয়ে বিশেষ আর কিছু বলিতে হইবে না। কিন্তু বিনোদ বাবু যে বলেন বসন্তের সংক্রামকতাই প্রধানতঃ ইহার চিকিৎসা

* এ প্রবন্ধটী বৈশাখ মাসে বসন্ত প্রকোপের সময়েই কল্পিত হইয়াছিল।

লোপের কারণ আমার তাহা সঙ্গত মনে হয় না কারণ আমরা স্কন্দপুরাণে শীতলাষ্টক স্তোত্রে দেখিতে পাই লেখা আছে ;—

বহবো ভিষজো নাত্র ভেষজং যোজযন্তি হি।
কেচিৎ প্রয়োজযন্ত্যেব মতস্তেষাং অথ ব্রুবে।

"অধিকাংশ চিকিৎসকই বসন্তে ঔষধ প্রয়োগ করেন না কেহ কেহ প্রয়োগ করেন বটে তাঁহাদিগেরই মত বলা যাইতেছে।" তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে বসন্তের ঔষধাদি সত্বেও পুরাকালেও অনেকেই ইহার চিকিৎসা করিতে চাহিতেন না। আসল কথা ইহার চিকিৎসা অপেক্ষা ইহা আদৌ যাহাতে আক্রমণ না করিতে পারে সেই বিষয়েই মানবের অধিক চেষ্টা হইয়া আসিতেছে।

অনেকের ইহাও ধারণা যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বসন্তরোগের একেবারে কোন উল্লেখই নাই। এমন কি তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে ভারতে বসন্তরোগ পূর্ব্বে ছিল না। ইহা আধুনিক রোগ। * কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বসন্তরোগের নাম ত আছেই; এমন কি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় ইহার যত নাম আছে তাহাদিগের অধিকাংশই এবং অধিকাংশ বিদেশীয় নাম গুলি পর্য্যন্তও বসন্তের সংস্কৃত নাম হইতে ধার করা।*

বসন্তের ইংরাজী নাম পক্স (pox); ইহা অ্যাংলোস্যাক্সন নাম পংকা (pocca) শব্দের অনুজ; ইহার জর্ম্মণ নাম পংকে। (pocke) ইহারা সকলেই এক সংস্কৃত স্ফোটক শব্দ হইতে উৎপন্ন। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় ফস্কা, ফুস্কুড়ি শব্দদ্বয় ও স্ফোটক শব্দের অপভ্রংশ। বাঙ্গলা ফস্কা ও ফুস্কুড়ি শব্দ জর্ম্মণ পংকে শব্দ এবং অ্যাংলোস্যাক্সন পংকা ও ইংরাজী পক্স শব্দ ইহারা সকলে একই গোষ্ঠীর, ইহাদিগের মূল বা পিতৃশব্দ স্ফোটক তাই ইহাদিগের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বিদ্যমান। ভাষাবিজ্ঞান আলোচনা করিলে দেখা যায় কতকগুলি অক্ষরের সহিত কতকগুলি অক্ষরের অত্যন্ত সখ্য, যেমন স'র সহিত হ'র, প'র সহিত ফ'র' ব'র সহিত ভ'র, ন'ব

* জ্যেষ্ঠমাসের সাধনা পত্রিকায় কোন লেখক 'বসন্তরোগ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন "আমাদের পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বসন্তরোগের কোন উল্লেখ আছে কি না সন্দেহ, বোধ হয় সে সময়ে এরোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না। সেই জন্য বসন্তরোগের কোন বিশেষ পারিভাষিক নাম পাওয়া যায় না। বসন্তকালে এই রোগ দেখা দেয় বলিয়া সাধারণ লোকে ইহাকে বসন্তরোগ বলিয়া থাকে।" ইংরাজ লেখকেরা বটে অনেক সময়ে আমাদের দেশের বিষয় কিছু না জানিয়াই এইরূপ একটা মত পাশ করিয়া বসেন। সাধনার লেখক দেশের লোক হইয়া যে হঠকারিতার সহিত এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন ইহাই আশ্চর্য্য। লেখক "আফ্রিকা পারস্য ও চীন দেশে টীকা দিবার রীতি ছিল" ইহা অনুসন্ধান করিয়া লিখিতে পারিয়াছেন কিন্তু স্বদেশের আয়ুর্ব্বেদে যে বসন্তের মসূরিকা বলিয়া একটা নাম আছে সে বিষয় অনুসন্ধান আবশ্যক বলিয়াই মনে করেন নাই। লেখক টীকারও কোন উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু দেখিয়া সুখী হইলাম যে সাধনার লেখক এই মাসের সংখ্যায় ভ্রম সংশোধনে প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি অনুসন্ধানে জানিয়াছেন' সংস্কৃত ভাষায় বসন্তের নাম মসূরিকা আছে।

সহিত ল'র ইত্যাদি; সংস্কৃতে রলয়োর-ভেদঃ বলে, এই জন্যই যে রও ল ইহারা অভিন্ন-প্রাণ সখা; স'র সহিত হ'র সখ্য বশতঃই সপ্তাহ হপ্তাহ হইয়াছে। সংস্কৃত পুনঃ শব্দ হইতে যে হিন্দি ফিন বাঙ্গলা ফের শব্দ আসিয়াছে, প'র সহিত ফ'র সখ্য তাহার কারণ; পুনঃ শব্দের প এ স্থলে আপনার স্থান ফকে ছাড়িয়া দিয়াছে। অ্যাংলো স্যাক্সন পঃ কা শব্দের প অক্ষরের স্থান যদি ফ অধিকার করে এবং মধ্যগত অক্ষরের উচ্চারণ বিসর্গের ন্যায় না হইয়া যদি স'র উচ্চারণ হয় তাহা হইলেই ফক্স হইয়া দাঁড়ায়। স, হ এবং বিসর্গ ইহারাও তিনটী র,ল'র ন্যায় অভিন্নপ্রাণ। সংস্কৃত ভাষায় বিসর্গের উচ্চারণই হ। অ্যাংলোস্যাক্সন পঃকা জম্মণ পঃকে ইংরাজি পক্স ইহারা তিনই অনুরূপ শব্দ।

বসন্ত রোগের লাটিন নাম ভারিয়লা (Variola), ফরাসী নাম ভেরল (Verole); উভয়েই একই সংস্কৃত শব্দ হইতে প্রসূত। যেমন পক্স প্রভৃতি শব্দগুলির মূল স্ফোটক শব্দ, সেইরূপ সংস্কৃত ব্রণ শব্দই পূর্ব্বোক্ত শব্দদ্বয়ের মূল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব অক্ষরে ভ অক্ষরে এবং ন (বাণ) অক্ষরে ল অক্ষরে সখ্য বশতঃ উহারা পরস্পর পরস্পরের স্থান অধিকার করে, যেমন পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা ভকে ব উচ্চারণ করে, ইংরাজেরা ব্যাকরণকে ভ্যাকরণ (Vyakaran) লিখে; আবার আমাদের কেহ কেহ নস্যকে লস্যও বলে এবং লেখাপড়াকে নেখাপড়া বলে। কিম্বা যেমন সংস্কৃত নষ্ট শব্দ ইংরাজিতে লষ্ট (Lost) হইয়াছে। এরূপ ব্রণ শব্দের ব ও ণ, ভ ও লতে ক্রমান্বয়ে পরিণত হইলে ভ্রল এইরূপ হয়। ভ্রল ঈষৎ বিকৃতভাবে উচ্চারিত হইলেই ভেরল হয়, যেমন আমরা ব্রণ শব্দকে বিকৃত করিয়া 'বেরণ' এইরূপ উচ্চারণ করি।

কিন্তু কথা হইতেছে এই যে পক্স ভেরল প্রভৃতি শব্দ ইহারা বসন্ত রোগের নাম; তবে ইহারা কেন যে স্ফোটক এবং ব্রণ শব্দদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইল, তাহার কারণ আছে। ভারতীয় ভৈষজ্য শাস্ত্রে বসন্ত রোগকে বিস্ফোটপ্রভেদ বলিয়া গণ্য করা হয়; নিদানটীকাকার স্পষ্টই লিখিয়াছেন 'বিস্ফোটপ্রভেদত্বাৎ তুল্যনিদানত্বাচ্চ মসূরিকানিদানং" "বসন্ত রোগ বিস্ফোট প্রভেদ বলিয়া এবং একই কারণে প্রায় উৎপন্ন হয় বলিয়া বিস্ফোট নিদানের পরেই বসন্ত নিদান বলা যাইতেছে"। চক্রদত্তের টীকাকারও ঠিক একই কথা বলিয়াছেন,—

বিস্ফোটভেদাৎ প্রায়স্তুল্যচিকিৎসিতত্বাচ্চ 'মসূরিকা চিকিৎসিত মুচ্যতে।

"বসন্ত রোগ বিস্ফোট প্রভেদ বলিয়া এবং ইহার চিকিৎসাও বিস্ফোটের চিকিৎসার ন্যায় বলিয়া বিস্ফোট চিকিৎসাধ্যায়ের পরেই মসূরিকা চিকিৎসা বলা হইতেছে।" বসন্তকে মসূরিকা কেন বলে তাহা পরে বলিব। বিস্ফোটের সামিল বলিয়াই বোধ হয় প্রাচীনতম চরক গ্রন্থে বসন্ত রোগের বিশেষ করিয়া কোন উল্লেখ নাই। পশ্চিম প্রদেশের প্রধান বৈদ্যক গ্রন্থকার শার্ঙ্গধরও বসন্ত রোগকে আদৌ বিশেষত্ব দেন নাই। আট প্রকার ক্ষুদ্র রোগাধিকারের মধ্যেই ইহাকে ফেলিয়া দিয়াছেন। বসন্ত যেকালে বিস্ফোটপ্রভেদ বলিয়া গণ্য, সেকালে পক্স ভেরল প্রভৃতি শব্দ যে

স্ফোটক এবং ব্রণ শব্দ হইতে উৎপন্ন তাহাতে আর দ্বিধা কি হইতে পারে। বিশেষতঃ মৌলিক অর্থ ধরিতে গেলে ইংরাজি পক্স শব্দে স্ফোটকই বুঝায়। ভারিয়লা শব্দেরও মূলার্থ কাহারও কাহারও মতে বয়স-ব্রণ।

এইরূপ হামের ইংরাজি নাম মীস্‌লস্‌ (Measles) শব্দটীও সংস্কৃত মসূরিকা হইতে উৎপন্ন। জর্ম্মন ভাষায় হামকে মাসর্ণ (Masern) বলে। ইংরাজি মীস্‌লস্‌ শব্দ অপেক্ষা জর্ম্মন মাসর্ণ শব্দ মসূরিকা শব্দের অধিক নিকটবর্ত্তী। হিন্দু ভৈষজ্য শাস্ত্রে হামকে মসূরিকা প্রকার বলিয়া বলা হইয়াছে,

মসূরিকায়াঃ প্রকারং রোমান্তিকামাহ।

যেমন পানিবসন্ত এক প্রকার বসন্ত সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ মতে হামও সেইরূপ, এক প্রকার বসন্ত, হাম মসূরিকা বিশেষ। অতএব য়ুরোপীয় ভাষা সমূহে হামের নাম যে মসূরিকা শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা অসঙ্গত হয় নাই।

আমাদের বাঙ্গলা 'হাম' শব্দ খুব সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'হৈম' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হৈম কিনা হিম সম্বন্ধীয়। সংস্কৃতে হামকে 'রোমান্তী' বলে। হামের লক্ষণ নিদানে বলিতেছে ;—

রোমকূপোন্নতিসমাঃ রাগিণ্যঃ কফপিত্তজাঃ।
কাসারোচক সংযুক্তা রোমান্ত্যঃ জ্বরপূর্ব্বিকাঃ॥

"যে বসন্ত বিশেষ রোমকূপোন্নতির সমান, রক্তবর্ণ, কফপিত্তজাত, কাসারোচক সংযুক্ত ও জ্বরপূর্ব্বক হয় তাহাই রোমান্তী।" এ বিষয়ে পাশ্চাত্যেরাও একমত ; পাশ্চাত্য মতে "Measles is a contagious fever of an inflammatory type attended with a characteristic eruption and all the symptoms of a violent cold ; watery discharge from the eyes and nose, dry cough hoarseness etc" হাম এক প্রকার জ্বর যাহা স্পর্শসঞ্চারী ও দাহোৎপাদক ; এই জ্বরের সঙ্গে বিশেষ এক প্রকার পীড়কার প্রাদুর্ভাব হয় এবং ভীষণ শ্লেষ্মার লক্ষণ সকল দেখা দেয় ; চোক নাক দিয়া জল পড়ে ও শুষ্ক কাশী স্বরভঙ্গ ইত্যাদি উপদ্রব সকল ঘটে। তাহা হইলেই দেখা গেল শৈত্যধর্ম্মী শ্লেষ্মাই হামের প্রধান লক্ষণ অতএব 'হৈম' শব্দ হইতেই 'হাম' শব্দ উৎপন্ন হওয়া অযুক্তিসিদ্ধ নহে। রাগিণ্যঃ অর্থাৎ রক্তবর্ণ বলিয়াই ইটালী ভাষায় হামকে 'রসোলিয়া' (Rosolea) এবং ফরাসী 'রুজিওল' (Rougeole) বলে। সংস্কৃত রঞ্জ ধাতুই ইহাদিগের মূল। এই রঞ্জ ধাতু হইতেই ইংরাজি রোজ (Rose) শব্দ আসিয়াছে।

দেশীয় বাঙ্গালা ভাষায় বসন্ত নাম যে কেন হইল সে কথা বলা বাহুল্য, বসন্ত কালেই ইহার প্রাদুর্ভাব বলিয়া ইহার নাম বসন্ত হইয়াছে। বসন্ত সচরাচর দুই প্রকার হইতে দেখা যায় এক পানি বসন্ত, দ্বিতীয় ইচ্ছা বসন্ত। পানি বসন্ত বলে এই জন্য যে এই বসন্তে স্ফোটক বা পীড়কা গুলি জল পূর্ণ থাকে। পানি বসন্তের বিষয় নিদান বলিতেছে ;—

তোয় বুদ্বুদ সঙ্কাশাস্ত্বগগতাস্তু মসূরিকাঃ
স্বল্পদোষাঃ প্রজায়ন্তে ভিন্নাস্তোয়ং স্রবন্তি চ।

"ত্বগ্‌গত যে মসূরিকা যাহারা দেখিতে জলবুদ্বুদের ন্যায় তাহারা অল্পদোষবিশিষ্ট

হয় এবং ফাটিয়া গেলে তাহাদের মধ্য হইতে জল নির্গত হয়"। মুক্তার ন্যায় দেখিতে হয় বলিয়া হিন্দিতে পান বসন্তকে 'মোতি মাতা' বলে। মোতি অর্থে মুক্তা এবং মাতা অর্থে বসন্ত। ইচ্ছা বসন্ত বলে এই জন্য যে এই বসন্ত হইলে হিন্দু দিগের ধারণা যে তাঁহাদিগের গৃহে শীতলা দেবীর স্বেচ্ছাক্রমে আগমন হইয়াছে। এখনও এমন লোক আছেন যাঁহারা এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কোনরূপ প্রতীকার না করায় বিপদাপন্ন হয়েন। একবার ইচ্ছা বসন্ত হইয়া গেলে আর কখনও হয় না এই জন্যই ইহাকে শীতলা দেবীর কৃপা বলিয়া ধরা হইয়া থাকিবে। কিন্তু এ বিশ্বাসেরও মূল আমরা সংস্কৃত শাস্ত্রে দেখিতে পাই, স্কন্দ পুরাণে আছে,—

দেব্যা শীতলযাক্রান্তা মসূর্য্যের হি শীতলা

"দেবী শীতলা কর্ত্তৃক আক্রান্ত বসন্ত রোগের নামই শীতলা"। অর্থাৎ বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামও শীতলা, বসন্ত রোগের নামও শীতলা। বসন্ত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে শীতলা আক্রমণ করিয়াছেন। শীতলার প্রভাব সমস্ত ভারতে এক সময়ে এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, হিন্দি মরাঠি প্রভৃতি ভারতের অধিকাংশ উপভাষায় বসন্তের নাম শীতলার নামে অভিহিত হয়। হিন্দিতে বসন্তকে শীতলাও বলে মাতাও বলে, মাতা অর্থে শীতলা মাতা। মরাঠি ভাষায় দেবী বলে; দেবী অর্থে শীতলা দেবী ইত্যাদি। পারস্য ভাষায় ইচ্ছা বসন্তের নাম চচ্‌কা বা চিচ্‌কা; ইহা খুব সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'চর্চিকা' শব্দ হইতে আসিয়াছে। সংস্কৃত 'বিচর্চিকা' শব্দ স্ফোটক, কণ্ডূয়ণ, কুষ্ঠ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমাদের 'ঘামাছি' শব্দ সংস্কৃত 'ঘর্ম্মচর্চিকা' শব্দ হইতে আসিয়াছে।

ছোট ছোট ছেলেদের বীজগুড়ি বীজগুড়ি ফোড়ার মত গায়ে এক প্রকার বাহির হয়, দেখিতে অনেকটা বসন্তের মত। লোকে তাহাকে সচরাচর 'মাসিপিসি' বলে। মাষকলাইয়ের ন্যায় দেখিতে বলিয়া, বোধ হয়, মাষ শব্দ হইতে 'মাসি' আসিয়াছে। অথবা মাসূরী শব্দ হইতেও মাসি শব্দ আসিতে পারে। তৎপরে স্নেহময়ী রমণীদিগের মুখে মাসির সঙ্গে পিসি কোন ক্রমে জোড়া লাগিয়া গেছে। ছেলেদের রোগ বলিয়া রোগের নামটাও বোধ করি আদরের ভাষায় করিয়া লওয়া হইয়াছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে প্রকৃত বসন্ত হইলেন মা শীতলা; আর এই সামান্য চর্ম্মরোগ, যাহা দেখিতে অনেকটা বসন্তের ন্যায় অথচ যাহাতে বসন্তের কোন গুণই নাই ইহা হইল মাসিপিসি। বসন্তের বেলায় হইল 'মা আসিয়াছেন' আর ইহার বেলায় হইল 'মাসি পিসি আসিয়াছেন।'

মসুর ডালের ন্যায় দেখিতে হয় বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় বসন্তকে প্রধানতঃ মসূরিকা বলে।—

মসূরাকৃতিসংস্থানাঃ পীড়কাঃ স্যুর্মসূরিকাঃ

অন্যত্র—

মসূর মুদ্গ মাষাণাং তুল্যাঃ

"মসূরিকার পীড়কাগুলি মসুরি ডাল, মুগের ডাল এবং মাষকলাইয়ের ডালের ন্যায় দেখিতে হয়"।

বসন্তের প্রচলিত 'গুটি' নামও সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দুর্লভ নয়।—

ধৃংবিতবারি সক্ষৌদ্রং শীতং দাহগুটীহরং (চক°)

"মধুর সহিত বাসি জল পান করিলে দাহ ও গুটী নষ্ট হয়"।

এক্ষণে দেখা যাউক যে আধুনিক বসন্ত রোগকেই যে সে কালে মসূরিকা বলিত তাহার প্রধানতঃ কি কি প্রমাণ পাওয়া গেল। প্রথম প্রমাণ এই যে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে মসূরিকার যে সকল লক্ষণ দেওয়া আছে সে সকল আধুনিক বসন্ত রোগেরই লক্ষণ। দ্বিতীয় প্রমাণ মসূরিকার আর একটী সংস্কৃত পর্য্যায় শব্দ 'গুটী'। তৃতীয় প্রমাণ আয়ুর্ব্বেদীয় কোন কোন গ্রন্থে শীতলার পূজা ও স্তবের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। স্কন্দপুরাণের মতে মসূরীর নামও শীতলা এবং মসূরীর অধিষ্ঠাত্রীর নামও শীতলা। চতুর্থ প্রমাণ ইংলণ্ড প্রভৃতি সুদূর বিদেশে পর্য্যন্ত বসন্তের নাম গুলি বসন্তের আয়ুর্ব্বেদীয় নাম হইতে গৃহীত।

বসন্তরোগ বহু পূর্ব্বে য়ুরোপের ন্যায় শীত দেশে কেহ জানিত না ইহা মনে হয় বটে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই যে ইহার জন্ম ইহা নিশ্চিত। তৎপরে আপনার সংক্রামকতাগুণে ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব। এক স্কন্দ পুরাণের কাশীখণ্ডে যে শীতলার স্তোত্র আছে তাহাতেই বুঝা যায় যে বসন্ত রোগ ভারতে কত পুরাতন। গ্রীক ও রোমানেরা যে এ রোগের বিষয় কিছু জানিত না এমন বোধ হয় না। থুসিডাইডস অথান্সের কতকগুলি মড়কের বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে সেই মড়কগুলিতে চর্ম্মক্ষত, স্ফোটক প্রভৃতি অত্যধিক প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহা সম্ভবতঃ বসন্তের মড়কের কথা। অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত এই যে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন ঘোরতর ক্রুসেড চলিতে থাকে সেই সূত্রে প্রাচ্যবাসীদিগের সহিত সঙ্ঘর্ষে প্রথম এই ব্যাধি য়ুরোপে প্রবেশ লাভ করে—সর্ব্বপ্রথম ফ্রান্সে ও স্পেনে, তৎপরে য়ুরোপের সর্ব্বত্র; কিন্তু ডাক্তার উডভিল ব্রিটীশ মিউসিয়মস্থিত নবম শতাব্দীর কতকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি হইতে দেখাইয়াছেন যে 'ভারিয়ল' শব্দ এখন যে অর্থে ব্যবহৃত হয় নবম শতাব্দীতে তাহা ঠিক একই অর্থে ব্যবহৃত হইত। অতএব বুঝা যাইতেছে যে ইংলণ্ডে নবম শতাব্দীতে বসন্ত রোগ বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত হস্তলিখিত পুঁথিসকলে ইহাও দেখা যায় যে বসন্ত নিবারণের জন্য সেকালে নানাবিধ স্তব ও নানা প্রকার মন্ত্র তন্ত্রেরও প্রচার ছিল। ক্রুসেডের পর ফ্রান্সদেশে এই ব্যাধি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এমনও হইতে পারে। তাই বোধ করি, ইটালীয় ভাষায় বসন্তকে ম্যালফ্রান্সি বলে; ম্যাল ফ্রান্সিস' অর্থে ফ্রান্স দেশের ব্যাধি। চীনদেশীয় গ্রন্থেও লেখা আছে যে বসন্ত অতি প্রাচীনকাল হইতে চীনে প্রচলিত আছে।

ইহাতে জানা যায়, বসন্ত রোগ যে বড় আধুনিক রোগ তাহা নয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে লোকেরা এই রোগ দ্বারা উপদ্রুত হইয়া আসিতেছে। সকল দেশই ইহার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অল্প বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছে। বসন্তে মৃত্যু নিবারণের জন্য টীকা দেওয়া প্রথা চীন, ভারত,

কাল্ডিয়া, তুরস্ক, আফ্রিকা প্রভৃতি নানা দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

প্রাচীনকালে ভারত সকল বিষয়েই পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ছিল। তখন ভারতের চিকিৎসা দেশ বিদেশে সমাদৃত হইত এবং সেই সঙ্গে অনেক রোগের ভারতীয় নামও অন্যান্য দেশে প্রচলিত হইত। বসন্ত রোগের নামও বোধ করি ভারত হইতে এইরূপ কোন এক সূত্রে য়ুরোপ খণ্ডে গিয়া পড়িয়াছে! যেমন বৃক্ষের একটা গুঁড়ি হইতে যে শত শত শাখা প্রসারিত হয় তাহারা যেরূপ একই আকারের হয় অথবা যেমন একই পিতার পুত্রের অনেকটা একই প্রকারের হয় সেইরূপ ইহারাও ভিন্ন দেশীয় হইলেও পরস্পরের মধ্যে সৌসাদৃশ্য হারায় না; তাহার কারণ, সকলেই সংস্কৃত ভাষার বীর্য্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কোথায় বাঙ্গালা ফস্কা প্রভৃতি শব্দ, আর কোথায় ইংরাজী পক্স প্রভৃতি শব্দ এ সকলের মধ্যে যে সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান, তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহারা সংস্কৃত স্ফোটকাদি শব্দের ঔরসজাত।

এবারে বসন্ত রোগের দেশীয় বিদেশীয় নামগুলির যথাসাধ্য তত্ত্বানুসন্ধান করা গেল; আগামী বারে হিন্দু শাস্ত্র মতে বসন্ত নিবারণের কিরূপ ব্যবস্থা সে বিষয় নিরূপণ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কভু।

এখন তুমিই কোথা, আমিই বা কোথা আছি,
দুজনে জীবন পথে কতদুর চলে গেছি,
জীবনের দুটী পথে দুইটী পথিক প্রাণ
মাঝে মহা উপেক্ষার, প্রাণ-ছিন্ন ব্যবধান,
ওপারেতে কত আলো কত গান কত প্রাণ
কত হাসি কত খেলা সারা নিশি দিনমান।
এপারেতে শুধু এক একতান গীত আছে,
একটুক ছায়া আছে জাগিয়া প্রাণের কাছে।
একগাছি ফুলমালা পড়িয়া রয়েছে বাসি
তুষার কঠিন আছে হৃদয়ের অশ্রুরাশি।
তবুও রয়েছি মোরা একই আকাশ-তলে
এখনো সে আকাশেতে অতীতের স্মৃতি জ্বলে।
শুধু সেই স্মৃতি মোর ক্ষুদ্র প্রাণটীরে নিয়ে
বেঁধে দেয় তোমা সনে শীর্ণ প্রিয় বাহু দিয়ে।
কতকাল হয়ে গেল শুধু তার আছে স্মৃতি,
সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে শুধু তার আছে প্রীতি,
কবে কোন সন্ধ্যাবেলা শেষ হয়ে গেছে গান
তারি ভাঙ্গা প্রতিধ্বনি এখনো জাগায় প্রাণ,
'কখন যে ফুলটুকু ঝরিয়া পড়িয়া গেছে,
এখনো সৌরভ তার পরাণে জাগিয়া আছে;
কবে কোন রজনীতে একটী তারকা হায়
পুড়ি' রেখে গেছে শিখা জ্বলন্ত আকাশ গায়,
হায় দেবি! কি বলিতে কত কি বলিয়া ফেলি
প্রাণের ভাষার তীরে মিছে কথা লয়ে খেলি।
মিছে মিছে মিছে হায়! মিছে এই যত কথা
জাগে না জাগে না হেথা প্রাণের নিবিড় ব্যথা।
কি এক অভাব যেন রহিয়াছে কোন খানে
কথা গুলি চলে যায় তবুত ঠেকে না প্রাণে।
কভু কি সার্থক দেবি! হবে এই মালা গাঁথা?
কভু সাঙ্গ হবে এই প্রাণের বেদনা-গাথা?
কভু কি কভু কি দেবি! ইচ্ছায় অথবা ভুলে'—
আমার এ মালাগাছি লইবে ও গলে তুলে?
কভু কি ঘুচিবে দেবি! এসংশয় উষা আলো?
কোন জন্মান্তরে কভু আমারে বাসিবে ভালো?

শ্রীমতী ফুলকুমারী বসু।

মুক্তিসেতু।

১। একা।

নিভৃত কুটীরে বসিয়া বসিয়া
একাকী গাহিছি গান—
বিশ্বের গান
প্রেমের গান
অনন্ত মহিমা গান—
দুঃখ শোক-পরিত্রাণ।

২। আপনার গান

আপনার গান গাহি—
জগত জড়িত তায়,
আপনার গৃহে বসি
দেখি যে বিশ্বের কায়।
প্রভাতে তপন উঠে দেখি
জাগায়ে বিহগগণে,
বিহগে ধ্বনিত করে বন
মহান হরষ মনে।
সন্ধ্যায় তপন ডুবে যায়
অকূল জলধি মাঝে,
আঁধারে জগত ঢেকে যায়
অসিত বসন-সাজে।
উঠে যে চন্দ্রমা ধীরে ধীরে
রজত কিরণ ফেলে,
তারা ফুটে ওঠে হেথা হোথা
সাজাবে গগণতলে।
বাহিরে এসব দেখে গেলে
কিছুই পাই না ঠাঁই,
আশা সুখ শান্তি—থাকেনাবে,—
বহে মরণের বায়;
জড়তায় পূর্ণ দেখি সব
প্রাণ নাহি কোথা পাই।

অন্তরের আঁখি দেখে যবে
তখনি জানিতে পাই—
তপনের গতি তোমারই নিয়ম-বলে;
তোমারই মহিমাগান পক্ষী-কলকলে;
নিশীথ আঁধারে শান্তির বিশ্রামশ্বাস,
চন্দ্রমা কিরণে স্নেহের চন্দনবাস,
তারকাগগনে তোমারই অসীমতা,
প্রভাত পবনে প্রেমময় কোমলতা;—
অন্তরে আঁখি তোমা দিয়াই
দেখিলে জানিতে পাই,
গাহি যবে আপনার গান—
জগত জড়িত তায়।

৩। যাব চলে

মুহূর্তের তরে এসেছি হেথায়
আবার যাইব চলে,
কে কোথায় তখন রহিবে পড়ে
কোন্ লোক শোকান্তরে।
তাই যতদিন আছি এ জগতে
ধরিয়া এ ক্ষুদ্র প্রাণ,
গাহিব কেবলি তোমারি মহিমা,
তোমারি মঙ্গল নাম,
ধরণী ছাড়িয়া সে গান চলিবে
অনন্তের মধ্য দিয়া,
পদতলে তব ভাঙ্গা ভাঙ্গা তানে
শোনাবে দগ্ধ হিয়া।
প্রেমবারি দিয়া করিবে শ্যামল
মরমের মরুভূমি;
আবার হাসিব,
নয়ন মুছিয়া
আবার গাহিব—
জয় ভগবান্ তুমি।
ধন্য হোক্ মরুভূমি!

রাসমালা।

এ স্থলে মহাত্মা টড প্রণীত "পাশ্চাত্য ভারত" নামক গ্রন্থ হইতে অনহলবারাপত্তনের সৌর ও শোলাঙ্কি রাজগণের নাম ও রাজত্বকাল সঙ্কলিত হইল।

প্রথম,—সৌর বংশ।

রাজগণের নাম।	অভিষেক-কাল।		রাজত্বকাল	মন্তব্য।
	সম্বৎ	খৃষ্টাব্দ।		
বনরাজ বা বংশরাজ ...	৮০২	৭৪৬	৫০ বৎসর	ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে ইনি ৬০ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।
যোগরাজ	৮৫২	৭৯৬	৩৫ „	
ক্ষেমরাজ	৮৮৭	৮৩১	২৫ „	আববীয় প্রথম পর্য্যটক (হিঃ ২৩৭ খৃঃ অঃ ৮৫১) এবং দ্বিতীয় (হিঃ ২৫৪, খৃঃ ৮৮৬
বোয়ারজি বা ভূয়দ ...	৯১২	৮৫৬	২৯ „	
বীরসিংহ বা বৈরসিংহ ...	৯৪১	৮৮৫	২৫ „	
রত্নাদিত্য	৯৬৬	৯১৯	১৫ „	
সামন্তসিংহ	৯৮১	৯২৫	৭ „ ১৮৬	সম্বৎ ৯৮৮ (খৃঃ ৯৩২) অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়,—শোলাঙ্কি বংশ।

মুলরাজ	৯৮৮	৯৩২	৫৬	সিদ্ধপুরের মন্দির আরম্ভ করেন।
চাওণ্ড বা চামুণ্ড	১০৪৪	৯৮৮	১৩	আবুল ফাজেলের মতে হিঃ ৪১৬ (সম্বৎ ১০৬৪) অব্দে মাহমুদ কর্তৃক পরাস্ত হয়েন।
বল্লিরাও বা বল্লভীসেন	১০৫৭	১০০১	½	কথিত আছে, মাহমুদ প্রাচীন বংশের কোন রাজাকে সিংহাসনে স্থাপন করেন; বোধ হয় তিনি এই বল্লভা।
দুর্লভ বা নাহুব রাও	১০৫৭	১০০১	১১½	ভোজের পিতৃব্য মুঞ্জের সমসাময়িক
ভীমদেব	১০৬৯	১০১৩	৪২	১০৪৪ খৃঃ অব্দে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে হিন্দুরাজগণের সম্মিলন।
কর্ণ	১১১১	১০৫৫	২৯	কোলি ও ভিলদিগকে জয় করেন।
সিদ্ধরাজ জয়সিংহ	১১৪০	১০৮৪	৪৯	
কুমারপাল	১১৮৯	১১৩৩	৩৩	
চোনিপাল, অজয়পাল বা জয়পাল	১২২২	১১৬৬	৩	কনোজের জয়সিংহের সমসাময়িক।
ভোলা ভীমদেব	১২২৫	১১৬৯	৩	দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী।
বল্লমুলদেব	১২২৮	১১৭২	২১	সম্বৎ ১২৪৯ (খৃঃ ১১৯৩) অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।
			২৬১	

চতুর্থ অধ্যায়।

বনরাজের শেষ বংশধর মহারাজ সামন্তসিংহের মৃত্যুর সহিত ‘অনহলবারা-পত্তন হইতে সৌরকুলের বংশতরু উৎপাটিত হইয়া পড়ে এবং সুপ্রসিদ্ধ শোলাঙ্কিকুল তাহার স্থান অধিকার করে। এই বিক্রমান্বিত অগ্নিকুলের সমস্ত বিবরণ রাজস্থানে সবিস্তারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তথায় বলা গিয়াছে যে, দুর্দ্দান্ত দানবদিগের করাল গ্রাস হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ অর্ব্বুদশিখরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে যে চারিটী বীরপুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, চুলুক তাহাদের অন্যতম। সেই চুলুক হইতেই চৌলুক্য বা শোলাঙ্কিকুল উৎপন্ন হয়। কিন্তু কর্ণেল টড সাহেব মিবারের অন্তর্গত রূপনগরের শোলাঙ্কি সর্দ্দারের নিকট শোলাঙ্কিদিগের যে বংশতালিকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে অন্যরূপ বৃত্তান্ত প্রকটিত আছে। সে বিবরণ আপাততঃ কাল্পনিক বলিয়া বোধ হইলেও এস্থানে সন্নিবেশ করা গেল। বর্ণিত আছে, “ভগবান্ ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টি শেষ করিয়া গঙ্গার সুরুঘাটে স্নান করিতে আইসেন। তথায় স্বীয় চুলুক্য মধ্যে কিঞ্চিৎ গঙ্গাজল ও দুর্ব্বা তৃণের একটী শিখা ধারণ করিয়া সঞ্জীবন মন্ত্রপ্রভাবে তিনি ব্রাহ্মচৌলুক্য-নামক একটী পুরুষ সৃষ্টি করেন।* উদ্ভবস্থানের নামানুসারে চৌলুক্য শোলাঙ্কি নামে অভিহিত হয়েন। সুরধুনীতটস্থ সেই সুরুঘাটে শোলাঙ্কিগণ সুরু নামে একটী নগর স্থাপন করিয়া সমগ্র ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ ব্যাপিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। শোলাঙ্কিকুলের গোত্রাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পঞ্চনদের অন্তর্গত প্রাচীন লোহকোট নগরে তাঁহাদিগের আদিম বাসস্থান। তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া তাঁহারা সুরধুনী-তটস্থ সুরু নগরে অবস্থিত হয়েন। যে ভট্টগ্রন্থ হইতে টড সাহেব উক্ত বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহার আর এক-স্থলে লিখিত আছে যে, “বিক্রমসম্বতের সপ্তম শতাব্দীতে রাজ ও বিজয় নামে দুইটী ভ্রাতা গঙ্গাতীর ত্যাগ করিয়া গুজ্জরে উপনীত হয়েন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি পত্তনের সৌর রাজের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহারই পুত্র কালে পত্তনের সিংহাসন হস্তগত করিয়াছিলেন। বংশরাজ হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত পাঁচ শত বাহান্ন বৎসর অতীত হয়। এই কর্ণ সেকন্দার খুনী কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হয়েন।” যাহা হউক, এক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয়ের আলোচনায় পুনঃপ্রবৃত্ত হইলাম।

কল্যাণরাজ ভুবরের অধস্তন চতুর্থ পুরুষে ভুবনাদিত্য নামে জনৈক রাজা অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহার তিন পুত্র,—রাজ, বিজয় ও দণ্ডক। এই তিন ভ্রাতায় একত্রিত হইয়া সুপবিত্র সোমনাথ তীর্থে গমন করেন এবং প্রত্যাগমন-কালে অনহলবারার সৌবরাজ সামন্তসিংহের সভায় উপস্থিত হয়েন। রত্নমালা গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, “জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রাজ দেখিতে পরম রূপবান্ ছিলেন। তাঁহার

* Tod,s Western India, page 165.

অবয়ব মধ্যাবিৎ, বর্ণ গৌরকান্তিময়। তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিতেন এবং নিত্য শিবপূজা করিতেন। কিন্তু সৌভাগ্যদেব তৎপ্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন না। রাজাদিত্যকে পত্নীগণের জন্য অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল।”

রাজকুমার রাজাদিত্য যেরূপ উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ উৎকৃষ্ট গুণগ্রামে বিভূষিত ছিলেন। তৎকালে লোকে তাঁহাকে একজন প্রধান বীর বলিয়া প্রশংসা করিতেন। এই সকল সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত থাকাতে রাজাদিত্য অচিরে সামন্তসিংহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। রাজা সামন্ত সিংহ তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত স্বীয় ভগিনী লীলাদেবীর বিবাহ দিলেন। কিছুকাল পরে লীলাদেবীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। তদ্দর্শনে সামন্তসিংহের আনন্দের আর সীমা রহিল না। কিন্তু তাঁহার আনন্দ সম্পূর্ণ হইতে না হইতে তদীয় প্রিয়তমা ভগিনী উৎকট প্রসব-বেদনায় প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার গর্ভ হইতে একটী সজীব পুত্রসন্তান বহির্নীত হইল। মূলা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করাতে এই শিশু মূলরাজ নাম প্রাপ্ত হইলেন। মূলরাজের অপ্রতিম রূপ দর্শনে সামন্তসিংহ ভগিনীর শোক অবহেলা করিয়া তাঁহাকে অশ্রু-প্লাবিত বক্ষে ধারণ করিলেন। শোকাশ্রুর সহিত আনন্দাশ্রু মিলিত হইল। সামন্তসিংহ মূলরাজকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন এবং অতিশয় যত্নের সহিত লালনপালন করিতে লাগিলেন। উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় রাজকুমার মূলরাজের তেজোবীর্য্য ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। অতি বাল্যকালেই তিনি স্বীয় ভবিষ্য জীবনের সূত্রপাত করেন। করে অসি ধারণ পূর্ব্বক মাতুলের রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করিয়া মূলরাজ অচিরে সকলের প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ কবি কৃষ্ণজি মূলরাজকে নির্দ্দয়, স্বার্থপর ও বিশ্বাস-ঘাতক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। মূলরাজের ভবিষ্যৎ আচরণ অনুশীলন করিলে কৃষ্ণজীর বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায্য বলিয়া বোধ হইবে। মূলরাজের বর্ণ কৃষ্ণ হইলেও তিনি দেখিতে শ্রীমান ছিলেন। তিনি অতিশয় কৃপণ ও ইন্দ্রিয়দাস ছিলেন; যুদ্ধে তাঁহার কিছুমাত্র পারদর্শিতা ছিল না। কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে তিনি কাপট্যের সাহায্যে তাহার বিশ্বাসোৎপাদন করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতেন।”

মূলরাজ পরিণত বয়সে পদার্পণ করিলে সামন্তসিংহ একদা সুরাপানে মত্ত হইয়া তাঁহাকে অনহলবারার সিংহাসনে অভিষেক করিলেন; কিন্তু যখন তাঁহার মত্ততা দূর হইল, যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, স্বহস্তে নিজ পদে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, তখন সর্ব্ব সমক্ষে মূলরাজের রাজ্যাভিষেক অস্বীকার করিলেন। চঞ্চলমতি সামন্তসিংহের সেই একটী প্রগল্‌ভ আচরণ প্রযুক্ত সেই দিন হইতে সোলঙ্কুদের দানের অকিঞ্চিৎকরতা আদর্শবাক্যে পরিণত হইয়াছে। মূর্খ সামন্তসিংহ নিজ বাক্য মুখে প্রত্যাহার করিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা সফল হইল না। মূলরাজ একবার দুর্ল্লভ রাজক্ষমতার রসাস্বাদন করিয়া আর কিছুতেই তাহা ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। মাতুলের নির্ব্বন্ধাতিশয্য

দর্শনে সেনাবল সংগ্রহ করিয়া তিনি তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন এবং অনহল বারার সিংহাসনে দৃঢ়রূপে অধিষ্ঠিত হইলেন। প্রসিদ্ধ কুমারপাল-চরিত রচয়িতা এই স্থল বর্ণন করিতে বলিয়াছেন, "জামাতা, বৃশ্চিক, ব্যাঘ্র; মদিরা, বাতুল, ভাগিনেয় ও রাজা,—এই সাতটী বস্তুর কৃতজ্ঞতা নাই; ইহারা উপকারের মূল্য বুঝে না।"

উপকারী মাতুলের শোণিতে হস্ত কলুষিত করিয়া মূলরাজ আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করিতে পারিলেন না। পাপার্জ্জিত রাজ্য নিষ্কণ্টকে উপভোগ করিবার আশায় তিনি মাতৃকুলের সকল ব্যক্তিকেই সংহার করিলেন। কবি কৃষ্ণজি বলেন, যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি মূলরাজ কর্ত্তৃক নিহত হয়, তাহারা ঘোর পাপাচারী ছিল; তাহারা দাম্ভিক, সুরাপায়ী, প্রজাপীড়ক এবং দেব ও ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ছিল।" হইতে পারে তাহারা অতিশয় অধার্ম্মিক ছিল; কিন্তু কবির বর্ণনায় বোধ হয়, তিনি মূলরাজের পাপাচরণ মন্দীভূত করিবার অভিপ্রায়ে কৌশলক্রমে সেই দুর্ভাগাদিগের চরিত্র সেরূপ গাঢ়বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি রাজার অপরাধ স্বীকার করুন আর নাই করুন, রাজা স্বয়ং অবশেষে তজ্জন্য যাবপর নাই অনুতাপ করিয়া পাপশান্তির নিমিত্ত কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

গুরুশিষ্য সংবাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অদ্ভির্বাচা চ দত্তায়াম্ ম্রিয়তেহথো বরো যদি।
নচ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা॥ ৫

যদি মন্ত্র সংস্কার না হইতেই দত্তা অথবা বাগ্‌দত্তা কন্যার বরের মৃত্যু হয়, তাহাকে পিতার অনূঢ়া কন্যা বলিয়াই জানিবে।

দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তির্দত্তা কন্যা প্রদীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ নচ কমণ্ডলুঃ। ৬

"দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, দত্তা কন্যার দান, যজ্ঞে গোবধ, এবং কমণ্ডলু ধারণ, কলিকালে করিবেক" না।

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ॥ ৭

"কলিকালে দত্তা কন্যাকে পুনর্ব্বার অন্যপাত্রে দান করিবেক না।"

এই সকল বচনে দত্তা কন্যার পুনর্ব্বিবাহের বিধি ও নিষেধ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

গুরু। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এই প্রথা ছিল যে, আসুর বিবাহে বাগ্‌দত্তা কন্যার পূর্ব্ব বরের সহিত বিবাহ না দিয়া, অপেক্ষাকৃত গুণবান্ পাত্রের সহিত বিবাহ দিলে কোন দোষ হইত না। এমন কি উক্ত বিবাহে সপ্তপদীগমনের

(৫) বশিষ্ঠ সংহিতা ১৭শ অং।
(৬) ক্রতু সংহিতা।
(৭) বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

পূর্ব্বে যদি বরের মৃত্যু প্রভৃতি বিশেষ বিঘ্ন ঘটিত, তবে সেই দত্তা কন্যাকেও অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিতে পারা যাইত। আর রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহে অপহৃতা কন্যার কোন প্রকারে উদ্ধার সাধন করিতে পারিলে, তাহাকেও অপেক্ষাকৃত গুণবান্ পাত্রে সম্প্রদান করা যাইত। কলিকালে এই সকল প্রথা রহিত হইয়াছে। অতএব, তুমি দত্তা কন্যার পুনর্ব্বিবাহের বিধি নিষেধ সংক্রান্ত যে সকল বচন বলিলে, সে সমস্ত এই আসুর রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ ঘটিত জানিবে। ব্রাহ্মাদিবিবাহে বাগ্দত্তারও পুনঃ সম্প্রদানের প্রথা ছিল না। এ সমস্ত আমার মনঃকল্পিত কথা নহে। যথা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা—

সকৃৎপ্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্।
দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাৎশ্রেয়াংশ্চেদ বর আব্রজেৎ॥

"একবার মাত্র কন্যা দান করিতে পারা যায়, দান করিয়া হরণ করিলে, অপহর্ত্তা চৌরদণ্ড প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পূর্ব্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর উপস্থিত হইলে, হরণ করিবে, অর্থাৎ পূর্ব্ব বরের সহিত বিবাহ না দিয়া, সেই শ্রেষ্ঠ বরের সহিতই বিবাহ দিবে।"

এই বচনে "দত্তা" শব্দে বাগ্দত্তাকে বুঝাইতেছে। অতএব রঘুনন্দন বলিয়াছেন,—

"দত্তাং বাগ্দত্তাম্ ইয়ং কন্যা অমুকায় দাতব্যেতি প্রতিশ্রুতাম্।" ৮

যদিও উদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্যবচনে বাগ্দত্তা মাত্রেরই হরণের বিধি দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু বক্ষ্যমান নারদ-বচনে এই বিধি অনেকটা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু পঞ্চস্বেষবিধিঃ স্মৃতঃ।
গুণাপেক্ষং ভবেদ্দানম্ আসুরাদিষু চ ত্রিষু॥

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব এই পঞ্চবিধ বিবাহে একবার মাত্র কন্যাদানের নিয়ম, কিন্তু আসুর, অর্থাৎ পূর্ব্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর উপস্থিত হইলে, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে হয়।

আমি যাহা বলিয়াছি, উদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদ বচন, তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে।

শিষ্য।—

"ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু পঞ্চস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্ম প্রভৃতি পঞ্চ বিবাহে একবার মাত্র কন্যাদানের নিয়ম; এই নারদ বচন দ্বারাই যখন আসুরাদি বিবাহে বিবাহিত কন্যা বিধবা প্রভৃতি হইলে, তাহার পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে, ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে; তখন আপনি, "সপ্তপদী গমনের পূর্ব্বে বরের মৃত্যু প্রভৃতি বিশেষ বিঘ্ন ঘটিলে, আসুরাদি বিবাহে সেই দত্তা কন্যারও পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারিত" এই প্রকার তাৎপর্য্য সঙ্কোচ করিলেন কেন?

গুরু। নারদ বচনের পূর্ব্বার্দ্ধ হইতে সহসা এই প্রকার অর্থই প্রতিপন্ন হয় বটে, কিন্তু "গুণাপেক্ষং ভবেদ্দানম্ আসুরাদিষু চ ত্রিষু" আসুর, রাক্ষস, ও পৈশাচ বিবাহে গুণাপেক্ষ দান অর্থাৎ পূর্ব্ব পাত্রাপেক্ষা অধিক গুণবান্ পাত্র উপস্থিত

(৮) উদ্বাহতত্ত্ব।

(৯) উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত নারদ বচন। এষঃ সকৃৎ দান বিধিঃ- উদ্বাহতত্ত্ব।

হইলে, তাহাকেই কন্যাদানের নিয়ম, এই শেষার্দ্ধ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আসুরাদি বিবাহে বিবাহিতা কন্যার বৈধব্য উদ্দেশ্য নহে, তবে "দত্তামপি হরেৎ কন্যাং শ্রেযাং শ্চেদ বর আব্রজেৎ" দত্তাকেও হরণ করিয়া, উপস্থিত উৎকৃষ্টবরে সম্প্রদান করিবে। এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনে সর্ব্বপ্রকার বিবাহেই বাগ্‌দত্তা কন্যাকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিবার সামান্যাকারে যে বিধি ছিল, নারদ বচনে সংক্ষেপপূর্ব্বক তাহাই আসুরাদি বিবাহত্রয়ে বিহিত হইয়াছে মাত্র। তথাপি সপ্তপদী গমনের পূর্ব্বে বিঘ্ন বিশেষে কন্যার যে পুনর্ব্বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা কেবল,—

নোদকেন ন বাচা বা কন্যাযাঃ পতিবিষ্যতে।
পাণি গ্রহণ সংস্কারাৎ পতিত্বং সপ্তমে পদে ॥ ১০

উদকদ্বারা কিংবা বাক্যদ্বারা পতিত্ব জন্মে না, কিন্তু পাণিগ্রহণ সংস্কারের পর সপ্তপদী গমন হইলে পতিত্ব জন্মে। ইত্যাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যানুবোধে মাত্র।

শিষ্য। বাগ্‌দত্তা কন্যা যদি অপরের বিবাহযোগ্যা হইল, তবে,—

সপ্তপোনর্ভবাঃ কন্যা বর্জ্জনীযাঃ কুলাধমাঃ।
বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা।
উদকস্পর্শিতা যাচ যাচ পাণিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা যাচ পুনর্ভূ প্রভবাচ যা।
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ ॥ ১১

যাহাকে বাক্যদ্বারা দান করা হইয়াছে, যাহাকে মনে মনে দান করা হইয়াছে, যাহার হস্তে সূত্র বন্ধন করা হইয়াছে, যাহাকে যথাবিধি জলস্পর্শ পূর্ব্বক দান করা হইয়াছে, যাহার পাণিগ্রহণ নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহার কুশণ্ডিকা হইয়াছে, যে পুনর্ভূর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কুলের অধম এই সাত পৌনর্ভবা কন্যাকে বর্জ্জন করিবে। কাশ্যপ কথিতা এই সাত কন্যা, বিবাহ করিলে, অগ্নির ন্যায় ইহারা ভর্ত্তৃকুল দগ্ধ করে।

ইত্যাদি নিষেধ শাস্ত্রের গতি কি হইবে?

গুরু। "ব্রাহ্মাদিষ বিবাহেষু পঞ্চস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ," ইত্যাদি শাস্ত্রের অনুবোধে অবশ্য ব্রাহ্মাদি পঞ্চবিধি বিবাহে এই সকল কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু আসুরাদি বিবাহে ইহাদের বিবাহ নিষেধ কদাচ কাশ্যপবচনের অভিপ্রেত নহে। কারণ, তাহা হইলে নারদের পঞ্চবিধি বিবাহে সকৃৎ দান বিধি; যাজ্ঞবল্ক্যের দত্তা কন্যার পাত্রান্তরে সম্প্রদান বিধি, নারদের গুণাপেক্ষ দান-বিধি সম্পূর্ণ নিরবকাশ হইয়া পড়ে; কিন্তু অকারণে শাস্ত্রীয় শাসনের বৈকল্য সাধন, কখনই মীমাংসকানুমত নহে। পুনর্ভূ—প্রসূতা কন্যাপক্ষেও এই নিয়ম অর্থাৎ আসুরাদি বিবাহে তাহার পাণিগ্রহণ নিষিদ্ধ নহে। অন্যথা পুনর্ভূ শাস্ত্রসম্মত পত্নী হইবে; অথচ তাহার গর্ভজাত কন্যা অনূঢ়া থাকিয়া পিতা মাতা প্রভৃতিকে নরকে পাঠাইবে, এতাদৃশ অপূর্ব্ববিধি হিন্দুশাস্ত্রে থাকিতে পারে না।

শিষ্য। যাহাকে একবার দান করা গিয়াছে, তাহাকে পুনঃ সম্প্রদান করা যে শাস্ত্রের অভিমত নহে, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু সম্প্রদত্তা

(১০) উদ্বাহতত্ত্বধৃত যম বচন।

(১১) উদ্বাহতত্ত্বধৃত কশ্যপ বচন। এই বচনে শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় পৌনর্ভব শব্দের পুনর্ভূ অর্থ করিয়াছেন কিন্তু শাস্ত্র সম্মত নহে। যথাস্থানে বিবেচিত হইবে।

কন্যার বৈধব্য প্রভৃতি ঘটিলে, যদি সে স্বয়ংবরা হয়, তাহাতে দোষ কি ?

গুরু। সে স্বয়ংবরাও হইতে পারে না ; যথা মনু—

যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতেঃ পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ।

পিতা অথবা পিতার অনুমতিক্রমে ভ্রাতা যে পাত্রে সম্প্রদান করিবেন, কন্যা যাবজ্জীবন তাঁহারই সেবা করিবে, পতি মরিলেও অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিবে না।

এমন কি দত্তা কন্যাকে যদি পতি পরিত্যাগ অথবা বিক্রয় পর্য্যন্তও করে ; তথাপি সেই পত্নীতে তাহার পতিত্ব সত্ত্বের কোনও হানি হয় না। যথা মনু—

ন নিষ্ক্রয় বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তু র্ভার্য্যা বিমুচ্যতে।

বিক্রয় অথবা ত্যাগাদিদ্বারা পত্নীতে পতির সত্ত্ব দূরীভূত হয় না।

আর যদি স্নেহ অথবা অন্য কোন কারণে পিতা প্রভৃতি পুনঃ কন্যা সম্প্রদান করেন, তবে তাহার পারলৌকিক দণ্ডও অতি গুরুতর। যথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে—

পুনর্দাতা চ কন্যায়াং ক্রিমিবে নোপজায়তে।

যে কন্যাকে পুনঃ সম্প্রদান করে, সে ক্রিমি হইয়া জন্মে।

অতএব যাঁহাদের শাস্ত্রীয় শাসনে কিছু মাত্র আস্থা আছে, তাঁহারা যেন কন্যাকে পুনঃ সম্প্রদান করিয়া, শেষে নরকের ক্রিমি না হন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

ইতি দ্বিতীয় প্রস্তাব।

শ্রীহৃষীকেশ ব্যাকরণ সরস্বতী

সাহিত্য ও সমাজ।

দুরন্ত কলির দারুণ ছায়া ভারতের সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িলে একদা শৌনকাদি মুনিগণ পুরাণতত্ত্বজ্ঞ সূতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সাধো ? আমাদের উপায় কি ?" কলির কুটিল প্রভাবে তখন মানবের বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত ও বিকৃত হইতেছিল, স্বার্থের অবিরত সংঘর্ষে,—জীবন সংগ্রামের কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অতীত গৌরবের ভস্মরাশির উপর দণ্ডায়মান হইয়া ভারতবাসী মাত্রেই পরস্পরের শোণিতপাত করিবার উদ্যোগ করিতেছিল ; কুরুক্ষেত্রের বিশ্বদাহী সমরানলে ক্ষত্রিয়ের বলবিক্রম দগ্ধ হইলে শূদ্রগণ ক্ষত্রিয়ের স্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে মাথা তুলিতেছিল ; বৈশ্যগণ ধন ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া বাণিজ্যাদি ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছিল, এবং ব্রাহ্মণগণ নিরুপায় হইয়া তপস্যা ও যজ্ঞের ফল-বিনিময়ে আত্মরক্ষার মন্ত্রণা করিতেছিলেন।

কলির প্রাবল্যকালে—কালকবলিত ভারতের সেই বিপ্লুত অবস্থায়—কুল, শীল, বিনয় ও শ্রৌত কর্ম্মাদির মুমূর্ষুকালে সমাজতত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ ভয়বিকলচিত্তে ভারতের যে ভাবী চিত্র অনুমান করিয়াছিলেন, আজি সহস্র সহস্র বৎসর পরে আমরা তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। সেই

ব্রাহ্মণ সেই একই যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া সেই অসিত দেবল, ভৃগু ও অঙ্গিরা প্রভৃতি গোত্রপতিগণের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের সে তেজ, সে তপোবল, সেই অধৃষ্য আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ কোথায়? যাঁহাবা ভূদেব নামে পূজিত হইয়া একদা রাজরাজেশ্বর দিগেরও উন্নত মস্তকে পদাঘাত করিতেন, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর একাধিপত্যও যাঁহারা হস্তামলকবৎ অগ্রাহ্য করিতেন, আজি তাঁহাদের নির্ব্বল, স্বার্থ বঞ্চিত ও অধঃপতিত সন্তানগণ ধর্ম্মধ্বজী অহম্মন্য শূদ্র ও বৈশ্যদিগের সম্মুখে দীনভাবে নিষণ্ণ। আজি তাঁহারা উদরান্নের জন্য যবনের কৃপাকটাক্ষের কণা মাত্রও লাভ করিবার আশায় নিরন্তর উদ্‌গ্রীব। আজি শূদ্র দ্বিজত্বের জন্য কঠোব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ; বৈশ্য স্বাধীন বৃত্তি ত্যাগ করিয়া দাস্যের সাহায্যে আত্মরক্ষায় লালায়িত, ক্ষত্রিয় অসি তূণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া মসিপেষণ দ্বারা রাজ্যাপহারকদিগের তুষ্টিবিধানে অবিরত বিব্রত। সে ধ্যান, সে তপস্যা, সে যজ্ঞানুষ্ঠান কিছুই নাই, "স্ত্রিভিঃ পুরুষবৃত্তিভিঃ শাসিতা পুরুষস্ত্রিয়ঃ"—পুরুষগণ স্ত্রীগণের শ্রেণীতে অবনীত হইয়াছে, স্ত্রীগণ পুরুষের স্থান অধিকার করিয়া তাহাদিগকে শাসন করিতেছে। এই ভীষণ যুগবিপ্লবকালে—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমাজ সঙ্ঘের তুমুল সংঘর্ষব্যাপারে আর একটী শ্রেণী জীব অপূর্ব্ব সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ত্রিকালদর্শী ভগবান্ ব্যাস ভারতের ভাবী চিত্র অঙ্কিত করিতে করিতে এক স্থলে বলিয়াছিলেন "কলৌতে কবয়ঃ সর্ব্বে" কলিকালে সকলেই কবি হইবেন। সেই "কবি" শব্দের মধ্যে কি অধুনাতন বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের বর্ত্তমান রচনাবিপ্লবের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে না? আজি বঙ্গের ঘরে ঘরে—বাহিরে অন্তপুরে লেখকের ছড়াছড়ি। পাঠশালে বাঙ্গালা-চর্চ্চার অভাব নাই—স্কুল কলেজে সংস্কৃত কাব্যাদির আলোচনার ত্রুটি দেখা যায় না; ইহার উপর ইংরেজি গ্রন্থসমূহ পাশ্চাত্য কবি ও মনিবিগণের উৎকৃষ্ট অংশ সকল সর্ব্বদাই "শিক্ষিত" ব্যক্তিগণের মানসপটে জাগিয়া থাকে। লেখক সোৎসাহে সেই সমস্ত দ্রব্য উদ্গার করেন, পাঠকগণ সাগ্রহে তাহা গলাধঃকরণ করিয়া থাকেন।

জীবন-সংগ্রামে জীবের নূতন নূতন আত্মরক্ষিণী শক্তি উদ্ভাবিত হয়; সেই সমস্ত শক্তির সংঘর্ষ অনিবার্য্য—অবশ্যম্ভাবী। তাহাতে কতকগুলি ক্ষুণ্ণ হইয়া অপরগুলিতে লীন হইয়া যায়, তখন তাহাদের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। অবশিষ্ট শক্তিনিচয় ও সময়ে পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমে দ্বিগুণতর বল উপচয় করিতে থাকে,—দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে আরম্ভ করে। এই সমবেত দৃঢ়ীভূত শক্তিনিবহের চরম পরিণতি বা স্ফূর্ত্তিই জগতের স্থিতিকারিণী। জীব সমাজের সকল স্তরেই এইরূপ জীবন-সংগ্রামের নিদর্শন পাওয়া যায়। ভিন্ন রুচিশালী বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী অনাত্মীয় পাশ্চাত্যজাতির শাসনে,—পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোতের অসাধ্য প্রভাবে বঙ্গসমাজ এখন আমূল আলোড়িত;—আজি প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ভীষণ দ্বন্দ্ব। লোক সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে পঞ্চাশ বর্ষ

পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গের এরূপ সর্ব্বজনীন বিপ্লব ঘটে নাই;—সাম্যবাদী বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব এরূপ বিপ্লুত ভাবের উদ্রেক করিতে পারে নাই, মুসলমানের উন্মুক্ত কৃপাণ কখন বঙ্গের বিরাট সমাজ-শরীরকে এত শতধা খণ্ডিত করিতে পারে নাই। আজি যেন "ভাঙ্গিয়া চুরিয়া—নূতন করিয়া গড়িতে চাহে।"

বঙ্গসমাজের প্রত্যেক স্তরেই যে, বিষম সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীমাত্রেরই অবিদিত নহে। হিন্দু সমাজ আজি পাশ্চাত্য পেষণীর প্রচণ্ড প্রহারে চূর্ণ হইতে চলিয়াছে,—আর্য্যগণের সাত্ত্বিক নীতি আজি তামসী সঙ্করতায় নিমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বিষম গণ্ডগোলের সময়ে কাব্যকলাপিগণের কেকারব কিছুতেই অনুপযুক্ত বা অসাময়িক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সকল দেশেই—প্রায় সকল সময়ে তিন শ্রেণী লেখক দেখিতে পাওয়া যায়,—নিষ্কাম বা স্বল্পকাম, সকাম ও অতিকাম। যাঁহারা অমানুষী প্রতিভা বা পাণ্ডিত্যের বিতরণে জগৎ আলোকিত বা প্রতিবোধিত করিতে চেষ্টা করেন, অর্থ, সম্মান বা গৌরব যাঁহাদের বাঞ্ছনীয় নহে, বিশ্বের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ভিন্ন বিনিময়ে যাঁহারা আর কিছুই চাহেন না, তাঁহারাই প্রথম শ্রেণীর কবি। ভারতবর্ষীয় আর্য্য ঋষিগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যাঁহারা কেবল সখের অনুরোধে রচনা-কণ্ডূয়ন পরিতৃপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে অল্প বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া গ্রন্থাদি রচনা, এবং সভাসমিতিতে বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন, অথবা অর্থের বিনিময়ে সারবান সাহিত্য দ্বারা সমাজের উপকার করিতে যত্নবান্ হয়েন, তাঁহারাই সকাম কবি। অবশিষ্ট সকলে অতিকাম। এই শ্রেণীর লেখকদিগের মধ্যে জীবন-সংগ্রামের উৎকট আধিক্য দেখা যায়। অর্থোপার্জ্জনই ইহাঁদের প্রধান অভিপ্রেত। নীতি বা পরিণতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খলভাবে ইহাঁরা যূক ও মৎকুণের ন্যায় প্রতিনিয়ত রাশি রাশি পুস্তক প্রসব করিতেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর কল্যাণে আজি পল্লবগ্রাহিতা একপ্রকার সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। আজি অজাতশ্মশ্রু বালক স্কুল ছাড়িয়া উপনিষদের বিশদীকরণে প্রবৃত্ত হয়েন, কোম্‌তের অকালকুষ্মাণ্ড শিষ্য গৌতমকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিতে চাহেন, শেলির লালিত্যবিলাসী, কালিদাসের বীণাতন্ত্রী ছিন্ন করিতে চেষ্টা করেন। যাহার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ কেবল তক্ষণ বা সূত্র ধারণ, হল বা বলীবর্দ্দ চালনা করিয়াই কাল কাটাইয়া গিয়াছে, আজি সে বেদরূপ বিশাল বৃক্ষ হইতে পুরাতন ফল হরণ করিয়া, নূতন ধর্ম্মের প্রবক্তা হইতেছে।

ফলকথা, বঙ্গের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের যে কোন স্থলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, তাহার সর্ব্বত্রই এই দারুণ বিপ্লবের প্রমাথিনী ভৈরবী মূর্ত্তি। ইহার প্রকৃত কারণ কি, তাহার অনুসন্ধান করা আজি আমাদের অভিপ্রায় নহে,—ইহার পরিণাম কি দাঁড়াইবে, তাহাই অনুমান করিতে হইবে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি সকল দেশে সকল সমাজের সমুদায় স্তরেই সর্ব্বদা সংঘর্ষ চলিতেছে। এই সমস্ত সংঘর্ষ, অবশ্যম্ভাবী সুতরাং

অনিবার্য্য। ইহাদের পরিণতির সহিত সমাজের পরিণতি হইতে থাকে। সমাজ কখনই স্থির থাকিতে পারে না; ইহার বহিরবয়ব প্রশান্তবৎ প্রতীয়মান হইলেও অভ্যন্তরে নিরন্তর অনন্ত তরঙ্গাভিঘাত দেখা যায়। হিন্দুরাজত্বকালে প্রাচীন হিন্দুসমাজের বিশ্লেষ করিলে ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। অন্তঃসলিলা এই প্রমাথিনী শক্তি যখন অতি প্রচণ্ড হইয়া উঠে, তখনই সমাজের বিপদ, তখনই সাত্ত্বিক শক্তি তাহা হইতে আপনি আবির্ভূত হইয়া তাহাকে রক্ষা করে; ইহাই ভগবানের অবতার স্বীকার। বর্ত্তমান কাব্যবিভ্রাটের পরিণতি কি হইবে, তাহা সহজে বুঝা যাইতেছে না। ইহাতে নানা অসাত্ত্বা প্রভাব আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা সঙ্কর হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই সঙ্কর সংঘর্ষে যে, বিশ্বের চিরন্তন নিয়ম বিতথ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? জীবন-সংগ্রামই যখন এই সংঘর্ষের মূলীভূত কারণ, তখন ইহার পরিণতিতে সমাজের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে, আমি ক্রমে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

৯। আলোক।

আলোক দূরস্থ দ্রব্যের আকার ও তাহাদের দৃশ্যমান আয়তন জানায়। যখন আমরা কোন গাছ বা বাড়ী বা পর্ব্বতের দিকে তাকাই, যখন আমাদের দৃষ্টি দৃষ্টি-সীমায় আবদ্ধ হয়, তৎক্ষণাৎ তথাকার পদার্থচয়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; উক্ত পদার্থচয়কে কেবল বাহ্য পদার্থমাত্র বলিয়া জানি না, কিন্তু এমন বাহ্যপদার্থ বলিয়া জানি, যাহার আকার, প্রভা, রং পারস্পরিক অবস্থান ও দূরতা আমরা এককালীন অনুভব করি।

বাহ্যজগৎকে যে আমরা এমন সত্ত্বরূপে, পূর্ণরূপে; আশ্চর্য্যরূপে জানিতেছি, ইহা আলোকেরই প্রসাদে। আলোকের দ্বারাই আমরা আকাশকে স্পর্শ করি, ইহা সেই অন্ধকার আকাশ নহে, যাহা আমরা অধ্যাহার করিয়া জানি; শূন্য জ্যামিতিক আকাশ নহে, যাহা দৃষ্টিহীন ব্যক্তিও অনুভব করে; কিন্তু ইহা সেই বাস্তবিক আকাশ, যাহা জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্, পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ, জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জ পরিপূর্ণ এবং সেই সকল তেজঃপুঞ্জ লোকমণ্ডলে পরিপূর্ণ যাহারা অন্তরীক্ষের শোভাসম্পাদন ও বিশ্বপতির মহিমা ঘোষণা করে।

কি আশ্চর্য্য সহজ প্রণালীতে এমন প্রকাণ্ড ব্যাপার সম্পন্ন হয়, সংক্ষেপে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক।

পৃথিবী একটী গোলাকার পদার্থ; ইহার ব্যাস প্রায় ১২৭০০ কিলোমেটর। ইহাকে ভূলোক বলে ইহা ১০০

কিলোমেটর ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত বায়ু দ্বারা আবৃত—এই স্থানকে ভুবলোক বলে। এই বায়ুসীমার ঊর্দ্ধে স্বর্লোকের আরম্ভ। মনে চিন্তা কর, এই আকাশ সকল স্থানেই প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে—উচ্চে আমাদের মস্তকের উপর, গভীরতায় আমাদের পদতলের নিম্নে এবং আমাদের সমুদয় আশেপাশে, সমভাবে অনিত ও অসীমরূপে বিস্তৃত আছে। আরো মনে কর, আমাদের পৃথিবী গ্রহ-সদৃশ বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর অন্যান্য গ্রহসকল পৃথিবীর ন্যায় শূন্যে ঝুলিতেছে এবং ইহাদের সাধারণ কেন্দ্র সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আকৃষ্ট বা ঘূর্ণায়মান হইতেছে। যে গ্রহ এই মধ্যবিন্দুর অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী, তাহা ১৬ মিলিয়ন লীগ অর পরিমিত (orbit) কক্ষরেখা অঙ্কিত করিতেছে। যে গ্রহ অত্যন্ত দূরবর্ত্তী, তাহা পৃথিবীর কক্ষরেখা অপেক্ষা ৩০ গুণ বৃহৎ কক্ষ-রচনা করিতেছে অর্থাৎ ৪০ মিলিয়নের ৩০ গুণ বা ১২০০ মিলিয়ন লীগ পরি-মিত অরবিশিষ্ট চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে। এইরূপে আমরা যাহার অন্তর্ভূত আছি, সেই সৌরজগৎপ্রণালীর আভাস প্রাপ্ত হইলাম।

সূর্য্য কেবল সৌরজগতের মধ্যবিন্দু এবং সেই সকলের গতির ও ক্রিয়ার কেন্দ্রমাত্র নহে, ইহা ঐ জগৎমণ্ডলের আলোকেরও কেন্দ্র এবং আধার। শতাবধি জ্ঞাত গ্রহ এবং তাহাদের অধীনস্থ উপগ্রহ এবং শত শত ধূমকেতু, এই সকল সূর্য্যেরই জ্যোতিতে দীপ্তি পায়; এবং চন্দ্র ও পৃথিবীর ন্যায় এই সকল গ্রহপ্রভৃতির যে অর্দ্ধখণ্ড সূর্য্যের অভিমুখে থাকে তাহাই দীপ্তি পায়, অপর অর্দ্ধাংশ রজনীর অন্ধকারে আবৃত থাকে।

আমাদের মানসচক্ষুর সমীপে যাহা এমন প্রকাণ্ড বলিয়া বোধ হইতেছে, জ্যোতিষশাস্ত্র যাহাকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না, সেই এই সৌরজগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধে একটী বিন্দু—একটী অদৃশ্য বিন্দুমাত্র।

যাহাদের আকার, গঠন ও নিয়মাবলী আমাদের নিকট এই সৌরজগতেরই সদৃশ বলিয়া বোধ হয়, এমন অসংখ্য জগৎ আকাশগহ্বরে অবস্থান করিতেছে। সূর্য্যের ন্যায় আকাশস্থিত প্রত্যেক নক্ষত্র আলোকের এক একটী মধ্যবিন্দু এবং গতি ও ক্রিয়ার কেন্দ্র বলিয়া উপলব্ধি হয়। উহারা প্রত্যেকে ঈশ্বরদত্ত অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মানুসারে আমাদের সৌরজগতের গ্রহ ধূমকেতু সদৃশ নিজ নিজ অধীন তারকাগণকে শাসনে রাখিতেছে।

যেমন পৃথিবীস্থ পদার্থসকল যত দূর হইতে দূরে গিয়া দৃষ্টিসীমার নিকটবর্ত্তী হয়, তত অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অবিষয় হইয়া দৃষ্টির বিষয়মাত্র হইয়া থাকে; তেমনি এই সমস্ত অসংখ্য জগৎ আলোকরশ্মি বর্ষণ দ্বারা আমাদিগের সহিত কেবল দৃষ্টির বিষয় হইয়া সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হয়। অসীম দূরতাবশতঃ তাহাদিগকে অসীম ক্ষুদ্র দেখা যায়। নক্ষত্ররাজির মধ্যে সিরিয়স (লুব্ধক) নামক নক্ষত্র পৃথিবীর নিকটতম বলিয়া তাহাকে আর আর নক্ষত্র অপেক্ষা সমুজ্জ্বল দেখায়। ইহাকে খালি চক্ষেও যেমন একটী অবিভাজ্য বিন্দু বলিয়া বোধ হয়, তেমনি যে দূরবীন কোন আয়তনকে লক্ষগুণ

বৃদ্ধি করে সেই দূরবীন দিয়া দেখিলেও উহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দেখায় না। কিন্তু আমরা ঠিক জানি যে সিরিয়স নক্ষত্রের স্থানে আমাদের এই সূর্য্য যাইলে তাহাকে আয়তনে অধিক না দেখাইয়া অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ দেখাইত।

সমুদ্রতীরস্থ বালুকারাশিসদৃশ রাশি রাশি তারকাগণ যে আকাশ-গভীরে বিছাইয়া আছে, ইহাদের পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী দূরতা যে কত, জ্যোতির্ব্বিদ্যা তাহা এখনো নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই। আমরা এ বিষয়ে এই একটীমাত্র জানিয়াছি যে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী যে তারকা, পৃথিবী হইতে সূর্য্য যত দূর, তদপেক্ষা ২০০০০০ গুণেরও অধিক পৃথিবী হইতে উহার ব্যবধান অথবা ৪০ মিলিয়ন লীগের ২০০০০০ গুণ পরিমাণ। ইহা দ্বারা জগতের সীমা কি তাহা বুঝিতে পারি না, কিন্তু বিশ্বমণ্ডলের যে কতদূর পর্য্যন্ত পরমেশ্বর আমাদের ক্ষুদ্র চক্ষুর আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি। যতদূর আমরা জানিতে পারিয়াছি, অন্তরীক্ষগত জড়জগৎ-শৃঙ্খলা এইরূপ।

মুহূর্ত্তের জন্য সৌরজগতে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। সূর্য্য এবং গ্রহগণের মধ্যবর্ত্তী স্থান জড়পদার্থসংঘটিত নহে অর্থাৎ পৃথিবী বা বায়ু যেমন ভারবান্ জড়পদার্থে নির্ম্মিত অথবা নীয়েট ও ভারী গ্রহ সকল যেরূপ পদার্থে সংরচিত ইহাতে তেমন কোন কিছু নাই; আমরা ইহাকে আকাশ বা শূন্য বলিব।

আমরা কোন্ অর্থে আকাশকে গ্রহণ করিলাম ইহা বুঝা আবশ্যক। কোন একটী স্থানকে শূন্য কহে, যদি তাহাতে ভারবান্ বা তুলবান্ বস্তু না থাকে। এখন, গ্রহসকল বিনা বাধায় তাহাদের সূর্য্যপ্রদক্ষিণ ক্রিয়া সম্পন্ন করে। তাহারা এমন কোন পদার্থ সম্মুখে পায় না, এমন কাহাদের সহিত তাহাদের ঠেকাঠেকী হয় না, যাহা তাহাদের সময়ের নিয়মে ব্যাঘাত করিতে পারে। ধূমকেতু সকল, যাহাদের দ্রব্যরাশি অতুলন পরিমাণে অল্প এবং আয়তন অতুলন পরিমাণে অধিক, তাহাদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ প্রমাণের ন্যায় সাক্ষ্য দিতেছে যে পদার্থ সকল ইতস্তত ছড়ান নাই কিন্তু তাহারা গ্রহমণ্ডলে এবং অস্থির, পরিবর্ত্তসহ ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ডে সংহতভাবে রাশীকৃতরূপে একত্র অবস্থিত আছে। অতএব তারকা ও গ্রহগণের অবাধ গতিই উহাদের মধ্যগত স্থানের শূন্যতা অর্থাৎ অসম্বদ্ধ পদার্থরাশি বিস্তরণের অসদ্ভাব প্রমাণ করিতেছে।

কিন্তু জগৎ দুই উপকরণে রচিত—এক, তারকাগণ যে পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত অর্থাৎ ভারবান্ উপকরণ; আর এক উপকরণ, যাহা ভারহীন উপকরণ, ইহাকে আকাশ বা ব্যোম (Ether) কহে। এই ব্যোম যেমন পৃথিবীর স্থান জুড়িয়া আছে, তেমনি অন্তরীক্ষগত স্থানও জুড়িয়া আছে,—কেবল সেই স্থান নয় যাহার মধ্যে সৌরজগৎ আপনার গতিক্রিয়া সম্পন্ন করে, কিন্তু অন্যান্য সৌরজগতের মধ্যবর্ত্তী শূন্যও পূর্ণ করিয়া থাকে—সেই শূন্য, যাহা আমাদিগের হইতে আকাশগহ্বরের অত্যন্ত গভীরগত তারাসমূহকে পৃথক্ করে; প্রত্যুত ইহা সমুদয় পূর্ণ করিয়া থাকে।

ইহা কেবল পদার্থের উপরিভাগে বদ্ধ নাই; ইহা বস্তু ভেদ করিয়া অণু ভেদ করিয়া স্থিতি করিতেছে। কোন এক সামগ্রীর মধ্যে রূঢ়িক বস্তু সকলকে যে ব্যবধান পৃথক্ করে এবং যাহা পরস্পরকে পৃথক্ করে, ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবধানকেও ব্যোম পূর্ণ করে। যে সকল আণবিক ক্রিয়া দ্রব্যের গঠন ও রাসায়নিক যোগানুরাগে (affinity) নিয়মিত করে সে সকল ঘটনার মধ্যেও ইহার আংশিক প্রভুত্ব আছে। সাধারণ উত্তাপ, যাহা অত্যন্ত নীরেট, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত অভেদ্য পদার্থেও সংকোচ ও বিস্তার বিধান করে এবং রশ্মিময় উত্তাপ, যদ্দ্বারা পদার্থ সকল পরস্পরকে অনুভব করে—আপনাদিগের উষ্ণতা বা শীতলতা দূরে প্রচার করে, এই উভয়েতেই ব্যোমের কার্য্যকারিতা আছে।

অতএব ব্যোম সর্ব্বত্রই আছে, পৃথিবীর বক্ষের মধ্যে, সূর্য্যের মধ্যে, তারকার মধ্যে। কোন স্থানে ঐন্দ্রিয়ক বা অনৈন্দ্রিয়ক, স্বর্গীয় বা পার্থিব এমন একটি খণ্ড অণু বা পরমাণু নাই, যাহা ব্যোম দ্বারা আচ্ছাদিত ও অনুবিদ্ধ নহে, যাহা ব্যোমের অধিষ্ঠানেই বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন হয় নাই।

এখন আলোক কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা এক কথায় বুঝান যাইবে। যেমন বায়ুর স্পন্দনে শব্দের, তেমনি ব্যোমের স্পন্দনে আলোকের উৎপত্তি। উহা কর্ণের গ্রাহ্য, ইহা চক্ষুর গ্রাহ্য। আমরা ব্যোমের যেরূপ লক্ষণ দিলাম, তাহাতে ইহা ভারহীন পদার্থ কিন্তু গতিহীন পদার্থ নহে বলিয়া বোধ হইবে। ইহা চঞ্চল, সংকুচ্য ও স্থিতিস্থাপক এবং ইহা যে গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রচালন করিবার পক্ষে ভারবান পদার্থ অপেক্ষা অতুলন গুণে সক্ষম। ব্যোমের স্পন্দন অত্যন্ত ক্ষীণ না হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত অনুচালিত হইতে পারে।

এই স্পন্দন কিরূপে সম্পন্ন হয়, দৃষ্টান্ত দ্বারা কতকটা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাক্। এমন মনুষ্য নাই, যাহার দৃষ্টি কোন না কোন সময়ে কোন এক প্রশান্ত নদী, সরোবর বা সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ জলে সমাকৃষ্ট হইয়া বিস্মিত ভাবে লক্ষ্য না করিয়াছে যে অতি ক্ষুদ্র হিল্লোল পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে সমতল জলরাশির উপরে উন্নত হইয়া পরিমিতবেগে নিকট হইতে দূরে গড়াইতে গড়াইতে বর্দ্ধিত মণ্ডলাকারে তীর পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। এই তরঙ্গরাশি ক্ষণস্থায়ী, মনে করিলে ইহাকে কালব্যাপী করা যায়। কোন একটী চোঙ্গার মত পদার্থকে জলে ডুবাইয়া তাহাকে উঠাইলে নামাইলে তরঙ্গরাশি কালব্যাপী হয়। ইহা দ্বারা তরঙ্গ সকল যেমন ক্রমশঃ দূরে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তেমনি নিয়ত নূতন জন্মাইতে থাকে। এইরূপে সত্বর সমুদয় জলতল মণ্ডলাকার তরঙ্গে বিভক্ত হয়। স্পন্দনশীল চোঙ্গা এই সকল তরঙ্গের নাভিদেশ। জলতলের প্রত্যেক অণু পর্য্যায়ক্রমে উচ্চ নীচ হওয়াতে ঐরূপ তরঙ্গাকার লক্ষিত হয়। জল ঐ চোঙ্গার স্পন্দনকে সম্পূর্ণ আবৃত্ত ও পুনরুদ্ভূত করে। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে, যেদিকে তরঙ্গ প্রচারিত হয়, সেই অরের লম্বভাবে জলের স্পন্দনক্রিয়া সমাধা হয়। এখন, তরঙ্গ স্পন্দ্যমান নাভিদেশ হইতে তীরাভিমুখে অর্থাৎ চক্রবাড়্দিকে বিস্তৃত

হয়, এমতে স্পন্দনক্রিয়া ঊর্দ্ধাধোদিকে হয়। জলের ভাঁজ দ্বারা উপরিভাগে যেরূপ তরঙ্গ প্রকাশ পায়, জলের মধ্যেও সেই সময়ে সেইরূপ তরঙ্গের উদ্ভব হয়। যদি মনে মনে ভাবা যায়, সমুদ্র উপর হইতে তল পর্য্যন্ত সম্যক্ প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে এবং যদি উহার গভীরদেশে একটা ছোট চোঙ্গা নির্দ্দিষ্ট-গতি অনুসারে অনধিক গভীর ভাবে উঠান নামান যায়, তাহা হইলে সমুদয় জলরাশি নিকট হইতে দূরে ক্রমে ঐ গতি প্রাপ্ত হইবে। জলাণু সকল প্রথম কতক মেটর (Metre) পর্য্যন্ত, পরে কতক কিলো-মেটর পর্য্যন্ত, অবশেষে অত্যন্ত দূর পর্য্যন্ত এমতভাবে স্পন্দিত হইতে থাকিবে যে, কতকগুলি প্রচারমুখী অণুর সম্বন্ধে লম্বভাবে, কতকগুলি তির্য্যক্‌ভাবে স্পন্দিত হইবে। যে সকল অণু চোঙ্গার অক্ষের সমানদিকে অবস্থিত, তাহাদিগের স্পন্দন অণুর দিকে হইতে থাকিবে।

ভারবান্ পদার্থের বিষয়ে উপরে যাহা বলা গেল, ইহা ব্যোমের প্রতিক্রিয়ার স্থূল আভাস মাত্র। তথাপি ইহা বুঝিবার পক্ষে উহা সহায়তা করে। উহাতে যেমন, ইহাতেও তেমনি স্পন্দিতগতি ক্রমে দূরে প্রসারিত হয়। ইহাতেও স্পন্দন একটী নির্দ্দিষ্ট বেগগতিতে প্রচারিত হয়; পরিমিত সময়ের মধ্যে স্পন্দন হয়; তরঙ্গের পরিমিত দৈর্ঘ্য আছে—প্রভেদ এই যে, ব্যোমের তরঙ্গে বা জ্যোতির তরঙ্গে, মধ্যবর্ত্তী পদার্থ অতুল্য গুণে প্রবাহধর্ম্মশীল হওয়াতে, গতির বেগ অতুল্য গুণে অধিক হইবে; কিন্তু তেমনি স্পন্দনের সময়টা এবং তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অতুল্য পরিমাণে ক্ষুদ্র হইবে।

অতএব সূর্য্যের অন্তরে যে সকল দহ্যমান পদার্থরাশি আছে, তাহারা বিনা বিশ্রামে ও বিনা ভঙ্গে ব্যোম পদার্থের মধ্যে নিরন্তর স্পন্দনক্রিয়া উত্তেজিত করে। এই স্পন্দন ক্রমে দূরে সঞ্চারিত হইয়া অনির্দ্দিষ্টরূপে অন্তরীক্ষে প্রচারিত হয়, যতক্ষণ না উহা ভারবান্ মণ্ডল কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ বা পরিণত না হয়। যে সকল স্পন্দন আমাদের বায়ুমণ্ডলের সীমায় আসে, তাহারা বায়ু ভেদ করিয়া, তাহার সমুদয় ঘনত্ব অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর কঠিন মৃত্তিকাতে আসিয়া আঘাত করে। এখানে উহারা নানা পরিণাম প্রাপ্ত হয়। যে সকল পদার্থ স্পন্দন সকলকে আপনাদের মধ্য দিয়া যাইতে দেয়, তাহাদিগকে স্বচ্ছ পদার্থ কহে, যাহারা স্পন্দনের কতক অংশ শোষণ করে তাহারা অস্বচ্ছ এবং যাহারা স্পন্দনকে একেবারে নিরুদ্ধ করিয়া দেয় তাহারা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ। এমতে চক্ষু স্বচ্ছ পদার্থ দ্বারাই রচিত। স্পন্দন গতি উহাকে ভেদ করিয়া তাহাকে কম্পিত করে অর্থাৎ যাহা চক্ষুর গভীরে অবস্থিতি করে এবং যাহা দৃষ্টিধমনীর প্রসারতা দ্বারা রচিত, সেই ধমনীজালের গুচ্ছকে কম্পিত করে। এইরূপে যে ব্যোমের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী ব্যোমের নিরন্তর যোগ আছে, চক্ষুস্তারাস্থ সেই ব্যোম কম্পন দ্বারা আমরা জ্যোতি অনুভব করি, পদার্থদিগকে প্রভেদ করিয়া চিনি, বৃক্ষ দেখি, আকাশ আলোচনা করি। যে সকল প্রবাহ আমাদের চক্ষুর মণিচ্ছিদ্র ভেদ করিয়া যায়, তাহারা যে কি আশ্চর্য্য-কর কৌশলে চক্ষুসম্মুখস্থিত তাবৎ পদার্থের আশ্চর্য্য প্রতিমা অঙ্কিত করে, যাহা

দ্বারা আমরা পদার্থসকলকে একভাবে স্পর্শ করিয়া দেখি ও জানি, দৃষ্টিবিজ্ঞান বিবরণ পাঠে আমরা তাহা অবগত হইতে পারি।

স্পন্দনগতির তীব্রতা বা মৃদুতানুসারে যে জ্যোতিস্তরঙ্গের দীর্ঘহ্রস্বতা হয় তদ্দ্বারা নানাপ্রকার বর্ণ উপলক্ষিত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ প্রবাহের সঙ্গে লোহিত বর্ণের ঐক্য এবং, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র প্রবাহের সঙ্গে বেগুনী বর্ণের ঐক্য আছে। অতএব মন্দ্র ও তারস্বর যেমন কর্ণের সম্বন্ধে, তদ্রূপ চক্ষুর সম্বন্ধে লোহিত ও বেগুণী বর্ণ। অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরীক্ষাদ্বারা তরঙ্গের দীর্ঘতা নির্ণীত হইয়াছে—নিম্নের তালিকাতে সেই সকল পরীক্ষাফলের সমষ্টি দেওয়া হইল।

বর্ণ	মিলিমেটরের নিযুতাংশ দীর্ঘ
লোহিত	৬৪৫
নারাঙ্গী	৫৯৬
হরিদ্রা	৫৭৪
হরিৎ	৫১২
শ্যাম	৪৯২
নীল	৪৫৯
বেগুণী	৪৩৯
গাঢ় বেগুণী	৪০৬

সূর্য্যের আলোক এবং সামান্যতঃ শ্বেত আলোক মাত্রেই পূর্ব্বোল্লিখিত তাবৎ বর্ণের যোগে উৎপন্ন হয়, সুতরাং ঐ সকল তরঙ্গের সমষ্টি দ্বারা রচিত। কোন দ্রব্যই প্রাপ্ত তরঙ্গকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না—উহা কেবল তাহাদিগকে শোষণ বা নির্ব্বাণ করিতে পারে; যাহাদিগকে না নির্ব্বাণ করে তাহাদিগকে পুনঃপ্রেরণ করে—তাহাই আবার সেই দ্রব্যের বর্ণ হয়। যখন কোন দ্রব্য অন্যান্য তরঙ্গদিগকে লালের তরঙ্গ অপেক্ষা অধিক নির্ব্বাণ করে তখনই সেই দ্রব্য লাল দেখায়। কোন দ্রব্য পিঙ্গল, হরিৎ বা নীল দেখায় অর্থাৎ তাহা পিঙ্গল, হরিৎ বা নীলের তরঙ্গ অপেক্ষা অন্যান্য তরঙ্গসকলকে অধিক পরিমাণে নির্ব্বাণ করে।

পার্থিব সমস্ত পদার্থ যখন একমাত্র সূর্য্যের আলোকেই প্রকাশিত হয়, তখন তাহাদিগের বিভিন্ন বর্ণই সূর্য্যের আলোকমাত্র। সূর্য্যের আলোক যে বিবিধ বর্ণের সমষ্টি, তাহার প্রমাণ, প্রকৃতির বিবিধ রাজ্যে আমরা যত প্রকার বর্ণ দেখি, এক সূর্য্যের আলোকে তাহার সমস্তই আছে।

আলোকের গতি এত দ্রুত যে অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহার প্রচার তাৎক্ষণিক বলিয়া বোধ ছিল; কিন্তু এখন কোন এক পরিমিত স্থান অতিক্রম করিতে আলোকের কত সময় লাগে তাহা নির্ণীত হইয়াছে। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে এই সুন্দর আবিষ্কার সর্ব্বপ্রথম ঘটে; রমর (Romer) নামক ডিনামার ইহার আবিষ্কর্ত্তা। এই আবিষ্কারের তথ্য বোধগম্য করিবার চেষ্টা করা যাউক। সূর্য্যের প্রতিভূ; প ফ ব ভ ম য পৃথিবীর কক্ষ; বৃ বৃহস্পতির স্থান,
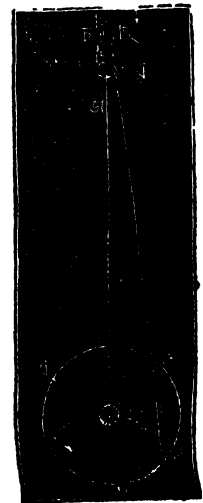
যাহা সূর্য্য হইতে পৃথিবী অপেক্ষা পাঁচ গুণ দূরে অবস্থিতি করে অর্থাৎ প্রায় ২০০ নিযুত লীগ দূরে। বৃহস্পতির প্রথম চন্দ্র আপন গ্রহের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করে যেমন চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে; কিন্তু চন্দ্র অপেক্ষা বৃহস্পতির চন্দ্রের বেগ বেশী এবং সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণের সময় অল্প—উহার কেবল ৪২ ঘণ্টা ২৮ পল ও ৩৫ বিপল অথবা স্থূলরূপে বলিতে গেলে সার্দ্ধ বেয়াল্লিশ ঘণ্টা লাগে। ঐ উপগ্রহের গ্রাস ও পরে মুক্তাবস্থার মধ্যে যে সময় লাগে তাহা দ্বারা ইহা নির্ণীত হইয়াছে। যখন উপগ্রহটী গ্রহের ছায়ার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হয়, তখন গ্রাস বলা যায়; যখন উহা ঐ ছায়া হইতে বাহির হয় এবং সূর্য্যালোক লাভ করিয়া চক্‌চক্ করিতে থাকে তখন তাহার মুক্তাবস্থা। যখন উত্তরায়ণের (Summer Solstice) কিছু পরে পৃথিবী আপন কক্ষের ফ বিন্দুতে আসে তখন ঐ উপগ্রহকে একবার মুক্তাবস্থা পাইতে দেখা যায়; সেই দিন ও লগ্ন সঠিক লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। তার প্রায় ৩ মাস পরে যখন পৃথিবী কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে ব বিন্দুতে আসে তখন আবার একবার ঐরূপ দেখা যায়। ইহা পূর্ব্বলিখিত মুক্তাবস্থা হইতে ৫০ বারের মুক্তাবস্থা; সুতরাং ইহা ৪২ ঘ ২৮ প ৩৫ বিপলের ৫০ গুণ সময়ে ঘটা উচিত কিন্তু এসময়ে উহা ঘটিতে দেখা যায় না, কতক পল বিলম্বে ঘটে—পৃথিবীর অধিক বা অল্প পথ গমনানুসারে ৮ বা ১০ পল বিলম্ব হয়। এই বিলম্বের অন্য কোন কারণ নাই—কেবল উপগ্রহের আলোক ছ হইতে ফ তে আসা অপেক্ষা ছ হইতে ব তে আসিতে অধিক পথ অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়, এই জন্য অধিক বিলম্ব হয় এইমাত্র। এমতে ফ হইতে ব তে আসিতে আলোকের যে সময় লাগে তাহা ব্যক্ত হয়। পৃথিবীর কক্ষ সম্বন্ধে ফ ব একটী জ্যা (cord), যাহার দৈর্ঘ্য লীগ বা কিলোমেটরে জানা আছে। অতএব ইহা হইতে গণনা করিয়া জানা যায় যে ১ এক বিপলে আলোক কতদূর যায়। গণনা দ্বারা দেখা যায় যে আলোক এক বিপলে ৭০০০০ লীগ গমন করে।

এইরূপ দ্রুতবেগে আলোক প্রচারিত হয়। এই সিদ্ধান্ত উক্ত বৎসরের দ্বিতীয়ভাগে আরো সপ্রমাণ হয। দক্ষিণায়নের (Winter solstice) কিছু পরে ম বিন্দুতে উপগ্রহের গ্রহণ সন্দর্শন করিয়া যদি তাহার ৩ মাস পরে য বিন্দুতে পুনর্ব্বার দেখা যায় তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে ৫০ বাবেব গ্রহণ কিছু শীঘ্র দেখা যায়, ৪২ ঘণ্টা ২৮ পল ৩৫ বিপলের ৫০ গুণ বিলম্ব অপেক্ষা করে না, কারণ এবাব আলোকের ম য জ্যা কম আসিতে হয়—ইহার দৈর্ঘ্য ফ ব দৈর্ঘ্যের ন্যায় গণনা দ্বারা জানা যায়। এই সিদ্ধান্তফল উত্তম উত্তম যন্ত্র সহকারে অনেকানেক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

যদিও পৃথিবীর পৃষ্ঠে ৭০ লীগ ব্যবধান যুক্ত এমন দুই স্থান নিরূপণ করা সুকঠিন, অসম্ভব বলিলেই হয়, যেথান হইতে পরস্পরকে দেখা যাইতে পারে; কিন্তু যদি তাঁহা হইত, তাহা হইলে মনোগতি সদৃশ আলোকগতি এক

বিপলের সহস্রাংশ সময়ে উহা উল্লঙ্ঘন করিত। আলোক যদি বৃহস্পতি হইতে পৃথিবীতে তৎক্ষণাৎ পর্য্যটন করিত, তাহা হইলে উপগ্রহের গ্রাস বা বিসর্জ্জন ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাইতাম। কিন্তু রয়মর দেখিলেন যে, যখন বৃহস্পতি হইতে পৃথিবী দূরতম অংশে থাকে, তখন ঐ ঘটনা ১৬ পল ৩৬ বিপল বিলম্বে দৃষ্ট হয়। এখন চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে যে পৃথিবী যখন সূর্য্যের সমান রেখায় এবং সূর্য্যের যে দিকে বৃহস্পতি সেই দিকে থাকে তখন বৃহস্পতিব নিকটতম স্থানে থাকে। আর তখনি পৃথিবী দূরতম দেশে থাকে যখন উভয়গ্রহ সূর্য্যেব সমরেখায় কিন্তু পরস্পর সূর্য্যের দুই বিপরীত দিকে থাকে, এবং এমতস্থলে ইহাদের দূবতার অন্তব পৃথিবী কক্ষের ব্যাস। এই হেতু রয়মর বিতর্ক কবিলেন, আলোকরশ্মি পৃথিবীব কক্ষের ব্যাস পার হইতে ১৬ পল ৩৬ বিপল লয়। ইহা হইতে গণনা করা যাইতে পারে, আলোকের বেগ প্রতি বিপলে ১৮৬০০০ মাইল।

"সাক্ষাৎ পরীক্ষা দ্বাবাও আলোকের বেগ নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ফিজোর যন্ত্র অনায়াসে বোধগম্য হইবে। মনে কর, একটা খাঁজকাটা চাকা আছে, তাহাব দুইটি দাঁতের মধ্যস্থ ফাঁক দিয়া আলোককিরণ প্রেরণ কবা গেল। উহার কতকদূবে একটা আয়না আছে। তাহার উপর ঐ আলোক এমতভাবে ফেলা গেল যে উহা প্রতিফলিত হইয়া ঠিক যে পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই দুই দাঁতের ফাঁক দিয়াই আবার প্রবেশ করিল। এখন যদি ঐ দন্তুর চাকাকে অত্যন্ত বেগে ঘোরান যায় তাহা হইলে ঐ আলোককিরণ আয়না হইতে যখন ফিরিয়া আসিবে, পরবর্ত্তী দাঁতের দ্বাবা প্রতিরুদ্ধ হইয়া ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিতে পারে না।

"এইরূপ ঘটিবে কি না, তাহা আলোক কিরণ দাঁতের ফাঁকের মধ্য দিয়া আয়নাতে যাইবার ও ফিরিয়া আসিবার সময়েব উপর এবং ঐ চাকাকে ঘুবাইবার বেগের উপর নির্ভর করে। ফিজো এমন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন যে প্রত্যাবৃত্ত আলোককিরণকে প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিলেন এবং ঐ দন্তুরং চক্রভ্রমেব বেগ অবগত থাকাতে তিনি চাকার ফাঁকের মধ্য হইতে আলোককিরণের আয়নায় গিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় গণনা করিতে পারিয়াছিলেন। এবং এইরূপে তিনি আলোকের বেগ পরিমাণ করিয়াছিলেন।" *

সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আসিতে আলোকের ৮ পল ১৩ বিপল লাগে। অতএব ৮ পল ১৩ বিপল পূর্ব্বে সূর্য্য যেখানে ছিল সেইখানে আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই।

সূর্য্য হইতে আলোককিরণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রহে পৌঁছিতে ভিন্ন ভিন্ন সময় লাগে। বৃহস্পতিতে যাইতে ৮ পল ১৩ বিপলের ৫ গুণ সময় লাগে; শনিতে যাইতে ৯ গুণ, এবং বরুণে যাইতে ৩০ গুণ সময় লাগে।

সূর্য্য হইতে যত দূর, পৃথিবী হইতে তারাগণের দূবতা তদপেক্ষা দুই লক্ষ

* Balfour Stewart's Elementary Physics.

গুণেরও অধিক হওয়াতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম ত বা হইতে আলোক আমাদিগের নিকট আসিতে ৮ পল ১৩ বিপলের ২ লক্ষ গুণেরও অধিক সময় লাগে অর্থাৎ এক হাজার এক শত একচল্লিশ দিনের অথবা ৩ বৎসর ৪৫ দিনেরও অধিক সময় লাগে।

ইহা অত্যন্ত সম্ভবপর যে, এমন অনেক দৃশ্যমান তারা আছে যাহারা এই ন্যূনকল্প সীমার বহুশত গুণ দূরে অবস্থিত আছে এবং সুতরাং তাহাদিগের আলোক পৃথিবীস্থ দর্শকদিগের গোচর হইতে বহু শতাব্দীকাল অতিবাহিত হয়। এমতে ঐ সকল দূর দূরস্থিত বৃহদায়তন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্য পরিবর্ত্তিত, উৎপাতগ্রস্ত বা একেবারে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইতে পারে, তথাপি আমরা পরে শতাব্দা শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বর্ত্তমান বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিব।

১০। সৌরজগতের স্থূলতত্ত্ব।

নিম্নলিখিত তক্তিতে সৌরজগতের স্থূলতত্ত্বগুলি সঙ্কলিত হইল; ইহা প্রাকৃতিক গবেষণাতে অনেক সময় প্রয়োজনে আইসে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের বিষয় এই মাত্র বলিলেই প্রচুর হইবে যে, আজ পর্য্যন্ত তাহাদের ন্যূনাধিক ১০০ সংখ্যা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গ্রহের নাম।	সূর্য্য হইতে মাধ্যমিক দূরতা।	প্রদক্ষিণ কাল।	ব্যাস।	আয়তন।	রাশি।	স্থূলতা।
বুধ (Mercury)	০,৩৯	৮৭,৯৭	০,৩৯	০,৬৯	০,১৮	১,০০
শুক্র (Venus)	০,৭২	২২৪,৭০	০,৯৮	০,৯৬	০,৮০	০,৯২
পৃথিবী (Earth)	১,০০	৩৬৫,২৬	১,০০	১,০০	১,০০	১,০০
মঙ্গল (Mars)	১,৫২	৬৮৬,৯৮	০,৫২	০,১৪	০,১৩	০,৯৫
বৃহস্পতি (Jupiter)	৫,২০	৪৩৩২,৫৮	১১,২২	১৪১৪,২০	৩১৮,০০	০,২৪
শনি (Saturn)	৯,৫৪	১০৭৫৯,২২	৯,০২	৭৩৪,৮০	১০১,৪১	০,১৪
উরেনস (Uranus)	১৯,১৮	৩০৬৮৬,৮২	৪,৩৪	৮২,০০	১৪,৮০	০,১৮
বরুণ (Neptune)	৩০,০৪	৬০১২৭,০	৪,৮০ ?	১১১ ?	১৯,৮০	০,১৮

পৃথিবী

বিষুবমণ্ডলের অক্ষ ৬৩৭৬৯৮৪ মেটর, (Environ ?) পরিধির আয়তন প্রায় ৬৩৭৭ কিলোমেটর।
মেরুর অক্ষ ৬৩৫৬৩২৪ মেটর, " " ৬৩৫৬ " "
অন্তর ২০৬৬০ " ; " " ২১ " "
মাধ্যমিক অক্ষ পরিমাণ ৬৩৬৬৭৪৫ " " মাধ্যমিক আয়তন ৬৩৬৭ " "
(Mean radius)

সূর্য্য

ব্যাস ১১২ পার্থিব ব্যাস; আয়তন, পৃথিবী অপেক্ষা ১৪০৭১২৪ গুণ বা প্রায় ১৫ লক্ষ বা দেড় মিলিয়ন গুণ। রাশি, পৃথিবী অপেক্ষা ৩৫৪৯৪৬ গুণ বা ৩৫৫০০০ গুণ; স্থূলতা, পৃথিবীর সম্বন্ধে ০,২৫ বা পৃথিবীর চার ভাগের একভাগ।

চন্দ্র

ব্যাস, পৃথিবীর ব্যাসের ০,২৬৪ গুণ বা ৩৩৫০ কিলোমেটর; আয়তন, পৃথিবীর ০,০১৮ গুণ। রাশি, পৃথিবীর ৮১ গুণ; স্থূলতা, পৃথিবীর ০,৬২ গুণ।

অভিব্যক্তিবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস *।

আজকাল পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মনুষ্য প্রভৃতি সকল প্রকার জীবজন্তুর উৎপত্তি লইয়া কত বাদানুবাদ চলিয়াছে। বুদ্বুদের ন্যায় কত উপপত্তি উঠিতেছে আর যাইতেছে। এই সকল উপপত্তির মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ চার্লস্ ডার্ব্বিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত অভিব্যক্তিবাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছে—সিদ্ধান্তকল্প করিয়া গৃহীত হইয়াছে।

অভিব্যক্তিবাদ কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বৃক্ষ বীজ হইতে প্রকাশিত হইল, ইহার নাম অভিব্যক্তি; ডিম্ব হইতে পক্ষী নির্গত হইলে, ইহার নাম অভিব্যক্তি; বরফ হইতে জল হইল, জল হইতে ধূম হইল; ধূম হইতে জল হইল, জল হইতে বরফ হইল—এই সমস্তকে আমরা অভিব্যক্তি বলিতে পারি। যে তত্ত্ব এইরূপ অভিব্যক্তি প্রণালী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রকাশ করিতে পারা যায় তাহার নাম অভিব্যক্তিবাদ হইতে পারে। কিন্তু আজকাল অভিব্যক্তিবাদ একটা সঙ্কীর্ণ শব্দ হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমতঃ মনুষ্যের ভিন্ন শ্রেণীর জীবজন্তু হইতে উৎপত্তি, দ্বিতীয়তঃ প্রাণপঙ্ক হইতে জীবজন্তুর উৎপত্তি এবং তৃতীয়তঃ জড় সৃষ্টিবাষ্প হইতে প্রাণের উৎপত্তি, এই তিনটা বিষয় অভিব্যক্তিবাদের সীমার মধ্যে পতিত হয়। কিন্তু আজকাল তৃতীয় বিষয়টী পরীক্ষায় ভ্রান্ত স্থির হইয়াছে, (যদিও কেহ কেহ তাহা অস্বীকার করেন); সুতরাং প্রথম দুইটীকেই অভিব্যক্তিবাদের প্রকৃত বিষয় বলিয়া ধরিতে হইবে।

ভারতের ঋষিরা স্বীয় অন্তরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কত মহান্ সত্য সকল আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহির্জ্জগৎ পর্য্যালোচনা করিয়া ঈশ্বরের কত আশ্চর্য্য সত্য নিয়ম সকল আবিষ্কার করিয়া জগতকে চমকিত করিয়া দিয়াছেন। জেম্স্ ওয়াট্ বাষ্পশক্তির আবিষ্কার করিয়া জগতের কি উপকারই করিয়াছেন—দূরতম দেশসমূহকে অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করিতেছেন। জর্ম্মানি দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ কেপ্‌লার গ্রহগণের গতিনির্ণায়ক নিয়ম সকল আবিষ্কার করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যার কত না উন্নতি সাধন করিয়াছেন। মার্কিন এডিসন সাহেব স্বনলিপি (Phonograph) যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া কি আশ্চর্য্য কাণ্ডই সংসাধিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেককে যেমন পদার্থবিদ্যা বিভাগে দেখিলাম, সেইরূপ আবার লামার্ক, ডার্বিন, ওয়ালেস্ প্রভৃতি অনেককে জীবতত্ত্ববিভাগে শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাই। জীবগণের, বিশেষতঃ মনুষ্যের, উৎপত্তি কি প্রকারে হইল, এই বিষয়টী বর্ত্তমানকালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। এই সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশ প্রাচীন ও পুরাতন প্রাণিতত্ত্ববিৎ

* অভিব্যক্তিবাদের পরিবর্ত্তে বিবর্ত্তবাদ শব্দ প্রয়োগ করিলে ভাল হয়, কেননা এ কথা সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত দেখা যায় এবং ইহার অনুবাদ Evolution ভিন্ন আর কিছুই নহে। সং—

পণ্ডিতগণ বলেন যে ঈশ্বর প্রত্যেক জাতীয় জীবের আদিপুরুষকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নব্য প্রাণিবেত্তাগণ বলেন যে ইহা বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিপ্রকরণ নহে। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি-প্রকরণ বহুকে একেতে লইয়া যাইবে এবং সেই বহুকে একেতে লইয়া যাইবার মধ্যে শৃঙ্খলা প্রদর্শিত হইবে। তাই নব্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, কুকুরই বল, বানরই বল, আর মনুষ্যই বল, যত প্রকার জীবজন্তু দেখি-তেছি, ইহারা সকলেই প্রথমে একই আদি প্রাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ক্রমে ঘটনাবশতঃ বা অবস্থা-বৈগুণ্যে, সেই আদি প্রাণের কতকগুলি বংশধর কুকুরে আসিয়া পৌছিয়াছে, কতকগুলি বা বানরে আসিয়াছে, আবার কতক-গুলি বা মনুষ্যে আসিয়াও পৌছিয়াছে। এই উপপত্তির (Theory) আভাস যদিও কয়েকজন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ওযালেস্‌ও ডার্ব্বিন স্বীয় অপরিমেয় অধ্যবসায়-ফলে এই উপপত্তিকে অনেক পরিমাণে সপ্রমাণ করিয়া প্রাণিবেত্তাদিগের শিরো-ভূষণ হইয়া পড়িয়াছেন। ডার্ব্বিনের নাম এবং তাঁহার পরীক্ষা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত অভিব্যক্তিবাদ (Theory of Evolution) পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে বিশেষতঃ জর্ম্মনি প্রদেশে আজকাল নিতান্তই "ঘরের কথা" হইয়া পড়িয়াছে। ১

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কয়েকজন প্রাণিবেত্তা পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিবাদের পূর্ব্বাভাস দিয়াছিলেন। এখন তাহাদের নিকট এই পূর্ব্বাভাস পাওয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি প্রাণিবেত্তা লামার্ক খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ-কালে (১৮০১ খৃঃ অঃ) এই সম্বন্ধে তাঁহাব মতামত সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত এই যে, প্রত্যেক জাতীয় জীবজন্তু অপর কোন জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে অঙ্গের ব্যবহার করা যায় সেই অঙ্গ পরিপুষ্ট ও দৃঢ় হয় এবং অব্যবহৃত অঙ্গ ক্রমে শক্তিহীন ও অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, এই একটী সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম আছে। লামার্ক বলেন যে এই নিয়মের বলেই জীবজন্তু আহারের চেষ্টা, অবস্থাবৈগুণ্য প্রভৃতি নানা ঘটনা বশতঃ নিজেদের উন্নতি কল্পে কার্য্য কবিতে কবিতে এক জাতি হইতে অপর জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই সম্পর্কে তিনি যে প্রথম প্রচার করিয়া ছেন যেমন অচেতন পদার্থে তেমনি চেতন পদার্থেও পরিবর্ত্তন আকাশ হইতে পড়ে না, কিন্তু তাহা নিয়মেব ফল, এই সত্যই তাঁহার নাম বিজ্ঞানজগতে চিরস্মরণীয় রাখিবে। উন্নতিকল্পে কার্য্য করিতে করিতে যদি প্রত্যেক জাতীয় জীবজন্তু উন্নত আকার ধারণ করিয়া অপর জাতিতেই পরিণত হয়, তবে এখনও সেই মূলজাতি জন্মে কিরূপে, এই একটী প্রশ্ন আসে। দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছে। বিড়াল জাতি উন্নত হইয়া ব্যাঘ্র হইল; কিন্তু এখনও তবে বিড়াল জন্মগ্রহণ করে কেন? মূলজাতির জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে লামার্ক তেমন সদু-ত্তর দিতে পারেন নাই। যাই হোক্, লামার্কের যুক্তিপ্রমাণসমূহ তখনকার

১ শ্রীযুক্ত অসকার স্মিড্‌ট্ কৃত "ডার্ব্বিনিসম" পুস্তকের ভূমিকা দেখ।

বৈজ্ঞানিকদিগের বধির কর্ণে প্রবেশ করিতে পারিল না। তাঁহারা সাধারণতঃ বিভিন্ন জাতির উৎপত্তিকে অপ্রমাণিত অথবা অসম্ভব সম্পাদ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু তথাপি দুই একজন করিয়া অসম্পূর্ণ প্রমাণাদির কারণে জীবতত্ত্বে অভিব্যক্তিবাদ অসম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতে লাগিলেন। লামার্কের পরে অনেকদিন পর্য্যন্ত অন্য কাহারও এতদ্বিষয়ক পুস্তকাদি ততদূর মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। তাহার কারণ, জিয়ফ্রেসেণ্ট হিলেয়র, ডীন হার্বার্ট, অধ্যাপক গ্রাণ্ট, বনবুক প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ হইলেও এবং তাঁহারা কতক অংশে অভিব্যক্তিবাদ সমর্থন করিলেও, কি নিয়মে যে জীবদেহের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রায় নীরব ছিলেন। অবশেষে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে "ভেস্‌টিজেস্ অফ্ ক্রিয়েশন" (সৃষ্টি-পরিচয়) নামক একখানি গ্রন্থ রচয়িতার নামবিরহিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এখন তাহা রবার্ট চেম্বার্স কর্ত্তৃক প্রণীত বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। সেই সময় এই পুস্তকখানির অত্যন্ত প্রচার হইয়াছিল। ইহাতেও বিশেষভাবে কিছুই উল্লিখিত হয় নাই যে কেমন করিয়া প্রত্যেক জাতি উন্নত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণভাবে বলা আছে যে কতকগুলি অজ্ঞাত নিয়মে ও অবস্থাচক্রে জীবজন্তু ও উদ্ভিদ্ সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই পুস্তকের বহুল প্রচারে সাধারণের মন হইতে অনেক কুসংস্কার দূর হইয়াছিল এবং তাহাদের মনোযোগ অভিব্যক্তিবাদের দিকে আকৃষ্ট হওয়াতে এই মত উত্তরকালে গৃহীত হইবার পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছিল।

ডার্বিন্ ও ওয়ালেসের পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকদিগের অধিকাংশেরই এই মত ছিল যে প্রত্যেক জাতীয় প্রত্যেক জীবজন্তু ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়াছে। বিড়াল যতগুলি আছে, তাহাদের প্রত্যেকটী কোন নিয়মে নহে, ঈশ্বর স্ব-ইচ্ছাক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহাদের আর পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই। কোন বিড়াল যে ধূসর তাহাও ঈশ্বর স্বহস্তে অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে রচনা করিয়াছেন; কোন বিড়াল যে শ্বেত, তাহাও ঈশ্বর স্বহস্তেই রচনা করিয়াছেন। এইরূপ মতকে আমরা বিসৃষ্টিবাদ (Theory of special creation) * বলিব। ডার্বিন এবং ওয়ালেসের সম্মুখে দুইটী বিষয় ধরিবার ছিল—এক, বিসৃষ্টিবাদ ঠিক নহে প্রমাণ করা; দ্বিতীয়, জীবজন্তুর অভিব্যক্তিই বা কি বিশেষ বিশেষ নিয়মে হইয়াছে তাহা আবিষ্কার করা। ইহাঁরা এই বিষয়ে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন যে মনে হয় যেন অভিব্যক্তিবাদ সপ্রমাণ করিতেই ইহাঁদের জন্মগ্রহণ। ডার্বিন এবং ওয়ালেস উভয়ে প্রায় একই সময়ে পৃথক্‌ভাবে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। অভিব্যক্তিবাদের প্রকৃত আবিষ্কর্ত্তা বলিতে গেলে উভয়কেই বলিতে হয়। ইহাঁদের অনুসন্ধানের ফলে, সকল প্রকার জীবজন্তু যে পরস্পর হইতে এবং দূরত ও মূলত যে এক আদি

* বিসৃষ্টি=বি+সৃষ্টি=বিশেষ বা ব্যষ্টি ভাবে সৃষ্টি এই কারণে প্রত্যেক পদার্থকে পৃথক্‌ভাবে সৃষ্টি করাকে আমরা বিসৃষ্টি বলিলাম।

জীব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আর কেহ বড় অস্বীকার করিতে পারেন না। এখন, সংক্ষেপে ডার্বিনের অভিব্যক্তিবাদ কি তাহা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি। অভিব্যক্তিবাদ দুইটী প্রধান নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত—(১) জন্তুদিগের গুণোত্তর পরিমাণে (Geometrical Progression) † বৃদ্ধি; (২) সন্ততিগণ পিতামাতার অনেকটা অনুরূপ হইলেও কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইয়া যায়, কখনই একেবারে সমান হয় না। প্রথম নিয়মের ফলে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বংশ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনসংগ্রামও উপস্থিত হইবে। ধাড়ী জন্তু দুইটী মাত্র, মর্দা ও মাদী; কিন্তু তাহাদের ছানা সংখ্যায় ধাড়ীদের চেয়ে অনেক বেশী হয়। এই রূপ হইলেও পৃথিবীতে মোটের উপর জীবজন্তুর সংখ্যা যাহা আছে তদপেক্ষা অধিকতর হইতে পারে না—কারণ আহার সংকুলন চাই, স্থান সংকুলন চাই। জীবজন্তু বেশী হইতেছে বলিয়া পৃথিবীর স্থানও বাড়িতেছে না, উৎপাদিকাশক্তিও বৃদ্ধি হইতেছে না। মানবের চেষ্টা প্রভৃতিতে উৎপাদিকাশক্তি যে টুকু বাড়িতেছে, জীববৃদ্ধির তুলনায় তাহা অতি সামান্য বলিয়া নধর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। এই জীবনসংগ্রাম বশত গড়ে প্রতি বৎসর যত জীব জন্মগ্রহণ করে তত জীব প্রাণত্যাগ করে বা নিহত হয়। যে আহার দুইটী প্রাণীর ছিল, এখন দশ প্রাণী হওয়াতে তন্মধ্যে যে সক্ষম, সেই অপরের আহার আপনি খাইয়া তাহাদিগকে উপবাসে রাখিল। ইহার উপর শীতগ্রীষ্ম, ঝঞ্ঝাবৃষ্টি, অগ্নি বন্যা প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক উপদ্রব আছে। এইপ্রকারে জীবগণের মধ্যে কে বাচিবে কে মরিবে, এই এক কঠোর জীবনসংগ্রাম চলিতেছে। এই কঠোর জীবনসংগ্রামে প্রতি পাঁচটার একটা, বা প্রতি দশটায় একটা এবং অনেক সময়ে প্রতি একশতে, এমন কি, এক সহস্রেও একটী মাত্র বাঁচিয়া যায়।

হাজার করা একটা কি দুইটা কীট-পতঙ্গ বাঁচিল, ইহাতে সাধারণ মানবের চক্ষে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদিগের সূক্ষ্মদৃষ্টি তাহার কারণা-নুসন্ধানে ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। তাঁহারা কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন যে জাত জীবদিগের কতকগুলি অপরাপেক্ষা বলবান্, কতকগুলি বা বেগবান্, কতকগুলি বা শ্রমসহিষ্ণু, কতকগুলি বা বুদ্ধিমান্। তাঁহারা দেখিলেন যে যে গুলি যোগ্যতম, সেই-গুলিই বাঁচিয়া যায়, অন্যগুলি পশ্চাতে পড়িয়া থাকে ও মরিয়া যায়। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে কর কোন ক্ষেত্রে ধান্য চারা রোপণ করা হইয়াছে। স্থানগুণে কতকগুলি সতেজ হইয়া অপরগুলি অপেক্ষা সমুন্নত হইয়া উঠিল। এখন যদি সহসা বন্যা আসিয়া সমুদয় ডুবাইতে চেষ্টা করে কিন্তু সতেজ ধান্যচারায় নাগাল না পায়, তবে অপর-গুলি জলে ডুবিয়া পচিয়া গেল কিন্তু সেই সতেজ চারাগুলি উপযুক্ত জল পাইয়া আরও সতেজ হইয়া উঠিল।

† ২, ৪, ৮, ১৬, এইরূপ সাধারণ সংখ্যা দ্বারা গুণিত বৃদ্ধিকে গুণোত্তর বৃদ্ধি বলে। ৩, ৯, ২৭ অথবা ১, ৪, ১৬, ৬৪ ইত্যাদি অঙ্ককে গুণোত্তর অঙ্ক বলা যায়।

উদ্ভিদগণের অত্যল্প বিভিন্নতার উপরেও তাহাদের জীবনমরণ নির্ভর করে। এই সকল হইতে আমরা জগতে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন এই নিয়মেরই প্রাধান্য উপলব্ধি করি। অভিব্যক্তিবাদের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা করিলাম।

অভিব্যক্তিবাদের দ্বিতীয় মূল ভিত্তি পূর্ব্বে যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাকে বংশানুক্রম প্রণালী বলিতে পারি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ছানাগুলি ঠিক বাপ মায়ের মত হয় না, কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হয়—ইহা কেবল আকৃতিতে নহে গুণেও বটে। সুতরাং যদি ছানাদের মধ্যে যোগ্যতমগুলিই বাঁচিয়া গেল, তখন তাহাদের পরস্পরের সম্মিলনে আবার যে ছানা হইবে, পূর্ব্বের যোগ্যতম জীবগণ যে বিশেষ বিশেষ গুণবশত যোগ্যতম হইয়াছিল সেই সকল গুণ তাহাদের ছানাদের মধ্যে আসিবার অধিক সম্ভাবনা—তবে সেই সম্ভাবনা কতকগুলি নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ। এইরূপে যোগ্যতম হইবার আকৃতি প্রকৃতি লাভ করিতে করিতে অভিব্যক্তিবাদিগণ বলেন আদিজীবের বংশধরগণ ক্রমিক উন্নতিলাভ করিয়া মনুষ্যে আসিয়া পৌছিয়াছে। এখনও যাহারা নিম্ন শ্রেণীতে আছে, তাহারাও কালে মনুষ্য হইবে এবং মানববংশধরগণ কালে দেবশরীর ও দেবপ্রকৃতি লাভ করিয়া ঈশ্বরের অসীম মহিমা অধিকতর ঘোষণা করিতে থাকিবে।*

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* ডার্বিন এবং ওয়ালেস প্রদত্ত অভিব্যক্তিবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সাহায্যে লিখিত।

মনন।

কথাতিপ্রিয়তা।

কথা মানবজীবনের একটী উপাদেয় ও আবশ্যকীয় বিষয়। ইহা দ্বারা মানবের ভাবসমূহ পরিস্ফুটতা লাভ করে। এই হেতু কথাকে আমরা দার্শনিক স্ফোট শব্দেও অভিহিত করিতে পারি—পাণিনি দর্শনে বলে "স্ফুটাতে ব্যজতে অনৈরিতি স্ফোটঃ।" বর্ণ দ্বারা অর্থ স্ফুটিত অর্থাৎ অভিব্যক্ত হয় বলিয়াই ইহার এক নাম স্ফোট। এই স্ফোটই প্রকৃত ভাবব্যক্তি অর্থাৎ প্রকৃত কথা। শুধু শব্দ কথা নয় অর্থযুক্ত হইলেই বর্ণটী—শব্দটী যথার্থ কথা হইল। অর্থাত্মক বর্ণই প্রকৃতপক্ষে স্ফোট। ইহাকে আমরা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে গেলে expression কথাটী যেন ঠিক ব্যবহার্য্য হয়; (আমার বোধ হয় expressionএর ভাব ব্যক্তি অভিব্যক্তি এইরূপ অনুবাদ সমূহ না করিয়া যদি স্ফোট বা স্ফোটন, বহিস্ফোট বহিস্ফোটন এইরূপ অনুবাদ করি তাহা হইলে expressionয়ের ঠিক প্রাণটী যেন বজায় থাকে।

এই স্ফোটের মূল প্রাণ ঈশ্বর; তিনি তাঁহার জীবদিগকে দয়া করিয়া ইহা না দিলে তাহারা অস্ফুট হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া থাকিত। ইহাদ্বারা মনুষ্য প্রকৃত জীবন লাভ করতঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে॥ মনুষ্য তাই ইহার ভাবকে দিব্য চক্ষে না দেখিয়া থাকিতে পারেন নাই। আমাদের আর্য্য শাস্ত্রকারগণ এই কল্যাণদায়ক স্ফোটকে নিরবয়ব নিত্যশব্দ না বলিয়া—সেই আদিকারণত্ব দান না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন "স্ফোটাখ্যো নিরবয়বে নিত্যশব্দো ব্রহ্মৈবেতি।" বাইবেল শাস্ত্রেও অনেকটা এতদনুরূপ ধ্বনি আছে "In the beginning was the word of God and the word was God।

স্ফোটকে আমরা যেমন নিত্যশব্দ সেইরূপ আবার কথামূল বা মূল কথাও বলিতে পারি। এই মূল কথার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উপনিষদের ঋষি "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" অন্য বৃথা বাক্য ত্যাগ কর বলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা কালরূপ সতত সকল বিষয়ের মধ্যে হংসের ন্যায়, মূল কথাটী শুনিতে চাইতেন—মূল কথাটী বলিতে চাহিতেন বাক্যবাহুল্য তাঁহাদের ভাল লাগিত না। ইহা সঙ্গত বটে; যাহার হৃদয় মূল কথা শ্রবণে ব্যস্ত সে আপনা হইতেই কথাতিপ্রিয়তাকে পরিত্যাগ করিতে চায়; কহিবার কালে তাহার কথা সতত সেই একায়ন থাকাতে অসংগতি ও অতিভাব হইতে সাবধান থাকে, সতত ভয় থাকে পাছে কথার অতিস্রোতের বন্যা আসিয়া তাহাকে মোহময় করিয়া ফেলে। তখন সে অসার ফেলিয়া সার কথার ব্যবহারে যে কি সুখ তাহা বুঝিতে পারে; বুঝিতে পারে যে স্ফোটের ভাব কিরূপ পরিষ্কার ও সহজ এবং তাহা বাক্যজাল-জনিত অস্ফুটতার আড়ম্বরের বিরোধী। এই এক স্ফোট কথার সাহায্যেই বুঝিতে পারি যে আমাদের দেশে প্রাচীন প্রাজ্ঞেরা বাক্যের কি সার মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা বাক্‌সংযম অভ্যাস করিয়া ও তাহার আদেশ দিয়া কথা কোলাহল হইতে নিস্তার-লাভে প্রয়াস পাইতেন। রাজর্ষি জনক মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন; তিনি তাঁহার সাধনার পাছে ব্যাঘাত হয় এই কারণে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বাগ্বিস্তারও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পুনশ্চ আমাদের শাস্ত্রসমূহের সূত্র শ্লোক ও মন্ত্রাদি দ্বারা বুঝা যায় যে ভারতের পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা কথাডম্বর বড় ভালবাসিতেন না। এতৎ সম্বন্ধে রাশি রাশি দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। একটী দৃষ্টান্ত দেখ এই ওঁ কথার মধ্যে প্রাচীন ঋষিরা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ার্থকে কেমন গাঁথিয়া গিয়াছেন। একটী স্বরবর্ণে তাঁহারা ঈশ্বরকে কেমন আশ্চর্য্যরূপে ধ্বনিত করিয়াছেন।

আমাদের সংস্কৃত বৈয়াকরণিকের ন্যায় অমন অল্প কথায় সংক্ষেপে ভাষার সমূহ ভাব ব্যক্ত করণে কোন্ বৈয়াকরণিক চেষ্টা করিয়াছেন? সংক্ষিপ্তভাবের জন্য আমাদের বোপদেব গোস্বামীর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ কি লোকজনকে মুগ্ধ করে না? বোপদেব তাঁহার ব্যাকরণে অত্যুক্তি যথাসাধ্য পরিহার করিয়া গিয়াছেন। এক কথা একবার

কোথাও বলিয়া আসিলে আর তাহা পুনরায় ব্যবহার করিতে না হয় তজ্জন্য উহ্য সূত্র অনুবৃত্তি সংজ্ঞাদির সহায়তা লইতেন। অল্প কথায় ব্যাকরণের বিস্তর কথা বুঝাইতে তাঁহার তুল্য কোন বৈয়াকরণিক সমর্থ হয়েন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার এক আশ্চর্য্য মৌলিকতা দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপে সংস্কৃত শাস্ত্রে দেখা যায় একটী অক্ষরে একটী বর্ণে একটী শব্দে কত সংক্ষেপে তাঁহারা অনেক ভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের মহা বুদ্ধি মহা সভ্যতা প্রকাশ পায়। যত জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, যত সভ্যতা বৃদ্ধি হইবে ততই লোকের মন অল্পের মধ্যে ভূমাকে আয়ত্ত করিতে চায়, বৃথা আড়ম্বর চায় না।

জ্ঞানী মাত্রেই বেশী কথা কহিতে চাহেন না। স্বল্পকথায় প্রকৃতরূপে কাজ সারিতে চাহেন। কথাতিপ্রিয় ব্যক্তিদিগের প্রতি সকল জাতিরই সাধারণতঃ ঘৃণা দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজীতে একটী জ্ঞানীবাক্য আছে তাহাতে অতিকথাপ্রিয়দিগকে ভাঙ্গা কুঁজার সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে—বলা হইয়াছে "Great talkers are like broken pitchers : everything runs out of them."

বেশী যাহারা কথা কহে তাহারা বোঝে কম। তাহাদের অন্তর ফাঁপা যেন শূন্যবৎ। ইংরাজীর এ প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য বোধ হয় সকলেই জানেন যে "Empty vessel sounds much."—একদিন গ্রীসদেশে একটী ভোজে এক ব্যক্তি বড় বেশী কথা কহিতেছিল; সেই ভোজে গ্রীসীয় বাগ্মিবর ডিমস্থিনিস উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তিকে কহিলেন "তুমি যদি এত অধিক বিষয় বুঝিতে, তবে এত অধিক কথা কহিতে না।" গ্রীকদিগের ন্যায় রোমীয়েরাও কথাতিপ্রিয়তার অপকারিতা বুঝিতেন; তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন "Vir sapit panca loquitm" সেই মনুষ্য জ্ঞানী যিনি অল্প কথা কহেন।

এ সংসারে লোকে যত অধিক বিষয় বুঝিবে তত কম কথা কহিবে, যত কম কথা কহিবে তত তাহাদের জন্য কম ব্যবস্থারও প্রয়োজন হইবে। আজকাল দেখ আদালতে লোকে সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কত কথাই বৃদ্ধি করে তাই তাহাদের জন্য আদালতে আইন ব্যবস্থারও আধিক্য হইয়া উঠিয়াছে। স্পার্টা দেশের রাজা কেরিলস্‌কে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে লাইকর্গস কি জন্য এত অল্প ব্যবস্থা করেন? তাহাতে রাজা উত্তরে কহেন "যাহারা অল্প কথা কহে তাহাদের অনেক ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই।"

কথাতিশয্যে লাভ? তাহাতে আমাদের অন্তরস্থ বাক্যবায়ুর অপব্যয় করা হয় মাত্র। কারণ কথা আমাদের ভাব প্রকাশের শব্দময় অনুষ্ঠান—Swift বলেন "words are lent winds"—এই কথার অতি মায়া যাঁহারা এড়াইতে পারেন তাঁহাদের ভাবের গভীরতা ও চিন্তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, এবং তাহাতে কাজ প্রকৃত বেশী হয়। যেখানে যত কথা অধিক, সেখানে তত কাজ কম ইহার দৃষ্টান্ত আমরা প্রকৃতি রাজ্য হইতে বহুল দেখাইতে পারি। দেখ বর্ষার মেঘে

কেমন অবিশ্রান্ত জলধারা স্বল্প মৃদুগর্জ্জনে পতিত হইতে আরম্ভ হয়; আর শরতের মেঘ, প্রভাতের মেঘডম্বরে গর্জ্জনই বেশী, জল কম হয়। আর ইহাও বিজ্ঞান সঙ্গত বাক্য যে মেঘে বেশী গর্জ্জন আরম্ভ হইলে তাহার অর্থ শীঘ্রই আকাশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে, তাহাতে জলীয় বাষ্পের গভীরতা নাই।—ভ্রমর ও মধুমক্ষিকার মধ্যে প্রভেদ দেখ—ভ্রমর সারাদিন গুণ্‌গুণ্ করিয়া বেড়ায় তাহা হইতে কোনরূপ জীবের উপকারার্থে কার্য্যের প্রত্যাশা করা বৃথা; কিন্তু মধুমক্ষিকা তাহার মত অত গুণ্‌গুণ্ করিয়া বেড়ায় না;-সে স্বল্প গুঞ্জনে আপন অভীষ্ট সিদ্ধির দিকে যত্নবান হয়, প্রকাণ্ড মধুচক্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে মধুসঞ্চয় করিয়া সকলের কত উপকার সাধন করে।

সর্ব্বশেষে একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি। দেখ ভগবান কিরূপ স্বল্প সূক্ষ্ম সংক্ষিপ্ত অনাহত ভাষায় সাধককে, তাঁহার ভক্তকে অসীম কথা বুঝাইয়া দেন!—সে তাহা বুঝিতে পারিয়া কৃতার্থ হয়।

ভক্ত।

ভক্ত অর্থাৎ বিভক্ত অর্থাৎ সীমাবদ্ধ। জগদীশ্বরের ভক্ত সন্তান কাহারা? যাঁহারা নিজেকে অসীম বলিয়া—অহং ব্রহ্ম বলিয়া অহঙ্কার না করিয়া সসীম করিতে চাহেন। যাঁহারা আপনাদিগকে সসীম বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে অসীমের ভক্ত অর্থাৎ অসীমের বিভক্ত অর্থাৎ সৃষ্ট কিছু। এইরূপ, অসীমের ভক্ত না হইলে কিছু কাজ করা যায় না! আপনারাই যদি অসীম হইয়া বসি তাহা হইলে আমাদিগের কাজকর্ম্ম কিছুই থাকে না। সৃষ্টি লোপ হইয়া যায়, সঙ্গে আমরাও লুপ্ত হইয়া পড়ি, আমাদের অস্তিত্ব আর থাকে না। অসীম যাহা রহিয়াছে তাহা যেমন আছে তাহাতো আছেই, শুদ্ধ আমরা নিজেদের লুপ্ত করিয়া দিলাম মাত্র। সেই জন্য ভক্ত হইতে চাহিলে আমাদের নিজেকে লুপ্ত করিয়া দিলে চলিবে না, নিজেকে ভালরূপে রক্ষা করিতে হইবে।—রক্ষা করিয়া অসীমে অগ্রসর হইতে হইবে। অন্তরে অসীমকে রক্ষা করিতে গেলেই আত্মরক্ষা চাই। এই অসীমের কোলে যিনি যতটা আত্মরক্ষণে সমর্থ হইয়াছেন তিনি ততটা অসীমের ভক্ত; তাঁহার অন্তরে পরমাত্ম রক্ষণে অসমর্থ। ভক্তের লক্ষণ লোপ করা নয় কিন্তু রক্ষা করা।

শ্রীহিতেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন-চরিত।

(প্রত্যুত্তর।)

বিগত চৈত্র মাসের সমীরণে বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীল অচ্যুতচরণ চৌধুরী কৃত প্রতিবাদের উত্তর দিয়াছেন। উপযুক্ত উত্তরটী হইলে কোন কথা বলিবারই ছিল না। একে ত অঘোর বাবুর নিজের ভ্রম কিন্তু আপন মত বজায় রাখিবার জন্য যে তিনি এরূপ সত্যের অপলাপ করিতে বসিবেন, বিশ্বাস ছিল না। একটী প্রবাদ আছে "আপন মান আপনি রাখে, কাটা কাণ চুল দিয়ে ঢাকে।" অঘোর বাবুর উত্তরটী দেখিলে বোঝা যায়, তিনি—"যেন তেন প্রকারেণ" সেই চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের আশা ছিল, অচ্যুত বাবু ইহার যথোচিত উত্তর লিখিবেন, কিন্তু তিনি ঐ সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা না করায়, এই প্রস্তাবটী লিখিত হইল। ইহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সমীরণে প্রকাশ করিলে কৃত-কৃতার্থ হইব।

লোকের স্বভাব সকলেই আপনাকে অভ্রান্ত মনে করে, এ বিশ্বাসে অন্ধ হইয়া প্রকৃত পক্ষে আপনারাই প্রতারিত হয়। উপদেশ দিতে সকলেরই ইচ্ছা, শুনিতে কে চায়? অঘোর বাবুর যে এ উচ্চাশা নাই, এ কথা আমরা বলি না।

১। অচ্যুত বাবু লিখিয়াছিলেন যে, অঘোর বাবুর পুস্তকে রঘুনাথের শেষ জীবনের কোন কাহিনীই বিবৃত হয় নাই। উত্তরে অঘোর বাবু লিখেন—"আমি এই সকল বৃত্তান্ত সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিয়াছি।" তিনি পুস্তকে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, সে সকলই তাঁহার প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। তারকা চিহ্ন দিয়া মধ্য হইতে "কথিত আছে" এই শব্দ দুইটী মাত্র বাদ দিয়াছেন।

বলি—ইহাই কি রঘুনাথের শেষ জীবনের বিস্তারিত বর্ণন? অঘোর বাবু যে "বিবৃত" শব্দটীর ও অর্থ পরিগ্রহ করিলেন না, এ কাহার দোষ? অচ্যুত বাবু তাঁহার পুস্তক অবশ্যই পড়িয়া থাকিবেন, তিনি কিন্তু অচ্যুত বাবুর কথা বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। অঘোর বাবু এই উদ্ধৃত অংশ টুকুই যদি রঘুর শেষ জীবনের বিস্তারিত বর্ণন মনে করেন, তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। রঘুনাথের শেষ চরিত্রে কএকটী বিভিন্ন ঘটনা বা কাহিনা আছে, অঘোর বাবুর পুস্তকে তাহার কোন কাহিনীই বিবৃত অর্থাৎ বিস্তারিত রূপ বর্ণিত হয় নাই। অঘোর বাবু কি বলেন যে, তিনি রঘুনাথের শেষ জীবন বিস্তারিতরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন? যদি বলিতে না পারেন, তবে ইহা লইয়া এত কথা কেন? অঘোর বাবুর পুস্তকের কলেবর ক্ষুদ্রতম, মোট ২৮ পৃষ্ঠা মাত্র। অচ্যুত বাবুর পুস্তকে রঘুনাথের শেষ জীবন অর্থাৎ বৃন্দাবনবাস-কাহিনীই ঠিক ২৮ পৃষ্ঠাতেই বর্ণিত হইয়াছে। অঘোর বাবু যে ২।৪টী অলোকিক ঘটনার কথা বলিয়া অচ্যুত বাবুর গ্রন্থ হইতে "আষাঢ়ে গল্পটী" পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন।

পাঠকবর্গকে জানাইয়া রাখি যে, অচ্যুত বাবুর গ্রন্থে, রঘুনাথের শেষ জীবন সম্বন্ধে এরূপ আর একটী গল্পও নাই। কিন্তু অঘোর বাবু এরূপ ২।৪টী গল্পের কথাই বলিতেছেন!!!

অচ্যুত বাবুর গ্রন্থখানি অঘোর বাবুর ন্যায় সুসভ্যের জন্য লিখিত হয় নাই—হইলে এই সুসভ্যকালে অঘোর বাবুর ন্যায় সুসভ্য ব্যক্তি তাঁহাকে এরূপ অপূর্ব্ব ভাষায় পাঁচ কথা শুনাইয়া দিতেন না। আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও অঘোর বাবুর প্রতিবাদের ভাষাটা শিক্ষা করিতে পারিলাম না, এই দুঃখ। কুসংস্কারাচ্ছন্ন আর যাহাই বলুন, অচ্যুত বাবু বৈষ্ণবগণের জন্য, বৈষ্ণবাদেশে বৈষ্ণবভাবে বিভাবিত হইয়া স্বীয় গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন; তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় এ কথা আছে। যাঁহাদের জন্য লিখিয়াছেন, তাঁহারা যে কথা বিশ্বাস করেন, ভাল বাসেন, সে কথা তিনি কেন ত্যাগ করিবেন? যে ভক্তিরত্নাকরকে অঘোর বাবুও প্রামাণ্য মনে করেন, তাহা হইতেই সেই "আষাঢ়ে গল্পটী" অচ্যুত বাবু সংগ্রহ করেন। তবে ভক্তিরত্নাকরের অন্যান্য কথা "আষাঢ়ে" না হইয়া কেবল এইটীই "আষাঢ়ে" হইয়া গেল কিসে? প্রক্ষিপ্তাদি দোষবর্জ্জিত গ্রন্থের একাংশকে প্রামাণ্য বলিলে অপরাংশকেও প্রামাণ্য বলিতে হইবে। এক অংশ যদি "আষাঢ়ে" হয়, তবে অপরাংশকেও "আষাঢ়ে" বলা যাইতে পারে। যে কথাটী উদ্ধৃত করায় অচ্যুত বাবুর গ্রন্থ মাটী হইয়া গেল, সাহেবের মুখে কথিত হইলে, মহজ্জীবনে এতদপেক্ষা অসঙ্গত অলৌকিক গল্পও যে অঘোর বাবুর ন্যায় জ্ঞানগর্ব্বিত ব্যক্তিরও বিশ্বাস্য হইয়া যায়, ইহাই আশ্চর্য্য। তখন "আষাঢ়ে গল্পই" "Miracle" নাম ধারণ করে। এমন কি, সেদিনকার রাজা রামমোহন রায়ের চরিতেও ত দুই একটী অলৌকিক কথা আছে; তবে কি তাহাও "আষাঢ়ে"?

নির্ম্মলচিত্ত ভক্তগণের মানসিক শক্তি কীদৃশ, অঘোর বাবু পরীক্ষার ছাঁচে ঢালিয়া কি তাহা দেখিয়াছেন? যাঁহার যে বিষয়ে অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাঁহার মত প্রকাশ করাই কি ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞতা? অঘোর বাবু যাহাকে "আষাঢ়ে গল্প" বলেন, কৃষ্ণ বাবুর বুদ্ধদেবচরিতেও এরূপ গল্প আছে; অক্ষয় বাবুর উপাসক সম্প্রদায়েও আছে; তবে তাহাও "আষাঢ়ে" দেখিতেছি। আর তাহা হইলে রণজিতের হরিদাস সাধু একটা মস্ত "আষাঢ়ে" লোক!!!

অঘোর বাবুর মতে যদি রঘুনাথ ১৫০৪ শকেই দেহত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার বৃন্দাবন-বাসকাল ৫১ বৎসর হয়। এই দীর্ঘকালইবা তিনি কি প্রকারে কেবল একটু "মাঠা" ও দুই চারিটা ফল ভক্ষণ করিয়া কাটাইয়াছিলেন? ইহাও কি একটা "আষাঢ়ে গল্প"? যদি ইহা "আষাঢ়ে" না হয়, তবে সেই গল্পটী বা "আষাঢ়ে" হইল কেন?

অত্রত্য কোন জমীদার একদা একটী লুসাইকে জঙ্গলে পাইয়া ধরিয়া আনিয়াছিলেন। দুইদিনের পর উক্ত লুসাইকে তাহার বসতি জঙ্গলে প্রেরণকালে একটী দ্বিভাষী দ্বারা তিনি লুসাই সর্দ্দারকে কিছু উপহার প্রেরণ করেন।

তন্মধ্যে কিছু চিনিও ছিল। উপহারাদি নীত হইলে লুসাই সর্দ্দারের সমক্ষে তাহা সংরক্ষিত হইল। সেখানকার বহু লুসাই একত্র হইল। ইহাদের স্ত্রীপুরুষ কেহই বস্ত্র পরিধান করে না। সর্দ্দার ও তৎপত্নী পৃথক আসনে উপবিষ্ট রহিল, আর অন্যান্য সমাগতগণ স্ত্রীপুরুষ একত্রে নৃত্য করিয়া উপহারগুলি সর্দ্দার সমক্ষেই উপভোগ করিতে লাগিল। ঐ সময় সর্দ্দারের চেহারা নিতান্ত প্রফুল্ল বোধ হইয়াছিল। শুষ্ক মৎস্য ও রসুনাদি দ্রব্য লুসাইগণ অতি আহ্লাদ সহকারে ভক্ষণ করিল। শেষে চিনি মুখে দিল, (চিনি তাহারা বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে আর দেখে নাই) চিনি মুখে দিয়া তাহারা মুখ বিকৃত করিল, শেষে একে অন্যের উপর চিনি ছুড়িয়া খেলা করিতে লাগিল। এইরূপে চিনির সদ্ব্যবহার হইল। আশ্চর্য্য এই যে চিনির স্বাভাবিক মিষ্টতাও তাহাদের জিহ্বায় লাগিল না। লবণ কেহই খাইল না, উপহারের সেই দ্রব্যটীই মাত্র সর্দ্দারের জন্য রক্ষিত হইল। জমীদারের দ্বিভাষী প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত অবগত হওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ রুচি অনুসারেই মনুষ্য কর্ত্তৃক ভাল মন্দ বিবেচিত হয়। আমরা যে চিনিকে কত ভাল মনে করি, লুসাইগণ তাহাতে কোন স্বাদই বোধ করে নাই, তাহাকে তাহারা ধূলার ন্যায় বোধ করিয়া ফেলিয়া দেয়! অঘোর বাবু যাহাকে "আষাঢ়ে গল্প" বলেন, বৈষ্ণব তাহাকেই মিষ্ট চিনি ভাবেন। তবে হইতে পারে (অঘোর বাবুর মতে) বৈষ্ণবগণ কুরুচিসম্পন্ন, আর তাহাদের গ্রন্থও "আষাঢ়ে গল্পে" পরিপূর্ণ।

২। হরিদাস যবন কি হিন্দু সন্তান, আমার বলিবার প্রয়োজন নাই। বিগত এপ্রিল মাসের "দাসী" পত্রিকায় অচ্যুত বাবু, অঘোর বাবুর মত খণ্ডন করিয়া সে উত্তর দিয়াছেন। তবে এখানে আমি "অমৃতবাজার" পত্রিকা সম্পাদক স্বদেশবিখ্যাত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের মতটি উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই :—

"ব্রাহ্মণের পুত্র, পিতৃমাতৃহীন বলিয়া মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত, কাযেই হরিদাস মুসলমান।"

অমিয় নিমাইচরিত ১ম খণ্ড ১৭৭ পৃষ্ঠা।

৩। অচ্যুত বাবু "ধানকে কাণ শুনেন" না, অঘোর বাবুই জীবন-ধারণ ধানকে হৃদ্বিদারণ বাণ মনে করেন। শচীমা চিকিৎসক ডাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়া যে রঘুনাথ সম্বন্ধেও তাই লিখিতে হইবে, ইহাই কি যুক্তি? কোন্ প্রস্তাবলম্বনে তিনি এ কথাটী লিখিয়াছেন, ইহাই অচ্যুত বাবুর জিজ্ঞাসা। কিন্তু এখনও মন্বন্তর উপস্থিত হয় নাই, তবে কেন "ধান ধান" বলিয়া প্রশ্নটী আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা?

৪। নীলাচল গমনের পূর্ব্বে মহাপ্রভুর সহ রঘুনাথের একবার কি দুইবার মিলন হয়, ইহা লইয়া একটী আপত্তি। অঘোর বাবু চরিতামৃতের যে পদগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে একবারের মিলন বলিয়াই বুঝিয়াছি। চরিতামৃতে দুইবারই সাতদিন করিয়া শান্তিপুর বাসের কথা লেখা আছে। প্রথমটী সূত্র বা সংক্ষিপ্ত বর্ণন, দ্বিতীয়টী প্রথমটীর বিস্তার বর্ণন। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সমস্তই গ্রন্থকার খুলিয়া বলিয়াছেন। সেইখানে

দুইবারের কথা নাই। (ইহাই অচ্যুত বাবুর মত, আমরা জানি।)

৫। অঘোর বাবু প্রতিবাদের পঞ্চম হেতু স্থলে আপন গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু যে কথা লইয়া তর্ক, তাহা উদ্ধৃত করেন নাই। এইরূপে তিনি পাঠকগণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই বুঝি সুরুচিসঙ্গত সত্যনিষ্ঠা!! তিনি না করুন, আমরা তাঁহার পুস্তক হইতে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। যথা— "রঘুনাথ এখন রক্ষকদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন।"

চরিতামৃত হইতে প্রতিবাদে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে পিতা মাতার আচরণ কিছু শিথিল হইয়াছিল জানা যায় সত্য, কিন্তু প্রহরীদিগকে তাড়াইয়া দিলেন, ইহা ত চরিতামৃতে লিখে না। অঘোর বাবু কোন্ গ্রন্থে তাহা পাইলেন? না, ইহাও "চিকিৎসক ডাক্তার" ন্যায়ই বুঝিতে হইবে?

৬। অঘোর বাবু স্বীয় গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠায় প্রহরীর কথা লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু (গ্রন্থকারের পূর্ব্বোদ্ধৃত কথা মতে) একবার যে প্রহরিগণ বিতাড়িত হইয়াছিল (১২ পৃষ্ঠায় এবং গৃহত্যাগকালে) তাহারাই আবার কোথা হইতে উদিত হইল, ইহাই ত অচ্যুত বাবুর প্রশ্ন? অঘোর বাবুর লেখনীকেই অচ্যুত বাবুর দ্বিজিহ্ব বলিয়া জানা ছিল, তিনিও কি তাই? যাহোক, অচ্যুত বাবুর প্রশ্নটী অঘোর বাবুকে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি।

৭। *কৃষ্ণদাস কাহার শিষ্য?* অঘোর বাবু না বুঝিলেও অচ্যুত বাবুর গ্রন্থে সে সিদ্ধান্ত আছে। অঘোর বাবু যে কথাগুলি (চরিতামৃতের) "বিবেচ্য" বলিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা বিবেচিত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে অচ্যুত বাবুর সিদ্ধান্তেরই পোষকতা করে।

৮। রঘুনাথের পুস্তক সম্বন্ধে অঘোর বাবু আপন ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন, সুখের বিষয় বটে।

৯। রঘুনাথ দাসের অন্তর্দ্ধান লইয়া তর্ক। যদি আপন মতে গ্রন্থকারের তত আস্থা না থাকে, তবে ইহা লইয়া সুদীর্ঘ তর্কের অবতারণা কি "প্রতিবাদ-কণ্ডুতি" নহে? অঘোর বাবু তাঁহার পিতৃতুল্য ভক্তিনিধি মহাশয়ের নব্যভারতে লিখিত প্রস্তাবের দোহাই দিয়াছেন, আমরাও ভক্তিনিধি মহাশয়েরই মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, অচ্যুত বাবুর গ্রন্থোক্ত শক সম্বন্ধে তিনি কি বলিয়াছেন, অঘোর বাবু দেখুন। অচ্যুত বাবুর গ্রন্থশেষে এই মতটী মুদ্রিত হইয়াছে। ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন;—

"তোমার রচনা সম্পূর্ণ গবেষণাপূর্ণ ও অতি মধুর। আমি যখন প্রথমে পাঠ করি, তখনই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এক্ষণেও জানিলাম, প্রথমাবধি যাহা যোজনা করিয়াছ, তাহার ভিতর কিছু লিখিতে বাকি নাই। জন্ম ও অন্তর্দ্ধানের শক যাহা উল্লেখ করিয়াছ, তাহাই যথার্থ।"

যাহা হৌক, অঘোর বাবু ভক্তিনিধি মহাশয়ের যে প্রবন্ধের দোহাই দেন, তাহা প্রেমবিলাসানুসারে লিখিত। ভক্তিনিধি মহাশয় কবিরাজের দেহত্যাগ সংক্রান্ত প্রবন্ধে যে "আকস্মিক দুর্ঘটনা"র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থচুরির

সংবাদ। প্রেমবিলাস গ্রন্থের ১৩শ বিলাসে লিখিত আছে যে, গ্রন্থচুরির সংবাদ বৃন্দাবনে পৌছিলে কবিরাজ তৎশ্রবণে রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দেন, রঘুনাথ তথা হইতে তাঁহাকে উত্তোলন করেন, সে অবস্থায় রঘুর কোলে তিনি দেহত্যাগ করেন। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে দেখা যায়, যে ইহার বহুপরে গোবিন্দ কবিরাজ বৃন্দাবনে আগমন করেন, আর তিনি কৃষ্ণদাসের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন। অতএব ভক্তিরত্নাকর প্রেমবিলাসের বিরুদ্ধ হইল। এদিকে কর্ণানন্দ রচয়িতা পদকর্ত্তা যদুনন্দন দাসও প্রেমবিলাসের অনুগমন করেন নাই। বিশেষ, তিনি প্রেমবিলাসের ঐ কথাটীতেই আপত্তি করিয়াছেন। তিনি শ্রীনিবাসসুতা হেমলতা ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, রঘুনাথের অন্তর্দ্ধানের পর কবিরাজ "রঘুনাথ সূচক" নামে একটী স্তব রচনা করেন। প্রেমবিলাস মতে রঘুনাথের অগ্রেই যদি তিনি দেহত্যাগ করিলেন, তবে শেষে (অর্থাৎ রঘুনাথের দেহত্যাগের পর) তিনি "রঘুনাথ সূচক" রচনা করিলেন কিরূপে? হেমলতা ঠাকুরাণী উত্তরে বলেন, যে গ্রন্থচুরির সংবাদে কবিরাজের দুঃখ হয়, সে দুঃখে তিনি কুণ্ডে ঝাঁপ দেন, এবং তথা হইতে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপরে উত্তোলন করা হয়, তখন তাঁহার মূর্চ্ছা হইয়াছিল, রসশাস্ত্রানুসারে সে দশাই মৃত্যু বা বিয়োগদশা। প্রেমবিলাসে এই পর্য্যন্তই প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে। পরের কথা অর্থাৎ কবিরাজের মূর্চ্ছাভঙ্গের কথা লিখিত হয় নাই। কবিরাজ তখন দেহত্যাগ করেন নাই, করিলে রঘুনাথের অন্তর্দ্ধানে "রঘুনাথ সূচক" লিখিতে পারিতেন না। কর্ণানন্দের ৭ম নির্য্যাস দ্রষ্টব্য। অতএব কর্ণানন্দের সিদ্ধান্ত এই যে, কবিরাজ ইহার পরে দেহত্যাগ করেন, এই মতই ভক্তিরত্নাকর এবং বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শিনীর সহ ঐক্য হয়। ভক্তিনিধি হইতে আমরা যে দিগ্‌দর্শিনী পাইয়াছি, তাহাতে রঘুনাথের অন্তর্দ্ধান শক ১৫১৪ বলিয়াই লিখিত। ১৫০৪ শকে হইলে গ্রন্থানৈক্য ঘটে। এখন, অঘোর বাবুকে বলি, তিনি যেন এ সকল মিলাইয়া দেখেন, আনুমানিক ঢিল ছুড়া "সুবুদ্ধির পরিচায়ক" নহে। আর জাহ্নবী দেবীর বৃন্দাবন-গমনটী যদি প্রথমবার বলিয়াই ধরা যায়, তাহা হইলেও ১৫০৪ শক হয় না, ইহার বহু পরেই তাঁহার প্রথমবারের বৃন্দাবন-যাত্রা।

অঘোর বাবুর ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ভ্রম-পরিপূর্ণ। অচ্যুত বাবু সকলগুলি প্রদর্শন করেন নাই। অদ্য আমরাও সে চেষ্টা করিব না। তবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব—

তাঁহার পুস্তকের ১০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "রঘুনাথের স্ত্রী দৈববরে অত্যুৎকৃষ্ট রন্ধন করিতে পারিতেন।" রাঘবের স্ত্রীর কথা অঘোর বাবু কোন্ গ্রন্থে পাইয়াছেন, আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি। অঘোর বাবু কুকল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া রাঘবের সংসারের কর্ত্রী, তৎভগিনী দময়ন্তীর কথাও কি ভুলিয়া গেলেন? চরিতামৃতে লেখা আছে,

"রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধাঠাকুরাণী।
দুর্ব্বাসার ঠাঞি তিহোঁ পাইয়াছেন বরে।
অমৃত হইতে পাক তার অধিক মধুরে॥"

"অঘোর বাবুর বিশ্বাস রাঘবের স্ত্রীর নাম ছিল রাধা, আর তিনি একজন ভাল রাঁধুনী। দুর্ব্বাসা কথাটা কিছু নয়, তবে "দৈববরে"ই হইবে কিন্তু দৈব জিনিসটা কি? পুরাণবর্ণিত দুর্ব্বাসার বরের কথাটাও যে অঘোর বাবু জানেন না, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।

রাধিকা আবির্ভূতা হইয়া ভক্ত রাঘবের বাড়ী রন্ধন করিতে পারেন, একথা অঘোর বাবুর বিশ্বাস হয় নাই, ইহাই মূল কথা। কিন্তু তাই বলিয়া বৈষ্ণববর্গের ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া নাড়া চাড়া বা কুকল্পনা কেন? অঘোর বাবু নিজে যাহা বুঝেন না, তাহারই একটা অর্থবাদ করিতে হইবে ইহাই কি সুসঙ্গত? যদি তাই হয়, তবে আমরাও তাঁহাকে একটা অর্থবাদ শুনাইতেছি—দেখুন।

রাধধাতু আরাধনে। যিনি আরাধনা করেন, তিনি রাধা। একান্ত ও মধুর ভক্তের চরম আদর্শ রাধা। ভক্ত সেই ভাবে ভাবান্বিত হইয়া প্রাণপতি কৃষ্ণের জন্য যখন রন্ধন করেন, তখন সে রন্ধন রাঘবের স্ত্রীর হইলেও রাধারই রন্ধন। তখন রাধার ভাব, শক্তি ও অনুরাগ-চ্ছটাই ভক্তে প্রতিফলিত হয়, তখন ভক্তই রাধা হইয়া যান। ইতি

শ্রীঅনিরুদ্ধচরণ চৌধুরী।

কালি নিশিতে সই!

কালি নিশিতে সই স্বপনে পেখিনু শ্যামে
কদম্ব তলায় জনু বৈঠি,
ফুকারে হামারি নাম বাঁশরিতে প্রাণ চোর
রূপে আলো করি দশ দিঠি।
রাধা নাম শুনি সই পরাণ পাগল ভেল
ছুটনুলো শ্যাম শ্যাম বলি,
চেতনা হারায়ে সই পড়নু চরণ তলে
রিঝে তুলি নিল বনমালী।
আদরে অধর চুমি কহত কতই বাণী
শুনি হাম সজল নয়ানে,
বাক্ ফুটলনা সখি নীরবে রহিনু চাহি
চাঁদ পারা কানুর বয়ানে।
বাক্ ফুরিলনা সখি বলিতে কানুরে মোর
কত কথা ছিললো মনেতে,
আবেশে বোধিল স্বর খালি আঁখি জল মোর
কালা বুঝি পাইল পেখিতে!
অমনি কপোল চুমি মুছাইতে আঁখি বারি
সুখ নিদ টুটল হামারি।
শ্যামের লাগিয়ে সই কাঁদি কাঁদি সারারাত
ফুরায়ে গিয়াছে আঁখি-বারি।
পাইবনা যারে সই সে কেন স্বপনে আসি
নিতি নিতি দেওলো বেদন?
কবি কহে ব্রজবালা সব সে শঠের খেলা
মিলায় যে স্বপনে রতন।

আয়ুর্ব্বেদ।

রাজযক্ষ্মা।

চিকিৎসা।

বলিনো বহুদোষস্য পঞ্চ কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
যক্ষ্মিণঃ ক্ষীণদেহস্য তৎকৃতং স্যাদ্বিষোপমম্॥
মলায়ত্তং বলং পুংসাং শুক্রায়ত্তন্তু জীবনম্।
তস্মাদ্ যত্নেন সংরক্ষেদ্ যক্ষ্মিণো মলরেতসী॥

বহুদোষব্যাপ্ত দেহ বলবান্ যক্ষ্মা-রোগীর পক্ষে প্রথমতঃ বমনাদি পঞ্চ কর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু ক্ষীণদেহ রোগীর পক্ষে এ সকল ক্রিয়া বিষবৎ অনিষ্টোৎপাদক; এই জন্য ঐক্ষণকার ক্ষীণদেহ দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের উহা আবশ্যক হয় না এবং করাও উচিত নহে। মনুষ্যের বল পুরীষায়ত্ত এবং জীবন শুক্রায়ত্ত, মলক্ষয়ে বলহানি এবং শুক্র-ক্ষয়ে জীবনহানি হইয়া থাকে। অতএব যক্ষ্মরোগীর মলও অতি যত্নে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

পেয় ও অবলেহ।—গোরক্ষচাকুলের মূল বাঁটিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ অথবা দুগ্ধের সহিত কাকজঙ্ঘা, ক্ষীর-পাক বিধান বা অন্য কোন প্রণালী অনু-সারে সংস্কৃত করিয়া সেবন করিলে ক্ষয় রোগের শান্তি হয়।

যক্ষ্মারোগে পার্শ্বশূল, জ্বর, শ্বাস ও পীনস প্রভৃতি উপস্থিত থাকিলে তাহা-দের নিবৃত্তির নিমিত্ত ধন্যা, পিঁপুল শুঁঠ ও দশমূল এই সমুদয় দ্রব্যের কাথ পেয়।

পিঁপুল, দ্রাক্ষা ও চিনি এই সমুদয় মধু ও তিলতৈলে অথবা অশ্বগন্ধা, পিঁপুল ও চিনি এই গুলি মধু ও ঘৃতের সহিত অবলেহরূপে সেবন করিলে উপকার দর্শে।

শুঁঠ পিঁপুল, মরিচ, যঁই ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে উপকার হইয়া থাকে। মাংসভোজী পক্ষিগণের (শ্যেনা-দির) মাংসের সহিত ঘৃত সিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত পিঁপুলের গুঁড়া ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে ক্ষয়জনিত কৃশতাদি নিবারিত হইয়া শীঘ্র বলবৃদ্ধি ও পীড়ার উপশম হয়।

স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু ও লৌহ সমভাগে ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত ও মর্দ্দিত করিয়া ⁄০ আনা ৵০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে বিশেষ উপ-কার দর্শে।

প্রলেপ।—শতপুষ্পা সমধুকং কুষ্ঠং তগরচন্দনম্।
আলেপনং স্যাৎ সঘৃতং শিরঃপার্শ্বাংসশূলনুৎ॥

মস্তকে, পার্শ্বে, বা স্কন্ধে বেদনা থাকিলে বেদনা-স্থানে শুল্‌ফা, যষ্টিমধু, কুড়, তগর ও শ্বেতচন্দন একত্র বাঁটিয়া ঘৃত সংযুক্ত ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

বেড়েলা, রাস্না, তিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল ও ঘৃত; গুগ্গুল দেবদারু, শ্বেতচন্দন, নাগেশ্বর ও ঘৃত; ক্ষীর কাকোলী, বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, এলবালুক, ও পুনর্ণবা অথবা শতমূলী, ক্ষীরকাকোলী, গন্ধতৃণ, যষ্টিমধু ও ঘৃত একত্র বাঁটিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে মস্তক, পার্শ্ব ও স্কন্ধের বেদনা নিবারিত হয়।

এই রোগে কখন কখন রক্তবমন একটী অতীব কষ্টকর লক্ষণ হইয়া পড়ে। সেই রক্ত পাকস্থালী অথবা ফুস্ফুস্ হইতে নিঃসৃত হয় কি না, তাহা স্থির করা কঠিন। সে যাহা হউক, রক্ত যে প্রকারে উদ্বামিত হয় না কেন,

অলক্তকরসৈঃ ক্ষৌদ্রং রক্তাস্থিহরং পরম্।
বিশল্যকর্ণীকাথঃ কুক্কুররক্ত দ্রবস্তথা॥

আলতার জল ২ তোলা ও মধু অর্দ্ধ তোলা একত্র পান করিলে রক্ত বমন নিবারিত হয়। আয়াপানের কাথ ও কুক্শিমার মূলের রসও এই পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

ষষ্ট্যাহ্বং চন্দনোপেতং সম্যক্ ক্ষীরপ্রপেষিতম্।
ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং রুধিরচ্ছর্দ্দিনাশনম্॥

যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া দুগ্ধে গুলিয়া পান করিলে রক্ত বমন নিবারিত হয়।

এই রোগে জীবন্ত্যাদি ঘৃত, অজাপঞ্চকঘৃত, বৃহদ্বাসাবলেহ, যক্ষ্মারিলৌহ, যক্ষ্মান্তকলৌহ, শিলাজত্বাদি লৌহ, ক্ষয়কেশরী, মৃগাঙ্ক বটিকা, মৃগাঙ্ক চূর্ণ, মৃগাঙ্ক রস, রাজমৃগাঙ্ক রস, রত্নগর্ভপোট্টলী রস, কাঞ্চনাভ্র রস, বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র রস, চূড়ামণি রস, ছাগাদি ঘৃত, ও কুঙ্কুমাদি ঘৃত বিশেষ উপকারী। চ্যবনপ্রাস এই রোগের মহৌষধ। আমাদিগের আবিষ্কৃত মৃগাঙ্কদ্রব সেবনে অসংখ্য রোগী যক্ষ্মারোগের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

যক্ষ্মা রোগে মহাচন্দনাদি তৈল মর্দ্দন করিলে অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। সেইরূপ অশ্বগন্ধারিষ্ট ও দ্রাক্ষারিষ্ট পান করিলে অনেকে উৎকট উরঃক্ষত, ক্ষয়রোগ, কাস, শ্বাস প্রভৃতি পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এই রোগে জ্বরাধিক্য থাকিলে জ্বরচূড়ামণি ও বৃহজ্জ্বরচূড়ামণি নামক ঔষধ অতীব প্রশস্ত।

মেহেন চোপদংশেন রসেন দেহগেন বা।
ধাতুর্বিকৃতিমাপন্নো যক্ষ্মাণং জনয়েদপি॥
শিরোরুহাণাং পতনং নিশাস্বেদশ্চ জায়তে।
রক্তনিষ্ঠীবনশ্বাসৌ বলমাংসক্ষয়াদয়.॥
যক্ষ্মাময়বিনাং স্বপ্নে রেতসশ্চ চ্যুতির্ভবেৎ।
কস্তূরীপ্রমুখং তত্র নিশাস্বেদোপশান্তয়ে।
প্রলাপে চ প্রযোক্তব্যং ভেষজং ভিষজাং বরৈঃ॥

প্রমেহ, উপদংশ ও দেহগত পারদ কর্ত্তৃক ধাতু সকল বিকৃত হইয়া পূর্ব্বোক্ত যক্ষ্মারোগকে উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই রোগে মস্তকের কেশ উঠিয়া যায়; রাত্রিকালে ঘর্ম্ম, স্বপ্নদোষ, রক্তনিষ্ঠীবন, শ্বাস এবং বলমাংসাদির ক্ষয় হইয়া থাকে। নিশাস্বেদ ও প্রলাপাদি নিবারণের নিমিত্ত কস্তূরী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

সত্বর ক্ষয়কারী সান্নিপাতিক যক্ষ্মারোগে বৈকালিক জ্বর, সর্ব্বদা ঘর্ম্ম, আহারে অনিচ্ছা, ও ইন্দ্রিয় শক্তির হ্রাস হয়; এবং রোগী ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। এরূপ

অবস্থায় প্রবালভস্ম, কস্তুরী, মৃতসঞ্জীবনী অরিষ্ট ও আসবাদি উপকারক। সর্ব্বকালিক ঘর্ম্ম-নিবারণের নিমিত্ত তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন এবং মাংস-যূষাদি পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

অধিকারগতানস্তানগদান্ সান্নিপাতিকে।
মেহজে চোপদংশোত্থে রসোদ্ভূতে চ যক্ষ্মণি।
প্রযুঞ্জীত সমীক্ষ্যাপি গদাগদ-বলাবলম্॥

মেহজ, ঔপদংশিক ও পারদবিকারজাত এবং সান্নিপাতিক যক্ষ্মারোগে বুদ্ধিমান চিকিৎসক যক্ষ্মাধিকারোক্ত সমস্ত ঔষধ পীড়া ও বলাবল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবেন।

উপদ্রবা জ্বরাদ্যাস্তে সাধ্যাঃ স্বৈঃ স্বৈশ্চিকিৎসিতৈঃ।
তেষু শান্তেষু রোগেষু পশ্চাদ্দোষমুপাচরেৎ॥

শোষ (যক্ষ্মা) রোগে জ্বরাদি যে সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত থাকে, তৎসমুদয়ের চিকিৎসা তত্তৎ রোগোক্ত বিধি-অনুসারে অগ্রে কর্ত্তব্য। ঐ সকল রোগ প্রশমিত হইলে পশ্চাৎ শোষ চিকিৎসা করিবে।

বাসক যক্ষ্মারোগের মহৌষধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

বাসায়াং বিদ্যমানায়াং আশায়াং জীবিতস্য চ।
রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কথং সীদসি মানব!

বহুকাল যাবৎ এই বচনটী প্রচলিত আছে যে, বাসক বিদ্যমান থাকিতে জীবিতাকাঙ্ক্ষী রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও কাস গ্রস্ত ব্যক্তি কেন অবসন্ন হইতেছ? বাস্তবিক শ্লোকটীর যাথার্থ্য শত শত স্থলে প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে ও হইতেছে। বাসকের অসীম শক্তি কাহারই অবিদিত নাই। অন্য ঔষধের অভাবে কেবল বাসক পত্র-রস সেবনেও কাসাদি রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। একমাত্র বাসকই যখন এতাদৃশ উপকারী, তখন তাহার সহিত অন্য বস্তু মিশ্রিত হইলে যে নিশ্চয় আরোগ্যজনক হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

শতং সংগৃহ্য বাসায়াস্তোয়দ্রোণে বিপাচয়েৎ।
চতুর্ভাগাবশেষেঽস্মিন্ শর্করায়াঃ পলং শতম্॥
ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধিশ্চ কট্‌ফলং মুস্তকং গদম্।
জীরকং পিপ্পলীমূলং রোচনী চবিকা শুভা॥
কটুকী শ্রেয়সী চৈব তালীশং সধনীয়কম্।
কার্ষিকং পৃথগেতেষাং ক্ষিপেন্মধুপলাষ্টকম্॥
তদ্ যথাগ্নিবলং লিহ্যাচ্ছৃতশীতাম্বুপানতঃ।
নিহন্তি বাজযক্ষ্মাণং রক্তপিত্তং ক্ষতং ক্ষয়ম্॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্বাসঞ্চৈব সুদারুণম্।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কাসঞ্চৈবারুচিং জ্বরম্॥
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতো হ্যেষ বৃহদ্ বাসাবলেহকঃ।

বৃহৎ বাসাবলেহ—বাসক মূলের ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের অর্থাৎ ৬৪ সের জলে ১২॥০ সের বাসক মূলের ছাল (অভাবে গাছের ছাল) জ্বাল দিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে ১২॥০ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কট্‌ফল, মুতা, কুড়, জীরা, পিপুলমূল, কমলাগুড়ী, চই, বংশলোচন, কট্‌কী, গজপিপ্পলী, তালীশ পত্র ও ধনে ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে ও আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে উহাতে ১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ॥০ হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা স্থির করিয়া শৃতশীতল (উষ্ণজল শীতল) জলের সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর, যক্ষ্মা ও শ্বাসাদি নানা রোগ নিবারিত হয়।

প্রত্যান্তরে বৃহৎ বাসাবলেহের অন্তরূপ প্রস্তুত-প্রাণালী দেখা যায়, উহাতে কতিপয় দ্রব্য অধিক থাকায় ইহা অপেক্ষা আশু ফলদায়ক, সুতরাং উহার নিয়মও লিখিত হইতেছে।

বৃহতী ২০০ তোলা, কণ্টকারী ২০০ তোলা, বাসক মূলের ছাল ২০০ তোলা, বামনহাটীর মূলের ছাল ২০০ তোলা, ৬৪ সের জলে জ্বাল দিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, ইহাতে ২ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে অভ্র ৮ তোলা, পিপুল চূর্ণ ৩২ তোলা, কুড়, তালীশপত্র, তেজপত্র মরিচ, বেনার মূল, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, গুড়ত্বক্, বামন হাটী, বালা ও মূতা ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে ঘৃত অর্দ্ধ সের প্রদান করিয়া আলোড়ন কবিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ১ সের প্রদান করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। ইহা বালক, বৃদ্ধ ও যুবা সকলের পক্ষেই সমান উপকারক। রাজযক্ষ্মা ও রক্ত পিত্ত প্রভৃতি রোগে ইহার আশ্চর্য্যকর ফল সর্ব্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ক্ষয়কারক সান্নিপাতিক যক্ষ্মারোগে জ্বর, সর্ব্বদা ঘর্ম্ম, অরুচি, ও ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যাদি উপস্থিত হইলে প্রবাল-ভস্ম ও 'কস্তুরী' ১ রতি মধুসহ সেবন করিতে দিবে। মৃতসঞ্জীবনী সুরা এবং বাসকারিষ্ট প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ ১।২ তোলা মাত্রায় সেবনেও বিশেষ উপকার হয়। মেহ, উপদংশ ও পারদবিকৃতি জন্য সান্নিপাতিক যক্ষ্মারোগে বিবেচনাপূর্ব্বক উল্লিখিত ও বক্ষ্যমাণ ঔষধ সমস্ত ব্যবস্থা করিবে।

সুপ্রসিদ্ধ চ্যবনপ্রাশের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। চ্যবন নামে ঋষি প্রথমে ঐ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সেবন করেন, এজন্য উহার নাম হইয়াছে চ্যবনপ্রাশ। ইহার ফল আমরা কিছু বলিতে চাহি না, যাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার সুফল অবগত আছেন। বাস্তবিক ইহার উপকারিতার সীমা নাই বলিতে হইবে। শ্লেষ্ম দোষ অর্থাৎ যাহাদের অল্প অল্প শ্বাস বা কাসের উদ্বেগ থাকে, চ্যবনপ্রাশ তাহাদের ঐ রোগ নিবারণ করিয়া শরীর বিলক্ষণ স্থূল ও বলিষ্ঠ করে। শুক্রবৃদ্ধির পক্ষে ইহা অমোঘ ঔষধ।

চ্যবনপ্রাশ।

বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোনাক কাশ্মর্য্যঃ পাটলা বলা।
পর্ণাশ্চতস্রঃ পিপ্পল্যঃ শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্ ॥
শৃঙ্গী তামলকী দ্রাক্ষা জীবন্তী পুষ্করাগুরুঃ।
অভয়া চামৃতা ঋদ্ধি জীবকর্ষভকৌ শঠী ॥
মুস্তং পুনর্নবা মেদা সূক্ষ্মৈলোৎপলচন্দনে।
বিদারী বৃষমূলানি কাকোলী কাকনাসিকা ॥
এষাং পলোন্মিতান ভাগান শতান্যামলকস্য চ।
পঞ্চ দদ্যাত্তদৈকধ্যং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥
জ্ঞাত্বা গত রসান্যেতান্যৌষধাণ্যথ তং রসম্।
তচ্চামলকমুদ্ধৃত্য নিষ্কুলং তৈলসর্পিষোঃ ॥
পলদ্বিদশকে ভৃষ্ট্বা দত্বাচার্দ্ধতুলাং ভিষক্।
মৎস্যণ্ডিকায়াঃ পূতায়া লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ ॥
যট্পলং মধুনশ্চাত্র সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ।
চতুঃপলং তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপ্পল্যা দ্বিপলং তথা ॥
পলমেকং বিদধ্যাচ্চ ত্বগেলা পত্রকেশরাৎ।
ইত্যয়ং চ্যবনপ্রাশঃ পরমুক্তো রসায়নঃ ॥
কাসশ্বাসহরশ্চৈব বিশেষেণোপদিশ্যতে।
ক্ষীণক্ষতানাং বৃদ্ধানাং বালানাঞ্চাঙ্গ-বর্দ্ধনঃ ॥

স্বরক্ষয়মুরোরোগং হৃদ্রোগং বাতশোণিতম্।
পিপাসাং মূত্রশুক্রস্থান্ দোষাংশ্চৈবাপকর্ষতি॥
অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত নোপরুন্ধ্যাচ্চ ভোজনম্।
অস্য প্রয়োগাচ্চ্যবনঃ সুবৃদ্ধোঽভূৎ পুনর্যুবা॥
মেধাস্মৃতিং কান্তিমনাময়ত্ব-
মায়ুঃপ্রকর্ষং বলমিন্দ্রিয়াণাম্॥
স্ত্রীষু প্রহর্ষং পরমগ্নিবৃদ্ধিম্
বর্ণপ্রসাদং পবনানুলোম্যম্॥
রসায়নস্যাস্য নরঃ প্রয়োগা
ল্লভেত জীর্ণোঽপি কুটিপ্রবেশাৎ॥
জরাকৃতং পূর্ব্বমবাপ্যরূপং, বিভর্ত্তিরূপংনবযৌবনস্য
সিতা মৎস্যণ্ডিকালাভে, ধাত্র্যাশ্চ মৃদুভর্জ্জনম্।
চতুর্ভাগজলে প্রায়ো দ্রব্যং শতবসং ভবেৎ।

বেলছাল, গণিয়ারীছাল, শোনাক-ছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলা-ছাল, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাষাণি, পিঁপুল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কাকড়াশৃঙ্গী, ভুঁইআদা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরিতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক ঋষভক, শঠী, মুতা, পুনর্নবা, ছোট এলাইচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, প্রত্যেক ৮ তোলা। শ্লথ (ঢিলে) পোট্টলীবদ্ধ কাচা আমলকী ৫০০টা বা ৭৸/০ ছটাক। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ৬৪ সের জলে উল্লিখিত দ্রব্যগুলি অল্প থেঁতো করিয়া দিবে এবং ৫০০টা আমলকী একখানি নূতন কাপড়ে ঢিলে করিয়া বান্ধিয়া ঐ জলে প্রদান করিবে ঐ বস্ত্রের উপবিভাগ (দোলা যন্ত্রবৎ) একখানি কাঠ বা বাখারিতে বান্ধিয়া রাখিতে হয়। ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া আমলকী গুলি বস্ত্রের অগ্রভাগ ধরিয়া পৃথক একটী প্রস্তর পাত্রে রাখিবে ও কাথটী ছাঁকিয়া লইবে।

পোট্টলীবদ্ধ আমলকী সকল খুলিয়া উহার বীজ গুলি ফেলিয়া দিবে, এবং তিন পোয়া ঘৃত ও তিন পোয়া তিল তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে আমলকী ভাজিয়া শিলায় উত্তমরূপ পেষণ করিবে। পরে মিছরি ⁄৬৷ সের (৫০ পল), ঐ কাথ জল ও আমলকী একত্র পাক করিবে। লেহবৎ গাঢ় হইলে বংশলোচন ৩২ তোলা, পিপুল চূর্ণ ১৬ তোলা, গুড়-ত্বক্ ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, এলা-ইচ ২ তোলা ও নাগেশ্বর ২ তোলা উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৩ পোয়া মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। মাত্রা॥০ হইতে ২ তোলা। অনুপান ছাগদুগ্ধ বা ঈষদুষ্ণ গোদুগ্ধ।

ইহা সেবনে স্বরভঙ্গ, যক্ষ্মা, শুক্রগত দোষ, অর্থাৎ প্রমেহ ও ধাতু দৌর্ব্বল্যাদি প্রশমিত হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি, ইন্দ্রিয় সামর্থ্য, বায়ুর অনুলোমতা, আয়ুর্বৃদ্ধি ও বৃদ্ধেরও যৌবন ভাব উপস্থিত হয়। দুর্ব্বল ও ক্ষীণধাতুর পক্ষে ইহার ন্যায় অত্যুৎ-কৃষ্ট ঔষধ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কণ্ঠক্ষত-চিকিৎসা।

শ্লেষ্মা উর্দ্ধগামী হইয়া, অথবা উপ-দংশাদি জনিত দুষ্ট রক্ত, কণ্ঠে ক্ষত উৎপাদন করে। ক্রমে ঐ ক্ষত ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মারোগের কারণরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। ইহার চিকিৎসা যক্ষ্মারোগের ন্যায় করিতে হইবে।

ক্ষীরিণ্যা বব্বূলস্যাপি ত্রিফলা কাথকেঽপি চ।
প্রক্ষিপ্য টঙ্গনং চূর্ণং কবলং ধারয়েত্ততঃ॥
কণ্ঠক্ষতাদিনাশার্থং পিবেন ভাবিতং পুরা॥

ক্ষীরিণী (যজ্ঞডুম্বর, বট, অশ্বথ, বেতস ও পাকুড়) ত্রিফলা (হরিতকী,

আমলকী, ও বহেড়া) অথবা বাবলার ক্বাথে সোহাগাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে কবল ধারণ করিলে কণ্ঠ-ক্ষতাদি সত্বর উপশমিত হয়। আমাদের

মৃগাঙ্কদ্রব ও বাসামৃত

সকল প্রকার যক্ষ্মারোগেই বিশেষ ফলপ্রদ। এতদ্ব্যতীত ১ পোয়া উষ্ণজলে ২ তোলা অশ্রহরারিষ্ট গুলিয়া কবল ধারণ করিলে কণ্ঠক্ষতাদি সমস্ত মুখক্ষত আশু প্রশমিত হয়।

পথ্যাদি চিকিৎসা।

রাজযক্ষ্মার পথ্যাদি চিকিৎসার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; কেন না রোগীর পথ্যে অবহেলা করিয়া কেবল ভৈষজ্য চিকিৎসা করিলে তাহার রোগ কিছুতেই প্রশমিত হয় না; কিন্তু এক-মাত্র সুপথ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া অল্প ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা অনেক স্থলে আমরা সুফল লাভ করিয়াছি। এইজন্য অনেকে বলেন যে, যক্ষ্মাগ্রস্ত ব্যক্তির পথ্যাদি চিকিৎসাই প্রধান চিকিৎসা ভৈষজিক চিকিৎসা ও জলবায়ু তাহার সহকারী মাত্র। চিকিৎসা-ক্ষেত্রে আমরা ইহা নিত্যই প্রত্যক্ষ করি।

চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অবধি এতগুলি যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা করিয়াছি, তাহাদের অধিকাংশে এই বৈচিত্র্য দেখিয়াছি যে, রোগীর শরীর-তার যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার পীড়া সেই পরিমাণে সুস্থ বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। এই স্বাস্থ্যসূচক উন্নতি কেবল উপযুক্ত পথ্য দ্বারা সাধিত হইতে পারে। উপযুক্ত আহার দ্বারা রোগীর কেবল নিত্যক্ষয় পূরণ করিতে পারা যায় এমত নহে, রোগজন্য শক্তিক্ষয়ও প্রভূত পরি-মাণে পুনরুপচিত হইতে পারে। এই জন্য রোগীর পাকস্থালীতে যে পরিমাণে পরিপাক পায়, সেই পরিমাণে পুষ্টিকর আহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

দুগ্ধ ও মাংসই রোগীর প্রধান পথ্য। রোগীর পরিপাক-শক্তির উপর দৃষ্টি রাখিয়া এই দুইটী পথ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসারে প্রয়োজন মত প্রয়োগ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিবিধ জন্তুর মাংস দ্বারা নানা প্রকার যূষ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে; আমরা ক্রমে তৎসমুদয়ের আলোচনা করিতেছি।

সাধারণ পথ্য।—

শালিষষ্টিকগোধূম-যব মুদ্গাদয়ো হিতাঃ।
মদ্যানি জাঙ্গলাঃ পক্ষিমৃগাঃ শস্তা বিশুষ্যতাম্॥

শালিতণ্ডুল, আউশ তণ্ডুল, যব ও মুগ প্রভৃতি, পুরাতন মদ্য এবং জাঙ্গল পশু-পক্ষীর মাংস যক্ষ্মারোগীর পক্ষে হিতকর।

পারাবত কপিচ্ছাগ কুরঙ্গাণাং পৃথক্ পৃথক্।
মাংসচূর্ণমজাক্ষীরেঃ পীতং ক্ষয়হরং পরম্॥

পায়রা, বানর, ছাগ বা হরিণের মাংস ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া ছাগ-দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ক্ষয়রোগের শান্তি হয়।

ছাগং মাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিঃ সশর্করম্।
ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ॥

ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ পান, শর্করা বা শুণ্ঠীর সহিত ছাগঘৃত পান, ছাগসেবা ও ছাগসমূহ মধ্যে শয়ন যক্ষ্মা-রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর। কিন্তু এরূপ ছাগসেবা করিবার পূর্ব্বে ছাগকে

পরীক্ষা করা আবশ্যক। যে সকল ছাগ শ্বাসকাস পীড়ায় আক্রান্ত, তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে নাই; নীরোগ ও বলিষ্ঠ ছাগ সংগ্রহ করিলে এরূপ আশঙ্কা থাকে না।

বিশেষ পথ্য।

ব্যবয়াদি বিশেষ বিশেষ শোষে বিশেষ বিশেষ পথ্য বিধান করা উচিত। এস্থলে তাহা সবিস্তারে আলোচিত হইল।

ব্যবায়শোষ।

ব্যবায়শোষিণং ক্ষীররসমাংসাজ্যভোজনৈঃ।
মুকুলৈর্মধুবৈহৃদ্যৈর্জীবনীয়ৈরুপাচরেৎ॥

ব্যবায়শোষ-পীড়িত রোগীকে দুগ্ধ, মাংসের যূষ, মাংস ও ঘৃতপক্ক পথ্য এবং তদীয় হিতকর মধুর ও হৃদ্য জীবনীয়গণ কৃত ঔষধ সেবন করাইবে।

শোকশোষ।

হর্ষণাশ্বাসনৈঃ ক্ষীরৈঃ স্নিগ্ধৈর্ম্মধুরশীতলৈঃ।
দীপনৈর্লঘুভিশ্চান্নৈঃ শোকশোষমুপাচরেৎ॥

শোকশোষে রোগীর মন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, এই জন্য হর্ষজনন, আশ্বাস প্রদান এবং দুগ্ধ ও অন্যান্য স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল, অগ্ন্যুদ্দীপক ও লঘু অন্ন পথ্য প্রদানরূপ চিকিৎসা কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে বন্য কপোত, ও কুক্কুটাদির মাংসের যূষ সেবন করা উচিত।

ব্যায়ামশোষ।

ব্যায়ামশোষিণং স্নিগ্ধৈঃ ক্ষতক্ষয়হিতৈর্হিমৈঃ।
উপাচরেজ্জীবনীয়ৈর্বিধিনা শ্লৈষ্মিকেণ তু॥

ব্যায়ামশোষে ক্ষতশোষোপকারক, শীতল জীবনীয়গণ দ্বারা এবং শ্লেষ্মাজনক বিধি আশ্রয় করিয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক।

অধ্বশোষ।

আস্যাসুখৈর্দিবাস্বপ্নৈঃ শীতৈর্মধুরবৃংহণৈঃ।
অন্নমাংসরসাহারৈরধ্বশোষমুপাচরেৎ॥

উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশনজনিত সুখ অর্থাৎ সুখোপবেশন, দিবানিদ্রা এবং শীতল, মধুর ও বৃংহন ঔষধ এবং অন্ন ও মাংসের যূষরূপ পথ্য—অধ্বশোষে উপকারী।

ব্রণশোষ।

ব্রণশোষং জয়েৎ স্নিগ্ধৈর্দীপনৈঃ স্বাদু শীতলৈঃ।
ঈষদম্লৈরনম্লৈর্বা যূষমাংসরসাদিভিঃ॥

স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, স্বাদু ও শীতল মুদ্গাদির যূষ ও মাংসরস প্রভৃতি দ্বারা ব্রণশোষ চিকিৎসনীয়। ঐ যূষাদি দাড়িম ও আমলকী প্রভৃতির রস দ্বারা অম্লীকৃত বা নিরম্ল অবস্থাতেই পেয়।

এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, যক্ষ্মারোগীর পক্ষে মাংস ও দুগ্ধই প্রধান খাদ্য:—এই দুইটীমাত্র দ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের চিকিৎসাধীন অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই দুইটী দ্রব্য কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

দুগ্ধ।—এককালে এক পোয়ার অধিক দুগ্ধ পান করা উচিত নহে; ইহাও একবারে গলাধঃকরণ করা অনুচিত,—অল্প অল্প করিয়া দশ পনর মিনিটের মধ্যে সমস্ত অংশ পান করিতে হইবে। সমগ্র দিবসের মধ্যে অধিকদুগ্ধ

পান করিতে হইবে। প্রতি পোয়ায় এক চামচ পরিমাণে চুণের জল মিশাইয়া লইলে ভাল হয়; যাহারা বিশুদ্ধ দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে মাখনতোলা দুধ উপকারী; দুগ্ধে ভাল দোবরা চিনি অল্প পরিমাণে মিশাইয়া লইলেও চলিতে পারে। কোন কোন রোগী আদৌ দুগ্ধ ভালবাসে না, তাহাদিগকে অল্প অল্প "কূমিষ" * বা সশর্কর নবীন তক্র দিলে উপকার দর্শে।

মাংস।—ইহা যত মেদবর্জ্জিত হয়, ততই উপকারী; আবার মাংস অপেক্ষা মাংসরসে যক্ষ্মারোগীর অধিকতর উপকার হইয়া থাকে। জাঙ্গল পশু পক্ষীর মাংস মেদবর্জ্জিত করিয়া শিখাবিহীন তেজোময় অগ্নিতে উত্তাপিত করিতে হইবে, তাহার পর তাহা হইতে কৌশলে রস নিঙড়াইয়া বাহির করা আবশ্যক। এই মাংসরসে অল্প মরিচচূর্ণ ও লবণ মিশাইয়া দেওয়া উচিত। ইহা আর অগ্নিতে উত্তাপিত করিতে নাই—করিলে সমস্ত রস জমাট বাঁধিয়া যাইবে এবং তাহা হইলে ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও অনিষ্টকর হইয়া পড়িবে। যদি রস নিতান্ত শীতল হইয়া পড়ে এবং গরম করা আবশ্যক হয়, একটী পাত্রে গরম জল রাখিয়া তাহাতে সেই মাংসের বাটী আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাখিলে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়।

এইরূপ মাংসরস কয়েকদিন খাইলেই অনেকের অরুচি হয়, আবার কেহ কেহ ইহা আদৌ স্পর্শ করিতে চাহে না, তাহাদের পক্ষে মাংসযূষ ও মাংস চূর্ণ প্রযুজ্য। মাংসযূষ যত সুপাচ্য হয়, ততই ভাল; এরূপ করিতে হইলে ইহাতে অল্প পরিমাণে মসলা ও ঘৃত সংযুক্ত করা আবশ্যক। মাংস চূর্ণ করিতে হইলে মেদবর্জ্জিত উৎকৃষ্ট মাংস জলে সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ বাষ্পতাপে শুষ্ক করিতে হইবে। সুচারুরূপে শুষ্ক হইলে উদুখলে গুঁড়াইয়া লইলেই মাংসচূর্ণ প্রস্তুত হয়। এই মাংসচূর্ণ রোগী নিজের রুচি অনুসারে ব্যবহার করিতে পারে। সূপ, যূষ, দুগ্ধ, শীতল বা গরম জল—যে কোন পেয় দ্রব্যের সহিত ইহা অনায়াসে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে যক্ষ্মারোগী বিশেষ উপকার পায়।

সুরা।—যক্ষ্মারোগী সুরাসেবনে বিশেষ উপকার পাইয়া থাকে। অনেকে বলেন যে, ইহা দ্বারা পীড়া উপশমিত হয় এবং সেই জন্য রোগের সকল অবস্থাতেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই মত সম্পূর্ণ সমীচীন; যক্ষ্মারোগীকে সুরা ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেকস্থলেই বিশেষ উপকার হইতে দেখিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রাক্ষারিষ্ট বিলাতী উৎকৃষ্ট সুরার সমতুল্য। ইহা যক্ষ্মারোগীর পক্ষে আহার ও ঔষধ উভয়ই হইতে পারে।

পথ্যাদি চিকিৎসা সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে আহারের নিয়ম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা যাইতে পারে:—

১। সমস্ত দিবা রাত্রির মধ্যে রোগীর অন্ততঃ ছয়বার আহার করা আবশ্যক।

---

* ইহা এক প্রকার বিলাতী খাদ্য। এদেশে দধি বা ঘোল যে উপায়ে প্রস্তুত করে, "কূমিষ" সেই উপায়ে প্রস্তুত হয়। মহানগরীতে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শারীরিক বা মানসিক শ্রান্তি বা ক্লান্তি, কিংবা স্নায়বিক উত্তেজনার পর আহার অনুচিত।

৩। মধ্যাহ্ন ও সান্ধ্য ভোজনের পূর্ব্বে অন্ততঃ কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়া বা শয়ান অবস্থায় বিশ্রাম করা আবশ্যক।

৪। আহারের সঙ্গে অতি অল্প পরিমাণে জলীয় পদার্থ সেবন করিবে।

৫। শর্করা ও শ্বেতসার যত পরিত্যক্ত হয়, ততই ভাল।

৬। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতটুকু খাদ্য পরিপাক পায়, ততটুকুই খাওয়া উচিত।

৭। সমর্থ হইলে প্রত্যহ অল্প অল্প ব্যায়াম করা আবশ্যক; অসমর্থ হইলে অন্য লোক দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে করাবর্ত্তন করাইলে কতকটা ব্যায়ামের কাজ হয়।

৮। খাদ্য খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক এবং পরিষ্কৃত পাত্রে শুচী ও শুদ্ধাচারী ব্যক্তিদ্বারা পরিবেশিত হওয়া উচিত।

এই সকল নিয়মে দৃষ্টি রাখিয়া রুচি ও পরিপাক শক্তির অনুসারে পথ্য করিলে যক্ষ্মা রোগী অনেক স্থলে বিনা ঔষধেই বা সামান্য ঔষধ সাহায্যেই আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

পরিশেষে বলা আবশ্যক যে, রোগী সর্ব্বদা সরু ফ্লেনেলের জামায় অথবা অন্য কোন গরম কাপড়ে অঙ্গ আবৃত রাখিবে এবং সুপরিষ্কৃত ও সুখপ্রদ শয্যায় শয়ন করিবে। শয্যা উপকরণ সমূহ যাহাতে শীতল না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

অপথ্য।

রুক্ষান্নপানং বিষমমশনঞ্চ বিদাহি যৎ।
কটুতিক্তকষায়াম্ল শাকমাষরসোনকাঃ॥
শিম্বী মৎস্যঞ্চ তাম্বূলং ব্যায়ামো বেগধারণম্।
সাহসানি চ কর্ম্মাণি শ্রমঃ স্বেদস্তথাঞ্জনম্॥
উচ্চৈঃ সম্ভাষণং মার্গসেবনং নিশিজাগরঃ।
বিশেষতো নিধুবনং কর্ম্মোরস্যমথেতরম্॥
নিদানত্বেন গদিতং যচ্চ হেতু চতুষ্টয়ম্॥
সর্ব্বাণ্যেতানি নিয়তং বর্জ্জনীয়ানি যক্ষ্মিণি॥

রুক্ষ অন্নপান, বিষম ভোজন (অতিরিক্ত বা ন্যূন পরিমাণে বা অকালে ভোজন) বিদাহি দ্রব্য, কটু, তিক্ত, কষায় ও অম্লরস-প্রধান দ্রব্য, শাক, মাষকলায়, রসুন, শিম, মৎস্য ও তাম্বুল ইত্যাদি দ্রব্য সকল আহার, কষ্ট স্বীকার বেগধারণ, সাহস কর্ম্ম সকল, পরিশ্রম, স্বেদ, বা স্নান, অঞ্জন, উচ্চৈঃস্বরে শব্দোচ্চারণ, পথ পর্য্যটন,—বিশেষতঃ মৈথুন ও বক্ষো বলসাধ্য কর্ম্ম সমুদায় এবং যক্ষ্মোৎপত্তির যে হেতু চতুষ্টয় লিখিত হইয়াছে, তৎ সমস্ত যক্ষ্মারোগে পরিবর্জ্জনীয়।

অন্যচ্চ। শোকং স্ত্রিয়ঃ ক্রোধমসূয়তাঞ্চ
ত্যজেদুদারান্ বিষয়ান্ ভজেচ্চ।
তথা দ্বিজাতীং স্ত্রিদশান্ গুরূংশ্চ
বাচশ্চ পুণ্যাশ্চ শৃণুয়াদ্ দ্বিজেভ্যঃ॥

যক্ষ্মারোগীর পক্ষে ক্রোধ, শোক, অসূয়া ও স্ত্রী-সম্ভোগ এমন কি স্ত্রীদর্শন পরিত্যাগ, উদার বিষয় ভজনা, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও গুরু সেবন এবং ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পুণ্য উপাখ্যান সমস্ত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

সমালোচনা।

রাঘবচরিত—শ্রীঅক্ষয় কুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত। গ্রন্থকার কাল্না স্কুলের প্রধান পণ্ডিত। বহুদিন শিক্ষা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি বালক-দিগের প্রকৃত অভাব বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সেই অভাবমোচনের অভিপ্রায়ে সমালোচ্য গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। মহাকবিগণের মহীয়সী কল্পনাসম্ভূত অনুপম রত্নরাজি যাহাতে বালকদিগের অধিগত হয়, তাহারই উপায়বিধানে ভট্টাচার্য্য মহাশয় চেষ্টা করিয়াছেন। "মহাকবি কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ ও আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি কৃত রামায়ণ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের ভাবাদি সঙ্কলন করিয়া রাঘবচরিত রচিত হইয়াছে।" ইহাতে সূর্য্যবংশীয় মহারাজ দিলীপ হইতে পঞ্চম পুরুষ শ্রীরামের বিবাহ পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় যথাযথ বর্ণিত আছে। গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ, অথচ সরল ও মনোরম। ইহার অনেক স্থানেই রঘুবংশের অবিকল অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়; সুখের বিষয় অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই। রাঘব-চরিত বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবার উপযুক্ত।

জ্যোতিঃ—মাসিক পত্র ও সমালোচক। আজিকালি বঙ্গের সর্ব্বত্রই জীবনসংগ্রামের কোলাহল শুনিতে পাওয়া যায়; সাধু জীবনযাত্রার সকল স্তরেই—বিশেষতঃ সাহিত্যের আলোচনায় প্রতিযোগিতা কিছু প্রখর হইয়াছে। মাসিক ও সাপ্তাহিকের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশেষ গুণ না থাকিলে জীবিত থাকিতে পারে না, "জ্যোতিঃ" পত্রিকা সৌভাগ্য-বশতঃ দ্বিতীয় বর্ষে প্রবেশ করিয়াছে; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সৎসঙ্গ—এখানিও একখানি মাসিক পত্রিকা; তৃতীয় বর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। গত বৈশাখ মাসের সংখ্যায় অনেকগুলি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ আছে। মোটের উপর কাগজখানি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

হরিনাম ও কলিধর্ম্ম—কলিকাতা দরমাহাট্টা হরিসভা হইতে প্রকাশিত। বিনামূল্যে বিতরিত। অল্পদিন হইল দরমাহাটায় একটি হরিসভা স্থাপিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম এই সভার সহিত একটী পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি একাদশীতে সভার অধিবেশন হয় এবং তদুপলক্ষে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আমরা অনেকবার সভায় উপস্থিত থাকিয়া ইহার সুচারু কার্য্য-প্রণালী দর্শনে সন্তোষ লাভ করিয়াছি। পুস্তিকা-খানি ধর্ম্মকথায় পরিপূর্ণ। কলেবর নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও ইহা পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

২য় খণ্ড। ১৩০২ সাল—শ্রাবণ ও ভাদ্র। ১১, ১২শ সংখ্যা।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

একত্রে দুই খণ্ডের মূল্য ।০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। সমীরণের দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হইল ; এইবার তৃতীয় বৎসরের জন্য বিপুল আয়োজন হইতেছে। দুই বৎসরে আমরা আশাতীত ফল লাভ করিয়াছি ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়।

২। দেশের সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণ তৃতীয় বৎসরে লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

৩। তৃতীয় খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হইবে।

৪। তৃতীয় বৎসরের মূল্য যাঁহারা ভ্যালিউপেয়েবলে পাঠাইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের নামে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ভ্যালিউপেয়েবলেই প্রেরিত হইবে।

সম্পাদক—

২য় খণ্ড। | ১৩০২ সাল—শ্রাবণ। | ১১শ সংখ্যা।

তৈল-তত্ত্ব।

(সামাজিক প্রবন্ধ)।

তৈল স্নেহ-পদার্থ কিন্তু তৈল ও স্নেহ একই পদার্থ কি না জানি না। কোথায় পিচ্ছিল তরল পদার্থ তৈল আর কোথায় সেই হৃদয়ের কোমলভাব স্নেহ। এই দুই শব্দের ভিতর যে কোন সম্পর্ক মাত্র আছে বলিয়া সহসা মনে হয় না। সহসা মনে হয় না বটে কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে ভাবিলে বুঝিতে পারা যায় যে উভয়ই এক জিনিস। আর আমরা সেই বিষয় সাধ্যানুসারে কথঞ্চিত বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

তৈল নানা প্রকার আছে। তন্মধ্যে যেগুলি প্রধানতঃ আমাদের দেশে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয় আমরা সেই গুলিরই কথা বলিব। তৈল শব্দ হইতেই বুঝা যায় ইহা তিল হইতে উৎপন্ন, অথবা তিলজ তৈলই প্রকৃত তৈল। ইহা অতি পবিত্র, অতি স্নিগ্ধ; ইহা রোগীর সেব্য, নিরোগের ভোগ্য। ইহা আমাদের পবিত্র স্নেহ—যথা পিতৃ-স্নেহ, ভ্রাতৃ-স্নেহ, দাম্পত্য-স্নেহ, অপত্য স্নেহ—অতি পবিত্র, অতি স্নিগ্ধ। সুখের সময় আরামের জিনিস। অসুখের সময় আরও আরামের জিনিস। তৈল শব্দ হইতে বুঝা যায় সেকালে তিলের তৈলেরই সমধিক আদর ছিল কিন্তু এখন নানা কারণে নানা প্রকার তৈলের আদর হইয়াছে এখন তিলের তৈলের আদর বড় একটা কাহার দেখা যায় না। স্নেহ পক্ষেও তাহাই, এখন আমাদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে নানা কারণে আমরা পিতৃ মাতৃ স্নেহ, অপত্য-স্নেহ, দাম্পত্য-স্নেহ ভুলিয়া যাইতেছি। এখন কাহার বড় শিরঃপীড়া—তিনি হয়ত দায়ে ঠেকিয়া তিলের তৈল ব্যবহার করিলেন অথবা কবিরাজী ঔষধের সহিত তিলের তৈল সেবন করিলেন। সংসারে আমরা কি দেখি, শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া শান্তির জন্য কোথায় যাই—পিতা মাতার কাছে যাই, ভাই ভগিনীর কাছে যাই, স্ত্রী পুত্র কন্যার কাছে যাই, তখন আর নিসম্পর্কীয় লোকের সান্ত্বনা, দাস দাসীর সেবা ভাল লাগে না, তখন হৃদয় সেই পবিত্র স্নেহ চায়,আর সেই পবিত্র সুস্নিগ্ধকর স্নেহ পাইলেই শান্তিলাভ করে, শরীর জুড়ায়, মাথা ঠাণ্ডা হয়, সকল

অসুখ সকল রোগ দূরে যায়। তিলের তৈলের এমনই গুণ। তিল এই পবিত্র তৈল প্রসব করে বলিয়াই আমাদের শাস্ত্রে ইহার এত প্রশংসা, ইহাকে এত মর্য্যাদা করিয়াছে, শ্রাদ্ধ শান্তিতে পিতৃপুরুষদিগকে স্বর্গীয় পিতা মাতা প্রভৃতির উদ্দেশে আমরা তিল উৎসর্গ করি, তিল ভিন্ন পিতৃলোকের তর্পণ হয না। পবিত্র স্নেহাধার তিল তাঁহাদিগেব উদ্দেশে প্রদান করিয়া আমরা আপনাদিগকে পবিত্র জ্ঞান করি। সেখানে আর তৈল দিলে চলে না, সেখানে স্নেহ থাকিলে হইবে না, পিতৃলোক আমাদের স্নেহের জিনিস নন। তাঁহাদিগকে স্নেহাধার হৃদয় দিয়া পূজা করিতে হইবে। তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য ছিটেফোঁটা তৈল দিলে চলিবে না, তাঁহাদিগকে স্নেহ করিলে হইবে না,—তাঁহাদিগকে অকপটে হৃদয় উৎসর্গ করিতে হইবে, তবেই তাঁহাদের তর্পণ করা হইবে, তাহাকেই শ্রাদ্ধ করা বলে। আবার যত প্রকাব সদগন্ধ তৈল সমস্তই গন্ধদ্রব্য যোগে এই তিলজ তৈল হইতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে সে আবও সুখসেব্য হয়, আরও স্নিগ্ধকর হয়, তবে একটু দাম বেশি, একটু বড়মানসীব উপাদান। স্নেহের উপর একটু রং চড়াইলেও ঠিক তাহাই। সমাজে অনেকেই পিতা মাতাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, ভাই ভগিনীকে, স্ত্রী পুত্র কন্যাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, তবু এক এক জনেব অদৃষ্টক্রমে একটা না একটার জন্য একটু নাম বাহির হয়, লোকে বলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃ-স্নেহ বড় অধিক, বিশ্বাস মহাশয়ের ভ্রাতৃ-স্নেহ বড় প্রবল, অমৃত বাবু ছেলেপিলেগুলিকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন। সেটা কেবল ফুলেলতৈলের গন্ধ, গন্ধটা বেশ সুস্নিগ্ধ, তবে একটা গন্ধদ্রব্যের সহিত স্নেহের যোগ করিতে হইয়াছে, তাহা না হইলে যে তৈল তাহাই থাকিত কেহ টের পাইত না, কেহ তাবিপ কবিত না।

ক্রমে অপবাপর তৈলের কথা বলা আবশ্যক। তিলের তৈলের নীচেই আমাদের দেশে সর্ষপ তৈলের ব্যবহার, সর্ষপ তৈল আমাদের প্রতিবাসীর স্নেহ; তিলেব তৈলের মত স্নিগ্ধকর না হউক অনেক উপকারে লাগে। তিলের তৈলেব ন্যায শবীবাভ্যন্তরস্থ বায়ু দমন না করুক ইহাতে চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হয, শবীবের উপবিভাগ বেশ চকচকে করে, চর্ম্মরোগ বিনাশ করে, নানা প্রকার উপকারে লাগে। প্রতিবাসীর স্নেহ ততটা হৃদয়স্পর্শী না হইলেও সামাজিক লোকেব পক্ষে উহা বড় উপকারী। প্রতিবাসীব সহিত সদ্ভাব থাকিলে সমাজে বেশ সুখে সচ্ছন্দে থাকা যায়; বাহিরে কোন উপদ্রব থাকে না, এখানে একটা ফোড়া ওখানে একটা পাঁচড়া হয় না, ইহাব সহিত দ্বন্দ্ব, উহার সহিত কলহ হয় না। জীবনটা এক রকম নির্ব্বিবাদে কাটিয়া যায, আজকাল নানা কারণে তিলেব তৈল অপেক্ষা সর্ষপ তৈলের ব্যবহার বেশি হইয়াছে, অনেকে পিতা মাতাকে ভালবাসেন না, ভাই ও ভগিনীকে আদর করেন না, হয়ত স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতিকেও যত্ন করেন না, অথচ দেশহিতৈষী সাজিয়া দেশের লোকের উপকার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। এটা এখন বেশি হইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্যই সর্ষপ তৈলের এত প্রচার বেশি। আমরা

বুঝি না তিলের তৈল কত স্নিগ্ধকর সর্ষপ তৈল কত ঝাঁঝাল (এই জন্য বোধ হয় ইহাকে কড়ুয়া বা কটু তৈল বলে)। সর্ষপ তৈল একটু সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়, মাখিবার সময় হঠাৎ চক্ষুতে লাগিলে বড় জ্বালা করে। প্রতিবাসীর সহিত ব্যবহারটাও খুব সাবধানে করিতে হয় কিছুতে তুমি তাহাদের যেন চক্ষুর জ্বালা উৎপাদন করিও না তাহা হইলে বড় কষ্ট। সর্ষপ তৈলের কথা এই পর্য্যন্ত।

তৎপরে নারিকেল তৈল। ইহা নারীকুলেই বেশি চলন সুতরাং ইহা রমণী স্নেহ বলিলে চলে। পচা নারিকেল হইতে উৎপন্ন, গন্ধটাও আমাদের বড় ভাল লাগে না। হৃদয়ের অপবিত্র ভাবে যে স্নেহের সৃষ্টি তাহা পূতিগন্ধময় হইবে বৈকি? নারিকেল ফলটা বড় ভাল, কিন্তু তাজা নারিকেল হইতে তৈল হয় কি? নারিকেলকে আগে পচাইতে হয় তবে তৈল বাহির হয়। যাহার জন্ম দোষাশ্রিত তাহা ভাল হইবে কেমন করিয়া। রমণী স্নেহ বলিতে আমি কি বলিতেছি ভরসা করি বুঝিয়াছে, মাতৃ স্নেহ পত্নী স্নেহ, ভগিনী বা কন্যার প্রতি স্নেহ তাহা পবিত্র তাহা তিলের তৈল, কিন্তু এক্ষণে আমি পূতি গন্ধময় নারিকেল তৈলের কথা বলিতেছি; নারিকেল তৈলে নাকি কেশের বড় শোভা হয়, কেশ বৃদ্ধি হয়, তাহা না হইলে কেশপ্রিয় রমণী কুলে ইহার এত আদর হইবে কেন! দুর্ভাগ্যের বিষয়, বলিতে লজ্জা হয়, এখন অনেকে তিলের তৈল ত অনেকদিন ছাড়িয়াছেন, সর্ষপ তৈলও ত্যাগ করিয়া নারিকেল তৈল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমাজের দুরবস্থা কালে এমনই মতি বিভ্রম ঘটে। আবার তেলের মসলা বলিয়া অনেক প্রকার জিনিস্ সহর অঞ্চলে সর্ব্বদা বিক্রয় হয়, বিলাসবতী রমণীগণ তাহা নারিকেল তৈলে সিক্ত করিয়া পূতি গন্ধময় নারিকেল তৈলকে আরও দুর্গন্ধময় করিয়া ফেলেন, এমনই মানুষের রুচিভেদ ঘটিয়াছে, অনেকে সেই দুর্গন্ধটাকে নাকি ভাল বলেন।

শেষ কথা রেড়ীর তৈল ইহা ছোটলোকের ভালবাসা, দাস দাসীর স্নেহ; বড় পুকরকম, একটু তফাতে রাখিতে হয়, গন্ধটাও বড় ভাল নয়, তবে অনেক উপকারে লাগে। পরিষ্কার তৈল রেচক; দাস দাসী না থাকিলে আবর্জ্জনা দূর করে কে? জিনিষটা যতই অপ্রিয় হউক উপকারী, দাস দাসী না থাকিলে ভদ্র লোকের একদিন চলে কি; প্রদীপ জ্বালাইতে অনেক সস্তা পড়ে, তবে বড় শলিতা উসকাইতে হয়। দাসদাসীর প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য না রাখিলে তাহারা কখনই ভাল করিয়া কাজ করিবে না। একটু তফাতে রাখিতে হয় বলিয়াছি, একবার হাতে লাগিলে শীঘ্র ছাড়ে না, অনেক কষ্টে ছাড়াইতে হয়। ভৃত্য সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই একটু তফাতে রাখিবে, ভাল বাসিতে হইবে অথচ একটু তফাতে রাখিয়া। একটু আনুগত্য হইলে ছাড়াইতে বড় কষ্ট হয়, অথচ যেরূপ চটচটে ও দুর্গন্ধ না ছাড়াইলেও চলে না, পুরাতন ভৃত্যও সময়ে সময়ে যেরূপ কটকটে ও অবাধ্য হয়; না ছাড়াইলে চলে না। সেই জন্য বলি রেড়ীর তৈল তফাতে রাখা ভাল।

এই চাঁবি রকম দেশীয় তৈলই সচরাচর আমাদের দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে তৈল সম্বন্ধে দুই একটা সাধারণ কথা বলি। তৈল সংসাবী লোকের ভোগ্য পদার্থ, যোগী লোকের সেব্য নহে। যাঁহারা সংসারেব মায়ায আবদ্ধ তাঁহাবাই পারিবারিক স্নেহে, প্রতিবাসীর স্নেহে, রমণীর স্নেহে বা পরিচাবকের স্নেহে আবদ্ধ আর যাহারা মায়া পাশ ছেদন করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিযাছেন তাঁহারা স্নেহ মমতার হাত এড়াইয়াছেন। তাঁহারা তৈল ব্যবহার করেন না তাঁহাবা ভস্ম মাখেন। সকল তৈলই তাঁহাদের কাছে অপবিত্র জিনিস; শাক্যসিংহ পিতা মাতা স্ত্রী নবজাত শিশু, পৌবজন, লক্ষ দাস দাসীযুক্ত রাজ্য সকল ত্যাগ করিলেন কেন; যিনি পরম জ্ঞানী তাঁহাকে কোন স্নেহই আবদ্ধ করিতে পারে না, সে স্নেহ পবিত্রই হউক বা অপবিত্রই হউক। স্নেহ পবিত্র অপবিত্র আমাদেব কাছে, আমরাই বলি পরিণীতা ভার্য্যাব স্নেহ পবিত্র দুষ্টা বারাঙ্গনার স্নেহ অপবিত্র কিন্তু যোগীর পক্ষে দুই সমান ত্যজ্য। তাঁহারা তিলের তৈলকেও অপবিত্র জ্ঞান করেন। তাঁহারা ভস্ম মাখেন তাহাতেই তাঁহাদের সুখ তাহাতেই শান্তি। তৈল দাহ্য—স্নেহেরও নাশ আছে একটু শলিতা যোগ কবিয়া সব তৈলকেই পোড়ান যায়। কেবল শলিতার অভাব। পিতা পুত্রে স্নেহ, ভ্রাতায় ভ্রাতায় সদ্ভাব, প্রতিবাসীর সদ্ভাব প্রভৃতি সকল রকম সদ্ভাবকেই অল্পেই বিনষ্ট কবা যায়, তবে আপনা আপনি তৈলে আগুণ লাগে না একটা উপলক্ষ চাই একটা শলিতা চাই; একটা কঠিন জড় পদার্থ চাই তাহা হইলেই সব ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে, সে কঠিন পদার্থ টাকা কড়ি, বিষয় সম্পত্তি, লোক জন। সম্পত্তির জন্য পিতা পুত্রে বিরোধ, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ, প্রতিবাসীর সহিত বিরোধ, রমনীর সহিত বিবোধ, দাস দাসীর সহিত বিবোধ। তবু আমরা বুঝিনা যে অতি অপকৃষ্ট পদার্থ ছেঁড়া নেকড়া হইতে প্রস্তুত শলিতা হইতে আমাদের এত বিভ্রাট তবু আমরা বিষয় লইয়া এত উন্মত্ত।

বোবা মেয়ে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বৰ্দ্ধমান।

বৰ্দ্ধমানে বাসাপ্রভৃতি স্থির কর্‌বার জন্য পূর্ব্বেই রেল্ল যোগে একজন পরিচারককে পাঠান হয়ে ছিল। সুতরাং সেখানে উপস্থিত হয়ে পণ্ডিত মহাশয়কে আর কোনরূপ ক্লেশ ভোগ কর্‌তে হল না, গাড়ি হতে নেমেই সকলে নিজ নিজ উপযুক্ত বিশ্রাম স্থানে গেলেন। পরদিনও কেবল বিশ্রামেই অতিবাহিত হয়ে গেল। এত দীর্ঘপথ নিরবচ্ছিন্ন ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে পণ্ডিত মহাশয় নিতান্ত ক্লান্ত হযে পড়ে ছিলেন, অন্ততঃ আরও একদিন বিশ্রাম না করে নূতন স্থানটা দেখ্‌বার ইচ্ছা ছিল না; মদনমোহনেরও সেইরূপ। কিন্তু সুরেশ নিশ্চেষ্ট একস্থানে দুই তিন দিন বসে থাক্‌বার লোক নহেন। তিনি কেবল পণ্ডিত মহাশয় আর মদনমোহনের অনুরোধেই অগত্যা একদিন বিশ্রাম কর্‌লেন, আর অধিক দিন নিশ্চেষ্ট এক-স্থানে বসে থাক্‌তে পার্‌লেন না! মধ্যাহ্ন-আহারাদির পর ক্ষণকাল বিশ্রাম করেই পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে নূতন স্থানটী দেখ্‌তে গেলেন। মহারাজাধিরাজ সিকিমাধিপতিও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। সিকিমাধিপতি বৰ্দ্ধমানের মনোহর স্থান সকলের অপেক্ষা শতসহস্র গুণে অধিক মনোহর ও আশ্চর্য্য স্থান দেখেছেন, সে সকল দেখ্‌বার জন্য আর তাঁর ঔৎসুক্য নাই; কেবল পণ্ডিত মহাশয় আর সুরেশের কৌতূহল নিবারণ কর্‌বার জন্যই যত চিন্তা!

বৰ্দ্ধমানের দেলখোষ প্রভৃতি দেখে অনেকেরই হৃদয়ে তৃপ্তিলাভ হয় বটে, কিন্তু সুরেশের হৃদয় সাধারণের অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন; সুতরাং সে সকল অকিঞ্চিৎকর কৃত্রিম শোভা তাঁর ভাল লাগ্‌ল না। স্বাভাবিক শোভা দেখ্‌বার জন্য বাকা নদীর তীরে বেড়াতে গেলেন। পণ্ডিত মহাশয় ভিন্ন প্রকারের লোক, তাঁর রুচি ভিন্ন প্রকার; সুতরাং সুরেশের সেরূপ ইচ্ছায় নিতান্ত বিরক্ত হলেন—এমন মনোহর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য স্থানগুলি দেখা হল না—গাড়ি ঘোড়া থাক্‌তে পদব্রজে ভ্রমণ কর্‌তে হচ্চে, এইরূপ নানা কারণে মনে মনে বড় চটে গেলেন, ; কিন্তু কি করেন, রাজাধিরাজ সিকিমাধিপতি যখন সে সকল বিষয়ে কোন কথাই বল্‌চেন না, তখন তার বিরুদ্ধে কোন কথা বল্‌তে সাহস হল না। অগত্যা সুরেশ ও মহারাজাধিরাজের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌লেন। পণ্ডিত মহাশয়ের মনোগত ভাব আর চতুর মদনমোহনের জান্‌তে বাকী রইল না,—আবার পাঁচটা অলীক গল্প কর্‌বার সুবিধা পেলেন।

মদনমোহন বল্লেন "পণ্ডিত মহাশয়! আপনি এরূপ পদব্রজে কতদূর ভ্রমণ কর্‌তে পারেন?".

"পণ্ডিত মহাশয় উত্তর দিলেন "পঠদ্দশায় অনেক ভ্রমণ কব্‌তে পার্‌তেম; এখন বোধ হয় তত পারি না, অনুমান চার্‌ পাঁচ ক্রোশ পারি।"

"সেকি, এত অল্প!"

পণ্ডিত মহাশয় "অল্প" এই কথাটী শুনেই একেবারে চম্‌কে গেলেন,—কি ভয়ানক চাব্‌ পাঁচ ক্রোশ অল্প! মদনমোহন পুনরায় বল্লেন "আমি যখন দেশভ্রমণে গিয়েছিলাম, তখন আমাকে স্থান বিশেষে এক এক দিন বিশ পঁচিশ ক্রোশ ভ্রমণ কর্‌তেও হয়েছে।"

"বিশ—পঁচিশ—ক্রোশ পদব্রজে!"

"কি করা যায়, সকল স্থানেত আর যানবাহনাদির সুবিধা হয় না; বিশেষতঃ স্বাভাবিক শোভা দেখ্‌তে হলে যানবাহনাদিতে বড় সুবিধাও হয় না। বিবেচনা করুন, একটা জলপ্রপাত কি ঝর্‌ণা দেখ্‌বার জন্য পর্ব্বতের উপর দিয়ে যেতে হল।"

পণ্ডিত মহাশয় সে কথাতে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বল্লেন "বলেন কি মহারাজ, পর্ব্বতের উপর বিশ পঁচিশ ক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ করেছেন?"

মদনমোহন ঈষৎ হেসে বল্লেন "পর্ব্বতের উপর ভ্রমণ আপনাদের যেমন কঠিন বিবেচনা হবে, আমাদের তেমন নয়। আমরা পাহাড়ী লোক, পর্ব্বতেই আমাদের জন্ম—পর্ব্বতেই আমাদের সমস্ত। আমাদের সিকিম রাজ্যের রাজধানীই যে হিমালয়ের শিখরদেশে।"

পণ্ডিত মহাশয়ের হৃদয়ে আবার একটী নূতন চিন্তার উদয় হল, ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে বল্লেন "তবে সিকিম রাজ্যত অতি শীতপ্রধান দেশ?"

"বোধ হয় ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক অবস্থা শুনে থাক্‌বেন, সিকিমেরও ঠিক সেইরূপ, বিশেষ রাজধানী বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় মাস বরফে আবৃত থাকে।"

"তবেত শীতকালে রাজধানীতে বাস করা অত্যন্ত ক্লেশকর হয়।"

"ক্লেশকর কিছুই নয়; আমার প্রাসাদ আর নূতন দুর্গটী পৌষ মাসেও গ্রীষ্মকালের ন্যায় উষ্ণ থাকে।"

পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বল্লেন "এত শীতে উষ্ণ থাকে! সে কিরূপ?"

মদনমোহন ঈষৎ হেসে বল্লেন "পণ্ডিত মহাশয়, বিজ্ঞানশাস্ত্রের কি কিছু অসাধ্য আছে—সেই ভয়ানক শীতের সময় আমরা বৈদ্যুতিক অগ্নি প্রস্তুত করে সমস্ত উষ্ণ করে ফেলি। প্রাসাদের আব দুর্গের নিম্নে প্রস্তরের মধ্য দিয়া তাম্রময় তার সকল বিস্তৃত আছে, সেই তারে বৈদ্যুতিক শক্তি সংযোগ করে দেওয়া যায়, আর সমস্ত স্থান গ্রীষ্মকালের ন্যায় উষ্ণ হয়ে ওঠে। বাস্তবিক আপনি আমার রাজধানী দেখ্‌লে বিবেচনা কব্‌বেন, যে" ইংরাজদের এসকল ছেলেখেলা মাত্র। জল বায়ু অতি উত্তম;—আপ্‌নি কখন বরিশাল অঞ্চলে গিয়েছিলেন?—বরিশালের যেমন চমৎকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, সেখানে ঠিক্‌ সেইরূপ! খাদ্য দ্রব্য অতি চমৎকার প্রস্তুত হয়—এক প্রকার ক্ষীর প্রস্তুত হয়ে থাকে, তার আস্বাদ অবিকল বরিশালের ক্ষীরের ন্যায়।" মহারাজাধিরাজ সিকিমাধিপতি অনবরত নিজ রাজ্যের ঐশ্বর্য্য বর্ণন কব্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, পণ্ডিত মহাশয়ও অবাক্‌ হয়ে সেই সকল

শুন্‌তে লাগ্‌লেন। সুরেশ একমনে প্রকৃতির শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে অগ্রসর হয়ে চল্লেন।

বাঁকানদীর প্রশস্ত হৃদয়ের মধ্য দিয়ে একটী অগভীর সূক্ষ্ম স্বচ্ছ বারিধারা ঝর্ ঝর্ করে প্রবাহিত হচ্চে। দুই পার্শ্বে অযত্নসম্ভূত বৃক্ষসমূহ কেমন এক প্রকার বন্য শোভায় শোভিত হয়ে, যেন হাস্‌চে। স্থানে স্থানে গাঢ় লতাজাল এক একটী বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করে, চারিদিক হতে ঝুলে ঝুলে পড়েছে, বড় বড় বন-পুষ্পের গুচ্ছ বায়ুভরে ধীরে ধীরে দুল্‌চে, স্থানে স্থানে বিমল জ্যোৎস্নার ন্যায় ধবল কান্তি কাঠমল্লিকার ফুল ফুটে, যেন আলোকিত করে রয়েছে, মৃদুমন্দ দক্ষিণ পবনে তার অল্প অল্প সুগন্ধ আস্‌চে। কোথাও বা বড় বড় বটগাছ স্থূল স্তম্ভ সদৃশ নামনারূপ অবলম্বনে বিস্তৃত শাখার গুরুভার ন্যস্ত করে যেন সুখে নিদ্রা যাচ্চে। সুরেশ আর কখন সেরূপ অপূর্ব্ব গ্রাম্য শোভা দেখেন নাই—সেই মনোহর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখে হৃদয়ে কেমন এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হল, তিনি বল্লেন "আ! দেখ দেখ কি চমৎকার শোভা! মদন—"

মদনমোহন বুঝ্‌লেন অদৃষ্টপূর্ব্ব মনোহর, বন্য শোভা দেখে সুরেশের হৃদয় একেবারে আনন্দে পূর্ণ হয়ে গিয়াছে,—সুরেশ সমস্ত বিস্মৃত হযে গিয়েছেন; এখনই সিকিমাধিপতির ছদ্মবেশ প্রকাশ করে ফেল্‌বেন। তাড়াতাড়ি সুরেশের নিকটে গিয়ে মৃদুস্বরে বল্লেন "কিহে, ব্যাপার খানা কি?"

"আহা! দেখ দেখি কেমন চমৎকার শোভা হয়েছে, যেন প্রকৃতি দেবীর আটচালাখানি! ইচ্ছা করে ঐ মনোহর নির্জ্জন স্থানটীতে বসে দিবানিশি কেবল মনোমত চিন্তা করি।"

মদনমোহন ঈষৎ হেসে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা কল্লেন 'কিসের চিন্তা? দিবা-নিশি চিন্তা কর্‌বে এমন কি প্রিয় চিন্তা আছে,—মোহিনী-রূপ-চিন্তা না কি?"

সুরেশ গম্ভীর ভাবে একবার সঙ্গীর মুখের দিকে থর দৃষ্টিপাত করে বল্লেন মদন, সে চিন্তা কি এখনও আমার হৃদয়ে স্থান পায়? তুমি কি জাননা এখন আমি আর সে সুরেশ নাই?"

"তবে কার চিন্তা? এমন নির্জ্জনে বসে দিবানিশি চিন্তা কর্‌বে এমন প্রিয় প্রণয়ভাজন কে?"

সুরেশ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে চিন্তা করে বল্লেন "কে? কার চিন্তা কর্‌ব? ভাই মদন, যথার্থ—আমি নিজেই জানিনা কার চিন্তা কর্‌ব। যার চিন্তা কর্‌ব তাকে আমি কখন দেখি নাই,—নামও শুনি নাই। সে একটী কল্পিত মূর্ত্তি; স্নেহের প্রকৃত মর্য্যাদা জানে ভাল বাসার মূল্য বুঝ্‌তে পাবে, নম্র, সরল প্রণয়মাখা কোন রমণী মূর্ত্তি।"

মদনমোহন একটু মুচ্‌কে হেসে বল্লেন "আ! বুঝেচি—তবে সেই কল্পিত প্রণ-য়িনীর অন্বেষণেই বাঁকা তীরে!"

"না ভাই, অন্বেষণের প্রযোজন কি—আর অন্বেষণও কারও করি নাই— দৈব যখন এনে দেবে, তখন সে আশার ফল স্বয়ংই উপস্থিত হবে।"

"বেস্ কথা, দৈব যদি ভাই আরও ত্রিশ বৎসরের পর মিলিয়ে দেয়? তাহলেইত—লোকে যা বলে তাই হবে।

সুরেশ মদনমোহনের সৈইরূপ পরি-হাসে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বল্লেন "মদন!

প্রণয়-কাকে বলে, সে কিরূপ পদার্থ তা তুমি জান না।”

মদনমোহন অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বল্লেন “সুরীবাবু! প্রণয়ত ক্রীড়া কর্বার পুত্তলিকা। বালক বালিকারা যেমন পুতুল নিয়ে, যার যেরূপ ইচ্ছা সে সেইরূপ বেশ ভূষায় ভূষিত করে ক্রীড়া করে; তেমনি যুবকেরাও আপনার মনোমত করে প্রণয়ের একটা রূপ গড়ে নিয়ে থাকে। কেমন পণ্ডিত মহাশয় অপ্নি কি বলেন?”

ছাত্রের সম্মুখে সেরূপ নিয়মে কথা-বার্ত্তা কহা পণ্ডিত মহাশয়ের অভিপ্রেত নয়, সুতরাং তিনি বল্লেন “আজ্ঞে ও সকল বিষয় আমি বড় বুঝি না।”

নানারূপ কথাবার্ত্তায় তিনজনে প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করে চল্লেন। সুরেশ স্থানে স্থানে প্রকৃতির শোভা দেখ্বার জন্যে দাঁড়াতে লাগ্লেন। পণ্ডিত মহাশয়ও সেই অবকাশে এক একবার শ্যামল তৃণক্ষেত্রের উপর উপ-বেশন করে বিশ্রাম কর্তে লাগ্লেন। একবার বস্লে পণ্ডিত মহাশয়ের পুন-রায় ওঠা অত্যন্ত কঠিন বোধ হতে লাগ্ল।” কিন্তু কি করেন সিকিমাধি পতির খাতির, কাজে কাজেই অগত্যা তাঁদের অনুসরণ কর্তে লাগ্লেন। সহসা অদূরে বাদ্যধ্বনি প্রতিগোচর হল। সুরেশ বল্যেন “বোধ হয় গ্রামে কোন-রূপ গ্রাম্য উৎসব থাক্বে; চলুন এক-বার দেখে আসা যাক্ নাগরিক আর গ্রাম্য আমোদ প্রমোদে কত বিভিন্ন।—সরলহৃদয় পল্লিগ্রামবাসিদের আমোদ আহ্লাদ বোধ হয় অধিকাংশে নির্দ্দোষ হবে।”

মদনমোহন তাঁর সে ইচ্ছায় আর কোন মত দিলেন না। পণ্ডিত মহা-শয়ের কোন আপত্তিই নাই,—উৎসব ভূমিতে অবশ্যই বিশ্রাম স্থান পাওয়া যাবে, ক্ষণকাল উপবেশন করে পথশ্রম দূর কর্তে পার্বেন, সুতরাং সে প্রস্তাবে তিনি আরও প্রীত হলেন।

নিকটেই এক ক্ষুদ্র গ্রাম; গ্রামের প্রান্তে বাঁকা নদীর তীরে ধর্ম্মতলা, একটী ধর্ম্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। গ্রামের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই কৃষিজীবী সামান্য লোক, সুতরাং সেখানে আর কোনরূপ উৎসব নাই; কেবল বৎসরা-ন্তর ধর্ম্মোৎসব বা ধর্ম্মের গাজন হয়, তাতেই বা উৎসবের চূড়ান্ত হয়ে থাকে। সেই আমোদেই সমস্ত গ্রামের আমোদ। এখন সেই গাজন উপস্থিত, ধর্ম্মতলায় মহা সমারোহ পড়ে গেছে। একদিকে কবির গান আরম্ভ হয়েচে, অন্য-দিকে ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম-বাসীরা নৃত্য কচ্চে। এখানে একটা বানর, ওখানে একটা ভালুক, এদিকে পাগল, ওদিকে মাতাল এই প্রকার নানা স্থানে নানারূপের সঙেরা যথাসাধ্য গ্রাম্য পরিহাস করে—অঙ্গ ভঙ্গী করে দর্শকদিগকে আনন্দিত কর্বার চেষ্টা কচ্চে। নিকটস্থ গ্রামবাসীরা প্রায় সক-লেই দেখ্তে এসেছে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা, কেহই আর বাকী নাই। একদিকে স্ত্রীলোকেরা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যদিকে বালক বালিকারা কোলাহল কচ্চে;—লোকে লোকারণ্য। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে প্রায় সকলেই হীনাবস্থ নিম্ন শ্রেণীর লোক; আমাদের নায়ক আর তাঁর সহচর দুইজন সেই স্থানে

গিয়ে দাঁড়াতেই তারা সম্মুখ থেকে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। "বাবুরা এসেছেন, বাবুরা এসেছেন" বলে কাণাকাণি গুজোগুজি হতে লাগ্‌ল। তাড়াতাড়ি একজন একখানি খুর্‌সী আর দুটো মোড়া এনে নবাগত দর্শকত্রয়ের সম্ভ্রম রক্ষা কর্‌লে। তিনজনেই উপবিষ্ট হলেন।

গ্রাম্য আমোদ প্রমোদ সুরেশের বড় অধিকক্ষণ ভাল লাগ্‌ল না; "আপ্‌নারা বসুন, আমি আস্‌চি" তিনি এই কথা বলেই, সেখান থেকে উঠে গেলেন। পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন, সিকিমাধিপতিরও বন্য দৃশ্য, ঝোপ, জঙ্গল ভাল লাগ্‌ছিল না, সুতরাং তাঁরা সেইখানেই বসে গাজন দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

সুরেশ উৎসবস্থান ত্যাগ করে পুনরায় নদীতীরে গেলেন। আনন্দধ্বনিপূর্ণ জনতা অপেক্ষা নির্জ্জন স্থানটা তাঁর অধিক মনোরম বলে বোধ হতে লাগ্‌ল। গাজনের বাদ্যধ্বনি নদীপারে প্রতিধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্চে—লোকের কোলাহল অল্প অল্প শ্রুতিগোচর হচ্চে। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগ্‌লেন, আর সেই সকল অস্পষ্ট শব্দ শুন্‌তে শুন্‌তে নিজ স্বাভাবিক চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। আ! একি! সহসা তাঁর গতিরোধ হল; সম্মুখে নদীর পাড়ের উপর, বটমূলে একটী কিশোরী রমণীমূর্ত্তি! রমণী এক দৃষ্টে গাজনতলার আমোদ আহ্লাদ নৃত্যগীত দেখ্‌চে।

কামিনী সবে এই বাল্যাবস্থা অতিক্রম করে যৌবন সীমায় পদক্ষেপ করেছে; বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক হবে না। এখনও মুখমণ্ডলে কোমল বালিকা ভাব স্পষ্ট লক্ষিত হচ্চে। ধর্ম্মতলায় বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে বালকদের ঊর্দ্ধ হস্তে নৃত্য দেখে বালিকার মুখমণ্ডলে কেমন একপ্রকার বিষাদমাখা মধুর ঈষৎ হাসি উদিত হল, পরক্ষণেই আবার সেটুকু বিলীন হয়ে মুখখানি একরূপ ম্লান গম্ভীর ভাব ধারণ কর্‌লে। সুরেশ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

বসন ভূষণে অনেককে সুন্দরী দেখায় বটে, কিন্তু প্রকৃত রূপে কোন প্রকার ভূষণেরই প্রয়োজন নাই। এও সেই প্রকৃত রূপ—কার সাধ্য এ রূপকে আচ্ছাদিত করে রাখ্‌তে পারে? জীর্ণ মলিন বস্ত্রখানিতে অতুল রূপরাশি ঢাকা পড়্‌চে না; রমণী প্রকৃত রূপবতী। অনেকের মনে অনেকরূপ সৌন্দর্য্যের ভাব আছে, কাহার কাহার মতে কেবল উজ্জ্বল গৌরবর্ণই সৌন্দর্য্যের প্রধান উপকরণ; যে গৌরাঙ্গী, সেই সুন্দরী; শত দোষ থাকুক না কেন সে-ই প্রকৃত সুন্দরী। সেরূপ লোকের নিকট এ বালিকাটী হয়ত রূপবতী নয়, কিন্তু তদ্ভিন্ন সকলেরই মনোহারিণী; রমণী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। ভাসা ভাসা আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন দুটীতে যেন কেমন একপ্রকার বিষাদপূর্ণ ভাব প্রকাশ হচ্চে জোড়া ভ্রুর দুই পাশ দিয়ে আকুঞ্চিত অলকাবলি মৃদু মৃদু বায়ুভরে দুল্‌চে। বালিকা ... পটু চিত্রকরের পটের পুতুলটীর মত স্থির বসে আছে। সুরেশ নিশ্চল নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রূপরাশি দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।—দৃষ্টি যেন কেমন সেই সরলতা মাখা মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ হয়ে গেল, তিনি আর কোনরূপে নয়নদ্বয় ফেরাতে

পাব্‌লেন না। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই আনন্দিত, গ্রামের সকলেই উৎসবে মত্ত, সকলেই ধর্ম্মতলায় গাজনের সমারোহ দেখ্‌চে, গান বাজনা শুনচে, আমোদ প্রমোদ কচ্চে; এমন উৎসবের দিনে এ বালিকাটী এখানে নির্জ্জনে একাকী নিস্তব্ধ উপবিষ্ট কেন? মুখখানি ম্লান, নয়নদ্বয় বিষাদপূর্ণ কেন? সুরেশ রমণীটাকে মুহূর্ত্ত কাল দেখেছেন মাত্র, তথাপি কেমন হৃদয় যেন আপনা আপনিই তার কোন অজ্ঞাত দুঃখে দুঃখ অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল। তার প্রকৃত বিবরণ জান্‌বার জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠ্‌লেন। এই সময় কয়েক জন চাষাভুষোমত লোক বাঁকা পার হয়ে সেই স্থান দিয়া গাজন দেখ্‌তে যাচ্ছিল, সুরেশ তাদের নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "হাঁগা তোম্‌রা বল্‌তে পার, ঐ বালিকাটী কে? এমন উৎসবের দিনে সকলেই দেখ্‌চি হেসে খেলে বেড়াচ্চে, সকলেই আমোদ প্রমোদ কচ্চে, কিন্তু এ মেয়েটী এমন ম্লান নিস্তব্ধ নির্জ্জনে বসে কেন?" তারা একবার বালিকাটীর দিকে চেয়ে দেখে বল্লে "আহা চিরদুখিনী মহা! এ ভারতে ও আর কখনই হেসে খেলে বেড়াবেনা।—ও আমাদের মহামায়া!" গাজন দেখ্‌বার জন্য তারা নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি যাচ্ছিল সুতরাং আর কিছুই বল্লে না,—কেন যে তিনি সেরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন কর্‌লেন, সে কথাও জিজ্ঞাসা কর্‌লে না, দ্রুত চলে গেল।

শ্রীমদ্রূপ সনাতন।

(শ্রীচৈতন্যের সহ সম্মিলন ও পলায়ন।)

একদা রাত্রিযোগে সাকরমল্লিক ও দবীর খাস মহাপ্রভুর সহিত সম্মিলনাকাঙ্ক্ষায় একত্রে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা মন্ত্রিবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীনহীন বেশে চলিলেন। প্রথমেই হরিদাস ও নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা দুই ভ্রাতাকে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলাইয়া দিলেন। রূপসনাতন গললগ্ন বস্ত্রে দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক বারম্বার দণ্ডবৎ প্রণাম ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এ জগৎ উপার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত। উপার্জ্জনের জন্য মানব কি না করিতেছে? দরিদ্র—ধনীর কাছে প্রার্থনা করে,—উপার্জ্জনের জন্য। আমরা কখন কখন ধার্ম্মিক মহাত্মাদের কাছে যাই, সেও উপার্জ্জনের জন্য বই নহে। অবস্থাভেদে উপার্জ্জন বহু প্রকার। সকলেই ভবিষ্যতের জন্য কিছু সম্বল সংস্থান করিতে চাহেন।

আমরা সাংসারিক অভাব বহু প্রকারে পূরণ করিতে পারি, কিন্তু মৃত্যুর হাত এড়াইতে আমাদের ক্ষমতা নাই। যিনি ধীরচিত্তে একবার মৃত্যু চিন্তা করেন, তিনি কখনই স্থির থাকিতে পারেন

না। ভগবানের মায়াশক্তি-প্রভাবেই আমরা এ গুরুতর বিষয়টী ভুলিয়া সংসারে সুখে বিচরণ করিতে পারিতেছি। যদি লোক মৃত্যুর কথা না ভুলিত; যথার্থ চিন্তা যাহাকে বলে, মৃত্যু-বিষয়ে সে চিন্তা যদি তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ় অঙ্কিত হইত, তবে সম্পূর্ণ না হউক, কিয়ৎ পরিমাণে বুদ্ধদেবের দশা প্রাপ্ত হইতে হইত।

যাঁহার মনে মৃত্যু-ভাবনা আছে, তিনিই ভবিষ্যতের যথার্থ সম্বলার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত। তিনি বলেন—গার্হস্থ্য জীবনে ভবিষ্যতের জন্য উপার্জ্জন করিয়া রাখা বিচক্ষণতা বটে কিন্তু সে-ই যথার্থ বিচক্ষণ,—সে-ই যথার্থ বিজ্ঞ, যে শেষ সময়ের জন্য কিছু সম্বল সংস্থান করে। যখন আমাদের আত্মীয় পরিবার হইতে কিছুমাত্র সাহায্য পাওয়ার আশা নাই, এখন যাহারা প্রাণাধিক প্রিয়, যে সময়ে তাহারাও পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়, তখনকার জন্য কিছু সম্বল সংস্থান করা বিজ্ঞজনেরই কর্ত্তব্য।

এখন পাঠক! রূপসনাতনের ক্রন্দনের হেতু কি বোধ হয় বলিবার আবশ্যকতা নাই। দরিদ্র ধনীর কাছে প্রার্থনা করে, রূপসনাতন মহাপ্রভুর কাছে প্রেমভক্তি প্রার্থনা করিতে উপস্থিত। কিন্তু তাঁহাদের ক্রন্দনের আরও হেতু আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বের কথা তখন বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। কেহ বিশ্বাস করিতেছিল, কেহ না। যখন অবতারের কথা প্রথম প্রকাশ হইল, দেশে তখন হুলস্থূল পড়িয়া গেল, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অধিকাংশই প্রতিকূলে দাঁড়াইলেন, অনুকূলবাদিগণ প্রমাণ-প্রয়োগে স্বপক্ষ দৃঢ় করিতে চেষ্টা পাইলেন। এই সময়েই ভবিষ্যৎ অবতারসূচক—চৈতন্যের অবতারত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলী সংগৃহীত হয়*। এই অবস্থায়

---

* পাঠকের পরিতৃপ্ত্যর্থে এইরূপ কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা—

১। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরং সাম্যমুপৈতি॥"
(সামবেদ)

২। "সপ্তমে গৌরবর্ণ বিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈতন্যমেত্য প্রাপ্তে।
প্রাতরবতীর্য্য সহস্বৈঃ স্বমনু শিক্ষয়তি॥"
(অথর্ব্ববেদ—পুরুষবোধিনী।)

৩। "ইতোঽহং কৃতসন্ন্যাসোঽবতরিষ্যামি নির্ব্বেদো নিষ্কামো ভূগীর্ব্বাণ স্তীরস্থোঽলকনন্দায়াঃ কলৌ চতুঃসহস্রাব্দোপরি পঞ্চসহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণো দীর্ঘাঙ্গঃ সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ঈশ্বরপ্রার্থিতো নিজরসাস্বাদো ভক্তরূপো বিপ্রাখ্যো বিদিতযোগোঽস্যাং।"
(আথর্ব্বণস্য তৃতীয়কাণ্ডে ব্রহ্মবিভাগে।)

৪। "গোলকঞ্চ পরিত্যজ্য লোকানাং ত্রাণ কারণাৎ।
কলৌ গৌরাঙ্গরূপেণ লীললাবণ্য-বিগ্রহ॥"
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ।)

৫। "আনন্দাশ্রু-কলালোমহর্ষ-পূর্ণিতবোধনং।
সর্ব্বংমামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসরূপিনং॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।)

৬। "দিবিজো ভূবিজায়ধ্বং জয়ধ্বং বৈ সুরেশ্বরাঃ
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥
(শিবে।)

৭। "ভবিষ্যামি কলৌকালে ভগবান্ ভূতভাবনঃ
দ্বিজাতীনাং কুলে জন্ম গ্রাহকৈঃ পুরুষোত্তম
(বিবৌ।)

রূপসনাতন কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে না পারিলেও তাঁহাদের মন পূর্ব্বাপর মহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট ছিল, পূর্ব্বাপর তাঁহাদের সরল ধর্ম্মমত চৈতন্যের সহিত এক হইয়াছিল। কিন্তু যখন তাঁহারা মহাপ্রভুকে দেখিলেন, তখন তাঁহাদের সংশয় অপনোদিত হইল—মন প্রফুল্ল হইল। শ্রীচৈতন্যে ভগবানের বিভূতি পূ। প্রকাশিত, শ্রীচৈতন্যে তাঁহার প্রেম পূর্ণ প্রতিফলিত দেখিয়া তাঁহারা অধীর হইলেন। "তিনিই এই"—দর্শনমাত্রই রূপসনাতনের মনে এ বিশ্বাস জন্মিল। তাই তাঁহারা শ্রাবণের বারিধারা বর্ষণের ন্যায় অবিরলধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যথা—

"প্রভুর দর্শনে দোঁহার হৈল চমৎকার।
ঈশ্বর জানিয়া করে স্তুতি নমস্কার॥"
(প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয়।)

"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥
নীচ জাতি নীচ সঙ্গে করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥

৮। কলৌ গোবৰ্দ্দনচ্ছন্নান্ সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতান্
শচীগর্ভে সমুদ্ভূতস্তারয়িষ্যামি নারদ॥"
(বামনে।)

৯। "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"
(ভাগবতে।)

১০। "শ্বেতং সত্যযুগে বর্ণো রক্তং ত্রেতাযুগে পুন।
দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণোঽহং পীতঃ কলিযুগে মম॥"
(স্কান্দে।)

অষ্টাদশ মহাপুরাণে, উপপুরাণাদিতে, তন্ত্রে, সংহিতায়, এবং বহু উপনিষদে এইরূপ ভাব ব্যঞ্জিত বহু শ্লোক পাওয়া যায়, এবং প্রাচীনগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত আছে। সে সমস্ত উদ্ধৃত করা অসম্ভব, উদাহরণ স্বরূপ কএকটী মাত্র উদ্ধৃত হইল।

পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
আমা বই পতিত জগতে নাই আর॥"
"জগাই মাধাই হৈতে কোটী কোটী গুণে।
অধম পতিত পাপী আমরা দুজনে॥
ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছ সঙ্গী করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম *
গোব্রাহ্মণ দ্রোহি সঙ্গে আমার সঙ্গম॥

* এই দৈন্যবাক্যগুলিই রূপসনাতনকে যবনত্বে পরিণত করিয়াছে। এইরূপ দৈন্য করায় ৪০০ শত বৎসর পরে তাঁহারা যবন হইয়া যাইবেন জানিলে বলিতেন না। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ম্লেচ্ছাদি পতিত জাতির দাসত্ব স্বীকারে পাতিত্য জন্মে। যবনরাজের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া রূপসনাতন আপনাদিগকে পতিত মনে করিতেন পূর্ব্বোক্ত বাক্যই তাহার প্রমাণ। যাঁহারা বিদ্বান বুদ্ধিমান বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদেরই দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রূপ দৈন্যবাক্যগুলি অর্থান্তরে বিবেচিত হইতেছে, ইহাই দুঃখ। রূপসনাতনকে যবন বলিলে—

"—নীচ সঙ্গে করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥"
এবং "ম্লেচ্ছ সেবী করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম।"

এই কথাগুলির সার্থকতা কি থাকে? যে ম্লেচ্ছ জাতি, অপর ম্লেচ্ছের কর্ম্ম করিতে তাঁহার লজ্জা বা দোষ কি আছে?

ভক্তি রত্নাকর বলেন:—

"পিতা পিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার।
তাহা বিচারেতে মনে মানয়ে ধিক্কার॥
যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়।
হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয়॥
করি মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে জান।
এহেতু আপনাকে মানে ম্লেচ্ছের সমান॥"
"যবে মগ্ন হন দৈন্য সমুদ্র মাঝারে।
ম্লেচ্ছাধিক হৈতে নীচ মানে আপনারে॥
নীচ জাতি সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার।
এই হেতু নীচ জাত্যাদিক উক্তি তাঁর॥
বিপ্ররাজ হৈয়া মহা খেদ যুক্তান্তরে।
আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে॥"

এখন কি বলেন? তিন শত বর্ষের প্রাচীন পুস্তকের কথা হইতেও যিনি আপনার অনুমানকে" শ্রেষ্ঠ বোধ করেন, তাঁহার অনুমানকে ধন্য!!

মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলীযে বান্ধিয়া।
কু-বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ডারিয়া॥
আমা উদ্ধারিতে বলি নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা চিনে॥"
(চৈতন্য চরিতামৃত)

চৈতন্য ভাগবতাদি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা জানেন যে, মহাপ্রভুর দুইটী ভাব হইত। একটী ভক্তভাব, অপরটী ভগবান্ ভাব। সহজ অবস্থায় তিনি আপনাকে দীনাতিদীন মনুষ্যমাত্র বোধ করিতেন, সেইরূপভাবে কথা কহিতেন, বিষ্ণু ও তুলসীকে শ্রদ্ধা করিতেন; এবং কেহ ভ্রমেও তাঁহাকে ভগবান বলিয়া উল্লেখ করিলে জিব কাটিয়া নিষেধ ও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন; বলিতেন—জীবে ঈশ্বরবুদ্ধি করিলে উভয়েরই পতন হয়। ভক্তগণও তাঁহাকে তখন ভগবান বলিয়া বিশেষভাবে ভক্তি করিতে সাহস করিতেন না। আবার, যখন তাঁহার ঈশ্বরভাব হইত, তখন তিনি "মুই সেই, মুই সেই" (অর্থাৎ আমিই ভগবান) বলিয়া বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক বিষ্ণুচক্রকে একদিকে ফেলিয়া দিয়া স্বয়ং বিষ্ণুর আসনে উপবেশন করিতেন। ভক্তগণ তখন তাঁহার চরণে গঙ্গাজল তুলসী দিয়া পূজা করিলেও আপত্তি করিতেন না; ঐ সময় মাননীয় ব্যক্তিগণের মাথায়ও অসঙ্কোচে পা তুলিয়া দিতেন; এবং কোন কোন সময় তাঁহার শরীর প্রভাবিশিষ্ট হইত, প্রকৃতিস্থ হইলে ঐ সকল কথা সম্পূর্ণ মনে থাকিত না। এ অবস্থাকে ভক্তগণ "আবেশাবস্থা" বলেন।

আবেশাবস্থা ভিন্ন মহাপ্রভু কখনও অলৌকিক কোন কথা বলিতেন না, বা কিছু করিতেন না। রূপসনাতন যখন তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীচৈতন্যের আবেশতার কিঞ্চিৎ আবির্ভাব হইল। সেই ভাবেই তাঁহাদিগকে—

"—শুনি প্রভু কহেন রূপ দবীর খাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥ *
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপসনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥"
"জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার॥
এত বলি দুঁহার শিরে ধরে নিজ হাতে।
দুই ভাই নিল ধরি প্রভুর পদ মাথে॥"
(চৈতন্যচরিতামৃত।)

এইরূপে দুই ভাই মহাপ্রভুর কৃপা আকর্ষণ করেন; এইরূপে তাঁহাদের নাম রূপসনাতন হইল। তাঁহাদের পিতৃদত্ত নাম অমর ও সন্তোষ; রাজদত্ত নাম—দবীর খাস ও সাকর মল্লিক, এবং

* বৈষ্ণব শাস্ত্রে ভগবান এবং তদীয় বিশেষ বিশেষ শক্তির অবতারণ স্বীকৃত হইয়াছে, বিশেষ বিশেষ পাত্রে বিশেষ বিশেষ ভাবের আবির্ভাব কে অস্বীকার করিবে? অতএব কথিত হইয়াছে—

"সাদ্য গোবাভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ সনাতনঃ।
তমেব প্রাবিশৎ কাম্যামুনিবত্বং সনাতনঃ॥"
এবং "শ্রীরূপ মঞ্জরী খ্যাতাস্ বৃন্দাবনে পুরা।
সাদ্য রূপাখ্য গোস্বামী ভূত্বা প্রকটতামিয়াৎ॥"
গৌরগণোদ্দেশদীপিকা।

জন্মান্তর স্বীকার করিলে,—আত্মা যখন অবিনশ্বর, তখন একরূপ অবতারণ অস্বীকার করিবার হেতু কি আছে? আবেশাবস্থায় মহাপ্রভুর তাঁহাদিগকে "পুরাতন দাস" বলিবার অর্থ তাহাই। "শুন রূপ দবীর খাস" নাম রক্ষার পূর্ব্বে এই "রূপ" সম্বোধনে পূর্ব্বনাম সূচিত হইতেছে কি?

প্রভুদত্ত শেষ নাম রূপসনাতন। এই নামেই তাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বিদায়ের পূর্ব্বে সনাতন মহাপ্রভুকে রামকেলি হইতে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন; বলিলেন— "যদিও যবনরাজ আপনাকে অত্যন্ত ভক্তি করেন, তথাপি হে প্রভো! তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না, যেহেতু তিনি হিন্দুবিদ্বেষ্টা যবন বই নহেন। যদ্যপি প্রভুর ইহাতে ভয়ের কারণ কিছুমাত্র নাই, তথাপি ইহা লৌকিক লীলা—লোকমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই হয়। ('যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়। তথাপি লৌকিক লীলা, লোকচেষ্টাময়॥" চৈঃ চঃ।) আর প্রভো! তীর্থযাত্রায় এত সংঘটও ভাল দেখায় না।"

শ্রীমহাপ্রভুর সে বার আর বৃন্দাবন যাওয়া হইল না। "ভক্তবৎসল" ভক্তের মহিমা বাড়াইতে জানেন, ভক্তের কথা তিনি কেন না শুনিবেন? রামকেলি হইতে আরো একটু অগ্রসর হইয়াই তিনি হঠাৎ ফিরিলেন ও বরাবর নীলাচলে চলিয়া আসিলেন।

রূপসনাতন গৃহে ফিরিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব সহ অতি অল্প সময়মাত্র অবস্থিতি করিয়া, প্রকৃত সুখ কি, তাঁহারা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন।

তৃপ্তিই সুখ। শান্তি যেখানে, সুখই সেখানে। ভোগীকে ভোগ্যবস্তু প্রদান কর, যত চাহে দাও; দেখিবে তৃপ্তি হইতেছে না। সুখ পা'তেছে না। ধনে মানে, ঐশ্বর্য্যে ক্ষমতায়, বাসনার চরিতার্থে বা বিলাসের প্রমত্ততায়, কিছুতেই যথার্থ তৃপ্তি নাই। থাকিলে যাঁহারা ধনী মানী, যাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী বা ক্ষমতাবান্ এবং পরম ভোগী বা বিলাসী ব্যক্তিগণ কেন হেলায় তাহা পরিত্যাগ করেন? বুদ্ধদেবের অভাব কি ছিল? কিন্তু প্রকৃত সুখ বা তৃপ্তি এ সকলে নহে। থাকিলে কে তাহা পরিত্যাগ করিতে চায়? তৃপ্তি ছাড়িয়া অতৃপ্তিকে কে আলিঙ্গন করে? শান্তি ছাড়িয়া অশান্তিতে কে ঝাঁপ দেয়? রূপসনাতন দেখিলেন, তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, মান সম্ভ্রম, পরিজন-প্রীতি বা লোকজন সম্বল, কিছুরই অভাব নাই। বঙ্গেশ্বর তাঁহাদের করধৃত, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে দেশের কর্ত্তা। সকলই তাঁহাদের আছে, তবে একটী নাই—সেটী মনের তৃপ্তি। একটী বস্তুর জন্য তাঁহারা লালায়িত—সেটী শান্তি। তাঁহারা বুঝিলেন, তৃপ্তিই সুখ; শান্তিই সুখ। তাঁহারা বুঝিলেন, সে সুখই ভক্তি। ভক্তিতেই তাহা অর্জ্জিত এবং ভক্তিতেই অবস্থিত। তাই আজ রূপসনাতন ভক্তি কণিকার জন্য ব্যাকুল। তাই অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহাদিগকে সুখ দিতে পারিতেছে না। যাহারা অভাবগ্রস্ত—দরিদ্র, তাহাদের আবার মান সম্ভ্রম কি? অসংখ্য প্রজার বৃথা সম্মান প্রদর্শন আর তাঁহাদের ভাল লাগিতেছে না। তাই তাঁহারা শান্তির উৎস, ভক্তির বিশ্রাম-ভূমি, শ্রীমহাপ্রভুর চরণাশ্রয়ের জন্য আজ লালায়িত।

কড্‌লিভার নামক তৈল ভারি বিস্বাদ ও দুর্গন্ধযুক্ত। যে রোগী অধিকদিন তাহা ব্যবহার করে, সে তাহাতে ক্রমে একটু একটু মিষ্টস্বাদ অনুভব করিতে থাকে। আমাদের অবিমিশ্র সাংসারিকতাও প্রায় তদ্রূপ। বস্তুতঃ

যে একবার সুমিষ্ট মধুর আস্বাদন করিতে পায়, সে কি কখন নিম্বে সন্তোষলাভ করিতে পারে? শ্রীচৈতন্য প্রভুর কৃপায়, প্রকৃত সুখ কি, রূপসনাতন বুঝিয়াছেন, আর কি "কু-বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে" তাঁহারা ডুবিয়া থাকিতে পারেন?—সংসার-ত্যাগই কর্ত্তব্য, ধর্ম্মই প্রকৃত পথ, ভক্তিই যথার্থ সম্বল,—রূপসনাতন মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, সংসার-ত্যাগ সামান্য নহে। ইচ্ছা করিলেই তাঁহারা যাইতে পারেন না। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা কখনই তাঁহাদিগকে চিরবিদায় দিবেন না। তখন ভাবিলেন যে, দৈবানুকূল্য ব্যতীত তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না, তজ্জন্য সৎব্রাহ্মণ দ্বারা বহু অর্থ ব্যয়ে দুইটী "পুরশ্চরণ" করাইলেন। ইহার উদ্দেশ্য আর কিছু নহে, কেবল—"অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ।" এতদ্ভিন্ন তাঁহারা পরিবারবর্গের কতক চন্দ্রদ্বীপে, কাহাকে কাহাকেও বা ফতোয়াবাদের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন; এবং মহাপ্রভুর সংবাদ সংগ্রহের জন্য দুই ব্যক্তিকে নীলাচলে প্রেরণ করিলেন। এইরূপ বন্দোবস্তের পর শ্রীরূপ আর বল্লভ, বহু ধন রত্ন বাটীতে আনিয়া সমানীত অর্থের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে দান এবং অবশিষ্ট কুটুম্বগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। যথা—

"ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে।
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে॥
দণ্ড বন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্র স্থানে স্থাপ্য রাখিল॥"

(চৈতন্য চরিতামৃত)

এতদ্ব্যতীত, সনাতন আবশ্যকমত ব্যয় করিতে পারেন, এজন্য গৌড়ের কোন এক বণিকের নিকট দশ সহস্র মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া আইসেন *।

শ্রীরূপের যে অবস্থা, মহাপ্রভুর সহিত রামকেলিতে সম্মিলনের পর সনাতনের দশাও তদ্রূপ হইল। এখন শ্রীরূপের হঠাৎ গৃহগমনে তদীয় হৃদয়নিহিত বৈরাগ্য-বহ্নি তীব্রতেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে। রাজকার্য্য এবং গৃহবাস তাঁহার পক্ষে বিষম ক্লেশদ হইয়া দাঁড়াইল; রাজানুগ্রহই এখন তাঁহার ভাবনার বিষয় হইল। অবশেষে স্থির হইল যে, হুসেনসার বিরক্তিভাজন হইতে না পারিলে তাঁহার আর অব্যাহতি নাই; রাজা তৎপ্রতি বিরক্ত হইলে, হয়ত বিদায় দিতে পারেন। যথা—

"এথা সনাতন গোসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোকে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন॥
কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয়॥"

(চৈতন্য চরিতামৃত)

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সনাতন রাজসভায় যাওয়া বন্ধ করিলেন, তাঁহার শরীর মন অসুস্থ, এই সংবাদ রাজাকে জানাইলেন। এইরূপে তিনি পণ্ডিত মণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া কিছুদিন ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা করেন।

রাজকার্য্যে সনাতন ক্রমাগত অনুপস্থিত, রাজকার্য্যে মধ্যে মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল; তখন রাজা আপন

* এই কার্য্যটীও—নব্যভারতের লেখক প্রবরের মতে, নাকি ভাবি দূষণীয়॥

নির্দ্দিষ্ট বৈদ্যকে * সনাতনের চিকিৎসার্থ প্রেরণ করিলেন।

বৈদ্য আসিয়া দেখিলেন যে, সনাতন সুস্থ শরীরে পণ্ডিতগণ সহ শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। বৈদ্য অধিক কিছু বলিলেন না, স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গেলেন; এবং যথাসময়ে রাজাকে জানাইলেন। হুসেনসা বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা সেই স্বর্ণকান্তি নবীন সন্ন্যাসীরই খেলা, সনাতন শ্রীরূপেরই ন্যায় রাজকার্য্য পরিত্যাগের উদ্যোগ করিতেছেন। রাজা ক্রুদ্ধ ও চিন্তিত হইলেন। সনাতনের ন্যায় মন্ত্রী পাওয়া সামান্য কথা নহে। যদি বা সনাতন চলে যান;—এই ভাবিয়া রাজা চিন্তিত হইলেন, এবং একটী সহচর সমভিব্যাহারে একদিন স্বয়ং সনাতন সভায় সমুপস্থিত হইলেন। যথা—

"এক দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে এক জন।
আচম্বিতে গোসাঞি সভাতে কৈল আগমন॥
পাতসা দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা॥
রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি সুস্থ সে দেখিল॥
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি ঘরে তুমি রহিলা বসিয়া॥
মোর যত কার্য্য কাম সব কৈলা নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে হয় কহ মোর পাশ॥"
(চৈতন্য চরিতামৃত।)

সনাতন বিনীতভাবে উত্তর করিলেনঃ—
"সনাতন কহে—নহে আমা হৈতে কাম।
আর এক জন দিয়া কর সমাধান॥" (ঐ)

সনাতনের এবম্বিধ উত্তর শ্রবণে রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; এবং সনাতনকে ভয় প্রদর্শন ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। যথা—

"তবে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা কহে আর বার।
তোর বড় ভাই করে দস্যু-ব্যবহার॥ *
জীব বহুমারি সব চাকলা কৈল নাশ॥"
হেথা তুমি কৈলে মোর সর্ব্বকার্য্য নাশ॥
(ঐ)

সনাতন ইহার আর কি উত্তর দিবেন? বলিলেন—আপনি স্বাধীন এবং শাস্তা, অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করিতে পারেন।

---

* অনেকের মতে এই বৈদ্য খণ্ডবাসী শ্রীমুকুন্দ দত্ত। মুকুন্দ দত্ত কোন যবন রাজের কার্য্য করিতেন। একদা রাজার মস্তকের পার্শ্বে ময়ূরপুচ্ছ নির্ম্মিত পাখা দর্শনে তিনি মূর্চ্ছাগত হন। মনে কৃষ্ণোদ্দীপনই ইহার কারণ। বঙ্গে তখন হুসেন সা ব্যতীত হিন্দুপক্ষপাতী রাজা কেহ ছিল না, অতএব পূর্ব্বোক্ত বৈদ্য মুকুন্দ দত্ত, এ অনুমান অসঙ্গত নহে।

* হুসেন সাব এই ভর্ৎসনা বাক্যে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে সনাতনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেহ ছিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সনাতনের বড় দুই ভাই ছিলেন, সনাতন তৃতীয়। শ্রীরূপ সনাতনের অনুজ, ইহাও আমরা বহু স্থলে দেখাইয়াছি। নব্যভারতের লেখক তর্কের খাতিরে এবং "তোর বড় ভাই করে" কথাটীর অগত্যা অর্থবাদ করিতে না পারায়, শ্রীরূপকেই এই জ্যেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রীরূপই নরহত্যাদি অপরাধে দোষী ছিলেন, এবং অপরাধের দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই পলাইয়া গিয়া শ্রীচৈতন্যের আশ্রয় লন!! এসম্বন্ধে আর বলিব কি? ধন্য তাঁহার কল্পনার বিকাশ! ধন্য তাঁহার অনুমান!! এবং শত ধন্যবাদ তাঁহার বিদ্বেষ বুদ্ধিকে!!!

রাজা মন্ত্রীভবন হইতে চলিয়া আসিলেন এবং পাছে সনাতন পলায়ন করেন, এই জন্য তাঁহাকে বন্দীদশায় কারাগৃহে রাখিয়া দিলেন।

উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত হুসেনসার বিবাদ চলিতেছিল। কার্য্য-বশতঃ এই সময়ে তাঁহাকে দক্ষিণদেশে যাত্রা করিতে হইল। বুদ্ধিমান ও সুচতুর মন্ত্রী সনাতনকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হুসেনসা মনস্থ করিলেন। সনাতন অস্বীকৃত হইয়া উত্তর দিলেন যে, রাজা যখন দেবতা-বিগ্রহ ও ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করিতে যাইতেছেন, তখন তিনি সঙ্গে গমন করিতে পারিবেন না। সনাতনের যাহা কিছু মুক্তির আশা ছিল, নিঃশেষে তাহা চলিয়া গেল।

এদিকে মহাপ্রভু নীলাচল পৌছিয়াই বনপথে আবার বৃন্দাবন গমন করিলেন। রূপ সনাতনের নিয়োজিত লোক এই সংবাদটী শ্রীরূপের নিকট পাঠাইল। সংবাদ পাইয়া শ্রীরূপ চঞ্চল হইলেন, বাড়ীতে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া সত্বর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভকে লইয়া, নদী যেমন সাগরাভিমুখে প্রধাবিতা হয় তদ্রূপ, শ্রীমহাপ্রভুর সহসম্মিলনাশায় যাত্রা করিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর এই সময়-কার কৃত দুইটী সুন্দর শ্লোক আছে, তাহা এই :—

"সংসারাম্বুসি সংভ্রুত ভ্রমভরে গম্ভীরতাপত্রয়,
গ্রাহেনাভিগৃহীতমুগ্রপতিনা ক্রোশন্তমন্তর্ভয়ং।
দীপ্রেণাদ্য সুদর্শনেন বিবুধক্লান্তিচ্ছিদাকারিণা,
চিন্তাসন্ততি রুদ্ধমুদ্ধর হরে মচ্চিত্ত দন্তীশ্বরং॥ ১।"
"বিধুত বিবিধ বাধে ভ্রান্তিবেগাদগাধে,
বলবতি ভবপূরে মজ্জতো মে বিদূরে।
অশরণগণবন্ধো হে কৃপাকৌমুদীন্দো,
সকৃদকৃত বিলম্বং দেহি হস্তাবলম্বং॥ ২।"

অর্থাৎ হে হরে! আমার চিত্তহস্তী চিন্তাসূত্রে আবদ্ধ ও ভ্রমপূর্ণ সংসারসাগরে, তাপত্রয়াদিরূপ কুম্ভীরাদি কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়া ভয়ে চীৎকার করিতেছে, আপনি প্রদীপ্ততেজা সুদর্শন দ্বারা অদ্য ইহাকে উদ্ধার করুন। ১।

বিবিধ বাধা এবং ভ্রান্তিবেগ-সঙ্কুল অগাধ সংসার-সাগরে আমি নিমজ্জিত হইয়াছি। হে কৃপাকিরণেন্দো! হে অশরণবন্ধো। শীঘ্র আমাকে একবার হস্তাবলম্বন প্রদান কর। আমি সংসার সাগর হইতে উদ্ধার হই। ২।

শ্লোক দুইটীতে শ্রীরূপ গোস্বামীর উৎকণ্ঠাভাব সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইতেছে।

শ্রীরূপ গৃহত্যাগের পূর্ব্বে আপন অগ্রজকে একখানি পত্র লিখিয়া যান। (তাঁহার গৃহত্যাগের পর) এই সময়েই সনাতন সেই পত্রখানি প্রাপ্ত হইলেন। পত্র প্রাপ্তির পর সনাতনের যে অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনাতীত। উদ্বেগ যন্ত্রণায় তাঁহার প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল, তিনি হাহুতাশে দিবানিশি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। আর যাঁহার নাম গ্রহণে ভববন্ধন দূরীভূত হয়, অসহায়ের সহায় সেই ভগবানকে একান্ত মনে ডাকিতে লাগিলেন। সনাতনের এই সময়কার অবস্থা, প্রাচীন পদকর্ত্তা রাধা বল্লভ দাস পরিস্ফুতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তৎকৃত পদটী এই :—

"রূপের বৈরাগ্য কালে, সনাতন বন্দীশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
রূপেরে করুণা করি, ত্রাণ কৈলা গৌরহরি,
মো অধমে না কৈলা স্মরণে॥

মোর কর্ম্মদোষ ফাঁদে, হাতে গলে পায়ে বান্ধে,
রাখিয়াছ কারাগারে ফেলি।
আপনে করুণা পাশে, দড় করি ধরি কেশে,
চরণ নিকটে লেহ তুলি॥
পশ্চাতে অগাধ জল, দুই পাশে দাবানল,
সম্মুখে সাঁধিল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,
এইবার কর পরিত্রাণ॥
জগাই মাধাই হেলে, বাসুদেব অজামীলে,
অনায়াসে করিলে উদ্ধার।
যে দুঃখ সমুদ্রে মরে, নিস্তার করহ মোরে,
তোমা বিনে নাহি হেন আর॥
হেন কালে একজনে, অলখিতে সনাতনে,
পত্রী দিল রূপের লিখন।
এ রাধা বল্লভ দাসে, মনে হৈল আশ্বাসে,
পত্রী দিল করিয়া গোপন।”
(পদকল্পতরু।)

শ্রীরূপ অগ্রজের নিকটে যে পত্রখানি লিখেন, তাহাতে শ্রীমহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রা ও আপনার গৃহত্যাগাদি সংবাদের সহিত বণিকের নিকট গচ্ছিত দশ সহস্র মুদ্রারও উল্লেখ ছিল। সনাতন এখন এই অর্থ সাহায্যেই মুক্ত হইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

তিনি কারারক্ষককে অনেক মিনতি স্তুতি করিলেন, কারারক্ষক তাঁহাকে ছাড়িল না। পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকার করিলেন ও কহিলেন—“পূর্ব্বে আমি তোমার কত উপকার করিয়াছি. এখন তাহার প্রত্যুপকার রূপ পুণ্য সঞ্চয় এবং অর্থ গ্রহণ কর।—কারারক্ষক সম্মত হইল না। তখন সাত সহস্র মুদ্রা স্তূপীকৃত করিলেন, এবার কারারক্ষক লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না,—স্বীকৃত হইল। যথা—

“পত্রী পাইয়া সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবন-রক্ষক পাশ কহিতে লাগিলা॥
তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান।
কিতাব কোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান॥
এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজধর্ম্ম দেখিঞা।
সংসার হইতে মুক্ত তারে করেন গোসাঞা॥
পূর্ব্বে তোমার আমি করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার॥
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব কর অঙ্গীকার।
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার॥
তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয়।
তোমা ছাড়িযে কিন্তু করি রাজ ভয়॥
সনাতন কহে রাজায় না করিহ ভয়।
দক্ষিণ গিয়াছে যদি লেউটি আসয়॥
তাহারে কহিও সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকটে গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিল॥
অনেক দেখিল তার লাগ না পাইল।
দাড়ুকা সহিতে ডুবি কাঁহা বহি গেল।
দরবেশ হইযা আমি মক্কা চলে যাব॥
কিছু ভয় নাহি আমি এ দেশে না রব॥
তথাপি যবনে প্রসন্ন না দেখিল।
সাত হাজার মুদ্রা আনি আগে রাশ কৈল॥
লোভ হইল যবনের দ্রব্য দেখিযা।
রাত্রে গঙ্গা পার হৈল গড়ুকা কাটিয়া॥
(চৈতন্য চরিতামৃত।)

সনাতন শ্রীচৈতন্যের প্রেমরূপ মন্দাকিনী সলিলে ঝাঁপ দিলেন—পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় পলাইলেন। ঈশান নামক একটীমাত্র অনুচর তাঁহার অনুসরণ করিল। (ক্রমশঃ)

মুক্তিসেতু।

বহিব আপনি।

তুইরে কঠোব সংসাবের মাযা
আমায় ছেড়েদে ছেড়ে দেবে।
ভেসে যাব সেথা প্রাণ যেথা যায়
আমায় যেতে দে যেতে দেরে।
দূর দূরান্তরে প্রান্তবেব ধাবে
বসিয়া বহিব একা একা,—
স্নিগ্ধ শ্যামল তরুবব তলে—
কারেও আর দিবনা দেখা।
প্রভাতে শুনিব পাখীদের গান—
পবম দেবের স্তুতিগান,
আকাশের পানে রহিব চাহিযা—
অসীম ঢালিবে ম‍াপ্রাণ।
ক্ষুদ্র কোলাহলে রহিব না আব,
করিব না আর কানাকানি;
হৃদয়ে গাঁথি —অসীমেব মাঝে
ক্ষুদ্র প্রাণী—সদা এই বাণী।
মধ্যাহ্নেও সেথা রহিব বসিযা
আপনারি ভাবেব মাঝে,—
আপনি হাসিব, আপনি কাঁদিব
আপনি থাকি, আপন কাছে।
সন্ধ্যায় দেখিব চাহি এক মনে
ডুবিবে তপন অস্তাচলে,
নিভিবে আলোক, আসিবে আঁধার
অসীম নীল গগনতলে।
দুএকটী করি ফুটিবে তারকা
অতুলন এজগত মাঝে,
তাহাই দেখিব ফিরিব না আব
নিদারুণ সংসারেব কাছে।
পরম পিতার সঁপি' প্রেম-হাতে
নির্ভবে ভ্রমিব যথা তথা,
কাহারেও কাছে ডাকিব না আর
শুনিব না আর কারো কথা;
এর কাছে গিযে ওর কাছে গিয়ে
করিব না আর কানাকানি;
আপনি হাসিব, আপনি কাঁদিব
সুখ দুখ বহিব আপনি।

ধবে থাকি যেন।

তুমি দীনবন্ধু হৃদয়নাথ
দেখা দাও হৃদযে আমার;
চিরকাল থাক আমারি সাথ
তোমারেই জানি সারাৎসার।
তোমারি কঠোর নিয়মবলে
ছুটেছে তারকা অসীমেতে,
ছুটেছে রবি বিশ্ব চরাচবে
তোমারি একের আদেশেতে।
নিযম এযে মহান্ সুখের—
তুমি বিনা করিতে কে পারে?
বুঝিবে কে মরম নিয়মের—
তুমি বিনা বুঝাতে কে পারে?
প্রেমরূপ তুমি করুণাময়
এস তুমি আত্মার আসরে,
দূরে থাক শোক, মোহের ভয়
স্নেহময় দেখি, ও আননে।
হৃদয়ে যে আছে পাপের ধূলি—
প্রেমবারি সেথা বরষিযে
জুড়াও প্রভু, কাঁদিছি আকুলি,
চরণতল তব ধরিবে।
পতিত পাবন তুমি হে নাথ
তার হে তার এ দীন জনে;
সম্পদে বিপদে তোমারি হাত
ধরে থাকি যেন প্রাণপণে।

শোন সবে শোন।

শোন সবে শোন যে আছে জগতে
চলেছে আমার গান,
কারো অশ্রু এতে যদি মুছে যায়,
পাপতাপ কারো যদি ধুয়ে যায়,
সংসারের পারে যদি যায় নিয়ে,
মরমে আনন্দ যদি যায় দিয়ে,—
তখনি বুঝিব ধরণীতে আমি
হয়েছি সফলকাম;
আকুল পরাণ সঁপেছি তাঁহারে,
লভেছি অমৃতধাম;
হৃদয়ের ব্যথা যাবে দূর হয়ে
অনন্তপ্রেমের সুরে,—
সে বাঁশীর ডাকে বিশ্ব এক হবে,
বিরহ রহিবে দূরে।

জীবনসংগ্রাম।

সুপ্রশস্ত মাঠে বিহগগণ সুখে বিচরণ করিতেছে; আপনাপন আহার অন্বেষণ করিতেছে; আপনাদের শাবকগণের জন্যও বা কিছু লইয়া যাইতেছে, সুন্দর গান করিতেছে, আর আমরা ইহাদিগকে এমন সুখে থাকিতে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেছি। এই চিত্র দেখিয়া কবিজনের কবিতার উৎস খুলিয়া যাইবে তাহা আর বিচিত্র কি—পাষাণেরও হৃদয়ে কবিতাস্রোত প্রবাহিত না হইয়া যায় না।-- দার্শনিক ইহার মধ্যে কত না দর্শনতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু জীবতত্ত্ববিৎ দেখিতে দেখিতে শান্তির রাজ্য হইতে অশান্তির রাজ্যে গিয়া পড়েন। তিনি অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিয়াছেন যে এক অতি কঠোর নিয়ম এই জীবনক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াই এই শান্তি আনয়ন করিয়াছে; সেই কঠোর নিয়ম —কঠোর জীবনসংগ্রাম।

জীবনসংগ্রাম কাহাকে বলে, তাহা আজকাল কাহাকেও বেশী করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে জীবনসংগ্রামের তীব্র তাড়নায় সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। জীবনসংগ্রামের একটী প্রধান লক্ষণ অন্নচিন্তা। শতবর্ষ পূর্ব্বে, এমন কি পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বেও আমাদের সোনার ভারতে এতদূর অন্নচিন্তা ছিল না, এতদূর তীব্র জীবনসংগ্রামের হস্তে পড়িতে হয় নাই। আমি পূজ্যপাদ পিতামহদেবের নিকট" শুনিয়াছি যে, এখন যে চাউল ৬৲ টাকায় এক মণ, তখন সেই চাউল ১৲ এক টাকায় মণ পাওয়া যাইত; তখন গোদুগ্ধ টাকায় ৬৪ সের পাওয়া যাইত, এখন তাহা টাকায় সাড়ে ছয় সের মাত্র পাওয়া যায়—তাহাও সকল সময়ে খাঁটি পাওয়া যায় না। আমরা ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে দেখিয়াছি যে, পল্লীগ্রামেও টাকায় ৩২ সের হইতে এখন সাড়ে ছয় সের দাঁড়াইয়াছে। ঘৃত পূর্ব্বে টাকায় ১৬ সের পাওয়া যাইত, এখন এক সের, পাঁচ পোয়া পাওয়া যায়। ভারতবাসীর মধ্যে কিরূপ জীবনসংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাই দেখাইবার জন্য এই দৃষ্টান্ত কয়েকটী উল্লেখ করিলাম।

ইহার ফল অতি দূরব্যাপী। মনে কর, আমার দুগ্ধের উপর জীবন নির্ভর করে এবং ধরিয়া লও যে আমি অতি প্রতিভাশালী ব্যক্তি। এখন, দুগ্ধ যদি উপযুক্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হই, তবেই আমার প্রতিভা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে। সেই প্রতিভার বলে হয়তো কত অলস ব্যক্তিকে পরিশ্রমের পথে ফিরাইতে পারিতাম, কত কুলোককে ধর্ম্মের পথে ফিরাইতে পারিতাম। কিন্তু অর্থাভাবেই হউক বা দুগ্ধাভাবেই হউক, যদি দুগ্ধ উপযুক্ত পরিমাণে প্রাপ্ত না হই, তবে আমার প্রতিভা উপযুক্তরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে না। হয়ত সেই অস্ফুট প্রতিভার বলে কাহাকেও আমার অভিলষিত পথে ফিরাইতে পারিলাম না। সুতরাং আমার প্রতিভাবলে জনসাধারণকে সুপথে ফিরাইয়া জগতের যে উপকার

সাধন করিতে ও করাইতে পারিতাম, তাহা পারিলাম না। অতএব, ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে জগতের প্রতি ঘটনার ফল অতি দূরব্যাপী।

মনুষ্যের মধ্যে জীবনসংগ্রাম ঘোরতরই চলিয়াছে তথাপি মনুষ্য অনেক সময়ে জীবনরক্ষণ কার্য্যেও স্ব-ইচ্ছায় নিযুক্ত হয়। একটা কর্ম্মের আমি প্রার্থী, আর একটা লোকও প্রার্থী। আমি দেখিলাম যে আমা অপেক্ষা সেই ব্যক্তি অধিকতর অভাবগ্রস্ত। এই অবস্থায় আমি তাহা পরিত্যাগ করিলাম। বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রমাত্রেই অবগত আছে যে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সহচর সৈনিক পুরুষের পিপাসা অধিকতর জানিতে পারিয়া সেই একই ক্ষেত্রে আহত বীর সেনাপতি আপনার মুখের জল তুলিয়া তাহাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু উদ্ভিদ্ পশুপক্ষী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণীগণ এরূপ কর্ত্তব্য বোধে আপনাদিগেরই শাবকাদি ব্যতীত এবং আত্মরক্ষার্থ ব্যতীত অপর কাহারও জীবনরক্ষণে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয় না। এই কারণে কঠোর জীবনসংগ্রাম তাহাদিগের মধ্যে অত্যন্ত কঠোরভাবেই কার্য্য করিতেছে। কেহ কাহারও প্রতি সদয় দৃষ্টিনিক্ষেপ করে না।

ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে অতি সুন্দর বাগান যদি কিছুদিন অযত্নরক্ষিত হয়, তবে সেই কিছুদিনের মধ্যেই তেমন বাগানেরও শ্রী নষ্ট হইয়া যায় এবং বাগানের সুগন্ধি পুষ্পও সরস ফলবৃক্ষের নিকটে কতকগুলি আগাছা জন্ম গ্রহণ করে এবং ফলপুষ্পের বৃক্ষসকল শীঘ্রই মরিয়া যায়। ইহার মধ্যে জীবনসংগ্রাম এইরূপে কার্য্য করিতেছে—যতটা মাটীর রস পূর্ব্বে ফলপুষ্পের বৃক্ষ টানিতে পাইতেছিল, এখন তাহাদের কতকগুলি আগাছাও সেই রসের ভাগী হইয়া পড়িল। সুতরাং রসের ভাগ মোটের উপর প্রত্যেকের ভাগ্যে কিছু কম করিয়া পড়িতে লাগিল। এই অবস্থায় ফলপুষ্পের সযত্ন লালিত সৌখীন বৃক্ষগুলি উপযুক্ত আহার না পাইয়া দুর্ভিক্ষের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া যাইতে লাগিল। এদিকে কষ্টসহ আগাছাগুলি সত্বর বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। আবার সেই আগাছাগুলির আশেপাশে অপর আগাছা জন্মাইতে লাগিল। তখন পূর্ব্বজাত আগাছা নূতন দুর্ভিক্ষে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে লাগিল এবং অধিকতর কষ্টসহ ও সৌভাগ্যবান্ নবজাত আগাছাগুলি সতেজে বাড়িতে লাগিল। অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে এক স্থানেই প্রথমজাত তৃণাদিকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া তাহার স্থানে কত বিভিন্ন তৃণাদি জন্মগ্রহণ করে।

আমাদের দেশের একটী সামান্য দৃষ্টান্ত ধরা যাউক। একটা ক্ষেত্রে দুর্ব্বাঘাস বসাইয়া দাও এবং তাহারই নিকট কতক মুতাঘাসও বসাইয়া দাও। বৎসর দুই তিনের মধ্যেই দেখা যাইবে যে দুর্ব্বাঘাসের পরিবর্ত্তে মুতাঘাস বিস্তৃত হইয়া সমস্ত ক্ষেত্রটী ছাইয়া ফেলিয়াছে। জীবনসংগ্রামের এই অতি সহজ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন হেতু মনে হইতে পারে যে এইরূপ আবির্ভাব তিরোভাবের কারণ অতি সহজেই স্থিরীকৃত হইতে পারে; কিন্তু ইহা যতটা সহজ মনে হয়, ততটা সহজ

নহে। এমন হয় যে, একস্থানের সকল উদ্ভিজ্জই হয়তো সমান কষ্টসহ, তথাপি একটীর ধ্বংসগতি হইতেছে, অপরটীর বৃদ্ধি হইতেছে; সেটীর ধ্বংস হইতেছে, আর একটী তেজে বাড়িতেছে। এই-রূপে সেই স্থানে শতাব্দী পরে হয়তো প্রথম উদ্ভিজ্জের কিছুমাত্রও অবশিষ্ট দেখিতে পাইব না।

পূর্ব্বে যে সকল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম, তাহাতে উদ্ভিজ্জ দ্বারাই উদ্ভিজ্জ ধ্বংসের কথা বলিয়াছি। কিন্তু উদ্ভিজ্জ-প্রাণ পশুপ্রাণ দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বিনষ্ট হয়। বীজকালে ও অঙ্কুরোৎপত্তি-কালেই অধিকাংশস্থলে এই ধ্বংসসাধন হয়। ছোলা প্রভৃতি দ্বিদল ক্ষেত্রে রোপণ কর; যদি বাহিরে বাহিরে ছড়াইয়া দাও, তবে মুহূর্ত্তকালেরও বিলম্ব হইবে না, পশুপক্ষীরা ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সমুদয় শেষ করিয়া দিবে। আর যদি মাটীর ভিতরে পুঁতিয়া দাও, তবে কীট পতঙ্গ তাহা নষ্ট করিবে। তাহার মধ্যে লুকাইয়া পুরাইয়া যদি কোনটা বাঁচিয়া গেল, তবে তাহাই বর্দ্ধিত হইল। একবার জীবতত্ত্ববিৎশ্রেষ্ঠ ডার্ব্বিন একটা ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের প্রত্যেক তৃণ গণিয়া ৩৫৭ সংখ্যা পাইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল, ২৯৫ সংখ্যা কীট পতঙ্গাদির দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ডার্ব্বিন স্কটলণ্ডের উত্তরাংশে গিয়া কোন স্থানের এক অংশ তৃণলেশহীন, অপরাংশ বৃক্ষ-সমন্বিত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া-ছিলেন। অবশেষে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে গবাদি পশু অনাবদ্ধ স্থানের তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া তথায় তৃণ জন্মাইতে দেয় না এবং সেই কারণে তথাকার উর্ব্বরাশক্তিও ক্রমে হ্রাস হইতে হইতে বিনষ্ট হইয়াছে এবং অপর অংশ আবদ্ধ থাকাতে গবাদি পশুর অগোচর হইয়া যথাযুক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশের উর্ব্বরা শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপে উদ্ভিজ্জপ্রাণ ও পশুপ্রাণের মধ্যে জীবন সংগ্রাম চলিতে থাকে।

প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীদিগের স্বজাতির মধ্যেই জীবন সংগ্রাম কিছু কঠোরতর হইয়া পড়ে। ইউরোপে কৃষ্ণ ইন্দুরই পূর্ব্বে সাধারণতঃ দেখা যাইত, কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আশিয়া হইতে বৃহৎ ধূসর ইন্দুর ইউরোপে অগ্রসর হইয়া তাহার আদিম নিবাসী কৃষ্ণ ইন্দুরকে তাড়াইতে আরম্ভ করিল। এখন কৃষ্ণ ইন্দুর ইউরোপে পাওয়া দুর্ঘট। এই ধূসর শ্রেণীর ইন্দুর এখন বাণিজ্য ব্যবসায় সূত্রে জাহাজাদির দ্বারা পৃথিবীস্থ প্রায় সকল দেশেই নীত হইয়াছে এবং নিউজীলণ্ড প্রদেশে গিয়া তথাকার আদিম নিবাসী একজাতীয় ইন্দুরকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়াতে মধুমক্ষিকার প্রতাপে তদ্দেশীয় সাধারণ মক্ষিকা অন্তর্হিত হইতেছে।

স্বজাতির মধ্যে জীবনসংগ্রাম এরূপ কঠোরতর হইবার পক্ষে কারণ এই যে, সকলেরই অবস্থা প্রায়ই এক, সকলে প্রায় একই প্রকার কষ্টসহিষ্ণু; সকলের অভাব, সকলের আহারাদি প্রায় একই; সুতরাং তাহাদের মধ্যে উন্নতি অবনতি একটু আধটু সুবিধা অসুবিধার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। অনেক সময়ে রীতিমত সংগ্রাম হইয়া একই জাতীয় জীবের দুর্ব্বলশ্রেণী সবল

শ্রেণী কর্ত্তৃক নিহত হয়। অনেক সময়ে এমনও হয় যে, স্বজাতীয় জীবের এক শ্রেণী শারীরিক দুর্ব্বল হইলেও অবস্থা-বিশেষে নানা সুবিধা পাওয়াতে, এক কথায়, সেই অবস্থার যোগ্যতম হওয়াতে অপর শ্রেণী শারীরিক সবল হইলেও নানা উপায়ে তাহার ধ্বংস সাধন করে। একক্ষেত্রে ভিন্নশ্রেণীর ধান্য রোপণ কর,; সেই স্থানের ও অবস্থার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত যে ধান্য হইবে, তাহারাই অপরকে ধ্বংস করিয়া বর্দ্ধিত হইবে। এই কারণে তৃণাচ্ছাদিত সুন্দর ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিলে এক জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর তৃণ বোপণ না করিয়া বিভিন্ন জাতীয় তৃণ রোপণ করা কর্ত্তব্য।

এখন দেখা যাউক যে এই জীবন-সংগ্রামের মূল কারণ কি? সকলেই সুখে শান্তিতে থাকিবে, তাহার পবিবর্ত্তে এই কঠোর জীবনসংগ্রাম আসিল কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জীবনের গুণোত্তর পরিমাণে বংশ বৃদ্ধি হওয়া একটী প্রধান কারণ। একটী মাঠে দুইটী গরু ছাড়িয়া দিলে তাহারা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল—তখন সেই একই মাঠেব তৃণাদিতে তাহাদের সকলের কি প্রকারে চলিতে পারে? আমাদের ভারতের বর্ত্তমান একান্নবর্ত্তী পরিবারের দৃষ্টান্ত হইতেও ইহা বেশ বুঝা যাইতে পারে। এক গোষ্ঠীপতি কর্ত্তা লক্ষ টাকার বিষয় করিলেন। তাঁহার দশ বারটী সন্তান। আবার তাঁহাদের সন্তান গড়ে প্রত্যেকের দুইটী করিয়া ধরিলেও কর্ত্তার ২০।২৪টী পৌত্র দৌহিত্র হইয়া পড়ে। সুতরাং এইরূপে বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিলে প্রথম কর্ত্তা লক্ষ টাকার বিষয়ে যেরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়াছিলেন, তাঁহাব নাতিপুতিদিগকে ঠিক সেইরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিতে আশা করা বিড়ম্বনা। তবে যদি সেই পরিবারে ধর্ম্ম থাকে, মনুষ্যের যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব যদি তাহা থাকে, তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, সবল ভ্রাতা দুর্ব্বল ভ্রাতার জীবন রক্ষণে অগ্রসর হয়। নচেৎ সেই পরিবার জীবন সংগ্রামের ভীষণ ক্ষেত্র হইয়া দাড়ায় এবং তথা হইতে শ্রীসৌন্দর্য্য শীঘ্রই দূরে প্রস্থান করে—সেই একই পরিবারের কোন গৃহে হয়তো অন্নসংস্থান নাই, অপর গৃহে মত্স্যমাংস প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ভক্ষিত হইতেছে, বিক্ষিপ্ত হইতেছে; কোন গৃহে হয়তো বস্ত্রসংস্থান নাই, অপর গৃহে আতর গোলাপ প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া দরিদ্র ভ্রাতার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত কবিতেছে। ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গের একান্নবর্ত্তী পরিবারের মূল মন্ত্র এই যে কর্ত্তাব ইচ্ছা কর্ম্ম। সুতরাং কর্ত্তা স্বার্থপব হইলে, নির্ম্মম হইলে, সমস্ত পরিবারের প্রতি মৌখিক কল্যাণকামনা কবিলেও, সেই পরিবারের কখনই কল্যাণ হইতে পারে না।

ইহা দেখা গিয়াছে যে কোন জীব যত নিম্ন জাতীয হইবে, তত অধিক পরিমাণে সন্তানপ্রসবশীল হয়। একটী মাত্র মাংসভুক মক্ষিকা কুড়ি হাজার ডিম্ব প্রসব কবে এবং সেই সকল ডিম্ব এত শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় যে পাঁচ দিনের মধ্যে তাহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহা দেখিয়া বিখ্যাত সুইডীয় প্রাণিতত্ববেত্তা লিনীয়স বলেন যে, একটী মৃত ঘোটককে

তিনটী মাংসভুক মক্ষিকা সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় শীঘ্র খাইয়া ফেলিতে পারে। যদি ধরা যায় যে, গ্রীষ্মের তিন মাস মাত্র ইহারা সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে গ্রীষ্মারম্ভে প্রতি মক্ষিকা হইতে কোটী মক্ষিকা উৎপন্ন হইতে পারে। কেবল এক শ্রেণীর মক্ষিকার কথা বলিলাম; এমন কত শ্রেণীর মক্ষিকা আছে। সকলেই যদি অবাধে নিয়মিত সন্তান উৎপন্ন করিতে পারিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে অন্যান্য জীবজন্তু থাকা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। এই ভয়াবহ বংশবৃদ্ধি নিবারণের জন্য কীটভুক্ পশুপক্ষী দ্বারা এবং নানা প্রাকৃতিক অবস্থা-বৈগুণ্যে তাহাদের বিনাশ সাধন হইতেছে।

আমাদের চড়াই পক্ষী গড়ে প্রতি বৎসরে অন্ততঃ দশটা ডিম্ব প্রসব করে। আর যদি ধরা যায় যে তাহারা অন্ততঃ দশ বৎসর সন্তান প্রসবক্ষম থাকে, তবে এক জোড়া চড়াই সেই দশ বৎসব অবাধে সন্তান প্রসব করিলে দুই কোটীব উপরে চড়াই পক্ষী উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু আমরা প্রতি বৎসরেই প্রায় সমান সংখ্যক পক্ষীই দেখিতে পাই। সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে অল্প সংখ্যক জীবিত থাকে, অধিকসংখ্যক বিনষ্ট হয়।

ভাল অবস্থায় যে কিরূপ বংশবৃদ্ধি হয়, তাহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। আমেরিকা প্রথম আবিষ্কারের সময় তথায় গবাদি দেখা যায় নাই। কলম্বস্ তাঁহার দ্বিতীয় গমনকালে সেণ্ট ডমিঙ্গো দ্বীপে কয়েকটী গরু ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এখন গবাদি স্বভাবত বৎসরে একটী মাত্র সন্তানপ্রসবশীল হইলেও সেণ্ট ডমিঙ্গোর সেই কয়েকটী পশুর এতদূর বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, উক্ত ঘটনার ২৭ বৎসর পরে উক্ত দ্বীপে ৪০০০।৮০০০ করিয়া গরু এক একটী দলে দেখা গিয়াছিল। এই দ্বীপ হইতে মেক্সিকো প্রভৃতি আমেরিকার অন্যান্য প্রদেশে গবাদি নীত হইয়াছিল। তথায়ও তাহা-দিগের অত্যন্ত বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল। মেক্সিকো জয়ের ৬৫ বৎসর পরে, ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে স্পেনবাসিগণ মেক্সিকো হইতে ৬৪০০০ সহস্রেরও অধিক এবং সেণ্ট ডমিঙ্গো হইতে ৩৫০০০ সহস্রেরও অধিক চর্ম্ম রপ্তানি করিয়াছিল। বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর শেষভাগে বুয়েনস আয়েরস এর নিকটস্থ সুবিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে এক কোটী কুড়ি লক্ষ গরু এবং ৩০ লক্ষ ঘোড়া দেখা গিয়াছিল। দক্ষিণ আমে-রিকায় গর্দভ আমদানি করিবার পঞ্চাশ বৎসর পরে তাহার এতদূর বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কোন স্পেনীয় পর্য্যটক গর্দভের দ্বারা উত্যক্ত হইযা গিয়াছিলেন। জীবজন্তুর গুণোত্তরবৃদ্ধি বিষয়ে যাহা বলিলাম, উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধেও সেই কথা। গাঁদাফুলের গাছ একটী রোপণ কর, এক বৎসরের মধ্যেই একটী ঝোঁপ হইয়া উঠিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মুতাঘাস কিরূপ ত্বরিত গতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রায় সকল উদ্ভিদ্‌ই বিশেষ বাধা প্রাপ্ত না হইলে গুণোত্তর পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। বঙ্গদেশের প্রায় সকলেই দেখিয়া-ছেন যে, শেয়াল কাঁটার গাছ একটা থাকিলে কিছুদিনের মধ্যে কিরূপ ছড়াইয়া পড়ে। এই শেয়াল কাঁটাও আবার; অধিক কাল নহে, আমেরিকা হইতে কোন সূত্রে এদেশে আসিয়া

পড়িয়াছিল কিন্তু এখন তাহা যেন এদেশীয় গাছ হইয়া গিয়াছে। এই অতি উপকারী পেঁপে গাছ এখন এদেশীয় হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা অন্য স্থান হইতে এদেশে উপনিবেশ করিয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে উদ্ভিদ্‌জাতিও স্থান বিশেষে নীত হইয়া কত সত্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এখন জীবনসংগ্রামের ফলাফলের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পৃথিবীর উপরে জীবন সংগ্রামের ফল দুই প্রকার দৃষ্ট হইতে পারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। এক স্থানে শাল বৃক্ষ রোপণ করিলাম, কয়েক বৎসর পরে শাল বৃক্ষের ছোট ছোট চারা হইয়া বনরূপে পরিণত হইতে চলিল। এই চারাগুলির পাতা-সকল পচিয়া রোগ বিস্তার করিতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া সমস্ত চারাগুলি কাটিয়া দিলাম। চারাগুলি কাটা গেল, আমি রোগের সম্ভাবনা হইতে অনেকটা মুক্ত হইলাম; ইহাতে জীবন সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ফলের একটী পরিচয় পাইলাম। দক্ষিণ আমেরিকার পম্পা নামক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে এই প্রত্যক্ষ ফলের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। প্রান্তরটী অধিকাংশ স্থানে লম্বা লম্বা ঘাসে আচ্ছাদিত। তথায় বড় বড় গাছ হইতে পারে না। তাহার প্রধান কারণ এই জীবনসংগ্রাম। গ্রীষ্মকালে তথায় নদনদীর অভাবে জলের অত্যন্ত অভাব হয়। সুতরাং উদ্ভিদের অভাব হওয়াতে জীবজন্তুর, প্রধানত বন্য গোমেষ ঘোটকাদির আহা-রের বড়ই ক্লেশ উপস্থিত হয়। তাহারা কেবলমাত্র বাঁচিবার চেষ্টায় তৃণগুল্মেরও চিহ্ন রাখে না। অগত্যা বড় গাছ জন্মাইতেই পারে না। তবে যেসকল তৃণগুল্মের অত্যধিক জীবনীশক্তি, যাহা-দিগের শিকড়ের অত্যল্প অংশ থাকিলেও বাঁচিয়া যায়; অথবা যেসকল তৃণগুল্ম বিষাক্ত, যাহাদিগকে পশুরা অনাহারে মরিয়া গেলেও স্পর্শ করিবে না, এইরূপ তৃণগুল্মই বাঁচিয়া গিয়া কালবিশেষে সমুদয় প্রান্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

পরোক্ষ ফলের কল্পিত দৃষ্টান্ত একটী দিই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কলম্বস যে কয়েকটী গরু আমেরিকা সংলগ্ন সেণ্ট-ডমিঙ্গো দ্বীপে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহারই ফলে কয়েক বৎসর পরে প্রায় লক্ষ গোচর্ম্ম আমেরিকা হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। এখন সেই গোচর্ম্ম বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহা দ্বারা আরও কত ব্যবসায় খুলিয়া আরও কত অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল! এইরূপ আলোচনা করিলে কে বলিতে পারে যে সেই অর্থ সুমেরুখণ্ডের আবি-ষ্কারে ব্যবহৃত হয় নাই? কে বলিতে পারে যে, তাহা ভারত অধিকারে প্রযুক্ত হয় নাই? জীবন সংগ্রামে প্রথমত্যক্ত গোধনগুলি আদিম পশু ও প্রাকৃতিক অবস্থার নিকটে জয়ী হইয়াছিল বলিয়াই তাহাদের হইতে দূরত কত ঘটনার কল্পনা করিলাম।

আর একটী দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। কলিকাতায় যে গোচর্ম্মের আমদানি হইতেছে, তাহা হইতে চীনে, মুচি প্রভৃতি শিল্পীরা জুতা প্রস্তুত করিতেছে। যদি গোচর্ম্মের আমদানি বন্ধ হয়, তবে তাহারা আর জুতা প্রস্তুত করিতে পারিবে না; সুতরাং আমরাও আর

জুতা পরিতে পাইব না; কাজেই রোগে আক্রান্ত হইতে পারি, সুতরাং সুস্থ শরীরে যেরূপ অন্নচেষ্টা ও বুদ্ধিশক্তি পরিচালনার সম্ভাবনা ছিল, রোগাক্রান্ত শরীরে তাহার সম্ভাবনা থাকিবে না। আমার বুদ্ধিশক্তি দ্বারা অপরের যে উপকার করিতে পারিব, তাহারও সম্ভাবনা থাকিবে না। এই ফলপ্রবাহকে লইয়া চলিলে আরও অনেকদূর চলিতে পারে। এক গোচর্ম্মের আমদানি পরোক্ষভাবে কতটা আমাদের উপর কার্য্য করিতেছে। আমি কল্পিত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছি বটে, কিন্তু প্রকৃতই জীবনসংগ্রাম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানারূপে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ ও মানবজাতির উপর কার্য্য করিয়া সকলকেই উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে।

আহারের অল্পতা হইতেই যে কেবল জীবনসংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা নহে; কীট পতঙ্গের আধিক্য হইতেও জীবন সংগ্রাম আইসে, শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুও তাহা উপস্থিত করে। এইরূপে এত সামান্য ও বৃহৎ কারণে জীবনসংগ্রাম ঘটে যে অনেক সময় সকল কারণ অনুসন্ধান করিয়াও বুঝা যায় না।

এইবারে আমরা জীবন সংগ্রামের নৈতিকভাব দেখাইয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। জীবন সংগ্রামের কথা পড়িয়া আমাদের মনে এই একটা প্রশ্ন হইতে পারে, কেন এই সকল কষ্ট, এত মৃত্যু, এত রোগ? যাঁহাদের মনে এই প্রশ্ন উঠে, তাঁহারা স্বভাবতই মৃত্যুকেই যন্ত্রণাকষ্টের পরাকাষ্ঠা বিবেচনা করেন। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের বিপরীতে এই প্রশ্ন করা যায় যে, যদি কোন জীবের মৃত্যু না ঘটিত, তাহা হইলে কি হইত? সংসারে মৃত্যু আছে অর্থাৎ শরীরের পরিবর্ত্তন আছে ইহা দেখিতেছি এবং ইহাও দেখিতেছি যে সেই মৃত্যুকে জয় করিবার জন্য, এমন কি সেই মৃত্যুর দ্বারাই, উন্নতিসেতুর নানা কার্য্য সংঘটিত হইতেছে। ফ্রাঙ্কলিন্ সুমেরুকেন্দ্র আবিষ্কারে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, পরে তাঁহারই অন্বেষণপথের যাত্রী হইয়া কত লোকে কত নূতন সত্য, কত নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। যুদ্ধ করিয়া, শত শত জীবহত্যা করিয়া ইংরাজজাতি যে আমাদের দেশের রাজা হইয়াছেন, ইহাতে আমরা কত উপকার পাইতেছি। সুতরাং জীবনসংগ্রামে "মৃত্যু যে সে অমৃত-সোপান।"

মানবের জীবনসংগ্রাম করিবার অধিকার আছে; কারণ তাহারও পশুপক্ষীর সহধর্ম্মী শরীর আছে কিন্তু জীবনরক্ষণে ততোধিক অধিকার, মানবের ইহাতেই শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব। আমাদের ··· জ্ঞানে ইহা এত সহজে প্রতিভাত হয় যে, আমরা পশুদিগকে পরস্পর হত্যা করিতে দেখিলে পাপ বলিয়া বিবেচনা করি না। কাঁকড়াবিছা যখন শত্রুর নিকট পরাজিত হইয়া ক্রোধে অভিমানে আপনার শরীরে দংশন করিয়া আত্মহত্যা করে, তখন আমরা তাহা পাপ বলিয়াই বিবেচনা করি না। কিন্তু মনুষ্য শত অপরাধী হইলেও তাহাকে অপর মনুষ্য যদি হত্যা করে, তখন তাহাকে নিষ্ঠুরতা বলি, পাপ বিবেচনা করি; মনুষ্য যখন আত্মহত্যাও করে তখন তাহাকে অতি তীব্র পাপ বিবেচনা

করি—হিন্দুদিগের মধ্যে এই ধারণা এতদূর বলবান যে তাঁহাদের বিবেচনায় আত্মঘাতিদিগের নরকেও স্থান নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জীবনসংগ্রামে "মৃত্যু সে অমৃত সোপান"; ইহা হইতে কি সেই অমৃতস্বরূপের পরিচয় পাই না? জীবনসংগ্রাম হইতে দেখা গিয়াছে যে, মোটের উপর উন্নতি চলিতেছে, সেই উন্নতিরূপ উদ্দেশ্য, পরিচালনা করা, মৃত্যুকে অমৃতরসে অভিষিক্ত করিয়া অমৃতে পরিণত করা যে অমৃতস্বরূপ এক মহান্ পুরুষের কার্য্য, এই জ্ঞান এত সহজ যে, ইহার বিষয় তর্ক করাই আশ্চর্য্যের বিষয় বিবেচনা করি। এক অমৃতস্বরূপ মহান্ পুরুষের ইচ্ছাতেই যে এই জগৎ চলিতেছে, পার্থিব জীবনসংগ্রাম ত্যাগ করিয়া অপার্থিব আধ্যাত্মিক জীবনসংগ্রাম-কালেই তাহার বিশেষ পরিচয় পাই। এক ব্যক্তি তোমার প্রতি অত্যাচার করিল, তুমি প্রতিহিংসার ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহার প্রতি সাধু ব্যবহার করিলে, তখন সেই সাধুতার ভিতরে কি অমৃত পুরুষের অমৃতভাব প্রাপ্ত হও না? পার্থিব জীবনসংগ্রামের বাহ্য লক্ষণ মৃত্যু, আধ্যাত্মিক জীবন সংগ্রামের বাহ্য লক্ষণ জীবন। আমাদের সকলেরই অন্তরের ভিতর, জ্ঞানত বা অজ্ঞানত, এই ভাবটাই বর্ত্তমান যে, কিসে মৃত্যুকে জয় করিতে পারি। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য যে, যতটা পারি, পার্থিব জীবনসংগ্রাম যাহার অন্তত বাহ্য লক্ষণ মৃত্যু, পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনসংগ্রাম, যাহার বাহ্য লক্ষণ জীবন, অবলম্বন করি। এই আধ্যাত্মিক জীবনসংগ্রামের উপকরণ প্রেম, দয়া, সরলতা প্রভৃতি—এক কথায় ধর্ম্ম। এই কারণেই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।" তবে এস, সকলে মৃত্যুর মাঝেও উন্নতির পথে অমৃতের পথে দণ্ডায়মান হইয়া সেই অমৃতস্বরূপ ভূমা পুরুষের জয় জয়কার করি, তাঁহাকে ধন্য ধন্য বলি, ভক্তিভরে তাঁহাকে নমস্কার করি।

কি দেখিবে ?

কি দেখিবে? লৌহময় হৃদয় কন্দর?
একবারে শূন্য তাহা কিছু নাহি আর
চুরি গেছে প্রাণময় পরশ পাথর
বিরাজিছে সূচীভেদ সেথা অন্ধকার!
যখন পরশমণি শোভিত তাহার
হেসে হেসে চিক দিয়ে যেত শশধর
ভুলে ভুলে ফেলে যেত কত কথা হায়
সোণাময় সেই পুরী হাসিত সুন্দর।

একদিন ঘুমঘোরে কে করিল চুরি
বুক ভরা সে রতন ভিখারীর ধন
কোন মূর্খ ভিখারীরে করিল চাতুরি
কেরে তুই কাঙ্গালীরে দিস্‌নে যাতন
ফিরে দেরে চোরাধন দয়াবান হয়ে
হৃদয় কলিজা নেরে তার বিনিময়ে।

মনন।

মাতৃগুরুত্ব।

সন্তানকে শিক্ষা দিতে, উৎসাহ দিতে মাতার তুল্য কেহ নাই, সন্তান প্রথম হইতেই মাতার নিকট শিক্ষা পাইয়া উন্নতি লাভ করিতে শিখে। মাতার গুণে সন্তান যে গুণবান হয় অতীত ও বর্ত্তমানে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। দেখ স্পটান্ বালক প্রধানতঃ তাহার মাতার নিকট হইতে উৎসাহ ও উত্তেজনা পাইয়া শত্রুধ্বংসি বীরত্ব লাভ করিত। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট—যিনি ইউরোপে এক নব যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তিনিও প্রধানতঃ তাঁহার মাতার গুণে শৈশব হইতেই সুশিক্ষা লাভ করিয়া উন্নত হইয়াছিলেন।—আমেরিকার স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক জর্জ ওয়াসিংটন দ্বাদশবৎসরে পিতৃহীন হইয়া শুদ্ধ তাঁহার মাতার শিক্ষা ও সদ্‌গুণে মহৎ লোক হইযাছিলেন।

আমাদের দেশের জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনে যে উন্নতি আমরা বর্ত্তমানে দেখিতে পাইতেছি তাহাও শুনিয়াছি যে, তাঁহার মাতার গুণেই ঘটিয়াছে। লেখকের পূজ্যপাদ পিতামহও শুনিয়াছি তাঁহার জীবনের মহোন্নতির জন্য মাতৃঋণে মহাবদ্ধ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও মাতৃগুণে আকৃষ্ট ছিলেন—তাঁহার মাতৃভক্তি প্রবলা ছিল। আমাদের আর্য্য শাস্ত্রে যে মাতাকে "পরম গুরু" বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। এই মাতার পরমগুরুত্ব অনার্য্য যে চীন, সেও রীতিমত বুঝিত; তাহারও গ্রন্থে জননীর গুণে যে সন্তান গুণবান হয় তদ্বিষয়ক উদাহরণ আছে।—উদাহরণস্বরূপ একটী চীনগল্প পাঠককে উপহার দিই :—

"কাউকি নামে এক চীন দেশীয় বিধবা চীন দেশের অন্তঃপাতী সান্‌টুঙ প্রদেশে বাস করিতেন। তাঁহার আইয়ট্ নামে এক পুত্র ছিলেন। এই আইয়ট্ কি প্রকারে যে তাঁহার জননীর পবিত্র উৎসাহ বাক্যে উৎসাহী হইয়াছিলেন; তাহার অধ্যবসায় ভঙ্গ হইলে তাঁহার মাতার বাক্যে পুনরায় কিরূপ অলস্ত উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে তিনি পারিবারিক দরিদ্রাবস্থা ঘুচাইয়াছিলেন তাহা বলি।

আইয়ট্ তাঁহার ষোল বৎসর বয়সের সময় খুব পড়িতে ভাল বাসিতেন; তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় নম্র এবং জননীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনি বিদ্বজ্জনদিগকে সতত মান্য করিয়া চলিতেন।

তাঁহার এই সকল সদ্‌গুণের কথা গ্রামের চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়াছিল।

আইয়ট্ একদিন তাঁহার পাঠে গাঢ়রূপে নিবিষ্ট হইয়া আছেন এমন সময়ে তাঁহার মা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন "আইয়ট্ আর তোমার পড়িতে হইবে না, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, বই বন্ধ কর। চল, বৈকাল বেলায় কিছু খাও নাই,

তুমি দিন রাত্রিই মানসিক শ্রম কর আহার ও বিশ্রামের উপর বেশী কিছু দৃষ্টি রাখো না। তখন আইয়ট্ তাঁহাকে বলিলেন" মা তুমি যা আদেশ করিবে তা আমি পালন করিতেছি কিন্তু মা তুমি আমার জন্য বেশ্‌মী কাপড় তৈয়ারি করিয়া আমার শরীর মনকে আহার ও জ্ঞান দ্বারা অহরহঃ পুষ্টি সাধন কবিতে ব্যগ্র হইয়া নিজের অমূল্য স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন করিতেছ ; মা তুমি ক্ষান্ত হও।"

জননী বলিলেন "সত্য আমি বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছি, জীবনের দিন আমার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে কিন্তু আমাকে ঈশ্বর যখন সংসারের গুরুতর ভার দিয়াছেন, তখন আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত তোমাদের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব। আমি এই বেশ্‌মী কাপড় তৈয়ারি করিতেছি এ তোমার জন্যই। ইহা আমি অবশ্যই শেষ করিব। আইয়ট্ আমি তোমাকে বলি, যৌবন কালে অনেকে বিপথগামী হয়, তুমি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছ তথাপি তোমার সুবুদ্ধি ও সততা দেখিয়া আমি সুখী হইলাম, কিন্তু শুধু বুদ্ধি সততা থাকিলেই সংসারে কার্য্য সিদ্ধি হয় না ; সংসারে প্রতিপদে তোমার অধ্যবসায় চাই, তাহা হইলেই তুমি বিঘ্নরাশি ভেদ করিয়া সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে। তুমি যে এই দুই পক্ষ ধরিয়া ক্রমাগত বিদ্যার পুরস্কার পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছ, তা খুব ভাল, কিন্তু এবারও যদি না পাও তবুও নিরাশ হইও না ; চেষ্টা ছাড়িয়া দিও না। এই তোমার অধ্যবসায়ের প্রথম সোপান। এর পরে জীবনে এমন কত শত বিষয় আসিবে তাহা অধ্যবসায়ের সাহায্য বিনা কোন প্রকারে আয়ত্ত করিতে পারিবে না। অতএব এখন হইতেই অধ্যবসায়ী হও।

দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল এই বৃদ্ধা জীর্ণা শীর্ণা স্ত্রীলোক এক অধ্যবসায়কে অবলম্বন করতঃ জরি দিয়া রেশমী কাপড় বুনিতেছেন, আর ঐ যুবক মাতার গুণে সদ্‌গুণান্বিত হইয়া কনফুসিয়সের স্বায়ত্ত শাসনের বিষয় পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন,—অধ্যবসায়ের অবসান নাই।

পরে একদিন "আইয়ট্‌কে তাঁহার মাতা আসিয়া বলিলেন আইয়ট্ তুমি এখন বই বন্ধ কর, তুমি পড়িয়া পড়িয়া শীর্ণ হইয়া গিয়াছ। তোমার এই সুতার কাপড় ঘর্ম্মাক্ত ও মাটী হইয়া গিয়াছে ; যাহা হউক আমার প্রিয় আইয়ট্ তাহার অধ্যবসায়ের পুরস্কার স্বরূপ একদিন মান্দারিণের (চীনদেশীয় শাসনকর্ত্তা) জরি দেওয়া রেশমী কাপড় পরিবে।"

আইয়ট্ বলিলেন "মা আমি নিরাশ হইয়া বিবর্ণপ্রায় হইয়াছি। দশবার আমি সাহিত্যের সম্মানপদবীতে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিয়াছি দশবারই আমি অকৃতকার্য্য হইলাম। আমি এখন আর সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে ইচ্ছা করি না ; আমি তাহা হইতে নিরস্ত হইয়া এমন কোন কারবার আরম্ভ করিব যদ্দ্বারা মা তোমার ও আমার ভরণপোষণ চালাইতে সক্ষম হই। মা তুমি আর ভাল দেখিতে পাও না তত্রাচ তুমি তোমার এই অনুপযুক্ত ছেলের ভরণপোষণার্থে কত শ্রম স্বীকার করিতেছ মা আমি এখন হইতে আর বই স্পর্শ করিব না।"

মাতা বলিলেন "প্রিয় আইয়ট্ কনফুসিয়সের বই পড়া তোমার খুব আবশ্যক।

তুমি উহা ছাড়িও না। কনফুসিয়সের গ্রন্থে আত্মসংযম সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত আছে সেগুলি একেবারে অমূল্য ধন। সেগুলি তোমার হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখা সম্যক্ উচিত। আমি তোমাকে বার বার বলিয়াছি যে অধ্যবসায়ী হও, শেষে জিতিবেই জিতিবে। যদিও তুমি দশবার অকৃতকার্য্য হইয়াছ তবুও তুমি হতাশ হইও না। ফের অধ্যবসায় অবলম্বন কর। তুমি এক দশবার চেষ্টা করিয়াই চেষ্টা হইতে বিরত হইতেছ তাহাতে কখন তুমি একটা বড় কাজ করিতে পারিবে! ইয়ংষ্টিকিয়ং নদীতে বল দেখি কত দশফোটা জল আছে? ছোট ছোট অমন কত ফোটা জলের সমষ্টিতে একটা বৃহৎ নদী হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত না তুমি অধ্যবসায় সহকারে একজন মস্ত পণ্ডিতের মান প্রাপ্ত হইবে, সে পর্য্যন্ত আমি পরিশ্রম করিতে ক্লান্ত হইব না। তুমি একজন মস্ত পণ্ডিতের পদবী পাইলে আমি আর শ্রম করিব না, কেবল তোমার জন্য যা রেশ্‌মী কাপড়টা বুনিব।

মাতৃবাক্যে উৎসাহিত হইয়া আইয়ট্ আরও দশ বৎসর অবধি অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া এক জন কিউজিন (পণ্ডিত) হইলেন; তথাকার বড়লোকদের তালিকার মধ্যে আইয়টের নাম রাখা হইল, স্বয়ং চীন সম্রাট তাঁহার গুণের প্রশংসা করিয়া পাঠাইলেন।

পুনশ্চ আরও দশ বৎসর পরে আইয়ট্ রাজসভায় প্রবেশাধিকার পাইলেন। তিনি তখন হইতে প্রায়ই সম্রাটের সম্মুখে অতি বিনীতভাবে ভক্তি প্রদর্শন করতঃ গমন করিতেন। একদা সম্রাট সমক্ষে রাজসভায় আইয়টের পরীক্ষা হইল, তিনি তাহাতে উত্তীর্ণ হইলেন; চীনরাজ তাঁহাকে রেদবুতন নামক স্থানের মান্দারিন ও একটী প্রদেশের রাজপ্রতিনিধি করিয়া দিলেন। তখন আইয়ট্ মনের সুখে মাতার পবিত্র উপদেশ স্মরণ করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন। যখন তিনি গৃহে আসিলেন দেখেন তাঁহার বৃদ্ধা জননী জরি দিয়া রেশ্‌মী কাপড় বুনিতেছেন; তাঁহার শীর্ণাবস্থায়ও কাজের বিরাম নাই; তাঁহার দৃষ্টিশক্তি হস্তপদাদি সকলই দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু প্রাণশক্তি তখনও খুব তীক্ষ্ণ ছিল। আইয়টের স্ত্রী আইয়টের পদধ্বনি শুনিতে পাইবার পূর্ব্বে জননী শুনিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, আইয়ট্ এস ঘরের ভিতরে এস। এই যে মহা প্রফুল্লিত দেখিতেছি।

আইয়ট্ কহিলেন "মা আমি একটী জায়গার মান্দারিন ও একটী প্রদেশের রাজ প্রতিনিধি হইয়াছি "

মা বলিলেন "আমি বলি নাই যে তুমি একদিন অবশ্যই মান্দারিণের রেসমী পোষাক পরিবে। আমি তোমাকে সতত অধ্যবসায়ী হইতে উপদেশ দিই নাই? এই লও তোমার রাজকীয় রেশ্‌মী পোষাক; ইহা আমি নিজ হস্তে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করিয়াছি। এখন তুমি রাজপ্রতিনিধি মান্দারিণ হইলে আর আমিও শ্রমে ক্ষান্ত দিলাম। তুমি আমার আদেশানুযায়ী কাজ করিয়াছিলে ও অধ্যবসায়ী হইয়াছিলে এখন তাহার ফলস্বরূপ তুমি মান্দারিন,

রাজপ্রতিনিধি হইলে। প্রিয়পুত্র আইয়ট্ তুমি টাইয়নকে (আইয়টের স্ত্রী) তোমার ছেলে সামুঙকে আমার নিকটে লইয়া আসিতে বল।” আইয়ট্ মাতার আদেশানুসারে তাঁহার পত্নী ও পুত্রকে ডাকিয়া আনিল। অবশেষে বৃদ্ধা জননী তাঁহার পৌত্রকে কাছে লইয়া বলিতে লাগিলেন “সামুঙ তোমার পিতার দিকে একবার চাহিয়া দেখ, তিনি একজন বড় মান্দারিন, একটা প্রদেশের রাজ-প্রতিনিধি এবং একজন পণ্ডিতলোক। সামুঙ! তোমার পিতা যখন তোমার বয়স্ক ছিলেন তখন আমরা অতিশয় দরিদ্র ছিলাম। আমি একা পরিশ্রম করিয়া আমার ও তোমার পিতার ভরণপোষণ চালাইতাম কারণ তখন তোমার পিতা-মহ কোন এক দূরস্থিত মফস্বল দেশে ছিলেন। তোমার পিতার শিশু বয়সে অত্যন্ত বিদ্যাভ্যাসের দিকে টান থাকাতে আমি তাঁহাকে তাঁহার আবশ্যকীয় বই-গুলি কোনরূপে কায়ক্লেশে কিনিয়া দিই; পরে মাস ঋতু বৎসর চলিয়া যায় আমাদের আর দরিদ্রতা ঘোচে না; তখন তোমার পিতা সাহিত্যের সম্পদে বসিবার জন্য গোনেরো বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে সে চেষ্টা হইতে বিরত হ'ন। কিন্তু আমি তাঁহাকে নানারূপ পরামর্শ দিয়া পুনরায় অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে বলিলাম। তিনি আমার পরামর্শ যত্নপূর্ব্বক শুনিয়া-ছেন, আমার আজ্ঞা ঠিক পালন করিয়া-ছেন; দেখ এখন পিতা একজন মস্ত বড় লোক। সামুঙ! তুমি তোমার পিতার মত হও। যা'যা' বলিলাম তা তোমার হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখ, সর্ব্ববিষয়ে অধ্যবসায়ী হইও। যাও এখন বেড়াওগে।

ইহার কিছুক্ষণ পরে তিনি আইয়ট্কে বলিলেন 'আইয়ট্ আমি বাঁচিয়া থাকিতে তোমাকে সৌভ গ্যবান হইতে দেখিলাম ইহাই আমার যথেষ্ট সুখ। আমিও বেশী দিন আর নাই চলিলাম; তোমরা সব সুখে থাক আর শুন তোমার বাসস্থানের শিরোদেশে যেন এই কয়টী কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে:—

“বড় বড় বিষয়ে যদি
কৃতকার্য্য হ'তে চাও
শ্রমোত্তম অধ্যবসায়
সদা তাহাতে লাগাও।
আমি মাতার আদেশ
সম্যকরূপে পালিয়া
তাঁর সব উপদেশ
প্রফুল্লরূপে মানিয়া
দেখ আমি একজন
মস্তলোক মান্দারিণ
(জেনে) সম্মানের দ্বারে রয়
অধ্যবসায় সঙ্গিন।

শিশুনাগ।

মহারথ জরাসন্ধের শাসনকালে ভারতের ক্ষত্রিয়তেজ মগধেই এক প্রকার কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার ধ্বংস সাধন করিয়া ভারতের রাজলক্ষ্মীকে যুধিষ্ঠিরের অঙ্কে স্থাপিত করেন। সেই অবধি মহারাজ ক্ষেমক পর্য্যন্ত তাহা পারীক্ষিতগণেরই অধিগত রহিল; কিন্তু ক্ষেমকের মৃত্যুর সহিত পাণ্ডবগণের জলপিণ্ড বিলুপ্ত হওয়াতে ভারতের সিংহাসন পুনর্ব্বার জরাসন্ধের সন্তানগণের করতলগত হইল। জরাসন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাত্রিংশৎ জন নরপতি সর্ব্বসমেত সহস্র বৎসর মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। রিপুঞ্জয় ইহাঁদের শেষ বংশধর। বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী সুনিক ইহাঁকে বধ করিয়া স্বীয় পুত্র প্রদ্যোতকে মগধের সিংহাসনে অভিষেক করিল। সম্ভবতঃ এই রাজঘাতী ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। রাজাকে হত্যা করিয়া সে যখন সহজেই স্বীয় পুত্রকে রাজা করিতে পারিয়াছিল, তখন বোধ হয় তাহার সেই ভয়াবহ চক্রান্তের মধ্যে রাজ্যের অনেক ক্ষমতাশালী কর্ম্মচারী সংলিপ্ত ছিল। যাহা হউক, রিপুঞ্জয়ের হত্যা ভারতে রাষ্ট্রবিপ্লবের একটী প্রধান নিদর্শন। যে বিপ্লববহ্নি ভারতের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে ধূমায়মান হইতেছিল, মহারাজা রিপুঞ্জয়ের হত্যায় তাহার প্রথম প্রচণ্ড বিস্ফুরণ দেখা যায়। পাপানুমোদিত এই শোচনীয় লোমহর্ষণ ঘটনার পর হইতে রাজহত্যা ভারতে প্রায় নিত্য হইয়া পড়িল। প্রজাবর্গের রাজভক্তি লোপ পাইতে লাগিল,—সেই সঙ্গে লোকের স্বার্থপরতা অতিশয় বর্দ্ধিত হওয়াতে সকল প্রকার ধর্ম্ম ও সামাজিক বন্ধন ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল:—জাতিভেদের কঠোর বন্ধন আর তত দৃঢ় রহিল না; লোকে স্বেচ্ছানুসারেই, অথবা স্থল বিশেষে বাধ্য হইয়াই, পিতৃপুরুষগণের বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল; স্বার্থপরতা—বিপ্লবপ্রিয়তা—স্বেচ্ছাচারিতা ভৈরবী প্রমাথিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে ভারতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। বলই তৎকালে অধিকারের একমাত্র মাপদণ্ড হইল, কাহারও স্বত্ব নিরাপদ বা অব্যাহত রহিল না। নৃপতিগণ রাজাসনে আসীন থাকিয়া নিষ্করুণ হৃদয়ে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন, প্রজাকুল তাহাতে নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া রাজার ঐশীশক্তিকে অধঃকৃত করিবার সুযোগানুসন্ধানে সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিল। এই সময়ে শাক্যসিংহের সাম্যভেরী প্রলয় বিষাণ সদৃশ প্রচণ্ড নাদে মগধের গিরিব্রজে নিনাদিত হওয়াতে সমগ্র ভারত এক ভীষণ বৈদ্যুতিক তেজে আলোড়িত হইল; জাতিভেদের কঠোর নিগড় শতধা ভগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইল—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম আপাদমস্তক আহত হইয়া নিতান্ত মুমূর্ষু হইয়া পড়িল।

শাক্যসিংহের ধর্ম্ম ভারতবর্ষীয় আর্য্যসমাজের সকল স্তরেই সঙ্করত্বের বীজ বপণ করিয়াছিল। ধর্ম্মের মূল নীতি

উৎকৃষ্ট হইলেও সকলেই কিন্তু অনুসরণ করে নাই। সেই মন্ত্রই আধারভেদে অনেকস্থলে বিভিন্ন ফল উৎপাদন করিয়াছিল। যেমন দলে দলে অনেকে সংসার ত্যাগ করিতে লাগিল, সেইরূপ অনেকে দলে দলে হিন্দুর সামাজিক বন্ধন ছেদন করিয়া উদ্দামভাবে স্বার্থসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইল। কেহ তাহাদিগকে বাধা দিতে সহসা সাহসী হইলেন না। শূদ্র শুদ্ধসত্ব ব্রাহ্মণের সহিত বংশগৌরবের স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল; যজনযাজন পরিত্যক্ত হইল, গ্রামে গ্রামে দেবমন্দির সকল শূন্য হইয়া রহিল অথবা দেবমূর্ত্তি সকল সামান্য কাষ্ঠলোষ্ট্রের ন্যায় শৃগাল কুক্কুরগণের পদতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। ব্রত হোম নিরস্ত হইল, হব্যগব্য অন্তর্দ্ধান করিল, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ সমাজের অযথা পুষ্টিবিধান করিতে লাগিল! পিতৃহত্যা ও রাজহত্যা রাজ্যলাভের প্রধান উপায় মধ্যে পরিগণিত হইল!

ভারতের এই সর্ব্বজনীন বিপ্লবকালে—ধর্ম্ম ও সামাজিক বন্ধনের এই শোচনীয় শ্লথ অবস্থায় রাজলক্ষ্মী ক্ষত্রিয়দিগকে ত্যাগ করিয়া বঙ্ককীতনয়ের অঙ্কশায়িনী হইলেন। প্রজাবিদ্রোহে প্রদ্যোতের শেষ বংশধর নন্দিবর্দ্ধন রাজ্যচ্যুত হইলেন। প্রভুহত্যা ও রাজহত্যা দ্বারা যে সিংহাসন অর্জ্জিত হইয়াছিল, প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়া তাহাতে শিশুনাগকে স্থাপিত করিল। এই শিশুনাগ কে? বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে শিশুনাগের কেবল নামমাত্র দেখা যায়, কিন্তু কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বায়ুপুরাণে ও মৎস্যপুরাণে ইহার সামান্য পরিচয় দেওয়া আছে:—

হত্বা তেষাং যশঃ কৃৎস্নং শিশুনাগো ভবিষ্যতি।
বারাণস্যাং সুতস্তস্য সো যাস্যতি গিরিব্রজম্॥
বায়ুপুরাণ।

বারাণস্যাং সুতং স্থাপ্য অধ্যাস্যতি গিরিব্রজম্;
মৎস্যপুরাণ।

অর্থাৎ প্রদ্যোতদিগের সমস্ত যশ হরণ করিয়া শিশুনাগ রাজা হইবেন। বারাণসীতে স্বীয় পুত্রকে স্থাপন করিয়া তিনি গিরিব্রজে আগমন করিবেন।

এতদ্ব্যতীত আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সিংহলের ইতিহাস মহাবংশের চতুর্থ পরিচ্ছেদে শিশুনাগ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত বিবরণ প্রকটিত আছে। এস্থলে তাহার মূল ও অনুবাদ প্রকটিত হইল।

"মন্দস্‌স পুত্তোপি তবণ্‌ঘাতেত্বা নাগদাসকো চতুবিশতি বস্‌সানি রজ্জন্‌ কারেসি পাপকো।

"পিতু ঘাতকবন্‌শোয়ন্‌" ইতি কুদ্ধাথ নাগরা নাগদাসকরাজানন্‌ অপনেত্বা সমাগতা।

শুশুনাগোতি পন্‌ত্তন্‌ অমচন্‌ সাহুসম্মতন্‌ রাজ্জে সমভিসিঞ্চিন্‌সু সব্বেশন্‌ হিতমানসা।

সো অঠ্‌ঠারস বস্‌সানি রাজা রজ্জমকারয়ি।

অর্থাৎ পাপাশয় নাগদাস পিতাকে হত্যা করিয়া চতুর্ব্বিংশতি বৎসর রাজ্য ভোগ করিল। ইহার এইরূপ কদর্য্য আচরণে নাগরিকবর্গ ক্রুদ্ধ হইয়া সমবেত হইল এবং "ইহা পিতৃঘাতকের বংশ" এইরূপ বলিয়া নাগদাসকে সিংহাসনচ্যুত করিল। সকলের হিতসাধনেচ্ছায় তাহারা সকলে একবাক্যে শুশুনাগ নামধারী মন্ত্রীকে রাজপদে অভিষেক

করিল। তিনি অষ্টাদশ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন।

মহাবংশের মূল অংশে এইমাত্র বিবরণ পাওয়া যায়; কিন্তু উহার টীকায় শিশুনাগের জন্ম ও অবদান সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। এস্থলে তাহার সারমর্ম্ম প্রকটিত হইল। বৈশালীর লিচ্ছবী রাজগণের চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত যে সকল নর্ত্তকী ছিল, তাহাদের প্রধানা "নগরশোভিনী" আখ্যায় সম্মানিত হইত। শিশুনাগ সেইরূপ কোন এক নগরশোভিনীর গর্ভে রাজার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে, নগরশোভিনী স্বগৃহে প্রতিগমন করিলে যথাকালে একটী পুত্রসন্তান প্রসূত হইল। দুঃখের বিষয় পুত্রটীর দেহে সজীবতার কোন লক্ষণই লক্ষিত হইল না; তজ্জন্য জননী তাহাকে একটী পেটক মধ্যে রাখিয়া রাজপথে নিক্ষেপ করিল। তখনই মগধের অধিষ্ঠাতৃ নাগরাজ সেইস্থানে আগমন করিয়া স্বীয় বিশাল ফণাদ্বারা সেই পেটক বেষ্টন করিয়া রহিল। সকলেই "শু"."শু" রবে সর্পকে ভয় দেখাইতে লাগিল; ফণিরাজ ভীত হইয়া অচিরে সেইস্থান পরিত্যাগ করাতে তত্রত্য কোন লোক সেই পেটক উন্মোচন করিল এবং তন্মধ্যে একটী সজীব শিশুকুমার দেখিতে পাইল। সেই শিশুর মুখাবয়বে ভাবী মহত্বের লক্ষণাদি দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। সে তাহাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া লালনপালন করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে মগধের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বালকের পালকপিতার সম্মতিক্রমে তাহাকে স্বীয় ভবনে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে রীতিমত সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নাগ সেই শিশুকে রক্ষা করিয়াছিল এবং নাগরিকগণ "শু" "শু" রবে তাহাকে তাড়িত করিয়া শিশুকে অধিকার করিয়াছিল বলিয়া বালক শুশুনাগ নামে অভিহিত হইল।

সেই বৈশালী নগরে সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অকৃত্রিম স্নেহ ও যত্নে লালিত হইয়া শিশুনাগ সর্ব্ববিদ্যা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শারীর সৌন্দর্য্য ও মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল। তিনি অল্পদিনের মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলেন এবং সকলের হৃদয় অধিকার করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ও নীতিবিদ্ বলিয়া পরিচিত হইলেন। এই সময়ে নাগদাসকে পিতৃহত্যা করাতে নাগরিকবর্গ তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শিশুনাগকে তদুপরি স্থাপিত করিল।

মহাবংশে বর্ণিত আছে শিশুনাগ আঠার বৎসর বৈশালীর রাজা ছিলেন; বোধ হয় ইহার পরই তিনি মগধে আগমন করিয়া রাজ্যচ্যুত নন্দিবর্দ্ধনের সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময় হইতে ৩৬২ বৎসর পর্য্যন্ত মগধরাজ্য শৈশুনাগদিগের অধিকৃত ছিল। তাহার পর তাহা নন্দবংশের করতলগত হয়।

আঁধা।

১

এস দুঃখ, নব পরিচিত!
এস, ধর, প্রেম আলিঙ্গন,
শুষ্ক দেহে উষ্ণতাপ জ্বরা প্রপীড়িত
কি ভীষণ তোমার স্পর্শন।

২

অমানিশি মসীবিলেপিত,
কি বিকৃত তোমার আনন।
শত দুঃস্বপ্নের চিহ্ন ললাটে অঙ্কিত
দুঃশ্চিন্তার মানস কানন!

৩

রুগ্নদেহ, ভগ্ন কলেবর।
মগ্নপ্রাণ বিম্ব সিন্ধুজলে
শ্মশান সৈকতসিক্ত কেশ শিরোপর
জ্বলে বিশ্ব আঁখির অনলে!

৪

শতগ্রন্থি চীর পরিধান,
পুতিকন্থা বিলাস আসন,
শত মন্বন্তর ক্ষুধা ওষ্ঠাগত প্রাণ
শত শেল ভীষণ শাসন!

৫

তাল জঙ্ঘা লঙ্ঘিয়া বিমান,
মুক্ত বাহু পথ আগুলিয়া,
কেব পাছে কাছে কাছে গতি সর্ব্বস্থান,
অমঙ্গল সঙ্গীত গাহিয়া।

৬

রচিয়াছ নিরানন্দ ধাম!
নাট্যশালা যবনিকা ফেলা,
উৎসবের কোলাহল লভেছে বিরাম
আনন্দের সমাধি মেখলা!!

৭

আস্তনর, শান্তি নিকেতনে!
রমে আঁখি, ভ্রমের ছলনে,
চপলা চমকি চলে যায়,
কাঁপে প্রাণ অশনি ভাষায়!!!

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সুগৃহীতনামা শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠে উনাশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিয়াছেন। ইনি এই উনবিংশ শতাব্দীর চতুঃপঞ্চম ভাগের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। ঈশ্বর প্রসাদে ইনি পুরুষায়ুষকাল সমস্ত উপভোগ করিয়া বঙ্গদেশের অবশিষ্ট কল্যাণ সাধন করুন।

মহাত্মা দেবেন্দ্র নাথ ১৭৩৯ শকের ৩রা জ্যৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ৪ মাস পূর্ব্বে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারী কলিকাতায় হিন্দু কলেজ সংস্থাপিত হয়। প্রথমে হিন্দু কলেজের "মহাবিদ্যালয়" নাম ছিল। জন্মাবধি বা জন্ম প্রসঙ্গাবধি এই বিদ্যালয় নানা প্রকার "গ্রহবৈগুণ্য" ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ইহার জন্মস্থানে যে সকল কর্ত্তা বা গ্রহের অধিকার ছিল, তাঁহারা কখনই সদ্ভাবে একমত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি বিধান করিতে পারেন নাই। ১৮১৬ খৃঃঅব্দের ১৪ই মে হইতে বারম্বার সভা হয়। ২৭শে আগষ্টের সভায় এই বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হয়। তাহার ৫ মাস পরে উহার কার্য্যারম্ভ হয়।

এত দিন ধরিয়া উক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে সকল বাদানুবাদ হইতেছিল, তাহার মধ্যে প্রধান তর্ক আমরা এই জানি যে, রামমোহন রায়কে এই বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে রাখা যায় কি না? স্থির হইল—"না।" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া উহার প্রতিষ্ঠাতাগণ আপনাদিগকে নিষ্কণ্টক জ্ঞান করিলেন। ইংরাজী, পারসী ও বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাসমন্বিত মহাবিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল।

পরন্তু এই বিদ্যালয়ের দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভ হইবে না, ইহা জানিতে পারিয়া ইহার প্রধান অনুষ্ঠাতাগণ পর বৎসর, (১৮১৮ অব্দে) "স্কুলসোসাইটী" নামে এক সভা স্থাপন করেন। তাহার তত্ত্বাবধানে কতকগুলি "পাঠশালা" ও "স্কুল" স্থাপিত হয়।

এই সকল বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের বিষম বিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা অজ্ঞানান্ধতার দোষ না বুঝিতেন, এমন নহে, সুতরাং তাঁহারা সুশিক্ষা প্রচারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তথাপি ইঁহাদের অন্তঃকরণে যে অজ্ঞান-কালিমা ছিল, তাহার ফল সর্ব্বাংশে শুভজনক হইবে না, ইহা বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন রামমোহন রায়ের অগোচর ছিল না। রামমোহন স্বদেশীয় লোকদিগের যতটুকু সৎকার্য্য দেখিতে পান, তাহাতেই আনন্দিত।

এই বিদ্যালয় সকল স্থাপনের পূর্ব্বে তিনিই এইরূপে সুশিক্ষা প্রচারের সূত্রপাত করেন। তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠিত এক স্কুল ছিল। সম্প্রতি তিনি আপনাকে এই স্কুল প্রকরণের কার্য্য হইতে দূরে রাখিয়া স্বদেশীয়দিগকে তৎপক্ষে নির্দ্বন্দ্ব করিয়া দিলেন। তথাপি তাঁহাকে ভাবিতে হইয়াছিল,—ধর্ম্ম জ্ঞান সমন্বিত সুশিক্ষা প্রচারের কি উপায় হয়?

"ধর্ম্মজ্ঞান সমন্বিত সুশিক্ষা প্রচারের কি উপায় হয়"—ইহাই রাম মোহন রায়ের এক অন্তঃস্ফূর্ত্ত প্রার্থনা। ঈশ্বর সে প্রর্থনা শুনিলেন। ১৮১৬ অব্দের ২৭শে আগষ্ট, যখন রামমোহন রায়কে ত্যাগ করিয়া হিন্দু কলেজের অনুষ্ঠাতাগণ ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন শিক্ষাপ্রচারের নিয়মাবলি-অবধারণ করিলেন, * সেই সময় রামমোহন রায়ের প্রার্থনার ফলস্বরূপ দেবেন্দ্র নাথ গর্ভস্থ হইয়াছিলেন। দশ মাস পরে এই শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেন। রামমোহন রায়ের এই বান্ধবপুত্র অতি শৈশব বয়সেই তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে আপনার ভবিষ্য কর্ম্মের সূচনা করিয়াছিলেন। †

হিন্দুকলেজ বা মহাবিদ্যালয়ে যে প্রণালীতে শিক্ষা প্রচার হইতেছিল, তাহার ফল সঙ্গে সঙ্গে ফলিল। নাস্তিকতার বাত্যায় কলেজ সমূলে আন্দোলিত হইল। বিদ্যাবৃক্ষের এই বিষম

† শুনা যায় রামমোহন রায় এই শিশুকে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন "এই শিশুই আমার গদি অধিকার করিবে।"

* Rules of the Hindu College —I the primary object of this Institution is, the tuition of the sons of respectable Hindoos in the English and Indian language and in the literature and science of Europe and Asia.

David Hare, by Peary Chand Mittra, Appendix A.

বিকৃত ফল দর্শন করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ রামমোহনের অন্তঃকরণে বড়ই ব্যথা জন্মিয়াছিল। *

এক্ষণে রাজোপাধিধারী রামমোহন ইংলণ্ড গমনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। যাত্রাকালে তিনি তাঁহার নয়নানন্দকর দেবেন্দ্র নাথের হস্তধারণ করিয়া কি কয়েকটী কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কেহই লিখিয়া রাখিতে পারেন নাই। দেবেন্দ্র নাথ তাঁহার গম্ভীর ভাব এবং নিয়ত-প্রার্থনা-পূর্ণ ঈশ্বরপ্রেমোদ্দীপক মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া আত্মহারা হইতেন, অথবা আপনাকে তাঁহার অন্তর্নির্বিষ্ট করিয়া ফেলিতেন; অতএব তিনিও তাঁহার যাত্রাকালীন আশীর্ব্বাদ বচন বা অধিকারদানমন্ত্র স্মরণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়েন নাই।

১৮৩১ অব্দের ৮ই এপ্রেল দিবসে রামমোহন রায় ইংলণ্ডের অন্তর্গত লিবরপুল নগরে উপনীত হইলেন। ২৫শে এপ্রেল দিবসে হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও সাহেবের কর্ম্ম ত্যাগপত্র তৎকালীন শিক্ষাসংক্রান্ত বাত্যাবর্ত্তের অবসান করিয়াছিল। এইরূপে এদেশে অজ্ঞান দূরীভূত ও ধর্ম্মজ্ঞানসহকৃত সুশিক্ষা বিধানের কাল সমুপস্থিত হইলে রামমোহন রায়ের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত ধীমান্ দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজের শিক্ষা গ্রহণার্থ তথায় প্রবিষ্ট হইলেন। তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ। ইতি পূর্ব্বে তিনি রামমোহন রায়ের নিজের স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যে বিদ্বেষ বশতঃ হিন্দুকলেজের অনুষ্ঠাতাগণ রামমোহন রায়কে উহার সংস্পর্শ হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলে তাঁহার স্কুলের মহাশালী শস্যবৃক্ষ উক্ত কলেজে প্রতিরোপিত হইল।

রামমোহন রায় ১৮১৪ হইতে ১৮৩০ অব্দ পর্য্যন্ত ১৬ বৎসর কলিকাতায় অবস্থিত হইয়া লুপ্তপ্রায় বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচার দ্বারা এদেশের ধর্ম্ম বিষয়ে যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের এ প্রবন্ধে অধিক আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার স্বনাভিষিক্ত

* রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গিয়াও তাঁহার এই মনোব্যথা ও আক্ষেপ ভুলিতে বা চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার তত্রত্য জীবন চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন।—

"In his younger years, his mind had been deeply struck with the evils of believing too much, and against that he directed all his energies; but, in his latter days, he began to feel that there was as much, if not greater, danger in the tendency to believe too little. He often deplored the existence of a party which had sprung up in Calcutta, composed principally of imprudent young men, some of them possessing talent, who had avowed themselves sceptics in the widest sense of the term. He described it as partly composed of East Indians, partly of the Hindu youths who, from education, had learnt to reject their own faith without substituting any other. These he thought more debased than the most bigoted Hindu, and their principles the bane of all morality."

Biography of Raja Ram Mohun Roy. London, 1833-34.

দেবেন্দ্র নাথ এই তাঁহার পবিত্র দীর্ঘ জীবনে কি কি কার্য্য করিয়াছেন, আমরা তাহারই কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের বিবেচনায় শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের জীবন চরিত আলোচনা করিবার কাল এখনো সমুপস্থিত হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজের এই অল্প বয়সে তাহার ইতিহাস-প্রিয় সভ্যগণ "ইতিহাস" নামে তৎসংক্রান্ত অনেক কথা লিখিয়াছেন। তৎ প্রযুক্ত দেবেন্দ্র নাথের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি পরিবর্দ্ধন ও উন্নতি সাধনের কতকগুলি সোপান বা অবস্থা প্রদর্শিত হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁহার একই মূর্ত্তির ক্রমশঃ বিকাশ দেখা যাইতেছে।

শৈশব কালে তিনি যেরূপ নিষ্ঠা সহকারে অহরহ দেবদেবীর পূজায় নিবিষ্ট থাকিতেন, এখনো তিনি সেইরূপ নিষ্ঠায় নিরন্তর ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। তখন বালকের যোগ্য দেবমূর্ত্তি; এক্ষণে জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিসেবিত পরমাত্মা-একই ভাবে তাঁহাকে উত্তরোত্তর উন্নতি মঞ্চে অধিরোহিত করিতেছেন। বাল্যকালের স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিশক্তি ও ধর্ম্ম-পিপাসা ক্রমশঃ পরিষ্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া ঈশ্বরে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। ভাগ ভাগ করিয়া যতই বিচার করা যাইবে, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের জীবন চরিতের সকল অবস্থাতে ঐ একই লক্ষণ পরিস্ফুট হইবে। অতএব তাঁহার জীবন চরিত সম্বন্ধে তাঁহার ভাববিকাশের ক্রম বা উদ্দেশ্যের ফলাফল বিচার না করিয়া আমরা এই মাত্র দেখিব যে তিনি কোন্ কোন্ সময়ে কি কি কার্য্য করিয়াছেন এবং কোন্ কোন্ সময়ে কি কি প্রধান উপদেশ দিয়াছেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা।

কলেজ পরিত্যাগের পর দেবেন্দ্র নাথের প্রথম কার্য্য তত্ত্ববোধিনী সভা-স্থাপন। "১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে এই সভার জন্ম হয়।" *

এই সভাস্থাপনের পূর্ব্বে হিন্দুকলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ অপরাপর ছাত্রগণের সহিত একসভা প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার নাম—The Society for the acquisition of general knowledge. বাঙ্গালা ভাষায় তাহাকে "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা" বলা হইত। ১৮৩৮ অব্দের ১৬ মে তাহার কার্য্যারম্ভ হয়। সাধারণতঃ ইংরাজী ভাষায় এবং কখন কখন বাঙ্গালা ভাষায় এই সভার বক্তৃতা হইত। ছাত্রাবস্থায় যে স্বল্পমাত্র জ্ঞান সঞ্চয় হয়, তাহার বৃদ্ধি সাধন এবং পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব উৎপাদন করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। প্রায় দুই শত যুবক ইহার সভ্য হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীমৎ দেবেন্দ্র নাথের নামও দৃষ্ট হয়।

এই সভার সভ্যেরা কলেজ-লব্ধ সংস্কার বশতঃ ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতে একান্ত পরাঙ্মুখ ছিলেন। ধর্ম্মের অনুশীলন করিলে হিন্দুসমাজের আবহমান কাল প্রচলিত রীতিনীতি বিচলিত হইবে, এই আশঙ্কায় কলেজের অধ্যক্ষগণ কলেজের ছাত্রগণের পক্ষে ধর্ম্মচর্চ্চা করা

* ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস।

দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্র নাথ ঐ কার্য্যের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার পক্ষে এই সভা কোন কার্য্যেরই হইল না। সুতরাং তাঁহাকে ধর্ম্মচর্চ্চা নিমিত্ত এক পৃথক্ সভার সৃষ্টি করিতে হইল।

জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা ২০০ সভ্য লইয়া মহাড়ম্বরে কলেজগৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভা আপাততঃ তাঁহার জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল, বলিতে হইবে। কারণ অতি অল্পমাত্র অকৃতবিদ্য সভ্য সমেত এই সভার অধিবেশন অতি ক্ষুদ্রাকারে তাঁহাব নিজ বাটীর এক নিভৃত প্রকোষ্ঠেই সাধিত হইত। প্রতি মাসে এই সভার অধিবেশন হইত। এক এক ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট মত বক্তৃতা পাঠ করিলে অন্যান্য আলোচনা হইত।

"তত্ত্ববোধিনী" নাম এবং এই সভার আলোচিত উপনিষদাদির বিষয় চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে যে শ্রীমৎ দেবেন্দ্র নাথ ধর্ম্মজ্ঞানৈষণায় এক স্বতন্ত্র পুরুষ। এরূপ কথিত আছে যে তিনি এক দিবস উপনিষদের এক ছিন্ন পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহার অর্থ বোধ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট উপনিষদুক্ত সমুদায় ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু এই সাধনা ও সিদ্ধি কিয়ৎকালেব কর্ম্মফল নহে। তাঁহার স্বভাবোদিত ব্রহ্মজ্ঞান কখন নক্ষত্র খচিত আকাশদর্শনে, কখন শ্মশানক্ষেত্র-প্রবাহিত বৈরাগ্য গীত শ্রবণে, কখন বা উপনিষৎ পাঠে অতি সহজেই আত্মার মধ্যে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি কৃতবিদ্য অকৃতবিদ্য সকল প্রকার লোককে লইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। যাঁহার যতদূর সা য তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের অংশভাগী হইতেন। সকল লোকের সহিত ধর্ম্মালাপ করা তাঁহার নিরতিশয় আনন্দের বিষয় ছিল।

তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত ব্রাহ্মসমাজের যোগ।

তত্ত্ববোধিনী সভাস্থাপনের ২ বৎসর পূর্ব্বে দেবেন্দ্র নাথ হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের ভাব গতি জানিয়াছিলেন। ইহার পরে দুই বৎসর তিনি ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত প্রবীন লোকদিগের উদ্দেশ্য ও চেষ্টার ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। ইত্যবসরে পূর্ব্বোক্ত কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রগণ তাঁহাব বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মভাবের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিলেন। তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের বলাধান হইল; দেবেন্দ্রনাথেরও কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইল। ১৭৬৩ শকে এই শুভ সম্মেলন হয়।

বিষয় কর্ম্ম।

এই সময়ে দেবেন্দ্র নাথের বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর। এই পঞ্চবিংশবৎসর ধরিয়া দেবেন্দ্র নাথ যে কেবল জ্ঞান ধর্ম্মের চর্চ্চা করিয়াছেন, বিষয়কর্ম্ম কিছু করেন নাই, তাহা নহে। তিনি যে মহাপুরুষের

মস্তান, তাঁহার পৃথিবী জুড়িয়া কর্ম্ম। তাঁহার অনন্ত বিষয় ব্যাপারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অবশ্যই লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। খৃঃ ১৮৩৪ অব্দে দ্বারকা নাথ ঠাকুর চাকুরী সম্বন্ধে মহোচ্চ পদ ত্যাগ করিয়া স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন উদ্দেশে কার, ঠাকুর এবং কোম্পানী নামে এক বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। দেবেন্দ্র নাথকে সেই কুঠিতে বিষয় কর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। এবম্বিধ আরো কোন কোন কর্ম্ম এবং জমিদারী ব্যাপার শিক্ষা করিয়া দেবেন্দ্রনাথ পিতার উপযুক্ত পুত্র হইতে পারিলেন, সংসারের সহিত কার্য্য করিতে জানিলেন, এবং পার্থিব ভার বহনের যোগ্যতা লাভ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই বদ্ধ হইলেন না। স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মানুরাগ প্রভাবে তিনি এই জটিল বিষয় জালের মধ্যেও নির্লিপ্ত রহিলেন। অথবা ইহা বলিতে পারা যায় যে সুদীর্ঘ জীবনকাল তিনি ঘোর বিষয় সংস্পর্শে থাকিয়াও কেমন অনাসক্ত ভাবে ঋষিধর্ম্ম পালন করিবেন, প্রথম যৌবনে তিনি তাহারই পরীক্ষা প্রদান করিলেন।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা।

এপর্য্যন্ত যাঁহারা সুশিক্ষিত বা দেশানুরাগী বলিয়া পরিচিত হইতেন, তাঁহারা অধিকাংশ বিষয়ে ইংরাজদিগের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেন। এই ইংরাজসংসর্গ এদেশীয় সাধারণ লোকের কোন দিনই তৃপ্তিজনক হয় নাই। এই জন্য ১৮১৭ অব্দে যখন হিন্দুকলেজ স্থাপন হয়, ১৮১৮ অব্দে যখন স্কুল সোসাইটী দ্বারা পাঠশালা সকল স্থাপন হয়, ১৮৩৫ অব্দে যখন মেডিকেলকলেজ স্থাপন হয়, তখন সাধারণ লোক ঐ সকল দেশহিতৈষীদিগের নিন্দাবাদ করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। ১৮৩৯।৪০ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের নানা স্থানে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা স্কুল ও কলেজ সংস্থাপিত হইল। খৃষ্টীয় মিশনরিগণ গ্রামে গ্রামে কত বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন; কিন্তু লোকেরা ঐ হিতানুষ্ঠানকারীদিগের প্রতি এক প্রকার সন্দিহানচিত্ত ছিল।

এমন অবস্থায় তত্ত্ববোধিনী সভা কলিকাতায় এবং পল্লীগ্রামে নূতন প্রকরণে পাঠশালা সকল স্থাপনের উপক্রম করিলেন। পূর্ব্বে সমাজদ্রোহীতার ভয়ে এদেশীয়েরা সুশিক্ষার নামে নিরীশ্বর শিক্ষা বিস্তার করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ নিঃসঙ্কোচে উপনিষদাদি শাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা নামে কতিপয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সকল বিদ্যালয়ের পুস্তক, অধ্যাপক ও অধ্যয়ন প্রণালীতে যে যে দোষ থাকুক, ইহা খাঁটি দেশীয় জিনিষ, এই খ্যাতিতে দেবেন্দ্রনাথের এই নবোদ্যম জয়যুক্ত হইতে লাগিল।

পাঠ্যপুস্তক।

তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপনের পূর্ব্বে *এদেশের পাঠ্যপুস্তকগুলি প্রায়ই* ইংরাজদিগের দ্বারা লিখিত বা অনুবাদিত অথবা দেশীয় লোকদিগের দ্বারা ইংরাজীর আদর্শে সঙ্কলিত হইত। ভাষার কদর্য্যতায় সেগুলি আরো অপাঠ্য বা দুষ্পাঠ্য বোধ

হইত। তত্ত্বোধিনী সভা হইতে সেই দোষ বিদূরিত হইল।

এবিষয়ে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। পুস্তকগুলির নাম করিলেই বর্ত্তমানকালের লোকেরা তাহার প্রকৃতি চিনিয়া লইতে পারিবেন।

তত্ত্বোধিনী সভার পূর্ব্বের পুস্তক—

১। পুরুষ পরীক্ষা। ২ পত্রাবলী। ৩। মার্শমেন সাহেবের বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস। ৪। ফর্গসন সাহেবের লিখিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা শ্রীযুক্ত যাতি সাহেব কর্তৃক অনুবাদিত। ৫। শ্রীযুক্ত যাতি সাহেবের কৃত পদার্থ বিদ্যাসার। ৬। শ্রীযুক্ত জানমাক সাহেব কৃত কিমিয়া বিদ্যাসার। ৭। বাজাবলি। ৮। কীথ সাহেবের কৃত বঙ্গভাষা ব্যাকরণ। ৯। জ্ঞানার্ণব।

তত্ত্বোধিনী সভার সাহায্যে রচিত পুস্তক অক্ষয়কুমার দত্ত কৃত ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি।

শেষোক্ত পুস্তক সকল তত্ত্বোধিনী পাঠশালায় অধ্যাপনার নিমিত্ত রচিত হইয়া প্রথমে অধীত এবং পরে ১৭৬৩ শকে মুদ্রিত হয়।

বাঙ্গালা ভাষা।

ক্ষণজন্মা দেবেন্দ্রনাথের প্রতি যেন বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর বিশেষ কৃপা আছে এমন বোধ হয়। তাঁহার বিপুল বংশের স্ত্রী পুরুষ সকলেই বিদ্যানুরাগী। এদেশের উন্নতিকর অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব শ্রীবৃদ্ধি সাধন কার্য্যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তি কোন না কোন প্রকারে যোগ দিয়াছেন। যাঁহারা এবিষয়ে কৃতী, তাঁহারা বিপুল যশের ভাগী হইয়াছেন। এই যশের ভাগ বিচারে অনেক ব্যক্তি নানা প্রকার দাবী করেন, কিন্তু ইহার পরিবেশনে যাঁহার প্রাপ্তব্য ভাগ অধিক, এমন অনেক ব্যক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ এই প্রচ্ছন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রধান। দেবেন্দ্রনাথ অনেক বিষয়ে অপরকে অগ্রণী করিয়া চলেন। এই জন্য তাঁহার তত্ত্বোধিনী পত্রিকার ভাষা বিষয়িনী খ্যাতি প্রধানতঃ অক্ষয়কুমার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু যিনি দেবেন্দ্রনাথের সামান্য একখানি পত্রের ভাষা ভালরূপে আলোচনা করেন তিনি তাঁহার মসৃণ ও সুচ্ছন্দভাষায় তাঁহার হৃদয়ের সরস, মধুর ও উদারভাব সহজে প্রতিফলিত দেখিতে পান। তাঁহার ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় তাঁহার ভাষার উল্লিখিত গুণ বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে যিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্য কোন পুস্তক প্রণয়ন করেন, তিনি যেমন বিদ্যাসাগরের লিখিত ভাষা অবলম্বন করেন, যিনি কোন প্রাকৃতিক তত্ত্ব বর্ণনা করেন, তিনি যেমন অক্ষয়কুমারের লিখন প্রণালীর অনুসরণ করেন; তেমনি যিনি এক্ষণে ধর্ম্ম বিচার ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা বা ঈশ্বরের প্রেম মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, তিনি কাশীবাসী হউন বা পদ্মাপারে অবস্থান করুন, তাঁহাকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাক্যাবলী গ্রহণ করিতে হয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে এই পত্রিকা ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাস হইতে প্রকাশিত হইয়া অদ্যাবধি নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিতেছে। ইহা মাসিক পত্রিকার মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। অদ্য পর্য্যন্ত বয়ঃক্রম ৫২ বৎসর হইল।

যাঁহারা বর্ত্তমানকালের সভ্যতাস্রোতে নানা দোষ দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও বঙ্গভাষার উন্নতি দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হয়েন।

যাঁহারা প্রথমে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি উদাসীন ছিলেন, এই পত্রিকা প্রকাশ হইলে ইহার ভাষার পারিপাট্য এবং আলোচিত বিষয়ের গুরুত্ব ও উপকারিতা দেখিয়া তাঁহারা সকলেই এই সভাদ্বারে আকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম সরলতা, অটল ব্রতশীলতা, বিশুদ্ধ দেশহিতৈষিতা এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি তাঁহার দলস্থ সমুদয় লোকের উপর সংক্রমিত হইয়াছিল। তাহাতে ইহার লেখকেরা সকলেই একভাবে কথা কহিতেন, এবং কর্ত্তব্যানুরোধে যদি কাহারও নিন্দাবাদ করিতেন, সমীচীন বিচারগুণে তাহাও হিতকররূপে পরিগৃহীত হইত।

এইরূপ পটুতার সহিত পরিচালিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—প্রথমাবস্থায় খৃষ্টান মিশনরিগণের আক্রমণ নিবারণ করেন; বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার প্রতি লোকদিগের অনুরাগ বর্দ্ধিত করেন; শিক্ষাসমাজসংক্রান্ত কর্ম্মচারীদিগের দোষ-খণ্ডন দ্বারা দেশে সুশিক্ষার পথ পরিষ্কৃত করেন; প্রজাপীড়নকারী জমিদারদিগের এবং কৃষকশোষণকারী নীলকরদিগের হস্ত হইতে দুর্ব্বল দরিদ্র লোকদিগের পরিত্রাণ সাধনের চেষ্টা করেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চিরদিন বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রের মর্ম্মোদ্ধার করিয়া দেশীয় পবিত্র ধর্ম্মের রক্ষা করিতেছেন। ঋগ্বেদ, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ এবং স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুবাদ এই পত্রিকার অঙ্গকে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে।

শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক কিরূপে সত্যামৃত লাভ করা যায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাহার বিশিষ্ট উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছে।

১৭৬৯।৭২ শকের পত্রিকায় "পাণ্ডুপুত্র ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের অস্ত্র পরীক্ষা" "মহাভারতীয় সভাপর্ব্ব" প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিবরণ" "ভারতবর্ষ মধ্যে হিন্দুদিগের বসতি বিস্তার", উপাসক মণ্ডলীর বিবরণ—এবং তত্তুল্য নানা প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে তাহার লেখকের সহিত চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

মিশনরি আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ।

এক্ষণে সাধারণের প্রত্যয় এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব হইয়াছে। কথাটী সত্য বটে, কিন্তু ইহাতে দেবেন্দ্রনাথের কত পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া না বলিলে বুঝা যাইবে না।

খৃষ্টীয় মিশনরিগণের মধ্যে রামমোহন রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী যেমন ডাক্তার কেরি ও মার্শমেন, দেবেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী সেইরূপ ডাক্তার ডফ্।

রামমোহন রায় তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে বাইবেল শাস্ত্র একেশ্বর প্রতিপাদন করে। সুতরাং তিনি বাইবেল শাস্ত্রকে এক প্রকার ভালই বাসিতেন, বলিতে হইবে। কিন্তু তা বলিয়া মিশনরিগণ যে অন্যথারূপে হিন্দু ধর্ম্মকে আক্রমণ করিবে, ইহা তাঁহার প্রাণে বড়ই ক্লেশকর বোধ হইত। এজন্য তিনি নানা প্রকারে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তদ্বিপরীতে তিনি বাইবেলের ত্রীশ্বরবাদের বিরুদ্ধে যে সকল তর্ক করিতেন, মিশনরিগণ তাহার খণ্ডন দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

এই প্রকরণের কার্য্য দেবেন্দ্রনাথের সময়েও আবশ্যক হইয়াছিল।

রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড গমনের পূর্ব্বে ১৮৩০ খৃঃঅব্দে পাদরী ডফ্ সাহেব তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এক-ঈশ্বর প্রতিপাদক বাইবেলের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা থাকাতে তিনি উহার অধ্যাপনার্থ ডফ্ সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল, বিদ্বান্ ডফ্ অত্রত্য কলেজের নিরীশ্বর শিক্ষাজনিত বিষময় ফলের প্রতিকার করিতে পারিবেন। ফলেও তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার সুশিক্ষা প্রভাবে ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য অত্রত্য যুবক মণ্ডলীর আস্তিক্য বুদ্ধি প্রবল হইল। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টানী বিষও সঞ্চারিত হইল। ভারতের সুপুত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটী যুবা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-গ্রহণ করিলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি মিসনরীগণের কটূক্তিও পুনরায় শ্রুত হইল।

ডফ্ সাহেব ১৮৩০ হইতে ১৮৬৩ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত ৩৩ বৎসর এদেশের মিশন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহার মধ্যে তিনি দুইবার ইউরোপে ও আমেরিকায় পরিভ্রমণ পূর্ব্বক মিশন কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন।* ঐ সকল দেশে হিন্দুধর্ম্মের বীভৎস ও কলঙ্কময় চিত্র প্রদর্শন করিলে দানশীল ধর্ম্মপরায়ণ লোকেরা সেই কুৎসিত জঘন্য দৃশ্যকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিবার জন্য বিস্তর অর্থদান করেন। অতএব প্রায় সকল মিশনরীরা অর্থাগমের ঐ সুগম উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। সদ্বিদ্যাশালী ডফ্ সাহেবও তাহাই করিয়াছিলেন।

১৮৩৪ অব্দে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া India and India's Missions † প্রসঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ঐরূপ আক্রমণ করাতে তত্ত্ববোধিনী সভা তৎপ্রতিবাদে অগ্রসর হইলেন। ১৭৬৭ শকে এই সভা হইতে Vedantic Doctrines Vindicated এবং Rational Analysis of the Gospel নামক পুস্তক দ্বয় প্রকাশিত হয়। প্রথম পুস্তকের তাৎপর্য্য বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্মের সমর্থন। দ্বিতীয় পুস্তকের তাৎপর্য্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মধ্যে সত্যের বিচার। ডফ্ সাহেবের ন্যায় ভারতের হিতৈষী

* ১৮৩৪ হইতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর এবং ১৮৫০ হইতে ১৮৫৬ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর।

† ১৮৩৯ অব্দে মুদ্রিত হয়।

লোকেরা কার্য্যতঃ আমাদের অপ্রিয় সাধনে প্রবৃত্ত, ইহার প্রমাণ দর্শন করিয়া এদেশের মিশনরী-গুণ-পক্ষপাতী লোকেরাও চটিয়া উঠিয়াছিলেন। শিক্ষিত লোকেরা উপযোক্ত পুস্তকদ্বয়ে খৃষ্টধর্ম্মের অযৌক্তিকতা এবং বেদান্তধর্ম্মের সারবত্তা বিলক্ষণরূপে বুঝিলেন। আলোচনার উপর আলোচনায় মিশনরীদিগের ভ্রান্তি ও দুর্ব্যবহারের প্রতিকূলে সকলেরই মন উত্তেজিত হইল। এইরূপে, নিদ্রিতপ্রায় হিন্দুসমাজ জাগিয়া উঠিলে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারবেগ মন্দীভূত হইল।

রামমোহন রায়ের অনুকরণে খৃষ্টিয় ধর্ম্মকে ছাঁকিয়া যে গ্রন্থ প্রস্তুত হইল, তাহার নাম হইল—The Rational analysis of the Gospel, কিন্তু তাহাতে খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব খণ্ডিত হইয়াছে, দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, ডফ্ সাহেব তাহার নাম দিলেন, the Irrational paralysis of the Gospel. উত্তরোত্তর ব্রাহ্মসমাজের যেমন উন্নতি ও বিস্তার হইতে চলিল, ডফ্ সাহেবের মর্ম্মান্তিক বেদনা তেমনি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮৬৩ অব্দে এদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় ডফ্ সাহেব এ দেশীয় দিগের উদ্দেশে নিরাশ অন্তঃকরণে বলিয়া গেলেন :—

I cannot, I cannot, in bidding you adieu now, bear the thought of bidding you adieu for ever !—in separating from you now in time, bear the thought of separating from you for all eternity !—in rejoicing over your earthly welfare and prosperity, bear the *thought of having to mourn over* your forfeiture of the heavenly inheritance.

হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়।

সদ্বিদ্যাশালী ডাক্তর আলেক্‌জণ্ডর ডফ্ ডি, ডি, এল্ এল্ ডি, এদেশের সর্ব্বার্থে অবগত হইয়া এই আক্ষেপ করিতেন যে এদেশীয় অখৃষ্টান সমস্ত লোকের সহিত তাঁহার অনন্তকালের পার্থক্য সন্নিকট ; অর্থাৎ অনন্তকালের জন্য তিনি স্বর্গে এবং এদেশীয় কোটি কোটি লোক নরকে প্রস্থিত হইবে। যাঁহাদের পাণ্ডিত্যের এইরূপ পরিণাম, তাঁহাদের এদেশের শিক্ষায় সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করিবেন, এবং স্কুল ও কলেজ যেমন শিক্ষা দিবেন, ছাত্রদিগের বুদ্ধি বিদ্যা ও চরিত্র সেইরূপে গঠিত হইবে,—এ আশা যে কেমন বিড়ম্বনা ও ইহার অধিক আমাদের দুর্ভাগ্য লক্ষণ আর আছে কি না, তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

যে দেশে রামমোহন রায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, সে দেশে শিক্ষাসংক্রান্ত এই তত্ব পরিজ্ঞাত হইতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। এতদ্দেশীয় বিদ্যানুরাগী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ধর্ম্মবিচারে রামমোহনের বিরুদ্ধবাদী হইলেও সুশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে তাঁহার সহিত এক মতাবলম্বী ছিলেন। আর ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে আমাদের সন্তানদিগের সুশিক্ষা বিধান আমাদেরই কর্ত্তব্য। অতএব বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহারাই হিন্দুকলেজাদি বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইংরাজদিগের হস্তে সমুদয় ভারতের মৃত্তিকা যদি ইংলণ্ডের

হইল, বিদ্যালয় গুলি আর এদেশীয়-দিগের অধিকারভুক্ত কেন থাকিবে। ক্রমে ক্রমে স্কুল ও কলেজগুলি গবর্ণ-মেণ্টের স্বকীয় সম্পত্তিরূপে পরিগৃহীত হইল। ইংরাজী ভাষার সহিত এতদ্দেশ প্রচলিত ভাষা সকলেরও ঐরূপ প্রতি-দ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। ক্রমে ক্রমে ইংরা-জির পরাক্রমই জয়যুক্ত হইল।

শিক্ষাসংক্রান্ত এই বিড়ম্বনা পরিহার নিমিত্ত এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গ যে সকল চেষ্টা করেন, দেবেন্দ্র নাথের চেষ্টা তন্মধ্যে প্রধান।

দেবেন্দ্র নাথ দেখিলেন, ডফ্ সাহেব প্রভৃতি মিশনরিগণ বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারাই এদেশীয় লোকের চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিতেছেন। অতএব তাঁহার প্রতীতি হইল যে আমাদের পক্ষেও উক্ত মিশনরিদিগের কলেজাদির ন্যায় মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। এজন্য দেবেন্দ্র নাথ অত্রত্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-দিগের গৃহে গৃহে ফিরিলেন। সিমু-লিয়াতে এক সভা হইল; এই সভায় কলিকাতাস্থ ধনী নির্দ্ধন, মধ্যবর্ত্তী প্রায় সহস্র ব্যক্তির সমাগম হইল। সকলে একত্রিত হইয়া "হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়" নামে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন।

হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও কর্ম্মকারিদিগের তালিকায় এই সকল নাম পাওয়া যায়—

শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বাহাদুর সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর, সত্যচরণ বাহাদুর, বাবু আশুতোষ দেব, (ছাতু বাবু নামে প্রসিদ্ধ) প্রমথনাথ দেব, (লাটু বাবু নামে প্রসিদ্ধ) ব্রজনাথ ধর, মতিলাল শীল, রমানাথ ঠাকুর রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলরতন হাল্দার, বীর নৃসিংহ মল্লিক, রমাপ্রসাদ রায়, নন্দলাল সিংহ, দুর্গাচরণ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্র-বর্ত্তী, কাশীনাথ বসু, হরিমোহন সেন, ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রাজকৃষ্ণ মিত্র। অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব ও প্রমথ নাথ দেব —ধনাধ্যক্ষ।

এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

এই বিদ্যালয়ের বিবরণ আমরা সম্যক্ জানিতে পারি নাই। আশা করি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত সমেত এই বিদ্যালয়ের ইতিবৃত্ত সাধারণের সুবিদিত হইবে।

সকল ক্ষেত্রেই এদেশের ভাগ্যলক্ষ্মীর একইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। Joseph Barretto and sons" এই নামধেয় কুঠি দেউলিয়া হইলে যেমন হিন্দু-কলেজের মূলধন নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি আশুতোষ বাবু ও প্রমথনাথ বাবু দেউ-লিয়া হওয়াতে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়েরও মূলধন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

শুনা যায় প্রথমেই হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের ৪০০০০ চল্লিশ হাজার টাকা মূলধন উত্থিত হইয়াছিল এবং সুপ্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় উহার প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

যে সকল ধনী কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নাম ইহার সহিত সংযুক্ত দেখা গেল, তাহাতে প্রত্যয় হয়, এই বিদ্যালয় দীর্ঘজীবী হইলে ইহা

হিন্দুসমাজের একটি বিশিষ্ট শক্তির কেন্দ্রস্থল হইত।

পিতৃবিয়োগ।

যে বৎসর হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান হয়, সেই বৎসর (১৮৪৫) দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৪২ অব্দে তিনি প্রথমবার ইউরোপে গিয়াছিলেন।

সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম যাত্রায় ইউরোপের সকল প্রধান প্রধান দেশে পরিভ্রমণ করেন। রোমের পোপ, প্রুসিয়ার প্রিন্স, ফ্রান্সের ও বেলজীয়মের রাজা, রাণী এবং আমাদের ও ইংলণ্ডের মহারাণী সপরিবারে তাঁহার মহা সমাদর করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় যাত্রায় তাঁহার জীবনকাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দের ১ আগষ্ট দিবসে ৫১ বৎসর বয়সে বিলাতে তিনি কলেবর পরিত্যাগ করেন।

এই দুর্ঘটনার সংবাদ যখন এদেশে উপস্থিত হইল, তখন ভ্রমণপ্রিয় দেবেন্দ্র নাথ চির অভ্যাস অনুসারে নদীতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পিতার অনন্ত কারবার সমন্বিত অনন্ত ধনের ভার হঠাৎ তাহার স্কন্ধে অধ্যারোপিত হইল।

কিরূপে দেবেন্দ্র নাথ সেই দুর্ব্বহ ভার বহন করিলেন,—কিরূপে তিনি একান্ত নির্লোভ অন্তঃকরণে পিতার ঋণ রাশি স্বীকার করিয়া দরিদ্রের বেশ পরিধান পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রথমে সেই ঋণদায় হইতে মুক্ত হইলেন, এবং কিরূপে মিতব্যয়িতা সহকারে যথাসম্ভব ধন সঞ্চয় করিয়া মহা সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীবর্গের সহিত সমপদবীতে কাল হরণ করিতে লাগিলেন,—দেবেন্দ্র নাথের সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে এই বিষয়ের ইতিবৃত্তটুকু মহামূল্য এবং মহোচ্চ শিক্ষাপ্রদ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি।

রামমোহন রায় বিশ্বজনীন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সর্ব্ববস্তুগত অগ্নির ন্যায় একপ্রকার অব্যবহার্য্য হইয়া রহিয়াছিল। সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার কিরূপে ধ্যান ধারণা করিতে হয়, রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী দ্বারা তাহাই জানা যায়। কিন্তু কি প্রকারে এই মতে সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্ম সাধন করা যায়, অথবা কিরূপে ইহাকে সর্ব্বার্থসাধক ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, রামমোহন রায় তাহার কোন পদ্ধতি নিরূপণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই কর্ম্মের ভার দেবেন্দ্র নাথের উপর ন্যস্ত ছিল।

এতৎ বিষয়ে দেবেন্দ্র নাথের কর্ম্মগুলি নিম্নোক্ত রূপে গণনা করা যায়:—

১। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ প্রণালী।
২। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বীজ নিরূপণ।
৩। ব্রাহ্মধর্ম্ম সঙ্গত উপাসনা পদ্ধতি।
৪। ব্রহ্মসঙ্গীতের বিস্তার।
৫। নানাস্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন।
৬। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ।
৭। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা।
৮। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মতও বিশ্বাস নির্ণয়।
৯। ব্রহ্মোপাসনা সহযোগী ধর্ম্মের ব্যাখ্যান।
১০। অনুষ্ঠান পদ্ধতি।

এতদ্ভিন্ন মাসিক পত্র, সংবাদ পত্র, ও বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের তত্ত্ব সহ মানব হৃদয়ের নানাধর্ম্ম লোক মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা দেবেন্দ্র নাথের জীবনের অনন্যসাধারণ কর্ম্ম।

এই সকল অনুষ্ঠান ভিন্ন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রকৃতি পরিস্ফুট হইত না। কি প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম লোকের গ্রহণীয় হয়, এই চিন্তা প্রথমাবধি দেবেন্দ্র নাথের হৃদয়ে জাগরূক ছিল। ক্রমশঃ তাঁহার উপযোগী উপরোক্ত গ্রন্থাবলী ও পদ্ধতি কালে কালে রচিত ও পুষ্টি প্রাপ্ত হইল। ব্রাহ্ম সমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার সংযোগ সাধন হইলে পর ব্রাহ্ম সমাজ লোকে পরিপূর্ণ হইল। দেবেন্দ্র নাথ দেখিলেন, নানা প্রকার লোকের সমাগম হয়, কিন্তু কে কি জন্য আসেন, তাহার কোনই পরিচয় নাই; ব্রাহ্ম সমাজে কি ভাবে আসিতে হয়, তাহার কোন পদ্ধতি নাই। এ অবস্থা দেবেন্দ্র নাথের মনঃপূত হইল না। তিনি চাহেন যে ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারিত এই ব্রহ্মজ্ঞানাত্মক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরস্পর একমত এবং এক ভাব প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়টা তত্ত্ববোধিনী সভায় আলোচিত হইয়া স্থির হইল, যাহারা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকেই ব্রাহ্মসমাজ-সন্নিবিষ্ট বিবেচনা করা যাইবে।

এই প্রকারে কতকগুলি লোক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্ম নামে পরিচিত হইলেন। কিন্তু যে ধর্ম্ম তাঁহারা গ্রহণ করিতেছেন, তাহার কোন বিশেষ লক্ষণ প্রখ্যাত নাই। এই অভাব অনুভূত হইলে তাহার পূরণ হইতে বিলম্ব হইল না। পরিমিত কথায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের লক্ষণ নির্ণীত হইল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সকল তত্ত্ব সেই লক্ষণাবলী মধ্যে বীজ রূপে নিহিত। তাহা হইতে শাখাপল্লব স্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ, তাহার তাৎপর্য্য এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যান উত্তরোত্তর প্রকাশিত হইল।

অতঃপর অনুষ্ঠানের কাল। ব্রাহ্মেরা পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া এই অঙ্গীকারে বদ্ধ থাকিতেন যে তাঁহারা দেবদেবীর পূজা বা হোমাদি ক্রিয়া করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা প্রথমতঃ সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালিত হয় নাই। পরে এমন এক সময় উপস্থিত হইল যখন উক্ত প্রকার পৌত্তলিক পূজা ত্যাগ করা ব্রাহ্মদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞান হইল। নবোৎসাহসম্পন্ন যুবকেরা তাহাদের উক্ত প্রতিজ্ঞানুরূপ কর্ম্ম করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। তদুপযোগী অনুষ্ঠান পদ্ধতি রচিত হইল। দেবেন্দ্র নাথ নিজেই তাঁহার অনুষ্ঠান পদ্ধতির প্রথম অনুষ্ঠাতা হইয়া নিজ পরিবারে নিত্যযুক্ত জ্ঞানকর্ম্ম সমন্বিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পরি-বারেও উক্ত পদ্ধতি মতে ক্রিয়ানুষ্ঠান হইল। ব্রাহ্ম পরিবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

ব্রাহ্ম দল বৃদ্ধি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে আছে, কিন্তু মুখে নাই; অথবা মুখে আছে কিন্তু কার্য্যে নাই—ইহা বড়ই কুলক্ষণ। যিনি ব্রাহ্ম হইবেন, তাঁহারসর্ব্বাংশেই ব্রাহ্ম লক্ষণ প্রকাশ পাইবে— নতুবা এই ধর্ম্ম গ্রহণ কেবলই বিড়ম্বনা। দেবেন্দ্রনাথ যখন

দেখিলেন যে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণপদ্ধতি রচনার ফল ফলিয়াছে, ব্রাহ্মেরা পরিমিত দেবতার স্থানে অনন্ত ঈশ্বরের পূজা করিয়া সকল গার্হস্থ্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে, তখন পরমানন্দ অনুভূত হইল।

কিন্তু এখনো তাঁহার আর একটী কর্ম্মের আবশ্যকতা দেখা গেল।

যাঁহারা ব্রাহ্ম পদ্ধতি মতে গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া "অনুষ্ঠানকারী" নাম প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা এমন ইচ্ছা করিলেন যে "ব্রাহ্ম" শব্দে কেবল তাঁহাদিগকেই বুঝাইবে, অপর লোকেরা ব্রাহ্মসমাজ বহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

দেবেন্দ্রনাথ উপরোক্ত মতে কোন প্রকারে মত দিলেন না। তাহাতে বিস্তর বাদানুবাদ হইল। কতকগুলি লোক ভিন্ন প্রণালীতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের জন্য তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, মনুষ্য মাত্রেই ভিন্নরুচি। কালক্রমে সমাজ পদ্ধতির নানা পরিবর্ত্তন সম্ভব। পূর্ব্ব ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তনও হয়। অতএব তিনি রামমোহন রায়ের বাক্য অবলম্বন করিয়া এই উপদেশ দিলেন যে সুবুদ্ধির প্ররোচনায় যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে ব্রাহ্মেরা কার্য্য করিতে চাহেন, তাহা করিতে পারেন, কেবল এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে যে ধর্ম্মমতের প্রভেদ জন্য যেন বিবাদ কলহ না হয়; যেহেতু বস্তুতঃ সকলেই এক ঈশ্বরের উপাসক।

এই উপদেশ অনুসারে ব্রাহ্মেরা ভিন্ন ভিন্নদলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন; অথচ ধর্ম্মভেদবুদ্ধি না থাকাতে তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ বৃদ্ধি হয় না।

ব্রত প্রতিষ্ঠা।

ব্রহ্মজ্ঞানে স্ত্রী শূদ্রাদি সকল লোকের অধিকার দেওয়া দেবেন্দ্রনাথের জীবনের একমাত্র ব্রত। তাঁহার জীবনের ছায়া স্বরূপিনী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাবধি এই ব্রতের সঙ্কল্প ও স্বস্তিবাচন দেখা যায়। তদবধি এ কাল পর্য্যন্ত তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করিয়া এই ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিযাছেন। ইহার জন্য তিনি শরীর মন ধন সকলি দিয়াছেন। নানাপ্রকার লোকের নিকট নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। ধর্ম্ম সংস্কারকের পক্ষে সচরাচর যে সকল দুর্গতি ঘটে, তাঁহার সে সমস্তই ভোগ হইয়াছে।

শ্রীমৎ চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার পক্ষে যেমন—

> পাত্রাপাত্র বিচারণাং নকুরুতে
> ন স্বং পরং বীক্ষতে।

পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সকলকেই হরিনামরূপ মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথও সেইরূপ স্ত্রী শূদ্র, পণ্ডিত অপণ্ডিত, সকলকেই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের সময় যেমন বঙ্গদেশে হরিনাম ধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথের সময়ে সমগ্র ভারতভূমিতে সেইরূপ ব্রহ্ম নাম প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। হরিনাম গ্রহণের ন্যায় এই ব্রহ্ম মন্ত্র সাধন করিতে পারুক বা না পারুক, ইহা কি প্রকারে অবলম্বন করিতে হয়,—কি

প্রকারে সমস্ত পরিবারে মিলিয়া ব্রহ্ম পূজা করা যায়, দেবেন্দ্রনাথ তাহার পদ্ধতি প্রদর্শন করিলেন এবং আপনি তাহার উদাহরণ স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিলেন।

এবিষয়ে অনেকেই তাঁহার প্রতিকূলতাচরণ করিলেন; যাঁহারা তাঁহার সহযোগী, তাঁহারাও কোন কোন অংশে তাঁহার ব্রতভঙ্গের উপক্রম করিলেন, কিন্তু সুবুদ্ধি একনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ কেবল ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করিয়া সহস্র বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিলেন। জ্ঞানকর্ম্মসমন্বিত পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণ লোকের আশ্রয় স্থান ও সেবনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিয়তই "যোগযুক্তাত্মা।" "মহর্ষি" শব্দে যেমন তাঁহার প্রকৃতির পরিচয় হয়, এমন আর কোন শব্দে হয় না। পূর্ব্বতন মহর্ষিগণকে কিরূপে চিনিতে হয়; কি প্রকারে তাঁহাদের ধর্ম্ম বুঝা যায় তাহারই বর্ণনা ও বিচারে তাঁহার পঞ্চাশোর্দ্ধ বৎসরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিপূর্ণ। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান অধ্যয়ন করিলে প্রকৃত ঋষিতর্পণ হয়।

ব্রাহ্মসমাজ আদ্যোপান্ত যে বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্মের ঘোষণা করিতেছেন, তাহা হিন্দুদিগের চিরন্তন সার সম্পত্তি। সম্প্রতি তাঁহাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল যে গৃহস্থ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান সাধন হয় না। ব্রাহ্মসমাজ এই সংস্কারের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিলেন।

রামমোহন রায় শাস্ত্র প্রমাণে বুঝাইয়াছিলেন, যে পূর্ব্বে গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী হইতেন। এই শব্দপ্রমাণ দ্বারা সকল লোকের সংশয়চ্ছেদ হয় নাই। তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতি হিন্দুদিগের যথোচিত শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে নাই। তাঁহাদের শাস্ত্রোক্ত গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞানী কলিকালে প্রাদুর্ভূত হইবেন না, ইহাই তাঁহাদের ধারণা ছিল। এই ধারণার বৈয়র্থ্য সাধন জন্য শ্রীমৎ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব বলিতে হইবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বদা যোগাসনে সমাসীন। বেদবিদ্যা তাঁহার সুসাধিত। স্মরণ মাত্রেই সমস্ত উপনিষদ্ ও শাস্ত্রীয় বচনাবলী তাঁহার জিহ্বাগ্রে বর্ত্তমান হয়। অথচ কোন লৌকিকীবিদ্যা তাঁহার অগোচর নহে। যিনি তাঁহার নিকট যে কামনায় উপস্থিত হয়েন, সেই কামনার ফললাভ হইতে পারে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সকল যোগ সিদ্ধ।

তীর্থ বাস।

ব্রহ্মপরায়ণ এই গৃহস্থ ঋষির গৃহবাসের কাল অপেক্ষা তীর্থবাসের কালই অধিক। সে তীর্থ যেমন সাধারণ, তেমনি অসাধারণ।

"প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা।" অর্থাৎ ভূমির অদ্ভুত প্রভাবে এবং জলের প্রখর স্রোতে যে তীর্থ মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়, এই ঋষি তাহারই অনুরাগী। তাঁহার তীর্থ হিমাচল শিখর, সাগরবক্ষ, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ এবং রাঢ়ভূমির অন্তর্গত বৃক্ষপল্লব শূন্য

মাত্রও সম্পর্ক বর্জ্জিত যোজন বিস্তৃত এবং মহা প্রান্তর।

জীবনের অধিকাংশকাল তিনি এই সকল শান্তি রসাস্পদ স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণা অভ্যাস করিয়াছেন। অথচ তাঁহার লক্ষ লক্ষ প্রজা, সহস্র সহস্র প্রতিপাল্য ব্যক্তি, শতাধিক পরিজন এবং এই দুঃখ দারিদ্র্য পূর্ণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভারতভূমি,—কেহই তাঁহার নিকট তাহার প্রাপ্য বস্তু লাভে বঞ্চিত হয় নাই।

"পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থনাং পুণ্যতা স্মৃতা।"

অতএব তাঁহার প্রধান সাধনক্ষেত্র "বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতন" তীর্থতুল্য পরিগণিত হইতেছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবন সফল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের যে গতি ও কর্ম্ম দেখা গেল, এই দীর্ঘ জীবন না হইলে তাঁহার সেই কর্ম্ম সুসম্পাদিত হইত না। দীর্ঘ জীবন মুনিব্রতের অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ।

বিশেষতঃ এই যুগে—এই ইউরোপ ও আমেরিকারূপ মহা কুরুক্ষেত্রের জীবন সংগ্রাম কালে—শত শত সমুদ্রপোতসমাকুল গঙ্গাতীরে—অনন্ত বিষয় ব্যাপারের মধ্যে, শত পুত্র পৌত্র বান্ধব সুহৃৎ সমাবৃত মহোচ্চকুলের কুলপতি কিরূপে ঋষিসেবিত আরণ্যক ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা করিতে পারেন, দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার অনুধাবন না করিলে তাহার উপযুক্ত পরীক্ষা হইবে কেন?

মহর্ষি এই মহাপরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ, ইহা এ দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের প্রতীতি হইয়াছে। যখন এ দেশে ব্রহ্মজ্ঞান লুপ্তপ্রায় ছিল, তখন "ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ" এখানকার গৃহস্থের পক্ষে মহোচ্চ আশীর্ব্বাদ বলিয়া পরিগণিত হইত। বর্ত্তমান যুগের এই মহর্ষি যদি গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের উপায় ব্যবস্থাপিত করিলেন, তবে ধন পুত্র লক্ষ্মীর সহিত পবিত্রতা স্বর্গ ও মুক্তি ইত্যাদি বাক্যের যোজনা করিতে হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে যদি ঐ সকল আশীর্ব্বাদ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে তাঁহার অবলম্বিত মহাব্রতের সিদ্ধি এবং তাঁহার দীর্ঘ জীবনের সাফল্য বিষয়ে কাহার সংশয় থাকিতে পারে?

শ্রী—

সংস্কার।

সমাবর্ত্তনের পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মধ্যে যে সকল সংস্কার কার্য্য সংসাধিত হইয়া থাকে তাহা সমস্তই পুত্রের সংস্কার কার্য্য। বিবাহও পুত্রের সংস্কার জন্য নির্ব্বাহিত হয়। অসংস্কৃতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পুত্র মধ্যে গণ্য নহে। স্ববীজজাত পুত্রের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট এবং জঘন্য পৌনর্ভব পুত্রের মাতাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে পুনঃসংস্কৃতা করিয়া লইতে হইত, নতুবা অসংস্কৃতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান এরূপ নিকৃষ্ট শ্রেণীর সন্তান বলিয়াও গ্রাহ্য হইত না। ইহযুগে ঔরস ও দত্তক এই দুই প্রকার পুত্রই শাস্ত্রবিহিত। ইহার কোনটিই অসংস্কৃতা কন্যা হইতে উৎপন্ন নহে। স্বজাতীয়া, স্বসংস্কৃতা ভার্য্যার স্বয়মোদ্‌পাদিত পুত্রই ঔরস পুত্র, এই ত্রিকক্ষের একটীর ব্যতিক্রম ঘটিলে আর সে সন্তান পুত্র স্থানীয় হইবার যোগ্য হইতে পারিবে না। দত্তক পুত্রও ঐরূপ অন্যের ঔরস পুত্র হওয়া চাই নতুবা দত্তক হইতে পারে না। কেহ সমাবর্ত্তন অন্তে নৈষ্টিকী ব্রহ্মচর্য্য করিয়া জীবন যাপন করিতে পারেন কিন্তু তাঁহাকে সংস্কার বিহীন বলিয়া প্রত্যবায়ভাগী অথবা প্রায়শ্চিত্তাই হইতে হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পুত্রার্থেই বিবাহ বিহিত এবং পুত্রেরই সংস্কার জন্য ইহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির মধ্যে বিবাহই সংস্কার। ব্রাহ্মণের উপনয়ন যে রূপ আত্মার পবিত্রতাসম্পাদক সংস্কার, স্ত্রী জাতীর বিবাহও সেইরূপ। বিবাহ হইলে কন্যার দেবকার্য্যে অধিকার জন্মে এবং বিবাহান্তে মৃত্যু হইলে সপীণ্ডদিগের পূর্ণাশৌচ হইয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে বিশদ করিয়া দেখাইয়াছি যে স্ত্রী ও পুরুষে বীজ নিহিত আছে ইহাদের সংযোগে সন্তানরূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। বীজে যে দোষ অস্পষ্টভাবে নিহিত থাকে ফলে তাহা সুস্পষ্টরূপে বিকাশিত হয়। পিতামাতার কুপ্রবৃত্তি কার্য্যে পরিণত না হইলেও পুত্র যে সেইসকল কুপ্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া ভূরি ভূরি অন্যায় কার্য্য সম্পাদন করিবে তাহার আর বিচিত্রতা কি? এই জন্যই লোকে সচরাচর বলিয়া থাকে যে "বিশকর্ম্মার বেটা বিয়াল্লিশ কর্ম্মা" এই প্রবাদ বাক্যটীর মূল বৈজ্ঞানিকদর্শন। পুত্র পিতার বীজমাত্র গ্রহণ করে কিন্তু মাতৃগর্ভে দশমাস অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার রস রক্তে পুষ্ট হইয়া থাকে সুতরাং মাতার দোষগুণ অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া থাকে সুতরাং বীজ প্রাধান্য অতি অল্পই লক্ষিত হয়। এই জন্য বহুদর্শী সত্যবাদী ঋষিগণ বলিয়াছেন "মাতৃবৎবর্ণশঙ্কর" "নরাণাং মাতুলক্রম" ইত্যাদি ইহাতে ক্ষেত্র প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছে। প্রকৃতকল্পে ক্ষেত্র প্রাধান্যই সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট বীজ ইহার উপযোগী উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে পতিত হইলে বহুল পরিমাণে সুপুষ্ট উৎকৃষ্ট জাতীয় ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহাই শ্রেয়ঃজনক। উৎকৃষ্ট জাতীয় বিষম ক্ষেত্রে বীজ পতিত হইলে ফলের হীনতা ও দোষাশ্রিত বীজের বৃদ্ধি জন্মিয়া

থাকে. সুতরাং পৌনপুণিকক্রমে কালে নিকৃষ্ট বীজে পরিণত হইয়া পড়ে সুতরাং ইহা কোন মতেই শ্রেয়স্কর নহে বরং পরিণামে ইহাতে বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। অপকৃষ্ট বীজ উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে পতিত হইলে ঘোরতর অনিষ্ট জনক সুপুষ্ট বীর্য্যবান দুষ্টফলের আধিক্য হইয়া অতি বিলম্বে দেশ ছাইয়া ফেলে। সুতরাং অপকৃষ্ট হীন জাতীয় বীজ উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে যাহাতে এককালে পতিত না হইতে পায় ইহা স্বতঃ পরতঃ বিশেষ যত্নের সহিত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে স্বজাতীয় বিবাহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অনুলোমক্রমে অসবর্ণা বিবাহ মধ্যম এবং প্রতিলোম-ক্রমে স্ত্রীপুরুষ সংযোগ অতিশয় ঘৃণ্য ও অতি নিকৃষ্ট।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে স্বজাতির মধ্যে যে স্বভাবতঃ বীজ ও ক্ষেত্র উৎকৃষ্টই হইবে এমত নহে। ইহার মধ্যে গুণ দোষানুসারে বিস্তর তারতম্য আছে। সুতরাং সকল স্থলেই উৎকর্ষ অপকর্ষ সম্বন্ধে বীজ ও ক্ষেত্রের নির্ব্বাচন করা অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিন্তু অধুনা বিবাহ সম্বন্ধ নিরূপণকালে বিধি অনুযায়ীক কার্য্য প্রায়শই উপেক্ষিত হয় সুতরাং উদ্ধত, অন্যায়াচারী, আত্মাভিমানী, পিতৃ মাতৃদ্বেষী নানা প্রকার রূপধারী পুত্র জন্মিয়া থাকে। পাত্র নির্ব্বাচন যেরূপ যত্ন সহকারে করিতে হয় ক্ষেত্র নির্ব্বাচন-কালে যে তাহার কিছুমাত্র ত্রুটী করিতে নাই তাহা কেহই মনে করেন না। কাহার কিছু অর্থ অধিক পরিমাণে পাই-লেই সর্ব্বদোষ প্রশমিত হয়, যাঁহারা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন তাহাদের পক্ষে কিছু অর্থের অল্পতা হইলেই সকল দোষ ঢাকিয়া যায়, কিন্তু দেখিলেন না যে এরূপ বিবাহ করা অপেক্ষা বংশ লোপ শতগুণে শ্রেয় কল্প ছিল। দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল নয় কি? এক্ষণে দেখুন ক্ষেত্র পরীক্ষা দ্বারা নির্ব্বাচন না করিয়া বিবাহ করা অপেক্ষা জগতের অনিষ্টকারক কার্য্য অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে দেখিতে হইবে কিরূপ কন্যা বিবাহের যোগ্যা।

মহাত্মা মনু বলিয়াছেন যে গুরুগৃহে বিদ্যা উপার্জ্জন করা সাঙ্গ হইলে স্ববর্ণা লক্ষণান্বিতা কন্যা পরিগ্রহ করিবে। এই লক্ষণান্বিতা কি? তিনি বলিয়া-ছেন স্বগোত্রা ও সমান প্রবরা কন্যা বিবাহ বর্জ্জন করিবে। পাত্রকে ছাড়িয়া পাত্রের পিতাকে প্রথম ধরিয়া ঊর্দ্ধে ৭ পুরুষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক হইতে উৎপন্ন অিম্নস্থ ৭ পুরুষ পর্য্যন্ত বর্জ্জনীয় ঐরূপ পাত্রের মাতৃপক্ষে মাতামহকে প্রথম ধরিয়া ঊর্দ্ধে পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক হইতে উৎপন্ন অধস্থ পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত বর্জ্জনীয়। আবার পিতৃবন্ধু অর্থাৎ পিতার পিশতুতা, মাসতুতা এবং মামাত ভাইদিগের প্রত্যেকের ঊর্দ্ধে সাতপুরুষ এবং পূর্ব্বরূপ প্রত্যেকের হইতে উৎপন্ন অধস্থ সাত পুরুষ পর্যন্ত বর্জ্জনীয়। মাতৃপক্ষে আবার মাতৃবন্ধু অর্থাৎ মাতার মামাত মাসতুতা ও পিসতুতা ভ্রাতৃবর্গের ঊর্দ্ধে পাঁচ পুরুষ তাহাদের প্রত্যেকের অধস্থ পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত বর্জ্জনীয়। বিমাতার ভাই মাতুল পদবাচ্য সুতরাং তাঁহার সন্ততি অবিবাহ্য। যে কুলে জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয় না;

বেদাধ্যয়ন হয় না, দীর্ঘ রোমশ সন্ততি যে বংশে জন্মে, অর্শ, ক্ষয়, মন্দাগ্নি, অপস্মার, শ্বেতকুষ্ঠ, গলিত কুষ্ঠাদি সংক্রামক রোগ সমূহ যে বংশে আছে এমত সকল বংশোৎপন্না কন্যা দারকর্ম্মে বর্জ্জনীয়া। যে কন্যার মাতা কেবলমাত্র স্ত্রী জননী অথবা মৃতবৎসা রোগগ্রস্থা এমত কন্যাকেও ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবে না। পিঙ্গলবর্ণা কেশযুক্তা অধিকাঙ্গী অথবা হীনাঙ্গী, মিতব্যয়িতা, রোমহীনা অথবা অতিলোমা, কর্কশভাষিণী এবং পিঙ্গলাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ করিবে না। ভ্রাতৃহীনা এবং অজ্ঞাত কুলশীলা কন্যাকে কখনইবিবাহ করিবে না।

অসবর্ণা বিবাহকে মনু মহাত্মা প্রশস্ত বিবাহ বলেন নাই বরং এরূপ বিবাহের নিন্দাবাদ করিয়াছেন। ইহাকে ধর্ম্ম বিবাহ না বলিয়া মোহোৎপন্ন কাম্য বিবাহ বলিয়াছেন। অনেকের এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে যে, যাহা কিছু কলি ভিন্ন যুগান্তরে আচরিত হইয়াছে, যাহাকে অধুনা অনভিজ্ঞ লোকে বৈদিককাল অথবা বৈদিক যুগ বলেন, তা সমস্তই ধর্ম্ম্য ও বিহিতা। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারেন যে শাস্ত্র নিষিদ্ধ, সাধু নিন্দিত আচরণ যে যুগেই আচরিত হউক না কেন, তাহা কখন বিহিত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। অতঃএব বিহিত অবিহিত নির্ব্বাচন স্থলে কোন যুগ বিশেষের আচরণ কি না তাহা দেখিতে হইবে না, এমতস্থলে ধার্ম্মশাস্ত্রের বিধি নিষেধ পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিতে হইবে।

আর্য্যবংশের দুর্দ্দিন বশতঃ ঐ যে এক সম্প্রদায় হেতুবাদী ভারত ক্ষেত্রে জলবুদবুদের ন্যায় উত্থিত হইয়াছেন তাঁহারা কি এসকল প্রামাণ্য বলিয়া মানিবেন? তাঁহারা অসবর্ণা বিবাহ, প্রতিলোমক্রমে স্ত্রীপুরুষ সংযোগ মধ্যে কোন দোষ দেখিতে পান না। হিন্দুশাস্ত্রের মর্য্যাদা বিধ্বস্ত করাই যেন একটা মহান্ প্রসংশনীয় কার্য্য বলিয়া বুঝেন। একটা ব্রাহ্মণের কন্যাকে একটা তাঁতির ছেলের হাতে দিতে পারিলেই যেন মনে করেন তিনি জগতের একটা বিশেষ উপকার করিলেন, তাঁহার মনুষ্য দেহ ধারণের সার্থকতা হইল। ইহাঁরা আত্মমদে বিভোর, কেহ বলেন ঋষিরা কি নাইন্‌টীনথ সেনচুরিতে কি হইবে জানিতেন যে তাহার উপযোগী শাস্ত্র লিখিবেন তাঁহাদের শাস্ত্র যুগান্তরের জন্য হইতে পারে এখন সমস্তই নূতন হওয়া চাই। সকলই ক্রমোন্নতির পথে ধাবিত সুতরাং বহুকালের পচা হিন্দুশাস্ত্রের সংস্কার হওয়া চাই। এই সকল মোহাচ্ছন্ন বাক্যবীরদিগের এমনি কুহকিনী শক্তি যে অনেকে উহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে নরকাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। ইহাদিগের বিশ্বাস যে বিনা সাধনে বিনা গুরূপদেশে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ঈশ্বরের স্বাক্ষাৎকার লাভ করা মানবের ইচ্ছামাত্র হইতে পারে। এমন সহজ উপায় আর আবিষ্কৃত হয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র সকল বর্ত্তমান যুগ ভিন্ন যুগত্রয়ের অনুপযোগী বলিতে কাহাকে শুনা যায় না। সুতরাং অনুমান করিতে পারা যায় ঐ শাস্ত্র বিগত যুগত্রয়ের শাস্ত্র হইতে পারে কিন্তু কলিযুগের জন্য নহে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ঋষিগণ সত্য ত্রেতা দ্বাপরের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন

কেবল বর্ত্তমান যুগবিষয়ই তাঁহাদিগের দুর্ব্বোধ্য হইয়াছিল। একথা কি হাস্যজনক নহে। যাঁহারা ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমানজ্ঞ, জীবন্মুক্ত তাঁহারা যদি সত্য ত্রেতা দ্বাপরের স্বভাব দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন তবে কলি বিষয় অবগত হইতে পারিবেন না কেন। মহাভারতের আরণ্যকপর্ব্বে কলিবিষয় বর্ণন যাহা মহামতি বেদব্যাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা যে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইতেছে দেখিয়াও কি কেহ উক্তরূপ প্রলাপবাক্য বলিতে পারে? যাহারা শাস্ত্রীয় চাক্ষুষ প্রমাণিত বচন গুলিকে খণ্ডন করিতে অক্ষম হইয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়েন তাঁহারা বলেন যে ঐ সকল বচন প্রক্ষিপ্ত। ইহার উপর আর কথা কি? যেমন মঞ্চ হইতে প্রক্ষিপ্ত শব্দ উচ্চারিত হইল অমনি ঐ সম্প্রদায়ের যে যেখানে আছেন সকলেরই মুখে প্রক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত এই শব্দ ঘোষিত হইতে লাগিল। পাঠক এরূপ নির্লজ্জ অবিবেচক আর কখন দেখিয়াছ কি? যে বেদবাক্য মনুপ্রভৃতি মহাত্মাগণ উপনিষদে, স্মৃতি, পুরানাদি গ্রন্থ সমূহে তৎপরে বহুপ্রাচীন কাল হইতে ভাষ্যকার টীকাকার প্রভৃতি ঐ সকল বাক্য পুনঃ পুনঃ বিবিধ গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়া সত্যযুগ হইতে ইহ যুগ পর্য্যন্ত ঘোষণা করিতেছেন ঐ সকল বাক্যও ইঁহারা প্রক্ষিপ্ত বলিতে শঙ্কুচিত হন না ধন্য সাহস। যত বিদ্যাবুদ্ধি কি আর্য্যঋষির নাম কর্ণে প্রবেশ করিলেই বিলুপ্ত হইয়া আত্মগরীমা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। অধুনা সকলেরই বাহ্যদৃষ্টিই প্রবল, কিসে পুষ্ট হইবে কিসে সাহসী হইবে ইহাই সকলের ধ্যান। কাজেই জীমন্যাষ্টিকআদি দৈহিক বলবিক্রম বৃদ্ধির উপায় সকল অত্যন্ত আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখে না যে কার্য্য কে করিবে? দেহের বল প্রয়োগ করিবে কে? যদি ঐ বল অন্যায় কার্য্যে প্রযুক্ত হয়, যদি সাহসিকতা ঔদ্ধত্যে পরিণত হয় তাহা হইলে কি বিষময় ফল হইবে বলুন দেখি। যাহারা দস্যুবৃত্তিপরায়ণ তাহারা বলবান না হইয়া দুর্ব্বল হইলে মঙ্গল কি অমঙ্গল। যদি মঙ্গল হয় তবে তাহারা যত নির্ম্মূল হইয়া যায় তত ভাল নয় কি? দেহের উন্নতি কল্পে কত চেষ্টা ও যত্ন, কৈ মনকে পবিত্র করিবার ত তাহার কিছুই দেখা যায় না। এই মন যদি কুপথগামি হয় তাহা হইলে দেহের পুষ্টতাই বল আর সাহসিকতাই বল সকল ঘোরতর অনিষ্টেরহেতু হইয়া উঠে। শিক্ষাদ্বারা মনের পবিত্রতা জন্মে না। বীজজাত প্রকৃতিই সর্ব্ব প্রধান। যতই শিক্ষা দেও না কেন তাহাতে সেই প্রকৃতিরই সম্যক বিকাশ হয। যেমন ধাতু পাত্রকে যতই সংস্কার করিবে ততই তাহার মূল প্রকৃতির জ্যোতি বাহির হইবে। যাহা কলঙ্কদ্বারা আবৃত ছিল তাহাই সমুজ্জল হইয়া বাহির হইবে, ইহাই শিক্ষার ফল। নতুবা কখনই রৌপ্য নির্ম্মিত ধাতু পাত্রকে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া মার্জনা করিলে স্বর্ণ করিতে পারিবে না, সেই রৌপ্যই থাকিবে। সুতরাং শিক্ষাদ্বারা মূল প্রকৃতির কিছুই মৌলিক পরিবর্ত্তন হয় না। কাজেই দেশের মঙ্গল করিবার বাঞ্ছা যদি প্রকৃতই হয় তাহা হইলে যাহাতে সৎবৃত্তি সম্পন্ন পুত্র জন্মে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। বিজাতীয় কন্যার গর্ভে স্বধর্ম্মদ্বেষী পিতার

ঔরষে কি কখন উৎকৃষ্ট পুত্র পাইবার আশা হইতে পারে। ইহা দুরাশা মাত্র। জড় ও প্রকৃতির তত্ত্ব যিনি সবিশেষ অবগত তিনিই ইহার সদ্‌গুরু নতুবা এখনকার "সবজান্তা" বাক্যবীরদিগের নিকট ইহার বিন্দু বিসর্গও নাই। সেই বিশুদ্ধাত্ম আত্মজ্ঞ ঋষি প্রবর ভিন্ন ইহার পন্থা বলিয়া দিতে আর কাহার শক্তি নাই। ফলকথা আর্য্যবংশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র গুলির উপর অকপট আস্থা রাখিয়া তাঁহাদিগের উপদেশ মতে পুত্রোৎপাদনে যত্নশীল হইলে পরিণামে অবশ্যই সৎপুত্র লাভ করিতে পারিবে নতুবা দেশে ক্রমশঃ পিতৃ মাতৃহন্তা পুত্রের বৃদ্ধি হইয়া অসভ্য অনার্য্য জাতিতেই পরিণত হইতে হইবে ইহার আর কোন সংশয় নাই।

শম্ভু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মানুষে কতকগুলা কাজ করিতে চায়, কতকগুলা করিতে যায়, কতকগুলা কাজ করিতে পারিবার আশা ধরে আবার কতকগুলা করিতে পারা তাহার শক্তির অতীত বোধে, কল্পনায় নিষ্পন্ন করিয়া, মনে মনেই তাহার ফল ভোগ করিয়া লয়।

দিন কএক সাদার উপর কালী চড়াইয়াই দুদিন দশ দিন হিজিবিজি লিখিয়া শম্ভু কবিতা লিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অবশেষে সেই কবিতা সিংহাসনে নায়ক নায়িকাকে বসাইয়া এক খানি মহাকাব্য রচনা করিবার জন্য দুদশদিন কত কি লিখিলেন, কত কি মুছিলেন—আবার লিখিলেন আবার মুছিলেন—আবার লিখিলেন আবার মুছিলেন। এইরূপ লিখিতে মুছিতে কত কালই না কাটিয়া গেল!

তা যাক্। সময় চলিয়া যাক্। শম্ভু যদিও এ যাবৎ কেবল কতকগুলা হা হুতাশের ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিলেন, যদিও "যত্নে কৃতে ন সিদ্ধতি" হওয়ায় শম্ভু কাব্য লিখিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াও কযে আকাবটী পর্য্যন্ত দিতে পারিলেন না—তথাপি তাহার আশা, খর্ব্বোপম তাহাকে শৈল শিখরে তুলিবার জন্য তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। শম্ভু যদিও এতকাল কেবল কাগজ কলম কালী অপব্যয় করিয়া, শ্বশুরের বাজার খরচাটা বাড়াইয়া দিয়াছিল, তথাপি বঙ্গরাজ্যে একটা নামজাদা লেখক হইবার বলবতী ইচ্ছা তাহার মুখ হইতে আগ্নেয় গিরির উত্তাপ প্রোজ্জ্বল ধাতু স্রাবের মত, কতকগুলা উত্তপ্ত কবিতা দমে দমে বাহির করিয়াছিল। কিন্তু হায়! অদৃষ্টবশে সময়ও অসময় হইয়া যায়। ক্ষণপূর্ব্বেই যাহা মুদারার পর উদারা উদারার পর তারা উচ্চ হইতে উচ্চতর উঠিয়া তারকা প্রস্রবনের মত তরলোজ্জ্বল শোভায় সহস্র মানবের হৃদয়াকৃষ্ট করিবার দাবী করিতেছিল, ক্ষণ পরেই তাহা তুষার শীতল, দুর্ভেদ্য শ্রীহীন প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। শম্ভুর হৃদয়োচ্ছাস কাহারও বড় ভাল লাগিল না। শম্ভু যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই সেই

কবিতা শুনাইতেন। শুনিতে শুনিতে কেহ গাত্র কণ্ডূয়ণ করিত, কেহ বা কানকোটারীর অছিলা করিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া করকম্পন করিত, কেহ বা শম্ভুর কবিতাবাণ সহিতে না পারিয়া ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাবলী হইতে চোখা চোখা বাণ তুলিয়া শম্ভুর প্রতি প্রতিনিক্ষেপ করিত। এরা সকলেই প্রায় সেকালের লোক। সেকালের লোকের বিশ্বাস ঈশ্বরগুপ্তের পর হইতে বঙ্গরাজ্য হইতে কবিতা ছাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই শম্ভু এ সকল লোকের কাছে কবিতা পাঠ করিতে যাইয়া বড় সুখী হইলেন না পরন্ত তাহাদের উচ্চারিত কবিরগাণ, ও পাঁচালীর তরঙ্গে পড়িয়া, হাবুডুবু খাইয়া তাহার প্রাণ আই ঢাই করিতে লাগিল। তাহার কবিতা কেবল একজনের ভাল লাগিত। সে সেই স্বামীগতপ্রাণা, স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী সুশীলাসুন্দরী। সুশীলা স্বামীর অবস্থা দেখিয়া ম্রিয়মানা হইয়াছিল। এখন কাছে বসিয়া স্বামীর কবিতা শুনিলে, স্বামীর মুখে হাসি আসে দেখিয়া, তাহার কাছে উপযাচিকা হইয়া কবিতা শুনিত; আর স্বামীকে সুখী দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া কবিতার সুখ্যাতি করিত। শম্ভু বুঝিলেন এক সুশীলা ছাড়া পাড়ার আর সকলে মূর্খ মূর্খা। ক্রমে ক্রমে সুশীলা শম্ভুর কবিতারসোদ্দীপিকা হইয়া পড়িল। অভ্যাসে সকলই সহিয়া যায়। অনেক বাবু সাহেব হইবার জন্য পণির, হাম চপাদি, মুখে তুলিতে যাইয়া, প্রথম প্রথম বমন বেগ দমন করিতে পারেন না। শেষে দিন কয়েক উকি তুলিতে তুলিতে বাঙ্গালীর সেই অখাদ্য গুলি এমন তাদের অভ্যস্ত হইয়া যায়, যে তখন ভাত আর তাদের ভাল লাগে না। সুশীলারও সেইরূপ হইয়াছিল। প্রথম প্রথম শম্ভুর প্রতিভায় তাহাকে মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিতে হইত। শেষে শম্ভুর কবিতাই তাহার রামায়ণ মহাভারত হইয়া পড়িল। স্বামী সুখে সুখিনী ফুল্লমুখীর মদির লোচনে আনন্দের তড়িত বিকাশ দেখিয়া শম্ভুর শ্বশুর শাশুড়ী পিস্‌শাশুড়ী সকলেই জীবন ফিরিয়া পাইলেন সকলেই অনুমান করিলেন শম্ভু কিছু না কিছু একটা হইয়াছে। কিন্তু কি হইয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না বুঝিবার চেষ্টাও করিলেন না কি জানি চেষ্টা করিলে যদি শম্ভু আবার বিগড়াইয়া যায়;

শম্ভুর, শ্বশুর গৃহের গণ্ডগোল যখন মিটিয়া গেল, তখন গৃহের কথা ছাড়িয়া শুদ্ধ শম্ভুর কথা লইয়াই দিনকয়েকের জন্য আত্মবিস্মৃত হওয়া যাক্।

(৭)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শম্ভু মহা কাব্য রচনার সাধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কল্পনায় কতকগুলি ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া, চক্ষু মুদিয়া সেই ছবি দেখিতে দেখিতেই তাহার অনেক দিন কাটিয়া গেল। মহাকাব্য লিখিবার আর বড় অবকাশ হয় না।

শম্ভু তাহার কবিতাগুলি, ও যে মহাকাব্য খানি রচনা করিবেন অভিলাষ করিয়াছেন সেইখানি বেচিয়া যে প্রভূত অর্থ পাইবেন, তাহাতে একখানি বাগান কিনিবেন স্থির করিলেন।

শম্ভুর সেই নন্দন লাঞ্ছন উদ্যান পাঠকের দেখিবার সাধ যায় কি? সেই

উদ্যানের চারিধারে সুবর্ণ-ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীর। প্রাচীরকে বেষ্টন করিয়া আবার একটী পরিখা। কমল মধু সেই পরিখার জল। সেই মধুলোভান্ধ পৌর্ণমাসী শশধর নিত্যকর্ত্তব্য পৃথিবী বেষ্টন ভুলিয়া, উপরে মধ্য গগনে এক স্থানে দাঁড়াইয়া নিম্নে মধুজলে, অক্ষৌহিনী দল কমলিনীর স্বচ্ছ পলাশে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঢল ঢল করিতেছে। কোথায়ও আবর্য্যোপন্থাসোক্ত কৃষ্ণ উপদ্বীপের যুবরাজের সরোবর হইতে আনীত, বেদরক্ষক মীনরূপী ভগবানের লাল, নীল পীত হরিৎ বংশধরগণ ঝাঁকে ঝাঁকে সাঁতার কাটিতেছে। কোথায় বা সর্ব্বাঙ্গ কালবোস গভীর জলের ভিতর থাকিয়া ঘুড়বুড়ী কাটিতেছে। চারিধারে রম্ভা, উর্ব্বশী, মেনকা, তিলোত্তমা বাছাই করা অপ্সরী সুন্দরী সকল, ছিপ হাতে করিয়া "শ্বেতবর্ণ প্রবমান তরঙ্গের প্রতি" প্রভাতের কক্ষ প্রবেশোন্মুখী তারকার ন্যায় ঈষদীষৎ কম্পিত নয়নগুলি রাখিয়া 'নানাবিধ অত্যাচারের হেতু হইতেছেন'। কোমলাঙ্গীর কমলকরের তরলটানে গাথিয়া গিয়া বীরত্বাভিমানী রোহিত লম্ফ প্রদানে ডোর ছিঁড়িবার ভয় দেখাইতেছে। বড়মাথা কাতলারও আর টোপ খাইবার দেরী সহিতেছেনা, কাছে আসিবামাত্র ডানায় লাগিয়া ঘুরিতেছে, ছুটিতেছে, আবার হুইলের পাকে পাকে টানে টানে কাছে আসিতেছে; ডানকোণা, কুচো চিঙড়ি, চেলা শুধু টোপ খাইয়া পলাইতেছে। মিরগেল জলে ডুবিয়া ডুবিয়াই খেলাইতেছে। মলয়ানিল, সেই কোথাকার দূর দেশ হইতে আসিতে আসিতে, চরিদিক হইতে ফুলবাস সংগ্রহ করিয়া সেই উদ্যানের বহির্গাত্রে সুবর্ণ শ্যামল তৃণশষ্পাচ্ছন্ন বিস্তৃত প্রান্তরে, পরিখার জলে, অপ্সর সুন্দরীগণের বদন কমলে, নিঃশেষে ঢালিয়া, যাব যাব করিয়া সেই স্থানেই ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া এক পাদপাশ্রিতা নিশীথের বিহগী-কুল-কূজনের মত কেমন এক রকম অতি ভীষণ মধুর হাস্যরঙ্গ, আর সেই হাস্যাভিঘাত-কম্পিত কাল জলের তরঙ্গ-ভঙ্গ!

এখন একবার উদ্যানের ভিতরটা দেখিবে কি? ভয় হয় পাছে দুর্য্যোধনের, ময়দানব নির্ম্মিত ইন্দ্রপ্রস্থ সভা প্রবেশের মত জলে পড়িতে দেয়ালে মাথা ঠুকিতে হয়। বেদীতে বসিতে জলমগ্ন হইতে হয়। হাতেমের হামাম প্রবেশের মত—একবার ঢুকিলে আর বাহির হইতে হইবে না। সেখানে গোলাপ কথা কয়, মল্লিকা মুচকি হাসে, নিশিগন্ধা প্রভিসমীর হিল্লোলে মাথা নামাইয়া ইঙ্গিতে তোমার আদর চায়। বল দেখি ভাই তাদের আদর কাটাইয়া এই পিচ্ছিল কণ্টকাকীর্ণ পথে নানা বিবাদের ভ্রূকুটী ভঙ্গের আবরণে দেহ ঢাকিতে তোমার মন লাগিবে কি? ইহা ছাড়া তাহার ভিতর আরও কত কি আছে। তাহার উপর আরও গোলাপজলের বাপীতটে "পারিজাত প্রসূনোথ গন্ধামোদিতদিঙ্মুখে" কুঞ্জমধ্যে সহস্র সহস্র বৈদূর্য্য মণি-খচিত সিংহাসনে কখন বা বসিয়া, কখন বা নীলকমল পলাশভরা বালিশে ভর দিয়া আকুলকেশা ললিতবেশা কুলবালাগণ—কিরণসঙ্গিনী মধুযামিনী আর সেই জলদ-তরঙ্গে চিরআমোদিনী স্থিরস্মিতাননী সৌদামিনী।

প্রবেশ করিলে আর বাহির হইতে পারিবে কি ?

আর প্রবেশ করিতেই বা দেয় কে ? শম্ভু কি সে বাগানে আর কাহারও প্রবেশ করিবার পথ রাখিয়াছেন ? তাই দুঃখিত হইও না। মানব যত কেন মহাত্মা হউক না, দেবহৃদয়ে নিজের যথা সর্ব্বস্ব বিকাইয়া, সেই বিক্রয়লব্ধ ধন তোমার পায়ে ঢালিয়া হাসিটুকু মুখে করিয়া রাখুক না কেন, তাহার সেই মহাত্মার ভিতরে, সেই দেব-হৃদয়ের অভ্যন্তরে একটু—অতি ক্ষুদ্র অনমুমের স্বার্থ আছে। মূর্খ পাঠক, তুমি হয়ত বুঝিবে না। কিন্তু কি বল পাঠিকা ঠাকুরাণী ? সেই অতি ক্ষুদ্র অনমুমের স্বার্থটুকুই মানবের স্থায়ী ধন— আর তাই লইয়াই মানবের মানবত্ব; একটু অতি ক্ষুদ্র স্বার্থ শম্ভুর নিজস্ব ছিল। সেই জন্য সে বাগানে প্রবেশ করিবার বড় সুবিধা রাখেন নাই।

শম্ভুর সেই কল্পনা-কাননে প্রবেশ করিবার সবেমাত্র একটী দ্বার, সেটী আবার বেতস লতায় ঘেরা, কালভুজঙ্গে ভরা, অসূর্য্যম্পশ্য ভীষণ পথের শেষ সীমায়। সে পথে উঠিতে হয় নামিতে হয় আবার মাঝে মাঝে চলিতে চলিতে পথ মধ্যস্থ তুষার শীতল শীলাতলে বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে হয়—আগুইব কি পিছাইব। সে পথে ঘোর আছে ফের আছে। আরি মাঝে মাঝে আছে সেই বেতসলতার বাহু পাশে তোমায় বাঁধিয়া রাখিবার আকিঞ্চন। আবার আছে অরুণ-কিরণ-স্নাতঃ পরিমলবাহী সমীরসেবিত, নয়নরঞ্জন লতাবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাপর্ণের প্রলোভন, চলিতে চলিতে মোহ আসে। শীতপীড়িত ভুজঙ্গভীত বেতসপ্রেমালাপনে জর্জ্জরিত করিতে তাই হে, কে তোমাকে সে বাগানের পথ দেখাইবে!

শম্ভুর উদ্যান সম্বন্ধে যে এত কথা কওয়া গেল পাঠক স্থির করিলেন হয়ত সে আমাদেরই মনগড়া কথা। এই যে এত আড়ম্বরের এত বিভূতির উল্লেখ করিলাম ইহা আমাদের স্বকপোলকল্পিত উক্তিমাত্র। তা নয় ঈশ্বরের আদেশে রচিত ইডেন উদ্যান আদম ও ইভের পতনের পর যখন টাইগ্রিস স্রোতে বিলয় প্রাপ্ত হইল, তখন সেই স্বর্গীয় উদ্যানের ভগ্নাংশ পাইবার জন্য পৃথিবীর চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়াছিল।

সেক্সপীর হিতাহিত জ্ঞানের গাছটাই পাইয়াছিল, আর পাইয়াছিল দুইটা বড় বাড়ীতে ঢুকিবার জন্য দুইটা বড় ফটকের চাবি।

This shall unlock the gate of tear
Of horror that—the sacred foun-
tain of Sympathetic tear.

মিল্টন অন্ধ, হাতড়াইয়া কিছুই পাইল না, কেবল ইডেন শোভার বর্ণনা করিয়া, নাচিয়া কুঁদিয়াই সারা হইল। ওয়ার্ডস ওয়ার্থ প্রকৃতির কতকগুলা মূর্খের চিত্র পাইয়া তাহাদের সঙ্গে কথা কইয়া পৌত্তলিক হইয়া পড়িল। সেলী খানিকটা ক্লোরোফরম পাইয়া আঘ্রাণের নেশায় জলে ডুবিয়া মরিল। আমাদের বঙ্গরাজ্যে মধুসূদন একটা মধুচক্র পাইল। গৌড়জন তাহে নিরবধি আনন্দে সুধা-পান সুরু করিল। হেম একটা ভাঙ্গা বীণা পাইল—'বাজরে বীণা বাজ এই রবে' বলিয়া কতই চেঁচাইল। বীণা

কেবল ঘ্যাণ ঘ্যাণ করিল কেহ শুনিল না। শেষে স্বাধীন ব্রহ্ম পরাধীন হইল, অসভ্য জাপান সুসভ্য হইল দেখিয়া বীণায় আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া গ্রীক শয্যায় শুইয়া পড়িল। রবি কতকগুলা ফুল পাইয়া ছড়াইল। নবীন কুরুক্ষেত্রের মাটী পাইয়া খড়াইল। আর নব প্রেম শলাকা নির্ম্মিত পিঁজরায় বসিয়া অনেক প্রবীন কবি কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইল। শম্ভু আমাদের কি করিল পায়েসের বাটি হইতে খড়কে কাটীটী পর্য্যন্ত পাইবার আশা রাখিয়া, আগে আগে হইতেই নাচিতে সুরু করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শম্ভুর বাগান আমাদের কথা নয়। শম্ভু মহাকাব্য রচনার পূর্ব্বেই গাহিল

"রচিব বাগান।

গৌড়জন যাহে প্রবেশিতে, পথ হ'তে
আড় হয়ে পড়ে, ডুমুরের ফুল দেখে—
হিষ্ট্রিয়া রোগ যথা কুল-কুণ্ডলিনী
রুকে রুকে ঝুঁকে ঝুঁকে উঠে ফুলে ফুলে
কিসে হবে কি করিব আর বলিব না।
ইত্যাদি

সেই উদ্যানে রচনার অর্থসংগ্রহের জন্ম শম্ভু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন।

বাবর।

২

বাবর ফরগণা অধিকার করিলেন। এতদিন অথৈ সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন, কুল কিনারা কিছুতেই ঠিক ছিল না—সহসা একটা অবলম্বন পাইয়া অনেকটা আশা পাইলেন। দূর ভবিষ্যতের অনন্ত শূন্ত হইতে কে যেন তাহাকে ডাকিয়া বলিল—"আর ভয় নাই!" বাবর আশস্ত হইলেন, ভাবিলেন—আর ভয় নাই!—পবিত্র জাক্সারতিসের বিমল সলিল তাঁহার হৃদয়ের মলিনতা দূর করিবে; পুষ্পিত কানন শ্যামল ধরা, শ্যাম শৈল; সুনীল আকাশ—তাঁহার নিরাশা মলিন হৃদয়কে প্রফুল্ল করিবে *; জিৎ-রাজি তোমিরীর পবিত্র আত্মা তাঁহার অদৃষ্ট-পথ আলোকিত করিবে; এটিলার বীর আত্মা তাঁহাকে অদৃষ্ট বিপদরাশি হইতে রক্ষা করিবে—আর ভয় নাই! বিশাল জগতের দিকে চাহিয়া বাবরের হৃদয় উৎসাহিত হইল। যে এলারিকের প্রচণ্ড বিক্রমে বল্‌তিক্‌ হইতে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল এই পবিত্র জাক্সারতিস-তীর কি তাহার পদ-চিহ্ন ধারণ করে নাই? সে পদ-চিহ্ন অনুসরণ করা কি বাবরের সাধ্য নহে? বাবর উৎসাহিত হইলেন।

কিন্তু এখনও তাঁহার সে দিন আসে নাই। সেদিন আসিতে এখনও বিলম্ব। তাই তাঁহার আশা সফল হইতে না হইতে পুনর্ব্বার বিফল হইল! আখোল

* বাবর প্রকৃতির সন্তান ছিলেন—প্রকৃতি শোভা বড়ই ভালবাসিতেন।

করগণা আক্রমণ করিলেন। তাম্বোল বাবরের বল বুঝিয়াছিলেন; বুঝিয়াছিলেন সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি ব্যতীত বাবর দমনের দ্বিতীয় উপায় নাই—সুতরাং দুর্দ্দমনীয় উজ্‌বেগগণের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। সাহায্যও পাইলেন,—রণকুশল দুর্দান্ত প্রকৃতি অসংখ্য উজ্‌বেগ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। এই বিপুল অনিকিনী বাবরের মুষ্টিমেয় সৈন্যের বিরুদ্ধে চালিত হইল। বাবর চিন্তিত হইলেন, কিন্তু ভীত হইলেন না। কতিপয় মাত্র অনুচর লইয়া সেই বিশাল সমুদ্রতুল্য শত্রু সেনারাশির উপর আপতিত হইলেন। তাঁহার দুর্দ্দমনীয় গতি ও তীব্র অসি চালনার সম্মুখে উজ্‌বেগগণ দলে দলে হটিতে লাগিল—কত উজ্‌বেগ ছিন্নশীর হইল! কিন্তু কতক্ষণ? এক হস্ত অসংখ্য হস্তের সহিত কতক্ষণ যুঝিবে? বাবর পরাস্ত হইয়া আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাকে পলাইতে দেখিয়া উজ্‌বেগগণ সিংহনাদ করিয়া চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল; বাবর ও তাঁহার অনুচরগণ সিংহবিক্রমে আত্মরক্ষা ও শত্রুহত্যা করিতে করিতে নগর অতিক্রম করিতে লাগিলেন। পথে পথে রক্তস্রোত বহিল। যখন বাবর নগরের বাহিরে আসিলেন তখন তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে কেহই নাই—আপনার বলিতে শুধু সেই অশ্বটী—তাহাও অর্দ্ধমৃত। বাবর চলিলেন। সহসা পশ্চাতে অশ্বপদধ্বনি হইল। বাবর ফিরিয়া দেখিলেন—দুই জন উজ্‌বেগ অশ্বারোহী তীরবেগে তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিয়াছে। বাবর অশ্বে কষাঘাত করিলেন—অশ্ব ছুটিল। কিন্তু কতক্ষণ? অজস্র শোণিতপাতে তাহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল—সে অধিক দূর ছুটিতে পারিল না। অশ্বারোহীদ্বয় বাবরকে ধরিয়া ফেলিল। কিন্তু বাবর সহজে বন্দী হইবার লোক ছিলেন না। তিনি কথায় কথায় তাহাদিগকে ভুলাইয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তাহাদের সম্মুখে এরূপ আশাবাক্য খুলিয়া দিলেন যে তাহারা মনোমুগ্ধের ন্যায় বাবরের অধীন হইল। বাবর তাহাদিগের সহিত পর্ব্বতে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে লোভে অন্ধ হইয়া তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিল। গোপনে তাম্বোলকে সম্বাদ দিল। বাবর অতর্কিতাবস্থায় বন্দী হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে বেশীদিন ঐ অবস্থায় থাকিতে হইল না। কোনরূপে কারাগার হইতে পলায়ণ করিলেন। কিরূপে পলাইয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে নাই। একজন বোখরাবাসীর নিকট সে সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা এই। তাম্বোলের কোন আত্মীয়া রমণী বাবরের যৌবন দেখিয়া মুগ্ধ হয়। বাবরের বয়স তখন ২৩বৎসর। উক্ত রমণী সুযোগ পাইলেই কারাগারে গিয়া বাবরের সহিত সাক্ষাৎ করিত। একদিন বাবরের যন্ত্রণা দেখিয়া তাহার বড়ই কষ্ট হইল। হায়! রমণীর কোমলতা পাষাণ হৃদয় পুরুষে কি বুঝিবে?—সে বাবরকে কারাগার হইতে পলায়ন করিতে অনুরোধ করিল। বাবর পলায়নের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণী বলিল—উপায় শুধু ছদ্মবেশ। বাবর প্রথমে ঐ উপায়কে ঘৃণা

প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু রমণীর কাতরোক্তিতে তিনি দৃঢ়তা হারাইলেন। রমণী বলিল তিনি যদি স্বয়ং জীবিত থাকেন তাহা হইলে তাঁহার রাজ্য তিনি পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন এই অন্ধ কারাগারে জীবন হারাইতেই কি তাঁহার ন্যায় বীর পুরুষের জন্ম হইয়াছিল? বাবরের হৃদয় মধ্যে বিশাল ফরগণা রাজ্য হাসিয়া উঠিল; বাবর সম্মত হইলেন। রমণী তাঁহাকে সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা মনোমত করিয়া সাজাইল। বাবর খুব সুশ্রী ছিলেন, অনায়াসেই একটী সুন্দরী রমণীতে পরিণত হইলেন। রমণী দ্বার মুক্ত রাখিয়া গিয়াছিল—গভীর রাত্রে বাবর বাহির হইলেন। দ্বারে অশ্বারোহী প্রহরী ছিল,—রমণী দেখিয়া কেহ বাধা দিল না। বাবর ঐ অবসরে সিংহের ন্যায় একজন অশ্বারোহীকে আক্রমণ করিলেন ; এবং অশ্বারোহীর প্রত্যাক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই তাহার তরবারি কাড়িয়া তন্মুহূর্ত্তেই তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন—এবং তাহারই অশ্বে আরোহণ করিয়া তীরবেগে প্রস্থান করিলেন! মুহূর্ত্তের মধ্যে এই কাণ্ড সমাধা হইল; সকলে অবাক্,—নিশ্চল,—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়,—প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল!

তাহার পর বাবরের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইল। জীবনের যে শেষ ভরসাটুকু ছিল তাহাও গেল। তাঁহার মাতুল শিবানী কর্ত্তৃক সসৈন্য পরাজিত ও বন্দী হইলেন। বাবরের সকল দিক শূন্য হইল! সমগ্র ভূমী উজবেগদিগের করায়ত্ত হইল। বাবর তখন বাষ্পাকুললোচনে মাতৃভূমীর নিকট শেষ বিদায় লইয়া হিন্দুকুশপাড়ে—উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রের অনুসন্ধানে—চলিলেন। তখন কে ভাবিয়াছিল যে এই বাবরই একদিন সুদূর ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে?—কে জানিত যে মহারাণা সংগ্রামসিংহের তরবারি বাবরের অপেক্ষায় কোষবদ্ধ রহিয়াছে?—বাবর চলিলেন। কোথায় চলিলেন তাহার স্থিরতা নাই—তবুও বাবর চলিলেন। এই সময়ে তাঁহার অবস্থা ভীষণ। বয়স ২১ বৎসর মাত্র; কিন্তু জগতে 'আপনার' বলিতে কেহই নাই—চারিদিকে ঘোর অন্ধকার! জন্মভূমি হইতে পশুর ন্যায় বিতাড়িত হইয়াছেন—পশুর ন্যায় বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিতেছেন! ঝড়,—বৃষ্টি,—রৌদ্র,—তুষার মাথার উপর দিয়া যাইতেছে—ভ্রূক্ষেপ নাই! স্থানে স্থানে বন্যপশুগণ আক্রমণ করিতেছে; তিনি তাহাদের বাহুবলে বিধ্বস্ত করিতেছেন! হায়! হায়!! পশুরও আশ্রয় আছে, বাবরের নাই!!!

এই সময়ে তিনি মাঝে মাঝে উদাস কবিতা লিখিতেন, বালকের ন্যায় রোদন করিয়া কঠিন শিলা অশ্রুসিক্ত করিতেন। কিন্তু তখনও তাঁহার বীর হৃদয় তাঁহার বীর সঙ্কল্পকে দৃঢ় রাখিয়াছিল, তখনও তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা তাঁহার নিরাশ মলিন হৃদয়কে উৎসাহিত করিত। পাহাড়, নদী, গাছপালা, লতা, পাতা, ফল, ফুল, দেখিয়া; সামান্য ফল মূলে উদরপূর্ত্তি করিয়া, নির্ম্মল নির্ঝরিণীর জল পান করিয়া, অনন্ত আকাশতলে শয়ন করিয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। নহিলে তিনি "বাবর" হইতেন না। কথিত

আছে একবার কোন ভয়ঙ্কর বিপদের সময়েও একটা সুন্দর 'সর্দ্দা' তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল।

বাবরের যখন এই অবস্থা তখন বাক্ত্রীয়াতে বিষম গোলযোগ। তাঁহার মাতুলের প্রিয় সহায় খুসরুশাহ তাঁহার (বাবরের) পিতৃব্যতনয় বাইসঙ্গর মির্জাকে হত্যা করিয়া বাক্ত্রীয়া অধিকার করিয়াছে। বাবর আর থাকিতে পারিলেন না। অনেক স্থান ঘুরিয়া, অনেক লোভ দেখাইয়া, তিন শত লোক একত্র করিলেন। তাহাদের শুধু লাঠি সম্বল। এই অপূর্ব্ব সৈন্য লইয়া তিনি মাতার সহিত বাক্ত্রীয়া যাত্রা করিলেন। বাবরের এই সময়ে দুইটীর বেশী তাঁবু ছিল না, তন্মধ্যে ভালটী মায়ের জন্য। বাবরের অসীম মাতৃভক্তি ছিল।

খুস্রু শুনিল—বাবর আসিতেছে সে ভীত হইয়া স্বয়ং বাবরের অভ্যর্থনা করিতে আসিল। বাবর বিনা বাধায় বাক্ত্রীয়া প্রবেশ করিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে বাক্ত্রীয়াতে যত মোগল ছিল সকলেই বাবরকে দেখিবামাত্র বাবরের পথাবলম্বী হইল; খুস্রুর ভ্রাতা 'বাকী' ও সেই পথ লইলেন। তখন বাবর অনেকটা আশা দেখিলেন। তাঁহার অধীনে এখন অনেক সৈন্য। তিনি সসৈন্যে কাবুল যাত্রা করিলেন। কাবুলে তখন ঘোর অরাজকতা—ঘোর অশান্তি! দুই বৎসর হইল উলেখ বেগের মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার পুত্র মন্ত্রী কর্তৃক রাজ্য-চ্যুত ও বিতাড়িত হইয়াছেন। রাজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা; বাধা দিবার কেহই নাই,—সুতরাং বাবর বিনারক্তপাতে কাবুল অধিকার করিলেন। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে কাবুলের সিংহাসনারোহণ করিয়া আপনাকে কাবুলাধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। উলেখ্ বেগের বিতাড়িত পুত্র একবার কাবুলোদ্ধারের শেষ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল। তিনি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইলেন।

এই সময়ে সম্বাদ আসিল বাক্ত্রীয়া তাঁহার অধিকারচ্যুত হইয়াছে। তিনি দুঃখিত হইলেন। খুস্রুকে লিখিয়া পাঠাইলেন; খুস্রু প্রাণপণ যত্নে বাক্ত্রীয়া উদ্ধার করিলেন,—কিন্তু কিছুদিনের পর উহা পুনর্ব্বার উজ্‌বেগ্‌গণের হস্তে পড়িল। সে দেশের সঙ্গে বাবরের সম্বন্ধ প্রায় একবারে ঘুচিল। তিনি কাবুল লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ২২ বৎসর ধরিয়া উহা নির্ব্বিঘ্নে শাসন করিলেন।

তাহার পর বাবর ভারতাক্রমণ করিলেন।

তরী ডুবিয়া গেল !

অকূল পাথারে তরী ডুবিয়া গেল !
তোরা রাখিতে নারিলি—তরী ডুবিয়া গেল !

সে যে উজান বাতাস ঠেলে,
সোণা রঙ্গী পাল তুলে,
চলেছিল হেলে দুলে—
আপনা ভুলে,—

ছোট ঢেউগুলি হেসে হেসে—
তরীখানি ঘেঁসে ঘেঁসে—
চলেছিল ভেসে ভেসে—
সুদূর কূলে——

তোরা কেন বারেকের তরে—
সারি দিয়ে নদী তীরে—
সোণামুখী তরিটিরে
দেখে গেলিনে ?

আমি ডাকিনু কত—
তোরা আপনার সুখে ছিলি
এমনি রত,
হায় ! ফিরে চেলিনে !
তরী ডুবিয়া গেল !

আকাশের সীমা ব্যেপে
মেঘরাশি এল চেপে—
জগৎ উঠিল কেঁপে ;
নদী টলিল।

আমি নামাইতে গিয়ে পাল
ছাড়িয়ে দিলেম হাল,
না চাহিতে এল কাল—
তরী ডুবিল।

হায় ! অকূল পাথারে তরী ডুবিয়া গেল।
তোরা রাখিতে নারিলি তরী ডুবিয়া গেল !!

কোথায় ?

পাপে তাপে এ জীবন মলিন—আঁধার
মলিন বিবেক জ্যোতি।
সংসারের অসরল পথে ঘুরে' ঘুরে'
হইয়াছি শ্রান্ত অতি।
কোন্ পথে যাব আমি কে দেখাবে পথ
ভীষণ আঁধার মাঝ ?
সাধের সংসার তব দেখ কি বীভৎস
মুরতি ধরেছে আজ।
ব্যাকুল অন্তরে সখা তাই হে তোমারে
ডাকিতেছি অবিরল।

সৃষ্টি হ'তে তুমি দূরে র'লে, প্রাণ সখা
কে রাখিবে এ সকল ?
ফিরাও ফিরাও দেব বিপথ হইতে
মানবের এ সংসারে।
নতুবা সংহার মূর্ত্তি করিয়া ধারণ
নাশ সৃষ্টি একেবারে !
বিশ্বাস আশ্বাস শূন্য জীবন লইয়া
নিশিদিন—অনিবার
একটু একটু করি মরণের পথে
পারিনা ছুটিতে আর !

সমিরা॥

২য় সর্গ।

প্রিয়ে চারুশীলে'!

কে করিল রমণীয় রমণী আনন?
কুসুমে সুষমা মাখি—
কণ্টকে কমলে রাখি,
কে করিল বিপরীত এহেন ঘটন?
রাকা শশি রাহুমুখে বল কি কারণ?
কাঁদে চাঁদ, হাসে তারা,
রাহুগ্রাসে রবি সারা,
তথাপি আকুল হেসে তারকার কুল,
যে করে জীবন দান,
যা'র তেজে জ্যোতিষ্মান,
তা'র অদর্শনে কেন আনন্দ অতুল?
কাল জলে কাল মেঘ,
পবনে প্রবল বেগ,
উজানে অজয় বহে,—বেগ খরশাণ,
তরঙ্গে তরঙ্গে খেলে শন্ শন্ স্বন॥

(২)

বৈশাখের নিশীথিনী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী,
গগনে সুঘন ঘন,
বহে খর সমীরণ,
অজয়ের রাঙ্গা জলে রাশি রাশি মসি।
তীরে [illegible] তরু সাজি,
তরিতে তরুণ মাঝি,
শাখী শিরে চক্রবাকী করিছে রোদন।
বিষাদে মলিন অতি শবরী বদন॥
শবর তরণী'পরে
তাপিত তরুণী ভাবে,
বাম করে কর্ণ ধ'রে চিন্তায় মগন।
দাঁড়ায়ে অজয় বক্ষে
মন কিন্তু নিজ কক্ষে,
হেরিছে মানস চক্ষে চারু চন্দ্রানন,
অশান্ত হৃদয়ে ভাবে শান্তি নিকেতন॥

(৩)

বহিল প্রবল ঝড়
বৃক্ষ সব কড় মড়,—
হুড় হুড় গড় গড় করে মেঘদল,
গম্ভীর গরজে ধায় অজয়ের জল॥
শবরের তরি, হায়
তীব্র বানে তৃণ প্রায়,
কর হ'তে খসি কর্ণ পড়িল তখন।
কে রাখে তরণী আর,
দশ দিক অন্ধকার—
ছুটিল—উঠিল—পুন উলটি মগন।
মেঘাচ্ছন্ন শবরের অদৃষ্ট-গগন॥
শিলা বৃষ্টি জলধারা
শত তীক্ষ্ণ শর পারা
অবিরল বরষিছে ইন্দ্রশরাসন।
শতচন্দ্র বিশ্বময় কাঁপে ঘন ঘন।

২য় খণ্ড। ১৩০২ সাল—ভাদ্র। ১২শ সংখ্যা।

শীতলা-পূজা প্রকৃত কি?

পাশ্চাত্যেরা যেরূপ বিজ্ঞানে জড় শক্তির প্রাধান্য অনুভব করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন হিন্দুরা সেইরূপ বিজ্ঞানে অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রাধান্য অনুভব করিয়া কৃতার্থ; তাই হিন্দুরা রোগে শোকে শান্তি স্বস্ত্যয়ন, জপ তপ ও দান ধ্যানের পরামর্শ দান করেন; ঔষধের জন্য একটী বৃক্ষের মূল কি অন্য কোন উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, অগ্রে ঈশ্বর নাম করিয়া স্নানান্তে শৌচ হইয়া তাহা সংগ্রহ করিবার নিয়ম। এই অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিবলেই যেখানে পাশ্চাত্যেরা ৬৪ মহাভূতকে সৃষ্টির আদি বলিয়া ধরেন সেখানে হিন্দুশাস্ত্র আর ও সূক্ষ্মেতে গিয়া সত্ব, রজ ও তম এই তিনটী গুণকে আদি বলিয়া ধরে।

বসন্তরোগে শীতলা-পূজা যে হিন্দুদিগের মনকে প্রাচীন কাল হইতে ঔষধাদির ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণ করিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত অতীন্দ্রিয়-প্রাণতাই তাহার কারণ। কিন্তু যাঁহারা শীতলা পূজা করেন তাঁহারা কি উহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত আছেন—তাঁহারা কি জানেন যে শাস্ত্রে শীতলার কিরূপ বর্ণনা আছে? অধিকাংশ সময় দেখিয়াছি শাস্ত্রে যেখানে মূর্ত্তির প্রশ্রয় দেয় নাই অজ্ঞ লোকেরা সেখানেও মূর্ত্তির আবাহন করিয়া থাকে। খ্রীষ্ট বিশুদ্ধ ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে বলিলেন কিন্তু আজ তাহার পরিবর্ত্তে য়ুরোপ খণ্ডে সহস্র সহস্র লোক খ্রীষ্টকেই ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছে। ইহুদিরা ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে একবার না হয় খ্রীষ্টের শরীরই ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে খ্রীষ্টানেরাই আজ ১৮০০ বৎসর ধরিয়া খ্রীষ্টকে হত্যা করিতেছে সে দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করেন না। খ্রীষ্টের শিষ্যেরাই যে খ্রীষ্টোপদেশের বিরুদ্ধে আজ ১৮০০ বৎসর ধরিয়া ঈশ্বরের স্থানে খ্রীষ্টকেই ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতেছে ইহাতেই প্রকৃত পক্ষে খ্রীষ্টকে ক্রুসে বিদ্ধ করা হইতেছে।

অনেকের ধারণা যে শাস্ত্রকারেরা হয়ত একটা দশহস্ত দশমস্তক ইত্যাদি কোন অদ্ভুতাকারের পুত্তলিকা অথবা কোন শিলা বা প্রস্তরকে শীতলা বলিয়া পূজা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন—ইহা

সম্পূর্ণ ভ্রম। শীতলার মূর্ত্তি শাস্ত্রে যাহা বর্ণিত আছে তাহা অমূর্ত্ত-ধ্যানগম্য—

মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্য সংস্থিতাং।
যস্তাং বিচিন্তয়েদ্দেবীং তস্ত মৃত্যুর্নজায়তে॥
(স্কন্দপুরাণ)

"যে ব্যক্তি শীতলাদেবীকে নাভিপদ্ম ও হৃদপদ্মে মৃণালতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম বলিয়া ধ্যান করেন তাঁহার মৃত্যুভয় থাকে না।" অতএব যাহা মৃণালতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম তাহার আর মূর্ত্তিকল্পনা কিসে হইল? ঈশ্বরের সূক্ষ্মতা ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্ত্রে তাঁহাকে কেশাগ্রের অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে। উপনিষদকার ঋষিরা যেখানে তাঁহাকে 'অণোরণীয়ান' বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন সেখানে তাঁহারা এ অর্থে বলেন নাই যে তিনি একটী ক্ষুদ্রতম জড় অণু, কিন্তু ঈশ্বরের অতীন্দ্রিয়ত্ব ব্যক্ত করিবার জন্যই পূর্ব্বোক্ত মহাবাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। ঈশ্বরের অনন্ততা বুঝাইবার জন্যও যেরূপ উপনিষদকার "আকাশো বৈ নাম তত্র" বলিয়া আকাশের তুলনা দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এস্থলেও সেইরূপ শীতলাদেবীর অমূর্ত্তভাব দিবার জন্যই বলা হইয়াছে 'মৃণাল তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম'। আমাদের দেশের লোকেরা শাস্ত্রোপদেশের বিশুদ্ধতা না বুঝিয়া তাহাকে ক্রমে বিকৃত আকার দিয়া মূর্ত্তি গড়িয়া তুলে।

শীতলার অর্থ কি—যাহা শীতল তাহাই শীতলা। শীতল বস্তু বলিলে সর্ব্ব প্রথমেই আমাদিগের কোন্ পদার্থকে মনে আইসে? অম্লরসের সঙ্গে যেমন তেঁতুলের সম্বন্ধ, মিষ্ট রসের সঙ্গে যেমন চিনির সম্বন্ধ, শীতলার সহিত জলের সেইরূপ সম্বন্ধ। শীতল বলিলেই জলের কথাই আমাদিগের মনে সর্ব্বপ্রথম উদয় হয়। শীতলাদেবী জলরূপিণী দেবী; শীতলাদেবী জলদেবীরই নামান্তর মাত্র। কিন্তু নামেতেই যা' শীতলাদেবীকে জল বলিয়া বুঝিতেছি; অবশ্য 'মৃণালতন্তু, সদৃশীং নাভিহৃন্মধ্য সংস্থিতাং' এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় কি ভাবে যে শীতলা বলা হইয়াছে তাহা ঠিকটা বুঝা যায় না, তবে মৃণালতন্তুর সহিত তুলনা দেওয়ায় জলের সঙ্গে যেন শীতলার কিছু সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয়। শীতলা নামের দ্বারাই যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহা যথেষ্ট বলিতে হইবে, কারণ শীতলদ্রব্যের মধ্যে জলই সর্ব্বপ্রধান। অগ্নির যেমন উষ্ণতা, জলের তেমনি শৈত্য; বিশেষতঃ শীতলা স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত ও স্ত্রীদেবতারূপে কল্পিত হওয়ায় শীতলা যে "জলদেবী এই কথাই সমর্থিত হইতেছে। জলের পর্য্যায় অপ্‌শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়াই শীতলাকে স্ত্রীলিঙ্গ করা হইয়াছে। বৈদিক জলদৈবত মন্ত্রগুলিতে অপ্‌শব্দের সহিতই দেবী ও মাতৃ শব্দের সংযোগ দেখা যায়। শীতলা দেবী বৈদিক মন্ত্রের 'আপোদেবী'রই পৌরাণিক সংস্করণ মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে কি পুরাণ কি স্মৃতি কি তন্ত্র কি অন্যান্য শাস্ত্র, ভারতবর্ষে যাহা কিছু শাস্ত্র আছে সকলেরই মূল বেদ—'সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি'। ভারতের অধিকাংশ ভাষা সমূহের মূল যেমন বৈদিকী ভাষা, সেইরূপ ভারতের কি পৌরাণিক কি তান্ত্রিক অধিকাংশ ক্রিয়া কলাপ, আচার ব্যবহার, পূজা পদ্ধতিরও মূল বৈদিক আচার, বৈদিক ক্রিয়া কলাপ; ভাষার ন্যায় অধিকাংশ আধুনিক আচার, আধুনিক

ক্রিয়া কলাপ বৈদিক আচার ও ক্রিয়া কলাপেরই অনুগত।

বৈদিক মন্ত্র সমূহে ঋষিরা জলকে মাতা বলিয়া, দেবী বলিয়া আবাহন করিয়া গিয়াছেন; শীতলাকে যে মাতা বলে, তাহা ঐ সকল বৈদিক মন্ত্র ব্যতীত অন্য কোথা হইতে উদ্ভূত নয়। সিন্ধুদ্বীপ ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দে বলিতেছেন—

আপোহিষ্ঠা ময়োভুব স্তান
উর্জ্জে দধাত মহেরণায় চক্ষসে।
যোবঃ শিবতমো রসস্তস্য
ভাজয়তেহনঃ উশতীরিব মাতরঃ।
তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায়
জিন্বথ আপোজনয়থা চনঃ।

এই মন্ত্রটীর দেবতা জল এবং গাত্র মার্জ্জনে ইহার বিনিয়োগ। "হে জল তোমরা সুখদায়িনী, তোমরা আমাদিগকে অন্নপ্রাপ্তির এবং পরম রমণীয় ঈশ্বর দর্শনের উপযোগী কর। তোমরা শুভাকাঙ্ক্ষিণী মাতার ন্যায় আমাদিগকে তোমাদের কল্যাণতম রসের ভাগী কর। সেই রস আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দাও যে রসে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎ জীবন লাভ করিতেছে এবং যাহাদ্বারা আমরাও পুত্র পৌত্রাদিসম্পন্ন হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারি"। এই মার্জ্জন মন্ত্রে বৈদিক ঋষি এক বিশ্বব্যাপী জলতত্ত্বের মনন করিয়াছেন, এস্থলে সমুদ্রের জল বা নদীর জল বা কূপের জল এমন কোন বিশেষ ভাব নাই। জলের যে রসরূপগুণে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জীবিত ইহা সেই সূক্ষ্ম অথচ বিশ্বব্যাপী রসাত্মক জলের ধ্যান। হিন্দুমতে পঞ্চ মূল ভূতের পাঁচটী গুণ আছে যেমন আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, তেজের গুণ রূপ, জলের গুণ রস ও ক্ষিতির গুণ গন্ধ; এই স্থলে সর্ব্বব্যাপক রসাত্মক জলেরই আবাহন করা হইয়াছে। 'আপঃ' শব্দের ধাত্বর্থই ব্যাপ্তি—'আপ্ ব্যাপ্তৌ'। সিন্ধুদ্বীপ ঋষি জলের এই সর্ব্বব্যাপকতা অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাতৃশক্তি অর্থাৎ পালনীশক্তিও স্পষ্ট অনুভব করিয়া বলিয়াছেন, "যোবঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহনঃ উশতীরিব মাতর" যাহা তোমাদিগের কল্যাণতম রস শুভাকাঙ্ক্ষিণী মাতার ন্যায় আমাদিগকে তাহার ভাগী কর।

প্রজাপতি ঋষিও আরেকটী মন্ত্রে জলের এই মাতৃভাব ও দেবীভাব অনুধ্যান করিয়া বলিতেছেন—

আপোঅস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ।
পুনন্তু বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীঃ॥

"হে জল তোমরা জগতের মাতা তোমরা আমাদিগকে পবিত্র কর তোমাদিগের যে ঘৃতরূপী বীর্য্য * দ্বারা সকল দ্রব্যই পবিত্র কর সেই ঘৃতের দ্বারা আমাদিগকে ও শুদ্ধ কর যেহেতু জল দেবী কর্ত্তৃক সকল পাপই ধৌত হয়"

পুনশ্চ দধ্যঙাথর্ব্বন ঋষিগায়ত্রীছন্দে বলিতেছেন।

শন্নোদেবীরভিষ্টয় আপোভবন্তু
পীতয়ে শংয়োরভিস্রবন্তুনঃ॥

জল ইহার দেবতা এবং শান্তি কর্ম্মে ইহার বিনিয়োগ "হে জল তুমি দেবী,

* ঘৃতকে জলের বীর্য্য বলা হইয়াছে এই হিসাবে যে জলের সারতম পদার্থই ঘৃত। জল হইতে ওষধি, ওষধি আবার গবাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া সাররূপে দুগ্ধে পরিণত হয়, আবার দুগ্ধের সার ঘৃত অতএব জলের বীর্য্য অর্থাৎ সারতম পদার্থই ঘৃত দাঁড়াইল।

অর্থাৎ তুমি স্তত্যাদির বিষয়ীভূতা, তুমি আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত এবং পানের নিমিত্ত আমাদিগের কল্যাণ-দায়িনী হও; এবং আমাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত আমাদিগের উপরে অভিবর্ষিত হও।" এখানেও জলকে "দেবী বলিয়া শান্তি কর্ম্মে আবাহন করা হইয়াছে"। আমরা এই সকল বৈদিক মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম যে বৈদিক ঋষিরা স্নান করিবার কালে জলের যে সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্মতত্ব তাহা মনোমধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক জলকে মাতার ন্যায় দেবীর ন্যায় অনুভব করিয়া শুদ্ধি এবং শান্তি প্রার্থনা করিতেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, দেবী শব্দে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায়। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

দীব্যতে ক্রীড়তে যস্মাদুচ্যতে দ্যোততে দিবি
তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ

ইহার ভাবার্থ এই "যাহা সুশোভন, যাহা মনোরম, যাহা সুব্যক্ত ও দ্যুতিমান তাহাই দেবতা"। এই কারণে হিন্দুদিগের নিকট ব্রহ্মও দেবতা, সূর্য্যও দেবতা, জলও দেবতা ইত্যাদি। যাহা সুন্দর শোভন তাহারই নাম দেবতা; এই হিসাবে শুভ্র সুন্দর পরমাত্মা, তিনিও দেবতা, মনের একটী সুন্দর ভাব, তাহাও দেব-পদবাচ্য। যেমন প্রসিদ্ধ অঘমর্ষণ মন্ত্রে ভাববৃত্তকেই দেবতা বলা হইয়াছে—'ভাববৃত্তঞ্চ দৈবতং'। অঘমর্ষণ মন্ত্র সৃষ্টি বিষয়ক, সৃষ্টিতত্বের ভাবকেই এস্থলে দেবতা বলা হয়। মনোহারী গুণ থাকায় দূর্ব্বাও তাঁহাদিগের নিকট দেবী, যথা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে—

সহস্রপরমা দেবী শতমূলা শতাঙ্কুরা।
সর্ব্বং হরতু মে পাপং দূর্ব্বা দুঃস্বপ্ননাশিনী॥

"হে দূর্ব্বা তুমি সহস্র দ্রব্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তুমি দেবী, শতদিকে তোমার মূল এবং শতদিকে অঙ্কুর, তুমি আমার সকল পাপ হরণ কর; যেহেতু তুমি দুশ্চিন্তা নাশিনী"। আজকাল দেবী অর্থে সচরাচর লোকে যাহা বুঝে, বৈদিক কালে সে হিসাবে দেবী শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। প্রাচীন কালে যাহা সুন্দর যাহা উচ্চ-ভাবাত্মক তাহাই দেব সম্মানে সম্মানিত হইত। এক্ষণে কিন্তু দেব শব্দে উপাস্য-মূর্ত্তিই সচরাচর বুঝায়। *

জলে ঈশ্বরের দিব্য হস্ত দেখিয়াই ঋষিরা জলকে দেবী বলিয়াছেন। ঈশ্বরের পালনী শক্তি জলে অনুভব করিয়াই জলকে মাতা বলিয়াছেন। ইহাতে মূর্ত্তির বদ্ধভাবনাই—ইহা ভাবময় উন্মুক্ত। যোগ শাস্ত্র ও তন্ত্র প্রভৃতি দ্বারাও বৈদিক জলদেবীর ধ্যান সমর্থিত হইয়াছে। এই বৈদিক আপোদেবী পুরাণে যেমন শীতলা সাজিয়াছেন, সেইরূপ আবার যোগীদিগের নিকটে যোগীবেশে উপস্থিত। যোগশাস্ত্রেও এই জলের ধ্যান আছে কিন্তু তাহা ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। জলের ধ্যানকে যোগশাস্ত্রে আম্ভসী ধারণা বলে, আম্ভসী ধারণার বিষয় লিখিত আছে

শঙ্খেন্দুপ্রতিমঞ্চ কুন্দধবলং তত্ত্বং কীলালং শুভং।
তৎপীযূষং বকার বীজ সহিতং যুক্তং সদা বিষ্ণুনা
প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘটিকাং চিত্তান্বিতাং ধারয়েৎ
এষা দুঃসহ তাপহারিণী স্যাদাম্ভসী ধারণা॥

* ইংরাজি আইডিয়া এবং আইডিয়াল শব্দে যাহা বুঝায় প্রাচীন কালে দেবশব্দে অনেকটা তাহাই বুঝাইত এক্ষণে কিন্তু দেবশব্দে 'আইডল'ই সচরাচর বুঝায়।

"জলতত্ত্বের বর্ণ শঙ্খ, চন্দ্র ও কুন্দবৎ শুভ্র; বকার ইহার বীজ এবং বিষ্ণুর সহিত সতত যুক্ত। এই জলতত্ত্ব পাঁচ ঘটিকা-কাল নিশ্চলভাবে মনে মনে চিন্তা করিবে, তাহা হইলেই আপ্তসী ধারণা হয়। ইহা দুঃসহতাপ হরণ করে। শীতলার স্তোত্রে দেখা যায়, শীতলা নাম হইয়াছে এই জন্য যে ইহার ধ্যানে শরীরের দাহ দূর হয়। আপ্তসী ধারণারও ঐ একই উদ্দেশ্য তাই বলা হইয়াছে

এষা দুঃসহ তাপহারিণী স্যাদাম্ভসী ধারণা।

প্রকৃতপক্ষে যদি কোন কিছুর ধ্যানে শরীর শীতল হওয়া সম্ভব হয় ত সে এক জলেরই ধ্যানে। যেমন অম্লরসের চিন্তা-মাত্র করিলে উহা শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া জিহ্বায় জল আনয়ন করে, এস্থলেও সেইরূপ জলের ধ্যানে মনে একটা শৈত্যের ভাব অনুভব হইলে শরীরেও তাহার কার্য্য হওয়া কিছু অসম্ভব নহে এবং তাহা দ্বারা ক্রমে জ্বর ও গাত্রদাহ প্রভৃতি দূর হওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নহে। একমনা হইয়া যাহা কিছু চিন্তা করা যায় শীঘ্রই তাহা শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এক মুহূর্ত্তে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না এই জন্য আম্ভসী ধারণা এক আধ ঘণ্টা নয়, পাঁচ ঘণ্টাকাল অবিচ্ছেদে করিবার ব্যবস্থা। শীতলা স্তোত্রেও এই জন্য বলা আছে ব্যাধি ভয় নিবারণের জন্য এক আধবার নয়, সদা সর্ব্বদা শীতলার স্মরণ করা চাই।

যে পালনী শক্তির জন্য বৈদিক মন্ত্রে জলকে মাতা বলা হইয়াছে, আম্ভসী ধারণাতেও সেই কারণে জলকে 'যুক্তং সদা বিষ্ণুনা' বিষ্ণুর সহিত নিত্যযুক্ত বলা হইয়াছে। শাস্ত্রমতে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইঁহারা তিন স্বতন্ত্র। তিনের মূলে যিনি তিনিই ব্রহ্ম আর এই যে তিন ইঁহারা ব্রহ্মের শক্তি ত্রয়; ব্রহ্মা সৃষ্টিশক্তি বিষ্ণু স্থিতি বা পালনী শক্তি এবং শিব প্রলয়শক্তি। আম্ভসী ধারণাতে 'যুক্তং সদা বিষ্ণুনা' বলিয়া বৈদিক মন্ত্রগুলিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছে মাত্র। বিষ্ণুর অর্থ ঈশ্বরের স্থিতি বা পালনী শক্তি, এই জন্যই রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতিকে বিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে। ভারতে যে কয়টী মানব অবতার হইয়াছেন, সকলেই হয় লোকরক্ষা প্রভৃতি দ্বারা ঈশ্বরের পালনী শক্তির উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই জন্যই কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণকে শাস্ত্রকারেরা শিবের বা ব্রহ্মার অবতার বলেন নাই। বিষ্ণুর অবতার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা ঈশ্বরের স্থিতি বা লোক রক্ষা শক্তির অবতার অর্থাৎ লোক রক্ষক রূপে তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন। এমন কি ঋষিরা যে প্রাণী বা যে জড়বস্তুকে লোকোপকারক বলিয়া পরিচয় পাইয়াছেন সেই খানেই বিষ্ণুপদ আরোপ না করিয়া ছাড়েন নাই। এই জন্য গঙ্গা তাঁহাদিগের নিকট বিষ্ণুপাদ প্রসূতা, পৃথিবী 'বিষ্ণুক্রান্তা'। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে গায়ে মাখিবার মাটীকেও 'বিষ্ণুপদাক্রান্ত' বলা হইয়াছে, ইহার কারণ মাটী শরীরপরিপুষ্টিকর। পালোয়ানেরা মাটীর এই গুণ থাকায় গায়ে বেশ করিয়া মাটী মাখিয়া থাকে।

বৈদিক ঋষিরা যেমন আপোহিষ্ঠা প্রভৃতি জলদৈবত মন্ত্রগুলি স্নানকালেই বিনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন, স্কন্দ-

পুরাণও তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া ব্যবস্থা করিতেছেন.

যস্ত্বাং উদক মধ্যেতু ধৃত্বা সংপূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটক ভয়ং ঘোরং কুলেতস্য ন জায়তে ॥

"যে তোমাকে (শীতলাকে) উদক মধ্যে অর্থাৎ স্নানকালে ধারণা করিয়া পুজা করে, তাহার বংশে আর কথনই বিস্ফোটক-ভয় থাকে না। শীতলা ধ্যানে শুদ্ধ যে বসন্তই আরোগ্য হয় বলিতেছে তাহা নয়, বসন্ত বিস্ফোটক জ্বরও আরোগ্য হয়; এতদ্ব্যতীত গলগণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য দারুণ রোগ সকলও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

গলগণ্ডগ্রহারোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাং।
ত্বদনুধ্যান মাত্রেণ শীতলে যান্তি তে ক্ষয়ং ॥

বৈদিক ঋষিরাও জলের নিকট রোগ সমূহ নিবারণের অনেক প্রত্যাশা করিয়া বলিয়াছেন

সুমিত্রান আপওষধয়ঃসন্তু

"জল এবং ওষধি আমাদিগের সুমিত্র হউক।"

অপাং যৎ ক্রূরং যদমেধ্যং যদশান্তং তদপগচ্ছতাৎ।

"জলে যাহা ক্রূর যাহা অপবিত্র যাহা রোগকর তাহা দূর হউক।" এতদ্ব্যতীত শুদ্ধির নিমিত্ত অভীষ্টের নিমিত্ত পদে পদে জলকে আহ্বান করিয়াছেন। জলে যাহা অহিতকর যাহা অপবিত্র মনোবলের দ্বারা তাহা পরিহার করিয়া যাহা হিতকর ও পবিত্র তাহারি জন্য একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বেদমন্ত্রগুলিরই অনুসারী হইয়াই পুরাণকার শীতলাতে সর্ব্বরোগহারিণী শক্তির আরোপ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক, মনোযোগ যাহাতেই দেওয়া যায়, তাহাই অভীষ্ট ফলদায়ক হয়। একটী জ্যামিতির অনুশীলনী প্রমাণ করিতে হইলে অবিশ্রান্ত মনের একাগ্রতায় তাহা সফল হয়। যদি একাগ্রচিত্তে মনে করা যায় যে এই খাদ্য শরীরপুষ্টিকর হউক তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহা ফলদায়ক হইবে। ঋষিরা এই মনোযোগের বল বুঝিয়া সকল বিষয়েই মনোযন্ত্রকে নিয়োগ করিতেন। এই মনোযন্ত্রের নামই মন্ত্র। স্নানে আহারে সকল সময়েই উঁহারা সমন্ত্রক হইয়া কার্য্য করিতেন, অমন্ত্রক হইলে সকল বিষয়ই তাঁহাদিগের নিকট অসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইত।

পাঠক এতক্ষণ দেখিয়া আসিলেন যে বেদে যাহা আপোদেবী বা 'আপোমাতা' পুরাণে তাহাই শীতলাদেবী বা 'শীতলামাতা' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। শীতলাধ্যান জলধ্যান বৈ আর কিছুই নয়। কিন্তু শীতলা সম্বন্ধে এখনো একটী কথা বলা হয় নাই শীতলার সঙ্গে আবার একটী বাহক আছে গর্দ্দভ। মহাদেব বলিতেছেন—

নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীং।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাং ॥

মার্জ্জনীকলসযুক্ত সূর্পালঙ্কৃতমস্তক গর্দ্দভবাহন দিগম্বরী শীতলাদেবীকে নমস্কার করি। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে যাহার মূর্ত্তি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে 'মৃণালতন্তু সদৃশী' সূক্ষ্ম এক্ষণে বলা হইতেছে দিগম্বরী, তাহার বাহনই বা আইসে কিরূপে, মস্তকই বা আইসে কিরূপে?

গণেশের ন্যায় স্থূলকায় ব্যক্তির যে একটী সামান্য মূষিককে বাহন বলা হইয়াছে, তাহা কি বাস্তবিক গণেশকে বহিয়া লইয়া বেড়াইত ? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে গণেশ লেখক ছিলেন, গণেশের ন্যায় লেখকই বেদব্যাসের মহাভারত লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সুতরাং যেখানে কাগজপত্র সেইখানেই মূষিকের সমাগম, তাই এই হিসাবে রূপকচ্ছলে বলা হইয়াছে যে গণেশের বাহন মূষিক। ছাগলকে অগ্নির বাহক বলে কি ছাগল অগ্নিকে স্কন্ধে বহিয়া লইয়া বেড়ায় বলিয়া ? ছাগমাংস ও ছাগদুগ্ধ প্রভৃতি অত্যন্ত অগ্ন্যুদ্দীপক বলিয়াই ইহাও রূপকচ্ছলে বলা হইয়াছে। সেইরূপ শীতলার বাহন গর্দ্দভ বলিবার একটুকু তাৎপর্য্য আছে। গরু বল, ঘোড়া বল, হাতী বল সকল চতুষ্পদ জন্তুরই বসন্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে গর্দ্দভের কখনই বসন্ত হয় না। ইহা ব্যতীত বসন্ত রোগে গর্দ্দভ দুগ্ধের উপকারিতা অনেক। প্রবাদ আছে যে বসন্তকালে গর্দ্দভ দুগ্ধ পান করিলে বসন্তরোগ হয় না। এমন কি বসন্ত রোগীকেও ইহা ব্যবহার করাইলে রোগের লাঘব হয়, স্ফোটকাদি শীঘ্রই শুকাইয়া যায়।

যদি এক্ষণে ইহার বিষয় পাশ্চাত্যেরা ঘুণাক্ষরেও অবগত নহেন তথাপি দেশীয় প্রবাদ বলিয়া ইহাকে আমরা একেবারে অবহেলা করিতে পারি না। কারণ দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে এক্ষণেও পাশ্চাত্যেরা আমাদের অনেক পশ্চাতে। খুব সম্প্রতিই পাশ্চাত্যেরা ভারত এবং চীনের নিকট হইতে কোন কোন বিশেষ রোগে চন্দনের ব্যবহার শিখিয়াছেন। ইহা তাঁহারা নিজ মুখেই স্বীকার করেন। জিহ্বার ঘায়ে মেষ দুগ্ধের উপকারিতার বিষয় আমরা অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি। শত শত অ্যালোপাথি ঔষধে যাহা না হয়, এক মেষ দুগ্ধে সহজেই তাহা আরাম হয়। একস্থলে আমরা জানি কোন দেশীয় আলোপাথি ডাক্তার এই দেশীয় টোটকায় কোন এক ব্যক্তির কষ্টসাধ্য জিহ্বার ঘা সহজে আরাম করেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার ক্রম্বি সাহেব সেই সময়ে জিহ্বার ঘায়ে মেষ দুগ্ধের উপকারিতা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ক্রম্বি এস্থলে এক মিল্লচারের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার ম্যাকনামারাও উদরাময় প্রভৃতি অনেক রোগে বিলাতি ঔষধ পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় মুষ্টিযোগ ব্যবহার করিতেন। এই সকল কারণে আমার মনে হয় বসন্ত রোগে গর্দ্দভদুগ্ধের উপকারিতার বিষয় যে প্রবাদ আছে তাহা অমূলক না হইবারই সম্ভব, কেবল একথার এক্ষণে ইহা কবিরাজ ও ডাক্তার দিগের পরীক্ষা সাপেক্ষ।

গর্দ্দভের বসন্ত হয় না বলিয়াই এবং গর্দ্দভের দুগ্ধ বসন্ত নিবারণে অনেক কার্য্যকারী বলিয়াই খুব সম্ভব পুরাণে রূপকচ্ছলে গর্দ্দভকে শীতলার বাহন বলা হইয়াছে। মার্জ্জনী, কলস ও সূর্প ইহারা স্নানের এবং গৃহদ্বার পরিষ্কার রাখিবার উপকরণ। বসন্ত কালে স্নান এবং গৃহদ্বার পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত কর্ত্তব্য এই কারণে শীতলার সহিত কলস

প্রভৃতিকে ধরা হইয়াছে। শীতলার বর্ণনায় বাহন প্রভৃতি মূর্ত্তি আঁকিবার জন্ত নয়—কেবল রূপকের কথায় ভাবের কথায় বলা হইয়াছে। শীতলা বিশ্বব্যাপক জলের মানস ধ্যান মাত্র—একটা আইডিয়া মাত্র। যেমন আমরা প্রলয়ের মনে মনে একটা কল্পনা করি ইহাও সেইরূপ। জল জগতের হিতকারী, জলের পালনী শক্তির দ্বারা বিশ্বজগৎ জীবিত এইরূপ ভাবিয়া একটা বিশাল শুভ্র জলরাজ্যের কল্পনা করিতে হইবে। ইহাই আপোদেবী, ইহাই শীতলা। ইহার হস্তও নাই পদ্ও নাই, ইহার মূর্ত্তিও নাই।

প্রকৃত কথা এই যে বেদের তত্ত্ব সমূহ তত্ত্বজ্ঞ দ্বিজদিগেরই মধ্যে আবদ্ধ ছিল। পুরাণকে সেই সকল তত্ত্ব লোকপ্রীতিকর ভাবে জাতিনির্ব্বিচারে সকলের সমক্ষে হাজির করিতে হইয়াছে; সেইজন্ত তত্ত্ব কথাকে অনেকটা গল্পের ভাবে বলিতে হইয়াছে। 'আপোহিষ্ঠা' প্রভৃতি বৈদিক জলদৈবত মন্ত্রগুলি দ্বিজদিগের স্নান কালে নিত্য স্মরণ করিবার বিধি আছে। আজিও হিন্দুরা তাহাই করিয়া আসিতেছে, কিন্তু বৈদিক আপোদেবীর কথা কয়টা লোকই বা জানে—শীতলার নাম জানেনা এমন লোক ভারতে অল্পই।

পোষামেয়ে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মহামায়া।

মহামায়া কে? কেনই বা মহামায়া চিরদুঃখিনী? সুরেশের মন সেই সকল জান্‌বার জন্য কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠল; এতক্ষণের ঔৎসুক্য এখন ব্যাকুলতায় পরিণত হল। যদি দৈববশে আর কেহ সেইখান দিয়ে যায়, তিনি সেই আশায় একটী বৃক্ষের মূলে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তাচলে অবতীর্ণ হলেন, পশ্চিম-গগনের মেঘগুলি পাটল বর্ণে রঞ্জিত হয়ে অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হল, বৃক্ষের ছায়া সকল দীর্ঘ হয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত লম্বমান হয়ে গেল। দিবা অবসান প্রায়—তথাপি সুরেশ মহামায়ার বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন এমন কোন লোককে দেখ্‌তে পেলেন না।

ভালবাসার একটী স্বাভাবিক গুণ, যখন তাহা হৃদয় অধিকার করে তখন এমনি অতর্কিতভাবে অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, যে কোন প্রকারেই বোঝা যায় না, কিন্তু একবার সমস্ত অধিকৃত হলে. একেবারে আপনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রকাশ কর্‌তে থাকে। সুরেশের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে সেই ভালবাসার অধীন হয়ে পড়্‌ল, সুতরাং তাঁর ব্যাকুলতাও ক্রমে বাড়্‌তে লাগ্‌ল। তিনি আর অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লেন না; বালিকার নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন

কর্‌লেন "হাঁগা! গ্রামস্থ সকলেই আমোদ আহ্লাদ কচ্চে, কিন্তু তুমি এমন নিস্তব্ধ ম্লান ভাবে নির্জ্জনে বসে আছ কেন?"

রমণী তাঁর সেই কণ্ঠস্বর শুনেই চমকে উঠে একবার ফিরে দেখ্‌লে। দেখ্‌লে একজন অপরিচিত পুরুষ নিকটে দাঁড়িয়ে, অমনি থতমত খেয়ে ত্রস্ত উঠে পড়্‌ল। সুরেশ কোমল স্বরে বল্লেন "আমি তোমার শান্তির ব্যাঘাত করলেম!—ভয় নাই, আমি কোন অনিষ্ট কর্‌ব না।"

বালিকা তাঁর সেই কোমল কথায় কতক সাহস পেয়ে থম্‌কে দাঁড়ান। সুরেশ বল্লেন "এমন নবীন বয়সে তুমি এত কি গুরুতর ব্যথা পেয়েচ, যে এমন আনন্দের দিনেও একরূপ ম্লান?—আহা আমার যদি ক্ষমতা থাক্‌ত, তাহলে আমি তোমার সে দুঃখ দূর কর্‌তেম।"

বালিকা সুরেশের কথাগুলির মর্ম্ম সমস্ত বুঝ্‌তে না পারুক, শেষ কথাগুলি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লে, নয়নদ্বয় দিয়ে দর দর অশ্রু ধারা প্রবাহিত হতে লাগ্‌ল। সুরেশের হৃদয় গলে গেল, তিনি আর থাক্‌তে পার্‌লেন না "আ! আমিই তোমার শোক উত্তেজিত করে দিলাম। আমিই তোমার পুরাতন ব্যথা নূতন করে দিলাম!" এই কথা বলেই ত্বরিত নিকটে গিয়ে উত্তরীয় বস্ত্রদ্বারা বালিকার অশ্রুজল মুছিয়া দিলেন। একি! একজন অপরিচিত পুরুষ সহসা গাত্র স্পর্শকর্‌লে। লজ্জাবতী বালিকা অমনি ত্রস্তভাবে হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে পালাল। সুরেশ বল্লেন "দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব দাঁড়াও।"

রমণী তাঁর সে কথায় একবার ফিরে দেখ্‌লেও না, দ্রুত নদী পারহয়ে চলে গেল। সুরেশের ইচ্ছা ছিল, সঙ্গেসঙ্গে দৌড়ে গিয়ে কথাটী জিজ্ঞাসা করে আসেন। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই সে মনোমোহিনী মূর্ত্তিখানি গোধুলির অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল, আর দেখ্‌তে পেলেন না। কাজে কাজে হতাশ হয়ে গাজন তলায় ফিরে গেলেন। তখনও গাজনের সমারোহ কমে নাই তেমনি লোকের জনতা রয়েছে, তখনও তেমনি আমোদ প্রমোদ হচ্চে; কিন্তু তাঁর সঙ্গীদ্বয় আর সেখানে নাই। কোথায় গেলেন? উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে দুই একজনকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—কেহই জানেনা। দুটী বাবু বসে ছিলেন সকলেই দেখেছে, কিন্তু কেহই বল্‌তে পারে না, তাঁরা কখন উঠে গেছেন। তাঁরা বিলম্ব দেখে কি আগেই বাসায় ফিরে গেলেন? না, তা কখনই হবে না, পণ্ডিত মহাশয় তেমন লোক নন, অবশ্যই সুরেসকে অন্বেষণ কর্‌বেন। তিনি একবার এদিক ওদিক সঙ্গীদের খুঁজে দেখ্‌লেন, কিন্তু দুজনের কাহাকেও দেখ্‌তে পেলেন না।—এ নিশ্চয়ই মদনমোহনের কাজ, মদনমোহনই পণ্ডিত মহাশয়কে দম দিয়ে নিয়ে গিয়েছে অন্ধকার রাত্রি, অপরিচিত পথে একাকী যাওয়া বিধেয় নয়; বিশেষ সহজ পথও জানা নাই। সুরেশ গাজনতলায় ফিরে এসে একজন লোককে বৰ্দ্ধমানে যাবার সোজা সহজ পথ দেখিয়ে দিতে বল্লেন। সে তাঁর সেই কথা শুনেই একটু আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে "মহাশয়ের নিবাস?"

সুরেশ বল্লেন "কল্‌কাতা।"

ও সেই কথা শুনে ক্ষণকাল চিন্তা করে বল্লে "আচ্ছা, তাইত, আপনি পথ

চেনেন না, সন্ধ্যাকাল, কি করি—আমিত এখন যেতে পারি না, বলেন ত বরং একটা লোক করে দিতে পারি।"

"হানি কি, একটী লোকই করে দাও—যত মজুরী লাগে আমি দিতে প্রস্তুত আছি।"

"তবে আপ্‌নি এইখানে দাঁড়ান, আমি ডেকে নিয়ে আস্‌ছি" সে এই কথা বলেই চলে গেল। সুরেশের মন কেবল সেই মনোহারিণী বালিকার চিন্তাতেই নিমগ্ন সুতরাং সঙ্গীদেব জন্য ভাবনা বড় অধিকক্ষণ হৃদয়ে স্থান পেলে না। তিনি মেরাপের বাশে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে কেবল মহামায়ার চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। ক্ষণকালের মধ্যে লোকটী আর একজনকে সঙ্গে করে সেইখানে এসে উপস্থিত হল। নবাগত লোকটার হাতে লণ্ঠন ছিল; সে তাব দীপটী জেলে দাঁড়াল। সুরেশ প্রথম লোকটাকে অনেক ধন্যবাদ প্রদান করে বিদায় হলেন। আলোকধারী পথ দেখিয়ে আগে আগে চল্‌ল।

সুরেশ গাজনতলা ছাড়িয়ে কতকদূর এসে লোকটীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "ওহে বাপু, তোমাব নামটী কি?"

সে উত্তব দিল "আজ্ঞা, আমার নাম দুল্লোব।"

"দুর্লভ, ভাল—তোমার নিবাস কি এই গ্রামেই।"

"আজ্ঞে হাঁ এই গাঁয়েই আমার বাড়ী—আমরা সাতপুরুষ এইখানে।"

"তবে তুমি গ্রামের সকলই জান—জিজ্ঞাসা কর্‌লে, সকলই বল্‌তে পার্‌বে?"

"আজ্ঞে, বলেন কি—এইখানেই জন্ম, এইখানেই এত বড্‌ডা হলাম, আমি আর গাঁয়ের সব জানিনে।"

"আচ্ছা—এই গ্রামে মহামায়া বলে একটী মেয়ে আছে, তুমি তাকে চেন?"

সুরেশের সেই কয়টী কথা শুনেই আলোকধারী আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বল্লে "আজ্ঞে, আপ্‌নিও তাকে চেনেন!—আহা মহামায়া বড় গরিব!—তাকে চেনে না এমন লোকত চাক্‌লায় নেই মোশায়! সবাই তাকে চেনে—আহা! তার অদেষ্ট বড় মন্দ।"

"মহামায়া গরিব,—অতি মন্দভাগিনী! কেন বল দেখি! তার বিবরণ কিছু জান?"

"আজ্ঞে সে জানে বা কে?—আমাদেব গাঁযের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত জানে—আহা মহামাযার মত মেয়ে হয় না মোশাই—কিন্তু ভগবান যে কখন কার কি করেন তা তিনিই জানেন।"

পথ প্রদর্শকের কথায় সুরেশের ঔৎসুক্য আরও দ্বিগুণিত হয়ে উঠ্‌ল। তিনি বল্লেন "মহামায়ার বৃত্তান্তটী সমস্ত আমাকে বল্‌তে পার?—আমার সেটী জান্‌তে বড় ইচ্ছা আছে।" সুরেশ এই কথা বলেই লোকটীর হাতে একটী টাকা দিলেন। সে সেই সামান্য বিষয়ের জন্য তত অধিক পারিতোষিক পেয়ে কিছু থতমত খেয়ে বল্লে "আজ্ঞে, তার জন্যে এত কেন,—আমি এখনই আপ্‌নাকে সমস্ত বল্‌চি—তার জন্যে, তার জন্যে—

সুরেশ ঈষৎ হেসে বল্লেন "হোক্, তার আর ক্ষতি কি—আমি তোমাকে পারিতোষিক দিলাম—তায় আর ক্ষতি কি?"

পথপ্রদর্শক টাকাটী কাপড়ে বেঁধে বেখে, মহামায়ার ইতিহাস বর্ণন কর্‌তে

আরম্ভ করলেন। সুরেশ তৃষিত চাতকের ন্যায় একাগ্রমনে সেই কথাস্রোত পান করতে লাগলেন।

বিবরণটী এই :—মহামায়া অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকা; কিন্তু তার পিতামাতা নিতান্ত অশিক্ষিত গ্রাম্য ছিলেন না। মহামায়ার জননী বিমলা নিকশ কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা। মামার বাড়ীই কুলীন-কন্যাদের নিজ বাড়ী—বিমলার মামা যথেষ্ট গোত্রপন্ন গৃহস্থ। উপযুক্ত মর্য্যাদার পাত্র মেলে নাই বলে বিমলা অনেক বয়স অবধি অবিবাহিতা ছিলেন, পঞ্চদশ বৎসর বয়সের সময় মহামায়ার পিতার সহিত বিমলার প্রসক্তি হয়। তিনিও সৎকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু হলে কি হয়, কুলমর্য্যাদা একটা ভীষণ অন্তরায়; চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণের সঙ্গে কুলীন দুহিতার বিবাহ কোনরূপেই সম্ভব নয়, বিশেষ মহামায়ার পিতা নিতান্ত সঙ্গতিহীন। সুতরাং সে গুপ্তপ্রেম ক্রমে উভয়েরই পক্ষেই বিষম হানিজনক হয়ে উঠল। চক্রবর্ত্তী কি করেন, অন্য কোন সদুপায় না পেয়ে কৌশলে বিমলাকে নিয়ে পলায়ন করলেন। কোথায় যাবেন?—যেখানে থাকবেন সেইখানেই ভয়—প্রবল ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতা করা হয়েছে—কাজে কাজেই ভদ্রলোকের বাস শূন্য নিরিবিলি স্থানে এসে বিমলাকে শাস্ত্রমতে বিবাহ করে বসবাস করতে লাগলেন। যে উপায়ে বিমলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল, যদিও সামাজিক নিয়মে অতি নিন্দনীয় ও গর্হিত, তথাপি চক্রবর্ত্তীর ভদ্রতায় ও বিমলার শীলতায় গ্রামের সকলেই সমস্ত ভুলে গিয়ে তাঁদের বড় স্নেহ করত। বাস্তবিক সেরূপ আচরণ দেখতে কি শুনতে যতই মন্দ হউক না কেন, বিশেষ বুঝে দেখলে কখনই তত দোষের বলে বিবেচনা হবে না। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেরই হৃদয় ক্ষীণ; সেই ক্ষীণতাতেই সময়ে সময়ে নানারূপ চাঞ্চল্যের উদয় হয়ে থাকে, এবং সেই চাঞ্চল্যই সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের নিদান। এই ক্ষীণতা বা চাঞ্চল্যের বশবর্ত্তী নহেন এরূপ লোক অতি বিরল; কেহ অল্প—কেহ অধিক, সকলেই এত অধীন। যখন বিজ্ঞ জ্ঞানবান লোকেরাও মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ হৃদয়তার জন্য বিচলিত হন, তখন স্বভাবতঃ ক্ষীণ হৃদয় যুবতী বিমলাকে তত দোষী বলা যেতে পারে না—আ! প্রকৃত বিষয় ত্যাগ করে আমরা অনেক দূর এসে পড়লাম; বিমলা দোষী কি নির্দ্দোষী কাহারও তাহা শ্রবণ করবার কোন প্রয়োজন নাই। দোষী হন দোষী, নির্দ্দোষী হন নির্দ্দোষী, তাহাতে আমাদের কিছুই ইষ্টাপত্তি নাই। প্রকৃত কথা গ্রামের সকলেই তাঁদের যথেষ্ট ভাল বাসত ও মান্য করত।

চক্রবর্ত্তী যদিও পার্থিব সম্পত্তি—ধনরত্নে নিঃস্ব, তথাপি তিনি ধনী—প্রণয়-ধনে ধনী। যার প্রণয় আছে তার কিছুরই অভাব নাই—কাজেই তাঁর পার্থিব অভাব আছে বলে বিবেচনা হত না; স্বচ্ছন্দে কেবল প্রণয়রসাস্বাদন করে দিন যাপন করতে লাগলেন—উপার্জ্জনের আর কোনরূপ উপায় করা হল না। ক্রমে সেই প্রণয়-তরুটী মুকুলিত, প্রস্ফুটিত, পরে ফলবান্ হইল। সে বৃক্ষের প্রথম ফল মহামায়া। মহামায়ার পর আর একটী পুত্রসন্তানও হল।

পূর্ব্বে প্রণয়ীদ্বয় এক প্রকার একাকী ছিলেন, এখন পরিবারসংখ্যা বেস বেড়ে উঠ্‌ল, সুতরাং তাঁহারা যা কিছু সঙ্গে এনেছিলেন, শিঘ্রই নিঃশেষিত হয়ে গেল। চক্রবর্ত্তী বড় বিপদে পড়্‌লেন, সংসার চলা বড় কঠিন হয়ে উঠ্‌ল। আপনারা কষ্ট ভোগ করেন সে বরং সহ্য হয়, কিন্তু বালকবালিকারা ক্লেশ ভোগ করবে, আহারাভাবে শুষ্ক হবে, সে অসহ্য। চক্রবর্ত্তীকে অগত্যা একটী চাক্‌রীর চেষ্টা করতে হল। আমরা যে সময়ের কথা বল্‌চি সে সময়ে মহাত্মার বয়ঃক্রম প্রায় সাত বৎসর, বালকটীর বয়স কিঞ্চিৎ অধিক তিন বৎসর। এই সময় উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বিষম সিপাহিবিদ্রোহাগ্নি জ্বলে উঠ্‌ল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সৈনিকদলের সহগামী হবার জন্য অনেকগুলি লোকেরও প্রয়োজন হলো। চক্রবর্ত্তী সেই সকল পদের একটী গ্রহণ করতে মনস্থ করলেন। বিমলা অনেক নিষেধ করলেন—"লড়াই হাঙ্গামার সঙ্গে যাবার প্রয়োজন নাই; এমন চাক্‌রিতে দরকার নাই; যিনি জীব দিয়াছেন তিনিই আহার দেবেন—না হয় আমরা দুজনে উপবাস করেই দিন কাটাব।" কিন্তু চক্রবর্ত্তী কিছুতেই শুন্‌লেন না—বালকবালিকার ক্লেশ, প্রণয়িনীর ম্লান মুখ দেখা অপেক্ষা তাঁর পক্ষে মৃত্যু শ্রেয়ঃ। সুতরাং তিনি কথঞ্চিৎ প্রিয়তমাকে প্রবোধ দিয়ে সৈন্যদলের সঙ্গে কর্ম্ম করতে গেলেন। বিমলার আর দুঃখের সীমা রইল না—সেই দুঃসময় তাহাতে আবার প্রিয় বিচ্ছেদ—মন সর্ব্বদাই যেন কেমন এক প্রকার ভয়ানক বিপদচিন্তায় ব্যস্ত! তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে পড়্‌লেন।

এক মাস দুই মাস, মাসের উপর মাস, ক্রমে ছয় সাত মাস অতিবাহিত হয়ে গেল; চক্রবর্ত্তীর কোন সংবাদই নাই। চক্রবর্ত্তী কোথায়?—আ! সরলা বিমলার আশঙ্কা যথার্থই ঘটে গিয়েছে। বিমলা কিছুই জানেন না কিন্তু বাস্তবিকই তাঁর পোড়া কপাল পুড়ে গিযেছে। চক্রবর্ত্তী যে দলের সঙ্গে ছিলেন দুর্ভাগ্য ক্রমে সে দলটী সিপাহিদের নিকট পরাজিত হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে, চক্রবর্ত্তী ও আরও দুই তিন জন কমিশরিয়েট কর্ম্মচারী সঙ্গে সঙ্গে কাটা পড়েন। অত্যন্ত স্নেহ—ভালবাসার একটী স্বাভাবিকগুণ, প্রিয় জন যত দূরস্থই হউন না কেন, দৈববশে কোন বিপদ ঘট্‌লে মন কেমন আপনা আপনিই ব্যাকুল হয়ে উঠে—মন যেন মনে মনেই সমস্ত বুঝ্‌তে পারে, মন্দ সমাচার আর স্পষ্টকরে শুন্‌তে হয় না। বিমলার মনে মনে কে যেন বলে দিলে "জগতের মধ্যে তোর এক সুখ তাও তিরোহিত হয়েছে।" বিমলা তখন পাগলিনী! কি হলো? মন কেন এমন হলো? মন তা জানেনা; মন কেন? কেহই জানেনা। কিন্তু ব্যাকুলতা দিন দিন ক্রমেই বাড়্‌তে লাগ্‌ল। লোকে কথায় বলে "পথ চেয়ে থাকা" বিমলা বাস্তবিকই সেই পথ চেয়ে রইলেন। পাগলিনী অপোগণ্ড কন্যার উপর শিশু সন্তানটীর রক্ষণাবেক্ষণ-ভার দিয়ে প্রত্যহ গ্রামের প্রান্তে, পথের ধারে—যেখানে চক্রবর্ত্তী সজলনয়নে বিদায় গ্রহণ করেন—সেইখানটীতে তাঁর প্রত্যাগমন অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে

থাক্‌তেন। এক এক দিন সেই নির্জ্জন গ্রাম-প্রান্তে এক প্রহর দেড় প্রহর রাত্রিও হয়ে যেত। সময়ে সময়ে বিমলার ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌তে ইচ্ছা হত; কিন্তু কাঁদ্‌লে অমঙ্গল হবে! সুতরং নিস্তব্ধ থাক্‌তেন। হায় রে! কার অমঙ্গল হবে? যার অমঙ্গল, সে নাই! একেবারে ফুরিয়ে গিয়েছে—

"——গিয় ছে সে চির দিন তরে।"

এইরূপ প্রায় তিন চারি মাস কেটে গেল। এক দিন সন্ধ্যার সময় মহামায়া একাকী ঘরে বসে আছে, পার্শ্বে বালকটী নিদ্রিত। মহা দুর্য্যোগ অল্প অল্প বৃষ্টি পড়্‌চে সঙ্গে ঝড় প্রবাহিত হচ্চে। জীর্ণ চালা ঘরখানি প্রবল বায়ুবেগে দুল্‌চে। এ দুর্য্যোগের সময় বিমলা কোথায়? বিমলা একাকিনী গ্রামপ্রান্তে পথচেয়ে! ক্রমে দুর্য্যোগ বাড়্‌তে লাগ্‌ল; ঘন ঘন বিদ্যুতের সঙ্গে মেঘগর্জ্জন হতে লাগ্‌ল—দুই একটী বজ্রাঘাতও হয়ে গেল। মহামায়া তখন শিশু সুতরাং সেই দুর্য্যোগে ভীত হবে তার আর বিচিত্র কি? বালিকা ভয় পেয়ে দৌড়ে মাকে ডাক্‌তে গেল। পথের মধ্যে একটা ভয়ানক বজ্র নির্ঘোষ শ্রবণগোচর হল। মহামায়া সেই জল ঝড়ে অতি কষ্টে গ্রামের প্রান্তে গিয়ে তিন চারি বার উচ্চৈঃস্বরে "মা মা" বলে ডাক্‌লে, কিন্তু কোন উত্তরই পেলে না। একটু দূরে চলে গিয়ে দেখ্‌লে বিমলা ভূতলে মূর্চ্ছিতা পড়ে আছেন। গায়ে হাত দিয়ে দুই তিন বার ডাক্‌লে তথাপি তাঁর মূর্চ্ছাভঙ্গ হল না। হায়, সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার নয়—সে চিরদিনের জন্য মূর্চ্ছা—বজ্রপাতের আতঙ্কে তাঁর প্রাণবিয়োগ হয়েছে। ভয়ানক বিপদের সময় অন্তঃকরণ যেন কেমন দৃঢ় হয়ে যায় তখন আর উপস্থিত বিপদ তত গুরুতর বলে বোধ হয় না। জগদীশ্বরের কৃপায় সে সময়ে যেন কোনরূপ অমানুষিক শক্তির দ্বারা অবিচলিত হয়ে লোকে অনায়াসে নিজে কর্ত্তব্য পালন করে। বালিকার মনও সেই বিপদ সময়ে কেমন একরূপ হয়ে গেল। সে অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে বাড়ীতে ফিরে এল। আ! একি! চালা খানি ধূধূ করে জ্বল্‌চে, ঘর দ্বার সমস্তই অগ্নিময়। পথে যে বজ্রাঘাতটী শ্রুতিগোচর হয়েছিল, সেটী দুর্ভাগ্যক্রমে মহামায়াদেরই ঘরের উপর হয়ে গিয়েছে! —"আমার ভাই! আমার ভাই!"—মহামায়া কনিষ্ঠ সহোদরটীকে রক্ষা কর্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়ে সেই অগ্নিময় গৃহের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লে। একে বালিকা, তাহাতে আবার গৃহটী তখন একেবারে ধূমে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে; মহামায়া অর্দ্ধদগ্ধ বালকটীকে বুকে করে নিয়ে আর পথ দেখ্‌তে পেলে না, গৃহের মধ্য স্থানে বসে পড়্‌ল।

এতক্ষণের পর পাড়া প্রতিবাসীরা অগ্নিকাণ্ড দেখ্‌তে পেয়ে দৌড়াদৌড়ি এসে পড়্‌ল। দুই এক জন সাহসিক কৃষক অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে মহামায়া ও বালকটীকে বাহির করে আন্‌লে; বিমলাকে পাওয়া গেল না। "বিমলা কোথায়?—হায় হয়ত সবলা রমণী গৃহের মধ্যেই দগ্ধ হয়ে গেল।" সকলে তাঁর অন্বেষণে গেল; ক্ষুদ্র কুটিরখানি দাঁড়িয়ে পুড়ে গেল, কেহই সে অগ্নিকাণ্ড নির্ব্বাণ কর্‌তে পার্‌লে না—তেমন চেষ্টাও

করা হল না। গৃহ হতে বাহির করে আন্‌বার অর্দ্ধ ঘটা পরেই বালকটী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হল,,—তখনও মহামায়া তাকে স্নেহভরে বুকে করে! বিমলাকে পাওয়া গেল না—সকলেই স্থির নিশ্চয় কর্‌লে তিনি গৃহের সঙ্গে দগ্ধ হয়ে গিয়াছেন; বাস্তবিক তিনি দগ্ধ হন আর না হন, তখন একই কথা। কি হবে, যাহবার তা হয়ে গেল, আর অন্য উপায় নাই—প্রতিবাসীগণ সৎকার কর্‌বার জন্য মৃত বালকটী নিতে গেল। মহামায়া কোন-রূপেই ছাড়্‌বে না, তখন সে যেন কেমন একরূপ উন্মত্তের ন্যায় হয়ে গেল—মুখে বাক্য নাই, চক্ষে জল নাই, নয়নদ্বয় কেমন একরূপ বিকট ভাব ধারণ করলে,—সে কোনরূপেই মৃত সহোদরকে ছাড়্‌বে না, কার সাধ্য ছাড়িয়ে লয়। অবশেষে অনেক কষ্টে সকলে মৃত শিশুটী তার বুক থেকে কেড়ে নিলে।

কুসুমের নীরবে শিক্ষাদান।

হাস কুসুম! একবার প্রাণ ভরিয়া হাস! তোমার হাসির উচ্ছ্বাস দেখিতে বড় ভালবাসি। তোমার হসিতানন দৃষ্টে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা যেন মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া যাই; ভগ্ন হৃদয়ের দীর্ঘ নিশ্বাস,—নিরাশার মনস্তাপ যেন ক্ষণেকের তরে বিস্মৃত হই! তোমাকে দেখিলে প্রাণ যেন এক অভূতপূর্ব্ব নব বলে বলীয়ান হইয়া উঠে,—শোক তাপ-দগ্ধ মৃতপ্রায় হৃদয় যেন শান্তির অমৃতময় সঞ্জীবন সলিলে অবগাহন করিয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে।

শুভ্র কৌমুদী বসন পরিহিতা বাসন্তী যামিনীতে, পোড়া স্মৃতি যখন মানস-চক্ষের সম্মুখে অতীতের যাবদীয় সুখ-সম্ভোগের মোহিনী মূর্ত্তি, রঙ্গভূমির সুরঞ্জিত চিত্রপটের ন্যায়, একে একে দেখাইয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলে তখনই ছুটিয়া তোমার নিকট আসি; বিগত সৌভাগ্যের অপরূপ সৌন্দর্য্য,—বিমল স্বর্গীয় শোভা, মানসপটে উদিত হইয়া যখন আত্মহারা হইয়া উঠি,—বর্ত্তমানের ভয়ঙ্কর বৃশ্চিক দংশনে জীবন-ভার যখন দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হয়, তখনই দ্রুতপদে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, তোমার নিকট উপস্থিত হই। এমন দুঃসময়েও তোমার হাস্যোৎফুল্ল বদন মণ্ডল,—তোমার সেই সারল্যময়ী চারুমূর্ত্তি,—মৃদু সমীরণের সহিত তোমার সেই তালে তালে সুন্দর নৃত্য, হেরিয়া অন্তরের বিষাদ কালিমা,—মর্ম্মস্থানের ক্ষত যাতনা সমস্তই যেন ধীরে ধীরে অপনীত হইতে থাকে! শুনিতে পাই,—স্বর্গে নাকি অপ্সরাগণের নৃত্য হইয়া থাকে,—কখনও দেখি নাই, দেখিবও কি না সে বিষয়ে সন্দেহ; কিন্তু সে নৃত্যও তোমার এই তালমান সুসঙ্গত সুন্দর দোলনের নিকট অতি তুচ্ছ,—ইহা বেশ বুঝিয়াছি! তাহাদের নর্ত্তনে স্বার্থপরতা আছে, তাহারা অন্যের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত—প্রাণ

ভুলাইবার জন্য, নাচিয়া থাকে; কিন্তু তুমি তাহা কর না! তোমার নৃত্য নিস্বার্থময়,—তুমি আপন মনেই প্রতিদিন নাচিয়া থাক, কাহাকে তাহা দেখাইতে চাওনা, কিম্বা তোমার নিকট কেহ তাহা দেখিতেও চায় না! এমন নিস্বার্থভাব,—এরূপ সরলতা, আর কোথাও দেখিতে পাই না! জগতে ইহার উপমাস্থল অতি বিরল; বিরল কেন? নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পূর্ণচন্দ্রেও কলঙ্ক আছে, সুগন্ধি চন্দন তরুও উরগের বাসস্থল, জগৎপ্রাণ সমীরণেও বিশ্বধ্বংসকারিণী শক্তি আছে, বিশ্বজনীন জলদেও ভীষণ বজ্র থাকে, রমণীর সরল হৃদয়েও গরল দৃষ্ট হয়, নির্ম্মল শারদাকাশেও জলজ্জাল দেখা যায়, পবিত্র স্বর্গরাজ্যেও পাপমূর্ত্তি বারাঙ্গনা থাকে, সকলেতেই কলঙ্ক আছে! কিন্তু তুমি নিষ্কলঙ্ক! তুমি নিরুপম!!

অনেকেই বলিয়া থাকে তোমাতে কীট আছে। সুতরাং তুমিও কলঙ্কহীন নহ! আমি কিন্তু উহা তোমার কলঙ্ক মনে করি না ও কথা ভ্রান্ত মানবগণই বলিয়া থাকে।

আমি বলি উহা তোমার অতুলনীয় মহত্ত্ব! এ হেন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের আধার হইয়াও যে তুমি অতি কুৎসিৎ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটকেও ঘৃণা করিয়া দূর কর না, বরং সাদরে স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাক,—ইহা তোমার মহত্তা উদারতা ভিন্ন আর কি বলিব? এ জগতে এমন উচ্চহৃদয়তা,—এমন অমায়িকতা,—এমন অভেদজ্ঞান,—আর কোথায় আছে? তাই বলি তুমি নিষ্কলঙ্ক! তুমি নিরুপম!

তুমি সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থ! তোমার গুণগ্রাম অসামান্য, তোমার সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয়!

যাঁহার সৃষ্ট বস্তু এহেন সুষমার আধার,—এত গুণের আকর, না জানি, তাহার স্রষ্টা কেমন? না জানি, তিনি কত কৌশলময়,—কত গুণের নিদান! বলিতে পার,—কুসুম! সেই সর্ব্বনিয়ন্তা,—অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক,—তোমার এই অতুল শোভা,—অনুপম—কান্তির স্রষ্টাকে জানিব কেমনে? যাঁহার কৃপায় তুমি এত গুণের আধার, বলিতে পার কি তাঁহাকে জানিবার উপায় কি?

তুমি সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানাভিমানী দার্শনিক, তুমি আমার কথায় হাসিবে। তুমি বলিবে "ন বস্তুনো বস্তু সিদ্ধিঃ"—পূর্ব্বে কোন বস্তু না থাকিলে অন্য বস্তু উৎপন্ন হয় না; "ন সদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ" মনুষ্যের শৃঙ্গ থাকা যেরূপ অসম্ভব, তদ্রূপ অবস্তু হইতে কিছু উৎপন্ন হওয়াও অসম্ভব; কেননা "উপাদান নিয়মাৎ" অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুরই উপাদান কারণ এইরূপ নিয়ম আছে। সুতরাং তুমি বলিবে—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হয় না। তুমি প্রকৃতিকেই সৃষ্টির একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে! ফুল প্রকৃতি গুণে আপনা হইতেই ফুটিতেছে, তাহার স্রষ্টা কেহ নাই। এ সৌর-জগৎ পূর্ব্বেও ছিল, এখনও রহিয়াছে,—তবে কালধর্ম্মে এক প্রকৃতি বলেই, ইহার পূর্ব্বাকারের হয়ত রূপান্তর ঘটিয়াছে,—ঈশ্বর কিছু করেন নাই, বা করিতেছেন না। পৃথিবী প্রকৃতির নিয়ম বশেই আপন কক্ষমার্গে এইরূপ পরিভ্রমণ করিতেছে,—তাহার

পরিচালনা জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার নিষ্প্রয়োজন; চন্দ্র প্রকৃতিজ ইহার স্বচ্ছতা, ও তাহাতে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া স্নিগ্ধরশ্মিজাল উৎপন্ন হওয়ার গুণ তাহার স্বাভাবিক! তুমি ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব কিছুতেই স্বীকার করিবে না। তুমি বলিবে,—"পারম্পর্য্য প্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞা মাত্রম্"—অর্থাৎ "কারণের কারণ, ও সেই কারণের পুনরায় অন্য কারণ, কল্পনা করিলেও এক স্থানে গিয়া, সেই কারণের পর্য্যাবসান হয়। প্রকৃতি সেই মূল কারণের নাম বই আর কিছুই নয়. অর্থাৎ এক প্রকৃতিই সমস্ত জগতের কারণ! যে জীব-জগতের কারণ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে বসিলে তাহার কারণ ও প্রকৃতি"।

আমি স্থূল-বুদ্ধি-মানব তোমার এ সূক্ষ্মতত্ত্ব আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে অশক্ত আর সমর্থ হইলেও আমি তাহা বুঝিতে চাই না। আমি আমার মোটা বুঝ লইয়াই থাকিব, তাহাতে তুমি আমাকে অশিক্ষিতই বল,—আর নির্ব্বোধই মনে কর।

কিন্তু এক বিষয় বলিতে গিয়া অন্য দিকে আসিয়া পড়িয়াছি! কি যেন বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম,—কুসুম! তোমার শ্রষ্টাকে জানিতে পারিব কিরূপে?

তোমাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার তাৎপর্য্য আছে। তুমি অতি পবিত্র বস্তু, তুমি দেবতারও আদরের ধন! তোমাকে পাইলে দেবগণও তুষ্ট হন।

প্রচুর অর্থে যাঁহাকে সন্তুষ্ট করা যায় না, কিন্তু, কুসুম! তোমাকে পাইলে তিনিও তৃপ্ত হন! তুমি দেব বাঞ্ছনীয়, তুমি স্বর্গীয় পদার্থ!

তাই মনে করিয়াছি, আমার প্রশ্নের মিমাংসা তোমার দ্বারাই হইবে। তোমার নিকট স্বরূপ উত্তর পাইব।

কই! উত্তর দিলে না যে! তবে কি তোমার নিষ্কলঙ্ক নামে, কলঙ্ক স্পর্শিবে? না,—তাহা কখনই নহে।

আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সংসারের কৃমীকীট। নীচতা, কুটিলতায় আমার হৃদয় শঙ্কুচিত, পাপ প্রবণতায় আত্মা কলুষিত, সংসার চক্রের ভীষণ আবর্ত্তনে মস্তিষ্ক আলোড়িত, বিপর্য্যস্ত, তাই তোমার এই নীরবতার অর্থ এতক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম না তোমারই এই নিঃশব্দ ইঙ্গিতের মর্ম্ম সহসা আমার দুর্ব্বল অন্তরে স্থ ন পাইয়াছিল না।

"তুষ্ণীম্ভাবে হপি বিজ্ঞেয়ং" এই বাক্যের সার্থকতা এতক্ষণে বোধগম্য হইল; তোমার ঐ নীরবতার অর্থ এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম; তুমি নিঃশব্দে জগৎবাসীকে এই শিক্ষা দিতেছ যে, "তোমার ন্যায়, সরলতা, উদারতা, পবিত্রতা, অভেদ জ্ঞান প্রভৃতি গুণ যাহার হৃদয়ে স্থান পাইবে, সেই, এই জগন্নিয়ন্তা, তোমার স্রষ্টাকে, জানিতে পাইবে"।

একটা ঘটনা।

"Ye villains ! ye murderers !!
Lo ! God is overhead—"

P. C. ROME.

(১)

পঞ্জাবের মধ্যে বটালাও একটী নগর; তবে লাহোর বা অমৃতসরের মত সমতল নহে। বটালায় কোটাবাড়ী বিস্তর, ভদ্রলোক, মাতাল, শুঁড়ি, গুণ্ডা, বেশ্যা, চোর, জুয়ারী, গাঁটকাটার সংখ্যাও অল্প নহে, তা ছাড়া একটা না-মাছ না-বিষ্ণু গোছ থিয়েটারের দলও আছে। এক কথায় যাহা থাকিলে লোকে সহর বলে বটালায় তাহার কোন অভাব নাই,—আর কেন যে পোড়া লোকে ইহাকে 'সহর' বলে তাও ভাবিয়া পাই না।

যাহা হউক, এই সহরে, বা নগরে বা গ্রামে বা যেথানেই বলুন একজন শিখের কাঠের গোলা ছিল। লোকটীর নাম অনুপসিংহ। অনুপসিংহ ভক্তবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সোব্রাওঁ ক্ষেত্রে পিতা অসি হস্তে করিলেন। শিখের মৃত্যুর সঙ্গে রাজলক্ষ্মীরও মৃত্যু হইল, শিশু অনুপের তাহা হইল না। কাকা তাঁহাকে মানুষ করিলেন। কাকার মৃত্যুর পর অনুপসিংহ সমস্ত বিষয়ের মালিক হইলেন।

অনুপসিংহ বটালায় কাঠের ব্যবসা করিতেন;—থাকিতেন পাঁচ ক্রোশ দূরে। সংসারে তাঁহার স্ত্রী ও একটী বিধবা কন্যা ছাড়া কেহই ছিল না। ইহাদের লইয়া তিনি 'আপনার জায়গায়' থাকিতেন। তাঁহার জমীর এক পাশে এক মাটির পাহাড় ছিল, প্রায় ছয় তোলা উঁচু *; এই পাহাড়ের উপর অনুপসিংহ বাড়ী করিয়াছিলেন। গোলাতে দেড় লাখ টাকার মাল, কাহাকেও বিশ্বাস করা যায় না; কাজেই তাঁহাকে প্রত্যহই বটালায় যাইতে হইত,—এ জন্য তিনি একটা ভাল ঘোড়া রাখিয়াছিলেন। তখন পঞ্জাবে রেল চলিয়াছে।

অনুপ সিংহের গায়ে খুব বল ছিল; এমন কি আঙ্গুল দিয়া টাকা ভাঙ্গা ও মহিষের সিং বাঁকাইয়া ধরা তাঁহার 'ছেলে-ভুলান খেলা' ছিল। † এদিকে, তিনি অতি অমায়িক ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, এজন্য তাঁহাকে সকলেই ভালবাসিত,—শুধু একজন ছাড়া।

* পুকুর কাটা মাটির ঢিবি। পঞ্জাবে এরূপ বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটা ঢিবি এত উঁচু যে একটা ছোট খাট পাহাড় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশে যখন পুকুরের উঁচু পাড়কে 'পাহাড়' বলা যায়, তখন এরূপ উঁচু ঢিবিকে 'পাহাড়' বলা বোধ হয় অন্যায় হয় না। পঞ্জাবে ইহাকে 'আবা' বলে।

† মাঝার জাট শিখদের মধ্যে এরূপ জোয়ান আছে যাহারা একটা মহিষকে মাথায় করিয়া ৪ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যাইতে পারে। বাঙ্গলা ও বেহারের চারিটা মহিষ পঞ্জাবের একটার সমান।

(২)

সেই "'একজনের' নাম মতিসিংহ। মতিসিংহ অতি কুচরিত্র ছিল। মদ খাওয়া, চুরি করা, জুয়া খেলা তাহার দৈনিক কার্য্য, এজন্য তাহাকে কেহই দেখিতে পারিত না।

মতি সিংহের তিন পুত্র,—করম সিংহ, দুর্জ্জন সিংহ, ও লেহনা সিংহ। বড় শিকারপুরে ব্যবসা করিত, মেজ ছিল পল্টনে, ও সেজ লেহনা সিংহ পিতার সহিত বটালায় থাকিত। চরিত্র সম্বন্ধে পিতা পুত্রে অতি অল্পই প্রভেদ ছিল। একদিন মাঠে বেড়াইতে গিয়া লেহনা সিংহ অনুপ সিংহের কন্যাকে দেখিল। বিধবার প্রস্ফুট যৌবন দেখিয়া পাপীর মন টলিল; গৃহে আসিয়া পিতার নিকট সব কথা খুলিয়া বলিল। লেহনা পিতার বড় আদরের; পিতা প্রতিজ্ঞা করিলেন উঁহার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিবেন। শিখের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, এই ভরসায় মতিসিংহ অনুপের নিকট গিয়া উক্ত প্রস্তাব করিল। অনুপসিংহ তাহাকে—উত্তম মধ্যম দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিলেন।

তাহার কিছুদিন পরে মতিসিংহ অনুপের নিকট হাত জোড় করিয়া ক্ষমা চাহিল, অনুপ তাহার সহিত ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিলেন,—সব গোল মিটিয়া গেল।

(৩)

বটালা হইতে ফিরিতে অনুপের রাত হইত। ঐ ভয়ানক স্থান দিয়া, অত রাত্রে, অত টাকা লইয়া যাওয়া ভাল নয়, সকলেই বলিত; কিন্তু অনুপ তাহা হাসিয়া উড়াইতেন; দুই বাহু বর্ত্তমান থাকিতে শিখ যে কিরূপে ভয় পায়, তিনি তাহা ভাবিয়া পাইতেন না। বলিতে ভুলিয়াছি, অনুপের আর একটি রোগ ছিল; তিনি আসিবার কালে প্রত্যহই একবার 'মামার বাড়ী' হইয়া আসিতেন। মামার 'লাল শরবত বড় মিষ্ট' ইহা নাকি তিনি বন্ধুদের নিকট যখন তখন বলিতেন। ইহা ছাড়া তাঁহার অন্য কোন রোগ ছিল না।

একদিন ১১ টার পরেও অনুপ বাড়ী আসিলেন না,—সকলে চিন্তিত হইল। কৃষ্ণ পক্ষ; ঘোর অন্ধকার। ২ টার পর দিগন্তে এক টুক্‌রা চাঁদ উঠিল, অনুপ আসিলেন না। চাকরেরা পাহাড়ের নীচে আসিয়া আড্ডা জমাইল।

পাহাড়ের দক্ষিণে আধ মাইল দূরে একটা ছোট্ গ্রাম ছাড়া দশ মাইলের মধ্যে কোন গ্রাম নাই; যতদূর দৃষ্টি যায় মাঠের অনন্ত বিস্তার,—দূরে—আকাশ ও মাঠের মিলন-স্থানে গাছের ধুসর রেখা;—সেই ক্ষীণ রেখার মাথায় এক টুক্‌রা চাঁদ জ্বলিতেছিল। চাঁদের আলো ক্ষীণ—সব মাঠকে আলোকিত করিতে পারে নাই। সে আলোকে শুধু আঁধার বাড়িয়াছে!

তত রাত্রেও অনুপ আসিলেন না; চাকরেরা পাহাড়ের নীচে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

(৪)

সহসা পাহাড়ের মাথায় দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল! সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের পশ্চাতে হুটোপাটির শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে—লোক জনের ছুটাছুটি,—দেখিতে দেখিতে চারিদিকে কি একটা ঘোর অশান্তি জাগিয়া উঠিল!

গ্রাম হইতে সাহায্যার্থ লোক জন আসিল; কিন্তু তাহারা কিছুই করিতে পারিল না। জল আনিতে, লোক ডাকিতে, পাহাড়ে উঠিতে, চীৎকার করিতে বাড়ী পুড়িয়া কয়লা হইল! কাঠের বাড়ী কতক্ষণ থাকিবে? কে আগুন দিল, কিরূপেই বা দিল কেহই বুঝিতে পারিল না; বৃথা গণ্ডগোল করিতে করিতে উপরে উঠিল। পাহাড়ের জলন্ত বুকে চাঁদের ম্লান জ্যোতি ভীষণতার ছবি আঁকিতেছিল; তাহারা বেগে ভিতরে প্রবেশ করিল, দেখিল—কিছুই নাই; যাহা ছিল পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে!—স্ত্রীলোকেরা কোথায়? ভৃত্যগণের মুখ শুকাইল; তাহারা এদিক, ওদিক, চারিদিক খুঁজিতে লাগিল। একস্থানে একটা আধপোড়া শরীর পাইল, চিনিল—অনুপসিংহের স্ত্রী, দেখিল—প্রাণ নাই! সকলে বসিয়া পড়িল। কর্ত্তা আসিলেই বা কি বলিবেন? কন্যাই বা কোথায়? সকলে আবার উঠিল—অনেক খুঁজিল, কোথাও কন্যাকে পাইল না! খুঁজিতে খুঁজিতে একবার পাহাড়ের পশ্চাতে গেল। পাহাড়ের নীচেই এক গভীর খাল। সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক চারিদিক দেখিতে লাগিল। পাহাড়ের উপর হইতে খাল পর্য্যন্ত দেখিল, অনেকগুলি পায়ের দাগ;—কোথাও গাছ পালার ডাল ভাঙ্গা, কোথাও ঘাস উপড়ান, লতা মাড়ান, আবার কোথাও বা মাটি ভাঙ্গিয়া, চাওড় খসিয়া এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে;—দেখিলেই বোধ হয় যেন ঐ স্থানে একটা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে—যেন অনেকগুলি লোক মিলিয়া হুটোপাটি, ঝটাপটি করিয়াছে!!

তাহারা ঐ সব চিহ্ন ধরিয়া খালে নামিল। খালে যত পাঁক ছিল তত জল ছিল না; নামিবামাত্র দেখিল, সম্মুখে এক মৃতদেহ। ধরাধরি করিয়া তীরে উঠাইল, দেখিল—কি দেখিল?—সর্দ্দার অনুপ সিংহ!! সেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকে অনুপ সিংহের মুখ বড়ই ভীষণ দেখাইতেছিল!!! সকলে ভীত—স্তম্ভিত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—কি করিবে, কি—বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, এমন সময়ে পুলীষ আসিয়া উপস্থিত হইল। আগুন লাগিবামাত্র একজন গিয়া বটালার থানায় খবর দিয়াছিল।

আট জন সিপাহী লইয়া ইন্সপেক্টার সাহেব স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ভোর হইয়াছে,—জ্যোৎস্না মলিন হইয়াছে, দিগন্তে উষার আরক্তিম-ছটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুই একটা কাক কা কা করিয়া মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল—যেন জগতের কোন গুপ্ত কথা বলিয়া গেল। সে কথা বুঝিল শুধু দুই চারি জন—যাহারা সেই নিশীথের ভীষণ ঘটনা দেখিয়াছিল!

ইন্সপেক্টার সাহেব আসিয়া অনেক প্রশ্ন করিলেন, লাস পরীক্ষা করিলেন, দেখিলেন শরীরের স্থানে স্থানে লাঠির দাগ। মাথা দেখিলেন, দেখিলেন মাথা ফাটিয়া মস্তিষ্ক বাহির হইয়া গিয়াছে, বুঝিলেন—এই শেষ আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কেই বা খুন করিল; কিরূপেই বা করিল, অনুপসিংহই বা তত রাত্র পর্য্যন্ত কোথায় ছিলেন, কি করিতেছিলেন, পাহাড়ের পশ্চাতেই বা আসিলেন কেন, ঘরে আগুনই বা লাগিল কেন, কন্যাই বা গেল কোথায়—

ইন্সপেক্টর সাহেব ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; সমস্তটা তাঁহার একটা রহস্য বলিয়া বোধ হইল। খালের ধার হইতে পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি এই মাত্র বুঝিলেন যে নৃশংসেরা অনুপসিংহকে সহজে মারিতে পারে নাই!

(৫)

বলা বাহুল্য, পুলীষ-পুঙ্গবের অনুসন্ধানে কোন ফল হইল না। ইন্সপেক্টার সাহেব উতলা হইয়া, বা হাল ছাড়িয়া, 'ইস্তেহার' দিলেন—"যে কেহ অত্যাচারী বা অত্যাচারিগণকে ধরিয়া দিবে বা তাহাদের সন্ধান বলিয়া দিবে, ৫০০ টাকা পুরস্কার পাইবে।"

অনেকে ভার লইল। কেহ বা পাহাড় পর্য্যন্ত 'অনুসন্ধান' করিল কেহ বা ততটা আবশ্যক বিবেচনা না করিয়া এক ছিলিম তামাক টানিয়া, একটু মুরব্বিআনা ভাবে স্ত্রীকে বলিল "ও সব যার তার কাজ নয়"; আবার কেহ বা সেটাও অনাবশ্যক ভাবিয়া একটু হাসিয়া দিল।

যাহা হউক, অবশেষে একজন শিখ জুটিল। সাহেব বলিল "তোমার নাম কি?"

"শের সিংহ।"

"তোমার বয়স অল্প; তুমি এই কার্য্য করিতে পারিবে?

"বোধ হয় পারিব। আপনি আমার সঙ্গে লোক দিয়া ঘটনা-স্থল দেখাইয়া দিন।"

ইন্সপেক্টার সাহেব স্বয়ং গেলেন। সব দেখাইলেন, সব বলিলেন; দেখিয়া শুনিয়া শের সিংহের মুখ গম্ভীর হইল,—গম্ভীর ভাবেই নিকটস্থ গ্রামের একজন ভদ্র লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন "অনুপ সিংহের কন্যাকে আপনি দেখিয়াছেন?"

"আজ্ঞা হাঁ, তিনি আমাদের গ্রামে প্রায় যাইতেন।"

"তাঁহার চরিত্র কেমন ছিল?"

"অতি সৎ।"

"তিনি আর কোথাও যাইতেন?"

"কোথাও না, দশ মাইলের মধ্যে আর গ্রাম নাই।"

শেরসিংহ আর কিছু না বলিয়া পাহাড়ের পিছনে গেলেন, উপর হইতে খাল পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া একটু হাসিলেন। সাহেব বলিলেন—"কি দেখিলে?"

"ভিন্ন ভিন্ন চারি রকমের পায়ের দাগ। অনুপসিংহকে লইয়া চারিজন সম্ভবতঃ তিন জন লোক অনুপসিংহকে খুন করিয়াছে। এক জনের পায়ে বোধ হয় ইংরাজী জুতা ছিল, সম্ভবতঃ পল্টনের। এই দেখুন—

সাহেব দেখিলেন, মনে মনে শেরসিংহকে ধন্যবাদ দিয়া দেখিলেন—জুতার দাগ গভীর। দাগের গড়নে বুঝিলেন এ জুতা পল্টনের। সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিলেন "A brain-puzzling miz-maze!"

শেরসিংহ ভদ্র সন্তান, ইংরাজীও অল্প বিস্তর জানিতেন, সাহেবের কথা বুঝিয়া বলিলেন "পায়ের দাগে চোর ধরাই আমাদের কাজ, * কিন্তু এবার তাহা

* পঞ্জাবের, বিশেষতঃ ফিরোজপুর জেলার Trackers নামজাদা। পায়ের দাগ দেখিয়া

দুষ্কর। দেখুন খালের ধার হইতে আর পায়ের দাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই যে টালি * গাছের সারি দেখিতেছেন, সম্ভবতঃ উহারই উপর দিয়া উহারা ঐ ঘাসের ক্ষেতে পড়িয়াছে। ঘাসের উপর পায়ের দাগ ধরা মুস্কিল। বিশেষতঃ উহারা যদি জুতা খুলিয়া গিয়া থাকে। যাহা হউক, প্রথমে অন্য চেষ্টা করিয়া দেখা যা'ক, পরে যাহা উচিত হয় করিব।"

এই বলিয়া শেরসিংহ উপরে উঠিলেন, সাহেব নীচে দাঁড়াইয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে শের ফিরিলেন। শেরের মুখ হাসি হাসি, সাহেব অন্যমনস্কভাবে বলিলেন "A mystery to be sure!"

শেরসিংহ বলিলেন—"Mystery নয় সাহেব clue পাইয়াছি।"

সাহেবের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল; বলিলেন—"কৈ—কৈ?"

শেরসিংহ সাহেবের হাতে একটী বোদাম দিলেন। সাহেব বলিলেন "এ যে পল্টনের বোদাম। এই ভীষণ কাণ্ডের মধ্যে যে এক জন সিপাহী লিপ্ত আছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কত সিপাহী আছে, কাহাকে ধরিবেই সে হয়তো এতদিন নুতন বোদাম লাগাইয়াছে। সব বোদাম দেখিতে এক প্রকার, শুধু এই বোদামটির সাহায্যে খুনী ধরা অসম্ভব।"

"অসম্ভব কি সম্ভব পরে দেখিবেন।" এই বলিয়া শেরসিংহ বিদায় লইলেন। সাহেবও নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন।

(৬)

শেরসিংহ বোদামটী লইয়া বটালায় আসিলেন। প্রথমে গেলেন অনুপসিংহের গোলাতে। দুই চারি জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তিনি প্রত্যহই সন্ধ্যার সময়ে হরিসিংহ চৌলার মদের দোকান হইয়া বাড়ী যাইতেন।

সেই দিন শেরসিংহ খুব জাঁকজমকের সহিত হরিসিংহের দোকানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আরবী ঘোড়া, ঘড়ির চেন ও ডবল পাগড়ি দেখিয়া হরিসিংহ ঝুঁকিয়া সেলাম করিল, বোধ হয় ভাবিল কোন সিন্ধালওয়ালিয়া সর্দ্দার। শেরসিংহ দশটাকার স্থলে কুড়ি টাকা দিয়া নিজের খাতির কিনিলেন, হরিসিংহ ভাবিল, শিকার মন্দ নহে।

চারি পাঁচ দিন যাতায়াতের পর শেরসিংহের সহিত হরিসিংহের খুব ঘনিষ্টতা বাড়িয়া গেল, হরিসিংহ মনের ভিতর জ্যোৎস্না দেখিল।

একদিন সন্ধ্যার পরে গিয়া শেরসিংহ দেখিলেন যে ঐ স্থানে আর দুইটী লোক বসিয়া আছে। দুই জনের মুখের ছাঁচ দেখিয়া বুঝিলেন—পিতা পুত্র, কিন্তু মুখের ভাব এত মলিন যে, দেখিলেই বোধ হয় যেন উহাদের আত্মীয় পরিজন যে যেখানে ছিল, এইমাত্র মরিয়া গিয়াছে।

শেরসিংহকে দেখিবামাত্র উহাদের মুখের ভাব ফিরিল,—কিন্তু চোখের ভাব ফিরিল না। তাহারা উঠিয়া শেরসিংহকে অভ্যর্থনা করিল। তাহার পর কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। পরিচয়ে শেরসিংহ

ইহারা এরূপে চোর ধরে যে, শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সে দাগ ডিটেকটিভের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইবে কিন্তু Trackerএর দৃষ্টি এড়াইবে না। এ সব কথা পড়িতে বড় মজার পরে লিখিব।

* শীসম।

জানিলেন, পিতার নাম মতিসিংহ ও পুত্রের নাম লেহনাসিংহ। পাঠক পাঠিকা বুঝিয়াছেন। ইহারা কাহারা? মতিসিংহ ও অনুপসিংহের তুচ্ছ বিবাদের কথা শেরসিংহ জানিতেন। কিন্তু এই সামান্য ঘটনার ফল যে সেই লোমহর্ষক ভীষণ কাণ্ড সেটা অসম্ভব। শেরসিংহের মনে সে সন্দেহ স্থান পাইল না। তিনি কথায় কথায় তাহাদের দুঃখিত ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, জানিলেন, মতিসিংহের এক পুত্র মিশর যাইবে বলিয়া তাহাদের এরূপ ভাব হইয়াছে। কথায় কথায় আরও জানিলেন যে, এই পুত্র পূর্ব্বে পল্টনের সিপাহী ছিল, এখন চাকুরী ছাড়িয়া মিসর যাইতেছে।

এই কথায় শেরসিংহের সন্দেহ বাড়িল। হইতে পারে মতিসিংহ সেই ঘটনা ভুলে নাই, হইতে পারে অভিহিত মতিসিংহ আপনাকে অপমানিত ভাবিয়া তাহার প্রতিশোধ লইয়াছে। কিন্তু কি ভয়ানক প্রতিশোধ!!! ঠিক সেই সময়ে সেই জুতার দাগ ও বোতামের কথা তাঁহার স্মরণ হইল, আবার এদিকে মতির মিসরযাত্রী পুত্রও সিপাহী,—শেরসিংহের সন্দেহ দৃঢ় হইল। সেদিন আর কিছু না বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

(৭)

পরদিন আসিয়া দেখিলেন, লেহনা সিংহ একেলা আসিয়াছে। শেরসিংহ ভাবিলেন—ভাল। লেহনা সিংহ অল্প বয়স্ক, কুচরিত্র; শেরসিংহ এই কণ্টক দ্বারাই কাটকোদ্ধারের চেষ্টা দেখিলেন। কিন্তু দুই চারি কথায় জানিয়া লইলেন —লেহনা 'পাকা'। বুঝিলেন এ'রূপে হইবে না; 'রস' চাই; রস না দিলে লেহনা গলিবে না। তিনি নিজের পয়সায় লেহনাকে দোকানের সেরা মাল খাওয়াইলেন, নিজের পয়সায় বাজারের সেরা মিঠাই খাওয়াইলেন। এক কথায় একবারে মিশিয়া গেলেন। কথায় কথায় জানিলেন তাহার মিসরযাত্রী ভাইয়ের নাম * দুর্জ্জন সিংহ; সে আজ এখানে আসিবে। শেরসিংহের দুর্জ্জন সিংহকে দেখিবার বড় সাধ হইল, কৌতুহল বাড়িয়া গেল—সোৎসুক চিত্তে দুর্জ্জনসিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দুর্জ্জন সিংহ আসিল। নামও দুর্জ্জন, দেখিতেও দুর্জ্জন। শিখ সৈনিক সচরাচর যেরূপ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ হয়, দুর্জ্জন তাহা অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ,—সাত ফিট্ লম্বা ও তিন ফিট্ চৌড়া। † শের সিংহ বলিলেন "তোফা জোয়ান্।"

---

* শিখেরা পিতা, পুত্র, ভ্রাতা সকলে মিলিয়া সুরা পানাদি করিয়া থাকে। ইহাদের মতে, কোন কাজ 'লুকাইয়া' করা—পাপ, প্রকাশ্যে পাপ নাই। কথাও ঠিক্।

† মাঝাব জাট শিখেরা প্রায় সকলেই ৬ ফিট্ ৬॥ ফিট্ উঁচু। তা ছাড়া আমি ৭ ফিট্, ৭ ফিট্, ৪ ইঞ্চি অনেক দেখিয়াছি। আসল জোয়ানেরা ইংরাজের চাকুরী করে না, যাহাদের রুটী জোটে না তাহারাই করে। তবু এই শিখ সৈনিক দেখিয়াই সকলে আশ্চর্য্য হয়। আসল জোয়ানদের ইংরাজেরা হং কং, রক্ষা বা সীমান্তে রাখিয়াছেন। ৩৪ নং শিখ পদাতিককে Pioneer giants বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল। জুবিলীর সময়ে যখন দড়ি টানাটানি বা 'Tug of war হয় তখন ইংরাজ, পাঠান, গুর্খা, রাজড়, সকলকেই শিখ জিতিয়াছিল। পাঁচজন গোরাকে এক জন জাট ৪০ হাত টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

দুর্জ্জন সিংহ সেলাম করিয়া বলিল "পিতার নিকট মহাশয়ের নাম শুনিয়াছিলাম, সাক্ষাৎ লাভে আনন্দিত হইলাম।"

শের সিংহ তাঁহাকে যথোচিত সাদর সম্ভাষণ করিয়া বসাইলেন। দুর্জ্জন সিংহ তখন সিপাহীর পোষাক পরিয়াছিল,—শের সিংহ তাহার আপদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বোদামগুলি অনেকক্ষণ ঠাওর করিয়া দেখিলেন; দেখিলেন সব বোদাম ঠিক্ আছে, তবে কিছু বেশী চক্‌চকে। ভাবিলেন—যদি বোদাম বদ্‌লাইয়া থাকে তবে সব মাটি! এদিকে ইহারাই যে খুনী এবং এই ব্যক্তিও যে খুনীর মধ্যে একজন, ইহাতে তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না। প্রথম সাক্ষ্য—মতি ও মোহনার মলিন ভাব, যেন কেমন একটা আশঙ্কার ছায়া মুখে পড়িয়াছে। দ্বিতীয়, ঘটনা-স্থানে তিন জনের পায়ের দাগ ও সিপাহীর বোদাম।—তৃতীয়, এই সিপাহীর হঠাৎ মিলন-যাত্রা।—চতুর্থ, সিপাহী বলিতেছে, চাকুরী ছাড়িয়াছি।' চাকুরী ছাড়িল তো পোষাক কেন? এই ব্যক্তি নিশ্চয় পলাইতেছে। যাহা হউক, খুনী ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু সাবুদ নাই। সাবুদ চাই, কিন্তু পাই কিরূপে?—

শের সিংহ—এইরূপ ভাবিতেছিলেন এমন সময়ে মতি সিংহ আসিয়া জুটিল; দোকানীও আসিয়া আড্ডা জমাইল; ক্রমে স্থানটী একটী রীতিমত আড্ডার রূপ ধারণ করিল।

শের সিংহ সময় বুঝিয়া, অনুপ সিংহের কথা তুলিলেন, বলিলেন "সে রাত্রের ঘটনা কি ভয়ানক! লোকটা এত জোয়ান, চিড়িয়ার মত মারা গেল—বাপ!"

সকলে শিহরিয়া উঠিল; দোকানী বলিল "লোকটাকে মদে খাইয়াছিল।"

শের সিংহ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মতি সিংহের দিকে—ফিরিয়া বলিলেন "আপনি অনুপ সিংহকে দেখিয়াছেন?"

মতিসিংহের মুখের ভাব কি যেন কেমন হইয়া গেল; তখনি হাসিয়া, সেই ভাবটা চাপিয়া যেন একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিল "আজ্ঞা হাঁ, তিনি আমার বন্ধু ছিলেন।"

শের সিংহ ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে হরি সিংহের চৌলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "শুনিয়াছি আপনার দোকানে তিনি প্রত্যহই আসিতেন। ঘটনার দিনেও কি আসিয়াছিলেন?"

আজ্ঞা হাঁ।"

"কত রাত্রে গেলেন?"

"প্রায় তিন্‌টা।"

"তিন্‌টা?" শের সিংহের মন যেন একটু ফরসা হইল; বলিলেন "এত রাত্র পর্য্যন্ত কি করিতেছিলেন?"

দোকানী শের সিংহের এত টাকা খাইয়াছিল যে, কথার উত্তর না দেওয়াটা ভাল বিবেচনা করিল না; বলিল "সে অনেক কথা মহাশয়। আজ যাঁহারা বসিয়া আছেন ইহারা সকলেই সে দিন ছিলেন। অনুপসিংহ আসিলে সর্দার মতিসিংহ তাঁহাকে এক গ্লাস রম্

লাহোরের কেল্লায় একজন হাইল্যাণ্ডার গোরার সহিত একজন শিখ বাজি রাখিয়াছিল। শিখ উপুড় হইয়া শুইয়া গোরাকে চিৎ করিতে বলে, কিন্তু গোরা নাড়িতে পারে নাই।

দিলেন ; কিন্তু অনুপসিংহ খাইতে অস্বীকার করিলেন, বলিলেন "আমি আজ সিদ্ধি খাইয়াছি, রম্ খাইব না, শুধু এক গেলাস ঠাণ্ডা শরবত দিন।" শরবত প্রস্তুত ছিল, দিলাম। রাত্রি প্রায় ১১ টার সময়ে অনুপসিংহ বাড়ী যাইবার জন্য উঠিলেন, কিন্তু উঠিয়াই আবার বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন "আমার বড় নেশা হইয়াছে বোধ হয় এখন যাইতে পারিব না, ভিতরে জিব টানিতেছে, শয্যা প্রস্তুত করুন, একটু আরাম কবিয়া যাইব।" শয্যা প্রস্তুত হইল, কিন্তু শয়ন করিয়া তিনি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, এত নেশা যে তিনি সামলাইতে পারিতেছেন না। আমি মদ দিতে গেলাম কারণ ভাঙের ঔষধ মদ, কিন্তু সর্দ্দার মতিসিংহ বলিলেন "ইহাতে উল্টা গুণ করিবে। আমি ঔষধ আনাইতে পাঠাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি সর্দ্দার দুর্জ্জনসিংহকে পাঠাইলেন।

শেরসিংহ বাধা দিয়া বলিলেন "সে ঔষধ কোথায় পাওয়া যায় ?"

হরিসিংহ দুর্জ্জনসিংহের দিকে চাহিল। দুর্জ্জন কিছু ইতস্তত করিয়া বলিল "সর্দ্দার অনুপসিংহের বাড়ীর আধ মাইল দক্ষিণে যে গ্রাম আছে, সেই গ্রামে।"

শের। তাহার পর ?

হরিসিংহ বলিল "তাহার পর রাত্রি আড়াইটা বা তিনটার সময়ে অনুপসিংহ আপনি সারিয়া গেলেন ; আমাদের জেদ্ ও বারণ সত্ত্বেও তিনি সেই তত রাত্রে একলা বাড়ী গেলেন। তাহার পর যাহা হয় তাহা আপনিও যা জানেন আমিও তাই জানি।"

হরিসিংহের কথা শেষ হইতে না হইতে দুর্জ্জন, মতি ও লেহনা উঠিয়া সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। শেরসিংহ তাহাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইলেন না, কিন্তু এই ব্যবহারে তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়তর হইল।

(৮)

সেই রাত্রেই তিনি "ভাঙের ঔষধের" গ্রামের দিকে যাত্রা করিলেন—যদি কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন।

রাত্রি প্রায় ১১ টার সময়ে গ্রামে পৌছিলেন। গ্রামটী ছোট। ছোট বটে তাহাতেই সব আছে। তিন হাত চৌড়া পাঁচ হাত লম্বা বাজার আছে ; বাজারে ছোলাভাজা হইতে এমন কি গুড় পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

শেরসিংহ যখন পৌছিলেন তখন গ্রাম অন্ধকার। রাত্রি ১১ টার সময়ে বটালার আলোই প্রায় নিবিয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে শেরসিংহের গায়ে কোতয়ালের পোষাক ছিল। গ্রামের প্রহরী আকাশের তারা গুণিতেছিল বোধ হয় কোন নূতন আবিষ্কার করিয়া জগতের কোন উপকারের চেষ্টায় ছিল, কিন্তু পোড়া জগতের তাহা সহিবে কেন ? রুলের গুঁতোয় ঘুম ভাঙিয়া প্রহরী দেখিল—সম্মুখেই কোতোয়াল! বলা বাহুল্য, কোতোয়াল শেরসিংহ। প্রহরী গেঙাইয়া, ভেঙাইয়া, লাফাইয়া, হাঁপাইয়া এক সেলাম ঠুকিল। শেরসিংহ অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিলেন "আমি অমৃতসরের কোতোয়াল, এখানে কোন কারণবশতঃ নূতন আসিয়াছি। তোমার কার্য্য দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক, এবার মাফ করিলাম, ভবিষ্যতে

সতর্ক থাকিও। তুমি এখানে কতকাল আছ?"

প্রহরীর ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। এক লম্বা সেলাম ঠুকিয়া বলিল "হুজুর! প্রায় দুই বৎসর।"

"যে রাত্রে অনুপসিংহের বাড়ীতে আগুন লাগে ও অনুপসিংহ মারা যায় সে রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?"

"হুজুর, এই গ্রামেই।"

"সাহায্যে যাও নাই?"

"যাইতে পারি নাই। গ্রামের অন্যান্য লোক গিয়াছিল।"

"কেন যাইতে পার নাই?"

একজন সিপাহী আমাকে জখম করিয়া গিয়াছিল।"

সিপাহীর নাম শুনিয়া শেরসিংহ চমকিয়া উঠিলেন; হৃদয়ে একটা নূতন আশার সঞ্চার হইল, বলিলেন "আগাগোড়া খুলিয়া বল।"

প্রহরী বলিল—"সেই রাত্রে এই গ্রামে একটী বিবাহ ছিল, কাজেই সকলে জাগিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছিল। রাত্রি ১টার পর একজন পল্টনের সিপাহী আসিয়া জল চাহিল। সিপাহী শিখ—দেখিতে খুব জোয়ান, গায়ে পল্টনের পোষাক ছিল। একজন গ্রামবাসী তাহাকে জল দিল। সে জল খাইয়া চলিয়া যাইতেছিল এমন সময়ে তাহার পকেট হইতে একটা মদের বোতল পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। এই কাণ্ড দেখিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সিপাহী ইহাতে আপনাকে অপমানিত ভাবিয়া লাঠি দ্বারা সকলকে আক্রমণ করিল। তাহারাও ছাড়িয়া কথা কহিল না, কিন্তু সিপাহী বড় জোয়ান ও সাহসী ছিল—হটিল না। তাহার লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে অনেক গ্রামবাসী ভূমিশায়ী হইল। অবশেষে আমি গেলাম। প্রায় পাঁচ মিনিট তাহার সহিত যুদ্ধ করিলাম বটে, কিন্তু সে আমাকে তুলিয়া নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিল—আমি অজ্ঞান হইলাম। তাহার পর কিছু জানি না। যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম ভোর হইয়াছে, শুনিলাম অনুপসিংহের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।"

শেরসিংহ যেন এতক্ষণে আলোক দেখিলেন, বলিলেন সেই সিপাহীকে, দেখিলে এখন তুমি চিনিতে পার?"

"বোধ হয় পারি।"

"কাল ঠিক সন্ধ্যার সময় তুমি বটালায় থানায় আসিও। তোমার স্থানে অন্য লোক পাঠাইব।

প্রহরী সেলাম করিয়া বলিল "আমি হুজুরের গোলাম।"

শেরসিংহ বটালায় ফিরিলেন। বলা বাহুল্য, তখন তাঁহার মনে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে।

(৯)

পরদিন সন্ধ্যার সময়ে প্রহরীকে লইয়া শের সিংহ হরি সিংহের আড্ডায় উপস্থিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন দুর্জ্জন সিংহও আসিয়াছিল। প্রহরী দেখিয়াই চিনিল—সেই সিপাহী। বলা বাহুল্য দুর্জ্জন প্রহরীকে চিনিতে পারে নাই—প্রহরীর পুলীসের পোষাক ছিল না।

আর কোন সন্দেহ রহিল না, শুধু সাবুদ দেখাইয়া গ্রেপ্তার করিতে পারিলেই হয়।

প্রহরীকে বিদায় দিয়া শের সিংহ দুর্জ্জনের নিকট আসিয়া বসিলেন। হরি

সিংহকে বলিলেন—"এন্‌কোর হুইস্কী।" অবিলম্বে তাহা সম্মুখে হাজির হইল। শের সিংহ দুর্জ্জনকে ইহার সদ্ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিলেন; দুর্জ্জন বিনা আপত্তিতে তাঁহার কথা—রাখিলেন,—সশব্দে 'হুইস্কি' দেবীর পূজা চলিতে লাগিল।

যখন দুইহাত ফিরিয়া গেল, শের সিংহ বলিলেন "আপনি চলিলেন, আপনার সহিত আমার বেশ মন মিলিয়া গিয়াছিল! আপনার কি মিসরে কোন কাজ আছে?"

দুর্জ্জনের চোখে তখন 'লালি' খেলিয়াছে। দুর্জ্জন বলিল "আজ্ঞা হাঁ, আমার মামা খেদিবের একজন শরীররক্ষক। মামা এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, কাজেই আমাকে সেই কার্য্যে বাহাল করিবার জন্য ডাকিয়াছেন। আমি দেখিতেছি এখানকার চেয়ে সেখানে লাভ বেশী—।"

শের সিংহ মনে মনে হাসিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন "ঠিক্‌, আপনার এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। আপনি কবে রওনা হইবেন?"

শের সিংহের উপর দুর্জ্জনের আদপেই সন্দেহ—ছিল না। সে ভাবিয়াছিল শের সিংহ কোন ধনী সর্দ্দার; এখন তাহার বন্ধু বা এক গ্লাসের ইয়ার। সুতরাং না ভাঁড়াইয়া বলিল "কাল রাত্রের গাড়ীতে রওনা হইব, সোমবার নাগা'দ বোম্বাই পৌঁছিব। শুক্রবারে বোম্বাই হইতে মিসর যাত্রা করিব। বোম্বাইয়ে তিন দিন থাকিব।"

তাহার পর শের সিংহ অধিক কথা কহিলেন না। এক হাত ফির'ইয়া বিদায় লইলেন; বলিলেন "আজ শরীর বড় অসুস্থ। বোধ হয় আমাকেও দুই এক দিনের মধ্যে বোম্বাই যাইতে হইবে। সেখানে আমার ভগিনীর বড় অসুখ। সেখানেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

দুর্জ্জন সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইল না, ভাবিল "বোম্বাইয়ে শালার নিকট হইতে কিছু—হাতাইব।"

দুর্জ্জন—সাবধান!

(১০)

সেই রাত্রেই শের সিংহ বোম্বাই যাত্রা করিলেন। ইংরাজের কৃপায় দুর্জ্জনের পৌঁছিবার একদিন আগেই বোম্বাই পৌঁছিলেন। থানায় গিয়া বটালার পুলিষ ইন্সপেক্টারের পত্র দেখাইয়া ৪ জন গোরা ও ৫ জন দেশী সিপাহী লইলেন। শের সিংহ জানিতেন আট জনের কমে দুর্জ্জনকে গ্রেপ্তার করা অসম্ভব।

শুক্রবার আসিল। শের সিংহ ভিতরে পুলীষের পোষাক ও উপরে সামান্য লোকের পোষাক পরিলেন; পুলীষের লোকেদেরও তাহাই করাইলেন। যে জাহাজে দুর্জ্জনমিসর যাইবে সেই জাহাজের কাপ্তেনকে গিয়া বলিলেন "আপনার জাহাজে আজ একজন খুনী আসিবে। আমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিব, বোধ হয় ইহাতে আপনার কোন আপত্তি নাই।"

কাপ্তেন সাহেব ঘোর আপত্তি তুলিলেন; কিন্তু ইন্সপেক্টারের পত্র ও পুলীষের পোষাক দেখিবামাত্র দমিয়া গেলেন, এমন কি সাধ্যমত সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন।

তাহার পর শের সিংহ অনুচরগণকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "তোমরা এক স্থানে না থাকিয়া এ'দিক ওদিক ছড়াইয়া থাকিবে। আমার ইসারা পাইলে ডেকের এক কোনে কেরোসিন তেল ঢালিয়া আগুন লাগাইয়া দিবে। কিন্তু সাবধান! যেন জাহাজের কোন অনিষ্ট না হয়। আগুন লাগাইয়া তোমরা খুব হল্লা করিও! যখন সকলে আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিবে তোমরা গোলেমালে আরও কেরোসিন ঢালিবে। কিন্তু আমি বাঁশি বাজালেই চলিয়া আসিও।"

আট জনে আট দিকে চলিয়া গেল। জাহাজ ছাড়িতে এখনো দুই ঘণ্টা বাকী এমন সময়ে দুর্জ্জন সিংহ আসিয়া জাহাজে উঠিল, দুর্জ্জনের গায়ে তখন সিপাহীর পোষাক ছিল না; বোধ হয় ব্যাগে ছিল, কারণ ব্যাগের ফাঁক হইতে কি একটা রাঙ্গা রাঙ্গা দেখা যাইতেছিল। শের সিংহ নিজের পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন বোদামটী আছে,—অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। দুর্জ্জন হঠাৎ সম্মুখে শেরকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল অভিবাদন করিয়া বলিল "আপনি তাহা হইলে সত্য সত্যই আসিয়াছেন?"

শের সিংহ প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলেন "না আসিয়া কি করি? ভগ্নীর মুমূর্ষু অবস্থা। আপনি যাইতেছেন, আবার কতদিনে দেখা হইবে, তা'ই আজ দেখা করিতে—আসিয়াছি।"

দুর্জ্জন সেলাম করিয়া বলিল "আমার সৌভাগ্য।"

তাহার পর অন্যান্য কথা হইতে লাগিল। এই সময়ে শের সিংহের চারি জন গোরার মধ্য হইতে এক জন তাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছিল; শের সিংহ তাহার গা টিপিয়া দিল। দুর্জ্জন তাহা দেখিতে পাইল না। কথা চলিতে লাগিল। কথায় কথায় দুর্জ্জন তাহার অবস্থার কথা পাড়িলেন, শের সিংহ সে জন্য বড় দুঃখ প্রকাশ করিলেন, তাহার পর দুর্জ্জন শের সিংহের মাথায় হাত বুলাইবার চেষ্টা দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে ডেকের পশ্চিম দিকে এক হল্লা উঠিল! "আগ্ লগা!" "দৌড়ো" "পানী"—হুড়্ হুড়্, দুড়্ দুড়্, হুট্ পাট্, ঘুট্ পাট্!!!

দুর্জ্জন লাফাইয়া উঠিল, বলিল "ও কি ও?" শের সিংহ বলিলেন "বোধ হয় জাহাজে আগুন লাগিয়াছে।"

"আপনি আমার ব্যাগ সামলান, আমি দেখিয়া আসি।" এই বলিয়া দুর্জ্জন ঊর্দ্ধশ্বাসে সে দিকে ছুটিল।

শের সিংহ ইহাই চান। তিনি তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলিয়া দুর্জ্জনের কোট বাহির করিলেন। এক একটী করিয়া বোদাম দেখিতে লাগিলেন; দেখিলেন সব গুলিই পরিষ্কার, দেখিতে এক রকম। পকেট হইতে সেই বোদামটী বাহির করিয়া এই গুলির সঙ্গে মিলাইলেন, দেখিলেন দুইই এক, তবে এইটী ময়লা ও ঐ গুলি পরিষ্কার। দুর্জ্জন হয় তো একটী নূতন লাগাইয়া পুরাণ গুলি মাজিয়া নূতন করিয়াছে! কিন্তু এ সাবুদে তো হইবে না? দেখাইতে হইবে যে কোন্‌টী নূতন, এইটীর স্থানে কোন্‌টী লাগাইয়াছে?

শের সিংহের মুখ মলিন হইল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার প্রফুল্ল হইল,

যেন কোন উপায়োন্তাবে সমর্থ হইলেন। কোট উল্টাইয়া প্রত্যেক বোদামের সেলাই দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন সুতা পুরাণ। এক, দুই, তিন,—চতুর্থ বোদামের সুতা নূতন—সাদা ধপ্‌ধপে। সেই বোদামটী বাহির করিলেন, দেখিলেন তাহার সুতা ও অন্যান্য বোদামের সুতা এক।

শের সিংহের আর কিছু বুঝিতে বাকী রহিল না; বুঝিলেন এই চতুর্থ বোদামটী নূতন লাগান হইয়াছে—তাহার সাবুদও পাওয়া গিয়াছে। শের সিংহ আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন—এত দিনের চেষ্টা বুঝি সফল হইল। তাড়াতাড়ি কোটটী ব্যাগে পুরিয়া বাঁশি বাজাইলেন, দেখিতে দেখিতে আটজন অনুচর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের কিছু দূরে দাঁড়াইতে বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে দুর্জ্জন আসিয়া উপস্থিত হইল। শের সিংহ বলিলেন—"দুর্জ্জন সিংহ! তুমি যে বিনা দোষে অনুপ সিংহকে সপরিবারে নিহত করিয়াছ তাহার প্রায়শ্চিত্তের দিন উপস্থিত!! আমার দোষ লইও না, আমি ঈশ্বরের দোহাই দিয়া তোমাকে—বন্দী করিলাম।" এই বলিয়া শের সিংহ দুর্জ্জনের হাত ধরিলেন।

দুর্জ্জন সিংহের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, তীব্রস্বরে বলিল "বেইমান! এই জন্য আমার সঙ্গ লইয়াছিলে?" সঙ্গে সঙ্গে শেরসিংহের মুখে ভীষণ মুষ্ট্যাঘাত, সঙ্গে সঙ্গে শের সিংহের চারি হাত দূরে পতন! গোরা ও সিপাহীরা এই কাণ্ড দেখিয়া এক সঙ্গে দুর্জ্জনকে আক্রমণ করিল, দুর্জ্জন অবলীলাক্রমে তাহাদের দূরে হটাইতে লাগিল। এই অবসরে শের সিংহ উঠিয়া উপরের চোগা খুলিয়া ফেলিল; পুলীষের বেশে দুর্জ্জনের সম্মুখে গিয়া সেই বোদামটী দেখাইল। যেমন বোদামটী দেখিল অমনি দুর্জ্জনের মুখ শুকাইয়া গেল, মুখের রক্ত জলের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল! দুর্জ্জন ব্যাগের উপর বসিয়া পড়িল। শের সিংহ বলিলেন "দুর্জ্জন! বোদামটী কাহার? সত্য বলিবে, আমি তোমার কোট দেখিয়াছি।"

দুর্জ্জনের মুখ নীল হইয়া গেল, বলিল "আমার।"

"তুমি তবে সত্যই খুন করিয়াছ?"

"করিয়াছি। যখন পাপ করিয়া ধরা পড়িয়াছি, তখন মিথ্যা বলিব না।"

শের সিংহ তাহাকে ঘেরাও করিয়া থানায় লইয়া গেলেন।

(১১)

থানায় সকল কথা প্রকাশ হইল।

অনুপসিংহের নিকট অপমানিত হইয়া মতি সিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যেরূপেই হউক উহার কন্যাকে হরণ করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইব! প্রকাশ্যে অনুপসিংহের খোসামদ করিত। এদিকে ভিতরে ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র করমসিংহ ও মধ্যম দুর্জ্জন সিংহ বটালায় আসিয়া পিতার সহিত মিলিল। লেহনা তো ছিলই। পিতা পুত্রে পরামর্শ চলিতে লাগিল, প্রকাশ্যে অনুপের সহিত ঘনিষ্টতা বাড়িতে লাগিল। অনুপকে প্রাণে মারিবার তাহাদের ইচ্ছা ছিল না, কোন প্রকারে অনুপকে সরাইয়া তাঁহার কন্যাকে হরণ করা, কারণ অনুপ থাকিতে সেটা বড় সহজ কাজ হইবে না। হরিসিংহ চৌলাকে

ঘুস খাওয়াইয়া ঘটনা-রাত্রে অনুপকে শরবতের সহিত ভাঙের সত্ব খাওয়াইয়া অচেতন করা হয়। ভাঙের ঔষধের নাম করিয়া মতিসিংহ দুর্জ্জনকে ইসারা করিয়াছিল। দুর্জ্জন, করম ও লেহনা, —এই তিন জনে অনুপের কন্যা হরণার্থ যাত্রা করিল। পথে সেই গ্রামে—জল খাইতে গিয়া দুর্জ্জন যে ঢলাঢলি করে তাহা পাঠক জানেন। সেই ঢলাঢলিই যে কাল হইল তাহাও বোধ হয় সকলে বুঝিয়াছেন। পাহাড়ের পিছন হইতে তাহারা উপরে উঠিল। অনুপসিংহের স্ত্রী ও কন্যা তত রাত্র পর্য্যন্ত অনুপের অপেক্ষা করিয়া এখন রুটী খাইতে বসিয়াছিল, সম্মুখে তিন জন অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া ভয়েতে উঠিয়া দাঁড়াইল। লেহনা সিংহ গিয়া কন্যাকে ধরিল, মাতা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। দুর্জ্জন তাহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য গলা টিপিয়া ধরিল। কিন্তু— দুর্জ্জনের ন্যায় সিপাহীর হাতের গুণে তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইল। পাপাত্মাদের প্রথমে খুন করিবার মতলব ছিল না; কিন্তু খুন হইয়া গেল চাপিবার জন্য ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল—কাঠের ঘর দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! এই অবসরে অনুপ সিংহের কন্যাকে লইয়া তাহারা পাহাড়ের পশ্চাদ্দিক দিয়া নামিতেছিল এমন সময়ে দেখিল, সম্মুখেই অনুপ সিংহ। অনুপ সিংহের নেশা ছুটিলে অনুপ সিংহ বাড়ী আসিতেছিলেন, হঠাৎ দূর হইতে দেখিলেন বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে! উর্দ্ধ শ্বাসে ঘোড়া ছুটাইয়া কাছে আসিলেন। সম্মুখ দিয়া যাইলে ঘুরিয়া যাইতে হইবে, কাজেই পশ্চাদ্দিক দিয়া উঠিতেছিলেন, হঠাৎ সম্মুখে অপরিচিত লোক দেখিয়া দাঁড়াইলেন। পাপ ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া পাপীরা মরিয়া হইল; পাহাড়ের ধারের কূপ মধ্যে অনুপের কন্যাকে ফেলিয়া অনুপকে আক্রমণ করিল। অনুপসিংহ বলে অসুর ছিলেন, সহজে কাবু হইলেন না, অনেকক্ষণ যুঝিলেন। অবশেষে বেগতিক দেখিয়া দুর্জ্জন লাঠির আঘাতে অনুপকে হত্যা করিল! খালে লাস ফেলিয়া তাহারা গাছে গাছে পলাইল।

দুর্ভাগ্য ক্রমে ধস্তাধস্তির সময়ে দুর্জ্জনের একটী বোদাম খসিয়া গিয়াছিল। এই বোদাম যে পরে কাল হইবে তাহা দুর্জ্জন ভাবে নাই! তাহার পর যাহা হইয়াছিল। পাঠক, পাঠিকা—সকলই জানেন।

যাহা হউক, দুর্জ্জন আত্মরক্ষাতে অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে সব ফাঁসিয়া গেল। মতিসিংহ করমসিংহ ও লেহনাসিংহ ধরা পড়িল। হরিসিংহ চৌলাও বাকী রহিল না।

বিচার হইয়া গেল। দুর্জ্জন লাহোরে আসিয়া 'বারে' জিম্ন্যাস্টিক্ দেখাইলেন, মতি ও লেহনা সমুদ্র যাত্রা করিলেন, করম সিংহ সাত বৎসর শ্রীঘরে থাকিতে

রাজি হইলেন, হরিসিংহ অম্লানবদনে ৫০০ টাকা দক্ষিণা দিয়া গেলেন।

ইন্সপেক্টার সাহেব শেরসিংহের বিস্তর সুখ্যাতি করিলেন," বলিলেন "তোমার কার্য্যে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। বোদাম বা মুক্তা লইয়া চোর ধরা এই নূতন দেখিলাম। তোমাকে ৫০০ স্থানে ১০০০ টাকা দিলাম।"

শের সিংহ বলিলেন "মহাশয়, মাফ করিবেন, আমি টাকার জন্য এই কার্য্য করি নাই। অনুরূপ আমার বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁহার হইয়া এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইলাম। আমি অমৃতসরের সর্দ্দার নরেন্দ্র সিংহ।"*

সকলে অবাক্ হইল! নরেন্দ্র সিংহের নাম কে না শুনিয়াছিল? নরেন্দ্র সিংহের পিতাকে কে না 'সোব্রাওঁ' যুদ্ধে দেখিয়াছিল?

* শিখেরা "নরীন্দর" উচ্চারণ করে।

রাজনীতি ও রাক্ষসী-নীতি।

সংসারে এরূপ একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা কথায় কথায় আগুন তুলিয়া বসেন। এই শ্রেণীর লোকেরা ধৈর্য্য ও তিতিক্ষাকে কাপুরুষতার নামান্তর বলিয়া, শতবার নিন্দা করিতে থাকেন এবং তর্জ্জন গর্জ্জনকেই কার্য্য সিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহাঁদিগের নিশ্বাস ঝটিকাময় রসনা স্ফুলিঙ্গময়, চক্ষু সায়ংকালীন আকাশবর্ণবৎ আরক্তিম, দৃষ্টি বক্র ও বিকট, ললাট নিয়তই কুঞ্চিত এবং গতি সকল সময়েই প্রমত্ত। ইহাঁরা বিনয় অপেক্ষা বিকটতাকেই অধিকতর ভালবাসেন এবং দীনতা অপেক্ষা দাম্ভিকতারই শতশত প্রশংসা করিয়া থাকেন। সন্তোষ ও সঙ্কোচ—এই উভয়ের মধ্যে সঙ্কোচই ইহাঁদিগের প্রার্থনীয়; সুতরাং শত আত্মাকে সন্তুষ্ট করিবার সহজ উপায় থাকিলেও তাহা না করিয়া অন্ততঃ একজনকেও সঙ্কুচিত করিতে পারিলেই, আপনাদিগকে যার-পর নাই সুখী মনে করেন। কোমলতা অপদার্থতার আদি, প্রীতি অসারতার প্রতিশব্দ, এই কারণে এই শ্রেণীস্থ লোকেরা কোমলতার পরিবর্ত্তে কঠোরতা এবং প্রীতির পরিবর্ত্তে ভীতির সেবাকেই শ্রেষ্ঠতর বোধ করেন; সুতরাং এই শ্রেণীস্থ লোকেরা কি পরিবার ও সমাজ, কি স্বদেশ ও বিদেশ, কি শিক্ষা ও শাসন এবং কি ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি সর্ব্বত্রে সকল বিষয়েই ভীতির শাসন-দণ্ড হস্তে করিয়া বসিয়া আছেন। ভীতিই ইহাঁদিগের উপায় ও উদ্দেশ্য, সাধন ও সিদ্ধি এবং ভীতিই ইহাঁদিগের যথাসর্ব্বস্ব সার সম্পত্তি। এই শ্রেণীস্থ রাজন্যবর্গ সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে, যখন তরবারি বলেই রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে, তখন তরবারি-বলেই উহা রক্ষিত হইবে এবং তরবারিই রাজ্য-সংক্রান্ত সকল বিষয়ের উন্নতির একমাত্র কারণ হইবে। এই

নিমিত্ত আমরা এই শ্রেণীস্থ নরপতি-বর্গকে রাক্ষস প্রকৃতির নরপতি এবং ইহাঁদিগের রাজনীতিকে রাজনীতি না বলিয়া, রাক্ষসী-নীতি নামে অভিহিত করিলাম।

সংহারই রাক্ষস প্রকৃতির ধর্ম্ম, সুতরাং সংহারই রাক্ষসী-নীতির একমাত্র মর্ম্ম। সংহারে শক্তির আবশ্যক এবং সেই শক্তিই পাশবীশক্তি; সুতরাং পাশবী-শক্তিই রাক্ষসী-নীতির প্রধান শক্তি। পাশব-বলের অভাবে এই শ্রেণীস্থ রাজনীতি কোনমতে কিছুতেই পরিচালিত ও প্রচারিত হইতে পারে না। যতক্ষণ তোমার শরীরে শুক্র শোণিত সতেজ থাকিবে; বাহুবল দুর্দ্দমনীয় রহিবে, কামান ও গোলা, বন্দুক ও বারুদে তোমার গৃহ পরিপূর্ণ থাকিবে, তীর ও তরবারি বল্লম ও বর্শার দূরস্পর্শিনী দীপ্তিরাশি সূর্য্যালোকে চক্মক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, ততক্ষণ এই শ্রেণীর ভূপালবর্গ কিছুতেই তোমার ত্রিসীমাতেও পদার্পণ করিবেন না। আর যাই তোমার অস্ত্রাগার অস্ত্রহীন হইয়া পড়িবে, তীর তরবারির ধার ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং দেহের শক্তি সামর্থ্য সরিয়া পড়িবে, অমনি রাক্ষসীনীতির সেবকেরা আসিয়া রোষকষায়িত লোচনে তোমার গলা টিপিয়া ধরিবেন এবং স্বীয় অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া তোমার রাজ্যে জয়ধ্বজা উড়াইয়া দিবেন। একদিকে পাশববল যেমন রাক্ষসী-নীতির-সহচর, সেইরূপ অবিশ্বাসও ইহার একজন অপরিহার্য্য সখা। জগতে যাঁহারা রাক্ষসী-নীতির সাহায্যে রাজপদের ও রাজমুকুটের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের চিত্ত ক্ষণেকের নিমিত্তও সুখী বা শান্ত নহে এবং তাঁহাদিগের হৃৎপিণ্ড নিয়তই সন্দেহ দোলায় দুলিতে থাকে। এই শ্রেণীস্থ ভূপালবর্গের প্রজামণ্ডলী রাজসেবা ও রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেও, ইহাঁরা তাহা যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহেন না এবং ইহাঁদিগের অধীনস্থ করদ ও মিত্ররাজ্য সমূহের নৃপতিরাও পদে পদে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ দেখাইলেও ইহাঁরা তাঁহাদিগের প্রতি সন্দিহান না হইয়া থাকিতে পারেন না। কখন কি ঘটে, এই ভাবনাতেই ইহাঁরা সতত অধীর হইয়া, কখন রাজ্যমধ্যে নিরস্ত্রীকরণের নীতি প্রচারিত করিয়া দেন এবং কখনও বা অতিমাত্র ভয় প্রদর্শনের নিমিত্ত কোনরূপ কঠোরতর বিধির প্রবর্ত্তনা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা যোদ্ধদল কমিয়া গেলেই কুণ্ঠিত হয়েন, অস্ত্রশালা তাদৃশ সজ্জিত না দেখিলেই চমকিয়া উঠেন এবং বন্দুক ও বর্শার তাদৃশ তেজ তিরোহিত হইলেই ভাবিয়া আকুল হয়েন এবং বন্ধনের পর বন্ধন টানিয়া প্রজাপুঞ্জকে কবকবলিত করিয়া রাখিতে পারিলেই আপনাদিগকে নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত বোধ করেন। কিন্তু তাহা করিলেও রাক্ষসীনীতির শক্তি কখনই স্থায়িনী হইতে পারে না।' কেন না, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, এই নীতি সর্ব্বতোভাবে পাশববলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। পাশববলের পরাজয়েই এই নীতির পরাজয়। সীজর ও সেকেন্দার এবং আরঙ্গজেব ও আগষ্টস্ রাক্ষসী-নীতির পরিচালনায় ইহ জগতে কি না করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? সেকেন্দারের প্রমত্ত গতিকে কে রোধ

করিতে সমর্থ হইয়াছিল ? তাঁহার পৃথিবী বিজয়ে কোন্ জাতিই না আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল ? রোমের সৌভাগ্য গর্ব্বান্দোলিত বিজয়-ধ্বজা ভূমণ্ডলের কোন্ খণ্ডের এবং কোন্ জাতির উপরে না, উড্ডীন হইয়াছিল এবং অহঙ্কার-মত্ত আরঙ্গজেবই কি আপনাকে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া, স্পর্দ্ধা করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন ? কিন্তু সে সকল এখন কোথায় ? সমস্তই এখন স্বপ্নবৎ অলীক অসম্ভব বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। রাক্ষসী-রাজনীতির পরিণামই এইরূপ। ইহার শক্তি আপাতু প্রবলা হইলেও পরিণামে যার-পর-নাই দুর্ব্বলা। এই নিমিত্ত আমরা এবম্বিধ রাজ-নীতির চিরদিনই বিরোধী।

বীরকুলকেশরী নেপোলিয়ন একজন রাজা আর সূর্য্যকুল শিরোমণি রামচন্দ্রও একজন রাজা। অথচ নেপোলিয়নের নাম ভীতিরই নামান্তর কেন—নেপোলিয়নের নামে ইউরোপের আবাল বৃদ্ধ সকলেই চমকিত হইয়া উঠেন কেন ? আর রাঘবশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রই বা ত্রিলোকপতি ভগবানের সাক্ষাৎ অবতাররূপে পূজিত হয়েন কেন, ভারতের কোটি কোটি লোক পবিত্র দেহে পবিত্র অন্তরে তাঁহার পুণ্যময় পবিত্র নাম উচ্চারিত করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ বোধ করেন কেন ? আকবরও একজন মোগল সম্রাট ছিলেন এবং আরঙ্গজেবও একজন মোগল সম্রাট ছিলেন—অধিক কি, মহামনা আকবর দিল্লীর যে মণিমণ্ডিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন, আরঙ্গজেবও দিল্লীর সেই মণিমণ্ডিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ভারতভাগ্য নিয়মিত করিয়াছিলেন, তবে আকবরের নাম ভারতের হিন্দু মুসলমান সকলেই পরম প্রীতির সহিত উচ্চারণ করেন কেন ? আর আরঙ্গজেবের নামোচ্চারণে কেবল মুসলমানেরাই সন্তুষ্ট হয়েন কেন ? এ সকলের কারণ আর কিছুই নহে—রঘুকুলভূষণ রামচন্দ্রের রাজত্বে রাক্ষসী-নীতির আদৌ পরিচালনা ছিল না। নেপোলিয়নের শাসনে তাহা ছিল, আরঙ্গজেব আপনার রাজনীতিকে রাক্ষস-মন্ত্রেই—সংহারমন্ত্রেই অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, আকবর ইহার পরিবর্ত্তে প্রীতির মন্ত্রেই শাসন নীতিকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই পরস্পরের ভিতর এত পার্থক্য। বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতা গর্ব্বিত ইউরোপের অবস্থা দেখিয়া আমাদিগের মনে বড়ই আশঙ্কা উপস্থিত হয়। ইউরোপ বিজ্ঞান বলে এতদূর উন্নত হইয়া এবং প্রকৃতির তত্ত্ব তন্ন তন্ন রূপে আলোচনা করিয়াও রাক্ষসী-নীতিকেই রাজনীতির প্রধান অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত কি ইংলণ্ড ও রুষিয়া, কি ফরাসী ও জার্ম্মণি সকলেই যেন ক্রোধ কম্পিত শার্দ্দূল দলের ন্যায় সতৃষ্ণনয়নে সময় প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। এই নিমিত্তই উহাদিগেরই মন্ত্রীসমাজে নিত্য নূতন ষড়যন্ত্রের উদ্ভাবনা হইতেছে। ঐ সকল জাতির সময়-সচিবেরা নূতন নূতন সমর-কৌশল আবিষ্কারের নিমিত্তই ব্যস্ত রহিয়াছেন। এই নিমিত্তই সুশাণিত সাংঘাতিক অস্ত্র সকল প্রস্তুত করিবার জন্য শতঘাতী—সহস্রঘাতী কামান সকল সৃষ্টি করিবার জন্য ঐ সকল দেশের

শিল্পীরা নিয়তই চিন্তিত রহিয়াছে এবং উহাদিগের বিদ্বান্‌-বিজ্ঞজন-পরিপূর্ণ মহাসভা সকল অবিরত নরঘাতিনী নীতির মন্ত্র-প্রচারেই ব্যস্ত হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব না যে, ইউরোপ উন্নতির অনেক গ্রামে উত্থিত হইলেও, সভ্যতার শতদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেও এখনও অসভ্যতার অন্ধতামস মনে অবস্থিত রহিয়াছে। কারণ ইউরোপের রাজশক্তি এখনও পাশব-শক্তির উপরেই সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত, ইউরোপের রাজনীতি এখনও রাক্ষস-নীতিতেই গঠিত। যাহাহউক, ইউরোপের অপরাপর শক্তি সমর-সংঘটনে উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে আমাদিগের বড় একটা কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই—লাভালাভ নাই, কিন্তু ইংরাজের ইষ্টানিষ্টের সহিতই আমাদিগের সমূহ সম্বন্ধ। অতএব ইংরাজের মঙ্গলে আমাদিগের মঙ্গল—অমঙ্গলে আমাদিগের অমঙ্গল। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশ যেরূপ তমসাবৃত হইয়াছে এবং সেই তমিস্র-রাশি দিন দিন যেরূপ গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে পাছে ইংলণ্ডের কোনরূপ অনিষ্ট সংঘটিত হয়, ইহাই আমাদিগের বিষম চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে—পশ্চিমে যেরূপ নিদর্শন দেখা যাইতেছে, মধ্য আশিয়ার মালভূমিতে দিন দিন যেরূপ অমঙ্গলের সূত্রপাত হইতেছে, আরব সমুদ্র ও ভূমধ্য সাগরের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ উত্তরোত্তর যেরূপ বিবাদ ভূমিতে পরিণত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে এই ভারত লইয়াই পাছে ইংরাজকে কোনরূপ সিদারুণ বিপদে পড়িতে হয়, ইহা আমাদিগের আরও চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যাহাহউক, ইংরাজ শাসন যখন আমাদিগের পক্ষে সুখশান্তির কারণ হইয়াছে, ইংরাজ রাজত্ব যখন এ দেশীয় লোকের অনুরাগের পাত্র হইয়া উঠিয়াছে এবং ইংরাজ জাতিই যখন আমাদিগের বহুবিধ মঙ্গলের নিমিত্তই নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছেন, তখন আমরা বলি, পাশব বলকেই সর্ব্বস্ব ভাবিয়া ভারত শাসনে প্রবৃত্ত না হইলে—রাজনীতির পরিচালনায় রাক্ষসী-নীতির প্রবর্ত্তনা না করিলে, ইংরাজের ভারতশাসন অগণ্য ভারতবাসীর, অগণ্য হৃদয়ে অনন্তকালের জন্য বদ্ধমূল হইয়া থাকিবে এবং সে শাসন বিদেশীর শত রণে, শত আক্রমণে কখনও কিছুতেই বিচলিত হইয়া পড়িবে না। অতএব ইংরাজের রাজনীতি রাক্ষসী-নীতির নামান্তর না হয়, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা।

গোপাল নায়ক ও আমীর খস্রু।

৫

এক কথায় বলা যায় যে, গোপালের তুলনায় খস্রুর শ্লেষে মৌলিকতা বিদ্যমান। অনেকটা কষ্টকল্পনার অনুসর্বর ক্ষেত্রে তাহা বিরাজ করিত। কিন্তু নায়ক গোপালের গোপালটীর মত প্রাণ ছিল বলিয়া সেই গীতিপূর্ণ সরল প্রাণে সহজ মৌলিকতা জন্ম লাভ করিত; তিনি যেটুকু শ্লেষ করিতেন তাহার বিশ্লেষের দ্বারা তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত মুক্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইত। গোপালের অন্তরের কাছে খস্রুর অন্তর ধরিলে তাহা যেন কিঞ্চিৎ মলিন ও ক্ষুদ্র হইয়া যায়; আর গীতবিষয়ে খস্রুর অন্তর বাস্তবিকই ক্ষুদ্র ছিল। গোপাল প্রকৃত নায়ক ছিলেন, গানের ভাণ্ডার তাঁহার নিকট অবারিত ছিল; তিনি চকিতে গাহিয়া দিতেন; কিন্তু খস্রুকে গাহিতে বলিলে তিনি সময় চাহিতেন,—কখন বাঁশী বাজাইয়া কার্য্য সারিয়া দিতেন ইত্যাদি।

খস্রু কৌশলে নায়কত্ব লাভ করিলেও সঙ্গীতে অসম্পূর্ণতা ও আসলে অনভিজ্ঞতা বশতঃ নায়ক গোপালের মাহাত্ম্যকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই। —আসল সোণায় ও গিল্টি করা সোণায় অনেক প্রভেদ। গোপাল তাঁহার অপেক্ষা সঙ্গীতে অনেক উন্নত ছিলেন, গীতি শাস্ত্রে তাই নায়ক গোপাল সঙ্গীত নায়কদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোচ্চসম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। এই সম্মানটী কাড়িবার জন্য আমীর খস্রু যে কৌশল ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রকারান্তরে নায়ক গোপালের শিষ্যত্বই লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; বস্তুতঃ তিনি গোপালের গুরুত্ব অপহরণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।—গোপালের অনুকরণেই খস্রুর নায়কত্ব। ইহাতে তিনি হিন্দুগায়কের নিকট একরূপ ঋণী। সঙ্গীত রাজ্যে অনুকরণ জনিত প্রকৃষ্ট ফল তিনি বাস্তবিকই হিন্দু গায়কের নিকটই বিশেষরূপে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় অনুকরণ বিষয়ে তাঁহার এই দুইটী বিষয় মুখ্য। এক, রাগ রাগিনী ও, অপরটী গীতশ্লোকের শেষে আত্মপরিচয় প্রদান। যদিচ গানে তাঁহার এই দুই বিষয়ে গৌণ ভাবে ঋজত্ব ছিল, কারণ তিনি আরব্য ও পারসিক রাগ অল্প স্বল্প জানিতেন এবং পারস্যভাষার কবি হইয়া সম্ভবতঃ অবশ্যই তাঁহার হাফেজাদি পারস্য কবির আত্মপরিচয়ের কথা তাঁহার মনে জাগরুক ছিল। তাহা হইলেও ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তিনি ঐ দুই বিষয়ে হিন্দু গায়কের নিকট বিশেষরূপে ঋণী। কারণ হিন্দুরা মুসলমানদিগের অপেক্ষা সঙ্গীতে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন ভারতীয় সঙ্গীতই আরবা পারস্য প্রভৃতি প্রতীচ্য প্রদেশে প্রধানতঃ বিস্তৃত হইয়াছিল। আর মুসলমানদিগের শ্লোকে, গানে কোথাও প্রায় বিশেষরূপে আত্মপরিচয়ের প্রথা দেখা যায় না।

ধরিতে গেলে এইরূপ আত্মপরিচয়-প্রদান-প্রথা সাহিত্য জগতে হিন্দুদিগেরই বিশেষ কার্য্য। হিন্দুদিগেরই খণ্ড কবিতায়, নাটকে, কাব্যে—সকল প্রকার ভারতীয় কাব্য গ্রন্থেই প্রায় শেষকালে রচয়িতার কোন প্রকার আত্মপরিচয় দেখা যায়।

এক্ষণে একেবারে নি সঙ্কোচে বলা যায় যে, পারসিক গীতি-কবি খস্রু হাফেজাদি পারস্য গীতি-কবির নিকটে গীতি কবিতা ও তদন্তে স্বীয় পরিচয়দান-কার্য্যের মধুর আভাস পাইয়া হিন্দুগায়ক নায়ক গোপালের নিকটে তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু গানে কবি খস্রুর আত্মপরিচয়ের মধ্যে একটী গূঢ় ভাব পরিলক্ষিত হয়,—সেটী গুরুভক্তি। (এই গুরুভক্তির কথা পূর্ব্ব প্রস্তাবে একবার বলা হইয়াছে) গুরুর প্রতি ভক্তি প্রাবল্যেই তিনি গানে, গুরুর পরিচয়েই নিজের পরিচয় ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন—যথার্থ শিষ্যেরই প্রাণ তাহাতে দেখাইয়াছেন। তাঁহার এইরূপ কার্য্যে আমাদের মনে পুনশ্চ এইটীই প্রধানতঃ ধারণা হয় যে, খস্রুর তুল্য নেজামদ্দীনের শিষ্য কেহ ছিল না।—ইহার প্রদীপ্ত প্রমাণ নেজামদ্দীনের সমাধির পার্শ্বে খস্রুর সমাধিস্তম্ভ এখনও পুরাতন দিল্লীতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্যত্বের সাক্ষ্যদান করিতেছে।

সকল গানেই তিনি গুরু নেজামদ্দীনকে কখন সুলতান, কখন পীর ইত্যাদি সম্মানীয় শব্দে ভূষিত ও সম্বোধিত করিয়া গিয়াছেন। গানে যেন তিনি গুরুকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে পদতলে বসিয়া তাঁহার স্তুতিকীর্ত্তন করিতেছেন, গুরুর নামেই যেন তাঁহার নাম, তাহাতেই তিনি যেন সুখী। গীত মাত্রেই তিনি গুরুর নামেই নিজকে প্রচার করিয়াছেন; আমীর খস্রু বলিয়া স্পষ্টরূপে পরিচয় তাঁহার গানে কোথাও দেখি নাই।

এরূপ স্পষ্ট পরিচয় অন্যরূপ শ্লোকে দেখা যায়; তাঁহার একটী পহেলি (প্রহেলিকা) শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। তাহাতে স্পষ্টরূপে তাঁহার নামের উল্লেখ আছেঃ—

তিরওআর সেইক তিরিয়া উতারি উস্‌নে বহুৎ রিঝিয়া, বাপ্‌কো উস্‌কে নাম যো পুছা আধা নাম পিতা পার পিয়ারা। বুঝ পাহেলি মোরি আমির খুস্‌রাউ ইয়ঁ। কহেঁ আপনা নাম না বোলি।

অর্থ

নামিয়া পাদপ হতে নারী একজন
হ'রেছিল অতিশয় মোর এই মন।
পুছিনু পিতার নাম সেই অবলার
কহিল নিজের অর্দ্ধ অর্দ্ধেক পিতার;
আমীর খস্রু কহে তাই বোঝো এ প্রহেলি
গোপন করিল নাম নাম না বলি *।

এইরূপ স্পষ্ট করিয়া আত্মপরিচয়ে একটী বিশেষ সুবিধা হয়। আমরা রচনা ও তাহার রচয়িতাকে একত্রে জানিতে পারি। ঐতিহাসিকের বা প্রত্নতত্ত্ববিদের

* এই পহেলির উত্তর নাবলি অর্থাৎ নিবোলি অর্থাৎ নিমফল; ইহা নিবোলির উপর একটী শ্লেষালঙ্কার। এ প্রহেলিকাও যেন কষ্ট কল্পিত বলিয়া মনে হয়।

ন্যায় রচয়িতার অনুসন্ধানের জন্ত আর মাথা ঘামাইতে হয় না, সহজে রচয়িতা কে তাহা আমরা অবগত হই।

কবি খস্রুর গানে তাঁহার গুরু নেজামদ্দীনের নাম থাকাতে অনেক সময়ে গাইয়েরা খস্রুর নামই নেজামদ্দীন, খস্রু ও নেজামদ্দীন একই লোক ভাবিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। গানে নেজামদ্দীন আমীর খস্রুরই নাম বলিয়া অনেক ওস্তাদের ধারণা।—শুনিয়াছি করিম খাঁ, রহিম খাঁ, মোগল খাঁ, আলিবক্স, হস্রু খাঁ, দেলওয়ার খাঁ, কায়েম খাঁ, মিয়া মীরণ প্রভৃতি বড় বড় সঙ্গীত ওস্তাদেরা এই ভ্রমের বশবর্ত্তী ছিলেন।

এরূপ ভ্রমে পড়া কিছু আশ্চর্য্য নয়, যেহেতু একাধিক খস্রু ছিলেন এবং গজনির বাইরাম সার পুত্র খস্রু সার উপাধি নেজামদ্দীন ছিল। ক্রমশঃ—

রাসমালা।

মুলরাজ।

সৌরকুল সমূলে উৎপাটিত হইলে গুর্জ্জর রাজ্যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল। মহারাজ বনরাজের প্রতিষ্ঠিত সিংহাসন শূন্য দেখিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ নরপতিগণ তাহা অধিকার করিবার অভিলাষে সৈন্যসামন্ত সজ্জিত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথম নাগোরের অধিপতি গুর্জ্জর রাজ্য হস্তগত করিবার নিমিত্ত সদলে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। তদীয় সেনাদল অনহলবারার প্রাকার-তলে উপনীত হইতে না হইতে নিকটে ত্রৈলঙ্গের অধিপতি তিলিপের * সেনাপতি বীর বার্পের প্রচণ্ড তূর্য্যনিস্বন শ্রুত হইল। মুলরাজ দেখিলেন, দুইটী বিক্রান্ত শত্রুর আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা অসম্ভব। তখন তিনি সচিবগণের সহিত কর্ত্তব্যাবধারণ বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাহারা সকলেই সমস্বরে বলিল, "মহারাজ! আপনি অনহলবারা পরিত্যাগ করিয়া অন্য নিরাপদস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করুন। ইহাতে আপনার অপমান বা কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। দেখুন, কঠোরতর আঘাত করিবার নিমিত্তই মেষগণ যুদ্ধকালে কয়েকপদ অপসৃত হইয়া থাকে। অতএব, এ সময়ে পশ্চাদপসরণ করিলে আপনার বল দ্বিগুণিত হইয়া উঠিবে।" তাঁহাদিগের পরামর্শানুক্রমে চতুর মুলরাজ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সুদূর কচ্ছের সীমান্তস্থিত দুর্গম গিরিগহনের মধ্যে কুন্তকোট দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তৎকালে দারুণ বর্ষা আরম্ভ হওয়াতে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, নাগোরের রাজা অবরোধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা সফল হইল না;—

* ইলিয়ট সাহেব কল্যাণনগরের শোলাঙ্কি রাজগণের যে একটী তালিকা সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে "তৈলপদেব" নামা জনৈক রাজার বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত তৈলপদেব ৯৭৪ খৃঃ অঃ হইতে ৯৯৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি এইস্থলে তিলিপ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

সমস্ত প্রাবৃটকাল নগর পরিবেষ্টন করিয়া থাকিয়া নাগোররাজ অবশেষে নগর অধিকার করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মূলরাজ স্বীয় সামন্তদিগকে একত্রিত করিলেন এবং অর্থসাহায্যে তাঁহাকে অনহলপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া ভীষণ বিক্রমসহকারে বার্পের সেনাদলের উপর আপতিত হইলেন। তখনই উভয়দলে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ত্রৈলঙ্গের সেনাপতি অবশেষে মূলরাজের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন; তাঁহার সৈন্যসামন্তদিগের অনেকে নিহত হইল; অবশিষ্ট সকলে দলিত ও বিত্রাসিত হইয়া ছত্রভঙ্গে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

মূলরাজের শত্রু উচ্ছিন্ন হইল; তিনি নিরাপদ হইয়া নিশ্চিন্তমনে, কয়েকটী দেবালয় স্থাপন করিতে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে তৎকর্ত্তৃক যে সকল মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সিদ্ধপুরের রুদ্রমাল বিশেষ প্রসিদ্ধ। দুঃখের বিষয় তাহা সমাপিত হইবার পূর্ব্বে মূলরাজ পরলোকগত হয়েন। কথিত আছে, শোলাঙ্কিরাজ মূলরাজের কঠোর তপস্যায় ভবানীপতি ভগবান্ মহাদেব এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বরস্বরূপ সমগ্র সৌরাষ্ট্ররাজ্য ও সোমনাথ দেবের মন্দির অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতবর হেমাচার্য্য স্বপ্রণীত "দ্ব্যাশ্রয়" নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে অন্য প্রকার বিবরণ সন্নিবেশ করিয়াছেন।

তিনি বলেন, "মূলরাজ জগতের হিতকর্ত্তা; তিনি অতি দয়াবান ছিলেন, বলিতে কি, তাঁহার হৃদয় সর্ব্বপ্রকার উচ্চ গুণগ্রামে বিভূষিত ছিল। দেশীয় নরপতিগণ তাঁহাকে সূর্য্যের ন্যায় পূজা করিতেন; দুর্দ্দান্ত রাজার অত্যাচারে যাহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া গুর্জ্জরে আশ্রয় গ্রহণ করিত, মূলরাজ তাহাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন; তাঁহার আশ্রয়ে তাহারা পরমসুখে কালযাপন করিত। এই জন্য মূলরাজ রাজাধিরাজ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যে তাঁহার যে সকল শত্রু ছিল, তিনি তাহাদিগের অর্দ্ধেককে সংহার করিয়া অপরার্দ্ধকে নগর হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। তাড়িত ও সমস্ত ধনৈশ্বর্য্যে বঞ্চিত হইয়া হতভাগ্যেরা নিতান্ত দীনহীনভাবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। তাহাদিগের বনিতাগণ কূপমণ্ডূকের ন্যায় কেবল অন্তঃপুর মধ্যেই বাস করিত, বাটীর বহির্দ্বারে তাহারা কখনও যায় নাই, কিন্তু স্বামীর দুর্দ্দশায় তাহারা নিতান্ত অরক্ষিত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল; ভিলেরা তাহাদিগকে ধরিয়া ক্রীতদাসীরূপে নগরে নগরে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল।"

কথিত আছে, ভগবান্ সোমনাথ মহাদেব একদা স্বপ্নাবেশে মূলরাজকে দেখা দিয়া বলিয়াছেন, "বৎস! দুর্দ্দান্ত গ্রহরিপু ও অন্যান্য দানবগণ ঘোরতর অত্যাচারে প্রভাস তীর্থকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে; অগ্রে 'তুমি তাহাদিগকে বধ কর।' আমার বরে তুমি সর্ব্বজয়ী হইবে।"

পরদিন প্রাতে নিয়মিত রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া শোলাঙ্কিরাজ মূলরাজ নির্জ্জনে স্বীয় মন্ত্রিদ্বয় জম্বুক ও জিহুলের

সমক্ষে গত রাত্রের স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন এবং ভগবানের আদেশ পালন সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "গ্রহরিপুকে পূর্ব্বে কেহই চিনিত না, আমিই উহাকে প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছি; কিন্তু কুক্ষণে জন্মিয়া সে অতি নির্লজ্জের ন্যায়, অতি পাষণ্ডের ন্যায়, প্রভাষের তীর্থযাত্রিদিগের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতেছে। অনেক লোক যখন তাহার হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তখন আমি তাহাকে কেন না বধ করিব? আমি স্বয়ং তাহাকে উচ্চপদে স্থাপন করিয়াছি বলিয়া কি তাহার পাপাচরণের শাস্তি বিধান করিব না?"

অনন্তর খিরালুর রাজকুমার জিহুল দুর্বৃত্ত গ্রহরিপুর অত্যাচারের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন "সেই মেষপালক অত্যন্ত অত্যাচারী; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সৌরাষ্ট্রের যে সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া জগৎ পবিত্র ও প্রসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আজি দুরাচার গ্রহরিপু সেই সিংহাসন কলঙ্কিত করিতেছে; পাপিষ্ঠ দানব এতদূর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে যে, পবিত্র প্রভাষতীর্থের অভিমুখে যে সকল লোক গমন করে, সেই রাক্ষস তাহাদিগকে বধ করিয়া তাহাদিগের মাংসাস্থিতে রথ্যা সকল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। যে পবিত্র বামনস্থলী নগরীর শিরোদেশে এককালে হনুমান ও গরুড়ধ্বজ উড্ডীন হইয়াছিল, দুর্বৃত্ত গ্রহরিপু আজি তথায় রাবণের ন্যায় অতিদর্পে ও নির্ভয়ে লৌহদণ্ড পরিচালন করিতেছে। তাঁহার আদেশক্রমে অন্য অন্য তীর্থস্থলগুলি চোরের উপদ্রবে নিরতিশয় উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রহরিপু ব্রাহ্মণবিদ্বেষী; তাহার অত্যাচারে কেহই স্বচ্ছন্দে পথ দিয়া ভ্রমণ করিতে পারে না; সেই দুরাচার দানব পথিকদিগের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়। সেই জন্য সে সাধুলোকদিগের হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শেলবৎ বিদ্ধ রহিয়াছে। সে যুবক, তাহার কাম ও দুরাকাঙ্ক্ষা অতীব বলবতী; সেই জন্য সে শত্রুদিগকে সংহার করিয়া তাহাদিগের পত্নীদিগকে বন্দীভাবে নিজ অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখে। সেই ম্লেচ্ছ নরপতি গির্ণারে শিকার করিতে যায় এবং প্রভাষের মৃগকুলকে সংহার করে; সে গোমাংস ভক্ষণ করে, সুরাপানে সদা রত এবং যুদ্ধস্থলে শত্রুশোণিতে ভূত, পিশাচ ও তাহাদের সৈন্যসমূহকে আনন্দিত করিয়া থাকে। সেই পাশ্চাত্য রাজার অত্যাচারে উত্তর ও দক্ষিণদেশীয় অনেক নরপতি পলায়ন করিয়াছেন; সেই জন্য সে কাহাকেও গ্রাহ্য করেনা, সেই জন্য সে নিজ বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পাপে বসুমতী অধীর হইয়াছেন, তাহার অত্যাচারে সমস্ত জগৎ ক্রন্দন করিতেছে; রাজন্! এক্ষণে যদ্যপি আপনি তাহাকে বধ না করেন, তাহা হইলে তাহার সমস্ত পাপ আপনাকে স্পর্শ করিবে। আপনি তাহাকে সংহার করিতে পারিবেন বলিয়া ভগবান্ মহাদেব আপনাকে আদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে অবিলম্বে সৈন্যসামন্ত সজ্জিত করিয়া সেই দুর্বৃত্ত দানবকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিউন, কি জানি, যদি কালে সে অধিকতর বলবান্ হইয়া উঠিয়া শেষে আপনার চেষ্টা বিফল করিয়া দেয়।"

জিহ্লের কথা শ্রবণ করিয়া মূলরাজ মন্ত্রিবর জম্বুককে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তখন বৃহস্পতির সদৃশ প্রজ্ঞাবান জম্বুক গ্রহরিপু সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন; "যে বামনস্থলী নগরে গ্রহরিপু বাস করে, তাহা দুর্জ্জয় গির্ণরের পাদপ্রস্থে স্থাপিত; এতদ্ব্যতীত তন্মধ্যে উপবেশন করিয়া সাগরের ভীষণ কল্লোল শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ নগর আর একটী দুর্গ দ্বারা দৃঢ়ীকৃত এবং চারিদিকে সাগর ও পর্ব্বত দ্বারা দৃঢ় রক্ষিত। গ্রহরিপু বড় দুর্দ্দান্ত, সতর্কভাবে সর্ব্বদা সে নিজ রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকে; এমন কি রজনীযোগেও নিদ্রা যায় না। সামান্ত কর্ত্তরিকা দ্বারা যেমন কেহ কখন শালবৃক্ষ ছেদন করিতে পারে না, বিপুল সেনাদল ব্যতীত তাহাকে জয় করা সেইরূপ অসম্ভব। তাহার নগরের নিকটে কোন সেনাদলই প্রবেশ করিতে পারিবে না, আর যদি পারে গ্রহরিপু তাহাদিগকে এরূপ দৃঢ়তর অবরোধ করিবে যে, তাহাদিগকে বিষম বিপদে পতিত হইতে হইবে। কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রের অতি সন্নিকটে অবস্থিত এবং চুলার পুত্র দুর্জ্জয় লক্ষ সহোদর ভ্রাতার স্থায় গ্রহরিপুর একান্ত অনুগত; তদ্ব্যতীত আরও অনেক দোর্দ্দণ্ড ম্লেচ্ছরাজা তাহার সহায়তা করে। রাজন্! ইহা একটী প্রসিদ্ধ কথা যে, যে শত্রুর দুর্গ পর্ব্বত, বন, অরণ্য, সাগর দ্বারা পরিবদ্ধ, তাহাকে জয় করা সুকঠিন। গ্রহরিপু উক্ত তিন প্রকার সাহায্যই পাইয়াছে। মহারাজ! যদি তাহাকে পরাস্ত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপনি স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হউন। আপনার নাম শ্রবণ করিলে সেই দুর্দ্দান্ত নরপতিগণ ভয়ে কম্পিত হইবে এবং তাহাদিগের রমণীগণ তখনই বৈধব্যের শোকসঙ্গীত গান করিতে থাকিবে।"

মূলরাজের হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল; ইতিপূর্ব্বে যুদ্ধাভিলাষ তাঁহার মনোমধ্যে প্রজ্বলিত হইয়াছিল, এক্ষণে উৎকট উৎসাহরূপ ইন্ধনের সংযোগে তাহার তেজোরাশি দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। প্রচণ্ড উৎসাহ সহকারে তিনি সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং বিকট ক্রোধে করদ্বয় নিপীড়ন করিতে করিতে মন্ত্রাগার হইতে বহির্গমন করিলেন। তদীয় সেনাপতিগণ অমনি তাঁহার অনুগমন করিল।

জাগিয়াছি।

বসন্ত গিয়াছে চলি,
কুঞ্জে কুঞ্জে নাহি ফুল;
যেথা সেথা মধু-আশে,
ছুটে না মধুপকুল।
বহে না তেমন ভাবে
মধুর মলয় বায়;
কোকিলা তমাল ডালে
তেমন গাহে না হায়!
আকাশে মেঘের ঘটা
দশদিশি অন্ধকার;
চাঁদিনীর জোছনায়
মধুরিমা নাহি আর।
পরাণী নাচে না তত
খুলিলে তো প্রাচী-দ্বার।
নিদাঘের খর-তাপে
দগ্ধ দেহ সবাকার।
তাপে তরু অঙ্গ হ'তে
ফেলে দেছে অলঙ্কার;
আহার ত্যজিয়া জীব
আশ্রয় লয়েছে তার।
গলা ভেঙ্গে পাখিগুলা
নীরবে রহেছে ব'সে;
পিক বধূ—বিরহিনী,
গেছে চলি কোন্ দেশে!
ক্ষুদ্র এক স্রোতস্বতী
উছলি সোহাগ ভরে,
কুটীরের নীচু দিয়া
বহে যেত কলস্বরে,
বাল রবি-কিরণে যে
জ্বলিত রজত-হার,
সে আজি শুকা'য়ে গেছে
থামিয়াছে রব তার।
যে দিকে ফিরাই আঁখি
নিমেষে দেখিতে পাই,
উৎসাহে বঞ্চিত সবে
হর্ষহীন সব ঠাঁই।
জাগে না কোথাও কিছু
সব অবসাদে ভোর,
একটী স্মিরিতি শুধু
জাগিয়াছে হৃদে মোর।
নদীটি শুকায়ে গেলে
মণি মুক্তা পড়ে রয়;—
যৌবন গিয়াছে চলি
আছে হৃদি স্মৃতিময়।
জাগিয়া উঠেছে স্মৃতি
পেয়েছি নবীন বল,—
তৃষিত চাতক আজি
পেয়েছে তৃষায় জল।
সকলে ঘুমায়ে আছে
আত্মহারা নিদ্রাবশে,
স্মৃতি ল'যে জেগে আছি
আত্মহারা আছি ব'সে।
হৃদয় কবাট খুলি
স্মৃতির প্রতিমা সঙ্গে
ভুলিয়া সকল জ্বালা
খেলিতেছি নানা রঙ্গে।
যাহা কিছু ছিল প্রীতি
রাখিয়াছি একাধারে,
কারো কিছু দেই নাই
ভ্রমেও অবনী'পরে!
নাহিক সম্বন্ধ কিছু
সংসারে কাহারো সনে,
সকল সম্বন্ধ-মূল
করিয়াছি এক জনে।
তাহারি মূরতি খানি
নিভৃতে লুকা'য়ে রাখি,
চোরে পাছে ফাঁকি দেয়
তাইতে গোপনে দেখি।
হেরিতে সঞ্চিত ধন,
কৃপণ নিশীথ চায়;—
খুলেছি ভাণ্ডার আমি
সকলে সুষুপ্ত তায়।
কৃপণের অর্থ হেরি,
ধরে না অধরে হাসি,
আমিও যা'কিছু আছে,
তাই দিয়ে সুখে ভাসি।

নিশীথে, নিশ্চিন্ত, শান্ত,
    ভ্রান্তজীব ঘুমে ঘোর,
কেবল জাগিয়া রহে
    পাপী, তাপী, হিংস্র, চোর।
কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করি,
    পাপেরে আশ্রয় দিয়া,
আশাতে বঞ্চিত শেষে
    তাপে জর জর হিয়া ;
পর প্রাণে দিয়া ব্যথা
    স্বার্থ খুঁজি নিশি দিবা,—
পরকে বিদলি পদে ;
    পশুতার বাকী কিবা ?
সকল জীবেতে মোর
    ছিল যাহা ভালবাসা,
চুরী ক'রে এনে সব
    বেঁধেছি একটী বাসা।

জাগিবার যে যে হেতু
    সব আমি পাইয়াছি,
তাই, অন্যে জাগিল না,
    আমি শুধু জাগিয়াছি।
চুপে চুপে করি যাহা
    তাহা তো নির্দ্দোষ নয়,
ভালবাসা—শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম,
    তবে তাতে কেন ভয় ?
আজ্ যে জেগেছি আমি
    কলুষ-কামনা করি,
এ জাগা তো জাগা নয়,
    এ যে নিদ্রা ভয়ঙ্করী !
সকলে সমান স্নেহ
    করিতে পারিব যবে,
সেই দিন কথা মোর
    "জাগিয়াছি" সত্য হবে।

বিয়ে !

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি।)

কলি
    ফোটে,
অলি
    ছোটে
দলি,
    বাতাসে—
ফুল তো কাঁদে না, সখী, চাপা হুতাশে ?
অলি কলি কা—লে,
সোণা ফোটে জ—লে,

ঢেউ গুলি ফুলিয়া বেড়ায়,
ফুল গুলি লহরী জড়ায়,
কোথা হ'তে কে আসে—কে যায় !
ফুল তোলে, মালা গাঁথে
আন মনে গায় !—
এ মালা কে পরে ?
    বরে !—
এ মালার গুণ ?
খয়ের আর চুণ।

আয়ুর্ব্বেদ।

কুষ্ঠরোগ।

কুষ্ঠ একপ্রকার চর্ম্মরোগ; স্নাকার-জনক পচনশীল অতি জঘন্য গলিত কুষ্ঠ হইতে সামান্য দদ্রু পর্য্যন্ত কুষ্ঠ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা দুইটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত, যথা ক্ষুদ্র ও মহা কুষ্ঠ। এই দুইটী আবার যথাক্রমে একাদশ ও সপ্ত উপবিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠ।—(১) এককুষ্ঠ, (২) গজচর্ম্ম (ইহারই নাম চর্ম্মকুষ্ঠ), (৩) চর্ম্মদল, (৪) বিচর্চ্চিকা বা বিপাদিকা (উৎপত্তিস্থান-ভেদে বিচর্চ্চিকাই বিপাদিকা নামে অভিহিত হয়), (৫) পামা, (৬) কচ্ছু, (৭) দদ্রু, (৮) বিস্ফোট, (৯) কিটিম, (১০) অলসক ও (১১) শতারু। এই এগার প্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠ।

কেহ কেহ বলেন পামা ও কচ্ছু এক রোগ। তাঁহাদের মতে বিচর্চ্চিকা ও বিপাদিকা ভিন্ন ভিন্ন পীড়া।

মহাকুষ্ঠ।—কাপাল, উডুম্বর, মণ্ডল, সিধ্ম, কাকণক, পুণ্ডরীক, ও ঋষ্যজিহ্ব এই সাত প্রকার মহাকুষ্ঠ।

কারণ।

বিরোধীন্যন্নপানানি দ্রবস্নিগ্ধগুরূণি চ।
ভজতামাগতাং ছর্দ্দিং বেগাংশ্চান্যান্ প্রতিঘ্নতাম্।
ব্যায়ামমগ্নিসন্তাপমতি ভুক্ত্বা নিষেবিণাম্।
শীতোষ্ণ লঙ্ঘনাহারান্ ক্রমং মুক্ত্বা নিষেবিণাম্।
ঘর্ম্মশ্রমভয়ার্ত্তানাং দ্রুতং শীতাম্বুসেবিনাম্।
অজীর্ণাধ্যাশিনাঞ্চাপি পঞ্চকর্ম্মাপচারিণাম্।
নবান্নদধিমৎস্যাতি-লবণাম্ল-নিষেবিণাম্।
মাষমূলক-পিষ্টান্ন-তিল-ক্ষীর-গুড়াশিনাম্।
ব্যবায়ঞ্চাপ্যজীর্ণেহন্নে নিদ্রাং বা ভজতাং দিবা।
বিপ্রান্ গুরূন্ ধর্ষয়তাং পাপং কর্ম্ম চ কুর্ব্বতাম্।
বাতাদয়স্ত্রয়ো দুষ্টাস্ত্বক্ রক্তং মাংসমম্বু চ।
দূষয়ন্তি স কুষ্ঠানাং সপ্তকো দ্রব্যসংগ্রহঃ।
অতঃ কুষ্ঠানি জায়ন্তে সপ্ত চৈকাদশৈব চ॥

বিরুদ্ধ অন্নপানীয়, দ্রব, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, নিঃসরণোন্মুখ বমি ও অন্যবিধ বেগের প্রতিরোধ, অপরিমিত ভোজন করিয়া ব্যায়াম করণ বা অগ্ন্যাদির তাপ-সেবন, অনিয়মিত শীত ও উষ্ণ সেবা, অথবা উপবাস ও ভোজন, রৌদ্র সেবনে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও ভয়ার্ত্ত অবস্থায় দ্রুতভাবে শীতল জল সেবন, অজীর্ণসত্ত্বে পুনর্ব্বার অধিক ভোজন, বমনাদি পঞ্চ কর্ম্মের পর তদনন্তর কৃত্য সমুদায়ের অবৈধাচরণ এবং নূতন অন্ন, দধি, মৎস্য, অধিক লবণ, অম্ল, মাসকলাই, মূলা, পিষ্টান্ন, তিল, দুগ্ধ ও গুড় এই সমুদয়ের বাহুল্য-রূপে ভোজন, দিবানিদ্রা, জীর্ণ না হইতেই মৈথুন, গুরু ও ব্রাহ্মণ-গণের অবমাননা, অন্যবিধ পাপাচরণ, এই সকল কারণে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া রস, রক্ত, মাংস ও নাসিকা প্রভৃতিকে দূষিত করে। বাতাদি দোষ-ত্রয় ও রসাদি দূষ্য চতুষ্টয় এই সপ্ত দ্রব্যের বিকৃতিহেতু কুষ্ঠরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

কুষ্ঠ সমস্তই ত্রিদোষজ, তবে ভিন্ন ভিন্ন দোষের উল্বণতাহেতু ইহা সাত প্রকার; যথা, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লেষ্মজ ও সন্নিপাতোৎপন্ন। দোষের উল্বণতানুসারে ইহারা সাত প্রকার হইলেও সংখ্যায় আঠার প্রকার।

বাতেন কুষ্ঠং কাপালং পিত্তেনৌড়ুম্বরং কফাৎ।
মণ্ডলাখ্যং বিচর্চ্চি চ ঋক্ষাখ্যং বাতপিত্ততঃ॥
চর্ম্মৈককুষ্ঠ কিটিমং সিধ্মালস বিপাদিকাঃ।
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবাঃ শ্লেষ্মপিত্তাদ্ দদ্রু শতারুষী।
সপুণ্ডরীক বিস্ফোট পামা চর্ম্মদলং তথা।
সর্ব্বৈরেবোল্বণৈর্দোষৈঃ কুষ্ঠং স্যাৎ কাকণাভিধম্॥

বায়ুর উল্বণতায় কাপাল, পিত্তের প্রাধান্যে উড়ুম্বর, কফের আধিক্যে মণ্ডল ও বিচর্চ্চিকা, বায়ু ও পিত্ত এই উভয়ের প্রাবল্যে ঋক্ষজিহ্ব, বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্যে চর্ম্মকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, কিটিম, সিধ্ম, অলস ও বিপাদিকা, কফপিত্ত প্রাধান্যে দদ্রু, শতারু, পুণ্ডরীক, বিস্ফোট, পামা ও চর্ম্মদল এবং সর্ব্বদোষ প্রাবল্যে কাকণ নামক কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়।

উর্দ্ধে যে সমস্ত কারণ নির্দ্দিষ্ট হইল, ঐ সকল ব্যতীত আর কোন কারণ আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করা হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইল যে, অধিক পরিমাণে মৎস্য খাইলে এই রোগ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগেরও এই মত, তাঁহারা বলেন যে, যাহারা নদীতীরে বা সমুদ্রতটে বাস করে ও লবণে জর্জ্জরিত অথবা পচা মৎস্য ভক্ষণ করে, তাহাদিগেরই এই রোগ হইয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বাসের কারণ আছে; য়ুরোপের মধ্যযুগে ঐরূপ স্থানে এবং লবণাক্ত মৎস্যজীবীদিগের মধ্যে ঐ রোগ হইত। ইহাতেই তাঁহাদের ঐরূপ বিশ্বাস হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে ও অন্যান্য স্থানে অনেক অনুসন্ধানের পর অধুনা স্থির হইয়াছে যে, যাহারা কখন মাছ খায় না, তাহাদিগের মধ্যেও এই রোগের অধিক প্রাদুর্ভাব। অতএব মৎস্য-ভক্ষণের সহিত এই রোগের কোন সম্পর্ক নাই। এক সময়ে বৃটিশ দ্বীপ-পুঞ্জে কুষ্ঠের প্রাদুর্ভাব ছিল; তথায় ত্রয়োদশ শতাব্দী ধরিয়া ইহার আক্রমণ অপ্রতিহতবেগে চলিয়াছিল; কিন্তু এখন আর তথায় ইহার আক্রমণ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কচিৎ কোন ব্যক্তিকে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। যখন ইহার আক্রমণ কমিয়া গিয়াছে, তখন যে, রোগের কারণ হ্রাস হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব মৎস্য-ভক্ষণ যদি ইহার একটী প্রধান কারণ হইত, তাহা হইলে এরোগের আক্রমণ না কমিয়া বরং বৃদ্ধি পাইত, কেননা শ্বেতদ্বীপবাসিগণের মধ্যে মৎস্যাহার বাড়িয়াছে বই কমে নাই। এই সকল বিষয়ের আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মৎস্যাহার ইহার একটী প্রধান কারণ নহে, তবে ইহা একটী সাধারণ অথবা উত্তেজক কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

হাম, বসন্ত, বিসূচিকা প্রভৃতি পীড়ার বৈশেষিক বিষের ন্যায় এই পীড়ারও বৈশেষিক বিষ আছে কিনা, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। তবে নিদান তত্ত্ববিৎ অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, কুষ্ঠরোগের একপ্রকার বৈশেষিক

বিষবীজ আবিষ্কৃত হইয়াছে, লসিকানালী দ্বারা তাহা শরীর মধ্যে প্রবেশ করে *।

হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এই রোগ ভয়ানক সংক্রামক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গাদ্ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
একশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥

সঙ্গম, গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, এক-পাত্রে একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন, এক বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপন ব্যবহার দ্বারা কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ, নেত্রাভিষ্যন্দ, উপদংশ, ঔপসর্গিক মেহ প্রভৃতি রোগ রোগী হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, এরোগ সংক্রামক বা স্পর্শাক্রামক কিনা, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেক সুবিজ্ঞ পণ্ডিতের মত এই যে, একগৃহে বাস, একত্রে শয়ন, বা সঙ্গম দ্বারা এরোগ সংক্রামিত হয় না। তাঁহারা বলেন যে, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পুরুষের সহিত নীরোগ রমণীর অথবা কুষ্ঠগ্রস্তা রমণীর সহিত নীরোগ পুরুষের সহবাসে এই উৎকট রোগ সংক্রামিত হইতে দেখা যায় না। আমরাও এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াছে। সেই জন্ত অনেকে বলেন যে, রমণকালে স্ত্রী কিম্বা পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের কোন্ স্থান ছিন্ন হইলে এবং কুষ্ঠের রস তন্মধ্য দিয়া শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে তবে কুষ্ঠ হইয়া থাকে। ফলতঃ কুষ্ঠের রস কোনরূপে রক্তের সহিত মিশ্রিত না হইলে এই রোগ হয় না। কিন্তু ইহাই একমাত্র অভ্রান্ত মত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, কেননা ইহার বিরুদ্ধ প্রমাণও বিস্তর পাওয়া যায়। কোন খৃষ্টান সন্ন্যাসিনী দার্জ্জিলিঙ্গ পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে করিতে এক গলিত কুষ্ঠরোগীকে পতিত হইতে দেখেন, অমনি অনুকম্পাবশতঃ তিনি তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন। এই ঘটনার অল্পকাল পরেই সেই হিতৈষিণী মহিলা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সে যাহাহউক কুষ্ঠরোগ যে পৈতৃক, তাহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ফাদার জেমিন্ এফ্রিকায় কুষ্ঠরোগাশ্রমে রোগী-দিগের শুশ্রূষা করিয়া স্বয়ং ঐ রোগে আক্রান্ত হয়েন; তাহাতে সভ্য জগতে এরূপ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় যে, অল্প সময়ের মধ্যেই এই বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে একটী কমিশন বসে। কমিশনের রিপোর্টপাঠে জানা যায় যে, অস্মদ্দেশে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদিগের মধ্যে এরোগের প্রাদুর্ভাব অধিক।

অধুনা ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশে, দক্ষিণ ভারতবর্ষে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও গড়োয়ালে; আশিয়ার মধ্যে ব্রহ্মদেশে, জেপান, চীনদেশে, এবং য়ুরোপের মধ্যে নরওয়ে, সিসিলি, মাল্টা, পর্টুগ্যাল, লেভান্ট ও ক্রাইমিয়া প্রভৃতি স্থানে এইরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহার প্রাদুর্ভাব শুনা যায়, এমন কি ঋগ্বেদেও ইহার উল্লেখ আছে *।

* Lancet. July 30. 1881.

* কাক্ষীবানের কন্যা ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেইজন্ত বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই। পরে

লক্ষণ।*

কুষ্ঠানাং পূর্ব্বরূপম্।

অতিশ্লক্ষ্ণ খরস্পর্শ স্বেদাস্বেদবিবর্ণতাঃ।
দাহঃ কণ্ডূস্ত্বচি স্বাপস্তোদঃ কোঠোন্নতিঃ ক্রমঃ॥
ব্রণানামধিকং শূলং শীঘ্রোৎপত্তিশ্চিরস্থিতিঃ।
রূঢ়ানামপি রূক্ষত্বং নিমিত্তেঽল্পেঽতিকোপনম্।
রোমহর্ষোঽসৃজঃ কার্ষ্ণ্যং কুষ্ঠ লক্ষণমগ্রজম্॥
ক্লম ইত্যত্র শ্রম ইতি পাঠান্তরম্।

পূর্ব্বলক্ষণ।—কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হ'বার পূর্ব্বে অঙ্গবিশেষে স্পর্শ অতি মসৃণ বা খর হইয়া পড়ে; অতিরিক্ত পরিমাণে ঘর্ম্ম-নির্গম, অথবা একবারে তাহার রোধ হইয়া থাকে। শরীর বিবর্ণ হয় এবং দাহ, কণ্ডু (চুলকানি গুড়গুড়ানি, দেহ মধ্যে পিপীলিকাদির সঞ্চরণবৎ), অঙ্গ বিশেষের ত্বকে স্পর্শশক্তির লোপ, সূচীবেধবৎ পীড়া, গাত্রের স্থানে স্থানে মণ্ডলাকার চিহ্ন প্রকাশ, ক্লান্তিবোধ, ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত যাতনা, ক্ষতের শীঘ্র উৎপত্তি, দীর্ঘকাল স্থিতি, অল্প কারণে অতিশয় প্রকোপ এবং উহা শুষ্ক হইলে অতিশয় কর্কশস্পর্শ হইয়া থাকে। এই সকল কারণের সহিত মধ্যে মধ্যে রোমাঞ্চ ও সমুদায় শরীরের রক্ত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে।

সাধারণ লক্ষণ।

মহাকুষ্ঠ সাত প্রকার; তাহাদের লক্ষণের পার্থক্য থাকিলেও কতকগুলি সাধারণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। এস্থলে তৎসমুদায়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। কুষ্ঠরোগ প্রথমে এত ধীরে ধীরে ও অলক্ষিত ভাবে আক্রমণ করে যে, সহসা তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সেই সময়ে বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিলে ক্লান্তি, শৈত্যানুভব, ক্ষুধারাহিত্য, নিদ্রালুতা, এবং অবসন্নতা প্রভৃতি দৌর্ব্বল্যসূচক এই সকল লক্ষণ প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু অল্পকাল পরে এইসকল লক্ষণ অদৃশ্য হয় এবং রোগী পূর্ব্ব উৎসাহ ও শক্তি পুনর্লাভ করে। কয়েক মাস পরে ঐ সকল লক্ষণ পুনর্ব্বার দেখা দেয়, তৎকালে তৎসমুদায়ের একটু গুরুত্ব দেখা যায়। এইরূপে কয়েকবার লক্ষণ সকল উদিত ও অন্তর্হিত হইলে উহার স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ম্যালেরিয়া বিষের আক্রমণে যেরূপ লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়, এই সকল প্রারম্ভ-লক্ষণের সহিত তৎসমুদয়ের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। এই জন্য অনেকে ইহাকে কুষ্ঠের অন্তঃস্ফুরণাবস্থা বলিয়া বর্ণন করেন।

এই সকল প্রারম্ভ লক্ষণ বার বার প্রকাশ পাইলে দুইটী সুস্পষ্ট লক্ষণ উদিত হয়, সমস্ত ত্বকের শোণিতাধিক্য ও কোন কোন স্থানের স্পর্শানুভূতির লোপ। এই শোণিতাধিক্য চক্রাকারে শরীরের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ হস্ত পদাদির মাংসল প্রদেশে প্রগাঢ়রূপে প্রকাশ পায়; সেই সঙ্গে মুখমণ্ডল ও গ্রীবা, হস্ত ও পদতল লাল হইয়া উঠে। এই সকল লক্ষণ এইরূপ অবস্থায় কিছুকাল প্রস্ফুটিত হইয়া কিছুদিনের জন্য যাপ্য থাকে; তাহার পর হঠাৎ জ্বর হয় এবং ঐ সমস্ত লক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়া

অশ্বিদ্বয়ের কৃপায় তিনি কুষ্ঠ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১১৭ সূক্ত।

উঠে; সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল চক্রাকার দাগের বর্ণ গাঢ়তর হইয়া থাকে।

কুষ্ঠরোগের রক্তিমা ফিকা, তাম্রবর্ণ অথবা বেগুনে। ইহা কমিয়া গেলে সেই স্থানের ত্বকে একপ্রকার বর্ণ রহিয়া যায় এবং তত্রত্য ত্বকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে এক প্রকার রস প্রস্রুত হওয়াতে তাহা ফুলিয়া উঠে। ত্বকের ছিদ্রগুলি বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠে; তৎকালে সেই আক্রান্ত ত্বক্ কমলালেবুর খোসার আকৃতি ধারণ করে। ক্রমে এই লালিমার গাঢ়তা কমিয়া আইসে, সেই সঙ্গে রোগ বাড়িয়া উঠে। শেষে গলিতভাব ধারণ করে। রোগীর মুখমণ্ডলে, নাসিকা ও কর্ণে এবং হস্ত ও চরণের অঙ্গুলি সমূহের সন্ধিস্থানে এই গলিতভাব অধিক দেখা যায়। আক্রান্ত স্থান মাত্রই যে, গলিত ও রসযুক্ত হয়, এমত নহে কোন কোন স্থান শুষ্ক, ভূষবৎ ও বন্ধুর হইয়া থাকে।

সকল আক্রান্ত স্থানেরই অনুভূতি শক্তি কিয়ৎপরিমাণে কমিয়া যায়। প্রথমতঃ কোনরূপ বেদনা বা যাতনা থাকে না, পরে রোগের বৃদ্ধি সহকারে স্থানে স্থানে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে।

এক্ষণে কাপালাদি মহাকুষ্ঠ সমুদায়ের লক্ষণাবলী ক্রমে ক্রমে বিবৃত হইতেছে।

কাপাল।

কৃষ্ণারুণ কপালাভং যদ্ রুক্ষং পরুষং তনু।
কাপালং তোদবহুলং তৎ কুষ্ঠং বিষমং স্মৃতম্॥

ইহা মিশ্রিত কৃষ্ণ লোহিত বর্ণবিশিষ্ট খর্পরের ন্যায় আভাযুক্ত রুক্ষ ও খরস্পর্শ। ইহাতে পীড়িত ত্বক্ অত্যন্ত পাতলা হইয়া পড়ে। সূচীবেধের ন্যায় নিরন্তর যাতনা হইয়া থাকে। এইরূপ কুষ্ঠ দুশ্চিকিৎস্য।

ঔডুম্বর।

রুগ্দাহরাগকণ্ডূভিঃ পরীতং রোমপিঞ্জরম্।
উডুম্বর-ফলাভাসং কুষ্ঠমৌডুম্বরং বদেৎ॥

উড়ুম্বর ফলের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট কুষ্ঠকে ঔড়ুম্বর কুষ্ঠ কহে। ইহাতে ব্যথা, দাহ ও কণ্ডু প্রবলরূপে বিদ্যমান থাকে এবং ব্যাধি স্থানের রোম সকল পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যায়।

মণ্ডল।

শ্বেতরক্তং স্থিরং স্ত্যানং স্নিগ্ধমুৎসন্নমণ্ডলম্।
কৃচ্ছ্রমন্যোন্য সংসক্তং কুষ্ঠং মণ্ডলমুচ্যতে॥

ইহা শ্বেতাভাসংযুক্ত রক্তবর্ণ, স্থির ভাবাপন্ন, আর্দ্র, উন্নত মণ্ডলবিশিষ্ট ও পরস্পর মিলিত। ইহা কষ্টসাধ্য ব্যাধি।

সিধ্ম।

শ্বেতং তাম্রং তনু চ যদ্ রজো ঘৃষ্টং বিমুঞ্চতি।
প্রায়েণোরসি তৎ সিধ্মমলাবুকুসুমোপমম্॥

ইহা শ্বেত বা তাম্রবর্ণ ও পাতলা ত্বক্‌সংযুক্ত। ইহা দেখিতে লাউফুলের ন্যায়। রোগস্থান ঘর্ষণ করিলে রজঃ সমূহ উত্থিত হয়। এই পীড়া দেহের মধ্যে প্রায় বক্ষঃস্থলেই হইতে দেখা যায়; কচিৎ অন্যাঙ্গেও হইয়া থাকে। ইহা ছুলি জাতীয় পীড়া বিশেষ।

কাকণ।

যৎ কাকণন্তিকাবর্ণমপাকং তীব্রবেদনম্।
ত্রিদোষলিঙ্গং তৎ কুষ্ঠং কাকণং নৈব সিধ্যতি॥

গুঞ্জা সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট (গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচের ন্যায় মধ্যে কৃষ্ণ,

অন্তে রক্তবর্ণ, অথবা মধ্যে লোহিত ও অন্তে কৃষ্ণবর্ণ) অপাকশীল, তীব্রবেদনাময় ও ত্রিদোষকৃত লক্ষণ সমূহযুক্ত কুষ্ঠকে কাকণ কুষ্ঠ কহে। ইহা অসাধ্য ব্যাধি।

পুণ্ডরীক।

সশ্বেতং রক্তপর্য্যন্তং পুণ্ডরীকদলোপমম্।
সরাগঞ্চৈব সোৎসেধং পুণ্ডরীকং তদুচ্যতে॥

যে কুষ্ঠের মধ্যভাগ শ্বেত বর্ণ, যাহা শ্বেত পদ্ম পত্র সদৃশ, অথবা ঈষৎ লোহিতাভাযুক্ত ও উন্নত, তাহাকে পুণ্ডরীক কুষ্ঠ বলে।

ঋক্ষজিহ্ব।

কর্কশং রক্তপর্য্যন্তমন্তশ্যাবং সবেদনম্।
যদৃক্ষজিহ্বাসংস্থানমৃক্ষজিহ্বং তদুচ্যতে॥

কর্কশস্পর্শ, অন্তে রক্তবর্ণ, মধ্যাংশে শ্যামবর্ণ, বেদনাযুক্ত ও ভল্লুকের স্থায় আকৃতিবিশিষ্ট কুষ্ঠকে ঋক্ষজিহ্ব বলে।

অতঃপর ক্ষুদ্রকুষ্ঠ সমূহের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠানাং মধ্যে
এককুষ্ঠগজচর্ম্মণোর্লক্ষণম্।

অস্বেদনং মহাবাস্তু মৎস্যশল্কোপমঞ্চ যৎ।
তদেককুষ্ঠং চর্ম্মাখ্যং বহলং গজচর্ম্মবৎ॥
চর্ম্মাখ্যং গজচর্ম্মাখ্যং চর্ম্মকুষ্ঠমিতি চ।
বহলং স্থূলং গজচর্ম্মবৎ রূক্ষং কৃষ্ণঞ্চ।

যে কুষ্ঠ ভেদ করিয়া স্বেদ নির্গত হয় না এবং যাহা বহ্বায়ত ও মৎস্যের ত্বক্ সদৃশ অর্থাৎ চক্রাকার অভ্রপত্র সদৃশ, তাহা এককুষ্ঠ * নামে অভিহিত।

গজচর্ম্মের স্থায় রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূলতাযুক্ত কুষ্ঠকে চর্ম্মকুষ্ঠ বা গজচর্ম্ম কুষ্ঠ কহে।

* এক অর্থে মুখ্য, ইহা ক্ষুদ্র সমুদয়ের মধ্যে মুখ্য অর্থাৎ প্রধান বলিয়া এককুষ্ঠ নামে অভিহিত।

চর্ম্মদল।

রক্তং সশূলং কণ্ডূমৎ সস্ফোটং দলয়ত্যপি।
তচ্চর্ম্মদলমাখ্যাতং স্পর্শাসহঞ্চ যৎ॥

রক্তবর্ণ, শূলব্যথিত কণ্ডূযুক্ত, স্ফোটকবিশিষ্ট, স্পর্শাসহিষ্ণু ও চর্ম্ম বিদারক কুষ্ঠকে চর্ম্মদল কহে।

বিচর্চ্চিকা।

সকণ্ডূঃ পিড়কা শ্যাবা বহুস্রাবা বিচর্চ্চিকা।

কণ্ডূবিশিষ্ট, শ্যামবর্ণ ও বহুপরিমাণে রসাদিস্রাবক পিড়কার নাম বিচর্চ্চিকা।

বিপাদিকা।

বৈপাদিকং পাদিপাণ্যোস্ফুটনং তীব্রবেদনম্॥

হস্তপদের বিদারক ও তীব্র বেদনাজনক ব্যাধিকে বৈপাদিক বা বিপাদিকা বলে।

পামা।

সাস্রাবকণ্ডূপরিদাহরূপাভিঃ
পামাণুকাভিঃ পিড়কাভিরন্যা।

স্রাব, কণ্ডূ, দাহ, ও বেদনাযুক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পিড়কার নাম পামা।

কচ্ছু।

স্ফোটৈঃ সদাহৈরতি সৈব কচ্ছুঃ
স্ফিক্পাণিপাদপ্রভবৈর্নিরূপ্যা॥

নিতম্ব, হস্ত ও পাদদেশে জাত দাহপরীত স্ফোটক সমূহ বিশিষ্ট পামাই কচ্ছু শব্দে অভিহিত হয়। এই দুইটী পীড়াই চলিত ভাষায় পাঁচড়া ও খোস নামে অভিহিত।

কতিপয় আচার্য্যের মতে বিচর্চ্চিকা ও বিপাদিকা অভিন্ন পীড়া; অপর কেহ কেহ বলেন যে, পামা ও কচ্ছু এক, কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিচর্চ্চিকা ও

বিপাদিকাকে ভিন্ন ভিন্ন পীড়া এবং পামা ও কচ্ছুকে অভিন্ন পীড়া বলিয়া মীমাংসা করাও মন্দ নহে।

দদ্রু।

সকণ্ডূরাগপিড়কং দদ্রুমণ্ডলমুদ্গতম।

কণ্ডূ, রক্তিমা ও পিড়কাবিশিষ্ট স্ফীতিযুক্ত এবং মণ্ডলাকারে উৎপন্ন ব্যাধিবিশেষ দদ্রু বা দদ্রুমণ্ডল নামে অভিহিত হয়।

বিস্ফোট।

স্ফোটাঃ শ্যাবারুণাভাসা বিস্ফোটাঃ স্যুস্তনুত্বচঃ।

শ্যাব বা কৃষ্ণবর্ণ, ক্ষতবৎ কর্কশস্পর্শ ও রুক্ষভাবাপন্ন ব্যাধি বিস্ফোটক নামে অভিহিত।

কিটিম।

শ্যাবং কিণখরস্পর্শং পরুষং কিটিমং স্মৃতম্।

শ্যাব বা কৃষ্ণবর্ণ, শুষ্ক ক্ষত স্থানের ন্যায় বন্ধুরস্পর্শ ও রুক্ষভাবাপন্ন ব্যাধিবিশেষকে কিটিম বলে।

অলসক।

কণ্ডূমদ্ভিঃ সরাগৈশ্চ গণ্ডৈরলসকং চিতম্।

কণ্ডূ ও রক্তিমাবিশিষ্ট বৃহৎ পিড়কা সমূহে আকীর্ণ ব্যাধিকে অলসক বলা যায়।

শতারু।

রক্তং শ্যাবং সদাহার্ত্তি শতারুঃ স্যাদ্ বহুব্রণম্।

রক্ত ও শ্যাববর্ণ দাহ ও বেদনা পরীত বহুব্রণরূপ পীড়াকে শতারু বলে।

এতদ্ব্যতীত সপ্তধাতুগত কুষ্ঠে যে সকল লক্ষণ প্রস্ফুটিত হয়, এস্থলে তৎসমুদয়ের সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

রসগত।

ত্বক্‌স্থে বৈবর্ণ্যমঙ্গেষু কুষ্ঠে রৌক্ষ্যঞ্চ জায়তে।
ত্বক্‌স্বাপো রোমহর্ষশ্চ স্বেদস্যাতিপ্রবর্ত্তনম্॥

রসগত কুষ্ঠে অঙ্গবৈবর্ণ্য, কুষ্ঠের রুক্ষতা, ত্বকের স্পর্শশক্তির লোপ, রোমাঞ্চ ও অধিক ঘর্ম্মনির্গম এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

রক্তগত।

কণ্ডূর্বিপূয়কৈশ্চৈব কুষ্ঠে শোণিতসংশ্রিতে।

রক্তাশ্রিত কুষ্ঠে কণ্ডূ ও অধিক পূয় সঞ্চয় হইয়া থাকে।

মাংসগত।

বাহল্যং বক্ত্রশোষশ্চ কার্কশ্যং পিড়কোদ্গমঃ।
তোদঃ স্ফোটঃ স্থিরত্বঞ্চ কুষ্ঠে মাংসসমাশ্রিতে॥

মাংসধাতুগত কুষ্ঠে কুষ্ঠের পুষ্টি, মুখশোষ, কুষ্ঠের কার্কশ্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কার উপরে সূচীবেধবৎ পীড়াস্ফোটকোৎপত্তি ও কুষ্ঠের অসঞ্চারিতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

মেদোগত।

কৌণ্যং গতিক্ষয়োঽঙ্গানাং সম্ভেদঃ ক্ষতসর্পণম্।
মেদঃস্থান গতে লিঙ্গং প্রাগুক্তানি তথৈবচ॥

কুষ্ঠ মেদোগত হইলে হস্তক্ষয়, গতিশক্তির লোপ, অঙ্গভঙ্গ, ক্ষতবিস্তার, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত রক্ত ও মাংসগত কুষ্ঠের লক্ষণ সমস্ত সঞ্জাত হয়।

অস্থি ও মজ্জাগত।

নাসাভঙ্গোঽক্ষিরাগশ্চ ক্ষতেষু ক্রিমিসম্ভবঃ।
স্বরোপঘাতশ্চ ভবেদস্থিমজ্জসমাশ্রিতে॥

কুষ্ঠ অস্থি মজ্জা ধাতুকে আশ্রয় করিলে নাসাভঙ্গ ও নেত্রলোহিত্য ঘটে

পীড়া প্রবল হইলে চক্ষুর ধ্বংস পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ক্ষত সমূহে ক্রিমির উৎপত্তি ও স্বরভঙ্গ এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

শুক্রগত।

দম্পত্যোঃ কুষ্ঠবাহুল্যাদ্দুষ্ট শোণিতশুক্রয়োঃ।
যদপত্যং তয়োর্জাতং জ্ঞেয়ং তদপিকুষ্ঠিতম্॥

কুষ্ঠ বাহুল্যহেতু সদোষ শোণিত শুক্র সম্পন্ন দম্পতী হইতে যে অপত্য উৎপন্ন হয়, তাহাকেও কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

খরং শ্যাবারুণং রুক্ষং বাতকুষ্ঠং সবেদনম্।
পিত্তাৎ প্রকুপিতং দাহরাগস্রাবন্বিতম মতম॥
কফাৎ ক্লেদি ঘনং স্নিগ্ধং সকণ্ডু শৈত্যগৌরবম্।
দ্বিলিঙ্গং দ্বন্দ্বজং কুষ্ঠং ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকম্।

বাতজনিত কুষ্ঠ কর্কশস্পর্শ, শ্যাব বা অরুণবর্ণ, রুক্ষভাবাপন্ন ও বেদনাবিশিষ্ট; পিত্ত কুষ্ঠ পূতি, ক্লেদ, দাহ, রক্তিমা ও স্রাবযুক্ত এবং কফজ কুষ্ঠ ক্লেদবিশিষ্ট, পুষ্ট, স্নিগ্ধ কণ্ডুব্যাপ্ত, শীতল ও গুরুতাসম্পন্ন হইয়া থাকে। কোন দোষদ্বয় কৃত তত্তদ্ দোষকৃত লক্ষণ সমূহ বিশিষ্ট এবং ত্রিদোষজনিত কুষ্ঠ উল্লিখিত সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন হয়।

ভাবীফল।

সাধ্যং ত্বগ্‌রক্তমাংসস্থং বাতশ্লেষ্মাধিকঞ্চ যৎ।
মেদোগং দ্বন্দ্বজং যাপ্যং বর্জ্জ্যং মজ্জাস্থিসংশ্রিতম্॥
ক্রিমিতৃড়্‌দাহমন্দাগ্নি সংযুক্তং যৎ ত্রিদোষজম্॥

ত্বক্, রক্ত ও মাংসগত এবং বাত শ্লেষ্মোল্বণ কুষ্ঠ সাধ্য। মেদোগত দ্বন্দ্বজ কুষ্ঠ যাপ্য। মজ্জা ও অস্থিধাতু প্রাপ্ত এবং ক্রিমিব্যাপ্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও মন্দাগ্নি সংযুক্ত এবং ত্রিদোষোল্বণ কুষ্ঠ অসাধ্য।

অরিষ্ট লক্ষণ।

প্রভিন্নং প্রস্রুতাঙ্গঞ্চ রক্তনেত্রং হতস্বরম্।
পঞ্চকর্ম্ম গুণাতীতং কুষ্ঠং হন্তীহ মানবম্॥

যে কুষ্ঠ বিদীর্ণ, যাহা হইতে রসাদি স্রুত হয়, যাহার আক্রমণে রোগীর নেত্র লোহিতবর্ণ ধারণ করে এবং স্বরভঙ্গ হয় এবং যে কুষ্ঠে বমনাদি পঞ্চক্রিয়ারূপ চিকিৎসা দ্বারা কোন ফল দর্শে না, সেই সমুদায় কুষ্ঠ অসাধ্য।

শ্বিত্র বা ধবল।

ইহাও এক প্রকার উৎকট চর্ম্মরোগ। কুষ্ঠ ও শ্বিত্র একই কারণে জনিত হয়। তবে উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ যে, কুষ্ঠ সান্নিপাতিক, শ্বিত্র পৃথগ্‌ভূত বায়ু, পিত্ত কফ দ্বারা উৎপন্ন হয়। কুষ্ঠ রসাদি সপ্ত ধাতুকেই আক্রমণ করে। ইহা কেবল রক্ত, মাংস ও মেদ এই তিনটী ধাতুকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। কুষ্ঠ হইতে রসাদি স্রুত হয়, কিন্তু শ্বিত্র প্রথমে ত্বক্‌কে আশ্রয় করিয়া পরে রক্ত ও মাংসকে আশ্রয় করে এবং তৎকালে ইহা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। তখন ইহা কিলাস সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

নিদান।—বাতজ শ্বিত্র রুক্ষ ও ঈষৎ লোহিতবর্ণ, পৈত্তিক শ্বিত্র তাম্রবর্ণ বা পদ্মপত্রের ন্যায় মধ্যে শ্বেত ও অন্তে লোহিতবর্ণ, দাহযুক্ত ও তৎস্থানের লোমনাশক। কফজ শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ, পুষ্ট, গুরুতাযুক্ত ও কণ্ডুবিশিষ্ট। বাতজ শ্বিত্র রক্তাশ্রিত, পিত্তজ শ্বিত্র মাংসাশ্রিত এবং কফজ শ্বিত্র মেদোগত। উভয়বিধ শ্বিত্রই দোষভেদে উক্ত বর্ণবিশিষ্ট হইয়া

থাকে। এই ত্রিবিধ অবস্থাপ্রাপ্ত শ্বিত্র যথাক্রমে কৃচ্ছ্রসাধ্য।

শ্বিত্রন্তু দ্বিবিধং বিদ্যাদ্ দোষজং ব্রণজং তথা।

শ্বিত্র দুই প্রকার; যথা বাতাদি দোষজাত ও ক্ষতোৎপন্ন। অগ্নিদাহজ শ্বিত্র ব্রণজ অর্থাৎ ক্ষতজ শ্বিত্রেরই অন্তর্ভূত।

যে শ্বিত্রস্থানের লোম সকল শুক্লবর্ণ হয় নাই, যাহা পাতলা, পরস্পর অসংযুক্ত ও অচিরোৎপন্ন এবং যাহা অগ্নিদাহোৎপন্ন নহে, তাদৃশ শ্বিত্র সাধ্য। ইহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত শ্বিত্র অসাধ্য।

মেঢ্র, যোনি, হস্ততল ও পদতলে উদ্ভূত শ্বিত্র অচিরোৎপন্ন হইলেও অসাধ্য। শ্বিত্র অতি দুশ্চিকিৎস্য রোগ। এই রোগে পীড়িত ব্যক্তি অতি কুৎসিতদর্শন হইয়া থাকে; এই জন্য ইহা কুষ্ঠবৎ ঘৃণিত। কিন্তু ইহা কুষ্ঠের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক বা অঙ্গবিধ্বংসক রোগ নহে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে সামান্য চর্ম্মরোগ বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়। ইহা অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ দেহের বিশেষ অনিষ্ট-সাধনে ইহার শক্তি নাই বটে, কিন্তু ইহা যে, অতি দুঃসাধ্য বা অসাধ্য, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

চিকিৎসা।

সর্পির্বাতোত্তবে কুষ্ঠে বমনং শ্লেষ্মসম্ভবে।
পৈত্তে বিরেচনং শস্তং তথা শোণিতমোক্ষণম্।

বায়ুপ্রধান কুষ্ঠে ঘৃতপান, শ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে বমন এবং পৈত্তিক কুষ্ঠে বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ বিধেয়।

দূর্ব্বাভয়া সৈন্ধব চক্রমর্দ্দ
কুঠেরকাঃ কাঞ্জিকতক্রপিষ্টাঃ।
প্রলেপরূপাঃ অপি বদ্ধমূলাং
কণ্ডূঞ্চ দদ্রুঞ্চ নিবারয়ন্তি॥

দূর্ব্বা, হরীতকী, সৈন্ধবলবণ, চাকুন্দাবীজ ও তুলসীপত্র এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজি ও ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডু ও দদ্রুর শান্তি হয়।

বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, কুড়, হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ ও সর্ষপ এই কয়েকটি দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু নষ্ট হইয়া থাকে। আমাদিগের

দদ্রুহর চূর্ণ

এই রোগের মহৌষধ। ইহা যথাবিধি ব্যবহার করিলে ত্বরায় সকল প্রকার দদ্রু উপশমিত হইয়া থাকে।

চাকুন্দেবীজ, কুড়, সৈন্ধবলবণ, শ্বেতসর্ষপ, ও বিড়ঙ্গ এই সমুদায় কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু ও সিধ্ম (ছুলি) নামক কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

রোগীর গাত্রে তৈল মাখাইয়া সোঁদালপত্র, কাকমাচীপত্র ও করবীপত্র তক্রের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা উদ্বর্ত্তন (গাত্রমার্জ্জন) করিয়া দিবে।

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হরীতকী, হাকুচবীজ, শ্বেতসর্ষপ, ডহরকরঞ্জবীজ, হরিদ্রা, ও আকন্দপত্র এই সমুদায় সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নাশ হয়।

কালকাসন্দার মূল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু ও কিটিম নামক কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

সোঁদালপাতা কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু, কিটিম ও সিধ্ম নামক কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

চাকুন্দেবীজ সিজের আটায় ভাবনা দিয়া এবং গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া সূর্য্যকিরণে কিঞ্চিৎ তপ্ত করিয়া প্রলেপ দিলে কিটিম রোগ নষ্ট হয়।

আপাংপত্রের রসে পিষ্ট মূলার বীজ অথবা হরিদ্রা সংযুক্ত কদলীপত্রের ভস্ম প্রলেপ দিলে সিধ্ম রোগ নষ্ট হয়। এই সকল ক্রিয়ার সহিত আমাদের

সুধাংশুদ্রব

ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার ছুলি বিনষ্ট হইয়া যায়।

চাকুন্দেবীজ, তিল, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, পিপুল, সৈন্ধব, সচল ও বিট এই সমুদায় দ্রব্য ৩ দিবস দধির মাতে ভিজাইয়া রাখিয়া দুর্গন্ধ হইলে তদ্দারা বিচর্চ্চিকা দদ্রুতে প্রলেপ দিবে।

মেটেসিন্দুর ও মরিচচূর্ণ মহিষ দুগ্ধের নবনীতের সহিত মিশাইয়া বারংবার প্রলেপ দিলে অথবা করবীমূলের কল্কে সিদ্ধ তৈল মর্দ্দন করিলে পামারোগ প্রশমিত হয়।

পারদ, শঙ্খভস্ম, গন্ধক, মনছাল, রাখালশশার মূল, চাকুন্দেবীজ, রাস্না, বরুণছাল, চিতামূল, ঈশলাঙ্গলা, ভেলার মুটী, গৃহের ঝুল, বকমূল, কুঁচ, সিজের আটা, নিমছাল, পুরাতন গুড়, মধু ও সোমরাজীবীজ এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্র কিম্বা কাঁজিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু, বিচর্চ্চিকা ও কণ্ডূ নষ্ট হয়।

বিষ, বরুণছাল, হরিদ্রা, চিতামূল, গৃহের ঝুল, ভেলা, মরিচ ও দূর্ব্বামূল এই সমুদায় দ্রব্য আকন্দের ও সিজের আটার সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে নানাবিধ কুষ্ঠ নষ্ট হইয়া থাকে, ভেলা, চিতামূল, সিজমূল, আকন্দের মূল, কুঁচফল, ত্রিকটু, শঙ্খচূর্ণ, তুঁতিয়া, কুড়, অশ্বলবণ, যবক্ষার, ও ঈশলাঙ্গলা এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া সিজের আটা ও আকন্দের আটার সহিত একত্রে লৌহপাত্রে পাক করিবে। ইহা শলাকা দ্বারা কুষ্ঠে লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহাতে অন্যান্য রোগেরও উপশম হয়।

একটা নারিকেলের অভ্যন্তরে কতকগুলি তণ্ডুল নিক্ষেপ করিয়া কিছুদিন রাখিলে ঐ সকল তণ্ডুল পচিয়া গেলে তদ্দারা বিপাদিকায় প্রলেপ দিবে; ইহাতে উক্ত রোগের শান্তি হয়।

তিলমূল, সৈন্ধবলবণ, গোমূত্র ও কটুতৈল এই সমুদায় দ্রব্য লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া প্রলেপ দিলে পাদস্ফোট নিবারণ হয়।

সোমরাজী, কালকাসন্দার পত্র, চাকুন্দের বীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও সৈন্ধবলবণ এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া দধির মাত ও কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডূ ও কচ্ছু উপশমিত হয়।

কাঁচা বাসকপত্র ও হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া তিন দিবস ক্রমাগত প্রলেপ দিলে কচ্ছুরোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

কাকমাচি, চাকুন্দেবীজ, কুড় ও পিপুল, ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্র (ধবল) রোগ নষ্ট হয়। নাটাকরঞ্জ, আকন্দ সিজ, সোঁদাল, ও জাতী—ইহাদের পত্র গোমূত্রে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্র ও দদ্রু প্রভৃতি নানারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। হস্তী ও চিতাবাঘের চর্ম্মভস্ম করিয়া কটুতৈলের

সহিত অথবা পাহুড়িয়া পোকা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ধবলরোগ নষ্ট হইয়া যায়।

সোমরাজী বীজ ৪ পল ও হরিতাল ১ পল, এই উভয় দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্ররোগ নষ্ট হইয়া ঐ স্থান স্বাভাবিক বর্ণ পুনর্লাভ করে।

ধাত্রীখদিরয়োঃ কাথং পীত্বা চ মধুসংযুতম্।
শঙ্খকুন্দেন্দুধবলং জয়েচ্ছিত্রং ন সংশয়ঃ॥
ধাত্রীখদিরয়োঃ কাথমবল্গুজবীজোঽন্বিতম্।
পীত্বা শঙ্খেন্দুকুন্দাভং হন্তি শ্বিত্রং ন সংশয়ঃ॥

আমলকী ও খদির এই উভয়ের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু অথবা সোমরাজী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শঙ্খকুন্দেন্দু সদৃশ ধবলকুষ্ঠ হইতে আরোগ্যলাভ করিতে পারা যায়। ধবল রোগের আরও নানাবিধ ঔষধ আয়ুর্ব্বেদে বর্ণিত আছে, বাহুল্যভয়ে তৎসমস্তের উল্লেখ করা গেল না। যাঁহারা ইহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, আমাদের ভৈষজ্য-রত্নাবলী পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

কুষ্ঠরোগে এতদ্ব্যতীত নানাবিধ তৈল ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে শ্বিত্রপঞ্চাননং তৈল, করবীর তৈল, কুষ্ঠরাক্ষস তৈল, কুষ্ঠকালানল তৈল, ষড়বিন্দু তৈল, সোমরাজী ও বৃহৎ সোমরাজী তৈল, মরিচাদ্য তৈল ও পৃথ্বীসার প্রভৃতি তৈল বিশেষ উপকারী।

এই সকল বিবিধ প্রকার কুষ্ঠে জ্যোতিষ্মান্ রস, উদয়ভাস্কর, অমৃতাঙ্কুর লৌহ, মহাভল্লাতক গুড়, রসমাণিক্য, তালকেশ্বর, মহাতালকেশ্বর প্রভৃতি ঔষধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আমাদিগের আবিষ্কৃত

মাহেশ্বর চূর্ণ

এই রোগের মহৌষধ। ইহা সেবন করিলে উৎকট বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগ নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়। এমন কি ত্বক্ স্ফুটিত এবং অঙ্গুলি সমুদয় আকুঞ্চিত, বক্র ও ক্ষতবিশিষ্ট হইলেও রোগী যদি এই ঔষধ নিয়মিত সেবন করে, রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে।

আগমনী।

এস মা আমার, সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়রূপিণি! আদ্যাশক্তি মহামায়ে! একবার এস! আজি কোটী কোটী হিন্দু-সন্তান করজোড়ে কাতরকণ্ঠে তোমাকে ডাকিতেছে;—একবার অসুরনাশিনী, গণেশজননী, বরাভয়-প্রদায়িনী মূর্ত্তিতে ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হও—মনের অন্ধকার দূর হউক, পাপতাপ দূরে যাউক, শোকসাগরে নিমগ্ন বঙ্গভূমি তোমার অভয়-চরণ সাহায্যে তীরে উঠুক! মাগো! এক মুহূর্ত্তও যাহা-দের সুখে অতিবাহিত হয় না, আজি দ্বাদশ মাস ধরিয়া তাহারা তোমার আসার আশায় বুক বাঁধিয়া রহিয়াছে; আশাপূর্ণে! একবার দেখা দিয়া তাহা-দিগের আশা পূর্ণ কর।

জননি! হিন্দুর শক্তি বহুদিন লোপ পাইয়াছে; হিন্দুর আশাভরসা অনেক দিন হইল অস্তমিত হইয়াছে; তথাপি সাতশত বৎসরের কঠোর দাসত্ব সহিয়াও এখন ও যে আমরা বাঁচিয়া আছি, তাহা কেবল তোমারই করুণাগুণে। নৈরাশ্যের অন্ধকারে—শোক দুঃখের অতলসাগরে নিমগ্ন হিন্দুর হৃদয় যখন অনন্ত অন্ধকারে ডুবিবার উপক্রম করে, তখনই তুমি আসিয়া তাহার উদ্ধার কর। তোমার আগমনে তিন দিনে যে তড়িৎতেজে তাহার হৃদয় অনুপ্রাণিত হয়, সম্বৎসরের সমূহ দুঃখ যাতনা সহিয়া তাহা কথঞ্চিৎ সজীব থাকে। আজি সম্বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল,—আর তাহা থাকে না; তাই শক্তিরূপিণি! তোমাকে কাতর-ভাবে কোটীকণ্ঠ মিলাইয়া ডাকি-তেছি,—মা একবার এস!

মূলাপ্রকৃতি! তুমি আসিবে বলিয়া সমগ্র বিশ্বসংসার—সুবিশাল প্রকৃতি-রাজ্যও আজি আশা-প্রোৎফুল্ল নয়নে তোমাকে অভ্যর্থনা করিতেছে। নিদা-ঘের কঠোর তাপ—বর্ষার প্লাবনপীড়ন—সহিয়াও তাহা কেবল তোমারই জন্য বাঁচিয়া রহিয়াছে। সুনির্ম্মল শারদ আকাশে শশাঙ্ক সুমধুর হাস্যে দশদিক উজ্জ্বল করিয়া অমৃতকর-স্পর্শে সকলকে সজীব করিতেছে,—নদনদীর আর সে আবিলতা—সে উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গ নাই;—সরোবর প্রাবৃটের সে মলদিগ্ধ শোক-বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছ ও বিমল বসন ধারণ করিয়াছে; কুমুদ, কহ্লার, কোকনদ, উদার হাস্য দ্বারা তাহার প্রসন্ন বক্ষ অলঙ্কৃত করিতেছে; কমল-মালার শুভ্র বদন তাহার স্বচ্ছ বক্ষে অনন্ত শুভ্রতার তরঙ্গ তুলিতেছে। কাননে—পথপার্শ্বে শুভ্র কাশ কুসুম-রাশি তোমার জন্য শ্বেত আস্তরণ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। সুমন্দ সমীরণ পদ্মগন্ধে বিভোর হইয়া বিশ্ববাসিগণের কাণে কাণে তোমার আগমনী গীতি গাহিতেছে। আকাশ পৃথিবী সকলই যেন শান্ত রসের আস্পদ অনন্ত শুভ্রতায় গুণ্ঠিত হইয়াছে।

মাতঃ, শৈলসুতে! গিরিরাজের গগন-ভেদী শৃঙ্গ-রাজি এতদিন রাশি রাশি তুষারে আচ্ছন্ন ছিল, আজি তাহাদের হিমানী খসিয়া পড়িয়াছে:—অনন্ত

শৃঙ্গমালা নীল নভস্তলে নীল তরঙ্গমালার স্থায় মিলিত হইয়াছে। নীলে—নীলে, বিমলে—বিমলে আজি অনন্ত মিলন। আকাশের নক্ষত্র, গিরিগাত্রে নানাবর্ণের কুসুমস্তবক,—অপূর্ব্ব শোভা! সেই সমস্ত কুসুমস্তবক গিরিরাজের স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া মা! তোমার সোপান-পংক্তির উপরে যেন মখমল বিছাইয়া রাখিয়াছে। কৈলাসবাসিনি! এস মা, কৈলাস হইতে তিন দিনের জন্ত নামিয়া আইস। আমরা প্রাণ ভরিয়া তোমার পূজা করিব।

অন্নপূর্ণে! যখন নববর্ষের অভ্যুদয়ে জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিলেন মা এবার নৌকায় আসিবেন ও ঘোটকে যাইবেন, বঙ্গবাসীর মন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। বঙ্গ কৃষিপ্রধান দেশ,—কৃষিই বাঙ্গালীর উপজীবিকা, কৃষিজাত দ্রব্যই বাঙ্গালীর সার সম্পত্তি। মা নৌকায় আসিবেন, দেশ জলে পূর্ণ হইবে;—শস্তক্ষেত্রে ধান্তস্তম্ব আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন হইয়া, দেবীর অভ্যর্থনার নিমিত্ত আপনাদের শরীর দ্বারা সবুজ মখমল ছড়াইয়া রাখিবে; কিন্তু দয়াময়ি! সে আশা পূর্ণ হইল কৈ? আজি বঙ্গের অধিকাংশ স্থল শুষ্ক ও বন্ধুর,—অধিকাংশ শস্তক্ষেত্র মরুভূমিতে পরিণত! কৃষকেরা কামরূপী জলদকুলের প্রতি বার বার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিয়া শেষে হতাশ হইল,—কৈ মেঘ ত বর্ষণ করিল না! বঙ্গের দরিদ্র কৃষকেরা একে দুই বেলা উদর পূরিয়া খাইতে পায় না, তাহার উপর আবার যখন অজন্মা হইল, তখন তাহাদের আর উপায় কি? হায়! মা, এই কি তোমার অন্নপূর্ণা নামের সার্থকতা?

কি পাপে বাঙ্গালী এত কষ্টে পড়িল? কেন তাহার উপর দেবতাকুলের এত আক্রোশ? যাহারা মা বৈ আর কিছু জানে না, মাকে দেখিবে বলিয়া যাহারা রোগ, শোক, তাপ, দুঃখ, সকলই ভুলিয়া যায়, মায়ের পূজা করিবে বলিয়া যাহারা পেটে না খাইয়াও সম্বৎসর ধরিয়া আয়োজন করে, তাহাদের এত দুর্দ্দশা কেন? মহামায়ে! এ তোমার কি মায়া? জননি! বঙ্গ হইতে পঞ্চনদ, হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি,—যে কালিকাপুরী * এককালে তোমার খড়্গাঘাতে শুম্ভ নিশুম্ভের শোণিতে সিক্ত হইয়াছিল, তাহার শৈল-প্রাকারে দাঁড়াইয়া তোমার আদিম লীলাস্থলী দেখিয়াছি; প্রয়াগ, কাশী, মগধ, মহারাষ্ট্র—সর্ব্বত্রই পর্য্যটন করিয়াছি, কিন্তু একমাত্র বঙ্গ ভিন্ন অন্য কোথাও তোমার পূজার এত আয়োজন—এত আড়ম্বর দেখি নাই। বলিতে কি, বঙ্গবাসী তোমার নামে সকল ভুলিয়া যায়। সেই মাতৃভক্ত—মাতৃগতপ্রাণ বাঙ্গালীর আজি এ দুর্গতি কেন?

দুর্গে! আগম নিগমে লিখিত আছে, যে বিপদে পড়িয়া একবার প্রাণ ভরিয়া "দুর্গা" "দুর্গা" বলিয়া ডাকে, তাহার সকল বিঘ্ন বিপদ দূর হয়। এ কথা কি এতদিনে বিফল হইল? লোকের জীবনে দুইবার কি চারিবার বিপদ হয়, কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গবাসীর ত নিত্য বিপদ!

* শিমলা শৈলে আরোহণ করিতে হইলে কাল্‌কা ষ্টেসনে রেলগাড়ী হইতে নামিতে হয়; কথিত আছে, এই কালিকাতেই (কালিকাপুরী) শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ হইয়াছিল।

সাত শত বৎসর পূর্ব্বে কুদিনে—অতি কুক্ষণে স্বদেশদ্রোহী, স্বজাতিবৈরী পাপ জয়চাঁদের কাপুরুষতায় ভারতে যে কাল রাত্রি প্রবেশ করিল, আর তাহা পোহাইল না। পৃথ্বীরাজ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহ, শিবজি প্রভৃতি বীরগণ তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত স্বহস্তে স্ব স্ব হৃৎপিণ্ডচ্ছেদন করিয়া বলি দিলেন, তথাপি সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলেন না। লাভের মধ্যে যাতনা গাঢতর হইল, কাল রাত্রির গভীরতা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল! তাই বলিতেছি, মা, আমাদের চির বিপদ। লোকে একটা বিপদে পড়িলে জীবনে হতাশ হইয়া পড়ে;—আজি রোগ, শোক, অন্নাভাব আমাদিগকে অষ্টে পৃষ্ঠে আক্রমণ করিয়াছে; রাজরোষ ও করভার ইহার উপর দাবাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়াছে, আত্মবিচ্ছেদ ইহাতে অনুকূল পবন তুলিয়াছে;—বাঙ্গালীর প্রাণ আর বাঁচে কিসে? তাই বলিতেছি দুর্গে! দুর্গা নামের কি এই ফল! জননি! শুনিয়াছি ভক্ত তোমার কাছে যাহা চায়, তাহাই পায়। আমরা তোমার কাছে ঐশ্বর্য্য চাহি না, গৌরব চাহি না;—চাহি কেবল এই যে, দরিদ্র বঙ্গসন্তান যেন দুইবেলা পেট পুরিয়া খাইতে পায়। অন্নাভাবে হাহাকার আর কতদিন শুনিবে? সম্বৎসর পরে তিনদিনের জন্য মর্ত্তে অবতরণ করিয়া যদি গৃহে গৃহে তোমাকে রোদনই শুনিতে হইল, তাহা হইলে তোমার আগমনেরই বা সার্থকতা কৈ? যাঁহার কটাক্ষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যাঁহার হস্তে ক্রীড়নক সদৃশ, সেই আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি মহেশ্বরীর পদার্পণে যদি ভক্তের দুঃখ না ঘুচিল, যদি দেশের দুর্দ্দশা দূর না হইল, তাহা হইলে তাহাদের বাঁচিয়া সুখ কি? যদি বাঁচিয়া থাকিয়া চির জীবন যাতনাই ভোগ করিতে হইল, তবে বাঁচিয়া কি হইবে?—ইহা মরণ অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর। তবে লও মা! তোমার প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই চির-দুঃখময় বঙ্গদেশ গ্রাস কর;—অথবা ইহাকে অনন্ত প্লাবনে প্লাবিত করিয়া এই একার্ণবীভূত দেশের উপর তোমার চরণরূপ তরণী চালিত কর; হতভাগ্য আমরা অনন্ত মোক্ষ লাভ করি;—এ মহাশ্মশানে আত্মবিস্মৃত পিশাচ ভৈরবের তাণ্ডব নৃত্য—এ বেতালের ছায়াবাজী আর দেখিতে পারি না।

এই কি সে দিন।

এই কি সে জীবনের সুখ-ময় দিন ?
যার লাগি এত কাল
বহি হৃদে জন্‌জাল
সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, হয়ে গেছে ক্ষীণ,
এই কি সে দিন ?

আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষাগুলি
শৈশবের খেলাধূলি,
জননীর মধুময় সুধা কণ্ঠ-বীণ ;
ক্ষুদ্র হৃদে ক্ষুদ্র আশা
দিত সুখ ভালবাসা,
ছিল তৃপ্তি হৃদি ভরি জানিত না হীন।

পদে পদে এত আন
কভু না করিত ম্লান,
কপটতা—প্রবঞ্চনা, কভু না জানিত ;
কি সুখে কি মহাদুখে
থাকিত মায়ের বুকে
শোক, তাপ যেত ভুলে, তখনি হাসিত।

সে যে হৃদি প্রেম-ভরা
ভাঙা বুক দিত যোড়া ;
জ্বালার জগতে সে যে শান্তি নিকেতন ;
স্নেহের অমৃত-ধারা
সে যে প্রাণ মাতোয়ারা
শরৎ পূর্ণিমা নিশি, বিহগ-কূজন।

জীবন প্রভাত কালে
ছিল প্রাণ কুতূহলে
অভাব না ছিল কিছু, পূর্ণ হৃদি দ্বার ;
নাহি ছিল হা হুতাশ !
বিরহীর দীর্ঘশ্বাস ;
ছিল না পরাণ কভু বৃথা বোঝাভার।

এখন এ যৌবনের
বুঝিতে পারিনে ফের,
হৃদয়ে না পাই কূল, সদা অন্তহীন ;
যত দিন হয় গত
অভাব বাড়ে গো তত,
এ যে গো আকাঙ্ক্ষা ভরা দুনিয়া মেশিন !
এই কি সে দিন ?

সন্ধ্যায়।

পশ্চিম গগন গায়
এলাইয়া শ্রান্তকায়
ক্রমশঃ ডুবিছে রবি, আসিছে আঁধার।
ক্ষুদ্র তটিনীর বুকে
হেলিয়া দুলিয়া সুখে
তরী গুলি চ'লে যায় দূর দেশ পার।
শ্রমকরি সারাদিন
হলস্কন্ধে দীনহীন
কৃষকেরা ফিরিতেছে গৃহে আপনার।
সরলতার আধার
ছেলেমেয়ে পত্নী তার
আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষায় তার।
নিকটে আসিলে চাষী
অমনি মধুর হাসি
শিশু গুলি ছুটে গিয়ে পড়ে তার গায়।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি যত
সেইক্ষণে অবগত,
এমনি মানব মুগ্ধ সংসার মায়ায় !
সন্ধ্যায় তটিনী কূলে
ক্ষুদ্র সংসারটি ভুলে
আমরা দুইটি বন্ধু ছিনু মুগ্ধ চিতে।
সুদূর ভবিষ্য ঘরে
আশার তুলিকা ধরে
কতকি সুখের চিত্র ছিলাম আঁকিতে।
সহসা সে অস্তমান
রবি পানে দেখিলাম
কি এক উদাস ভাবে চেয়ে গেল প্রাণ।
ভাবিনু ঐ রবি মত
এই জীবনেরো যত
আছে উষা, আছে সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন বিধান।
ওই তপনের(ই) মত
সাধি নিজ নিজ ব্রত
অবশেষে ডুবে যায় এমনি সন্ধ্যায়।
প্রাণের বন্ধনগুলি
একে একে যায় খুলি,
ছায়ার মতন নয় ভালবাসা হায় !
দেখিলাম—বুঝিলাম
তবু এ অবুঝ প্রাণ
বুঝ্ না মানিল হায়। পুনঃ স্নেহ ডোরে
বাঁধিলাম পরস্পরে অন্তরে অন্তরে !

সমালোচনা।

প্রেম—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, প্রণীত, মূল্য ১৲ এক টাকা। সম্প্রতি আমরা সমালোচনার্থ একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থ খানির নাম "প্রেম"; রচয়িতা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ সিংহ। হেমেন্দ্র বাবু নিশ্চয়ই প্রেমিক, তাহা না হইলে তাঁহার হাত দিয়া প্রেমের এমন যশোগীত বাহির হইত না। গ্রন্থকার যখন প্রেমিক, তখন তিনি যে কবি তাহা বলা বাহুল্য। গদ্যে লিখিলেই যে কবি হওয়া যায় না, এই সেকেলে ভাব চলিয়া গিয়াছে। এখন আমাদের ধারণা, "রসাত্মক বাক্য" গদ্যে লিখিলেও আমরা তাঁহাকে কবি বলিতে পারি। ইহাই কবির লক্ষণ ধরিলে আমরা হেমেন্দ্র বাবুকে নিশ্চই কবি বলিব। তিনি এরূপ ভাবাত্মক বিষয় এত সুন্দর কথায় সমাবেশ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে কবি না বলিয়া থাকিতে পারি না। স্বীকার করি, তাঁহার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে অপরের অনেক উদ্ধৃত অংশ আছে। থাক্ কিন্তু কবি না হইলে সেই সকল পুষ্প লইয়া এমন সুন্দর মালা গাঁথিতে পারিত কে? উদ্ধৃত অংশ যেন একটু অতিরিক্ত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে সে দোষ মার্জ্জনীয়। আমরা তাঁহার নিজের উক্তি হইতে দুএকটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার হৃদয়ের প্রতিচ্ছায়া দেখেতি চেষ্টা করি।

"জ্ঞান আত্মার শোভা। প্রেম আত্মার সৌরভ। জ্ঞান স্বর্গীয় আলোক। প্রেম স্বর্গের সোপান। জ্ঞান পথ প্রদর্শক। প্রেমই পথ। জ্ঞান অন্ন। প্রেম রস। জ্ঞান পল্লব। প্রেম পুষ্প।" পৃঃ ৬

"প্রেম অনন্তের দ্বার। প্রেম বিন্দুর মধ্যে প্রবেশ কর, অনন্তের ছায়া দেখিতে পাইবে। বিন্দুর অন্তরালে সিন্ধুর আভাস পাইবে। সিন্ধু ও বিন্দুর একতার তাৎপর্য্য প্রেমের অভিধানেই মিলে।" পৃঃ ৭

এই শেষ অংশে লিখিত প্রেমের উদার ও কেন্দ্রগত ভাবের প্রতিধ্বনি নূতন জগতের কবিশ্রেষ্ঠ ওয়াল্ট হুইটম্যানের প্রত্যেক কবিতায় দেখিতে পাই। হুইটম্যান তাঁহার প্রথম কবিতা হইতেই এই ভাবের মূল মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

হেমেন্দ্র বাবুর ভাষা সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, ইহা সরল প্রেমের ভাষা। তিনি প্রেমিক বলিয়াই ভাষার চাকচিক্যের প্রতি অত্যধিক দৃষ্টি করেন নাই। হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্যই ভাষা—"প্রেম"গ্রন্থে প্রেমিক হৃদয়ের ভাব সুব্যক্ত হইয়াছে। প্রেম সম্বন্ধে ঠিক অনেক ভাব তাঁহার হৃদয়ে আসিয়াছিল বলিয়াই গ্রন্থকার এত স্পষ্ট ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন।

প্রভা—মাসিক পত্রিকা ও "সমালোচনা।" শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইহা একখানি অতি ক্ষীণ-কলেবর মাসিক পত্র, অল্পদিন হইল জন্মগ্রহণ করিয়াছে,—এখনও প্রথম বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই। কিন্তু এই অল্পদিনেরই মধ্যে এই ক্ষীণাঙ্গী প্রভার যে জ্যোতিঃ

দেখা দিয়াছে, তাহা আশাপ্রদ। আমরা ইহার কয়েক সংখ্যা পাঠ করিয়া প্রীতি-লাভ করিয়াছি।

রাবণবধ কাব্য—(প্রথম খণ্ড) শ্রীহরগোবিন্দ লস্করবিরচিত ও প্রকাশিত। কাব্যের উপক্রমণিকাবস্তেই কয়েকটী কথায় গ্রন্থকারের আশা ও আশঙ্কা যুগপৎ উদ্ভাসিত হইয়াছে। আশা অপেক্ষা আশঙ্কারই কারণ প্রবল-তর, কেননা বঙ্গভাষার এপর্য্যন্ত যে সকল প্রণালীতে পদ্য বিরচিত হইতেছে, ইনি সে সকল প্রণালী অবলম্বন না করিয়া বহুবিধ সংস্কৃত ছন্দে গ্রন্থখানির রচনা করিয়াছেন। পজ্ঝটিকা, ভুজঙ্গ-প্রয়াত, মালিনী, অনুকূলা, দোধক, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবর্ত্তিত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালীর পক্ষে এই সকল ছন্দ এবং এই ছন্দবদ্ধ কবিতা নূতন ও নীরস বলিয়া প্রতীত হইবে। কবিবর মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গালায় ব্যবহার করাতে প্রথম কত বিড়ম্বিত হইয়া-ছিলেন; সুখের বিষয় কালে তাঁহার জয়লাভ হইয়াছে। তিনি একটী নূতন ছন্দ প্রবর্ত্তিত করাতে তাঁহার বিরুদ্ধে যখন তত কূট সমালোচনা হইয়াছিল, তখন হরগোবিন্দ বাবু এককালে অনেক গুলি সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে স্থাপন করাতে যে সহজেই সিদ্ধমনোরথ হইবেন, তাহা আশা করা যায় না। এরূপ সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কাব্য-রচনার একটী প্রধান অন্তরায় এই যে, ছন্দের রহস্যভেদ করিতে যাইয়া পাঠক ভাবগ্রহণে অশক্ত হইয়া পড়েন। সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কাব্য লিখিতে গেলে লঘুগুরুত্বের অনুরোধে অনেক নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে হয়, সংস্কৃত ব্যাকরণের আশ্রয় লইয়া যে সকল ভাব সহজে সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত ছন্দে বিন্যস্ত করিতে পারা যায়, বাঙ্গালা ব্যাকরণের আশ্রয়ে সেই সকল ভাব সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা ভাষায় প্রস্ফুটিত করা বড়ই কঠিন। ইহাতে বড়ই সতর্কতা ও সাবধানতা এবং বিপুল আয়াস ও পরিশ্রম আবশ্যক। লস্কর মহাশয়ের রাবণবধে যদিও ইহার একটীরও অভাব নাই, তথাপি

"স্ববিক্রমে প্রসপিধে স্বিবৎগৃহে ছিন্নাস্তরে,
(নৃপেন্দ্র অদ্য উক্তিলেন্) স্বকায্য সদ্য উদ্ধরে।
"বিনিদ্দিশশ্রেষ্ঠ সদ্ভক্তি ধন্তে,
নিযুক্ত ভৃত্য প্রভুকার্য্য জন্তে।"

ইত্যাদি কবিতায় "উক্তিলেন্" "সদ্ভক্তিধন্তে" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ সমী-চীন হয় নাই। সুখের বিষয় এইরূপ শব্দ সমগ্র গ্রন্থে দুই চারিটীর বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা হর-গোবিন্দ বাবুর উদ্যমের প্রশংসা না করিলেও তাঁহার যত্ন, অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি যদি বাঙ্গালা মিত্রাক্ষ-রাদি ছন্দে "রাবণবধ" রচনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ হয়ত একখানি সুন্দর কাব্য হইত। বহুদিন পূর্ব্বে এই-রূপ ছন্দে কর্ণার্জ্জুন কাব্য নামে একখানি বাঙ্গালা কাব্য রচিত হইয়াছিল, এই কারণেই তাহা সাধারণ্যে পরিগৃহীত হয় নাই।